কালকূট-রচনা : বিষয় ভাবনা ও শিল্পরূপ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে
পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য উপস্থাপিত
গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

বনানী মণ্ডল

সেনপাড়া, জলপাইগুড়ি

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মঞ্জুলা বেরা

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

LIBRARY
DARJEELING

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
২০১৫

Th
80.01
বনা/কাল

278429
31 MAR 2016

Declaration

I declare that the thesis entitled "কালকূট-রচনা : বিষয় ভাবনা ও শিল্পরূপ" has been prepared by me under the guidance of Dr. Manjula Bera, Professor of Bengali, Department of Bengali, University of North Bengal. No Part of this thesis has formed the basis for the award of any degree or fellowship Previously.

Banani Mandal

[Banani Mandal]
Research Scholar
Department of Bengali
University of North Bengal
Rajarammohanpur
Darjeeling-734013

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

nbubangla@gmail.com
telephone 0353-2776 352

রাজা রামমোহনপুর, ডাকঘর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, থানা মাটিগাড়া, মহকুমা শিলিগুড়ি, জেলা দার্জিলিং - ৭৩৪ ০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

পত্র সংখ্যা..... তারিখ.....২০.....

Certificate

I Certify that Banani Mandal has prepared the thesis entitled "কালকূট-রচনা : বিষয় ভাবনা ও শিল্পরূপ" for the award of Ph.D. Degree of the University of North Bengal, Under my guidance. She has carried out the work at the Department of Bengali, University of North Bengal.

Manjula Bera 2/1/2015

[Dr. Manjula Bera]
Professor of Bengali
Department of Bengali
University of North Bengal
Rajarammohanpur
Darjeeling -734013

প্রাক্‌কথন

কালকূট তথা সমরেশ বসুর সাহিত্য নিয়ে পর্যাপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বিষয়ক গ্রন্থ আমার চোখে পড়েনি। সেই অসম্পূতাই আমাকে এই কাজে হাত দিতে উৎসাহী করেছে। এ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য নিয়ে তেমন গবেষণামূলক কাজ হয়নি। কালকূটের 'অমৃতকূটের 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'কোথায় পাবো তারে' ও 'শাম্ব'-র মুগ্ধতাই আমাকে এই গবেষণার কাজে ব্রতী করেছে। এক অজানা বাঁশীর সুরে লেখক কালকূট বারে বারে ঘর ছেড়ে পথে বেড়িয়েছিলেন। তাঁর সেই চলার অভিজ্ঞতা লেখনীর তুলিতে তিনি যেভাবে চিত্রিত করেছেন সেই চিত্রলেখার যাদুতে সম্মোহিত হয়ে মনপবনে তাঁর চলার পথে নদী-পর্বত-সাগর-অরণ্য-মন্দির-মসজিদ-হাটে-মাঠে-ঘাটে-ঘুরে বেড়িয়ে আমি এই গবেষণার কাজটি সমাপ্ত করেছি। সেই আমার প্রিয় লেখক 'কালকূট'কে জানাই অন্তরের শদ্ধাঞ্জলি।

এই বিস্তৃত পর্যালোচনার তত্ত্বাবধান এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। এই গবেষণা তত্ত্বাবধানের কাজে তাঁর প্রয়োজনীয় মূল্যবান নির্দেশ, অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রেরণা আমার জীবনের পরম প্রাপ্তি। তাঁর কোমল-কঠোর স্নেহপূর্ণ সাহচর্যে আমি এই গবেষণার কাজটি শেষ করতে সমর্থ হয়েছি। তিনি যদি আমাকে কঠিনে-কোমলে না বাঁধতেন তাহলে হয়ত আমার এই গবেষণার কাজটি অসম্পূর্ণই থেকে যেত। তিনি চির নমস্যা আমার কাছে।

এই গবেষণার কাজে আমাকে প্রয়োজনীয় বই সরবরাহ করেছেন কলকাতা দে'জ পাবলিশিং ও আনন্দ পাবলিশার্স। এই জন্য আমি ওই সংস্থাগুলোর কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়া আমাকে প্রয়োজনীয় বইপত্র সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছেন জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার, 'আজাদহিন্দ পাঠাগার' জলপাইগুড়ি, কোচবিহার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও অন্যান্য গ্রন্থাগারের মাননীয় গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। তাঁদের কাছে আমি ঋণী। আমার সমস্ত কাজে সহায়তা করার জন্য আমার ছোট বোন প্রান্তিকা মণ্ডল, ভাই স্বরূপ মণ্ডল ও অনুজ প্রতিম অনিমেষ দেবনাথ এদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এছাড়া আমার বন্ধু-স্বজন ও অন্যান্য ব্যক্তি যারা আমাকে এই কাজের পূর্ণাঙ্গ রূপটি দিতে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আজীবন শিক্ষাবিষয়ক প্রেরণা দিয়েছেন আমার পিতা শ্রী শ্রীদাম মণ্ডল ও মাতা শ্রীমতী পারুল মণ্ডল। তাঁদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। জলপাইগুড়ি জেলা রাজগঞ্জ পশ্চিম মণ্ডলের গান্ধীনগর হিন্দী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় বিনয় কুমার চক্রবর্তী মহাশয় ও আমার শুভানুধ্যায়ী শ্রী ধনঞ্জয় বর্মন এঁদের কথা না বললে মনের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করব। এঁরা দুজনেই আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। এদের আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ও নমস্কার জানাই।

পরিশেষে গবেষণা অভিসন্দর্ভের মুদ্রণে জন্য 'এস. ডি ইম্প্রেশন' কোচবিহার, সুজিৎ রায়, মনোজিৎ বর্মন, শিব মন্দির, দার্জিলিং এবং বাঁধাইয়ের কাজে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন, তাদের সকলকে জানাই অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

জানুয়ারি ২০১৫

সেন পাড়া, জলপাইগুড়ি

পিন : ৭৩৫১০১

গবেষিকা

বনানী মণ্ডল

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা ১ - ৪

প্রথম অধ্যায় ঃ কালকূটের ব্যক্তিসত্তার পরিচয় ৫ - ৩২

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ কালকূটের রচনাবলীর বিষয়গত শ্রেণীকরণ ৩৩ - ৩৮

তৃতীয় অধ্যায় ঃ কালকূটের মানবজীবন কেন্দ্রিক রচনাবলীর বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ ৩৯ - ৩৮২

চতুর্থ অধ্যায় ঃ কালকূটের ইতিহাস-পুরাণ-মহাকাব্য কেন্দ্রিক রচনাবলীর বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ ৩৮৩ - ৬৭৯

পঞ্চম অধ্যায় ঃ কালকূট রচনা ঃ বিষয়ভাবনা ও শিল্পরূপ ৬৮০ - ৭৪৯

উপসংহার ঃ ৭৫০ - ৭৫৬

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ঃ ৭৫৭ - ৭৬২

ভূমিকা

বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' (১৯৫৪) লেখার মধ্য দিয়ে কথা সাহিত্যিক সমরেশ বসুর 'কালকূট হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। কথাসাহিত্যের কালটাকে আমরা উপন্যাসের আমরা উপন্যাসের কাল হিসেবে ধরতে পারি। উনিশ শতকে কথাসাহিত্যের যে ধারাটি বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে চলে আসছিল সেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হয়ে বিশতকের কল্লোলের কোলাহলে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসুর কথা-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা সাহিত্যের মধ্যে অন্যমাত্রা পাওয়া যায়। তারপর চল্লিশের দশকের সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র এঁদের কথাসাহিত্যে নানা সুর ও স্বরকে খুঁজে পাই। এই স্বতন্ত্র ধারার মধ্যে সমরেশ বসু ১৯৪৬-এ 'আদাব' গল্পের মধ্যদিয়ে সাহিত্য জগতে অনুপ্রবেশ করেন। সমরেশ বসুই 'কালকূট' ছদ্মনামে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'-এর মাধ্যমে অন্যরূপে সাহিত্যের জগতে অনুপ্রবেশ করেন। ১৯৪৬-এ 'আদাব' ছোটগল্প থেকে যে ধরনের লেখাগুলো সমরেশ বসু লিখেছেন 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' তার সত্তাগত পার্থক্য লক্ষ্য করা গেল।

সমরেশ বসুর 'কালকূট' নামে সাহিত্য জগতে পরিচিতি 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' -এর মাধ্যমে হলেও এই নামে এটি তার প্রথম রচনা নয়। এর আগে ১৯৫২-তে 'ভোট দর্পণ' নামে ছোট একটি লেখার মধ্য দিয়ে 'কালকূট'-রে সাহিত্যজগতে প্রথম অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এই ছদ্মনামের আড়ালেই ১৯৫২-তে শিল্পাঞ্চলে বাঙালীবিহারী বিরোধের নোংরা রাজনীতির মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছিলেন। দৃপ্ত নির্ভিকতায়। তবে এই ধরণের রাজনৈতিক রচনার সমাপ্তি ঘটেছিল ওই একটি রচনাতেই। 'কালকূট' নামের ব্যাপক পরিচিতি ঘটেছিল 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'-এর মধ্য দিয়ে 'সমরেশ বসু' সৃষ্ট 'কালকূটে'র আসল নাম কোনটি? 'সমারেশ বসু'-র আসল নাম ছিল 'সুরথ নাথ'। তাঁর বন্ধু তথা শ্যালক দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া নাম হল 'সমরেশ' ঢাকা শহরের মোহনীমোহন বোসের অষ্টম সন্তান ছিলেন 'সুরথনাথ'। পাঠশালার প্রথাগত পড়াশুনায় তাঁর মন বসতো না, পাঠশালা পালিয়ে চলে যেতেন প্রকৃতির কাছে পাঠ নেওয়ার জন্য কখনো বুড়িগঙ্গার তীরে, কখনো শ্মশানে, কখনো 'রমনা'র ধানমণ্ডীর মাঠে, আবার কখনো বাল্যসঙ্গি নী রাজলক্ষ্মীর হাত ধরে কলুটোলার দোলাইখালের ধারে রামসীতার মন্দিরে, এমনি আরও নিষেধের বেড়ি ভাঙা ছিল তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। নিয়মের শাসন তাঁকে করে তুলেছিল বিদ্রোহী। ঢাকার অলিগলি, বুড়িগঙ্গার চোরা টান ও মোহনার আকর্ষণ তাঁকে বাল্যকালে বারবারে ঘরছাড়া করেছে। এক বেদুইনমন

তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। নৈহাটি-জগদ্দল গঙ্গার তীরে এসেও তাঁর সেই চলা থামে নি। দ্বিতীয়বার ঢাকা থেকে এসেছিলেন নৈহাটীতে বড়দার কাছে, ইচ্ছে ছিল আর্ট স্কুলে ভর্তি হবেন। কিন্তু আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়া তাঁর হয়নি। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় শেখার তালিম নেওয়া, তাও হয়নি। ছাত্র জীবনের অকাল মৃত্যু ঘটেছিল তাঁর নিজের হাতেই। সেই ঘর বিবাগী, প্রকৃতি প্রেমিক 'সুরথনাথ' ১৯৪৬-এ 'সমরেশে' লীন হয়ে যান। তাইতো 'সমরেশ বসু'র সত্তার মধ্যে 'বালক সুরথনাথই' বারে বারে উঁকি দিয়ে গেছে। 'সুরথ নিশি'র হাতছানি দেখেছিলেন 'সমরেশ বসু'। এই সুরথ নিশি'ই সমরেশ বসুকে তীব্রবেগে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে। তাই সমরেশ বসু তার প্রথম সত্তা 'সুরথনাথ'কে কালকূট চরিত্রের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছিলেন ১৯৫৪-তে। সুরথনাথের ঘরবিবাগী বাউল মন কালকূট চরিত্রের নিরাসক্ত 'বাউল মনের' সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে।

'কালকূট' সমরেশ বসুর দ্বিতীয় সত্তা। সাহিত্য জগতে কালকূটের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এক নতুন রচনাশৈলীর সম্ভার নিয়ে যা সমরেশ বসুর রচনাশৈলী থেকে আলাদা। একই মানুষের দ্বৈত সত্তা 'কালকূট' ও 'সমরেশ'। 'কালকূট' যার অর্থ হলো 'মহা হলাহল'। এই নাম কেন নিয়েছেন 'গাহে অচিন পাখি' (১৯৮২) তে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। ''লেখার কথা বলার আগে, নামকরণের ভাবনাটাই আগে মনে আসে। একথা বিদিত সংসারে, জানেন সর্বলোকে, ছদ্মনামের প্রয়োজন হয়, নামের আড়ালে নিজেকে ব্যক্ত করা। এমন না যে সংসারেতে এসেছিলেম কিছু কথা বলবো বলে। বরং বলতে হয়, 'আমি একদিনও না দেখিলাম তারে আমার ঘরের কাছে আরশিনগর এক পড়শী বসত করে'। — গানখানি যে অর্থে লালন গেয়েছিলেন, বলতে গেলে একদিক থেকে আমারও সেই অর্থেরই স্মরণ। আসলে তো আরশীনগরটি তাঁর আপন দেহ, পড়শী হলেন তাঁর সাধক সত্তা। যাকে তিনি সন্ধান করেছেন দেখতে চেয়েছেন। কেননা, তাঁর সাধন ভজনে যা-কিছু সবই যে দেহ-ভাণ্ডে অবস্থিত।

কিন্তু আমি তো সাধক না। অতএব বলি, নামের আড়াল থেকে নিজেকে ব্যক্ত করা কথাটা তেমন কতসই লাগছে না। বরং আমার আরশীনগর যদি হয় জগৎ ও জগৎজন, তাদের মধ্যে আমার পড়শী সত্তাটিকে সমানই নামের আড়ালে ঘুরা ফেরা। ইংরেজীতে একে আইডেন্টিফিকেশন বলে নাকি? যা খুশি বলুক গিয়ে। ওতে আমি নেই। যা বলেছি তা-ই আড়াল দিয়ে খুঁজে ফিরি বোধ হয় নিজেকেই। তারই নাম কালকূট।'' (পৃ. ৩১, কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড)

সমরেশ বসুর রচনাগুলোর মধ্যে সমকালীন সমাজের জীবনচিত্র উঠে এসেছে। তিনি সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক-পারিবারিক জীবন, যুবসমাজের জীবনযন্ত্রণার চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর গল্প উপন্যাসে। তার সব উপন্যাসই কমবেশি সমাজ সচেতন, শোষণ-বিরোধী এবং উল্লেখযোগ্য সমস্ত উপন্যাসেই রচিত হয়েছে সত্তরের দশকের সময় থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তাঁর রচিত

উপন্যাসগুলো 'উত্তরবঙ্গ' (১৯৫১), 'গঙ্গা' (১৯৫৭), 'বাঘিনী' (১৯৬৩), 'জগদ্দল' (১৯৬৬), 'বিবর' (১৯৬৫) 'প্রজাপতি' (১৯৬৭), 'স্বীকারোক্তি' (১৯৬৭), 'ঘাতক' (১৯৬২), 'বিশ্বাস' (১৯৭১), 'মানুষ শক্তির উৎস' (১৯৭৪), মহাকালের রথের ঘোড়া' (১৯৭৭), 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' (১৯৮৪) 'বাথান' (১৯৮৫), 'তিনপুরুষ' (১৯৮৬), 'খণ্ডিতা' (১৯৮৭), 'দশদিন পরে' (১৯৮৬) 'এপার-ওপার' (১৯৬৮), 'টানাপোড়েন' (১৯৮০), 'ওদের বলতে দাও' (১৯৭২), 'গন্তব্য' (১৯৭৮) ইত্যাদি। এছাড়া 'উরাতীয়া (১৯৫৪), 'আলোর বৃত্তে' ১৯৬২), উত্তাপ' (১৯৫৬), অকাল বৃষ্টি' (১৯৫৩), ছেঁড়া তমসুক' (১৯৭১),স্রষাধ্বনি' (১৯৭৩), 'অকাল বসন্ত' (১৯৫৩), 'সোনাটারবাবু' (১৯৫৩), 'ত্রিধারা' (১৯৫৬) , 'মরশুমের একদিন' (১৯৫৩), মানবের নানা পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে সে দুঃসহ সংঘাত রয়েছে সেগুলোই কালের মানসিকতা নিয়ে সমরেশ তুলে ধরেছেন তরবারির ফলার তীক্ষ্ণতার মতো নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গিতে।

তাইতো তিনি প্রচলিত সাহিত্য রীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন 'বিবর' উপন্যাসের মধ্য দিসয়। এক লড়াকু সংগ্রামী বাস্তববাদী লেখক সত্তার পরিচয় মিলেছে 'সমরেশ বসু' নামে লেখা গল্প উপন্যাসগুলোতে। কিন্তু কালকূটের লেখায় ধরা পড়ে তিনি আত্মার আত্মীয় হতে চান। কালকূট ভ্রমণের মেজাজে বেড়িয়েছিলেন, কিন্তু সেই ভ্রমণ যে তাকে এতরকম অভিজ্ঞতায় ভরিয়ে দিতে পারে এ তিনি ভাবতে পারেন নি। সামাজিক পারিবারিক জীবনের বাইরে পথ চলতে চলতে মানুষের মধ্যে এত বৈচিত্র্য দেখেছেন যে তার ভ্রমণ কাহিনী থাকেনি। জীবন দর্শনের বিরাট রূপ উঠে এসেছে কালকূটের লেখনীতে। এই পথ চলতে চলতেই তিনি বিভিন্ন রকমের মানুষের সঙ্গে পরিচিত মানব জীবন অন্যরূপে চিনেছেন, জীবনাচারের সঙ্গে। কোন সামাজিক বা পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে থেকে মানুষের এত বৈচিত্র্যকে তিনি দেখেননি, দেখেছেন পরিচিত গণ্ডীর বাইরে, যা থেকে অনুভূতি হয়েছে এক নতুন জীবন দর্শন। ভ্রমণে বেড়িয়ে কালকূট তাঁর এই নতুন জীবন দর্শনের কথাই বলেছেন তার কাহিনী গুলিতে। ১৯৫৪-তে 'অমৃকুম্ভের সন্ধানে'-এর মধ্যদিয়ে তার সেই দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা বলা। কালকূটের সাহিত্যে ভ্রমণের মধ্যে উঠে এসেছে সেইসব মানুষের কথা--- অভিনব পট-পরিবেশ আমাদের চারপাশে লুকিয়ে থাকা অন্য মানুষের কথা যা ধরা পড়েছে রূপসন্ধানী কালকূটের সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে। তাই কালকূট তাঁর কাহিনীতে মানবমনের সুক্ষ্ম মনঃস্তত্বের কথাই আমাকে আকৃষ্ট করেছে এই গবেষণামূলক কাজটি করতে। কালকূটের রচনার মধ্য দিয়ে যেভাবে মানব মনের বৈচিত্র্য অনুসন্ধান চলেছে তার বিস্তৃত রূপরেখা নির্ণীত চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণা কাজে। ফলে কালকূটের রচনাবলীকে বিষয়ানুক্রমে শ্রেণীকরণ করে তার অর্ন্তনিহিত মূল বক্তব্যকে চিহ্নিত করে শিল্পিত রূপের সার্থকতার দিকটিও আলোচনায় আনা হয়েছে।

কালকূটের রচনাগুলির মধ্যে বিষয়বৈচিত্র্য এবং লেখকের মনোভঙ্গি ও আত্মানুসন্ধানকে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের সমগ্র গবেষণা কাজটিকে নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলিতে বিভাজন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় ঃ কালকূটের ব্যক্তিসত্তার পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ কালকূটের রচনাবলীর বিষয়গত শ্রেণীকরণ

তৃতীয় অধ্যায় ঃ কালকূটের মানবজীবন কেন্দ্রিক রচনাবলীর বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ

চতুর্থ অধ্যায় ঃ কালকূটের ইতিহাস-পুরাণ-মহাকাব্য কেন্দ্রিক রচনাবলীর বিশ্লেষণ

পঞ্চম অধ্যায় ঃ কালকূট রচনা ঃ বিষয়ভাবনা ও শিল্পরূপ

উপসংহার

পরবর্তী আলোচনাতে উক্ত অধ্যায়গুলির শিরোনামের দিকে লক্ষ্য রেখে কালকূটের রচনার সারসত্তা নির্ণয়ের চেষ্টা রয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

কালকূটের ব্যক্তিসত্তার পরিচয়

কথাশিল্পী কালকূটের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল 'ভোটদর্পণ' নামে ছোট একটি রাজনৈতিক লেখার মধ্য দিয়ে। সেই আত্মপ্রকাশটি ঘটেছিল ১৯৫২ সালে। আর 'কালকূট' স্রষ্টা সমরেশ বসুর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ১৯৪৬ সালে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত ঢাকা শহরের পটভূমিকায় এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদী লেখা 'আদাব'-এর মাধ্যমে। আর 'কালকূট' নামে লেখকের রাজনৈতিক লেখাটি ঐ একটি লেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। লেখক কালকূট আর কখনও রাজনৈতিক লেখা লেখেননি। ১৯৫৪ সালে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'র মাধ্যমে কালকূট তাঁর নিরাসক্ত বাউল-মনকে পাঠকের সামনে হাজির করলেন অন্য আঙ্গিকে। সম্পূর্ণ নতুন রচনাশৈলী নিয়ে কালকূটের আবির্ভাব হয়েছিল যা বাঙালী পাঠককুলকে প্রাণের আবেগে উদ্বেলিত করে তুলেছিল। সমরেশ বসুর লেখনীশৈলী থেকে আলাদা কালকূটের লেখনীশৈলী। একই মানুষের দ্বৈত সত্তা — 'সমরেশ' ও 'কালকূট'। একদিকে সমাজ সচেতন-লড়াকু-সংগ্রামী-প্রতিবাদী-বাস্তববাদী লেখকসত্তা আর একদিকে বাউলমনের নির্বিকার সত্তা, যে মানব-মন অন্বেষণে পথে পথে বেরিয়ে পড়ে। এখন এই 'সমরেশ বসু' ও 'কালকূট' এই দুই ভিন্ন সত্তা কীভাবে কাজ করে গেছে এটাই আলোচনা করা হবে নানান ঘটনাবলীর মাধ্যমে।

১৯৪৬ থেকে ১৯৮৮-র মার্চ পর্যন্ত প্রায় চার দশক ধরে সমরেশ বসু ও কালকূট প্রয়াগের গঙ্গাযমুনার স্রোতধারার মতো কলমের দুই ধারায় জাল বুনে বিচিত্র পটভূমি, বিচিত্রভাবনা, জীবনের ভাঙাগড়া, সুখদুঃখের খুঁটিনাটি চিত্র ও মানবমনের আন্তরভূমিকে নিপুণ চিত্রকরের মতো চিত্রায়িত করে বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। নিকট দূরত্বে বাইরে দেখে বা চোখের দেখাকে কল্পনার জাল বুনে লেখাকে প্রাণবন্ত করে তোলেন নি। ব্যক্তিজীবনের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, অন্তরঙ্গ অনুসন্ধানই ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন পটপরিবেশের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যে উপস্থিত করেছেন। যে কোন পরিবেশে যে কোন মানুষের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশে যেতে পারতেন। ভদ্রতার আবরণ, অহঙ্কারের আভরণ আর আভিজাত্যের কৌলিন্যকে দূরে সরিয়ে রেখে তিনি হয়ে যেতেন তাদের আপনজন, একেবারে অতি কাছের মানুষ।

তিনি ছিলেন আশ্চর্য গল্প বলিয়ে কথকঠাকুর। এই গুণ তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মা ও বাবার কাছ থেকে। মা শৈবলিনী দেবী ও পিতা মোহিনী মোহন বোসের অষ্টম সন্তান ছিলেন সুরথনাথ। সমরেশ বসুর বাল্যকালে নাম ছিল সুরথনাথ। অদ্ভুত এক ক্ষ্যাপামি বারে বারে সুরথনাথকে ঘরছাড়া করেছে। তাঁর মা বলতেন অষ্টম গর্ভের ছেলে একটু অন্যরকম হয়। তার মা

ছিলেন আশ্চর্য কথকী। পৌষের নিশাকালে বাতি নিভিয়ে তিনি ব্রতকাহিনী বলতেন। রোমাঞ্চকর ব্রতকাহিনী রাতের আঁধারে কালকূটকে এক অজানা কল্পলোকে নিয়ে যেত। সেইসব কাহিনী বন্ধুদের বলতে গিয়ে নিজের কল্পনাকে মিশিয়ে দিয়ে ব্রতকাহিনীকে উপভোগ্য করে তুলতেন। শৈশবেই মনের অবচেতনে উত্তরকালের কথাশিল্পীর বীজ বোনা হয়ে গিয়েছিল। মা-ই ছিলেন ভাবীকালের কথাচিত্রশিল্পীর প্রথম প্রেরণাদাত্রী। আর পিতা? তিনি ছিলেন সংসার উদাসীন। জমিদারি এস্টেটে চাকরি করতেন কিন্তু চাকরির গুরুত্ব তাঁর কাছে ছিল না। গুরুত্ব ছিল রামায়ণের পাঠকতা আর পাঁচালীর গায়কীতে। কথা-কাহিনীকে তিনি নাটুকে ভঙ্গিতে পরিবেশন করতেন মহিলা-পুরুষের জমজমাট আসরে। রসিক গায়ক ছিলেন তিনি। ব্যবসা করতে গিয়ে বারে বারে ব্যর্থ হয়েছেন। শহরে বা গ্রামে কোথাও কোন পেশাতেই তিনি সাফল্য লাভ করেন নি। সংসারে কোনো সমস্যা দেখা দিলেই তাঁর সংসার বৈরাগ্য আসত। তিনি বেরিয়ে পড়তেন তীর্থদর্শনে। সেইজন্য তাঁর সংসারে তেমন সচ্ছলতা কখনও আসেনি। কিন্তু অর্থের চিন্তাও তেমন ছিল না। জ্যেষ্ঠপুত্র মাতুলালয়ে মানুষ হয়েছিল। মাতুলালয়ের মাধ্যমেই মাত্র ঊনিশ বছর বয়সে জ্যেষ্ঠপুত্র রেলের চাকরিতে ঢুকেছিল। অর্থকরী দায়িত্ব পুত্রের ওপরেই পড়েছিল। তাঁর পিতার সংসার উদাসীনতা, সংসার বৈরাগ্য, রসিক গায়কী সবকিছুই প্রভাব ফেলেছিল বালক সুরথনাথকে যা সমরেশ বসুকে কালকূট হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

শুধু তাঁর পিতা কেন? ছোট কাকাও ছিলেন বাউন্ডুলে চিত্রশিল্পী। শিল্পচর্চা একটু জমে উঠলেই তাঁর ডানায় কাঁপন লাগত। মাঝে মাঝে তিনিও উধাও। কোথায় শিল্পচর্চা? রং, তুলি, ইজেল সব ধূলায় গড়াগড়ি। আর সুরথনাথের মনে রং তুলিই নেশা ধরিয়ে দিত। রং তুলি নিয়ে আঁকতে বসে মেতে যেতেন কল্পনাকে ইচ্ছে মতন রাঙিয়ে দিতে। কখনও কখনও ছোটকাকাও তাঁকে রং-তুলির খেলায় মাতিয়ে দিতেন। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন যখন সবাই ঘুড়ি লাটাইয়ে মন দিত তখন সুরথনাথের মন লেগে থাকত রং-তুলি-ইজেলে। তাঁর দিদি ও মেজদা আঁকাকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। ওঁদের গুরুত্ব ছিল পাঠ্য বিষয়ে। কিন্তু সেখানে সুরথনাথ আপনভোলা। পড়ার বিষয়ে মন নেই কিন্তু রচনা লিখতে দিলে? নিজের কল্পনা সেখানে ডানা মেলবে যে, তাই রচনা লিখতে উৎসাহী। সুরথনাথের রক্তের মধ্যেই ছিল ঘরবিবাগী স্বভাব তাই কাকার শিল্পচেতনা 'সমরেশ বসু'র ভাবীকালকে সমৃদ্ধ করেছিল। তিনি তাঁর কলমকেই তুলি করে ভিন্ন ভিন্ন পটপরিবেশে মানবজীবনকে চিত্রায়িত করেছেন। লালবাগের কেল্লা, বুড়িগঙ্গার চোরা টান, নৌকার বেদেনীদের সঙ্গ সবই তাঁকে বারে বারে ঘরছাড়া করেছে। হাতে তামার দু'পয়সা পেতেই ডিঙি নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছিল একাই বুড়িগঙ্গায় যাবে বলে। বড় নৌকার মাঝিরা তাঁকে উদ্ধার করে এনেছিল নিশ্চিত বিপদের মুখে পড়ার আগে। ছোট নাও বুড়িগঙ্গায় পড়ার আগেই উদ্ধার

পেয়েছিল। লালবাগের কেল্লা, ঢাকার বুড়িগঙ্গার চোরা স্রোত, পাখ-পাখালি, গাছপালা প্রাকৃতিক পরিবেশ সবকিছু সুরথনাথের মনে বৈরাগ্যের ছায়া ফেলেছিল। তাঁর ভাবুক মন অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে থাকত। তাই সে একদিন বুড়িগঙ্গার তীরে উদাস চোখে নদীর স্রোত, বিভিন্ন ধরনের নৌকা, লোকজন দেখতে দেখতে আবার অজানা পথে পা বাড়িয়েছিল। বাবু একটা পয়সা দ্যান, এই ধ্বনিতে মোহগ্রস্ত হয়ে পশ্চিম সর্দার ঘাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন — - 'বাবু একটা পয়সা দ্যান' বলে। পায়ে পায়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন ঘোরের মধ্যে, তাই মতিমহল বায়োস্কোপের কাছে বাবার চেনা শিশির ডাক্তারবাবুর কম্পাউন্ডার পাকড়াশীকে চিনতে না পেরে তারই কাছে হাত পেতেছিলেন। এই ক্ষ্যাপামির উত্তর দশ বছরের বালক দিতে পারেনি সেদিন।

এই ক্ষ্যাপামিই তাঁকে স্কুলের প্রথাগত পাঠও শেষ করতে দেয়নি। পাঠশালায় গুরুর শিক্ষা তাঁর ভালো লাগত না তাই স্কুল পালিয়ে চলে যেতেন প্রকৃতির কাছে পাঠ নিতে। জায়গাটা এমন বেছেছিলেন ভাবলেই আশ্চর্য লাগে — মানুষের শেষগতি যেখানে, সেই শ্মশানে। কেউ তাঁকে দেখে ফেলবে না সেইরকম একটা নিরিবিলি স্থানে বসে চিন্তা-ভাবনার জাল বুনে যেতেন। বুড়িগঙ্গায় বয়ে যাওয়া স্রোতে নৌকার চলাচল দেখতে দেখতে প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধে ডুবে যেতেন। স্বভাব বৈরাগ্য শৈশবকাল থেকে সুরথনাথকে গ্রাস করেছিল। অজানার হাতছানিতে তাঁর কৌতূহলী মন শৈশবকাল থেকে বারে বারে বিপদের মুখে পড়েছে তবুও মন দমে থাকেনি। তাই আবার ওই শ্মশানের কাছেই একটি টিনের চালাঘরে শেয়ালের গর্ত দিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন। ঘরে ঢুকেই ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলেন, সামনে দুটো লাশ ছিল। তা দেখে ওই গর্ত দিয়ে আর বেরোতেই পারেন নি। ডাক্তার ছাত্ররা এসে যখন দরজা খুলেছিল তখন বহু বিড়ম্বনার মধ্য দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। বই পড়ে রইল লাশকাটা ঘরে আর সুরথনাথ পড়ার টেবিলে 'অনধিকার প্রবেশ' নিয়ে লিখতে বসে কল্পনার ডানায় ভর করে উড়ে গিয়েছিলেন ভাবরাজ্যে। বাড়ীতে সবাই জানতে পারলে তার যে কঠিন শাস্তি হবে এ ভাবনাও সেই মুহূর্তে ভুলে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্যই অসুস্থও হয়েছিলেন। এমনি ছিল তাঁর কৌতূহলী মন যা সমরেশ বসুকে ভাব বৈরাগ্যের বৈচিত্র্যে পৌঁছে দিয়েছে।

সুরথনাথের হাতছানিতে কালকূট নব নব রূপে তাঁর সৃষ্টিকে পাঠককুলের সামনে তুলে ধরেছেন। জীবনের কঠিন সময়ে মস্তিষ্ককে কীভাবে স্থির লেখনীর মাধ্যমে কল্পনার রাজ্যে পৌঁছে দেওয়া যায়, এই প্রেরণার বীজটি শৈশবকালে তাঁর ডাকাবুকো স্বভাবের মধ্যে নিহিত ছিল। বাবার উদাসী মনে বাউলের হাতছানি ছিল, তিনি মাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। সুরথনাথ মিথ্যা বলে তাড়াতাড়ি পাঠশালা থেকে এসে দেখেছিলেন ভো ভো।

সবাই চলে গেছে, তাঁকে সঙ্গে নেননি মা-বাবা। মনের দুঃখের কথা তাঁর বন্ধু বলু জানতে পেরেছিল। বড় একটা ইলাস্টিক দেওয়া ইজের পড়ত। কোটটা পিলেতে ফোলা ছিল, সেই ইজেরটা সবসময় একহাত ধরে রাখত। বলুর সঙ্গে মেশাটা তাদের বাড়িতে কেউ পছন্দ করতেন না তবু নিয়মের ঘেরাটোপে কেউ সুরথনাথকে বেঁধে রাখতে পারেনি। সুরথনাথ তাই স্কুল পালিয়ে বলুর সঙ্গে রমণার মাঠ পেরিয়ে ধানমন্ডীর পাহাড় দেখতে গিয়েছিলেন। ছোট্ট বলু সৈনিকের পুরনো চাঁদমারির ঢিপিকে পাহাড় বলে মনে করেছিল তাই ওকে নিয়ে গিয়েছিল। অনেকখানি রাস্তা পেরোতে দশ বছরের বালকের পা ফুলে গিয়েছিল, চোরকাঁটায় ভরে গিয়েছিল পোশাক; তবুও পাহাড় দেখেছিল। পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে যাওয়া বড় বড় গাছের ছায়া, ঝোপঝাড়ের গলাগলি, তদুপরি পাহাড়ের ওপর অ্যাশশ্যাওড়ার আর কাঁটা গাছের ছড়াছড়িতে একটা ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। বলু ভয় পেয়ে সুরথনাথকে তার কোমরের লোহাটাকে স্পর্শ করে থাকতে বলেছিল। ভয় কাটিয়ে তবু সুরথনাথ পাহাড়ে উঠেছিল। বড় বড় গর্তে পাহাড়টা হাঁ করে ছিল, কিন্তু পাথর বা প্রস্রবণ দেখতে পায়নি। ভূগোলের সঙ্গে তেমন করে মিলিয়ে নিতে পারেনি। তবুও পাহাড়! পাহাড়ের মাথায় উঠে দিগন্ত ব্যাপী রমণার মাঠ, ঢাকা শহর, পাকা রাস্তা, তাঁকে এক মুগ্ধতায় ভরিয়ে দিয়েছিল। বলুর সঙ্গে মনে মনে এই বিশ্বাসে পৌঁছেছিল যে চন্দ্রনাথ পাহাড় হয়ত এমনটিই হবে। দেরীতে বাড়ীতে ফিরেছিলেন ছেঁড়া জামা, চোরকাঁটায় ভর্তি পোশাক নিয়ে দিদির কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। বৌদি তাঁকে দিদির মারের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু পাহাড়ের কথা শুনে সুরথনাথের এক আত্মীয় সম্পর্কিত দাদা মনোতোষদা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে হাসতে হাসতে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ওটা পাহাড় নয়, সৈনিকদের পরিত্যক্ত চাঁদমারির ঢিপি। কিন্তু সুরথনাথের বিশ্বাস হয়নি, মনোতোষদা জানে না! অনেককাল পর্যন্ত সুরথনাথের মনে ধানমন্ডীর পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। সেই পাহাড়ের মোহময় হাতছানি সেই ছোটবেলা থেকেই অন্তরে জাগরুক ছিল যা পরবর্তীকালে কালকূটকে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী অপুই যেন সুরথনাথে এসে ভর করেছিল। সব শিশুই অপু, অপুর চোখের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা; অজানাকে জানবার, অচেনাকে দেখবার আগ্রহ সব শিশুর মধ্যে বিরাজমান থাকে। অপু দিদি দুর্গার সঙ্গে রেলগাড়ি দেখতে গিয়েছিল। দৌড় দৌড় দৌড়। অপু দিদির সঙ্গে অনেকদূর তার কচি পায়ে দৌড়ে গিয়েছিল, তেমন করেই তো বলুর সঙ্গে সুরথনাথ ধানমন্ডীর মাঠ পেরিয়ে পাহাড় দেখতে গিয়েছিল। অপু আর সুরথনাথ মিলেমিশে একাকার। সমরেশ বসুকে এই সুরথনাথ যেমন সারাজীবন ছুটিয়ে নিয়ে গেছে তেমনি তাঁরই সৃষ্ট কালকূটকে অমৃতের তৃষ্ণায় বার বার ঘরছাড়া করে বিশ্বপথিক করেছে। নদী যেমন ছোট্ট

সুরথনাথকে টেনেছে তেমনি করে ওই ছোটবেলা থেকে নারীও ঠিক তাঁরই সমবয়সী মেয়েরাও তাঁকে টেনেছে। নারীর হাতছানিতেও তিনি বরাবরই মোহিত হয়ে যেতেন। একবার বেদেনীদের ডেরায় ভানুমতীর খেল ও ভেল্‌কীতে মুগ্ধ হয়ে দিদির বয়সী সারি বেদেনীর কালো চোখের ঝিলিকে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওই অল্পবয়সেই তার চিরদিনের পুরুষের প্রেমিক মনটি জেগে উঠেছিল সারিনিশির ডাকে সাড়া দিয়ে। শুধু সারি বেদেনীই নয়, মিশুক স্বভাবের জন্য অন্য বেদেনীদের সঙ্গেও অল্প সময়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ঘরে ফেরার কথা তার মনে পড়েনি, তার যাযাবর মন বেদুইন হয়ে গিয়েছিল। বাড়ীর পেয়াদা এসে ওই ডেরা থেকে তাকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত ওদের রঙ্গ সঙ্গেই গা ভাসিয়েছিলেন। বেদেদের কাছে থেকে এই যে অন্য এক ধরনের জীবনপ্রণালীকে উপভোগ করা, তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ এই 'মিলমিশ' পরবর্তীকালে সমরেশ বসুকে কালকূটের লেখার রসদ জুগিয়েছিল। শুধু তাই নয়, বয়সে বড় মেয়েদের প্রতি এই আকর্ষণ পরবর্তী সুরথনাথের জীবনে বিরাট ঝড় তুলেছিল যা থেকে পরিণামে বাঙালী পাঠককুল পেয়েছিলেন একজন বলিষ্ঠ-লড়াকু-সমাজসচেতন প্রতিবাদী লেখক সমরেশ বসুকে। আবার এই সমরেশ বসুকে সুরথনাথ হাতছানি দিয়ে তাঁর ভাবরাজ্যে কালকূটকে সৃষ্টি করেছিলেন।

সমরেশ বসুর ব্যক্তিজীবনে যতই প্রবেশ করা যায় ততই দেখা যায় সর্বত্রই সেই সুরথনাথের নিশি। সুরথনাথের মিলমিশের ক্ষমতা এতই বেশি ছিল সমবয়সী মেয়েদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে ঈর্ষার উদ্রেক হত। যেমন হয়েছিল দিদির ভাসুর-কন্যা হেলেন ও তার বন্ধু সোরির মধ্যে। তেমনটি হয়েছিল মেমী, কমলা, মণি ও পুষির মধ্যে। রাজু অর্থাৎ রাজলক্ষ্মী কেন আলির সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াবে? রাজুর সঙ্গলাভেই তার হৃদয়ের প্রেমিক পুরুষটি জেগে উঠেছিল। ছেলেবেলার বন্ধু রাজলক্ষ্মীকে একদিন পুঁই মেটুলী দিয়ে সাজিয়ে দিয়ে দু'জনে হাত ধরাধরি করে রাজলক্ষ্মীর দিদির সামনে দিয়ে দোলাই খালের বাঁধে রামসীতার মন্দিরে চলে গিয়েছিলেন। পিছনের পরিণামের কথা বোধহয় একবারের জন্যও মনে পড়ে নি। ভাবরাজ্যের আপন খেয়ালে সেই বালক বয়সেই পত্নীনিষ্ঠ রামের মতো তাঁর মনে চির প্রেমিক পুরুষটি জেগে উঠেছিল। জ্যোৎস্না রাতে রামসীতা মন্দিরের ছায়াময় পরিবেশ, মায়াময় ভজনের সুরধ্বনি, রামসীতার ঘাট, কলুটোলার রাস্তা, প্রাকৃতিক পরিবেশ সবকিছু বালক সুরথনাথের হৃদয়ে চিরদিনের প্রেমিক পুরুষের জন্ম দিয়েছিল, যা উত্তরকালে সুরথনাথকে সমরেশ বসুতে পরিণত করেছিল। তাহলে যার সঙ্গে প্রাণের মিলমিশ সে কেন আলির সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতে যাবে এই অভিমানে রাজুর ডাকে সাড়া না দিয়ে নিশ্চিন্দার জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছিলেন। জঙ্গলে ঢুকে নিস্তার ছিল না, সেখানে পিঁপড়েরা তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিল। মাথাভর্তি পিঁপড়ে সহ পিঁপড়ের ডিম নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে ঝাড়াঝাড়ি করার সময় মেমীদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তারা পরিচর্যার জন্য বাড়ীতে নিয়ে যায়। মেমীর সামান্য ত্রুটিতে

ওর দুই বন্ধু কমলা ও মণি চলে যায় আর একজন পুষি দূর থেকে ভ্রূ কুঁচকে মেমীর পরিচর্যা লক্ষ করতে থাকে। মেমীর কাজের মধ্যে একটা অহংভাব, নিজস্ববোধ জেগে উঠেছিল যা দেখে মনে হচ্ছিল যে সুরথনাথের ওপর অধিকার শুধু মেমীরই আছে। চার বন্ধুর মধ্যে আচমকা আসা সুরথনাথকে নিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। রাজুকে শিক্ষা দিতে এসে চার কন্যার মধ্যে তাঁকে নিয়ে আলো-আঁধারি খেলা শুরু হয়েছিল সেটা সেই বালকবয়সেই সুরথনাথ বুঝতে পেরেছিলেন। এই অপরকে বোঝার, তাঁর হৃদয়স্থলে ঢোকার সূক্ষ্মদৃষ্টি তাঁর সেই বালকবয়সেই হয়েছিল। এই সূক্ষ্মবোধে সমরেশ বসু যখন কালকূট হয়ে লেখনী ধরেছেন তখন তিনি মানব-মন সন্ধানী হয়ে ঢুকে পড়েছেন হৃদয়ের অন্তঃস্থলে। এই বোধ, অনুভূতি তাঁর মধ্যে বাল্যকাল থেকে জাগরুক ছিল।

আবার জীবনবোধের তীব্র ঘৃণা, ধিক্কারের জন্মও হয়েছিল বালকবয়সেই। সেখানে তার চিন্তাশক্তি বাস্তববোধকে সজাগ করে তুলেছিল। মণিদি ও নরেনদা, দুটি ভাইবোনে এত প্রভেদ কী করে হয়, ভেবে কূল পেতেন না সুরথনাথ। অল্পবয়সের বিধবা মণিদি তাঁকে আকর্ষণ করত। তাঁর স্নেহের টানে কখনও কখনও সুরথনাথ তাঁর বাল্যসঙ্গিনী রাজুকে নিয়ে তাঁর কাছে যেতেন। মণিদির বিষণ্ণতা সুরথনাথের মনকে স্পর্শ করত। ওই বয়সেই তাঁর মনে হত মণিদির হাসিটা ঠিক হাসি নয়, ওর মধ্যে বেদনা লুকিয়ে আছে। একদিন সুরথনাথ দেখে ফেলেছিলেন মারমুখী মণিদির দাদাকে। যা বোঝবার সেদিনই ওই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে সুরথনাথ বুঝে গিয়েছিলেন। মণিদি আত্মহত্যা করেছিল। সুরথনাথ মণিদির মৃত্যুর জন্য তাঁর দাদাকেই দায়ী করেছিল, সেই ক্রুদ্ধ চোখের চাউনি আর মণিদির ভীত আর্ত চোখের চাউনি সুরথনাথকে প্রতিবাদী, সমাজ-সচেতন লেখক সমরেশ বসু হতে সাহায্য করেছে। নরেনদার বাইরের আবরণটি ছিল বিনয়ী, ভদ্র আর ভিতরে ছিল হিংস্রতা, বর্বরতা যা সুরথ বাল্যবয়সে ভয়মিশ্রিত চোখে প্রত্যক্ষ করেছিল, যা তাঁর উচিত-অনুচিত বোধকে জাগরিত করেছিল চির উদাসী সুরথনাথের মনে। তীব্র ঘৃণার জন্ম হয়েছিল ঐ মুখোশধারীর নৃশংস আচরণে। আরো তীব্র ঘৃণার জন্ম হয়েছিল আর একজনের ওপরে। সে হল ভুঁইমালীদের যুবক ছেলেটির ওপরে। সে রমণার মাঠে ঘোড়দৌড়ের জন্য জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়েছিল। পান্না গোয়ালার ছোট্ট মেয়েটাকে ওই ভুঁইমালী যুবক ছেলেটি হত্যা করেছিল তার কানের সোনার দুল খুলে নেওয়ার জন্য। ছটফটে, দোলাই খালের দুরন্ত সাঁতারু ছিল সে। পান্না গোয়ালার বুক চাপড়ে তীব্র ক্রন্দন ধ্বনি তার মনকে ব্যথাতুর করে তুলেছিল। আর তীব্র ঘৃণার জন্ম হয়েছিল ওই নৃশংস যুবকটির ওপর। তাঁর ছোটবেলার চেনা বৃত্তের মধ্যে অচেনা হিংস্রতার জন্ম দেখেছিলেন। ভুলতে পারেন নি, বাল্যকালের সেই দেখা ঘটনাটি; সমরেশ বসু চিত্রিত করেছেন তার হ্রেষাধ্বনিতে। এমনই অনেক দেখা, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার বীজ রোপিত হয়েছিল তাঁর মনে যা তাঁর উত্তরকালকে পত্রে পত্রে পল্লবিত করেছিল। সুরথনাথের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা, চোখে দেখা

ঘটনা নানা পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে একটি নতুন সত্তার চরভূমি জেগে উঠেছিল। সেই চরভূমির প্রাথমিক লেখকসত্তাই হল সমরেশ বসু।

ছোটকাকার বিয়ের বিভিন্ন ক্রিয়া অনুষ্ঠান সুরথনাথের মনে বিশেষ ছাপ ফেলেছিল। তিনি ঘোরের মধ্যে সেই অনুষ্ঠান লক্ষ করেছিলেন আর ছোটকাকিমা সৌন্দর্যে মুগ্ধ বালক কিছুতেই তাঁর কাছ ছাড়া পাচ্ছিলেন না। বাল্যকালে দেখা সেই বিয়ের দৃশ্য কয়েকটি বালকের চোখ দিয়ে তুলে ধরেছেন লেখক সমরেশ বসু। ছোট ছোট দৃশ্য, ঘটনা, পরিবেশ সবই বালক সুরথনাথের ভাবীকালকে পরিপুষ্ট করেছিল। পড়াশুনায় তাঁর মন বসত না। অঙ্ক কষতে ইচ্ছা করতই। বাংলা ও ইতিহাস তার ভালই লাগত আর রচনা লেখায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার, নিজের বক্তব্যের স্বাধীনতায় ভাষা ডানা মেলত। কিন্তু পাঠ্যবিষয়ে তাঁর মন লাগত না। বাবার শাসন, গৃহশিক্ষকের ধমকানি, মেজদার বিদ্রূপ, দিদির শাসানি— কোনকিছুই সুরথনাথকে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে টেনে আনতে পারেনি। ইস্কুল তাঁর কাছে জেলখানার মতো। নিয়মের শাসন তাঁকে কোন কিছুতে বেঁধে রাখতে পারে নি। পাঠশালা ছেড়ে হাইস্কুলে গেলে কি হবে, পড়াশুনায় তেমন অগ্রগতি হয়নি। রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের নিয়মনীতি তাঁর ভালো লাগেনি। তাঁর জামাইবাবু ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন কিন্তু নিয়মের শাসনে সুরথ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। উদাস প্রকৃতি তাঁকে হাতছানি দেয়। স্কুল পালিয়ে প্রকৃতির কাছে শিক্ষালাভ করে। এছাড়া এক ধরনের অসামাজিক সামাজিকতায় সুরথনাথ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আগ্রহীশীল হয়ে পড়েন। বন্ধু চিত্তর কাছ থেকে লুকিয়ে গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড, দুর্গেশনন্দিনী, মা পড়েছিলেন। বই পড়ে বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল অনিবার্যভাবে। দিদি ও মাস্টারমশাই-এর আচরণ তাঁর চোখে বিশেষভাবে ধরা পড়েছিল। সুরথনাথের এই ধারণাকে স্পষ্ট করেছিল তাঁর সঙ্গিনী রাজলক্ষ্মী। তাঁর অজানা ভিতর দুয়ারের কপাট খুলে দিয়েছিল রাজির চোখের কালো দ্যুতি। উন্মোচিত হয়েছিল দশমীর চোখের অপার রহস্য একাদশী অনুসন্ধিৎসু চোখে। যেখানে নিষেধ সেখানেই তার কৌতূহল বেশি। সময়টা ভুললে চলবে না — কৈশোর। দশ বছরের ছেলের ক্ষ্যাপামি তার কৈশোর কালকেও ক্ষেপিয়ে নিয়ে চলেছে। অবশেষে এই স্কুল পালানো, ঘর জ্বালানো ছেলেকে পাঠিয়ে দেওয়া হল নৈহাটীতে, বড়দা মন্মথনাথের কাছে। বুড়িগঙ্গা থেকে একেবারে গঙ্গায়। স্বভাব বৈচিত্র্যে ক্ষ্যাপা বালকের আরও সুবিধা হয়ে গেল। প্রায় অভিভাবকহীন অবস্থায় পড়াশুনা শিকেয় উঠেছিল। দাদা কর্মস্থলে, আর ছোট গানবাজনা করে গল্প উপন্যাস পড়ে একবছর কাটিয়ে নবম শ্রেণীতে আর ওঠা হল না। নৈহাটী রেল কোয়ার্টারের বাস উঠিয়ে আবার ফিরে আসতে হল ঢাকায়। ঢাকেশ্বরী কটন মিলে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে কাজ শিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু ওই ক্ষ্যাপামি তাঁকে কারখানা পালিয়ে নাটক অভিনয়ে মাতিয়ে রেখেছিল। এই নাটকীয়তা উত্তরকালে তাঁর জীবনে দ্বিমুখী ভূমিকা

নিয়েছিল।

এই কিশোর বয়সেই সুরথনাথ সুন্দরের খোঁজ পেয়েছিলেন এক ভয়ংকর কুৎসিতের মাঝে। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া ঝকঝকে চেহারার ছেলে সেন্টুর কুষ্ঠ হয়েছিল। সকলে তাকে পরিত্যাগ করেছিল, এমনকি তার বাড়ির লোকও তাঁকে নিচের একটা ঘরে অনাদরে ফেলে রেখেছিল। সেই কৈশোরকালে সুরথনাথ সকলকে লুকিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যেত। অনেক গল্প করত তার সঙ্গে। এই ঘটনা তাঁর মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। কুষ্ঠ রোগীকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছিলেন ও তাঁর ব্যথাবেদনার অংশীদারও হয়েছিলেন। মনের অবচেতনে 'শাম্ব' রচনার বীজ বপন হয়েছিল সেই কৈশোরকালে। সেই বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল সমুদ্রের নির্জন সৈকতে ভ্রমণে গিয়ে। কোণারকের মন্দির দেখে কালকূট অভিভূত, রোমাঞ্চিত। মৈত্রেয় বনের শন্‌শন্‌ বাতাসের সঙ্গে পঞ্চনদীর দেশ শাম্বাদিত্যপুরের বাতাসের স্পর্শ পেয়েছিলেন। যেখানে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব মানব কল্যাণার্থে বারো বছর ধরে কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে কুষ্ঠ রোগ নির্মূলের চেষ্টা করেছিলেন। নিজেও রোগমুক্ত হয়েছিলেন; আর সঙ্গে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত একদল হতমান, আশাহত মৃত্যুপথযাত্রী মানুষেরও রোগমুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। কুষ্ঠ কোন অভিশাপ নয় — রোগ; সেই রোগ সারানোর জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছিলেন। কর্মের মাধ্যমে শাম্ব ঢিবি আরোহণ করেছিলেন। এই কাহিনী কালকূটকে 'শাম্ব' কাহিনী রচনাতে ব্রতী করেছিল। সুরথনাথের সেন্টুকেই সমরেশ বসু কালকূটের মাধ্যমে শাম্বকে পুরাণ থেকে বের করে এনে এই পার্থিব জগতের মানব রূপে নতুনভাবে চিত্রায়িত করেছিলেন। এছাড়া বিশ্বমানবের কাছে একটা বার্তাও ছিল কুষ্ঠ রোগ অভিশাপ নয়, যথাযথ চিকিৎসার দ্বারা কুষ্ঠ রোগ নির্মূল করার শপথের বার্তা পাঠককুলের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া। শাম্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। শৈশবকাল থেকেই ভয়ডরহীন দুঃসাহস, ঘৃণাহীন আসক্তি এসবই কিশোর সুরথনাথকে সাহায্য করেছিল।

বাড়ীতে দৈনিক পত্রিকা আসত ঢাকা ও কলকাতা থেকে। সেইসব পত্রিকা পাঠ করে বিস্তর আলোচনা চলত। আলোচনা প্রধান হয়ে উঠে আসত রাজনৈতিক দলাদলি ও পাশ্চাত্য জঙ্গীবাদ। সেইজন্য কংগ্রেস, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, জহরলাল, টেরিরিষ্ট বিপ্লবীদের কথা, মুসলিম লীগ, ফজলুল হক, জিন্নাসাহেব এই নামগুলোর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পরিচিত ছিলেন বিভিন্ন বক্তৃতার সঙ্গে। তাঁদের বাড়ীতে গান্ধীবিরোধী আলোচনা চলত। গান্ধীজীর কীর্তিকাহিনী শুনে শুনে গান্ধীজী সম্পর্কে একটা কৌতূহল ওই ছোটবেলাতেই জন্মেছিল। গান্ধীজীর বসবার অদ্বিতীয় ভঙ্গিটি সুরথনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। গান্ধীজীকে দেখবার জন্য তাঁর মনে ইচ্ছা জেগেছিল। বাড়ীর পরিবেশে ইংরেজ বিরোধী হাওয়া ছিল তাই 'টিকটিকি' কথাটার সঙ্গে সুরথনাথ ছোটবেলা থেকেই পরিচিত ছিলেন। বিপ্লবীদের সঙ্গেও পরিচয় ঘটেছিল। তাঁদের বাড়ীতে হরপ্রসন্ন গুহ ও বগলাপ্রসন্ন গুহ ভাড়া

থাকতেন। বগলাপ্রসন্নকে দীর্ঘদিন কারাবাসের পর বাড়ীতেই অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল; তাঁকে শুধু একবারই দেখেছিলেন সুরথনাথ। তারপরে হঠাৎই একদিন উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। হরপ্রসন্নকে মাঝে মাঝে দেখেছেন। দুই ভাই-ই সশস্ত্র বিপ্লবী। এঁদের খোঁজে প্রায়ই পুলিশের আগমন ঘটত। পুলিশের তল্লাশি কী ভয়ংকর হতে পারে সেই অভিজ্ঞতা সুরথনাথ নিজের চোখেই দেখেছেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল, কোনো ছোটছেলের কাছ থেকে পুলিশ একটি কথাও বের করতে পারেনি কখনও। হরপ্রসন্নের স্ত্রী সুরবালা স্বামী-সঙ্গ লাভে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁর বাপের বাড়ি থেকে তাঁর দুঃখকে ভুলিয়ে রাখার জন্য নানারকম জিনিস দিয়ে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করা হত। কলের গান তাঁর ছিল। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের স্বাদ প্রথম তাঁর কাছ থেকেই সুরথনাথ পেয়েছিলেন। এই সুরবালা মাসির বুকেই মুখ লুকিয়ে একদিন সুরথনাথ কেঁদে ভাসিয়েছিলেন। তাঁর ছোটকাকা কাকিমার চলে যাওয়াটা সুরথনাথ সহ তাঁদের বাড়ির কেউই মেনে নিতে পারেন নি। তরুণ কাকিমার বিরহ বেদনায় কেঁদেছিলেন সুরথনাথ, আর সুরবালা মাসিও কেঁদেছিলেন তাঁর কারাবাসী বিপ্লবী স্বামীর বিরহে। দুই ধারায় বয়েছিল অশ্রুধারা। সুরথনাথের বালককালের নরম মনে বিপ্লবীচেতনা, শেকড় গেঁড়েছিল। বিপ্লবী পরিমণ্ডল ছোটদের সতর্ক হতে শিখিয়েছিল পুলিশের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য। এসবই সুরথনাথকে সমরেশ বসু হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

সুরথনাথের আবেগতাড়িত মনে মেয়েদের প্রভাব পড়েছিল। পরবর্তীকালে সমরেশ বসুর জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। নারী সান্নিধ্য থেকে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন সেগুলো তাঁর শিল্পীসত্তাকে বিকশিত হতে সহায়তা করেছিল। রাজু-সুরথনাথ হল চিরকালের নর-নারী। রাজু প্রেমিকসত্তাটিতে শৈশবকালেই জাগরিত করে তুলেছিল। দিদির বন্ধু ময়নাদি ও তার বোন মেমীর পরিচর্যা, ছোট কাকিমার চুম্বন, কাকার আঁকা নগ্ন নারীমূর্তির স্কেচ, কেষ্ট ঠাকুরের ছবি আঁকায় পারদর্শী তরুণী বউয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, সুরবালার সান্নিধ্যে গল্প-উপন্যাস পাঠ ও গীতচর্চা, বেদেনী কন্যার চোখের কটাক্ষ — সব সুরথনাথকে সমরেশ বসু হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। ভবিষ্যতে সমরেশ বসু হয়ে ওঠার বীজ শৈশবেই তাঁর আন্তরভূমিতে পোঁতা হয়েছিল। সমকালে তাঁর লেখনীর সঞ্জীবনী ধারায় সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে পত্রে পুষ্পে শোভিত হয়েছিল। কথাশিল্পী সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতির শিখরে পৌঁছেছিলেন। এই বাল্যকাল থেকে কৈশোরকালের থেকেই তিনি জীবনের রস সংগ্রহ করেননি। আরও কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। পনের বছর আবার তাঁকে যেতে হয়েছিল নৈহাটীতে, বড়দার কাছে। সংসারের নিয়মের মধ্যে কিছুতেই সুরথনাথকে বেঁধে রাখা যাচ্ছিল না। তাই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল নৈহাটীতে। ছোটকাকা হেমেন গাঙ্গুলির বোহেমিয়ান জীবনযাত্রা উদাসী বাউল সুরথনাথকে আকৃষ্ট

করেছিল। নিজে আঁকতে পারতেন, আবার কাকাও তাঁর ভুলত্রুটি সংশোধন করে দিতেন। এবারে নৈহাটী এসেছিলেন কাকার মতো চিত্রকর হবেন এই আশা নিয়ে। আর্ট স্কুলে ভর্তি হবেন বলে এসেছিলেন। তাঁর মা তাঁর মেজদা ও দিদির মত আঁকাকে গুরুত্বহীন বলে মনে করলেও মা অতটা করতেন না। তবে মা অপছন্দ করতেন, সেই আমলে চিত্রশিল্পীর অত গুরুত্ব ছিল না। তবু সুরথ চিত্রশিল্পী হবেন এই আশার ডানাতেই ভর করে এসেছিলেন নৈহাটীতে। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের হাতছানি তাঁকে বিদ্যালয়মুখী হতে দেয়নি। শ্রীরঙ্গমে গানের তালিম নিতে শুরু করেছিলেন কিন্তু বিধি বাম।

ভাগ্যের চাকা অন্যদিকে ঘুরতে শুরু করেছিল। কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েছিলেন। সেখানে বন্ধু দেবশঙ্করের দিদি গৌরীদেবী তাঁকে শুশ্রূষা করে সারিয়ে তুলেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, বিভিন্ন নারী তাঁর জীবনে বার বার এসেছে। এবার এলেন গৌরীদেবী সেবার প্রতিমূর্তি হয়ে। সুরথনাথ সুস্থ হয়ে ওঠার সময় গৌরীদেবীর প্রেমে পড়ে যান। কিশোর বয়সে প্রেম এতটাই গভীর ছিল যে সেই প্রেমের উন্মাদনায় মাত্র সতের বছর বয়সে চার বছরের বড় বাল্যবিবাহিতা, স্বামী পরিত্যক্তা গৌরীদেবীকে বিবাহ করে ফেললেন। যেখানে নিষেধ সেখানেই তাঁর মন ঘুরে ফিরে; কোন নিষেধের ভ্রূকুটি তিনি শৈশবকাল থেকে মানেন নি। এবার ওই ডাকাবুকো স্বভাবের কিশোরটি নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটা নিয়ে ফেললেন। যৌবনের উন্মেষকালে সমাজনীতি লঙঘনের ফলে রাতারাতি তাঁর জীবনটা বদলে গিয়েছিল। বাড়ীর কেউ এই দুঃসাহসিক কাজে সায় দিতে পারেন নি। অতএব রেল কোয়ার্টারের নিশ্চিন্ত বাসের জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেল। পায়ের তলায় মাটি সরে গিয়েছিল। গৌরীদেবীকে বিয়ে করায় তাঁকে উঠে আসতে হয়েছিল বস্তিতে। নিম্নস্তরের মানুষের সঙ্গে তাঁর আনাগোনা ছিল, তাই ভাগ্যের ফেরে সেই বস্তিজীবনেই তাঁকে প্রেমের নীড় বাঁধতে হয়েছিল। শুধু বেঁচে থাকার জন্য কঠিন জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন ওই সতের বছর বয়সেই। বস্তি জীবনে হয়ত উপার্জনের, ঘর বাঁধার সঠিক সময় ছিল; কিন্তু সুরথনাথ যে পরিবার থেকে, যে পরিবেশ থেকে এসেছিলেন সেখানে কোনোটাই স্বাভাবিক ছিল না। গঙ্গার তীরে এসেছিলেন চিত্রশিল্পী হতে কিন্তু ভাগ্যের চক্রে তিনি হয়ে গেলেন সংসারশিল্পী। নৈহাটী থেকে চলে যেতেন গরিফায়। সেখানে জোয়ারদারের পোলট্রি থেকে ডিম সংগ্রহ করে ব্যারাকপুরের কোয়ার্টারে ডিমের যোগান দিতে যেতে হত। এই নতুন জীবনের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই একটা অচেনা জগতের দুয়ার খুলে যায় তাঁর সামনে। সত্য মাস্টারের পরিচয় হয় এই জীবনসংগ্রাম সূত্রেই। এরপরেই বস্তিজীবনের অন্ত হয়, উঠে আসেন আঁতপুরের তরফদার পাড়ায়। রাজনীতির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে 'জনযুদ্ধে'র তালিম নিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। রাজনীতির পাঠ যখন নিয়েছেন তাতে সক্রিয় অংশীদারীত্ব তো থাকবেই। পার্টির ছুট্‌কো কাজ 'পোস্টার লেখা'য় অংশীদার হয়ে গেলেন। আঘাটা থেকে ঘাটে ওঠার এটাই ছিল প্রথম সোপান।

তাঁর ছন্নছাড়া জীবন অন্যদিকে মোড় নিতে শুরু করেছিল।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দ 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে দেশ উত্তাল। সেই সময়ে ডিসেম্বর মাসে ইছাপুর রাইফেলস ফ্যাক্টরির স্মল আর্মসের ড্রয়িং বিভাগে ট্রেসারের চাকরিতে ঢুকে গেলেন, দৈনিক পাঁচ সিকে তাঁর বেতন। আঁকতে তিনি ভালোই পারতেন তাই চাকরিটা জুটে গিয়েছিল ওই ড্রয়িং বিভাগে। তাঁর নৈহাটী দ্বিতীয়বার আসার এক চিলতে ইচ্ছাপূরণ! কিন্তু তাঁর বিবাগী মন এতে থেমে থাকতে পারল না, খুঁজতে লাগলেন সংসারের যাঁতাকল থেকে মুক্তির উপায়। দেশ খুঁজছে বৈদেশিক শাসনের বাহুপার্শ্ব থেকে মুক্তির উপায়; সুরথনাথের বাউলমন খুঁজছে সংসারের যাঁতাকলের নিষ্পেষণের হাত থেকে মুক্তির উপায়। প্রাণের তাগিদেই স্থাপিত হয় 'উদয়ন ক্লাব' এবং যুক্ত হয়ে গেলেন হাতে লেখা 'উদয়ন পত্রিকা'র সঙ্গে। শুরু হল উদয়ন ক্লাবে রাজনীতি ভিত্তিক সংস্কৃতি চর্চা আর বুদ্ধিজীবী আড্ডা। চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রবন্ধ নিবন্ধ সহ প্রগতিশীল বক্তব্য 'উদয়ন পত্রিকা'য় প্রকাশ পেতে থাকল। পাণ্ডুলিপির লিপিকর ও চিত্রকর ছিলেন স্বয়ং সুরথনাথ। অতএব প্রতিটি লেখার অক্ষর তাঁকে পড়তে হত ও বুঝতে হত। এর ফলে পাঠ্যবই পড়তে ভালো না লাগা সুরথনাথ নিজের অজান্তেই পড়ায় মন দিলেন। মন রে কৃষি কাজ জান না! সেই কৃষিকাজই সুরথনাথকে করতে হল, শুরু হয়ে গেল নিজেকে শিক্ষিত করে তোলা। হাতে লেখা পত্রিকা ভরাট করতে গিয়ে নিজেকেও কলম ধরতে হয়েছে। এটাই সুরথনাথের হাতে খড়ির প্রথম ধাপ। 'উদয়ন ক্লাবে' পাঠচর্চার সঙ্গে সঙ্গে তার কলমের কালির উত্তরণ ঘটেছে ভাবীকালে। বাল্য ও প্রথম কৈশোরের অস্থিরতার সমস্ত কিছুই ছিল একজন ভবিষ্যৎ কথাচিত্রশিল্পীর মানস গঠনের উপযুক্ত ভিত্তিভূমি। যা সাধারণের চোখে স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। সুরথনাথের মনের ভিতরে ছিল এক জাত চিত্রশিল্পী হওয়ার তুলি, আর হাতে উঠে এসেছিল কথাকারের কলম-রূপ তুলি। দুইয়ের সংমিশ্রণে সুরথনাথ হয়েছিলেন সমরেশ বসু। আর সমরেশ বসু বাল্যকালের ছন্নছাড়া স্বভাব বৈরাগী সুরথনাথকে ফিরিয়ে এনে সৃষ্টি করেছিলেন 'কালকূট'কে। একজনেরই দ্বৈত সত্তা। এই অধ্যায়ে শুধু আলোচিত হবে সমরেশ বসুর ব্যক্তিসত্তাকে নিয়ে আর পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে কালকূট সত্তা নিয়ে।

যাই হোক্, এই 'উদয়ন' পর্বে সুরথনাথের জীবন জীবিকা ও শিল্পের মধ্যে টানাপোড়েন চলছিল। ছাত্রজীবনের অকালমৃত্যু ঘটিয়ে সমাজের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে যে সংসার পেতেছিলেন সেই সংসারের চারটি প্রাণীর মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য কঠিন জীবন সংগ্রাম করতে হয়েছিল। ভোররাতে অন্ধকার থাকতে উঠে স্নান সেরে ট্রেনে করে ইছাপুর যেতেন। প্রায় চোদ্দ ঘণ্টা পরে বাড়ী ফিরে ক্লান্ত শরীরে ছোট্ট একটা জলচৌকি নিয়ে হ্যারিকেনের আলোতে এক সৃষ্টির উন্মাদনায় লিখতে বসে মেতে যেতেন। ভুলে যেতেন সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি, লেখার উন্মাদনায় তখন

তিনি অন্য ভাবজগতের মানুষ। স্ত্রী গৌরীদেবী সবসময় তাঁকে লিখতে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। বন্ধুদের ভালোবাসা থেকেও বঞ্চিত হননি তবুও প্রতিবেশীর উপহাস, জীবনের মূল্যবান সময় পরিবারের মুখে অন্ন তোলার জন্য তাঁকে বেচে দিতে হয়েছে। এই যন্ত্রণাবোধ স্বভাব অস্থির সুরথনাথকে স্থির থাকতে দেয়নি, সেই অস্থিরতাই তাঁকে কালিকলম নিয়ে বসিয়ে দিয়েছে 'নয়নপুরের মাটি' লিখতে। সেটা ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ, আর শেষ করেছিলেন অস্ত্রকারখানায় অবকাশের সময়ে বসে। ১৯৪৫, মাত্র একুশ বছর বয়সে 'আদাব' লিখেছিলেন এরও অনেক আগে কিন্তু মুদ্রিত হয়েছিল অনেক পরে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরিচয়' পত্রিকায়। 'আদাব'ই তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্প। অজ্ঞাতনামা এক লেখক প্রথম আবির্ভাবেই সাহিত্য সমাজে সাড়া ফেলেছিলেন। একটি গল্পেই ব্যাপক পরিচিতি এমনটি অবশ্য হয়নি। বিশেষত বামপন্থী সাহিত্যমহলে তিনি বিশেষ সাড়া ফেলেছিলেন। এই গল্পের মাধ্যমেই তিনি সাহিত্য জগতে প্রথম পা ফেলেছিলেন। এরই সঙ্গে একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল — এই অজ্ঞাতনামা লেখক পরিচিতি পেয়েছিলেন সমরেশ নামে। সমরেশ বসু, এই নামেই তিনি 'আদাব' লিখেছিলেন। স্বভাব অস্থির সুরথনাথ সমরেশে হারিয়ে গেলেন। না, ঠিক হারাননি, একটু ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন।

'নয়নপুরের মাটি' সমরেশ বসু প্রথম লিখেছিলেন কিন্তু সর্বজনসমক্ষে প্রথম আলো দেখেছিল 'উত্তরঙ্গ'। 'উত্তরঙ্গ'ই সমরেশ বসুর প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস। এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'বুক ও ওয়ার্ল্ড' প্রকাশনী থেকে। শচী সেন ছিলেন এর প্রকাশক। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে 'উত্তরঙ্গ' প্রকাশের পর থেকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ছুটির অবকাশে বা কাজের অবকাশে পার্টির কাজে বা ট্রেড ইউনিয়নের কাজে গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলে যে চটকল শ্রমিকদের বস্তি আছে সেগুলোতে সমরেশ বসু ঘুরে বেড়াতেন। তাদের সঙ্গে নানান ধরনের গল্প করতে করতে তাদের জীবনায়নের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচিত হচ্ছিলেন, ওদের জীবনপ্রণালী নতুনভাবে সমরেশ বসুর চোখে উঠে এসেছিল। তাঁর এই নতুন করে দেখা সমাজজীবনকে আরও আলোকিত করে দিয়েছিলেন চটকল শ্রমিক 'নবকুমার দাশ'। যিনি পনের বছর বয়সে চটকল শ্রমিক হয়ে ঢুকেছিলেন গত শতাব্দীতে। তাঁর মুখে গত শতাব্দীর চটকলগুলোর দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী সর্দারদের কথা, সাহেব-মেমদের কথা শুনতে শুনতে 'উত্তরঙ্গ' লেখার চিন্তা তাঁর মনের অবচেতনে কাজ করতে থাকে। বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি গ্রেফতার হয়ে যান ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে। সাতদিন প্রেসিডেন্সি জেলের নারকীয় সেলে ছিলেন। এরপরে ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডের সেলে, তারপরে অন্য ওয়ার্ডে। পার্টি তার ওপরে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। জেল কমিটি জানিয়েছিল তিনি বহিষ্কৃত বা সাসপেন্ডেড ব্যক্তি — এইরকম একটা নির্দেশ বাইরের পার্টি থেকে এসেছে তাই তাঁকে পনের নং ওয়ার্ডে থাকতে হবে। জেল কর্তৃপক্ষ

অবশ্য সেই নির্দেশ দেখাতে পারেনি। তারা তাঁকে তারপরে অন্য ওয়ার্ডে রেখেছিল। এই একটি ঘটনা ও অন্য কমরেডদের কিছু আচরণ সমরেশ বসুকে সচেতন করে তুলেছিল, কিন্তু লাভও হয়েছিল। তাঁর চিন্তার জগৎ প্রসারিত হয়েছিল। এই জেলে কাটানোর সময় তাঁর মনের মধ্যে 'উত্তরঙ্গ'-এর জন্য টুকরো টুকরো ঘটনা তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন। নাটক 'লেবার অফিসার'ও লিখে ফেলেছিলেন। 'নাটক' এবং 'উত্তরঙ্গ'-এর জন্য লেখা টুকরো টুকরো অংশগুলো জেলেরই এক কর্মীর সাহায্যে জেলের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর কাছে। জেলেই গণনাট্য সংঘের সম্পাদক নিরঞ্জন সেনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। জেল থেকে বেরোনোর পরে ইছাপুর রাইফেল্‌সর ট্রেসারের চাকরিটি আর ফিরে পাননি। যখন জেলে ছিলেন তখন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় দেড়শ টাকা করে মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন; জেল থেকে বেরোনোর পর সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। চরম আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়ে নিরঞ্জন সেনের ছোট ভাই শচী সেনের কাছে 'নয়নপুরের মাটি'র পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শচী সেনের 'নয়নপুরের মাটি' পছন্দ না হওয়ায় তিনি 'উত্তরঙ্গ'-এর বিষয়বস্তু নিয়ে কথা বলেছিলেন।

কাহিনী শুনে শচী সেন সমরেশ বসুকে 'উত্তরঙ্গ' লেখার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু উপন্যাস লিখতে একটু সময় লাগবে, তারপরে তো প্রকাশ। কম করেও দু'তিনমাস সময় লেগে যাবে। বন্ধুদের সাহায্য ও স্ত্রী গৌরীদেবীর সেলাই-এর সামান্য আয় থেকে কোনমতে অনাহারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া, এই চরম দুরবস্থার কথা শচী সেনকে বলতেই হয়েছিল। শচী সেন তিনমাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও একসঙ্গে টাকা দিতে পারতেন না, অল্প অল্প করে দিতেন; তিনমাস পরে সেটাও দিতে পারেন নি। 'উত্তরঙ্গ' ছাপা শেষ হয়ে গিয়েছিল তাই শচী সেন দপ্তরীর ঘর থেকে বই নিয়ে বিক্রি করে টাকা নিয়ে যেতে বলেছিলেন। পরের দিন এত বৃষ্টি হয়েছিল যে হাঁটুজল জমে গিয়েছিল। সমরেশ বসু মানিকতলার রেললাইনের ধারে দপ্তরীর ঘর থেকে বই নিয়ে বেরোতে পারছিলেন না। বৃষ্টি একটু কমতেই গায়ের জামা খুলে বইগুলো ঢেকে 'নৈহাটী বাসন্তী কেবিন'-এ চলে এসেছিলেন। সেখানে বন্ধু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া উমাশঙ্কর গাঙ্গুলি, সত্যজিৎ চৌধুরী, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, কনিষ্ঠ বন্ধু রমেশ দে — এরকম আরও অনেকেই সমরেশ বসুর প্রথম প্রকাশিত বই 'উত্তরঙ্গ'-এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। বন্ধুদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় 'নৈহাটী বাসন্তী কেবিন' মুখরিত হয়ে উঠেছিল। আর সমরেশ বসু আনন্দে সারারাত 'প্রথম ছাপা' বই বুকে নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন। 'উত্তরঙ্গ'-এর সাফল্য এতটাই ছিল যে ন'মাসেই প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল 'ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী'র মাধ্যমে। শর্ত ছিল শতকরা পনের ভাগ রয়্যালিটির পুরো একটি সংস্করণের টাকা, কিছু অগ্রিম টাকা ও একটি গল্পের বই 'অকালবৃষ্টির জন্য'। এর ফলে অন্ন চিন্তার সমস্যা মিটে

31 MAR 2016
278429

গিয়েছিল, আর লেখাকেই পেশা করবার চিন্তাটা মনের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে বসেছিল।

'উত্তরঙ্গ'-এর সাফল্যে কবি বিষ্ণু দে তাঁকে চিঠি দিয়ে প্রথম অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তিনি কী লিখেছিলেন সে সম্পর্কে সমরেশ বসু তার 'নিজেকে জানার জন্য' রচনাটিতে লিখেছেন এইভাবে 'তাঁর দুটি কথা আমি এখনো মনে রেখেছি। এক 'আপনার উপন্যাসটি পড়ে মনে হলো, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আপনার পরিচয় অতি ক্ষীণ।' দ্বিতীয় 'আরো লিখুন; গঙ্গার ধারের যে কথা আপনি লিখেছেন আপনাকে দেখতে চাই তার সাগর সঙ্গকে।' ... *(পৃ: ২৭, 'দেশ' সমরেশ বসু স্মরণে)* সিগনেটের দিলীপ গুপ্ত একটি ফাউন্টেন পেন ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সে-কালের কথা'র দুটি খণ্ড উপহার দিয়েছিলেন। 'উত্তরবঙ্গ'-এ সমালোচনা বেরিয়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকায়। চিন্মোহন সেহনাবীশ সমরেশ বসুকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর বন্ধু অধ্যাপক সনৎ বসু 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় চিন্মোহন সেহনাবীশের সমালোচনার উত্তর দিয়েছিলেন। 'নতুন সাহিত্য'-এ পরের সংখ্যায় আবার সমালোচনা করেছিলেন অচ্যুত গোস্বামী; আর তার পরের সংখ্যায় প্রতি-সমালোচনা করেছিলেন গান্ধী ও বানার্ডশ-এর জীবনীকার ঋষি দাস। ঋষি দাস 'ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী'র প্রহ্লাদ প্রামাণিকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন। 'মরশুমের একদিন' গল্প সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রহ্লাদ প্রামাণিকের প্রচেষ্টায়। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে 'বি. টি. রোডের ধারে' ও তার লেখা প্রথম উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি' প্রকাশিত হয়েছিল। এরপরে ১৯৫৩-তে 'চতুষ্কোণ' পত্রিকা 'শ্রীমতী থেকে কাফে' এবং এর পাশাপাশি ছোটগল্প 'অকাল বসন্ত' ১৯৫২ তে ও 'সোনাটার বাবু' ১৯৫৩ তে প্রকাশিত হয়েছিল। কালকূট নামে 'ভোটদর্পণ'-এর কথা আগেই বলা হয়েছে।

'নয়নপুরের মাটি' উপন্যাসটি তাঁর বিধ্বস্ত জীবনে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাওয়ার প্রথম প্রয়াস, তাঁর মনের রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়েছিল সাহিত্যের দরজার প্রথম সোপানে পা রাখবার। গ্রামীণ পটপরিবেশে বেড়ে ওঠা কৃষক সন্তান হয়ে যায় পুতুল গড়ার শিল্পী। গ্রামীণ জীবন তার স্বাধীনতার সুরে বাঁধা, মাটি তার সেই শিল্পীমনকে বিকশিত করে। তার শিল্প প্রশংসিত কিন্তু নিজে উপহসিত। নায়িকা এসেছে শহর থেকে; এসে তাকে শহরে নিয়ে যেতে চায় খ্যাতির জগতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সামন্ততান্ত্রিক সমাজজীবনে স্বৈরতন্ত্র গ্রামীণ মানুষকে নিষ্পেষিত করতে থাকে, কখনও ধর্মের নামে, কখনও ফসল লুট করে, কখনও রক্তে হাত রাঙা করে। মানুষের অধিকার লুণ্ঠিত হয়, গ্রাম জীবনে ধ্বংসের প্রতিধ্বনি শোনা যায়, গ্রাম ছেড়ে ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ শহরমুখী হতে চায়। নায়ক নয়নপুরের মাটি আঁকড়ে ধরে তাঁর শিল্পীমনের পরিবর্তন করে সংগ্রামী জীবনের ডাক দেয়। গ্রামীণ জীবনের ও নাগরিক জীবনের যে টানাপোড়েন তাই আছে 'নয়নপুরের মাটি'তে। 'বি. টি. রোডের ধারে' বস্তিজীবনের কথা; ভিন্ প্রদেশের মানুষের বস্তি জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। ছোট বস্তির

বাড়িওয়ালা মালিকের বিষয়সম্পত্তি বড় বস্তির মালিক আইনের ফাঁদ পেতে গ্রাস করতে উদ্যত। ছোট বস্তির মালিকের আস্ফালিত হৃদয়ে কোমলের সন্ধান, সে নিজেই জানে না তাঁর রাজ্যপাট দাঁড়িয়ে আছে ভুয়ো জমির ওপরে। গোবিন্দ ওরফে ফোরটোয়েন্টি অনেকদিন নিরুদ্দেশ থাকার পর ছদ্মবেশে হঠাৎ করে বস্তিজীবনে এসে ভূতভবিষ্যতহীন মানুষগুলোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখ দিয়ে বস্তিজীবনের বিভিন্ন চরিত্রের নানা দিক উন্মোচন করা হয়েছে। ভূমিহীন মানুষেরা খোলার চালটুকু বাঁচানোর জন্য একক লড়াই করে, কিন্তু কিছুই বাঁচাতে পারে না, না নিজেকে না বস্তিকে। লেখক গোবিন্দর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সংঘশক্তির জন্মের সংকেত দিতে চেয়েছেন। লেখকের নিজ রাজনৈতিক ছায়া আছে 'গোবিন্দ' চরিত্রটিকে। এরকম অনেক কাহিনীতেই নিজের জীবনের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও বিশ্বাসভঙ্গের টানাপোড়েনে অনেক কাহিনী লিখেছিলেন। বিশেষ সংখ্যা 'দেশ' সমরেশ বসু স্মরণে 'সমরেশ : আদরা বনাম খসড়া' তে আনন্দ বাগচী 'বি. টি. রোডের ধারে' সম্পর্কে বলেছেন, বর্ণনার গুণে, অজানা পরিবেশের টানে নাটুকে বিন্যাসে আর যৌনবোধের আলোছায়ায় বি. টি. রোডের ধারে টান টান হয়ে আছে। 'দিন শেষ হতে না হতেই রাত্রি নেমে এল। সারাদিনের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ছড়ানো আকাশটার এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পর্যন্তকে যেন দিগন্তহীন আলকাতরার ব্রাশ নিয়ে গেল বুলিয়ে।' উপন্যাসের এই সূচনা-ভাষ্যটির চিত্রকাব্যিক ভাষায় শরৎচন্দ্রের অস্পষ্ট আদল থাকলেও সমরেশের কলম যে আড়ভেঙে গল্পরসকে ধরতে অনেকটা এগিয়ে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই।'' *(পৃ: ৪৭, দেশ, সমরেশ বসু স্মরণে)*

এরপরে 'শ্রীমতী কাফে', 'নৈহাটী বাসন্তী কেবিন'-এর ছায়ায় তিনি সৃষ্টি করেছেন। এই উপন্যাসে তিনি ১৯২০ থেকে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত সমাজের ব্যক্তিমানস, গান্ধীবাদ সন্ত্রাসবাদ সব কিছুই তুলে ধরেছেন। বাসন্তী কেবিনে আড্ডা দেওয়া মানুষগুলোকে পরিবর্তিত রূপে তুলে ধরেছেন 'শ্রীমতী কাফে' তে। তাই বাসন্তী কেবিনের মালিক হরি লাট (হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়) হয়ে যান শ্রীমতী কাফের ভজু লাট। তাঁর চোখ দিয়ে স্বাধীনতার পূর্বের এবং সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অস্থিরতা, অগ্নিগর্ভ, সমস্যাসঙ্কুল সময়কে তুলে ধরেছেন। 'শ্রীমতী কাফে' সমরেশ বসুর প্রথম দিকের উপন্যাস হলেও পাঠককুলে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। 'শ্রীমতী কাফে'র কুশীলবদের প্রভাব পরবর্তী কিছু কিছু উপন্যাসেও পড়েছে। দশকে দশকে সমরেশ বসু তাঁর উপন্যাসের দিক বদল করেছেন। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত চারটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। 'শ্রীমতী কাফে' রাজনৈতিক উপন্যাস লেখার পরপরই তার মনের কোণে সেই সুরথনাথ উঁকি দিতে থাকে। একদিকে সুরথনাথের হাতছানি আর একদিকে প্রয়াগে কুম্ভমেলার প্রস্তুতি পর্বের ঘোষণা। 'গাহে অচিন পাখি'তে কালকূট বলেছেন আমার চোখের সামনে এঁকে দিল একটি ছবি। প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে মহামানবের মেলা বলতে কি, কেমন একটা শিহরণ ঢেউ দিল

প্রাণে। বাঁশির ডাক শুনতে ভুল হল না। সারা দেশের মূর্তিখানি যদি দেখতে হয়, তবে সেই মেলার প্রাঙ্গণে চলো। কী করে বোঝাবো সেই ব্যাকুলতা। তেমন কথা আমার জানা নেই, কেবল মনে হতে লাগল, বড় অন্ধকারে আছি। চোখ ভরে দেখা হয়নি আপন রূপেরই বিস্তৃতিকে। "এখন উপায়? কড়ি চাই কড়ি। পারানির কড়ি। পাই কোথায়।" *(পৃ: ৩২, 'গাহে অচিন পাখি', কালকূট রচনা সমগ্র ১ম খণ্ড)*

কিন্তু কেমন করে? রেলগাড়িতে ভাড়া লাগে। ঘোরাফেরাতেও খরচা কবুল করেছি আগেই, পকেট শূন্য, অন্ন বাড়ন্ত ঘরে। কিন্তু সন্ন্যেসী বিবাগী তো নই। ঝোলাঝুলি কাঁধে নিয়ে, জয়গুরু বলে বেরিয়ে পড়ার উপায় নেই। আমি তীর্থযাত্রীও না। ভিন্ চালের টান আমার, সঙ্গম টেনেছে আমাকে, আমার দেশের নানা রূপের এক মূর্তি ধরে। মূর্তির হাতছানি দিয়ে। আমার নিজের পরিচয় যে সেখানে রয়েছে।

এ'কথাগুলো কালকূট লিখেছেন 'গাহে অচিন পাখি' তে, সমরেশ বসু সৃষ্ট দ্বিতীয় সত্তা। কুম্ভমেলার হাতছানিতে সমরেশ বসু মোহগ্রস্ত হয়ে পারানির কড়ি খুঁজতে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অগ্রজ সাহিত্যিক মনোজ বসু তাঁকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন 'যুগান্তর' পত্রিকার পরিমল গোস্বামীর কাছে। উত্তর বাগবাজারের 'শিশির ইনস্টিটিউট'-এ একতলার একটি ঘরে টেবিলের উপর কিছু লেখালেখি করছিলেন। ব্যস্ত মানুষকে বিরক্ত করা উচিত হবে না মনে করেও মনোজ বসুর চিঠিটি তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। পরিমলবাবু চিঠিটি পড়ে একপাশে সরিয়ে রেখে মুখ না তুলেই বাঁ হাত নেড়ে দিয়েছিলেন। সমরেশ বসু হাত নাড়ার কারণটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে 'মনোজদাকে তাহলে ...।' *(পৃ: ৩২, ঐ)* কথাটা আর শেষ করতে হয়নি, আরও দ্রুত হাত নাড়িয়ে তিনি দরজা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। যার অর্থ একটাই দাঁড়ায় তফাত যাও। বুকের মধ্যে মোচড়ানো ব্যথা আর ঝাপসা চোখে ফিরে এসেছিলেন মনোজ বসুর কাছে। অপমানিত সমরেশ বসুর কথায় মনোজ বাবু বিমর্ষ হয়ে অনেক কথা বলেছিলেন, এবং আশ্বাস দিয়েছিলেন যে পরের দিন দক্ষিণারঞ্জন বসুর কাছে তাকে পাঠাবেন আর একটা চিঠি দিয়ে যাতে উনি একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। মনোজ বাবুর কাছ থেকে বেরিয়ে পবিত্র গঙ্গে াপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ব্যাপারটা শুনে উনিও দুঃখ পেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন "ওসব মনে রাখিস না। তোর ভেতরে জিনিস থাকলে তা চেপে রাখবে কে? আমার উপায় থাকলে এখুনি তোকে এলাহাবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা করতাম। এখন আমার আর সেদিন নেই।" *(পৃ: ৩২, ঐ)* আর্মহার্স্ট স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের মাঝে কথাগুলো শুনে সমরেশ বসুর চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছিল। গভীর রাতে গৌরী দেবীর সঙ্গে আলোচনা করে পরদিন 'জয় মা' বলে বর্মন স্ট্রীটে 'দেশ' পত্রিকার অফিসে সাগরময় ঘোষ মহাশয়ের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলেন। সাগরময় বাবুর সঙ্গে

সমরেশ বসুর সামান্য পরিচয় ছিল। পিলে চমকানো তাঁর আচরণ নয়, কিন্তু মুখের রেখা দেখে বোঝা যায় না প্রসন্ন না অপ্রসন্ন। সাগরময় বাবুর মুখোমুখি চেয়ারে বসে আছেন খদ্দেরের ধুতি পাঞ্জাবি পরা, ছোট করে কাটা চুল, শক্ত স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি। এনাদের সঙ্গে সমরেশ বসুর কথাবার্তা হওয়ার আগে একটু অন্য প্রসঙ্গ বলে নেওয়া যাক। এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের শেষ দিকে আঁতপুরের বাসা ছেড়ে সমরেশ বসু সপরিবারে নৈহাটী উঠে এসেছিলেন। দু'খানি থাকার ঘর, টালিতে ছাওয়া, রান্নাঘরে ঢুকতে গেলে মাথা ঠেকে যায়। ফণী মনসা রাং চিতার বেড়া দিয়ে বাড়ীটা ঘেরা। এর পূর্ব-দক্ষিণ ঘিরে বাজার আর পশ্চিম-উত্তরে খাপরা, টালির ছাওয়া ঘনবস্তি। বাড়ীর সামনে ফাঁকা জমিটাতে বাজারের সব জঞ্জাল জমা করা হয়। বৃষ্টিতে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে যায় রান্নাঘরে, আর সামনেই একটা ভাঙা খাটা পায়খানা। এই ঘরে ছোট একটা টুলে বসে 'সওদাগর' উপন্যাস লেখা হচ্ছিল সেই সময়ে। শুধু বই লিখে সংসার চালানো একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল সমরেশ বসুর পক্ষে। চারটি বাচ্চা ও পত্নীসহ সংসারটিও ছোট ছিল না। তাই অন্ন চিন্তার তাগিদে আঁতপুরে থাকতেই আনন্দবাজার পত্রিকায় পনেরো দিন অন্তর 'শহরতলীর পথে' একটি ফিচার ধরনের লেখা পাঠাতেন। গঙ্গার ওপারে গুপ্তিপাড়া থেকে বালী আর এপারে কাঁচরাপাড়া থেকে দমদম পর্যন্ত প্রত্যেকটি পৌর অঞ্চল ধরে, সেইসব স্থানের খুঁটিনাটি তথ্য ফটো সহ এই ফিচার ধরনের লেখা। সোমনাথ ভট্টাচার্য ও সমরেশ বসু সারা শহর ঘুরে পৌর অঞ্চল, স্কুল-কলেজ, মন্দির-মসজিদ-গির্জা সৌধ-দিঘির ছবি, খুঁটিনাটি তথ্য যোগাড় করে ও কোনো বৃদ্ধ মানুষের কাছ থেকে পুরনো দিনের কথা জেনে নিয়ে এই ফিচারগুলো লিখতেন। কিন্তু 'শহরতলী পথে'র উপাদান ফুরিয়ে আসতেই আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে 'অতীত দিনের প্রসঙ্গে' লিখতে শুরু করেছিলেন। পুরনো দিনের মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের কয়েকজনের সম্বন্ধে লেখা শুরু করেছিলেন। প্রথম প্রসঙ্গ ছিল, নৈহাটীর জগা, উড়িষ্যার মানুষ। থুত্থুরে বুড়ো, কথা ঠিকমতো বোঝা যায় না। তিনমাথা এক। "তার দাবী কিশোর বয়সে সে সাহিত্য সম্রাটকে দেখেছে। তাঁর বাড়ির ভৃত্য ছিল। কোনো পাথুরে প্রমাণ নেই। তবুও সমরেশদা তাকে দিয়েই শুরু করলো। 'অতীত দিনের প্রসঙ্গে'। পর পর আরো ..." *(পৃ: ৮১, সখা কথা রাখেনি, সোমনাথ ভট্টাচার্য, দেশ, সমরেশ বসু স্মরণে)* ঠিক এইরকম সময়েই কুম্ভমেলায় যাওয়ার জন্য বাঁশির সুর শুনেছিলেন। মন আর ঘরে রয় না সমরেশ বসুর। এক জায়গায় পারানির কড়ি ব্যবস্থা করতে গিয়ে অপমানিত। এবার মনে অনেক আশা নিয়ে সাগরময় বাবুকে নমস্কার করে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন দুরু দুরু বক্ষে। কেউ কোনো কথা না বলে নির্বিকার ছিলেন। শেষে বাধ্য হয়ে আমতা আমতা করে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন। সমরেশ বসু লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর কথা শুনতে শুনতে সাগরবাবু আর ভদ্রলোকটি দু'জনে দু'জনার দিকে তাকাচ্ছিলেন। কথা শেষ হতেই

সাগরময় বাবু কানাইলাল বাবুর সঙ্গে সমরেশ বাবুর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেই তিনি গর্জিত স্বরে বলে উঠেছিলেন "গুড। ভেরি গুড আইডিয়া। কী বল সাগর?" *(পৃ: ৩৩, গাহে অচিন পাখি, কালকূট রচন সমগ্র ১ম খণ্ড)* সাগরময় বাবুও উত্তরে জানিয়েছিলেন যে — তারও প্রস্তাবটা ভালোই লেগেছে। তিনি কানাইলাল সরকারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতি নমস্কার জানিয়ে "কানাইবাবু মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন 'আপনি চলে যান এলাহাবাদ, আমরা আপনার লেখা ছাপব। দেশে নয় আনন্দবাজারে। আপনি কুম্ভমেলায় যেতে চান, দেখতে চান শুনে খুব ভাল লাগল। আমি খুশি হয়েছি। আপনি যান, দেখুন আর আমাদের সংবাদ দিন। ফটো তুলতে পারেন?" *(পৃ: ৩৩, ঐ)* আমার অবস্থা তখন কাকেই বা কী বোঝাব। খুশিতে প্রাণ ডগমগ হতে হতেই ঝপ্। তবু বলে ফেললাম, 'পারি। বক্স ক্যামেরায়।'

কানাইবাবুর মুখে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটু হাসি দেখা গেল। সাগরবাবুর দিকে একবার তাকালেন। সাগরবাবুর টেপা ঠোঁটেও কি হাসির ঝিলিক? কানাইবাবু বলে উঠলেন, 'ওতেই হবে।'

আমরা নেগেটিভ দেখে শুনে প্রিন্ট করে নেব। আপনি — হ্যাঁ ওখানে গিয়ে এক কাজ করবেন। আপনি নিশ্চয়ই মেলায় মেলায় ঘুরবেন?'

আমি ঘাড় কাত করে বললাম 'হ্যাঁ, তাই তো যাচ্ছি।'

'বেশ, ভেরিগুড।' কানাইবাবু নড়েচড়ে বসে বললেন, 'আপনি যা দেখবেন— আই মীন, বিশেষ বিশেষ সব ঘটনা, রোজ একটা ইনল্যান্ড খামে লিখে পাঠাবেন। আমরা সেগুলো সংবাদ করে ছাপব। আমরা আপনার প্রত্যেকটি চিঠির জন্য— ইয়ে (এক মুহূর্ত মুখ বুজে ভাবলেন, ভ্রূকুটি চোখের তারা এক কোণে বিদ্ধ হল, তারপরেই) হ্যাঁ, কুড়ি টাকা করে দেব। টুয়েনটি রুপিজ, অ্যাঁ কী বলো সাগর?'

সাগরবাবু বললেন 'হ্যাঁ, ভালই তো।'

কানাইবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি ফিরে এসে আর্টিকেল টার্টিকেল গোছের যা লিখতে চান, লিখবেন, আনন্দবাজারের লাস্ট পেজে ছাপা হবে।'

আমি তো যেন বাসরঘরের বউ। যেমন আনন্দ, তেমনি ভয়। গলার স্বরই যে গর্জানো।" *(পৃ: ৩৩, ঐ)*

সমরেশ বসু কানাইবাবুকে অ্যাডভান্সের কথা বলাতে উনি বলেছিলেন যে সেই মুহূর্তে টাকা দেওয়া সম্ভব নয়, ফিরে এলেই টাকা পেয়ে যাবেন। একথা শুনেই সমরেশ বসুর আনন্দ মুহূর্তেই মিলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কানাইবাবুই আবার আশার আলোও জ্বেলে দিয়েছিলেন। এলাহাবাদে কবি অরুণ মিত্রকে তিনি একটা চিঠি লিখে দেবেন, ওনার সঙ্গে দেখা করলেই উনি তাকে সবরকমের সাহায্য করবেন। সাগরময় বাবু সমরেশ বসুর নিঃস্বতার কথা বুঝতে পেরে বলেছিলেন যে

কানাইদার উপায় থাকলে নিশ্চয়ই দিতেন। কারও কাছে ধার করে এলাহাবাদ চলে গেলেই অরুণ মিত্র সব ব্যবস্থা করে দেবেন। সমরেশ সেদিনই সাগরময় বাবুর কাছে জেনেছিলেন যে কানাইবাবুই আনন্দবাজার পত্রিকার সব কিছু পরিচালনা করেন। অতএব আর কী করা। বন্ধুদের কাছে টাকা ধার করে ও বক্স ক্যামেরা চেয়ে নিয়ে মেজদার দেওয়া রেল কোম্পানীর গরম ওভারকোটটি নিয়ে ঝুলি কাঁধে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষার অধ্যাপক অরুণ মিত্রর আতিথ্য গ্রহণ করে একটি সাইকেল ভাড়া করে মেলায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন রোজকার মেলার বিবরণী ফটোসহ পাঠাবার জন্য। শুরু হয়েছিল নতুন পথে চলা। ফটো তুলতে গিয়েও আর এক বিপদ, কোতোয়ালজী মেলার থানায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। শেষে এক জটাধারী সাধুজীর কথায় কোতোয়ালজী ছেড়ে দিয়েছিল। তবু সমরেশ বসু লুকিয়ে ফটো তুলেছিলেন পত্রিকায় পাঠানোর জন্য। কুম্ভমেলায় আসা সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাষা-পোশাক-খাদ্য-ধর্মীয় আচরণ, পুরান-ইতিহাসের স্মৃতি, গঙ্গা-যমুনা নিরন্তর দুই রঙে বয়ে যাওয়া, সরস্বতী গুপ্তধারা, কোথাও কোথাও ক্ষীণভাবে দৃশ্যমান, বিশাল বালুচর, পুরনো কেল্লা, সবকিছুই তার হৃদয়তন্ত্রীতে বৈরাগ্যের সুর তুলেছিল। মেলার শেষদিনের মহাশ্মশানের ভয়াবহ করুণ দৃশ্য ও ক্রন্দনধ্বনি তাঁর বিষবাহী প্রাণে অমৃতের তৃষ্ণা বাড়িয়ে তুলেছিল। প্রয়াগে জ্বলে উঠেছিল চিতার আগুন যা আকাশ ছুঁয়েছিল। বেদনার্ত হৃদয়ে মনে অশৌচ নিয়ে তিনি ফিরে এসেছিলেন। তাই অশৌচ কাটাতে কানাইলাল সরকারকে বলেছিলেন ''যদি আমার বিষবাহী প্রাণের অমৃত সন্ধানের কথা 'দেশ' পত্রিকায় একটু বিস্তৃত করে লেখবার অনুমতি দেন।'' *(পৃ: ৩৫, ঐ)*

কানাইবাবু খুশি মনে রাজি হয়ে বলেছিলেন যে, মনে হয় লেখাটা ভালই হবে। ইচ্ছে হলে ছদ্মনামেও লেখা যেতে পারে। সমরেশ বসুর মনে হয়েছিল পাথরের মুখের রেখা কাঁপছে আর সাগরময় বাবু বলেছিলেন ''লেখাটার একটা নাম ঠিক করে ফেলুন। চারটে কিস্তি লেখা হলেই ছাপা শুরু করা যাবে।'' *(পৃ: ৩৫, ঐ)* সমরেশ বসু 'কিস্তি' কথাটাও জীবনে সেই প্রথম শুনেছিলেন। ''শুরু হল যাত্রা, 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'। কালকূট তার নামের সংজ্ঞার্থ খুঁজে পাচ্ছে।'' *(পৃ: ৩৫, ঐ)* ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় ৯টি কিস্তিতে ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়েছিল 'অমৃতকুভের সন্ধানে'; কালকূটের দৃষ্টিতে নতুন ধরনের রচনাশৈলীতে যা সমরেশ বসুর রচনাশৈলী থেকে আলাদা। সমরেশ বসুর সৃষ্ট তাঁর দ্বিতীয় সত্তা 'কালকূট'-এর সার্থক উত্তরণ ঘটেছিল। সমরেশ বসুতে বালক সুরথনাথের হারিয়ে যাওয়া মনটি সমরেশ বসুই ফিরিয়ে এনেছিলেন 'কালকূটের মাধ্যমে।' 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'র অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে কালকূটের সাহিত্যিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। একই উৎস থেকে দুটি ধারা দু'দিকে চলতে শুরু করেছিল। কিন্তু কখনও কখনও দেখা গেছে দুটি ধারা প্রয়াগের গঙ্গা যমুনা ধারার মত একসঙ্গে চলেছে। সমরেশ বসুর শেষ

জীবনীমূলক উপন্যাস 'দেখি নাই ফিরে' তে 'সমরেশ বসু' ও 'কালকূট' হাত ধরাধরি করে চলেছে।

'কালকূট' রূপী সমরেশ বসু 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' লিখেছিলেন নৈহাটীর এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে টালির ঘরে বসে— যে বাড়ি ও পরিবেশের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'দেশ' পত্রিকার 'সমরেশ বসু স্মরণে' বিশেষ সংখ্যাটিতে। সোমনাথ ভট্টাচার্য 'সখা কথা রাখেনি' তে সমরেশ বসুর বাড়ির পরিবেশ আরও বিস্তারিত করে লিখেছেন। তিনি বলেছেন — "বর্ণনা খুঁটিয়ে লেখার উদ্দেশ্য একটাই, আমাদের নৈহাটী শহরে এই পরিবেশে দুই মেয়ে, দুই ছেলেকে নিয়ে সস্ত্রীক বাসা বাঁধলেন, এ'যুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সমরেশ বসু। ওই টালির ঘরে বসে লেখা হল একটার পর একটা অসাধারণ ছোট গল্প, কয়েকটি সার্থক উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে কালকূটের আবির্ভাব হল 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'র নৈবেদ্য হাতে নিয়ে।" *(পৃ: ৮০, দেশ, সমরেশ বসু স্মরণে)*

একদিকে মরমীয়া অন্বেষণ ও আর একদিকে রাজনৈতিক অন্বেষণ একই কলমের দ্বৈতধারা। কালপ্রবাহের অন্তর্বর্তী স্রোতধারা বারে বারে বাঁক নিতে সাহায্য করেছে। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'র পর সমরেশ বসু ১৯৫৭ তে লিখেছিলেন 'গঙ্গা'। 'গঙ্গা'য় তিনি তাঁর লেখার পুরোনো ধারা ছেড়ে নতুন ধারায় গঙ্গার মতই গতিশীল করেছিলেন। এই উপন্যাসে উঠে এসেছে দক্ষিণবঙ্গের বিশেষ এক অঞ্চলের 'মাছমারা'দের কথা। যাদের জীবনের একভাগ থাকে ডাঙায় আর বাকি তিনভাগ থাকে জলে। 'মাছমারা'দের জীবনের বিচিত্র কাহিনী সমরেশ বসু অনেক কাছ থেকে নিকট আত্মীয়ের মত মাছমারাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের জীবন-যন্ত্রণা, সেই অনুভূতি তিনি তুলে ধরেছেন 'গঙ্গা'য়। জীবিকাই হয়ে উঠেছে তাদের নেশা। নারী এসেছে তাদের জীবনে, আবার কুল ভেঙেছে নারী নদীর মতোই। 'মাছমারা'দের শিকারী জীবন কত অনিশ্চিত, ফাঁদ হাতে ধরা কিন্তু শিকার দৃষ্টির বাইরে; অভুক্ত ক্লান্ত শরীরে সেই শিকারের জন্য প্রতীক্ষা। শিকারী তার প্রিয়তমাকেও ত্যাগ করে 'মাছমারা'য় পূর্ণতা প্রাপ্তির নেশায়। হিমি বিলাসের প্রেমকাহিনীর প্রয়োজনেই এসেছে। বিলাসের চরিত্র কল্পনায় নতুনত্ব আছে। 'মাছমারা'দের অনিশ্চিত জীবনের সঙ্গে মৃত্যুচেতনা কাহিনীকে চিরকালীন করেছে। 'গঙ্গা' উপন্যাসের জন্য সমরেশ বসু ১৯৬৭ তে আনন্দ পুরস্কার পান। ১৯৬০-এ লিখেছিলেন 'বাঘিনী'। বুর্জোয়া-লুম্পেন সমাজের কৃত্রিম গোষ্ঠী জীবনের কথা, স্মাগলারদের জীবনচিত্রের কথা তিনি চিত্রিত করেছেন। ১৯৬৬ তে তিনি লিখলেন 'জগদ্দল'। নৈহাটী জগদ্দল কেন্দ্রিক শিল্প অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের কাহিনী ছিল উত্তরঙ্গ। ১৮৬০ থেকে ১৮৮১ এই বাইশ বছরের কাহিনীর উত্তরপর্বই হল 'জগদ্দল' উপন্যাস। লোকশ্রুতির সঙ্গে ইতিহাসের বহু প্রামাণ্য নথিপত্র থেকে তিনি এই বৃহৎ উপন্যাসটি লিখেছিলেন। আর ১৯৬৭ তে লিখেছিলেন সেই বিতর্কিত উপন্যাস 'বিবর'। 'বিবর' বাংলা সাহিত্যের মোড়

ঘুরিয়ে দিয়েছিল, নবযুগের সূচনা করেছিল। স্বকীয় বিশ্বাস ও সমাজ চেতনায় 'প্রজাপতি' (১৯৬৭) , 'স্বীকারোক্তি' (১৯৬৭), 'পাতক' (১৯৬৯), 'বিশ্বাস' (১৯৭১) উপন্যাসগুলি চূড়ান্ত রূপ পেয়েছিল লেখকের নায়ক ভাবনায়। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তর থেকে সৃষ্ট নায়কদের কেউ নিঃসঙ্গ , কেউ হতাশাগ্রস্ত, কেউ মারমুখী, কেউ প্রেমহীন মৌনতায় পীড়িত রাজনীতির জটিল আবর্তে দিশাহীন। ঘরে-বাইরের পঙ্কিল আবর্তে থেকে বেরিয়ে এসে বাঁচতে চাইছে কিন্তু আসতে পারছে না। রাজনীতির শিকারে পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে। মুখের ভাষাকে ধারালো গালাগালে পরিণত করে আধুনিকতার অজুহাতে যৌনতা এনেছেন খোলাখুলিভাবে। 'বিবর' ও 'প্রজাপতি'র ভাষাকে অনেকেরই অশ্লীল বলে মনে হয়েছে। এই দুটি উপন্যাস সাহিত্যসমাজে প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে নতুন ভাবনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এই পাঁচটি উপন্যাসে সমরেশ বসু হয়ে উঠেছেন দুর্বার, অপ্রিয় সত্যভাষী লেখক। 'বিবর' ও 'প্রজাপতি' সম্পর্কে সাহিত্যিক আনন্দ বাগচী বলেছেন 'দেশ' এর সমরেশ বসু স্মরণ সংখ্যায়, সমরেশ 'আদরা বনাম খসড়া'য় বলেছেন, 'নৈতিকতার প্রশ্ন শ্লীলতার প্রশ্ন বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে নতুন ভাবনার মুখোমুখী দাঁড়ানো।... বিবর-সাহিত্যের ফলকথা এই দাঁড়ালো যে বাংলা সাহিত্য পরিপার্শ্ব সচেতন হয়ে ওঠার সাহস সাবালকত্ব অর্জন করল রাতারাতি। এই নতুন রীতির উপন্যাস হয়ে থাকলো নতুন কালের এক স্থায়ী আদরা।" *(পৃ: ৫২, সমরেশ : আদরা বনাম খসড়া, দেশ, সমরেশ বসু স্মরণ সংখ্যা)* 'বিশ্বাস' (১৯৭১) উপন্যাসে নায়ক নীরেন তার পারিবারিক জীবন ও রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। দেশীয় কমুনিষ্ট পার্টির বিভাজন ও মতভিন্নতার কারণে যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল তারই চিত্র এঁকেছেন নায়কের বিশ্বাসভঙ্গের মত দিয়ে। ব্যক্তিজীবনেও তাঁর ঝড় উঠেছিল। উপন্যাসের নায়কদের মতো তাঁর সংসার জীবনেও ভাঙচুরের অনিবার্য ঘটনা ঘটে গেছে। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি গৌরীদেবীর বোন ধরিত্রী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন। একদিকে গৌরীদেবী ও দুই পুত্র, দুই কন্যা আর একদিকে শ্যালিকা ধরিত্রী দেবীর সঙ্গে প্রেমের টানাপোড়েন। পাপপুণ্যে, ন্যায়-অন্যায়বোধ ধূলুণ্ঠিত। মূল্যবোধের অস্তিত্ব বিপন্ন। 'স্বীকারোক্তি' লেখা হয়েছিল দু'ভাবে — একটি ছোটগল্প আর একটি উপন্যাস। এই দুই 'স্বীকারোক্তি'র মাঝেই 'বিবর' সৃষ্টি করেছিলেন। স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সমরেশ বসু 'নিজেকে জানার জন্যে' তে বলেছেন ''এক 'স্বীকারোক্তি' একটি ছোটগল্প, দুই বছরের ব্যবধানে আর এক 'স্বীকারোক্তি' আমার উপন্যাস। শ্রেষ্ঠতার আখ্যা? কেমন করে শ্রেষ্ঠ শব্দটাকে কবুল করি? কিন্তু স্বীকারোক্তির মধ্যে যেহেতু আত্মানুসন্ধানের এক নৈতিক ও মানসিক আর্তি রয়েছে, সেইহেতু আমার কাছে তার মূল্যের পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে।" *(পৃ: ২৯, দেশ, সমরেশ বসু স্মরণে)* সমরেশ বসু 'বিবর' সম্পর্কে নীরব থেকেছেন।

১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে 'প্রজাপতি' উপন্যাসের জন্য অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন ও

'প্রজাপতি' বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ১৮ বছর পরে অশ্লীলতার অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এই সময়ে কালকূট লিখেছিলেন 'নির্জন সৈকতে' (১৯৬৩), 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে' (১৯৬৬), 'কোথায় পাবো তারে' (১৯৬৮)। একদিকে মরমীয়া অন্বেষণ আর একদিকে রাজনৈতিক অন্বেষণ এই কলমের দ্বৈতধারা। কালপ্রবাহের অন্তবর্তী স্রোতধারা সমরেশ বসুকে বারে বারে বাঁক নিতে সাহায্য করেছে। সত্তরের দশক থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত রাজনীতিকে লক্ষ রেখে আন্তর্জাতিক মানবতাবোধে লিখেছিলেন 'মানুষ শক্তির উৎস' (১৯৭৪), 'সংকট' (১৯৭৬), 'মহাকালের রথের ঘোড়া' (১৯৭৮) এবং 'যুগ যুগ জীয়ে' (১৯৮১) ইত্যাদি ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য সমস্ত উপন্যাসই রচিত হয়েছে সত্তর দশক থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। সমকালীন রাজনৈতিক পটপরিবেশ নানান বিপরীতমুখী ঘটনাস্রোতে উত্তাল, পুরোনো জাতীয় কংগ্রেসের তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধিতায় যুবককুল দ্বিধাবিভক্ত, সন্ত্রস্ত, দিগ্‌ভ্রষ্ট, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সংকট, কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নয়া চেতনাবোধ জাগরিত। তারা বুঝতে পারছে না কোন্‌টা গ্রহণীয় কোন্‌টা বর্জনীয়। এক কথায় তারা বিভ্রান্ত। আর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নয়া প্রেক্ষাপটে দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলন শতধা। যুবককুল সেই আবর্তে ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে, তারা দিশেহারা। একদিকে গান্ধীবাদ আর একদিকে মার্কসবাদের সর্বৈব পটপরিবেশ সমাজ বিবর্তনের এই ধারাকে সামনে রেখে তার নিজস্ব চিন্তাধারাগুলো প্রকাশ করেছেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে। 'মহাকালের রথের ঘোড়া'র নায়ক রুহিতন কুরমি ছিল নকশালবাড়ি এলাকার চা বাগানের শ্রমিক। 'কৃষক আন্দোলনে' নেতৃত্ব দিয়েছিল নতুন কৃষক গড়বে বলে। এই সর্বহারা শ্রেণীর নায়ক রুহিতন কুরমি স্বপ্নের সওয়ারী হয়ে কারাবরণও করেছিল। কিন্তু কারাবাস থেকে বেরিয়ে এসে তার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল পার্টির সদস্যদের অতিবিপ্লবী কার্যকলাপে। নয়া সংশোধনবাদীদের ভূমিকায় রুহিতন কুরমি আশাহত হয়েছিল। শ্রেণী শত্রুদের খতমের নামে মানুষকে অতর্কিতে খুন এসব মেনে নিতে পারেনি। জেলখানায় কুরমি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। কুষ্ঠ ব্যাধি প্রতীকী হিসাবে দেখিয়েছেন— সময়ের ব্যাধি। এই ব্যাধিতে কুরমি আক্রান্ত হয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। দলের মতবাদের সঙ্গে সংঘর্ষে তার কালের রথের চাকা বসে গিয়েছিল। সেইখান থেকে সে একাকী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল হৃত মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার জন্য ও মানুষ খুনের নির্মম সন্ত্রাসবাদ রাজনীতির বিচারের আশায়। রুহিতন কুরমি বন্দুকের মুখে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার মুখেও বন্দুকটা বুকের পাশে রেখে দেয় তাঁর একক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মানসিকতায়। তার একক সংগ্রাম, প্রতিবাদকে বিশ্বমানবতায় পৌঁছতে চায়। 'মানুষ শক্তির উৎস'-এর মধ্যেও এই একই ধরনের বিভ্রান্তি এসেছে নায়কের মধ্যে। এখানেও নকশাল আন্দোলনে শ্রেণীশত্রু খতমের পরিকল্পনায় বিশ্বাসী ছিল খণ্ডিত কমিউনিস্ট পার্টির কোন কোন খণ্ডিত দলের সদস্যবৃন্দ। এখানেও লেখক নায়কের অন্তরে ওই হিংস্র রাজনীতিকে মানবতাবোধে

জাগরিত করতে চেয়েছেন। মানুষের নিরন্তর অসহায়তার বিরুদ্ধে যে শক্তি অহরহ তাঁকে প্রেরণা দেয় সেই শক্তিকে জাগরিত করাতে চেয়েছেন।

১৯৪২ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত কংগ্রেসী মতবাদ ও কমিউনিস্ট মতবাদের যে নীতিগত পার্থক্য, সংঘর্ষ ছিল তারই ইতিহাস তুলে ধরেছেন লেখক। সেই রাজনৈতিক পটপরিবেশে নায়ক ত্রিদিবেশ সক্রিয়ভাবে রাজনীতির অংশীদার। এখানেও লেখক নায়কের মধ্য দিয়ে রাজনীতির সংকীর্ণতার উর্দ্ধে বিশ্বমানবতাবোধের কথা বলিয়ে নিয়েছেন প্রতীকী চিত্র-ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে। আর 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' (১৯৮৪)-র নায়ক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। ভোটে নির্বাচিত হয়ে এম. পি. হওয়ার পরে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ তাঁর শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল একদিন। সে শিকড় খুঁজে পাওয়ার জন্য আবার নিজ কর্মভূমিতেই ফিরে এসেছিল। এই সকল রাজনৈতিক উপন্যাস লেখার পরই সমরেশ বসু তাঁর সৃষ্টির গতিপথ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন আঞ্চলিক তাঁত শিল্পীদের দিকে। বিষ্ণুপুরের বালুচরী শাড়ির তাঁতিদের জীবনপ্রণালী নিয়ে লিখেছিলেন 'টানাপোড়েন' ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে। 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা' গ্রন্থে শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন 'ভূমিকা বা লেখকের কথার শেষ অংশে সমরেশ আমাদের জানিয়েছেন, "আমি চেষ্টা করেছি, বিষ্ণুপুরের তাঁত-শিল্পীদের জীবনযাপনের ছবি, মুখের ভাষা, ধ্যান-ধারণাকে রূপ দিতে।" এইখানেই তিনি বলেছেন যে এ উপন্যাসে "... এক প্রায়-গতায়ু শিল্পী-গোষ্ঠীর পরিচয়" তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। লেখকের এ কথাটা কিন্তু আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা যায় না। টানাপোড়েন বিষ্ণুপুরের গোটা তাঁতি সমাজের পরিচয় নয়। বালুচরী তাঁতি সমাজের নয়। টানাপোড়েনে বিশেষ ক'রে নকশাশিল্পী এবং তাঁতি পাচু কীতেরই স্বপ্ন, চেষ্টা, কামনা-বাসনার পরিচয়ই আড়ালে চলে যায় নি। মানুষগুলিকে, তাঁদের কলহ-রসালাপকে, তাঁদের মুখের ভাষা ও মনের চেহারাকে সমরেশ এত জাজ্জ্বল্যমানভাবে উপস্থিত করেছেন যে তাদের প্রত্যেকের হাত ধরে খানিকটা ক'রে তাঁতিজীবন আসরে উঠে এসেছে।' *(পৃ: ২৬৬, * ঐ)*

বিষ্ণুপুরের বালুচরী শিল্পীদের বেঁচে থাকা আর অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কাহিনীটি আসলে একটা গোটা শিল্পী-জাতির সঙ্কটের কাহিনী। একটিমাত্র তাঁতি পরিবারে বালুচরী শাড়ি তৈরি করে, পাঁচুকীত সে-ই 'বালুচর' শাড়ি শিল্পী, আর তার গুরু অভয় খান শুধু নকশা শিল্পী। তাঁর মৃত্যু জীব ও পাঁচুর আশাভঙ্গের মধ্যে কাহিনী শেষ হয়েছে। 'দেশ' সমরেশ বসু স্মরণে বিশেষ সংখ্যায় 'প্রিয় লেখক সমরেশ বসু' তে বোলান গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'টানাপোড়েন-এর শেষ পঙক্তিটি সম্পর্কে বলেছেন, 'জীবন বুনে চল রই হে, জীবন বুনে চল্ বই' — আমার মনে যে সুরেলা ঝংকারে ধ্বনিত হয়েছে বাংলাসাহিত্যে তেমন আর কটি পংক্তিই বা আছে।" *(পৃ: ১৩৮, ঐ)*

এই সময়েই কালকূটরূপী সমরেশ বসু লিখেছিলেন 'বাণীধ্বনি বেণুবনে' (১৯৭০), 'হারায়ে সেই মানুষ' (১৯৭১), 'অমৃত বিষের পাত্রে' (১৯৭২), অরণ্য জীবনের ত্রয়ী উপন্যাস 'মন চল বনে' (১৯৭২), 'বনের সঙ্গে খেলা' (১৯৭৩), 'প্রেম নামে বন' (১৯৭৪), 'তুষারসিংহের পদতলে' (১৯৭৫), 'শাম্ব' (১৯৭৮)। 'আরব সাগরের জল লোনা' লেখাটি ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে 'জলসা' পত্রিকায় কিছুটা প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। তার দশ বছর পরে আবার কিছুটা 'সাজঘর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর পূর্ণাঙ্গরূপে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে লেখাটি শেষ হওয়ার পরে ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

পৌরাণিক পথে চলতে গিয়ে কালকূট 'শাম্ব'কে চিত্রায়িত করেছেন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। পৌরাণিক পথে চলতে গিয়ে কালকূটরূপী সমরেশ বসু এক বিখ্যাত সংগ্রামী অভিযাত্রীকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কালকূট বলেছেন ''শাম্ব আমার কাছে এক 'সংগ্রামী' ব্যক্তি, 'বিশ্বাস' এখানে আমার বক্তব্য বিষয়, এবং এক বিপন্ন ব্যক্তির উত্তরণকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে চেয়েছি, কালের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।— কালকূট, ১ বৈশাখ, ১৩৮৫।'' *(পৃ: ১৬৮৩, কালকূট রচনা সমগ্র ৩য় খণ্ড)*

শাম্ব লেখার আগে ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে সমরেশ বসু লিখেছিলেন 'মহাকালের রথের ঘোড়া'। নায়ক রুহিতন কুরমি কারাবাসের সময় শেষ করে তাঁর স্বভূমিতে ফিরে আসার পর রাজনৈতিক মতাদর্শে সংঘাত হয়েছিল। তার কুষ্ঠ হয়েছিল যা প্রতীকী সময়ের কালব্যাধি। বিনষ্ট নেতৃত্বে হৃতমূল্যবোধের সন্ধানে সে একক সংগ্রামী। শাম্বও উত্তরণের পথে একক সংগ্রামী। 'মহাকালের রথের ঘোড়া'-রই উত্তরসূরী 'শাম্ব' উপন্যাস। এই দুই উপন্যাসে সমরেশ বসু ও কালকূট হাত ধরাধরি করে কাহিনী দুটিকে একই কলমের দুটি ধারায় বইয়ে দিয়েছেন বাংলাসাহিত্যকে গৌরবান্বিত করেছেন। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে 'শাম্ব'র জন্য কালকূট 'সাহিত্য একাডেমী' পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

১৯৬৪ তে শ্যালিকা ধরিত্রী দেবীকে বিয়ে করে বালিগঞ্জে স্টেশন রোডের ফ্ল্যাটে সংসার পেতেছিলেন। বালিগঞ্জের ঐ ফ্ল্যাটটিকে তিনি কিছুদিন আগেই কিনেছিলেন, কলকাতায় ওটাই ছিল লেখকের প্রথম আস্তানা। নৈহাটীর বাড়ির মত ওখানে তিনি প্রতিদিন নিয়ম করে লিখে যেতেন। দুপুরে কেউ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা, গল্প-গুজব করতে গেলে নিজে আগেই বলে দিতেন — লিখছি যে। তিনি যে লেখাকে পেশা করেছিলেন; অতএব লেখার বিষয়ে তাঁর শৃঙ্খলাটি ছিল। এরপরে বালিগঞ্জ থেকে সর্কাস রেঞ্জের দোতলা ফ্ল্যাটে উঠে এসেছিলেন। এখানে আসার পর তিনি প্রথম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ডাক্তার দোতলায় ওঠা বারণ করেছিলেন একটু বেশি সাবধানতার জন্য। যোধপুর পার্কে কল্যাণ চৌধুরীর নতুন বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সেইকালের বিখ্যাত সাহিত্যিক ওই ঘেরাটোপের মধ্যে বন্দী থাকতে পারেন নি। যোধপুর পার্কের বাড়িতেই ক'দিন বাদে ফিরে এসে 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে', 'মহাকালের রথের ঘোড়া' ও

'টানাপোড়েন' এই উপন্যাসগুলোর পূর্ণতা দিয়েছিলেন। এদিকে কালকূট ইতিহাস-পুরাণ-মহাকাব্য বিষয়ক রচনায় মনোনিবেশ। মহাভারত বিষয়ক রচনাগুলো হল 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' (১৯৮২) , 'পৃথা' (১৯৮৬), 'অন্তিম প্রণয়' (১৯৮৭), রামায়ণ বিষয়ক রচনা হল 'প্রাচেতস' (১৯৮৪)। ইতিহাস ও জীবনী বিষয়ক রচনাগুলো হল 'প্রেম কাব্য রক্ত' (১৯৮৭) ও 'জ্যোর্তিময় শ্রীচৈতন্য' (১৯৮৭)। এই রচনাগুলো প্রথমে ভ্রমর ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এগুলো কালকূট রচনাবলীর সঙ্গে সংযোজিত হয়ে যায়। কালকূটের রচনাগুলো তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

সমরেশ বসু একসময়ে কমুনিষ্ট আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু সেই কমুনিষ্ট পার্টির মধ্যে তিনি মুক্তি খুঁজে পান নি। সেই ছাপ তার লেখায় পড়েছে। তিনি ক্রমশ গান্ধীবাদের দিকে আকর্ষণ বোধ করছিলেন। 'তিনপুরুষ' (১৯৮৬), 'খণ্ডিতা' (১৯৮৪) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি তার গান্ধীবাদের আকর্ষণকে তুলে ধরেছেন।

ব্যক্তির জীবন ইতিহাসকে নিয়ে দীর্ঘ দশ বছরের পরিশ্রমে ভাস্কর 'রামকিংকর বেইজের' জীবনীমূলক উপন্যাস 'দেখি নাই ফিরে' লিখতে শুরু করেছিলেন 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে। এই উপন্যাসেই 'সমরেশ বসু' ও 'কালকূট' হাত ধরাধরি করে চলতে শুরু করেছিলেন কিন্তু অসমাপ্ত রয়ে গেল তাঁর সেই সাহিত্য কীর্তি। 'দেশ' সমরেশ বসু স্মরণে বিশেষ সংখ্যায় বোলান গঙ্গোপাধ্যায় 'প্রিয় লেখক সমরেশ বসু' তে 'দেখি নাই ফিরে' সম্পর্কে বলেছেন তাঁর শেষ এবং অসম্পূর্ণ লেখা 'দেখি নাই ফিরে' যখন থেকে দেশ-এর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অনেক আগেই এই উপন্যাসটি রচনার প্রস্তুতি পর্বের খানিকটা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। কি অসম্ভব ধৈর্য আর নিষ্ঠা সেই প্রস্তুতিতে! ভেতরে ভেতরে অপেক্ষা করেছে সৃষ্টিশীল এক লেখক কিভাবে লিখবেন এই জীবনী-উপন্যাস। এখানে তথ্যে স্থির হতে হবে (অবশ্য সমরেশ সর্বদা তথ্যে স্থির) এবং সেইসঙ্গে আনতে হবে উপন্যাসের কল্পনার স্বাদ। কি দুঃসাধ্য সেই কাজ। রামকিংকরকেই বা তিনি বেছে নিয়েছেন কেন? নিজের শিল্পী-জীবনের কোন প্রতিফলন কি তিনি রামকিংকরের মধ্যে দেখেছিলেন? এখানেও কি ব্যক্তির স্বাধিকারের, তার নির্বাচনের মর্যাদার প্রশ্নটি ঘুরে আসছিল না? কোন একটি বিন্দুতে গিয়ে কি ভাস্কর রামকিংকর আর লেখক সমরেশ বসু মিলে যাচ্ছিলেন না? কেবলই কি রামকিংকরের জীবন নাট্যময় সংঘাতে পূর্ণ বলে তাঁর এই নির্বাচন? আমার তা মনে হয় নি। যেহেতু এই জীবনী-উপন্যাসের লেখক সমরেশ বস— তাই আমিও পেয়ে গেলাম আর এক আশ্চর্য জগতের খোঁজ। চণ্ডীনাপিতের ছেলে রামকিংকর জীবনে কখনও সমান ব্যবহার পান নি। "নাপিতের ছেলে" এই জাতপাতের কলঙ্ককে তাঁর শিল্প মুছে দিতে পারে নি। এই সংজ্ঞাটি তাঁর ভাস্কর হয়ে ওঠার পাশাপাশি থেকেছে। আজীবন। 'দেশ' এর পাতায় আমরা দেখেছি কী ভীষণ

নীরব নিষ্ঠুরতা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে।'' *(পৃ: ১৩৮)* আর ঐ 'দেশ' সমরেশ বসু স্মরণে, সংখ্যাটিতে মুক্তি রায় চৌধুরী 'স্মৃতির মালা'য় বলেছেন, 'সমরেশ মজুমদার'-এর আগে ওঁর রামকিংকরকে নিয়ে লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শারীরিক কারণে সাহস পাননি, যদি নিয়মিত লেখাটি দিতে না পারেন; সমরেশ মজুমদারের লেখাটি শেষ হলেই ওঁর লেখাটি বেরুবে। হায়রে! আজ বড় আফসোস হচ্ছে তখন যদি আগে মজুমদার মহাশয়ের লেখাটি বেরুত তাহলে আমরা পরিপূর্ণ গ্রন্থটি পেতাম।' *(পৃ: ১৩৪)*

১৯৮৭-র ৩রা জানুয়ারী থেকে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে এই উপন্যাসেই 'সমরেশ বসু' ও কালকূট হাত ধরাধরি করে চলতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু অসমাপ্ত রয়ে গেল তাঁর সে-ই সাহিত্য কীর্তি। ১৯৪৬ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত দীর্ঘকাল সমরেশ বসু সাহিত্যকর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। লেখাকেই তিনি জীবিকা করেছিলেন। এ'বিষয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায় স্মৃতিতর্পণ করেছেন তার 'জীবন বুনা কর'-এ 'কোনো বিশেষণ প্রয়োগের শৃঙ্খলিত অলংকার ব্যবহার না করেই বলা যেতে পারে একজন মানুষ নিজের হৃদপিণ্ড এবং অন্তঃকরণ নিজেরই হাতে নিঙড়ে মুচড়ে শুধুমাত্র এই একটি শিল্পকর্মের জন্য জীবনভর যুগপৎ স্বেচ্ছা যন্ত্রণা ও আনন্দ উপভোগ করেছেন। এ যাতনা ও সুখের প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রত্যক্ষমর্মী লেখক নিজেই।' *(পৃ: ১০৪, দেশ, সমরেশ বসু স্মরণে)*

যেহেতু সমরেশ বসু লেখাকেই জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন, সেইহেতু তাঁর গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক। প্রায় পৌনে তিনশোর মত। যে কয়েকটি উপন্যাসের কথা আলোচনায় উঠে এসেছে সেগুলো ছাড়া সমরেশ বসুর আর কিছু বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ হলো — 'ছিন্নবাধা' (১৯৬২) , 'শেষ দরবার' (১৯৬৩), 'তিন ভুবনের পারে' (১৯৬৬), 'আত্মজ' (১৯৬৭), 'অপরিচিত' (১৯৬৮), 'এপার ওপার' (১৯৬৮), 'পাতক' (১৯৬৯), 'যাত্রিক' (১৯৭০), 'যার যা ভূমিকা' (১৯৭০), 'ছুটির ফাঁদে' (১৯৭০), 'সওদাগর' (১৯৭১), 'রক্তিম বসন্ত' (১৯৭১), 'বিকালে ভোরের ফুল' (১৯৭২), 'ওদের বলতে দাও' (১৯৭২), 'পরম রতন' (১৯৭৩), ত্রিধারা (১৯৭৩) , 'প্রাচীর' (১৯৭৩), 'অবশেষে' (১৯৭৩), 'নাটের গুরু' (১৯৭৫), 'সবুজ বনে আগুন' (১৯৭৫), 'সংকট' (১৯৭৬), 'সূর্যতৃষ্ণা' (১৯৭৬), 'বারো বিলাসিনী' (১৯৭৬), 'গন্তব্য' ((১৯৭৮), 'শেষ অধ্যায়' (১৯৭২), 'বিপর্যস্ত' (১৯৮০), 'অস্বীকার' (১৯৮১), 'হত্যারহস্য' (১৯৮২), 'বিজন বিভূঁই' (১৯৮৩), 'অভিজ্ঞান' (১৯৮৪), 'বাথান' (১৯৮৫), 'জবাব' (১৯৮৬), 'আদি মধ্য অন্ত' (১৯৮৭), 'মোহমায়া' (১৯৮৮) ইত্যাদি ইত্যাদি।

এছাড়া অসামান্য দক্ষতায় বাহুল্যহীন, এক বগ্গা, অলঙ্কারবিহীন অসংখ্য ছোট গল্প লিখে গেছেন। যার মধ্যে কিছু কিছু ছোট গল্প বিশ্বমানে পৌঁছে গেছে। 'দেশ', 'সমরেশ বসু স্মরণে'

সংখ্যায় আনন্দ বাগচী বলেছেন তার সমরেশ বসু কাগজে কলমে কাটাকুটি বা ঘষামাজা কম করতেন। সে কাজটা হত মুখে মুখে। 'হঠাৎ আলোর ঝলকের মত সমরেশের মাথায় কোন গল্প খেলে যাবার পরই তিনি তাকে মাথার মধ্যে সাজিয়ে নিতেন। তারপর মুখে মুখে গল্পটা বলে যেতেন। গল্প পাঠের মতই গল্প বলার আর্টও ছিল সমরেশের অসামান্য। এই বলতে বলতেই তাঁর গল্পে পালিশ ধরত, গল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে উঠত। অক্লান্ত কথক সমরেশ প্রয়োজনবোধে একটি গল্পকে চার পাঁচবারও শুনিয়েছেন বিভিন্ন শ্রোতার সামনে। সেই একাধিক বৈঠকে হাজির থাকার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তাঁরাই গল্পের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবর্তন লক্ষ করেছেন। এইভাবে গল্পটি তৈরী হয়ে যাবার পর এক বৈঠকে কিংবা এক ঝোঁকে সেটা লিখে ফেলতেন। কান দিয়ে দেখা আর চোখ দিয়ে শোনার কাজটি এই দুই দফায় ঘটে যেত। মৌখিক গল্প রচনার ফলে লেখার মধ্যে একটা সাবলীল স্বতঃস্ফূর্তি এবং অন্তরঙ্গ স্টাইল ফুটে বেরতো। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি না থাকলে একটা গল্পের পাণ্ডুলিপি কেউ এভাবে মগজে তুলে রাখতে পারে না।' তার উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পগুলো হলো — আদাব (১৯৪৬), উরাতীয়া (১৯৫৪), উত্তাপ (১৯৫৬), ছেঁড়া তমসুক (১৯৭১), হ্রেষাধ্বনি (১৯৭৩), আলোর বৃত্তে (গল্প সংগ্রহ, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৮ (মে ১৯৮১), পার, পসারিণী, শানা বাউরীর কথকতা, ৭৮ দিন পরে, স্বীকারোক্তি, শিকল পরার ছল (বাছাই গল্প, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৯২ (অক্টোবর ১৯৮৬) ইত্যাদি। তাছাড়া কিছু গল্প লিখেছেন ছোটদের জন্য — 'শিমূলগড়ের খুনে ভূত' (১৯৮০), 'গোগোল চিক্কুস নাগাল্যান্ডে' (১৯৮৩), 'জঙ্গলমহলে গোগোল' (১৯৮৭), 'বিদেশী গাড়িতে বিপদ' (১৯৮৮) ইত্যাদি।

ব্যক্তিজীবনে সমরেশ বসু তাঁর সাহিত্যে যে ভাষা ও ভাষ্যের সৃষ্টি করেছিলেন তা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। শ্লীল-অশ্লীলতা নিয়ে পাঠকমহলে, বিদগ্ধ মহলে অনেক ঝড় উঠেছে, তবু তিনি ক্ষান্ত হন নি। নিজ বিশ্বাসে অটল থেকেছেন। তিনি সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে নানাবিষয়ে তার গল্পের উপাদান সংগ্রহ করে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অনমনীয় আত্মবিশ্বাসই তাঁকে সাফল্যের সিংহদুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে। আর ছদ্মনাম 'কালকূট'-এর লেখাগুলো গভীর ব্যঞ্জনাময় ও অর্থবহ যা বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাসাহিত্যে তিনি ছিলেন মহীরুহ সদৃশ এই বিরাট প্রতিভাকে হঠাৎই চলে যেতে হয়েছে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সমরেশ বসু তথা কালকূট ১৯৮৮-এর ১২ই মার্চ ইহলোক ত্যাগ করলেন। জীবন শুরু হয়েছিল ঢাকায় মামার বাড়ি থেকে, ১৯২৪-এ ১১ই ডিসেম্বর থেকে। এই বিরল প্রতিভার প্রয়াণে পাঠককুলকে গুণীজন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় পরিজন সব শোকস্তব্ধ। ২৫শে ফেব্রুয়ারী ভুবনশ্বেরে গিয়েছিলেন অসুস্থ শরীরে। বরেন্দ্রকৃষ্ণ বলকে কথা দিয়েছিলেন বলেই অসুস্থ শরীরে পত্নী ধরিত্রী বসু ও ডঃ কল্যাণ বসুকে নিয়ে মুখ্য অতিথি

হিসাবে ভুবনেশ্বরে গিয়েছিলেন ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ বইমেলার উদ্‌ঘাটন উৎসবে। এ সম্পর্কে বরেন্দ্রকৃষ্ণ ধল স্মৃতি তর্পণ করেছেন এইভাবে 'সেইদিন শাম্ব উপন্যাসের ওড়িয়া ভাষান্তর ওর উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী উদ্‌বোধন করলেন। আমি 'শাম্ব' বইয়ে যে ভূমিকা লিখেছিলাম তাঁর বাংলা অনুবাদ উনি চেয়েছিলেন। ওটা আমি ভুবনেশ্বরে ওঁকে দিয়েছিলাম। উনি পড়ে একটু হাসলেন এবং বললেন, তুমি আমাকে অনেক উঁচুতে নিয়ে গেছো, সেটা সম্ভবত আমার প্রাপ্য নয়।'' *(পৃ: ১৩০, দেশ, সমরেশ বসু স্মরণে)* ভুবনেশ্বরে থাকার সময়েই ওঁনার শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়ায় প্লেনের টিকিট ক্যানসেল করতে হয়েছিল। পরে ২৯শে ফেব্রুয়ারীতে কলকাতার পথে রওনা দিয়েছিলেন। বিমানবন্দরে বরেন্দ্রকৃষ্ণ ধলকে বলেছিলেন 'তুমি কলকাতায় এলে আমার সঙ্গে দেখা করবে! নিশ্চয়ই এসো।

তখন ভাবতেও পারি নি, এই শেষ দেখা। ভুবনেশ্বরের বইমেলাতেই তিনি শেষ প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিলেন, সেদিন তোলা ছবিটিই সম্ভবত তার শেষ ছবি।'' *(পৃ: ১৩০, দেশ, সমরেশ বসু স্মরণে)* বাংলা কথাসাহিত্যের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এরপর অকালেই চলে গিয়েছিলেন। দেশ পত্রিকার ২রা এপ্রিল ১৯৮৮-র সংখ্যায় 'দেখি নাই ফিরে' ধারাবাহিক উপন্যাসটি পঁয়ষট্টি নং অধ্যায়ে 'দেখি নাই ফিরে' শিরোনামের দক্ষিণে বক্রভাবে লেখা হয়েছে 'এই লেখা তার শেষ হল না'। রামকিংকর বেইজের জীবনীমূলক উপন্যাস লেখাটাকে সমরেশ বসু তথা কালকূট ধ্যান জ্ঞান করেছিলেন। পাখির চোখের দিকে চোখ রেখে লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন না। সমরেশ বসু ও কালকূট হাত ধরাধরি করে চলতে গিয়ে হঠাৎই থেমে পাড়ি দিলেন অজানায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কালকূটের রচনাবলীর বিষয়গত শ্রেণীকরণ

'কালকূট' ছদ্মনামে সমরেশ বসুর যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই ১৯৫৪ থেকে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' রচনার মধ্য দিয়ে। যদিও 'কালকূট' ছদ্মনামটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন 'ভোটদর্পণ' (১৯৫২) নামে একটি ছোটগল্পের মধ্যে। কিন্তু 'কালকূট' নামের অধিক পরিচিতি ঘটেছিল পাঠককুলের কাছে ওই ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে, 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'র মাধ্যমে। সেই ১৯৫৪ থেকে 'কালকূট'-এর ছদ্মনামে লেখা রচনাগুলোকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি বিষয় নজরে আসে। বিষয়ের ভিন্নতা অনুযায়ী রচনাগুলিকে মূল দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১) মানবজীবন-কেন্দ্রিক রচনা

২) ইতিহাস-পুরাণ-মহাকাব্য কেন্দ্রিক রচনা।

এই মূল দু'টি ভাগের মধ্যে রচনাগুলোর বিষয়গত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আরও নানা ভাগ করা হয়েছে। যেমন,

কালকূটের মানবজীবন কেন্দ্রিক রচনাগুলির মধ্যে আছে —

অমৃতকুম্ভের সন্ধানে : ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে (বাংলা ১৩৬১ বঙ্গাব্দে কার্তিক মাসে) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'বেঙ্গল পাবলিশার্স' থেকে। এর আগে 'দেশ' পত্রিকায় কালকূট ছদ্মনামে এই লেখাটিই প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বিপুল জনসমাদর লাভ করে। প্রকাশকের মুদ্রণ থেকে জানা যায়, প্রতি বছর দুটি করে সংস্করণ হয়েছে।

খুঁজে ফিরি সেই মানুষে : ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ (১৩৬৬ বঙ্গাব্দের ২১শে ফাল্গুন) 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রচনাটিকে 'কোথায় পাবো তারে'র চুম্বক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে (১৩৮২ বঙ্গাব্দে) 'মৌসুমী প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত 'বাঁশীর তিন সুরে' বইটিতে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আরব সাগরের জল লোনা : ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে (১৩৬৮ বঙ্গাব্দে) 'জলসা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু কিছুদিন পরে লেখাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ দশ বছর পরে আবার কিছুটা অংশ 'সাজঘর'

পত্রিকায় প্রকাশিত। কিন্তু 'সাজঘর' পত্রিকা বেশিদিন টিকে না থাকার জন্য লেখাটি আবার বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৭ বঙ্গাব্দে) লেখা সম্পূর্ণ করার পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'দে'জ পাবলিশিং' থেকে ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে (১৩৭৮ বঙ্গাব্দে)।

নির্জন সৈকতে : প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে (১৩৬৮ বঙ্গাব্দে) শারদীয় সংখ্যায় 'জলসা' পত্রিকায়। পরে 'ত্রিবেণী প্রকাশন' থেকে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে (১৩৬৯ বঙ্গাব্দে) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'জলসা' পত্রিকায় যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তা থেকে অনেক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে : ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে (১৩৭১ বঙ্গাব্দে) 'জলসা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। প্রায় এক বছর পরে ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর (১৩৭২ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র) মাসে 'করুণা প্রকাশনী' থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংস্করণে 'জলসা' পত্রিকায় যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তার থেকে কিছু পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হয়।

কোথায় পাবো তারে : ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে (১৩৭৪ বঙ্গাব্দে) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'আনন্দ পাবলিশার্স' থেকে। কালকূটের এই বৃহত্তম রচনাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

পিঞ্জরে অচিন পাখি : ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৭ বঙ্গাব্দের নববর্ষ সংখ্যা (বৈশাখ) 'নবকল্লোল' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 'নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রা: লি: থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে (১৩৮৯ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে)।

হারায়ে সেই মানুষে : ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৭ বঙ্গাব্দে) 'সিনেমা জগৎ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে 'দে'জ পাবলিশিং', ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে (১৩৮২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে।)

মন চল বনে : ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৮ বঙ্গাব্দে) 'উল্টোরথ' পূজা সংখ্যায়। 'বিশ্ববাণী প্রকাশনী' থেকে ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে (১৩৭৯ বঙ্গাব্দে) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

বনের সঙ্গে খেলা : প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৯ বঙ্গাব্দে) 'নবকল্লোল' পত্রিকার পূজা সংখ্যায়। পরে ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে (১৩৮০ বঙ্গাব্দে) জানুয়ারি মাসে 'বিশ্ববাণী প্রকাশনী' থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

প্রেম নামে বন : ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে (১৩৮১ বঙ্গাব্দে) 'নবকল্লোল' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে 'বিশ্ববাণী প্রকাশনী' থেকে ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে (১৩৮২ বঙ্গাব্দে) বৈশাখ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

তুষার সিংহের পদতলে : প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে (১৩৮১ বঙ্গাব্দে) শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায়। পরে 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড' থেকে ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে (১লা বৈশাখ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ঘরের কাছে আরশি নগর : ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে (১৩৮৫ বঙ্গাব্দে) শারদীয় সংখ্যা 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়। (১৯৮০ খৃষ্টাব্দে) ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'বিশ্ববাণী প্রকাশনী' থেকে বৈশাখ মাসে।

মুক্তবেণীর উজানে : ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে (১৩৮৬ বঙ্গাব্দে) শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে 'দে'জ পাবলিশিং' থেকে ১৯৮১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে (১৩৮৭ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে) প্রকাশিত হয়।

চল মন রূপনগরে : ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে (১৩৮৬ বঙ্গাব্দে) শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'দে'জ পাবলিশিং' থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ফাল্গুন, ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে (১৩৮৮ বঙ্গাব্দে) ইত্যাদি।

পণ্যভূমে পুণ্যস্নান : ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে। এটি প্রথমে ১৯৮৬ 'দেশ' পত্রিকায় শারদীয় সংখ্যায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। পরে ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ : ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ থেকে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত ৯টি কিস্তিতে আনন্দবাজার পত্রিকায় মেলার বিবরণী হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে।

উক্ত মানবজীবন কেন্দ্রিক রচনাগুলিকে রচনার প্রকৃতি অনুযায়ী তিনটি উপবিভাজনে বিভাজিত করা হয়েছে।

(ক) লক্ষ রূপের আরশিতে বৈচিত্র্যের অন্বেষণ,

(খ) প্রকৃতির টানে ঘরছাড়া কালকূটের মানবজীবন অন্বেষণ ও

(গ) বাউলের সহজিয়া সাধনায় মানবমনের তত্ত্বতালাশ।

ক) লক্ষ রূপের আরশিতে বৈচিত্র্যের অন্বেষণ। এই পর্বে রয়েছে —

'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' [১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে (১৩৬১ বঙ্গাব্দে কার্তিক মাসে)]

'পিঞ্জরে অচিন পাখি' [১৯৭১ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৭ বঙ্গাব্দের নববর্ষ সংখ্যা (বৈশাখ)]

'হারায়ে সেই মানুষে' [১৯৭১ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৭ বঙ্গাব্দে)]

'ঘরের কাছে আরশি নগর' [১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে (১৩৮৫ বঙ্গাব্দে)]

'মুক্তবেণীর উজানে' [১৯৮০ খৃষ্টাব্দে (১৩৮৬ বঙ্গাব্দে)]

'চলো মন রূপনগরে' [১৯৮১ খৃষ্টাব্দে (১৩৮৬ বঙ্গাব্দে)]

'পণ্যভূমে পুণ্যস্নান' [১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ]

'পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ' [১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে] ইত্যাদি।

খ) প্রকৃতির টানে ঘরছাড়া কালকূটের মানবজীবন অন্বেষণ।

এই প্রকৃতি কেন্দ্রিক মানবজীবন পর্বকে আবার ২টি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(১) বন পর্ব, (২) নদী-সমুদ্র-পর্বত পর্ব।

বন পর্বে রয়েছে তিনটি রচনা —

'মন চলো বনে' [১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৭৮ বঙ্গাব্দে)],

'বনের সঙ্গে খেলা' [১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৯ বঙ্গাব্দে)],

'প্রেম নামে বন' [১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে (১৩৮১ বঙ্গাব্দে)],

নদী-সমুদ্র-পর্বত পর্বে রয়েছে তিনটি রচনা —

'নির্জন সৈকতে' [১৯৬২ খৃষ্টাব্দে (১৩৬৮ বঙ্গাব্দে)],

'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে' [১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে (১৩৭১ বঙ্গাব্দে)] ও

'তুষার সিংহের পদতলে' [১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে (১৩৮১ বঙ্গাব্দ)]।

গ) বাউলের সহজিয়া সাধনায় মানবমনের তত্ত্বতালাশ। এই পর্বে রয়েছে —

'খুঁজে ফিরি সেই মানুষে' [১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ (১৩৬৬ বঙ্গাব্দের ২১শে ফাল্গুন)],

'কোথায় পাবো তারে' [১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে

(১৩৭৪ বঙ্গাব্দে)]।

একালের দৃষ্টিতে কালকূটের ইতিহাস-পুরাণ-মহাকাব্য কেন্দ্রিক পরিভ্রমণের রচনাগুলো হল :

'বাণীধ্বনি বেণুবনে' : ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৬ বঙ্গাব্দে), 'সিনেমা জগৎ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৭ বঙ্গাব্দে) মার্চ মাসে মৌসুমী প্রকাশনী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

শাম্ব : প্রথমে ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় এবং পরে ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে ১লা বৈশাখ আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লিমিটেড থেকে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম ভ্রমর না হয়ে কালকূট হয়ে যায়।

জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য : প্রথমে ১৯৮০, ১৯৮১, ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে (১৩৮৬, ১৩৮৭, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে) 'প্রসাদ' পত্রিকায় শারদীয় সংখ্যায় 'ভ্রমর' ছদ্মনামে যথাক্রমে 'প্রেমনিত্য', 'প্রেম নিত্য, অনিত্য সংসার' এবং 'প্রভু কার হাতে তোমার রক্ত' নামে তিনটি অধ্যায়ে প্রকাশিত হয় এবং পরে এই তিনটি অধ্যায় একত্রিত করে 'জ্যোর্তিময় শ্রীচৈতন্য' নামে ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে (১৩৯৩ বঙ্গাব্দে) মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

যুদ্ধের শেষ সেনাপতি : প্রথমে ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে (১৩৮৮ বঙ্গাব্দে) শারদীয় 'প্রসাদ' পত্রিকায় এবং পরে ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে (১৩৯০ বঙ্গাব্দে) আগস্ট মাসে এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স প্রা. লি. থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

প্রাচেতস : প্রথমে ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে (১৩৮৯ বঙ্গাব্দে) শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পরে ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে (১৩৯০ বঙ্গাব্দে) ফেব্রুয়ারী মাসে দে'জ পাবলিশিং থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

পৃথা : প্রথমে ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে (১৩৯২ বঙ্গাব্দে) শারদীয় 'প্রসাদ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পরে ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে (১৩৯৩ বঙ্গাব্দে) ১লা বৈশাখ মন্ডল বুক হাউস থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

অন্তিম প্রণয় : প্রথমে 'প্রসাদ' পত্রিকায় 'ভ্রমর' ছদ্মনামে এবং পরে ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে (১৩৯৩ বঙ্গাব্দে) এপ্রিল মাসে জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স

থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

প্রেম কাব্য রক্ত : 'প্রসাদ' পত্রিকায় 'ভ্রমর' ছদ্মনামে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পরে ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে (১৩৯৩ বঙ্গাব্দে) জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ইতিহাস-পুরাণ-মহাকাব্য কেন্দ্রিক রচনাগুলিকে চারটি ভাগে বিভাজন করা হয়েছে।

ইতিহাস-পুরাণ-রামায়ণকে কেন্দ্র করে রচনাটি হল —

'বাণীধ্বনি বেণুবনে', ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৬ বঙ্গাব্দে)

পুরাণ মহাভারতকে কেন্দ্র করে রচনাটি হল —

'শাম্ব', ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে (১৩৮৪ বঙ্গাব্দে)

মহাকাব্যকে কেন্দ্র করে রচনাগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

রামায়ণকে কেন্দ্র করে রচনাটি হল —

'প্রাচেতস', ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে (১৩৮৯ বঙ্গাব্দে)

মহাভারতকে কেন্দ্র করে রচনাগুলি হল —

'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে (১৩৮৮ বঙ্গাব্দে)

'পৃথা', ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে (১৩৯২ বঙ্গাব্দে)

'অন্তিম প্রণয়', ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে (১৩৯৩ বঙ্গাব্দে)

জীবনী ও ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রচনাগুলি হল —

'জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য', ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে (১৩৯৩ বঙ্গাব্দে)

'প্রেম কাব্য রক্ত', ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে (১৩৯৩ বঙ্গাব্দে)

কালকূটের রচনাগুলি যেভাবে বিভাজন করা হয়েছে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে এগুলি আলোচনা করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

কালকূটের মানবজীবন কেন্দ্রিক রচনাবলীর বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ

কালকূটের মানবজীবন কেন্দ্রিক রচনাগুলি হল — 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'মুক্তবেণীর উজানে', 'খুঁজে ফিরি সেই মানুষে', 'কোথায় পাবো তারে', 'আরব সাগরের জল লোনা', 'হারায়ে সেই মানুষে', 'পিঞ্জরে অচিন পাখি', 'ঘরের কাছে আরশিনগর', 'চল মন রূপনগরে' 'মন চল বনে', 'বনের সঙ্গে খেলা', 'প্রেম নামে বন', 'নির্জন সৈকতে', 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে', 'তুষার সিংহের পদতলে' ইত্যাদি। মানবজীবন কেন্দ্রিক রচনাগুলিকে বিশ্লেষণ করে অন্তঃবিষয়গত বিভিন্নতা লক্ষিত হয়েছে। লেখকের জীবনদৃষ্টিতে ভিন্নতা অনুযায়ী এই পর্যায়ের রচনাগুলিকে তিনটি উপবিভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই তিনটি ভাগ ও প্রতিটি ভাগের রচনাগুলি হল :

ক) লক্ষ রূপের আরশিতে বৈচিত্র্যের অন্বেষণ।

এই পর্বে রয়েছে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ', পণ্যভূমে পুণ্যস্নান', 'হারায়ে সেই মানুষে', 'মুক্তবেণীর উজানে', 'পিঞ্জরে অচিন পাখি', 'ঘরের কাছে আরশি নগর' ও 'চলো মন রূপনগরে' ইত্যাদি।

খ) প্রকৃতির টানে ঘরছাড়া কালকূটের মানবজীবন অন্বেষণ।

এই পর্বে রয়েছে 'মন চলো বনে', 'বনের সঙ্গে খেলা', 'প্রেম নামে বন', 'নির্জন সৈকতে', 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে' ও 'তুষার সিংহের পদতলে' ইত্যাদি।

গ) বাউলের সহজিয়া সাধনায় মানবমনের তত্ত্বতালাশ।

এই পর্বে রয়েছে 'খুঁজে ফিরি সেই মানুষে', 'কোথায় পাবো তারে' ইত্যাদি।

বিষয়গতভাবে বিভক্তিকরণে প্রথম ভাগে অর্থাৎ 'লক্ষ রূপের আরশিতে বৈচিত্র্যের অন্বেষণ' — এই উপবিভাগের রচনাগুলির মধ্যে — 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'পণ্যভূমে পুণ্যস্নান' ও 'পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ' — এই তিনটি রচনায় তিনটি বিশাল জনসমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপের মধ্যে কালকূট নিজেকে অন্বেষণ করেছেন। নিজেদের পরিচিত পরিবেশে যে মানুষকে প্রতিদিন দেখেছেন সেই মানুষই বিশেষ স্থানে বিশেষ রূপে ধরা পড়েছে কালকূটের চোখে। কালকূট মানবমনের গহীনে ডুব দিয়ে তুলে এনেছেন সেইসব অমূল্য মণিমুক্তা। যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দেখা থেকে আলাদা। এই চেনা মানুষের না দেখা রূপটি হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন কালকূট এবং সেটি তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন পাঠককুলের কাছে। চরিত্রগুলি উঠে এসেছে মেলার মধ্যেকার লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্য থেকে। মেলার স্থান মাহাত্ম্যের থেকে বেশি করে উঠে এসেছে সাধারণ মানুষের

কথা। এখন দেখা যাক্ রচনাগুলির দিকে মনোনিবেশ করে। প্রথমে আলোচনা করব 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'পণ্যভূমে পুণ্যস্নান' ও 'পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ' তারপরে 'হারায়ে সেই মানুষে' ও 'মুক্তবেণীর উজানে'।

কালকূট তথা সমরেশ বসু **'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'** রচনা করেছিলেন ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রথমে 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু হয়েছিল প্রথম চারটি কিস্তি জমা দেওয়ার পর। সমগ্র রচনাটি ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে 'বেঙ্গল পাবলিশার্স' থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকের মুদ্রণ থেকে জানা গেছে যে গ্রন্থটির বছরে দুটি করে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং 'কালকূট' জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে গেছেন। দ্বিতীয় মুদ্রণের সময় কালকূট মূল রচনার প্রারম্ভে 'বিচিত্র' নামে একটি সংযোজনী লিখেছিলেন। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরে বহু মানুষের বিচিত্র সব চিঠি পেয়েছেন। জনে জনে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, তাই এই 'বিচিত্র'-এর সংযোজনা। এই সংযোজনীতে তিনি একটি কথা বলেছিলেন মেলায় যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাদের অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র আলাদা হওয়ায় তিনি চিনতে পারেননি। কালকূট তাঁর 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' চেনা মানুষের বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ রূপটি চিত্রিত করেছেন।

যাই হোক্, 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' রচনার আগে প্রয়াগের 'কুম্ভমেলা হাতছানি' দিচ্ছিল সমরেশ বসুকে। সমরেশ বসুর বাল্যকালে নাম ছিল সুরথনাথ। ব্যক্তিসত্তার পরিচয়ে এ বিষয়ে বলা হয়েছে, তাই নূতন করে আর উল্লেখ করা হল না। 'সুরথনাথ'-এর মধ্যে ছোটবেলা থেকেই একটা বিবাগী, ছন্নছাড়া বাউলমনা মন ছিল, যা তাকে সেই শৈশবকাল থেকে হাতছানি দিয়েছে। এবারও সমরেশ বসুর সেই বাল্যকালের সুরথনাথ তাঁর মণিকোঠায় উঁকি দিয়েছিল। অতএব চল মন ত্বরায়, কুম্ভমেলায়। আর্থিক সঙ্গতি ছিল না মেলায় যাওয়ার। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ ও আনন্দবাজার পত্রিকার কানাইলাল সরকার তাঁকে সেই সুযোগ করে দিয়েছিলেন। মেলার বিবরণী তিনি রোজ পাঠাবেন। ইন্‌ল্যান্ড খামে পাঠাবেন, আনন্দবাজারে সেই লেখা ছাপা হবে। মেলা থেকে ফিরে এসে মেলা সম্পর্কে যা কিছু লিখবেন সেটা আনন্দবাজারের শেষ পাতায় ছাপা হবে। অর্থাৎ সাংবাদিকের কাজে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। এলাহাবাদে কবি অরুণ মিত্রর বাড়িতে থেকে মেলা ঘুরে ঘুরে মেলার বিবরণী পাঠিয়েছিলেন। মেলার শেষ দিনটিতে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন "সেই মহাশশ্মানের ছবি। পুণ্য স্নানের মহা মুহূর্তে যাওয়া আসার পথের ভুলে, বিশৃঙ্খলায় শত শত মানুষ, নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ পিষ্ট হয়ে গেল। তারপরে খুঁজে পাই নি অনেক চেনা মুখ। কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে যে কান্না ধ্বনিত হয়েছিল, তা কি এই শোকার্ত, আপনজন হারাদের হাহাকারের মতোই? যে বিশাল চিতার আগুন প্রয়াগের আকাশ স্পর্শ করলো, মহাকাব্যের

শশ্মানভূমির চিত্র কি এর থেকেও মর্মন্তুদ হয়েছিল?'' *(পৃষ্ঠা ৩৫, 'গাহে অচিন পাখি', কালকূট রচনা সমগ্র ১ম খণ্ড)*

মেলা শেষে মনে অশৌচ নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। মনের মধ্যে জমে থাকা বেদনার মুক্তি ঘটানোর জন্য তিনি আবার সাগরময় ঘোষের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, ''যদি আমার বিষবাহী প্রাণের অমৃত-সন্ধানের কথা 'দেশ' পত্রিকায় একটু বিস্তৃত করে লেখার অনুমতি দেন?'' *(পৃষ্ঠা ৩৫, ঐ)* কানাইলাল সরকার সমরেশ বসুর কথা শুনে বলেছিলেন ''ইয়েস, হোয়াই নট? এতো খুব ভালোকথা, তুমি কি বলো সাগর?' সাগরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আমার তো বেশ মনে লাগছে।' *(পৃষ্ঠা ৩৫, ঐ)* কানাইবাবু গর্জিত স্বরে বেণুধ্বনি রবে লেখার অনুমতি দিয়েছিলেন। আরও বলেছিলেন 'ছদ্মনামে' লিখতে চাইলে তাতেও লিখতে পারেন। সাগরময় বাবু বলেছিলেন 'লেখাটার একটা নাম ঠিক করে ফেলুন। চারটে কিস্তি লেখা হলেই ছাপা শুরু করা যাবে।' *(পৃষ্ঠা ৩৫, ঐ)* তিনি অনুমতি পেয়ে গিয়েছিলেন 'কালকূট' ছদ্মনামে 'দেশ' পত্রিকায় কিস্তিতে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' লেখার। কালকূটের জয়যাত্রার সেই শুরু। ভ্রমণের আঙ্গিকে নতুন এক রচনাশৈলীতে নিজ 'অশৌচ আত্মা'র মুক্তি ঘটিয়েছিলেন। তারপর? তারপর ইতিহাস।

'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' এই কাহিনীর প্রায় প্রথমেই দেখি কুম্ভমেলা যাওয়া প্রসঙ্গে এক বন্ধুর বিদ্রূপাত্মক কথা, ''কী দেখতে? লক্ষ লক্ষ ধর্মান্ধ মানুষকে?'' *(পৃ: ৩৮, অমৃত কুম্ভের সন্ধানে, কালকূট রচনা সমগ্র ১ম খণ্ড)* উত্তরে কালকূট বলেছিলেন যে, ''ধর্মান্ধ কিনা জানি নে, তবে মানুষ দেখতে যাচ্ছি। আমাদের সব কিছুতে সাধ মিটতে পারে। সাধ মেটে না মানুষ দেখে, মানুষ চেখে! মানুষের চেয়ে বিচিত্র এ সংসারে আর কী আছে?'' *(পৃ: ৩৮, ঐ)* কালকূট ডুব দিয়েছিলেন 'লক্ষ হৃদি-কুম্ভ সায়রে'। পিঠে ঝোলা আর হাতে ঝুলি নিয়ে হাওড়া স্টেশনে ছোট একটি কামরাতে কোনরকমে জায়গা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। ''মহামেলার পথে, লক্ষ জনের অকল্পিত বিচিত্র রূপ বিচিত্র নাদে আমার প্রতিটি ধমনীকে ডাক দিয়ে চলেছে। পথে কী আছে কে জানে।'' *(পৃ. ৩৯, কালকূট রচনা সমগ্র ১ম খণ্ড)*

লক্ষ রূপের মাঝখানে যে বৈচিত্র্য আছে তারই অন্বেষণে চলেছেন কুম্ভমেলায়। ট্রেনের কামরাতেই সেই বৈচিত্র্য তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে। কালকূটের সামনের সীটে কম্বলের পুটলির মত একটি মুখ। লিকলিকে ঘাড়ের উপরে একটি মাথা, কোটরগত চোখ, কিন্তু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। কালকূটকে সে বলেছিল যে, ব্যামোর কষ্ট তার আর সহ্য হচ্ছে না, তবু চোখে হাসির ছোঁয়ায় খুশির ছোঁয়ায় ''আমি যাব, হ্যাঁ।'' *(পৃ. ৩৯, ঐ)* তার এই কথা বলার মধ্যে দিয়ে ছোট্ট শিশুর আবদারের সুরটি লেখকের চোখে ধরা পড়েছে। মনের আবেগে সে বলে চলেছে ''কুম্ভযোগে সঙ্গমে স্নান করলে মানুষ শত বছর পরমায়ু পায়, রোগমুক্ত হয়। তাই তো আমি যাচ্ছি।'' *(পৃ. ৩৯, ঐ)*

প্রয়াগের মেলায় যাত্রার শুরুতেই মেলা অভিমুখী যাত্রীদের ভিড়ে বিশেষ এক অসুস্থ যাত্রীর মনের আশা বিশেষভাবে উঠে এসেছে। যার যন্ত্রণা ও আশা দুটোই পাঠক মনকে প্লাবিত করেছে। কঙ্কালসার মানুষটি কালকূটকে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। অনেক রাতে যন্ত্রণায় কাশতে কাশতে বলছে "উঃ, বড় তখলিফ, বড় তখলিফ। এখন নয়, হে ভগবান! সে যে অনেক দূর, অনেক দূর।" *(পৃ: ৩৯, ঐ)* তার মুখ দিয়ে চল্‌কে চল্‌কে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল। দরজা খুলে দেওয়ার জন্য আকুল আকূতি। কালকূট দরজা খুলে দিয়ে গার্ড-এর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে গিয়েছিলেন কোন সুরাহা করার জন্য, কিন্তু সুরাহা করতে না পেরে গার্ডের পরামর্শমত ওই মৃত্যুজীবাণু বহনকারী কামরাটা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন উচ্চশ্রেণীর একটি কামরায়। একটি অন্ধ্র ও একটি মধ্যপ্রদেশের পরিবারের সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছিলেন এই কথা বলে যে, সুযোগ পেলে পরে অন্য কামরায় চলে যাবেন।

ভোরবেলায় গাড়ী মোকামাঘাটে পৌঁছতেই কালকূট প্লাটফর্মে নেমে কিছুদূর গিয়েই দেখতে পেয়েছিলেন কুম্ভসঙ্গমে স্নান করে শতবর্ষ পরমায়ু অভিলাষী, রোগমুক্তি অভিলাষী সেই কঙ্কালসার মানুষটিকে, লাল কাঁকরের উপর শুয়ে আছে। অমৃতসন্ধানী যাত্রী মোকামাঘাটেই পড়ে রইল, যাত্রাপথের শুরুতেই এই মৃত্যুদৃশ্য কালকূটের হৃদয়মনকে ব্যথিত করে তুলেছিল। লেখক তার হৃদয়যন্ত্রণাকে পাঠক হৃদয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন এইভাবে "তুমি পড়ে রইলে। সে যে এতদূর, তা আমিও জানতাম না। তোমার হয়ে আমি হাজারটা ডুবও যদি সঙ্গমে দিই তাহলেও তোমার আশা আর কোনদিন মিটবে না। তুমি পড়ে থাক, আমাদের পরমায়ু নিয়ে আমরা ছুটে চলি"। *(পৃ: ৪০, ঐ)*

এই রকমই ট্রেনের ভেতরের আরও টুকরো টুকরো মানবমনের হৃদয় নিংড়ানো বেদনার কথা, যা বিশেষ মুহূর্তে কালকূটের চোখে ধরা পড়েছে। বিচিত্র মানুষকে বিচিত্ররূপে দেখতেই তো তিনি চলেছেন। তাঁর 'ভারতদর্শন, রেলগাড়ীর কামরা থেকেই শুরু হয়েছে। তার হৃদি-কুম্ভ অমৃতের স্পর্শ পেতে শুরু করেছে। উচ্চশ্রেণীর রেলের কামরাটিতে অন্ধ্র পরিবারটির সঙ্গে আলাপ জমতেই জেনে গেলেন ওই পরিবারটির অন্তর্বেদনার কথা। তিন ভাই ও তাদের বড় বউ তাঁদের কুলগুরুর নির্দেশে অমৃতকুম্ভে চলেছে অভিশাপমুক্ত হতে। এর আগেও তারা অন্য তীর্থে ঘুরেছে, এটি তাদের শেষ পরিক্রমা। মুক্তিস্নান করবে তারা, পরিবারের লোকেরা, বড় বউকে অভিশাপের জন্য দোষারোপ করছিল। বধূটির স্বামীও লেখকের কাছে ঐ বিষয়ে কিছু বলতে শুরু করেছিলেন। বধূটি স্বামীকে নিরস্ত্র করতে চাইছিলেন কিন্তু বলতে পারছিলাম না। লেখক দেখেছিলেন বধূটির ঠোঁট দুটি বেদনায় কেঁপে উঠছিল। ভদ্রলোকটি কথা বলতে গিয়েও থেমে গিয়েছিলেন। "কিছু মনে করবেন না। আমি আমাদের নিতান্ত ব্যক্তিগত একটা কথা আপনাকে বলছিলাম।" *(পৃ: ৪১, ঐ)*

ভদ্রলোকের ধন মান ও বিলাসের তলে বুকে একটি পাথর চেপে আছে সেটি নিজের

অজ্ঞাতসারে কয়েক মুহূর্তের জন্য সরিয়ে ফেলে মন পেতে বসেছিলেন অপরিচিত নগণ্যের কাছে। লেখকের উপলব্ধির সঙ্গে পাঠকের উপলব্ধিতেও এই সত্য উঠে এসেছে। "প্রায়শ্চিত্তের শেষ দিন আগত। গরলে হবে অমৃতের উদ্ভব। ভরে উঠবে তাদের তিন ভায়ের সংসার। এমনি ভরিয়ে তোলবার জন্যে ছুটে চলেছে লক্ষ মানুষ। লক্ষ জনের লক্ষ রকম কামনা।" *(পৃ: ৪২, ঐ)* কালকূট ওই অভিশপ্ত পরিবারটির মনোবেদনা, মনঃকষ্ট, কথাবার্তা, রাগ-অভিমান সব ধীরে ধীরে তুলে ধরেছেন তার লেখনীর মাধ্যমে এবং সেই বেদনার সুর পাঠক মনকেও বেদনার্ত করে তোলে।

রেলের কামরায় যে চরিত্রটি উঠে এসেছে সে হল বলরাম। সমগ্র কাহিনীতে বলরাম একটি মুখ্য চরিত্র হয়ে পাঠকের দরবারে ধরা পড়েছে। লেখক অন্ধ্র পরিবারটির সঙ্গে কথা বলতে বলতেই পায়ের নীচের কাছে শোয়া নুলো বলরামের দৃষ্টিতে আকর্ষিত হয়েছেন। নবদ্বীপের কাছে আমঘাটায় লক্ষ্মীদাসীর আখড়ার মূল গায়েন সে। বলরাম তার নাম। লক্ষ্মীদাসী সহ দলের অন্যান্যরা নুলো বলরামকে উচ্চ শ্রেণীর কামরায় তুলে দিয়ে গেছে, এলাহাবাদে সময়মতো নামিয়ে নেবে। কিন্তু বলরামের এ ব্যবস্থা পছন্দ হয়নি, লক্ষ্মীদাসীর সঙ্গে বলরাম নরকে যেতেও রাজি। কালকূটের চোখে উঠে এসেছে লক্ষ্মীদাসীর আখড়ার মূল গায়েনের লক্ষ্মী নির্ভরতা। কালকূট এই গায়েনকে এড়াতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেন নি তার মিষ্টি গলা ও বাউল মনের পরিচয়েই।

বলরামের কাছে 'আতাউলের' পদ শুনেছিলেন। রবিঠাকুরকে সে চেনে না কিন্তু কেন্দুলিতে জয়দেবের মেলায় এই রবিঠাকুর বাউলের সঙ্গে তার নিশ্চয় দেখা হয়েছে। লেখক কালকূটই তাকে রবিঠাকুরের গানের লাইন শুনিয়েছিলেন, গান শুনে মুগ্ধ বলরাম। তিনি তাঁর বিষময় দেহে অমৃতের পরশ পেতে পেতে কুম্ভমেলার দিকে এগিয়ে চলেছেন। বলরাম-লক্ষ্মীদাসী বৃত্ত কাহিনীর গতি এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে।

এই কাহিনীর অন্যতম প্রধান যে চরিত্রের সঙ্গে লেখকের দেখা হয়েছে সে হলো শ্যামা। শ্যামাদের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার মুহূর্তটি কালকূটের কাছে ঝড়ের মত।

"হঠাৎ একটা তুমুল গণ্ডগোল আর তার সঙ্গে শিলাবৃষ্টির মত কামরাটার মধ্যে এসে পড়তে লাগল বাক্স, প্যাঁটরা, বোঁচকা, পুঁটুলি। প্রতিবাদের অবসর ছিল না।" *(পৃ: ৪৩, ঐ)* এক বাঁজখাই মহিলা কণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল। "শ্যামা! প্রেমবতী। ইধার, ইধার মে। বুঢ়া কো উঠাও। পাতিয়া, এ পাতিয়া। ছোকরি বহেরা হো গয়ী। শুনতি কি নহি? শ্যামা, হাঁ হাঁ তু কোণে চলে যা।" *(পৃ: ৪৩, ঐ)* লেখকের ঘাড়ের ওপরে দু-মনী বস্তার মত মহিষাসুর মর্দিনী পড়েই খুশীতে বলে উঠল "আরে বাপরে, গাড়ি মে উঠনা এক আজীব কাম হ্যায়।" *(পৃ: ৪৩, ঐ)* ভিড় গাড়িতে উঠতে পারার আনন্দটাই সব কষ্টকে ভুলিয়ে দিয়েছে। তীর্থযাত্রীদের ঝড়ো বাতাসের তাণ্ডবে গাড়ীতে ওঠাটা দুঃসাধ্য, তবুও তারা উঠতে পেরেছে। তাই তার মুখ থেকে এই উক্তি বেরিয়ে এসেছে। লেখক

কালকূট মানসচক্ষে দেখতে চান, তাদের মনের অন্তগহীনে প্রবেশ করতে চান। তার সামনেই সেই অমৃতরসের স্পর্শ।

কোন কিছু বুঝে ওঠবার আগেই চারটে স্ত্রীলোক ও ঘাড় নোয়ানো এক বুড়োকে নিয়ে একটি দল কামরাটিতে ঢুকে পড়েছে। কামরার মধ্যে নতুন দলের সঙ্গে পুরোনো দলের যুদ্ধই শুরু হয়ে গেল। মধ্যপ্রদেশের লোকটির সঙ্গে নতুন দলের বয়স্কা মহিলার সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে কামরাটি মুখরিত হয়ে উঠল। একটু সরতে বলাতে সেই ঘাড়মর্দিনী ঘাড় বাঁকিয়ে লেখককে বলল "আরে ভাই, সবকোইকো তখ্‌লিফ, কিসীকো তো একলী নহি। এ দেখো, আদমি লোগ ঝগড়া কর রহে।" *(পৃ: ৪৪, ঐ)* কালকূট অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝে গেলেন মূল উদ্দেশ্য একটাই, সকলকেই পৌঁছতে হবে 'অমৃতকুম্ভে'।

নতুন দলের ঝড়ে নুলো বলরাম চাপা পড়ে গেছে। তাকে টেনে তুলে কালকূট আগলাতে লাগলেন। তাঁর চোখে পড়ল ওই চারজন স্ত্রীলোক বুড়োকে পরমধনের মতো আগলে রেখেছে। দুটো মানুষকে আগলানোর বৈপরীত্য উঠে এসেছে। একদিকে নুলো বলরাম আর একদিকে অশীতিপর বৃদ্ধ। দুটো ঘটনাই অনবদ্যভাবে পাঠককে নাড়া দিয়েছে। লেখকের মনে জিজ্ঞাসা ওই বৃদ্ধের সঙ্গে এতগুলো স্ত্রীলোক কেন? মালের চাপে বলরাম চাপা পড়ে গিয়েছিল। তার কপালে জমা রক্ত ফুটে বের হচ্ছিল, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। বলরামকে টেনে বের করতে গিয়ে শ্যামাদের মাল ছুঁড়ে ফেলে দিতে ওরা আবার তেড়ে এসেছিল লেখকের ওপর। "আরে, আরে, আদমি আন্ধা না কি? দিলে সব মাল চৌপাট করে।" *(পৃ: ৪৪, ঐ)* লেখক বললেন "আন্ধা তো মনে হচ্ছে তোমরাই। তোমরা যে একটা জান চৌপাট করে দিচ্ছিলে।" *(পৃ: ৪৪, ঐ)* বলরাম চোট পেয়েও হাসছিল দেখে কালকূট অত্যন্ত রেগে গিয়েছিলেন। কিন্তু বলরাম নির্বিকার। বলরামকে দেখে প্রৌঢ়াসহ শ্যামাদের দল হেসে উঠেছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই হাসি থামিয়ে প্রৌঢ়া করুণ মুখে শ্যামাকে দু'চার পয়সা দিয়ে দিতে বলেছিল। আর শ্যামাও ট্যাক থেকে এক আনা বের করে ছুঁড়ে দিয়েছিল বলরামের কোলে। প্রৌঢ়া লেখককে বলেছিল, "আরে ভাই, দেখা নহি উনকো। গোসা না করো।" *(পৃ: ৪৪, ঐ)*

এইভাবেই হয়েছিল প্রথম দেখা ও শ্যামাদের ঝড়ের বাতাস লেগেছিল কামরার প্রত্যেকের মধ্যে। লেখকের মনে হয়েছে "তারা শুধু খ্যাপা হাওয়ার মত আসেনি। খ্যাপা তারা নিজেরাও। তাদের হাসি কথা কাজ দেখে তাই মনে হয়। যেন খাঁচার পাখি খাঁচা ছাড়া হয়েছে। মাতিয়ে তুলেছে বনপালা।" *(পৃ: ৪৪, ঐ)* তাদের খুশির জোয়ারে বলরামের হৃদয় ভেসে গেছে। সে খুশিতে বলে চলেছে, "এতক্ষণ এই কামরাটাতে বইসে মনে হচ্ছিল না যে পেরাগে যাচ্ছি। এইবার দেখেন তো, কেমন কলর-বলর গমগম কইরছে।" *(পৃ: ৪৪, ঐ)* লেখক তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে রেলের কামরায়

অতিসাধারণ এক নুলোর চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। সময় ও পরিবেশ অনুযায়ী লেখক কালকূট বলরামের মুখের ভাষা যুগিয়েছেন। তার স্বভাব, কথা বলার ধরণ, কথা তো নয়, যেন কথার ফুলবাগান, সেইসঙ্গে সুরেলা গলায় গান। ব্যথা পেলেও ব্যথাকে হাসিমুখে মেনে নেওয়ার মানসিকতা সবই পাঠকের কাছে সূক্ষ্মভাবে ধরা পড়েছে। কাঁচা কুয়োয় উপরের জল যেমন চুঁইয়ে পড়ে তেমনি বলরামের সহজ মনের রস পাঠকের মনেও চুঁইয়ে পড়ে। লেখক কালকূট পাঠকের অন্তরও সেই রসে রসসিক্ত করেছেন। বলরামের আনন্দের সুর পাঠকের মনেও ধ্বনিত হতে থাকে "একলা সুখ, একলা দুখ, এ কি হয়। তবে মরণ ঘনাইলে অত কান্না কিসের, অ্যাঁ। ছেইড়ে যাবার ভয়েই তো। আসুক, আরো আসুক। কী বলেন বাবু, যে কয় একলা চলি, সে তো চলে দোকলার জন্যে। নইলে চইলতে যাবে কেন, অ্যাঁ।" *(পৃ: ৪৪, ঐ)*

শ্যামাদের মালের চাপে তার কপাল ফুলে গিয়েছিল। তার ব্যথা লেগেছে কিনা এ'কথা জানতে চাওয়ায় লেখককে সে বলেছে "চোট আমার লাগেনি বাবু? কিন্তু কাঁদব কার কাছে বলেন কাঁদলে লাভ? ওনারা কইবেন, দেখি নাই বাপু। মিটে গেল।" *(পৃ: ৪৪, ঐ)* বলরামের কথায় ফুল ফুটে উঠেছে, লেখক উত্তর দিতে পারেন নি। তার হৃদয় কথার স্রোতে ভেসে গেল। সামান্য একটি নুলোর কাছেও লেখকের বিদ্যাবুদ্ধির হার মেনে যায়। পাঠকের মনেও অনুরণিত হয়। "চইলতে চোট লাগে না বাবু? আপনার লাগে না?" *(পৃ: ৪৪, ঐ)* সামান্য একটি কথা কী অসাধারণভাবে লেখক চিত্রিত করেছেন। বলরামের কথার সঙ্গে পাঠককুলও সহমত হয়ে যায়। লেখক কালকূট এইরকম ছোট ছোট কথার জাল বুনে কাহিনীকে একটি সুতোয় গেঁথেছেন। বলরামের মুখ দিয়ে লেখক কথার ফুলঝুরি ফুটিয়েছেন। "সংসারে কত ব্যথা, কত চোট। সেখানে পেটে চোট, মনে চোট। পেটে খেতে নাই, বুক-জোড়া মানুষটি নাই, হাজার চোট খেয়েও থেমে আছে কেউ বলেন?" *(পৃ: ৪৫, ঐ)* বলরামের কথায় লেখকের মনের দুকূল ভেসে ভরে উঠেছে। বলরামের কথাই তো লেখকের অন্তর্দৃষ্টি। তিনি তার অসহায়তাকে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন "অ্যালবাদ ইস্টিসনে এট্টুস হাত দুইখান ধরবেন, কোনরকমে একবার টেনে হিঁচড়ে ফেলতে পারলেই হইবে। আপনি একলা মানুষ, তাই কইলাম।" *(পৃ: ৪৫, ঐ)* একজন বিকলাঙ্গের অসহায় করুণ রূপটি অন্তরে উপলব্ধি করেছেন।

বলরাম জন্ম বিকলাঙ্গ, পা দুটো হাঁটুর কাছ থেকে বেঁকে পাছার কাছে গিয়ে ঠেকেছে। এই দুটোর জন্যই তার মা তাকে জন্ম দিয়ে নিজেকে সামলাতে পারেনি নিজে মরে গিয়েছিল সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে। সকলে তাকে 'মা-খেগো' বলে। জন্ম নুলো সে বুকে হেঁটে চলে বেড়ায়, উদাত্ত মিষ্টি সুরে গান গেয়ে সকলকে মজিয়ে দেয়। নুলো পায়ের জন্য সে ঘরে বসে থাকতে রাজি নয়। "সবুর-মেওয়া রইলো মাথায়

চইলব এবার যথায় তথায়,

রোদবিষ্টি আশীর্বাদী

আমার মাথায় ঢেলো।।" *(পৃ: ৪২, ঐ)*

আতাউলের পদটিতে ঘরছাড়া বাউলের সুর ধ্বনিত হয়। সে বলে "বাবু, বৈরাগ্য এইলে বেরাগী হয়। আসলে আমরা সব্বাই বাউল। সব গানেতেই আপনি ওইটি পাবেন। আবাগী রাই-কিশোরী যে প্রেমে পাগল হইয়ে পথে পা দিছিল, সেও তো একই ব্যাপার।" *(পৃ: ৪৩, ঐ)* লেখকের স্বভাব বৈরাগ্য বলরামের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে। তিনিও রবিঠাকুরের গানের লাইন বলে ফেলেন বলরামের সঙ্গে সুর মেলাতে

"কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে,

আমি চলব বাহিরে।

শুকনো ফুলের পাতাগুলো পড়তেছে খসে

আর সময় নাহিরে।" *(পৃ: ৪৩, ঐ)*

বলরাম পদকর্তা রবীন্দ্রনাথের নাম শোনে নি। কিন্তু বাউল যে উনি সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ নেই। লেখক কালকূট বলরামের কথা সৃষ্টি করেছেন, আবার উনিই উত্তর দিয়েছেন "আবার এও ভাবি, বলরামের ভুলই বা কোথায়, যে ভুল ভাঙব, মন যার বাউল হয়নি, তিনি বাউল গান গাইলেন কেমন করে।" *(পৃ: ৪৩, ঐ)* বিকলাঙ্গ বলরাম মনের দিকে স্বাবলম্বী, বুকে হেঁটে চলতেও পারে কিন্তু ভিড় গাড়ীতে উঠতে নামতে তার একটু অবলম্বন, একটু সাহায্যের দরকার হয়। এখানে সে অসহায়। লেখক সেই অসহায়তা তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তুলে এনে পাঠক সমাজে বিশেষ বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, অসহায়কে অবজ্ঞা নয়, ভালবাসা, ঘৃণা নয় সহানুভূতি, কৃপা নয় আন্তরিকতা।

এলাহাবাদগামী যাত্রীরা কিভাবে উঠেছিল, সকলেরই লক্ষ্য পূর্ণকুম্ভে পুণ্যস্নান কিন্তু মনে ভিন্ন ভিন্ন আশা। সেই আশা পূরণের ইচ্ছাতেই সকলেই গাড়ীতে উঠেছে। ঠেলাঠেলি, মারামারি, ঝগড়াঝাটি, ঠাসাঠাসি সব তুচ্ছ সেই ইচ্ছার কাছে। এক অসহনীয় অবস্থার দৃশ্য লেখক নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন টুকরো টুকরো চিত্রের মাধ্যমে। দীর্ঘসময় একসঙ্গে থাকতে থাকতে অপরিচয়ের বেড়া ভেঙে ধীরে ধীরে মানুষগুলো নিজের অজান্তে পরস্পরের কাছাকাছি এসে গেছে। লেখক কালকূট যাত্রীদের বক্তব্যগুলির মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলোকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যেখানে প্রত্যেকের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেছে। নিজেরই সৃষ্ট চরিত্রে লেখক তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চরিত্রগুলোর বিশেষ বিশেষ মুহূর্তগুলো আলোকিত করেছেন। চরিত্রগুলো আমাদের প্রতিদিনকার দেখা কাছের লোক। কিন্তু নিত্যকার দেখার সঙ্গে লেখকের দেখাটা অন্যরকমের। তিনি ডুব

দিয়েছেন মানবমনের গহীনে, সেখান থেকেই তিনি তুলে এনেছেন সূক্ষ্ম মানবিকবোধসম্পন্ন নরনারী। তাদের দিয়েই তিনি অন্য ধরনের কাহিনী সৃষ্টি করেছেন, যা সেই সময়ে বাঙালী পাঠককুলের হৃদয় জয় করে নিয়েছিল। ''এসে পড়েছে। একটিমাত্র কথার অপেক্ষা। সত্যিই এল কি-না, সন্ধানের প্রয়োজন নেই। শোনামাত্র সংক্ষিপ্ত স্থানে পাক-খাওয়া ঘূর্ণি জলের আবর্ত মুহূর্তে পথ পাওয়ার জন্য ফুলে ফুলে উঠল। অকস্মাৎ এই স্ফীতিতে একটা তীব্র আর্তনাদ উঠল সারা কামরাটার মধ্যে। 'মরে গেলুম, বাবারে। মেরে ফেললে, মেরে ফেললে।' কারুর হাত ভাঙল, পা ভাঙল, গুঁতো খেয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়ল মুখ দিয়ে। এরই মধ্যে বাঁদরের মত কুলিদের লম্ফ-ঝম্ফ।'' *(পৃ: ৪৫, ঐ)* অল্পকথায় অতিবাস্তব একটি চিত্র কালকূট তুলে ধরেছেন।

লেখক বলরামকে দু'হাতে তুলে ধরে একটা অন্ধ ক্ষিপ্ত মোষের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে নামতে গিয়ে দেখলেন যে তাঁর কনুই শ্যামার গলায় চেপে বসেছে, শ্যামা চিৎকার করছে। কিন্তু সেই আবার লেখকেরই কনুই দু'হাতে চেপে ধরে লেখকের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, বলরাম ঘাড়ের ওপর থেকে খসে পড়েছে, কিন্তু তার ব্যথা লাগেনি। শ্যামার চোখের জলসহ অনুরোধে ওর দলের সবাইকে নামিয়ে নিয়ে এলেন। ওর দলের বৃদ্ধ লোকটি তাকে নামিয়ে দেওয়ার জন্য দু'হাতে লেখককে জড়িয়ে ধরেছিল ভিড় থেকে নিরাপদে নামিয়ে দেওয়ার জন্য। এইভাবেই অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরতে ভরতে কুম্ভমেলার দিকে এগিয়ে গেছেন। পথের দেখা ও মেলার দেখা লোকজনের সঙ্গে কখনও একবারই দেখা হয়েছে আবার কখনও বারে বারে দেখা হয়েছে।

এলাহাবাদ স্টেশনে এসে দেখা হয়েছে লক্ষ্মীদাসী, পেল্লাদ, তার দিমা ও বালিকা বধূ ব্রজবালা, পাঁচ বদ্যি। এদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। বলরাম, লক্ষ্মীদাসী, শ্যামা ও তার পরিবার নিয়ে একটি বৃত্ত তৈরি হয়েছে আর একটি বৃত্ত তৈরি হয়েছে পেল্লাদ, ব্রজবালা, দিমা, পাঁচ বদ্যি, হারুর মা এদের নিয়ে। এদের বাইরেও আশ্রমের সন্ন্যাসী, কোতয়াল সন্ন্যাসী, রমণীমোহন, সুরদাস, ভূতানন্দ ভৈরবী, অবধূত ও তার পরিবার। মেলায় আসা লক্ষ লক্ষ লোকের আরশিতে লেখক নিজেকে চিনতে চিনতে লেখক তার বিষবাহী প্রাণের জ্বালা জুড়াবার জন্য অমৃতরসের সন্ধান করেছেন। তার হৃদিকুম্ভ অমৃতরসে পূর্ণ করার চেষ্টা করেছেন, তিনি অমৃতরস সন্ধানী। সারা মেলা জুড়ে লক্ষ লক্ষ রূপের মাঝে তিনি অমৃতসন্ধান করেছেন।

কুম্ভমেলায় আসার সময় রেলের কামরা থেকে এলাহাবাদ স্টেশনে আসা পর্যন্ত ও মেলায় দেখা মানুষগুলোকে নিয়ে টুকরো টুকরো চিত্রগুলো কালকূটের সৃষ্টিকে কতখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে সেটাই পরবর্তীকালে পর্যবেক্ষণ করা যাবে। যেহেতু ভ্রমণের আঙ্গিকে বিশেষত কুম্ভমেলার পটভূমিতে এই কাহিনী রচিত হয়েছে তাই প্রচলিত উপন্যাসের মত লেখক সৃষ্ট বিশেষ চরিত্র মুখ্য হয়ে ওঠে নি। মেলার পটভূমিতে বহু মানুষের উপস্থিতি এই কাহিনীতে ভিড় করেছে।

এই চরিত্রগুলো লেখকের দৃষ্টিতে অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে এবং এদের দিয়েই অন্য এক ধরনের রচনাশৈলী নিয়ে। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। এই কাহিনীতে যে সকল মানুষের সঙ্গে লেখকের পরিচয় তাদের মধ্যে বলরাম, লক্ষ্মীদাসী ও শ্যামা অন্যতম। কিন্তু এদের কথা বলার আগে দিদিমা প্রহ্লাদ (পেল্লাদ), ব্রজবালা, পাঁচবদ্যি ও হিদের মার কথা একটু বলা যাক।

কাহিনীর গতি ট্রেন থেকে নেমে এলাহাবাদ স্টেশনে মোড় নিয়েছে। স্টেশনের বাইরে আসার আগেই ইন্‌জেকশন নিতে হবে সকল যাত্রীদের, কালকূট দেখেছেন বিশাল বিশাল চেহারার পুরুষরা ইনজেকশনের ভয়ে কাঁদছে। চেঁচামেচি, ঝগড়া, কান্নাকাটির মধ্যে পরিচয় হয়েছিল দিদিমা, পেল্লাদ, পাঁচবদ্যি ও এদের বালিকা বধূ ইত্যাদি দলটির সঙ্গে। সেখানে দুঃখজনক অথচ মজার নাটক। তার মধ্যে পেল্লাদ তার দিদিমাকে বলছে "আমি শালা এখুনি ইন্‌জেকশন নেব, যা খুশি তাই কর।" *(পৃ: ৪৭, ঐ)* তাই শুনে দিদিমা ক্ষেপে গিয়ে বলছে "মাথা কুটে মরব পেল্লাদ, তোর দিমার তালে আজ এখানেই মিত্যু আছে। খবরদার।" *(পৃ: ৪৭, ঐ)* পেল্লাদ আস্ফালন করে বলছে 'হোক মরণ তবু নেব।' *(পৃ: ৪৭, ঐ)* মজার কাণ্ডটি দেখে কালকূট বলছেন "বলে, কিন্তু এগোয় না। আর আমিই কি জানতাম যে এলাহাবাদ স্টেশন-প্রাঙ্গনে এমনি একটি নেহাত বাঙলা নাটক দেখব!" *(পৃ: ৪৭, ঐ)* এই নাটক চলছে দিদিমা ও ত্রিশ-বত্রিশ বছরের নাতির সঙ্গে।

শুধু বাঙলা নাটকই নয়। অনেক নাটকই ইন্‌জেকশন নিয়ে ঘটতে দেখছেন কালকূট। তার মধ্যে শ্যামাদের দল ও ইন্‌জেকশন নিতে ভয় পেয়েছে। এক মস্ত জোয়ান মরদ পাগড়ি দিয়ে চোখের জল মুছছে। ইন্‌জেকশন ভীতিকে কালকূট 'করালরূপ' বলে কৌতুকসহ বিবৃত করেছেন। কালকূট ইন্‌জেকশন নিয়ে নেওয়াতে বুড়ি দিমার রাগের প্রকাশ ঘটেছে "এমনি করে তোমরা প্যাঁক প্যাঁক করে নিলে মড়ারা কি আর আমাদের ছাড়বে? একটু বলে কয়ে ব্যবস্থা তো করতে হয়।" *(পৃ: ৪৭, ঐ)*

রেলের কামরা থেকে স্টেশন চত্বর পর্যন্ত অনেক দৃশ্যের অবতারণা করেছেন তার দু'একটি উল্লেখ করা হল এইজন্য, লক্ষ রূপের মেলায় লক্ষজনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছেন রূপ নেহারির জন্য। তবুও এই কয়টি দলের কথা বিশেষভাবে বলা হল এইজন্য শ্যামাদের দলের বিশেষত শ্যামাকে চিনিয়েছে, লক্ষ্মীদাসীর দলের মূল গায়েন বলরাম আর দিদিমা, পেল্লাদ, বালিকা বধূ ব্রজবালা ও পাঁচবদ্যিকে কালকূট নিজেই চিনে নিয়েছেন সেকথা কাহিনীর বর্ণনার সময়ে একটু উল্লেখ করা হয়েছে। মেলায় বহু রূপের সঙ্গে কালকূট নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কারও কারও সঙ্গে আবার ফিরে তেমন করে দেখা হয়নি। তাঁদের কাছ থেকে অমৃতের রসটুকু আহরণ করেছেন ওই একবারই, ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু শ্যামা-বলরাম-লক্ষ্মীদাসী-দিমা- পেল্লাদ, ব্রজবালা, পাঁচবদ্যি, হিদের মা — এরা বারে বারে ফিরে ফিরে এসে কাহিনীর গতিতে গতিময়তা দিয়েছে।

মনে হয়েছে চরিত্রগুলি কাহিনীর প্রয়োজনেই বাস্তববোধ থেকে উঠে এসেছে।

মেলায় আশ্রয়ের কোনো ব্যবস্থা করে না আসায় কালকূট যখন আশ্রয়ের সন্ধানে মেলা চত্বরে হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন আবার দেখা হয়ে যায় দিদিমার দলের সঙ্গে। দিদিমার দৌলতে তাদেরই তাবুতে কালকূটের জায়গা হয়ে যায়, খাদ্যের ব্যবস্থাও হয়ে যায়। একলা বলে আশ্রমেও ঠাঁই হয়নি। দিদিমা পাঁচবদ্যিকে বলে দিয়েছিল যে, "এখন ও আমাদের তাঁবুতে আমাদের সঙ্গেই থাকবে। এতে যদি না হয়, তবে বলে দে আমরাও পথ দেখি।" *(পৃ: ৫৫, ঐ)* দিদিমার স্নেহরসে কালকূট আপ্লুত। পাঁচবদ্যির আশ্রয় বেদখল হয়ে যাচ্ছে কালকূটকে দিদিমা থাকতে দেওয়ায়। কালকূট পাঁচবদ্যির 'চোখের বিষ' হয়ে উঠেছিল। সেই বিষ দিদিমা বুকে করে নিয়েছে স্নেহভরে। কালকূট দিদিমা সম্পর্কে বলেছেন, "সেই কথা, রূপে তাকে চিনব না। ডুব দেব তার হৃদিসায়রে। রূপের পরে যে রূপ থাকে লুকিয়ে। মনের অন্ধকারে। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত দেহ। তবু চোখ ভরে জল এসে পড়ল। উঠতে চাইলাম! আড়ষ্ট হয়ে রইল হাত-পা। বোধহয় এই-ই দেখতে এসেছি। যা দেখতে এসেছি, তাই তো দেখছি নিজের অপমানের মধ্যে, নিজের অসহায়তার মধ্যে, আমার চোখের জলে।" *(পৃ: ৫৫, ঐ)*

বারে বারে দিদিমা ফিরে এসেছে কালকূটের লেখনীতে, কখনো মূর্তিমতী করুণা, কখনো খর খর স্বরে কঠিনা, কখনো কৃষ্ণের শতনামের সঙ্গে মাতৃরূপা। কৃষ্ণের শতনামের সুর শুনতে শুনতে লেখক-কথক কালকূট তার শৈশবে ফিরে গেছেন— মায়ের মুখে ঘুমের ঘোরে শুনতে থাকা শতনাম। লক্ষরূপের হাটে দিদিমাই এসেছে বহুরূপে। তার সঙ্গে এসেছে বালিকা বধূ ব্রজবালা। কালকূটের সঙ্গে মিষ্টি একটি সখ্যতা হয়েছে। আশ্রমের ও মেলার অনেক খবর সে চুপিচুপি কালকূটকে জানাত। হিদের মা, সর্ব্বনাশী পকেটমার মেয়ের কাছ থেকে সাবধানে থাকতে বলেছে। স্বামী খুঁজতে আসা সুন্দর বৌ-এর কথা বলে তাকে একদিন দেখিয়ে দেয়। দেওরের সঙ্গে বৌটিকে বেশ মানিয়েছে এটি জানাতে ভোলে না। ব্রজবালার কথায় লেখকেরও মন সায় দেয় "সত্যি দেখায়। ঠিক কথাটি দেখছি বয়স মানে না! কেন বলল ব্রজ, কে জানে। মনে মনে ভাবলাম, দেখায় হয়তো, মানায় কিনা কে জানে। মানানো যে আলাদা।" *(পৃ: ৯০, ঐ)* লেখকের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বালিকা বধূর জীবনবোধের কথা উঠে এসেছে। ব্রজর কথায় সায় দিয়েও সমাজজীবনের বন্ধনে মানানো আলাদা বলে নিজেই খণ্ডন করেছেন।

ব্রজবালার বালিকা মনেও পেল্লাদের জন্য ভালবাসার ফুল ফুটেছে সেটা কালকূট ছোট ছোট কথার মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে বালিকা বধূকে তুলে ধরেছেন তার কাহিনীতে। ব্রজবালা কালকূটকে জানিয়েছিল পেল্লাদের জন্যই ব্রজবালারা তিপুন্নিতে অর্থাৎ ত্রিবেণীতে এসেছে; কারণ পেল্লাদ ব্যামোয় ভোগে, নেশা-ভাঙ করে। পুরুষ মানুষের মতিগতি ভাল নয় বলে তার দিদিমা তাড়াতাড়ি

বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। যদি পেল্লাদ বিগড়ে যায় তাহলে ব্রজবালা কি করবে? কালকূটের এরকম কথার উত্তরে কালকূট ব্রজর ডাগর চোখে ধকধকে আগুন দেখেছিলেন। ব্রজ বলল, 'করুক না একবার, দেখি।' ''ব্রজর মূর্তি কী! ভয় ধরে গেল আমারই। ওইটুকু মেয়ের এত আত্মসম্মানবোধ! অনাচারে এত ঘৃণা! স্বাধিকার-জ্ঞান এতখানি?''*(পৃ: ৭৩, ঐ)* লেখক খেলাচ্ছলে আবার বলেছিলেন যে তবু যদি করে? লেখক দেখেছিলেন এর প্রতিক্রিয়া। ব্রজর ''গলার শিরা থেকে ঠোঁট কেঁপে উঠল থরথর করে। আচমকা যেন ফণা মেলল ফণিনী।''*(পৃ: ৭৩, ঐ)* অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলে উঠেছিল ''যেখানে মন চায়, চোখ যায়, চলে যাব সেখানে ঠিক, হ্যাঁ।''*(পৃ: ৭৩, ঐ)* ব্রজকে কাঁদতে দেখে লেখক লজ্জিত ও ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর অন্তর্গহীনে ডুব দিয়ে প্রেমবীণার সুর শুনেছেন। তাই তিনি একথাই বলেছেন যে, ''বালিকা ভেবে তার ছোট্ট হৃদয়টুকুর সঙ্গে পেতেছিলাম খেলাপাতি। কিন্তু, সে খেলা যে বালিকার এতখানি বাজবে, তা কে জানত।'' *(পৃ: ৭৩, ঐ)* ব্রজবালার দেহলতায় ফোটেনি ফুল, কিন্তু তার হৃদিসায়রে ফুটে উঠেছে ভালবাসার পদ্ম। লেখক বালিকাবধূ ব্রজবালার কোমল বালিকা সুলভ মনটি তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গে বালিকা বধূর হৃদয়ে ভালবাসার পদ্মটির সৌরভও ছড়িয়ে দিয়েছেন। লেখকের সঙ্গে ব্রজবালার একটু বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাকে 'বৌঠান' বলাতে সে খুশি হয়েছিল। সে চুপি চুপি গায়ে মাখার জন্য তেল এনে দিয়েছিল। হিদের মাকে পয়সা দেওয়ার জন্য ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়েছিল।

এমনি অম্লমধুর করে ব্রজবালাকে চিত্রিত করেছেন লেখক। মেলার ভয়াবহ মৃত্যু মিছিলের পর সন্ধ্যার তাবুতে ফিরে আসার পরে দেখেছিলেন সবাই পালানোর জন্য গোছগাছে ব্যস্ত। ব্রজরাও চলে যাবে। চলে যাওয়ার সময় শুধু ব্রজই ডেকেছিল 'যাবে না?' বলে। লেখকও ওদের সঙ্গে চলে যাচ্ছিলেন কিন্তু যেতে পারেন নি বলরাম-লক্ষ্মীদাসী, শ্যামাদের জন্য। ওদের খুঁজে পান নি, ওদের খোঁজেই আবার ছুটে গিয়েছিলেন প্যারেড গ্রাউন্ডে। একটি তেরো চৌদ্দ বছরের বালিকা বধূ ব্রজবালা। লেখকের দৃষ্টিতে সে বালিকাও নয় যুবতীও নয়, বৃদ্ধও নয়। ব্রজবেশিনী এক মঙ্গ লচারিণী নারী। মানুষ খোঁজার ছলে তিনি মন খুঁজেছেন। রূপসায়রে ডুব দিয়ে তার হৃদিকুম্ভে তলিয়ে গেছেন। বালিকা বধূ স্বামীর মঙ্গলের জন্য, ব্যাধিমুক্তির জন্য পূর্ণিমায় তিপুন্নি অর্থাৎ ত্রিবেণীতে ডুব দিতে এসেছে।

ওই তীব্র শীতের মধ্যেও সঙ্গমে সে ডুব দিয়েছে। তীর্থক্ষেত্রে তেল-সাবান মাখতে নেই জেনেও দিদিমার চোখ এড়িয়ে তেলের শিশি এনে দিয়েছে। মেয়ে চোরের কাছ থেকে সাবধানে থাকতে বলা, কিপটে বুড়িকে পয়সা না দিতে বলা, এইরকম ছোট খবর দেওয়া, সব্বনাশী মেয়ে চোর ও হিদের মাকে পয়সা দেওয়াতে ক্রুদ্ধ চোখে চাওয়া, আবার সারাদিন না খেয়ে থাকা লেখকের জন্য চিন্তা, স্বামী পেল্লাদ গাঁজাসক্ত তবুও তার জন্য মঙ্গলকামনা টুকরো ঘটনা দিয়ে

লেখক ব্রজবালাকে সৃষ্টি করেছেন। সেই সঙ্গে তুলে এনেছেন তার মানসিক দিকগুলো। লেখকের সঙ্গে তার সখ্যতা হয়েছিল। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে পাঠককুলের সামনে বিচিত্র রূপ নিয়ে ব্রজবালা এসেছে। 'সুখে, দুঃখে, কামনা ও বাসনায় অতি সাধারণ ও অসাধারণ মানুষী।' *(পৃ: ৭৪, ঐ)* এই কাহিনীতে ব্রজবালা এই পার্থিব জগতের একটি অতিপরিচিত চরিত্র হয়ে উঠেছে।

ব্রজবালার স্বামী পেল্লাদ, দিদিমার আদরের নাতি। এলাহাবাদ স্টেশন থেকে দিদিমা-নাতিতে ইন্‌জেকশন নেওয়া নিয়ে ঝগড়া ঝগড়া নাটক। বছর ত্রিশ-বত্রিশের এক যুবক। ইনজেকশন কখনও নেয়নি বলে নিতে ভয় পাচ্ছে। লেখক এক কৌতুকের মধ্য দিয়ে প্রহ্লাদ ও দিদিমাকে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। বিচিত্র তাদের ঝগড়ার বিষয়, বিচিত্র দিব্যি। একটি প্রাণবন্ত চরিত্র। লেখকের কাছে তার অকপট স্বীকারোক্তি 'মানে কথা, কখনো নিই নি কি-না, তাই বড় ঘাবড়ে যাচ্ছি। দেখুন না, আমার পরিবারটি তো একেবারে মরিয়া হয়ে গেছে দাদা। আর দিদিমার কথা তো শুনলেনই।' *(পৃ: ৪৭, ঐ)* প্রহ্লাদদের সঙ্গে প্রথম দেখার সময়েই কিছু নাটকীয় কথাবার্তা তুলে কাহিনীর গতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যার কৌতুকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়েছেন পাঠককুল। দ্বিতীয় দেখা মেলার মধ্যে, কালকূট প্রহ্লাদদের দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ওই দিদিমা ও নাতির কথা কাটাকাটির মধ্য দিয়ে। দিদিমা ছ'টা টাকা দেয়নি বলে মিউনিসিপালের হেলথ অফিসারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট আনতে পারে নি। দিদিমা বুড়ির কিপ্‌টেমির জন্য ইন্‌জেকশন নিতে হয়েছে!

'আর জ্বালাস নি আমাকে পেল্লাদ। এবার আমি গঙ্গায় ডুবে জানটা দেব।' জবাবে পেল্লাদের ক্রুদ্ধ ছেঁড়ে গলা শোনা গেল, 'যা খুশি তাই করগে যা। 'আমি আমার পরিবারকে নিয়ে কাল চলে না যাই তো' 'খবরদার পেল্লাদ, দেবতার থানে দিব্যি কাটিস নে।'

'কাটব, হাজার বার দিব্যি কাটব। দেখি আমাকে কে কী করতে পারে।'

'কাট, কাট তাহলে। দ্যাখ, আমিও গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে পারি কি-না!' *(পৃ: ৫৩, ঐ)*

লেখক কৌতুক করে বলেছেন যে সেই নাটক এখনো শেষ হয়নি। শুধু বর্হিদৃশ্যের পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। এই ঝগড়া-নাটকের মধ্য দিয়ে দিদিমা-নাতির অম্লমধুর সম্পর্কটি লেখকের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। দিদিমাকে মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্য প্রহ্লাদ জানায় ব্যথায় নির্ঘাত তার জ্বর আসবে। দিদিমা শঙ্কিত হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানায়। প্রহ্লাদদের তাবুতে লেখকের থাকার ব্যবস্থায় দিদিমার সঙ্গে ওরও সায় ছিল। লেখককে আহ্বান জানায় 'চলে আসুন না মোশাই, ডাক্তারমামা ওরকম বলেই থাকে। মাথা খারাপ কি না।' *(পৃ: ৫৫, ঐ)* প্রহ্লাদ গঞ্জিকাসেবী। দু'হাত এক করতে অর্থাৎ গাঁজা টানতে না পারলে পেল্লাদ নিজেকে নিরম্বু উপোসী বলে মনে করে। সেই গাজা প্রেমী পেল্লাদ বিশ্রাম নিতে নিতে দিদিমাকে গদ্‌গদ্ স্বরে বলে 'জানলি দিমা, ছেলেটা

একেবারে ভদ্দরলোক।' *(পৃ: ৫৬, ঐ)* মেলায় আসা হঠাৎ দেখা অচেনা লেখককে তাদের পরিবারের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা হওয়ায় সে মনে মনে তৃপ্তি বোধ করে। তার ভাললাগার রেশ লেখকের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

অশিক্ষিত, গ্রাম্য, সরল, বাউন্ডুলে, গাঁজা সেবী প্রহ্লাদের মনের অন্ধকারে যে রূপ লুকিয়েছিল সেই রূপ লেখক তার হৃদিসায়রে ডুব দিয়ে তুলে এনেছেন। দিদিমার দৌলতে তাদেরই তাবুতে লেখকের জায়গা হয়ে যায় পরিবারের একজন হিসাবে। শুধু তাই নয়, লেখকের "আমার ঝোলা উজাড় করে বিচুলির উপর পাতা হয়েছে কম্বল। ঝোলা শিয়রে রেখে হয়েছে বালিশ। গায়ের কম্বলটিও ভাঁজ করা হয়েছে পায়ের দিকে। এবার শুয়ে পড়ার ওয়াস্তা।" *(পৃ: ৫৬, ঐ)* লেখক কালকূট বলেছেন ক্যাটকেটে দিদিমা টাকি মুরগীর মত বহুরূপিণী, ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলানো। তাঁর স্নেহের পরশ আরও ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। লেখক সাবান গামছা নিয়ে দেহটি আবর্জনা মুক্ত করতে বার হতেই বুড়ি দিদিমার চেরা বাঁশের গলায় ঝাঁঝানো সুর, মেলেচ্ছ কাণ্ড এটি, তীর্থক্ষেত্রে তেল সাবান মাখা যায় না। গায়ে হাতে পায়ে জল লাগিয়ে ফিরে আসতেই দিদিমার অন্য সুর। 'বলি ও ভাল মানুষের ছেলে, সাবাং তো মাখতে যাচ্ছিলে তোমার আবার এত ছুচিবাই কিসের বাপু?' বললাম 'কিসের ছুচিবাই?' 'এই যে গায়ে জল ঢেলে এলে। বারো জাতের ছোঁয়া নিয়ে আমরাও এসেছি, কিন্তু এই শীতে কি আমরা জল ঢালতে গেছি।' *(পৃ: ৫৭, ঐ)*

দিদিমার ক্ষণেই রূপ বদল। লেখকের পরিষ্কার হওয়ার জন্য গায়ে জল ঢালা, আর দিদিমা ভাবছেন ছুঁচিবাই। কিন্তু সেই কথার মধ্যেও একটি গভীর সত্য বেরিয়ে এসেছে এই শীতে কেন তারা স্নান করেনি। আর লেখককেও সাবধানবাণী 'দেখো বাপু, শেষে নিমুনি বাঁধিয়ে বোসো না। ওসব ঝক্কি পোয়াতে পারবো না।' দিদিমার স্নেহসুলভ মনটি ধরা পড়েছে সকালের দেখা ছেলেটির উপর। এই স্নেহসুলভ মনটির জন্যই তো দিদিমা পাঁচুগোপালকে বলেছে 'পাঁচু ছেলেটাকে নিয়ে নে। রাত করে যাবে কোথায়?' *(পৃ: ৫৫, ঐ)* 'যেখানে খুশি সেখানে যাক, তোমার অত ভাবনা কিসের খুড়ি! এখানে ও থাকবে কোথায়?' *(পৃ: ৫৫, ঐ)* বলে সে এগিয়ে গেল। দিদিমা শণনুড়ি মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলল, 'এস, চলে এস। আমার যেন মরণ নেই, সব হয়েছে একতরো।' *(পৃ: ৫৫, ঐ)* চরিত্র অনুযায়ী কথা বিন্যাস, লেখক কালকূট দিদিমা চরিত্রটিকে একটা বিশেষ দৃষ্টিতে সৃষ্টি করেছেন। যাদের আমরা আমাদের চেনা চৌহদ্দির মধ্যে নিয়তই দেখে থাকি। কিন্তু তীর্থক্ষেত্র এই প্রয়াগে এসে দিদিমা নিজের গুণেই বিশিষ্ট হয়ে লেখকের চোখে ধরা পড়েছে। থাকা-শোওয়ার ব্যবস্থা হওয়ার পরে খাওয়ার আয়োজনটিও বাদ পড়েনি। চিঁড়ে মুড়কি বার করে তাঁকেও দুটো চিবিয়ে শুয়ে পড়তে বলল। লেখকের খাওয়ার থেকে শোওয়ার জন্যই প্রয়োজনটাই বেশি ছিল। কিন্তু তিনি সাধ্যমত চিঁড়ে মুড়কি চিবিয়ে শুতে গেলেন। আশেপাশের তাবুগুলোর গুঞ্জন, মেলার

কোলাহল সবই কানে ভেসে আসতে লাগল আধো আধো ঘুমে। একটা স্বপ্ন স্বপ্নভাবে তাঁর মনে হতে লাগল তিনি যেন এসব থেকে অনেক দূরে আছেন। এমন সময়ে দিদিমার তন্দ্রাচ্ছন্ন গলায় কৃষ্ণের শতনাম ভেসে এসেছিল। যে সুর তার সর্বাঙ্গে এক বিচিত্র শিহরণ জাগিয়ে তুলেছিল। এই সুর তার শিশু রক্তের শিরায় শিরায় ঘুমের মায়া হয়ে জড়িয়ে থাকত। মায়ের গানের সুরে ঘুম আসত আবার এই সুরেই ঘুম ভেঙে যেত। প্রয়াগের এই কুম্ভমেলার তাবুর মধ্যে দিদিমার কৃষ্ণের শতনামের সুরের সঙ্গে তার মা আর দিদিমা একাকার হয়ে গেছে।

লেখক দিদিমার হাতের মিষ্টি রান্না খেয়ে মুগ্ধ। কুম্ভমেলার বালুচরে বাঁধাকপির পাতার সঙ্গে বড়ি দিয়ে নিরামিষ চচ্চড়ি স্বাদ অপূর্ব। রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল পাঁচুগোপালের চাপা আওয়াজে "শালা, নো জায়গা নট কিচ্ছু। চলো বাহার।" *(পৃ: ৫৭, ঐ)* পাঁচুগোপাল পর্দা তুলে বেরিয়ে যাওয়ার পরে লেখকও তীব্র বরফ ছুড়ে মারার শীতের মধ্যে তাবু থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। বুড়ি দিদিমা খেতে দিতে দিতে লেখককে বকছিলেন রাতে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। লেখক দিদিমার গঞ্জনা শুনেও বারোমাস দিদিমার হাতের রান্না খেতে রাজী আছেন। দিদিমা গঞ্জনার সুর লেখককে আপ্লুত করেছে স্নেহরসে। সর্বনাশী ভিখারিণীকে লেখক কালকূট দু'আনা ভিক্ষে দিয়েছিল বলে কলের কাছে মেয়ে মহলে ঢি ঢি পড়ে গিয়েছিল, যেন কী-না অপরাধ করে ফেলেছে। ব্রজবালা দিদিমা, সন্ন্যাসী কোতোয়ালজী এরা ছুটে এসেছে। সব জেনে ব্রজবালার ক্রুদ্ধ চাউনি, দিদিমার চাউনি আর কোতয়ালজীর অ-সন্ন্যাসী মনোচিত বক্রহাসিতে বলে ওঠা, ভালো লোককেই পাকড়েছিল। কঠিনে নরমে কোমলে এক চিরন্তন নারী যিনি একাধারে স্নেহময়ী মা ও দিদিমা। আবার একই সঙ্গে সংস্কার মুক্ত ও সংস্কার পন্থী। নাতিকে ব্যামো মুক্ত করানোর জন্য নাতবৌ সহ কুম্ভমেলায় এসেছে তিপুন্নিতে নাইতে। অতি একটি জীবন্ত চরিত্র এই কাহিনীতে উঠে এসেছে।

দিদিমার সঙ্গেই জড়িয়ে আরও একটি চরিত্র, পাঁচবদ্যি অর্থাৎ পাঁচুগোপাল রাতে লেখক কালকূটের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল পাঁচবদ্যির গলার আওয়াজে। ঘুম ভেঙে যেতেই ওভারকোট গায়ে দিয়ে ওই রাতে কালকূট বিশাল মেলা চত্বরে বেরিয়ে পড়েন। তীব্র শীতে রাতের মেলা দেখতে দেখতে নদীর দিকে এগিয়ে গেছেন শিশিরসিক্ত বালুতে পা ডুবাতে ডুবাতে। দেখেছেন বিশাল বালুকাবেলায় কিছু কিছু মানুষ শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে আগুন জ্বেলে তার কাছেই শুয়ে আছে। সন্ধ্যার মত আলোর ছড়াছড়ি নেই। দু'একটা আলোতে দিগন্ত জুড়ে তাবুগুলো যেন সমুদ্রসৈকতে নিশ্চল নীরব পাখির মত দেখাচ্ছে। গঙ্গার উপর দিয়ে রেলগাড়ী ঝমঝম করে চলে যাওয়ার পরই বিশাল বালুচর একদম স্তব্ধ হয়ে গেল। সেই গাঢ় নিস্তব্ধতার মধ্যে লেখক কালকূট শুনতে পেলেন কারা যেন কাঁদছে আর বলছে 'বহুত বহুত পাপ কিয়া ভগবান! হে ঈশ্বর, আমার অর্থ নাও, আমার সোনা নাও, আমার খাওয়া নাও, আমাকে বিবস্ত্র কর, আমার সব নিয়ে আমাকে

মৃত্যু দাও। আমার এই পাপের প্রাণ আমি তোমার পায়ে দিচ্ছি। গ্রহণ করে তুমি আমাকে মুক্তি দাও।' *(পৃ: ৫৮, ঐ)*

লেখক শুধু কথাই শুনতে পেলেন কিন্তু কাউকে পেলেন না। শুধু মৃত্যু কামনার আকুতি, পাপের স্বীকারোক্তি শুনতে শুনতে তিনি যেন হাজার বছরের অতীতে ফিরে গেলেন। তাঁকে যেন বালুচরের নিশি দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে। আধো আলো-অন্ধকারে দূরের ওই অগ্নিকুণ্ড কালকূটকে এক কল্পনার জগতে নিয়ে গেছে। তিনি অতীতচারী হয়েছেন। মনে মনে তিনি যেন ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের যজ্ঞের কাঠ পোড়ার দৃশ্য দেখছেন। তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার বছরের অতীতের ছায়া মানুষরা তাঁর কাছে এসে ভীড় করেছে। তারা যেন ওভারকোট পরা রক্তমাংসের মানুষটিকে তাদের বিচরণ ক্ষেত্রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। তারা ভাবছে তাদের বিচরণ ক্ষেত্রে এ কোন্ জীব? অক্ষয়-বটের ওপর থেকে যে মানুষরা ভগবানের কাছে প্রাণ দান করেছে তারা অনেক পরিবর্তন দেখেছে। বাদশাহ আকবর অক্ষয় বট কেটে দিয়েছিলেন, তবুও সেই বটের স্মৃতিচিহ্নে মরজগতের লক্ষ লক্ষ লোক মাথা ঠুকছে, তারা বেঁচে থাকতে ভালবাসে, পাপ গোপন করার চেষ্টা করে। এইসব দেখে সেই গঙ্গার কোল থেকে উঠে আসা ছায়া মানুষরা বিদ্রূপ করছে, অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। কিন্তু লেখক তাদের সে হাসি শুনতে পাচ্ছেন না। প্রয়াগের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ইতিহাস লুকিয়ে আছে তা পাঁচশ, হাজার বছরের ছায়ারা জানে। লেখক কালকূট তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না কেমন একটা ঘোরের মধ্যে নদীর দিকে এগিয়ে গেছেন। জলের স্পর্শে তিনি কল্পজগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এসেছেন।

বাস্তবের জগতে ফিরতেই দেখেছেন এক গৃহাবধূত ও তার সঙ্গিনীকে; তাদের ছেলে ও মেয়েকেও দেখেছেন। তারা নদীর বাঁকে দুই দিকে চলে গিয়ে নগ্ন হয়ে স্নান করে গঙ্গা স্তোত্র আবৃত্তি করছে। তীব্র শীতে তাদের কম্পন ধরে গেছে তবুও তারা তাদের কল্পে অচল। গৃহাবধূতের সঙ্গে কালকূটের পরিচয় হয়েছে তাদের কল্প সম্বন্ধে। কালকূট জ্ঞানলাভ করেছেন। তাদের মত বহুজনই আছে 'মাঘব্রতে'র কল্প নিয়ে গঙ্গা চরে মকরসংক্রান্তি থেকে কল্পবাস করছেন এবং ব্রাহ্মমুহূর্তে নগ্ন হয়ে নাইছেন। প্রয়াগে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে রাতের আলো-আঁধারিতে পুণ্য অর্জন অভিলাষী মানুষদের আত্মাহূতির চিত্রকে এনেছেন অতীতচারী হয়ে। অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে মিলিয়ে দিয়েছেন নিজের উপস্থিতি দিয়ে। অক্ষয় বটের পরিবর্তে অন্য একটি বটের ডাল দেখিয়ে ধর্মভীরু মানুষের কাছ থেকে পয়সা অর্জন করছে।

কল্পবাসীরা তীব্র শীতের মধ্যে ব্রাহ্ম মুহূর্তে নগ্ন হয়ে নাইছেন। এই নগ্নতাকে লেখক দেখলেন 'নগ্নতা কী ভয়ঙ্কর অথচ কী অপরূপ!' *(পৃ: ৬০, ঐ)* ঊষার সিন্দুরকণা ছড়িয়ে পড়েছে নগ্ন শরীরে, বলছেন কোন যুগের হাত ধরে এ ছবি তিনি দেখতে পেলেন? দেখব। ''ঘুরেফিরে এ নিজেকেই

দেখা। না দেখলে চিনব কী করে? বিস্ময় আর সন্দেহ? তার নিরসন তো পরে।" *(পৃ: ৬০, ঐ)* লেখক যেন যুগান্তেরের সাক্ষী। একদিকে কল্পবাসীদের কৃচ্ছসাধন আর একদিকে সেই কোন আদিকাল থেকে আত্মাহুতি এখনও সমানতালে ঘটে চলেছে। তিনি অত্যন্ত সন্তর্পণে বালুচরের নিশির মধ্য দিয়ে আপন বক্তব্য ব্যক্ত করেছেন ছায়াময়দের অট্টহাসির মধ্য দিয়ে। এখানেই কালকূট তার নিজস্ব বোধে স্বকীয় হয়ে উঠছে না। তাঁর সেই দৃষ্টি পাঠকের দৃষ্টিতে সম্প্রসারিত।

অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরতে ভরতে কালকূট মেলার বিস্তর এলাকা ঘুরে বেড়ান। নদীর চর থেকে ফেরার পথে পাঁচবদ্যির সঙ্গে দেখা। উনি কালকূটকে সেই রাত থেকে অনুসরণ করছিলেন এবং ক্ষুধাতৃষ্ণায় ও অনিদ্রায় কাতর ছিলেন। তাঁর (লেখক) উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধও হয়েছিলেন। কিন্তু লেখক কালকূট তার ক্ষুধা-তৃষ্ণার উপশম ঘটাতেই বিশেষ মুহূর্তে নিজেকে ব্যক্ত করেছেন অভিমানী বয়স্ক শিশু ও এক স্নেহশীল পিতা হিসাবে। পাঁচবদ্যি তীর্থযাত্রীদের একটি দল এনেছিলেন, থাকার জন্য তাদের সুব্যবস্থা করেছিলেন। কনট্রাক্ট হয়েছিল দু-বেলা খেতে দেবে আর রাতে শুতে দেবে পালা করে। সেইমত মেলার পথে দিদিমা বুড়ি বলেছিল, "পাঁচু, আজ আমার কাছেই খাবি থাকবি। কিন্তু একবার ডাকলে! যখন নিজেরা খেলে? ক্যাম্পের বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলাম।" *(পৃ: ৬৬, ঐ)* কালকূটের কারণে এমনটি ঘটেছে এটা পাঁচবিদ্যর ধারণা। কালকূট রাতের এই ঘটনাটি জানতে পেরে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পাঁচবদ্যি ব্যাপারটাকে আর গুরুত্বই দিলেন না। নিজের অজান্তে মনের জ্বালার কথা উদ্‌গীরণ করতে শুরু করেছিলেন।

কালকূট ধাক্কা দিয়েছিলেন 'বহুদিনের মরচে পড়া দরজায়'। দশ বছর সাধু হয়ে সারা দেশ ঘুরেছেন। "জীবন-মরণ-ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সব জ্বালা, জ্বালা হয়ে গেছে। আমাকে রুখবে কে? কিন্তু প্রাণ জুড়োল? জ্বালা জুড়োল?" *(পৃ: ৬৬, ঐ)* জ্বালা জুড়োয় নি। প্রাণের চেয়েও প্রিয় মেয়ে শিউলি কোথায় হারিয়ে গেছে পাড়ারই একটি ছেলের সঙ্গে। শেফালির মত সুন্দর আর নরম মিষ্টি চেহারা ছিল। লেখককে তিনি তার মেয়ের ছবি দেখিয়েছিলেন একটা ময়লা, কুঞ্চিত চামড়ার মত কাগজের মধ্য থেকে। 'সুন্দর, সত্যি সুন্দর! টানা টানা শান্ত চোখ। সু-উচ্চ নাক। কপালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া চুলের গোছ। বয়স অনুমান করা শক্ত।' *(পৃ: ৬৬, ঐ)* মা-মরা শিউলি ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান, প্রেম-ভালোবাসা, স্বর্গ, ভগবান সব। মেয়ের থেকে মেয়ের মা আরো বেশি সুন্দরী ছিল। মেয়ের জন্ম দিতে মা মারা গিয়েছিল বলে পাঁচবদ্যি প্রথমে মেয়েকে সহ্য করতে পারতেন না। কালে কালে ওই মেয়েই তার সব হয়ে গেল। তাকে নিয়েই তার অনেক স্বপ্ন। অনেক লেখাপড়া ও গান শেখাবেন ইত্যাদি। বিয়ে কথা হলে মেয়ে বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে বলত 'বাবা তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমি পারব না।' *(পৃ: ৬৭, ঐ)*

লেখকের চোখ দিয়ে পাঁচবদ্যির হৃদয়যন্ত্রণার কথা পাঠকের চোখে উঠে এসেছে। এই কথা

বলতে বলতে পাঁচুগোপালের মুখ যন্ত্রণায় কুচকে গিয়ে থেমে গেল। তারপরে বলে উঠলেন, 'মিছে কথা। একেবারে শয়তান। সুন্দরের মধ্যে বিষ। চলে গেল। না বলে না জানিয়ে পালিয়ে গেল একটা ছেলের সঙ্গে। পাড়ারই ছেলে।' *(পৃ: ৬৭, ঐ)* মেয়েই তাকে বদলে দিয়েছে। পাঁচুগোপাল রায় 'ডাক্তারবাবু' নন, একজন ফেরিওয়ালা। রাস্তায় জরিবুটি, দাউদ কাউরের মলম ফেরি করে, প্রয়োজনে মাদুলিও দেন। পাঁচুগোপাল সকলের কাছে কবে যে পাঁচবদ্যি হয়ে গেছে সেটা তিনি নিজেও জানেন না। পাঁচবদ্যি নামে নিজেকেই বিদ্রূপ করে। কালকূট পাঁচুগোপালের পিতৃহৃদয়ের বেদনাকে সর্বকালীন করেছেন এভাবে।

"কিভাবে পাঁচুগোপালের জীবন আজ এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, কেন সে সাধু হয়েছিল, তার কারণ ব্যাখ্যারও আর প্রয়োজন ছিল না। দরকার নেই আর বলার, কেন তার এত হাঁকাহাঁকি, কথার খেই হারানো, পাগলামি আর সুন্দর ছেলেমেয়ে দেখলেই একটা তিক্ত সন্দেহে ও যন্ত্রণায় জ্বলে ওঠা।" *(পৃ: ৬৭, ঐ)* লেখক তার কথা পাঁচুগোপালের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন এ কেমন যাওয়া, দশ বছরে একবার খোঁজখবর করেনি! কিন্তু লেখক পাঁচুগোপাল তার বেদনাকে ছাপিয়ে মহত্বকে তুলে ধরেছেন। কালকূটকে দিদিমার আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে দেননি। এবং চলে গেলে যে তিনি দুঃখ পাবেন এটাও জানাতে ভোলেননি। বিশ্বের বিচিত্র নিয়মের মতই এই পাঁচুগোপালও বিচিত্র হয়েই ধরা দিয়েছে। বিচিত্র মনের গতি কালকূটের দিকে বন্ধুত্বের দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছে। "পেতেছে মন। ভালবেসেছে। হৃদয়াবেগের গতিই এমনি।" *(পৃ: ৬৯, ঐ)*

কালকূট যে লেখালেখি করেন সেটা জানতে পেরে বলেছেন যে তাদের পাড়ার কেষ্টকান্ত বাপের পয়সায় বউ বাচ্চা নিয়ে খায় আর কাঁড়ি কাঁড়ি লেখে, বাউড়ি চুল রাখে, উড়নি চাপায়, চশমা পরে। তার মনে হয় লেখক কালকূট হয়তো সেরকমই হবে। মানবমনের বিচিত্র ভাবনা তিনি পাঁচুগোপালের চোখে তুলে ধরেছেন। লেখক নিজেই উত্তর দিয়েছেন সকলে সেরকম হয় না, ওটা কেষ্টকান্তর ব্যক্তিগত পছন্দ। কুম্ভমেলা লেখক প্রথমবার এসেছেন জেনে তাকে রাত করে একা একা বেরোতে নিষেধও করে দিয়েছেন। পকেটে রেস্তো থাকলে খুনও হয়ে যেতে পারেন। তীর্থক্ষেত্র খুন! কিন্তু তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাতে উড়িয়ে দিতে পারেন নি লেখক। অমাবস্যার আগে একদিন পাঁচুগোপাল লেখকের লেখা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে বলেছিলেন 'লিখ দিও যদি সে একবার এসে বলে, বাবামণি, তুমি আমায় মাপ কর, তবে, তবেই আমি তাকে...'। পিতৃস্নেহের বুভুক্ষ হৃদয়বেদনা পাঠকের চোখে ধরা পড়েছে। লেখক পিতার এই বার্তাকে পাঠক হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আন্তরিক হয়েছেন। "কিন্তু আমি লিখে দিলে যদি সে পাঁচুগোপালকে এসে বাবামণি বলে ডাকে তবে লিখে দেব। নিশ্চয় লিখে দেব।" *(পৃ: ১২২,ঐ)* লেখক লিখেছেন "শিউলি! কোথায় ফুটেছ, কোথা থেকে ছড়াচ্ছে এত গন্ধ! ডক্টর পাঁচুগোপাল পাগল হয়ে ফিরছে পথে

পথে। একবার বাবামণি বলে ডেকে তার কোল ভরে দিয়ে যাও।'' *(পৃ: ১২২,ঐ)*

এমনি এক সন্তান পিপাসিত পিতার জীবনচিত্র এঁকেছেন যার বাইরেটা অত কঠিন, আর ভেতরটা মেয়ের জন্য বেদনায় দীর্ণ। কালকূট যে অমৃতের সন্ধানে এসেছেন মেলার হৈ চৈ, মানুষের বন্যা সবকিছুকে ছাপিয়ে স্নেহশীল পিতার দুঃখের পরশ পেয়েছেন, এই তো অমৃত। আশ্রমের কুটিরে এসে পেল্লাদের বালিকা বধূ ব্রজবালা, কুঠিয়ায় হিদের মা সহ আরও চরিত্র উঠে এসেছে। হিদের মার নিজের ছেলের সঙ্গে বনিবনা হয়নি। লেখককে দিয়ে চিঠিও লিখিয়েছিল। আঁচল থেকে দলামোচড়া একটি দু-আনা পোষ্টেজের খামে। বোঝাই যাচ্ছে আঁচলে থাকতে থাকতে ওরকমটি হয়েছে। মায়ের স্নেহের আঁচল বিছানো আছে ওই কাগজে। লেখককে লিখতে বললেন 'এবার লেখো তোর পায়ে পড়ি বাবা হিদে, নেদো, গোপাল, পারুল, সকলে মিলে কেমন আছিস, ধর্মত জানাস। ইতি তোর —' *(পৃ: ৯০, ঐ)* ব্যাস চিঠি লেখা শেষ।

কানে বাজতে লাগল সেই ধ্বনি, শুধু লেখকের নয় পাঠকেরও। সকলকে নিজের দুঃখের কথা বলে ও সুযোগ পেলে পয়সা নেয়। দানের চেয়ে মহৎ কার্য নেই এই সত্যে বিশ্বাসী সে। কালকূটকে সাক্ষী রেখে সে মেলার মধ্যে এক সাধুবাবাকে প্রাণভরে ভোজন করিয়েছিল। তার চিত্ত আনন্দিত, ফিসফিস করে ''পাষাণভার নামল আমার বুক থেকে। আনন্দ হোক, আনন্দ হোক প্রাণে। আমার প্রাণের সব নিরানন্দ ধুয়ে মুছে যাক'' *(পৃ: ১১৪, ঐ)* বলতে বলতে কারও দিকে না তাকিয়ে কাউকে না ডেকে এক মহা আনন্দের আবেগে ভেসে গিয়েছিল সে। চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখে কালকূটের এক টাকা দানের অহঙ্কার, মনের শঙ্কা সবকিছু দূর করে দিয়েছিল। কালকূটের চলার পথে এও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা, এও এক অদ্ভুত চরিত্র। হিদের মা নিজের বিশ্বাসে স্থির থেকে লেখককে যেন শিক্ষা দিয়ে গেল। আর হতভম্ব দোকানী যেন দেবী দর্শন করছিল। পয়সা নেওয়ার সময় 'হিসাব আমার হয়েছে মায়ীজী, ও আমার ভগবানের দান।' (পৃ: ১১৪, ঐ) এইভাবেই আশ্রমের তাবুবাসী, আশ্রমের কোতোয়াল, সন্ন্যাসী প্রতিটি মানব চরিত্রই বিশেষভাবে কালকূটের চোখে ধরা পড়েছে — রঘুনন্দন ও রুকমিণীর প্রেম, রুকমিণী থেকে মনিয়াবাঈ, তারপরে রামজীদাসী। মেলার আশ্রমের মণ্ডপে মণ্ডপে কীর্তন নৃত্যের তালে তালে সে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। রাম প্রেমে পাগলিনী। রাম-সীতার মূর্তি নিয়ে নৃত্যের তালে তালে দেহবল্লরীতে হিল্লোল তুলে ভক্তজনকে মুগ্ধ করে রাখে। রামজীদাসী মীরা দু'জনেই ঈশ্বর প্রেমে পাগলিনী। একজন কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী আর একজন রাম প্রেমে।

কাহিনীর ভিতর কাহিনী ছড়িয়ে আছে কালকূটের এই লেখায়। সেই কাহিনীর চরিত্রগুলিকে কালকূট নিজ দেখা ঘটনা ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন। তিনি সেখানে দেখিয়েছেন সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রগুলির জীবনাযাপন। যা সেই সময়কালকে অতিক্রম করে চিরকালীন

করেছে। যেমন রঘুনন্দন ও রুক্মিণীর প্রেমকথা। রঘুনন্দন ও রুক্মিণীর কথা বর্ণনে কালকূট ঐ আশ্রমের কোতয়াল সন্ন্যাসী অপর এক সাধুজীর সাহায্য নিয়েছেন। সেইখানেই ব্যক্ত করেছেন 'সন্ন্যাসীর আছে কুলাচার' ও 'কুলাচার কী'। সাধুজীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে লেখক সহজ করে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন যা পড়তে গেলে, জানতে গেলে পাঠককুল কখনই কঠিন বিষয়বস্তু বলে দূরে সরিয়ে রাখেন না চোখকে। লেখক রঘুনন্দন ও রুক্মিণীর মধ্য দিয়ে কঠিন তন্ত্রশাস্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন। তার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন বাউলের সহজীয়া তত্ত্ব। সাধুজী বলেছেন লেখককে "আপনাদের ভক্ত চণ্ডীদাস, কবি-সাধক। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা গেয়েছেন। তিনিও কিন্তু কুলাচারী। কুল তার রজকী। রামী ধোপানী। ব্রাহ্মণী, চণ্ডালী, নটী, ডোমী আর রজকী — এ হল বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের নির্বাচন। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রমতে নয়টি কুল। ওই পাঁচ, আর চারটি বেশ্যা, কাপালী, নাপিতানী, গোপিনী। কোন কোন তন্ত্রমতে চৌষট্টি কুল আছে। যবনীও বাদ যায় না তাতে। এসব সাধনমার্গের গুহ্য পদ্ধতি। তবে এ সবই তন্ত্রমতে। কিন্তু সন্ন্যাসীর তো তন্ত্র নেই। অনেকে কুলাচার পদ্ধতিতে সাধন করে থাকে। আপনাকে সন্ন্যাসীদের কথাই বলি।..." *(পৃ: ৮০, ঐ)*

কালকূট সাধুজীর কাছে সাধনভজনের অনেক গূঢ় তত্ত্ব ধীরে ধীরে অবগত হয়েছেন। নিজেও জেনেছেন পাঠককুলকেও তার অংশীদার করেছেন। সন্ন্যাসী ও অবধূতরা জোতমার্গের সাধন করেন। জোতমার্গে পৌঁছতে হলে চৈত্রমাসে নবরাত্র নামে একটি ব্রত করতে হয়। "এই ব্রতের দিন সন্ন্যাসী চক্র করে আর গুপ্তস্থানে মিলিত হয় আওরতের সঙ্গে। এই মিলন হল সন্ন্যাসীর গুপ্ত সাধনের সিঁড়ি। একে ছাড়া চলবে না।..." *(পৃ: ৮০, ঐ)* সাধুজীর চোখে রুক্মিণীর রূপ যেন আশ্রমের ফুল হয়ে উঠেছিল, তার কথা, নির্মল হাসি, চলা যেন ঝরনার জলের মত মুখরিত। আশ্রমের সকলের স্নেহধন্যা ছিল সে। আর রঘুনন্দন রুক্মিণীকে প্রথমে দেখেই একেবারে নির্বাক ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। "বাবুজী, রঘুনন্দনের চোখেও দেখলাম তেমনি আলো। সন্ন্যাসীর মুগ্ধতা! সে তো ভাল কথা নয়, কিন্তু দু'জনেই কী সুন্দর! আমি জ্ঞানী নই, সাধনা নেই আমার। তবু আমার মনে হল, আমার সামনে স্বয়ং হরগৌরী রয়েছে দাঁড়িয়ে।" *(পৃ: ৮১, ঐ)* রঘুনন্দনের জোতমার্গের সাধন-সঙ্গিনী হয়েছিল রুক্মিণী। কিন্তু এই ঘটনার দুদিন পর থেকে রঘুনন্দন, বদলে গিয়েছিলেন। রঘুনাথ শিখাসূত্র ত্যাগী, ষট্কর্ম শেষ করে পূর্ণ সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত, কলিকালের আখড়াশ্রয়ী অবধূত তবুও তিনি নিজেকে চেনার জন্য ব্যাকুল। সপ্তগুরুর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রঘুনন্দন বলছেন 'সপ্তগুরু কেন? গুরু আমার তুমি, এই প্রকৃতি, গুরু আমার রুক্মিণী, এই সংসার, সংসারের সব আদিম আর আওরত যা অপরূপ, তাই গুরুর রূপ। এর শুরু কোথায় জানিনে, জানিনে বন্ধু, এর শেষ কোথায়।' *(পৃ: ৮২, ঐ)* কালকূটের চোখে রঘুনন্দন ধীরে ধীরে সহজিয়া বাউল হয়ে উঠেছেন। তিনি নুলো বলরামের সঙ্গে রঘুনন্দনের মিল খুঁজে পেয়েছেন।

রঘুনন্দনের সবকিছু রুক্‌মিণীময় হয়ে গেল একদিন। রঘুনন্দন বলছেন 'হে ব্রহ্ম ও জ্ঞান তোমার নাম রুক্‌মিণী। হে পৃথিবী, তোমার নাম রুক্‌মিণী। এই হিমাচল ও গঙ্গা, এই বিহঙ্গ ও গাছ, এই আকাশ ও মাঠ সকলেই রুক্‌মিণী নামে ও রূপে সুন্দরী। হে অবধূত-হংস, তুমি আসলে দেহস্থিত একটি নারী। তোমারও নাম রুক্‌মিণী। এবার আমি যাব তোমার সন্ধানে। সময় হয়ে গেছে। ডাক পড়েছে।' *(পৃ: ৮৩, ঐ)* আর রুক্‌মিণীও সকলকে স্তম্ভিত করে রঘুর পায়ে ফুল, জল, চন্দন দিয়েছিল। সেই রাত্রেই আশ্রমের মোহান্ত কিছু করবার আগেই রঘুনন্দন সকলকে কাঁদিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল। সন্ন্যাসী আরও বলছিলেন "বাবুজী, হৃদয়ের রসহীন যে চারাগাছ উঠেছিল রঘুর মাথায়, রুক্‌মিণী তাতে ফুল ফুটিয়েছিল। রঘুর জ্ঞান ও হৃদয়ের মাঝামাঝি বন্ধ দরজার চাবি হয়ে এসেছিল রুক্‌মিণী। এর পর রঘুকে কে কী দিয়ে রাখবে বেঁধে।" *(পৃ: ৮৩, ঐ)*

কাহিনীর টুকরো টুকরো চিত্র তুলে ধরে রঘুনন্দন ও রুক্‌মিণীর প্রেম যে কুলাচারের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছিল সেটা বলা হল। এক স্বপ্নময় দক্ষতায় কালকূট সন্ন্যাসীর মুখ দিয়ে লক্ষরূপের মাঝে নিজের দেখা দুটি প্রেমময় মানব মানবী স্বর্গীয় আলোকে তুলে ধরেছেন পাঠককুলের সামনে। এ কাহিনী বহু দেখা কাহিনীর মত হলেও নিজস্বতার গুণেই অনন্য হয়ে উঠেছে। লেখক কালকূট এখানে সমকালকে ছাপিয়ে গিয়ে চিরকালীন হয়ে গেছেন। তারই দেখা মানুষগুলোকে নিজধারার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে কাহিনীর গতিকেও দুর্বার বেগে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। রঘুনন্দন-রুক্‌মিণীর কাহিনী এখানেই শেষ হয়নি। রুক্‌মিণীর দেহাতী স্বামী কিছু লোককে সঙ্গে এনে জোর করে আশ্রম থেকে নিয়ে গিয়েছিল। রুক্‌মিণীর নিজ গাঁও-এ যাওয়ার পথে ওর স্বামীর সঙ্গীরা ওকে ছিঁড়ে খেয়েছিল। ওর কাপুরুষ স্বামী পালিয়ে গিয়েছিল। রুক্‌মিণীর গাঁও-এ ফেরা হয়নি। লক্ষ্ণৌর সেরা বাঈজী মনিয়াবাঈ হয়ে গিয়েছিল রুক্‌মিণী। কিন্তু রুক্‌মিণীই মনিয়াবাঈ তো থাকল না, চার পাঁচ বছর আগে সে 'রামজীদাসী' হয়ে গেল। নৃত্যের ছন্দে ছন্দে সকলের চোখে মুখে একটা ভক্তিরসের মাতন লাগিয়ে দিয়েছে, রাম-প্রেমে পাগলিনী। কাহিনীর মধ্যে উপকাহিনীর মাধুর্যের রস কালকূটের অতৃপ্ত হৃদিকুম্ভকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে গেছে।

লেখক কালকূটের বোধোদয়, কেন এসেছে পূর্ণকুম্ভে? শুধুই কি পুণ্য সঞ্চয়ের লোভে? তা নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ পুণ্য স্নানে এসেছেন, মনে তাদের ভিন্ন ভিন্ন বাসনা। সেই বাসনার রূপেই লেখকের মনের কোণে ধরা পড়েছে। নিরালা আশ্রমে ভূতানন্দ প্রায় দিনরাতই নিমগাছের কষের রস পান করে থাকেন। তাদের দুজনের জীবনে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য দেখেছেন। দেখেছেন ঝগড়া-অভিমান-প্রেম। ভূতানন্দ-ভৈরবীর কাহিনী একটা বাড়তি মাত্রা এনে দিয়েছে। দুজনের ঝগড়া-মান-অভিমান এই কাহিনীর অমূল্যরতন। "আমার বাপের কেষ্টোর গুণ আছে। তোমারই কালীনামের মুরোদ নাই। ওই যে বলে না, মুরোদ বড় মান; তানার ছেঁড়া দুইখান কান।" *(পৃ: ১০১, ঐ)* লেখক

ভূতানন্দর আহত অপমানিত হৃদয়টিতে ডুব দিয়েছেন। সম্মান বাঁচানোর জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে ভূতানন্দ বলছে "তোর মত মেয়েমানুষের মুখে এতবড় কথা। বজ্জাত, নষ্ট মেয়েমানুষ। ... তোরে দুবেলা খাওয়ার বলে কিরা কাটছি মা কালীর দোরে — অ্যাঁ?" *(পৃ: ১০১, ঐ)* কালকূট দেখেছেন দৃপ্তভঙ্গিতে দুদিনের উপবাসী চন্ডিকাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে। কেউটের ফণার মত ফুঁসছে ভৈরবী। "কালো মেয়ের এমন বিচিত্র, ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ আর কখনো দেখিনি।" *(পৃ: ১০২, ঐ)* ভূতানন্দ এই ভয়ঙ্কর রূপের সামনে দাঁড়িয়ে না থাকতে পেরে পালিয়ে গিয়েছিল। আর ভৈরবীর দু'চোখে জলের ধারা নেমে এসেছিল। কালকূটের কাছে নিজের মনের কথা উজাড় করেছিল। কালী সাধকের সঙ্গে বৈষ্ণবের মেয়ের প্রেম, সেই প্রেমই ময়লাকে ঘরছাড়া করেছিল। সেই ময়লাই ভূতানন্দর সাধনসঙ্গিনী। লেখক বুঝেছেন অভিমানে, অপমানে ময়লার চোখে জল। সেই ফাঁকেই কালকূট লক্ষ্য করেছেন ভৈরবী আদুরে বউটির মত কথা। প্রেমপূর্ণ কথা। "ওইরকম কয়। শোনা আমার কপাল দাদাবাবু। কিন্তুন্ সামনে যদি থালায় কইরা কিছু দিতে পারি, তখন কালী নামে কি হাসনের ফোয়ারা, একবার দেইখ্যা যাইয়েন।" *(পৃ: ১০৩, ঐ)* ভৈরবীর কথাই ঠিক। ভূতানন্দর রাগ পড়ে গিয়েছিল। কালকূট চলে যেতে যেতে ভূতানন্দর কথা শুনতে পেলেন "রাগ দেখলেন তো? আসল ভৈরবীর ও-ই লক্ষণ আজ্ঞে, আর আমি —" *(পৃ: ১০৪, ঐ)* লেখকের সঙ্গে পাঠকও সহমত হয়ে যায় করুণ মুখে জোড়হাত করে তার ভৈরবীর কাছে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। কালকূট ভূতানন্দ-ভৈরবীর বিচিত্র প্রেমোখ্যান দেখে কালকূট নিজেই বলেছেন 'তবু জানি মানুষের ধর্ম, প্রেম ও ক্ষুধার এ ঘটনা অক্ষয় হয়ে থাকবে।' কালকূটের হৃদয় টাবুটুবু ভরে কালকূটের অমৃতের পাত্র পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে।

পূর্ণিমাতে স্নান আছে সঙ্গমে। সঙ্গমে সঞ্চারিত হচ্ছে অমৃত। কামনা-বাসনার অমৃতে ঢেউ লেগেছে। চারধারে শুধু চল চল ডাক। কার বাঁশি শুনে ভয়ঙ্কর শীতে সঙ্গমে ডুব দিতে পাগল হল সকলে। স্নানের সময় বাঁধা আছে, সেই সময়েই সবাই ডুব দিতে ছুটছে। লেখকেরও ডাক পড়েছে, ব্রজবালা হ্যাঁচকা টানে কম্বল টেনে দিয়ে তাকে ডেকে দিদিমা ও স্বামীর দেহলগ্ন হয়ে বেরিয়ে গেল। ব্রজবালা ডুব দেবে তার জীবনে, যৌবনে, তার শাখা-সিঁদূরে, মাছে-ভাতে, স্বামীর পরমায়ুতে। সবাই ছুটছে শুভ মুহূর্তে ডুব দিতে, তাবু শূন্য। লেখকও উঠে পড়লেন। মুখ ধোয়ার জন্য কলপাড়ে গিয়ে দেখতে পেলেন নিরুদ্দেশ স্বামী সন্ধানী বৌদি উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, চোখে জলের ধারা, ঘোমটা খসা। ব্যথিত দেবরটি পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। 'নিঃশব্দ আসরে বেদনার ও চোখের জলের একটি আবেগময় সুর বাজছিল। এই নিরালা অবসরেই মানুষ তার ব্যথার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে, ব্যথায় গৌরবে পারে হাসতে-কাঁদতে।' হৃদয়-মথিত বেদনাকে আশ্চর্য দক্ষতায় তুলে ধরে কাহিনীকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন।

লক্ষ লক্ষ মানুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত সঙ্গমে ছুটে চলেছে আর এরা বেদনার অশ্রু ঝরানোর জন্য নিরালা অবসরটুকু বেছে নিয়েছে। মানবমনের গভীরে ঢুকে তিনি বেদনাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন পাঠক হৃদয়ে। সঙ্গমের দিকে ছুটে চলা মানুষদের নিয়ন্ত্রণ করছে পুলিশ। বাঁধের ওপর সারবন্দী হস্তিবাহিনী উঠে আছে। রাজকীয় জড়ি-মখমলে সজ্জিত হাতির ওপরে ছাইমাখা সাধু! একদল মেয়ে হাতির পায়ে হাত দিয়ে কপালে ছোঁওয়ার চেষ্টা করার আগেই, হাতির পেছনের পায়ের লাথিতে অনেক দূরে ছিটকে পড়েছিল। তবুও তাদের বিরাম নেই। পুণ্য অর্জন করতেই হবে। প্রাণের ভয় নেই, এও তো লক্ষ রূপের এক রূপ! অমৃতের রণে কুম্ভ পূর্ণ হয়েছে। লক্ষ রূপ দিয়েই এই কাহিনীর মালা গাঁথা হয়েছে। অমৃতের কুম্ভকে পূর্ণতা দিয়েছে আরও বহুরূপ। সঙ্গমে যেতে যেতে দেখলেন একদল সাধু এসেছেন একদল সাধু এসেছেন যারা কখনও থেমে থাকেন না, অনবরত চলতেই থাকেন। যদি কেউ থামিয়ে দেয়, কিছু দান করে বা কিছু জানতে চায় তাহলে ক্ষণিক না চলে পা দুটোকে ওঠানামা করাতে থাকে। চলাই জীবন, পা ফুলে ফেটে একাকার, তবুও চলার বিরাম নেই। কোন ভক্ত শ্রদ্ধাভরে কিছু দিলে, তাদের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থী হলে, তাদের ঝোলা থেকে কিছু অংশ ছিঁড়ে দেন। সেই ভক্ত অমূল্য ধন পেয়েছেন মনে করে খুশি হন।

একদল সাধুনী অর্থাৎ অবধুতানী এসেছেন হরিদ্বার থেকে। এঁরা নৃত্যগীত করেন, এবং কলহাস্যে মুখরিত সর্বদা। রাস্তার দু'পাশে ভিখারিদের ভিড়। ছোট একটা বছর দশের ছেলে কাঁটার বিছানায় শুয়ে আছে। জিভে ফোঁড়ানো আছে একটি সরু ত্রিশূল। ছেলেটি থর থর করে কাঁপছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে। লেখক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে এ কেমন ধর্মলীলা? মহামেলায় কেন এমন করুণ দৃশ্যের অবতারণা। পরমুহূর্তেই নিজেই উত্তর দিয়েছেন এই যন্ত্রণার মধ্যে তার কৃচ্ছসাধনা আছে। বাংলাদেশেও পথে, ট্রেনে এরকম সাধনা দেখা যায়। সবই পেটের টানে। লেখকের অন্তর্দৃষ্টি পৌঁছে গেছে সমাজের দরিদ্র মানুষের পেটের চিন্তায়। বাঁচার জন্য ভয়ঙ্কর সাধনা। হটযোগীরাও এসেছেন তাদের কলাকৌশল দেখাতে। এসব যেভাবে সারা মেলায় ঘুরে ঘুরে কালকূট পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সেইভাবে তিনি হৃদিকুম্ভে ডুব দিয়ে রচনাতে এদের তুলে ধরেছেন।

জলের ধারের কাছে এসে দেখেন জল পাঁক হয়ে উঠেছে। সেই পাঁকের মধ্যে ক্ষিপ্ত মোষের মত মানুষ ঠেলাঠেলি করছে। সঙ্গমের বুকে নৌকার ভিড়, দড়ি দিয়ে যমুনার বুকে সীমারেখা টানা হয়েছে। ওইটি ডেঞ্জার জোন। ভলান্টিয়ারের বাঁশি বাজছে, পতাকা উড়ছে। এক বুড়ো লেখককে মহারাজ মহারাজ বলে জড়িয়ে ধরে জলের কাছে টেনে নিয়ে পাঁকের মধ্যে স্নান করে এল। মনে তার প্রশান্তি, ফোকলা দাঁতে বলল "জীতা রহো বাবা। পানি মে বহুত ডর, সাঁতার নহি জানতা।" (পৃ: ১০৮, ঐ) লজ্জার অবকাশ নেই, কারো কাপড় খুলে গেছে, কেউবা নিজেই খুলে রেখেছে। পাঞ্জাবী মহিলার বেশি করে উদাসীন। এত লোকের সামনে কিভাবে তারা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে স্নান

করছে তারা এই চিন্তা লেখকের মাথায় খেলে গেল। মরালীর মত তারা স্নান করছে। এমনি করেই দ্বিধামুক্ত মনে পুণ্য স্নানে মেতেছে।

সঙ্গমের মাঝখানে যাওয়ার জন্য মাঝির হাত ধরে নৌকায় উঠে পড়লেন। ভিড়ের চাপে নৌকা যখন ডুবু ডুবু তখন নৌকা ছাড়ল। ভয়াবহ নৌকাবিলাস, নৌকা যত টলমল করে, আধুনিক স্যুট পড়া পাঞ্জাবী যুবক-যুবতীরা ভয়ের হাসিতে জড়াজড়ি। লেখক নৌকার পাটাতনের উপরে যাত্রীদের নিয়ে একটি উপভোগ্য চিত্র এঁকেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন, হাসিটা সত্যি হাসি নয়, ভয়ের হাসি। নৌকার উপরে দুটি অল্পবয়সী তরুণী এসেছে কোনো পুরুষ সঙ্গী ছাড়া! সঙ্গে একটি কয়েকমাসের শিশু! ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে পুরুষসঙ্গী ছাড়া সঙ্গমে স্নান করতে আসা। অবাক হওয়ার মতই ঘটনা। তারা দু'জনেই কাঁদছে, দুই জা, একজন শিবপিয়ানী। এসেছে শিশুটির পরমায়ুর সন্ধানে। সঙ্গমে সবাই স্নানের ঝড় তুলেছে। হাসি-কান্না-কলহে মুখরিত সঙ্গমে ওরা কাঁদছে। শিশুটিও পাল্লা দিয়ে চিৎকার করছে, পাটাতনের ওপরে নামিয়ে দিয়েছে। ওরা স্নান করবে বলে শিশুটিকে ফেলে রেখেছে, ওকে স্নান করাবে এইজন্য "ওর বাবা নেই, ওকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে, না চান করলে চলবে কেন?" *(পৃ: ১১০, ঐ)* ওরা স্নান সেরে এসে লেখকের কোল থেকে শিশুটিকে নিয়ে পাটাতনের ওপরে রেখে অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে স্নান করিয়ে দিল। শিশুটির মা শিবপিয়ানী নিজের হাতের দুটি সোনার চুড়ি জলে ফেলে দিল, তার জার নিষেধ সে শোনেনি। কিন্তু জা 'পাগলী' বলে হেসেছিল, এত একধরনের প্রশ্রয় এটা মনে হবে পাঠকের। পাড়ে এসে নৌকা থেকে নেমে লেখককে যাচ্ছি বলে খুশিতে নেমে গেল।শিশুটির পরমায়ু সন্ধানী ওর মা। ও বেঁচে থাক এই শুভ কামনা করতে করতে কালকূটের ভাবনা এক সঙ্গীকে হারিয়েছিলাম পথে আসতে। সে আসছিল তার ব্যাধিমুক্তি ও আয়ুসন্ধানের জন্য। আমরা একজন মরি, আর একজন জন্মাই। দিবানিশি এই যাওয়া-আসার মধ্যে আমরা নূতন থেকে নূতনতর। একজনের আকাংক্ষা পুরাই আর একজন। একজন পথের শেষে, শুরু করি আর একজন। লক্ষরূপের আরশিতে কালকূট নিজেকে অন্বেষণ করতে করতে কুম্ভমেলায় দেখা মানুষগুলোকে বিচিত্র রূপে তুলে ধরেছেন। স্নানের আনন্দে মেতেছে শিখপুরুষ, সঙ্গে তার সঙ্গিনীও আছে। লেখককে দুষ্টুমিভরা চোখে স্নানের জন্য জলে নামতে না পেরে জল ছিটিয়ে দিয়েছে। তীব্র শীতল জল শরীরটাকে কেটে কেটে ভিতরে ঢুকে গেছে। এও আর এক রূপ।

লক্ষ লোকের মিলন ক্ষেত্রে মৈত্রীর সুরে বাঁধা একে অপরে। নৌকা থেকে তাড়াতাড়ি নেমে আসতেই আশ্রমের তাবু খনপিসী। মুণ্ডিত মস্ককে পুরুষের রূপ ধরেছে। দিদিমা প্রহ্লাদ সব ন্যাড়া। প্রহ্লাদ লেখককে মাথা মুড়িয়ে নিতে বলল, আগের পাপ সব কেটে যাবে, পরে আবার পাপ করবেন। একথা শুনে খনপিসী 'ছি ছি ছি, কি অনাচ্ছিষ্টির কথা। সঙ্গমে দাঁড়িয়েও মুখের রাখ-ঢাক

নেই?' *(পৃ: ১১০, ঐ)* খনপিসীর পাশেই সর্বনাশী মেয়ে চোরটি। খনপিসী চিনতে পারেনি, বিচিত্ররূপ সর্বনাশী তার পাশে। কালো রোগা ক্ষীণ এক পুরুষকে অঞ্জলি ভরে জল ছিটিয়ে দিতে দিতে কী যেন বলছে, তা শুনে পুরুষটি শিশুর মত হেসে উঠছে। সিঁথি ভরা, কপাল লেপা সিঁদূরে সঙ্গমে পাঁকমেশানো জলে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। খনপিসী গায়ে ধাক্কা লেগে গেল, খনপিসী রাগ না করে বেদনার ছায়া ঘনিয়ে জানতে চাইল যে অনেকদিন ধরে ব্যামোয় ভুগছে নাকি। সেটা জেনে পরম আশ্বাসের সুরে 'ভালো হয়ে যাবে মা, আমি বলছি। এত কষ্ট করে সঙ্গমে নিয়ে এসেছ, কে নেবে ওর পেরমায়ু। তোমার শাঁখা ও সিঁদূর অক্ষয় হোক, চির-আয়ুষ্মতী হও।' *(পৃ: ১১১, ঐ)* এই অপরূপ দৃশ্য দেখে বিস্মিত, মনে মনে শ্রদ্ধা ও বেদনার নমস্কার জানিয়েছেন। 'নমস্কার মানুষের জীবনের ও হৃদয়ের কোটি কোটি বৈচিত্র্যকে, অপরূপ বিচিত্রকে।' *(পৃ: ১১১, ঐ)*

লেখক ওই সর্ব্বনাশীকে বারে বারে দেখেছেন। কখনও একা কখনও একদল মেয়ের সঙ্গে ঝড়ের মত ছুটে গেছে। ছুটতে ছুটতেই যৌবনের অগ্নিকণা ছিটিয়ে গেছে পুরুষের চোখে। সমুদ্রগুপ্তে কূপে সুড়ঙ্গে এই মেয়েই তার বুকের ভিতরে হাত চালিয়েছিল পয়সার খোঁজে। ভিড়ের মধ্যে তাকে মুঠি করে ধরে ব্যাগটি বাঁচিয়েছিলেন। সেই সর্বনাশী প্রেমেও স্নেহের এমন মূর্তি ধরতে পারে, এমনি করে অমৃতে একাকার হতে পারে তাকে পঙ্ক বলে মেনে নিতে মন সায় দেয় না। কারো যেন কোনদিন সে দুঃসাহস না থাকে এই বার্তাই তিনি পাঠককুলে ছড়িয়ে দিয়েছেন। মেলা চলাকালীন সময়ে একদিন সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর মত ঝড় হয়ে গেল। খোলা আকাশের নিচে যে সব সাধুরা আস্তানা গেড়েছিল, যারা মাটিতে গুহা কেটে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা শহরের দিকে চলে গেল। তাবু, ঘর সব ঝড়ে তছনছ, হয়ে গেছে, তারাও চলে গেল। তীব্র শীত থেকে বাঁচার জন্য আগুনের প্রয়োজনে কাঠের অভাব হয়ে গেল। এক সাধু কাঠ চুরি করে ধরা পড়ে মার খেল তবুও কাঠ ছাড়ল না।

ঠাণ্ডা কমতেই নতুন নতুন সাধুবাহিনী হাতি, ঘোড়া ও নিশানের মিছিল নিয়ে ছুটে আসছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে ঘোড়ার উপর বসে উলঙ্গ নাগা সন্ন্যাসীরা রুদ্রমূর্তিতে ছুটে আসছে। লেখক নাগা সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে যা জেনেছেন তাই নিজ লেখনীতে ব্যক্ত করেছেন। নগ্নতা বহুদিনের। আর অসহায় সাধুদের রক্ষা করবার জন্য বালানন্দজী সাধু সংরক্ষণী সশস্ত্র সাধু সেনাবাহিনী তৈরি করেছিলেন। এই বাহিনী তৈরি হয় চৌদ্দশ শকে। কখনও কখনও এঁরা রাষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। মৌনী অমাবস্যার দিনে তারা পূর্ণকুম্ভে স্নান করবে। মেলায় সাধুবেলা আশ্রমের তাবু পড়েছে। সুসজ্জিত মঞ্চ ও আলোর ছড়াছড়ি। বেনাসর থেকে এসেছে দলটি। আগে এই আশ্রম পাকিস্তানের এলাকায় ছিল। লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি আছে এই আশ্রমের। গৈরিক বসনধারী সাধুটি লেখক কালকূটকে এইসব তথ্য দিয়েছন। প্রচুর শিখভক্ত

আসে, সিগারেট পিনা মানা। জুতো খুলে আশ্রমে ঢুকে লেখক রিডিং রুম দেখতে পেয়েছিলেন। টেবিলের উপর অনেক পত্র পত্রিকা, ইংরাজী, হিন্দি, উর্দু, তামিল, মারাঠী, ওড়িয়া ভাষা আছে। কিন্তু বাংলা পত্রিকা একটিও দেখতে পেলেন। ওদের খাতা কলমে বাংলায় লিখেদিলাম নিজের নামটি। নীচে লিখলাম বাংলাদেশ।

অনেক ভাষার মধ্যে বাংলাভাষা বসিয়ে দিয়েছিলেন শুধু লেখার তুষ্টির জন্য। রূপের মাঝে অপরূপকে বসিয়ে দিয়ে মনের তুষ্টিসাধন করেছিলেন। বহু চরিত্রের সমাবেশে এই কাহিনী এগিয়ে গেছে। লেখক কুম্ভমেলায় এসে লক্ষ লক্ষ রূপের মাঝে নিজেকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। মানবমনের আরশিতে তিনি তার চরিত্রগুলোকে কিভাবে কাহিনীতে এনেছেন, কিভাবে তার সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মুখে ভাষা জুগিয়েছেন সেগুলো এতক্ষণ ধরে আলোচনা করা হল, কিন্তু যে চরিত্রগুলো এ'কাহিনীর প্রাণবিন্দু, তাদের কথা এলাহাবাদ স্টেশনে আসার পরে তেমন করে বলা হয়ে ওঠেনি। এবার সেই চরিত্রগুলোকে আবার আলোকিত করা হবে।

মেলায় যাওয়ার সময় এলাহাবাদের রাজপথের উপর দিয়ে যেতে যেতে কালকূটের মনে হয়েছে এলাহাবাদ শহরের সঙ্গে ঢাকা শহরের মিল রয়েছে। যেতে যেতে পুরোনো দিনের প্রয়াগে মনের গতিকে ডানা মেলে দেন। হাজার বছর আগের প্রয়াগ, রাম-সীতা-লক্ষ্মণের বনবাসের পথ দিয়ে তিনি যেন চলেছেন। "ভাবি, যে পথের উপর দিয়ে আজ রিক্সায় চেপে চলেছি, একদিন এখানকারই ভয়াবহ বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অযোধ্যার দশরথ-পুত্র রাম, ভাই লক্ষ্মণ ও স্ত্রী সীতাকে নিয়ে বনবাসের পথে গিয়েছিলেন। দেখতে পেয়েছিলেন দূর আকাশের ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠেছিল ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম থেকে।" *(পৃ: ৪৮, ঐ)* লেখক রামের বনযাত্রাকে এ'কালের দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন সৎমায়ের তাড়নায় দুইভাই আর এক বউ তাদের ঘর ছেড়ে বর্তমানের এই পথ দিয়ে বনে এসেছিলেন, সে অনেককাল আগে। 'তাঁদের দিয়েই আমাদের রাজকথা, কাব্য, গৌরবগাথা, রূপকথা, আমাদের ইতিহাস।' *(পৃ: ৪৮, ঐ)* লেখক কালকূট প্রয়াগের ইতিহাসে ডুব দিয়েছেন। 'এই প্রয়াগ (প্রে = প্রকৃষ্ট, যাগ = যজ্ঞ)। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রকৃষ্ট স্থান হল প্রয়াগ। পুরাণশাস্ত্রের প্রজাপতি ব্রহ্মার যজ্ঞবেদী, যজ্ঞের মধ্যবেদী এই প্রয়াগ। প্রজাপতের্যজ্ঞ আসীৎ প্রয়াগে। ভারতের আদিম যুগের ধর্মীয় ইতিহাসের লীলাক্ষেত্র। পৃথিবীর প্রথম যজ্ঞের ধূম সঞ্চারিত হয়েছে এখানকার মাথার উপরের আকাশে। প্রয়াগ সেই পুণ্যভূমি।' *(পৃ: ৫২, ঐ)* লেখক কালকূট তার কাহিনীতে স্থানকে তেমন প্রাধান্য দেননি, যেমন প্রাধান্য দিয়েছেন মানুষকে, মানবমনকে। তিনি মানবমনের অন্তগহীনে ডুব দিয়ে তুলে এনেছেন অমূল্য রতন। তবুও স্থানের গরিমাকে ম্লান হতে দেননি। কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে এমনভাবে স্থানকে তুলে ধরেছেন সেখানে স্থানের বর্ণনা পড়তে পড়তে পাঠকের মনে ক্লান্তি আসে না। ইতিহাসের পথ ধরে মৌর্য বংশ, ফা-হিয়েন, মেগাস্থিনিস,

সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধন— সব সব স্মৃতি একে একে ভীড় করতে থাকে। মনে মনে গৌতম বুদ্ধর পদরেণু খুঁজতে থাকেন। প্রয়াগই 'বৎসদেশ' নামে পরিচিত ছিল। আকবর নাম রাখেন 'ইলাহাবাস', ভিত্তিস্থাপন করেন এলাহাবাস দুর্গের। শাজাহান নতুন নামে অভিহিত করেন 'ইলাহাবাদ'।

বিদ্রোহী বুন্দেলা আর মারাঠারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মুঘল-মারাঠীদের রক্তে মাটি লাল। এরপর দেনার দায়ে বিকিয়ে দিল অযোধ্যা নবাব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে। সংক্ষিপ্ত একটি স্থানিক চিত্র চিত্রিত। লেখক কালকূট অতীতের প্রয়াগ থেকে যাত্রা শুরু করে ইলাহাবাদ পর্যন্ত মনে মনে বিচরণ করেছেন। তিনি খুঁজেছেন অতীতের ছায়ায় ছায়ায় সেইসব বীরপুরুষদের, যাদের কীর্তি আমাদের গৌরবান্বিত করে। আবার অন্ধকার দিকটাও দেখেছেন, দেনার অযোধ্যার নবাব ইলাহাবাদকে ইষ্ট ইণ্ডিয়ার কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এইসব মিলিয়েই ইলাহাবাদের ইতিহাস। ইলাহাবাদের রাজপথের উপর দিয়ে কুম্ভমেলায় যেতে হয়। টাঙায় করে শ্যামারা চলেছিল সেই পথেই। পথে যেতেই লেখকের সঙ্গে তার টুকরো টুকরো কথা। এরপর আর দেখা হয়নি। বলরামের সঙ্গেও ষ্টেশন পর্যন্তই দেখা।

পূর্ণিমার দিন ভোরে সঙ্গম যাত্রা করেছিলেন। সেই সঙ্গমযাত্রা থেকে শুরু করে সারাটি দিন ঝড়ের গতিতে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। লক্ষরূপের হৃদিসাগরে ডুব দিয়ে। বেলা শেষে আশ্রমের দিকে না ফিরে যমুনার দিকেই পা চালিয়ে দিয়েছিলেন। হঠাৎ কিসে পা আটকে গিয়েছিল। কে যেন তার পা চেপে ধরেছে। কিছু বলার আগেই 'তুমি কে-এ পাগলপারা হে। বহুদিনের চেনা বলে মনে হতেছে, পাগলপারা হে।' *(পৃ. ১১৪, ঐ)* বলরামের খোলা গলার উদাত্ত স্বর আকাশ ছুঁয়েছিল। সে গান লেখকের হলদয়ের বদ্ধ জলাশয়ে দোলা দিয়ে ঢেউ তুলে দিয়ে তাতে পানসি চালিয়ে দিয়েছিল সে। তার পাগলপারা গানে হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়ে যায়। কিন্তু লেখক কালকূট নিজের সমালোচনা করে বলেছেন কৌতূহলী নরনারীর লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, বলরামের হৃদয়াবেগের উত্তরণ তার ঘটেনি। তাই বলরামকে তিনি থামতে বলেছিলেন লোক জমা হয়েছে বলে। তারপরে দু'জনেই কেল্লার কাছে যমুনার শুষ্ক বালুসৈকতে এসে বসেছিলেন। বলরাম গামছাকে হৃদয় করে পেতে দিয়েছিল তাঁর বসার জন্য। তারপরে যমুনার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি সুরে গান ধরেছিল। কত চোখের জলে যমুনা নীল হয়েছিল তা সে জানে তবু বলল 'ভাবি, এখনো কি বাঁশি বাজে ঠাকুরের। ছুটে ছুটে আসে রাইঠাকরুন। সুরে তাল নাই। বাঁশি বাজবে, পায়ের মলের তাল বাজবে না?' *(পৃ. ১১৫, ঐ)* তারপরে সে অভিমান করে ''হেসে বলল, 'তা হইলে, এই যমুনার পাড়ে বইসেই কই, একবার কি মনে করতেও নেই? লক্ষ লক্ষ গলা পাইছেন, তাই তুমি আমারে ভুলছেন।'

বললাম, 'না', তোমার আশ্রমটি তো চিনি না।'

বলল, 'ওই তো, কেল্লার কাছেই। নন্দগোপাল মাধবাচর্য বাবাজীর আশ্রম। আজ কিন্তুন যাইতে হইবে। আমি কি একলা? আরো নোক রইছে বইসে আপনার জন্য। রোজ আমারে জিজ্ঞেস করে, 'তোর সে কোথায়?'

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে বলরাম? লক্ষ্মীদাসী?'

সে বলল হেসে, শুধু লক্ষ্মীদাসী কেন? সে আছে, আরো আছে। নিজের চোখে গিয়া দেখতে হইবে। যাবেন তো?'

বলরামের মুখের দিকে তাকিয়ে আর 'না' বলতে পারলাম না।" *(পৃ: ১১৫, ঐ)*

বলরাম ও লেখকের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে একটা আত্মিক সম্পর্ক। মাত্র ক'দিন আগের পরিচয়। কয়েকদিন না দেখার পর দেখা যেন দুটি হৃদয়ের গঙ্গাযমুনা সঙ্গম। বলরামের কথার বাগানে ফুল ফুটেছে। যমুনার তীরে বসে সে যমুনার সঙ্গে কথা কয়। মন কৃষ্ণের বাঁশি আর রাইঠাকরুণের নূপুরের ধ্বনি শোনার জন্য উতলা। মানসচক্ষে সে যুগান্তরের প্রেমকে দেখতে চায়। তার বাউল মনে প্রেমধ্বনির একতারা বাজে। বলরাম লেখক কালকূটকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে যেতে চায়। হেঁচড়ে হেঁচড়ে দু'হাতে ভর দিয়ে গুন গুন করতে করতে সে চলে, মেলার প্রচণ্ড ভিড়ে একা ছেড়ে দেওয়া যায় না, যে কেউ তাকে মাড়িয়ে দিতে পারে। তাই লেখক তার সঙ্গে আশ্রমের দিকে চলতে থাকেন।

যেতে যেতে অনেক কথা হয়। বলরাম লেখক কালকূটকে খুঁটিয়ে দেখে বলে 'আমার ঠাকুরের মুখখানি অমন শুকু শুকু ক্যান? এই কয়দিনে মুত্তিখানিও বড় রোগা হয়েছে। কষ্টে আছেন?' *(পৃ. ১১৫, ঐ)* লেখক বলরামের দৃষ্টিতে নিজেকে দেখেছেন। বলরামের গভীর দৃষ্টি লেখকের অন্তর্ভেদ করে, সারাদিন ঘুরে ঘুরে দিন কেটে যায়, সারাদিনে খাওয়া হয়নি সেদিন। আখড়াবাসী মূল গায়েন বলরাম একদম ঠিক নজর করেছে। সে বলতে থাকে একা একা বলেই কষ্টে আছেন তার ঠাকুর। সঙ্গে কেউ থাকলে ঠিক 'চখে চখে' রাখতে পারত। ব্যামো হলে যে বিষম বিপদ হবে সেটা জানাতে ভোলে না। মনের আগল যে তার খোলা, কথার ফুলবাগান সে।

আশ্রমে পৌঁছে অভিমানাহত লক্ষ্মীদাসীকে দেখেন, চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। অভিমানে বলরামের দিকে চোখে অগ্নিবর্ষণ করে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল যা দেখে লেখকের মনে হয়েছে। "মধ্যমা ঋতু আশ্বিনের ঢল ঢল মকালসা গাঙের বিস্তারে চকিত বাতাসের শিহরণ।" *(পৃ. ১১৬, ঐ)* লেখক কালকূটকে প্রথমে চিনতে পারে নি। বলরাম বুঝতে পেরে লক্ষ্মীদাসীকে বলে, কাকে ধরে নিয়ে এসেছে সেটা যেন একবারটি দেখে। এ'কথা বলে গানে গানে মানভঞ্জন করে 'মানের বসো যাইও না গো, রাখো মিনতি, ভাবো আমার কি হইবে গতি।' *(পৃ. ১১৬, ঐ)* লক্ষ্মীদাসী ফিরে এসে লেখককে দেখে লজ্জিত নয়নে বালিকার মতো খুশি হয়ে উঠে সাদর অভ্যর্থনা করে।

আড়ম্বরহীন আশ্রম, তাবু ও হোগলা পাতার ঘরে ঘেরা, হ্যাজাকের আলোয় আলোকিত। ছোট পিতলের শিঙ্কার মধ্যে ফুটখানেক রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির সামনে খোল করতাল সহযোগে ঢুলে ঢুলে নামাবলী ধারীরা নাচে-গানে মত্ত। বাংলায় গান গাইছিল তারা, অনেককে এলাহাবাদ স্টেশনে দেখেছেন, গ্রাম্য দরিদ্র বোষ্টমের ছাপ রয়েছে তাদের গায়েমুখে। লেখককে দেখে আসর একটু বে-তাল হয়েছিল। আশ্রমের প্রতিটি খুঁটিনাটি চিত্র লেখকের দৃষ্টিতে ছবির মত উঠে এসেছে। লেখা তো নয় চিত্রকথা এঁকেছেন। আশ্রমের ভক্তদেরও একটি মানসিক দিকও উঠে এসেছে। অনাড়ম্বর আশ্রমে বলরাম ও লক্ষ্মীদাসী মনের উদারতা মেলে ধরেছে প্রসন্ন হাসিতে।

লেখকের শুকু শুকু মুখখানি বলরামের আগেই নজরে পড়েছিল তাই লক্ষ্মীদাসীকে রাধামাধবের প্রসাদ দিতে বলেছিল। লক্ষ্মীদাসী শালপাতায় করে খানিকটা খিচুড়ি, বেগুন ভাজা, বাঁধাকপির তরকারি ও খানিকটা খোয়া এনে দুজনকেই রাধামাধবের প্রসাদ এনে দিয়েছিল। খেতে দিয়ে আড়চোখে সে বলরামকে দেখছিল। বলরামের আহারে বিহারে যে একটি সযত্ন হাতের স্পর্শ থাকতে পারে সেকথা লেখক কালকূট যখন তাকে প্রথম দেখেছিলেন তখন বুঝতে পারেন নি, প্রথমে ভেবেছিলেন পথের ভিখারী, তারপরে জেনেছেন আখড়ার মূল গায়েন। ''আজ আমারই এক পংক্তিতে সে আহারে বসেছে। আমার ঢাকা চোখের সামনে বিস্মিত মুক্ত প্রাঙ্গণকে খুলে দিলে বুঝতে পারলাম না। লক্ষ্মীদাসী, না বলরাম? হৃদয়াবেগ, ভক্তি ও জ্ঞানের পরিচয় মিলেছিল বলরামের গানে ও কথায়। সে একদিন। আর একদিক দেখিয়ে দিল তার লক্ষ্মীদাসী।' *(পৃ. ১১৬, ঐ)*

লক্ষ্মীদাসী বলরামের বিরুদ্ধে নালিশ করে, বিচার চায়। বলরামও তাতে সায় দেয়, সেও বিচার চায়। আমঘাটার আখড়ার মূল গায়েন আর অধ্যক্ষার বিচিত্র ভাবরসের চিত্র ফুটে উঠেছে লেখক কালকূটের লেখনীতে। লক্ষ্মীদাসী জলপূর্ণ চোখে বলে 'কথা নাই, বাত্তা নাই, যখন তখন বাহির হইয়ে যায়, কোথায় গিয়ে বইসে থাকে। এট্টা বিপদ আপদ হইলে আমি কোথায় যাইব, বলেন তো?' *(পৃ. ১১৭, ঐ)* লক্ষ্মীদাসীর অভিমানের কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখকের চোখে লক্ষ্মীদাসীর প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি ধরা পড়ে। বাইরের ভিড়ে বলরামের প্রাণসংশয় হতে পারে যে কোন সময়ে। কিন্তু বলরামও থেমে থাকে না, সেও যে বিচার প্রার্থী। হেসে সে জানায় কুম্ভমেলায় কেউ তাকে আনতে চায়নি, জোর করে এসেছে সে, এসেছে যখন তখন সে আখড়ায় পড়ে থাকবে কেন? কে যে তাকে ডাক দিল, সে বুঝতে পারে না। 'ঠাকুর, আমি যে লুলা, এমজন কইরে আর কোনদিন বুঝি নাই। আজই বার বার দৌড়বার নেগে য্যাখন ছটফট করতেছি, পাখা য্যাখন মেলতে চাইতেছি, ত্যাখন দেখি, এ পাখা উড়তে পারে না। যদি আসলাম, তবে যেটুকু ঠেকতে ঠেকতে পারি।' *(পৃ: ১১৭, ঐ)*

বলরাম বিপদ-আপদের কথা ভেবে ঘরে বসে থাকতে রাজী নয়। সামনে যমুনা কলকল

করে বয়ে যাচ্ছে, সেখানে সে আসল জনকে গান শোনাতে যায়। এক বিকলাঙ্গ মানুষের জীবনযন্ত্রণা ও জীবনবোধ ধরা পড়েছে। বলরামের মুখে তার মনঃকষ্টের কথা শুনে লক্ষ্মীদাসীর বিচার চাওয়া, নালিশ সব কোথায় যেন হারিয়ে যায়। সে শুধুই দুচোখ মেলে বলরামের দিকে চেয়ে থাকে। বলরাম আর লক্ষ্মীদাসী হৃদয়ের প্রীতিতে বাধা পড়েছে এই সত্যটুকু পাঠকের চোখে ধরা পড়েছে। লক্ষ্মীদাসীর কথা পাঠকের হৃদয় দুয়ারে ধাক্কা দিয়েছে। 'কিন্তুন যদি কিছু হয়, তবে আমার আখড়া যে অন্ধকার হইবে। রাধামাধব তো আর কারুর গানে তুষ্ট নয়!' *(পৃ. ১১৭, ঐ)* রাধামাধবের অনুভূতি লেখক তার মানুষসুলভ মন দিয়ে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। মনেরই কারসাজি এসব। "মনে হল, যদি বলরামের বিপদ হয়, তবে এক জায়গায় অন্ধকার নেমে আসবে। তার গান না শুনলে কোন এক হৃদয়ের রাধামাধব চিরদিনের দরজা বন্ধ করবে।" *(পৃ. ১১৭, ঐ)*

এমনি করেই লেখকের দৃষ্টিতে পাঠকের উঠে এসেছে আর এক নিষ্কলুষ প্রেম কাহিনী। বিকলাঙ্গ মূল গায়েন বলরাম লক্ষ্মীদাসীর হৃদয় জুড়ে আছে সেই অনুভূতি পাঠকের হৃদয়েও ছড়িয়ে পড়ে। আশ্চর্য দক্ষতায়, সহজ গ্রাম্য কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বলরাম-লক্ষ্মীদাসীর হৃদয়ের প্রেমমাধুর্য চিত্রায়িত করেছেন। বলরামের কথার জালে বন্দী লেখক। তার সুরের নদীতে তিনি ডুব তিনি তাঁর লজ্জাও সঙ্কোচ ধুয়ে তাদেরই একজন হয়ে উঠেছেন। তার মন বাউল হয়ে উঠল, তিনি গানে ধরা দিলেন।

'আমার মন বলে চাই চাই গো —
যারে নাহি পাই গো।
সকল পাওয়ার মাঝে
আমার মনে বেদন বাজে —
নাই নাই নাই গো।' *(পৃ. ১১৭, ঐ)*

বলরাম-লক্ষ্মীদাসী গান শুনে মুগ্ধ। শুধু তারাই নয়, আশ্রমের আরও অনেকেই সুরে মেতেছে। তারা হাতজোড় করে আরও গাইতে অনুরোধ করল। রবীন্দ্রনাথের গান যে এরকম গ্রাম্য-অশিক্ষিত মানুষদের ভাসিয়ে দিতে পারে তা তিনি কোনদিন ভাবেন নি। গান শুনে লক্ষ্মীদাসীকে বলরাম হাসতে হাসতে বলেছিল 'ভাব, মূল গায়েন করবা কিনা?' *(পৃ. ১১৭, ঐ)*

আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় বলরাম সঙ্গ ছাড়ল না। একজনের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে চলল। কোথায়, কার সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে যাচ্ছে সেটা বলল না, শুধু মৃদু হাসল লক্ষ্মীদাসীর দিকে চেয়ে। জ্যোৎস্না আলোকিত পথে তারা চলতে লাগল, লক্ষ্মীদাসী ছুটে এসে সারা গায়ে একখানি কম্বল জড়িয়ে দিল। বিকলাঙ্গ বলরামের প্রতি তার অনুরাগের পরশ জড়িয়ে থাকল জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতার মত। জ্যোৎস্নারাতের আলোকিত মায়াবী

আলোর মতই দেখা করতে যাওয়াটা মায়াময় হয়ে রইল লেখকের কাছে। একটা তাবুর সামনে এসে বলরাম দাঁড়িয়ে পড়ল। হ্যারিকেনের আলোয় দেখতে পেলেন একটি জ্বলন্ত উনুনের কাছে একজন রুটি ভাজছে আর একজন বেলে দিচ্ছে। তারা মুখ ফেরাতেই লেখক চমকে উঠেছিলেন, কানে শুধু চাপা খিলখিল হাসির শব্দ বেজে উঠে কুহক সৃষ্টি করেছিল। আগুনের তাপে হাসিতপ্ত লাল মুখ শ্যামাকে বলরাম বলল "রোজ রোজ বলেন, লুলা সাধু তোমার সেই বাবু কোথায়? একদিন ডেইকে নিয়া আস। আজ ধইরে নিয়া আসলাম।" *(পৃ. ১১৮, ঐ)*

লেখক কালকূটকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে বলরাম শ্যামাদের তাবুতে নিয়ে এসেছে। বলরামের উপর রাগ হলেও কিছুই বলতে পারেন না, বলরাম লোকলজ্জার ধার ধারে না। সে মনের আনন্দে হৃদয়ের গতিতে চলে। শ্যামা চটুল চোখে বিস্ময় নিয়ে হেসে উঠেছিল। সেই হাসি শুনে 'সেদিন' বিদায় মুহূর্তের হাসির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। 'সে হাসি শুনেছিলাম পথে পথে, এক বন্দী বিহঙ্গের ঝাপটা খাওয়া শব্দ শুনেছিলাম তখন লৌহ পিঞ্জরে। আর এখন, দুর্গকোলে, এই যমুনাতীরের জ্যোৎস্নাভরা হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রি। এ রাত্রি যেন বদ্ধজলার নিস্তরঙ্গ জল। তাতে যেন হাসিতে আচমকা বায়ু শিহরণের কম্পন লাগল। এ যেন আরো রুদ্ধশ্বাস। ব্যথা ও যন্ত্রণা এক নতুন হাসির কুহকজাল ঘিরে আনন্দময়ের রূপে ফুটে উঠতে চাইছে।' *(পৃ. ১১৮, ঐ)*

এ অভিশপ্ত জীবন ও হৃদয়ের তিক্ততায় সেদিন শ্যামা লেখকের মাথা হেঁট করে দিতে চেয়েছিল। বিচিত্ররূপ ধরে লেখকের রিক্সার সঙ্গে সঙ্গে টাঙায় করে চলছিল। চলতে চলতেই কথা হচ্ছিল শ্যামার সঙ্গে। লোমচর্মসার অশীতিপর বৃদ্ধ শ্যামার বাবা নয়, স্বামী! একথা বলে ঘনকালো মেঘপূর্ণ মুখে উদাসী হয়েছিল, এই প্রসঙ্গ আগেই আলোচনা করা হয়েছে। শ্যামার সতীন কি হয়েছে জানতে চাওয়ায় শ্যামা মুহূর্তে মুখভঙ্গি বদলে ঠোঁট বাঁকিয়ে, চোখে কটাক্ষ হেনে গ্রাম্য মেয়ের মত ন্যাকা হয়ে বলে উঠেছিল 'দেখ না, খুঁটিয়ে আমাকে কত কথা জিজ্ঞেস করছে। ও কে, সে কে, কী জাত? কেন রে বাবা?' *(পৃ. ৫১, ঐ)* তীব্র বিদ্রূপে হেসে উঠেছিল। তাঁর এই চকিত বহুরূপিনী রূপে লেখক কালকূট একটুও ব্যথিত হননি। তিনিও নীরবে হেসেছিলেন। বুঝেছিলেন শ্যামার মন। তিনি তাঁর অন্তর্গহীনে ডুব দিয়েছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে সে এমন আচরণ করেছে। নিজের অসহায় বন্দীযন্ত্রণা সে হঠাৎই প্রকাশ ফেলে বুঝতে পেরেছে তার মর্যাদাহানি হয়েছে তাই সেই অপমানের জ্বলুনিটুকু লেখক কালকূটের উপর রেখে দিয়েছিল। লেখক তো কালকূট, তিনি সেই তীব্র বিষের জ্বালায় জ্বলেই অমৃতের পরশ চেয়েছেন। তিনি তাঁর বিষময় শরীরে শ্যামার দেওয়া বিষ ধারণ করে অমৃতের পরশে নিজেকে বিষমুক্ত করতে চেয়েছেন। লক্ষ রূপের মধ্যে এই বৈচিত্র্যকেই তিনি দেখতে চেয়েছেন, জানতে চেয়েছেন।

শ্যামাদের তাবুতে শ্যামার হাসি শুনে মনে হয়েছিল এক তীব্র বিদ্রূপের ধ্বনি অনুরণিত

হচ্ছে। তার দিকে ফিরে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন বাঁকা চোখে অনুসন্ধিৎসা। 'ঠোঁটের কোণের হাসিটুকু কেন যেন নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে নি, বরং হঠাৎ লজ্জায় আর খরহাসির তীব্রতাকে একটু করুণ করে তুলেছে। কাচা সোনার অলঙ্কার ঝিকমিক করছে তার হাতে গলায়। তার অপলক চোখের দৃষ্টিটা এমন করে বিঁধে রইল আমার সারা মুখ জুড়ে যে মুখ ফেরাতেও পারি নে।' *(পৃ: ১১৮, ঐ)* এমনি করে বলরাম শ্যামার সঙ্গে আবার দেখা করিয়ে দিয়েছিল। লক্ষ্মীদাসীর দিকে চেয়ে তাই বলরাম হেসেছিল, লেখকের মনকে তৈরি করেছিল। 'যাইয়া দেখবেন' বলে।

পূর্ণিমার আলোয় আলোকিত কেল্লার পথের প্রাচীরের কোলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আলো আঁধারির একটা কুহকী মায়া ছড়িয়ে দিয়েছেন তার লেখনীতে, তার লেখনীর মায়াজালে আবিষ্ট পাঠককুল। শ্যামার হৃদয়ের বেদনা পাঠকের হৃদয়কে বেদনার্ত করে। চটুল হাসি, বাঁকা চোখের কটাক্ষ, কৌতুকপূর্ণ কথার সঙ্গে সঙ্গে বাঁকা কথার ঝিলিক লেখক কালকূট বুঝতে পারেন কিন্তু ডেকে বসিয়ে যদি সে মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তাহলে তার মনের গতি কিভাবে বুঝবেন? তাবুতে সতীন, স্বামী নেই, শ্যামার সঙ্গে কথায় বসতে গিয়ে কোন বেদনাদায়ক অপমানের সম্মুখীন হতে হবে না তো, এই চিন্তা লেখককে ঘিরে ধরল। পথে বেরিয়ে লজ্জা, ঘেন্না, ভয় এই তিনের বালাই রাখবেন না ভেবেছিলেন, কিন্তু যে সংস্কার আছে রক্তধারায়, তাকে ছাড়ব বললেও সহজে ছাড়া যায় না। লেখক তাঁর গভীর অনুভূতি দিয়ে সামাজিক বন্ধনের দিকগুলো নির্দেশ করেছেন। বলরাম গান গেয়ে বলে দিল যে, কত কথা ছিল মনে, আজ মনের বাইরে এল না, সখি, সময় বয়ে যায়, বুক ফেটে মুখ খুলল না। শ্যামা নিজেই কৈফিয়েত দিল যে সে লুলাসাইজীকে জিজ্ঞাসা করেছিল লেখকের সঙ্গে তার দেখা হয় কিনা।

চলে আসার সময় শ্যামা জানতে চেয়েছিল 'সেদিন রাগ' করেছিল কি না। লেখক কালকূট বলেছিলেন যে তিনি রাগ করেন নি! 'সত্যি? সচ বলছ?' *(পৃ: ১১৯, ঐ)* সংশয়াকুল হাসি ছিল তার জিজ্ঞাসার মধ্যে। লেখকের কথা শুনে কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠেছিল।

'কাল এস কিন্তু এই সময়?' *(পৃ: ১১৯, ঐ)* বিষণ্ণ হেসে অনুরোধ করেছিল শ্যামা।

জবাব না দিয়ে বলরামের সঙ্গে চলে এসেছিলেন। কিন্তু মনটা লেখকের চম্‌কে গিয়েছিল। লেখক বলেছেন মন যে পথের ধারে দোলানো আয়নার মত যেখানে লক্ষ চমক প্রতিবিম্বিত হয়। শ্যামা বিহারের এক ভুঁইয়ার পরিবারের অশীতিপর বৃদ্ধের যুবতী বউ। তার মনের আবেগ, ইচ্ছা, ভাললাগা, ভালবাসা সব বন্দী হয়ে আছে সমাজের কঠিন বন্ধনে। তার উচ্ছলতা, চটুলতা, বাঁকা চোখে কটাক্ষ, প্রগলভতা অনেকের চোখে অসহনীয়, অভব্য বলে মনে হতে পারে। নিজ সমাজ পরিবেশে ইচ্ছাগুলো খাঁচায় বন্দী হয়েছিল, সেই ইচ্ছাগুলো সমাজজীবনের বাইরে লক্ষ লোকের

মেলায় এসে ডানা মেলতে চেয়েছিল। লক্ষ রূপের হাটে নিয়মের অনুশাসন থাকে না, সেইখানে আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। লেখক বলেছেন 'শ্যামা স্বৈরিণী নয়। এক কুলীন ভুঁইহার ঘরের অশীতিপর বৃদ্ধের যুবতী বউ! হৃদয়ে তার বহু বজ্রের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ রয়েছে চাপা। উৎসবের রাত্রে তা খোলা আকাশের বুকে বহু রঙের আলোর ঝাড়ে হাউয়ের মত জ্বলে উঠতে চায়। চোখ ও মন ভরে দিতে চায়। উৎসবের বাসর রচনা করতে চায় সর্বত্র, জীবনের বিড়ম্বনার অন্ধকারে। তাই এ সমাজের সব পরিবেশেই সে ভিন্ন ও বিচিত্র।' *(পৃ: ১১৯, ঐ)*

পরের দিন শ্যামাদের ওখানে যাবার ইচ্ছা থাকলেও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ইচ্ছা থাকলেও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যমুনার ওপর দিয়ে আসার সময়ে কালবৈশাখীর মত চকিতে মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকে যমুনা ঝলকে উঠেছিল। ঝড়ো বাতাসে নৌকা দুলে উঠেছিল। নৌকা পাড়ে ঠেকবার আগে বৃষ্টি নেমে এসেছিল, অতএব আর যাওয়া হয় নি। এরপরে তীব্র শীতে তিনদিন কোথাও যান নি তিনি। প্যারেড গ্রাউন্ডে আগুন লেগেছে শুনে বলরামদের আশ্রমে ছুটে গিয়েছিলেন। ওদের তাবু অক্ষতই ছিল। বলরাম তার ঠাকুরকে দেখে খুশি, তিনি যে না এসে পারবেন না এটা বলরাম যেন জানতই। বলরাম লেখক কালকূটকে আরও বলেছে, শ্যামা এসে বারে বারে খোঁজ নিয়ে গেছে। 'কই লুলাসাধুজী, তোমার বাবুজী তো আইসলেন না? মনে মনে কইছি, রয়েন গো ঠাকুরুন, সময় হইলে আপনি আইসবেন।' *(পৃ: ১২১, ঐ)*

লেখক শ্যামার জন্য বেদনাবোধ করেন। মন ব্যাকুল হয়। 'শ্যামার নিষ্পাপ হৃদয়লীলা দু'দিনের জন্য সুর তুলতে চেয়েছিল। তার সেই বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে পারিনি, আমার সমাজ বোধের জন্য'। *(পৃ: ১২১, ঐ)* বলরাম আরও বলল যে শ্যামাদের চারজনকে নিয়ে বলরাম লেখকের তাবুতে গিয়েছিল। লেখক ব্রজবালা মুখে শুনেছিলেন কারা যেন তাঁকে ডাকতে এসেছিল। আর বেশি কিছু ব্রজবালা বলতে পারে নি। ওর মনখারাপ ছিল, প্রহ্লাদ ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় শয্যা নিয়েছিল। বলরাম আবার শ্যামাদের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু সমাজবন্ধন পায়ে বেড়ি দিয়েছিল। লক্ষ্মীদাসী ছুটে এসে বলেছিল 'ঠাকুর আপনে এট্টু বারণ কইরে যান তারে, যেন এমনি করে বাইরে না বইসে থাকে। আবার মেলায় মানুষ বাড়তেছে। কাইলকে কার পায়ের তলায় পইড়ে মাথায় চোট খাইছে। আপনে এট্টু কন, আপনার কথা শুইনবে। কিছু কইলে খালি এক কথা, নক্কীদাসী! মন যে মানে না গো!' *(পৃ: ১২১, ঐ)*

নুলো বলরামের জন্য লক্ষ্মীদাসীর কেঁদে ভাসা লেখককে আপ্লুত করে, কিন্তু বলরাম নির্বিকার। বেন্দাবনের বাঁশিতে বাজছে তার নাম, সে ঘরে বসে থাকতে পারবে না। জীবন সংশয় করে আখড়ার মূল গায়েন মেলার পথে পথে হেঁচড়ে হেঁচড়ে ঘুরে বেড়ায়। সেও তো লেখকের মতোই দেখব বলে এসেছে। ঘরে বসে থাকবে কেন? লক্ষ্মীদাসীকেও ডাক দেয় চলার পথে সাথী

হওয়ার জন্য। লেখকও ওর চলার মধ্য দিয়ে নিজেকে দেখলেন। লক্ষ রূপের হাটে বলরাম লেখকের চোখে অনন্য হয়ে ধরা দেয়। লক্ষ্মীদাসী তার গানে পাগল, প্রেমে পাগল হয়ে বারে বারে নতুনরূপে লেখকের চোখে ধরা দেয়। বলরাম নিজে ছুটে বেড়ায় মেলায়, নিষেধ মানে না লক্ষ্মীদাসীর কিন্তু তার প্রেমময় মন প্রিয়জনের হৃদয়ের ব্যথা, আকুতি বোঝে। তাই শ্যামার বেদনাকে সে অগ্রাহ্য করতে পারে না। অমাবস্যার আগে লেখককে কিছু না জানিয়ে সে ডেকে নিয়ে যায় গঙ্গার তীরে। লাল টকটকে শাড়ী পড়ে পায়ের কাছে কলসী রেখে সে দাঁড়িয়েছিল। ভেজা জামাকাপড় কলসীর মুখে রাখা। অভিমানে মুখ ফিরিয়েছিল। শ্যামার হয়ে লেখককে বলরাম বলে কেন্দে কেন্দে যে আনন্দ পেতে চায় তাকে সে ফেরাবে কেমন করে? 'এই যমুনা পারে আপনারা দেখা করেন, কেন্দে ফিরে যান। আমি তাই দেখি। দেইখে ফিরে যাইব। সেই আমার আনন্দ। পথ চলার ওই তো মজা। ওই আনন্দটুকুই তার লাভ।' *(পৃ: ১২২, ঐ)*

পথ চলার আনন্দ পেতেই তো কালকূটও এসেছেন এই মহামেলায়। এক গ্রাম্য মূল গায়েনের কাছে পথ চলার আনন্দের হদিশ পেয়ে যান বলরামের কথার কাছে লেখক দীন। প্রেমকে বেদনার তুলতে এঁকেছেন লেখক কালকূট। শ্যামার প্রেম কোনও দিশা পাবে না এটা নুলো বলরাম জানে। তার হৃদয় রাধাকৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা। বাঁশি শুনে রাইঠাকুরণও যে ছুটে ছুটে যমুনা পাড়ে এসেছে, দুঃখকে বলরাম জয় করতে জানে, তাইতো লেখককে নিয়ে যমুনা পাড়ে। সেই যুগান্তরের প্রেমকে দুঃখের মধ্যে বরণ করতে।

লেখক কালকূট নিজ বক্তব্য তার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। যেখানে তার সংশয়, দ্বিধা, অস্পষ্টতা সেটাও তিনি চরিত্রগুলোর মাধ্যমে বলিয়ে নিয়েছেন। আবার নিজ বক্তব্যকে উচিত অনুচিত বোধে খণ্ডনও করেছেন। লেখক প্রথমে বলরামের উপর রুষ্ট হলেও পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নিয়ে অভিমানী শ্যামার দিকে এগিয়ে গেছেন। 'শ্যামা ফিরে তাকাল। কিন্তু এ কী! এতদিন সে অন্য শাড়ি পরে রাঙা হাসি হেসেছে। আজ রাঙা শাড়ি পরে এসেছে, কিন্তু সারা মুখে ব্যথা-নীল যমুনার স্থির ও গম্ভীর ছায়া। ভেজা চুল এলানো। বাঁকা চোখে তার অভিমান-ক্ষুব্ধ তিরস্কার। তাকিয়ে প্রথমে শুধু বলল, 'মিথ্যুক!' ওইটুকু বলতেই তার গলায় যেন অনেক জোর দিতে হল' *(পৃ: ১২২, ঐ)*

লেখক কালকূট শ্যামার অভিযোগ জেনে নিয়ে হেসে ফেলেছিলেন। শ্যামার ভয়ে যে তাবু থেকে পালান নি সে অভিযোগ খণ্ডনও করলেন। কিন্তু অভিমানে আহত শ্যামা জানাল যে, সে খারাপ অবাওরত বলে লেখক তাকে কথা দিয়েও তার সঙ্গে দেখা করেন নি। 'তুমি এসেছ, চলে যাবে। আমিও চলে যাব। মানুষের সঙ্গে কি মানুষের মিতালি হয় না?' *(পৃ: ১২২, ঐ)* শ্যামাকে 'মিত্রাণী' করতে কদিনের জন্য সেই শুরু হল হৃদয়ের লেনদেন। বলরাম একটা হিন্দী গান শিখেছিল

মহামেলায় এসে, সেটাই গেয়ে দিল

'শুন শুন রাধে, মৎ যাই হো যমুনাকে তীর
বেন্দাবনকে কুঞ্জ গলিমে কর পকড়ত মরি চীর।' *(পৃ: ১২৩, ঐ)*

গানের অর্থ বুঝতে শ্যামার অসুবিধা হয় নি। শ্যামা বলরাম সহ লেখক কালকূটকে নিয়ে গেল ওদের তাবুতে। তাবুর পরিবেশ বদলে গেছে। লেখককে দেখে কোন বিকার হল না ওদের মধ্যে। প্রৌঢ়া হেসে বলল 'লুলা সাধুজীর সঙ্গে তোমার আশ্রমে গিয়েছিলাম। কদ্দিন আছ আর?' *(পৃ: ১২৩, ঐ)* বৃদ্ধ স্বামী সহাস্য বদনে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। "বুড়ো বলল, 'আমার ছোট বউ তোমার কথা খুব বলে।' তারপর গুরুগম্ভীর গলায় বলল, 'ভগবান তোমার ভাল করুন।' বলে বৃদ্ধ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দূর আকাশের দিকে।" *(পৃ: ১২৩, ঐ)*

লক্ষরূপের মাঝে এ আর একরূপ। ভিন্ন পরিবেশে শ্যামার বন্ধন মুক্তি ঘটেছে। শ্যামার যন্ত্রণাকে ওর পরিবার বুঝেছে। তাই মহামিলন ক্ষেত্রে এসে সামাজিক নিষেধাজ্ঞার বেড়ি গেছে টুটে। শ্যামার বেদনাকে লেখক যুগান্তরের রাধার বেদনার সঙ্গে একাকার করে দিয়েছেন। বিচ্ছেদ অনিবার্য, সবই যমুনার কারসাজি। লেখকের সঙ্গে শ্যামার সম্পর্ক মধুর হয়েছে। এরপরে দেখা হয়েছে প্রায় প্রতিদিনই। শুধু ঘাটে নয়, কখনও নাগাবাসুকির মন্দিরে, কখনও দাবাগঞ্জের বেণীমাধবের স্থানে, কখনও ওপারে অড়হর ক্ষেতের ধারে। সঙ্গী সেই বলরাম রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে হৃদয়ে অনুভব করতে চায় সে। মাঝে মাঝে প্রৌঢ়া, প্রেমবতীয়া এরাও সঙ্গী হয়েছে। বলরাম এই দু'জনের প্রেমসঙ্গী, সে তো বৃন্দাদ্যুতি। এ'কালের সম্পর্ককে সেই জোড়া দিয়েছে বারে বারে। আর তার প্রেমে মজেছে লক্ষ্মীদাসী। তাকে পাগলের মত খুঁজতে বারে বারে ছুটে এসেছে লক্ষ্মীদাসী। লেখকও শ্যামার সঙ্গিনী হয়েছে সে-ও। লক্ষরূপের হাটে রূপসন্ধানী লেখক কালকূট বৈচিত্রের সন্ধানে হৃদয়ে সঞ্চিত করেছেন অমৃত রূপরস। তাঁর হৃদিকুম্ভ অমৃতরসে ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়ে উঠছে।

মেলার শেষদিকে অর্থাৎ অমাবস্যার আগের দিনে যমুনার ঘাটে শ্যামার সঙ্গে দেখা, সঙ্গে বলরাম। বিদায়ের সুর বাজছে হৃদয়ে। রুদ্ধ গলায় শ্যামা জানতে চেয়েছিল এই মেলার কথা তাঁর মনে থাকবে কিনা। লেখকের 'থাকবে' উত্তরে শ্যামা তাঁকে 'মিথ্যুক' বলেছিল। লেখক আপন হৃদয়তলে ডুব দিয়ে বলেছেন, তিনি মিথ্যুক নন, তার বুক ও মন ভরে গেছে, কিসে ভরেছে তা জানেন না। বলরামের পাওনা শ্যামা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল পরদিন ভোরে, লেখক কালকূটের সামনেই সেটি সে দেবে বলেছিল। কিন্তু পরদিন ভোরে লেখক যেতে পারেন নি।

পুণ্যস্নানে অনেকেই গেছে, আশ্রম ফাঁকা। বেলা করে উঠে বাইরে আসতেই সবার আচরণে একটা ভীতসন্ত্রস্তভাব লক্ষ্য করলেন। চারিদিকে মানুষ কাঁদতে কাঁদতে, চিৎকার করতে করতে ছুটে চলেছে। কেউ উত্তর দিচ্ছে না। তাবুর বাইরে এসে শুনতে পেলেন সাধুতে-মানুষে দলে পিষে

প্যারেড গ্রাউন্ডে হনুমানজীর মন্দিরের কাছে মৃতদেহের স্তূপ হয়ে আছে। বেলা দশটায় বেরিয়ে একটায় সাঁকো পার হয়ে বলরাম, লক্ষ্মীদাসী, শ্যামা এদের খুঁজে পেলেন না। বলরামদের তাবু তছনছ। "চারিদিকে শুধু মৃতদেহের স্তূপ। তাকে ঘিরে রয়েছে পুলিশ-বাহিনী। অপরিচিত নারী ও পুরুষ কণ্ঠ লগ্ন হয়ে পিষে মরেছে। শিশু চেপটে লেপটে রয়েছে মায়ের বুকে। যে দেহ ও রূপ নিয়ে অনেক লজ্জা, তা আজ ঠাণ্ডা, স্পন্দনহীন স্তূপীকৃত।" *(পৃ: ১২৩, ঐ)* সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় সে স্তূপে একটিও সাধু নেই! কে একজন চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলছে 'সব মাতাল সাধুরা এদের খুন করেছে, খুন।' *(পৃ: ১২৩, ঐ)* মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ছে। বিষণ্ণ মন নিয়ে আশ্রমের তাবুতে এসে দেখলেন অনেকেরই হাত পা ভাঙা। সবাই পাগলের মতো পালানোর জন্য ব্যস্ত। সন্ধ্যাবেলায় 'শত শত চিতার আগুন লকলকিয়ে উঠল প্রয়াগের আকাশে।' *(পৃ: ১২৩, ঐ)* মৃত্যুর বিভীষিকায় সবাই আতঙ্কিত। লেখকের বিষবাহী প্রাণ অমৃতরসের পরশ পেল তার হৃদয়? মৃত্যুমিছিলে লেখক বেদনার্ত। 'কার প্রতিশোধ এমন রূপ নিল, কার প্রতিদানের এমন ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখা দিল!' *(পৃ: ১২৩, ঐ)* লেখক সন্তর্পণে এ জিজ্ঞাসা পাঠকের মনে তুলে দিয়েছেন। 'গাহে অচিন পাখি' তে লেখক বলেছেন এক সাধুজীর কাছে তিনি শুনেছেন 'এবারের মেলায় নাগা সাধুদের ঝুসির চর থেকে গঙ্গার শহরের পারে প্রবেশ নিষেধ। প্রবেশ করতে হলে নগ্নতাকে আবরণ দিতে হবে। কিন্তু নাগা সাধুরা আবরণের স্বীকৃতি কখনোই দিতে পারে না, তারা সরকারের নির্দেশ শুনে ভীষণ রেগে আছে।' *(পৃ: ৩৫, কালকূট রচনা সমগ্র, ১ম খণ্ড, কালকূট নিতাই বসু সম্পাদিত সংস্করণ)* সেই সাধুজী ভুল বলেন নি তার স্বপক্ষে লেখক কালকূট বলেছেন, 'জওহরলাল নেহরু কল্যাণী কংগ্রেসে যাবার পথে মেলা দর্শনে এলেন। আচমন করলেন গঙ্গায়। সেতু পেরিয়ে যেই নাগা সাধুদের আখড়ায় ঢুকলেন, তৎক্ষণাৎ সকলে যে যার ঝুপড়িতে ঢুকে ঝাঁপ বন্ধ করে দিলেন। জওহরলাল আখড়ার উঠোনে দাঁড়িয়ে তা দেখলেন, ফিরে গেলেন। নাগা সাধুরা প্রতিবাদ করলেন, তাঁদের অধিকার হননের।" *(পৃ: ৩৫, ঐ)*

'গাহে অচিন পাখি'তেই তিনি বলেছেন "হেসে কেঁদে ধন্য হলাম, আর শেষদিনটিতে দাঁড়িয়ে দেখলাম সেই মহাশ্মশানের ছবি। পুণ্য স্নানের লগ্ন মুহূর্তে যাওয়া আসার পথের ভুলে, বিশৃঙ্খলায় শত শত মানুষ, নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ পিষ্ট হয়ে গেল। তারপরে খুঁজে পাই নি অনেক চেনা মুখ। কুরুক্ষেত্র রণভূমিতে যে কান্না ধ্বনিত হয়েছিল তা কি এই শোকার্ত, আপনজন হারাদের হাহাকারের মতোই? যে বিশাল চিতার আগুন প্রয়াগের আকাশ স্পর্শ করলো, মহাকাব্যের শ্মশানভূমির চিত্র কি এর থেকেও মর্মন্তুদ হয়েছিল?" *(পৃ: ৩৫, ঐ)* লেখক কালকূট এই কাহিনীর শত শত মানুষের মৃত্যু ও চিতার আগুনের আকাশ স্পর্শকে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। সে'কালের মহাশ্মশানের বেদনাবোধকে একালের শ্মশানভূমিতে দাঁড়িয়ে

উপলব্ধি করেছেন, শুধু নিজেই অনুভব করেননি পাঠকহৃদয়ে সেই বেদনাবোধকে জাগ্রত করেছেন। এইখানেই লেখকের স্বকীয়তা, আপন বৈশিষ্ট্যে তিনি প্রস্ফুটিত।

আশ্রম ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় শুধু ব্রজবালা লেখক কালকূটকে ডাকতে এসেছিল, যাওয়ার জন্য। ঝোলা কাঁধে তাদের সঙ্গে রওয়ানা দিয়েছিলেন কিন্তু প্যারেড গ্রাউন্ডে এসে আর স্থির থাকতে পারেন নি, আবার ছুটে গিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন লক্ষ্মীদাসীকে। কয়েকজন ভীতসন্ত্রস্ত বৈষ্ণবকে নিয়ে বিষণ্ণ মুখে গাছতলায় বসে আছে। বলরামকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু লক্ষ্মীদাসীর শান্ত গলার আওয়াজ 'কতবার, কতবার বারণ করেছি ঠাকুর। কিন্তন সে যে যাওনের জন্য আসছিল, তারে আমি ফিরাইয়া নিয়া যাইবে কেমনে?' *(পৃ: ১২৪, কালকূট রচনা সমগ্র, অমৃতকুম্ভের সন্ধানে সংস্করণ)* একজন বৈষ্ণব চিতার দিকে দেখিয়ে বলেছিল 'বলরাম ওইখানেই আছে।' *(পৃ: ১২৪, ঐ)*

'বলরাম নেই' শুনে লেখকের হৃদয়শূন্য হয়ে গেল। 'বলরাম তার কথার ফুলবাগান নিয়ে এখানে এসেছিল। তার মালিনী ছিল লক্ষ্মীদাসী। এখন বাগান দগ্ধ হচ্ছে। এইখানে বসে আছে।' *(পৃ: ১২৪, ঐ)* লেখক কালকূট চলে যাওয়ার জন্য ডাক দিয়েছিলেন কিন্তু লক্ষ্মীদাসী শুধু বলল 'চিতা নিভুক ঠাকুর, পরে যাইব।' *(পৃ: ১২৪, ঐ)* অধিক রাতে লক্ষ্মীদাসীর কাছে কালকূটের 'ওনার' অর্থাৎ শ্যামাদের কথা শুনে ভেতরটা অস্থির হয়ে উঠেছিল। 'ওনারে দেখি নাই। ওনার সতীনেরে দেখেছি ঠাকুর, বুক থাপড়াইয়ে কানতেছিল। কিন্তন কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি নাই।' *(পৃ: ১২৪, ঐ)* কথাটা শুনেই তার ভেতর তোলপাড় হয়ে গেল। কিন্তু মনের শঙ্কা প্রকাশ করতে পারলেন না। পরদিন সকালেও চিতার আগুন নেভেনি। কিন্তু লক্ষ্মীদাসীর দলসহ আরও অনেকের মতই লেখককেও ফেরার ট্রেন ধরতেই হল। সেখানেই দেখা হল শ্যামাদের সঙ্গে। প্রৌঢ়া ও শ্যামার মুখ দুটি সাদা কাপড়ে ঢাকা। ট্রেনে ওড়না খসে যেতে শ্যামাকে দেখতে পেয়েছিলেন। চোখেমুখে ক্লান্তির ও বেদনার ছাপ ছিল কিন্তু কালকূটের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল সুখের একটি ছাপ পড়েছে শ্যামার মুখে যেটা শ্যামার বৈধব্যের যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে দিয়েছে।

পাটনায় নেমে যাওয়ার আগে শ্যামা জানিয়েছিল বলরামকে সে একটি আংটি দিয়েছিল কালকূটের হয়ে। কালকূটকে সে বলেছিল 'তুমি নিষ্ঠুর'। শ্যামা যমুনাপারের ওই ঘাটে বসে অনেকবার ভেবেছে তাদের সম্পর্ক নিয়ে। লেখক নির্বিকার। কিন্তু শ্যামা তার কথা বলেছে দ্বিধাহীন চিত্তে "অনেক কিছু। যমুনার ঘাটে আর আমার মনে রয়েছে তা। এই প্রথম আর ...' চুপ করে আবার বলল 'এই শ্যামাকে, নতুন বিধবাকে তোমার মনে থাকবে?' 'থাকবে!' সে আবার আমাকে বলল, 'মিথ্যুক! তুমি বড় মিথ্যুক!' বলতে বলতে তার গলা রুদ্ধ হল।" *(পৃ: ১২৪, ঐ)* শ্যামাকে মনে রাখবে বললেও কালকূট তাকে মনে রাখবে না। এই কথা বলে ভালোলাগার

ভালবাসার রেশ ছাড়িয়ে তার মিত্রাণী চলে গেল। লক্ষ্মীদাসীও বর্ধমানে নেমে গেল। বলরামের গুরু সে, মিষ্টি সুরে চোখ বুজে গুনগুন করতে লাগল 'মনের আগুন কেউ দেখল না। তোমার বাঁশির সুরে বাতাস আগুন ....।' *(পৃ: ১২৫, ঐ)* দু'চোখে জলের ধারা। লেখক বলেছেন মন্দিরে রাধারাণী মূল গায়েনের অভাবে নিজেই কেঁদে কেঁদে গাইছে।

শ্যামা ও লক্ষ্মীদাসী দুই রাধারাণীকে বেদনার তুলিতে চিত্রকথায় এঁকেছেন। শ্যামার প্রেম পরিপূর্ণতা পায় নি। সমাজজীবনের বাইরে মহামেলায় শুধু ক'দিনের জন্য তার হৃদয়তন্ত্রীতে মুক্তির সুর বেজেছিল। লেখকের হয়ে বলরামকে তার প্রীতি উপহার আংটি মেলাতেই চিতার আগুনে ভস্ম হয়ে গেছে। স্মৃতি আঁকড়ে বেশিদিন থাকা যায় না সেটাই লেখক প্রতীকী হিসাবে এনেছেন তার কাহিনীতে। শ্যামা ফিরে যায় তাঁর সামাজিক গণ্ডিতে, লেখকও তাই। আর লক্ষ্মীদাসী শূন্য হৃদয়ে ফিরে আসে আখড়ায়, বলরামের গানই তার সম্বল। শূন্য হৃদয়ে মনে অশৌচ নিয়ে ফিরে এলেন লেখক কালকূট। এই হল কাহিনী। কালকূট কুম্ভমেলায় গিয়েছিলেন অমৃতের সাধ পেতে। অমৃতসন্ধানী কালকূট লক্ষ মানুষের রূপের ফেরে মেলায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। যেখানে যা দেখেছেন তার রূপপিয়াসী মন তাই পান করেছে। মেলায় যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষের আগমন, 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'র এই লেখনীতেও উঠে এসেছে ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন রূপে। তাদের নিয়ে লেখা চিত্রকথা এঁকে কাহিনীতে স্থান দিয়ে কাহিনীকে গতিময় করেছেন। ভ্রমণকাহিনী আর ভ্রমণকাহিনীতে দাঁড়িয়ে থাকেনি। কাহিনীর শুরু থেকে প্রকৃতির বর্ণনা, স্থানের বর্ণনা, অতীত ইতিহাসের সঙ্গে সেই সময়ের বিখ্যাত মানুষের ছায়ায় কাহিনী এগিয়ে গেছে। কালকূট লক্ষ রূপের আরশিতে নিজেকে অন্বেষণ করেছেন, তাঁর দেখা মানুষগুলিকে বিশেষ মুহূর্তে যেভাবে পরখ করেছেন সেইভাবে চিত্রিত করে তার কাহিনীকে উপন্যাসে পরিণত করেছেন। প্রাণে তার কালকূটের বিষ। অমৃতের স্পর্শ পাওয়ার লক্ষ মানুষের হৃদি কুম্ভে ডুব দিয়ে অমৃতের রস আস্বাদন করেছেন। সেই অমৃতের পরশ তিনি 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' কালকূটের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তুলে ধরেছেন পাঠককুলের সামনে, ভ্রমণের বর্ণনাতেই পার্থিবজগতের মানবমানবীর জীবনায়নের কথা তুলে ধরে উপন্যাসে উত্তরণ ঘটিয়েছেন।

'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'র পর আলোচনায় আসব **'পণ্যভূমে পুণ্যস্নান'**। 'পণ্যভূমে পুণ্যস্নান'— এটি রচনা করা হয় ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে। এটি প্রথমে ১৯৮৬ 'দেশ' পত্রিকায় শারদীয় সংখ্যায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। পরে ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি শ্রী গৌরকিশোর ঘোষকে উৎসর্গ করা হয়েছে। যে রূপের হাটের ডাক বার বার কালকূটকে ঘরছাড়া করে ডেকে নিয়ে যায় সেই রকমই এক ডাকে সাড়া দিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন সোনপুরে 'হরিহরছত্রে'র মেলায়। এই ডাক পেয়েছিলেন পশুপাখির কাছ থেকে। যে

রূপের হাটে গিয়ে কালকূট এক অন্য বৈচিত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের কার্তিক মাসে লক্ষ্মৌ থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। মেলায় ঘুরে ঘুরে বহুরূপের মধ্য থেকে যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন, তাই তিনি পাঠককুলের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। অনেক বছর পরে ১৯৮৬ যখন তিনি 'সোনপুরে'র মেলায় গিয়েছিলেন তখন যে সকল ঘটনায় আশ্চর্য হয়েছেন, অবাক হয়েছেন সেই সকল ঘটনাই যখন তিনি ১৯৬৮ তে 'পণ্যভূমে পুণ্যস্থানে' নিজেকে সিক্ত করেছেন তখন অত রহস্যময় বলে মনে হয়নি। এত বছরের অভিজ্ঞতায় তাঁর ঝুলি বিচিত্রতায় পূর্ণ। কাহিনীর শুরু হয়েছে প্রায় এক অভিজাত ক্ষয়ে যাওয়া জমিদার পরিবারের ছোট ছোট দৃশ্যায়নের মধ্য দিয়ে।

কালকূট তথা সমরেশ বসু একবার লেখক বন্ধুর আহ্বানে লক্ষ্মৌ গিয়েছিলেন। তার সেই লেখক বন্ধু রেলের কর্মচারী ছিলেন, তবুও তিনি নিজেকে সাহিত্যিক বলে পরিচয় দিতে ভালবাসেন। লক্ষ্মৌর সাহিত্যিক মহলে পরিচিতিও অনেক। তিনি কিছু নামকরা বাঙালী সাহিত্যিকের বই হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়া বেশ কিছু হিন্দি গল্প ও উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। কালকূট লক্ষ্মৌতে থাকাকালীন সময়ে কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গলাভ করেছেন ও সাহিত্যচর্চা করেছেন। এই খ্যাতির দৌলতেই তিনি এলাহাবাদ গিয়েছিলেন। মিত্র প্রকাশন সংস্থার কর্ণধার অলোক মিত্র ও তাঁর বন্ধুটির সঙ্গে কালকূট আবার প্রয়াগের সঙ্গমস্থলে গিয়েছিলেন। এবং বাঁধের ওপরে দাঁড়িয়ে সেই ১৯৫৪-এর কুম্ভমেলার বিয়োগান্তক দৃশ্য মানসচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন। মন আবার বহুজনের বিয়োগব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়েছিল। অমৃতকুম্ভের সন্ধানে তিনি এসেছিলেন, কিন্তু কী নিয়ে ফিরেছিলেন। গরলে তিনি জরজর ছিলেন। অমৃত না গরল তা তিনি বুঝতে পারেননি। সেই রূপের তৃষ্ণায় কালকূট বারে বারে ঘরছাড়া হয়েছেন, যেমন এবার। কালকূটের বন্ধু মজুমদারবাবু তাঁকে রাতের গাড়িতে তুলে দিয়ে ট্রেনের কামরাতেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সিংবাহাদুর সাহেবজীর সঙ্গে ''আমার এই বাঙালি বন্ধুটি পাটনা যাবেন। তাকে তুলে দিতে এসেছি। তা আপনার মত রহিস্ আদমি যখন পেয়েই গেলাম, তখন আর আমার কোনো ভাবনা নেই।'' *(পৃ: ১৪১২, কালকূট রচনা সমগ্র, ৩য় খণ্ড)* সিংসাহেবজী লক্ষ্মৌর খানদানি জমিদার বংশের সন্তান। অত্যন্ত সজ্জন ও উঁচুদরের মানুষ। কালকূট দেখেছেন পুরো পরিবার ও নোকর-নোকরানী, তার নিজস্ব লোকজন নিয়ে এক রাজসিক চালে রেলভ্রমণ করছেন। ফরসীর হুঁকোর ডগার কলকে থেকে অম্বুরি তামাকের গন্ধ ছড়াচ্ছেন। ট্রেনে যেতে যেতে সিংসাহেব সহ তার পুত্র জয়রাজসিং, পত্নী ব্রহ্মদেবী সহ সকলের অমায়িক ব্যবহার, আতিথেয়তা, আপ্যায়ন সবকিছুতে কালকূট অভিভূত। লেখক কালকূট সোন্‌পুর যাচ্ছেন শুনে তারা খুশিতে ডগমগ। পাটনা স্টেশনে নামতে দেননি, নিজেরাই বাঁকাঘাট স্টেশনে নেমে সাইকেল রিকশায় করে গঙ্গার ঘাটে, তারপরে তাদেরই

ভাড়া করা নৌকা করে নদীর ওপারে পহেল্‌জা ঘাটে নিয়ে গেছেন। এবং সেখানে সিংসাহেবজীর দুটি হাতী এসেছে। লছ্‌মীপিয়ারী আর সূরয। এর পিঠেই সোন্‌পুরের দিকে যাত্রা। হাতী দুটিকে দেখেই পুরো সিং পরিবার বিষণ্ণতায় ঢেকে গেল। সবার চোখে জল। হাতীর পিঠে চড়ে যেতে যেতে জেনেছিলেন যে লছমীপিয়ারী ও সূরযকে সোন্‌পুরের মেলায় বিক্রির জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। জমিদারি নেই, অর্থনৈতিক সংকট উপস্থিত হয়েছে। ষাট বছর ধরে এই হাতী দুটি তাদের পরিবারের সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তবুও বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এই দুটো প্রিয়জনকে উপোস করিয়ে রাখার চেয়ে বিক্রি করে দেওয়া অনেক ভালো। দুঃখ হলে স্বস্তি পাবেন। তাদের পরিবারের ''সকলেই শোকে দুঃখে উপোস করে কেবল তাকিয়ে দেখেছে এদের শেষ যাত্রা। আর এটা ঘটছে আমার জমানায়। ভাবুন, কত বড় হতভাগ্য আমি।'' ... *(পৃ: ১৪১২, ঐ)* কালকূটের চোখে উঠে এসেছে সদাহাস্যময়, রসিকপ্রবণ, অমায়িক সিংসাহেবজীর ব্যাথাতুর মনটি। সঙ্গে শোকাহত পুরো পরিবারটিকেও কালকূট সহজাত অনুভূতি দিয়ে বুঝে ফেলেছেন।

সিংবাহাদুর সাহেবের তাবুতে যাওয়ার আগে মজুমদারের বন্ধু রেলকর্মচারী (লোকোমোটিভ ফোরম্যান) বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া সেরে সন্ধ্যায় সিংজীর তাবুতে ফিরে যেতে হয়েছিল। মেলার কদিন সিংজীদের তাবুতেই থাকতে হবে, তাবু থেকেই মেলা দেখতে সুবিধা। কালকূটের থাকার ব্যবস্থা রেল কোয়ার্টারের বদলে সিংজীদের তাবুতেই হয়ে গেল। সিংজীদের আপ্যায়ন, আমন্ত্রণ সম্ভ্রমের সঙ্গে স্বীকার্য।

রেল কোয়ার্টারের সত্যেনবাবুর স্ত্রী কালকূটের পূর্ব পরিচিত। কালকূট আসবেন জেনে অনেক গুণীজন গুণমুগ্ধ এসেছেন। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মি: টি. চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় হল, ওনার কন্যা কুসুমের সঙ্গে। কুসুম এনসিয়েন্ট হিস্টরি নিয়ে এম. এ. পাশ করে পালিভাষা আর বৌদ্ধধর্মের মৌলিকতা নিয়ে গবেষণা করেছে। পিতা-পুত্রী উভয়েই বাংলা জানে, কালকূটের সাহিত্য পড়েছে, বাংলা পত্র-পত্রিকা সবই পড়ে। কালকূট সিংবাহাদুর সাহেবের তাবুতে ফিরে এসেছিলেন সত্যেনবাবু, রুনু ও কুসুম সহ। কালকূটকে তাবুতে ফিরে আসতে দেখে ''আ গেইলান বাবুজী'' বলে আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল পবন নন্দন। চোদ্দ-পনের বছরের একটি কিশোর, নজর কাড়া রূপ, অনেকটা গ্রীক পুরাণের দেবতার মত মুখ। জামার হাট খোলা বুকে ময়লা পৈতেটা দেখা যাচ্ছে। কালকূট যখন ঘুমিয়েছিলেন, তখন আরা থেকে ট্রেনে উঠেছে ও ধীরে ধীরে নিজগুণে সিংবাহাদুর সাহেবের ও পরিবারের সকলের মন জয় করে ওদের সঙ্গে সোন্‌পুরের মেলায় এসেছে। সোন্‌পুরের তাবুতে এসে ধীরে ধীরে পবন নন্দনকে জেনেছেন। ছাপরা অঞ্চলের অধিবাসীদের মত তার কথাবার্তা। বাবা নেই, মা আছে, ''চাচার খিদমদগারি করে'' সংসার চালানোর জন্য। একবছর হল সে ঘরছাড়া। সে তার সম্বন্ধে বলেছিল ''বহু জায়গা ঘুরে

বেড়িয়েছি। আমি দিল্লী পর্যন্ত ঘুরে এসেছি। দরিয়াগঞ্জে একটা হোটেলে, বড় রসুইকরের সাকরেদি করেছি। বান্‌রসে এক পাণ্ডার ঘরে চারমাস আমাকে রেখে দিয়েছিল। পাণ্ডা মিশ্রজীর মতলব ছিল, আমাকেও পাণ্ডা করবে। ওখান থেকে পালিয়ে চুনারে পাথরের গুঁড়ো আর মাটি মিশিয়ে মাল বানানোর কারখানায় কাজ করেছি। মালিক বহুত খাটাতো। ওখান থেকে বড়াবাঁকিতে আবার একটা মিঠাইয়ের দোকানে কাজ করেছিলাম। ত, কী মনে হল সেখান থেকে মেলায় চলে এলাম। দোকানের মালিকটা খারাপ ছিল না। মায়ের কাছে ঘরে যাব শুনে, বকেয়া মাইনে মিটিয়ে দিল।" *(পৃ: ১৪১২, ঐ)* কালকূট নিজেই এর কাহিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি'র তারাপদর সঙ্গে মিল আছে বলেছেন।

তারাপদর সঙ্গে পবন নন্দনের তফাৎ অনেক আছে। জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। খামখেয়ালী, নির্বিকার। খাওয়া, পরা, থাকা, শোওয়া কোন কিছুর প্রতি তার আকর্ষণ নেই। যেমন করেই হোক কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই। বড়দের সঙ্গেই বেশী মেলামেশা বলে জীবনের অনেক গূঢ় তত্ত্বর সে হদিশ পেয়ে যায়। অপ্রিয় কথাও ঘুরিয়ে বলতে জানে না। বিড়ি, ভাং, মদ, গাঁজা কোন কিছুতেই তার বিতৃষ্ণা নেই। এই মেলায় এক বছর আগে ও এসেছিল তাই অনেকের সঙ্গে তার জানাশোনা আছে। যে কোনো পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে জানে। হরিহর মন্দিরের কাছে এই পবন নন্দের সঙ্গে কুসুমের পরিচয় হয়েছিল। কুসুম ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে ওর বিশেষ গুণের পরিচয় পেয়েছিল। মেলায় প্রথম দিনে ঘুরতে যাওয়ার সময়ই পবন নন্দনকে কুসুম লক্ষ্য করেছিল। পবন প্রকাশ্যে কালকূটের সঙ্গে তাঁদের সঙ্গী হয়নি। অথচ কালকূটের অজান্তে পিছে পিছে সঙ্গী হয়েছে। তাই মেলাতে আলো-আঁধারিতে দেখতে পেয়ে ওকে ডেকে নিয়েছিলেন। ওর সঙ্গে দু'একটি কথা বলে কুসুম কালকূটকে জানিয়েছিল যে "আপনি সোন্‌পুরের মেলা শুধু নয়, গোটা বিহার ঘুরতে হলে, ওর চেয়ে ভালো সঙ্গী আর পাবেন না। এ মেলার এমন কিছু নেই, যা ও জানে না।" *(পৃ: ১৪৩৪, ঐ)* কালকূট সিংবাহাদুরজীর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে ঘুরেছেন, ব্রহ্মদেবী জোর করে ধরে নিয়ে পুণ্যস্নানের দিন স্নান করিয়েছেন, হরিশঙ্কর মন্দিরের ভেতরে নিয়ে বিগ্রহ দর্শন করিয়েছেন এটাও যেমন ঘটনা তেমনি পবন নন্দনের সঙ্গে মেলা পরিক্রমা করা সেটাও ঘটনা। পবন নন্দন কালকূটকে সঙ্গে নিয়ে হাতীবাজার, ঘোড়াবাজার, গরু-বাছুর-মহিষ-বলদের বাজার, সওদাগর পট্টি, মীনাবাজার সব ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। কালকূট পবন নন্দনের চোখ দিয়ে মেলার চত্বরের জানা অজানা বহু তথ্য পেয়েছেন। সত্যেনবাবু বলেছেন, "আমাকে অনেকে বলেছে, সোন্‌পুর নাকি পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বড় পশুর মেলা। মানে পশু পাখিই কেবল বেচাকেনা হয়। তা সত্যি নয়। মানুষও বিক্রি হয়।" *(পৃ: ১৪২৮, ঐ)* কুসুমও এর সত্যতা স্বীকার করেছে তবে নিজের চোখে দেখে নিতে বলেছিল। পবন নন্দনের সঙ্গে মীনাবাজারে গিয়ে

দেখেছিলেন, পণ্য শুধু মেয়েরাই — আট-দশ বছরের বালিকা থেকে পঞ্চাশ বছরের মেয়েমানুষ পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। একটা মোষের বলদের গাড়ীতে রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে থাকা নোটেঙ্গি, গঙ্গা-গন্ডকের সঙ্গমস্থল। লালমোহন ওঝার চ্যালাদের ওঝা বানানোর দীক্ষাস্থান সবই ঘুরে ঘুরে দেখায়। কালকূট যতই পবনের সঙ্গে ঘোরেন ততই তাঁর বিস্ময়ের শেষ থাকে না। এইটুকু কিশোর জীবন সম্বন্ধে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা সে অর্জন করেছে। আর কুসুম তাকে কালী মায়ের মন্দির, মন্দিরের ভাস্কর্য, যে মূর্তিগুলো আছে তার পরিচয়, সোন্‌পুরের পুরনো ইতিহাস, ফা-হিয়েন কোন পথে এসেছিলেন, সোন্‌পুর-হাজিপুর কোন প্রজাতন্ত্রের অংশ ছিল লিচ্ছবিদের সঙ্গে অজাতশত্রুর সঙ্গে কেমন সম্পর্ক ছিল, একে একে কালকূটকে জানাতে থাকে। "প্রাচীন ইতিহাসের মাস্টার ডিগ্রি পাওয়া মেয়ের মুখ থেকে, আমার অজানা বৃত্তান্তে মন ছিল বিচরণশীল।" *(পৃ: ১৪৪৮, ঐ)* 'সীডলিংস' বাজার থেকে কুসুম কালকূটকে কুসুমগাছের একটি চারাগাছ দিতে চেয়েছিল কিন্তু দেওয়ার শর্ত ছিল। সতী দেবীর মন্দিরের কাছে গায়ত্রী নদীর দিকে মুখ করে অবগুণ্ঠিতা কুসুম জানিয়েছিল তার ধর্ষিতা হওয়ার কথা। "পাটনাতেই ইউনির্ভাসিটির শেষ বছরে শেষ পরীক্ষার আগেই এক বান্ধবীকে সন্ধ্যার পরে সিভিল লাইনে সাইকেল রিক্সায় পৌঁছে দিতে গিয়েছিল। ক'জন শারীরিক বলপ্রয়োগ করেছিল, ওর মনে নেই। যারা জ্বালাতন করতো, তাদের মধ্যে বছরের পর বছর ফেল করা কিছু বখাটে বড়লোক ছেলে ছিল।" *(পৃ: ১৪৫১, ঐ)* কুসুমের হাসপাতালে জ্ঞান ফিরেছিল কিন্তু ওর বান্ধবীর জ্ঞান ফেরেনি। মামলার তদন্তে কোনোদিনই কোনো অপরাধী ধরা পড়েনি। সেই থেকে কুসুম মরে বেঁচে আছে। কোথাও বিশেষত সোন্‌পুরে সন্ধ্যাবেলায় একা বেরোতে পারে না। শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা অশ্লীল কথা বলে। "বলি যখন হয়েই গেছে তখন এই মাংসে আমাদের দাবী থাকবে না কেন? যাঁরা আপনাকে নিয়ে বৈঠক করতে চান, ঐ যে অধ্যাপক মিশ্র, তাঁর মতো লোকও একথা বলেন।" *(পৃ: ১৪৫১, ঐ)* সে আরও বলেছে, আজ যদি তাকে কেউ গ্রহণ করে, বলির মাংস খাবার জন্যই করবে। তারপরে ফেলে দেবে। কিন্তু সেটাও সে ভাবে না। "কিন্তু একলা জীবন কাটানোও যে কী কঠিন এখানে। অথচ আমি যেখানেই যাবো, সেখানে বাতাসে খবর যাবে, বলির মাংস বলির মাংস ..." *(পৃ: ১৪৫১, ঐ)* একটা গভীর জীবনবোধের কথা লেখক কালকূট কুসুমের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন। দেখিয়েছেন সভ্য সমাজে ভদ্রতার মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কদর্যতা, বীভৎসতাকে। তিনি কুসুমের যন্ত্রণাবোধকে পাঠকহৃদয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন আপন বোধের অনুভূতি দিয়ে। এবং কুসুমের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন নিজ বিশ্বাসের জীবনবোধ। সে বলছে, "পালি ভাষাটা বৌদ্ধধর্মকে জানা বোঝার পক্ষে সবচেয়ে দরকারি। মৌলিকতা খুঁজতে গিয়ে আমি বুঝেছি, জীবন একটি পরিপূর্ণ যন্ত্রণা আর দুঃখের আধার। শেষ পর্যন্ত মুক্তি বা নির্বাণ কিছুই নাই। দুঃখ আর যন্ত্রণাকে ভুলে থাকার জন্য, ব্রহ্মচর্য আর

নির্বাণের তপস্যার স্বপ্নে ও সান্ত্বনায় জীবন কাটিয়ে যাওয়া। আপনি বিশ্বাস করেন না? আপনি জীবনকে কী চোখে দেখেন? মনে হয় উদাসীন আর নিরাসক্ত চোখে। কেন আপনি সংসারের মধ্যে থেকেও সংসারে নাই? *(পৃ: ১৪৫১, ঐ)* লেখক কুসুমের জীবনবৃত্তান্ত জানার পরে ওর এতগুলো জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারেন নি, মনে মনে উপলব্ধ হওয়া যন্ত্রণাকে পাঠকহৃদয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন এইভাবে 'ও কোথায় ভেঙেছে — ভেঙে যাচ্ছে, ওর অবিশ্বাস, কষ্ট যন্ত্রণা যেটুকু বুঝেছি জীবন এখন ওর কাছে মূল্যহীন।' *(পৃ: ১৪৫১, ঐ)* লেখক-কথক কালকূট কুসুমের যন্ত্রণা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। দুঃখ-যন্ত্রণার আধারকে ভেঙে দিয়ে মনের মধ্যে জমে থাকা ভয়কে (গ্রামের ভয়, শহরের ভয়) জয় করতে বলেছিলেন। অন্ধকারের যে আলো আছে সেই আলোতে উদ্ভাসিত হতে বলেছিলেন। ওই সোন্‌পুর-পাটনার ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়ে আনন্দ খুঁজে নিতে বলেছেন।

সোন্‌পুর ছাড়ার আগে কুসুমকে নিয়ে বিভিন্ন আতিথেয়তা ও হাজিপুরে বৈঠক সেরে নিয়েছেন। পবন কালকূটকে না জানিয়ে চলে গেছে। কালকূটের চোখে ও পথিক, কোন বন্ধন তার নেই। কুসুমের ভাললাগাকে, নীরব প্রেমকে কালকূট সম্মান জানিয়েছেন তার দেওয়া কুসুম গাছটি গ্রহণ করতে। গাছটি বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি। তিনি তো মালী নন। প্রেমপাত্র অধরাই।

কাহিনীটি এইরকম — কাহিনীর ভিতর চরিত্রের ঘনঘটায় এই কাহিনী দুরন্ত গতিতে এগিয়ে গেছে। কী ট্রেনের কামরা, কী সিংবাহাদুরজীর তাবু, কী মেলার মাঠ — সব কিছুই একটা অদ্ভুত গতিময়তা লাভ করেছে। কাহিনীর প্রথমেই কালকূট ক্ষয়িষ্ণু জমিদারবর্গের অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে পড়ে নিজেদের কৌলিন্য, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কীভাবে ব্যাহত হচ্ছে। যে পশুমেলায় লক্ষ্মৌর জমিদার বংশধর সিংবাহাদুরজী কিন্তু আসতেন, সেই মেলায় সপরিবারে সপার্ষদ এসেছে। তাদের ৬০ বছর সময় ধরে একসঙ্গে থাকা দুটি হাতী নিয়ে। কালকূটের চোখে পুরো পরিবারের বেদনার চিত্রটি ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে তাদের আতিথেয়তা, মহানুভবতা, রসিকতাবোধ। কালকূটের সঙ্গে সিংবাহাদুরজী ও তার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কটি মিষ্টিমধুর। সিংবাহাদুরজী লেখক কালকূটকে 'মিঠাইচোর' বলেছেন। কেন এই বিশেষ নাম? কৌতুকের ছটা নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা "বাবুজী, দুনিয়ার তামাম মানুষের প্রাণে, কিছু মিঠাই থাকে। মানুষের প্রাণে আরও অনেক কিছুই থাকে। তার মধ্যে মিঠাইও থাকে আপনার প্রাণেও আছে। কিন্তু আপনি মানুষটা পরের প্রাণের মিঠাই চুরি করে খান।" *(পৃ: ১৪২৩, ঐ)*

কালকূট বলেছেন যে, 'আর "মিঠাই চোর" বিশেষণের সম্মানে, স্বার্থপর মনের অন্ধকার কেটে গেল। রূপের হাটের উৎসবের মাত্রায়, কোনোকালেই কি কেবল হেসে বেজেছি? তা সম্ভব হয়নি। সিংবাহাদুরজী জীবনের সত্যটাকে সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন।" *(পৃ: ১৪২৩, ঐ)* এমন কাব্যিক বিশেষণে লেখক কথক মুগ্ধ, কথাটার আসল অর্থ নিশ্চয় 'প্রাণ কাড়ানো' অথচ আখ্যা

'চোর'। ট্রেনের মধ্যে সিংবাহাদুরজী তার অতি নম্র অথচ অভিজাত স্বরে ও ভঙ্গিতে লেখককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "বাবুজীর রাত্রের পান ভোজন কি হয়েছে?" *(পৃ: ১৪১২, ঐ)* এত দেরি পর্যন্ত যে না খেয়ে থাকবেন না, সেটা জানেন, "তবুও জিজ্ঞেস করলাম। রাস্তার কথা কিছুই বলা যায় না। আর আমাদের কিছু খাবার আছে। তবে মজুমদার সাহেবের বন্ধু অতিথি আপনি। উনি কি আর আপনার সেবা না করে ছাড়বেন।" *(পৃ: ১৪১২-১৪১৩, ঐ)*

এইভাবেই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কাহিনী এগিয়ে গেছে। ভারাক্রান্ত মনে সোন্‌পুরে যাচ্ছেন অস্তমিত পূর্বপুরুষের জমিদারি। লেখকের বন্ধু তাঁকে লখনৌয়ের খানদানি ব্যক্তি বলে পরিচয় করিয়ে দিতেই তিনি যেন মরমে মরে গেলেন। দু'হাত জোড় করে বললেন, "সূর্য যখন অস্ত যায়, তখন সবকিছুর ছায়াই লম্বা দেখায়। আপনি আমাকে যেরকম দেখছেন। জানেন তো অন্ধকার নেমে আসছে।" *(পৃ: ১৪১২, ঐ)* দু'চারটি উর্দু শব্দের মিশেল থাকলেও লেখক একটা করুণ সুর ধ্বনিত হতে শুনেছিলেন। এবং তার শোনাটা ঠিকই ছিল। পরে তিনি বলেছিলেন যে ভারি মন খারাপ নিয়ে তাঁরা সোন্‌পুরে যাচ্ছেন। 'গলার স্বর শোনালো নিচু আর বেসুরো ধরনের মোটা, "হাসি মস্‌করা নিয়ে ভুলে থাকবার চেষ্টা করছি, কিন্তু আসলে এবার সোন্‌পুরের মেলায়—" *(পৃ: ১৪১৫, ঐ)* কথা তাঁর শেষ হলো না। উলটো দিকের আসন থেকে মহিলা বলে উঠলেন, "এখন এসব কথা না বললে কী ক্ষতি আছে?" *(পৃ: ১৪১৫, ঐ)* কালকূট ছোট ছোট কথার জাল বুনে ঘটনাকে উপস্থাপন করে, বেদনাকে কখনো হাসির আড়ালে, কখনো চোখের জলে কখনো চাপা দীর্ঘশ্বাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বময় চরিত্র সিংবাহাদুরজীর কোমল হৃদয়ের নরম আলো পড়েছে কালকূটের ওপরে, অচেনা কিশোর ব্রাহ্মণ, পবন নন্দনের উপর। তিনি রসিকতা করতে গিয়ে তার গাম্ভীর্যের মুখোশ যে কখন খুলে ফেলেছেন সেটা নিজেই বুঝতে পারেন নি। কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সিংবাহাদুরজীর মুখ থেকে হরিহরছত্র ও সোন্‌পুরের মেলার কিংবদন্তী বলিয়ে নিয়ে।

আর তার এই কাহিনীর আর এক কলাকার কুসুম। ফুল ফোটার সময়ে যে রাঙা হয়ে ফুটে ওঠে, ক্ষণিকের জন্য ভুলে যায় নিজের প্রতি অন্যায়ের কথা। প্রথম দিন মেলায় এসে সিংজীদের তাবুতে বসে কুসুম সিংজী, কালকূটসহ অন্যান্যদের নিয়ে যায় ইতিহাসের পাতায় পাতায়, বর্তমানের আলোকে ভৌগোলিক বিবরণে। এমনি লেখক-কথাকার কালকূট হরিহর ছত্র মেলার ভৌগোলিক বিবরণ তুলে ধরেন পাঠকের কাছে, সেই বর্ণনায় মিশে থাকে ঐতিহাসিক তথ্য, কখনো পুরাণের তথ্য। দেখা যাক্ কুসুমকে দিয়ে লেখক কালকূট কীভাবে বলিয়ে নিয়েছেন। সে বলেছে "সোনপুরের মেলা এখনো পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। এরকম মেলা আর কোথাও হয় না। এ মেলা কতকাল আগে থেকে শুরু হয়েছে, ইতিহাসে তার সঠিক উল্লেখ নেই। এই হরিহরছত্রের কিংবদন্তী, আর কার্তিক

পূর্ণিমাতে গণ্ডক-গঙ্গার সঙ্গমে স্নান কোন্ প্রাচীনকাল থেকে শুরু হয়েছিল, পুরাণে তারও কোনো খোঁজ মেলে না। এ জায়গাকে ''হরিক্ষেত্র'' বা ''দদরিক্ষেত্র'' বলা হতো। অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধার মুখে শুনবেন, এখনো তাঁরা এ জায়গাকে ''দেবঘাট'' বলেন। *(পৃ: ১৪৩০, ঐ)* সে আরও বলে ''আদিতে লোকে জানতো, ভগবান শ্রীহরি, তাঁর গোধনসমূহ অগ্রে করে এখানে এসেছিলেন, আর শূলপাণি হরের সঙ্গে গোধন সব রক্ষা করেন। *(পৃ: ১৪৩০, ঐ)* লেখক কালকূট এই কথারই উপরে আবার তাঁর বিশ্বাস-অবিশাসের দোলায়িত মনকে প্রকাশ করেছেন, তিনি বলেছেন 'কৃষ্ণকে কোনো সময়ে বৃন্দাবন থেকে গোধন নিয়ে এখানে আসতে হয়েছিল কি না, আমার জানা নেই। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, এ স্থানের হরিহরক্ষেত্র বা দদরিক্ষেত্র নামের পিছনে, কোনো কারণ আছে।' *(পৃ: ১৪৩০, ঐ)* এইভাবেই লেখক কালকূট সোনপুরের মেলার হরিহরের মিথ বর্ণনা করেছেন।

মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার পরই পূর্ণিমার যোগ লেগে যাওয়াতে শেষ রাত্রি থেকেই সঙ্গ মে আস্নান শুরু হয়ে যায়। সিংবাহাদুরজীদের সঙ্গে ভোরবেলা লেখক পুণ্যস্নানও করেছেন। শুধু তাই-ই নয়, ব্রহ্মদেবী তাঁকে হাত ধরে টেনে গৌরীশঙ্কর মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করাতে নিয়ে গেছেন। তাঁর বক্তব্য, তুমি নাস্তিক না আস্তিক তা দেখার নেই। যেখানে যখন যাবে তখন সব দেখবে। ষাটোর্ধ্ব, ব্যক্তিত্বময়ী, রসিক মহিলাকে লেখকের স্নেহশীলা বান্ধবীর মতো মনে হয়েছে। এই ব্রহ্মদেবীকে লেখক এক ব্যক্তিত্বশালিনী, কোমলপ্রাণা, কৌতুকপ্রিয়া, স্নেহময়ী, স্বামী সোহাগিনী করে দেখিয়েছেন। লছমীপিয়ারী ও সূরযের প্রতি তাঁর স্নেহভালবাসা সবই লেখক কালকূট টুকরো চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এ'ছাড়া ওই হস্তি-হস্তিনীকে বিক্রি করে দেওয়ার মনোবেদনাকে তিনি বেদনার তুলিতে এঁকেছেন। এরই সঙ্গে উঠে এসেছে অস্তমিত জমিদারি পরিবারের বিলাস বৈভবের আড়ালে অর্থনৈতিক সঙ্কট। যার জন্য পরিবারের দীর্ঘদিনের সদস্যদু'টিকে সোনপুরের মেলায় নিয়ে আসতে হয় বিক্রির জন্য। সাড়ে তিনশো এককের এই পশু বিক্রির বাজারে লেখক পবন নন্দনের চোখ দিয়ে তুলে এনেছেন পশুদের মনোকষ্ট, পশু বিক্রির আদব-কায়দা, ইশারা। বিক্রীত পশুদের বিশেষত হাতীদের মানসিক অবস্থা খুবই অসহনীয় হয়ে ওঠে। তাঁদের চোখ দিয়ে জল পড়ে, খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়। লছমীপিয়ারী হস্তিনী সূরযের আগেই এই পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ ব্যথায় কাতর হয়ে খাওয়া বন্ধ করেছিল। সেই চিত্রও লেখক কালকূট নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন, যা পড়ে, জেনে পাঠকের মনও বেদনার্ত হয়ে ওঠে।

ব্রহ্মদেবীর স্নেহের কথা বলতে গিয়েই একটু প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া হয়েছিল। তিনি কীভাবে লেখককে স্নেহরসে আপ্লুত করেছেন। ''ভিড় তো কী হয়েছে? মেলায় এসেছো, আর ভিড়ে মিশবে না? আস্নান করবে, পানি গায়ে লাগাবে না?'' *(পৃ: ১৪৪৫, ঐ)* ব্রহ্মদেবী সহজ অথচ গভীর কথায় বাউলের সুর ধ্বনিত হয়েছে। 'জলে ডুবে স্নান করেও তার গা ভিজবে না। এ কথার অর্থ

আলাদা। সাধকের গূঢ় ভাষা। ব্রহ্মদেবী কোন গূঢ়ভাষা বলেন নি। মানুষের সত্য ধর্মের কথা বলেছেন।" *(পৃ: ১৪৪৫, ঐ)* পণ্যভূমে গিয়ে লেখক মানবমনের অন্তর্গহীনে ডুব দিয়েছেন, ব্রহ্মদেবী অন্তর্লোককে বিকশিত করেছেন। পূর্ণিমার স্নান করতে রেল কলোনির সত্যেনবাবু, রুনু, অধ্যাপক মিশ্র, অরুণ দত্ত সহ হাজিপুরের আরও কিছু ভদ্রলোক ও মহিলারা। এঁদের সঙ্গে কুসুমও এসেছিল। কথা প্রসঙ্গে কুসুম মনে করিয়ে দিয়েছিল প্রয়াগের কথা। সেবার তিনি স্নান করেন নি কিন্তু এবারে সিংজীরা ছিলেন বলেই স্নান করতে হয়েছে। এ'কথা প্রসঙ্গেই তিনি আবার প্রয়াগের মেলার স্মৃতিতে চলে গেছেন। 'প্রয়াগের কুম্ভে সে-বছর স্নানে গেলে, হয় তো আর কোনোদিন ফেরা হতো না। সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা, মৃত্যুলীলা আর কয়েকদিন ব্যাপী আগুনের লেলিহান শিখা এখনো আমার চোখে ভাসে। হারিয়েছিলাম অনেক পথে পাওয়া প্রিয়জনকে।' *(পৃ: ১৪৪৭, ঐ)*

কুসুম ফিরে যায় নি সত্যেনবাবুদের সঙ্গে। কমলা রঙের লালপাড় শাড়ীতে তাকে যোগিনীর মতই দেখাচ্ছে। ভিজে চুল এলিয়ে দিয়ে। লেখককে নিয়ে কালী মন্দিরে গিয়েছে সুঙ্গ, গুপ্ত আর পাল আমলের কিছু নির্দশন দেখাতে। কিছু ভাঙা পাথরের মূর্তি আছে যেগুলোকে আর চেনা যায় না। বুদ্ধ মূর্তি না বিষ্ণু মূর্তি একটি মূর্তি দেখে মেয়ে মনে হলেও বোঝা যাচ্ছে না সেটি কে? হিন্দু দেবী না যক্ষিণী না বৌদ্ধ দেবী। তবে ঐতিহাসিকের অনুমান এগুলো পাল আর বৌদ্ধ যুগের। এমনি করেই লেখক ঐতিহাসিক তথ্যকে তুলে ধরেছেন কুসুমের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। আবার এই পুণ্য স্থানের যে মিথ্‌টা সবাই জানে সেটাই দরজার সামনের দেওয়ালে খোদাই করা আছে। এমনিভাবেই লেখক কালকূট মিথ্‌কে সামনে এনেছেন। হাতীর ডান পা কামড়ে ধরেছে কুমীর। লেখক কুসুমকে বললেন যে, "সিংহবাহাদুরজীর কাছে এই গজগ্রহের কাহিনী শুনেছি।" *(পৃ: ১৪৪৮, ঐ)* সেই কাহিনীই মন্দিরগাত্রে খোদিত। অতএব মিথ্ বিশ্বাস করা বা না করা তিনি পাঠকের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছেন এবং মন্দিরে ভাঙা মূর্তিগুলোর কথা বলতে বলতে ঐতিহাসিক সত্যতায় পৌঁছে গেছে। ফাহিয়েন বৈশালী থেকে মগধের পাটলিপুত্রে যেতে কোন পথে কীভাবে এসেছিলেন, গন্ডকের প্রাচীন নাম সদানীরা কিন্তু ঋক্‌বেদে এই নাম পাওয়া যায় নি, সোনপুরের নামও নেই। ফাহিয়েন সোনপুর অঞ্চল দিয়ে পাটলিপুত্রে গিয়েছিলেন। 'পাটলিপুত্র নগর তো ছিল হিরণ্যবাহো আর গঙ্গার ধারে। হিরণ্যবাহোই সোন নদী।' *(পৃ: ১৪৪৮, ঐ)* এইভাবে তিনি ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য দিয়েছেন। তথ্যের ঘনঘটায় বর্ণনা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। তিনি যেন লেখনীর মাধ্যমে পাঠককে অতীতে নিয়ে গেছেন। এমনি তিনি দৃশ্যচিত্র এঁকেছেন।

কালীমন্দিরে 'রামজানকী' আর 'রাধাকৃষ্ণ' আছেন, কালী দেখতে কিন্তু কুসুম বললো "এ জায়গার নাম কালী আস্থান। কালী তো জরুর আছেন।" *(পৃ: ১৪৪৯, ঐ)* কালীমন্দির থেকে বেরিয়ে কুসুম লেখককে নার্সারী বাজারে নিয়ে যায় তাঁকে কিছু দেবে বলে। লেখক কুসুমকে

পারিজাত ফুলের গাছ দিতে চান কিন্তু কুসুম বলে 'পারিজাত ফুলের রাজা। রানী নয়? তারপরে কে জানে বাঁচাতে পারবো কি-না। কী ফুলের গাছ আপনাকে দেবো, বুঝতে পারছি না।' *(পৃ: ১৪৫০, ঐ)* তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলেছিল সে তাকে কুসুম ফুল দিতে চায় কিন্তু একটি শর্ত আছে। 'আমার কিছু জিজ্ঞেস করার আছে। বলবার আছে। তারপরেও যদি আপনি কুসুম ফুল চান দেবো। আমি বোধহয় একটু পাগলামি করে ফেলেছি। আমাকে ক্ষমা করবেন।' *(পৃ: ১৪৫০, ঐ)* কালকূটের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে কুসুম কালকূটের মনের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে চায়। লেখক কালকূট ছোট্ট ছোট্ট ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাঁদের সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন। কুসুম নামের সঙ্গে পোশাকের সাদৃশ্য এনে বৈরাগ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। নার্সারী মার্কেট থেকে চিড়িয়াঘর, সেখান থেকে সতীদেবীর মন্দিরে। মন্দিরের কাছে ছোট নদী গায়ত্রী। 'গায়ত্রী'র একটি মিথ আছে। মাথায় ঘোমটা টেনে মন্দিরে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে লেখকের দিকে তাকিয়ে বলেছিল 'আমিই বললাম, সতীদেবী সিদ্ধিদাত্রী।' ধীরে ধীরে একটা মায়াময় পরিবেশ তৈরি করেছেন। আবেগঘন মুহূর্ত। গায়ত্রীর তীরে আমগাছতলায় বসে কুসুম সেই মর্মন্তুদ কাহিনী শুনিয়েছিল কীভাবে সেই পরিবেশ তৈরি করেছেন দেখা যায় 'গায়ত্রীর স্রোত পূর্বের গণ্ডক থেকে, পশ্চিমে ধীরগতিতে চলেছে। ওপারে দিহারা ভূমি। জঙ্গল পাখির আস্তানা। গায়ত্রীর স্রোতই কি এই মর্মন্তুদ কাহিনী শোনাচ্ছে?' *(পৃ: ১৪৫১, ঐ)* নদী আর মানবীকে এক করে দেখিয়েছেন, তাঁর ধর্ষিতা হওয়ার বেদনার কথা নদীর মতো বইয়ে দিয়েছে কুসুম। এ প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবু আবার বলা হলো কুসুমের বেদনা পাঠকহৃদয়ে গায়ত্রীর স্রোতধারার মতো বইয়ে দেওয়ার জন্য। নিজের ধর্ষিত হওয়ার কথা বলে কারও করুণা ভিক্ষা সে করে না। কুসুমের বেদনাভরা জিজ্ঞাসার উত্তর সেদিন লেখক দিতে পারেন নি। কুসুমের কাহিনী শোনার পরে লেখক তার হাত থেকে কুসুম ফুলের গাছ নিতে চেয়েছিলেন। কুসুমের বেদনায় দীর্ণ মনকে তিনি স্পর্শ করেছিলেন তাঁর প্রেমকে মর্যাদা দিয়ে। মেলার অষ্টম দিনে আবার দেখা হয়ে গেল কুসুমের সঙ্গে লেখকের। বিধ্বস্ত চেহারা, অবিন্যস্ত নীল শাড়ি পরিহিতা, আলুথালু কেশে জল ভরা চোখে জিজ্ঞেস করেছিলো 'এ কতোদিন কোথায় ছিলেন? একদিনও এসে খুঁজে পাইনি।' *(পৃ: ১৪৫৩, ঐ)* মরমী মনের বেদনা মরমীভাবেই চিত্রিত হয়েছে। কুসুম উদ্‌ভ্রান্ত এইজন্য যে, তাঁর কথার উত্তর না দিয়ে কালকূট পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? কুসুম মাথায় ঘোমটা টেনে পাগলিনীর মত অসংকোচে লেখকের হাত টেনে নিয়ে সতীদেবীর মন্দিরের কাছে চলে যায়। গায়ত্রীর তীরে সেই আমগাছের কাছে গিয়ে বসে ডান গালে টোল ফেলে বলে 'একদম বেশরম হয়ে গেছি। রাগ করছেন?' *(পৃ: ১৪৫৩, ঐ)*

কুসুমের এই পাগলপারা আত্মনাশের চিন্তা থেকে তাঁকে মুক্ত করে আনন্দের মধ্যে বেঁচে থাকার পথ দেখান। সভ্য শিক্ষিত সমাজে লোলুপমানুষগুলো হাত থেকে বাঁচার জন্য অন্ধকারের

আঁধার কাটিয়ে আলোর পথের সন্ধানী করে তোলেন। তিনি বলেন 'কুসুম, কথা শুধু কথা বলে নিওনা। তোমার দুঃখ আর অপমানের তুলনা নেই। তোমার বোধ কত গভীর। কী করে সেই আনন্দের জন্ম হবে তোমার মধ্যে তুমিই একমাত্র তা জানবে। বিশ্বাস কর আমি নিজে সেই ধারায় বিশ্বাসী, অন্ধকারেও আলো আছে। দুঃখ যন্ত্রণা আর ভয়ের আধারকে মেনে নেবে কেন? ঐ আঁধারটাকে ভাঙো।'' *(পৃ: ১৪৫৩, ঐ)* লেখক বুদ্ধের প্রেমময় বাণীর মধ্য দিয়ে তাকে অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের পথ দেখালেন। মন থেকে ভয় দূর করে তারই নিজের সৃষ্ট আনন্দের মধ্যে জীবন কাটাতে বলেছিলেন। তাকে সাহস দিয়েছিলেন এই বলে যে মুহূর্তে তার মন থেকে ভয় দূর হবে সেই মুহূর্তে শয়তান পালিয়ে যাবে, মন নির্ভয় আনন্দের হাসিতে ভরে উঠবে। লেখকের চোখে চোখ রেখে কুসুম পাথরের মত নিশ্চল হয়ে রইল। 'আমার বুকের ওপর দু'হাত চেপে, এখন অনেকটা ঝুঁকে এসেছে।' *(পৃ: ১৪৫৪, ঐ)* লেখক এইভাবে কুসুমের প্রেমকে সম্মানিত করেছেন। অপমানিত, লাঞ্ছিত, বেদনার্ত এক নারীর প্রেমকে মেনে নিয়েছেন আনন্দময় বৈরাগ্যের মধ্য দিয়ে। তিনি যে প্রেমে বিশ্বাসী, সেই বিশ্বাসকেই তিনি কুসুমের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন।

কালকূট কুসুমের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন ''আপনার কথাই মেনে নেবো তবে, এখন কিছুদিন আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন, ঘুরবেন। গৌতম বুদ্ধের পায়ের ছাপ দেশের মতো জায়গায় আছে, সবখানে। যাবেন তো'' *(পৃ: ১৪৫৪, ঐ)* কালকূট কুসুমের প্রেমকে মহীয়ান করেছেন কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন নি। কুসুম ফুলের গাছটি লেখককে দিয়ে বলেছে ''আপনি কোনোকালেই আপনার ঘরের সামনে এক কুসুম গাছের নিচে বসবেন না।'' *(পৃ: ১৪৫৪, ঐ)* কুসুমের দেওয়া গাছটি বাঁচাতে পারেন নি। তিনি বলেছেন ''আমি কোনোকালে মালী হতে শিখিনি। আমাকে ঘিরে কোনো ফুলবাগান নেই। কিন্তু যাঁদের আছে, তাদের চিনি। তাঁদের বাগানের দিকে চেয়ে থাকি।'' *(পৃ: ১৪৫৮, ঐ)* অত্যন্ত অর্থবহভাবে কাহিনীর অন্ত ঘটিয়েছেন। পরিচিত সমাজজীবনের বাইরে বহুরূপের মাঝখানে সময় পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট হওয়া ভাললাগা, প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। সমাজ বন্ধনের সে প্রেম নিষ্পেষিত হয়। লেখক কালকূটও সে বন্ধন কাটিয়ে উঠেছেন। প্রাত্যহিক জীবনের বন্ধনে তিনি ধরা দেন নি। লক্ষ রূপের হাটে তিনি রূপসন্ধানী কালকূট অমৃতের তৃষ্ণা এই রূপবৈচিত্র্যই তো দেখতে এসেছিলেন। এই রূপবৈচিত্র্যের হাটে আর এক রূপের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। সিংবাহাদুর সাহেবজীর আর কে আশ্রিত পবন নন্দন ঝা। কালকূটের ছেলেবেলার সঙ্গে এর মিল খুঁজে পান। কুসুমও কালকূটকে মনে করিয়ে দেয় এই মিলের কথা, সে বহুজনের সঙ্গে মিশেছে জীবনযাপনের জন্য, সে কিশোর হলেও মূলত কিশোর নয়। জীবন তার অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। তাঁর চোখ দিয়ে লেখক কালকূট সোন্‌পুরের লক্ষরূপের মেলা দেখেছেন। কুসুম পবন নন্দন সম্পর্কে বলেছিল 'ওকে যে আপনার ভালো

লেগেছে, তা বুঝতেই পারছি। তবে, ওর এই সুন্দর মুখটা সব না। ও যে জীবনটাকে কী নজরে দেখছে, আপনি তা জানেন না। তবে এটা আপনাকে বলে দিতে পারি, ও আপনাকে ইতিহাস বলতে পারবে না। এ মেলায় ওর সঙ্গে ঘুরলে, ও আপনাকে অনেক বেশি দেখিয়ে দেবে। আর আমাকে যদি অনুমতি করেন, আপনার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবো, তো সেটা হরিহরনাথের কৃপা।' *(পৃ: ১৪৩৪, ঐ)* কুসুমের চোখ দিয়েও মেলা দেখেছেন। কুসুম তাঁকে জানিয়েছিল যে প্রয়াগের কুম্ভমেলার থেকে সোন্‌পুরের মেলার অনেক তফাৎ আছে। পশুমেলায় কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হয়, শ্রীমান খাটটা (পবন নন্দন) ঝা অনেক কিছু বাৎলে দিতে পারবে। লেখক কালকূট পবনের মত ঘর ছেড়ে, মাকে ছেড়ে বেঁচে থাকবার জন্য বাইরে ঘুরে বেড়ান নি ঠিকই তবে তিনি তাঁর সঙ্গে পবন নন্দনের মিল খুঁজে পেয়েছেন। 'যার ডাক আমাকে, আমাদের পরিবারের আর দশটা ছেলের মতো হতে দেয় নি। পাঠ্যের পড়ায় মন ছিল না। স্কুলের বন্দীশালা থেকে পালানো ছেলে আমি। সারাটা দিন খাল নদী মাঠে শ্মশানে ঘুরে বেড়িয়েছি, শাসিত হয়েছি। তবু সেই হাতছানি কোনদিন বন্ধ হয়নি। কে আমাকে ঘরছাড়া করে ডেকে নিয়ে যেতো, তাকে কোনদিন চিনতে পারি নি।'' *(পৃ: ১৪৩৪, ঐ)* লেখকের সঙ্গে পবনের মিল আছে এই কথা কুসুম বলার পর তিনি তাঁর অন্তর্গহীনে ডুব দিয়ে বলছেন 'এক ঘণ্টা আগেও ওকে আমি রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' সেই ব্রাহ্মণ বালকের সঙ্গে তুলনা করেছি।' *(পৃ: ১৪৩৪, ঐ)* কুসুম লেখকের সঙ্গে একমত হলেও একটু তফাৎ খুঁজে পায়। পবনের চোখ দিয়ে লেখক কালকূট এক বিচিত্র জগৎ দেখতে পান।

মেলায় মানুষ বিক্রি হয় মানে মেয়ে মানুষ বিক্রি হয় সেই বাস্তব সত্যের মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেয় সে। সেই রূপের হাটে গিয়ে দেখেন পিতা-স্বামী-ভাই এরাই তাদের বাড়ীর মেয়েদের পশু-বিক্রির বিশাল পণ্যভূমিতে বিক্রির জন্য নিয়ে এসেছে। চুপিচুপি বিক্রি হয়ে যায়। যারা বিক্রি করে, যারা কেনে আর যারা বিক্রি হয়ে যায় শুধু তারাই জানতে পারে। কি বিচিত্র এই রূপের হাট। ''ভারতে মেয়ে বিক্রি হয় বিক্রি করে বাবা মা স্বামী ভাই। অনেক সময়, স্ত্রীলোক স্বয়ং নিজেকে বিক্রি করে। সোন্‌পুরের মেলায় দেখেছিলাম ঊনিশশো আটষট্টি সালে। লিখছি ছিয়াশিতে।'' *(পৃ: ১৪৫২, ঐ)*

পবনের মুখ দিয়ে এই পশুমেলার রূপের হাট সম্পর্কে বলিয়ে নিয়েছেন ''বাবুজী হাতী তো দূরের কথা, একটি ঘোড়া বয়েলের থেকেও অওরতের দাম অনেক কম। খুবসুরত যোয়ানী আর বাচ্চা লেড়কির দাম খুব বেশি হলে পাঁচ শো টাকা। একটা খারাপ জাতের দুবলা ঘোড়াও দেড় হাজার টাকার কমে বিকোয় না। একজোড়া ভালো বয়েল সাত আট হাজার টাকা।'' *(পৃ: ১৪৫৩, ঐ)* রূপের হাটে আর এক রূপ পবন নন্দনের চোখ দিয়ে লেখক দেখেছেন। ঊনিশশো আটষট্টি সালের অর্থনৈতিক চিত্রের পাশাপাশি নারী বিক্রির এক করুণ, নির্মম চিত্র তিনি চিত্রিত করেছেন।

অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন পরিবারের স্বামী-পুত্র-পিতার ওপর, যারা অর্থের প্রয়োজনে নিজ স্ত্রী-কন্যা-মাতাকে পণ্য করে।

পবনের চোখ দিয়ে মীনাবাজারের এক অদ্ভুত রীতির কথা ধরা পড়েছে। মীনাবাজার অর্থাৎ বেশ্যালয়! মস্ত একটা মাটির পাত্রের সামনে কিছু পুরুষ একবার করে উঁকি দিয়ে চলে আসছে। নতমুখে পবন জানিয়েছে 'পুলিশ সব জানে। আর ঐ ওটা বাবুজী, ওটায় ওরা প্রস্রাব করে রেখেছে। ওদের কাছে যারা যাবে, তারাই দেখতে যায়। এটা আদত।' *(পৃ: ১৪৫২, ঐ)* মীনাবাজারের এক বিকৃত রীতিকে অনায়াস ভঙ্গিতে পবনের চোখ দিয়ে তুলে এনেছেন। লেখক কালকূট পশুমেলায় পশুবিক্রির সঙ্গে মেলার একটা দিক টুকরো টুকরো ছবির মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। দেখিয়েছেন সুন্দর-অসুন্দর লুকিয়ে রয়েছে। দুঃখবোধও দেখেছেন পশু-বিক্রি স্থলে গিয়ে। একজন বৃদ্ধ লোক ধরা গলায় বলছে 'বেটি রাজমোহিনী, এ লাড্ডু ক'টি খেয়ে নে। তুই তো লাড্ডু খেতে ভালবাসিস।' *(পৃ: ১৪৪২, ঐ)* তার কথা শুনে আর একটি লোক এটি পাকা বলে অভিহিত করেছিল। জানিয়েছিল ''দেওতা গণেশের প্রাণে চোট লাগে। গতকাল থেকেই এই হাতিনী খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এ সোন্‌পুরের মেলায় অনেক পাপ হয়।'' *(পৃ: ১৪৪২, ঐ)* সমস্ত পরিবেশটা বদলে গিয়েছিলো, একটা লোকের ছায়া নেমে এসেছিল। লেখক বলেছেন 'সোনপুরের মেলার এক ভিন্ন রূপ দেখছি। আর একটা দীর্ঘশ্বাস আমার বুকেও জমে উঠছে।' *(পৃ: ১৪৪২, ঐ)*

তবে এই রূপের হাটে পবনের সর্বত্র অবাধ যাতায়াত। অনেকেই তাকে চেনে, মাঝিরা তাকে ডাকাডাকি করে। সে মাঝিদের সঙ্গে ক'দিন কাটিয়ে নাচ-গান করে আনন্দে দিন কাটিয়ে দিয়েছিল। লেখকের সঙ্গে দেখা হতেই সে চলে এসেছিল এবং স্পষ্ট স্বীকার করেছিল গাঁজা বিড়ি ফুঁকেনি সে, দু'দিন খুইনি চুষেছে। এই হলো পবন নন্দন, কোনো নিষেধের বেড়ি ওর ছিল না। বিশ্বনিখিলের মানুষজন সবাই ওর আপন। তাইতো গাভী-বলদ বিক্রেতারাও তাকে ডাকাডাকি করে তাকে দুধ পান করার কথা বলে। গাভী-ভঁইষের বাজারে এক করুণ দৃশ্য, সবাই কাঁদছে। গাভী-ভঁইষের সঙ্গে মনিবও কাঁদছে। সিংবাহাদুরের লছমীপিয়ারী আর সূরযকে কিনে নিয়েছে ডুয়ার্সের 'ডিফো' সাব। ডি. এফ. ও-ই পবনের কাছে 'ডিফো' সাব। এই 'ডিফো' সাব লেখকের পূর্বপরিচিত। ডিফো সাব পূর্ব পরিচয় মনে করিয়ে দিয়েছিলেন লেখককে। সঙ্গে ডুয়ার্সের মালবাজারে দেখা হয়েছিল। মেলা দেখতে আসেন নি, 'তবে এ মেলাতেই এসেছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ে, হাতী কিনতে।' *(পৃ: ১৪৪০, ঐ)* অন্য রাজ্যের বনবিভাগও হাতী কিনতে আসে এ মেলাতে, এটা জেনে তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও এটাই সত্য যে বনবিভাগ তাদের কাজের জন্য পোষা হাতীই কিনে থাকে। তারা সিংবাহাদুরজীর হাতী পছন্দ করেছিল; সিংসাহেবজীর পরিবারের শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। কিন্তু বিক্রি তো করতেই হবে। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার,

পরিবারের আর্থ-সামাজিক চিত্র তুলে ধরেছেন এই করুণ দৃশ্যের মধ্য দিয়ে।

মানবমন সন্ধানী লেখক কালকূট তাঁর অন্তর্দৃষ্টি মানবমনের সঙ্গে পশুদেরও মনচিত্র অবলোকন করেছেন। এবং আশ্চর্য দরদী মন দিয়ে সেই চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর অনবদ্য লেখনীর প্রয়াসে। আর একটি চিত্র তুলে ধরেছেন সেটি হল নৌটোঙ্গি। নোটোঙ্গীরা নাচ-গান করে। ওরা অনেক কিছু সাজে, রামায়ণে সীতা, মেনকা এসবও সাজে। পবনের চোখ দিয়ে লেখক তুলে ধরেছেন নোটোঙ্গীদের জীবনপ্রণালী। তবে বাবুজী নোটোঙ্গী আর মীনাবাজার কিন্তু আলাদা।' *(পৃ: ১৪৪১, ঐ)* ওদের জন্য একটা সম্মানবোধ পবনের মধ্যে আছে। সে একবার তাদের নাচ দেখেছিল। তার খারাপ লাগেনি। সে বলেছে সকলের চোখের সামনে তো তারা খারাপ কিছু করে নি, তবু লোকে তাদের খারাপ বলে। সে আরও বলেছে অনেকে তো লুকিয়ে চুরিয়ে খারাপ কাজ করে। 'মীনাবাজারের রেন্ডিদের থেকে তারা কিছু ভাল না।' *(পৃ: ১৪৪১, ঐ)* কী গভীর জীবনবোধের কথা বসিয়ে নিয়েছেন তিনি পবন নন্দনের মুখ দিয়ে যদিও কাহিনীর চরিত্র লেখকেরই সৃষ্টি, তাদের মুখের কথাও তারই। নিজ বিশ্বাস, যুক্তি, বক্তব্য সবই লেখক বিভিন্ন চরিত্রগুলোর মুখে বসিয়ে বাস্তবের আঙিনায় নিয়ে এসেছেন। স্থান-কাল অনুযায়ী বিভিন্ন চরিত্র ও তাদের কথোপকথনও লক্ষণীয়। বিহার ছাপড়ার ছেলে পবন নন্দন, ঘর পালানো ছেলে। তার মুখে নৈহাটীর চটকল অঞ্চলের বিহারী শ্রমিকদের মতো কথা বসিয়েছেন। আবার কুসুম বাংলার মাঝে মাঝে হিন্দি কথা আর সিংবাহাদুরজী উর্দু মেশানো হিন্দি কথা যথার্থ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ এসব চরিত্র লেখকের অন্তর্দৃষ্টি ও তীব্র জীবনবোধ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

লক্ষ রূপের হাটে বিভিন্ন ঘটনা চাক্ষুস করিয়ে পবন কালকূটকে নূতন নূতন রসে সিক্ত করেছে। তারপর একদিন নিজেই উধাও হয়ে গেছে। ও যে বিশ্বপথিক, পথই যে পবনকে বার বার ঘরছাড়া করে, কোনো বন্ধনই তাঁকে আটকে রাখতে পারে না। কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এসেছে রতন চক্রবর্তী, রেলকর্মী, মিঃ টি. চৌধুরী, অরুণ মিত্র, সিংবাহাদুরজীর স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ, পুত্র, জয়রাজ --- সবাই এসে কাহিনীকে সমৃদ্ধ করেছে। কাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন কাহিনী উঠে এসেছে। এই লক্ষ রূপের হাটে নিজেকে অন্বেষণ করেছেন কালকূট। আর অমৃতরসের ছোঁওয়া পৌঁছে দিয়েছেন পাঠককুলের মধ্যে। সোন্‌পুরের পণ্যভূমে সবচেয়ে বড় পশুমেলার ও হরিহরছত্রের মেলার আহরিত রূপতৃষ্ণার পরশ দিয়ে তার কাহিনীকে একটি উপন্যাসে পরিণত করেছেন।

'পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ' কালকূট লিখেছেন 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'র একত্রিশ বছর পরে। ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ থেকে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত ৯টি কিস্তিতে আনন্দবাজার পত্রিকায় মেলার বিবরণী হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। ১৩৬১-র মাঘের সংক্রান্তিতে প্রয়াগের লক্ষ রূপের হাতছানিতে তিনি পূর্ণকুম্ভমেলায় গিয়েছিলেন অমৃতের

সন্ধানে। সেই অমৃত সন্ধানেই ঘুরতে ঘুরতে আবার এসে পৌঁছলেন আর এক কুম্ভমেলায়, হরিদ্বারে। ইংরাজিতে ১৯৫৪ থেকে ১৯৮৬ হিসাব করলে ৩২ বছর হয়। এত বছর পরে এসেও লেখক কালকূট লক্ষ রূপের মধ্য দিয়ে যেন নিজেকেই অনুসন্ধান করেছেন। আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়ে বারে বারেই ফিরে গেছেন ৩১ বছর আগের প্রয়াগের কুম্ভমেলায়। সেই সময়ে ৭ই ফেব্রুয়ারী ও ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে আনন্দবাজার পত্রিকায় কুম্ভমেলার যে প্রতিবেদন লিখেছিলেন, তারই পুনরুল্লেখ করেছেন এবং সেই প্রতিবেদন দুটির আয়নায় ৩১ বছর পরে নিজেকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন।

তাই তিনি নিজেই বলেছেন— "প্রয়াগে লক্ষ চোখের আরশিতেও নিজের যে মুখটি দেখেছিলেম, আজ ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে, লক্ষ চোখের আরশিতে নিজের সেই মুখটিকে তো খুঁজে পাচ্ছিনে। কেবল প্রয়াগের সেই লুলা বলরামের গানের কলি মনে পড়ছে : 'তুমি কে-এ-এ-এ-এ? / বহুদিনের চেনা বলে মনে হতেছে।' ব্রহ্মকুণ্ডের লক্ষ চোখের আরশিতে নিজেকে দেখে কি বুকে কোথাও মোচড় দিয়ে উঠল? একটু ব্যথা মনের কোথাও কি টনটনিয়ে উঠল? অথবা একটি উদগত দীর্ঘশ্বাস, হঠাৎ আটকে রইল কণ্ঠনালীর কাছে? চোখে কি কিঞ্চিৎ ঝাপসা দেখছি? না, না হে। কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমি? আমার দু পাশ দিয়ে যে বয়ে চলেছে দুরন্ত গতিতে, তার অনেক নামের এক নাম গঙ্গা। মহাকালেরই প্রতিরূপ, সে চলেছে নিরন্তর। আর এই যে আমার চারপাশে নানা বয়সের নরনারী, নানা বেশ, গৃহস্থ, সাধু, সাধুনী, ব্রহ্মকুণ্ডে মহাবেগ মহাকালের মতো তারাও নিরন্তর। আমিও নিরন্তর। সেই নিরন্তরতার মধ্যেই আমি রয়েছি, আমার কেশের রুপোলি ঔজ্জ্বল্যে, ব্যথার শিখরে শুভ্র হাসির গর্ব। মুখের শীর্ণতা ও রেখায় কেবল ফেলে আসা দিনগুলোর অভিজ্ঞতার শক্তি সঞ্চয় হয় না। পেয়েছি গভীরতর জিজ্ঞাসার সুধা মাখানো আর্তি। আর্তিতেও সুধা থাকে। বুঝ হে রসিক জন।" *(পৃ: ১৫৭৭, কালকূট রচনা সমগ্র, ৩য় খণ্ড)*

এতকাল অর্থাৎ ৩১/৩২ বছর পরে কালকূট এসেছেন পূর্ণকুম্ভে। ৩১/৩২ বছর আগে যখন প্রয়াগে গিয়েছিলেন সেটা ছিল প্রথম প্রয়াগ দর্শন, আর ৩২ বছর পরে গঙ্গাদ্বারে এসেছেন, এটাও প্রথম গঙ্গাদ্বার দর্শন। ৮ এপ্রিল থেকে ১৬ এপ্রিল কালকূট গঙ্গাদ্বার অর্থাৎ হরিদ্বারের কুম্ভমেলার পরিভ্রমণের বিভিন্ন ঘটনাবলী, কাহিনী এতে বিবৃত করেছেন। সময়ের সাথে সাথে মানুষের রঙরূপ বদলে যায়, এমনকি অন্তরের আর্তিও কি বদলে যায়? এই বত্রিশ বছরের ব্যবধানে লক্ষ লক্ষ রূপের আরশিতে তিনি মানবজীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়ে। ৩২ বছর পরে নিজেকে প্রত্যক্ষ করার জন্য ও পাঠককুলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি শুরুটা করেছেন ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪-এর প্রতিবেদন দিয়ে। উপনাম দিয়েছেন কুম্ভ মহামেলা। এই উপনাম ছাড়াও তিনি গঙ্গাদ্বারের কুম্ভমেলার পরিক্রমায় দিনলিপির আকারে

আলাদা আলাদা উপনাম দিয়েছেন। 'মহা কুম্ভমেলা' এই উপনামের পরে তিনি যে উপনামগুলো দিয়েছেন সেগুলো হল :

(১) প্রয়াগ থেকে গঙ্গাদ্বার

(২) আসন্ন সন্ধ্যার পাখির চোখ, হরিদ্বার, ৮ই এপ্রিল

(৩) পাখির চোখে ঘুম নেই, হরিদ্বার ৯ই এপ্রিল

(৪) নির্ভয় শক্তির পথে, নির্ভয়ে, হরিদ্বার ১০ই এপ্রিল

(৫) দূরকালের উমাকে প্রণাম,
প্রণাম একালের উমাদেরও, হরিদ্বার ১১ই এপ্রিল

(৬) জগৎ বশ মহামায়ায় হরিদ্বার ১২ই এপ্রিল

(৭) স্বামী কোথায়, সোনা যে নিয়ে গেল, হরিদ্বার, ১৩ই এপ্রিল

(৮) সাধু প্রসঙ্গ, সাধু দর্শন, হরিদ্বার ১৪ই এপ্রিল

(৯) ইতিহাস ও অমৃতের উৎস সন্ধান, হরিদ্বার ১৬ই এপ্রিল

'কুম্ভ মহামেলা'র শুরুটাই করেছেন কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া বন্যা দিয়ে যে বন্যা এলাহাবাদ শহরকে জলমগ্ন করেছিল। এলাহাবাদ আরও এক মহা প্লাবনের মত সে বন্যার সম্মুখীন হল। মানুষের সঙ্গে হাতি-ঘোড়া উট-এর বন্যার ঢেউ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আছড়ে পড়ল। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সমগ্র হিন্দুস্থানের এক জনসমুদ্রের ঢেউ বিশাল রূপে, বিচিত্র বর্ণে, বিচিত্র ভাষায় বিচিত্র রূপে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সঙ্গমে অর্থাৎ মহা কুম্ভমেলায় আছড়ে পড়ছে।

কালকূটের চোখে ধরা পড়েছে মহা কুম্ভমেলায় আগত লক্ষ মানুষের ঢল। এলাহাবাদ স্টেশনে যে গাড়িগুলি এসে থামছে তাতে তিল ধারণের জায়গা নেই, দরজা জানালা সব কিছু দিয়ে মানুষ যেন উছলে পড়ছে। স্টেশনটি বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। বসন্তের প্রতিষেধক ইনজেকশন নেওয়ার সার্টিফিকেট না দেখালে মেলায় প্রবেশের অনুমতি মিলবে না। যাত্রীরা এসেছে গ্র্যান্ডট্যাঙ্ক রোড ধরে প্রাইভেট মোটরকারে, গরুর গাড়িতে, টাঙ্গায়, গাধার পিঠে চড়ে। এছাড়া উত্তর-পূর্বের পাহাড় ডিঙিয়ে দুর্গম বন ও জঙ্গল অতিক্রম করে উপরের সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীরা নেপাল ও ভুটানের ভয়ঙ্কর খাড়ি ও খাদ অতিক্রম করে এই জনতরঙ্গের ঢেউ নেমে এসেছে। গাড়োয়াল, হরিদ্বারের আশ্রমগুলো থেকেও নেমে এসেছে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মহাসঙ্গমে। লক্ষ মানুষের রূপের আরশিতে আর একবার কালকূট নিজেকে অবলোকন করতে করতে প্রয়াগযাত্রী হয়েছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ কিসের টানে প্রয়াগের কুম্ভমেলার পানে ছুটে চলেছেন সেই জিজ্ঞাসাই তাঁর মনকে আকুলিবিকুলি করে তুলেছে।

ট্রেনে এলাহাবাদে যাওয়ার পথে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা যেন তিনি তুলি দিয়ে এঁকে এঁকে করেছেন। শরতের আকাশের বর্ণনায় তিনি প্রকৃতিকে এইভাবে তুলে ধরেছেন। "নীল আকাশের বুকে শুভ্র মেঘরাজি পাখা মেলিয়া রহিয়াছে। এই আকাশ বাংলার শরৎকালকে মনে করাইয়া দেয়। সবুজ শস্যভরা ক্ষেত। আর আছে পেয়ারা বাগান। তাহাও দীর্ঘস্থান জুড়িয়া ফসলের ক্ষেতের মতো, তাহা কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু।" *(পৃ: ১৫৭১, ঐ)* প্রকৃতির বর্ণনা দিতে দিতে তিনি প্রয়াগের কুম্ভমেলার স্থানের চিত্র অঙ্কিত করেছেন তার লেখনীর তুলির টানে। মেলা উপলক্ষে দারাগঞ্জ স্টেশনের নীচে 'প্রয়াগ ঘাট' নামে একটি সম্পূর্ণ নতুন স্টেশন। যাত্রী সুবিধার জন্য এই নতুন ঘাটটি তৈরি করা হয়েছে যাতে যাত্রীরা সহজেই প্রয়াগ ঘাটে যেতে পারে। কালকূট দেখেছেন মেলায় আগত চলমান যাত্রীরাজিকে— রুগ্ন মানুষ ধুঁকতে ধুঁকতে, বিকলাঙ্গ হামাগুড়ি দিয়ে, কোথাও স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে কাঁধে নিয়ে, মা দুধের শিশুকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে আর খোল-করতাল-একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছেন বাংলার বাউল বৈষ্ণবরা।

গঙ্গা-যমুনার বুকে নৌকার মিছিল। উত্তরপ্রদেশ, বিহারের অবগুণ্ঠিতা রমণীরা রামায়ণের ঘটনাবলী গান করতে করতে এগিয়ে চলেছে, এছাড়াও অমৃতকুম্ভের যেসব কিংবদন্তী সেগুলোও কেউ সুর করে গাইতে গাইতে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্রোতে ভেসে চলেছেন।

কালকূট এত মানুষের এত বৈচিত্র্য দেখে বলেছেন "জানি না কাহার বাঁশি বাজিয়াছে, কী সুর বাজিয়াছে, কী কথা লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণে স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছে। শুধু দেখিতেছি, সকলে খরস্রোতের বুকে তৃণখণ্ডের মতো ভাসিয়া চলিয়াছে।" *(পৃ: ১৫৭১, ঐ)* এলাহাবাদ শহরে এই লক্ষ রূপের হাটেও সময়ের সুযোগে কিছু সুযোগসন্ধানী মানুষও এসেছেন এলাহাবাদ শহর থেকে প্রয়াগসঙ্গমে যেতে টাঙা-রিকসায় অথবা প্রয়াগ ঘাট থেকে নৌকায় সঙ্গমের দিকে যেতে দ্বিগুণের বেশি ভাড়া হাঁকাচ্ছেন। কালকূট বলেছেন মেলার মধ্যে রিকশা-টাঙ্গায় করে ঢুকতে গেলে সেখানে 'মেলার পাসে'র দাম যাত্রীকেই গুণতে হচ্ছে। 'পাসে'র মূল্য ছয় ছানায় বারো ঘণ্টা, এবং সাইকেল যাত্রীদের 'পাসে'র দাম দুইআনা। কালকূট এই খণ্ড খণ্ড চিত্রের মধ্যেই অনুভব করেছেন সবাই পুণ্যার্থী নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, মুনাফা লাভের জন্যেও অনেকেই এসেছেন বিশালরূপের হাটে।

প্রয়াগের পুণ্যস্নানের পুণ্যক্ষণের আগেই কালকূট পৌঁছে গেছেন মেলায়। তিনি মেলার বিস্তৃত অঞ্চলের রূপ কেমন তারই একটি ভৌগোলিক চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশও বাদ যায়নি। প্রয়াগের মেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল শুরু হয়েছে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে দারাগঞ্জের কোল ঘেঁষে গিয়েছে। গঙ্গার পশ্চিম পারে বিস্তীর্ণ বালুকাবেলার শেষে ঝুসির উচ্চভূমির নীচ পর্যন্ত, গঙ্গার পূর্বপাড়ে বাঁধ ও গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড। উত্তরে দারাগঞ্জের রেলসেতু ছাড়িয়ে ধূ-ধূ বালুপ্রান্তর, এবং দক্ষিণে কেল্লার নীচে যেখানে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম হয়েছে, সেই

ঢালু প্রান্তর পর্যন্ত মেলা বিস্তৃত। উত্তর দিক থেকে সঙ্গমের কাছে গঙ্গা একটু বেঁকে আর দক্ষিণ দিক যমুনা কেল্লার কোল ঘেঁষে যমুনা তার গাঢ় নীল জল নিয়ে গঙ্গা-যমুনা পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছে কিন্তু একদেহে লীন হয় নি। বৈচিত্র্যে দুই পাড় আপন আপন বৈশিষ্ট্যে এগিয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। কালকূট বলেছেন, "সঙ্গমের নিকটে গঙ্গার বালুচর এক জায়গায় দ্বিধাবিভক্ত হইয়া একটি জলের ধারা ঝুসির কোল ঘেঁষিয়া খানিকটা চলিয়া গিয়াছে। আবার বালু প্রান্তরের এক স্থানে বসিয়া গিয়াছে। অনেকের মতে ইহাই সরস্বতী।" *(পৃ: ১৫৭১, ঐ)*

কালকূট কুম্ভমেলা পরিক্রমাকালে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচিতি সাথে সাথে অন্য কতকগুলি বিষয়ও লক্ষ্য করেছেন। গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোড থেকে ঝুসি ও সঙ্গম থেকে রেলওয়ে সেতুর ওপার পর্যন্ত বর্ষাকালে জলমগ্ন হয়ে থাকে, অন্য সময়ে শুধু বালি আর বালি, কোথাও পলির ওপরে কিছু কিছু জন্মায়। প্রতি মাঘ মাসে কিছু পুণ্যার্থী কল্পবাস করতে আসে। তাবু খাটিয়ে কিছুদিন বাস করে তারা চলে যায়, দিনের বেলায় এই বালুকা বেলার উপর দিয়ে কাঠুরেরা উটের পিঠে কাঠ বোঝাই করে শহরে যায় ও সন্ধ্যায় ফেরে। কৃষকেরা ভেড়া চড়ায় পলিজমির ওপরে। কাঠের খুঁটির মাধ্যমে বিদ্যুতের আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সারি সারি চালাঘর ও তাবুতে তাবুময় একটি শহরে পরিণত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড়ে, মাইকের চিৎকারে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুরা বিভিন্ন রকমের নিশান উড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড় সামলাতে পুলিশ বাহিনী, ভলান্টিয়ার হিমসিম খাচ্ছে। কালকূট মেলায় দেখেছেন আধুনিক ডিজাইনের ফুলদানি, চায়ের সেট, ছাইদানি, কাশী ও মোরাদাবাদী পিতলের বাসনপত্র। নয়নভুলানো মাটির বাসনপত্র, নানারকম ফল-মিষ্টি, কাঁচের চুড়ি, পুতির মালা ও সিঁদুরের দোকান, কাশ্মিরী গালিচা, কম্বল, আসন, মতিবাই শাড়ী, মারোয়াড়ি ও আজমিরি শাড়ীতে গঙ্গার এ পারের দোকানগুলো সেজে উঠেছে। কালকূটের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে দোকানগুলো চাকচিক্য ও বর্ণবৈচিত্র্যে ঘোমটা ও ওড়নার আড়াল থেকে গ্রামীণ নারী, মুগ্ধ গ্রামীণ পুরুষদের, আধুনিক যুগের দোকানপাট দেখে চোখের পলক পড়ছে না।

এছাড়াও 'সঙ্গম ডাকখানা' বলে কয়েকটি অস্থায়ী পোষ্ট অফিস, রেলওয়ে অফিস, এন্‌কোয়ারী তাবু, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, অস্থায়ী প্রাথমিক ও মহামারী ডিস্‌পেন্সারি, সরকারি তরফ থেকে খোলা হয়েছে। টাউন এ্যান্ড ভিলেজ কনস্ট্রাকশন, উত্তরপ্রদেশের সরকারি বিভাগ কুম্ভ সঙ্গমের একটি নক্সা তৈরি করে একটি অস্থায়ী টাওয়ারের উপরে রেখে দিয়েছেন। চার আনা পয়সা দিয়ে ওই টাওয়ারে উঠে সমস্ত মেলা প্রাঙ্গণটিকে দেখা যেতে পারে।

কুম্ভমেলার একটি বিশেষ আকর্ষণ হল সাধুসন্তরা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে তারা মেলায় উপস্থিত হয়েছেন। রক্তবর্ণ চক্ষু ও সম্পূর্ণ উলঙ্গ সাধুরা হাতে শাণিত তরবারি, ত্রিশূল নিয়ে

সবচেয়ে বেশি আকর্ষিত হয়েছেন। কিছু নাগা সন্ন্যাসিনীও আছেন। এছাড়াও আরও শত শত পরমহংস-আচার্য-মোহান্ত বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, উত্তর ও মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশার সমস্ত প্রদেশের বনজঙ্গল পাহাড় জনপদ ছেড়ে এসে লক্ষ লোকের মেলায় তাদের আস্তানা গেড়েছেন ও নিজ নিজ সংঘ, আশ্রমের পতাকা তুলে নিজ নিজ আশ্রমের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। কালকূট জেনেছেন কুম্ভমেলায় এবারই প্রথম মাইকের ব্যবস্থা। অতএব মাইকের মাধ্যমে নিজ নিজ আশ্রমের ও সংঘের মহিমা প্রচার করা, ধর্মোপদেশ দেওয়া অনেক সহজতর হচ্ছে আচার্য, মোহান্তদের কাছে। কিছু সাধু পরিবারও কালকূটের চোখে ধরা পড়েছে। কিছু আধুনিক মহিলাদের পোশাকে সজ্জিত মহিলা সাধুও এসেছে এই লক্ষ রূপের হাটে। কালকূট সেই লক্ষ রূপের আরশিতে নিজেকে পরখ করতে করতে এগিয়ে চলেছেন।

গঙ্গার ওপারে এবার সাধুদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে; এতে সাধু সম্প্রদায় একটু অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ১৯শে জানুয়ারী পৌষ পূর্ণিমার দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর এই সঙ্গমস্থলে আসবার কথা বলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য পুলিশবাহিনী ও সামরিকবাহিনী বিশেষভাবে তৎপর। প্রয়াগ-সঙ্গমের মহামেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ যে যেভাবে পেরেছে সেইভাবেই লক্ষ রূপের হাটে নিজেদের মিলিয়ে দিয়েছেন। কালকূটও এই লক্ষ রূপের মানুষের মধ্য দিয়ে নিজেকে দেখতে দেখতে অমৃতের পরশ পাওয়ার জন্য এই মহাসঙ্গমে এসে উপস্থিত। তিনি দেখেছেন সাপুড়েরা এসে দলে দলে ময়াল অজগর ছেড়ে দিয়ে, মেলায় বসে পড়েছে। বিচিত্র রূপে সজ্জিত তারা, আলখাল্লাটি লাল রঙের তাতে পুঁতি ও কড়ি বসানো। ছোট ছোট কিছু শিশু সারা গায়ে ছাই মেখে উলঙ্গ অবস্থায় শয্যায় শুয়ে থর্ থর্ করে কাঁপছে। এই শিশু যোগীদের জিভে এক ফুট পরিমাণ সরু ত্রিশূল ঢোকানো আছে। আর কিছু শিশু-সাধু চোখ বুজে বসে আছে। তারা আবার হাত তুলেও আশীর্বাদ করছে।

এমন সব বৈচিত্র্যময় জীবনধারা দেখে কালকূট যা বুঝতে পেরেছেন, চিনতে পেরেছেন তাই তিনি তুলে ধরেছেন ৭ই ফেব্রুয়ারির ১৯৫৪ দিনলিপিতে। এর পরবর্তী দিনলিপিটি লিখেছিলেন ১৪ ফেব্রুয়ারী। এটিও আনন্দবাজারেই প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু পূর্ণিমার দিন ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে গিয়েছিলেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারীর এই প্রতিবেদনটির কোন উপনাম কালকূট দেননি। পূর্বের প্রতিবেদনের সূত্র ধরে তিনি তার লেখনীকে গতিশীল রেখে এগিয়ে গেছেন মেলার পরবর্তী বিষয়গুলি বিবৃত করবার জন্য। দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি কালকূট তুলে ধরেছেন আরও প্রাকৃতিক বিপর্যায়ের কথা। পৌষ-পূর্ণিমায় মহাসঙ্গমের স্নান শেষে মেলা প্রাঙ্গণ একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। একদিকে তীব্র শীত আর একদিকে পূর্ণিমার কয়েকদিন পরেই কালবৈশাখী ঝড়ের মতো দুরন্ত মেঘ গর্জন আর বিদ্যুতের ঝলকানি সহ প্রবল বৃষ্টি নেমে আসায় প্রয়াগের মেলাস্থলের হাজার

হাজার তাবু সমুদ্রের ঢেউয়ের মত দুলতে লাগল। কল্পবাসীদের স্বল্প আচ্ছাদনের আস্তানাগুলো ভেসে গেল; তছনছ হয়ে গেল ঝড়ে-জলে। যেসব সাধুরা বালির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে আস্তানা গেড়েছিল সেগুলো ভেসে গেল। মেলা থেকে আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে চলা মানুষদের দেখে কালকূটের প্রথমে মনে হয়েছিল "সমস্ত মেলা ভাঙিয়া মানুষ বুঝি আজই চলিয়া যাইবে।" *(পৃ: ১৫৭৩, ঐ)* কিন্তু কালকূটের এই ভুল ভেঙেছিল। তিনি দেখেছেন যেসব পুণ্যার্থীরা এসেছিল তারা কেউ মেলা ছেড়ে একেবারে চলে যায় নি। বৃষ্টির পরে তীব্র শীতের প্রকোপে জ্বালানী সংকট দেখা দিল। জ্বালানী কাঠের ব্যবসায়ীরা, সুযোগের সদ্ব্যবহার করল। পুণ্যার্থী মানুষেরা নিরুপায় হয়ে অধিক দামে জ্বালানী কাঠ কিনতে বাধ্য হল।

কালকূট মেলার পুণ্যার্থী ও ব্যবসায়ীদের এই চিত্র খুবই সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন সমাজের সুযোগ সন্ধানীদের। তারা কিভাবে তাদের লোভের জাল বিস্তার করে। পর পর দুদিন ক্যাম্পে আগুন লেগে গেল। পুণ্য লোভাতুর মানুষ পুণ্য করতে এসে মৃত্যুকে আলিঙ্গ ন করল। পকেটমারদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ নারী। এটাও কালকূটের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে।

মেলার খণ্ড খণ্ড চিত্র, টুকরো টুকরো ঘটনা কালকূটের চোখে ধরা পড়েছে। তিনি প্রতিটি ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজেকে মন্থন করতে করতে অমৃতের স্বাদ পেতে চাইছেন। মেলার লক্ষ লক্ষ মানুষের এমন সব চিত্র তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে মেলে ধরেছেন। মহামারী-প্রতিষেধক ইনজেকশন নিতে ভীতি লক্ষ্য করেছেন উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিশাল স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যবতী কৃষাণ-কৃষাণীদের মধ্যে। তারা কান্নাকাটি করছে। কালকূট এ বিষয়ে "কুসংস্কারই যে তাদের মনে এক অজানা ভীতি জানাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।" *(পৃ: ১৫৭৩, ঐ)*

সঙ্গমে ডুব দেওয়ার জন্য আট আনা কর দিতে হবে— এই জনশ্রুতিতে গ্রাম্য নরনারীরা মেলায় আসা কমিয়ে দিয়েছিল। সাধুরা প্রতিদিনই মিছিল করে এসেছে ধ্বনি, সঙ্গীত ও নাকাড়ার শব্দ সহযোগে, মিছিলের অগ্রভাগে নাগা সাধুরা ত্রিশূল, তলোয়ার ইত্যাদি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন কসরত করতে করতে মেলায় আসছে। মোহান্ত গুরু আচার্যরা মোটরগাড়ি অথবা হাতির উপর হাওদায় বসে আসছেন।

কালকূট সাধুদের সঙ্গে আলাপ করে যে অনুভূতি লাভ করেছেন তা মেলে ধরেছেন এইভাবে— "কয়েকজন সাধুর সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলাম এই নাগাবাহিনী সমস্ত সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে। যেখানেই থাকুক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় তাহারা আসিবেই। ইহারা প্রকৃতপক্ষে সাধু সম্প্রদায়ের ফৌজ বা পল্টন।" *(পৃ: ১৫৭৩, ঐ)* কালকূটের অবাক লেগেছে চশমা চোখে উলঙ্গ নাগা সাধুর মুখে ইংরাজি শুনে।

গঙ্গার ওপারের ঝুসির বালুচরে সাধুদের আস্তানা। এইখানে সাধুচেলা আশ্রম। দেশ-

বিদেশের পত্র-পত্রিকা এখানে আছে, সুতরাং শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের ভিড় এই আশ্রমে। পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশে আদি আশ্রম আছে। বলে বর্তমানে কাশীতে এই আশ্রমটি নতুনভাবে গড়ে উঠেছে। কত যে বিচিত্র রকমের সাধু আছে তা কালকূটের চোখ দিয়ে এই প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। তিনি দেখেছেন একদল সাধু দ্রুতপদে হেঁটে চলেছে ধূলায় ঢেকে গেছে পা, চলাই তাদের সাধনা। কালকূট বিস্মিত। তিনি লিখেছেন "এই চলা কখনও থামিবে না। মানুষের প্রকৃতিতে তাহা কী করিয়া সম্ভব তাহা জানি না।" *(পৃ: ১৫৭৩, ঐ)* আর এক ধরনের সাধু, দুইদিকে ক্রাচের মতো দুটি গাছের ডালের উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে, আমৃত্যু এইভাবেই থাকবে। তারও পা ফুলে গেছে। আর এক ধরনের সাধু গাছের আগ ডালে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকে, দিনান্তে একবার ভাগবত পাঠ শোনার জন্য নেমে আসে, পানাহার করে না। অসংখ্য মৌনীবাবা। ছড়িয়ে আছেন, নানারকম হঠযোগী বহু ভঙ্গিতে হঠযোগের প্রদর্শন দেখাচ্ছে। বিহার কীর্তন ক্যাম্পে তিনটি ছেলেকে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ সাজিয়ে একজন আধুনিকা তরুণী, জর্জেট পরিহিতা, লম্বা বিনুনী ঝুলিয়ে নেচে চলেছে, তার নাচ শেষ হয়ে গেলে একজন বয়স্কা নাচ শুরু করলেন। এরা গৃহী নয় সাধিকা। সারা কুম্ভমেলায় অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনা কালকূট তুলে এনেছেন লক্ষ মানুষের হৃদয় মন্থন করে। সাধু-সন্তদের সংখ্যা মেলায় বেশি, কালকূট তার প্রতিবেদনটিতে সেই চিত্রই তুলে ধরেছেন। সাধু-সন্তসহ লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে মহাসঙ্গমে পুণ্যস্নানের পুণ্যমুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিল। তাদের অনেকেরই সেই পুণ্যস্নান সম্ভব হয় নি। ভিড়ের চাপে বহু পুণ্যার্থীর ভয়াবহ পরিণতি হয়েছিল। মহাসঙ্গমের পুণ্যভূমি মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছিল। কালকূট অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে লিখেছেন — "সমস্ত হিন্দুস্থান তার ধর্ম, তার মানুষ, তার কারু ও চারুকলা, শিল্প, সবকিছু লইয়া যে মহামেলার সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই মহামেলা আজ বিষাদভূমি হইয়াছে।" *(পৃ: ১৫৭৪, ঐ)*

কালকূট তথা সমরেশ বসু প্রয়াগের মেলায় গিয়েছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক হিসাবে মেলা পরিক্রমার বিবরণকারী হিসাবে। সেই তিনি যা দেখেছিলেন যা বুঝেছিলেন তাই তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তখন তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি ছিল অপূর্ণ, তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার অপূর্ণতাকে ধীরে ধীরে পূর্ণতার পথে নিতে চেষ্টা করেছেন। মেলার বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে কালকূট তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদ পাঠকের কাছে পৌঁছতে চেয়েছেন। এইজন্য তিনি হরিদ্বারের পুণ্যকুম্ভে পুনরায় যাওয়ার সময়ে প্রথমবারের অভিজ্ঞতাকে পাঠককুলের কাছে একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে হরিদ্বারের পথে এগিয়ে গেছেন।

দ্বিতীয়বারও মেলার বিভিন্ন তথ্য-ঘটনাবলী তিনি নিজ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে বিবৃত করে সংবাদ পাঠকের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছতে চেয়েছেন। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদ

পরিবেশক হিসাবেই প্রথমবারের মতো দ্বিতীয়বার পূর্ণকুম্ভে গিয়েছিলেন। তাঁর বাউল মনের আর্তিতেই তিনি পথে বেরিয়ে পড়েছেন বারে বারে। কালকূট অমৃতের সন্ধান করেছেন; লক্ষ মানুষের তৃষ্ণা কালকূটের বুকে বিষের জ্বালা ধরিয়েছে। কালকূট নিজেই তাঁর বুকের গরলের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য বলেছেন — "দেবাসুরের সকল পণের, সর্বশক্তি প্রয়োগে যে অমৃতের দাবি, তার চোখে তখন লক্ষ মানুষের রূপে সেই অমৃতকুম্ভ টলটল করছে। অথচ তৃষ্ণা মিটছে না, বাড়ছে। রূপের আকণ্ঠ তৃষ্ণা মন্থন করে, প্রাণে গরলের উদ্ভব হয়েছে। তখন আর গরল উদগীরণ না। তৃষ্ণার গরলকে মন্থন করে, অমৃতের স্বাদ চাই। সেই আবার নতুন করে জন্মান্তর ঘটে গেল কালকূটের। অমৃতের সন্ধানী, আমি দারুণ বিষে জর্জরিত কালকূট।" *(পৃ: ১৫৭৬, ঐ)*

কালকূটের নিজের জন্মান্তরের ঘটনা এইজন্যই আবার নূতন করে উল্লেখ করলেন কারণ তিনি যখন প্রথম কালকূট নামটি ধারণ করেছিলেন তখন তার উদ্দেশ্য আর সিদ্ধান্ত ছিল "রাজনৈতিক ভাষ্যে, কালকূট কেবলই গরল উদগীরণ করবে।" *(পৃ: ১৫৭৬, ঐ)* শুরুও করেছিলেন সেই একটি রাজনৈতিক প্রতিবেদন লিখে কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ঐটিই প্রথম এবং ঐটিই শেষ। কেননা, তিনি রাজনৈতিক জটিলতার আবর্তে ও কারার বাইরে কারায়, গণ্ডীবদ্ধ জীবনের জটিল আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে যখন তার নাভিশ্বাস উঠছে তখনই ডাক এসেছিল প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গম থেকে, তেরশো একষট্টির মাঘ মাসে। সেই থেকে তাঁর সন্ধানী মনটা তার কোনদিন ঘরে ফিরতে পারে নি। সংসারের দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে অমৃতের সন্ধানে নিজেকেই সন্ধান করে ফিরছেন।

বঙ্গাব্দের হিসেবে তেরশো বিরানব্বইয়ের বসন্তে আবার নতুন করে নিমন্ত্রণের ডাক পেয়ে কালকূট বলেছেন, "ডাক এসেছে গঙ্গাদ্বারের পূর্ণকুম্ভের লক্ষ হাতের হাতছানিতে। লক্ষ মুখের হাসির আমন্ত্রণে। বহুকাল পরে, বহুপথ ঘুরে আবার সেই পূর্ণকুম্ভ। মধু চৈত্রের সংক্রান্তিতে গঙ্গ াদ্বারের গঙ্গায় অমৃতের উদ্ভব হবে। সারা ভারতের অমৃতের প্লাবনের উচ্ছ্বাস স্রোতে বইবে।" *(পৃ: ১৫৭৬, ঐ)*

"প্রাচীন গঙ্গাদ্বার, আধুনিক হরিদ্বার। তার পূর্ণকুম্ভ যোগে, এই আমার প্রথম আমন্ত্রণ। কালকূটের আকণ্ঠ তৃষ্ণায়, ফাটি যাওত ছাতিয়া। বঙ্গাব্দের হিসেব একত্রিশ বছর পরে, আবার নতুন করে আমার পূর্ণকুম্ভ যাত্রা। ইতিমধ্যে, হারিয়েছি কী, পেয়েছিই বা কী, তার হিসাব হবে, মহাভারতের গঙ্গাদ্বারের তটে। কেবল জানিনে, হিসেবটা কোনকালেই এ জীবনে মিলবে কি না। কিন্তু আর তো এমন করে, নিজের অপরিচয়টাকে নিয়ে ফিরতে পারিনে। অমৃতের আকণ্ঠ তৃষ্ণার মতই এই অপরিচয়। আমার আবিষ্ট অমৃতেই কি নিজেকে দেখতে পাব। অমৃতে আমাকে নিয়ে চলো। এই প্রার্থনা নিয়ে যাত্রা — অমৃতং গময়।" *(পৃ: ১৫৭৬, ঐ)* পূর্ণকুম্ভের মেলায় পরিভ্রমণের সময় তিনি বারে বারেই মানসচক্ষে ফিরে গেছেন ৩১/৩২ বছর আগের প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভের

মেলায়। সময়ের সাথে সাথে মানুষের রঙরূপ বদলে যায়, অন্তরের আর্তিও কি বদলে যায়? এই বত্রিশ বছরের ব্যবধানে তিনি লক্ষ মানুষের আরশিতে মানব-জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়ে।

দিনলিপি ভিত্তিক লেখার মধ্য দিয়ে গঙ্গাদ্বার অর্থাৎ হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভে দেখা ঘটনাবলী ও উপলব্ধিগুলো তুলে ধরেছেন। প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভের থেকে হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভে যাত্রার যোগসূত্র হিসাবে তিনি লিখেছেন 'প্রয়াগ থেকে গঙ্গাদ্বার'। এই লেখার মধ্য দিয়ে তিনি বারে বারে ফিরে গেছেন তেরশো একষট্টির প্রয়াগের কুম্ভমেলায়। ৭ই এপ্রিল হরিদ্বারে দেখা ঘটনাবলী তিনি লিখতে শুরু করেছেন ৮ই এপ্রিল সকাল থেকে। সে লেখা চলেছে ১৬ই এপ্রিল পর্যন্ত। ৭ই এপ্রিল থেকে কুম্ভমেলার মেলা দেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পারিপার্শ্বিকতাকে যেভাবে দেখেছেন ও উপলব্ধি করেছেন তার ক্রমপর্যায়টি এরূপ — কালকূট তাঁর ৮ই এপ্রিল দিনলিপিটির একটি উপনাম দিয়েছেন। "আসন্ন সন্ধ্যার পাখির চোখে।" এতে তিনি তুলে এনেছেন ৭ই এপ্রিলের দেখা বিষয়গুলি। কিন্তু সেগুলো বলার আগে তিনি পূর্ণকুম্ভের যোগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভে তিনি 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' লিখেছিলেন সে সময় পূর্ণকুম্ভের যোগ সম্পর্কে তাঁর মনে কোন প্রশ্ন জাগেনি। পূর্ণকুম্ভ কতদিনে হয় এবং তা যে বিভিন্ন স্থানে হয় এবং সেই সেই স্থানের পূর্ণকুম্ভমেলা যে একইসঙ্গে ঘটে না ইত্যাদি বিষয়গুলো তাঁর চিন্তা জগতে তখন প্রভাব ফেলেনি। কারণ সেই প্রয়াগের কুম্ভমেলায় যাওয়ার প্রেক্ষাপটটি ছিল ভিন্ন এবং অভিজ্ঞতার ঝুলি ছিল অপূর্ণ। কিন্তু তেরশো বিরানব্বইয়ের কুম্ভমেলায় প্রায় ৩১ বছর পরে এসে এই মেলার যে তিথি নক্ষত্র যোগ আছে, যা সাধারণভাবে চলে আসছে — বার বছর পর পর পূর্ণকুম্ভ মেলা হয় তা যে বাস্তবে সব সময় ঘটছে না তিথি-নক্ষত্র যোগের কারণে — সেই বিষয়টি তিনি অভিজ্ঞ মন নিয়ে দেখে চলেছেন এবং একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন **'পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ'** রচনাটির মধ্যে।

গঙ্গাদ্বারের পূর্ণকুম্ভে এসে তার যে অপরূপ মহিমা প্রত্যক্ষ করেছেন তা তিনি নিজ দিনলিপিতে বলেছেন। গঙ্গাদ্বারের নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু মাহাত্ম্য। গঙ্গাদ্বারই হরিদ্বার, হরদ্বার, স্বর্গদ্বার, মায়াপুর, মোক্ষদ্বার, কঙ্খল ইত্যাদি বহু বিচিত্র ও অপরূপ সব নামে পরিচিত। এইসব নামের সঙ্গে যে সব ইতিহাস জড়িয়ে আছে সেইসব ইতিহাসকে তিনি ধীরে ধীরে বর্তমান সমাজপ্রেক্ষিতে উন্মোচিত করেছেন।

৮ই এপ্রিলের লেখাটিতে তিনি জানিয়েছেন যে এবার কলকাতা থেকে পূর্ণকুম্ভে যাত্রা শুরু প্রথমবারের মতই মৃত্যু দিয়ে। তাঁর এক সাহিত্যিক বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলেন দূরভাষে। কিন্তু শেষবারের মতো তাকে দেখতে যেতে পারেন নি, সেদিনই হরিদ্বার যাচ্ছিলেন বলে। বন্ধুর

মৃত্যুসংবাদ তাঁর মনে এক অনন্য মাত্রা যোগ করে দিয়েছিল। তাঁর মনের মণিকোঠায় আবার সেই একত্রিশ বছর আগের ট্রেন যাত্রার করুণ দৃশ্য ভেসে উঠেছিল। যাত্রী ভিড়ে ঠাসা ট্রেনের কামরায় পূর্ণকুম্ভ তীর্থযাত্রী তার মুখের রক্ত তুলে তার যাত্রা শেষ করেছিল। প্রয়াগ যাত্রার প্রাক্কালেই সহ তীর্থযাত্রীর মৃত্যু কালকূটের মনে এক নতুন চেতনা এনে দিয়েছিল। তাঁর মনে আলোড়ন উঠেছিল, প্রশ্ন জেগেছিল, কীসের আশায় পূর্ণকুম্ভের মেলায় যেতে চেয়েছিল? পুণ্যের নেশায়? রোগমুক্তির আশায়? সে কি পুণ্যস্নানে তাঁর পাপমুক্তি ঘটাতে প্রয়াগে যেতে চেয়েছিল? কালকূট তাঁর বিষে জর জর দেহ নিয়ে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভের মেলায় পৌঁছে গেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষের আরশিতে অমৃতের স্বাদ নিতে।

৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় ব্রহ্মকুণ্ড থেকে ফেরার পথে কালকূটের নজরে এল গ্রাম্য উস্কখুস্কো চুল শীর্ণ মুখের মানুষকে। হঠাৎ সেই গ্রাম্য মানুষটি তার ঝোলা থেকে একটি হলুদ রঙের খাম বের করে তার ভেতর থেকে একটি এক্স-রে প্লেট বের করে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকের কাছে সে জানতে চেয়েছিল "বাবুজী, দেখুন তো এই ফটো, আমার বুকের ক্যামেরার ছবি। আমি কি ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানে যেতে পারব? স্নান করলে বাঁচব তো?" *(পৃ: ১৫৭৭, ঐ)* কালকূটের চোখে আবার সেই রেলগাড়ির কামরার মধ্যে পূর্ণকুম্ভ যাত্রীর মৃত্যু চিত্র ভেসে উঠল। এ চিত্র দেখে তিনি নিজের মনেই প্রশ্ন করেছেন "শুরু যে একই রকম? এতকাল পরেও তবে পরিবর্তন কোথায়, কতখানি ঘটেছে?" *(পৃ: ১৫৭৭, ঐ)* গ্রাম্য লোকটি কেন এসেছে? তাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছেন কুম্ভমেলায় পুণ্যস্নানে এসেছে রোগমুক্তির সঙ্গে পাপমুক্তির জন্য। কুম্ভমেলার প্রথম দিনের দেখাকে কালকূট বলেছেন "আমার আজকের দেখাটা, আসন্ন সন্ধ্যার পাখির শেষ ওড়ার মুহূর্তের মত।" *(পৃ: ১৫৭৭, ঐ)* প্রথমদিনের দিনলিপি এখানেই শেষ করেছেন কিন্তু প্রথমদিনের দেখার গভীরতা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর উপলব্ধিতে উঠে এসেছে, কালকূট জীবনের সন্ধ্যাবেলায় উপস্থিত, বুকে তার রোগের ছোবল। মানবজীবন থেকে প্রাণ পাখি উড়ে যাওয়ার আগে যেটুকু দেখে নেওয়া যায়, লক্ষ রূপের মানুষের মধ্য থেকে, সেটুকুই তিনি দেখে নিচ্ছেন।

'প্রয়াগ থেকে গঙ্গাদ্বার' এই উপনাম দিনলিপিতে দেখা যাচ্ছে তিনি বারে বারেই ফিরে গেছেন প্রথমবারের কুম্ভমেলার স্মৃতিতে। তিনি হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় চলেছেন লক্ষরূপের আরশিতে অমৃতের স্বাদ পেতে। কালকূট নিজেই বলেছেন এ বিষয়ে, "মাঘে, প্রয়াগে, পূর্ণকুম্ভের পুরাণের কাহিনীটা অনেকবার মনে পড়েছে। দেবতা আর অসুরদের সমুদ্রমন্থন। সেই সমুদ্রমন্থনে প্রথম গরলের উৎপত্তি। গরল থেকে অমৃতের উদ্ভব। সেই কাহিনীটার অন্তর্নিহিত অর্থ যাই হোক, পূর্ণকুম্ভ যোগে, প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী এই ত্রিবেণী সঙ্গমে সেই অমৃত উত্থিত হয়।

লক্ষ লক্ষ মানুষের রূপে কালকূট মাতাল হয়েছিলেন। কিন্তু প্রয়াগের মেলায় দাঁড়িয়ে কালকূটের রূপের তৃষ্ণা মেটেনি। প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভ তাঁকে দিয়েছে আকণ্ঠ তৃষ্ণার হাহাকার। সেই আকণ্ঠ তৃষ্ণার হাহাকারের মধ্য দিয়ে যে 'ভারত দর্শন' ঘটেছিল, সেই যাত্রাকেই কালকূট 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' নামে অভিহিত করেছেন। 'প্রয়াগ থেকে গঙ্গাদ্বার' দিনলিপিতেই তিনি তার সেই ৩১/৩২ বছর আগের উপলব্ধির কথা বারে বারে ব্যক্ত করেছেন। অতীতের অভিজ্ঞতার ঝুলি কাঁধে নিয়ে হরিদ্বারের কুম্ভমেলার দিকে পা বাড়িয়েছেন। তিনি লক্ষ মানুষের মধ্য দিয়েই আত্মানুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রাণের তীব্র হলাহলের জ্বালা মেটাতে চান। তাঁর নিজের মনে যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন সেই প্রশ্নেরই সম্মুখীন হতে হয়েছিল প্রথমবার প্রয়াগযাত্রার কালে। বন্ধুর বক্রোক্তিজনিত প্রশ্ন ছিল "কেন যাচ্ছো কুম্ভমেলায়? *(পৃ: ১৫৭৫, ঐ)* সে সময়ে কালকূট তাকে বোঝাতে পারেন নি, যে প্রতিবেশীকে প্রতিদিন দেখেও তেমন করে দেখেন নি, সেই প্রতিবেশীকে লক্ষজনের মেলায় বিশেষ মুহূর্তে নতুন রূপে আবিষ্কার করা ও সেই নতুন রূপে মুগ্ধ তিনি, সেই নতুন রূপের রস সুধা পান করতেই তিনি ছুটে যাচ্ছেন লক্ষ মানুষের ভিড়ে। তার নতুন করে দেখা মানুষটিকে প্রশ্ন করেছিলেন কালকূট "কেন যাচ্ছেন? তীর্থ করতে?" *(পৃ: ১৫৭৫, ঐ)* উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন যে, একরকম অর্থে তীর্থই বলা যায়, কেননা রাম, সীতা আর লক্ষ্মণকে নিয়ে তো এইখানে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমেই এসেছিলেন। কিন্তু তিনি খুঁজতে এসেছেন এমন একজনকে যাকে একবার দেখলে আর কিছু চাইবার থাকবে না। তিনি ঈশ্বর কিনা তা জানেন না, কখন কীভাবে তার দেখা মিলবে জানা নেই। তবুও তিনি এসেছেন, লক্ষ রূপের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজতে? কালকূটের দৃষ্টিতে নতুন রূপে দেখা দিলেন মেলায় আসা মানুষটি, তিনি অজান্তেই তাঁর নমস্কার আদায় করে নিলেন, নিজের অজান্তেই তাঁর হৃদয়ের তীব্র হলাহলের জ্বালা একটু একটু করে প্রশমিত হতে চলেছে অমৃতের স্বাদ পেয়ে।

বত্রিশ বছর পরে দিল্লি থেকে হরিদ্বার যাওয়ার পথে এক সহযাত্রীর মুখেও একই প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন। "কী দেখতে যাচ্ছেন? সব তো বুড়োবুড়ি।" *(পৃ: ১৫৭৮, ঐ)* যে প্রশ্নের উত্তর কালকূট বত্রিশ বছর আগে বন্ধুকে দিতে পারেন নি, এবার তিনি পেরেছেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় তিনি ঋদ্ধ, তিনি প্রশ্নকর্তাকে জানিয়েছিলেন যে, বয়সের চিন্তা তাঁর মাথায় আসেনি, কাদের দেখতে যাওয়া হচ্ছে সেটা মেলায় গেলে প্রশ্নকর্তা নিজেই বুঝতে পারবেন। কালকূটের এই কথার মর্মার্থ ৯ এপ্রিলের দিনলিপিতে উল্লেখ করেছেন।

৯ই এপ্রিলের দিনলিপিতে কালকূট 'পাখির চোখে ঘুম নেই' উপনাম দিয়েছেন। প্রথম দিন আরতি না দেখেই তিনি ব্রহ্মকুণ্ড থেকে চলে এসেছিলেন। পরে আবার গিয়েছিলেন ব্রহ্মকুণ্ডে। ব্রহ্মকুণ্ড থেকে কালকূট গঙ্গার মূলস্রোত ধারাকে লক্ষ্য করেছিলেন। ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে সামান্য

আবরণে নিজেকে জড়িয়ে যুবক, যুবতী, বধূ, তরুণী, কুমারী পুণ্যস্নানে মেতেছে, গঙ্গাদ্বারের গঙ্গ াতীরে বসন খুলতে কোন সংকোচ নেই। কালকূট লক্ষ্য করছেন তার প্রশ্নকর্তা সঙ্গীটিকে। "তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, দু'চোখ ভরা অবিশ্বাস আর বিস্ময় নিয়ে সে তাকিয়ে আছে ঘাটের দিকে।" *(পৃ: ১৫৭৮, ঐ)* তাঁর মনে স্থির বিশ্বাস যে, তিনি তাকে আরও অনেক উৎসর্গের সৌন্দর্য দেখাবেন। মানুষ নিজেকে উন্মুক্ত করছে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য। সেই প্রয়াগের কুম্ভমেলার দৃশ্যের মত। তাঁর মনে জিজ্ঞাসার ঝড় উঠেছে, এতকাল পরে তাহলে কী পরিবর্তন হয়েছে। হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভে সেটাই মিলিয়ে নিতে শুরু করেছেন। প্রয়াগে যখন এসেছিলেন, তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল 'কল্যাণী কংগ্রেস' যাওয়ার পথে কুম্ভে এসে পুণ্যস্নান করে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সেই সময়ে গঙ্গার ওপারে সাধুদের থাকবার আস্তানা করায় অসন্তুষ্ট নাগা সন্ন্যাসীরা তাঁর সঙ্গে দেখা করেন নি। বত্রিশ বছর পরে হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় ভারতের যুবক প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন ২৬শে চৈত্র মেয়েদের ঘাট উদ্‌ঘাটন করার জন্য, তিনিও পুণ্যস্নান করেছিলেন। ২৪শে চৈত্র সন্ধ্যার আগে হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডের কাছে যা দেখেছিলেন তা তুলে ধরেছেন ২৫ শে এপ্রিলের দিনলিপিতে। তিনি আবার ২৬ শে চৈত্র ব্রহ্মকুণ্ডেই দেখেছেন, স্নানরত পুণ্যার্থীদের মধ্যেই একজন ভেসে গিয়েছিল, উদ্ধার করা যায় নি। গঙ্গার তীব্র স্রোতে তার মুক্তি ঘটেছে এই পুণ্যতীর্থে। এই ঘটনার পর সেই ঘাটেই তিনি দেখলেন একজন মাকে, উন্মুক্ত বক্ষে এক শিশু কোলে বসে আছে। শিশুটি হাত-পা ছুঁড়ে হাসছে। জীবনমৃত্যুর এই নিরন্তর খেলা, নদীর মতোই বয়ে চলেছে।

কালকূট ২৫শে চৈত্রর শেষরাতে ২৪শে চৈত্রর আসন্ন সন্ধ্যায় দেখা ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। ২৪শে চৈত্রর সন্ধ্যারাতে ব্রহ্মকুণ্ড থেকে ফিরে এসে রাজসিক পান্থশালার দ্বিতল থেকে প্রায় 'সারারাত ধরে কত মানুষ, কত বেশে, কত রূপে আসছে' তা দেখেই চলেছেন। পথ চলতি মানুষেরা কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে ক্ষণিকের জন্য কালকূটের মনে ভাবনার উদয় তাদের দৃষ্টিকে লক্ষ্য করে। কৌতূহল না তৃষ্ণা? তৃষ্ণাকে তিনি ঈর্ষা বলছেন। তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ঋদ্ধতায় তাদের দৃষ্টিতে অনেক কিছু বুঝতে পেরে যান, কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে হয় না। যেমন পান্থশালা থেকে বর্ণবাহারে নারীদের পরস্পরের হাসাহাসি থেকে কালকূট বুঝতে পারেন, তাদের কৌতুক মিশ্রিত হাসিতে উঁকি দিচ্ছে একটা জিজ্ঞাসা, একটা আবেগ উচ্ছ্বাস সেই জিজ্ঞাসার সঙ্গে উঁকি দিচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে এই সাধারণ কথাটি কালকূটের চোখে ধরা পড়েছে অন্যরূপে। তিনি বলেছেন, "কিন্তু পুণ্যের সঙ্গে, গৃহ থেকে এই বহির্জগতে বেরিয়ে আসতে পারার আনন্দে মুক্তির স্বাদও তারা পান করছে গণ্ডুষে গণ্ডুষে। অপরিচিত পুরুষের দিকে তাকাতে আজ তাদের নিষেধের ভ্রূকুটি কঠিন দৃষ্টির নিঃশব্দ সংকেত নেই। আর, হে, রমণী, তুমি ছাড়া তোমাকে পুরুষ কবে আর

ভাল করে চোখ মেলে দেখেছে?" *(পৃ: ১৫৭৮, ঐ)*

কালকূটের চোখে এই গ্রাম্য, দরিদ্রতায়পূর্ণ অল্প বয়সের বধূরা অনন্য রূপে উঠে এসেছে। তিনি কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোটালের বান দেখছেন। ঐ চলমান মানবস্রোতের চাউনিটা বুঝতে পেরেছেন। "তোমরা ভাবছ, বেকুবটা ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছে? ও কি আসবে না আমাদের সঙ্গে। তোমার ভিতরের এই ডাকের মধ্যেই আর এক রূপে যে দেশের ডাকও আছে।" *(পৃ: ১৫৭৮, ঐ)*

কালকূটের কানে ভেসে আসছে ভারতের দূর-দূরান্তের জনপদ থেকে আসা মানব-মানবীর ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান-হাততালিতে মুখরিত রাজপথ। আসন্ন সন্ধ্যার পাখির চোখে ঘুম নেই, মনের মধ্যে আলোড়ন উঠছে। তাঁর ভিতরটা তাঁকে কেবল বারান্দা থেকে নামিয়ে নিয়ে লক্ষ রূপের মিছিলের অংশীদার করতে চাইছে আর বাইরেটা তাঁকে কড়া চোখে নিষেধের ভ্রূকুটি করছে। কালকূট লক্ষ রূপের সঙ্গে এবারে মিলতে পারলেন না বয়সের কারণে, অসুস্থতার কারণে।

লক্ষ রূপের কোটালের বানের ঢেউ দেখতে দেখতে শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম থেকে উঠে তিনি চৈত্রের ২৫ তারিখে ২৪শে চৈত্রের দেখা ঘটনাবলী লিখতে শুরু করেছেন। তিনি এক আবেগমথিত অনুভূতিতে বলেছেন, "আমি যে সময়ের সঙ্গে তোমাকে মহাকালের কোলে রেখে, তোমারও পরিবর্তন দেখব ভেবেছিলাম। অথচ দেখছি — সারারাত ধরে দেখলাম, তোমার সিংহাসনের তলায় যে মানুষের ধারা, সেখানে তুমি বত্রিশ বছরের আগের রূপেই আসীনা। পাখিটাকে ঘুমাতে দাওনি সারা রাত।" *(পৃ: ১৫৭৮, ঐ)*

৯ এপ্রিলের দিনলিপিতে দেখা যাচ্ছে তাঁর বর্তমানের উপলব্ধিতে বারে বারে প্রয়াগের উপলব্ধিকে নতুন করে মনে করিয়ে দিয়ে ঘটনাবলীকে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছেন।

কালকূট ১০ই এপ্রিলের লেখা দিনলিপিতে 'নির্ভয় শক্তির পথে, নির্ভয়ে' উপনামে অভিহিত করেছেন। বিচিত্র রূপে, বিচিত্র বর্ণে কুম্ভমেলাকে দেখে চলেছেন। চৈত্রের সংক্রান্তির কয়েকদিন আগেই কালকূট এসে উঠেছেন হরিদ্বারের এক রাজসিক পান্থশালায়। পশ্চিম দিক থেকে আসা রাজপথ সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে পূর্বে গঙ্গার ত্রিধারার দিকে। ধর্মীয় বিশ্বাস মতো একটি ধারা ব্রহ্মকুণ্ড আর কুশাবর্তের ঘাট ভাসিয়ে চলেছে, ব্রহ্মকুণ্ড বা হর-কি পৌরির পুবে বিশাল ধারাটি দ্বিতীয় আর তৃতীয় ধারাটি চণ্ডী পাহাড়ের নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে, নীলধারা। কয়েকদিন কালকূট হরিদ্বারে মেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছেন লক্ষ রূপের মধ্যে থেকে অমৃতের স্বাদ আস্বাদনের জন্য। কিন্তু তেমন করে ঘুরতে পারেননি শরীরের জন্য, ফিরে এসেছেন তাঁর রাজসিক পান্থশালায়। কালকূট পান্থশালাটি রাজসিককে বলেছেন এই কথার আড়ালে কালকূটের শ্লেষ জড়িয়ে রয়েছে। পূর্ণকুম্ভে বহু মানুষের সমাগম হবে, স্থান সংকুলান হবে না, অতএব পান্থশালার

মালিকরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন, পাঁচতারা, সাততারার বা তারও বেশি মূল্য দিতে হচ্ছে প্রতিটি কক্ষের জন্য। বত্রিশ বছর পরে পূর্ণকুম্ভের মেলায় এসে কালকূটও হয়েছেন এদের লোভের অসহায় শিকার, এখানে তিনি নিজেকে বিড়ম্বিত মনে করেছেন। বত্রিশ বছরে তাঁর দেহমনের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু সেই পরিবর্তনই কালকূটকে পীড়া দিয়েছে এ সত্য কালকূটের লেখনীতে ধরা পড়েছে। কিন্তু সেই সময়েও কালকূটের চোখ দিয়ে কিছু ঘটনা উঠে এসেছে — যেমন, রিকশা-টাঙ্গাওলা, নৌকার মাঝিদের পৌষ মাস ছিল। দশ আনার ভাড়া আড়াই টাকায় রফা হয়েছে, আর 'মেলায় ঢোকার পাসে'র ভাড়া যাত্রীদেরই দিতে হয়েছিল। তাঁর চোখে দুটি মেলার মধ্যে এই সামঞ্জস্যটুকুও উঠে এসেছে। একদিকে পুণ্যার্থীদের পুণ্যলাভের ইচ্ছা আর একদিকে ব্যবসায়ীদের এই একই পুণ্যক্ষেত্রে সুযোগের সদ্ব্যবহার— বেশি মুনাফা লাভের চেষ্টা!

১০ই এপ্রিলের দিনলিপিতে দেখা যাচ্ছে, কালকূট ৭ই এপ্রিল (২৪শে চৈত্র) -এ দেখা ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রথম দিনের দেখা কিছু কিছু ঘটনা পরবর্তী দিনলিপিগুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী তুলে ধরেছেন। 'পৌরি' মানে কি? কোলকাতায় একজন বলেছিলেন পৌরি মানে ঘাট। কিন্তু কালকূট তবুও হরিদ্বারের বসবাসকারী মানুষের কাছেই জানতে চেয়েছেন এবং মেলায় 'জ্যোতিষী কা হাইকোর্ট' সাইনবোর্ড দেখে কৌতূহলী হলে সেই শিবিরে ঢুকেছিলেন। তিনি একটু কৌতুকমিশ্রিত সুরে সেই ঘটনাটি ব্যক্ত করেছেন। ওই শিবিরেই এক ব্যক্তির কাছেই তিনি জেনেও নিলেন পৌরি শব্দের মানে 'সিঁড়ি', "নদী-পুকুরের সিঁড়িকে তো আমরা ঘাটই বলি।" তাঁর এই যুক্তিকে মেনে নেওয়া যায়।

কালকূট এদিনের দিনলিপি লিখেছিলেন ঘুমের চট্‌কা ভেঙে যাওয়ার পরে, শেষ রাতে ২৪ শে চৈত্রর দেখা কিছু কিছু ঘটনা। ২৪ চৈত্র 'হর কি পৌরি'র দিকে পায়ে পায়ে সামিল হয়েছেন লক্ষ মানুষের স্রোতধারার সঙ্গে, যানবাহন সবই চলছে। হঠাৎ এক মোপেড আরোহী ধাক্কার টান সামলাতে না পেরে লেখকে কালকূট প্রায় ঘাড়ের উপরে এসে পড়তেই, ভয় পেয়ে এক রাজপুতানী বধূ বর্ণবাহার ওড়নায় ঢাকা তার মুখ, ঢাউস মোটা বালার হাতটা দিয়ে পাঞ্জাবী খামচে ধরেছিল কালকূটের। সেই রাজপুতানীর দলের মুণ্ডিত মস্তক সাধুজি এক ঝটকায় বধূটির হাত কালকূটের খামচে ধরা পাঞ্জাবী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রক্তচোখে কালকূটকে যেন তীক্ষ্ম তীর বিদ্ধ করতে লাগল। কালকূট এখানে সেই মহারাজের একটু বর্ণনা দিয়েছেন। "তাঁর গেরুয়া কৌপীন, সম্পন্ন সাধুদের মতো প্রায় পায়ের কাছে লুটিয়ে না পড়লেও হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঢেকেছে। পায়ে রীতিমত জরির কাজ করা সোনালি, মাথার অগ্রভাগ হাতির শুঁড়ের মতো, ঝকঝকে নাগরা। বাঁ হাতের কব্জিতে হালের ইলেকট্রনিক্সের ঘড়ি। গায়ে হাফ হাতা পাঞ্জাবির মতো কিছু, যার রঙও

গেরুয়া।'' *(পৃ: ১৫৮৩, ঐ)* সাধুজির কপালে ডাইনে-বাঁয়ে লম্বমান ত্রিপুণ্ড্রকেই আখড়া জামাতের পরিচয় লেখা। বিরক্তি আর ক্ষোভে চোখ মুখ দুই-ই আরক্ত হয়ে উঠেছে। এই সাধু হলেন 'দশনামী' সম্প্রদায়ের শৈব সাধু।

কালকূট এই ছোট্ট একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে সাধুদের পরিবর্তিত রূপের একটি রূপচিত্র তুলে ধরেছেন। কদিনের কুম্ভমেলায় তিনি এমনি পরিবর্তিত চেহারার আরও অনেক সাধু মহারাজার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। কালকূটের এই সূক্ষ্ম ভাবনার থেকেই একটি আরও গূঢ় তথ্য বেরিয়ে এসেছে যে সাধু-সন্ন্যাসীতে মানুষের আগের মত বিশ্বাস নেই। কালকূট হরিদ্বারের এই কুম্ভমেলায় তার দেখা সাধুদের নিয়েই 'সাধু প্রসঙ্গ সাধু দর্শন' বিষয়ে একটি অধ্যায় রেখেছেন। কালকূট বত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় একটি সত্যে উপনীত হয়েছেন যে সাধুরা মানুষকে অমানুষ জ্ঞানে অবহেলা করছেন, তাঁদের ভিতরে অহংবোধ তীব্রভাবে জাগ্রত হয়েছে। এই ঘটনার পর কালকূট পায়ে পায়ে কোটালের বানের মতই ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে এগিয়ে গেছেন। একসময়ে যন্ত্রযানের চলায় ইতি হল হরিদ্বারের কোতোয়ালি গৃহের কাছে এসে। কালকূট ২৪ শে চৈত্রর ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করে চলেছেন। জানালা দিয়ে তাকিয়ে একবার দেখছেন চলমান নব নব রূপের জনস্রোত ও একবার লেখায় মনোনিবেশ করছেন, দুটোই চলতে লাগল।

কালকূটের চোখে উঠে এসেছে পান্থশালার বাইরের রূপচিত্র, বাইরে রূপের হাটে বেরিয়ে এসে দেখেছেন, স্টেশন থেকে এক দল নারী পুরুষ হলুদ রঙের পোশাকে বেরিয়ে আসতে। তীর্থযাত্রীদেরও পোশাক থাকতে পারে সেটা কালকূট আগে বুঝতে পারেন নি, পরে বুঝেছেন। বিশাল এই রূপের যে দলটি এসেছে, তাদের অনেকের সঙ্গে হয়ত পরিচয়ই নেই, একটি জায়গা থেকে অনেকে একত্রিত হয়েছে কুম্ভমেলায় আসার জন্য। অতএব সকলের জন্য একটি পরিচয় জ্ঞাপক চিহ্নই হল ওই তীর্থযাত্রীদের এক রঙের পোশাক। কালকূট তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ তীর্থযাত্রী দলের এই পোশাকের মূল রহস্যটিকে তাঁর উপলব্ধিতে তুলে ধরেছেন। কালকূটের অবাক হওয়ার পালা, মানুষকে নতুন করে চেনার দিগন্ত একটু একটু করে আলোকিত হচ্ছিল।

স্টেশন থেকে এবার অন্যদিকে চোখ ফেরাতে কালকূটের নজর এল পশ্চিম দিক থেকে আগত একটি বিশাল বাহিনীর গ্রাম্য দলটির দিকে। একটি যুবকের মাথায় একটি ঝুড়ি। তার মধ্যে একটি লোল চর্মসার জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধা বসে আছে যুবকটিকে শক্ত করে ধরে। কালকূটের বিস্ময়ের সীমা নেই, লোলচর্মসার এক বৃদ্ধাকে মুক্তি দিতে, তাঁর ইচ্ছাকে সম্মান দিতে গ্রামশুদ্ধ লোক এসেছে কুম্ভমেলায় পুণ্যস্নানে। সকলেই এসেছে পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু আর্তি দু'দিক থেকে দু'রকমের। দাদির মুক্তি আর দাদিকে মুক্তি দেওয়া — পুণ্যের ইচ্ছা দু'দিক থেকে। খুবই ছোট একটি খণ্ড দৃশ্য, কিন্তু কালকূটের চোখে বৃহৎ হয়ে ধরা পড়েছে। কালকূট বলেছেন — 'কিন্তু

নাতির মাথায় ঝুড়িতে আসীনা বৃদ্ধা, আমার মুখের হাসির ঠোঁটকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল। এখানেই আমি সংসারে হেরেছি। আমার দুহাত উঠে আসে বুকে। তারপরে কপালে।" *(পৃ: ১৫৮০, ঐ)* কালকূট বৃদ্ধার এই কুম্ভমেলায় এসে শেষ গতি লাভের নির্ভয় শক্তিকেই নমস্কার করেছেন। হরিদ্বারের কুম্ভমেলার খণ্ড খণ্ড চিত্র কালকূটের আত্মোপলব্ধির মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে।

১১ই এপ্রিলের দিনলিপিকে কালকূট 'দূরকালের উমাকে প্রণাম, প্রণাম এ'কালের উমাদেরও' — এই উপনামে অভিহিত করেছেন। কালকূট তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় একটি নির্মম সত্যকে তুলে ধরেছেন। হর-কি-পৌরি ঘাটে তীর্থে অতীতে মৃত্যুর সংখ্যার হিসাব নেই, তবুও একটা রেকর্ড আছে। যাতে তিনি দেখেছেন সেই মৃত্যুসংখ্যা ছয় হাজার অতিক্রম করে নি। রেকর্ড থাকুক আর না থাকুক, হর-কি-পৌরিতে যে মানুষটি তলিয়ে গিয়েছিল তার মৃত্যু বেদনা কালকূটকে আবিষ্ট করে রেখেছিল। তবুও লক্ষ লোকের রূপের ফেরে কালকূটের সেই বেদনা অন্তর্হিত হয়েছিল, অপরূপ রূপে সাজানো একটি মিছিল দেখে।

"মসৃণ, কৃষ্ণবর্ণ, স্বাস্থ্যবান মহিষবাহিত শকট সমূহে নানা মঞ্চের আবির্ভাব হয়েছিল।" *(পৃ: ১৫৮১, ঐ)* জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও চেতনার পরিচয় বহন করছিল মঞ্চগুলি। কোনটিতে যুবকেরা বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গান গাইছিল। সবচেয়ে আকর্ষিত হয়েছিল উত্তরাঞ্চলের রূপসী তরুণীদের নৃত্যগীত— তারা মঞ্চ থেকে নেমে এসে রাস্তা জুড়ে নাচতে নাচতে চলছিল। আর শিখ যুবকেরা ভাঙ্‌রা নৃত্যগীতের মাধ্যমে হাজার হাজার পথচলতি তীর্থযাত্রীদের মাতিয়ে তুলেছিল। কালকূট পরের দিন অর্থাৎ ২৭ শে চৈত্র গঙ্গার ওপারে এক বিশাল তাবুতে গিয়ে দেখেছেন, সেদিনও তারা মঞ্চের শকট নিয়ে বেরোচ্ছে। দেখেছেন একেবারে শেষের শকটটিতে একটু ধর্মের আভাস, একটি সিংহাসনের উপর গণেশের একটি মূর্তি ছিল। 'নর্থজোন'-এর একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক দলের কীর্তি। এতে কালকূটের মনে এসেছে হয়ত ঐ সংস্থার জানিয়ে দেওয়ার প্রয়াস ছিল— "আমাদের সংস্কৃতি, অদ্যাপি ধর্মের বাঁধন ছিঁড়তে পারে নি!" *(পৃ: ১৫৮১, ঐ)* কালকূট এই সাংস্কৃতিক দলটির নর্তক-নর্তকী-গায়ক-গায়িকাদের রূপে মুগ্ধ। তরুণীদের সুগঠিত দেহলাবণ্যে নাচের যে ছন্দ উঠেছিল, তা দেখে কালকূটের মনে হয়েছে 'পুঁথি থেকে উঠে আসা বর্ণনার মূর্তি' যেন তারা। বহু রূপের ফেরে মুগ্ধ কালকূট। সেই মুগ্ধতাই কালকূটকে মনে মনে অতীতচারী করে তোলে। গন্ধর্বদের সঙ্গে এই সুন্দরী তরুণীদের মিল খুঁজে পান। তিনি গন্ধর্বদের বাসস্থানের হদিস করতে থাকেন কল্পনায়। "ভারতের পশ্চিমোত্তরে হিমবর্তের কিছু ওপরে ও অন্তরীক্ষে, সংলগ্ন পর্বতবেষ্টিত সমতলের রমণীরাই সম্ভবত সর্বাধিক সুন্দরী।" *(পৃ: ১৫৮১, ঐ)* গন্ধর্বদের বাসস্থানের সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের সুন্দরীদের বাসস্থানের সাদৃশ্য খুঁজে পান। গন্ধর্বরা নৃত্য-গীত প্রিয় ছিল, এবং নৈতিক

দিকটি তাদের সমাজে শিথিল। তারা সোমরস পান করতে ও তৈরি করতে জানত বলে দেবতারা তাদের ঈর্ষা করত। কালকূটের উপলব্ধিতে উঠে এসেছে শিথিলতার কারণেই হয়ত 'গন্ধর্ব বিবাহ তার একটি প্রাচীন প্রতীক।' কালকূট উত্তরাঞ্চলের সুন্দরীদের রূপের মুগ্ধতার পাশাপাশি হিমালয়ের কোলে পূর্বোত্তরের সুন্দরীদের রূপের সৌন্দর্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। মহাকাব্যের নায়িকাদের মতো সুন্দরী না হলেও তারা অন্য আর এক রূপে রূপসী।

গন্ধর্ব সুন্দরীদের কথা ভাবতে ভাবতেই কামাখ্যার সুন্দরীদের নিয়ে যে মিথ্ আছে সেটা তুলে ধরেছেন। কালকূট ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছেন যে, কামাখ্যা সুন্দরীরা বিশেষত খাসিয়া সুন্দরীরা মায়াবিনী। পুরুষকে একমাত্র তারাই ভেড়া করে রাখতে পারে। তাদের সমাজে গন্ধর্বদের মত নৈতিক শৈথিল্য আছে। কালকূটের চোখে বিষয়টি স্পর্শকাতর হলেও এটি প্রাচীন ইতিহাস। ধর্ম ও বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। সময়ের সাথে সাথে সামাজিক নিয়ম নীতিও পরিবর্তিত হয়েছে।

১১ এপ্রিলের দিনলিপিতে কালকূট হরিদ্বারে গঙ্গার ত্রিধারার বর্ণনা করেছেন। 'হর-কি-পৌরি'-র পুবে বিশাল ধারাটিই কালকূটের চোখে আসল গঙ্গা। কালকূট এই গঙ্গাদ্বারে মহামেলার বিস্তৃত অঞ্চলে চলতে চলতে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বঙ্গ, মহারাষ্ট্র আর গুজরাটের পুরুষ ও নারীদের মুখে গঙ্গার স্তুতি শুনেছেন। বিভিন্ন প্রদেশে ভাষা না বুঝলেও 'হে গঙ্গা, গঙ্গা মাইয়া' শব্দের পরে প্রার্থনার সুর থেকে একটু বুঝেছেন যে, এই মহামেলায় গঙ্গাদ্বারে তারা বলছেন "মহাদেবের জটা থেকে নেমে এসেছ, তোমার স্পর্শে পুণ্য। তোমার বুকে অবগাহনে পুণ্য। তুমি আমাদের সকল গ্লানি, পাপ ধুয়ে দাও। তোমাকে পান করে আয়ু বৃদ্ধি পায়।" *(পৃ: ১৫৮১, ঐ)* কালকূট তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছেন লক্ষ মানুষের আর্তি। কেন আসে লোকে কুম্ভমেলায়? এই জিজ্ঞাসায় কালকূট রূপের ফেরে ঘুরছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের রূপের ফেরে তিনি অন্তরে গরলের জ্বালাকে অমৃতের স্পর্শে প্রশমিত করতে করতে বিস্তীর্ণ মেলা প্রাঙ্গন ঘুরে বেড়িয়েছেন, অসুস্থ শরীরে। ৯ এপ্রিলের দিনলিপিতে দেখা যাচ্ছে তিনি গঙ্গাদ্বারে দাঁড়িয়ে গঙ্গার ভৌগোলিক ব্যাখ্যা করেছেন আবার মহাভারতের সেই উক্তি "হে গন্ধর্ব, দেবলোকে স্বর্গ — গঙ্গার নামান্তর অলকানন্দা। সেই অলকানন্দাই দক্ষিণ ভারতে প্রবাহিত হয়েছে। এই অলকানন্দাই মন্দাকিনী। অধিকতর নিম্নভূমিতে সে ভাগীরথী।" *(পৃ: ১৫৮১, ঐ)* এই দিয়ে তিনি গঙ্গা স্তুতি করেছেন কিন্তু তার অনুসন্ধিৎসু মন ভৌগোলিক ব্যাখ্যায় ব্রতী হয়েছেন। ভৌগোলিক ব্যাখ্যা : 'মন্দাকিনীর বিহারক্ষেত্র সুদূর উত্তরবর্তী হতে পারে না। কারণ, উত্তরকুরু সাইবেরিয়ায়। সেখানে গঙ্গার সঙ্গে সম্পর্ক নেই।' *(পৃ: ১৫৮১, ঐ)* তিনি ভাস্করাচার্যর 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' অনুসরণ করে যে তথ্য পেয়েছেন তাই উল্লেখ করেছেন। 'বিষ্ণুপদই বা গঙ্গা তিব্বতের বিষ্ণুপদ ভূমিস্থ, বিষ্ণুপদ হ্রদ হতে উৎপন্ন হয়ে, বিস্কন্দ পর্বতের উপরের হ্রদে পতিত হয়। সেখান থেকে বিয়ং বা স্বর্গের (ইলাবৃত

বর্ষ) এক দেশ, তিব্বতের মধ্য দিয়ে চারভাগে বিভক্ত হয়েছে। তার যে ভাগটি চীন দেশ দিয়ে পূর্বসাগরে গিয়ে পড়েছে, নাম তার সীতা। যে শাখা কেতুমালাবর্ষ বা আফগানিস্তান (সংলগ্ন অন্তরীক্ষ, গন্ধর্বলোক কাশ্মীর প্রায় নিকটবর্তী) গিয়েছে তার নাম চক্ষু বা অক্সুস। আর যে-শাখা ভারতে প্রবেশ করেছে তারই নাম অলকানন্দা বা মন্দাকিনী।' *(পৃ: ১৫৮১-১৫৮২, ঐ)*

গঙ্গাদ্বারে কালকূট যে পান্থশালায় উঠেছেন। সেখান থেকে একটা ভৌগোলিক চিত্রও তুলে ধরেছেন। পান্থশালাটি এমন জায়গায় অবস্থিত যার উত্তর দিক হরিদ্বার রেলস্টেশন, পশ্চিম দিক থেকে আসা প্রশস্ত রাস্তাটির রাজস্থান মোড়ে অবস্থিত। পশ্চিম দিক থেকে আসা রাস্তাটি রাজস্থান মোড় থেকে দক্ষিণ দিকে তাঁর পান্থশালার গা ঘেঁষে চলে গেছে। আর পূর্বতর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রেলগাড়ি চলছে সারাদিন সারারাত্রি ধরে। লক্ষ লক্ষ রূপের স্রোত কালকূটের হৃদয়কে ভাসিয়ে নিয়ে ছুটে চলেছে ব্রহ্মকুণ্ডে ও গঙ্গার কূলে। পুণ্যস্নান শেষে তারা ফিরে চলেছে তারই পান্থশালার পাশ দিয়ে কনখলের দিকে। কালকূট নিজেও কনখলের পথে চলেছেন 'দক্ষযজ্ঞের সেই স্থানটিকে' দর্শন করবার জন্য। যেখানে উমা স্বামীর প্রতি দুরন্ত অভিমানে, অপমানে, স্বামী প্রেমের আত্মগরিমায় যজ্ঞস্থলে আত্মাহূতি দিয়েছিলেন। কালকূট যজ্ঞস্থলের সামনে দাঁড়িয়ে অতীতের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তিনি ভারতীয় ইতিবৃত্তের সন্ধানে গিয়ে যা পেয়েছেন তার মধ্য থেকে নিজেকেই যেন অন্বেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন সতীর আত্মাহূতির পরে তার পতি ভয়ঙ্কর প্রলয়রূপে এসেছিলেন কিনা তিনি জানেন না। বিষ্ণুর চক্রেই যে সতীর দেহ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে সারা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল কিনা তাও তিনি জানেন না! সেইসব সতী-পীঠের মধ্যে মাহাত্ম্য আছে কিনা তাও তিনি জানেন না। ইতিবৃত্তের সংকেত তিনি বুঝতে পারেন নি। তিনি উমার আত্মত্যাগকে অন্য রূপে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন এক প্রতিবাদী, নির্ভীক কন্যাকে, যে কন্যা প্রেমের জন্য পিতার রক্তচক্ষুর কাছে নতি স্বীকার করেনি। দক্ষরাজের দাম্ভিকতা, অহঙ্কার, রক্তচক্ষু কোনকিছুই উমাকে তার শিবের প্রতি প্রেম থেকে দমিয়ে রাখতে পারে নি। পিতার প্রতি তীব্র অভিমানে, অপমানিতা উমা কখন যে যজ্ঞের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল তার গর্বিত পিতা সে'কথা জানতেই পারেন নি। কালকূট উমার সেই প্রেমকে বর্তমানকালের উমাদের প্রেমের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। সেইসঙ্গে তিনি তাঁর নিজের জীবনে অর্থাৎ কালকূটের অন্য সত্তা সমরেশ বসুর সঙ্গে গৌরী দেবীর প্রেমের কথা আভাসে ইঙ্গিতে করেছেন। তাঁর নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া প্রেমও এমনটিই ছিল। সমাজের কোন প্রতিবন্ধকতাই গৌরী দেবী ও সমরেশ বসুর অসামঞ্জস্য প্রেমকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তাই বলেছেন "কোনও দক্ষরাজই কোনওকালে, কোনও উমাকে অহঙ্কারের নিগড়ে বাঁধতে পারে নি। কনখলের গঙ্গার কূলে দাঁড়িয়ে, আজ আমার প্রণাম সেই দূরকালের উমাকে, সেইসঙ্গে, একালের সারা বিশ্বের উমাদের প্রতিও আমার প্রণাম" *(পৃ: ১৫৮২, ঐ)* এইভাবেই কালকূট গৌরী দেবীর

প্রেমকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

কালকূট সতীপীঠের মহিমা থেকেও উমার প্রেমকে প্রধান করে দেখেছেন। তিনি তাঁর বিশ্বাসকেই স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন "এই অনিত্য সংসারে উমার প্রেম আজও নিত্য হয়ে আছে। এখানে আমার বিস্ময় নেই, দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। এই বিশ্বাস আমার অটল, প্রেমের উৎসর্গপাত্র, নব নব ঋতুর মতোই চির নতুন।" *(পৃ: ১৫৮২, ঐ)*

কালকূটের আবিষ্ট হৃদয়ের আবিলতার মধ্য দিয়েই সেই কিছু পুণ্যার্থী ছুটে এসে গানে গানে দক্ষরাজের প্রাসাদ তথা মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত করে তুলল। কালকূট ধীরে ধীরে গঙ্গার ঘাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে টিমটিমে আলোয় দেখতে পেলেন তিন রমণী গঙ্গার দিকে মুখ করে নিশ্চল হয়ে বসে রয়েছে। অস্পষ্ট আলোয় সেই নারী মূর্তিগুলো কালকূটকে আবিষ্ট করে তুলল। তার মনে হল "অন্ধকার দক্ষরাজপ্রাসাদের বাইরে, আজও কি উমাকেই দেখছি, একাধিক মূর্তির মধ্যে।" *(পৃ: ১৫৮২, ঐ)* কালকূটের মনে হয়েছে তিন রমণী কি তাঁদের অপূর্ণ প্রেমের বেদনাকে গঙ্গার কূলে নীরবে গঙ্গায় বয়ে যাওয়া স্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছেন? 'প্রেম নিত্য বহমান' এই বোধেই কালকূটের "মনে হল ঘাটের সেই ধাপে, সেই তিন রমণী মূর্তির কালে ও যুগে আমি পৌঁছতে পারব না।" *(পৃ: ১৫৮২, ঐ)* কালকূট এই প্রতিবেদনে দূরকালের উমার প্রেমকে একালের উমাদের প্রেমকে মিলিয়ে দিয়ে প্রেমকে সম্মানিত করেছেন।

১২ এপ্রিলের প্রতিবেদনে কালকূট 'জগৎ-বশ-মহামায়ায়' এই উপনামে চিহ্নিত করেছেন। কালকূটের পান্থশালাটি যেহেতু দ্বারগঙ্গায় প্রবেশের প্রধান সড়ক, কনখলের পথে যাওয়ার মোড় আগলে রয়েছে সেইহেতু কালকূট নিজেকে দ্বারপাল বলে মনে করছেন। কিন্তু মোটের উপরে আসলে মোড় আগলে রয়েছেন স্বয়ং ষড়ভুজ শিব। এই ষড়ভুজ শিবকে ঘিরে গর্বিত ঘোড় সওয়ারা টহল দিচ্ছে। কুর্তা, পাগড়ি আর টোপি পরা সেপাইরা যাত্রীস্রোত নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খাচ্ছে। শিবমূর্তির কাছে উত্তরদিকে অস্থায়ী নহবতখানার স্তম্ভ থেকে মাইকে নানা কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে কালকূট লক্ষ্য করেছেন "কেবল, যে একটু কান পেতে শুনবে, সে-ই ধরতে পারবে হারিয়ে যাওয়ার সংখ্যা পুরুষের থেকে নারী-ই বেশি। নারীর পরেই শিশু।" *(পৃ: ১৫৮২, ঐ)* কালকূটের সূক্ষ্ম চেতনায় আর দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ মন একটি অতীব বাস্তব পরিসংখ্যানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কালকূট নিজের গভীর উপলব্ধিতে বুঝেছেন প্রয়াগের কুম্ভমেলায়ও এই চিত্র দেখেছেন, বত্রিশ বছর পরেও সেই একই। কী বদলেছে তাহলে মানুষের? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও কালকূট নিজেকে দেখেছেন কুম্ভমেলার এই লক্ষ লক্ষ রূপের মধ্য দিয়ে। পুণ্য লোভাতুর গ্রাম্য-মূর্খ অবুঝ নারীরা আর শিশুরা সুযোগ সন্ধানী মানুষের লোভের শিকার হয়ে মেলায় হারিয়ে যায়। তাদের মনুষ্যত্ব হারিয়ে যায় বাঁচার

তাগিদে।

কালকূট লক্ষ লক্ষ রূপের আরশিতে চোখ রেখে নিজ উপলব্ধিতে এই সমাজের কঠিনতম গূঢ় রহস্যটি উদঘাটন করেছেন। এই বিশাল রূপের হাট "যে রূপে মুগ্ধ হয়ে আমি মানুষকে সব থেকে বড় করে দেখেছি, সেখানে কেবলই কি আমাকে অন্তরের আবেগ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ভিতরে কি বিশ্বাস ছিল না? সেই বিশ্বাস কি একেবারেই বিচার বিবেচনাহীন? চোখের জলে কি কেবল হরিদ্বারের সুখ বা শোকের উচ্ছ্বাসই প্রকাশ পায়? মস্তিষ্কের ক্রিয়া কি সেখানে স্তব্ধ?" *(পৃ: ১৫৮৩, ঐ)* মানুষ কেন আসে এই মেলায়? তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের মেলায় আসাটাকে তাঁদের অন্তরের আর্তি ব্যাকুলতা বলেই সম্মানিত করতে চাইছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন "যে অমৃতের সাধন একদা আমাকে ঘরছাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল, সেই অমৃতের সন্ধানেই আজও এসেছি। দেবতাদের অমৃত মন্থনের কথায়, আমাকে অবিলম্বেই আসতে হচ্ছে। তবুও, মানুষও যে অমৃতের সন্তান, একথাই বা ভুলব কেমন করে। অমৃতের সন্তান হয়েও আবার সেই এক-ই কথা, অয়ি মা, এত গরল দিয়ে আমাকে কেন সেই অমৃত সন্তানের তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত করলে।" *(পৃ: ১৫৮৩, ঐ)* তাঁর এই অমৃতের তৃষ্ণা তার ১৩৬১-এর কুম্ভমেলা থেকে নয়। ছেলেবেলা থেকেই একটা অজানার হাতছানিতে বেরিয়ে পড়েছেন সমস্ত নিষেধ, কঠিন ভ্রূকুটি, রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে কালকূট ফিরে গেছেন তাঁর শৈশবকালে।

কালকূট তথা সমরেশ বসুর ছেলেবেলা ঢাকা জেলায় তাদের বাড়ির কাছেই রেল জংশন ইস্টিশন ছিল। দেশ-দেশান্তরের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রূপ, কালকূটকে নেশাগ্রস্ত করে তুলত। সেই রূপ মুগ্ধতাকে কালকূট এইভাবে ব্যক্ত করেছেন "রূপ সেখানেই যথার্থ প্রকাশমান, যখন রূপের ভেতরেও কার্যকারণ ঘটে।" *(পৃ: ১৫৮৩, ঐ)* গঙ্গাদ্বারে এসেও কালকূট সেই ইস্টিশনের নেশাতেই পায়ে পায়ে যাত্রী ঢেউয়ের দোলায় তিনি অনায়াসে ইস্টিশন চত্বরে ঢুকে গেলেন। ইস্টিশনে ট্রেন ঢোকামাত্র, মানুষ প্ল্যাটফর্মে বন্যার জলের মত আছড়ে পড়তে লাগল। তার সঙ্গে বাক্স, প্যাটরা, পোটলা-পুঁটলি দমাদ্দম ছিটকে পড়তে লাগল। সেই একই দৃশ্য, প্রয়াগ যাত্রার দৃশ্যের মতো। "নরনারী ক্রুদ্ধ। বিচলিত, কষ্ট জর্জিত। কেউ কেউ চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। দেখলাম, সকল বয়সের, সকল শ্রেণির মহিলারাই কাঁদছেন। কারও শাড়ির অর্ধেক নেই, কারও পুরোটাই নেই। নারী-পুরুষ উভয়পক্ষেরই। কারুর কারুর ঠোঁটের কষে রক্ত। কপাল ফুলে আড়িল।" *(পৃ: ১৫৮৩, ঐ)* কালকূট অত্যন্ত সহজভাবে বত্রিশ বছর আগের দৃশ্যটাকে বর্তমানে নিয়ে এসেছেন। সেই একরকম দুরবস্থার অভিব্যক্তি। কালকূট লক্ষ্য করছিলেন ওই প্ল্যাটফর্মেই একজন মাকে। তিনি অবাক হয়ে গেছেন ওই দু-একমাসের শিশুকে নিয়ে মাও এসেছে পুণ্যকুম্ভের মেলায়। এই রূপমুগ্ধতার অবসরে এক অবাঙালি ভদ্রলোক 'এদের একটু দেখুন' বলেই ট্রেন থেকে মালপত্র

নামাবার জন্য ছুটে কালকূটপে হতচকিত করে।

পরিবারের কর্ত্রীর কাছে লেখক কালকূট জানতে পেরেছেন রেলওয়ে বড় অফিসারটি রিজার্ভ করা বাতানুকূল কামরাতে উঠতে না পেরে প্রথম শ্রেণির কামরাতে উঠেছিলেন, সেখানে মেঝেয় বসে এসেছেন। আবার এমন ঘটনাটি ঘটেছে টিকিট চেকারদের সামনেই। তারা সব রকমের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের পুণ্যকুম্ভে আসাটাকে বাতিল করতে পারেন নি। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মতো তাদেরও একটা উদ্দেশ্য আগে ব্রহ্মকুণ্ডে পুণ্যস্নান। মেয়েরা সবাই কাঁদছে — সেই বত্রিশ বছর আগের রেলযাত্রীদের মত।

ভদ্রলোক একজন রেলের কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে এসে বিস্তর গালাগালি করতে করতে বললেন, "ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানটা আগে সেরে নিতে হবে। তারপর ..." *(পৃ: ১৫৮৩, ঐ)*

কালকূট তার দৃষ্টিতে সেই বিশেষ ক্ষণটি তুলে ধরেছেন। পিতৃগরবে গর্বিতা কন্যাটি বিড়ম্বিত, কুণ্ঠিত অপমানে লজ্জিত পিতার যন্ত্রণাকে পিতার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিল। মহামানবের মিলন মেলার বেদনার এই অমৃতটুকু কালকূট তুলে এনেছেন আপন লেখনীর গরিমায়।

এরপরে ওখান থেকে সরে পড়তেই এক অভুতপূর্ব ঘটনার সম্মুখীন। একজন গেরুয়া কৌপীন প্রায় নেংটি পরিহিত আর একজন গেরুয়া ফেট্টি, গেরুয়া মালা, হাফহাতা পাঞ্জাবি, একজনের হাতে ত্রিশূল আর একজনের হাতে লাঠি। সাধুরা বাংলায় গালাগালি করছে দেখে কালকূট ছুটে গিয়ে তাদের ধমক দিলেন, "বাঙালি সাধু, এখানে এসে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছেন?" *(পৃ: ১৫৮৩, ঐ)*

কালকূটের কথা শেষ হওয়ার আগেই কালকূট শুনতে পেলেন "আ-হা-হা-হা বাবু ছেড়ে দ্যান।" গেরুয়া রঙের শাড়ি পড়া এক সাধুনী না বৈষ্ণবী কয়েক ধাপ নেমে আসতে আরও বললেন 'শিবে আর কিষ্টে যখন লড়ছে, লড়তে দ্যান।' কালকূট অবাক বিস্ময়ে দেখলেন লড়াই থেকে গেল! কপালের উপরে রসকলির চিহ্নটি ঝাপ্‌সা হয়ে এলেও বোঝা যায় তিনি বৈষ্ণবী, সাধুনীর কথাতে লড়াই থেমে যেতেই সাধুনী তাদের উপহাস করে জানতে চাইল আরও লড়াই করবে কি না। কালকূট দেখছেন সাধুদের কী আশ্চর্য পরিবর্তন। একজন জটা সামলাচ্ছে আর একজন চূড়ো করে চুল বাঁধছে। সাধুনী তাদের দু'জনের মাঝখান দিয়ে তাঁর অটুট স্বাস্থ্যে, দেহের এক অপরূপ ভঙ্গি তুলে চলে গেল। যাওয়ার আগে কালকূটকে আশ্বস্ত করল এই বলে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। কালকূট দেখলেন শিব কি দুজনেই সাধুনীর পিছু পিছু এগিয়ে গেল। এই ছোট ঘটনাটি কালকূটের চোখে অন্যরূপে ধরা ছিল।

"কী অবাক করো গো অয়ি মা। যেন মহামায়ার পশ্চাদ্ধাবন করল শিব আর কৃষ্ণ। নাকি মহাপ্রকৃতি।" *(পৃ: ১৫৮৪, ঐ)* এই রকমই কুম্ভমেলার ছোট ছোট ঘটনা মথিত মানবচরিত্র কালকূটের

হৃদয়কে মথিত করে অমৃতের স্পর্শ এনে দিয়েছে। ১২ই এপ্রিলের প্রতিবেদনে মেলার ছোট ছোট ঘটনাগুলো কালকূটের চোখ দিয়ে উঠে এসেছে। কালকূট লক্ষ রূপের আরশিতে নিজেকে দেখেছেন, তীব্র হলাহলের জ্বালা মেটাতে অমৃতের সন্ধান করছেন। কখনও তাকে হাতছানি দিচ্ছে হর-কি-পৌরি, কখনও গঙ্গানহর আর নীলধারার কাছ থেকে। ১৩ এপ্রিলের প্রতিবেদনটির উপনাম এইরকম 'স্বামী কোথায়, সোনা যে নিয়ে গেল।' হরিদ্বারের কুম্ভমেলার খণ্ড খণ্ড চিত্রের মধ্য দিয়ে বিচিত্র সব মানবচরিত্র এবং মেলার খণ্ড খণ্ড চিত্র দিয়ে আদি অন্তহীন মেলার একটা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ১৩ এপ্রিল সমস্ত মেলা জুড়ে বিশেষ তৎপরতা শুরু হয়েছে। ১৪ এপ্রিল সেই পুণ্যদিন, হাজার হাজার সাধুসন্ত মিছিল করে এসে পুণ্যস্নান যাত্রা করবেন। কালকূট রিক্সা করে প্রেস-ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দেখতে পেয়েছিলেন ছোটবড় বিভিন্ন রকমের তাবু, নিতান্ত মাথা গোঁজবার মতও কিছু খুবই ছোট ছোট তাবু। ১০ এপ্রিলের প্রতিবেদনটিতে কালকূট উল্লেখ করেছিলেন "গঙ্গার ওপারের পুণ্যকুম্ভের পুণ্যার্থীদের অস্থায়ী বাসস্থান একটিও খড়কুটো দিয়ে তৈরি হয় নি। খড়ের কুঁড়ে বলতে যা বোঝায় সব ত্রিপলের তাবু।" *(পৃ: ১৫৭৯, ঐ)* যে তাবুগুলোকে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর সেই জায়গাতেই অবশেষে প্রেস ক্যাম্পের সন্ধান পেলেন। ভিতরে ঢুকে দেখলেন, সেই উত্তরাঞ্চলের সাংস্কৃতিক বাহিনী তাদের সারি সারি শকট মঞ্চ নিয়ে বেরোবার উদ্যোগ করছে। একজন স্যুটেড বুটেড জেন্টেলম্যান তাকে কালচারাল গ্রুপের একজন মনে করে নর্থ জোন কালচারাল গ্রুপের বিষয় ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। শকট মিছিল এগিয়ে যেতেই কালকূট ওই জেন্টেলম্যানের কাছে অনুমতি নিয়ে শকট মিছিলের মঞ্চে ওঠার জন্য এগিয়ে গেলেন। মিছিলের সেই অপ্সরাদের দু-চোখ কালকূটকে মঞ্চে ওঠার জন্য আহ্বানও জানিয়েছেন। কালকূট তাঁর মুগ্ধতায় নিজেকেই যাচাই করছেন "ওই হে গরল ভরা বুক কালকূট, অপ্সরাদের অমৃত কি তোর তৃষ্ণা মেটাতে পারবে?" *(পৃ: ১৫৮৪, ঐ)* দু'হাত কপালে ঠেকিয়েই নিজেকে সংবরণ করলেন ও পরে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গেই এই একই তাবুতে প্রেসের কাছে চলে গেলেন।

প্রেসক্যাম্প থেকে হর-কি-পৌরি'র দিকে ফেরার পথে এক তরুণী অথবা বালিকা গুচ্ছের পোটলা পুঁটলি নিয়ে কালকূটের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তার সঙ্গে মুখভর্তি দাড়িযুক্ত এক বৃদ্ধ। ধূলায় মলিন তার চাদর, ধুতি। তার ডাগর চোখে ভীরু চাউনি। কালকূট তাদের কোনও কথা বুঝতে পারেন নি এবং তাদেরকেও নিজের কথা বোঝাতে পারেন নি। শুধু 'ব্রহ্মকুণ্ড' 'চল' আর 'সোনে' ছাড়া কিছুই বুঝতে পারছেন না। কালকূট লিখেছেন "শুনতে অনেকের অবাক লাগবে হয়তো, কিন্তু বৃদ্ধ বোধহয় এই প্রথম জানল, ভারতে বাঙালি বলে একটি জাতি আছে। কলকাতা নামে একটি শহর আছে। কন্যাটির তো কোনও কথাই নেই।" *(পৃ: ১৫৮৫, ঐ)* কালকূট এই রাজস্থানী বৃদ্ধা ও কন্যাটির কথা বলতে গিয়ে ভারতের অনেক গাঁয়ে যে শিক্ষার আলোটুকু পৌঁছায়নি সেটা তাঁর

অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তুলে ধরেছেন। কালকূটকে তারা শেঠ বলাতে তিনি বুঝেছিলেন হয়ত তাদের টাকার দরকার তাই তিনি বৃদ্ধের হাতে দশ টাকার একটি নোট দিয়েছিলেন অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে।

হর-কি-পৌরিতে পৌঁছেও তারা কালকূটকে ছাড়েনি যতক্ষণ না তারা তাদের কথা পান্ডার মারফৎ বোঝাতে পেরেছে। পান্ডাটি জানালো যে, বৃদ্ধর সোনার কানের মাকড়ি দুটো দুর্বৃত্তেরা নিয়ে গেছে, তাদের ছেলে হারিয়ে গেছে, কন্যাটি তার পুত্রবধূ। যা কিছু কালকূট আভাসে ইঙ্গিতে বুঝেছিলেন তাই তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্যে স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হল।

১৪ এপ্রিলের দিনলিপিটিকে কালকূট 'সাধু প্রসঙ্গ, সাধু দর্শন' উপনামে অভিহিত করেছেন। এই প্রতিবেদনটিতে কুম্ভমেলায় দেখা ও পরিচিত হওয়া কয়েকজন সাধু-সন্তদের কথা উল্লেখ করেছেন। সাধুসন্ত প্রসঙ্গে কালকূট তার ১৩ এপ্রিলের প্রতিবেদনে লিখেছিলেন, যে তাঁর বত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় এবার সাধুরা কোথায় যেন একটা চিড় ধরিয়ে দিয়েছে।

এই প্রতিবেদনে কালকূটের সঙ্গে ব্রহ্মকুণ্ডে তথা হর-কি-পৌরিতে সন্ধ্যারতি দেখার, আগে এক সাধুজির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সাধুজির হাতের যষ্টিটি সুদীর্ঘ একটি সর্পের মতো, মাথাটি দুধ গোখরোর ফণার মতো। তার ঝকঝকে সুন্দর গেরুয়া বসন, চোখে গাঢ় কাচের চশমা আর গলায় রুদ্রাক্ষ আর স্ফটিকের মালা। মুণ্ডিত মাথা ও গোফ দাঁড়ি কামানো পুষ্ট মুখ সাধুজির সৌন্দর্য্যে এক অনন্যতা এনে দিয়েছিল। কালকূট সাধুজিকে চিনতে না পারলেও সাধুজি কালকূটকে চিনেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে সাধুজি তাকে ১১ই এপ্রিল হৃষীকেশে ভোলাগিরির আশ্রমে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাদের আশ্রমে গেলে কালকূটকে তিনি রুদ্রাক্ষ আর স্ফটিকের মালা পরাবেন। বিশাল অগ্নিশিখার প্রদীপের আরতি দেখতে দেখতে কালকূটের মনে ভাবনার উদয়, ওই বিশাল প্রদীপ 'মানুষ হাতে নেয় কেমন করে?' *(পৃ: ১৫৮৬, ঐ)* কালকূটের চোখে তখন প্রধান হয়ে উঠল আরতি থেকেও লক্ষ লক্ষ রূপের জনসমুদ্র। গর্ভবতী মায়েরাও এই গঙ্গা আরতি দেখতে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছে। কালকূট লক্ষ রূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেইসব দুধের শিশুদের কথা ভাবছেন, যেখানে মানুষের নিশ্চিদ্র দেওয়াল ভেদ করে এক পা এগোনো যায় না সেখানে মায়ের বুকে শিশুরা কিভাবে ঠিক থাকবে? তিনি লক্ষ রূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে মায়ের বুকে জড়িয়ে থাকা শিশুদের অসহনীয় কষ্টের কথা অনুভব করেছেন। আরতি শেষে লক্ষ রূপের দেওয়াল ঠেলে এগোতে চেষ্টা করতেই একটা টান অনুভব করলেন। বৃদ্ধের সেই পুত্রবধূটি টেনে নিয়ে চলেছে সেই লক্ষ মানুষের দেওয়াল ভেদ করে। এই অরূপসী বধূটি কালকূটকে টেনে নিয়ে এসে ফাঁকা সেতু পেরিয়ে পুবের ওপারের দিকে চলতে চলতে তিনি অনর্গল কথা বলেই চলেছে, কখনও হাসছে, কখনও গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে, কখনও তীব্র অভিমানে তার চোখের কোণ জলে ভরে উঠছে। সে যে একজন অপরিচিত পুরুষকে টেনে নিয়ে এমন একটি জায়গায় নিয়ে তুলল যেখানে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান

ও পাহাড়ের অধিবাসীরা সাময়িক আস্তানা গেড়েছে। বধূটি তাকে টেনে নিয়ে তার পরিবারের মাঝখানে নিয়ে বসিয়ে দিল। ওদের ভাষা কিছুই বুঝতে না পারলেও দেহের ভাবভঙ্গি, বাচনভঙ্গি তে বুঝতে পেরেছিলেন তাঁকে সবার মাঝে বসিয়ে সবার কাছে পরিচিত করাতে চায়।

এই মেলাতেই ঘটে যাওয়া পূর্ব একটি অভিজ্ঞতার সঙ্গে দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে দিয়ে বলেছেন, "অথচ এক রাজপুতানী হরিদ্বারের রাজপথে, ভয়ে চমকে আমার পাঞ্জাবি খামচে ধরেছিল বলে তাদের গুরু সাধুবাবাজির চোখে নিদারুণ ভর্ৎসনা ফুটে উঠেছিল।" *(পৃ: ১৫৮৬, ঐ)* কালকূটের চোখে লক্ষ লক্ষ রূপের হাটে দুই রাজস্থানী বধূর আচার আচরণের মধ্যে দিয়ে দুটি ভিন্ন ধরনের সামাজিক জীবনযাত্রার চিত্র ফুটে উঠেছে। রাজস্থানের গ্রাম্য বধূটির শ্বশুর ও তার পরিচিতজনের মধ্যে যে উদারতা ছিল তা তিনি রাজপথে চলা রাজপুতানী বধূটির গুরুজির মধ্যে দেখতে পান নি। দেখেছেন তার চোখে দাম্ভিকতা ও ঘটনা না জেনে বুঝেই ক্রুদ্ধ চাউনি।

রাজপুতানী বধূটি তার কপালে মঙ্গলার্থে একটা টিকা দিয়ে দিয়েছিল। কালকূটের মধ্যে বধূটি এমন কিছু দেখেছিল যা থেকে সেও লক্ষ লক্ষ জনের মধ্য এক পরম বিশ্বাসে ও নির্ভরতায় সে ও তার শ্বশুর কালকূটকে আঁকড়ে ধরেছিল। সেইজন্যই গঙ্গা-আরতি শেষ হতে না হতেই জনসমুদ্রের ঢেউ থেকে আবার তাকে শক্ত হাতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি লক্ষ রূপের আরশিতে বধূটির শ্বশুর সহ পরিবারের অন্যান্যদের উদারতার অমৃতের স্পর্শটুকু তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন সংবাদপাঠকের মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। বিদায় নেওয়ার সময় মনে মনে বলেছেন যে, তার হারিয়ে যাওয়া স্বামী ঠিক তাকে খুঁজে বের করবেন, কিন্তু শ্বশুরের কানের সোনাটি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু "স্বামীর সোহাগ যখন ভোগ করবে, তখন অয়ি রাজপুতানী বধূ, এ বঙ্গ বাসীকে যদি মনে পড়ে, এই গঙ্গাদ্বারের পুণ্যকুম্ভে সেটাই আমার পুণ্যের ফল।" *(পৃ: ১৫৮৬, ঐ)*

কালকূট ওখান থেকে ফিরে আসার সময় কিছু বাঙালি সাধুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন, শুধু সাধুরাই নয়, তাদের অনেকের সঙ্গে আবার ভৈরবী বা প্রকৃতি ঠাকরুণও আছেন। কালকূটের কেবলই মনে হতে লাগল এরমধ্যে হয়ত সেই বৈষ্ণবীও আছেন যিনি শিব-কিষ্টকে আঁচলে বেঁধে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েছিলেন। বাঙালি সাধুদের আখড়ার কাছ দিয়ে আসার পরে তিনি চণ্ডীদ্বীপে গিয়েছিলেন। এইখানে না এলে তার একটা দিক অজানা থেকে যেত। কত রকমের যে আখড়া, আশ্রম আছে, আর সেই সবস্থানে ঈশ্বরের প্রার্থনা করার ভিন্ন ভিন্ন পথ। কোনো আখড়ায় বালকেরা সেজে রামকীর্তন, কোন আখড়ায় তরুণীরা হরপার্বতী সেজে আখ্যানগীত করছে। মহাযোগী পাইলট বাবার আখড়ার সাধুরা হিন্দিতে বক্তৃতা করছেন, জনগণকে ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করছেন। পাইলট বাবা অর্ধ-নির্মীলিত চোখে বসে আছেন। তার পাশেই সুন্দরী যোগিনী মাতৃদেবী। এর কাছেই ভারত সেবাশ্রম সংঘ। সেখানেও কালকূটকে যেতে হল একজন

বাঙালি স্কাউট অ্যান্ড গাইডস-এর কল্যাণে। এরা পূর্ব রেলের কর্মচারী, কালকূটকে ধরে নিয়ে গেলেন সংঘপ্রধান সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজের কাছে। কালকূটের পরিচয় পেতেই বাঙালি তরুণীরা "যেন এল এক আলগা ঝড়ের ঝাপটা। সে এক বিরাট পর্ব।" *(পৃ: ১৫৮৬, ঐ)* লক্ষ লক্ষ রূপের আরশিতে নিজেকে দেখতে চলছেন এবং সেই যা প্রত্যক্ষ করেছেন, দিনলিপিতে কখনও সেইদিনেই কখনও কয়েকদিন পরে তার সেই দেখা আত্মোপলব্ধি লেখনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন আনন্দবাজার পত্রিকায় মেলা পরিক্রমার সংবাদ পরিবেশনের জন্য। তরুণীদের ঝড় শেষে ওই খ্যাতির দৌলতে সম্বুদ্ধানন্দজি কালকূটকে গাড়ি করে পান্থশালায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং যে কোনরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতিসহ তাঁকে নিমন্ত্রণও করেছিলেন।

গেরুয়া বসনা অথচ সিঁথি কপালে সিঁদুরে রাঙানো, একজন সুগৌরী যোগিনী তাঁকে 'চণ্ডীদ্বীপের নীলধারার' কাছে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। দুটি বৃহৎ তাবুর মাঝখান দিয়ে আবছায়া আলোয় যেতে যেতে তিনি কালকূটকে হাতছানি দিয়েছিলেন, ঘাড় হেলিয়ে পথ নির্দেশ দিয়েছিলেন। কালকূট যোগিনীটি সম্পর্কে নিজেই বলেছেন, "কিন্তু কিছুতেই পা বাড়াতে পারলাম না। কে ও? চিনি অথচ চিনতে পারলাম না।" *(পৃ: ১৫৮৭, ঐ)* পান্থশালায় ফিরে এসেও তার মন থেকে ভাবনাটা দূর হল না। তিনি রহস্যময়ীই থেকে গেলেন। চৈত্রের শেষ দিন। পূর্বদিন থেকেই কালকূট পুলিশ প্রশাসন, কী সাধুসন্ত, সবার মধ্যেই একটা সাজো সাজো রব, ব্যস্ততা লক্ষ্য করেছেন। চৈত্রের শেষদিনে পুণ্যস্নান, লক্ষ লক্ষ নরনারী অপেক্ষা করছে, পুণ্যের স্বাদ সবাই পেতে চায়। কালকূট তার পান্থশালা থেকে লক্ষ্য করছেন মধ্যরাত থেকেই জনস্রোতের বন্যা ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে আছড়ে পড়ছিল পুণ্যস্নানের জন্য। কিন্তু রাত পোহাতেই রাজপথের সবরকমের যানবাহনের চলা বন্ধ হয়ে গেল। পুণ্যার্থীদের স্নানের জন্য ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে যাত্রা শেষ হতেই শুরু হয়ে গেল সাধুদের আগমন।

সাধুদের মিছিল আসার আগে এসেছে ঘোড়সওয়ার পুলিশের দল। তারপরে মাত্র তিনটি ঘোড়ায় চেপে, তিনটি নাগা যুবা, মুক্ত কৃপাণ হাতে এল। গায়ে ছাইমাখা মাথায় ফেট্টি বাঁধা। তাদের পেছনে ছয়জন নগ্ন নাগা যুবা তলোয়ার তলোয়ারে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা দেখাতে দেখাতে এগিয়ে চলেছে, খেলাও দেখাচ্ছে। কালকূট এই কয়েকজন নাগা সন্ন্যাসীকে দেখার পরে প্রতীক্ষা করছিলেন "তারপরেই দেখব পরপর বেশ কিছু হাতি আসবে, যাদের সোনার উপর সাজানো হাওদার উপর মহান্তরা বসে থাকবেন। অন্য সাধুরা চামর দোলাবেন। আর গুরুজিরা ভক্তিমত্ত জনতার প্রতি হাত তুলে আশীর্বাদ জানাবেন। নরনারীরা পাগলের মতো সেই হাতির অঙ্গে একটু হাত স্পর্শ করে নিজেদের কপালে ঠেকাবার জন্য ছুটে আসবে। সেই তো আমার বত্রিশ বছর আগের অভিজ্ঞতা। কিন্তু আজ এ কী দেখছি? প্রথমত পুণ্যার্থী নরনারীদের স্রোত দাঁড়িয়ে নেই।

একেবারে নেই, তা বলব না। বিদেশীদের সঙ্গে কিছু ভারতীয় অবাক কৌতূহলে দাঁড়িয়ে দেখছে। বাকি লক্ষ লক্ষ মানুষের স্রোত দুই ধারায় চলেছে পুবে ও পশ্চিমে। স্নান শেষে, স্নান করতে। নিতান্ত একবার মুখ ফিরিয়ে দেখতে হয় তাই সাধুদের দেখছে।" *(পৃ: ১৫৮৭, ঐ)*

বত্রিশ বছর পরে গঙ্গাদ্বারে কুম্ভমেলায় এসে কালকূট বারে বারে প্রয়াগের কুম্ভমেলার সঙ্গে এবারের কুম্ভমেলাকে মিলিয়ে নিচ্ছেন। সাধুসন্তদের মিছিল দেখার জন্য, তাদের বাহন ছোঁয়ার জন্য মাথা ঠেকানোর জন্য যে উন্মাদনা, ভক্তিস্রোতে প্লাবিত হওয়ার উচ্ছ্বাস বত্রিশ বছর আগে লক্ষ লক্ষ নরনারীর মধ্যে দেখেছিলেন সেরকমটি তিনি দেখতে পেলেন না! বত্রিশ বছরে মানুষের জীবনযাত্রার যে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে হয়ত তারই প্রভাব জনমানসে পড়েছে। তাই কালকূটের মন ভরে নি সাধুসন্তদের মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যার্থী নরনারীদের যে ব্যাকুলতা উচ্ছ্বলতা আশা করেছিলেন তা দেখতে না পেয়ে। সাধুদের মিছিলেও পরিবর্তন এসেছে সেই কালকূট তুলে ধরেছেন। সাধুদের মিছিলে হাতিই নেই। মহান্ত গুরুজিরা এসেছেন রবারের টায়ারের চাকাওয়ালা বারো মানুষে টানা রথে অথবা খোলা মটর ভ্যানে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে বিচিত্র বর্ণের পোশাকে সজ্জিত ব্যান্ডপার্টি, হিন্দি গানের সুর বাজাতে বাজাতে।

এদের পিছনে দুশো জনের মতো নগ্ন নাগাদের মিছিল। তারপরে আবার একটি খোলা মোটর ভ্যানে গুরুজি-মহান্তরা। মিছিল চলছেই নিরঞ্জনী ও জুনা আখড়ার সাধুদের। বত্রিশ বছর আগের গুরুজি-মহান্তদের আচার আচরণের সঙ্গে বর্তমানে তাঁর সামনে দিয়ে চলে যাওয়া গুরুজি-মহান্তদের মেলাতে পারছেন না। আর নাগাদের দেখে কালকূটের মনে হয়েছিল "আমার চোখের সামনে দিয়ে যেন চলে গেল একদল ক্ষুধার্ত, স্বাস্থ্যহীন হতভাগা নগ্নদের দল।" *(পৃ: ১৫৮৭, ঐ)* অথচ বত্রিশ বছর আগে যে নাগা সাধুদের দেখেছিলেন তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন "নাগা সাধুরাই বিশেষভাবে সকলকে আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের শাণিত তীক্ষ্ন ত্রিশূল, রক্ত চক্ষু ও সম্পূর্ণ উলঙ্গ মূর্তি এক অভূতপূর্ব অনুভূতির সৃষ্টি করে।" *(পৃ: ১৫৭২, ঐ)* এবারে নাগা সাধুদের মিছিল দেখে কালকূটের মন বিষাদে ভরে উঠেছিল। তাঁর মন খুঁজতে লাগল কোন রমণী পুরুষ গুরুজি-মহান্তদের রথ কেন স্পর্শ করতে ছুটে এল না এবং এই ভাবনার মধ্যেই তিনি ১৪ই এপ্রিলের দিনলিপি লেখা শেষ করেছেন।

এরপর আর একটাই দিনলিপি তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশনের জন্য লিখেছিলেন। ১৬ই এপ্রিল যে প্রতিবেদনটি লিখেছিলেন 'ইতিহাস ও তার উৎস সন্ধানে'। উপনাম থেকেই বিষয়টি সম্পর্কে একটু অনুমান করা যায় ১৪ এপ্রিলের প্রতিবেদনে তিনি নাগা সাধুদের দেখে হতাশ! বত্রিশ বছর আগের দেখা সবচেয়ে বেশি আকর্ষক নাগা সাধুদের মিছিলের সঙ্গে গঙ্গাদ্বারের কুম্ভমেলার নাগা সাধুদের কোন মিল নেই। পান্থশালার বারান্দা থেকে বেলা আড়াইটের

সময় কালকূট 'নানক পন্থী' ও 'নির্মল আখড়ার' আরও দুটি মিছিল দেখেছিলেন। নানকপন্থীদের প্রত্যেকটি রথের সঙ্গে, পাশে পিছনে, গৃহস্থ শিষ্যা মহিলা বাহিনী। নির্মল আখড়ার মিছিল শেষ হতে সময় লেগেছিল প্রায় চল্লিশ মিনিট। এঁদের মিছিল চলে যাওয়ার পরই পুলিশের বেষ্টনী উঠে গিয়েছিল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে পাশে তাকাতেই শুনতে পেলেন একজন উজ্জ্বল গেরুয়া বসনধারী গোঁফদাঁড়ি আর মাথায় বড় বড় চুলওয়ালা সাধুর মুখ থেকে শুনলেন 'খেল খতম'। সন্ন্যাসীর হাতে কিন্তু ত্রিশূল, কমন্ডলু, চিম্‌টা কিছুই নেই। কালকূট সাধুসন্তদের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখেছেন। কালকূট তাঁর সেই দেখাটাকে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন "পরিবর্তনের মধ্যে বিশেষ করে চোখে পড়ল, স্বামীজিরা আজকাল অনেকেই মোটর সাইকেল, স্কুটার, মোপেড অথবা মোটরগাড়ি, নিজেরাই চালিয়ে ঘোরেন। তাদের যানের সামনে ওড়ে আখড়ার পরিচয় জ্ঞাপক নিশান। প্রত্যেকের হাতেই ঘড়ি। গেরুয়া পোশাকের চাকচিক্য অনেক বেড়েছে। কিন্তু অবাক লাগছে, সাধারণ পুণ্যার্থী জনতার উদাসীনতা দেখে। নাকি আমি-ই দেখতে ভুল করছি?" *(পৃ: ১৫৮৭, ঐ)* এক সাধুজি তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটেই সাধুসন্তদের ভিড় বেশি। আখড়ার মহান্তরা ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে এসে পুণ্যস্নান করে, আবার আখড়াতেই ফিরে যায়। কেউ কেউ আবার রোরি, বোলায়াল দ্বীপেও ফিরে যায়। কালকূট সাধুসন্তদের পরিবর্তনগুলো সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং স্বামীজির সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে সেই উপলব্ধিই পাঠককূলের কাছে তুলে ধরেছেন। ত্রিশূল-চিম্‌টা-ঘড়িহীন সাধুজিটি অবধূতাশ্রমের কুলাচারী সাধক। তিনি আবার বৈষ্ণবও বটে। সাধুজির নাম প্রবুদ্ধানন্দ, চণ্ডীদ্বীপের নীলধারার ধারে আশ্রমের সাধক তিনি। সাধুজি কালকূটকে আগেও দেখেছেন, ভোলাগিরি আশ্রমের প্রণবানন্দের সঙ্গে কথা বলতে। আবার এই তথ্যও জানালেন, যে বাঙালি সিঁদুর পরা যোগিনীকে কালকূট চিনতে পারেন নি, নীলধারার আশ্রমে গেলে তার সঙ্গেও দেখা হবে। তিনি দেখেছেন আখড়ার বিশেষত বাঙালি সাধুদের মধ্যে একটা মেলবন্ধন আছে। লক্ষ লক্ষ রূপের মধ্যে তারা একে অপরের খোঁজ রাখেন, বিশেষ বিশেষ মানুষকে তারা চিনে রাখেন। কালকূট আখড়ার সাধুদের মধ্যে এই মেলবন্ধনটুকুও দেখতে পেয়েছেন তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে।

কালকূট বিকেলের দিকে হর-কি-পৌরিতে গিয়ে দেখলেন অন্যদিনের থেকে আরও বেশি জমজমাট। একটা জিনিস বিশেষভাবে কালকূটের নজরে এসেছে। এক একটি আখড়ার সাধুদের স্নান পর্বের শেষেই পুণ্যার্থী যাত্রীরা স্নান করছে। পালা করে চলছে স্নান পর্ব। প্রশাসনে ঢিলেঢালা ভাব চোখে পড়ল। শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনীরা ছবি তুলছে স্নানরত পুণ্যার্থীদের, কালকূটের চোখে এদৃশ্য ভালো লাগে নি। কালকূটের মন ভারাক্রান্ত, হয়ত কুম্ভমেলা শেষ বলে অথবা অন্য কোন কারণে। নিরিবিলি স্থান খুঁজতে খুঁজতে বাইপাসের কাছে একটু উঁচু বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে তিনি পুবের দিকে মোটামুটি মনের মতো জায়গা পেয়ে তিনি সেদিকেই এগিয়ে গিয়ে একটি গাছের ছায়ায় বসে

মহাভারতে বর্ণিত ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাপুর, গঙ্গাদ্বারের কাছে যে অরণ্যে, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী বাণপ্রস্থ করতে এসে দাবানলে জ্বলে পুড়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, সেইসব স্থান কোথায় মনে মনে সেইসব চিন্তা করতে লাগলেন। কালকূট মনে মনে ভাবছেন তিনি যেখানে বসে আছেন সেখান থেকে কতদূরে সেই অরণ্য, যে অরণ্যে "বিদুর বিবস্ত্র, খাদ্য-পানীয়হীন অবস্থায়, অরণ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। যুধিষ্ঠির কাছে যাওয়ার পর বিদুর তাঁর দৃষ্টির ভিতর দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। বাইরে গাছের কাছে দাঁড়ান তাঁর মৃতদেহ স্থির হয়েছিল।" *(পৃ: ১৫৮৮, ঐ)* কালকূট দূরকালের সেই ঐতিহাসিক চিত্র মানসপটে দেখছিলেন। তিনি বলিষ্ঠভাবে বলেছেন যে, "যুধিষ্ঠির স্বয়ং ধর্মপুত্রই ছিলেন।" *(পৃ: ১৫৮৮, ঐ)* কালকূটের এ বক্তব্য 'পৃথা'য় দেখেছি। সেখানেই তিনি ধর্ম হিসাবে বিদুরকে দেখেছেন এবং তিনি সেখানেই বলেছেন বিদুরের ঔরসজাত সন্তানই হলেন যুধিষ্ঠির। কুম্ভমেলায় এসে গঙ্গাদ্বারে গাছের ছায়ায় বসে মহাভারতে বর্ণিত সেই বর্ণনা অনুযায়ী ঐতিহাসিক স্থান খুঁজতে খুঁজতে আবার যুধিষ্ঠির-বিদুর সম্পর্কে একই কথা বললেন। শিবালিক পাহাড়ের গহ্বর থেকে গঙ্গা সমতলে অবতীর্ণ হয়েছে তাই নাম গঙ্গাদ্বার। কালকূটের বক্তব্য এই যে, গঙ্গাদ্বার থেকে হস্তিনাপুর খুব বেশি দূরে ছিল না। তাহলে কোথায় ছিল সেই নগরী? কালকূট নিজেই ইতিহাস সন্ধানের মধ্য দিয়ে অমৃতের উৎস সন্ধান করেছেন। ভৌগোলিক অনুসন্ধানও করেছেন। হস্তিনা নগরীর অবস্থান ছিল মীরাটের ৩৫ কিমি উত্তর-পূর্বে ও ২৯.৯° উত্তর অক্ষাংশে ৭৮.৩° পূর্ব দ্রাঘিমায়। প্রাচীন গঙ্গার খাতে হস্তিনা নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। আর গঙ্গাদ্বারের অবস্থান হল মীরাটের সাহারানপুর জেলার রুবকি তহসিলেব ২৯°৫৭'৩০" উত্তরে ৭৮°১২'৫২" পূর্বে গঙ্গাদ্বার। কালকূট এই গঙ্গাদ্বারে বসেই মহাভারতে বর্ণিত স্থানগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন হিমাবৃত হিমালয়ের অন্তরীক্ষ সংলগ্ন গন্ধর্বদের রাজত্বটা কত উঁচুতে। গঙ্গাদ্বার থেকে চিত্ররথ বন খুব উঁচুতেও নয় খুব বেশি দূরেও নয়, এটা কালকূট বুঝেছেন। কালিদাসের মেঘদূতও কালকূট অনুসরণ করেছেন গন্ধর্বদের রাজত্ব, বাসস্থান খুঁজতে। তিনি দেখেছেন কালিদাস লিখেছেন, বিন্ধ্যাচলে নির্বাসিত গন্ধর্ব উপরদেশে চলে যাওয়া মেঘকে যে বার্তা পাঠাতে চেয়েছিলেন তার প্রিয়তমার কাছে সেখানে কনখলের কথা উল্লেখ। তিনি আরও ভাবছেন তাহলে কনখলে হয়ত গন্ধর্বদের বাস ছিল। তাঁর মনের মধ্যে যে চিন্তাগুলো ভাবনাগুলো কালকূটকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে তারই অনুসন্ধান করছেন। তিনি মহাভারতের বর্ণিত অংশে বারে বারে ফিরে যাচ্ছেন গন্ধর্বদের রমণীয় বাসস্থান ও লীলাভূমির সন্ধানে। চিত্ররথ বন তো গঙ্গাতীরেই ছিল। পাণ্ডবেরা মাতা কুন্তীকে নিয়ে গঙ্গাতীরে সোমস্রায়ন তীর্থে এসেছিলেন। সন্ধ্যার পরে সশস্ত্র অর্জুন আলো হাতে নিয়ে জায়গাটি পর্যবেক্ষণ করতে বেরিয়েছিলেন। গন্ধর্বরাজ অঙ্গনাপরিবৃত হয়ে বিহার করছিলেন। অর্জুনকে দেখতে পেয়ে গন্ধর্বরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন এই কথা বলে যে

'এ সময়ে এখানে এই রাক্ষসীবেলায় কোনও মানুষের আসার কথা না। অতএব তোমাকে আমি এখনই হত্যা করব।' *(পৃ: ১৫৮৮, ঐ)* অর্জুন এর প্রত্যুত্তরে জানিয়েছিলেন যে সমুদ্র, হিমালয়ের পার্শ্বদেশ, আর নদীকূল, এই তিনটি প্রদেশ কারও অধিকৃত জায়গা হতে পারে না এবং এই পবিত্র তীর্থস্থানে আসার জন্য কোনো বাধা তিনি মানবেন না। এরপর গন্ধর্বরাজের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ পরাজিত হয়েছিলেন ও তার বিচিত্র রথ দগ্ধ হয়েছিল।

কালকূট বারে বারে গন্ধর্বদের সন্ধান করেছেন। মহাভারতে সমুদ্রমন্থন করে অমৃতের আবির্ভাবের ঘটনাতে কালকূট বাস্তবতা খুঁজে পাননি। তাঁর দৃষ্টিতেই দেখা যাক দেবগণ ও অসুরগণ সমুদ্রমন্থন করার ফলে ''সমুদ্র থেকে চন্দ্রোদয় হল, ঘৃত থেকে শ্বেতপদ্মে লক্ষ্মী আর সুরদেবী উঠলেন। উচ্চৈঃশ্রবা নামে শ্বেতবর্ণ হয় রত্ন ঘৃত থেকে উৎপন্ন হল। তার থেকে উৎপন্ন হন কৌস্তুভমণি এবং এরা সবাই সুরপক্ষ অবলম্বন করলেন। শেষ পর্যন্ত মূর্তিমান ধন্বন্তরী অমৃতপূর্ণ শ্বেতবর্ণ কমন্ডলু হাতে, সমুদ্র থেকে আবির্ভূত হলেন।'' *(পৃ: ১৫৮৯, ঐ)* অমৃত উত্থানের এই ঘটনা ও তার পরবর্তীকালে দেবতাদের অমৃত পান করতে বসে যাওয়া, রাহুর মস্তক ছেদন, গরুড়ের অমৃত আহরণে যাওয়া ও অমৃত হরণ করা, দেবতাদের সঙ্গে গরুড়ের যুদ্ধ ও বিষ্ণুর বাহনত্ব হওয়ার মধ্য দিয়ে সকল সঙ্কট মোচন। কালকূট বলেছেন এইসব ঘটনা নিতান্তই অতিশয়োক্তি, অবাস্তব বলে মনে হয়।

'অমৃত উত্থান' বিষয়ে আরও কাহিনীর একটি হল, ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত অমৃতকুম্ভ হরিদ্বার, প্রয়াগ, গোদাবরীতট ও উজ্জয়িনীতে রেখেছিলেন বলেই এই চার স্থানে অমৃতের উদ্ভব হয়। কালকূট বলেছেন 'এ'কথা সত্তর বছর আগেও লেখা হয়েছে এবং এখনও কেউ কেউ লিখেছেন।' *(পৃ: ১৫৮৯, ঐ)* তিনি ঋগ্বেদের 'ব্রাহ্মণ'-এর শ্লোকের কাহিনীটিকে অনেক বেশি বাস্তব সম্মত ঘটনা বলে মনে করেছেন।

ঋকের 'ব্রাহ্মণ' কাহিনীতে অমৃতকে সোমরস নামে অভিহিত করা হয়েছে। গন্ধর্বরা 'সোমরস' তৈরি করতে জানতেন, কিন্তু দেবতা-অসুরদের 'সোমরস' তৈরির পদ্ধতিটি জানা ছিল না। কিন্তু 'সোমরস' তৈরি পদ্ধতি গন্ধর্বরা কাউকে শেখাতেন না। দেবাসুরেরা পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। তারা 'বাক্' কে পাঠালেন গন্ধর্বরাজ্যে সোমরস তৈরির পদ্ধতি জানতে। বাক্ নিজের কর্তব্য ভুলে গিয়েছিল। অসুররা বাক্‌কে নিয়ে আসার জন্য আগে গন্ধর্ব রাজ্যে গিয়েছিল, কিন্তু বুদ্ধির দোষে গোপন ইচ্ছাটি প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে গেল। অসুররা হেরে পালিয়ে গিয়েছিল।

এরপর দেবতারা গন্ধর্বদের কাছে গিয়ে প্রথমে বাক্‌কে বোঝালেন। এরপর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে গন্ধর্বদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সোমরস তৈরির পদ্ধতিটি জেনে নিয়ে সোমরস নিয়ে দৌড়ে

স্বর্গাভিমুখী হয়েছিল। একদিকে গন্ধর্বরা আর একদিকে অসুররা উভয়েই 'সোমরস' ছিনিয়ে নিতে দেবতাদের ধাওয়া করেছিল। দেবতাদের কাছ থেকে 'সোমরস' কেউই কেড়ে নিতে পারে নি। অমৃত পেয়েই দেবতারা একমুহূর্তও অপেক্ষা না করে পান করতে বসে গিয়েছিল।

কালকূট কাহিনীটি এই পর্যন্ত বিবৃত করে তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন এই প্রতিবেদনে। পাঠককুলকে যেমন মহাভারতে বর্ণিত কাহিনীকে নতুন করে মনে করিয়ে দিয়েছেন তেমনি সেই ঘটনাকে আধুনিক দৃষ্টিতে ব্যক্ত করেছেন। ''গন্ধর্ব ও অসুরদের কাছ থেকে বাধা পেয়ে দেবতারা কি সোমরস নিয়ে তাদেরই জাতি, ভারতবর্ষের মানুষের কাছে নেমে এসেছিলেন? আর প্রাণভরে সোমরস পান করেছিলেন গঙ্গাদ্বারে, প্রয়াগে উজ্জয়িনীতে আর গোদাবরী তটে।'' *(পৃ: ১৫৮৯, ঐ)* কালকূটের এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেক বেশি বাস্তব বলে মনে হয়। তিনি অমৃতের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে পুরাণে যে কাহিনীগুলো পেয়েছেন, তার মধ্যে 'ব্রাহ্মণ'-এ যে কাহিনীটি, সেটিই তাঁর কাছে বাস্তব সম্মত বলে মনে হয়েছে। কিন্তু কালকূটের চোখ দিয়ে আরও একটি বিষয় উঠে এসেছে সেটি হল অধ্যাত্মবাদী ধার্মিকদের মত শঙ্করাচার্য সাধু সম্মেলনের জন্য চারটি স্থান নির্বাচন করেছিলেন। সাধু সম্মেলনের জন্য নির্বাচিত স্থানগুলি হল কুম্ভমেলার চারটি স্থান। কুম্ভমেলার কারণ সম্পর্কে কালকূট যে তথ্যগুলি পেয়েছেন তা থেকে কালকূট বলেছেন ''এই সাধু জমায়েত আর পুরাণের অমৃতযোগ সাধারণ পুণ্যার্থী নরনারীদেরও টেনে এনেছে।'' *(পৃ: ১৫৮৯, ঐ)* কালকূট নিজেই এসেছেন হরিদ্বারে অমৃতের সন্ধানে। গঙ্গাদ্বারে অমৃতের উদ্ভব হবে, সেই নেশাতেই তিনি ছুটে এসেছেন লক্ষ লক্ষ রূপের হাটে। এই লক্ষ লক্ষ রূপের হাট থেকেই তিনি অমৃতের পরশ পেতে চান। মহাভারতে সমুদ্র মন্থনে কালকূট গরলের উদ্ভব হয়েছিল, কালকূট গরলের বিষবাষ্পে দেবাসুরের মৃত্যু ঘনিয়ে উঠেছিল। স্বয়ং মহাদেব দেবাসুরকে কালকূট গরলের তীব্র বিষের জ্বালা থেকে মুক্তি দিয়ে সেই তীব্র বিষ কালকূট পান করেছিলেন। কিন্তু বিষের জ্বালা এমন তীব্র ছিল যে মহাদেব গলাধঃকরণ করতে পারেন নি। গলাতেই বিষ আটকে তিনি নীলকণ্ঠ। কালকূট বলেছেন 'এই যে লক্ষ রূপের হাটে এসে দাঁড়িয়েছি, এর মধ্যে আমি একটা অমৃতের স্বাদ পাচ্ছি। এই যে আমার দেশ, আমার অনরূপ রূপসী জননী। যেখানে আমার গর্ভধারিণীর মুখের সঙ্গে সব মুখ একাকার হয়ে গিয়েছে। এই মহান রূপে আমি মুগ্ধ। কী যে অহঙ্কার, বুঝিয়ে বলতে পারি না।' *(পৃ: ১৫৮৯, ঐ)* গঙ্গাদ্বারের পবিত্র গঙ্গায় অমৃতের উদ্ভব হবে, সেই অমৃতে পুণ্য স্নান করে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেকে পাপমুক্ত করতে চায়। তাদের প্রতিদিনের জীবনে ঘটে যাওয়া অন্যায় প্রলোভন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বিবেকের মধ্যে যে পাপবোধ জমা হয় সেগুলো মানুষ পূর্ণকুম্ভের পবিত্র জলে স্নান করে পাপস্খলন করতে গঙ্গাদ্বারে এসেছে। কালকূটের ভেতরের অন্ধকারে যে বিষ জমা হয়ে আছে সেখানে বিষের মন্থন চলছে। লক্ষ রূপের হাটে, লক্ষ মানুষের হৃদয়ে ডুব দিয়ে, এই

অমৃতযোগে, কালকূট বিষমুক্ত হতে চাইছেন। লক্ষ লক্ষ রূপের আরশিতে কালকূট নিজেকে উৎসর্গ করতে চাইছেন, বিষমুক্ত জীবনের সন্ধান করছেন। এইভাবেই কালকূট ১৬ এপ্রিলের দিনলিপি তথা গঙ্গাদ্বারের কুম্ভমেলার প্রতিবেদনটি শেষ করেছেন।

কালকূটের 'পূর্ণকুম্ভ, পুনশ্চ' এই রচনাটিতে দেখা যাচ্ছে কালকূট তথ্য পরিবেশন করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে তিনি সংবাদ পাঠকের কাছে পৌঁছেছেন। ৭ই এপ্রিল থেকে ১৬ এপ্রিলের দিনলিপির মধ্য দিয়ে দিনলিপিগুলো বিভিন্ন উপনাম দিয়ে তিনি কুম্ভমেলা পরিক্রমার বিভিন্ন তথ্য, ঘটনা, বহু মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ছোট ছোট ঘটনা, চিত্র তুলে ধরে তাঁর আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে। গঙ্গাদ্বারের কুম্ভমেলায় দেখা ঘটনাবলী বারে বারে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে প্রয়াগের কুম্ভমেলায়। বত্রিশ বছর আগের লেখা দুটি প্রতিবেদনও তিনি পাঠককে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য পূর্ণকুম্ভের মুখবন্ধ হিসাবে যোগ করেছেন। নিজেও বারে বারে বত্রিশ বছর আগের দেখা মেলাতে ফিরে গেছেন এবং পাঠককুলকে প্রয়াগের দেখা অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন করে দেখা হরিদ্বারের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সঙ্গে সামিল করেছেন। বত্রিশ বছর আগে আনন্দবাজার সংবাদ পত্রে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন পরবর্তীকালে প্রয়াগের মেলায় দেখা মানুষগুলির অন্তর গভীরে ডুব দিয়ে তাঁদের জীবনের ভূমিতে নিয়ে এসে মানুষের সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, লোভ-লালসা, স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' রচনা করে সাহিত্য পাঠকের কাছে পৌঁছেছিলেন। তিনি তার সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' রচনাটিকে সাহিত্যের রূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু 'পূর্ণকুম্ভ, পুনশ্চ' সাহিত্য পাঠকের দৃষ্টিতে সাহিত্যের সেই জায়গাতে পৌঁছতে পারেননি। তবুও 'পূর্ণকুম্ভ, পুনশ্চ'-এ তার সাহিত্যিক সত্তাটিকে অস্বীকার করা যায় না। যদি তিনি এই রচনাটিকে পরবর্তীকালে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'-এর মত তাঁর দেখা চরিত্রগুলোর অন্তর গভীরে ডুব দিয়ে জীবনভূমিতে এনে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে তার রূপ দিয়ে বত্রিশ বছর পরে নতুন করে দেখা হরিদ্বারের কুম্ভমেলাকে নিয়ে সাহিত্যিক মনোভাব নিয়ে নতুন ভাবনায় নতুন কিছু সৃষ্টি করতেন তাহলে হয়ত 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'র মত আর এক অনবদ্য সাহিত্যের রূপ নিত। তবু এই তথ্য পরিবেশনের মধ্য দিয়েই কালকূট একটা কাব্যিক সৌন্দর্যকে লেখনীর তুলিতে চিত্রায়িত করেছেন। লক্ষ লক্ষ রূপের আরশিতে নিজের আত্মোপলব্ধিকে মেলায় দেখা, পরিচিত হওয়া মানুষগুলোকে তাঁর লেখনীর তুলিতে চিত্রায়িত করেছেন। বহু মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সেই বিশেষ মুহূর্তটিকে তাঁর তীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তুলে ধরেছেন এবং তার সঙ্গে দেখা হওয়া মানুষগুলির সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহগুলিকে মালার মত গাঁথতে গাঁথতে কাহিনীর গতিকে এগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর নিজের আত্মোপলব্ধিগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী চরিত্রগুলোর মুখে বসিয়ে দিয়ে নিজের বক্তব্যগুলোকে বলিষ্ঠ

করে তুলেছেন। তিনি লক্ষ লক্ষ রূপের আরশিতে গঙ্গাদ্বারে কুম্ভমেলাকে দেখে নিজ লেখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রচনাটি উপন্যাসের পূর্ণতায় পৌঁছতে না পারলেও কালকূটের সৃজনশীল সাহিত্যিক সত্তাটিকে অস্বীকার করা যায় না।

'হারায়ে সেই মানুষে' রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় 'সিনেমা জগৎ' পত্রিকায় ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৭ বঙ্গাব্দে)। পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৭ বঙ্গাব্দে) আশ্বিন মাসে। দে'জ পাবলিশিং এটি প্রকাশ করে। গ্রন্থটি কালকূট 'স্বর্গত যোগেন্দ্রনাথ দাস-এর স্মরণে' উৎসর্গ করেন। ভূমিকায় তিনি লেখেন, " 'হারায়ে সেই মানুষে' ছাপাতে ছাপাতে দীর্ঘকাল ছাপাখানায় পড়েছিল। তার একমাত্র কারণ, সেই এক 'আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়।' ইচ্ছা ছিল, রচনাটিতে আরো অনেক ঘটনা সংযোজন করব, যা এই রচনার আবশ্যিক অঙ্গ ছিল। অথচ নানান কারণে, বিশেষ করে অসুস্থতাবশত: কিছুতেই তা সম্ভব হল না। আমার ছলনার কথা সেই কারণেই। ফল যা লাভ হয়েছে, তা হলো, অধিককাল ছাপাখানায় পড়ে থাকার জন্য, প্রথম দিকে কয়েকটি ফরমায় কালের রঙ ধরে গিয়েছে। এ ত্রুটি একান্তই আমার। রচনাটি অপূর্ণ নয়, কিন্তু সমগ্রের অঙ্গ সজ্জায়, কিছু বাকী থেকে গেল। পরবর্তী সংস্করণে, সমগ্র রূপটি দেবার চেষ্টা করব। আশাকরি সেটা নিতান্ত ছলনা হবে না। ইতি - ১০.৯.৭৫। *(পৃ: ১৬৮১, কালকূট রচনা সমগ্র, ৩য় খণ্ড)*

এই কাহিনীতে লেখক মনপবনে সওয়ারী হয়ে তাঁর বাল্যকালে পৌঁছেছেন। বুড়ি গঙ্গার তীরে জীয়সের লেন ছেড়ে দিদির শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে বছর বারোর একটি ছোট ছেলে। দিদিকে নিয়ে দ্বিতীয়বার শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে জামাইবাবু, সঙ্গী হয়েছে জামাইবাবুর ছোট শ্যালকটি। এই জামাইবাবু প্রথমে তাদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। 'জিনারদি' স্টেশন ছাড়িয়ে দু'ক্রোশ দূরের গ্রাম থেকে ঢাকা শহরে কলেজে পড়তে এসেছিল, পরে আইন পড়ার ইচ্ছে আছে। বালকটির তখন ন'বছর বয়স। কলেজ পড়ুয়াটি বাইরে খেতে পারে না আবার রাধতেও পারে না, তাই বালকটির বাড়িতে দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল, বিনিময়ে বালকটি ও তার মেজদাকে পড়াতে হবে। এই শিক্ষকই তিন বছরে জামাইবাবু হয়ে গেছে। ব্যাপারটিতে বালকটির বেশ লেগেছে, যে মাস্টারমশাই-এর কাছে পড়া বলতে না পেরে মাথা হেঁট করে থেকেছে, এখন তাঁরই হাত ধরে ঘোড়ার গাড়ি চেপে সদরঘাটে বেড়াতে যায়, ফ্ল্যাশ গর্ডনের মতো বায়োস্কোপ দেখতে যায়।

কালকূটরূপী লেখক স্মৃতিচারণের মাধ্যমে তাঁর ছেলেবেলা তুলে এনেছেন। ছোটবেলা থেকে নিষেধ না মানা, ভয়ডরহীন এক বালককে তুলে এনেছেন। এই নিষেধ না মানা, অচেনা, অজানার প্রতি আগ্রহ চিরকাল লেখক কালকূটকে ঘরছাড়া করেছে। সেই আভাসই এই কাহিনীতে ফুটে উঠেছে। লেখকের স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে বিয়ের আগে দিদি ও যোগেন্দ্রনাথের আচার-আচরণ।

দিদির দিকে তাকান, কথা বলার ধরন, হাসি সবই বালকটির অন্যরকম লাগত। তার মারকুটে দিদিও গৃহশিক্ষকের কাছে অন্যভাবে, অন্যরূপে কথা বলত। ''যমুনার জলে তো অন্তস্রোত বহে।'' আজ পরিণত বয়সে সেই ঘটনাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছোট হলেও তারা যে কিছুই বোঝে না তা নয় এটা পাঠকের চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। সেই শিক্ষক তথা জামাইবাবুর সঙ্গে দিদির শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে বালক সমরেশ বসু তথা কালকূট। খুশিতে উদ্বেলিত, যাওয়ার আগে বাড়ি থেকে অনেক কিছু শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন দিদিকে 'তুমি' বলতে হবে, দিদির কোলে দিদির মাথার ঘোমটা খুলে চুল টেনে যেন পেড়ে না ফেলে। দিদির ভাসুরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা, গুরুজনদের প্রণাম, তাদের কথা মেনে চলা, গাছে না ওঠা, সাঁতার না কাটা ইত্যাদি ইত্যাদি নানা নির্দেশ। বালকটি সব কিছুতেই মাথা নেড়েছিল, মনে মনে অন্য ভাবনা। আগে দিদির শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার অনুমতিটা পাওয়া, তারপরে যা হওয়ার তাই হবে। দিদিকে তুমি বলতে ওর বয়েই গেছে। বালকটির মনে একটা অন্যরকমের জেদ, শাসন না মানা, এইরকমের ইচ্ছা কাজ করত। সেটা 'জিনারদি' স্টেশনে পৌঁছেই শুরু হয়ে গেল। দিদির গ্রাম্য ভাসুরকে প্রথমে প্রণাম করবে না। কিন্তু প্রণাম করার পরে দিদির ভাসুর সুরেন্দ্রনাথ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরার পরই হৃদয়টা গলে গেল। কিন্তু দিদির সঙ্গে পাল্‌কিতে গেল না। দু'ক্রোশ পথ যে কতটা সেটা সেদিন ওই বালকটি বুঝতে পারেনি। কিছুদূর যাওয়ার পরই বুট জুতো পরে আর হাঁটতে না পেরে জুতো খুলে হাতে নিয়ে মনের খুশিতে হাঁটতে শুরু করল। সুরেনদা ওর কাণ্ড থেকে হেসে উঠলেন এই বলে যে লোকে চাষা বলবে যে। কার কথা কে শোনে, পায়ে যে আরাম লাগছে, খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতেও দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। সেটাও আর পারা যাচ্ছে না।

গ্রামে ঢোকার মুখে ছেলেটি আবার জুতো মোজা পরে নিল। দিদির বাড়ি নতুন পরিবেশ, ছনের বাড়ি। দিদির শ্বশুরমশাই সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি জড়িয়ে ধরলেন, কিন্তু গায়ে তামাকের কটু গন্ধ, ছেলেটির বাবা যে তামাক গড়গড়ায় টানে তার মিষ্টি সুবাস, আর শ্বশুরমশাই-এর তামাক, তাঁদের জমির তামাক ঘরোয়াভাবে তৈরি তিনি এই তামাকেই অভ্যস্ত। ছেলেটির দিদির বিয়েতে শ্বশুরমশাই তাঁর বাবার ইসলামপুরী তামাক নেন নি, দেশী তামাকই টানতে চেয়েছিলেন। দিদি শ্বশুর বাড়িতে তাঁত আছে, রাব মিশিয়ে দেশী তামাক মাখানো হয়, পাট নামিয়ে হাটের দিন নিয়ে যাওয়া হয়, ধানের গোলা আছে। রান্নাঘরের পিছন দিকে দীঘি আছে। দিদির দুটি শাশুড়ি, সেটা প্রথমে ছেলেটি বুঝতে পারেনি। দিদির শ্বশুরমশাই-এর মত আর একজন শ্বশুরমশাই কোথায় জানতে চেয়েছিল। তখন ওকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল বড় শাশুড়ি যাকে সবাই ধনমা বলে তাঁর সন্তান না হওয়ায় ছোটবোনকে বিয়ে করেন দিদির শ্বশুরমশাই তথা তালুইমশাই। তারই সন্তান তার জামাইবাবু। জামাইবাবু যোগেন্দ্রনাথ, ছোটভাই

বীরেন্দ্রনাথ, বড় ভাই সুরেন্দ্রনাথ। তাদের দুটি বোনও আছে। বালকটি যত দেখে ততই অবাক হয়ে যায়; দিদির শাশুড়ি সুরেনদার বউ বড়দিদি, এরা শুধু শাড়ি পরে আছে, ব্লাউজ গায়ে নেই। সুরেনদার তিনটি ছেলেমেয়ে, হেলেন বছর দশেকের, আর গান্ধী বছর আটের। রেণু ওদের ছোট। গান্ধী যে কারো নাম হতে পারে এটা বালকটি ভাবতেই পারে নি। গান্ধী বলে যে সে একজনকেই জানে, তার ছবি সে দেখেছে। তাদের ঢাকার বাড়িতে দুই মেসো রাজনীতি করতেন, তারা গান্ধী-বিরোধী ছিলেন। পুলিশ তাদের সারা বাড়ি তালাশ করতে আসত, হঠাৎ করে যখন-তখন আসত, কিন্তু কখনও ধরতে পারে নি। বাড়ির পিছন দিয়ে মসজিদের ওপর দিয়ে পালিয়ে যেতেন। এসব ঘটনা লেখক কালকূটের নিজের চোখে দেখা। বালকটি ও তার দিদিকে দেখতে গ্রামের অনেকে এসেছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়ের এসে ওদের দেখছে। ছেলেদের প্যান্টগুলো ঢলঢলে, হাঁটুর ওপরে এসে নেমেছে, জামাগুলোও সেইরকম, মেয়েদের ফ্রকগুলো বেঢপ। আর পুঁচকে পুঁচকে মেয়েদের নাকে একটা করে নাকছাবি পরা। সব, সবকিছুই নতুন লাগে দিদির শ্বশুরবাড়ির। তার পোশাকের সঙ্গে ওই ছেলেমেয়েগুলোর পোশাকের বিস্তর পার্থক্য, তার জামাইবাবুর ফিনফিনে ধুতি ও পাঞ্জাবির সঙ্গে সুরেনদা ও তালুই মশাই-এর পোশাক মেলে না — মোটা, নিতান্তই সাদামাটা। বালকটি বাড়ির সকলের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে যায়। টুথ পাউডার দিয়ে দাঁত না মেজে বলে 'আমি মটখুরা ডাল দিয়ে দাঁত মাজব।' *(পৃ: ৭৬৫, কালকূট রচনা সমগ্র, ২য়)* এগুলো করার আগে তাঁতঘরে গিয়ে তাঁত চালনা দেখে আসে। হেলেনরা মটখুরার ডাল খুঁজতে যেদিকে ছুটে যায় বালকটিও সেইদিকেই চলতে থাকে। দিদির পিছু ডাক কানে নেয় না। পুকুরপাড়ে এসে হেলেন-এর বয়সী একটা মেয়েকে দেখতে পায়, পিছন ফিরে বসে আসে। ওর ইচ্ছে মেয়েটাকে একটা ঢিল মারে কিন্তু নতুন জায়গা বলে সেটা না করে মেয়েটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল যে সে কে? কোন উত্তর না দিয়ে মেয়েটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে। ইতিমধ্যে হেলেনরা এসে যায় মটখুরার ডাল নিয়ে হেসে হেলেন জানিয়ে দেয় যে ওর নাম সোরি। 'ওদের তো পুকুর নেই, তাই আমাদের পুকুরে আসে।' *(পৃ: ৭৬৫, ঐ)* সোরি কেন কথা বলছে না এটা হেলেন জেনে নিয়ে বলে যে বালকটিকে ও ভূত মনে করেছিল। ক'দিন আগে তেঁতুলতলায় বীণাদিকে মধুভূত দেখা দিয়েছিল সাহেবের বেশে। বালকটির পোশাকও অনেকটা সাহেবের মত তাই ও ভয় পেয়েছে। গান্ধী শুনে ওকে ঘুষি মারতে চাইল, এতে বালকটি খুব রাগ করল। হেলেনের সঙ্গে কথাকাটাকাটি হতে হতেই গান্ধী সোরিকে একটা ঘুষি মেরে দৌড়ে পালিয়ে গেল। দুটো ছোট ছোট বালকের স্বভাব দুষ্টুমি উঠে এসেছে। বালকটির দুষ্টুমি ভরা মন ও গান্ধীর ঘুষি মারা দুটোই সোরিকে নিয়ে।

লেখক নিটোল ছবির মতো একটি গ্রাম্য পরিবেশ গড়ে তুলেছেন, একটা শহুরে বারো বছরের ছেলেকে চোখ দিয়ে সব উঠে এসেছে। যদিও লেখক কালকূট তার মন-পবনের নাতী

ভাসিয়েছেন অনেক পরে। তাঁর জামাইবাবু মারা যাওয়ার পরে এই গ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করেছেন। সেই ছোট বয়সে একটা ছোট যা বুঝতে পারে নি, এখন পরিণত বয়সে এসে সেগুলো বুঝতে পেরেছেন। তবুও বালকের মনের জিজ্ঞাসাই তিনি পাঠক মনে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নতুন সাথিকে দেখে উৎসুক্য, ঐ নিয়ে নিজেদের মধ্যে খুনসুঁটি, নতুন মামার সঙ্গ ী কে হবে এসব ছোট ছোট ঘটনার মালা গেঁথেছেন লেখক নিপুণভাবে। একটা গ্রাম্য পরিবেশের মানুষজন ধীরে ধীরে বালকটির অনেক কাছের হয়ে উঠেছিল সেটা লেখক সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। এখান থেকেই বেরিয়ে এসেছে ছেলেটির নিষেধ না মানার কথা, উল্টোদিকে চলা। বাড়ির লোকের শাসনের ভয় আছে তবু সে সেই অজানাকে জানতে চায়, অদেখাকে দেখতে চায়। তার মনের মধ্যে মধুভূতের কাহিনী ভেসে বেড়ায়, কেউ কাউকে বিয়ে করতে চাইলে, তাকে না পেলে মরে যায় কেন? হেলেন বলেছিল মধু 'শ্যাকেদের (শেখ মুসলমান) মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, ও শ্যাক হয়ে যেতে চেয়েছিল। সেটা পারেনি বলে মনের দুঃখে গলায় দড়ি দিয়েছিল।' *(পৃ: ৭৬৭, ঐ)*

হেলেন নতুন মামার সঙ্গ ছাড়ে না। প্রথমে তুমি বলেছিলে মামাকে, মা আপনি বলতে বলেছে, তাই সে মামাকে আপনিই বলছে। বালকটি এসব পছন্দ করছে না, 'আপনি' বলতে না করছে। বলছে কথা না শুনলে কি হয়? 'আমাকেও তো, আমার দিদিকে 'তুমি' করে বলতে বলে আমি বলি?' *(পৃ: ৭৬৮, ঐ)* গলায় আত্মপ্রত্যয়ের ভাব বালকটির। কিন্তু হেলেনের অত সাহস নেই, সে আপনিই বলবে। বালকটি খাওয়াদাওয়ার পর আবার তাঁতঘরের দিকে গেল। তালুইমশাই তখন পশ্চিমের ঘর থেকে পাট নামাচ্ছিলেন। বালকটি হেলেনকে ওই তেঁতুল গাছটা দেখিয়ে দিতে বলল। হেলেন যেতে রাজি না হলেও শেষ পর্যন্ত গাছটা ওকে দেখিয়ে দিয়ে ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। বালকটি তেঁতুল গাছের কাছে গেল — কাছে আসতেই ঝপ করে একটা শব্দ হল। একটা পাখিকে উড়ে যেতে দেখল। 'সে' কী না জানে না। কিন্তু বালকটি স্পষ্টই বুঝতে পারল গাছের তলাটা কেমন থম্‌থম্‌ করছে। না দেখতে পেলেও, সেখানে যে কেউ আছে, তা বুঝতে পারছে। একেবারে গোড়ায় যাওয়াটা ঠিক হবে না বোধহয়। লেখক কালকূট তার বাল্যকালে তেঁতুল তলায় এক ভৌতিক অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন এইভাবে— ''আমি গাছের ওপরের দিকে তাকালাম। ছায়ায় যেন অন্ধকার হয়ে আছে। বেল্টের আংটা ঠিক ধরে আছি। বাঁদিকে তাকিয়ে অন্যান্য গাছপালার মাথার ওপরে, এতটা চিলেকোঠায় ছাদ দেখতে পেলাম।'' *(পৃ: ৭৬৯, ঐ)*

এইরকম একটা আধিভৌতিক পরিবেশে হঠাৎ সুরেনদার ডাক শুনতে পেল বালকটি। হেলেন, গান্ধী, রেণু সবাই এসেছে সুরেনদার সঙ্গে। সুরেনদা শুধু বললো যে ওদিকে একলা যেতে নেই। পাগলা শেয়াল তাড়া করতে পারে। কিন্তু ছেলেটা মানবে কেন? দিনেরবেলায় কি শেয়াল

বের হয় তার প্রশ্ন ছিল। কথা বলতে বলতে বাড়ির উঠোনে পা দেওয়ার আগেই জামাইবাবু তাড়াতাড়ি ছুটে এসে সুরেনদার কাছে জানতে চেয়েছিল কোথায় গিয়েছিল? একটু পরে তালুইমশাইও জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তর ছিল বিশ্বাসদের বাড়ির পিছনে। কেউ তেঁতুলগাছের কথা বলল না। দিদি একলা কোথাও যেতে বারণ করল, কথা না শুনলে চিঠিতে বাবাকে জানিয়ে দেবে। ছেলেটি গ্রাহ্য করল না, ঘাড় বাঁকিয়ে বলে দিল 'দি খালি বাবা আর, বাবা। *(পৃ: ৭৭০, ঐ)* ছেলেটির কথায় বাড়ির সকলেই খুব মজা পায়, এবারও পেল। এই কাজটি হেলেন করেছে সেটা বুঝতে বাকি রইল না। মামা কোথায় হারিয়ে গেছে, তাই সে সবাইকে খবর দিয়েছে। শিশুমনে যা হওয়া উচিত তাঁর মনপবনে সেই বাল্যকালের স্মৃতিকে তুলে এনেছেন। এখানে সবই তার নিজের চারপাশে বহুদিন আগে দেখা চরিত্র। তিনি বহুদিন আগে দেখা স্মৃতিকে তুলে এনে পাঠককে একটা কথা না-শোনা, সকলের মন কাড়া, চিত্ত জয়কারী বালককে উপহার দিয়েছেন। পাঠকও নিজের জীবনের সঙ্গে ছেলেবেলাকে মিলিয়ে নিতে পারেন।

সোমবার হাটের দিন, সকাল থেকে সাজো সাজো রব। সুরেনদার সঙ্গে ছেলেটি হাটে গেল, মাধবদির হাট, বিশাল; হাজার হাজার লোক সেই হাটে যায়। যাওয়ার সময়ে সকলে সাবধান করে দিল, একলা যেন কোথাও না যায়। গান্ধী হাটে যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করেছিল কিন্তু সুরেনদা তাকে স্কুলে যেতে বলেছিলেন। সোরিদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেল। সোরি তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে বলল গল্প করার জন্য। সোরির সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে। প্রথমদিন বিকেলে সোরি এসেছিল হেলেনের সঙ্গে। কিন্তু বালকটি রাগ করে ওর সঙ্গে কথা বলেনি এবং বলবে না জানিয়ে দিয়েছিল। সোরি দুঃখ পেয়ে চলে যেতে হেলেন সোরির হয়ে বলেছিল, ওর দোষ নেই, ভয় পেয়েছিল ভূত ভেবে। একদিন পরে সোরি আবার এসেছিল ভাব করতে, একটা বাটিতে করে নকুলদানা নিয়ে। সোরি ওদের বাড়িতেও নিয়ে গিয়েছিল, হেলেন যেতে চায় নি, শুধু দুটো ঘর দেখার মধ্যে কী আছে? কিন্তু ছেলেটার জেদে হেলেনও গেল সোরিদের বাড়িতে। সোরির মা খুব আদর করল, তার দেওয়া খাবার সে খায়নি, আচার খেয়েছিল। ছেলেটি সোরিকে লুকোচুরির বড় খেলা 'টিলোট' আর জলের মধ্যে 'হলডুপ' খেলার পদ্ধতি বলছিল। টকিতে কাননবালাকে দেখেছে। তারপরে গানের কথা উঠতে সোরি গুন গুন করে গান গেয়েছিল, কৃষ্ণযাত্রার গান। 'আমি যখন বসে থাকি গুরুজনের মাঝে / নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশি, আমি মরি লাজে।' *(পৃ: ৭৭২, ঐ)* সোরির অনুরোধে ছেলেটি রেকর্ড থেকে শোনা গানটি গেয়েছিল, 'নিশিথে যাইয়ো ফুল বনেরে ভ্রমরা/ নিশিথে যাইয়ো ফুল বনে।' *(পৃ: ৭৭৩, ঐ)* সোরি গানের প্রশংসা করাতে ছেলেটিও সোরির প্রশংসা করেছিল, বলেছিল ওর গলাটা ওর বৌদির মত সুরেলা। সোরির প্রশংসা হেলেন ভালভাবে নেয়নি, ওর মনে ঈর্ষা জেগেছিল। রাতে কিছুতেই ছেলেটির কাছে পড়তে বসে মুখ

খোলেনি। শুধু কাঁদছিল। ছেলেটির দিদি ছেলেটিকে বকছিল নিশ্চয়ই কোন দোষ করেছে। শেষে রেগে দিদিকে 'ধূতেরি শালা' আর 'পেতনি' বলে গাল দিয়েছিল।

এইভাবেই সোরির সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল। হাটে যাওয়ার দিন রাস্তায় সোরি দাঁড়িয়েছিল, বলেছিল তাড়াতাড়ি ফিরে আসলে অনেক গল্প করবে। হাটে যেতে যেতে সোরির দাদা মাখনের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। হাটে পৌঁছে বীরেনদার দোকানে গেল। বীরেনদার দর্জির দোকান, ওখানে আরও অনেকের সঙ্গে লেখক তথা কালকূটের ছোট ছেলেটির সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। কেশব ঠাকুর তাকে তার যাত্রাদলে নিয়ে যায়। তার জন্য নতুন করে যাত্রাপালা করবে ও পীত বসন পরিয়ে মাথায় ময়ূর-পাখার চূড়া দিয়ে হাতে একটি বাঁশী ধরিয়ে দিয়ে যাত্রায় নামিয়ে দেবে। কেশব ঠাকুরের বিশ্বাস, অমল সুন্দর চোখের সঙ্গে গজদাঁতের হাসি আর মিষ্টি গানের সুরে সকলের মন হরণ করবে। শুধু কৃষ্ণই নয়, নীলবসনা সুন্দরীও মানাবে। লেখক কালকূট পরিণত বয়সে বসে তাঁর বাল্যকালকে স্মরণ করছেন। কেশব ঠাকুর এই বালকটির মন হরণ করে নিয়েছে। বালকটি যাত্রা করতে রাজি হয়ে যায়। পাঠকের চোখে বালকের মনবাসনা ফুটে উঠেছে, যাত্রা করার অভিজ্ঞতা যে বালকটির আছে, তাই যাত্রাদলের সঙ্গে নানা দেশে ঘুরে বেরিয়ে গান গাইতে চায়। বালকের সুদূর পিয়াসী মনটি লেখকের চোখ দিয়ে পাঠকের চোখে উঠে এসেছে। শিশুমনে যাত্রাদলের নায়ক হওয়ার সাধ জেগে উঠেছে। নিমাই সন্ন্যাসের পালাগান দেখতে গিয়ে চোখের জলে বুক ভেসে গিয়েছে। আবার এই বালকটিই কবুতর কেমন করে কাটে সেটাও দেখতে চায়। বীরেনদার দোকানে আদারি নামে ছেলেটি নতুন ছোট অতিথিকে 'কবুতরে'র ঝোল দিয়ে আপ্যায়ন করতে চায়। তাই বালকটি বায়না করে বলে 'কাটবার সময় আমি দেখব।' দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে বালকমনের বৈপরীত্য উঠে এসেছে। মিষ্টি খাওয়ার সময় মাখন ছিল না, তার ক্ষীরমোহনের স্বাদ বিস্বাদ লাগলো। বালকের মনের বৈচিত্র্য বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে উঠেছে। এক স্বভাব বৈরাগ্য, মিশুকে, দুরন্ত বালক এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র হয়ে পাঠকের চোখে উঠে এসেছে।

মাধবদীর হাটে হাজার হাজার লোকের আনাগোনা। সবাই যখন কাজে ব্যস্ত তখন পায়ে পায়ে হাট দেখতে দেখতে নিজের অজান্তে এগিয়ে যায়। সারি সারি কাঁসা পিতলের দোকান দেখতে দেখতে দিক হারিয়ে ফেলে বীরেনদার দোকানের। অন্যদিকে চলতে চলতে জলের কাছে এসে পড়ে। নদী না খাল বালকটি বুঝতে পারে না। বেদেনীদের ইশারায় তাদের কাছে ভানুমতীর খেল দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। এক বুড়ি বেদেনীর চোখের পাতা ফাঁক করে লম্বা একটা শলা ঢুকিয়ে দেয়, একটুও রক্ত পড়ে না, দুটো জিনিসই বালকটিকে হতবাক করে দেয়। একটি পয়সাও দিয়ে দিল বুড়িকে, বুড়ি তাকে অনেক আদর করল। বালকটির দিদির বয়সী সারি বেদেনীকে খুব ভাল লেগে গেল। সেও তাকে একই খেলা দেখাতে লাগল। সম্ভাষণটিতে সে মুগ্ধ। 'এস আমার কালিয়া

নাগর, তুমি আমার ছোট বর। (আইয়ো আমার কালিয়া নাগর, তুমি আমার ছোট সোয়ামী।)' *(পৃ: ৭৭৭, ঐ)*

তাকে এত ভাল লেগে গেল যে তাকে সে বারে বারে পয়সা দিতে লাগল। মেয়েটি দৌড়ে নৌকায় উঠে গিয়ে একটি সাপ এনে বালকটির সামনে নিজের গায়ে ছেড়ে দিল দেখে তার গা শিরশির করে উঠল। কিন্তু এরই মধ্যে পাঠকের চোখ দিয়ে বেদেনী সমাজের একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরেছেন। ছোট বড় প্রত্যেকের জীবনযাত্রার ধরণ, কথাবার্তা রঙ্গরসিকতা, সব উঠে এসেছে। উঠে এসেছে বালক মনের ইচ্ছা; তারও ইচ্ছা করছে সাপটিকে হাতে নিতে, পোষ মানাতে, খেলা দেখাতে। কিন্তু যদি কামড়ে দেয়, কিংবা বাড়িতেই বা কিভাবে রাখবে এমনি শিশুমনের নানা ভাবনা। সারি বেদেনী জানতে চাইছে তার নাগরের কাকে ভালো লেগেছে নাগকে না তাকে। বালকটির উত্তর ছিল 'দুজনকেই'। সারি খুশি হয়ে তার গাল টিপে বলল, ''ওগো আমার নাগর গো। তবে আমাকে চার আনা পয়সা দাও।'' *(পৃ: ৭৭৮, ঐ)* ছোট ছোট কথাবার্তার মধ্য দিয়ে দুটি ভিন্ন ভিন্ন সমাজজীবনের চিত্র উঠে এসেছে। সারিকে তার সব টাকা দিতে রাজি হয়নি, মনের ভাবনা বিকশিত হয়েছে সোরি, মাখন, গান্ধী, হেলেন ও রেণুর জন্যও কিছু নিতে হবে তো। বালক মনের টানাপোড়েন পাঠকের চোখে ধরা পড়েছে।

সারি তাকে বলে ''তা নাগর, মূলো দিয়ে কাছিমের মাংস রেঁধেছি, দুটো গরম ভাত খেয়ে যাও।'' *(পৃ: ৭৭৮, ঐ)* বেদেনীদের কথার মায়াজালে বালকটি সম্মোহিত। ওদের সান্‌কিতে করে মূলো দিয়ে কাছিমের মাংস ভাত খেয়েছিল। শুধু তাই নয়, বুড়ি বেদেনীর অনুরোধে হুঁকোতে টান দিয়ে কাশতে লেগেছিল। বুড়ি বেদেনী তার মাথার তালুতে চাপড়াতে চাপড়াতে বলল যে ''ষাট ষাট ষাট, চাঁনের কষ্ট আমার বুকে লাগ্‌'' *(পৃ: ৭৭২, ঐ)*

পরিণত বয়সে লেখকের দৃষ্টিতে তাঁর ছেলেবেলার একটি বোহেমিয়ান জীবনের সূত্রপাত পাঠকের চোখে উঠে এসেছে। একে সম্মোহন বলে কিনা জানা নেই তবে ছেলেটি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল বেদেনীদের কথাবার্তা আচার ব্যবহারে। তাই ওদের সঙ্গে খেতেও তার ভাল লেগেছিল, হয়তো খিদেও পেয়েছিল, মাংসের রান্নার ভালো গন্ধ তার মনটাকে খাওয়ার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

সুরেনদা খুঁজতে খুঁজতে বেদেনীদের হাত থেকে উদ্ধার করে। ওদের মারতে উদ্যত হয়, কিন্তু কেশব ঠাকুর নিরত করেন— ''আরে, মারামারির দরকার কী। ছাওয়াল পাওয়া গেছে, নিয়ে চল।'' *(পৃ: ৭৭৮, ঐ)* কিন্তু চৌকিদার ও সুরেনদাদা জিজ্ঞাসা করতে থাকল— পয়সা দিয়েছে কিনা? বালকটি সারির চোখের দিকে তাকিয়ে কোন গুণে যেন মন হারিয়ে না বলে দিল। সুরেনদাদার সন্দেহ গেল না, সোনাবউ অর্থাৎ বালকের দিদিকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন

সে কথা বলে বীরেনদার দোকানের দিকে চলতে লাগল। এই ঘটনায় পাঠকের চোখে একটি মিনিপাওয়া বালকের মনের চিত্র ভেসে উঠেছে। সারির কোন্ গুণে বালক মন হারিয়ে ওই মিথ্যা কথা বলেছিল। লেখক কালকূটকে বাল্যকাল থেকেই এক অন্যরকমের জীবনযাত্রা আকর্ষণ করত। বয়স যাই হোক, সারির মন ভুলানো মিষ্টি মিষ্টি কথায়, চটুলতায় তার মনে ছোট নাগরের ভাবটি জাগ্রত হয়েছিল। লেখক কালকূটের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলা যেতেই পারে 'ওরে বালক, তুই সেই চিরদিনের পুরুষ। প্রকৃতির কাছে যার বয়স দিয়ে হিসাব হয় না। মিথ্যা বলে, নষ্ট হলি, না ভ্রষ্ট হলি, সে বিচারের ভার রইল ভবিষ্যতের হাতে।' *(পৃ: ৭৭৯, ঐ)*

মাধবদীর হাট থেকে দিদির বাড়ী ফিরে এসেছিল অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে কবুতরের মাংস ও মিষ্টির ভাঁড় ঝুলিয়ে। জামাইবাবু মারতে ছুটে এসেছিলেন। সুরেনদাদা সেই যোগেনকে নিয়ে মজা করতে লাগলেন ''তোমার শালা বেদেনীর প্রেমে পড়েছিল। সময় মত না গেলে বোধ হয় ওদের নৌকোয় করে চলেই যেত।'' *(পৃ: ৭৭৯, ঐ)* সারা বাড়ী বেদেনীদের সঙ্গে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল হাটে হারিয়ে গিয়ে বেদেনীদের সঙ্গে রঙ্গতামাশা খাওয়া দাওয়ার জন্য। তবুও বালকটি বলেছিল, রান্না ভাল ছিল। মাখনও ওর কথায় সায় দিয়েছিল। হেলেন ওয়াক থু করেছিল। রান্না করে বালকটি কথা বলেনি, পরে হেলেন নিজেই করেছিল আর বলবে না বলে। রাতে শুয়ে শুয়ে হেলেনের কাছে কালো নাগের গল্পও করেছিল। বেদেনীকে বালকটির ভালো লেগেছিল, প্রেমের কুসুমও অঙ্কুরিত হয়েছিল। এটাই পাঠকের চোখে উঠে এসেছে।

লেখক কালকূট নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই কাহিনী একটার পর একটা ঘটনার জাল বুনে চরিত্রগুলো দিয়ে মালা গেঁথেছেন। ছোটবেলায় মেলায় হারিয়ে গিয়েছিলেন। চৌকিদার সঙ্গে নিয়ে তাঁকে খুঁজে আনা হয়েছিল। বেদেনীর সঙ্গে মূলো কাছিমের মাংস খাওয়া নিয়ে দিদির শ্বশুর বাড়ীতে রঙ্গরসের সৃষ্টি হয়েছিল। হেলেন 'ওয়াক থু' বলেছিল। মাখন শুধু ছোট বালকটিকে সমর্থন করেছিল 'ওদের রান্না খুব ভাল' *(পৃ: ৭৭৯, ঐ)* এই কথা বলে। সোরি ওর দাদাকে বলেছিল যে সে একটা পিশাচ আর বড়দিকে বলেছিল 'কাকীমা, ওকে তুলসী খাইয়ে দিন।' *(পৃ: ৭৭৯, ঐ)* কিন্তু বালকটি তার জেদ নিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল 'আমি ওসব খাব না।' *(পৃ: ৭৭৯, ঐ)* এমনি একটি উপভোগ্য চিত্র পাঠকের চোখে ফুটে উঠেছে। শুধু তাই নয়, ওই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মানসিক দিক অতি সূক্ষ্মভাবে উঠে এসেছে। বালক লেখক কালকূট রাগ করে রাতে কথা না বলায় হেলেন নিজে নত হয়ে তার নতুন মামার মান ভাঙিয়েছিল। আবার শিশুমনের কৌতূহলবশত জানতে চেয়েছিল 'আপনার বেদে হতে ইচ্ছে করছিল?' *(পৃ: ৭৮০, ঐ)* বালকটি বেদেনী কন্যা সারির কালা নাগের গল্প করেছিল হেলেনের কাছে। পরিণত বয়সে লেখক কালকূট স্বয়ং তার স্মৃতিচারণ করেছেন। বলেছেন 'হায় বালক, বেদেনী সারি-প্রেমের কী শিক্ষা!' *(পৃ: ৭৮০, ঐ)*

পাঠককুলের চোখে লেখকের দিদি-জামাইবাবুর বিবাহের পূর্বে প্রেমপূর্ণ বিশেষ চাউনি ইঙ্গিত তারা ছোট হলেও বুঝতে পারত। নয় বছরের বালক তার দ্বাদশবর্ষীয়া দিদি, অতএব, সারি বেদেনী কন্যার প্রেমপূর্ণ কথাবার্তা, চোখের ইঙ্গিত সবই বালকটিকে আকৃষ্ট করেছিল। তাই সে যে পয়সা দিয়েছিল তাকে সেটা সে সারির চোখের দিকে তাকিয়ে অস্বীকার করেছিল। বালক লেখকই যখন প্রধান চরিত্র, পরিণত বয়সে সেই ঘটনা লিখতে গিয়ে নিজের প্রেমিক মনটি তুলে ধরেছেন। "যাবার আগে সারির সঙ্গে চোখাচোখি হল। ও চোখ নাচিয়ে হাসল। ওরে বালক, তুই সেই চিরদিনের পুরুষ। প্রকৃতির কাছে যার বয়স দিয়ে হিসাব হয় না। মিথ্যা বলে, নষ্ট হলি, না ভ্রষ্ট হলি, সে বিচারের ভার রইল ভবিষ্যতের হাতে।" *(পৃ: ৭৭৯, ঐ)* হেলেন ও সোরি, এই দুইজনের বন্ধুত্বে মাঝে মাঝে ফাটল ধরেছে নতুন মামাকে নিয়ে। সোরির প্রশংসা বা সোরির কাছে যেতে চাইলে হেলেন অসুখী। দুটি ছোট ছোট মেয়ে খুনসুটি, রাগ-অনুরাগ দুটোই সুন্দরভাবে পাঠকের চোখে ধরা পড়েছে। তিলফুলের ভেতরে মধু খেতে ঢুকে পড়া মৌমাছি ধরতে গিয়ে বালকটির হাতে মৌমাছি হুল ফুটিয়ে দিতেই যন্ত্রণায় মৌমাছি রাখা কৌটাটি ফেলে দেয় ও সোরিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। পরে অনেক মৌমাছি কোটাটিতে ভরে সোরির কাছে যায়। হেলেনের নিষেধ না শুনে জেদী মনে চলে যায় সোরির কাছে। সোরি অতসী ফুলের ঝাড়ের কাছে ভেজা চোখে বসেছিল। বালকটিকে মৌমাছি ভরা কৌটাটি সোরিকে দিতে গেলে সোরি নেয় না কথাও বলে না। বালকটি সোরির পায়ের কাছে কৌটাটি বসিয়ে দেয়। সোরির রাগ পড়ে গেলো। সোরি ওদের ঘরে নিয়ে হাতে চুন লাগিয়ে দিতে চায়, এতে হেলেন রাগ করে বলে, 'তোকে মধুতে পাকা।' *(পৃ: ৭৮২, ঐ)* মধুতে পাক মানে সেই তেঁতুল গাছের 'সে' ধরুক। সোরি-হেলেনের ঈর্ষাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক তুলে ধরেছেন।

লেখক এক প্রতীকী চিত্র এঁকেছেন তিলফুল ও মৌমাছির মধ্য দিয়ে। তিনি লেখক কালকূট, তার বাল্যপ্রেম, ভাললাগাকে রাধাকৃষ্ণে প্রেমের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। 'দেহি পদপল্লবমুদারমে'র প্রেম নৈবেদ্য সোরির পায়ের মৌমাছি ভরা কৌটাটির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। এছাড়া দিদির শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে আসার আগের দিন সোরি ওর মাথায় নিজের হাতে তৈরি করা রাংতা লাগালো ময়ূর পাখার চূড়া পরিয়ে দেয়। গলায় মোমের মুক্তোর মালা পরিয়ে দিয়ে একটা লাল শাড়ি দিয়ে সাজাতে চায়। বালকটি বলল 'শাড়ি পরব কেন?' *(পৃ: ৭৮৩, ঐ)* সোরি বলল 'কাছা দিয়ে পরবে, বেশ দেখাবে।' *(পৃ: ৭৮৩, ঐ)* পরবে না শাড়ি। সোরির দেওয়া কোনও জিনিষই সে নেয় না, তাদের শহরে অনেক ভালো ভালো জিনিস আছে এটা জানিয়ে দেয়।

সোরির দাদা মাখনের সঙ্গে সে চুপি চুপি নৌকা বাইতে যেত। ওই গ্রামের অনেকের সঙ্গেই ভাব হয়ে গেছে, মুসলমান পাড়ার ছেলেদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। কেরালির সঙ্গে মাখন

পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ওখানে সবাই ক্যারালি বলে। ওর সঙ্গে মেশামেশিটা জামাইবাবুরা পছন্দ করে না। পদা, ভোলা, মণি, রতন, জহর এদের সঙ্গে ও এদের বাড়ির সকলের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছে। কম করে পাঁচটি বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়েছে। মাখনের সঙ্গে ধনুক ঘুড়ি উড়িয়েছে। জামাইবাবুর দিদির ছেলে গোপালের সঙ্গে মাঠে পাইখানা করতে গিয়ে সিগারেটেও টান দিয়েছে। গান্ধী গোপালের পকেট থেকে সিগারেট বের করে সুরেনদাদার কাছে দেওয়াতে গোপাল বেদম মার খেয়েছে, তবুও লেখক কালকূটের নামটি সে বলেনি।

এমনি করে পুরো গ্রামটির ছোটবড় সকলের সঙ্গে সম্পর্কের মালা গেঁথে মজা কাটাতে কাটাতেই একদিন ঢাকার বাড়িতে ফেরবার জন্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে গেল। এবং জামাইবাবুর ছুটি শেষ হয়ে যাওয়াতে বালকটি তাঁর জামাইবাবুর সঙ্গে ঢাকা শহরে ফিরে চলল, দিদি রয়ে গেল সেখানেই। দিদি জড়িয়ে ধরে কাঁদল, কাঁদল হেলেন গান্ধী রেণু। মাউইমারা, বড়দিদি ওরাও কাঁদলেন। সোরিকে বেরোবার সময় দেখতে পেল খড়ের গাদায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এইভাবে সকলকে কাঁদিয়ে, গ্রামের ছোটবড় সকলের হৃদয়খানি চুরি করে সে সম্পর্কের মালা নিজেই গেঁথেছিল, তা একদিন ছিন্ন করে দিয়ে গ্রামখানিকে শূন্যতায় ভরিয়ে দিয়ে ঢাকা শহরে চলে এসেছিল।

কয়েকদিন পরে তালুইমশাই-এর চিঠি এসেছিলো তাঁর বাবার কাছে। তাঁর পুত্রা, তাদের পরিবারকে ও গ্রামকে হাসিয়ে কাঁদিয়ে মজিয়ে চলে গেছে। তার অভাবে সকলেই একটা শূন্যতাবোধে মনে কষ্ট পাচ্ছে। লেখক নিজে নিজের বাল্যকাল সম্পর্কে লিখেছেন "সে আপনার বেগে ভাসিতে ভাসিতে বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার বেগ বাহিরে স্তিমিত হইয়াছে, ভিতরে বাড়িয়াছে। সে নিজেকে প্রশমিত করিতে পারে না।" *(পৃ: ৭৮৩, ঐ)*

লেখক কালকূট তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতিবিজড়িত টুকরো টুকরো ঘটনাবলী দিয়ে কাহিনীটি রচনা করেছেন। তিনি তাঁর বাল্যকালের স্মৃতি দিয়ে পরিণত বয়সে এই স্মৃতি তর্পণ করেছেন তার সদ্যপ্রয়াত জামাইবাবু যোগেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে। এই পরিণত বয়সে লিখতে এসে তিনি ছোট ছোট ঘটনা তুলে ধরেছেন। তিনি কয়েকটি ছোট ছোট বালকবালিকার হৃদয়তলে ডুব দিয়ে তাঁর স্মৃতির তরণী ভাসিয়েছেন। ছোট ছোট মনের সুখ-দুঃখ মেঘ রৌদ্রর মত কখনও স্নিগ্ধ ছায়া দিয়েছে, কখনও রোদের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করেছে। অনবদ্য এই স্মৃতি তর্পণ, পাঠককুলকেও অন্য এক জগতে যেখানে ছেলেবেলা ঘুরে বেড়ায় সেখানে নিয়ে গেছেন। বালকমনের নিখুঁত একটি হৃদয় চিত্র এঁকেছেন লেখক কালকূট।

'মুক্তবেণীর উজানে' ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকাকারে দে'জ পাবলিশিং থেকে ১৯৮১ (১৩৮৭) সালের জানুয়ারী (মাঘ) মাসে প্রকাশিত

হয়। কালকূট এই বইটি উৎসর্গ করেছেন 'মীনাক্ষী ও শক্তিকে'।

কালকূটের প্রথম যাত্রা শুরু হয়েছিল গুপ্তবেণী প্রয়াণ সঙ্গমে। লক্ষ্য রূপের আরশিতে নিজের পরম অর্থাৎ চেনা মানুষকে বিশেষ সময়ে পরিবর্তিত রূপে দেখার পরখ শুরু করেছিলেন। সেই থেকে তাঁর নিজেকে খোঁজা চলছেই। তাই নিজেকে খুঁজতে তিনি ১৯৮০ সালে চলে এলেন গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর আর এক সঙ্গমে — ত্রিবেণীতে। ত্রিবেণীতে এসে এই তিন নদী তিন দিকে পৃথক ধারায় বইতে শুরু করেছে। ত্রিবেণী হল মুক্তবেণী। সরস্বতী প্রয়াগের মত গুপ্ত নয়। মাঘী পূর্ণিমায় ত্রিবেণী ঘাটে পুণ্যার্থী মানুষেরা নাইতে আসে। শুধু মাঘী পূর্ণিমায় নয় ত্রিবেণীর ঘাটে যত পালাপার্বনের যোগ আছে উত্তরান, বারুনি, দশেরা ইত্যাদিতে নাইতে আসে। কিন্তু কালকূট এসেছেন এমন একটি দিনে যে দিনে কোন পালাপার্বন নেই। ঘরের কাছে এই মুক্তবেণীতে কালকূট এসেছেন এর আর এক রূপ দর্শন করতে।

বাঁশবেড়েতে বাস থেকে নেমে তিনি পাকা রাস্তা ছাড়িয়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে কিছুটা যেতেই বিরাট লম্বা গুদাম ঘরের মতো একঘর দেখতে পেলেন। টিনের চালাগুলো গোলাকার, রাস্তার দিকে কোনো জানলা নেই। ছোট ছোট কতগুলো ফোকর দিয়ে বিভিন্ন মুখ উঁকি দিচ্ছে। কোনটিতে দুই তরুণী উদাস চোখে তাকিয়ে আছে, আবার কোনটিতে লোমচর্মসার পাকা চুলের বৃদ্ধা, যে আপনমনে কথা বলেছে। গুদাম ঘরের মতো ভিতর থেকে বামাকণ্ঠে আওয়াজ ভেসে আসছে, কোথাও ঝগড়াঝাটিও চলছে বোধহয়। টিনের চালে সাত-আট বছরের তিন-চারটি ছেলে খালি গায়ে হনুমানের মত লাফালাফি করছে। নির্জন রাস্তায় কৌতূহলী লেখক ওই গুদাম ঘরটি সম্বন্ধে। কারা থাকে ওই মিলিটারী গুদাম ঘরে, বন্দীশালা নাকি? এসব ভাবতে ভাবতে এগিয়ে যেতেই কানে ভেসে এল 'নিখুঁজি'। খাটো রোগা ময়লা লুঙ্গির ওপরে ময়লা মোটা সুতির চাদর পরিহিত একটি লোক কালকূটকে কথাটি বলছে। তাঁর মনের কথার উত্তর ভেসে এসেছিল ওই গোঁফদাঁড়ি পূর্ণ মুখে হলুদ দাঁতের হাসি দিয়ে। কালকূট 'নিখুঁজি' কথাটি বুঝতে না পেরে তার কাছেই জেনে নিয়েছিলেন পাকিস্তান থেকে আসা যেসব মেয়ে মানুষের বাপ সোয়ামী হারিয়ে গেছে বা মরে গেছে, অথবা বড় ছেলেপিলে নেই, কচিকাঁচা, সেইসব মেয়ে-মানুষদের সরকারী আবাসস্থল। কালকূট বুঝতে পারলেন যে রিফ্যুজি ক্যাম্পের কথা বলছে লোকটি, সে উচ্চারণ করতে পারে না রিফ্যুজি। তিনি ওই লোকটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে এক করুণ বাস্তব সত্যের মুখোমুখী হন। গরমেন্ট এদের দেখভাল করলেও এরা মনের তাগিদে সরকারী আস্তানা থেকে রাতের আধারে নৌকা করে বাইরে চলে যায়। ক্যাম্পের গায়েই গঙ্গানদী, অতএব যেতে অসুবিধা কিসের? ক্যাম্পের মধ্যে এরকম বেচাল আকছার হতেই থাকে, পুরুষবিহীন ক্যাম্পে মেয়ে মানুষের পেট বড় হলেই ক্যাম্পেই বিচার মজলিশ বসে। এবং গুরুতর ব্যাভিচারের অভিযোগে তাদের ক্যাম্প

থেকে বের করেও দেওয়া হয়। কালকূট লক্ষ্য করছেন যে ওই গ্রাম্য মানুষটির কথা বলবার ধরণটিতে মেয়েদের গুরুতর ব্যভিচারের কথা, সরকারের নিয়মনীতির কথা অনায়াস ভঙ্গিতে সহজ-সরল ভাবে চলে আসছে। ওই গ্রাম্য লোকটির কথাবার্তার মধ্য দিয়ে কালকূট তাঁর অন্তর্দৃষ্টি মেলে ধরেছেন। কালকূট নাম এমদাদ আলি খাঁ। লেখক এমদাদ আলির মধ্য দিয়ে রিফ্যুজি ক্যাম্পের একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন অর্থাৎ এমদাদ আলির মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন।

জীবনের চেনাছক থেকে একদম অন্যরকমের জীবনের চিত্র, বিশেষত পিতামাতা, স্বামী-পুত্র-ভাই-বোন আত্মীয় স্বজনহারা উদ্বাস্তু মেয়েদের কথা তুলে ধরেছেন। কারো কারো সোয়ামী, ভাই জোয়ান ব্যাটা খোঁজ করে তাদের নিয়ে, কেউ বা ক্যাম্পের কোনো মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে চলে যায়। বিয়ে করলে সরকারী ব্যবস্থা আছে, সরকার সংসার করার জন্য কিছু টাকাপয়সা দিয়ে দেয়। এইভাবেই অনির্দিষ্টভাবে সরকারী ব্যবস্থাপনায় 'নিখুঁজি' মেয়েদের জীবন নদীর মতো বয়ে যায়। যে সব মেয়েরা থেকে যায় তাদের অসহায় অবস্থাকে চিনে নিতে নিতে কালকূট গঙ্গার কূলে কূলে উত্তরের উজানের দিকে এগিয়ে চলেছেন। সরকারী ব্যবস্থাপনায় শুধু খাওয়া-পরা-থাকার ব্যবস্থা হলেই চলে না, যুবতী মেয়ে জৈবিক কামনা-বাসনার কথাও উঠে এসেছে। এমদাদ আলির কথা। ভাগ্যের পরিহাসে ভিটেমাটি ছেড়ে কোথায় এসে পড়ে রয়েছে, ভাগ্যের কি লিখন। কিন্তু যুবতী মেয়েরা তো একটু বেচাল হয়ে উঠতেই পারে। পেট বড় হলেই ক্যাম্প থেকে বহিষ্কার। সরকারী নীতিকেও এমদাদ আলি অস্বীকার করতে পারে না, আবার মানব জীবনের যৌবনের ধর্মকেও অস্বীকার করতে পারে না। লেখক কালকূট এমদাদ আলির চোখ দিয়ে উদ্বাস্তু অসহায় মেয়েদের জীবনাচারকে চিনছেন। তাঁর দৃষ্টিতে ভাগ্যের লিখন নয়, নেতাদের দেশকে দু'ভাগ করার ফল ভোগ করছে পূর্বপাকিস্তান থেকে দেশবাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে ভারতে চলে আসা মানুষের মিছিলে যারা নিজের আত্মীয় পরিজনকে হারিয়ে ফেলেছে। এমদাদ আলির বিশ্বাস আল্লার মর্জিতেই এসব হয়েছে, তাঁর মর্জিতেই তো নেতারা এমন কাজ করেছেন। কিন্তু এমদাদ আলি চোদ্দপুরুষের ভিটে ছেড়ে পাকিস্তানে যাবে না। সেখানে সে যাবে না, এখানে তো কেউ তাকে মেরে তাড়াচ্ছে না; তবে সে যাবে কেন যেখানে তার কেউ নেই?

কালকূট এমদাদ আলি খাঁর কথার মধ্য দিয়ে জীবনের এক চরম সত্য তুলে ধরেছেন। আর মন মানবমনের হৃদিসায়রে ডুব দিয়েছে তাই তো তিনি তাঁর দৃষ্টি দিয়ে এমদাদ আলির মুখ দিয়ে এমন নিরিখ তুলে ধরেছেন। এমদাদ আলি খাঁর সঙ্গে বাঁদিকে একটা উঁচু ঢিবির দিকে পায়ে চলা পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন। এমদাদ আলি খাঁ কালকূটের গাজীসাবের মসজিদের পথপ্রদর্শক হয়ে যায়। কথা প্রসঙ্গে সে নিজেকে গাজীসাবের উত্তরসূরী হিসাবে জানায়। মসজিদে লেখককে সে দেখিয়ে দেয় মসজিদের গায়ে হিন্দু মন্দিরের নরনারীর মূর্তি তা দেখে তাঁর মনে হয়েছে বৌদ্ধরা

হিন্দু মন্দিরের শিল্প খোদাই করা পাথর দিয়ে মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। একটি খিলানের মিহরাবে লেখা থেকেই ঐতিহাসিকরা হিসাব করেছেন ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। লেখকের অনুসন্ধিৎসু ঐ খৃষ্টাব্দে উঁকি দিয়েছে। আদি সপ্তগ্রাম বিজেতা হলেন জাফর খাঁ। আবার জাফর খাঁই নাকি দরাফসাহী বলে পরিচিত। পান্ডুয়া বিজয়ী শাহ সুফির ভাই তিনি। সরস্বতী আর গঙ্গার সঙ্গমস্থলে এই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। আদি সপ্তগ্রাম থেকেও ব্যস্ত এক বন্দর ছিল ত্রিবেণী। সমুদ্রগামী বিশাল বিশাল নৌকার মাল খালাস আর ভর্তির জন্য মানুষের ব্যস্ততা। তারপর সেই সময় অর্থাৎ মুসলমান প্রারম্ভ থেকে এগিয়ে আসতে আসতে বদলে যাওয়া ত্রিবেণীর ঘাটের পরিবর্তন দেখেছেন। গৌড়ের পাঠানরা মুঘলের কাছে মার খাচ্ছে, ফিরিঙ্গিদের জাহাজের ভিড় বেড়েছে। উঁচু উঁচু মাস্তুলে ত্রিবেণীর আকাশ ছেয়ে গেছে। কবিকঙ্কণ কাব্য লিখছেন — চণ্ডীমঙ্গল; চাঁদ সওদাগরের উপাখ্যানও লেখা চলছে। ভিনদেশীরা ত্রিবেণীকে বলছেন তিরপানি, তারাবাসিনী কিন্তু ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম ওসমান সা বাংলার শাসনকর্তা থাকাকালে ত্রিবেণী সাগঞ্জ নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু আজিম সা সেই বড় গঞ্জটির নাম রেখেছিলেন আজিমগঞ্জ, এরপরে ত্রিবেণী নামে পরিচিত। সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে গেল ত্রিবেণী, হয়ে গেল বিশাল বন্দর। ধোয়ীর 'পবনদূতম'-এর কাল গত হয়েছে। পাঠান-মুঘলও রাজ্যছাড়া, ফিরিঙ্গিরা কলকাতায় জাঁকিয়ে বসেছে। সেই সময়ে একদিন ঘাটে স্নান করার সময় দুই সাহেবের ঝগড়া শুনছিলেন অসাধারণ শ্রুতিধর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়। ঝগড়া গড়িয়ে কোর্ট পর্যন্ত গেল, সাক্ষী হিসাবে তর্কপঞ্চানন পণ্ডিত মশায়ের ডাক পড়েছিল। ইংরেজী জানতেন না পণ্ডিতমশাই, কিন্তু যা যা দু'জনের মুখে শুনেছিলেন তাই তিনি অবিকল দুই সাহেবের ইংরেজী ঝগড়ার বুলি গড় গড় করে বলেছিলেন। বিচারক সেই বুলি শুনেই রায় দিয়েছিলেন।

কালের গতিতে সেই ত্রিবেণী বদলে গেছে। মফস্বল হয়ে গেছে। ত্রিবেণী কেবল এক তীর্থ আর মহাশ্মশান। চারশো বছর আগে গঙ্গার সঙ্গে সরস্বতীর যোগাযোগ নাকি একটা খাল কেটে করা হয়েছিল। নাম তার কাটি গঙ্গা। জাফর গাজী সাহেব গঙ্গাস্তোত্র রচনা করেছিলেন এবং নিয়মিত গঙ্গাপূজাও করতেন। কালকূটের অতীতচারণা ভঙ্গ হল এমদাদ আলি খাঁর ডাকে। আলির প্রশ্নের উত্তরে লেখক কালকূট জানিয়েছিলেন যে তিনি মসজিদ প্রাঙ্গন থেকে দূরে ত্রিবেণীকে দেখছিলেন। আলি ভেবেছিল কালকূট চোরাই গরুর খোঁজ করছেন, বিহারীরা নাকি গৃহস্থের গরু ভাগাতে ওস্তাদ। যখন জানল লেখক ত্রিবেণীকে দেখছেন তখন সেও কিছু কিছু তথ্য লেখককে দিয়েছিল। আলির কথায় আলির বাসস্থানের দিকে অর্থাৎ মসজিদের উত্তর-পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। মসজিদের পেছনে ঢালু জমি নেমে গেছে, জঙ্গল আর ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথ নেমে গেছে। দূরে উত্তরদিকে মাঠ আর সরস্বতী নদীর উপরে ঝোলানো লোহার সেতু।

অথচ জাফর খাঁ মসজিদটি তৈরি করেছিলেন গঙ্গা সরস্বতীর সঙ্গমে। এমদাদ আলি খাঁ মসজিদের কাছেই জাফর খাঁর আর তার এক হিন্দু পুত্রবধূর সমাধি ক্ষেত্রও দেখিয়েছিলেন। পুত্রবধূটি হুগলীর কোন এক রাজার মেয়ে ছিল, যাদের রাজ্য জয় করে জাফর খাঁর ছেলে শাদী করেছিল। এমদাদ আলি খাঁ আরো জানিয়েছিল যে জাফর খাঁ বাঁশবেড়ের খামার পাড়ার ভিখিরিদাসের আখড়ায় একবার বাঘের পিঠে চড়ে গিয়েছিলেন। জাফর খাঁকে দেখে যে দাওয়ার উপরে তিনি বসেছিলেন, সেই দাওয়াকে চলতে বলে তিনি জাফর খাঁর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে একজন নামলেন বাঘের পিঠ থেকে, আর একজন দাওয়া থেকে। তারপর দু'জনের সে কি 'গলাগলি পিরীত'। এইরকম আড়াআড়ি পিরীত ছিল দু'জনের মধ্যে, কিন্তু কেউ কারও কাছে হার মানবে না, মধুর সম্পর্ক। প্রায় সাতশো বছর আগে হিন্দু মুসলমানের মধুর ভাব গাজীর মুখে শুনছিলেন কালকূট। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারী সাহায্য কিছু পাওয়া যায় আর দর্শকের এসে যা কিছু মসজিদে দিয়ে তাই তারা কয়েকঘর ভাগ করে নেয়। যেদিন যেমন জোটে তেমন করে চালিয়ে নেয় এই ভূমিহীন, দরিদ্র বাঙালী; দিন যাপনের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা নেই। এমজাদ আলি আরও জানিয়েছিল 'কেবল মাঘী পূর্ণিমায় সবাই নাইতে আসে ত, ইদিক্কার তারা সবাই সাবেক হিন্দু আছে, সব্বাই এই মজ্জিতে একবার আসবে। কেবল মাঘী পূন্নিমায় নয়, ত্রিবেণীর ঘাটে যত পালপাবনের যোগ আছে। আর মোচলমানের ত কথাই নেই। তা ব্যাপারটা বুঝলেন তো বাবু।' *(পৃ: ১০৯৭, কালকূট রচনা সমগ্র, ২য় খণ্ড)* এমদাদ আলি খাঁ এই নিয়ে গুন গুন করে গান করে লেখকের মন ভিজিয়ে দিয়েছিল।

"কী বা হিন্দু কী মোচলমান,
মিলেজুলে করছে সাঁইজীর কাম।
হিঁদুর গুরু মোচলমানের পীর,
সেই নাম রেখেছেন সাবের ফকির।" *(পৃ: ১০৯৭, ঐ)*

আলি বলে চলেছে জাত বেজাতের বিচার নেই এখানে। তার মনের প্রশ্ন কথক কালকূটকে নাড়িয়ে দেয়, জাতের বিচার কে করলো? কালকূট বলতে পারেন না কিন্তু তার অনুভূতি, 'নিখুঁজি' মেয়েদের মন গতরের প্রতি সহানুভূতি, এবং 'কবে আছি, কবে নাই, জানের বাস ফুড়ুৎ।' *(পৃ: ১০৯৭, ঐ)* এই জীবনবোধ লেখকের কাছে অনন্য হয়ে ধরা পড়ল। মাঘের এই প্রাক্‌দুপুরে 'জাফর খাঁ' নির্জন মসজিদ প্রাঙ্গনে ভূমিহীন গ্রাম্য দরিদ্র এমদাদ আলি খাঁর কাছে জীবনের চরমসত্যর একটি পাঠ নিয়ে ত্রিবেণীর ঘাটের দিকে চললেন। কিন্তু কালকূটের কথাটা এমদাদের পছন্দ হল না। কালকূটকে শুভানুধ্যায়ীর মত বলে দিলে যে, 'ঘাটে যাবার কথা' নেই। এমদাদ লেখককে সাঁকো পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার জন্য লেখকের সঙ্গেই পথ চলতে লাগল। উপায় থাকলে সে ঘাট পর্যন্তই

যেত কিন্তু ঘাটে যাওয়ার উপায় নেই!

গাজীর প্রশ্ন আবার লেখকের মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল জাতের বিচার কে করল? যে মসজিদ ছেড়ে লেখক চলে যাচ্ছেন সেই গাজী নাকি গঙ্গামন্ত্র জানতেন, গঙ্গাপূজা করতেন। এমদাদ আলি খাঁর পূর্বপুরুষ ইনি। জীবনের বৈপরীত্য এখানেই প্রধান হয়ে ধরা পড়েছে লেখকের। চেনা জীবনের চৌহদ্দি ছেড়েও যে আরও অন্য ধরনের জীবন আছে আমাদের আশেপাশে, তাই লেখকের চোখে অনন্যরূপে ধরা পড়েছে। উদ্বাস্তু নিখুঁজি মেয়েদের এক জীবনের জলছবি এঁকেছেন এমদাদ আলির খাঁর মুখ দিয়ে, তাদের খাওয়ার পরার পিছনেও মনগতরেও একটা ক্ষুধা আছে, দেশভাগের ফলে ক্যাম্পের মেয়েদের জীবনযন্ত্রণা, অসহায়তা কালকূটের অন্তর্দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে। আর সঙ্গে সাতশো বছর আগের জনবহুল জমজমাট ব্যস্ত এক বন্দরের, সেই সময় থেকে বন্দরের পরিবর্তিত রূপ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সমাজজীবন খুবই সামান্য কথায় চিত্রিত করেছেন। তাঁর মনকে অতীতচারী করে পাঠককুলকেও অতীতচারী করে তুলেছেন।

মসজিদ থেকে চালু পথে নামতে নামতে কথক কালকূটের চোখ আটকে গেল অভূতপূর্ব এক দৃশ্যে। শবকাঁধে নিয়ে চারজন প্রৌঢ়া হেঁটে চলেছে। তার পেছনে পেছনে একদল কুঁচোকাঁচা, হাততালি দিয়ে হাসছে। সঙ্গে আরও কিছু লোকও শবানুগমন করছে; হাসাহাসি, কথা বলাবলিও চলছে। এমন দৃশ্য কেউ কখনও দেখেনি, মেয়েমানুষ শববাহিকা। লেখকও বুঝতে পারছেন না এরা কারা? এরা চলতে পারছে না, কোমর সোজা করে চলার ক্ষমতা নেই, এলোমেলো পা পড়ছে, ঘাম ঝরছে। শাড়ি জামায় সাধারণ সধবার বেশ, বসনভূষণের একটা স্তরভেদের ছাপ আছে, গ্রাম্যতার ছাপও আছে, তবু দৃষ্টি যেন কোথাও ঠেক খাচ্ছে। এমদাদ আলি খাঁ তোবা তোবা বলে উঠলো এমন তাজ্জব কাণ্ড দেখে। মহিলা শববাহিকাদের সঙ্গে লম্বাচওড়া ফরসা ধুতির ওপরে বুকখোলা পাঞ্জাবি পরা খালি পায়ে একজন সুপুরুষ হরিবোল বলতে বলতে এগিয়ে চলেছে। ব্যাপার দেখে এমদাদ লেখককে এগোতে বলে সে শব মিছিলের পেছন দিকে চলে গেল খবর সংগ্রহের জন্য। কিছুটা দূরত্বে শববাহিকাদের সঙ্গে চলতে চলতেই কথক কালকূটের মনে হল সামনের দিকের শববাহিকা তাঁহাকে ইশারায় ডেকে নিয়ে বারবার কাঁধ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। পা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে, হাঁপাচ্ছে থরথরিয়ে শরীর কাঁপছে। এই সময়ে এমদাদ কালকূটকে তার দিকে চলে আসতে বলছে। কথক কালকূট কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু লম্বা চওড়া ফরসা লোকটি তাঁকে কাঁধ দিতে অনুরোধ করল, সে পুরুত ঠাকুর, শ্মশানক্রিয়া করতে এদের সঙ্গে যাচ্ছে, সে মরা বইতে পারে না। শবদেহের সঙ্গে চলতে থাকা প্রৌঢ়া তাকে অনুরোধ করল 'নাও বাবা, একটু কাঁধ বদলাও, ও আর পারচে না। দেখে মনে হচ্ছে তোমার ডাগর চোখ, প্রাণে দয়া আছে' *(পৃ: ১১০২, ঐ)* কোমল মুখের পৈতাধারীও বারে বারে অনুরোধ করল, চামড়া স্যান্ডেল পায়ে

থাকলেও চলবে, সব কিছু উনি মন্ত্র দ্বারা শোধন করে দেবেন। লেখক আর কিছু না ভেবেই ঝোলা আর কোঁচা সামলে কাঁধ দিয়ে দিলেন। এমদাদের সঙ্গে চোখে চোখ পড়তেই সে কপালে হাত ঠাস ঠাস করে চাপড়াতে লাগল। কিন্তু আর কিছু করার নেই। নিজ গর্ভধারিণীর প্রতি সম্মান জানাতে কাঁধে এক মহিলাকে নিলেন এক বৃদ্ধা, অসমর্থ মহিলার ডাকে সাড়া দিয়ে। পৈতাধারী কাঁধ ছেড়ে দেওয়া মহিলাকে দুগ্‌গা দিদি বলে সম্বোধন করে একটু বিশ্রাম নিতে বলেছিল নিজে এগিয়ে যেতে যেতে। শবদেহ নিতে নিতে শববাহিকাদের সঙ্গে পৈতাধারীর কথাবার্তা শুনতে শুনতে লেখক বুঝতে পেরেছিলেন এদের সঙ্গে একটা মিষ্টিমধুর স্নেহের সখ্যভাবের সম্পর্ক আছে। সন্ধ্যাতারাকে বলছে সন্ধ্যেতারা, লক্ষ্মীকে লক্ষ্মীমণি, চারুবালা বলে সম্বোধন করছে। আর শববাহিকার কথার উচ্চারণে কালকূট গ্রাম্যধ্বনি শুনতে পেলেন 'মিনসে', 'মরণ'। সাঁকোর কাছে আসতেই দুগ্‌গা চলে এল। পাঁচজনে মিলে সাঁকোর উপর দিয়ে চলতে লাগল। নারীলোকের শববহনের আজব ঘটনা দেখে সাঁকোর উপরে ভিড় বাড়তে লাগল। শ্মশানযাত্রায় মৃতের প্রতি এরকম হাসি হাততালির অ্যাপায়ন কালকূট কখনও দেখেন নি। সেই ছোট ছোট ধূলিঝাড়া কচিকাচা দল তখনও পিছু ছাড়েনি। ভিড় ঠেলে সাঁকোর উপর দিয়ে যাওয়ার সময় চব্বিশ-পঁচিশ বছরের এক যুবতী ডুরে শাড়ী বুকের ওপর টানতে টানতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। কপালে ঝাপসা লাল টিকা, বাসি কাজলের ছোঁয়া তখনও মুছে যায় নি। সে সন্ধ্যেদিদিকে জিজ্ঞেস করল 'হ্যাঁ গো শেষটায় তোমাদের ঘাড়ে করে বয়ে আনতে হলো?' *(পৃ: ১১০৬, ঐ)* পুরুতমশাই বললেন যে 'জোয়ান মরদরা ঘরে সব বসে রইলো, কেউ এগিয়ে এলো না। তবে নাটের গুরুটিকে আমিও ছাড়ব না।' *(পৃ: ১১০৬, ঐ)* সবাইকে ঘরে বসিয়ে রাখা যায় না, নির্দেশ অমান্য করেই শবদেহ শ্মশানে নিয়ে আসা হয়েছে। বংকা যেন দিদিদের তাগদ দেখে যায়।

সাঁকো পার হতেই নানা কথা কানে ভেসে আসতে লাগল — কালকূটকে দেখে— 'নাগরটি' কে? ঠাকুর মশাই হয়তো বা পটিয়ে এনেছে ইতাদি। লেখক চলতে থাকলেন শবদেহ নিয়ে। ঠাকুরমশাই উত্তর দিতে দিতে এগিয়ে চললেন। কিভাবে দয়ার শরীর লেখক কাঁধ দিয়েছেন সেকথা বলতে বলতে পুরুতমশাই এগিয়ে চলতে লাগল। বয়স তিরিশের নিচে এক রূপকুমারী শায়ার ওপরে কোনমতে শাড়ী জড়িয়ে এসে চাঁদদিদিকে একবারটি নামাতে বলেছিল। কিন্তু পুরুতঠাকুর আর নামাতে দেয়নি, একেবারে শ্মশানে গিয়েই নামিয়েছিল। ঘিঞ্জি বস্তির অলিগলি থেকে একপাল স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসেছিল চাঁদদিদিকে দেখতে, তাদের মুখে হাসি ছিল না, হল্লা ছিল। তারা বিষণ্ণ। কথক কালকূট সকলের কথাবার্তা শুনে বুঝে গিয়েছেন যে তিনি এক বারাঙ্গনার শব বহন করে নিয়ে এসেছেন।

ত্রিবেণীর মহাশ্মশানে শব নামিয়ে একটু বিশ্রামের চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু মহাশ্মশানের চিত্র

দেখে হতবাক। এক চিতা জ্বলছে, এক সাজানো হচ্ছে, সেই চিতার পাশে এক প্রৌঢ় গানের সুরে আর্তনাদ করছে। তার মৃত মাতা তার মাল খাওয়ার জন্য দুটো টাকাও রেখে যায়নি, এতেই তার শোক উথলে উঠছে। মাল না খেলে সে কুটো ভেঙেও দু'খান করতে পারে না। শহর ঘেঁষা লোকজন এরা, এক তরুণী কথা শুনে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছে। চাঁদদিদির নাম চন্দ্রাবলী, তাকে দেখতে বংকা, বেজি, লতু, রুকি হেটো এরা এই কথা শুনে হাসাহাসি করছে। পোড়াবার কাঠের টাকা না থাকলেও দুঃখ নেই, কিন্তু মালের টাকা চাই-ই। কী নির্মম পরিহাস; প্রৌঢ় লোকটির পেটে মাল পড়েছে বলেই ওরকম করছে এটি পুরুতমশাই বেজিকে বলছিলেন। দু'টাকার খোঁজ নয়, অনেক টাকার খোঁজ করছে। এই কথা শুনে বেজির কথা লেখকের কানে ভেসে এল যে তার কোন চিন্তা নেই, চাঁদমণি পুরুতমশাইয়ের জন্য অনেক টাকা রেখে গেছে মাল খাওয়ার জন্য।

শ্মশানের বিচিত্র চিত্র লেখকের চোখে ধরা পড়ল। মৃত্যু শোকের, কিন্তু শোক কোথায়? বৃদ্ধার প্রৌঢ় ছেলে মায়ের টাকায় মাল খেতে না পেয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। তার স্ত্রী রাগে ক্ষোভে বারে বারে ঝলকাচ্ছে। ঘটনার ঘূর্ণীতে হাসির উচ্ছ্বাস দুলকিয়ে যাচ্ছে। পুরুতমশাই চাঁদমণির টাকাপয়সা পেয়েও বেজির সঙ্গে খেঁকিয়ে কথা বলছে ব্যাপারটা স্পষ্ট করতে চাইছে না, শ্মশানবাসী ডোম্বিনী বউ দুটি হাসতে এতই ব্যস্ত যে তিন চার বছরের বাচ্চা মেয়েটির কান্না ভ্রূক্ষেপই করছে না। মহাশ্মশানের নদীতে আসীন মহাজন ও মৃতের সাথীরা কাঠ কেনাবেচায় ব্যস্ত। সন্ধ্যেতারা কালকূটকে চান করার আগে চায়ের ব্যবস্থা করল। এও জানিয়ে দিল তারা লেখকের চানটান হয়ে গেলে তার একটু সেবা করেই তাকে ছেড়ে দেবে। তবে চাঁদকে চিতায় তোলার পরে লেখককে যেতে বললেন। কালকূট শ্মশানের ভিন্ন ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছেন। আর পরিচিত গণ্ডির বাইরে বিভিন্ন বয়সের বারাঙ্গনাদের ভিন্ন পরিবেশে তাদের আর জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। তাদের সামাজিকতা তারা তাদের মত করে করছে। লতা, রুকি মজাও করছে। দয়ার শরীর মানুষটা যদি তাদের ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করেন সেটাও করতে পারে। সন্ধ্যেতারা তাঁর আঁচল বিছিয়ে দিয়ে লেখক কালকূটকে বসতে অনুরোধ করে, কিন্তু তিনি শুধু মাটিতেই বসলেন। ওখানে বসেই সন্ধেমণি ও চারুবালার কাছে চাঁদমণি সম্পর্কে, ওদের জীবনাচার সম্পর্কে কালকূট বিশেষভাবে তাদের চেনেন। চাঁদমণির রূপই চাঁদমণির এই পরিণতি ঘটিয়েছে। চন্দননগরের রূপসী চন্দ্রাবলীর জন্য খুনোখুনি হয়েছে। নিজেও খুন হতে হতে বেঁচে গিয়েছে। বয়েসকালে চাঁদ নিজেকে সামাল দিতে পারে নি। রূপের গরবে চাঁদের রমরমা বাজার, রাজ্যের বাবুদের আনাগোনা। রক্তের জোর যখন কমল তখন চাঁদমণি পালিয়ে চলে এল লক্ষ্মীমণিদের কাছে।

চাঁদমণি যে রূপসী তা কালকূট শবদেহ দেখেই বুঝতে পেরেছেন। রূপের গরবে সে দেমাকী

ছিল, মৃত্যুর পরেও তার মুখ থেকে সেই গর্বিত ভাবটা যায় নি। লেখক কথা প্রসঙ্গে সন্ধ্যেমণি, চারুবালা ও লক্ষ্মীমণির কাছ থেকে তাদের জীবনাচারের চিত্র তুলে ধরেছেন। তার লেখা থেকে পাঠককুল বুঝতে পারেন যে বারাঙ্গনাদের জীবনকাহিনী। ষাটর্ধ্বো মহিলাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাদের ফেলে আসা জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। রূপের হেরফেরে বাবুদের আনাগোনার তারতম্য ঘটে, তারতম্য ঘটে অর্থ উপার্জনে। শুধু রূপ থাকলেই হয় না, বয়সকালে সামাল দিয়েও চলতে হয়। অনেকেই সামাল দিতে পারে কিন্তু রূপের ঝলকে চাঁদমণি সামাল দিতে পারে নি। সন্ধ্যামণি, চারুবালার কথার মধ্য দিয়ে সেই সত্যটাই ফুটে উঠেছে। কালকূট বলেছেন শরীরের শুদ্ধাচারের দায় মানবীর সেই কুঁড়ি ফোটার কাল থেকে। সতীত্ব শুদ্ধাচারের মন্ত্র তার কানে দিয়েছে পুরুষ। সেই আত্মরক্ষার দায়কে নারীর বলে কিনা তাঁর জানা নেই। তবে পরিবর্তন আর বৈপরীত্য নারীকে আত্মরক্ষা করতে শিখিয়েছে। ওটা নারীর সহজাত প্রবৃত্তি।

"সেই শরীর যখন বারো ঘাটের ডুবুরি ঘাট, তখন সেই ঘাটের ভোগ কেমন— হাসি রঙ্গ উন্মাদনা বিলাসব্যসন যাই থাক, ঘাটের সেই উথাল-পাথাল জলে ঘৃণা উথলে ওঠে না, এমন বাক্য কেউ করে না। যা রক্ষা করতে পারিনি, তবে নে সেই ভাগাড়ের মড়া। ভোগের ঝলকানো আলোয়, রাগ আর ঘৃণার ছায়া গাঢ়। কেবল চন্দ্রাবলীর না। আমার পাশে যারা বসে আছে, নিশ্চয়ই সকলেরই। ধারণাটা নিজস্ব। সত্যি মিথ্যার বিচার তোমাদের।" *(পৃ: ১১০৯, ঐ)*

কালকূট পাঠকের উপরই এ বিষয়ে বিচারের দায় তুলে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি নিজ বক্তব্য করেছেন যে এমন জীবন কোন নারী সাধ করে নেয়নি। অসহায়তা, দারিদ্র্য, অপমান যে কোন অন্ধকার থেকে চন্দ্রাবলী সন্ধ্যেতারার মতো নারীরা উঠে এসেছে। চন্দ্রাবলী নিজেকে সামাল দিতে পারে নি। রূপ চিরকাল থাকে না, বয়সও থাকে না। ভাতার পুত নয়, জাব নিয়ে সারাজীবন চলতে হলে একটু বুঝে শুনে চলতে হয়। চন্দ্রাবলী দু'নৌকায় পা দিয়ে চলেছিল। একদিকে সিদ্দিঠাকুর আর একদিকে সিংবাবুজী। সিদ্দিঠাকুর, বিস্তর সম্পত্তি, কোঠাবাড়ি ছিল। ঘরভর্তি ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনী। নিজের একটা ছেলেকে মানুষ করতে পারে নি, একটা মেয়েরও বিয়ে দিতে পারে নি। মদ মেয়েমানুষ আর জুয়ায় সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছে। শেষে চাঁদের বুঝি মরণ ধরল, সিদ্দিঠাকুরকে ঘাড়ে নিল। আর সিংজী চাঁদকে প্রচুর দিয়েছে, ধনী লোক। ভাল ব্যবসাবাণিজ্য, সুদী তেজারতির কারবার, কিন্তু যতই থাকুক না কেন, সে আরো চায়। চাঁদ সম্পত্তিও অনেক করেছিল। চন্দননগরের হুগলিতে দুটো বাড়ি, সোনাদানা, নগদ টাকা পয়সা ভালোই করেছে। এগুলো সবই চাঁদ সিদ্দিঠাকুরকে দিয়ে দিয়েছে। চাঁদ মারা যাওয়ার পরই চাঁদের সম্পত্তির খোঁজখবর পড়তেই ব্যাপারগুলো জানাজানি হয়ে যায়। সিংজী কিছুই পেল না। এই দু'জনের আকচা আকচিতে আজ এই নারীরা শববাহিকা হয়েছিল। সিংজী টাকা দিয়ে সব ছেলেদের মুখ বন্ধ

করে দিয়েছিল। বিকেলের শব রাত শেষেও ত্রিবেণীর ঘাটে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা না হওয়াতে সিদ্দিঠাকুর এই বয়স্কা মেয়েমানুষদের হাতে পায়ে ধরে শববাহিকা করেছে। সিদ্দিঠাকুর বলেছে রামায়ণ না মহাভারতের আমলেও মেয়েরা মড়া বইত। লক্ষ্মীমণিরা পাড়ার ছেলেদের শব বইবার জন্য অনুরোধ করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা চারজনেই চাঁদকে কাঁধ দিয়ে এনেছে। চাঁদের ইচ্ছে ছিল ত্রিবেণীতে যেন তার দাহ হয়। চাঁদের দু'নৌকায় পা দেওয়াকে লক্ষ্মীমণিরা মেনে নেয়নি তবু চাঁদ তাদের বন্ধু ছিল, তাই সিংজীর ধমকানি, নিষেধ সত্ত্বেও এই মেয়েমানুষরা চাঁদের শব বয়ে নিয়ে আসার সাহস দেখিয়েছে। তাদের যৌবনকাল শেষ, সিংজীকে তাদের কিসের ভয়। ভয়কে তুচ্ছ করে এই বিরল নারী শব বাহিকার দায়িত্বভার তুলে নিয়েছে। এমনকি শব যাত্রার যাবতীয় খরচ সন্ধ্যেতারারাই বহন করছে। সিদ্দিঠাকুর একপয়সাও খরচ করেনি।

কালকূট তার শ্মশানভূমিতে দেখা বারাঙ্গনা নারীদের মানবিকতা, প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করবার সাহস অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন। তাঁর লেখনীর যাদুতে সমাজের নিষিদ্ধ মেয়েদের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি জাগিয়ে তুলেছেন। যেদিক সাধারণ মানুষের অজানাই থাকে সেটা তিনি নিপুণ হাতে তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন বাবুদের আকচাআকচি নারীকে নিয়ে। তার সম্পত্তি নিয়ে টানাটানি। শ্মশানে মৃত বৃদ্ধার ছেলে টাকা পয়সা পায়নি বলে শোক, হানাহানির উদ্রেক শ্মশানে আসা লোকজনের মধ্যে। চাঁদের বেলাতেই দুই বাবুতে সম্পত্তি নিয়ে ঈর্ষা, ক্রুরতা। ফল নারী শববাহিকা, লোকজনের হাসাহাসি, বিদ্রূপ, লেখক নিখুঁজি ক্যাম্পের মেয়েদেরও বিদ্রূপ করতে শুনেছেন। তারাও বলছে যে পুরুষহীন ক্যাম্পে তারা তাদের মড়া এরপর থেকে বইবে। মনের অজান্তে নিখুঁজি ক্যাম্পের মেয়েদের পথপ্রদর্শক হয়ে যায় ঐ বারাঙ্গনা শববাহিকারা। লেখক বিরল দৃশ্যের অবতারণা করেছেন এই কাহিনীর মধ্যে। মুক্তবেণীর পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণীর ঘাটে যেতে গিয়ে বিরল শববহনের ঘটনায় অংশীদার হয়েছেন। লেখক যে একজন বারাঙ্গনাকে কাঁধ দিয়েছেন সেটা জানার পরেও যে লেখকের ঘেন্না হয়নি এটা জেনে সন্ধ্যেতারারা খুশি হয়েছিল।

কালকূট তারা চান করতে ঘাটে পাঠিয়ে দিল, বংকা তাঁর ঝোলা-টাকা পয়সা সবকিছু পাহারা দিতে লাগল। ঘাটে নামতে নামতে তাঁর কানে বাজতে লাগল হারমোনিয়ামের বাজনা, সঙ্গে মন্দিরার তাল। বেশ বড়ো পালতোলা মাস্তুলের নৌকা থেকে আওয়াজটা আসছিল। ঘাটের দিকে মুখ করে গেরুয়া চাদর গায়ে, ঝালর দেওয়া মসৃণ কম্বলে কোল থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা, মাথায় ধূসর বড় বড় চুল ও গোঁফদাড়ি, উচ্চনাসা টানা চোখ, শক্ত সমর্থ শরীরের একজন হাসিমুখে হারমোনিয়াম বাজিয়েই যাচ্ছেন। মন্দিরা বাজনদার গেরুয়াধারী, কম বয়স, মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত ছড়ানো, কপালে লাল মোটা হাতে লোহার বালা। কালকূট বুঝতে পারছেন না দশনামী সম্প্রদায়ের

সাধু না শৈব। নৌকার পাটাতনে গলুইয়ের কাছে আরও কয়েকজন শুয়ে আছে, ফাঁকা জায়গায় বাসনপত্র। আর এক নীল শাড়িতে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। লেখক এতকালের বন্দর শহরের ঘাটে দাঁড়িয়ে আবার অতীতচারী। সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজের ভীড়। কবি মুকুন্দরামের নাকি ত্রিবেণীর কোলাহলে কানে তালা লাগবার উপক্রম হয়েছিল। দক্ষিণ দিকে ভগ্নপ্রায় ঘাটের ওপরেই গঙ্গাযাত্রীদের ঘর, প্রাচীনতম ঘাট। ওই গঙ্গাযাত্রীর ঘরেই একসময়ে যারা নিদান গুণে মৃত্যুর অমোঘ যাত্রায় এসে ঐ ঘরে এসে ঠাঁই নিত। অনেকের মরণ হাত থেকে ফসকে যেত, যমরাজা পলাতক অতএব মৃত্যুপথ যাত্রীর শরীরে নতুন প্রাণের পরশ। একেই বলে যমের অরুচি। তারা তখন ঘরে না ফিরে নদীর ওপারে শান্তিপুরে চলে যেত। এদের নিয়েই শান্তিপুরে পল্লীর পতন হয়েছিল। কালকূট কেতাবে লেখার সঙ্গে নিজের সুদূরের দেখাকে মিলিয়ে নিচ্ছিলেন। যারা ঘরেও নেই পারেও নেই তারা ওই ঘরে ধুনো জ্বালাচ্ছে, কিছু লোক তাকা পেটাচ্ছে, তারা মালবাহী নৌকার মাঝিও হতে পারে, ভিখিরি, কুকুরকুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। আর ঘাটে নদীর জলে কুচোকাচারা জলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, কেউ স্নান করছে, কেউ মালা জপছে, কেউ নদী প্রকৃতির দিকে চুপচাপ তাকিয়ে আছে, শুয়েও আছে দু'একজন।

লেখক কালকূট জলে নেমে স্নান সেরে উপরে যেতে গিয়ে বংকার সঙ্গে বছর ষাটের ছাই রঙের চাদর গায়ে ও গরদের ধুতি পরা এক ভদ্রলোককে দেখতে পেলেন। রোগা কালো, মাথায় সামান্য চুল, গোঁফ-দাড়িহীন মুখের সঙ্গে মানানসই লম্বা তার। তিনি কয়েক ধাপ নেমে এসে কালকূটের নাম জিজ্ঞেস করে কায়েত জানতে পেরে দুর্বাসার মতো ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়েছিলেন। বংকা তাকে বুঝিয়েছিল তার তো অনেক কায়েত যজমানও আছে। কালকূট চলে যাবার অনুমতি নিতে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যাওয়া অত সহজ নয়। বংকারা অতিথি সেবা না করে ছাড়বে না। তাঁর ভেজা জামাকাপড় ভদ্রলোক নিজেই জলে নেমে গঙ্গার জল ছিটিয়ে দিয়ে শুদ্ধ করে তাকে অনুসরণ করতে বললেন। বেজি কথককে জানিয়ে দিলেন ওনার নাম গোরা চক্কোতি, ছুঁচিবায় আছে। কোথায় যেতে হবে জানতে চাওয়াতে গোরা চক্কোতি ঠোঁট বেঁকিয়ে দু'হাত ঝাড়া দিয়ে বলে দিলেন যে যমের বাড়ি। তাঁর মনে হয়েছে কাঁধ থেকে চালি নামলেও কাঁধ এখনও খালি হয়নি। তখন ছিল বারবণিতা আর এখন চোটেপাটে এক অতি জীবন্ত মানুষ।

বংকার ইশারায় লেখক চলতে চলতে একটা পুকুরের ধার দিয়ে একটা পুরনো একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাড়ির সামনে একটি দোকান, সেই দোকানের একপাশে একটা নড়বড়ে বেঞ্চিতে কালকূটকে বসতে বলে নিজে ভেতরে চলে গেলেন। লেখক দেখলেন দোকানীর চেহারা অনেকটা গোরা চক্কোতির মত, শুধু একটু তফাৎ, মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল। দোকানে এক বৃদ্ধা, একটি বালিকা ও খাটো মধ্যবয়স্ক কাঁথা গায়ে জড়ানো একজন লোক। এরপরে দোকানী

কাঁথা গায়ে লোকটিকে বললেন যে বামুনের দোকান কিন্তু বামুনের গরু তো নয় যে বাঁট টিপলেই দুধ বেরোবে। সাত ছটাক তেলের দাম বাকি আছে, আর দিতে পারব না। সেই বৃদ্ধা হেসে বলে দিল যে বামুনের গরু আর তেমনটি নেই, যেমন খাওয়াবে, তেমন দুধ দেবে। বৃদ্ধা আরও বলল যে, বামুনের গরু হল কামধেনু। দোকানীর সঙ্গে বৃদ্ধার লেগে গেল। দোকানী যত রাগে বৃদ্ধা তত হেসে রসিকতা করে বলে যে বামুনের গরু কামধেনু, বাঁট টিপলেই দুধ। রসিকতার দমক লেখককেও ছুঁয়ে যায়। দোকানী জানিয়ে দিল যে চাল ডাল আর বাকিতে দেবে না তার ছেলে চটকলে নতুন কাজ পেয়েছে বলে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। বৃদ্ধা হাসিমুখে মস্করা করে বলতে লাগল মরতেই তো চলছে, যমে নেয় না এই কথা বলতে বলতে ইস্টিশনে মিশিরজীর দোকানেই চাল ডাল আনতে চলে গেল। লেখক দেখতে পেলেন ওই বৃদ্ধা দোকান ছেড়ে চলে যাচ্ছে, সর্বাঙ্গে তার হাসির দমকে কম্পন উঠেছে। এরই সুযোগে ওই মধ্যবয়স্ক, গোবরা নামের লোকটি বুড়িকে একবার পাগল, একবার বজ্জাত বুড়ি, নচ্ছার, খচ্চর বুড়ি বলে দোকানীর সঙ্গে তাল দিতে লাগল। দোকানীর সঙ্গে ওই বৃদ্ধার মস্করা করাটা ঠিক হয়নি এটাও সে জানিয়ে দিল।

এবার আসল রহস্য বেরিয়ে গেল। দোকানী নিচু গলায় গোবরাকে বলতে লাগল, বুড়ি দোকানে এসে, পাড়ার দশজনের কেচ্ছা করে, মজার মজার কথা বলে, তার ভালই লাগে ওসব গালগল্প কেচ্ছা শুনতে। কিন্তু তাই বলে বুড়ি দোকানীরই পেছনে লাগবে? কালকূট বুঝতে পারলেন রসিকা বুড়ি এত সাহস কোথা থেকে পেয়েছে। রসিকা বুড়ি আনন্দের রস চুঁইয়ে চুঁইয়ে লেখকের হৃদয় ভিজিয়ে দিয়েছে লেখকের সঙ্গে পাঠককুলও এই সামান্য অর্থাৎ মহার্ঘ রসবোধটুকু নিজ অন্তরে প্রবাহিত করেন। বুড়ি চলে যাওয়ার পর এই পরিবেশ অসামান্য হয়ে পাঠকের চোখে ধরা পড়েছে। বাকির তেল নিয়ে দোকানীর সঙ্গে তাঁরই বোঝাপড়া চলছিল। বুড়ি এসে ঠিক রসভঙ্গ নয়, সুযোগ করে দিল গোবরাকে। বুড়ির নামে নিন্দা করতে করতে দোকানীর মন প্রসন্ন করে ফেলল ও দোকানী তেলের শিশিটা গোবরার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নিল। এক ছটাক তেলের জন্য গোবরার এত বিশেষণ প্রয়োগ এটা পাঠককুলও সহজেই বুঝতে পেরেছে। এই ছোট ঘটনা পাঠকের কাছে মহার্ঘ হয়ে ধরা পড়েছে। লেখক বলেছেন "কে বললে কথায় চিঁড়ে ভেজে না? সময় আর সুযোগ বুঝে বলতে পারলে, ঠিকই ভেজে। বৃদ্ধার কাছে তার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু গোবরা হল নিরুপায় ছিঁচকে চোর। বৃদ্ধার বুকের পাটায় সমাজ দর্পণের রসের খেলা। আর এই মহাজনকে কী বলবো? ঢাকির ঢাক?" *(পৃ: ১১১৭, ঐ)*

দোকানের মঞ্চের নাটক শেষ হতে না হতেই লেখককে চক্কোতি মশাই তাঁকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। পুরনো বাড়ি, অজস্র দাগের মত ফাটা, তার ওপরে আসন পাতা। গরমভাতের থালা দেখেই কালকূটের ভিতরে ভিতরে মহাপ্রাণীটি জিভে জল এনে দিল। বংকা বলবার পরই

ভাত বসানো হয়েছে, হঠাৎ করে সামান্য এই আয়োজন, বংকাকে ফিরিয়ে দিলে পেছনে গুন্ডা মাতাল লাগিয়ে দিত। বংকার প্রতি কোথায় যেন একটু সহানুভূতিও ঝরে পড়ল। বংকা বামুনের ছেলে, ওর বাবা চুঁচুড়া কোর্টের উকিল, আর তার ছেলে মেয়ে মানুষ নিয়ে বেশ্যা পাড়ায় সারাদিন পড়ে থাকে। শ্মশানে যে সুন্দরমত মেয়েটা এসেছিল বছরখানেক আগে বহু হুজ্জোতি করে বংকা মেয়েটির দখল নিয়েছে। পেছন থেকে স্ত্রী কণ্ঠ ভেসে এল — আগে খাওয়া হোক, পরে সব কথা। ভাতের পাতের পাশে গৃহদেবতা গোবিন্দর ভোগের সামান্য বেগুনভাজা ও পায়েস রাখা ছিল। ভোগের প্রসাদ খাওয়ার সময় সেটা কপালে না ঠেকানোয় চক্কোতি মশাই বলে উঠলেন যে, আজকালকার ছেলেরা ভোগের প্রসাদ একটু কপালেও ছোঁয়ায় না। চক্কোতি মশাই গল্প করতে লাগলেন কিভাবে এই হঠাৎ করে সামান্য এই আয়োজনটুকু করতে হয়েছে। কথক কালকূটের দয়ার শরীর, চাঁদদিদির জন্য কাঁধ দিয়েছে, তার সম্মান-আপ্যায়ন করার জন্যই এই ক্ষুদ্র ব্যবস্থা বংকা এসে করিয়েছে। কথকের মনে পড়ল শ্মশানে রুকি, লতা, দুর্গাদেবী সন্ধ্যেতারা এদের লেখকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শলা-পরামর্শ করা, বংকার ছুটে যাওয়া, ঘাটে গোরা চক্কোতি মশাই-এর আগমন। রুকি, লতার অল্পবয়েস, তাঁদের চোখের তারা, হাসিতে বহুদিনের বাবু ভোলানোর অভ্যাস দু'একবার কথক কালকূট দেখতে পেয়েছিলেন। তারা যখন বলেছিল তাদের সেবা কি দয়ার শরীর নেবেন? নিলে তারা সেবা করতে রাজি নইলে সাধ্যমত অন্য ব্যবস্থা। "তাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে না, সমাজের পিছন দরজার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। বরং গৃহস্থদের সদরের ছবিই যেন স্পষ্ট।" *(পৃ: ১১১১, ঐ)* পথে বেরিয়ে কপালে এইরকম আন্তরিক পরিবেশে অন্নের লিখন, কথক অভিভূত। শুধু তিনি নিজে অভিভূত নন, পাঠককুলও এক না জানা সমাজের আন্তরিকতা, সামাজিকতার পরশ পেয়ে অভিভূত। সন্ধ্যেতারার মত চক্কোতি মশাই-এর সেই একই প্রশ্ন, বেশ্যার মড়া বইতে হবে জানলে কথক কাঁধ দিতেন কিনা? কথকের উত্তর ছিল যদি সকলেই শক্ত সমর্থ অল্প বয়সের হত তাহলে তিনি জানলেও কাঁধ দিতেন না। এইসব শক্ত-পোক্ত কথা শুনে চক্কোতি মশাই-এর মনে হয়েছে, তিনি 'কর্মনষ্ট দলে'র লোক। 'কর্মনষ্ট দল' তিনি বুঝতে না পারাতে ওনার মেয়ে পুষি বলেছিল, ওর বাবা কম্যুনিস্ট দলকে 'কর্মন'ট দল' বলেন। চক্কোতি গিন্নী আরও যোগ করলেন, পুষির মেজদা ওই দলের সদস্য। গলায় পৈতে টৈতে রাখে না বলে বাপছেলেতে নিত্য খিটিমিটি একথা জানিয়ে দিলেন চক্কোতি গিন্নি। তিনি কথককে এঁটো থালা তুলতে দিলেন না। কথক এরই মধ্য দিয়ে আরও একটি সূক্ষ্ম জিনিস তুলে ধরেছেন। "ওঁ শান্তি। বড় স্বস্তি পেলাম। পথে ঘাটে যাই করি, গৃহস্থের বাড়িতে খেয়ে, এঁটো বাসন কোনোদিন তুলতে হয়নি। আখড়া আশ্রমে কলাপাতার এঁটো পাড়া এক কথা। গৃহস্থের বাড়িতে এক কথা। মনে করি পথে বেরিয়ে ফেলে এসেছি সব কিছু। ওটা মনের সান্ত্বনা। আসলে নিজের সমাজ

পরিবারে মন আর চরিত্রটা ভিতর কপাটে ঘাপটি মেরে বসে আছে। সময় হলেই সজাগ হয়ে ওঠে। স্বস্তিটা সেই কারণে। আর মনে মনে কৃতজ্ঞতা এই মহিলাদের কাছে।" *(পৃ: ১১২১, ঐ)* হাত মুখ মোছার জন্য গামছার বদলে প্রয়োজনে পুষি তাঁর শাড়ীর আঁচলও দিতে পারে। এই কথা বলে কলেজে পড়া তরুণী পুষি, লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি লক্ষ্য করলেন একটা উচ্ছ্বাসের ঢেউ ওকে লজ্জার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। গৃহিণী বরাভয়ে চক্কোতি মশাই-এর কাছে গিয়ে দেখলেন অভিমানে আহত এক বুড়ো শিশু বসে আছেন। উনি থাকলে লেখকের খাওয়া হত না তাই উনি চলে এসেছেন এ'কথা জানাতে ভুললেন না। উনি নিজের মনেই বলে চললেন সংসারে যার যেমন ইচ্ছে চলবে, তার তো কিছুই করার নেই, নিজের ছেলেই কথা শোনেনা। কালকূট অন্যায় কিছু করেনি। বেশ্যা হোক আর গেরস্থের বউ হোক, মড়া সবাই সমান। মড়া সংসারের কোন ক্ষতি করে না। তিনি জানতে চাইলেন তাঁর মা বাবা বেঁচে আছেন কিনা। কালকূটের নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল যিনি এখন নিরাসক্ত। সেই মাকে তিনি বেশ্যার শব বহনের কথা বলতে পারবেন না; কেননা তাঁর মন অকল্যাণের শঙ্কায় কেঁপে উঠবে। কথকের এই কথা শুনে চক্কোতি মশাই কাঁসরের ঢং ঢং শব্দের মতো বেজে উঠলেন। ত্রিবেণী ঘাটের ক্ষ্যাপাবাবা কথককে ধর্মাত্মা বলেছেন, তিনি তাঁকে দেখা করতে বলেছেন। চক্কোতি মশাই জানিয়ে দিলেন শ্যামা ক্ষ্যাপা বা ক্ষ্যাপা বাবা প্রত্যেক মাসেই পূর্ণিমাতে ত্রিবেণীর ঘাটে আসেন, কয়েকদিন থেকে গুপ্তিপাড়া না কালনা, নিজের আশ্রমে চলে যান। চক্কোতি মশাই যখন ঘাটে নেমেছিলেন গঙ্গাজল ছিটোবার জন্য তখন ক্ষ্যাপা বাবা তাকে এই কথা বলেছেন। পুষি চক্কোতি মশাই-এর কথা শুনে বলেছিল 'তুক-তাক জানে, বলি না দিক ভেড়া বানিয়ে রাখতে পারে', *(পৃ: ১১২২ ঐ)* এ'কথাও জানাতে ভুলল না। তারপর মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লেগেছিল। চক্কোতি মশাই পুষির কথায় আমল না দিয়ে বলে দিলেন তিনি শুনেছেন গলায় নাকি সাপ জড়িয়ে বসে থাকেন। শ্যামাক্ষ্যাপার সিদ্ধিলাভ ঘটেছে। কালকূটের মাথায় ঘুরতে লাগল গুপ্ত-মুক্ত সাধন কর্ম তিনি দেখেছেন। কিন্তু সাধনবলে কেমন করে সিদ্ধিলাভ ঘটে সেটা তিনি বুঝতে পারেন না সিদ্ধপুরুষ কেমন করে হয় তাও জানেন না। তবে কিছু সাধক সাধিকার সঙ্গে তাঁর কথা বলে ভালো লেগেছে, সংসারের বাইরে থেকেও সংসারের সহজ কথাই তারা শুনিয়েছেন।

চক্কোতি গিন্নী ঘরে ঢুকতেই পুষি একটি সাপ্তাহিক চক্কোতি মশাই-এর সামনে মেলে ধরল। পুষি নাম শুনেই লেখক কালকূট চিনতে পেরেছিল, তাই আগেই দেখে চক্কোতি মশাইকে বলে রেখেছিল খাওয়া হলে তাকে একটা জিনিস দেখাবেন। মেয়ে তাঁকে আগেই চিনতে পেরেছে এটাও সাপ্তাহিক পত্রিকাটা দেখে চক্কোতি মশাই আশ্চর্য হয়েছিলেন। সত্যতা প্রমাণের পর পুত্রী গরবে পিতা গর্বিত। আর পুত্রীর ধারণা মিলে গিয়ে দেখে পুত্রী আহ্লাদে আটখানা। মেয়ে বলছে গাল

গপ্‌পো নয়, তার বাবাকে নিয়েও হয়ত কোনদিন কিছু লিখে দিতে পারেন। চক্কোতি শুনে বললেন যে কি আর লিখবে, হয়তো কিছু গালাগাল দেবে। একথা শুনে কালকূট বললেন 'যাই লিখি, আমি তিনি অকৃতজ্ঞ নন।' *(পৃ: ১১২৩, ঐ)* এ'কথা শুনেই চক্কোতি মশাই মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠে "কিন্তু ঘাটে যখন নিজে গঙ্গাজল এনে তোমার গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম, তখন তুমি আমাকে একটা পেন্নামও করোনি।" *(পৃ: ১১২৩, ঐ)* কালকূট অদ্ভুত দক্ষতায় চক্কোতি পরিবারের ক্ষণিক চিত্র এঁকেছেন। ভাললাগা, ভালবাসা, রাগ, অভিমান, অম্লমধুর কথাবার্তায় তুলে ধরেছেন। পাঠক অনায়াসেই চক্কোতি মশাইয়ের অভিমানটা বুঝতে পেরেছেন। প্রথমে মানুষটাকে যে রাগী-কাঠখোট্টা বলে মনে হয়েছে, সেই মানুষটাই অন্য পরিবেশে কেমন বিশেষ হয়ে উঠেছেন। লেখক কালকূটের বৈশিষ্ট্য এখানেই। পুষি কলেজে পড়া মেয়ে, কালকূটের লেখার সঙ্গে তার পরিচয় আছে, এমন একজন কালকূট তাদের বাড়িতে হঠাৎ করে এসেছেন এটাই তার কাছে অভাবনীয়। পুষি তার বাবাকে জানিয়ে দিয়েছে ওদের মড়া বয়ে এনেছে বলেই তো এমন ঘটনা ঘটল তাদের জীবনে। গৃহিণী বলছেন মড়ায় কাঁধ দেবার ডাক হচ্ছে দৈববাণী। কিন্তু পুষি কী তার বন্ধুদের কাছে কথাটা গোপন করতে পারবে একথা চক্কোতি মশাই মেয়ের কাছে জানতে চাইলেন। কালকূট বললেন যে তার পরিচয় জানানোটা কোন গোপন রহস্যের ব্যাপার নয়, একটু অস্বস্তি হয়, তাই বলেছেন। চক্কোতি মশাইরা তারপরে তাঁর ত্রিবেণীতে আসার বৃত্তান্ত ও পরবর্তীকালে কোথায় যাবেন সেগুলো জেনে নিলেন। কালকূট যদি ত্রিবেণীতে থাকেন তবে এখানেই ফিরে আসবেন একথা শুনে পুষি হেসে ঝিলিক দিয়ে বলেছিল 'আপনাকে তো মিথ্যেবাদী বলতে পারি নে।' *(পৃ: ১১২৪, ঐ)* পুষির মুখে বিষাদের ছায়া কথক কালকূট লক্ষ্য করেছেন। সকালে ফোটা বিকালের বাসী ফুলের ছবির মতো পুষির হাসিটা লেখকের চোখে ফুটে উঠেছিল যখন তাঁকে কাপড়ের পুটুলিটা হাতে দিয়ে বিদায় জানিয়েছিল।

চক্কোতি মশাই নিজেই চললেন ত্রিবেণীর ঘাট পর্যন্ত কালকূটকে এগিয়ে দিতে। বংকাকেও বলতে হবে এবং চন্দ্রাবলীর দাহকার্য কতটা এগোল সেটাও দেখবেন। ঘাটে এসে দেখা গেল পিণ্ডদানের আগে কী একটা ছুঁইয়ে সিদ্দিঠাকুর ট্যাকে গুঁজল। তারপরে পিণ্ডদানের মন্ত্র আউড়াতে লাগল। সিদ্দিঠাকুর ভুল মন্ত্র পড়ছে, শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডও উল্টোপাল্টা করছে, এসব দেখেশুনে চক্কোতি মশাই রাগে সিদ্দিঠাকুরকে গাল দিতে লাগলেন। সিদ্দিঠাকুরই পুরুত, নিজেই পিণ্ড খাওয়াচ্ছে, নিজেই মুখাগ্নি করল দেখে বলেই ফেললেন নিশ্চয়ই টাকাকড়ি কিছু পেয়েছে। তিনি আরও বললেন, সিদ্দিঠাকুর বেশ্যার মুখাগ্নি করলেও উতুরি কাছা কিছুই নেবে না। যদি নিয়মকানুন মানে তাহলে চারদিনে ভূর্ষৎসর্গ করবে, ছ'দান দিতে হয় ব্রাহ্মণকে, সেটাও সেই নেবে মিটে যাবে শ্রাদ্ধ। তারপর চন্দ্রাবলীর সম্পত্তি-টাকাপয়সায় তোফা থাকবে। কালকূট জেনেছিলেন

চন্দ্রাবলীর কোনো সন্তান নেই। এঁদের সম্পত্তি সরকারের হয় কিন্তু চন্দ্রাবলী কোবলা করে সব সিদ্দিঠাকুরকে দিয়ে গেছে। চন্দ্রাবলীর চিতা আস্তে আস্তে জ্বলে উঠতেই বংকাদের চোখ পড়ল কথকের দিকে। সন্ধ্যেতারা, চারুবালা, রুকি, লতা সবাই এসে চক্কোতি মশাইকে দু'হাত তুলে নমস্কার জানাল। সন্ধ্যাতারা বলল, "ঠাকুরমশাই, বাবাকে আপনার বাড়ি নিয়ে গিয়ে আমাদের উদ্ধার করেছেন।" *(পৃ: ১১২৭, ঐ)* কালকূটের কাছ থেকে সবকিছু শুনে ওরা কৃতজ্ঞ হল চক্কোতি মশাইয়ের কাছে। বংকাকে সকলে প্রশংসা করাতে লতা লজ্জা পেয়ে বলল সবার সঙ্গে পরামর্শ করেই এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে দাদার, রুকি, লতা এমন মানুষকে কাছে বসিয়ে দু'দণ্ড সেবা করতে পারলে ধন্য হয়ে যেতে পারত, একথাও জানিয়েছিল। একরকম মানুষ দেখে তাদের জীবন পচে গেছে, এমন মানুষ সহসা মেলে না, তাই মনের ইচ্ছাটা একটু জানিয়ে দিল। তার কথা শুনে কথক কালকূট যেন রাগ না করেন এ'কথা বলে লতা গৃহস্থের মত সাদাজমির চওড়া লালপাড়ের ঘোমটাটা একটু টেনে দিল। কথক কালকূট ঠাকুর মশাইয়ের বাড়িতে নিমপাতা দাঁতে কাটেন নি জেনে লতা বলেছিল আমরাই আপনার নিমপাতা। শ্মশানযাত্রীর নিমপাতা দাঁতে কাটা শুদ্ধিকরণ কিনা তার জানা নেই কথকের, তবুও সেই পুণ্যি পাতাকে দাঁতে ছোয়ালেন মনে মনে, আর লতাকে বললেন কেটে দিয়ে গেলাম। লতার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

চক্কোতি মশাই চন্দ্রাবলী শবদাহ করতে এত দেরী হল কেন এ'কথা জানতে চাইতেই এক বিচিত্র কাহিনী সন্ধ্যেতারা বলে গেল। সিংজী দু'জন সেপাই আর একজন জমাদার নিয়ে চন্দ্রাবলীর দেহকে চুঁচড়ো নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সিদ্দিঠাকুরও কম যায় না, বলে দিল যদি বিষ খাওয়ানো প্রমাণ না হয় তাহলে সিংজীকেই নিজের হাতে বিষ খেতে হবে; সন্ধ্যেতারারাও এই নিয়ে হইচই শুরু করে দেওয়াতে সিংজী পিছিয়ে গিয়েছিল। পুলিশদের সঙ্গে ফিসফাস করে, সব্বাইকে জেল খাটিয়ে ছাড়বে, এইকথা বলে শাসিয়ে গেছে। এতসব ঝামেলা কাটাতেই এত দেরী হয়ে গেল। চক্কোতি মশাই সব শুনে বললেন যে, সিদ্দিঠাকুরকে সবকিছু করতে দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছেন সম্পত্তির ব্যাপার আছে। এসব কথা বলে চক্কোতি লেখককে নিয়ে বিদায় নিলেন। কথক সিদ্দিঠাকুরকে লেলিহান শিখার উর্ধ্বপানে অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। অভিব্যক্তি বোঝা যাচ্ছে না। চন্দ্রাবলীর বিরহে কী প্রেমের চিতা জ্বলছে? তিনি যেটুকু শুনেছেন তার থেকে বুঝেছেন— যদি চন্দ্রাবলী তার সম্পত্তি না দিয়ে যেত তাহলে সিদ্দিঠাকুরকে এই শ্মশানে হয়ত দেখা যেত না। সম্পত্তির গতি কী হবে সেটাও তিনি বুঝতে পেরেছেন, সন্তানদের মুখের দিকে যে তাকায়নি, জীবনে কোনো দায়িত্ব বহন করেনি সে জানাবে কৃতজ্ঞতা? কালকূটের কাছে এ কৃতজ্ঞতা নয়, ছলনা। 'কৃতিত্ব তার একটাই। অথবা জাদুকর সে একজন গণিকামোহন পুরুষ।' *(পৃ: ১১২৮, ঐ)* মুক্তবেণীর উজানে, লেখক কালকূট ত্রিবেণীর মহাশ্মশান দেখতে এসেছেন, একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের

মধ্য দিয়ে। ঘাটে আসতে আসতে মানবজীবনের অচেনা একটা দিক ধীরে ধীরে লেখকের কাছে উন্মোচিত হয়েছে। কালকূট তার অচেনা, অদেখা জগৎকে অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে ধীরে ধীরে পাঠকের কাছে উন্মুক্ত করেছেন। শ্মশানঘাটে তুলে ধরেছেন দেহোপজীবিনীদের জীবনপ্রণালীকে; পাঠকদের তাঁদের কথাবার্তা সুখদুঃখের সঙ্গে একীভূত করে দিয়েছেন। তীব্র দারিদ্র্য, অপমান, অসহায়তা থেকে সমাজের এই মেয়েরা অন্ধকারময় এই জীবনের পথ বেছে নিয়েছে। স্বেচ্ছায় কেউ এই জীবন বেছে নেয় নি, লেখক কালকূট অল্পটুকু সময়ের মধ্যে দেহোপজীবিনীদের জীবনাচার চিত্রিত যা পাঠককুলের মধ্যে সহানুভূতির ঢেউ তুলে দিয়েছে আবার ঘৃণা তুলে সিদ্দিঠাকুরের মত গণিকামোহন পুরুষকে প্রতি। ত্রিবেণীর মহাশ্মশানে বসে এক অনবদ্য জীবনচিত্র এঁকেছেন।

চক্কোতি মশাই-এর সঙ্গে কালকূটও বিদায় নিয়ে গেলেন। লতা আবার বলল নিমপাতা মুখে কাটলে মিষ্টিমুখ করে যেতে হয়। লেখকের উত্তর তাও করেছেন তিনি। রুকি গম্ভীর হয়ে বলেছে, সবাইকে সব কথা বলা যায় না, মানুষ বুঝে কথা বলতে হয়। কথককে, রুকির কথা নাড়িয়ে দিয়েছিল, সবাইকে সব জায়গায় মানায় না। 'এক দেহোপজীবিনীর শব বহন করাটা আমার পক্ষে মানানসই ছিল না, তবুও বইতে হয়েছিল। কর্মে আর দৈবে, মিল অমিলের দ্বন্দ্ব সেখানেই। লতা আর রুকিকে যুক্তির কথা শুনিয়ে গেলাম। তবে হেথা নয়, অন্য কোথাও, ভবিষ্যতে হয়তো ওদেরই অঙ্গনে একদিন দাঁড়াতে হতে পারে।' *(পৃ: ১১২৮, ঐ)* বংকা দৌড়ে এসে কষ্ট দেওয়ার জন্য মাফ করতে বলল। কিন্তু তিনি কিছু না কিছু না বলে সিঁড়ির ওপরে উঠে গেলেন। ভাবনা ছাড়েনি লেখককে। পাঠকের মনেও সেইভাষা ছড়িয়ে দিয়েছেন। সংসারের বিপরীত সীমানায় চলে গিয়েও সংসার জীবনের সহবত একেবারে ভুলে যায় নি। বংকার মত সমাজ বখে যাওয়া ছেলের মধ্যে মানবিকতাবোধ, সৌজন্যবোধ, ভদ্রতাবোধ তুলে ধরেছেন, সেইসঙ্গে এটাও তুলে ধরেছেন, প্রয়োজনে সে গুণ্ডামিও করতে পারে, ভালোমানুষের পেছনেও লাগতে পারে। জীবনের কী বৈপরীত্য!

চক্কোতি মশাই ঘাটের সর্বোচ্চ ঘাটে দাঁড়িয়ে কথক বলে গিয়েছিলেন, যে আর নবদ্বীপের ট্রেন তিনি ধরতে পারবেন না, যদি ত্রিবেণীতেই থাকতে হয় তবে যেন তাঁদের বাড়িতেই রাতটা কাটানো হয়। পুষি ও তার স্ত্রী খুশি হবে, দুই ছেলের সঙ্গেও দেখা হবে। কালকূট দূর থেকেই দেখতে পেলেন নৌকা থেকে ক্ষ্যাপাবাবা ডান হাত তুলে ইশারা করছেন। চক্কোতি মশাই তাঁকে ক্ষ্যাপাবাবার কাছে যেতে বললেন। কথক ওনাকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। চক্কোতি মশাই অস্ফুটস্বরে আশীর্বাদ করে বিষণ্ণ মনে বিদায় জানালেন। চক্কোতি মশাই, পাঠককুলকে মিঠেকড়ায় আপ্লুত করে। প্রথমে যে মানুষকে এই ঘাটের ওপর দেখা গিয়েছিল তার যে মানুষ কথকের কাছ থেকে চলে গেলেন তিনি একমানুষ নন। বাইরে কঠিন, ভেতরে হাস্যরসে, স্নেহপ্রবণে, উদারতায়

আর এক মানুষ। প্রতিদিনের দেখা থেকে এই আলাদা মুহূর্তগুলোই নিরিখ করেছেন। বিচিত্র এক মানুষ, অচেনা তার রূপ।

নৌকা ঘাটের দিকে এগিয়ে এসে ঘাটে লাগার পরে নৌকা থেকে ক্ষ্যাপাবাবা নেমে এলেন। তার পেছন পেছন দুই শ্যামাঙ্গী গৌরাঙ্গী যুবতী নেমে এলেন। শাড়ীজামায় দু'জনেই আধুনিক; শ্যামাঙ্গী গায়ে লাল আর গৌরাঙ্গীর কালো শাল, অলংকারের চিহ্ন নেই। মন্দিরাবাদক কথককে ঘাটের দিকে ডেকে নিয়ে গেল। ক্ষ্যাপাবাবা হাত ধরে ধর্মাত্মা বলে কথক কালকূটকে তার পাশে বসালেন। আর একপাশে গৌরাঙ্গী-শ্যামাঙ্গী। তাঁকে কেন 'ধর্মাত্মা' বলছেন ক্ষ্যাপাবাবা সেটি জানতে চাইলে তিনি মিটিমিটি হেসে গঙ্গাযমুনাসহ অন্যদের বলেছিলেন যে তার ধারণার সঙ্গে সব মিলে যাচ্ছে। ক্ষ্যাপাবাবা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। তারপরে হাসি থামিয়ে বলেছিলেন "তুমি বলো, মড়া তোমার ঘাড়ে কেউ জোর করে চাপিয়ে দিয়েছেন, আমি মানব না। কর্মের নাম ধর্ম। তোমার ধর্ম। তুমি কাঁধে নিয়েছ। এখন তুমিই ভেবে দেখ, তোমার মধ্যে সেই ধর্ম কোথায় গেছে।" *(পৃ: ১১২৯, ঐ)* কালকূট বললেন, একজন বইতে পারছিল না বলে তিনি কাঁধ দিয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ম কোথাও নেই। ক্ষ্যাপাবাবা এইজন্যই তাঁকে ধর্মাত্মা বলেছেন। কালকূটকে বারে বারে 'ধর্মাত্মা' বলাতে তিনি লজ্জা পাচ্ছেন শুনে ক্ষ্যাপাবাবা ভরাট গলায় আবার হেসে উঠে জানতে চাইলেন ওবেলা ওনার বাজনা কেমন শুনেছে। কালকূট বলেছিলেন যে নামকরা বাজিয়েদের থেকেও তার হাত ভালো। আস্তে আস্তে কথাবার্তা চলাচলি হতে হতেই ক্ষ্যাপাবাবা জেনে গেলেন কালকূট কোথা থেকে কেন এসেছিলেন, কোথায় যাবেন। কী কাজ করেন? আহার যত্রতত্র, শয়ন হট্টমন্দিরে, আর লেখালিখির কাজ কিছুটা করেন আবার অকাজও করেন একথা শুনে ক্ষ্যাপাবাবা আনন্দিত হয়ে লেখককে আটকে দিলেন। কথক বিব্রত হতে দেখে বললেন যে ডাঙাপথে না গিয়ে জলপথে অনেক ঘাটে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবেন। ক্ষ্যাপাবাবা হাত ধরে লেখককে নৌকায় তুলে দিলেন, লেখক স্যান্ডেল পায়ে গেলেও বুঝতে পারলেন পলি আর শ্যাওলার পিছল। নৌকার ছইয়ের ভেতরে নরম বিছানা, বালিশ, কম্বল, শীতের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সবরকম ব্যবস্থা। ভাটার ঢলে নৌকাটা অল্প অল্প দুলছে, ক্ষ্যাপাবাবাকে কালকূট জানালেন যে হরি চক্কোতি তার সম্বন্ধে শুধু বলেছেন ক্ষ্যাপাবাবা গায়ে সাপ জড়িয়ে থাকে, মন্দিরে বলি হয় না, শ্যামা আছে, তাই তাকে শ্যামাক্ষ্যাপা বলে। এ'কথা জেনে ক্ষ্যাপাবাবা আশ্চর্য হয়ে গঙ্গাযমুনাকে ডেকে বললেন যে গৌরহরি তার কোন খবরই রাখে না, গোটা ত্রিবেণীর লোক তার সম্পর্কে কত কী জানে। একদিন গৌরহরিকে নেমন্তন্ন করে আশ্রমে নিয়ে এসে সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাতে হয়। যমুনা বলে দিল যে লেখক মানুষ তার কাগজপত্রে একবার লিখে দিলেই তার আশ্রম সম্পর্কে সকলে জেনে যাবে। যমুনার কথা শুনে ক্ষ্যাপাবাবা সন্তুষ্ট হয়ে ওদের ডাকিনী যোগিনী বলে ডাকলেন। মেয়েরা এই

কথাতে রাগ করতেই কাছে ডেকে নিয়ে বুকের কাছে কিছুক্ষণ রেখে মেয়েদের অভিমান ভাঙিয়ে আদর করলেন। ক্ষ্যাপাবাবা বলেছিলেন, উনি শাক্ত, শাক্ত সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা, পৃথিবীতে সব থেকে কঠিন সাধনা। তিনি জানতে চাইলেন, কালকূট কি জানে এ বিষয়ে? উত্তরে বললেন, শক্তিতত্ত্ব নিয়ে সবার জানার অধিকার নেই তাই তিনি জানেন না। এ তথ্য তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে জেনেছেন। এছাড়া তিনি শুনেছেন সম্মানের কথা — "নারী ত্রিলোকের জননী, তিনিই জগতের স্বরূপিণী, তিনি বিদ্যা, তিনি পরম ব্রহ্ম, তিনিই শক্তির আধার। তাঁকে সর্বদা সেবা করা উচিত।" *(পৃ: ১১৩২, ঐ)* ক্ষ্যাপাবাবা লেখকের কথায় হা হা হাসির স্বরে পাখোয়াজের তান তুলে ফেললেন। আরও জেনে নিলেন লেখকের কাছে 'যিনি শাক্ত, তিনিই প্রেম। প্রেমই শক্তির আধার।' *(পৃ: ১১৩২, ঐ)* ক্ষ্যাপাবাবা আনন্দে কালকূটকে জড়িয়ে ধরেছেন, দুই কন্যা গঙ্গ াযমুনার চোখে জল, মুগ্ধতা। ক্ষ্যাপাবাবা রুদ্ধস্বরে বলতে লাগলেন "ওগো তোরা শোন। ও তো ধর্মে নেই। এমনি করে বলে।" *(পৃ: ১১৩২, ঐ)* তারপরে আরও জানবার জন্য রতনকে ডেকে বলে দিলেন লেখককে গঙ্গায় চুবিয়ে আনতে, নইলে কথা বের করা যাবে না। কিন্তু খাওয়ার সময় হয়ে যাওয়াতে খাওয়ার পরে চুবানোর কাজটি করবে বলে জানিয়ে দিল। খাওয়াদাওয়ার পর লেখক সিগারেট খাওয়ার বাইরে যেতে চাইলে যেতে দিলেন। নিজেও একটা সিগারেট নিলেন, লেখককেও টানতে বললেন। গঙ্গা সিগারেট নিতে দেখে বাবাকে শাসন করল, কিন্তু ক্ষ্যাপাবাবা শুনলেন না। সিগারেটে টান দিতে দিতে বলে গেছেন যে কোন কিছুতে তার নিষেধ নেই। কিন্তু তিনি বিশ বছর আগে মদ ভাঙ ও গাজা মাছ মাংস সব ছেড়েছেন। পূজা আহ্নিকও করেন না। শুধু বাজনা বাজান আর সাপ খেলান। বড় সংসার তার। তিনি তার আশ্রমকে সংসার বলেন। গঙ্গ া-যমুনা রতনদের মত অনেক ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর আশ্রম। কুড়ি বছরে সাইত্রিশটা মেয়েকে পাত্রস্থ করেছেন। আরো বারো চোদ্দটা আছে, তার মধ্যে এই পেত্নী দুটোও আছে।

ক্ষ্যাপাবাবা একবার ডাকিনী যোগিনী, একবার পেত্নী এইসব নামে গঙ্গা যমুনাকে ডাকছিলেন। স্নেহপূর্ণ পেত্নী ডাক শুনে যমুনার উত্তর ছিল যারা দুচক্ষের বিষ তাদের এছাড়া আর কী বলা যায়। কালকূট বলছিলেন রূপসী মেয়েদের বাবারা মনে মনে খুব অহংকারী হন, কিন্তু লোককে শোনাবার জন্য অন্যরকম বলে। ক্ষ্যাপাবাবা দুষ্টু ছেলের মত চোখে হাসির ঝিলিক এনে বলেছিলেন 'চোখে ধরবার মতো রূপ আছে, না?' *(পৃ: ১১৩৩, ঐ)* গঙ্গা এই কথা শুনে কালকূটের কাছে জানতে চেয়েছিল বাবার মন রাখা কথা বলছেন কিনা? তিনি বলছিলেন যে, তা নয়, তাহলে ক্ষ্যাপাবাবার অহংকারের কথা জানতেন না। ক্ষ্যাপাবাবা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ধমকে বলেছিলেন যে ছুঁড়ি দুটোর চুলের ঝিটকি নেড়ে দিতে, তাঁকে ওরা বাজিয়ে দেখছে। ক্ষ্যাপাবাবার সঙ্গে তাঁর ছেলেমেয়েদের এক মধুর সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। কথক কালকূট ত্রিবেণীর ঘাটে নৌকোর

ক্ষ্যাপাবাবার দলের লোকের সঙ্গে আছেন সেটা ভুলেই গেছেন। কথা প্রসঙ্গে ক্ষ্যাপাবাবা বলতে লাগলেন গঙ্গা-যমুনাকে তিনি সত্যিই বিদেয় করতে পারলে বাঁচেন। কথকের চোখের সামনে এক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মুখ ভেসে উঠল। যমুনাকে পাঁচ বছর বয়সে আর গঙ্গাকে তিন বছর বয়সে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। আর রতনকে কে যেন বছর খানেকের রেখে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে এদের মানুষ করছেন। নামগুলোও সব ক্ষ্যাপাবাবারই দেওয়া। ক্ষ্যাপাবাবা বলেই চলেছেন তাঁর আশ্রমিক সংসারের কথা। মেয়েদের বড় করা, বিয়ে দেওয়া, ছেলেদের কাজ যোগাড় করে দেওয়া, ইত্যাদি। যেসব ছেলেদের কাজ জোটে না, বিয়ে হয় না, তাদের আশ্রমের ভার দেওয়া। বর্ধমান, নদীয়া, চব্বিশ পরগণায় ভিক্ষের দানের কিছু জমি আছে, সে সব জায়গায় এইসব ছেলেকে আশ্রম গড়তে নিযুক্ত করেছেন। "আশ্রম তো কথার কথা, সবই আসলে সংসার। সংসারের যজ্ঞকাণ্ড।" *(পৃ: ১১৩৩, ঐ)*

ক্ষ্যাপাবাবা আশ্রমের কর্মকাণ্ড এখন তুলে ধরেছেন ছবির মতো, আশ্রমিক ক্রিয়াকাণ্ডর মধ্যে সাংসারিক ধর্ম থাকে। যে যেভাবে কর্মকে ধর্ম বলে মানে। ক্ষ্যাপাবাবার আশ্রমে চলছে অন্য এক কর্মসাধনা। বিশ বছর আগে তিনি সাধক জীবন কাটিয়েছেন। মদ-ভাং-গাঁজা-মাছ-মাংসের যে দিকটা উল্লেখ করে লেখক একটি জিজ্ঞাসা রেখেছেন মনে মনে। "সে কি তার শক্তিসাধনার পঞ্চম কার?" *(পৃ: ১১৩৪, ঐ)* কথকের কাছেই শুধু এ প্রশ্ন নয়, পাঠকের মনেও এইরকমই প্রশ্ন উঠে এসেছে।

ক্ষ্যাপা তার আমন্ত্রিত অতিথিকে নিয়ে নিজের পাশে শুলেন আর গঙ্গা যমুনা ছইয়ের আর একপাশে। রতন উত্তরের তাবু খাটানো পাটাতনে। ক্ষ্যাপাবাবার কথায় গঙ্গা যমুনা গান ধরল বীণা স্বর আর মন্দিরা স্বর একযোগে গাইতে লাগল। ক্ষ্যাপাবাবা গান শুনতে শুনতে 'হে মহাকাল হে মহাকালী' বলে রুদ্ধস্বরে গলা মেলালেন। একসময়ে গান থেমে গেল। কথক কালকূটের কানে দুটো কথার প্রতিধ্বনি হতে লাগল 'মহাকাল নিরন্তর' ধ্বংস সৃষ্টি নিরন্তর। পরের দিন যখন ঘুম ভাঙল তখন নৌকো ত্রিবেণীর ঘাট ছেড়ে ডুমুরদহের সীমানায় পৌঁছে গেছে। রাতে জোয়ার এসেছিল এগারটা নাগাদ, নৌকা ছেড়েছিল দুটো নাগাদ। জোয়ারের টানে একঘণ্টায় এতটা পথ চলে এসেছে। লেখককে নদীর পারে জঙ্গলে ঘুরে আসতে বলাতে কালকূট সংকেত বুঝে নীচে নেমে গেলেন। নৌকায় আর রান্না হবে না এবেলা এ'কথা ক্ষ্যাপাবাবা জানিয়ে রেখেছিলেন কালকূটকে। ভাটির টানে নৌকা ঠেলতে ঠেলতে যেতে হবে।

ডুমুরদহ, গঙ্গার তীরে সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথের সাধনভূমি, ঠাকুরের গ্রাম। শ্রীরামাশ্রম দর্শন করতে চাইলে লেখক দর্শন করতেই পারেন। এছাড়া শ্রী শ্রী উত্তমানন্দের উত্তমাশ্রমও দর্শন করা যেতে পারে। ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের নাম জানা থাকলেও বাকি কিছুই লেখকের জানা ছিল না।

ডুমুরদহের বিশে ডাকাতের কথা তাঁর জানা ছিল। সেকথা বলতেই ক্ষ্যাপাবাবা জানালেন যে সেটা দেখা যেতে পারে। সেকালের বড়লোক মানেই ডাকাত। এই কথা বলার পিছে পিছেই কালকূট আর এক ডাকাতের কথা বলে ফেললেন। ইংরেজরা যাদের দরকার বুঝলে ডাকাত বানিয়ে দিত। বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলবিদ্রোহের নেতা, যার মাথার দাম ধার্য হয়েছিল দশ হাজার টাকা। বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তার নিজের দল, ইংরেজরা সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাঁকে ধরেছিলেন। তবে ডুমুরদহের তিনি কিনা সেটা জানা নেই। একথা শুনে ক্ষ্যাপাবাবা বললেন তেমন ডাকাত হলে তার ভালই হতো, সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাকে ধরতে আসত। গঙ্গার বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর ছিল যে তারাই তো ডাকাতকে ধরে রেখেছে।এইকথা শুনে তিনি আবার একটি নতুন নামে ডাকলেন 'রাক্ষুসী'। যমুনা খুশি বাবাকে জেলে পুরতে পেরে। কালকূট বললেন, সেই জেলের নাম মায়াডোর? লেখক কালকূটের কথায় ক্ষ্যাপাবাবা আরও খুশি "অই, অই শোন, ওতো ধর্ম জানে না, কিন্তু এমনি করে বলে।" *(পৃ: ১১৩৫, ঐ)*

দুপুর দুটো নাগাদ নৌকো গুপ্তিপাড়া আর কালনার মাঝে একটি গ্রামের ঘাটে এসে থামল। ঘাট থেকে কয়েক মিনিটের পথ। প্রথমেই মন্দির, মন্দির সংলগ্ন নাটঘর, নাটঘরের দুপাশে ঘর। একপাশে দোতলার সিঁড়ি। মন্দিরের একপাশে ছেলেদের ও একপাশে মেয়েদের থাকবার জায়গা। নানান বয়সের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ডজনখানেক বয়স্ক মেয়ে পুরুষও থাকে এই আশ্রমে। তিনদিন থাকতে হল আশ্রমে ক্ষ্যাপাবাবার নির্দেশে। গঙ্গা যমুনা রতন লেখকের দেখভালের দায়িত্বে। মন্দিরের চতুর্ভুজা কালী বিগ্রহ। মন্দিরে উত্তরে ক্ষ্যাপাবাবা থাকেন। তিনি বসলে সাপের ঝাঁপি খুলে বসেন, সাপেরা তার গায়ে কিলবিলিয়ে ওঠে। ছেলেমেয়েরা সমবেত গান গায়, গঙ্গা যমুনার আলাদা গান তো আছেই। আর ক্ষ্যাপাবাবা হারমোনিয়াম বাজান। কালকূটের চোখ দিকে পাঠকের ও পরিচয় ঘটতে আশ্রমিক সংসারে। বাইরে যার অনেক কিছুই অজ্ঞাত থেকে যায়। সেই অজ্ঞাত জিনিসের সঙ্গে লেখক কালকূট পাঠককুলের পরিচয় করে দিয়েছেন। মাঘের বুকে বসন্তের আগমন আশ্রমে। আমের বোল, পত্রহীন গাছে নতুন পাতার উঁকি, ফুলের সুবাস আর কোকিলের কুহুতান। তৃতীয় দিনে গঙ্গা তাঁকে নিয়ে গেল বাবার সিদ্ধিলাভ স্থানে। বিশেষ অনুমতি না থাকলে এই স্থানে আসা যায় না। গঙ্গা সেই অনুমতিটি নিয়ে রেখেছে। গঙ্গার ধার, ঝোপঝাড়ে ভোরবেলাতেও অন্ধকার। একটি বড় গাছের পাশে লোহার শিক ঘেরা একটি ছোট ঘর। গঙ্গা দেখিয়ে দিল ঐ গাছের গুঁড়ির নীচে কুড়ি বছর আগে বাবা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। পঞ্চমুন্ডির আসন এটা জানিয়ে দিল গঙ্গা। গঙ্গা আরও বলল যে লেখক কালকূট যদি মাঝে মাঝে আশ্রমে আসেনতবে বাবা খুশি হবেন। লেখক কালকূট বললেন তখন হয়ত গঙ্গা থাকবে না, বিয়ে হয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে গঙ্গা। গঙ্গা কথাটির সত্যতা স্বীকার করল কিন্তু নিজের মনের একটা ভয়ের কথাও জানিয়ে দিল।

আশ্রমে মানুষ, সংসার জীবনের নিয়মকানুন তার জানা নেই। তার আশ্রম ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না অথচ আর পাঁচটা মেয়ের মত কামনা বাসনা তারও আছে। ওর চোখ চিক চিক করে উঠল। দেখে লেখক কালকূটের মনে হল যেন বিশাল কোনো শান্ত সরোবরের একধারে রোদের কিরণ পড়েছে। তাঁর সঙ্গে পাঠকের মনেও প্রশ্ন জেগেছে তাহলে গঙ্গা কোন জীবনে দাঁড়িয়ে আছে? নিবিড় জঙ্গলে ভরা ক্ষ্যাপাবাবার সিদ্ধিলাভ স্থানে কালকূটের গঙ্গাকে 'কপালকুণ্ডলা'র মত মনে হল। সংসার বিমুখ কন্যা। ক্ষ্যাপাবাবা কাপালিক নন যে কপালকুণ্ডলাকে সংসার করতে দেবেন না, প্রতিশোধও নেবেন না। সিদ্ধপুরুষ ক্ষ্যাপাবাবা অনাথ বালকবালিকাদের নিয়ে অন্য এক সাধনায় মেতেছেন, গঙ্গাকে নিয়ে ওনার চিন্তা, গঙ্গার মনের কথা তিনি জানেন। রেগে গিয়ে কখনও বলেন যে ওকে সাপ দিয়ে খাওয়াবেন; কখনও স্নেহের সুরে বলেন, যখন তার সময় হবে সে ঠিক গঙ্গার কাছে চলে আসবে আর গঙ্গাও ঠিক তার কাছেই চলে যাবে। কিন্তু কথক কালকূটের মনে হল পঞ্চমুণ্ডির ভূমিবেষ্টনী শিকের মধ্যে গঙ্গা বন্দিনী হয়ে গেছে। গঙ্গা আরও জানাল যমুনা ওর পছন্দের সাথী খুঁজে পেয়েছে। কলকাতার এক ডাক্তার বাবার ভক্ত, তার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে কিছুদিনের মধ্যে। লেখক জানালেন গঙ্গারও পছন্দমত মনের মানুষ সময় হলেই আসবে, তখন তাকে ঠিক চিনে নেবে গঙ্গা। কিন্তু গঙ্গা মুখে রহস্যের হাসি হেসে বলেছিল "কেউ যে আসেনি, তা তো নয়। অনেকে এসেছে, গেছে, আরও আসবে। ঠিক তাকে চিনে নিতে পারবো কি?" *(পৃ: ১১৩৬, ঐ)* লেখকের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে হেসে বলল যে নিজেকেই সে চিনতে পারে নি, তাকে সে চিনবে কেমন করে? একথা বলেই সে পেছন ফিরে হাঁটতে লাগল। রৌদ্রালোকিত পুণ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে কথকের মনে হল "আমার চোখের সামনে, সংসারের দিগন্ত এক অসীমে হারিয়ে যাচ্ছে।" *(পৃ: ১১৩৬, ঐ)* লেখকের মনের ভাবনায় পাঠককুলও ভাবিত। আশ্রমিক পরিবেশে পালিতা গঙ্গা কী করবে। ওর নামের সঙ্গে, গায়ের সঙ্গে গঙ্গা নদী একাকার হয়ে গেছে। একধরনের সংসার বৈরাগ্য গঙ্গাকে আবৃত করেছে গঙ্গা কী বেরোতে পারবে।

'মুক্তবেণীর উজানে'র কাহিনী এখানেই শেষ হয়ে গেছে। লক্ষ্য ছিল ত্রিবেণীর ঘাটে যাবেন, অতীতকালের প্রসিদ্ধ, ব্যস্ত বন্দর শহর ত্রিবেণীতে তিনি যাবেন। পুণ্যের জন্য নয়, যেমন করে জীবনকে দেখবেন, মানুষ কেন যায় পুণ্যতীর্থে, নিজেকে জানার জন্য লেখক এক মাঘের কালে গুপ্তবেণীর সঙ্গম প্রয়াগে গিয়েছিলেন। লক্ষ্য লোকের আরশিতে তিনি নিজেকে দেখেছিলেন। মানবমনের হদিশ করেছিলেন চেনা ছকের বাইরে বিশেষ মুহূর্তে মানবমনের অমূল্যরতন তুলে তিনি তার শূন্য ঝুলি পূরণ করেছিলেন। কালকূটের বিষের জ্বালায় তার জরজর হৃদিকুম্ভ অমৃতের সন্ধানে সেই থেকে ফিরছে। তাই তিনি ঘরের কাছে মুক্তবেণীর সঙ্গমে গিয়েছিলেন, তিথি নক্ষত্রের হিসেবে কোনো পুণ্যদিনে নয়। চলার পথে যা তিনি নিরিখ করেছিলেন তাই তিনি নিয়ে তার এই

কাহিনী। শাক্ততন্ত্রের নারীর যে সম্মানের কথা তিনি শুনেছিলেন সেই সম্মানই তিনি জানিয়েছিলেন এই কাহিনীর মধ্যে। পুরো কাহিনী লেখক নিজেই একটি চরিত্র প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু নির্বিকারত্ব এখানেও বিদ্যমান, পিছুটান নেই। ঝোলা কাঁধে বেরিয়ে পড়াতেই তাঁর আনন্দ। সেই আনন্দের পরশ তিনি অমৃতের পরশ তিনি এই কাহিনীতে ব্যক্ত করেছেন। একটার পর একটা কাহিনী মালার মত তিনি গেঁথে গেছেন। কখনও পাঠকের মনে হয়নি ক্লান্তি আসছে কাহিনী পড়ে। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে পাঠককুলকে তিনি আগ্রহীশীল করে গেছেন। কাহিনীর ভেতর উপকাহিনীও এসে গেছে। ঘটনার ধারাবাহিকতা কাহিনীকে কখনও ক্ষুণ্ণ করেনি। চরিত্র চিত্রায়নগুলোও স্থানোপযোগী। লেখক নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মধ্যে দিয়ে আপন দৃষ্টি আপন বক্তব্য বলিয়ে নিয়েছেন। কাহিনীর গতি ত্বরান্বিত করেছেন। ত্রিবেণীর ঘাট তথা মুক্তবেণী ত্রিবেণীর সঙ্গে মানুষজন চরিত্রগুলো চিত্রিত হয়েছে। তবুও কালকূট স্বয়ং এই কাহিনীর নিয়ন্ত্রক।

কালকূটের মানবজীবন কেন্দ্রিক রচনাগুলির মধ্যে আর একটি পর্ব হল — প্রকৃতির টানে ঘরছাড়া কালকূটের মানবজীবন অন্বেষণ। এই প্রকৃতিকেন্দ্রিক মানবজীবন পর্বকে আবার ২টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) বন পর্ব, (২) নদী-সমুদ্র-পর্বত পর্ব। বন পর্বে রয়েছে তিনটি রচনা।

১) মন চল বনে ২) বনের সঙ্গে খেলা ৩) প্রেম নামে বন

আর নদী-সমুদ্র কেন্দ্রিক প্রকৃতি পর্বে রয়েছে তিনটি রচনা—

১) নির্জন সৈকতে ২) স্বর্ণ শিখর প্রাঙ্গণে ৩) তুষার সিংহের পদতলে

এখন উক্ত দুটি পর্বের রচনাগুলিতে প্রকৃতির টানে ঘরছাড়া লেখক কালকূটের চোখে মানবজীবনের কত বিচিত্র রূপ কত বৈচিত্র্য নিয়ে ধরা পড়েছে তা আলোচনায় ধরার চেষ্টা রয়েছে। কালকূটের বাউল মন তাঁকে বারে বারে ঘর ছাড়া করেছে। মানবমন সন্ধানী কালকূট এবারে মানবজীবন অন্বেষণে চলেছেন বনে। বনের ডাক তিনি অনেকদিন আগেই শুনতে পেয়েছেন কিন্তু সেই ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটে যেতে পারেন নি। কিন্তু সত্যি সত্যিই একদিন তিনি ঝোলা কাঁধে বেরিয়ে পড়লেন বনের পথে। বিহার-উড়িষ্যার সীমান্ত স্টেশন 'জরাইকেলা' থেকেই শুরু হয়েছে এই বনভ্রমণ। জরাইকেলা থেকে ছোটনাগরা, ছোটনাগরা থেকে এদেলবা, এদেলবা থেকে থলকোবাদ। থলকোবাদ থেকে আবার ছোটনাগরা হয়ে ঘরে ফেরা অর্থাৎ কলকাতায় ফেরা। সারেন্ডারেঞ্জের এই বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল তিনি ভ্রমণ করেছেন। তাঁর ভ্রমণপিপাসু মন যেমন ন'দিন ধরে এই বনাঞ্চলের বৃক্ষরাজি লতাগুল্ম-ফল-ফুল, পশুপাখি, 'কোয়েল', 'কোয়েলা'র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছে তেমনি বনবাসী-বনবাসিনীদের জীবনাচারের মধ্যে নিজেকে সঞ্জীবিত করেছেন। সেখান থেকে আহরণ করা সৌন্দর্য ও জীবনাচার নিয়ে তাঁর শিল্পী মন 'মন চল বনে', 'বনের সঙ্গে খেলা' ও 'প্রেম নামে মন' এই তিনটি বনকাহিনী দৃশ্যায়িত করে পাঠককুলকে উপহার দিয়েছেন।

লেখক কালকূট তাঁর অরণ্যজীবনের ভ্রমণকাহিনী এই তিনটি রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাঁর এই তিনটি রচনাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদচিহ্ন অনুসরণ করে বর্ণিত হয়েছে। বনভ্রমণ কাহিনীর লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অরণ্যসত্তায় যোগীপুরুষ অরণ্যের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব সত্তা একাকার হয়ে গেছে। কালকূট তাঁর এই তিনটি কাহিনীর মধ্যে বারে বারেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়ায় ছায়ায় চলেছেন। তাই এই তিনটি রচনাই তিনি উৎসর্গ করেছেন তাঁর অরণ্য জীবনের পথপ্রদর্শক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সারেন্ডারেঞ্জের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘুরে বেরিয়েছেন, কালকূট তাঁরই পদচিহ্ন ধরে চলেছেন। উৎসর্গ পত্রটিতে তিনি লিখেছেন, "স্বর্গত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে যাঁর পদচিহ্ন ধরে বনের মনকে স্পর্শ করতে চেয়েছি।" *(পৃ: ১৩৬১, কালকূট রচনা সমগ্র, ৩য় খণ্ড, কালজয়ী কালকূট)*

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঘাটশিলা'কে স্মরণীয় করেছেন, কালকূটও তার 'মন চল বনে'র কাহিনীর আরম্ভে 'ঘাটশিলা' নামটি উল্লেখ করে লেখনীর মাধ্যমে বর্ণ সত্তায় একীভূত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন।

এখন কালকূটের বনভ্রমণের প্রথম রচনা 'মন চল বনে'-র মধ্য দিয়ে কীভাবে মানবজীবনকে দেখেছেন কালকূট তা আলোচনা করা যাক্—

'মন চল বনে' এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৮ বঙ্গাব্দে) শারদীয়া 'উল্টোরথ' পত্রিকায়। পরে এটি ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৯ বঙ্গাব্দে) ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'বিশ্ববাণী প্রকাশনী' থেকে।

'মন চল বনে'তে জরাইকেলা থেকে ছোটনাগরা পর্যন্ত মোট চারদিনের বনভ্রমণের ঘটনাবলী কালকূটীয় দৃষ্টিতে উঠে এসেছে। জরাইকেলা পৌঁছানোর ডাকটি কীভাবে পেয়েছেন সেটি বিবৃত করেছেন এইভাবে— কালকূটের মনে হয়েছে "বাংলার ভূ-প্রকৃতির দক্ষিণ-পশ্চিমে উত্তরের টানও থাকবে। নাম কি স্থানের? ছোটনাগপুর? পাশ ঘেঁষে উড়িষ্যা প্রদেশের গায়ে ঢলে পড়া? তবে তাই। চলো, ডাক এসেছে সেই নীলপাহাড় থেকে, সবুজ বন থেকে, ইস্পাতরঙ নদী-নির্ঝর থেকে, নানা রঙ ফুল পাখি পতঙ্গ প্রজাপতির কাছ থেকে। সময় হয়েছে, তাই চকিত মন, বিবাগী খুশির ঘরছাড়া ডানায় বেগ পেয়েছে। চল যাই বনে। কেবল এইটুকু বললেই কি হয়। এ ঘরছাড়া বনের ডাক কি বনভোজনের ডাক। না, এমন ভাবতে ইচ্ছা করে না।" *(পৃ: ৬৭০, কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড)*

অরণ্য জীবনে প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে থাকা অরণ্যচারীদের মধ্য থেকে জীবনকে উপলব্ধি করার জন্য, অরণ্যের ভয়াল সুন্দর রূপকে দেখবার জন্য এই বনযাত্রা। 'বনবাসে' নয়, অন্য একরকমের

বনভোজনের জন্য বনযাত্রা। বনভোজনের বহু রকমফের আছে। কালকূট বলেছেন বনভোজনের সঙ্গে 'চড়ুইভাতি' কথাটার মিল আছে। তিনি দেখেছেন 'চড়ুই'রা খানিকটা বন, খানিকটা মাঠে শ'য়ে শ'য়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে খুঁটে খুঁটে কিছু ভোজন করেই কয়েক মুহূর্ত পরে আবার ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়। সেই রকমের 'চড়ুই'দের মত মানুষরা সংসারের বাঁধাধরা নিয়মনীতি থেকে মুক্তি পেতে, হাঁফ ছেড়ে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য পাখি হয়ে 'চড়ুইভাতি' করে।

এছাড়া 'পল্লীবাংলার মেলা'য় বনভোজনের যোগসূত্রটি রয়ে গেছে। সেকালে মেলা উপলক্ষে মানুষ কয়েকদিনের জন্য সংসার জীবন থেকে বেরিয়ে এসে চিন্তাভাবনাশূন্য মনে মেলা প্রাঙ্গণে কাটিয়ে কেনাকাটা করো, গান শুনে আর রান্নাবান্না করে খাওয়া-দাওয়া করো। একরকম উদাসীভাবে জীবন কাটত। সেটাও এক ধরনের বনভোজন।

আর 'মানত করা'-র মধ্যেও কালকূট সেই বনভোজনটিকেই দেখেছেন, — "সাকুল্যে হাঁটা পথে আর মোটরবাসে তিনকুড়ি বারো মাইল রাস্তা, তোমার রাস্তা, তোমার নাম করেই হেঁটে আসব।" *(পৃ: ৬৭০, ঐ)*

সেখানে কয়েকদিন থেকে সাংসারিক চিন্তামুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সাধনা করত। ভোজন এবং ভজন, দুটোই একসঙ্গে চলত। কালকূটের মতে এটা তো এক ধরনের 'বনভোজন'।

কিন্তু বর্তমানে এই বনভোজনই 'ফিস্টি' নামে পরিচিত। তিনি বলছেন, — "ফিস্টি! শুনলেই যে ধ্বনি আর চিত্রটি মনে আসে, বড় ভয় ধরানো।" *(পৃ: ৬৭০, ঐ)* কালকূট এইরকম বনভোজনে যাচ্ছেন না বনের ডাকেই যাচ্ছেন 'প্রাণের ক্ষুধা' মেটানোর জন্য। হেঁটে গেলে জানে কুলাবে না তাই যেতে হবে গাড়িতে। রেলগাড়িতে গেলে লৌহনগরী 'টাটানগর' পার হয়ে মনোহরপুর। তারপর বিহার-উড়িষ্যার সীমান্ত স্টেশন জরাইকেলা। এটাই লেখকের গন্তব্যস্থল।

'মন চল বনে'র কাহিনীর আরম্ভটিও করেছেন এক অদ্ভুত চরিত্রের কথার মধ্য দিয়ে। লেখক চলেছেন বনে। বনযাত্রার প্রাক্কালে ট্রেনের জানালা দিয়ে 'ঘাটশীলা' নামটি দেখে অদ্ভুত এক নস্টালজিয়ায় কালকূটের মন শ্রদ্ধাবনত হয়ে যায়। "এই 'ঘাটশীলা' ইস্টিশনে কী মায়া লেগে আছে? ফলকে অন্য নাম ভাসে কেন আমার চোখে। মাথা নত হয়ে আসে। মনে মনে বলি, যাই তোমারই ধ্যানাসনের সন্ধানে। তীব্র বিষের নিজের কি কোনো জ্বালাবোধ আছে? আমি কালকূট। হলাহল গভীর। আর কিছু না, তীর্থক্ষেত্রের ঝরাপাতার নিবিড় ছায়ায়, অমৃতের একটু বাতাস যদি ছুঁয়ে যায়।" *(পৃ: ৬৭২, ঐ)* বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথেই কালকূট চলেছেন। ধলভূমগড়ের বনভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রূপরসে লেখকের বিচরণকারী মন বাস্তবের জগতে ফিরে এল একটা 'যশোরিয়া টানে', 'শালাগোর যত বাটপাড়ি আর জুয়াচুরি' কথাটি কানে পৌঁছতেই কালকূটের বিবাগী মন সচকিত হয়ে দেখল একজন চলন্ত গাড়ির মধ্যে বিড়িটিকে ধরাতে

পারছেন না। অতএব রাগ গিয়ে পড়েছে দেশলাই কোম্পানীর উপর। মাথা জোড়া বিশাল টাক, টাকের তিনদিক ঘিরে সামান্য চুলের রেখা, আধময়লা, বোতাম খোলা জামার বুকের ভেতরটাও দেখা যাচ্ছে। বুকের লোমগুলো সাদা হয়ে গেছে, তারই মধ্যে তৈলাক্ত পৈতাটি দেখা যাচ্ছে। মোটা ধুতি অনেকখানি তুলেছেন, পা তার খালি।

যশোরিয়া টানের কথাতেই সাড়া দিয়ে কালকূট তাঁর নিজের ম্যাচবাতিটা দিয়ে দিলেন। কিন্তু চলন্ত গাড়িতে 'ঘুন্‌সি পোড়ানো বিড়িটা' ধরাতে না পেরে তার ছেলের কথাতে পোড়া বিড়িটা ফেলে দিয়ে নতুন একটি বিড়ি দাঁতে দাঁত চেপে ধরালেন।

এমন একটি মানুষ প্রথমেই কালকূটের মন কেড়ে নিল। কথাবার্তায় নমনীয়তা নেই, কেমন রুক্ষ্ম, খরখরে ভাব। তাঁর ষোড়শী কিংবা অষ্টাদশীর সীমায় তন্বী কিশোরী কন্যা ও আঠারো কুড়ির তরুণ জোয়ান পুত্র পিতার এই কাণ্ড দেখে হেসে কুটিপাটি, সঙ্গে সঙ্গে ঘোম্‌টার আড়াল থেকে তাদের মাও যোগ দিয়েছেন। তাঁদের পায়ের কাছেই একটি বনবাসিনী ও বনবাসী বসে আছে। এরাও ধূমপান বিলাসী, কিন্তু কালকূট জানলেন এরা 'ফিকা' অর্থাৎ বিড়ি ধরাতে জানে না, শুধু তাই নয়, কালকূটের হাতে সিগারেট দেখে বনবাসী ও বনবাসিনী উভয়েরই সিগারেটটি টানার ইচ্ছা হয়েছে।

এইভাবেই যাত্রাপথটি একটু সুন্দর হাস্যরস, কথা-কূট-কচালি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে ঐ মহাশয়ের সঙ্গে দেশলাই দেওয়ার সুবাদে পরিচয় হয়ে গেছে লেখকের। মহাশয়টি গাঙ্গুলি মশাই, বনের ইজারাদার। বড় ছেলের টাটায় একটি মুদিখানা দোকান আছে। সেখান থেকেই ফিরছেন জেরাইকেলায়। জেরাইকেলায় চারুকলা শিল্পী বলরাম ঘোষের পৈতৃক বাড়িতে অর্থাৎ যেখানে তাঁর ভাই গোপাল ঘোষ পৈতৃক ব্যবসা করে সেই বাড়িতেই লেখক যাচ্ছেন। আলাপচারিতায় কালকূট জানতে পারলেন যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে , তাঁদের পরিবারের পরিচয় আছে; বিভূতিভূষণও তাঁদের মত যশোরের লোক ছিলেন। গাঙ্গুলী মশাইয়ের কথায় উঠে এসেছে বিভূতিভূষণের বনপ্রেমী মন। তিনি গাঙ্গুলি মশাইয়ের বাড়িতে এসেছেন, থেকেছেন, খেয়েছেন, গল্পগুজব করেছেন। তিনি ছিলেন প্রাণখোলা ঋষির মত। তিনি ধ্যান মগ্ন যোগীর মত তাকিয়ে থাকতেন, 'মনে হত যেন, সেই টিলার ওপরে কোনো দেবতাকে দেখতে পেয়েছেন।' *(পৃ: ৬৮০, ঐ)* সারেন্ডারেঞ্জের সমস্ত বনটাকে আতিপাতি করে দেখেছেন, মা যেমন তার সন্তানের দেহের কোথায় একটা তিল, কোথায় একটা জড়ুল, কোথায় একটা ফুসকুড়ি সব কিছু খোঁজ রাখেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তেমনই সমস্ত বনটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। কালকূট গাঙ্গুলি মশাই-এর কাছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনে একেবারে সম্মোহিত। গাঙ্গুলি মশাই তো বিভূতিভূষণের মতোই বনপ্রেমিক, বনকে তিনিও ভালবাসেন।

ভাষার লহরী উঠেছে তাঁর হৃদয়তন্ত্রীতে। কালকূটের চোখে গাঙ্গুলি মশাই এক নতুন রূপে ধরা পড়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গৃহে এসেছেন, তাঁর কাছে সে বাড়িতো একটি 'তীর্থক্ষেত্র'। তিনি নিজেই বলেছেন, ''বনসাহিত্যের সৃষ্টিরাজ্যে যিনি রাজা সেই রাজা গাঙ্গুলিমশাইয়ের অতিথি হয়েছিলেন, পরিচয় ছিল, খাওয়া-দাওয়া গাল-গল্প করেছেন একসঙ্গে দাওয়ায় বসে। গাঙ্গুলিমশাইয়ের পায়ের ধূলা নেবার জন্য যে আমার শিরদাঁড়া নত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেও যে আবার থিয়েটারের মতো চমক লাগানো ব্যাপার হবে। নিজেরই তাতে লজ্জা করবে।'' *(পৃ: ৬৮০, ঐ)*

গাঙ্গুলিমশাইরা সৌভাগ্যবান, অতএব সেই 'তীর্থক্ষেত্র'-এ যাওয়ার জন্য কালকূট নিজে থেকেই নিমন্ত্রণ নিয়ে নিলেন। তবে পরে তিনি বুঝেছেন যেচে নিমন্ত্রণ না নিলেও তাঁকে যেতেই হত। যে বাড়িতে অতিথি কালকূট শুধু সেই গোপালরাই আনন্দ করবে তা কখনো হয়? গাঙ্গ ুলীমশাইদের তাদের বাড়ির দাওয়ায় বসতে হবে, যেতে হবে, গল্পগুজব করতে হবে, স-ব। কালকূট তাঁদের যতই দেখেছেন, ততই অবাক হয়েছেন আর ভেবেছেন 'মানুষ চেনা কত দায়, বোঝা তো বহুত দূর।' *(পৃ: ৬৮০, ঐ)* গাঙ্গুলিমশাই তো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'হৃদয়ে রেখে বসে আছেন।'

তাই কালকূট তাঁর বনভ্রমণের সূচনা করলেন গাঙ্গুলিমশাইয়ের মনোভূমিতে প্রবেশ করে তাঁর চোখ দিয়েই সীমান্ত বনাঞ্চল ও সেই বনাঞ্চলের বনবাসীদের জীবনাচরণ দেখে নেবেন।

স্টেশনে নেমে বনপাহাড়ের দেশের সকলের কথাবার্তা, বনবাসী-বনবাসিনীদের কৌতূহল মেশানো দৃষ্টি, আবার কারো বা কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই— সবকিছুই কালকূটের মনকে প্রথম ফাগুন বাতাসের মতো দুলিয়ে দিচ্ছিল। সব থেকে বেশি মনকে দুলিয়ে দিয়েছিল গাঙ্গ ুলিমশাইয়ের কন্যা তিপু ও গোপালের ভাই নিতুর খুনসুটি, এই বনাঞ্চলের এক কিশোরী কন্যা ও নবীন তরুণের খুনসুটি, নিষ্পাপ খুশির উদ্দামতা কালকূটের নাগরিক মনকে ধীরে ধীরে বনভূমির বনজীবনের দিকে আকৃষ্ট করেছে।

জরাইকেলা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত বিহার, নেমে গেলেই উড়িষ্যা। দুটি প্রদেশের বাসিন্দা নিতু ও তিপুরা। কিন্তু কালকূটের চোখে ধরা পড়েছে রাজনৈতিক বেড়ি নিতু-তিপুর মধ্যে কোনো বিভেদ আনেনি।

নিতুদের বাড়িতে এসে দেখলেন জেমা নামে একটি বনবাসী ওঁরাও মেয়ে নিতুদের বাড়ির ঘরকন্না সামলাচ্ছে। নিতুর (গোপালবাবুর ভাই) কাছে লেখক জেনেছেন জেমার জন্ম তাদের বাড়িতেই। জেমার বিয়ে হয়েছিল একজন আদিবাসী ওঁরাও যুবকের সঙ্গে, কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতিতে মানুষ হওয়া জেমা নিজের গোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে নি, তারা ফিরে এসেছে নিতুদের বাড়িতেই। জেমা বাঙালি পছন্দ করে। বাঙালি মেকানিক সুরীন তাঁর পছন্দের লোক।

সুরীন জামসেদপুর থেকে এসে তিপুদের বাড়ির কাছে ছোট একটা মাটির ঘর বানিয়েছে। সম্প্রতি ওর বউ মারা গিয়েছে, না জেনে বুনো ফল খেয়েছিল। তাতেই সে মারা গিয়েছিল, হাসপাতালে নিয়েও কাজ হয়নি। কালকূট প্রকৃতির নির্মল পরিবেশে থাকা জীবনগুলিকে অভিজ্ঞতায় ভরে নিচ্ছেন।

কালকূটের এই সুরীনের সঙ্গে দেখা হয়েছে ট্রেনে, পরিচয় হয়েছে স্টেশনে। নিতুদের বাড়িতে যেদিন কালকূট উঠলেন, সেদিন জেমা নিমপাতা ভাজা থেকে শুরু করে মাছের ঝোল, চাটনী বিভিন্ন পদ এত সুস্বাদু করে কালকূটের পাতে সাজিয়ে দিয়েছিল; কালকূট তার বাঙালিয়ানায় মুগ্ধ। সুরীনকে জেমার পছন্দ, তিনি শুনেছেন নিতুর মুখে, প্রতিদিন দুপুরের দিকে জেমা সুরীনের বাড়ি গিয়ে ওর বাচ্চাগুলোর দেখাশোনা খাওয়ানো সবকিছুই করে আসে। নিতু মৃদু হেসে কালকূটকে এসব ঘটনা খুবই সহজভাবে জানায়। এই বন পরিবেশের সীমারেখায় সমাজ জীবনের ধারাটা একটু অন্যরকমের। কিন্তু তাদের সম্পর্কটাকে কেউ খারাপ চোখে দেখে না। কালকূট নিজের কানেই শুনেছেন, দুপুরে সুরীনের সঙ্গে জেমার হাসি-গুঞ্জন। সুরীনের নিতুদের বাড়িতে অবাধ যাতায়াত। অনেক ফাইফরমাসও খেটে দেয়। নিতুদের বাড়ির জন্য মাংস না পেয়ে দুটো মোরগের মাংস পাঠিয়ে দেয় অতিথি রাতে খাবেন বলে। এইরকম স্বভাবের মানুষ হল সুরীন। সকলেই তাকে ভালবাসে, সে নিতুর মেজদার কাছে ও জেমার কাছে বিয়ের কথা বলেছে। জেমা উত্তর করে নি, কিন্তু নীরব সায় আছে এটা নিতু দুষ্টুমি ভরা চোখে জানিয়েছে।

প্রথম দিনে নিতু তাদের বাড়ি থেকে কালকূটকে গাছপালা চেনায়, ছোট ছোট গল্প কথা শোনায়। বন পরিবেশে মানুষ বলে ভয়ডর বলে কিছু নেই। সাপ দেখে কালকূট মনে মনে ভয়ে শিউরে ওঠেন, কিন্তু তিপু নির্বিকার।

বিকালে নিতুর সঙ্গে কালকূট তাঁর আকাঙ্ক্ষিত 'তীর্থভূমি'তে যান। যাওয়ার পরে হঠাৎই বনের শিখায় আগুন লেগেছে বলে কালকূট বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। কুসুম বনে আগুন লেগেছে। ফুল ফোটেনি, কেবলই পাতারই বাহার। নিতুর চোখ দিয়ে কালকূট জানলেন, ক'দিন পরেই আগুন ঝরানো কুসুমবন সবুজে সবুজে পল্লবিত হয়ে উঠবে। এতো শুধু পত্র পল্লবিত আগুন। আর প্রস্ফুটিত নানা বর্ণের ফুলের শোভা আর আগুন ঝরানো পাতার মেলায় কালকূট বিমূঢ় বিস্মিত। বনের এই রূপসুধা পান করতে করতে কালকূট তিপুর বাড়ির কাছে এসে পড়েছেন জানতেই পারেন নি। নিতুর কথায় সম্বিৎ ফিরল। নিতু বনের সীমানার ছেলে, এই বনভূমি বনবাসীদের জীবনাচরণের মধ্য দিয়েই সে বড় হয়েছে। বনবাসীদের মত অত্যন্ত সহজ-সরল তার জীবন।

তিপুদের বাড়িতে পৌঁছেই নিতু-তিপু খুনসুটি শুরু করে দিল। কালকূট গাঙ্গুলিমশাইয়ের

বাড়িতে পা দিয়েই বুঝলেন সবাই তাদেরই অপেক্ষায় রয়েছে। কালকূট তো এই বাড়িতে পা দিয়েই বনরাজ্যের অবিস্মরণীয় কাহিনীর সৃষ্টিকর্তাকে অর্থাৎ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুভব করতে চাইলেন মরমে মরমে। তিনি তো গাঙ্গুলিমশাইয়ের দাওয়ায় বসে প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, খাওয়া-দাওয়া করেছেন, গল্প করেছেন। কালকূট সেই দাওয়ায় বসে টিলাটিকে দেখার চেষ্টাও করলেন, কিন্তু সেটা তো বাড়ির পিছন দিকে তাই দেখতে পেলেন না। কালকূট ভাবছেন সেই ধ্যানমগ্ন যোগীকে গাঙ্গুলিমশাই দেখেছেন।

বনে নয়, বনের সীমানায় গাঙ্গুলিমশাইয়ের গৃহাঙ্গন। তাঁর বাড়ির পাশ দিয়েই জরাইকেলায় যাওয়ার পথ। কথা বলতে বলতে কালকূট বুঝতে পারলেন, বিভূতিভূষণের আরণ্যক-সত্তা গাঙ্গুলিমশাইয়ের হৃদয়ের গভীরে বহুদূর পর্যন্ত শেকড় গেড়েছে। বনের ইজারাদার ছিলেন তিনি। কোনদিনও লাভের মুখ দেখেননি। প্রাণী হত্যা তিনি করতে পারেন নি।

কিন্তু কোন্ প্রাণী হত্যার কথা তিনি বলছেন তা প্রথমে কালকূট বুঝতে পারেন নি। গাছেরও প্রাণ আছে, কাটলে, ছিঁড়লে গাছেরও কষ্ট হয়! এ'কথা শুনেই কালকূট গাঙ্গুলি মশাই-এর হৃদয়ের অন্তর্বেদনাকে ছুঁয়ে ফেললেন, আরণ্যক সত্তা তাঁর ভেতরে ভেতরে কাজ করে যাচ্ছে।

ঋষিতুল্য মানুষ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর প্রভাব গাঙ্গুলি মশাইয়ের হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে পৌঁছে গেছে। আর গাঙ্গুলি মশাই তাঁর সেই বোধ, বনের প্রতি প্রেম ধীরে ধীরে কালকূটের মনের ভিতরে ছড়িয়ে দিচ্ছেন তাঁকে বনের সঙ্গে আত্মস্থ করার জন্য। গাঙ্গুলি মশাই যেন কালকূটকে বনসহ বনবাসীদের ভালবাসার শিক্ষা দিয়ে বনপ্রবেশের ছাড়পত্র দিলেন।

তিপু-নিতু ও শিবুর সঙ্গে এবার কালকূটের বনে প্রবেশ। পথ চলতে চলতে নিতু-শিবু পথের বাঁকে হারিয়ে গেল। সঙ্গে রইল শুধু তিপু। কোয়েল নদীর মত উচ্ছল, চঞ্চল তিপু কালকূটকে গাছ চেনাতে চেনাতে নিয়ে যাচ্ছে।

কোয়েলের দিকে যেতে যেতে পথে টিলার কাছে লম্বা লম্বা কিছু পাথর চৌকো করে পোঁতা আছে। ওঁরাওদের সমাধিক্ষেত্র। তিপু হঠাৎই ভয় পেয়ে সিঁটিয়ে কালকূটকে জড়িয়ে ধরল। কালকূট বুঝলেন, ষোড়শী কিশোরীর যুবতীর গভীরতা আসেনি, তাই এত সহজেই ভীত হয়ে কালকূটকে জড়িয়ে ধরতে পেরেছে। দিনের আলোতে কালকূটের মনে হল কেমন একটা বাতাসলাগা আবহাওয়া সেখানে। বড় বড় গাছের ছায়া আর পশুর মত বড় বড় পাথর একটা ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তিপুর ভয় তাঁরও মধ্যে ছড়িয়ে গেল।

তিপুর বিশ্বাস, যাদের মন ভালো তাদের ওরা কিছু করে না। কিন্তু পাপ তো সব মানুষের মনেই আছে। তিপুর মনে মনেও পাপ আছে। হিংসাও তো পাপ। তিপুর মতো একটি কিশোরী মেয়ের চিন্তায় পাপবোধের একটি নিজস্ব ধারণা আছে। এতবড় কথা তিপু এমন অনায়াসে বলল,

কালকূট এই ছোট বন-কিশোরীর কথাটা মনে মনে স্বীকার না করে পারলেন না। বনের ছায়ায় চলতে চলতে তিপু নিজের মনে বেজে চলেছে।

তিপুর কথা কালকূটের অন্তঃস্থলে নাড়া দিয়েছে। কালকূট নিজেই বনের ডাকে চলে এসেছেন, "যদি বা সেখানে বিবাগী মনে আপনভোলা সুর বেজে থাকে, বনে ছায়ায় চলতে চলতে, নিজের মনে ডুব দিয়ে দেখি, তিপু ধর্মে বেজেছে। হয়তো না জেনে তিপু নৃত্যে বেজেছে।" *(পৃ: ৬৯৩, ঐ)*

এর মধ্যে চালু পথের বাঁক ফিরতেই কোয়েল নদীর সোনালী চর দেখা গেল। নদীর ওপরে নীল পাহাড়ের ছায়া পড়েছে, দূরে গভীর বন, সেখানে পাহাড়ের ভিতর থেকে কোয়েল নেমে আসছে ঝর্ ঝর্ শব্দে, ঠিক একটা বাঁকের মুখ থেকে। নদীর চরে ও জলে বড় পাথরের চাংড়া পড়ে আছে। যেগুলোকে দেখলে মনে হয় হাতী বা মোষ জলে গা ডুবিয়ে আছে। বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে উড়িষ্যা প্রকৃতির একটু অমিল চোখে পড়ল। শরতের বদলে ফাল্গুনে কোয়েলের তীরে কাশফুল ফুটেছে।

কোয়েলের জলে দেখা প্রায় উলঙ্গ এক আধবুড়ো লোক হাতে ময়লা একটা পুটুলি। লোকটি সোনা খোঁচা। কোয়েলের তীরে তীরে যেখানে সোনা থাকে, সেখান থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বালি তুলে মাড়োয়ারী মহাজনের কাছে বিক্রি করে। দিনান্তে আট আনা একটাকা পয়সা পায়। কালকূট দেখছেন কী ভয়ানক বঞ্চনা! সারাদিনের পরিশ্রমের কী মূল্য। তিপু দিতে না চাইলেও কালকূট তাকে একটি টাকা দেন। লোকটি উইলিয়ম সাহেবের করাত কারখানার পাশে একটি ভাঙা ঘরে থাকে, সঙ্গে একটি কুকুরও থাকে।

এরপরে তারা হাঁটু পর্যন্ত জলে নামে। স্রোতের টানে দু'জনেই টলমল। তিপু টাল সামলাতে না পেরে কালকূটের হাত এবারও অনায়াসে ধরে ফেলে নিসঙ্কোচে। নদী থেকে উঠে এসে জরাইকেলার দোকানপাট যেদিকে আছে সেদিকে পৌঁছতেই তিপুর ঘাড়ের কাছে লাফিয়ে পড়ল নিতু-শিবু। তিপু ভয়ে কালকূটকে জড়িয়ে ধরল। তারপরেই ছিট্‌কে দূরে সরে গিয়ে নিতুকে তাড়া করতে করতে হরিণ-হরিণীর মত বনের মধ্যে হারিয়ে গেল। কিন্তু সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসছে দেখে নদী চরে শিবু আর থাকতে চাইল না।

কিছুদূর গিয়ে কালকূট অপরূপ দৃশ্য দেখতে পেল। "নিতু দুহাত-পা ছড়িয়ে বালির ওপরে চিত হয়ে পড়ে আছে। ওর চোখ বোজা। আর একটু দূরেই, তিপু বালির ওপর বসে হাঁপাচ্ছে। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কিন্তু মুখে হাসি। আমাদের দেখে, পড়ে থাকা আঁচলটা তুলে নিল বুকে। দ্রুত নিশ্বাসে সর্বাঙ্গ দুলছে। নিতুর অবস্থাও তা-ই। যদিও সে চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে, দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। চুল এলোমেলো। ঠোঁটের কোণে হাসিটি ঠিক আছে।" *(পৃ: ৬৯৬, ঐ)*

তিপুর দাদা শিবু জানিয়েছে ছোটবেলা থেকেই ওরা দুটিতে এমনিভাবে খেলাধুলা-মারপিট কথা কাটাকাটি করে আসছে। কাজেই কারো চোখেই দৃষ্টিকটু বলে মনে হয় না। কালকূট অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বনের প্রান্তসীমার জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। নাগরিক জীবন থেকে এ জীবনচিত্র আলাদা, কলুষতা মুক্ত।

বনবাসিনী মেয়েরা হেলেদুলে গান গাইতে গাইতে টলতে টলতে, কোমরে জড়াজড়ি করে এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের চলন দেখে তিপু বলে দিল ওরা দিন শেষে কাজ করে বাড়িতে ফিরছে হাঁড়িয়া খেয়ে। কালকূট তিপুকে অনুসরণ করে লক্ষ্য করলেন — তারা তালে তালে চলছে, বক্ষ উদাস, কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিপুর চোখ দিয়ে কালকূট জরাইকেলার বনের সীমানার বন ও বনবাসীদের সম্বন্ধে জানছেন চিনছেন। এরপরে সুরীনের সঙ্গে দেখা, তারই পরামর্শে নিতু-তিপু কালকূটকে নিয়ে রেললাইন পেরিয়ে অন্যপারে গিয়ে ঘন অন্ধকারে উইলিয়ম সাহেবের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। নিতু কালকূটকে জানিয়েছে,— একসময় উইলিয়ম সাহেব ডি. এফ. ও. ছিলেন। ওনার মেমসাহেব স্ত্রী জামসেদপুরে থাকতেন আর সাহেব থাকতেন ফরেস্ট বাংলোতে। মুন্ডা মেয়েদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কও তৈরি হওয়ায় তাঁর মেমসাহেব বউ ডিপার্টমেন্টের কাছে নালিশ করায় উইলিয়ম সাহেবের চাকরি চলে যায়। উইলিয়ম সাহেব এরপরে জরাইকেলায় এসে এক মুন্ডানীকে বিয়ে করেন। ছেলেমেয়েও হয়। প্রথম বউ মরে যাওয়ার পরে সুনি বলে তিপুর বয়সের একটি অল্প বয়সের এক মুন্ডানী বিয়ে করে সুখেই আছেন। লেখক কালকূট নিতুর মুখ দিয়ে বনজীবনের জীবনাচার তুলে ধরেছেন। মানবজীবনে বন পরিবেশ কতটা প্রভাব ফেলেছে সেটাই এখানে উঠে এসেছে উইলিয়ম সাহেবের চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। উইলিয়ম সাহেব নাগরিক সমাজের নিয়মের অনুশাসনের বেড়াজাল ছিন্ন করে বন পরিবেশের সমাজ জীবনে মিশে ধীরে ধীরে বদলে ফেলেছেন।

কালকূটকে উইলিয়ম সাহেব 'মদগম' অর্থাৎ 'মহুয়ার মদ' দিয়ে আপ্যায়ন করেন। সাহেব বললেন যে বান্ডামুন্ডার আগের স্টেশন বিসরার কারখানায় ডিসটিল করা যেতে ভালই লাগবে। আপ্যায়নের রীতি ঐ পানীয় দিয়েই। তিপু এসবের সঙ্গে পরিচিত; তাই সে কালকূটের অস্বস্তি দূর করতে বলল,— "একটু চেখেই দেখুন না। খারাপ লাগলে খাবেন না।" *(পৃ: ৬২৮, ঐ)* কালকূট 'মদগম' মুখে দেওয়ার পর সহ্য করতে পারেন নি। মুখে ছোঁয়াবার পর মুখ থেকে গলা দিয়ে জ্বলন্ত কিছু যেন নেমে গেল এটাই মনে হয়েছিল।

সাহেব লেখককে জানিয়েছেন যে ডিজেল চালিত করাত কলের মেশিন ভাড়া নিয়েছেন এবং কোনরকমে সংসার চলে যায়। যেদিন মেশিন ভাড়া দিতে পারবেন না সেদিন থেকে তিনি কোয়েলের সোনাখোঁচা হয়ে যাবেন। ভ্রমণে এসেছেন কালকূট। তাঁর চলার পথে যেসব মানুষের

সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন সেই মানুষের সেই পরিবেশ কোন বিশেষ মুহূর্তে অন্যরূপে কালকূটের কাছে ধরা দেয়। কালকূট তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সেই সূক্ষ্ম ঘটনাগুলিই মালার মত করে সুসজ্জিত করে গেঁথে তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে কথাসাহিত্যে রূপান্তরিত করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। কালকূট হঠাৎ নিতু-তিপুর সঙ্গে এসেছেন উইলিয়ম সাহেবের কাছে। প্রথমে যেভাবে দেখেছিলেন উইলিয়ম সাহেবকে একটি বিশেষ মুহূর্তে সাহেব অচেনা হয়ে ধরা দিলেন। কালকূট সাহেবের অন্তরকে দেখতে পেলেন। তাঁর জন্য কালকূটের মন ব্যথায় টলটলিয়ে উঠল। তবুও উইলিয়ম সাহেব সুনিকে নিয়ে সুখেই আছেন, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মদগম পান করে যাচ্ছে দেখে লেখক আবার নিজেই বলেছেন, "সংসারের এমন দুর্লভ দৃশ্যের সামনে বসে, সব ভুলে গেলাম। মনে হল, বনে এসেছি, বন তার যা দেবার, যেন এই মুহূর্তেই সব উজাড় করে ঢেলে দিল।" *(পৃ: ৬৯৯, ঐ)*

কালকূট ধীরে ধীরে বনবাসীদের জীবনপ্রণালীর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন নিতু-তিপুর হাত ধরে। স্টেশনের কাছে আসতেই টর্চ লাইট হাতে গোপাল চন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এবং তাঁরা বনের বড় ইজারাদার ও প্রভাবশালী ব্যক্তি সিংজীর বাড়ি চলে গেলেন। ঘরে ঢুকতেই উষ্ণ অভ্যর্থনা সিংজী এবং মোহনবাবুর। কালকূটের সিংজীকে দেখে মনে হল "মানুষ হিসাবেও যেন কোথায় একটা দূরত্ব অনুভব করছি, যেটা মোহনবাবুকে মনেই হচ্ছে না।" *(পৃ: ৬৬৯-৬৭০, ঐ)* সিংজীর চলন-বলনটা একটু রাজকীয়। গোপালবাবু, মোহনবাবু ও সিংজীর সঙ্গে কথা বলে কালকূটের বনভ্রমণের ব্যবস্থা করেছেন। সিংজীর কাছে যখন কালকূট থাকবেন তখন সিংজী খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করবেন, আর যখন মোহনবাবুর কাছে থাকবেন তখন মোহনবাবু ব্যবস্থা করবেন। গোপালবাবুর কাজ আছে বলে যেতে পারবেন না। পরশু সকালে তাঁরা বনের পথে বনের ভিতরে যাওয়ার যাত্রা শুরু করবেন।

মোহনবাবু ও সিংজী পানীয়ের মাত্রা বাড়াতেই দু'জনে দু'রূপে দেখা দিলেন কালকূটের সামনে। মোহনবাবু উচ্চস্বরে বাজতে লাগলেন, তার নম্রভাব মিলিয়ে গেল। আর সিংজী গম্ভীর হতে লাগলেন। একসময়ে গোঙানো স্বরে বললেন "সীমা বলছিল, কয়েকদিন থলকোবাদের বাংলোয় এসে থাকবে সেই জার্মান সাহেবের সঙ্গে।" *(পৃ: ৭০০-৭০১, ঐ)* আর তাকিয়ায় এলিয়ে পড়তে পড়তে বললেন "ছেলেটা বোধহয় বাঁচবে না। টাটার ডাক্তার সেইরকমই বলেছে।" *(পৃ: ৭০১, ঐ)* কথাগুলো কালকূটের মনে বেদনায় বাজতে লাগল।

সীমা সিংজীর পূর্বতর প্রেমিকা। আর তার ছেলে পোলিও রোগে ভুগছে, টাটায় আছে। কালকূটের নজরে ধরা পড়েছে নেশার ঘোরেও সীমা ও ছেলের কথা সিংজী ভুলতে পারেন নি। ভালবাসা ও সন্তান স্নেহ একাকার। অবচেতন মুহূর্তেও সীমার প্রেম ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট রোগশয্যায় শায়িত পুত্রকে ভুলতে পারেন নি। বনের রাজা সিংজী, প্রভাবশালী সিংজী মনে মনে কত অসহায়,

বেদনার্ত — তা কালকূট মরমে মরমে বুঝেছেন।

নিতুদের বাড়ি ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়ার পরে শুতে যাওয়ার আগে গোপালের দীর্ঘশ্বাসটিও কালকূট শুনতে ভুল করলেন না। 'আমার বাবা এক সময়ে এখানকার বনের নাম-করা ইজারাদার ছিলেন। এখন আর কিছু নেই।' *(পৃ: ৭০১, ঐ)*

কালকূটের আবার গাঙ্গুলিমশাই-এর কথাটা মনে পড়ল — 'প্রাণীহত্যার দায় যাবে কোথায়? বনের ইজারাদারদের বংশ কখনো সুখী হয় না।' *(পৃ: ৬৯২, ঐ)* গাঙ্গুলিমশাইয়ের কথাগুলো কালকূটকে সত্য দর্শন করাচ্ছে, তাঁকে বিশেষ উপলব্ধির জগতে পৌঁছে দিচ্ছে। পরের দিন কালকূটকে তিপু এসে নিয়ে গেল সাম্‌টা নালার ধারে। সাম্‌টা নালার এক এক জায়গায় জল কাঁচের মতো স্থির, কালকূটের যেন ভয় ভয় করতে লাগল, অথচ তিপু নির্বিকার। চার-পাঁচ মাস আগে একটা মেয়েকে একটা অজগর খেয়ে ফেলেছিল এটা শুনে কালকূটের মনে ভয় আরও জাঁকিয়ে বসল। বনভূমির আধিভৌতিক সংস্কারগুলোও কালকূটের মনে ছায়া ফেলেছে। এই ছায়া তাঁর নাগরিক জীবনে পড়েনি। কিন্তু ধীরে ধীরে তিপুর সঙ্গে বনদেশে ভ্রমণ করতে করতেই তাঁর নাগরিক মনটি অর্থাৎ তাঁর আগের সত্তাটি হারাতে বসেছেন। কালকূট তিপুর হাত ধরে, তার দেখানো দৃষ্টিতে এই বনভূমির একজন হয়ে উঠছেন।

তিপু কামিনী ফুলের মত থোকা থোকা ফুলকে 'রাজারানী' ফুল বলে পরিচিত করাল। কালকূট কিছু ফুল ছিঁড়ে তিপুর মাথায় ফুল গুঁজে দিলেন। বনবাসী মেয়েরা তাই দেখে সমবেতভাবে এমন ধরনের গান গাইতে লাগল যা শুনে তিপু রেগে গিয়ে পাথর ছুঁড়তে চাইল। কিন্তু কী কথা ওরা বলেছে তা বলল না।

কালকূট বলেছেন ''বলার দরকার আছে কী? ভাষা বুঝি না। ওদের গান, হাসি, খোঁপায় ফুল গোঁজা, কিশোরী তিপুর কেশ, এসবই তো, অধরা থেকে ধরার মধ্যেই আছে। কিন্তু আমি তো আমি-ই আমার মন খুশিতে টলটলানো। এই বনের সংসারে, আমি এক নবজাতক। তিপু আমার ধাত্রী। আমি তো জানি, ওর চোখে-মুখে এই যে লজ্জার ছটা, সেটা প্রকৃতির আপন ধর্মে রঙ ফেরানো। হৃদয়ের অকলুষ স্পর্শ আমাকে সতেজ করেছে।'' *(পৃ: ৭০২, ঐ)*

তিপু কালকূটের হাত ধরে সাম্‌টা নানা পার করে নিয়ে বনের পথে পথে কোয়েলের ধারে চলে এল। কোয়েলের জলে নেমে স্নান করতে লাগল, বনবাসিনী মেয়েরাও তার সঙ্গে যোগ দিল। শিবু-নিতুও এসে উপস্থিত। স্নানের আনন্দে মেতে উঠল, চোখ লাল না হওয়া পর্যন্ত। কালকূট তিপু-নিতু-শিবুর সঙ্গে কোয়েলের স্রোতে গা ভাসিয়ে তাঁর নাগরিক সত্তাটুকুকে বিসর্জন দিয়ে অরণ্য সত্তাটির উন্মোচন করলেন। তিপু হল তাঁর বনধাত্রী। তিপুর হাতের মাছের ঝাল খেয়ে তিনি বিদায় নিলেন সন্ধ্যাবেলায়। তিপু বিকেলে চুল বেঁধে 'রাজারানী' ফুলটা আবার মাথায় পরেছিল।

ফেরার সময় জরাইকেলা হয়ে যাওয়ার জন্য তিপুর অনুরোধ করেছিল। 'দেখা হবে' বলে বিদায় নিয়েছিলেন।

পরদিন অর্থাৎ তৃতীয় দিনে বনের পথে যাত্রা শুরু হয়। কালকূটের মন এখন বনমুখী। ট্রেন যাত্রা থেকে শুরু করে জরাইকেলা থেকে গভীর বনের দিকে যাত্রা শুরু করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একটা পর্ব বলা যেতে পারে। বনের সীমানায় জরাইকেলা। বন-প্রকৃতির কোলে বসবাসকারী যে কয়েকজনের সঙ্গে কালকূটের পরিচয় হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই একটি ভূমিকা আছে কালকূটের মনে বনের মানসিকতা গড়ে তোলার, বনের আত্মার সঙ্গে মানব আত্মার উপলব্ধির বাতাবরণ তৈরী হয়েছে তাদেরই দ্বারা।

এখন দেখা যাক্ কালকূটের বনভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বনবাসীদের বনাচরণের কোন দিক আলোকিত হয়েছে। উদ্দেশ্য বনভ্রমণ, প্রকৃতিকে জানা-চেনা, অরণ্য সত্তাকে উপলব্ধি করা; কিন্তু কালকূটের রচনায় যা বারে বারে উঠে এসেছে তা হল মানব জীবন অন্বেষণের চিত্র। এই মানব জীবন অন্বেষণের টানেই তিনি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়েন। প্রথমেই কালকূট বনরাজ্যের গল্পকাহিনীর যিনি অবিস্মরণীয় সৃষ্টিকর্তা সেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসৃত পথেই চলেছেন। সারেন্ডারেঞ্জের বনভূমির প্রতিটি বনকে তিনি চিনেছেন মা যেমন করে সন্তানের দেহে কোথায় কি আছে চেনেন ঠিক সেইভাবে। আর এই অদ্ভুত সুন্দর তুলনাটা যার থেকে শুনেছেন তিনি হলেন গাঙ্গুলিমশাই। তিনি হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবশিষ্য। তিনি বনের কান্না, যন্ত্রণা, ব্যথা সব উপলব্ধি করতে পারেন।

এমন একটি মানুষের সঙ্গে কালকূটের পরিচয় হয়েছে রেলগাড়ির খুপরিতে। জরাইকেলা যাওয়ার সময় রেলের খুপরির একটি জীবন্ত চিত্র চিত্রায়িত করেছেন কালকূট তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। তিনি ছোট ছোট অথচ অত্যন্ত স্পর্শকাতর কথার মধ্য দিয়ে গাঙ্গুলিমশাইকে তুলে ধরেছেন। কখনও কিছু কৌতুকরসও মিশিয়ে দিয়েছেন। কালকূট তুলে ধরেছেন এইভাবে।

একটা আধপোড়া বিড়ি দাঁতে কামড়ে ধরে জ্বালানোর চেষ্টা করছেন। পায়ের কাছে এক ডজনের বেশী কাঠি পড়ে আছে "কালকূটের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ক্ষোভে ফেটে দাঁতে বিড়ি কামড়ে রেখেই পায়ের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'শালার কাণ্ড দেখেছেন, এত গুলানের মধ্যে একটাও জ্বলল না!' " *(পৃ: ৬৭২, ঐ)* তারপেরে কাঠিশূন্য দেশলাইটা দেখিয়ে বললেন "বর্ষা বাদলের দিনও নয়, চারটে বিড়ি জ্বালাতে পেরেছি কিনা সন্দেহ। অ্যাঁ, শালাগোর ব্যবস্থা দেখেছেন, অ্যাঁ, এই করেই বাঙালীর ব্যবসা ডোবে, এত ফাঁকি দিলে হয়" *(পৃ: ৬৭২, ঐ)* মেয়ে তিপু যখন বলল ওই পোড়া বিড়িটা ফেলে দিতে তখন তার হুশ হল যে সবটাই দেশলাইয়ের দোষ নয়, আরও মজার ব্যাপার হল নতুন বিড়ি বের করার পর! কানের কাছে শুকনো তামাকের আওয়াজ নিয়ে তারপরে দাঁতে

চেপে বিড়ি ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে, একটু আরাম বোধ করার পরে, তখন বললেন, একটা 'পান দাও গো'। আবার পানেরও নেশা! এমনি টুকরো টুকরো দৃশ্য সৃষ্টি করে কৌতুক রসের সঙ্গে গাঙ্গুলী মশাই-এর অন্তর লোকে তুলে ধরেছেন। মূল কাহিনী বিবৃত করার সময়েও এরকমই কিছু কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের প্রতিদিনের দেখা মানুষ হিসেবেই গাঙ্গুলী মশাই কাহিনীতে উঠে এসেছেন।

কালকূট জরাইকেলা যাবেন বললে গাঙ্গুলি মশাই-এর অভিব্যক্তি —

"গাঙ্গুলি মশাই এতক্ষণ বসেছিলেন একভাবেই। এবার হঠাৎ সমগ্র শরীর নিয়ে, আমার দিকে ফিরতে গিয়ে, ধাক্কা মারলেন আমাকে। পতন ঘটত, জানালা না ধরে ফেললে। তখন অন্যদিক থেকেও আওয়াজ উঠেছে, 'জরাইকেলা জরাইকেলা কোথায়।' গাঙ্গুলি মশাই এতক্ষণে আমাকে হাত জড়িয়ে ধরে ফেলেছেন। 'আ হা হা লাগেনি তো?' "

কালকূট জরাইকেলা বেড়াতে যাচ্ছেন শুনে বিশ্বাস হয়নি। তখন তিনি তার দেখা একটা ঘটনা বলেছিলেন, "সাহেব সিং যখন প্রথম এসেছিল, বলেছিল তার মা নাকি স্বপ্ন দেখেছে, কোয়েল নদীর বালির চরে, পূর্ব-দক্ষিণ কোণে নাকি শিবলিঙ্গ পড়ে আছে। উনি সেটা উদ্ধার করতে এসেছেন এক মাস ধরে।

তাঁর মায়ের দেখা সেই শিবলিঙ্গ খুঁজে না পেয়ে একটা পাতার ঘর করে মুদী দোকান খুলেছিলেন। তারপর? "সাহেব সিং-এর এখন মস্ত মোকাম। চারখানা লরি। সব থেকে বড় বনের ঠিকাদার, বড় বড় দুটো দোকান।" *(পৃ: ৬৭৬, ঐ)*

'যাক গে যাক' দিয়ে প্রায় গোটা কাহিনীর সমস্ত সংকেত শেষ করে গাঙ্গুলি মশাই আবার হা হা করে হাসলেন।" এমন কথা শুনে কালকূটের রাগ হয়েছিল। আবার তিনি 'গোপাল চন্দ্র ঘোষের বাড়ি' যাবেন শুনে কালকূটকে দোষারোপ করলেন "সে কথাটা বলতে এত দিকদারি" *(পৃ: ৬৭৭, ঐ)* উল্টোপাল্টা কথা বলে কালকূটের 'ভ্রমণে'র কথাটাকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন সেটা ভুলেই গেলেন।

গাঙ্গুলিমশাই-এর যে ছোট ছোট কয়েকটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা থেকে গাঙ্গ ুলিমশাইকে কিছুটা বুঝতে পারা যায়। অত্যন্ত সাদামাটা প্রাণবন্ত, বিরক্তিকর কথাবার্তা। খুব কাছ থেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেছেন। প্রকৃতি প্রেমকে হৃদয়ে পূজার বেদীমূলে বসিয়ে দিয়েছেন।

দেখা যাচ্ছে 'মন চল বনে' তে বনে প্রবেশের পূর্বে গাঙ্গুলি মশাই কালকূটের মনে আরণ্যক মনের বীজটি বপন করে দিয়েছেন।

লেখক কালকূট প্রথম দিন নিতুদের বাড়ির পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে নিতুর দুষ্টুমি ভরা

সদা হাস্য মুখের উপস্থিতিতে প্রথম প্রকৃতি পাঠ নিয়েছিলেন। কালকূটের চোখে নিতু হচ্ছে সেইরকম ছেলে "যাকে আমরা বলি মুখ ফাজিল। বাক্যেতে যে যন্ত্রণা দেয় না, কিন্তু হাসির মধুর সঙ্গে একটু ঝাল মিশিয়ে দেয়, যার স্বাদটা আলাদা। অন্যদিকে ওর মনটা শাদা যাকে বলে অকৃত্রিম, আর একদিকে বুদ্ধির ধারটা বেশ শানানো।" *(পৃ: ৬৮২, ঐ)* ওই পরিচয় করিয়ে দেয় আদিবাসীদের জীবনের ধারা সম্পর্কে।

নিতুদের বাড়িতে জেমার পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। কালকূট তাকে এভাবে দেখেছেন— "আমাদের সাড়া পেয়েই বোধহয়, একটি মেয়ে, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে, মাটির ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, চোখ দুটি নামিয়ে নিল। মুখে ফুটল একটু লাজে লাজানো হাসি। বয়স অনুমান পঁচিশ-ছাব্বিশ। নীল পাড় সাদা জমির শাড়ি পরার ধরণটি, পুরোপুরি আটপৌরে বাঙালি। গায়ে একটি জামাও আছে। দু'হাতে কাচের চুড়ি, মাথার চুলে এলোখোঁপা জড়ানো। কালো মেয়েটিকে হঠাৎ দেখলে বনবাসিনী বলে মনে হয় না। অথচ তার মুখে এ অঞ্চলের বনবাসিনীর ছাপ সুস্পষ্ট। যে কথাটা আমার বলতে বাধে, তা হল 'আদিবাসী'। শব্দটার উৎপত্তি কোথা থেকে এবং কেন, কোনোটাই আমার মনঃপুত না। আদিবাসী বললেই কেমন যেন দূরে ঠেলে দেওয়া হয়, আজকের সমগ্র ভারতের সঙ্গে মেলানো যায় না। ভারতবাসী থেকে আলাদা করে রাখার মতো শোনায়" *(পৃ: ৬৮৫, ঐ)*

জেমার একটি নিটোল মার্জিত চেহারা কালকূটের চোখে ফুটে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের প্রতি সম্ভ্রম বোধ— 'আদিবাসী' নয় 'বনবাসী'।

নিতুর চোখ দিয়ে আরও একটি আদিবাসীকে কালকূট দেখেছেন মংলা হাঁড়িয়া খাওয়া সত্ত্বেও টলতে টলতে 'কলকাতাকা বাবু'র বাকসো বয়ে নিয়ে এসেছিল। কালকূট তাকে একটি টাকা দিয়েছিলেন। এই টাকা দিয়ে সে মান্ডি পাকিয়ে খাবে। এই খাবার কে পাকিয়ে দেবে, ওর বৌ তো তার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দু'সাল হল কাজ করতে গিয়ে আর আসেনি। জেমা আর নিতু এই নিয়ে ঠাট্টা করছিল। কালকূট মংলার হৃদয়ের বেদনাটাকে ছুঁয়ে ফেললেন— "মংলার রক্তাভ চোখের ধূসর তারা কেমন যেন অন্যমনস্ক অবাক আর স্থির হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে ঝাঁকড়া চুলো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল 'আয়ে গা, এক রোজ চলা আয়েগা। লেড়কা-লেড়কি কেল গিয়া না? সব কো লেকে এক রোজ চলা আয়ে গা।' নিতু আর জেমা এবার তেমন হেসে উঠলা না " *(পৃ: ৬৮৫, ঐ)* মংলা কালকূটের কাছে পয়সা পেয়েই টলতে টলতে বেরিয়ে গেল। লেখক সহানুভূতি ভরা মন নিয়ে মংলার দুঃখকে ছুঁয়েছেন তার মনে হল—"মংলার হাসির আলোয় কেমন যেন একটু ছায়া ঘনিয়ে দিয়ে গেল। হয়তো সে নিজেও জানে, তার বৌ-ছেলেমেয়েরা আর কোনোদিনই ফিরবে না। তাদের কথা মনে হলে এখন সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়, অবাকও হয়

বোধহয়।" *(পৃ: ৬৮৫, ঐ)*

নিতুর এ সবে কোনো ভাবান্তর হয় না। সে তো তার জন্মকাল থেকে বনের প্রান্তসীমার মানুষজনের প্রকৃতি অর্থাৎ চলন বলনের সঙ্গে পরিচিত। যেটা নিতুর কাছে স্বাভাবিক সেটা কালকূটের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। মংলা বৌ চলে যাওয়ার ব্যাপারে নিতু তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছিল "ওদের এমনি ছাড়াছাড়ি লেগেই থাকে।" *(পৃ: ৬৮৫, ঐ)* জেমাও মংলার সম্প্রদায়ের বনবাসিনী। সেও ঠাট্টা মজা করছিল মংলার সঙ্গে, কিন্তু নিতুর কথাটা শুনেই জেমা তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নেয়। জেমারও তো ওর স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। কালকূটের মনে এই ছাড়াছাড়ি লেগে থাকা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন— "যদি থাকে, তা হলে বুঝতে হবে, জীবনে কোথাও বিড়ম্বনার একটা গভীরমূল শিকড় ছড়িয়ে আছে।" *(পৃ: ৬৮৫, ঐ)*

কালকূট কত সূক্ষ্মভাবে মংলা ও জেমার জীবনের বেদনাটাকে তুলে ধরে পাঠককুলকে বেদনার্ত করে তাদের মনেও একই জিজ্ঞাসার বীজ বপন করে দিয়েছেন। বনভ্রমণে বেরিয়ে মানবজীবনের বিভিন্ন চালচিত্র পর্যবেক্ষণ করতে করতে মনকে বনমুখীন করে তুলছেন।

অগভীর বনের ভিতর নিতুদের নিঝুম উঁচু বারান্দাওলা বাংলো ধরনের বাড়িটি দেখে কালকূটের মনে হয়েছে — "কাশের বনের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় যে ঘরখানি 'সেথায় বঁধু থাকে গো' অনেকটা সেইরকম।" *(পৃ: ৬৮৫, ঐ)* অদ্ভুত একটা স্বপ্নময়তা আছে নিতুদের বাড়িটিতে। বনপরিবেশের সঙ্গে বাড়িটা যেন নিজেকে মিলিয়ে নিয়েছে। শালের ফুল ও নাম না-জানা গাছে অজস্র বেগুনী ফুলে ফুলে বনে দীপ্তি ছড়িয়েছে। রং-বেরঙের প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। হলুদ রঙের নীল পাখাযুক্ত একটা পাখি উঠোনে খুঁটে খুঁটে খেতে ব্যস্ত। একটানা ঝিঁঝিঁর ডাকে বন পরিবেশ মুখরিত। বনের বাহ্যিক রূপে কালকূট সিক্ত নিতুই তাকে বনের গাছ গাছালি চিনিয়েছে। ভয় মেশানো বনের গল্পকাহিনী, বনপরিবেশের কিছু ভাষা ও জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা শুনিয়েছে। লেখক ধীরে ধীরে কখন যে বনের সঙ্গে বন জীবনচারণার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছেন সেটা নিজেই বুঝতে পারেন নি।

নিতু তাঁকে তিপুর কাছে পৌঁছে দিল। বাকি বনভূমি ও বনজীবন সম্বন্ধে পরিচিত হওয়ার জন্য। তিপু বনের কন্যা। বনেরই একটি অবিচ্ছেদ্য আত্মা যেন তিপু। তাকে প্রথম বিকেল থেকে পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত বন চিনিয়েছে। চিনিয়েছে বনবাসী-বনবাসিনীদের সহজিয়া জীবনধারা। হাঁড়িয়ার রসে মত্ত মাতাল মেয়েদের টলতে টলতে, ছন্দে ছন্দে চলতে চলতে গান গাইতে শুনেছেন জরাইকেলার বনপথে যেতে যেতে।

তিপু বনকন্যা; অন্ধকারে, বনপথে কত অনায়াসে চলতে পারে তা কালকূট বুঝতে পেরেছেন; তিপু কালকূটের ডানা ধরে নিঃসঙ্কোচে বনপথে নিয়ে গেছে। এই তিপুকে কালকূট

অন্যরূপে দেখেছেন। তিপু ও ওর দাদা শিবু গাঙ্গুলী মশায়ের বিড়ি খাওয়ার ধরনে মজা করেছে, বাবাকে মেয়ে একটু সংযত হতেও বলেছে বলে কালকূটের মনে হল।

"তুমি উনপঞ্চাশটা বিড়ি খাবে আর ওনার ম্যাচবাত্তি জ্বালাবে?" *(পৃ: ৮৭৪, ঐ)* কালকূট গাঙ্গুলী মশাই, মা, মেয়ে ও ছেলের অন্তর তুলে ধরেছেন। নিজের ম্যাচবাতি জ্বলছে না আর কালকূটের কাছে চাইতেও পারছেন না, জরাইকেলার বনে বেড়াতে আসার কথা শুনে বক্রভাবে কথা বলে তবুও তিনি উদাসভাবে কালকূটের কাছ থেকে দেশলাইটি নিলেন। এ দৃশ্য দেখে "মা-ঝি-পো, সকলের সঙ্গেই একবার চোখাচোখি হল। পো তখন কী একটা ছায়াছবির বইয়ে মনোনিবেশ করেছে, তবু একবার চোখ তুলে দেখল। মা পান মুখে দিতে দিতে ঘোমটার আড়াল থেকে একবার দেখলেন। ঝি-এর ঠোঁটে ওটা কী? হাসি? ষোড়শী না, দেখছি চতুর্দশী বা আরো চব্বিশ ঘণ্টা কম ত্রয়োদশী।" *(পৃ: ৬৭৭, ঐ)* কালকূট দেখেছেন ওর চোখের তারায় কেমন যেন দুষ্টামি চিকচিক করছে। "ও কি ওর মস্তবড় অভিমানী ছেলেটিকে দেখে মজা পাচ্ছে নাকি?" *(পৃ: ৬৭৭, ঐ)* তার গাঙ্গুলি মশাইকে কেননা সেইরকম মনে হয়েছে। এরপর লেখককে জিজ্ঞাসা 'জরাইকেলায় কাদের বাড়ি যাবেন আপনি?' *(পৃ: ৬৭৭, ঐ)*

"পিতার কৌতূহল চুঁইয়ে ঢুকেছে কন্যাতে। মনে হল, সেটা যে কেবল নিজের কৌতূহল মেটানো তা নয়। পিতার মনকেও একটু সহজ স্বচ্ছন্দ করা। হতে পারেন পিতাটি বয়স্ক, কিন্তু ছেলে যে বড় মেজাজী। এখন মাকেই তাই দায়িত্ব নিতে হয়।"

রাজারানী ফুল তুলে নিয়ে কালকূট খোঁপায় পরাতে গেলে তিপুর মুখ লাল ছটা রাঙা হয়ে গেল। কিশোরী তিপুর হৃদয়ের অকলুষ স্পর্শে কালকূটের 'নবজাতক মন' সতেজ সজীবতায় পল্লবিত হয়েছে। তিপুর দৃষ্টিতে তিনি বনকে, বনভূমির বনচারী বনচারিণীদের চিনেছেন। কোয়েলের জলধারার মত উচ্ছল, চঞ্চল, গতিময় শীতল জলের স্নিগ্ধ স্পর্শের মত তিপুর সঙ্গ কালকূটকে অচেনা বনজগতে প্রবেশের প্রেরণা দিয়েছে। তিপুই কালকূটের মনে বনভ্রমণের বীজটাকে অঙ্কুরিত করে বনে প্রবেশের সিংহদ্বারে পৌঁছে দিয়েছে; এক অনাবিল আনন্দের মধ্য দিয়ে নিষ্কলুষ পবিত্রতার স্পর্শ দিয়েছে।

জরাইকেলা যাওয়ার তৃতীয় দিনের দিন সকালবেলায় লরিতে যাত্রা শুরু হল। কালকূট বনপ্রকৃতিকে পেছনে বসে স্পষ্টভাবে দেখতে পারেন বলেই পেছনে বসলেন।

সাম্‌টা নাকা অর্থাৎ চেকপোস্টে আইনমাফিক সব কিছু চেক করিয়ে লরি ছুটল অরণ্যপথে। বন ক্রমশ নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে লাগল। 'নোয়াডিহির পাহাড়ি জঙ্গলে' বন এত গভীর যে সূর্যালোক পর্যন্ত ঢোকে না। কোয়েনা নদী পাহাড়ের উপর থেকে কলকল শব্দে নেমে আসছে।

বনভূমি বিচিত্র রূপে সেজেছে। কালকূটের চোখে এই বনভূমির রূপ ধরা পড়ল —"এখন

এই বনের গভীরে, কোথাও কোথাও কেবল রক্তকুসুম। মনে হয় জগৎ সংসার সব লাল হয়ে গিয়েছে। বর্ণের হিসাব তো সাতটাই জানি। কিন্তু বড় বড় গাছে একটি পাতা নেই, কেবল নানা রঙের ফুলে ভরা। মাটির রঙও যে এত বিচিত্র, বিচিত্রতর হয়, দেখা ছিল না। লাল, নীল, হলুদ, কালো, সাদা, পাহাড়ের গায়ে এক এক জায়গায় এক এক রঙ।"

মোহনবাবু জানালেন এই রঙিন মাটি দিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে কিন্তু লাভ হয় নি। একটা জায়গায় অনেকটা জুড়ে লাল ও আয়নার মতো চকচকে তাতে বড় বড় ফুটো। মোহনবাবু জানিয়ে দিলেন 'হাতীরা গা ঘষেছে' ওদের গা চুলকোয় তো, দেখুন মাঝে মাঝে বড় বড় ফুটো আছে ওদের দাতা হাতি দাঁত ফুটিয়েছে। দাঁত গুলোয় তো মাঝে মাঝে, আক্রমণও করে ফেলতে পারে। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল প্রাগৈতিহাসিক বিশাল দেহ সেই প্রাণীদের কথা। গা টা যে ছমছম করছে, তা না তবু মনে হল বনের বাসিন্দাদের মন একটু ছুঁতে পেলাম।' *(পৃ: ৭০২, ঐ)*

বনের মধ্যে শুক্রম কুলি, তার বউ ও শালীকে দেখতে পেয়ে মোহনবাবু তাদের ডেকে ধমক দিয়ে লরিতে তুলে নিলেন। এদেলবা যাওয়ার জন্য। যুবতী বনবাসিনীটির কোঁচড়ে মৃত বনমোরগ, বনমোরগটিকে ঢাকতে গিয়ে তার বক্ষ উন্মুক্ত কালকূটের অন্তর্লোকে প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে —"কোণারকের শিল্পীরা কি এইসব চোখে দেখেছিল? বন্য বালাটির বয়স অপেক্ষাকৃত কম। তার চোখ দুটি ডাগর। উদ্ধত শরীর যেন একটু কাপড়ের আবরণে ভয় ধরানো বিদ্রোহে কাঁপছে।" *(পৃ: ৭০৩, ঐ)* একটি শুক্রমের বৌ সোমারি, আর অপেক্ষাকৃত ছোট যুবতীটি ওর শালী সুরসতিয়া। সুরসতিয়া নাম কালকূটের কানে বাজল --- "সুরসতিয়া কি সরস্বতীর অপভ্রংশ?" *(পৃ: ৭০৪, ঐ)*

গাড়ির টাল সামলাবার জন্য শুক্রম সোমারির পীন বক্ষে হাত রেখেও ওরা নির্বিকার। কালকূটের নাগরিক চোখ জাগ্রত হয়ে ওঠে, অস্বস্তি বোধ করে। কালকূটের চোখে বনবাসীদের জীবনধারা একটি ঝলক চোখে পড়েছে। একসময়ে শুক্রম সোমারির কোমর জড়িয়ে ধরে আর সোমারি শুক্রমের উরুর তলায় পা ঢুকিয়ে দিয়ে বসে রইল। সুরসতিয়া হাসছে, গুণ গুণ করে গান ধরে সোমারির দিকে তাকিয়ে। এই সুরটাই কালকূট শুনেছেন জরাইকেলার বাজারে তিপুর মাথায় ফুল গুঁজে দেওয়ার সময় বনবাসী মেয়েরা সমবেত সুরে গাইছিল। সুরসতিয়ার সুর শুনে কালকূটের মনে হয়েছে "মানুষ না, বনেরই গান শুনছি। বনের সঙ্গে মিলে যায়।" *(পৃ: ৭০৪, ঐ)*

কালকূট গানের ভাষা বোঝে না, কিন্তু সুরীন বুঝিয়ে দিচ্ছে। দু'বোনে একসঙ্গে গেয়ে চলেছে 'এমন মিঠা গন্ধের সিগারেট। বাবু কি আমাদের দিতে পারে না? একলা খাওয়াতে কোনো সুখই নাই।' *(পৃ: ৭০৪, ঐ)*

ওরা নিজেরাই গান বেঁধেছে। কালকূট বলেছেন গানের কথা 'নিমেষে আমার অনুভূতির

এক নতুন দরজা খুলে দিল। সেই সঙ্গে আমার বোধেরও। এই হল বনতত্ত্ব। একলা কোন কিছুতেই সুখ নেই।' *(পৃ: ৭০৪, ঐ)* কালকূট আরও ভাবছেন "এমন করে বলতে জানে কে? চাইতে জানে কারা? এমন ধরণটিতো আর কোথাও দেখিনি,' *(পৃ: ৭০৪, ঐ)*

সিগারেটের কৌটা খুলে সিগারেট দিতে গেলে সুরসতিয়া প্রথমে লজ্জিত হয়েছিল তারপরে সিগারেট ধরিয়ে খোশমেজাজে সুরসতিয়া গান ধরেছে, "মানুষটার মন বড় দরাজ। আমি চাইলে বোধহয় একটা পাহাড় দিয়ে দেবে।" *(পৃ: ৭০৪, ঐ)* মুখে মুখে গান বেঁধে গাইছে সুরসতিয়া। কালকূট কবিগানের কবিদের সঙ্গে মিল খুঁজে পেলেন। স্বাভাবকবি, কবিগানের কবিরা মুখে মুখে গান বাঁধে।

কালকূটের মনে হচ্ছে "সুরসতিয়া আমাকে ওদের আদিম মন্ত্রে মুগ্ধ করছে? উইলিয়ম কি এমনি চোখের টানেই মুণ্ডা হয়ে গিয়েছেন? সুরসতিয়া যেন এই গভীর বনের এক উল্লাস আমার রক্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে।" *(পৃ: ৭০৫, ঐ)* বনজীবনের মধ্যে আদিম রূপের সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করছেন।

ইতিমধ্যে কোয়েনা নদীর জলস্রোত পার হয়ে তারা একটি উপত্যকার মতো জায়গা দিয়ে চলছে। লাল কাঁকর বিছানো রাস্তা, কিছু কিছু ঘরবাড়ি, সবই প্রায় মাটির, খোলার চাল অথবা কাঠির মতো এক জাতীয় ঘাসের চাল। এই ধরনের ঘাসের চাল বাংলাদেশে দেখা যায় না। কালকূট বনভূমির ভৌগোলিক অবস্থান তার সঙ্গে বনভূমির সমাজ জীবনের একটি সাদামাটা অথচ কাব্যিক চিত্র চিত্রায়িত করেছেন।

বড় একটি ইঁদারা থেকে কপিকলে জল তোলা থামিয়ে রেখে গাড়ির মধ্যেকার লোকজনদের দেখছে। এদের রীতিনীতি আলাদা, পরপুরুষকে দেখে এরা ঘোমটা দেয় না। এরা বন্য কৌতুহলে তাকিয়ে দেখছে, উলঙ্গ বাচ্চারা খেলা করছে। ইঁদারা পার করে একটি রক্তকুসুমের ছায়ায় লরিটি থামল।

মোহনবাবু জানিয়ে দিল 'এ জায়গায় নাম নাগরা— ছোট নাগরা।' *(পৃ: ৭০৫, ঐ)*

কুসুম গাছের বিপরীত দিকের দুটি টালি ছাওয়া মাটির ঘর থেকে বেরিয়ে আসে রতন, কদমছাট চুল, ছোট একটা শিখি, বনবাসী নয়। মেহমানকে অভ্যর্থনা জানায়। কালকূটকে নামিয়ে দিয়ে মোহনবাবু ও সুরীন আবার গাড়িতে ওঠে এদেলবা যাওয়ার জন্য।

রতনের সঙ্গে গল্প করতে করতে কালকূট জেনেছেন, ছোটাগরায় যারা বাস করে তাদের নিজের জমি বলতে কিছু নেই। বনবিভাগ থেকে কিছু লোককে থাকতে দেওয়া হয়েছে, সময়ে-অসময়ে কাজের জন্য বনে আগুন যায় নিয়মিত বন পরিষ্কার রাখাতে হয়। এ'জন্য বাইরের কাজের লোকের দরকার হয়, তাই এই ব্যবস্থা। সিংজী প্রভাবশালী বলে তাকেও থাকতে দেওয়া হয়েছে। এই গ্রামে ব্লক ডেভেলপমেন্টের একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। ডাক্তার মাঝেমধ্যে আসে। একজন নার্স

এই গ্রামেই থাকে। মাটির বাড়িগুলি হাতি এসে ধাক্কা দিলেও নাকি সহজে ভেঙে পড়ে না। রতন দু'বছরের মধ্যে মাত্র দু'বার হাতি দেখেছে।

কালকূট বনভ্রমণে এসে বনপ্রকৃতির মধ্যে যে বনবাসীরা জীবনযাপন করে সে সম্পর্কে ধীরে ধীরে জ্ঞান আহরণ করে নিজের 'নবজাতক' মনটিকে সাবালকের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর অন্তরভূমিতে যে বীজ গাঙ্গুলি মশাই বপন করেছিলেন, সেই বীজ পত্র সমন্বিত হয়ে বীজপত্রের বাইরের খোলস ছাড়িয়ে বাইরের জগতে উঁকি দিয়েছে। তিপু সেই 'নবজাতক'কে বনের পত্র পুষ্প লাল কাঁকুরে মাটির মধ্যে লালন করে, কোয়েলের জলে স্নান করিয়ে নাগরিক মনটিকে বনভূমি বনজীবনচারণার উপযুক্ত করে দিয়েছে। প্রবেশের ছাড়পত্র 'সামটা নালা' দিলেও মানসিক ছাড়পত্র দিয়েছে তিপু। নবজাতকের ধাত্রী, সরলতায়, সজীবতা-সতেজতা ভরা বনের দেশের এক সদাচঞ্চল উচ্ছল বনকন্যা। বনের সংসারে কালকূট নবাগত। অতএব রতনের সাবধান বাণী মাথায় রেখে কালকূট ঘুরতে ঘুরতে রক্তকুসুমের রক্তিম আভার দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন বাঁধানো ইঁদারার সিঁড়িতে কলসী নিয়ে গালে হাত দিয়ে এক বনবালা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, পরনে তার কিচরি, পাশের শালগাছ থেকে তার ফুল ঝরে ঝরে পড়ছে তার গায়ে মাথায়। কিসের এত ভাবনা, এইকথা ভাবতে ভাবতে কালকূট এগিয়ে গেলেন এবং দেখলেন কয়েকটি নেংটি পরিহিত বনবাসী, দুটো গরু খুটিতে বাঁধা, ছাগল-মুরগি চরছে। মাটির ছোট ছোট ঘর। দু'একটি ঘর সিংজীর মত, বাড়ির চেয়ে গাছই বেশি। একটি বয়স্কা বনবাসী মাদুরে মহুয়া শুকোচ্ছে। আর একটি বনবালা কাঠের খোলে কি যেন একটা গুঁড়ো করছে। ঐ বনবালা ঘর থেকে ব্যাঙের ছাতা এনে দেখিয়ে বলেছিল, 'ভরন্ডো কুকরি না?' গুঁড়ো করে শুকিয়ে রাখে, পরে ওতু অর্থাৎ তরকারী করে খায়।

কালকূট 'কলকাতা' থেকে এসেছে জেনে তার চোখেমুখে একটি বিস্ময়ের ঝলক লাগে কালকূটকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে থাকে। সিংজীর মেহমান জেনে একটু গম্ভীরও হয়ে যায়। কোয়েনার তীরে এসে পায়ের স্যান্ডেল খুলে সন্তর্পণে কোয়েলার জলে পা ডুবিয়ে, পাথরের উপর দিয়ে নদী পার হয়ে গেলেন। সাদা রঙের একটি পাকা ঘর, মাথাটা মন্দিরের চূড়ার মত ত্রিশূল গোঁজা, অ্যাসবেসটস দেওয়া চালা দেখে অবাক হয়ে কালকূট সেইদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন— "মাঝখানে একটি বেদী ছাড়া আর কিছুই নেই।" *(পৃ: ৭০৮, ঐ)* পিছন ফিরে বনের দিকে তাকাতে গিয়ে প্রায় অবিশ্বাস্য দৃশ্য "একটি বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে। ফরসা রঙ, খানিকটা মাজা মাজা বলা যায়। চোখ দুটি ভাসা ভাসা, কালো ডাগর। মুখখানি স্নিগ্ধ। একটি লালপাড় মিলের পাতলা শাড়ি, কুঁচিয়ে ফেরতা দিয়ে পরা। যাকে বলে নাগরিকা পরিধান। গায়ের জামাটি লাল। কাঁধে একটি কাপড়ের ব্যাগ। হাতে ঘড়ি, কানে দুটি সাদা পাথরের ফুল। পায়ে স্লিপার। মুখে একটু ধুলো

লেগেছে। চুলে বিনুনি বাঁধা।'' *(পৃ: ৭০৮, ঐ)*

এইরকম বনপরিবেশে একটি নাগরিকা কন্যা। কালকূটের বিস্ময়বিমূঢ় অবস্থার মধ্যে কন্যাটির প্রশ্ন— 'আপনি কি বাঙালী?' *(পৃ: ৭০৮, ঐ)* এই মেয়েটির প্রশ্ন কালকূটের হৃদয়বেদীতে ঝংকার তুলল — 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' *(পৃ: ৭০৮, ঐ)*

বনপরিবেশে এমন স্নিগ্ধ মূর্তিতে বাঙালি কন্যাটি ছোটনাগরার ব্লক ডেভেলপমেন্টের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নার্স, তৃপ্তি ভৌমিক। নার্সের মুখে জানলেন— নামেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ওষুধপত্র কিছুই নেই, দু'মাসে একবার হয়ত ডাক্তারবাবু এই বনজঙ্গলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন। তিনি প্রসূতিদের একটু দেখাশোনা করে, প্রসবের সময় কাছে থাকে। এ'ছাড়া জ্বরজ্বালা হলে একটু মিকচার দেন, ওটুকু পর্যন্ত।

রাশি রাশি শাল ফুটেছে, এতে একটা রি-অ্যাকশন হয়, শরীরের উত্তাপ, একশো তিন পর্যন্ত প্রায় জ্বর উঠে যায়। এটা 'ফুলজ্বর'। বনবাসীরা ওষুধ খেতে চায় না, গুণিনদের তৈরি 'সিম্‌জাস্টি সিমনানি' গাছের পাতার রস সেদ্ধ খায়।

কালকূট বনদেশের ওষুধপত্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সেবিকা কন্যাটির কাছ থেকে জেনে নিচ্ছেন বন রহস্য। দু'বছর হল বিধবা মা, ভাইবোনদের ভরণপোষণের জন্য দমদমের বাসা ছেড়ে একাকী এই নির্জন বনে এসেছেন। বনে থাকতে থাকতে এই বনজীবনের বনবাসী-বনবাসিনীদের জীবনধারার অনেক কিছুই আপন করে নিয়েছেন। জেনেছেন অনেক কিছু, তাদের ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, জঙ্গলের মানুষদের জড়িয়ে অনেক গল্প কথা, লোকশ্রুতি বনের প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কি ধরনের রোগজ্বালা ইত্যাদি। বনজীবনকে নিবিড়ভাবে ভালো না বাসলে এগুলো জানা সম্ভব নয়। কালকূটের এই সূক্ষ্ম জিনিসগুলো নজর এড়িয়ে যায় নি।

কালকূটের পরিচয় পেতেই তৃপ্তি ভৌমিকের চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। 'ছোটনাগরা'য় স্বয়ং কালকূট, খুশিতে তৃপ্তি ভৌমিক জানিয়ে দিল যে সেও গুণমুগ্ধ পাঠিকা। এরপরেই বলল, 'শুনেছি, এ জঙ্গলে বিভূতিভূষণ ঘুরেছেন।' *(পৃ: ৭০৯, ঐ)* সারেন্ডারেঞ্জের বনভূমির বনবাসী মানুষেরা অনেকেই তাঁকে জানে।

তৃপ্তি ভৌমিক কালকূটকে 'নাগরা' দেখাতে নিয়ে চললেন। আর এই যাওয়ার পথে কালকূট তৃপ্তি ভৌমিকের চোখ দিয়ে চিনলেন একটি বুনো জামের গাছ। সে খেয়ে দেখেছে, একদম রঙে ও স্বাদে পরিচিত জামফলের মত। তারপরে হাসতে হাসতে বলেছে বিষফল নয়, যদি বিষফল হত তাহলে তো সব জ্বালা তার জুড়িয়েই যেত। এই কথা বলাতে তৃপ্তি ভৌমিকের অন্তঃস্থল কালকূট দেখে ফেললেন, হাসির অন্তরালে একটি বিষণ্ণতার সুর ধ্বনিত হচ্ছে। সে আরও বলেছে বনে একধরনের পোকা আছে, সেটা কামড়ালে সারা শরীর ফুলে যায় এবং অবশেষে সে মরেও যায়। কালকূট ধীরে ধীরে তৃপ্তি ভৌমিকের কাজ থেকেই বনজীবনের বিচিত্র সব তথ্য জেনে

নিচ্ছেন ও নিজেকে বনজীবনের একজন বলে মনে করছেন। তৃপ্তি ভৌমিক আরো জানাল 'বায়তানা শব্দের মানে হল কান্না।' *(পৃ: ৭০৯, ঐ)* বনবাসীদের চিন্তাধারা, বেশবাস সবকিছু 'আমাদের ঝিল্লি স্বর তাদের কাছে কান্না', কথাটা নতুন লাগল কালকূটের। নিরন্তর কান্না, বনবাসীদের ধ্যানধারণা- বেশ-বাস-চিন্তা-ভাবনা, বিশ্বাস সবকিছুই নাগরিক মানুষের থেকে আলাদা। বিজ্ঞানে তিনি জেনেছেন পতঙ্গের ডাকাডাকি কেবল প্রেম-কুহর। যেমন ''জোনাকির আলো কেবল মিলনের ইশারা, ডাহুক-ডাহুকির ডাক কেবল বিরহের কান্না'' *(পৃ: ৭০৯, ঐ)* তবে ঝিল্লির ডাক বনবাসীদের কাছে কান্না কেন?

একটা খোলা জায়গায় উপুড় করা দুটো বিরাট নাকাড়া, গায়ে বড় বড় লোহার গজাল দেওয়া, দুটি নাকাড়া সমান নয়, একটি একটু ছোট। তৃপ্তি ভৌমিক জানাল— এখানকার লোকদের বিশ্বাস, উৎসবের সময় নাকাড়া দুটি আপনিই বেজে ওঠে, কিন্তু নিজে দু'বছরের মধ্যে কোনদিনও বাজতে শোনেনি। এবং একটা অজগর নাকি এই নাকাড়া দুটি পাহারা দিচ্ছে। বনবাসীদের বিশ্বাস কালকূটের মনে ধীরে ধীরে চেপে বসেছে, একটা ভয়ের সঞ্চার হচ্ছে।

বনবাসীরা নাকাড়াকে নাগরা বলে। তৃপ্তি ভৌমিক জানালো তবে মহাবুরু বলে একটা জায়গায় আরো কয়েকটি নাকাড়া আছে। মুন্ডাদের রাজার বাড়ি ছিল ওখানে, বড় বড় থাম এবড়ো-খেবড়ো থাম এখনো দেখা যায়। তৃপ্তি ভৌমিকের মুখে এ'কথা শুনেই কালকূটের মন কল্পনার ডানায় ভর করে বনের রাজার আরণ্যক উৎসবের রাতে পৌঁছে গেল; দেখতে পেলেন রাজবাড়ির বড় বড় পাথরের থামে মশাল জ্বলছে, 'এইরকম বড় বড় নাকড়া বাজাচ্ছে খালি গা পেশীবহুল বলিষ্ঠ পুরুষ।' *(পৃ: ৭১০, ঐ)* সেই নাকাড়ার শব্দে এমনি তন্ময় হয়ে গেছেন যে সামনে তৃপ্তিকে দেখেও কালকূটের মন কল্পনার জগতেই বিচরণ করছে। ''সহসাই যেন একটা মুগ্ধতা আমার চোখে নেমে আসে।'' *(পৃ: ৭১০, ঐ)* তৃপ্তি ফিরে যাওয়ার তাড়া দিতেই হুঁশ ফিরতে দেখলেন যে তৃপ্তির ধূলা লাগা মুখে রক্তকুসুমের ছটা লেগেছে।

কালকূট ফেরার পথে বসে বনজঙ্গলের নানারকম অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে লাগলেন। তৃপ্তি ভৌমিক বনবাসীদের অনেক শব্দের মানে বলে দিল, 'বোঙার' কথা বলল, বনবাসীদের কোন দেব-দেবী নেই, সবই অপদেবতা, অপদেবী। আর আছে সাতবহিনী নামে পরীরা। এরাও অপদেবী, এরা যুবক-যুবতীদের মাথা খারাপ করে ভুলিয়ে বনের মধ্যে নিয়ে মেরে ফেলে। চা দিতে এসে বনবাসী মেয়ে কয়ো তৃপ্তিকে ঠাট্টা করল, 'তুমি কি তোমার বর ধরে নিয়ে এলে?' *(পৃ: ৭১১, ঐ)* তৃপ্তি ভৌমিক কয়োর ঠাট্টা কালকূটকে বুঝিয়ে বলে দিল, কিন্তু তার মুখটি 'লাজে লাজানো' হয়ে উঠল।

তৃপ্তির কথায় কালকূটের মনের ভিতর ভাবান্তর দেখা দিল। এই দূর জঙ্গলে কি করে তৃপ্তি

বর ধরবে? সে সময় ও মন তার আছে কি? একদিন কারো জন্য হয়ত সত্যিই মনে রঙ লাগবে। জরাইকেলায় বন দেখিয়েছিল তিপু, বনবাসীদের অনেককথা শিখিয়েছিল। এখানে যেমন করে তৃপ্তি ভৌমিক শেখাচ্ছে। তিপু কোয়েল নদীর মতো উচ্ছল, তৃপ্তি ভৌমিক নিবিড় বনের মতো শান্ত, স্নিগ্ধ।

তিপুর মতো তৃপ্তি ভৌমিকও বোঝে বনবাসীদের ভাষা। কয়ো বাংলা ভালোই বলতে পারে। তৃপ্তিরও সব থেকে ভাল লাগে বনবাসীদের গান। তৃপ্তি ভৌমিকও জানে, বনবাসীরা ওরা গান বেঁধে গান করতে জানে।

মাঘী পরবের দিন বনবাসীরা সবাইকে জোর করে হাঁড়িয়া খেয়ে উদ্দাম হয়ে যায়। তৃপ্তিও খেয়েছে, কিন্তু বিচ্ছিরি গন্ধ আর স্বাদের জন্য খেতে পারেনি। মাঘী পরবের দিন বনবাসীদের লজ্জা শরম বলে কিছু থাকে না। যাকে প্রাণ চায় তাকেই টেনে নিয়ে যায়, 'গণমিলন উৎসব'। তাইতো সে দরজা বন্ধ করে থাকে, এসব কথা বলতে বলতে তৃপ্তির মন উদাস হয়ে যায়। বনবাসীদের জীবনাচরণের অনেক কিছু এতদিনে রপ্ত করে ফেললেও সমাজবদ্ধ মানুষের যৌনাচারের ভাবনার সঙ্গে বনবাসীদের গণমিলন উৎসবকে মেলাতে পারে নি তৃপ্তি। বনমধ্যে কারো সঙ্গে তেমন একটা কথা বলা হয় না, কালকূটকে পেয়ে একটু সময়ের মধ্যে সে অনেক কথা বলে ফেলেছে বলে একটু লজ্জিতও হয়।

বিকালে রতনের সঙ্গেই আবার বনের সৌন্দর্য ও বনজীবনের চিত্র দেখতে বেরোচ্ছিলেন, কিন্তু তৃপ্তি এসে যাওয়ায় তৃপ্তিই নিয়ে গেলেন বহুদূরের বনজঙ্গল দেখাবেন বলে। 'তারা মাচা'য় উঠে তার মনে হল 'পৃথিবী ছাড়িয়ে যেন কোন এক দুর জগতে চলে এসেছি। যে দিকে তাকাই, তিনি দেখালেন— নানা বর্ণের সমারোহ,' *(পৃ: ৭১২, ঐ)* নীল আর সাদার সঙ্গে রক্তকুসুম, সবুজের বিচিত্র বর্ণের সমাহার, তাই সবুজ বনকে নীল দেখাচ্ছে। দূরে লাল পাহাড় তার গা দিয়ে সারি সারি কী যেন চলছে, তৃপ্তি জানাল— ওটা 'গুয়া রেঞ্জ, ওখানে আয়রন ওরের খনি আছে, রোপওয়ে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে'। *(পৃ: ৭১২, ঐ)* 'তারা মাচা' থেকে নেমে এসে উভয়ে ছোটনাগরা গ্রামের অন্যপ্রান্তে এসে দেখলো একটি মেয়ের কোলে ময়ূরের বাচ্চা, তৃপ্তি ভৌমিক কোলে নিয়ে আদর করতে; কালকূটও লোভ সামলাতে পারলেন না, তাই নিজেও বনের শোভাকে কোলে নিয়ে নূতন এক আস্বাদন অনুভব করলেন। এমনি করেই লেখক কালকূট বন সৌন্দর্যের রূপ-রস-গন্ধে মুগ্ধ হলেন।

বনের গভীরে কোয়েলা নদীর ধারে পৌঁছে একটি মদির গন্ধ পেলেন। জানতে পারলেন — এ গন্ধ তিলুয়া ফুলের। ছোট ছোট কাগজের মত পাতলা পাপড়িযুক্ত ফুল— হলুদ ও শাদা বর্ণের। কালকূট কয়েকটি ফুল তুললেন গন্ধ ও সৌন্দর্যের ঘনিষ্ঠতা পেতে। আর তৃপ্তি দুটি ফুল

নিয়ে বনবালাদের মত কানে পরলেন বনের সঙ্গে ওতপ্রোত হতে।

তৃপ্তিকে এই রূপে ভাল লাগছে বলাতে তৃপ্তির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। ইতিমধ্যে একটি নীল রঙের গাই কোয়েলার অপর পারে মাত্র পঞ্চাশ হাত দুরে দেখতে পেয়ে তৃপ্তি কালকূটের হাত চেপে ধরে গাইটিকে দেখাল। বন্য পশু প্রথম দেখলেন তিনি।

কালকূট পরের দুপুরে তৃপ্তির বাড়িতে পেঁয়াজ দিয়ে পোস্তবাটা, মোচার ঘণ্ট, ডাল আর কোয়েলা নদীর মাগুর মাছের ঝোল খেলেন, সবশেষে এক বাটি ঘন দুধ। খাওয়ার পর তৃপ্তির বিছানায় বিশ্রাম করতে করতে তৃপ্তির সঙ্গে গল্প করলেন। তৃপ্তির অনুরোধে 'তাকে আপনি' থেকে 'তুমি' করে বলতে শুরু করেছেন। তৃপ্তি কালকূটের সঙ্গে কেন এদেলবায় যেতে চায় তার কৈফিয়ত সে নিজেই দিল — "এলেদবার জঙ্গল আপনাকে আমি ঘুরিয়ে দেখাবো। মোহনবাবু ইজারাদার মানুষ, উনি গাছ কাটার জন্য কুলিরেজাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। আমি বেড়াব আপনাকে নিয়ে।" *(পৃ: ৭১৩, ঐ)* কালকূটের সম্মতিতে তৃপ্তির মুখে খুশি আর লজ্জার ছটা লেগে গেল। কালকূটের সঙ্গে তৃপ্তির ভালোলাগার সম্পর্ক তৈরী হচ্ছে।

পরের দিন সকাল আটটায় বদরিকা প্রসাদ জীপ নিয়ে এসে গেল। কিন্তু তৃপ্তি ম্লান মুখে জানাল — "একটি মুন্ডা বৌয়ের ব্যথা উঠেছে, প্রসব হবে। দু'দিন ধরে কষ্ট পাচ্ছে" *(পৃ: ৭১৩, ঐ)* তৃপ্তির চোখ দুটো এদেলবায় যেতে না পারার বেদনায় টলমল করে উঠছে, কিন্তু কর্তব্য তাকে সংযত হতে শিখিয়েছে। চোখ মুছে জানাল "মাত্র তো একটা দিন, তবু কেমন যেন হয়ে গেল। তবে, আপনি এদেলবায় থাকবেন, সন্তান প্রসব করিয়ে আমি কারোর কোনো লরিতে চলে যাব।" *(পৃ: ৭১৩, ঐ)*

কালকূট গাড়িতে ওঠার আগে তৃপ্তি হঠাৎ তাকে প্রণাম করল। চোখ দুটো ভিজে উঠেছে। সভ্য সমাজের মানুষ তৃপ্তি রুচির টানে একাকী বনবাসী হতে বাধ্য হয়েছে। কিছুটা বনজীবনের সঙ্গে মিশতে শিখেছে। তবে সভ্য সমাজের মানুষের সঙ্গ পূর্ব স্মৃতি জাগরিত করিয়ে নতুন এক অনুভূতির জগতে আনে তাকে। কালকূটের আরও একটু সঙ্গ পেতে চাইছিল তার মন; কিন্তু কর্মজীবনের কর্তব্য মানসিক তৃপ্তির পথকে রুদ্ধ করে দিল।

কালকূট গাড়িতে উঠতেই বদরিকা প্রসাদ জীপ চালিয়ে দিল এদেলবায় যাওয়ার জন্য। তৃপ্তি রক্তকুসুমের রক্তাভ আভা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'মন চল বনে'র তৃপ্তিকে নিয়ে কালকূটের বনভ্রমণ শেষ হল।

'মন চল বনে'র কাহিনীর সঙ্গে নির্জন বনভূমিতে তৃপ্তি নার্সের দেখা পাওয়াটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। ওইরকম একটা নিবিড় বনপরিবেশে মার্জিত পোষাকের নাগরিকা কন্যা তৃপ্তি ভৌমিক কালকূটের নাগরিক মনের চেতনা ফিরিয়ে আনতেই যেন উপস্থিত হয়েছে। যে কিনা

সংসারের ভরণপোষণের জন্য নির্জন বনে চাকুরি করতে এসেছে। যদি তার খুঁটির জোর থাকত তাহলে হয়ত সেও চলে যেত, কিন্তু সে নিরুপায়।

নির্জন বনভূমিতে থাকতে থাকতে সেও বনভূমির আত্মাই যেন হয়ে গেছে। বনের কোথায় কী আছে, কোন্‌টা অপদেবী, অপদেবতা সবকিছুই সে ধীরে ধীরে জেনে ফেলেছে, চিনে নিয়েছে। সে বনবাসীদের যেমন অন্ধবিশ্বাস অস্বীকার করে না, তেমনি নিজের নাগরিক মনের ধারণায় যুক্তি দিয়ে বোঝাতে ছাড়ে না। কালকূটকে বনভূমির গাছপালা, বনজন্তু এবং বনবাসীদের জীবনাচরণ সবকিছু সম্বন্ধে অবহিত করিয়েছে।

নির্জন বনে কালকূটের মতো লেখককে পেয়ে তৃপ্তি ভৌমিক অনাবিল আনন্দে ও খুশিতে মেতে উঠেছে। কালকূটের কথা সে তার মাকে চিঠিতে জানাবে— এ'কথা শুনে কালকূট বলেছেন, 'বনে আর একটা পাগল মেয়ে জুটল'। *(পৃ: ৭১১, ঐ)*

দুদিনে তৃপ্তি ভৌমিকের সঙ্গে একটা মধুর বন্ধুত্বের বন্ধনে কালকূট বাঁধা পড়েছিলেন। তৃপ্তি ভৌমিকের সঙ্গে বনে ঘুরতে ঘুরতে তার একাকীত্ববোধ, যন্ত্রণা এমনভাবে কালকূট বুঝতে পেরেছিলেন যে, মনের অজান্তে তিনি তৃপ্তির হৃদয়ের কাছাকাছি চলে এসেছিলেন।

'মন চল বনে' কাহিনীতে জরাইকেলা থেকে ছোটনাগরায় আসার পথে দুটি বনবাসী কন্যার সঙ্গে যে কালকূটের দেখা হয়েছিল, যদিও ঠিক দেখা বলা যায় না, বনপথ থেকে শুক্রম, তার বৌ সোমারি, শালী সুরসতিয়াকে লরিতে তুলে নেওয়া হয়েছিল, সেই সামান্য পথটুকুতে এই তিনটি চরিত্রের আচার-আচরণ কথন-বলন যতটুকু দেখেছিলেন, তাই স্মৃতিতে ধরা হয়ে রইল। সোমারি ও সুরসতিয়া দুটি বোন সারা বনপথ নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি, কানাকানি, ঠিক কানাকানি নয় গুণগুণানি করেছে। নিজেরাই গান বেঁধে সুর তুলেছে। সুরসতিয়া তার কোণারকের নারীমূর্তির সৌন্দর্য নিয়ে কালকূটের মন জয় করেছে। ছোটনাগরায় মোহনবাবু কালকূটকে নামিয়ে দিয়ে এদেলবায় চলে গিয়েছে। আর তাই সুরসতিয়া কালকূটের দেওয়া সিগারেট নেয় নি; ওর দিদি সোমারি বলেছে এদেলবায় গেলে ''তব পিয়েগা''।

'মন চল বনে' কাহিনী কালকূটের চারদিনের বনভ্রমণের মধ্যে দিয়ে ভিন্ন বনের ভিন্ন রূপ ও বনবাসীদের ভিন্ন ভিন্ন জীবনাচরণের চিত্র আঁকতে আঁকতে ভ্রমণকাহিনী কথাসাহিত্যের দিকে মোড় ঘুরিয়েছে। টুকরো টুকরো সব ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে যেসব চরিত্র উঠে এসেছে সেইসব চরিত্র ঘটনা পরম্পরায় পর পর যুক্ত হয়ে একটি নিটোল কাহিনীর রূপ নিয়েছে।

রেলগাড়ির কামরা থেকে শুরু করলে দেখা যাচ্ছে যে চরিত্রগুলো যেসব ঘটনার মধ্যে দিয়ে, তাদের কথপোকথনের মধ্য দিয়ে, সেইসময় ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে উঠে এসেছে যে তাদের চরিত্রচিত্রণ যথাযথ হয়েছে। প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে প্রত্যেকটি ঘটনা অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে

চিত্রিত করেছেন।

গাঙ্গুলিমশাই সপরিবারে কালকূটের সহ-রেলযাত্রী। রেলগাড়ির চিত্র, স্টেশনের চিত্র, বনবাসী-বনবাসিনী রেলযাত্রীদের আচার আচরণ সব কিছু উঠে এসেছে। বনবাসী-বনবাসিনীরা সিগারেট খেতে ভালবাসে, সেটা কালকূট ট্রেনের মধ্যেই কৌতুকের ছোঁয়া মিশিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। অচেনা মানুষের কাছ থেকে সিগারেট চাইতে তারা সঙ্কুচিত হয় না। আটপৌরে সাদামাটা খরখরে ভাষায় কথা বলা গাঙ্গুলি মশাই-এর অন্তঃকরণ যে বনময়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই যে তাঁর মধ্যে প্রকৃতি প্রেম জাগ্রত করেছিলেন, সেই গাঙ্গুলি মশাই-ই কালকূটের বনভ্রমণকে বনের রসে জারিত করেছেন। তিনি তাঁর অন্তরভূমিতে প্রকৃতি প্রেমের বীজটি বপন করেছেন। নিতুদের বাড়িতে নিতু কালকূটকে বন চিনিয়েছে, সেইসঙ্গে আদিবাসীদের জীবনাচরণের কথা জানিয়েছে। কালকূটের বনচিত্রে এসেছে প্রতিবাদী, সংস্কারপন্থী জেমা। আর বনের সীমানার বনকন্যা। তিপুর চোখ দিয়ে কালকূট বন দেখা, বনের গা ছমছম করা পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত ও একাত্ম হওয়া, কোয়েলের জলে স্নান করা ইত্যাদির মাধ্যমে বনপ্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধকে আস্বাদন করার ইচ্ছা পূরণ করেছেন।

তিপুর কথাতেই উইলিয়ম সাহেব বাড়িতে 'মদগম' খাওয়া। সিংজী মোহনবাবু গোপালবাবুর সাহচর্যে বনভ্রমণের সূচি তৈরী করা, লরিতে করে ছোটনাগরা যাওয়ার পথে সোমারি-সুরসতিয়াকে দেখা, অবশেষে তৃপ্তি ভৌমিক-এর সঙ্গে বনকে দেখা ও বনজীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সবকিছু গতিময়তার সঙ্গে কাহিনীর মধ্যে উঠে এসেছে।

তিপু কালকূটকে বনে প্রবেশের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে। সোমারি ও সুরসতিয়া, বিশেষত সুরসতিয়া বনপথের সঙ্গী বনবাসীদের সিগারেটের নেশাকে স্থায়িত্ব দিয়েছে। গান বেঁধে গুনগুন সুর তুলে বনযাত্রার একঘেয়েমি দূর করেছে। ক্ষণিক যাত্রায় ঝলকে উঠে যাত্রাপথকে আলোকিত করেছে। আর ছোটনাগরায় তৃপ্তি ভৌমিক বনভূমির নির্জনতার মধ্যে ধুলা লাগা গালে রক্তকুসুমের আগুনে নিজেকে আলোকিত করেছে। কালকূট বনভূমির সঙ্গে পরিচিত বন্ধুত্বের বন্ধনে ধরা পড়েছে। বন্ধুত্বকে স্বীকার করেছে ঠিকই, কিন্তু সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগেই বিদায়ের সুর। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কালকূট তাঁর এই নির্লিপ্ততা বজায় রেখেছেন। তিপু, সুরসতিয়া ও তৃপ্তি ভৌমিক— এই তিন নারী চরিত্রের বন্ধনে ভ্রমণকাহিনীটি ক্রমশ উপন্যাসের পূর্ণতার রূপ পেয়েছে।

প্রকৃতির টানে বনভ্রমণের দ্বিতীয় কাহিনীটি হল **'বনের সঙ্গে খেলা'**। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৯ বঙ্গাব্দ) 'নবকল্লোল' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায়। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে (১৩৮০ বঙ্গাব্দ) 'বিশ্ববাণী প্রকাশনী' থেকে।

উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল : 'স্বর্গত বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়-এর স্মরণে যাঁর পদচিহ্ন ধরে বনের মনকে স্পর্শ করতে চেয়েছি' *(পৃ: ১৩৮১, কালকূট রচনা সমগ্র, ৩য় খণ্ড)* ছোটনাগরা থেকে এদেলবা পর্যন্ত বনভ্রমণে গিয়ে নিজেকে বনজীবনেরই অংশীদার করে তুলতে চেয়েছেন। বনবাসী-বনবাসিনীদের সঙ্গে বনরীতির খেলায় মেতে ডিয়েং পান করে নৃত্যগীতে অংশ নিয়ে তাদেরই মত নিজের জীবনটা বন্য করে তুলেছিলেন। বনবাসিনী সুরসতিয়ার প্রেমে বন্য হয়ে বৃহৎ জলাশয়ে মাতৃপূজায় ব্রতী হয়েছেন, পুজো শেষে বন্যপ্রকৃতির কোলে সুসতিয়াকে রেখে আরো নিবিড় বনের দিকে এগিয়ে গেছেন। প্রেমকে অধরা রেখে নিজের বন্যপ্রেমকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বনের সংসারে 'নবজাতক' কালকূট তিপুর সান্নিধ্যে বনকে চিনেছেন। তিপুর তার 'বনধাত্রী'। এরপরে লেখক 'বনের সঙ্গে খেলতে' এসেছেন। এখন 'বনের সঙ্গে খেলা'য় লেখক কিভাবে খেলেছেন সেটা আলোচনা করা যাক্।

লেখক কাহিনীর প্রায় প্রথমেই বলেছেন ''ঘর ছাড়ার কি কোন খেলা আছে? আছে বোধহয়। নানা রূপের নানা খেলা, নানা সময়ে। বন আমাকে খেলতে ডেকেছে, তাই আমি বনে ছুটে এসেছি। আমি তাপস নই, তপশ্চর্যা করতে আসিনি। আমার জ্ঞান নেই, তবে আমার কিসের ধ্যান? না, আমার কোনো ধ্যান নেই যে, গভীর বনের মহীরুহের তলে ধ্যানে বসব। আমার একটা ধ্যান আছে, খেলা। অরণ্য আমাকে খেলতে ডেকেছে, তার নিবিড় গভীর রূপসাগরে। এ খেলার নিয়মকানুন, সব আমার জানা নেই। খেলতে খেলতে জানব। জানতে জানতে খেলব। সে আমাকে যেমন করে খেলা দেবে, আমি তেমনি করে খেলব। খেলতে খেলতে আঘাত যদি লাগে, চোখের কুল ছাপিয়ে জল আসে, খেলার কানুন মেনে চলব।

সেই খেলা খেলতে এসেছি, তার আগে, ঘরের খেলার দান দিয়ে আসতে হয়েছে। এখন বনের খেলা।

বনের নাম সারেন্ডা খণ্ড।

ধলভূমগড় পেরিয়ে এসে, ছোটনাগপুরের সীমানায়। প্রথম এসে য়ে ইস্টিশনে নেমেছিলাম, তার নাম জরাইকেলা।'' *(পৃ: ৭১৫, কালকূট রচনা সমগ্র, ১ম খণ্ড)*

এই বনসীমানার গা ঘেঁষে এই জরাইকেলা। কাহিনীর প্রথমে তিনি 'মন চল বনে'র সংক্ষিপ্ত একটি পরিচিতি দিয়েছেন। সারেন্ডারেঞ্জের বনভ্রমণের পূর্ববর্তী চারদিনের বনভ্রমণের সঙ্গে পরবর্তী ভ্রমণের যোগসূত্র রাখার জন্য এই আলাপ।

জরাইকেলা আসার পথে ট্রেনে 'যশোরিয়া টানে'র অদ্ভুত স্বভাবের গাঙ্গুলী মশাই লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কথা প্রসঙ্গে গাঙ্গুলি মশাই জানতে পেরেছেন লেখক জরাইকেলায় যাদের বাড়িতে অতিথি হবেন তারা গাঙ্গুলি মশাইদের বিশেষ' পরিচিত, ঘনিষ্ঠতা আছে। কথায় কথায়

বলেছিলেন "বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় --- নাম শুনেছেন তো, সেই যে বই লিখতেন, তিনি আমার জরাইকেলার বাড়িতে দুই রাত বাস করেছিলেন।"*(পৃ: ৭১৬, ঐ)* কথাটা শুনে লেখক বিস্ময়ে চোখ ফেরাতে পারেন নি। লেখকের মনে হয়েছে "উনি যে তীর্থক্ষেত্রের মান্দররক্ষক পূজারী।"*(পৃ: ৭১৬, ঐ)* এই তীর্থক্ষেত্রের পূজারীর বাড়িতে লেখক গিয়েছিলেন তিপু আর নিতুর সঙ্গে এবং ওদের সঙ্গে কোয়েলের ধারে গিয়ে কোয়েল আর বনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ। কোয়েলের একটা বাঁকের মুখে দেখেছিলেন প্রায় নগ্ন একটি লোক নদীর চরে খোঁচাচ্ছিল, এরা 'সোনাখোঁচা'। সারাদিনের পরিশ্রমে দু'সের বালি তুলে এনে দিলে শেঠের কাছে সের প্রতি চার আনা করে পায়। কি অবিচার, লেখক অত্যন্ত সংবেদনশীল মন দিয়ে সোনা খোঁচাদের দুরাবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়িতে তিনি দেখেছিলেন কোথায় বিভূতিবাবু বসতে ভালোবাসতেন। এখানে বসে বসে, চুপ করে বনের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। লেখক গাঙ্গুলিমশায়ের সঙ্গে কথা বলতে বুঝেছিলেন "গাঙ্গ ুলিমশাই অরণ্যপ্রেমিক নন, অরণ্যেরই আর একটি মনুষ্যরূপী সত্তা।"*(পৃ: ৭১৮, ঐ)* লেখক গাঙ্গ ুলিমশাইকে আগে চিনতে পারেন নি। মনে মনে বলেছেন, "নমস্কার অজানাকেই। প্রণাম অপরিচয়ের বিস্ময়কে।"

গাঙ্গুলিমশাইয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে তিপুর হাতের রান্না কোয়েলের স্বাদু মাছের ঝাল খেয়েছিলেন। তারপরে তিপু ও নিতুর সঙ্গে সামটা ব্লকের বনে বনে ঘুরে বেরিয়েছিলেন। এই জরাইকেলাইতেই ওদের সঙ্গে গিয়ে আলাপ হয়েছিল উইলসন সাহেব সহ বিরাট ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার সিংজী ও ইজারাদার মোহনবাবুর সঙ্গে। বনের সীমারেখায় বনকে পরিচিত করিয়েছিল তিপু ও নিতু। আর নিবিড় অরণ্য ভ্রমণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সিংজী।

সিংজীরই নির্দেশিত পথে মোহনবাবু সঙ্গে লেখক গভীর বনের দিকে এগিয়ে যান। চলে আসার সময় তিপুর চোখ ঝাপসা হয়ে আসায় লেখক তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে ফেরার সময় জরাইকেলা হয়ে যাবেন। বনের পথে যেতে যেতে লেখক ভাবছেন "বনের সঙ্গে খেলতে খেলতে, কোথা আমার সেই খেলা সাঙ্গ হবে, এখন আর আমি তা জানি না। কে জানে, তিপুর কাছে হয়তো চিরদিনের জন্য মিথ্যুক হয়েই থাকতে হবে।"*(পৃ: ৭১৮, ঐ)*

লেখককে ছোটনাগরায় নামিয়ে দিয়ে মোহনবাবু চলে যায় এদেলবায়। ছোটনাগরায় কোয়েলা নদীর ধারে "বন যেখানে সাত রঙে সেজে, আমার চারপাশে" তৃপ্তি ভৌমিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

প্রথম আলাপেই তৃপ্তি ভৌমিক, বিহার সরকারের হেলথ সেন্টারে নার্স, জঙ্গলের ভিতরে উপুড় করা নাকাড়া দুটি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল এবং নিজের লালমাটির গৃহাঙ্গনে নিয়ে গিয়েছিল। লেখক বলেছেন, "সারেন্ডা অরণ্যে গভীরে, একটি বাঙালী মেয়ের হাতে, বাঙালী খাবার জুটবে,

সেটা আশাতীত।'' *(পৃ: ৭১৯, ঐ)*

তৃপ্তি ভৌমিকের কাছে বন ও বনবাসীদের নানাকথা শুনতে শুনতে এই বনবাসীদের জীবনাচারে নিজেকে ঋদ্ধ করেছেন। লেখক তৃপ্তি ভৌমিকের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন বনবাসীদের দারিদ্র্য ক্ষুধা আর ব্যাধির কথা। ডাক্তারের দেখা মাসে একবারও পাওয়া যায় না, কঠিন ব্যাধির চিকিৎসা তৃপ্তি করতে পারে না। মাসে একদিন জামাদায় গিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র নিয়ে আসে।

থোকা থোকা লাল রঙের মধুফুল, লেখক তৃপ্তির চুলে গুঁজে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেন নি একটু সংকোচ হয়েছিল। ''ওর শ্বেত সিঁথি কি কোনদিন রক্তিম হবে না? জীবনটা কি কেবল জীবিকার সন্ধানে কেটে যাবে?'' *(পৃ: ৭১৯, ঐ)* গভীর অরণ্যে তৃপ্তি ভৌমিকের উপস্থিতি যেন লেখকের বনমুগ্ধ মনে নাগরিক চেতনার পরশ। বনজীবনে নাগরিক বোধ উঁকি দিয়ে সচকিত করেছে লেখককে। তৃপ্তি ভৌমিকের একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা লেখকের সাহচর্যে দুরীভূত হয়েছে। এক আশ্চর্য ভালোলাগায় তৃপ্তি ভৌমিক তিলুয়া ফুলের গন্ধের মতো বিমোহিত হয়েছে। তিনি তৃপ্তি ভৌমিক লেখকের সঙ্গে এদেলবায় যেতে চেয়েও যেতে পারে নি সেদিন। লেখকের চোখ দিয়ে উঠেছে বনজীবনে বনবাসীর প্রতি কর্তব্যবোধ। নিরাশায় ছলছল চোখে 'নবজাতকের আহ্বানে' সাড়া দিয়ে তৃপ্তি ভৌমিক। 'এদেলবা' অর্থাৎ শিমূল ফুল বনভূমিতে যাওয়া হল না। বদরিকা প্রসাদ লেখককে নিয়ে এদেলবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। শিমূল ফুল গ্রামে বনবাসী-বনবাসিনীদের এবার খেলা শুরু হবে।

'বনের সঙ্গে খেলা' বনভ্রমণ কাহিনীর এই পর্যন্ত 'মন চল বনে'র পুনরাবৃত্তি। যেহেতু 'মন চল বনে' তিনি লিখেছেন 'বনের সঙ্গে খেলা'র এক বছর আগে সেইহেতু পাঠককুলকে বনসীমা ও বনমধ্যে প্রবেশের প্রাক্কালে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী ও সারেন্ডারেঞ্জের বনভূমির জীবনাচারের ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দিতে এই দ্যোতনা। এছাড়াও আরও একটা উদ্দেশ্য নিয়েও লিখে থাকবেন, যে সকল পাঠক 'মন চল বনে'র রস আস্বাদন করেন নি, তাঁদের মধ্যে সেই রস সঞ্চারিত করা। গাঙ্গুলিমশাইয়ের মুখ দিয়ে লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। অরণ্য ভূমিতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন যোগীপুরুষ। তাঁর অরণ্যচেতনা গাঙ্গুলী মশাইয়ের মধ্যে জাগরিত হয়েছিল। গাছের হাসি কান্না, কথা সবই বোঝেন গাঙ্গুলিমশাই। গাছেরা সজীব এই বোধে তিনি ইজারাদারিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন। গাঙ্গুলিমশাইয়ের অপরাধবোধ ''অনেক প্রাণী হত্যা করেছি, আর পারলাম না। চোখের সামনে, জ্যান্ত প্রাণীগুলোকে হত্যা হতে দেখে, আর সইতে পারি নি। আমি তাদের কান্না শুনেছি, অনেক অভিশাপ কুড়িয়েছি, আর না।'' *(পৃ: ৭১৭, ঐ)* নিপুণ কথাশিল্পী ছোট ছোট ঘটনা কথার মধ্যে দিয়ে ট্রেনের গতির মতোই কাহিনীকে অরণ্যের রং বাহারের মতো সজীব করেছেন। কোয়েলার মত গতি দিয়েছেন তিপু আর

নিপু চরিত্র দুটিতে। ওরা যেন অরণ্য প্রকৃতির আর এক সত্তা। লেখকের মনকে ধীরে ধীরে অরণ্যমুখী করে তুলতে এই দুটি চরিত্রের, একটি কিশোরী ও আর একটি সদ্য তরুণ, অনবদ্য প্রশংসা বনের প্রান্তসীমায় থেকে বনভূমির রূপ-রস-গন্ধে লেখককে অরণ্যসত্তাকে জাগরিত করেছে। আর একদিকে উইলসন সাহেব, ডি. এফ.ও ছিলেন। বনে কাজ করতে করতে মুন্ডা, ওঁরাও-দের অতিরিক্ত মেলামেশা করতে করতে বনের মায়ায় বশীভূত হয়ে গেছেন। মুন্ডা বৌ, ফুটফুটে বাচ্চা নিয়ে মাটির ঘরে সুখে দিন কাটাচ্ছেন আর 'মদ্‌গম্' অর্থাৎ মহুয়ার রসে মাতোয়ারা হয়ে যাচ্ছেন। সিংজী, এই বনের 'রইস আদমি। দিলদার মানুষ। গভীর বনের ছোট্ট লোকালয়ে বিদেশের শ্রেষ্ঠ সুরা পান করছেন, অন্যকেও পান করান। সৌখিন মানুষ। মোহনবাবুর সঙ্গে সিংজীর সখ্যতা আছে। লেখকের গভীর বনভূমিতে প্রবেশের সবরকম ব্যবস্থা সিংজী করেছেন। কাহিনীর প্রয়োজনে এই চরিত্রগুলি উঠে এসেছে যা কাহিনীকে সমৃদ্ধ করেছে। যা জানতে সাহায্য করেছে অরণ্য প্রকৃতির মধ্যে বসবাসকারীদের জীবনের চালচিত্র। আর বনমধ্যে নার্স তৃপ্তি ভৌমিক লেখকের কাছে মুগ্ধ বিস্ময়। তিনি কপালকুন্ডলার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন যেন বিস্ময়ের ঘোরে। তার কথা শুনে লেখক কালকূটের মনে হয়েছিল "তবে নাকি বাঙালীরা কর্মে বিদেশ বিমুখ। তৃপ্তি ভৌমিক যেন, তারই একটি নীরব কিন্তু অত্যন্ত বাস্তব প্রতিবাদ।" *(পৃ: ৭১৫, ঐ)* ছোট ছোট ভাইবোন আর বিধবা মায়ের দায়িত্ব এবং বনমধ্যে বনবাসীদের ব্যাধিমুক্ত করার নিরলস প্রয়াস। বনমধ্যে খেলতে যাওয়ার আগে নাগরিক চেতনার অনুভূতি তৃপ্তি ভৌমিকের মধ্যে জাগরিত। বনভ্রমণের সঙ্গে মানবজীবনের জীবনাচারের বিচিত্র সব ঘটনাবলী কালকূটের চোখে ধরা পড়েছে। এবার কাহিনীর দ্বিতীয় অংশে প্রবেশ করা যাক্। এই অংশটিই 'বনের সঙ্গে খেলা'র মূল অংশ।

বদরিকা প্রসাদ লেখককে নিয়ে এদেলবার উদ্দেশে রওনা দিলেন। পিছনে পড়ে রইল কুসুমের রঙে আগুন ধরানো বনভূমি আর বেদনার রঙে রাঙা তৃপ্তি ভৌমিকের ছলছল আঁখি দুটি। পাহাড়ী পথে গাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় নীল পাহাড়কে পাশে রেখে। লেখক নীল পাহাড়ের নীলমাটি ছুঁয়ে দেখার জন্য গাড়ি থেকে নেমেছিলেন কিন্তু বাতাসে বাঘের গায়ের গন্ধ ভেসে আসায় তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসতে হয়। পথে যেতে যেতে বদরিকা প্রসাদ তার বনজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লেখককে শোনাতে লাগলো নিয়ে গেল। হাতির ভয়ে লেখকের অন্তঃস্থল কেঁপে উঠেছিল। বন্যপ্রাণী বিশেষত বন্য হাতি পথ আগলে দাঁড়াল পরিস্থিতি পরিবেশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। এইসব বলতে একটি দুর্ঘটনার কথা বলল। যার জন্য পাপবোধে সে দীর্ণ, একটা অপরাধবোধ তাঁকে প্রতিনিয়ত দংশাতে থাকে। বছর দুই সিংজীর অনুরোধে মদ্যপান করে পাহাড়ী পথে কদমপোদা থেকে সামটা অফিসে আসার সময় দুটো পাঁচ-ছয় বছরের শিশুকে ধাক্কা দিয়েছিলেন। তৎক্ষণাৎ শিশু দুটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। বদরিপ্রসাদ নিজেকে দোষী মনে

করে, মদ্যপান করার ফলেই সে জোরে গাড়ি চালিয়েছিল। লেখক বদরিকা প্রসাদের এই পাপবোধের মধ্যেও সুন্দরতা খুঁজে পেয়েছেন।

বদরিকা প্রসাদ লেখককে নিয়ে এদেলবায় অর্থাৎ শিমূল ফুল গ্রামে ঢুকলেন। মুন্ডা ভাষায় 'এদেল' মানে 'শিমূল' আর 'বা' মানে ফুল অতএব 'শমূলফুল গ্রাম'। এই গ্রামে শিমূল ফুলের বদলে কাঠালি চাঁপার আধিক্য বেশি। ফুলে ফুলে এদেলবা রঙিন। মোহনবাবু পাতার ছাউনিতে যেতে যেতে দেখলেন গ্রাম্য প্রকৃতি আর অরণ্য প্রকৃতি একাকার। বন পাহাড়ের গা ঘেঁষে কোয়েনা নদী। তার জলে ছায়া পড়েছে পাহাড় ও বিরাট বিরাট বনস্পতির। আশ্চর্য এক স্বপ্নময় পরিবেশ লেখকের কাছে। রূপমুগ্ধ লেখক ঘোরের মধ্যে আছেন। মা শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছে দেখে তাঁর মনে হয়েছে "যেন কচি ঘাসের মাঠটিতে গোবৎস চরে বেড়াচ্ছে।"*(পৃ: ৭২৩, ঐ)* যেতে যেতে দীর্ঘ পুচ্ছওয়াল ময়ূর দেখে লেখক কালকূট উত্তেজিত। লেখক কয়েকবার ধরতে চেষ্টা করেও ধরতে পারলেন না। বনমধ্যে এই ময়ূর দেখে লেখকের ভাবনা উঠে এসেছে এইভাবে, "ময়ূর তো নয় এ যেন মায়ার হরিণ। স্বর্ণ মারীচ। কয়েক মুহূর্ত হতাশ চোখে অপরূপ ময়ূরটির দিকে তাকিয়ে থাকি, তারপরেই নিজের বালখিল্যতায় নিজেই হেসে উঠি। কেন মাতি এই ধরাবাঁধার খেলায়? আমার হাতের পাঞ্জায়, বুক চেপেও যদি আদর করে ধরি, পাখিটির সেই বন্দীদশার রূপটিই আসল না। বনের এই অঙ্গনে, এই যে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাদ্য খুঁজছে, এটাই আসল রূপ। যার যেখানে ঠাঁই। আমার নিতান্ত মানুষিক লোভ, সুন্দরকে অসুন্দরই করবে।" *(পৃ: ৭২৩, ঐ)*

মোহনবাবুর গুঁইয়া অর্থাৎ পাতার ছাউনিতে মোহনবাবুর কাজের লোক হোরো ছাড়া আর কাউকে দেখতে না পেয়ে যেখানে গাছ কাটা হচ্ছে, সেখানেই তারা গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন। গাড়ি থামিয়ে একটি ছোট নালা পেরিয়ে কয়েকশো ফুট ওপরে সন্তর্পণে উঠে গেলেন। অনেকগুলি লোকের চিৎকারের সঙ্গে মূল থেকে গাছের গুঁড়ির বিচ্ছিন্ন হওয়ার শব্দ মিশে গেল। লেখককে দেখে কাজের গতি থেমে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর আবার সেই বৃক্ষমেধ যজ্ঞ। মোহনবাবুও গাছ কাটার তদারকিতে ব্যস্ত। হঠাৎ একটা গানের সুর ভেসে আসতেই সেদিকে দৃষ্টি দিতেই একটি মেয়েকে দেখতে পেলেন। "সে একবার যেন ঘাড়ও দোলালো, তারপরে খিলখিল করে হেসে। কষ্টিপাথরের শরীরে, প্রাণ-সঞ্চারি লহরি তুলে, কাটারি দিয়ে মহীরুহের ডালপালা কাটতে লাগল।" *(পৃ: ৭২৩, ঐ)*

জরাইকেলা থেকে ছোটনাগরা যাওয়ার পথে মোহনবাবু লরীতে তুলে নিয়েছিলেন রেজা, সুরসতিয়া ও তার দিদি সোমারি এবং কুলি শুক্রমকে। লেখক লরীর পেছনে বসে মনে হয়েছিল কোনো মন্দিরের মূর্তি। লেখকের হাতে সিগারেট দেখে ওদের খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল তাই গুণ গুণ করে গান গাইছিল। ইজারাদার মোহনবাবু মোটর মেকানিক সুরীনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন

গাড়ির কাজ করবার জন্য। বর্ষাকালে, জুন, জুলাই ও আগস্ট গাছ কাটা বন্ধ থাকে তখন আরো অন্য মিস্ত্রী আনিয়ে গাড়িগুলিকে সারাই করা হয়। সুরীন সুরসতিয়াদের গানের ভাষা লেখককে বুঝিয়ে দিয়েছিল। সোমারি-সুরসতিয়া তাৎক্ষণিক গান বাঁধতে জানে।

ছোটনাগরা লেখককে নামিয়ে দিয়ে বাকী যাত্রীদের নিয়ে লরী এদেলবায় চলে যায়। বনের মধ্যে ডালপালার আড়াল থেকে হরিণীর মতো সুরসতিয়া লেখককে দেখছিল, হঠাৎ করে তিনি চিনতে পারেন নি। একথা সুরসতিয়া গানে গানে জানিয়েও দিয়েছে বদরিকা প্রসাদকে। বন ঘুরে দেখার আগে মোহনবাবু সুরসতিয়ার সঙ্গে দেখা করে যেতে বললেন। লেখক সুরসতিয়ার কাছে যাওয়ার আগেই সুরসতিয়া গাছের ডালপালা কেটে সরিয়ে লেখকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। খোঁপায় ছিল সাদা ফুলের সঙ্গে কচিপাতা। বনকন্যা লেখকের সামনে দণ্ডায়মান, খুশিতে ঝলমল করছে। সন্ধ্যায় আবার দেখা হবে 'গাড়া কিনারা গুঁইয়োতে মে'। *(পৃ: ৭২৮, ঐ)* এইসব কথাবার্তা বলে লেখক বনের অন্যদিকে চলে গেলেন। কিন্তু বনবাসী মেয়েরা লেখককে দেখে হাসাহাসি করতে লাগল। লেখক এগিয়ে যেতে ফরেস্ট গার্ড, চিকো, পাহাড়ের গায়ের দিকে যেতে নিষেধ করল "মারাং হোরে রহনে সকতা।" *(পৃ: ৭৩০, ঐ)* হাতিকে বনবাসীরা 'মারাং হোরে' বলে।

বদরিকা প্রসাদ ও মোহনবাবু কথাটির সত্যতা স্বীকার করে বলে বলেছিলেন যে, ওদিকটা কোয়েনা চওড়া, একটা ন্যাচারাল দীঘির মত আছে, সেখানে হাতিরা স্নান করে। এছাড়া ওদের মর্জির কথা কিন্তু বলা যায় না। ক্ষ্যাপা হাতির আক্রমণের গল্প বলে লেখককে সতর্ক করেছিলেন। "পালিয়ে যাবার আগেই হয়তো দেখা যাবে, সে নিঃশব্দে একেবারে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।" *(পৃ: ৭৩০, ঐ)* এইরকমই হাতির আরও নানারকম গল্প করতে করতে মোহনবাবু পাতার ঘরে ফিরে এসেছিলেন।

পাতার ঘরের কাছেই ময়ূরের ডাক শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এক তপোবনের মত সুন্দর জায়গায় দাঁড়িয়ে ময়ূরের ডাক লেখকদের কল্পনাপ্রবণ মনকে হাজার হাজার বছর আগে মুনি-ঋষিদের তপোবনে নিয়ে গেল। কল্পনায় মন রোমাঞ্চিত। "তারা হয়তো এখানেই তপস্যা করতেন। শকুন্তলা, তার সখী প্রিয়ম্বদার মতো ঋষি-কন্যারা, এই তপোবনে হয়তো বিচরণ করতেন। আর তাদের সঙ্গে পাশে পাশে ঘুরে বেড়াতো ময়ূর হরিণেরা। আমাকে এই বন সম্মাহিত করলো, না, আমি নিজে আত্মসম্মোহিত হলাম, জানি। কোয়েলার তীরে হাঁটতে হাঁটতে, আমি ছায়াছন্ন গভীর বনের মধ্যে চলে গেলাম।" *(পৃ: ৭৩২, ঐ)*

মোহনবাবু ও বদরিকা প্রসাদ লেখককে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। বনে পথ হারিয়ে গেলে পথ খুঁজে বনে বাইরে বের হওয়া দুরূহ ব্যাপার। সুরীনের রান্না করা মসলা মাখানো মুরগি, গরম ভাত ডাল, আলু ভাজা খেয়ে বিশ্রাম করে আসন্ন সন্ধ্যায় দেখলেন বনবাসীরা সব পাতার ছাওয়া

ঘরে ফিরে নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সোমারি-সুরসতিয়া সহ অন্য মেয়েরা জল ছিটিয়ে, জড়াজড়ি করে স্নান করছে। সুরসতিয়া জল থেকে হাত নেড়ে তার খুশির অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছিল। লেখক ক্রমশ সুরসতিয়ার প্রতি টান অনুভব করছেন। স্নান সেরে মোহনবাবুর কাছে চাল নিতে এসে মেয়েরা হাসি-গানে মজা করছে, গানে গানে মজাটা করছে লেখক কালকূট আর সুরসতিয়াকে নিয়ে। তিনি বুঝতে না পারায় সুধীন বুঝিয়ে দিলো। মেয়েরা লেখককে নাচ দেখাবে এই শর্তে "হমলোগকে ডিয়েং পিয়ানে হোগা, সিগারেট ভি দে হোগা।" *(পৃ: ৭৩৫, ঐ)*

লেখক ওদের এক টিন সিগারেটও দিয়েছিলেন মোহনবাবুর নিষেধ সত্ত্বেও। সুরসতিয়া "জিজ্ঞেস করলো, 'তুম ভি হমারা সাথ্ নাচে গা'? বললাম, 'হম নাচ নহি জানতা।' সুরসতিয়া ওর বুকের দিকে চিবুক ঝুঁকিয়ে দেখিয়ে বললো, 'হম তুমকো শিখায়েগা।' সুরসতিয়ার কৃষ্ণ ডাগর চোখের দিকে তাকিয়ে, মনে হয়, আমি যেন কোন্ দূরের অতলে ডুবে যাই। বললাম, 'তব হম নাচেগা।' সুরতিয়ার চোখের ঝিলিক যেন ওর অঙ্গে লেগে গেল"

বনের আকর্ষণে ও লেখক মোহগ্রস্ত হয়ে কোয়েনার ধারে বসেছিলেন। রাতের আঁধারে আগুনের শিখার ধারে নারী-পুরুষের ছায়া মূর্তিগুলিকে দেখে লেখকের মনে হচ্ছে "মন্দিরের গা থেকে প্রাচীন শিল্পীর প্রস্তর মূর্তিগুলো প্রাণ পেয়ে নেমে এসেছে।" *(পৃ: ৭৩৬, ঐ)* সেই মূর্তিগুলির কাছে গিয়ে সোমারিকে দেখতে পেলেন। সোমারির কাছেই তিনি জানতে পারলেন— ওরা শুধু নমক আর ভাত খায়। মাঝে মাঝে ঝিনুকের ভেতরের 'রক্তিম একটি ছোট ড্যালা' ভাতের ভেতরে সেদ্ধ দিয়ে খায়, শুধু ওরা নয়, সবাই-ই খায়'। লেখক এক অনির্বচনীয় মুগ্ধতায় বোবা হয়ে যান আর ভাবেন এত দৈন্যের মধ্যেও এরা মুখের হাসিটি কেমন করে বজায় রাখে। বনজীবনের বনবাসীদের জীবনাচারের একটি নির্মম সত্য তুলে ধরেছেন। সোমারি বুক উদাস করে বলছে "ডাল? ভাজি? কঁহা মিলেগা?" *(পৃ: ৭৩৬, ঐ)*

উনানের আগুনের কম্পিত শিখার মধ্য দিয়ে সুরসতিয়া আবার লেখকের সামনে এসে লেখকেরই দেওয়া সিগারেটটি প্রায় লেখকের মুখের কাছে তুলে দিয়েছিল। সিগারেটে কৌটোটিতে সে 'পুনহার' যখন কিনবে তখন রেখে দেবে। মাংরির আছে ওর নেই, পুনহার হলো 'পুঁতির হার'। এমনি সব কথাবার্তা চলতেই "সুরসতিয়া আমাকে ঘাড় নেড়ে, কৃষ্ণ চোখের ইশারা করে ডাকলো, পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করল।" *(পৃ: ৭৩৬, ঐ)* কালকূট প্রেমে পাগল হয়েছেন কিনা বুঝতে পারলেও মন্ত্রমুগ্ধ যে হয়েছেন, এটা বুঝতে পেরেছেন। "আমার সাতবহিনি সাতপরী দেখছি একলা সুরসতিয়া নিজেই।" *(পৃ: ৭৩৬, ঐ)* বড় পাতা ছাওয়া ঘরে সুরসতিয়া ও মাংরি কালকূকে নিয়ে এলো। ঘরের একদিকে এক শুড়িনীর কাছে তারা এসে মাটিতে বসে পড়ল। সুরসতিয়ার চোখে সেই আদিম মন্ত্র যা তঁকে সম্মোহন করছে। কালকূটের কোলের উপরে হাত রেখে "ডিয়েং পিয়েগা

না?" *(পৃ: ৭৩৮, ঐ)* লেখক ভাবছেন "বনের ডাকে এসেছি বনের সঙ্গে খেলতে। এই খেলাটা কী? বনের সঙ্গে খেলার সঙ্গে, বনবালার এই খেলাটাও অঙ্গাঙ্গী? কোথায় নিয়ে যেতে চায় সে আমাকে, কতদূরে। ওকি ওদেরই সাতবহিনির কেউ নাকি? বললাম 'কভি পিয়া নহি।'

সুরসতিয়ার ভুরু কাঁপলো, জিজ্ঞেস করলে। 'তুম দারু কভি নহি পিয়া?' দারু যদি সুরা হয়, তাহলে, অস্বীকার করার উপায় নেই, তার স্বাদ প্রতিক্রিয়া সকলই আমার জানা আছে।" *(পৃ: ৭৩৮, ঐ)* শুন্ডিনীকে ঘিরে যারা আছে তারা লেখক ও সুরসতিয়াকে নিয়ে বন্য এবং গ্রাম্য রসিকতা করতে করতে সুরসতিয়াকে বলল "সুরসতিয়া কুড়ি নাই কোট্‌রি হ্যায় কোট্‌রি।"*(পৃ: ৭৩৮, ঐ)*

একথা শুনে সুরসতিয়া লেখকের কোলের কাছে, জামা টেনে ধরে, লেখকের কাঁধের কাছে ওর মুখ চেপে ধরল। জনপদের বাসিন্দা লেখকের কাছে এ ব্যাপারটা একেবারে অভাবনীয় বলে মনে হয়েছে। "প্রেম কি এতগুলো বয়োজ্যেষ্ঠ নরনারীর সামনে হতে পারে? কিন্তু কোট্‌রি মানে কী?" *(পৃ: ৭৩৮, ঐ)* স্থান বিশেষে এদের ভাষার প্রয়োগে কালকূট মুগ্ধ। কুমারী মেয়েকে বিশেষণ দিয়েছে 'কোট্‌রী' অর্থাৎ যে মুরগী এখনও ডিম পাড়েনি। বনজীবনে বনবাসীদের সঙ্গে একআসরে বসে ওদের জীবনাচারের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চেয়েছেন চরিত্রগুলোকে বাস্তবমুখী করে তুলতে দু'একটি করে হিন্দি মিশ্রিত ভাষা বসিয়ে দিয়েছেন। যেমন এখানে বসিয়েছেন। এমনি হাসি-মস্‌করার মধ্যেই সুরসতিয়া 'ডিয়েং'-এর বাটি লেখককে দেওয়াতে তিনি দোটানায় পড়ে গেলেন। কিন্তু ডিয়েং পান করতেই হল, সকলেই তার দিকে তাকিয়ে আছে। মাংরি বলল, যে "কোই লেড়কি দেনে সে পিনে হোতা"*(পৃ: ৭৩৮, ঐ)* নইলে বন্ধুত্বের অমর্যাদা হয়। অতএব এক চুমুকে পান করে ফেললেন, বমি উঠে আসছিল, তবুও সামলে নিলেন। সুরসতিয়া নিজেও পান করে সিগারেট টান দিয়েছে। কিন্তু তারা বুঝতে পেরেছে লেখকের কষ্ট হচ্ছে তাই মাংরিকে সুরীনের কাছে পাঠিয়েছে কিছু ভাজি নিয়ে আসার জন্য। কালকূট বনবালার ইজ্জত রক্ষা করে ক্রমে ক্রমে দ্রব্যগুণের প্রভাবে মোহগ্রস্ত হতে শুরু করলেন। সুরসতিয়ার চোখের টানে মুগ্ধ হয়ে ওর হাত থেকে সিগারেট নিয়ে নিজের ঠোঁটে ছোয়ালেন। লেখক কালকূট নিজেকেই বলছেন "এখন আমি বনের তবে চলো বনের সঙ্গে, খেল বনের লীলায়।"*(পৃ: ৭৩৯, ঐ)* কালকূট সম্মাহিত হয়ে নাচের আহ্বান। সুরসতিয়া আর মাংরি দু'জনে মিলে লেখককে নাচ শেখাতে লাগল। সুরসতিয়া তাঁর হাতে জোরে চাপ দিয়ে বললেন "শক্ত করে ধরো, তা না হলে পড়ে যাবে।" *(পৃ: ৭৪১, ঐ)* কিন্তু অনভ্যস্ত লেখক কিছুতেই তাল মেলাতে পারছিলেন না। দুটি তরুণীর একটি জীবন্ত বোঝা হয়ে গেছেন। আর সুরসতিয়ার চোখেও আর সেই মন্ত্রমুগ্ধতা নেই, আছে গুরুর দৃঢ়তা। "সে নাচতে নাচতেই আমাকে, পায়ে পা দিয়ে মেরে, বলে দিতে লাগল, 'আগে দু'পা, পিছনে এক পা, ডাইনে

এক পা। সবসময় সামনে আর ডাইনে এগোবে। ডাইনে শেষ হলে বাঁয়ে ফিরে আসবে, একভাবেই। হ্যাঁ— চলো — চলে, আহ, পিছে হটো! আহ্ ডাইনে পা দাও।' হায়, এবার ঈশ্বরকে স্মরণ করা ছাড়া, উপায় দেখি না।'' *(পৃ: ৭৪১, ঐ)*

অবশেষে লেখক কালকূট নাচ থামিয়ে ওদের জানালেন যে আগে দেখবেন, পরে নাচার চেষ্টা করবেন। কিছুক্ষণ পরে সুরসতিয়া আবার টেনে নিয়ে গেল। সুরীন এসেছিল, ভাজা জাতীয় জিনিষ নিয়ে, সেও তাকে উদ্ধার করল না। আর সব থেকে মর্মান্তিক ঘটনা হল ''ও সকলের সামনে, অনায়াসে, ওর প্রতিমা বক্ষের ওপর আমার হাতটি চেপে ধরলে। এ রাত্রি আরণ্যক, নরনারী সকলেই আরণ্যক। কিন্তু আমার আরণ্যক ওয়ে ওঠার অর্থ আলাদা। কী বিষম পরীক্ষা! আমার ঊর্ধ্বে আমি কেমন করে যাবো? আমার প্রতিক্রিয়া যে অনিবার্য।'' *(পৃ: ৭৪২, ঐ)* লজ্জায় লেখকের মাথা নত হয়ে যাচ্ছে অথচ সুরসতিয়ার কোনো লজ্জার রেশ নেই। লেখককে কঠিন বেষ্টনে জড়িয়ে ধরেছে, একদিকে সুরসতিয়া আর একদিকে মাংরি। কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর এই প্রাণান্তকর অবস্থা থেকে প্রায় জোর করে মুক্তি নিতে হল মাংরির সহায়তায়। কালকূট বলেছেন জনপদে যে আচরণ অকল্পনীয় তাই এই অরণ্যভূমিতে স্বাভাবিক। বহুলোকের সামনে অনায়াসেই করা যায়। তাদের জীবনাচারে এটা স্বাভাবিক। যে সুরীন, জরাইকেলা থেকে এসেছিল, সেও মজা পেয়েছে। মোহনবাবুও রসিকতা করতে ছাড়েন নি। সবাই বনভূমির বনাচারের সঙ্গে তাল মিলিয়েছে।

নাচ শেষে সুরসতিয়া কালকুটকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে যায়। সেখানে ঘনিষ্ঠভাবে বসে থেকে উনি জানতে পারেন শহরের লোককে ওরা 'দীখু' বলে। দীখুদের ওরা ভাল চোখে দেখে না। এক দীখু তাকে জোর করে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কয়েক মাস আগে। বান্ডামুন্ডা আর রুরকেলায় বহু মেয়ে চলে গেছে অন্যরকম জীবনে, তারা আর ফিরে আসে নি। কালকূট নিজেও এইরকম ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন বান্ডামুন্ডায়। বনবাসীদের সরলতা হারিয়ে গেছে শহরের চাকচিক্যে, জৌলুষে। সুরসতিয়া কালকূটের সঙ্গে এই বিশ্বাসে এসেছে যে তিনি অন্যরকম। এছাড়া এই যে, সে লেখকের সঙ্গে একাই এসেছে, সকলেই দেখেছে, এটা কোনো দোষের ব্যাপার নয়। জোর করে ধরে আনলে 'কান্ডেয়র' লেখককে কুড়াল দিয়ে মারতে আসত। কান্ডেয়র সুরসতিয়াকে বিয়ে করতে চায়। এই অরণ্যসমাজে নারীর অধিকারই প্রথম বিবেচ্য। ''সমাজের চেহারাটা এমনই, পুরুষ কিছু না দিলে, তার পৌরুষ প্রমাণিত হয় না। হয় তো সমাজের আর দশজনের কাছেও নিজেকে হেয় মনে করে।'' *(পৃ: ৭৪৫, ঐ)* কান্ডেয়র এই অন্ধকারের মধ্যে যে তাদের লক্ষ্য করছে এটা সুরসতিয়া জানে। কিন্তু ও কাকে বিয়ে করবে সেটা সুরসতিয়া নিজেই ঠিক করবে। সুরসতিয়া বলছে ''তোমাকে আমি যখন প্রথম দিন দেখেছি, তখনই তোমাকে

আমার ভাল লেগেছিল।" *(পৃ: ৭৪৪, ঐ)* অনেকটা অন্ধ সারল্যের মত সুরসতিয়া তার ভাবনাটা বলে দিল "আমাকে তোমার ভাল লেগেছে আমি জানি।"*(পৃ: ৭৪৫, ঐ)* সুরসতিয়া চোখে সম্মোহনের মন্ত্র। কালকূটকে বলার অবকাশ না দিয়ে তার বন্য আবেগ বন্য বিশ্বাসকেই সুরসতিয়া ব্যক্ত করেছে।

লেখক সুরসতিয়ার দেহলগ্ন হয়ে ভাবছেন "মুগ্ধ মানুষের আচরণকে অনেক সময় বোকার মত মনে হতে পারে। কিন্তু এই বন, এই অন্ধকার, ফুল পাতা লতা গুল্মের এই গন্ধ, কেকাধ্বনি, সম্বরের গম্ভীর নাদ, আর যেন পুরাকালের কোন্ পাথর প্রতিমা নায়িকা আমার দেহলগ্ন আসীন। সংসারে মুগ্ধ হওয়ার আর কী লক্ষণ থাকতে পারে।"*(পৃ: ৭৪৪, ঐ)* সুরসতিয়া লেখক কালকূটের দেহলগ্ন থাকাকালীন অবস্থাতেই শুক্রম আর সোমারি ওদের দলে এসে যোগ দিয়ে ওদের ভাষায় নানারকম কথাবার্তা মজা করতে লাগল। লেখক বুঝতে না পারাতে সুরসতিয়া বুঝিয়ে দিল ওরা কি বলাবলি করছে। এক মুন্ডা উপকথা। সেই আদি সৃষ্টির কাহিনী। কচ্ছপের সমুন্দর থেকে মাটি তুলে আনাতে জগৎ তৈরী হয়েছে। পাহাড়, জঙ্গল, পশু, পাখি ঝরনার জল সব আছে কিন্তু মানুষ নেই। তাদের সেই মহাদেবতা দুটো গাছ থেকে দুটো মানুষ একটা কোড়া আর একটা কুড়ি বানিয়ে দিলেন। আর রাতে যখন শোয় তখন দু'জনের মাঝখানে থাকে একটি করম গাছের ডাল। মাবাংবুরু, ওদের বড় পাহাড় দেবতা ওদের ডিয়েং বানানো শিখিয়ে ডিয়েং পান করাতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আর মাঝের ডালটি তুলে নিয়েছিলেন। কোড়াকুড়ি দুজনকে জড়িয়ে ধরাতে ওদের মনে হয়েছিল ওরা পাপ করছে কিন্তু মাবাংবুরু তাদের সেই পাপ থেকে রক্ষা করে ওদের ছেলেমেয়ে হবে এইকথা বলে চলে গেলেন। লেখক বলেছেন "আমি যেন আদি পাপের সেই নিষিদ্ধফল ভক্ষণেরই কাহিনীই, আর এক রূপে শুনলাম।" *(পৃ: ৭৪৬, ঐ)* সোমারি এই মাঝের করম ডালটিরই কথা বলেছিল। রাতে কোৎরা হরিণের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়াতে সুরীনের সঙ্গে গল্প করার সময় সুরীন জানায় সুরতিয়ার কথা, "আপনাকে ওর ভাল লেগে গেছে। ওদের ভাল লাগাটা ওপরের না, মুশকিল সেখানে। মনে কষ্ট পাবে, এই আর কী! আর কিছু না।" *(পৃ: ৭৪৭, ঐ)*

একথা শুনে তাঁর মনে যন্ত্রণা উঠে আসে এইভাবে "কিন্তু কোনো এক বনবালাকে কষ্ট দিতে, আমি বন ভ্রমণে আসিনি। এসেছি, বনের সঙ্গে খেলতে, অনেক দিনের আশা পুরাতে। সে কেন তার সাতবহিনির হাতছানি দেয় আমাকে, শোনায় সেই উপকথার নিষিদ্ধ বৃক্ষকাণ্ডের কথা।" *(পৃ: ৭৪৭, ঐ)* ভেবেছেন হয়ত বনের সঙ্গে খেলার এটাও একটা রীতি।

পরের দিন সুরসতিয়া কাজে গেল না। আড়াল থেকে কালকূটের ঘাড়ে এক গোছা ফুল ছুঁড়ে দেওয়াতে কালকূট চমকে গিয়েছিলেন। সুরীন ও লেখকের সঙ্গ নিল সুরসতিয়া। তিন জনে

চলতে চলতে গ্রাম পেরিয়ে কয়েকটি ছোট মাটির ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। একটি ঘরের সামনে বাঁশের গায়ে ছোট মাছ ধরার জাল শুকাচ্ছে। অনেকটা বাংলাদেশের আটোল জালের মতো। সুরীন নেংটি পরা একটি লোককে মাছের কথা বলে এল। আরও বলল "ও এখন আপনার জন্য মাছ ধরতে যাচ্ছে। তার মানে, মাছ পেলে, পেতেন ওবেলা।"

সুরীনের কাজ হয়ে যেতে সুরতিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিল, "তুমি চলে যাও, আমি বাবুজীকে নিয়ে যাবো" *(পৃ: ৭৪৯, ঐ)* সুরীন চলে গেলে সুরসতিয়া আর লেখক চলতে লাগলেন। সুরসতিয়া ভেবেছিল লেখক আর তার সঙ্গে মিশতে চাইছেন না, তাই ছায়ানিবিড় বনের মতো সুরসতিয়ার চোখেও অভিমানের ছায়া পড়েছিল। লেখক কালকূট সুরসতিয়ার চিবুকে হাত দিয়ে ওর মুখ তুলে জানালেন যে তিনি নারাজ হননি। দুশ্চিন্তা হচ্ছিল সুরসতিয়া কাজে যায়নি বলে। উত্তরে সুরসতিয়া জানিয়েছিল যে ওরা রোজ কাজে যায় না যখন গাছ কাটার কাজ থাকে না তখন ওরা বনের ধারে যে গ্রামে ওরা, বাস করে সেই গ্রামে চলে যায়। সরকারের জমিতে থাকে, ওরা তাই সরকারের কাজ যেমন জঙ্গল পরিষ্কার, জমা পাতায় আগুন দেওয়া, আগুন নেভানো, রাস্তাঘাট ঠিক করা এসব করে। এছাড়া তাদের যে জমি আছে সেই জমি চাষ করে ভুট্টা মকাই ফলায়। যতদিন ইজারাদারের কাজ করে ততদিন ওরা ভাত খায়, অন্য সময় ওরা মহুয়ার ছাতু, সাঙ্গা, কান্দা, সোয়াক, ডুমরী এসব খেয়ে কাটিয়ে দেয়। যেদিন চাল কেনার পয়সা জোটে সেদিন চাল কিনে ভাত বানায়, ডিয়েং বানায়। ডিয়েং ওদের সবকিছুতে লাগে। কালকূট সরতিয়ার কথাতে শাক্তের কারণবারির মিল পেয়েছেন। "শক্তি পূজা মন্ত্রমতে হলেই কারণবারি অনিবার্য" *(পৃ: ৭৫০, ঐ)* মায়ের তোয়ায় দুধ না থাকলে পাতলা করে ছোট বাচ্চাদের ডিয়েং খাওয়ায় এ কথাও জানাল সুরতিয়া। তোয়া কথাটি মানে জানতে চাইলে "একটি অপরূপ লজ্জায় বনবালা যেন মুহূর্তে একেবারে প্রাণমোহিনী হয়ে উঠে, বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে, নিজের দুরন্ত উদ্ধত বক্ষ দেখিয়ে দিল।" *(পৃ: ৭৫০, ঐ)* নাগরিক সংস্কারে লেখক লজ্জিত হয়ে গেলেন। "এই যে নিঃশব্দে, অঙ্গুলি সংকেতে দেখিয়ে দেওয়া, জানিয়ে দেওয়া, এই দেহের এই নামও, এমন অভিজ্ঞতা আর কখনো হয়নি।" *(পৃ: ৭৫০ ঐ)* লেখক প্রসঙ্গ পাল্টে সঙ্গা, কান্দা এগুলো ওরা কিভাবে খায় জেনে নিলেন। এরকম আরও অনেক তথ্য যেতে যেতে জেনে বুঝলেন। ওদের কাছে নুনটা খুবই মহার্ঘ। যখন ভুট্টা, মকাই, মহুয়া, জামফল থাকে তখন এসব দিয়ে ওরা হাটুরেদের কাছ থেকে নুন কেনে। বনবাসীরা সবদিন নুনভাত বা নুন দিয়ে অন্য কিছু খেতে পায় না। তিনি বনজীবনে বনবাসীদের খাদ্যাভ্যাস জেনে নির্বাক হয়ে যান। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই নির্মম সত্যটুকুকে তুলে ধরেছেন তাঁর কালকূটীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে। কথা বলতে বলতে এগিয়ে যেতে যেতে একটা ময়ূরকে দেখতে পেলেন, চঞ্চু ঠুকে যাচ্ছে, কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। লেখক ময়ূরটাকে একটু ছুঁয়ে দেখার জন্য

সুরসতিয়াকে ধরে দিতে বললেন। লেখকের ধ্যান ময়ূরের দিকে দেখে সুরসতিয়া বলেছিল "আমি একটা ময়ূর হলে বেশ মজা হতো, তাই না?" *(পৃ: ৭৫২, ঐ)* ধীরে ধীরে সুরসতিয়া লেখককে মন্ত্রমুগ্ধ করছে। ও বাঁ হাত দিয়ে লেখকের কোমর জড়িয়ে ধরে পাহাড়ের উৎরাইয়ের দিকে তাকিয়েছিল। "ওর চোখে যেন একটা কেমন আচ্ছন্নতা, এবং ঈষৎ রক্তিম। ও প্রায় আমার বুকের কাছে মুখের এক পাশ চেপে দিয়ে, বাঁদিকে আঙুল তর্জনী দিয়ে দেখালো।" *(পৃ: ৭৫০-৭৫১, ঐ)* লেখকের কাছে দৃশ্যটা অভাবনীয়, অচিন্তনীয় কিন্তু ঘটনাটা সত্যি, "বনবাসী দুটি নগ্ন যুবক যুবতীকে এর থেকে স্পষ্ট করে দেখার কিছু নেই।" *(পৃ: ৭৫১, ঐ)* সুরসতিয়া নির্বিকার, শুধু দৃশ্যটি লেখককে দেখাতেই ওর আনন্দ। লেখক এ দৃশ্য দেখে বলেছেন যে, যেখানে স্বর্ণচাঁপার গন্ধ মনকে মাতিয়ে দেয়, বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি ও ভ্রমরেরা ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়, ময়ূরেরা ঘুরে বেড়ায়, ঝরা পাতার মর্মর ধ্বনি শোনা যায় সেখানে মহাদেবতা ঠাকুরের সৃষ্ট সন্তানের নগ্ন দেহে জীবলীলা করে। "বরং বলি, মানবলীলা করে, এবং এমন সরল গভীর লীলা যেন আমার দৃষ্টি দগ্ধ করে দেয়।" *(পৃ: ৭৫১, ঐ)*

সুরসতিয়া লেখককে জড়িয়ে ধরে গান গাইতে গাইতে কোয়েনার কাছে চলে এল। সুরসতিয়ার গান কোয়েনার কুলুধ্বনির মতো লেখকের কানে বাজতে থাকল। "আলকন বা লেকা ডিন্ডা সোময়। অর্থাৎ জোয়ানী সময় যেন ফুল ফোটার মত। হো কুড়ি আপে সুসুন মে। হে লেড়কি, তোমরা নাচো।" *(পৃ: ৭৫১, ঐ)* কোয়েনার তীরে নরম মাটিতে সদ্য চলে যাওয়া মারাং হোরোর অর্থাৎ হাতির পায়ের ছাপ, হস্তী বিষ্ঠা দেখে লেখক ভীত সন্ত্রস্ত হতে গেলেন। বনবালার নিবিড় স্পর্শের মাদকতার অনুভূতিতে যে নৈতিকতাবোধ জাগরিত হয়েছিল সেটা বিলীন হয়ে গেল। তার মনে হতে লাগল সান্দা, কান্দা খেয়ে জীবনধারনের থেকে বন্যপ্রাণীর সঙ্গে থাকা, তার পদচিহ্ন ধরে এগিয়ে যাওয়া, এও কম নিষ্ঠুর নয়, বাঁচাটা অনেকটা মৃত্যুর সঙ্গে সমঝোতা করা। সুরসতিয়া লেখককে আশ্বস্ত করে এই বলে যে যদি হাতী সামনে এসে দাঁড়ায় তাহলে এই পাহাড়ের খাড়াই ছেড়ে উঠে যেতে হবে! সুরসতিয়ার কাছে বনজীবনের এই ঘটনা স্বাভাবিক, এইভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে ওরা বেঁচে থাকে। কিন্তু নাগরিক প্রাণ? লেখক সুরসতিয়াকে আঁকড়ে ধরলেন আর সুরসতিয়া লেখকের হাত ওর বামবক্ষে স্থাপন করে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে চলতে চলতে বনের নিবিড় ছায়ায় লোরের কাছে পৌঁছে। শুধু দুটো ময়ূর-ময়ূরী এই পথেই চলতে গিয়ে লেখক কালকূটকে সাহস জুগিয়ে গেল।

মোহনবাবু বলেছিলেন ঝিল বা দীঘি আর সুরসতিয়া বলল লোর। এটি প্রাকৃতিক জলাশয়, বারোমাস এটি জলে ভরা থাকে। "হাতিরা এখানে স্নান করে, জলখেলা করে। প্রকৃতি যে বিশাল দেহ প্রাগৈতিহাসিক সেই বন্য পশুদের জন্যই, এমন একটি জলাশয়, নিবিড় বন, নরম মৃত্তিকা সৃষ্টি

করেছে।" *(পৃ: ৭৫৪, ঐ)* হাতির থেকেও বড় বড় প্রস্তর খণ্ড। কোথাও মাকড়া পাথরের আস্তরণ জলাশয়ের নিচে চলে গেছে। বাঙলা পাঁচের মত জলাশয়টি একটি বাঁক নিয়ে পুবদিকে বনের বাইরে চলে গিয়েছে, রোদের কিরণ লেগে ঝলকাচ্ছে। শাল, অর্জুন, সেগুন, স্বর্ণচাপায় অলংকৃত বনভূমি। প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্যে লেখকের মন থেকে ভয় দূর হয়ে যায়, এক গভীর মুগ্ধতায় তাঁর হৃদয় ভরে ওঠে। লেখক সুরসতিয়ার ডাগর কালো চোখের সম্মোহনের মন্ত্রে যদি এসেও থাকেন তাহলে তিনি সুরসতিয়ার কাছে কৃতজ্ঞ। সেইসব প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরা তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেও প্রাণের মূল্যে সেই অনিশ্চয়তাকে গ্রহণ করবেন। বনভূমির উদার আকাশের মত সুরসতিয়া নিজের শাড়ীর বাঁধন আলগা করে দিল, উন্মুক্ত বক্ষ আকাশের মতই অধরা। মন্দিরের পাথর মূর্তির মতো সেই সৌন্দর্য। লেখক সেই অধরা রূপসৌন্দর্য অবলোকন করছেন যেন নিবিড় প্রকৃতিকেই দু'চোখ মেলে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছেন। তার নাগরিক জীবন, নাগরিক মূল্যবোধ সবকিছুকে পিছনে ফেলে তিনি বনবালার বনসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রইলেন।

কালকূটকে সুরসতিয়া জানায় যে সে লেখককেই চায়, একটু পরেই যে তিনি চলে যাবেন সেটা ও জানে তবু তার মনের কথা, অব্যক্ত যন্ত্রণা-অনুভূতির কথা অনায়াসেই বন সরলতায় বলে ফেলে। বনবালা লেখককে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলে যে, সে কখনও কলকাতায় যাবে না, এই বনভূমিতেই থাকবে। তবুও "তোমার সঙ্গে মিশলাম, সবাই আমাকে খারাপ বলবে। তুমি কেন মুন্ডা হলে না?" *(পৃ: ৭৫৪, ঐ)* বনবালার মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়েছে। সে বলেই চলেছে "তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে তাহলে আমরা দু'জনে খ্রীষ্টান হয়ে যেতাম। সবাই তাই করে। কিন্তু আমি বন ছেড়ে যাবো না।" *(পৃ: ৭৫৫, ঐ)* সে এমন কোনো ডাল পায় নি যাকে সে জড়িয়ে ধরতে পারে। লেখকই তার কাছে বড় মুন্ডা। হেসে সুরতিয়া বলেছিল " এলাচি আবেনেবেন উড়ক্কতনা। গাছে জড়ানো লতার মত" *(পৃ: ৭৫২, ঐ)*

এরপরে নিজের গা থেকেই খাটো শাড়ি খুলে মাটিতে ফেলে দিয়ে লেখককে লোর-এ চান করবার আহ্বান জানায়। নিজেই লেখকের পোশাক খুলে "হাত ধরে নিয়ে গেল, জলে ডোবা পাথরের ওপর" *(পৃ: ৭৫৫, ঐ)*। তারপরে আরো একটু গভীরে গেল এবং যে খেলাটি চলল তা এরকম — "অঞ্জলি ভরে জল তুলে, আমার বুকে কাঁধে ছড়িয়ে দিল। ঠাণ্ডা শীতল, কবেকার সেই দূরকালে বহমান আদিম জলের স্পর্শ আমার গায়ে। মাতৃপূজার ছবি আমার চোখে। শক্তিরূপিনী মহামায়া তোমার সামনে। আদিম আরণ্যক জলাশয়ে, এখন তোমার পূজার লগ্ন।" *(পৃ: ৭৫৬, ঐ)*

কালকূট অরণ্যভূমির প্রকৃতির কাছে অরণ্যভূমির বনবালার কাছে পূজারীর নৈবেদ্য রাখলেন। পাতার আস্তানায় তিনি ফিরে এলেও বনদেবী আসেনি তার সঙ্গে। সিংজী এসে গেছেন, বিদায় লগ্ন আসন্ন। এক সুসুন কুড়ির সঙ্গে কালকূট হারিয়ে গেছেন, এই কথা বলে সিংজী মজা

করলেন। শাণিত আভিজাত্যে বললেন "সুসুন কুঁড়ির জন্য, নিশ্চয়ই আপনার মন কেমন করবে?" *(পৃ: ৭৫৫, ঐ)*

গভীর অবগাহনের স্নিগ্ধতা লেখকের দেহ মন জুড়ে। সুরসতিয়ার সঙ্গে একবার দেখা করতে যাবেন বলে তিনি সুরীনের সঙ্গে দেখা করতে যান। বনবাসী বনবালারা তাঁর কাছে খাসিয়া চানা আর ডিয়েং খেতে চেয়েছিল, সেই ব্যবস্থা করার জন্য সুরীনকে টাকা দিতে গিয়েছিলেন। সুরীন নেয় নি। বনবাসীরা তাঁর সঙ্গে থেকেই নাচতে, খানাপিনা করতে চেয়েছিল, লেখক না থাকলে ওরা এসব কখনোই করবে না, যদি কখনও সুযোগ হয় তখন আবার খানাপিনা, নাচ হবে। সুরীনের কথাগুলির মধ্যে দিয়ে বনবাসীদের আত্মসম্মানবোধ প্রকাশ পেয়েছে।

কালকূট মনে মনে বলেছেন — এটা যে আর কখনও হবে না, এটা সুরীনও জানে। সিংজী আজই লেখককে নিয়ে যাবেন কিছুক্ষণ পরে। তাই বিষণ্ণ মনে তিনি ফিরে আসেন পাতার কুটিরে। সিংজীর কাছ থেকে পান তৃপ্তি ভৌমিকের চিঠি। এদেলবায় যাবে দু'একদিনের মধ্যে। কপালে দর্শন থাকলে কোথাও দেখা হয়ে যাবে, এসবই জানিয়েছে চিঠিতে। তৃপ্তি ভৌমিকের চিঠিতে মন কেমন হয়ে গেল কিনা জানতে চাইলেন সিংজী। তিনি আরও বললেন "জগৎটা আলাদা। মনও তাই। আমরা সব বুঝব।" সিংজী বুঝেছেন কালকূটের মানসিক অবস্থা। লেখক জেনেছেন "এই শাণিত অভিজাত ব্যক্তিটির প্রাণে কী গভীর অন্ধকারের যাতনা!" *(পৃ: ৭৫৫, ঐ)*

থলকোবাদ যাওয়ার জন্য সবাই প্রস্তুত। কিন্তু বনবালার সঙ্গে দেখা না করে লেখকের যেতে মন সরে না। সুরীনকে নিয়ে গিয়ে তার পাতার ঘরে দেখলেন তার সেই খাটো শাড়িটি জড়িয়ে সুরসতিয়া ঘুমোচ্ছে। সুরীন ডাকতে দিল না। কিন্তু লেখকের বুকের ভিতরটা খচ্ করে উঠল। নিঃশব্দে বিদায় নিলেন। "কারণ, জাগ্রত, চাক্ষুষ বিদায়, অনেক সময় বিদায়ের স্বরূপকে চিনতে দেয় না। বিদায় সুরসতিয়া। আমার প্রণাম তোমার কালো শীতল দুটি পায়ে।" *(পৃ: ৭৫৬, ঐ)*

কাহিনী এইভাবেই শেষ হয়েছে। লেখক বনবালার সঙ্গে, বনপ্রকৃতির সঙ্গে প্রেমকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় নিয়েছেন। সমস্ত কাহিনীতে বনের প্রকৃতি ও বনবাসীর প্রকৃতি অপরূপ বৈচিত্র ধরা পড়েছে। বনপ্রকৃতি, বনভূমির সৌন্দর্য, বনের রঙ যে শুধু সবুজ, তা নয়। বিভিন্ন রঙের ফুলে তা রঙিন, রঙিন প্রজাপতির দল ফুলের সঙ্গে মাখামাখি করে উড়ে বেড়ায়। একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক। ময়ূরের কেকাধ্বনি সেইসঙ্গে বনভূমি বনবাসী-বনবাসিনীদের জীবনাচার একটু একটু করে তুলে ধরার প্রয়াস করেছি। লেখক কালকূট প্রতিটি চিত্র অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সঙ্গে বিস্তৃত করে কাহিনীর প্রয়োজনে তুলে ধরে কাহিনীর গতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি অরণ্য প্রকৃতির বুকে গিয়ে দেখেছেন বৃক্ষমেধ হচ্ছে। একদল কুড়ুলের কোপ মারছে, একদল মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বৃক্ষকে

টুকরো টুকরো করছে, আর একদল পণ্যের হাটে নিয়ে যাওয়ার জন্য টুকরোগুলিকে লরীতে তুলছে।

গাঙ্গুলিমশাইয়ের সঙ্গে লেখক কালকূট একাত্ম হয়ে গেছেন। বেদনার্ত হয়েছে তাঁর মন। বনপ্রকৃতির প্রেমে লেখক একাত্ম হয়ে গেছেন। তাঁর ববপ্রেমকে এগিয়ে নিয়ে গেছে সুরসতিয়া। বনের যেন একটি অংশ এই সুরসতিয়া। বনের মধ্যে যখন প্রথম প্রকাশ, ডালপালার ফাঁক দিয়ে যখন সে লেখকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল মনে হচ্ছিল সে এই বনের কোন গাছ, রোদের পরশ পেয়ে তার কচিপাতা ছড়িয়েছে। "অতএব খোঁপায় গোঁজা একগুচ্ছ সাদা ফুল রয়েছে, যদিও রোদে এখন কিঞ্চিৎ মলিন। ফুলের সঙ্গে ছোট ছোট কয়েকটি সবুজ পাতাও আছে। ফুলের নাম জানি না। ও আমার সামনে দাঁড়িয়ে সাদা দাঁতের ঝিলিক দিয়ে হাসল। একটু লজ্জার ছটা আছে মুখে কিন্তু তা লজ্জাবতী লতার মত গুটিয়ে যাওয়া না।" *(পৃ: ৭২৮, ঐ)*

বনপ্রকৃতি লেখককে আকৃষ্ট করে কোয়েনার ধারে ধ্যানস্থ করেছিল আর বনবালা সুরসতিয়া তার ডাগর চোখের চাহনিকে মন্দিরের পাথরপ্রতিমা মূর্তির শরীরী আহ্বানে সম্মোহিত করেছিল। কোয়েনায় স্নান সেরে এসে "এদিকে একবার দৃষ্টিপাত করে। হেসে, ভেজা কাপড়ে জড়ানো পাথর প্রতিমা শরীর নিয়ে চলে গেল একটু দূরে গাছের আড়ালে।" *(পৃ: ৭৩৪, ঐ)* সুরতিয়ার সৌন্দর্যকে দেখলেন এইভাবে।

"ভেজা চুল মুছে আঁচড়েছে। কপালে একটি মেটে সিঁদুরের টিপ, যেন এই সারেন্ডা অরণ্যের মৃত্তিকারই ফোঁটা।" *(পৃ: ৭৩৪, ঐ)*

"হাসির ঝিলিকটি ওর কৃষ্ণ ডাগর চোখেও। সেই কথাটাই আবার আমার মনে হল, সুরসতিয়া যেন আমাকে অরণ্যের আদিম মন্ত্রেমুগ্ধ করে।" *(পৃ: ৭৩৪, ঐ)* বনের সঙ্গে, বনবালার সঙ্গে খেলতে গেছেন লেখক কালকূট। "সুরসতিয়া ওর বুকের দিকে চেয়ে চিবুক দেখিয়ে বলল, 'হম তুমকো শিখায়েগা।' সুরসতিয়ার কৃষ্ণডাগর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় আমি যেন কোন দূরের অতলে ডুবে যাই। বললাম, 'তব হম নাচেগা।' মোহনবাবু বললেন, 'এই সুরসতিয়া, চাল লে আও পহলে, বাবুকো দিমাক মত্ খারাপ করো।' আমি মোহনবাবুর দিকে তাকালাম, মোহনবাবু হাসলেন।"

টুকরো টুকরো কথার মধ্যে দিয়ে লেখক বনভূমির জীবনচিত্র এঁকেছেন। সুরসতিয়া মোহময়ী ডাগর কালো চোখের আকর্ষণ, লেখক ও সুরসতিয়াকে নিয়ে গান-হাসি বন্যরসিকতা কাহিনীকে গতিশীল করেছে। এদের সঙ্গে সুরীন, মোহনবাবুও ব্যাপারটা উপভোগ করেছেন। বন্য পরিবেশে এসে নাগরিক জীবনের জীবনাচার এখানে ছায়া ফেলেনি। আবার বনভূমির আর্থসামাজিক পরিবেশ টুকরো টুকরো কথার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। মোহনবাবুরা বনে কাজ করতে আসার সময়েই কুলি রেজাও নিজেদের জন্য প্রয়োজন খাদ্যরসদ, জ্বালানী নিয়ে আসেন। কুলি রেজাদের

একসঙ্গে সব রসদ দেন না, দিলেই এরা কাজ ফেলে ডিয়েং খেয়ে মাতাল হয়ে যাবে। বনবাসীদের কাছে এমনি কোন আলোর ব্যবস্থা নেই, উনুনের আগুন ছাড়া। এছাড়া খাদ্যাভ্যাস সেগুলোও কিছু কিছু বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। কাহিনীর পটপরিবর্তনেই বন্য ময়ূরীরা কাছে এসেছে। বারে বারেই স্বর্ণ মারীচের মত লোকালয়ের কাছে পিছে অথবা গম্ভীর বনভূমিতে ঘোরাফেরা করেছে। লেখক প্রয়োজনে এই 'স্বর্ণমারীচ' কথাটা ব্যবহার করেছেন। সুরসতিয়াও অনেকটা স্বর্ণমারীচের মত। ধরা গেলেও তাকে কাছে রাখা যাবে না।

বিশাল বৃক্ষ ভূতলে পড়ে গেল, বৃক্ষ নিধন যজ্ঞ দেখবার জন্য ফরেষ্ট গার্ড আছে। লেখক কালকূট অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সঙ্গে এদিকটি তুলে ধরেছেন। দারু খেয়ে ঘুমোচ্ছে, গাছে চিহ্ন দেওয়া আছে সেটা তাহলে কে দেখবে। দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক ইজারাদারদের সঙ্গে সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। কাহিনীর প্রয়োজনেই মাংরি সোমারি, শুক্রম, কন্ডেয়র এই চরিত্রগুলি উঠে এসেছে। লেখক এদের সঙ্গে ডিয়েং পিয়ে নৃত্যে যোগ দিয়েছেন। দুই আদিবাসী যুবতী তাঁকে জড়িয়ে লেঙ্গি মেরে মেরে নাচ শেখাতে সাহায্য করেছে। এরা অনায়াসে লেখককে, দীখু, জেনেও বন্য, আদিম খেলায় খেলতে নেমেছে। সুরীন জরাইকেলায় থাকে, বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। ওই বাড়ির জেমা, ওঁরাও মেয়ে, ও বাড়ির কর্ত্রীই বলা চলে। ওই বাড়িতেই জন্ম। বাঙালী পরিবেশে মানুষ বলে আদিবাসী সমাজের চালচলনে অভ্যস্ত স্বামীর ঘর করতে না পেরে গোপালচন্দ্র দাসের বাড়িতে ফিরে এসেছে। এই জেমার সঙ্গে সুরীনের প্রেম। ওর বৌ মারা গেছে। তিনটি ছেলেমেয়ের দেশাশোনা বলতে গেলে জেমাই করে। সুরীন তো বাইরে বাইরেই কাটায়। জেমা ও সুরীনের সম্পর্ককে কেউ খারাপ চোখে দেখে না। একটা নিষ্কলুষ প্রেমে তারা বিবাহ বন্ধনে হয়ত আবদ্ধ হবে অচিরেই। তাই সুরীন আদিবাসী সমাজ ও নাগরিক সমাজের মাধ্যম। নইলে লেখক বনের সঙ্গে, বনমধ্যে বনবালাদের সঙ্গে খেলবেন কী করে। লেখক যখন সুরতিয়ার কালো চোখে সম্মোহিত, তখনই উঁকি দিয়েছে তিলুয়া ফুলে সজ্জিত তৃপ্তি ভৌমিক। তৃপ্তি ভৌমিক লেখকের নাগরিক চেতনাবোধ মনে করিয়ে দিয়েছে। কাহিনীর শেষে এসেছে তৃপ্তি ভৌমিকের চিঠি, নাগরিকা কন্যা অথচ বনবাসিনী, তার ছোট্ট একটি চিরকুট লেখককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে নাগরিকবোধকে। সিংজী নিজে বেদনার্ত সীমাকে দাসকে নিয়ে। তারই প্রেমিকা, চলে গেছে তার জার্মাণ প্রেমিকের কাছে। বেদনাভরা মন নিয়ে তিনি বনভূমির নিয়মের মতোই তার দাবী ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু নিজে বনবাসীদের মত রক্তাক্ত হয়েছেন। তার ছেলে পোলিও রোগে আক্রান্ত। বিশাল তার প্রতিপত্তি, প্রভাব সমস্ত সারেন্ডারেঞ্জের বনভূমিতে, তবুও তার বেদনা। লেখক একটি দুটি কথায় কী অপরিসীম বেদনায় তুলে ধরেছেন লেখকের সঙ্গে সুরসতিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদকে বোঝানোর জন্য।

আর মাঝে মাঝে 'মারাং হোর'-দের এনেছেন। বনভূমিতে হাতীদের কী বিভীষিকা, কিভাবে তারা মোকাবিলা করে সেটাও যথাযথ ভাবে চিত্রিত করেছেন। একটা তীব্র ভয় দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়। মারাং হোররা লোরের জলে স্নানের আনন্দে মেতে ওঠে। কালকূট প্রকৃতির সৃষ্ট এই 'লোর' দেখে বলেছেন ''প্রকৃতি যে বিশাল দেহ প্রাগৈতিহাসিক সেই বন্য পশুদের জন্যই, এমন একটি জলাশয়। নিবিড় বন, নরম মৃত্তিকা সৃষ্টি করেছে'' *(পৃ: ৭৫৪, ঐ)*। প্রাগৈতিহাসিক কথাটির সঙ্গে লেখক আদিম বন্যতাকে মিশিয়ে দিয়ে সুরসতিয়া লেখকের প্রেমকে অন্য এক মহিমায় পৌঁছে দিয়েছেন। বনবাসীরা প্রায় নগ্ন বা অর্ধনগ্ন হয়েই থাকে। নগ্নতা এখানে তেমন প্রাধান্য পায় না। সেই আদিম লীলা দেখানোর জন্যই প্রথমে দূর থেকে দুটি বনবাসী যুবক-যুবতীকে এনেছেন, যারা নগ্ন হয়ে মানবক্রীড়ায় মেতেছে ওই লোরের কাছে। ঘটনাটি প্রতীকীও বটে। কালকূট দূর থেকে আকৃষ্ট হয়ে বনভূমিতে দূরকালের বহমান আদিম জলের স্পর্শ গায়ে নিয়ে মহামায়ার পূজায় মেতেছেন। দেবী বিসর্জন অনিবার্য। লেখকের 'বনের সঙ্গে খেলা' এইভাবেই সাঙ্গ হয়েছে। খেলা যেমন হঠাৎই শুরু হয়েছে আবার তেমনি করেই হঠাৎই শেষ হয়ে যায়। 'বনের সঙ্গে খেলা'র কাহিনী খেলতে খেলতেই শেষ হয়েও গেছে। কাহিনী গতিময়, বনভ্রমণ কাহিনীই ধীরে ধীরে উপন্যাসের গতি পেয়েছে। এদেলবা ভ্রমণের কাহিনী ধীরে ধীরে বনভূমি বনবাসীদের জীবনাচারের মধ্য দিয়ে বনভূমি প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে পর্যবসিত হয়েছে। বনভ্রমণে গিয়ে বনজীবনের খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু, বনবাসী-বনবাসিনীদের জীবনযাত্রা, সুখ-দুঃখ, আনন্দবেদনা লেখক কালকূটের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। বনজীবন যে তাঁর আবাসস্থল নয়, এটা তিনি অরণ্যভূমির সম্মোহনে ও বনবালা সুরসতিয়ার সম্মোহনে সম্মোহিত তবুও তৃপ্তি এসেছে তাঁর নাগরিক চেতনায়। লেখকের জীবনে তৃপ্তি ভৌমিকের নীরব সংযত প্রেম মনোজগতে এসে উঁকি দিয়েছে কাহিনীর একদম শেষে। মানবজীবনে বিশেষ করে বনবাসীদের জীবনের জলছবি লেখক তুলে ধরেছেন। বনভূমির রঙিন বর্ণময় সৌন্দর্যের মতই লেখক তাঁর কালকূটীয় দৃষ্টিতে 'বনের সঙ্গে খেলা'র মানবচরিত্রগুলি চিত্রায়িত করে বর্ণময় করে তুলেছেন। বনভ্রমণকাহিনীতে শুধু বনের নয় মানুষের জীবনাচারের কথা বলেছেন, তাই এই কাহিনী উপন্যাসে পরিণত হয়েছে।

এরপরে আমরা আলোচনা করব **'প্রেম নামে বন'** কাহিনীটি। লেখক কালকূটের বনভ্রমণের এটি শেষ পর্যায়। এদেলবা থেকে থল্‌কোবাদ যাওয়া এবং ঐ বনভূমিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী লেখক কালকূটের দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। লেখক-এর 'মন চল বনে' রচনাটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে (১৩৮১ বঙ্গাব্দে) 'নব কল্লোল' পত্রিকার পূজা সংখ্যায়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে (১৩৮২ বঙ্গাব্দে) বৈশাখ মাসে 'বিশ্ববাণী প্রকাশনী' থেকে। দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ঐ বছরই কার্তিক মাসে। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে ছিল 'স্বর্গত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপধ্যায়ের

স্মরণে যার পদচিহ্ন ধরে বনের মনকে স্পর্শ করতে চেয়েছি। *(পৃ: ১৬৮২, কালকূট রচনা সমগ্র, ৩খন্ড)* লেখক কালকূটের সারেন্ডারেঞ্জের বনভূমিতে বনভ্রমণের এটি শেষ পর্যায়। ষষ্ঠ দিন বেলা দুটো নাগাদ এথেলবা থেকে অজিত সিংজীর সঙ্গে থলকোবাদ যাবার জন্য যাত্রা শুরু করেছিলেন। লোরের জলে বনকন্যা সুরসতিয়ার সঙ্গে গভীর অবগাহনের স্নিগ্ধতা লেখকের দেহমনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছি। অবগাহনের অনুভূতির রেশ কাটিয়ে ওঠার আগেই এদেলবা বনভূমিকে বিদায় জানাতে হয়েছে। তিনি এদেলবা থেকে থলকোবাদ যেতে যেতে বনভূমির অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে পাহাড়ী পথের চড়াই-উৎরাই ডিঙোতে ডিঙোতে মনের ভাবনাতে ডুব দিয়েছিলেন "সুরসতিয়া আমার জীবনের মণি কী না, তা এই মুহূর্তেই বলতে পারছি না। তবে সুরসতিয়া নামে মুন্ডা মেয়ে যে, আমার ক্ষুদ্র জীবনকালের নক্ষত্র, তা কখনোই ভোলা সম্ভব না। প্রকৃতপক্ষে, আমার প্রেম এখন বন, এই বোধ আর অনুভূতি সুরসতিয়ার দান। সুরসতিয়া বনবালা। বনের যে প্রকৃতি সৌন্দর্য, তার যে গভীরতা, আনন্দ সুখ এবং তীব্র একটি বেদনাও বটে, সুরসতিয়ার মধ্যেই আমি তা দেখতে পেয়েছি। অনুভব করেছি, আমার সকল রক্তকণা দিয়ে।" *(পৃ: ৮৪৩, ঐ)*

লেখক অরণ্যের প্রেমবাহুডোরে বাঁধা। এই কাহিনীর শুরুটা করেছেন এইভাবে 'প্রেম সাধিলে প্রেম মিলে।' প্রেম সাধকের কথায় তিনি বোঝাতে চেয়েছেন --- সাধিলে অর্থ সাধন করলে। প্রেম পীরিতি কাকে বলে সেটাও তিনি সঠিক অর্থে জানেন না। সাধকের কথায় বলতে গেলে, প্রেম করা যায় না, সাধন করা যায়। কিন্তু আবার লেখক নিজেই বলেছেন কেমন করে প্রেমে পড়তে হয় তার ব্যাখ্যা তার জানা নেই। যদি জানতেনই তাহলে যেথায় সেথায় তিনি প্রেমে পড়তেন না। তিনি তাঁর মনের অবস্থাটাকে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন "পাগলারে, মনটারে তুই বাঁধ। কেন রে তুই যেথা সেথা পরিস প্রেমের ফাঁদ।" *(পৃ: ৮৪০, ঐ)* ফাঁদও যে অলংকার হয়, সেটা গলায় লটকে বা বুকে ঝোলানো যায় সেটাও তিনি জানতেন না। প্রাণের ভাঁজে ভাঁজে সেই অলংকার অর্থাৎ ফাঁদ পরে যে লেখক তথা কালকূট ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেটাও স্পষ্ট ভাবে তার জানা নেই। যদি জানতেন কেন প্রেমের ফাঁদে পড়েন তা জানলে কি আর সাধ করে প্রেমের ফাঁদের গহনা পরতেন? "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।" *(পৃ: ৮৪৫, ঐ)* কবির এই লেখায় আরও মজা পেয়েছেন এই কথাটায় "এ যেন যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াল ব্যাপার।" *(পৃ: ৮৪০, ঐ)* বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে লেখক কালকূট মীরপুরে গিয়েছিলেন, যেখানে পাকিস্তানী দালালরা বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করেছিল সেই জায়গাটিকে দেখতে। লেখক মীরপুরে যাওয়ার কয়েকদিন আগেই জহীর রায়হানকে টেলিফোনে ডেকে হত্যা করা হয়েছিল। মৃত্যুফাঁদটা ছিল এইরকম যে, তাঁর দাদাকে নাকি মীরপুরে আটকে রাখা হয়েছে, রায়হান সাহেব গেলেই দাদার মুক্তি হবে। রায়হান সাহেবের জীবন থেকে মুক্তি ঘটেছিল। সেই বধ্য ভূমিতে

লেখক তথা কালকূট গিয়েছিলেন। গুপ্তঘাতকরা আশেপাশেই লুকিয়ে থেকে লেখক সহ সশস্ত্র পুলিশের দলটিকে লক্ষ্য করছিল। জীপ থেকে নেমে জায়গাটা যখন দেখছিলেন তখন সাদা পোশাকের এক পুলিশ বলেছিল "সায়েব, যেইখানে হেইখানে পারা দিয়েন না, হালারা পুরা মীরপুরটারে মাইনের ক্ষ্যাত কইরা রাইখ্যা গেছে।" *(পৃ: ৮৪০, ঐ)* একটিমাত্র বিস্ফোরণ শুধু। এই কাহিনী বলতে গিয়ে লেখক নিজেই সপক্ষে বলেছেন — তিনি ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে ফেলেছেন। কোথায় প্রেমের ফাঁদ আর কোথায় মাইনের ক্ষেত, মীরপুরের বধ্যভূমি, তবুও তার এই উদাহরণটাই মনে এসেছে। প্রেমের ফাঁদকে যদি অলংকারই মনে করা হয় তাহলে একে খুলতে গেলেও বাজে, পরতে গেলেও বাজে। বিষম জ্বালা। বিশ্বসংসারের এই মায়ার ব্যাখ্যা কালকূটের জানা নেই! সাধকের প্রেম সাধন অতি কঠিন ও গোপনীয় বিষয়। তিনি সাধক নন, অতএব সাধকের প্রেম সাধনও তাঁর জানা নেই। মহাকবি চণ্ডীদাসের মতে প্রেম সাধন "ভেকের মুখেতে সাপেরে নাচায়।" কালকূট বলেছেন এই প্রেম সাধন তাঁর জন্য নয়। প্রেম করা কাকে বলে তার সঠিক অর্থ তিনিআজও বুঝে উঠতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, "চিরদিন দেখে এলাম, কখন কোন্ সময়ে, মনোহরণ হয়ে গিয়েছে, তার সঙ্গে প্রাণহরণও বটে। আমি প্রেমের বাহুডোরে বাঁধা।" *(পৃ: ৮৪১, ঐ)*

লেখক মূল কাহিনীতে প্রবেশের পূর্বে এমনই একটি সংকেত দিয়ে দিয়েছিলেন। পাঠককুল সংকেত ধরতে পারলে ভালো নইলে লেখক যার প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়েছেন সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। "যার প্রেমের বাহুডোরে আমি বাঁধা পড়েছি, অরণ্য তার নাম। সে আমাকে ডাক দিয়ে এসেছিল অনেক আগেই, ঘরছাড়া করে। তখন ভাবি নি, কী, রূপের মোহ যে তার সারা অঙ্গে ধারণ করে আছে। আমার বিচরণ এখন তার অঙ্গে অঙ্গে, তার অঙ্গের অভ্যন্তরে। শুকনো মৃত্তিকার গভীরে, যেমন করে জলের ধারা চুইয়ে প্রবেশ করে, বনে বস তেমন করে আমার গভীরে ছড়িয়ে দিয়েছে তার প্রস্রবণ। আমি এখন মাতাল হয়েছি। তার ফুল ফল লতাগুল্মের মদির গন্ধ আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে, অবশ করেছে। 'চোখ গেল' পাখিটার মতো, আমারও চিৎকার করে ডেকে উঠতে ইচ্ছা করছে। এখন তার বর্ণাঢ্য রূপ, চেয়ে দেখতে পারি না, অথচ চোখ ফেরাতে পারি না। এক কথায় বলি, এই বনের সঙ্গে খেলতে খেলতে কখন আমি তার কোমল বাহুডোরের নিবিড়ে ধরা পড়েছি, খেয়াল করি নি।

এখন আমি তার চরণে প্রণাম করছি, সে আমাকে বাহুবন্ধনে আলিঙ্গন করে চুম্বন করছে। প্রেমের এমনি খেলা। আমি যদি তাকে মা বলে ডাকতে যাই, সে অপরূপা প্রকৃতির সাজে, আমাকে প্রেমশরে বিদ্ধ করে।' *(পৃ: ৮৪১, ঐ)*

তিনি আরও বলেছেন 'আমি কালকূট, বিষে অঙ্গ জরজর। মরুর উত্তাপের জ্বালায়, আমি

যখন তার নিবিড় ছায়ায় সুখ সন্ধান করি, সে আমার চোখের দু'কুল ভাসিয়ে দেয়। জ্বালায় পড়ে, যখনই প্রলাপ বকতে যাই, কী এক অনির্বচনীয় সুধায়, সে আমার প্রাণ ভরিয়ে দেয়।' *(পৃ: ৮৪১, ঐ)*

এ প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যাও আমি জানি না, এখন বন আমার প্রেম, সে আমাকে টেনে নিয়ে যায় তার আপন ঘরে, যার কোনো সীমা সেই অসীমের মধ্যে, সসীম খেলা কতখানি আমার চোখে পড়বে জানি না। আমার আপন হৃদয় কি আমার আছে? আমার নিজের দৃষ্টি? দেখি?" *(পৃ: ৮৪১, ঐ)*

সুরসতিয়া আর অরণ্যভূমি লেখকের চোখে একই অনুভূতির দুটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ। বনপ্রকৃতির সৌন্দর্য আর সুরসতিয়ার বন সৌন্দর্য একাকার হয়ে গেছে। বনভূমি রক্ত কুসুমের রক্তিম ছটায় রঞ্জিত, এর সঙ্গে রঞ্জিত সিংজীর চোখ মুখ। সিংজীর মুখে রক্তিম ছটা লেগেছে সুরা দ্রব্যগুণে। গাড়ি চালাচ্ছেন সিংজী তাঁর বাঘের মতো থাবায়। সারেন্ডারেঞ্জে সিংজীর প্রতিপত্তি ব্যাঘ্রসদৃশ, তাঁর চালচলনও বনের রাজার মতই। পাহাড়ী পথেই তার ঝকঝকে নতুন জীপ চলছে, এই পথ তাঁর কাছে নতুন নয়, বহুবার এসেছেন। বনের বাঁকে বাঁকে বিপদের হাতছানি, সবকিছুকে উপেক্ষা করে সিংজীর জীপ ছুটে চলেছে। একটু অসাবধানী হলেই সারেন্ডা বনের অতলে তলিয়ে যেতে হবে। তাই লেখকের প্রাণটি দুরুদুরু করছে। লেখক ও সিংজীর মাঝখানে একটা ইটালিয়ান হ্যামার, বুলেট ভর্তি। যে কোনো মুহূর্তে দরকার হলেই সিংজী কাজে লাগাতে পারে। যদিও এটা সংরক্ষিত বন, পশুরাও সংরক্ষিত। সিংজী হলেন সেই পর্যায়ের ব্যক্তি যিনি কোনো নিষেধের গন্ডী মানেন না। সিংজী অনেক ওপরতলার মানুষ, আইন ভাঙতে দেরী হয় না। লেখকের সঙ্গে তার পরিচিতি জরাইকেলায় এসে। বনভ্রমণের পুরো পরিকল্পনা — জরাইকেলা থেকে ছোটনাগরা — এদেলবা— থল্‌কোবাদ, সিংজী সাহেবের। বয়স আনুমানিক চল্লিশের ওপরে, মেদবর্জিত শক্তপোক্ত শরীর। ফর্সা গায়ের রং। মাথায় পাতলা কাঁচাপাকা চুল, সূচ্যগ্র এবং সুদীর্ঘ গোঁফও রূপালি ঝলক। পরণে চোস্ত-পাঞ্জাবি, হীরার বোতাম; অনামিকা, মধ্যমার একটিতে হীরার আংটি। ওনার সম্বন্ধে লেখক এর থেকে খুব বেশি জানেনও না, চেনেনও না। "জানি না, অন্তরের দিক থেকে তিনি কতটা নিষ্ঠুর, এখনো সে পরিচয় পাবার অবকাশ আমার হয়নি। আজ নিয়ে, তাঁর সঙ্গে আমার দু'দিনের দেখা। প্রথম দিন, জরাইকেলায়, তাঁর বাসভবনে। যদিও তাঁর বাসভবন কেবলমাত্র জরাইকেলাতেই নেই, তা ছড়িয়ে আছে, টাটানগর থেকে রাউরকেলা পর্যন্ত এমনকি জঙ্গলের অভ্যন্তরে, ছোটনাগরাতেও তার নিজস্ব বাড়ি এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী আছে। এই জঙ্গলের ভেতরে প্রথম এসে, তাঁর ছোটনাগরার বাড়িতেই। তারপরে, দ্বিতীয়বার দেখা এদেলবা, যেখান থেকে আমরা এখন চলেছি, থলকোবাদের দিকে। এখন আমি পুরোপুরি সিংজীর অতিথি।" *(পৃ: ৮৪১, ঐ)*

এই দুদিনে তাঁকে চিনে ওঠা কঠিন। তবুও লেখক এটুকু বুঝেছেন সুরাপান তাঁর একটা অভ্যাস, সময় নেই, যখন-তখন পান করেন। লেখক বন্দুক টোটা ভরতে দেখে জানতে চেয়েছিলেন এর কোনো দরকার আছে কিনা। উনি কৌতুক করে বলেছিলেন যে, রাইটার সাহেব চোখে দেখে মনে মনে সব বুলেট জমা করে রাখছেন, প্রয়োজনে কলমের ডগা দিয়ে বুলেট ছুঁড়বেন। কিন্তু "আমার তো তা না, শিকার পেলেই, আমি গুলি করবো। তা সে জানোয়ারই হোক, আর মানুষই হোক।" *(পৃ: ৮৪২, ঐ)* কথাটি শুনে লেখক চমকে উঠেছিলেন। কিন্তু সিংজীর উত্তর ছিল "কেন নয়? আপনি কি মনে করেন, পৃথিবীর সব মানুষই অবধ? এমন কিছু মানুষ তো থাকতে পারে, যাদের বধ করা ছাড়া, কোনো উপায় থাকে না।" *(পৃ: ৮৪২, ঐ)* লেখক সিংজীর অন্তঃস্থলে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে তল পান নি, নিজের মনেই সিংজীর কথার অর্থ খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু ভাববার অবকাশ পেলেন না কারণ সিংজী তাঁর ডানহাতের উচ্চবাহুতে একটা ক্ষতের দাগ দেখিয়ে বলেছিলেন যে ওটা গুলির দাগ। বছর চারেক আগে জরাইকেলায় সামটা নালার পাশ দিয়ে কোয়েনের দিকে হেঁটে যাওয়ার পথে গুলিটা তার বাহুতে লেগেছিল। হামা দিয়ে জঙ্গলের অন্যদিকে সরে গিয়ে প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়েছিলেন। পর পর অনেকগুলি গুলি ছুটে এসেছিল তাঁকে লক্ষ্য করে। সাপের মতো এঁকেবেঁকে পালিয়ে বেঁচেছিলেন, নিরস্ত্র ছিলেন তিনি। গুলির আওয়াজে বনমধ্যে যারা কাজ করছিল ও গৃহপালিত পশুরা চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছিল বলে বন্দুকধারী আর এগিয়ে আসতে পারেনি। লেখক বারে বারে সিংজীর মনের গহীনে ডুব দেওয়ার চেষ্টা করছেন। "সিংজীর পিছনে গুপ্তঘাতক ঘুরে বেড়ায় কেন? সে জবাবটা নিশ্চয়ই আছে, সিংজীর জীবনের ক্ষেত্রেই, যার কোনো এখনো পরিচয় আমি জানি না। এখন আমি শুধু তাঁর, এই বন পাহাড়ে, গাড়ি চালানো দেখছি।" *(পৃ: ৮৪২, ঐ)*

অপরাহ্নের বেলা। গাছের ছায়া দীর্ঘ। বনবেষ্টিত পাহাড়ী পথ দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। একদিকে বনপাহাড় আর একদিকে গভীর খাদ। ঘন বাঁক, প্রতিটি বাঁকেই সাবধান চিহ্ন, কালভার্ট, সেতুর আগে পথ নির্দেশ। এদেলবা ছেড়ে আসার পথে কিন্তু সিংজী সুরসতিয়াকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলেন। 'সুসুনকুড়ি' নামে সুরসতিয়াকে বলছিলেন, সুসুনকুড়ি মানে নাচের মেয়ে, মুন্ডা অথবা ওড়িয়া শব্দ। সিংজী একবার কালকূটকে বলেও ফেলেছিলেন "আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ কিছু এদেলবা ফেলে এলেন। আপনাকে মনে হচ্ছে মণিহারা অজগর, অন্ধকারে যে পথ দেখতে পাচ্ছে না।" *(পৃ: ৮৪২, ঐ)* লেখক কথাটা শুনে নিজেই চমকে উঠেছেন, নিজের অন্তঃস্থলে নিজেই উঁকি দিয়েছেন। একটা আড়ষ্টতা, লজ্জাবোধ লেখককে ঘিরে রেখেছে। আর বেদনাবোধ আবেগে হৃদয় টলটল করছে। সিংজী তার বাস্তববোধ নিয়ে আরও বলে চললেন যে, সারেন্ডার জঙ্গলে ঘুরতে এসে একটি মেয়ের সঙ্গে এমন ঘটনা কলকাতায় বসে ভাবা

সম্ভব ছিল না। কিন্তু লেখকের সাহস আছে। নারীপুরুষের মিলনের চুক্তিটা সব সমাজেই আছে। বনপাহাড়ে সুরসতিয়াদের নিয়মটা একটু অন্যরকম। যে যত বেশি পণ দিতে পারে সেই সব থেকে সুন্দরী মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারে। অবশ্য আদিতে নিয়ম ছিল অন্যরকম। মেয়েরা ছিল বীর্যশুল্কা। যে, তার গোষ্ঠীর সঙ্গে, যুদ্ধ করে হরণ করে নিয়ে যেতে পারত বরমাল্য তার গলায়ই পড়ত। কালের পরিবর্তনে এই নিয়মটা একটু বদলে গেছে। সিংজী বলেই চলেছেন "তবুও উৎসর্গটাই আসল কথা। আপনার যদি ইচ্ছা না থাকতো, আলাদা কথা। কিন্তু একজনের উৎসর্গের কাছে, আপনিও নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। আপনার সঙ্গে, আমাদের অনেকের সেখানেই তফাত। কারণ, উৎসর্গের থেকে, আমরা সভ্যতার ইতরামিটাকেই বেশী পছন্দ করি।" *(পৃ: ৮৪৩, ঐ)*

সিংজীর কথা শুনতে শুনতে সিংজীর অন্যদিকের ভাবনা, অভিজ্ঞতার জীবনবোধ স্পষ্ট হয়ে লেখকের চোখে ধরা পড়ছিল। দীর্ঘদিন বনসমাজে থাকতে থাকতে বনবাসী-বনবাসিনীদের জীবনের অনেক কিছুতেই তিনি ঋদ্ধ হয়েছেন। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কথাগুলো বলতে বলতে ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠছিলেন। সিংজীর যে কথাগুলো প্রথমে ঠাট্টার ছলে কোয়েলার জলধারার মত ছুটে চলছিল, শেষের দিকে সেই কথাগুলোই রাত্রির স্তব্ধতার মত গম্ভীর হয়ে গেল। "আপনাকে আমি ঋষিপুরুষ হতে বলছি না, তবে সুরসতিয়ার ব্যাপারটা আপনি ঋষিপুরুষের মতোই ভুলে যাবার চেষ্টা করবেন।" *(পৃ: ৮৪৩, ঐ)* সিংজী আরও বললেন, সুরসতিয়াও একদিন ভুলে যাবে কিন্তু মনের দাগটা থেকেই যাবে। কখনও নিজের মনের কথা নিজেই তৈরী করে সুর দিয়ে গাইবে। এই ঘটনার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলেন না তবুও ঘটনাটি ঘটেছে "আপনাদের দুজনের একটি আনন্দের স্মরণযোগ্য ঘটনা।" *(পৃ: ৮৪৩, ঐ)* লেখক-এর উত্তর ছিল "কিংবা আরো কিছু অধিক, জীবনকে নতুন করে জানা নিষ্পাপ কামনার মাধুর্য্যের ঐশ্বর্যকে পাওয়া।" *(পৃ: ৮৪৩, ঐ)*

ভাগ্যবান ছাড়া এমন পাওয়া সহজে পাওয়া যায় না বলে সিংজী একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। পাহাড়ের স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। শুধু গাড়ির ছুটে চলার শব্দ। থলকোবাদের প্রায় কাছে এসে সিংজী আবার কথা বলতে শুরু করলেন। রাইটার সাহেব কথার উত্তরে তিনি আরও জানালেন যে তিনি কাউকে চাপা দেন নি, কিন্তু নিজে জব্বর চাপা পড়েছিলেন। তাই বলে লেখক যেন ওনাকে মুর্দা না ভাবেন। এ'কথা বলার পরও বিষণ্ণ হাসিতে, বেলা শেষের রক্তিম আলোর ম্লানিমার মত, লেখককে বললেন যে তবে এক অর্থে তাকে মুর্দাই বলা যেতে পারে। সিংজীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথাগুলো শুনে লেখকের মনে হল, "তাঁর কথাগুলো সবই আলো অন্ধকারের ছায়ায় ঝাপ্‌সা। শুনতে একরকম শোনায়, আসলে বলেন অন্য কথা। সেই চর্যাপদের দোহার ভাষার মতো, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই যার নাম দিয়েছেন, সন্ধ্যাভাষা। আমি বলি গূঢ় ভাষা।" *(পৃ: ৮৪৫, ঐ)*

গাড়ি গ্রামের মধ্যে ঢুকছে। হঠাৎই দুটো বনবালার সামনে গাড়ি ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। বনবালাদের আর সরবার জায়গা নেই। সরতে গেলেই বারো চোদ্দ ফুট নীচে কোয়েনার জলে। সিংজীর সঙ্গে কোনো কথা নিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠছে। গ্রামে ঢুকতে ঢুকতে লেখক গ্রাম্য পরিবেশের ছবি চিত্রায়িত করেছেন। সেই সঙ্গে বনবালাদের সঙ্গে কথাবার্তা কি হলো তা কালকূটকে জানিয়েও দিলেন। সিংজী ঐ বনবালা দুটিকে আগামীকাল কাজের জন্য আহ্বান করেছেন। লেখকের এটা পছন্দ হয়নি এটা বুঝতে পেরে সিংজী বলেছেন যে ওরা এলে এই বন্য পরিবেশে একাকীত্ব দূর হবে। লেখক আর কোনো বনবালার সঙ্গে মিশতে চান না। গাড়ি আবার পাহাড়ে উঠে গেল এবং একটু পরেই বাংলোয় উঠে গেল। এদেলবা থেকে থলকোবাদ যাত্রাপথ শেষ। এক বনজীবন থেকে আর এক বনজীবনে প্রবেশ। দুপুর ২টার পর থেকে প্রাক সন্ধ্যা পর্যন্ত চলার পথে লেখক নিবিড় ভাবে প্রকৃতিকে দেখেছেন। সারেন্ডারেঞ্জে কোয়েনা কখনো কুলুধ্বনিতে মুখরিত কখনো দূরে, ধ্বনি শোনা যায় না, শুধু টিক্ টিক্ করে অস্তিত্ব জানান দেয়। দুর্গম এই পথে সিংজী চলেছেন লেখককে নিয়ে। এই চলার বারে বারে ফিরে এসেছে এদেলবার বনকন্যা সুরসতিয়ার কথা। লেখক সুরসতিয়ার স্মৃতিতে অবগাহন করছেন, "আজ দুপুরেই আমি ওর সঙ্গে , সেই গভীর জলাশয়ে স্নান করেছি। আমাদের ভূমিকা ছিল, পৃথিবীর আদি নারী পুরুষের এখনো তার রেষ থেকেই আমি মুক্ত নই" *(পৃ: ৮৪৫, ঐ)*

সুরসতিয়ার মধ্যে লেখক বনপ্রকৃতির সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছে। বনপ্রকৃতি ও মানবী বনপ্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধে লেখক বিমোহিত। নানারূপে নানাভাবে সুরসতিয়া আর লেখকের সম্পর্ক, ভাবনা তুলে ধরা হল। সুরসতিয়া আর এদেলবার বনভূমির সৌন্দর্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সিংজী বলেছেন সুসুনকুড়ি সুরসতিয়া ঘুম থেকে উঠেই লেখকে না দেখে সে কাঁদবে না, ঘুমোবে, ডিয়েং খাবে কাজ করতে পারবে না। কিন্তু একদিন ভুলে যাবে শুধু মনের কোণে দাগ থেকে যাবে। লেখক-সিংজীর কথাবার্তার মধ্যে কালকূটের মনের আচ্ছন্নতা, একটি আনন্দের স্মরণযোগ্য ঘটনা তুলে এনেছেন দু'জনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। সিংজী বনজীবনের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে এত বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যে অনেক কিছু তিনি অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকে বুঝতে পারেন, বলতে পারেন।

এরই সঙ্গে লেখক তুলে ধরেছেন সারেন্ডারেঞ্জের বনভূমির প্রতাপশালী ব্যক্তির ব্যক্তিত্বময়, বেপরোয়া, সংবেদনশীল, কৌতুকপ্রিয় একজন মানুষকে। বনজীবনের বনবাসী-বনবাসিনীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে বনসংস্কৃতির মিলন ঘটেছে সিংজীর চরিত্রে। লেখক সিংজীর 'জব্বর চাপা' ও 'মুর্দা' এই দুটো কথার উপর অন্তর্দৃষ্টি মেলে ধরেছেন। সন্ধান করেছেন কি সেই রহস্য। আত্মরক্ষার জন্য তাকে অস্ত্র হাতে রাখতেই হবে। এছাড়া শিকার পেলে

তিনি গুলি করবেনই। কেবল জানোয়ার নয়, মানুষের জন্যও দরকার হতে পারে বন্দুক। এই পর্যন্ত কাহিনীতে দুটি মানুষকে কেন্দ্র করে কাহিনী অন্যান্য মানুষের কথা উঠে এসেছে। এমনি করেই উঠে এসেছে রেঞ্জার-সাব বদরিকা প্রসাদ। যে ছোটনাগরা থেকে এদেলবা নিয়ে এসেছিল। তিনি মদ্যপান করে গাড়ী চালাতে গিয়ে দুটি ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েকে চাপা দিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কোন শাস্তি হয় নি, ছাড়া পেয়েছেন কিন্তু ছাড়া পাননি নিজের মনের দরবারে। সুরাপানের জন্যই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। পাপবোধে দীর্ণ। এই পর্যন্ত কাহিনী জীপের গতি মতো এগিয়ে গেছে। পাহাড়ী পথের বাঁকে বাঁকে রহস্যের মত একটার পর একটা ঘটনা জাল বুনে দিয়ে কাহিনীকে গতিময় করেছে।

এবারে প্রবেশ করা যাক পরবর্তী অংশে। সূর্য যখন পশ্চিমে ঢলে আকাশে লাল রঙের ছটা ছড়িয়ে অস্ত যাচ্ছে তখন তাঁরা সিংজীর বাংলোয় পৌঁছেছিলেন। নাতিদীর্ঘ পাহাড়ের ওপর একটি সুন্দর বাংলো। বাংলোর ডানদিকে মোরাম বিছানো চত্বর, কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা, রেলিং-এর ধারে ধারে কাঠের চেয়ার, বিভিন্ন রঙের ফুলের শহর, আর রেলিং-এর নীচ থেকে খাদ নেমে গিয়েছে, জঙ্গলে ঢাকা। চত্বরের সামনে, বাঁদিকে কুঞ্জবীথি যাওয়ার জন্য একটি সেতু। সেতু পেরিয়ে কিছুটা গেলে একটা কাঠের পাটাতন। তারপরেই রেলিং দিয়ে ঘেরা। মনোরম সেই দৃশ্য। বাংলোর নিচে খাদ বেয়ে মাঠ, সেই মাঠ জলাশয়ে নীচের দিকে চলে গেছে। লেখকের মনে হল তিনি যেন সেই মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন, বাংলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে লেখক অভিভূত। "আমি যেন অনেকটা, উঁচু শূন্য থেকে, পাখির মতো পাখা মেলে দিয়ে, দিগন্তের বনানীকে দেখতে পাচ্ছি।" *(পৃ: ৮৪৬, ঐ)* প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্যে "আমি প্রেমে মাতোয়ারা হয়েছি। এ বনের নাম দেবো প্রেম বন।" *(পৃ: ৮৪৬, ঐ)*

লেখক বনপ্রকৃতির সঙ্গে নিজসত্তাকে মিশিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্য পান করতে করতে সিংজী সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এমন একটা স্বপ্নময়, মায়াবী বনপরিবেশে নিয়ে আসার জন্য। লেখক বাংলোর দিকে ফিরে আসতে আসতে সিংজীর কাছে 'ভিউফাইডিং প্ল্যাটফরম'টি সম্বন্ধে জেনে নিচ্ছিলেন। সিংজীর কথা শুনতে শুনতেই লেখক তাঁর অন্তঃস্থলে ঢুকে পড়তে শুরু করেছেন। লেখকও সিংজীর কথপোকথন লক্ষ্য করলে ব্যাপারটা অনেকটা বোঝা যায় "এটা শিকারের জন্য বানানো হয়নি, চারিদিকের দৃশ্য দেখাবার জন্যই। তবে ধরুন, আমি যদি এখন দেখি, নিচের ওই মাঠ দিয়ে, একটা দাঁতালো শুয়োর চলে যাচ্ছে তাহলে কি আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকবো? আমি ছুটে গিয়ে, আমার সাইড হ্যামারটা নিয়ে এসে কাজে লাগাবো।" *(পৃ: ৮৪৬, ঐ)*

"কথাটা বোধহয় আপনার ভালো লাগলো না, না?" *(পৃ: ৮৪৭, ঐ)*

লেখক হেসে বলছেন ''সৌভাগ্যবশত আমি বন্দুক চালাতে শিখি নি।''*(পৃ: ৮৪৬, ঐ)*
সিংজী উত্তরে বলছেন ''তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, যারা বন্দুক চালাতে শিখেছে, তারা দুর্ভাগা?''*(পৃ: ৮৪৭, ঐ)*

তার পাল্টা প্রশ্নে লেখক কালকূটের উত্তর ছিল ''কিন্তু তাতে আমি কিছু মনে করছি না এই কারণে, আমাদের সকলের মধ্যেই বিভিন্নতা আছে, তথাপি আমরা মেলামেশা করি। কারণ এই কনট্রাস্টই আসলে সৌন্দর্য। শিকার করাটা আমার কাছে একটা অত্যন্ত উত্তেজক আর আনন্দের খেলার বিষয়। কিন্তু যারা বন্যপ্রাণীদের জন্য মমতাবোধ করেন, তাদের কাছে, আমি হয় তো একটা মূর্তিমান কালান্তক যম।''*(পৃ: ৮৪৭, ঐ)* লেখক ও সিংজীর শিকার সম্বন্ধে কথাবার্তাগুলো থেকে সিংজীর চরিত্রের একটা দিক লেখকের কাছে ক্রমশ আলোকিত হতে শুরু করেছে। লেখক ভাবছেন যে সিংজীর জীবনের ভাবনা চিন্তা অন্যরকম। তিনি বলেছেন ''তিনি আমার বনপ্রকৃতির মুগ্ধতা বোঝেন অথচ নিজে শিকারের কথা ভাবেন।''*(পৃ: ৮৪৬, ঐ)* শুধু তাই নয় দাঁতালো শুঁয়োর দেখতে পেলে তিনি কিছুতেই ওদের ছেড়ে দেন না, কেননা ওদের সামনে কেউ পড়লে ওরা ওদের ধারালো দাঁত দিয়ে তাকে ফালা ফালা করে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেবে। সিংজী বনপ্রকৃতির মধ্যে থাকতে থাকতে বনভূমির পশুপাখিদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানেন। তাই তিনি বলেছেন ''ভীরু আর সন্দিগ্ধ বলেই, ওরা আগেই সবাইকে শত্রু ভেবে আক্রমণ করে।'' *(পৃ: ৮৪৭, ঐ)* আর ময়ূরেরা খুঁটে খুঁটে নতুন গজিয়ে ওঠা চারা, কচিপাতা খেয়ে ফসলের ক্ষেত নষ্ট করে দেয়। বনবাসীরা তীর-ধনুক দিয়ে ওদের মেরে ফেলে। কিন্তু ময়ূর-হরিণ মারা নিষেধ অথচ বরাহ-বনমোরগ মানুষের খাদ্য হিসাবে চিহ্নিত বলে মারা নিষেধ নয়।

তিনি তো একবার মাত্র একুশ বছর বয়সে একটা দাঁতাল হাতি মেরেছিলেন চক্রধরপুরে। আট দশজন মানুষ মেরে ছিল, তার মধ্যে শিশুও ছিল, এক ডজন গরিবের চালাঘর ভেঙে মূর্তিমান ত্রাসের সঞ্চার করেছিলে সেই হাতিটি। অতএব... কিন্তু তিনি পশুপাখিদের ভালোই বাসেন একমাত্র বন্য শুয়োর ছাড়া। লেখক অত্যন্ত সুচারুভাবে সিংজীকে বনপ্রকৃতির পরিবেশে তাঁর হিংস্রতা ও কমনীয়তা ফুটিয়ে তুলেছেন। বনপরিবেশে শহুরে মানুষের বনপ্রকৃতি ও বনজীবনের মানসিকতায় গড়ে ওঠা চরিত্রটিকে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করাচ্ছেন। লেখক নিজ অভিজ্ঞতার রসে বন্য-মানসিকতার এক ব্যক্তিত্বময় মানুষ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন কালকূটীয় মহিমায়। তাঁর আতিথেয়তা বোধও কম নয়। এই বনবাংলোয় থাকবার জন্য রাজসিক ব্যবস্থা। নিজে শৌখিন, তার পরিচয় আগে একটু দেওয়া হয়েছে। বনবাংলোয় থাকবার জন্য রাজকীয় ব্যবস্থা। ঘরগুলোতে ড্রেসিংটেবিল, ওয়ারড্রব, নরম গদির বিছানা ধপধপে পরিষ্কার বালিশ, সংলগ্ন বাথরুম, বেসিনের কল ঘোরালেই জল পড়ে, এমনি সব ব্যবস্থা করা আছে। লেখক মনে মনে

ভাবছেন বিজলীর ব্যবস্থা নেই তবুও ম্যানপাওয়ারের দ্বারা এইরকম ব্যবস্থা এই বনমধ্যে বনবাংলোয়।

তিনি কথাচ্ছলে একটি সূক্ষ্মদিক নির্দেশ করেছেন "ম্যান পাওয়ারের দ্বারা। এখানে পাহাড়ের ওপর কুয়ো খনন করা অতি দুরূহ ব্যাপার। বাংলোতে তা আছে। বড় জলের ট্যাংকও আছে। লোকজন, কুয়োর জল দিয়ে, ট্যাংক ভরেছে।" *(পৃ: ৮৪৮, ঐ)* বনবাসীদের কষ্টসাধ্য শ্রমের বিনিময়ে বিজলীহীন বাংলোতে জলের সুবিধা। কালকূট তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই সব চিত্র তার কাহিনীতে খুবই সাধারণভাবে তুলে ধরেছেন। "খুব অসুবিধে হবে না তো?" *(পৃ: ৮৪৮, ঐ)* সিংজীর প্রশ্নের লেখক ধন্দে, বিনয় না বিদ্রূপ! তারপরে বললেন "এ জঙ্গলে, এরকম বাংলো কমই আছে। ইংরেজদের তৈরি। কাজ আর আরাম, দুটো বিষয়ে ওরা আমাদের থেকে একটু আলাদা বুঝতো। চলুন, আপনাকে একটু ঘুরিয়ে দেখাই।" *(পৃ: ৮৪৮, ঐ)* এইরকমই ছোট ছোট কথা, অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে চরিত্রগুলোর মানসিক চিন্তাভাবনা তুলে ধরেছেন। চরিত্রগুলোর জটিল দিকগুলো ধীরে ধীরে পাঠককুলের কাছে উন্মোচিত করেছেন। এবং কাহিনী যত এগিয়ে ততই কাহিনী পাহাড়ী পথের বাঁকের মত জটিলতায় আবর্তিত হয়েছে।

বারান্দায় বসে হ্যারিকেনের আলোতে বসে মুড়ি, ডিম ভাজা খেতে খেতে ছোটনাগরার তৃপ্তি ভৌমিকের কথা এসে পড়ল। তৃপ্তি ভৌমিক ছোটনাগরা থেকে লেখকের সঙ্গে এদেলবায় আসতে চেয়েছিল কিন্তু সেবাই যে তার কাজ। একটি মেয়ের প্রসববেদনা ওঠায় সে লেখকের সঙ্গী হয়ে উঠতে পারে নি। তৃপ্তি ভৌমিকের কথা সিংজীর সঙ্গে আলোচনা করতে করতে লেখক তার জন্য বেদনার্ত হয়েছিলেন। লেখক মনে মনে বেদনাবোধ করেছেন তৃপ্তি ভৌমিকের জন্য "ওর বয়সের মেয়েদের সীমন্তে সিঁদুর নিয়ে, ইতিমধ্যেই গৃহবধূরূপে কোথাও বিরাজ করার কথা। অথচ জীবন ওকে আজ কোথায় টেনে এনেছে। বলতে গেলে একরকমের বনবাস।" *(পৃ: ৮৪৯, ঐ)* লেখক তাই সিংজীকে বলেছিলেন যে মেয়েটা বড় দুঃখী। লেখকের কথা শুনে সিংজী হাসতে হাসতে বললেন যে "কিন্তু আমাদের দুঃখটা কেউ দেখতে চায় না।" *(পৃ: ৮৪৯, ঐ)* লেখক কালকূটীয় দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন সিংজীর ভেতরটা। সিংজীর টাকা পয়সা, লোকবল, প্রভাব-প্রতিপত্তি সব আছে ছেলে পোলিও রোগে আক্রান্ত, কিন্তু কোথায় যেন একটা বেদনার সুর ধ্বনিত হচ্ছে। কথা চলতে লাগল উভয়ের সঙ্গে, একটু লক্ষ্য করা যাক্, সিংজী লেখককে জিজ্ঞাসা করলেন "রাইটার সাহেব, আপনি জীবনে কীরকম শান্তি পেয়েছেন?" *(পৃ: ৮৪৯, ঐ)* লেখক অপ্রস্তুত হয়ে ভাবনার গভীরে ডুব দিলেন। শান্তি পাওয়ার ইচ্ছার গভীর উপলব্ধি না থাকলে এভাবে কেউ বলতে পারে না এটা লেখক বুঝেছেন। উত্তর দিলেন "সিংজী, শান্তি কথাটা গভীর অর্থব্যঞ্জক বলে আমার মনে হয়। ওটাও আপেক্ষিক, আমার ধারণা শান্তি ব্যাপারটা অনুভূতির বিষয়। সকলের শান্তি পাওয়ার অনুভূতিটা এক না।" *(পৃ: ৮৪৯, ঐ)* তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন সিংজীকে " জীবনে শান্তির

অবস্থান কীরকম?" উত্তরে সিংজী বলেছিলেন পরিস্কার করে "ও বস্তুটি আমার ভাগ্যে কখনো জোটে নি। আপনি অবিশ্যি ভিন্ন জগতের মানুষ, শান্তিকে আপনি সৃষ্টি করতে চান মনের মধ্যে। আমি আপনার মতো করে ভাবতে পারিনা। কিন্তু শান্তি? সে আমার কাছেও নেই, কোনোদিন ছিলও না।" *(পৃ: ৮৪৯, ঐ)*

সিংজী আপন খেয়ালে বলেই চলছেন তিনি যাকে বিয়ে করেছেন, সে পাটনার এক বড়লোকের মেয়ে, প্রভা তার নাম। "ও সুখী হতে পারে নি। আমি কি ওকে সুখী করবার চেষ্টা করেছি? না, তাও করি নি, কারণ আমি জানতাম, আমার সেই চেষ্টা হতো মেকী, আর সংঘর্ষ লাগতো অনিবার্য। তার ফল হয়েছে, আমরা সংঘর্ষ বাঁচাতে গিয়ে, দুজনে এক ঘর, অচেনা জীবনযাপন করেছি। যেন ভদ্র আর অমায়িক দুই আবাসিক। "প্রভার সঙ্গে যে সম্পর্কই থাক, আমিও আর দশজন সাধারণ বাবার মতোই, আমি আমার ছেলেকে ভালোবাসি। ওর রুগ্ন চেহারা, আর করুণ চোখের দিকে তাকিয়ে ---।" *(পৃ: ৮৫০, ঐ)*

হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় লেখক সিংজীর মুখে রক্তের ছটা লাগতে দেখেছেন। সুরাপানের জন্য হয় নি, কারণ অনেকক্ষণ ধরে সুরাপান করেন নি সিংজী। লেখক বুঝেছেন "তিনি তাঁর ভিতরের কোনো তীব্র অনুভূতির উদ্যত প্রকাশকে যেন দমন করছেন। সম্ভবত অসহায় পিতার, এই হলো যাতনার রূপ, সন্তানের জন্য প্রতিমুহূর্তে যার বুক ফাটছে। তাঁর চোখের সামনে, এখন হয়তো, সেই রুগ্ন একমাত্র সন্তানেরই সেই করুণ চোখ দুটি ভাসছে।" *(পৃ: ৮৫০, ঐ)*

লেখক সিংজীর বক্তব্যের ভেতর দিয়ে মানবজীবনকে অন্বেষণ করেছেন। সারেন্ডারেঞ্জের বৈচিত্রপূর্ণ প্রকৃতির মধ্যে যারা বসবাস করেন সেই বনপ্রকৃতির মানুষ থেকেই জীবনের রস আহরণ করছেন। নাগরিক জীবনে কী বনজীবনে সেই গর্বিত, দর্পিত অথচ অমায়িক মানুষটি থল্‌কোবাদের বনবাংলোয় এসে বিশেষক্ষণে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সিংজী নিজেই বলেছেন "আসলে আমি আমার অল্প বয়স থেকে চেয়ে এসেছি সুখ। স্বস্তি বলুন, আর শান্তি বলুন, ও সবের কথা আমি কখনো ভাবি নি। এই সুখের অন্বেষণই ছিল আমার জীবনের মূল কথা, আর সেই সুখ ---" *(পৃ: ৮৫০, ঐ)*

কথাটা সিংজী শেষ করতে পারেন নি আবছা অন্ধকারে একজনের উপস্থিতি টের পেয়েই চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। চৌকিদারের বেটার বৌ বিসোয়ারি বর্তন নিতে এসেছিল। সিংজী বিসোয়ারিকে দিয়েই দুটো গ্লাস আর জলের জগ আনিয়ে নিলেন। বিসোয়ারিকে বলেও দিলেন "আন্ধার মে এ্যায়সা চুপচাপ খাড়া মত্ রহো। মেরা সাথ বন্দুক হ্যাঁয়, গোলি মার দে সক্‌তা। সামঝি।" *(পৃ: ৮৫১, ঐ)* সিংজী ঘর থেকে স্কটল্যান্ডের সুরার বোতল এনে গ্লাসে ঢেলে লেখককে বললেন "গ্রহণ করুন কালকূট মহাশয়, আজ আপনাকে আমি আমার সুখের সন্ধানের কথা শোনাবো।" *(পৃ: ৮৫১,*

ঐ) তিনি মনে করতেন, "যা চেয়েছি, তা আমি পেয়েছি। এমনকি সীমাকেও পেয়েছিলাম। আর সেই সীমার কাছ থেকেই জানতে পারলাম সুখের আসল সংজ্ঞাটা কী। তার আগে আপনাকে সীমার পরিচয়টা দিয়ে নিই।" *(পৃ: ৮৫১, ঐ)* যেমন করে বনপ্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বনরহস্য ধীরে ধীরে জানতে পারা যায় সেইভাবে নিবিড় বনের বনবাংলোয় হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় সারেন্ডারেঞ্জের প্রভাবশালী ব্যাক্তি, আচার-আচরণে বনের রাজা, সিংজীর মনবনের নিবিড় ছায়ার অন্ধকারে লেখক প্রবেশ করছেন। প্রকৃতির কোলে বনের রাজা নিজের অন্তরের জমে থাকা বিষ উদ্‌গীরণ করছেন। সারেন্ডা বনের সব থেকে শ্রেষ্ঠ থলকোবাদের বাংলোয় বসে রাত্রের অন্ধকারে, একটানা ঝিঁঝির ডাকের মতোই একজন দুঃখী মানুষের মনের কথা শুনে গেলেন। এ দেশে, বনের আদিম অধিবাসীদের ধারণা, ঝিঁঝি কাঁদে। সিংজী কাঁদলেন কী না, আমি জানি না, শুনতে শুনতে মনে হলো, এই বন-প্রকৃতির সঙ্গে ওঁর স্বর যেন একাকার হয়ে গেল।"*(পৃ: ৮৫২, ঐ)* সুরার গ্লাসে চুমুক দিয়ে সীমার কথা বলার আগে সিংজী স্ত্রী প্রভার কথাও একটু বলে নিয়েছিলেন। সুন্দরী, শিক্ষিতা প্রভা সিংজীর কাছে আত্মসমর্পণ না করার জন্য সিংজীর আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল। কাজে কর্মে তেমন করে মন বসছিল না, মদ্যপানেও বিতৃষ্ণা। ঘটনাটা ঘটেছিল সেই সময়ে। একটা মামলার কাজে কটকে যেতে হয়েছিল। মামলার শেষে রাতে উকিলবাবু সিংজীকে নাটক দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। একটি ওড়িশা সামাজিক নাটকের নায়িকা ছিল সীমা। নাটক দেখতে দেখতে সিংজীর সবকিছু সীমাময় হয়ে গিয়েছিল। শ্যামবর্ণা, চেহারায় এমন একটা দীপ্তি যা সোজাসুজি পুরুষের রক্তে গিয়ে বেঁধে। রঙ্গমঞ্চে তার রূপসৌন্দর্য অবলোকন করে সিংজী মরিয়া হয়ে উকিলবাবুর কাছে সীমা সম্বন্ধে বিস্তারিত জেনে নিয়েছিলেন। সীমার বাবা নিকুঞ্জ দাস ওড়িয়া বিয়ে করেছিল। সীমার মামা, দাদামশাই এরা গঞ্জাম জেলা থেকে কটকে বসবাস করছিল। সীমার মামাবাড়ীতে আবার অন্ধ্রের প্রভাব ছিল, সীমার মা নাচতে পারতেন, গাইতেও জানতেন। কিন্তু পাবলিকলি কখনও গাইতে দেখেন নি সিংজী। কিন্তু সীমা সেই সূত্রেই নাচ-গান শিখেছিল, ছোটবেলা থেকে নানা অনুষ্ঠানে নাচ-গান করার জন্য পাটনা, দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ ও কলকাতা প্রভৃতি স্থানে দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। প্রতিভা ওর ছিল, কিন্তু প্রতিভাকে বিকশিত করে তোলার জন্য একজন শক্তিশালী গুরুর শিক্ষা সীমা পায়নি। অল্পবয়সেই সীমা দু'হাতে টাকা রোজগার করছে দেখে তার বাবা মেয়েকে কোনো বাধাই দেয়নি। সীমা সম্বন্ধে সিংজী বলেই চলেছেন। মুখের বিড়িটা নিভে যাওয়ার পর আবার ধরিয়ে নিয়ে সীমা সম্বন্ধে বললেন "আস্তে আস্তে দেখা গেল, মাত্র আঠারো ঊনিশ বছর বয়সের মধ্যেই, সীমা দাস হয়ে উঠলো ফেমাস ভোলাপুচুয়াস গার্ল।" *(পৃ: ৮৫০, ঐ)* সিংজীর সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয়েছিল তখন ওর বয়স্ কুড়ি বছর আর এখন ২৪ বছর। লেখক সিংজীর মুখ থেকে সীমার জীবনের কথা, পরিবারের

কথা সব শুনেন। সিংজী ব্যথাতুর হৃদয়ে, তার প্রেমকুসুম উদ্ভাসিত হওয়ার কথা সিংজী সুরাপানের নেশার ঘোরে বলে যাচ্ছেন। স্বাভাবিক ভাবে যে কথা বলা যায় না, অস্বস্তি লাগে সেই কথাই তিনি বলে চলেছেন। সিংজী তার প্রিয় নারীকে বলেছেন যে, 'বিখ্যাত স্বেচ্ছাচারিণী মেয়ে'। সীমা সম্বন্ধে উকিলবাবুর কাছে জেনে নিয়ে সেই রাত্রেই উকিলবাবু সিংজীকে নিয়ে সীমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। সীমা তখন চাটুকার ও তোষামোদকারিদের মধ্যমণি হয়ে আছে। উকিলবাবু সিংজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। "তিনি বোধহয় ইচ্ছে করেই, আমার বংশগত আভিজাত্য, ব্যবসা বাণিজ্য আর্থিক অবস্থার কথাও বলেছিলেন। আর আমি যে নাটক দেখে, সীমার গুণ এবং প্রতিভায় একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি তাও বলেছিলেন।" *(পৃ: ৮৫৩, ঐ)*

সীমার বাড়ীতে গিয়ে সিংজী সীমার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলেন না। "সীমা যতবারই আমার দিকে তাকাচ্ছিল, ততবারই চোখাচোখি হচ্ছিল। আমার দৃষ্টির মধ্যে, আবেগ, মুগ্ধতা, কোনো কিছুই গোপন করার চেষ্টা করি নি।" *(পৃ: ৮৫৩, ঐ)* সীমা দাস চাটুকার পরিবৃত হয়ে থাকার ফলে লেখক ও উকিলবাবু চলে যেতে চেয়েছিলেন। এরপরের ঘটনা জলবৎ। তিনদিনের মধ্যে সিংজী সীমাকে নিয়ে গেলেন রাউরকেলায়। রাউরকেলার, স্টীল প্ল্যান্টের জার্মান ক্লাব থেকে, সমস্ত অফিসার আর কন্ট্রাক্টরের দল সীমাকে নিয়ে মেতে উঠেছিল। দুদিন নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল সীমা দাস, সবাই সীমার জয়জয়কার করছে। তারপর সীমাকে নিয়ে চলে এসেছিলেন থল্‌কোবাদের এই বাংলোয়। "সীমা আমার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে দিয়েছিল, কিংবা তার অধিক, ও নিজেকে আমার কাছে উৎসর্গ করেছিল। আত্মসমর্পণ যে আমার কাছে কেউ আগে করে নি, তা না, কিন্তু তাদের কারোর জন্য আমি কখনো সে উন্মাদনা বোধ করি নি। আপনি কেবল রাইটার না, পুরুষমানুষ, আপনি খানিকটা নিশ্চয়ই বুঝবেন মাতালের যেমন মদ, শিশুর যেমন মাতৃস্তনের নেশা, কিছুতেই মিটতে চায় না, সীমা আমার কাছে তাই।" *(পৃ: ৮৫৪, ঐ)* এই বাংলোয় তারা দুজনে কাজের লোকেদের সামনে নির্লজ্জের মতো ব্যবহার করেছেন, দরজা বন্ধ করতে ভুলে যেতেন। সীমারূপ মদের খোয়ারি কিছুতেই কাটতো না সিংজীর। "সুখের অনুভূতি যে কতো তীব্র হতে পারে— একেবারে নিছক যৌবনের সুখের কথাই বলছি, সীমার সঙ্গে এই বাংলোতে কাটাবার আগে, তা জানা ছিল না।" *(পৃ: ৮৫৪, ঐ)*

সীমার সঙ্গে প্রেমানুভূতির কথা বলতে বলতে সিংজী হঠাৎ থেমে গেলেন। লেখকের মনে হল সিংজীর গলার কাছে যেন কিছু ঠেকে গেল, সিংজী উত্তেজনায় কথা বলতে পারছেন না। কালকূট সিংজীর বেদনার্ত হৃদয়ের মর্মবেদনা শুনতে পেয়েছেন। কোয়েনার মতো সিংজী সীমার প্রতি প্রেমানুরাগের নির্ঝরিণী বইয়ে দিয়েছেন। বাঁকে বাঁকে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে সেই গতি, বিচিত্র তার বর্ণ-গন্ধ-রস। সীমা পরের দিন ফিলিপের সঙ্গে আসবে এই থলকোবাদের বনবাংলোয়। সীমার সঙ্গে

সিংজীর প্রেমে মাতামাতির দিন দু'বছর স্থায়ী ছিল। সিংজী সীমাকে নিয়ে সারা ভারত কখনো নিজের বাড়িতে, কখনো উড়োজাহাজে, কখনো রেলগাড়িতে ঘুরেছেন। বাড়ি-গাড়ি, টাকাপয়সা সব দিয়েছিলেন কিন্তু দিতে পারেন নি স্ত্রীর মর্যাদা। স্ত্রী প্রভাকে সিংজী দুঃখ দিতে পারেন নি। সীমা সিংজীর কাছে কোনো সন্তান কামনা করেনি, অকালে একটি মৃত সন্তান প্রসব করেছিল। সিংজীর বিশ্বাস, ঐ দুর্ঘটনাটি সীমা ইচ্ছাকৃত ঘটিয়েছিল, সীমা সিংজীর সন্তানের মা হতে চায়নি। তীব্র সুখের বিষক্রিয়ায় সীমা পরিবর্তিত হতে থাকল। রাউরকেলায় সীমার জার্মান সাহেব ফিলিপের সঙ্গে চাহনি, হাসিভঙ্গি দেখে সিংজী বুঝে গেলেন "সীমা আর আমার নেই, ও জার্মান সাহেব ফিলিপের প্রেমিকা। বোঝামাত্রই, সেটা সাপের ছোবলের মত লাগল। ফিলিপের সঙ্গে, আমিই সীমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। সে জানতো, আমার সঙ্গে সীমার কী সম্পর্ক। তাকে আমি দোষ দিই না। দোষ কি সীমাও করেছে? যুক্তির দিক দিয়ে দেখতে গেলে করে নি। তবু, রাইটার সাহেব, মন মানে না। এখন আপনি যে অজিত সিং এর সঙ্গে বসে আছেন, সে একটা ছোবল খাওয়া প্রাণী। আপনি ভাই মিথ্যুক, আপনার নাম কেন কালকূট হবে? কালকূট হলাম আমি।"*(পৃ: ৮৫৪, ঐ)*

সিংজী ও লেখকের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে লেখক একটি ভারাক্রান্ত হৃদয়ের কথা, সীমার স্মৃতিতে ডুবে থাকা ভগ্নহৃদয়ের কথা দরদী ভাষায় প্রকাশ করেছেন। সিংজীর দীর্ঘশ্বাস বনের ঝরাপাতার সঙ্গে মিশে গিয়ে বনবাংলোয় মর্মরধ্বনি তুলেছে। লেখকের ভাবান্তর যেখানে এত গভীর প্রেমলীলা চলেছে সেখানে তারই প্রেমিকা আসছে রাত কাটাতে অন্য পুরুষ তথা অন্য প্রেমিকের সঙ্গে? সিংজী সত্যি সত্যিই হাসছেন না। তার ভিতরে ক্ষয় ধরেছে, সীমাহীন বেদনার শূন্যতা তার হৃদয়কে প্রতি মুহূর্তে ক্ষত-বিক্ষত করছে। ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় নিয়ে সিংজী বাংলোতেই তার আশায় দিন গুণছেন। লেখক সিংজী-সীমার প্রেমকাহিনী শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব। শুধু লেখক নয়, পাঠককুলও। কাহিনীর নিপুণ বিন্যাসে পাঠককুলের মধ্যেও আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু সিংজীর কাহিনী শেষ হয় না। বুধন, চৌকিদারের ছেলে, জঙ্গলকা ফায়ার গার্ড বারান্দার নীচে দাঁড়িয়েছিল, দূরে ওর স্ত্রী বিসোয়ারি, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, সেটা পুরো বোঝা যায় না। ওদের কথাও লেখক বুঝতে পারেন নি। কিন্তু সিংজী বুঝতে পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন বন্দুক হাতে করে নিয়ে। এবং ধমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই বেত্‌মিজ ঠার যা, ইধার আ।"*(পৃ: ৮৫৫, ঐ)* কোমল স্বরে সিংজী বলেন "ক্যায়া পিয়েগা রে? সড়্গা না মদ্‌গম?"*(পৃ: ৮৫৫, ঐ)* পকেট থেকে দুটো টাকা ওর হাতে দিয়ে "যা কিন্‌কে লে আয়, লেকিন বহু কো সাথ পিনা, হ্যাঁ"*(পৃ: ৮৫৫, ঐ)*

সিংজী আর লেখক সুরা পান করছিলেন, দেখে তাই বুধনের বৌ বিসোয়ারি ঠেলে পাঠিয়েছিল বুধনকে লেখকের কাছে, ছল করে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যাতে তাদের সুরা গ্লাসে একটু

হুহুস্কি/সুরাপান করতে পারে। সিংজী ওদের ভাষা, ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বুধনকে যা বলেছিলেন তার কিছু অংশ তুলে দেখানো হয়েছে। বনের মানুষের সঙ্গে থাকতে থাকতে তিনি বনবাসীদের আচার আচরণ সবই মোটামুটি জানেন। ওরা মদ্‌গম বা সড়াব অনেক বেশি পছন্দ করবে হুহুস্কির থেকে। সিংজীর কাছে টাকা পেয়ে মুক্ত মুরগীর মতো অন্ধকারে ছুটে গিয়েছিল নেশার বস্তু আনার জন্য। লেখক ছোট ছোট কথা, ঘটনার মধ্য দিয়ে বনবাসীদের জীবনাচার, তার সঙ্গে সিংজীর ব্যাঘ্রসদৃশ আচরণের মধ্য দিয়েও কোমল একটি দিক তুলে ধরেছেন। সীমা কাহিনী বলবার ফাঁকে ফাঁকে লেখক অন্য প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন কাহিনীর গতিতে, পাঠকের চাহিদা জিইয়ে রেখেছেন, একঘেয়েমির অন্ত ঘটিয়েছেন। তাই সীমা কাহিনী শেষ করতে গিয়েও শেষ হয়নি। অরণ্যের গভীরতা, সৌন্দর্য যেমন লেখককে থল্‌কোবাদের বাংলো পর্যন্ত টেনে এনেছে তেমনি সীমাকাহিনীও লেখককে কোয়েনার বাঁকে বাঁকে যে রহস্য লুকিয়ে আছে, সেই রহস্যের দিকে আকর্ষিত করেছে।

বুধন চলে যাওয়ার পর সিংজী লেখককে নিয়ে ভিউ পয়েন্টের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বলে উঠলেন, ''ইয়েস, টিজ দ্য প্লেগ্ অব্ গ্রেট ওয়ানস প্রোরোগেটিভড্ অব দ্য লেস্ দ্যান দ্য বেস্ টিজ ডেস্টিনি আন্‌শানেবল, লাইক ডেথ/এভন্ দেন দিস ফরকড্ প্লেগ ইজ ফেটেড টু আস/হোয়েন উই ডুনট কুইকেন। লুক হোয়্যার শী কামস্!''*(পৃ: ৮৫৬, ঐ)*

সিংজী বলেই লেখককে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন কিন্তু লেখক দ্বিতীয়যার ধূলা ধোঁয়াহীন কুহকী জ্যোৎস্নায় কিছুই দেখতে না পেলেও মনে মনে যেন সেই ভয়ংকরকে দেখতে পেয়েছিলেন। তাই লেখক বলছেন ''কিন্তু আমি যেন রুদ্ধশ্বাস প্রত্যাশায় তাকালাম, ডেসিডেমোনিয়ার আবির্ভাবকে দেখতে পাবো। ইয়াগোর সেই সর্বনাশা অপবাদের পরেই, ওথেলো এই কথাগুলো বলে উঠেছিল। আমি সিংজীর দিকে তাকালাম। সিল্কের লুঙ্গির ওপরে, পাঞ্জাবি গায়ে পয়েন্ট টু বোর রাইফেল তাঁর ডান হাতে। তাঁর এই থলকোবাদ বাংলোর পরিবেশকে বদলিয়ে দিল।''*(পৃ: ৮৫৬, ঐ)* অপূর্ব তার অভিনয় তার বলার ভঙ্গি তার সঙ্গে সুন্দর উচ্চারণ।

লেখকের মনের মধ্যে ওথেলোর কথাগুলো খচ্‌খচ্ করতে লাগল। কিন্তু সিংজী বললেন যে হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাই বলে ফেললেন, তিনি অভিনয় জানেন না চুরি জোচ্চুরির নানা কায়দা কানুন জানেন, তার সঙ্গে জানেন বন্দুক চালাতে। ভিউ প্লাটফরমের রেলিং ঘেরা মাচার ওপরে গিয়ে দাঁড়াতেই মাচা ক্যাচ ক্যাচ মচ্‌মচ্ আওয়াজ হলো। লেখক কালকূটের গাটা সিরসির করে উঠলো এই ভেবে প্রায় আটশো হাজার ফুট উঁচু। প্লাটফরম ভেঙে পড়ে গেলেই কোনো গাছের ডালে বিদ্ধ হয়ে ঝুলে থাকতে হবে। মাচার কাছে, ঝোপের মধ্যে একটা বড়সড় জন্তুর খস্‌খস্ আওয়াজ হতেই সিংজী সতর্ক, গুরুয়াকে চিৎকার করে ডেকে টর্চ আনিয়ে নিলেন। ডান হাতে বন্দুক তুলে নিয়ে আলোর বৃত্তে নল তাক করে ট্রিগারে রাখলেন। হত্যার জন্য প্রস্তুত। লেখক

কখনো এরকম হত্যার সম্মুখনী হননি। রীতিমত উত্তেজনা বোধ করতে লাগলেন। কিন্তু টর্চের আলোয় কিছু দেখা গেল না, সিংজী জন্তুর আওয়াজে বুঝতে পেরেছিলেন বুনো শুয়োর। তাকে হত্যা করবেনই, লেখককে টর্চটা দিলেন প্রয়োজন অনুসারে আলো ফেলার নির্দেশ দেবেন এইজন্য।

কিন্তু কিছু দেখতে না পাওয়ায় লেখকের উত্তেজনা কমে আসায় লেখক বললেন "ছেড়ে দিন না। বেচারি তো জানতে পারে নি, সিংজী সাহেব আজ বাংলোয় এসেছেন। জানলে কখনোই আসতো না।"*(পৃ: ৮৫৭, ঐ)* সিংজী হা হা করে হেসে উঠলেন, কথাটার জন্য লেখককে প্রশংসা করলেন। ঝোপের মধ্যে আবার শব্দ হলেই লেখককে টর্চ জ্বালতে নির্দেশ দিলেন না। বললেন "থাক্, ছেড়ে দিন। আমার কথা বেচারি যখন জানেই না, তখন আর চেষ্টা করবো না। মারবো যখন, তখন আগে জানিয়েই মারবো, আমি এসেছি। আমার হাতেই তোমাকে —"*(পৃ: ৮৫৭, ঐ)* আবার গেলাসে চুমুক দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে শিকারের গল্প করতে লাগলেন। থলকোবাদের বাংলোয় এলেই শিকার করেছেন, শুধু একবার বাদে — সেবার সীমাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। সীমাকে নিয়ে আরো দুবার এসেছেন, এরপরে সীমা ছেড়ে যাওয়ার পরেও এসেছেন। ধীরে ধীরে সীমা প্রসঙ্গ উঠতে শুরু করেছে। সিংজী বলতে লাগলেন "শুনেছি হত্যাকারীরা, হত্যার পরে, সেখানে একবার ফিরে আসে। আমি সেই কারণে আসি না। কোনো সুখ বা আনন্দের জন্যেও আসি না। যন্ত্রণার মধ্যে বোধহয় একটা আরাম পাওয়া যায়, কিংবা তা বেড়ে ওঠে। যাই হোক, ঘুরে ফিরে বারে বারে এখানে আমার আসতে ইচ্ছা করে।"*(পৃ: ৮৫৭, ঐ)* লেখক সিংজীর অন্তরের রুদ্ধকক্ষে উঁকি দিয়েছেন— সেই দরজা খুলেছে, সিংজীর বেদনাকে বেদনার তুলিতে চিত্রায়িত করেছেন, পাঠককুলের হৃদয়েও সিংজীর বেদনার অঙ্কুর রোপন করে দিয়েছেন। একটা মরমী ব্যথা পাঠককুলের অন্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে সিংজীর মুখে ওথেলোর সেই উক্তি ও বুনো শুয়োরকে না মেরে ছেড়ে দেওয়ার পরে সেই উক্তি, 'আমার হাতে তোমাকে...' এটাও একটা রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তের ভাবনায় আতঙ্কিত করে তোলে।

সিংজী লেখককে জানিয়েছেন যে সীমা তাকে পুরোপুরি ছেড়ে যায় নি। রাউরকেলায় সিংজীর দেওয়া বাড়িতেও মাঝে মাঝে ফিলিপের কোয়াটার ছেড়ে থাকতে আসে। "আমি রাউরকেলায় গেলে, ওর ওখানে আমাকে ডেকে পাঠায়, সে হিসাবে ও আমাকে বঞ্চিত করতে চায় না।"*(পৃ: ৮৫৭, ঐ)* সীমার সঙ্গে ফিলিপের প্রেমের সম্পর্ককে বিবৃত করেছেন সিংজী সাহেব। সীমার সঙ্গে ফিলিপের হৃদয় দেওয়া - নেওয়ার সম্পর্ক যখন সিংজীর রাউরকেলার বন্ধুগোষ্ঠী জানাতো তাতে তিনি কান দেননি কিন্তু তার মস্তিষ্কে বিদ্ধ হয়ে থাকত। তবু তিনি সীমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি "ডিগনিটির কথা বলবো না, ডিগনিটির কোনো প্রশ্ন এখানে নেই। সীমা আমার বিবাহিত স্ত্রী না। আমি নিজে আমার বিবাহিতা স্ত্রীকেই বা কতটুকু সুখী বা সম্মানিত করতে

পেরেছি। পারি নি। সেখানে বরং প্রভা ওর ডিগনিটি বজায় রেখেছে, ও আমার সঙ্গে কখনো আপোস করতে চায়নি। আমি মনে মনে মানি, প্রভারই জয় হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে?" *(পৃ: ৮৫৮, ঐ)*

লেখক লক্ষ করেছেন— সিংজীর গলার স্বর একেবারে খাদে নেমে যাওয়া তানপুরার তারের মোটা ঝংকারের মতো হয়ে যাচ্ছে। সীমা ফিলিপের সঙ্গে আগামীকাল আসছে, সিংজী প্রতীক্ষা করছেন ওদের জন্য। লেখক যে "সীমাকে আপনার প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতাটাই ব্যক্ত করবেন।" *(পৃ: ৮৫৮, ঐ)* সীমা কখনো ফিলিপের সঙ্গে ওর সম্পর্ক নিয়ে কোনো কথাই বলে নি। "আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ওর মনের কথা স্পষ্ট পড়তে পেরেছি। তা হল এই 'আমার জীবন বা আচরণের ক্ষেত্রে কারোর হস্তক্ষেপ আমি মানবো না। যার সঙ্গে ইচ্ছা, তার সঙ্গেই মিশবো। আমি কারোর কাছেই দাসখত্ লিখে দিই নি।' এসব কথা ওর মুখ ফুটে বলবার দরকার ছিল না। আমি সবই বুঝতে পারতাম, এখনো পারি।" *(পৃ: ৮৫৮, ঐ)* সিংজী সীমার চরিত্রগত দিকটি তুলে ধরছেন "সীমা ওর নিজেকে আমার কাছে তুলে দিতে চেয়েছে, আমি নিতে পারিনি। কেন নিতে পারিনি, সেটাও সীমাই সব থেকে ভালো বুঝেছে। বুঝেও আমার প্রাণের ইচ্ছাকে আমল দিতে চায় নি। কারণ — কারণ তো একটাই, আমি প্রাণে মরেছি, ও তো মরে নি। ও যা ছিল, তা-ই আছে, কী ফিরিয়ে নেবো ওর কাছ থেকে" *(পৃ: ৮৫৯, ঐ)*

প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের হাহাকার লেখক প্রতি সংলাপে সংলাপে তুলে ধরেছেন। যন্ত্রণায় সিংজীর মাথাটা বুকের কাছে নেমে এসেছে। রাইটার সাহেবকে সিংজী বলেই চলেছেন "রাইটার সাহেব, এ সংসারে দু'জনের জন্য, আমি সব কিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি। একজন সীমা, আর একজন টাটার হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে, আমার ছেলে — আমার লাল।" তার ভালোবাসার দু'জন মানুষকে তিনি তেমন নিজের করে পাবেন না। তিনি সীমাকে ভালোবেসে মরেছেন। কিন্তু সীমা মরে নি। সীমা ফিলিপকেও ভালবাসে না। সীমা উর্বশীর অংশ নিয়ে জন্মেছে। ও স্বর্বেশ্যা, কিন্তু মর্ত্যের গণিকা কখনোই নয়। "উর্বশীর জন্য, শক্তিশালী রাজাকেও অভিশপ্ত হতে দেখা গেছে। সম্ভবত ওদের জন্মলগ্নেই হৃদয় নামক বস্তুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সীমা হল সেইরকম স্বর্বেশ্যা। এক অর্থে, প্রেমই তার প্রকৃতি, জীবনের একমাত্র ধর্ম। ব্যক্তির কোনো সত্তা সেখানে স্থান পেতে পারে না। ব্যক্তি মানুষ যে মুহূর্তে ওর প্রেমে পড়বে, সেই মুহূর্তেই তার কপালে লেগে যাবে অভিশাপের দাগ। কটকে কতজনের লেগেছিল জানি না। বোধহয় ফিলিপও সেই দাগ নিয়েই একদিন জার্মানীতে ফিরে যাবে। কিন্তু ---" *(পৃ: ৮৫৯, ঐ)*

লেখক যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা বাতাসের তরঙ্গের স্বর সিংজীর কণ্ঠস্বরে শুনতে পেলেন "কিন্তু, মানুষ কী করবে? সে যে নিঃশেষে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।" *(পৃ: ৮৫৯, ঐ)* লেখক কী আশ্চর্য দক্ষতায় একটি ভেতরে ক্ষয়ে যাওয়া প্রেমিক মানুষের অন্তর্বেদনাকে তুলে ধরেছেন। বাইরে

থেকে সিংজীকে ব্যাঘ্রসদৃশ মনে হলেও ভেতরে যে একটা কোমল মন আছে, সেই কোমল মনটাকে লেখক তুলে এনেছেন কালকূটের লেখনীর স্বকীয় দক্ষতায়। লেখক তাঁর এই বেদনাকে কাব্যিক পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। তিনি আবার শুনতে পাচ্ছেন দূর থেকে ভেসে আসা সেই ওথেলোর স্বর সিংজীর মুখে "পুট আউট দ্য লাইট, অ্যান্ড পুট আউট দি লাইট। ইফ্ আই কোয়েঞ্চ দী, দো ফ্লেমিং মিনিস্টার, আই ক্যান এগেন দাই ফরমার লাইট রেস্টোর, শ্যুড আই রিপেন্ট মী; বাট ওয়ানস্ পুট আউট দ্য লাইট ...।" *(পৃ: ৮৫৯, ঐ)* ওথেলো ডেসসিমোনাকে হত্যা করতে চলেছেন — এই দৃশ্য লেখকের চোখে ভেসে আসছে। লেখক থলকোবাদের বনবাংলোর এক মাচায় বসে যেন প্রত্যক্ষ করছেন এক দিগ্বিজয়ী জেনারেলের ক্যাসল অট্টালিকার হৃদয়বিদারক প্রতিহিংসার ঘটনা। লেখকের "বুকের মধ্যে যেন সিংজীর স্বর ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল। আমি তার দিকে তাকালাম। দেখলাম তিনি ওপর দিকে মুখ করে, অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন।" *(পৃ: ৮৬০, ঐ)* লেখক সীমা-সিংজীর প্রেমকে এক কাব্যিক মহিমায় উন্নীত করেছেন। দেখা যাক পরবর্তী কাহিনী কী রহস্য উন্মোচিত হয়।

লেখক শঙ্কিত বোধ করছেন। সীমা যখন সিংজীকে ছেড়ে চলেই গেছে তাহলে কী দরকার ছিল সীমার ফিলিপকে এখানে নিয়ে আসার। সিংজীর যে চরিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে তাতে লেখক মনে করেছেন এ প্রস্তাব কখনোই সিংজী দেন নি। নিশ্চয়ই ওরাই দিয়েছেন। "সিংজী তাঁর অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করেছেন। সেটা তার চরিত্রানুগ বটে, তথাপি, আমি স্বস্তি বোধ করছি না।" *(পৃ: ৮৬০, ঐ)*

সীমা কাহিনী শেষ, এখন পরদিন সকালে তার আসার প্রতীক্ষায় বনবাংলো। পরদিন সকালে সিংজী জানালেন যে, সেই আদিবাসী মেয়ে দুটি কাজ করতে এসেছে, এটা তাদের উপরি পাওনা। ওরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মী, বনকে পরিষ্কার রাখাই ওদের কাজ, বনবিভাগ ওদের পয়সা দেয় না। বনের মধ্যে ঘর বানিয়ে থাকতে দেয়। চাষ করার জন্য নিষ্কর জমি দেয়। ওরা বিনিময়ে ঝাট দিয়ে পাতা পরিষ্কার করে, কোথাও কোদাল চালায় আবার কখনো চাষবাস করে। দুটি যুবতী মেয়ে সবসময় বনবাংলোয় থাকবে, ফাইপরমাস খাটবে, সিংজীর এসব ভালো লাগে, তাই ওদের দু'টাকা রোজে কাজে লাগিয়েছেন, হয়তো লেখকেরও ওদের ভালো লাগবে। একথা বলে সিংজী সুরসতিয়ার কথা মনে করিয়ে দিতে চাইছেন বলে লেখকের মনে হল। লেখক এখানে সুরসতিয়ার কথা স্মরণ করেছেন, "জীবনে আমার একটি বিশেষ প্রার্থনা, সুরসতিয়ার সঙ্গে যেন আর কখনোই সাক্ষাৎ না হয়। আমাদের দুজনের দুজনকে যা দেবার ছিল, তা আমরা দেওয়া নেওয়া করেছি। জীবনে সব কিছুর হিসাব মেলানো যায় না, কে কী পেলাম, কাকে কতোটা দিলাম। আমি আর সুরসতিয়া, জীবনের তথাকথিত বাস্তবের সীমানা লঙঘন করেছিলাম। কিন্তু

সেটাও জীবনের নির্দেশেই, এবং একই কারণে, আমরা আমাদের জীবনের পথে ফিরে গিয়েছি।" *(পৃ: ৮৬০, ঐ)*

সীমা-সিংজীর প্রেমকাহিনীর ঘটনার সঙ্গে লেখক তাঁর সুরসতিয়ার দুদিনের ক্ষণস্থায়ী প্রেমকে স্মরণ করেছেন। সুরসতিয়ার সঙ্গে লেখক লোরের জলে আদিম-লীলায় মেতে উঠেছিলেন। তার সুখস্মৃতির রেশ মেলানোর আগেই বিচ্ছেদ ঘটেছিল। এই কাহিনীর প্রথম দিকে দেখেছি অনেকটা স্থান সুরসতিয়া জুড়ে। লেখকের সুরসতিয়ার সঙ্গে প্রেম বনপ্রকৃতির সঙ্গে প্রেম মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। লেখক তাঁর স্বপ্নময় বনপ্রকৃতিরূপী বনবালার প্রেমকে নিবিড় বনের স্বপ্নময় অনুভূতির মধ্যে রেখে দিতে চান। লেখক ফিরে আর সাক্ষাৎ চান না কিন্তু সীমা-সিংজীর প্রেমকাহিনী বিচ্ছেদেই ইতি হয়নি। সীমা-ফিলিপ আসছে তারই বনবাংলোতে। প্রতীক্ষা! শুধু একটু সময়ের প্রতীক্ষা! সিংজী বাইরের দিকে তাকিয়ে উৎকর্ণ হয়ে কিছু শোনবার চেষ্টা করেই জানান দিলেন একটা গাড়ী আসছে। কিন্তু ট্রাক বা লরির মতো ভারী গাড়ী নয়। সিংজী অনুমান করছেন যে হয়ত ফিলিপরাই এসে যাচ্ছে। সিংজী ভাবছেন যে কত ভোরে ওরা রওনা দিতে পারে যে, এত সকালেই এসে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা এসে পড়ল। লেখক বাথরুম থেকেই ফিলিপের মুখে বনবাংলোর প্রশংসা, নারীকণ্ঠের হাসি ও কথা আর সিংজীর কথা "আমি সরকারের ওপর সরকার নই, এই বনকে আমি ভালবাসি। এই বন আমার প্রেম। কিন্তু, আবার ঠিকাদার হিসাবে এই বনই আমি ছিন্নভিন্ন টুকরো করি।" *(পৃ: ৮৬১ ঐ)* শুনতে পাচ্ছিলেন। আরও শুনতে পাচ্ছেন নারীকণ্ঠের আওয়াজ "কোথায় সিং, তোমার লেখক অতিথি কোথায়? তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না তো? তাঁকে নিয়ে আসো নি?" *(পৃ: ৮৬০, ঐ)* বাথরুম থেকে বেরিয়ে প্রথম দর্শনেই লেখক বুঝতে পেরেছিলেন সিংজী একটুও বাড়িয়ে বলেন নি। সিংজীর ভাষায় স্বর্বেশা ঊর্বশী, পুরুষের রক্তে আগুন ধরানো প্রকৃতি রূপ। প্রথম দর্শনেই লেখক সীমা দাসের রূপ বর্ণনা করেছেন, "তার চোখের তারা দুটি চঞ্চল না, হঠাৎ দেখলে মনে হয় চোখ দুটি যেন ঢুলঢুল অথচ উজ্জ্বল। তার নাক টিকলো, টানা ভুরু আর এইরকম ঠোঁটকেই বোধহয় বিম্বোষ্ঠ বলে। পাতলা না, মোটাও না। মনে করিয়ে দেয়, ভারতীয় মন্দিরের গায়ে, ভাস্কর্যের বিলাসিনী নারীমূর্তিকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত, সীমা যেন তাই ভাস্করের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, ভাঙলে বা জীর্ণতার দাগ লাগলেও, যার বয়স কখনো বাড়ে না।" *(পৃ: ৮৬১, ঐ)*

সীমা দাস দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নিজেই পরিচয় বাংলায় করে নিল, পরিষ্কার বাংলায় "নমস্কার। আপনি নিশ্চয়ই আজিতের রাইটার সাহেব?" *(পৃ: ৮৬১, ঐ)* সীমা নিজের পরিচয় দিয়েছিল "মিস মিসেস কিছুই আমি নিজের সম্পর্কে বলি না, সীমা দাস আমার নাম।" *(পৃ: ৮৬২, ঐ)* এই কথার উত্তরে লেখক বলেছিলেন, যে কোনো সীমাতেই বাঁধা থাকতে চায় না তার নাম

অসীমা হওয়া উচিত। সিংজীও ওদের কথাতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনজনে আরও নানা কথা বলে মজা করে হাসছিলেন। ফিলিপের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। ব্রেকফাষ্টে বসে ফিলিপ সীমার কাঁধে বা কোমরে বারে বারে হাত রাখছিল। এই দৃশ্য সিংজীর সামনেই হচ্ছিল দেখে লেখকের অস্বস্তি হচ্ছিল কারণ সীমা যে সিংজীর অঙ্কশায়িনী হয়েছিল। এছাড়া সিংজীর অন্তরের কথা লেখক জেনেছেন, সিংজীর হৃদয় সীমার প্রেমে রক্তাক্ত এখনও। সিংজীকে লক্ষ করেছেন লেখক; সিংজী ফিলিপের আচরণকে লক্ষই করছেন না, স্বাভাবিকভাবেই খাচ্ছেন, কথা বলছেন। সিংজীকে লেখক যতটা বুঝেছেন তাতে লেখকের মনে হয় এই আচরণই সিংজীর পক্ষে যথার্থ। ব্রেকফাস্ট সেরে কালকূট একাই পিছনের বারান্দার দিকের রান্নাঘরের সামনে দিয়ে আসতেই বিসোয়ারিদের সঙ্গে দেখা হল। হাসি বিনিময় করে, বিসোয়ারি ও সুইয়া, গতকালের দেখা দু'জন বনবালার একজন, ওদের সিগারেট দিলেন। সিগারেট ধরাতেও সাহায্য করলেন। সুইয়া নামের অর্থ চিড়িয়া -- এটাও জেনে নিলেন। বৃহস্পতিবারে জন্ম বলে নাম বিসোয়ারি এটা সুইয়া জানিয়ে দিল। ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এগিয়ে যেতেই বিসোয়ারি লেখককে ডেকে জানতে চাইল, সিংজী সাহেবের বউ কেন ওই গোরা সাহেবের সঙ্গে এসেছে? লেখক ধন্দে পড়ে গেলেন কি উত্তর দেবেন। সিংজী সীমা তো এই বাংলাতে স্বামী-স্ত্রীর মতোই বসবাস করেছেন। তবুও লেখক উত্তরে জানিয়ে দিলেন যে সীমা সিংজী সাহেবের বউ না। বিস্মিত চোখে সুইয়ার প্রশ্ন "এই তাবত জঙ্গল জানে, ওই আওরত সিংজী সাহেবের জরু আছে। আর তুমি বলছ, না? তবে ও কে?" *(পৃ: ৮৬৩, ঐ)*

লেখকের মনে আছে মোহনবাবু জরাইকেলায়, প্রথম যখন সীমার কথা বলেছিলেন তখন তিনি সীমাকে 'কংকোবাইন' বলে উল্লেখ করেছিলেন। লেখক মনে মনে ভেবে নিলেন জঙ্গলের বাইরের লোকরা নিশ্চয়ই সীমাকে ভাবেন যে সীমা সিংজীর রক্ষিতা। লেখকের মনে জিজ্ঞাসা এই প্রশ্ন তো বাংলোর লোকরা করবেই, এ'কথা সিংজী নিশ্চয়ই জানেন তবে কেন তিনি সীমা ফিলিপকে আমন্ত্রণ করেছেন? ওদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতেই কি এত আয়োজন? কোন ভাবনা থেকে সিংজীর এই সিদ্ধান্ত? লেখক বললেন, "ওই অওরত সিংজী সাহেবের বউ না। এক সময়ে সিংজী সাহেবের সঙ্গে, ওর মহব্বত ছিল। এখন আর নেই। এখন ওর মহব্বত ওই গোরা সাহেবের সঙ্গে।" *(পৃ: ৮৬৪, ঐ)* বিসোয়ারি কথাটা অবিশ্বাস করতে পারল না। ওদের সঙ্গে লেখকের কথাবার্তাগুলো লক্ষ করলেই বনবাংলোর লোকগুলোর সমাজচিত্রও বুঝতে পারা যাবে। "সুইয়া হেসে, ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করলো "ত, ওই অওরতটা কী? ও কী করে? একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল "ও হলো সুসুনকুড়ি।" সুইয়া আর বিসোয়ারি নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলো, কথাটা ওরা যেন বিশ্বাস করতে পারলো না। সুইয়া বললো "আমাদের তো অনেক

সুসুনকুড়ি (নাচের মেয়ে) আছে, তারা তো এর তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় না।" *(পৃ: ৮৬৪, ঐ)* লেখক বললেন "ও নিজের খুশী মতো, যখন যার সঙ্গে ইচ্ছা, তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।"*(পৃ: ৮৬৪, ঐ)* লেখক টুকরো টুকরো কথার মধ্যে বনবাসীদের একটা জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন, যেটা এই কাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। বিসোয়ারি, সুইয়াদের সমাজে মেয়েদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, সেইজন্য এই বনবাসীদের সমাজে মেয়েরাই বিবাহের জন্য পণ নেয়। সেখানে সীমা দাসের এই স্বেচ্ছাচারিতা ওরাও ভালো চোখে দেখেনি। কালকূট দেখেছেন ওদের হাসাহাসি করতে। শহরে সীমা দাস সিংজীর রক্ষিতা, বনবাসীদের কাছে সীমা দাস 'ওদের সুসুনকুড়ির মত নয়'। এই ছোট ছোট কথার মধ্য দিয়ে নগর সভ্যতার সমাজজীবন ও বনবাসীদের সমাজজীবনের একটা চিত্রও লেখক তুলে ধরেছেন। অত্যন্ত সূক্ষ্মবোধের সঙ্গে লেখক কালকূট বলিষ্ঠ ভাষায় নিজ বক্তব্য বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বসিয়ে দিয়ে কাহিনীর ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন। লেখক ওদের কাছ থেকে সরে গিয়ে কাঠের মাচার প্রান্তে গিয়ে বনপ্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। চারিদিকে ফুলের ছড়াছড়ি, শাল ফুল ছাড়া হলুদ-নীলের ছড়াছড়ি। আর তার মাঝে রক্ত কুসুম সবুজ বনে আগুন ধরিয়েছে। রৌদ্রালোকে বনভূমি সূর্যস্নান করছে। পাহাড়ী টিলার নিচে দূরে কোয়েনার একটি শাখা সূর্যচ্ছটায় চিকচিক করছে। নদীর ওপারে লালমাটিতে হয়তো অভ্রের কুচি মেশানো আছে, তাই রাস্তাও চিক্‌চিক্ করছে। মহুয়া ফুলের সুমিষ্ট বাতাস দেহমনে একটা আবিলতা এনে দিয়েছে এমন সময়ে সীমা দাস এসে পেছন থেকে ডাকল। "কচি দূর্বা ঘাস রঙে চওড়া লাল পাড় শাড়ি পরেছে, আর সবুজ রঙেরই জামা। মুখে কোনো রঙ মাখে নি, কপালে ওর চওড়া লাল পাড়ের মতোই, টকটকে একটি লাল ফোঁটা কপালে পরেছে। সদ্যস্নাত চুল, এখনো ভেজা, আঁচড়ানো এবং খোলা। কিন্তু তার মধ্যেই, খোলা চুলের বাঁ দিকে, অলকগুচ্ছের সঙ্গে, টাটকা ফুলের গুচ্ছ লতিয়ে জড়ানো। একটি সুগন্ধ বাতাস ছড়িয়ে পড়েছে। গন্ধটা ওর অলকগুচ্ছে জড়ানো ফুলের কী না, তা বুঝতে পারছি না।"*(পৃ: ৮৬৪, ঐ)*

সীমার সৌন্দর্য নিবিড় বনানীর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। লেখকের মনে হল কুসুমের লাল লেলিহান শিখা মেলে সবুজ বন তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বেশিক্ষণ ওই রূপের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। পুরুষ মানুষের মনে নেশা ধরিয়ে দেয় ওই রূপ। লেখকেরও মনে হচ্ছে তিনিও পুরুষ। বনপ্রকৃতির হাতছানিতে তিনি এই থল্‌কোবাদের বনবাংলোয় এসেছেন, এখানে সীমাও বনপ্রকৃতি হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। সীমার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে লেখক জেনে গেলেন সীমা লেখকের বই পড়েন নি। কিন্তু লেখকের একটা বই সিনেমা হয়েছিল তিনি দেখেছেন। তার ভালোই লেগেছে। "কিন্তু আপনি জানেন তো, সেই সিনেমাটা উড়িষ্যায়, দু'একবার দেখানোর পরেই তুলে নিয়েছে? এদেশের লোকের ধারণা, আপনি তাদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছেন।"

(পৃ: ৮৬৫, ঐ) লেখকের বলেছেন "আমার সিনেমা না, আমার কোন গল্পের ফর্ম আপনি দেখে থাকতে পারেন"। *(পৃ: ৮৬৫, ঐ)*

সীমা বলল "কিন্তু আপনার গল্পে একজন ওড়িয়া পাণ্ডার কথা আপনি লিখেছেন, যে চরিত্র আপনার পাঠককে শুধু হাসাবে, মজা দেবে। সেইজন্যই, ওড়িয়ারা সিনেমাটা তাদের দেশে দেখাতে দেয়নি।"*(পৃ: ৮৬৫ ঐ)* লেখক বললেন, "আপনার কথা খুব সত্যি, এখানে সেন্টিমেন্টের প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু অসত্য কিছু বলা হয়নি।"*(পৃ: ৮৬৫, ঐ)* সীমার উত্তর "তা জানি, মিথ্যাকথা কিছু বলা হয় নি, তবু মনে লাগে। আপনাদের নিয়ে লিখলে, আপনাদেরও মনে লাগতো।"*(পৃ: ৮৬৫, ঐ)*

"আপনার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছি, না? কিন্তু সিনেমাটা এমনিতে আমার খুব ভালো লেগেছিল। তাই সিং-এর মুখে যখন শুনলাম, ও আপনাকে নিয়ে এই থলকোবাদের বাংলোতে বেড়াতে আসছে, ভাবলাম, তা হলে, এই সুযোগে, আমিও একবার ঘুরে যাই।"*(পৃ: ৮৬৫, ঐ)*

কালকূট কিছু বলার আগেই সীমা বলল "তাছাড়া ফিলিপেরও অনেকদিন থেকে শখ, এই বাংলোয় বেড়াতে আসবে। সেটা সিং না থাকলে হয় না। ও এক কথাতেই, চাইবাসা হেড কোয়ার্টার থেকে পারমিশন করিয়ে আনতে পারে। খাওয়া - দাওয়ার ব্যবস্থার ব্যাপারটাও ওর ভাল রপ্ত আছে ও এই জঙ্গেলের মানুষ।"*(পৃ: ৮৬৫, ঐ)*

সীমা সিংজী সম্পর্কে বলল, "ওকে আপনি এই বনের আনক্রাউন্ড কিং বলতে পারেন। ওকে এখানকার লোকেরা ভালবাসে, ভয়ও পায়। ও কারোর পরোয়া করে না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আইন মেনে ও কখনো চলে না। কিন্তু বনের মানুষদের ও ভালবাসে, কখনো কারোর কোনো ক্ষতি তো করেই না, বরং উপকারই করে। আমাকে এই বনের নেশাটা সিংই ধরিয়েছে।"*(পৃ: ৮৬৫, ঐ)* লেখকের সঙ্গে সীমার কথাগুলো থেকে সীমা চরিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। সীমা বাঙালী হলেও তার মধ্যে ওড়িয়া সংস্কৃতি বহমান। সাহিত্য বেশি পড়ে না, পড়লেও ওড়িয়া বই-ই পড়ে। কিন্তু সীমার সাহিত্যের গভীরতা আছে, তাই বললেন বাঙালী-ওড়িয়া সেন্টিমেন্টের একটা সংঘাত আছে। কোন কথাটা সেন্টিমেন্টে ঘা দিতে পারে সেটাই অনেক সময় কেউ বুঝে উঠতে পারে না। বাংলা সাহিত্যেও তেমন করে ভালো ভদ্র, বিদ্বান আধুনিক ওড়িয়া চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে কিনা সীমার জানা নেই। তবুও সীমা এসেছে লেখকের টানে। লেখকের অন্তঃজিজ্ঞাসার কারণ সীমা ব্যক্ত করলেও লেখকের মনের দ্বিধা যায় নি। লেখক সীমার সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নির্জন সৈকতের প্রসঙ্গ তুলেছেন ওড়িয়াদের অভিমানের জায়গাটা খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাকে অস্বীকারও করেন নি। তিনি সীমাকে বলেছেন যে ভারতের কোনো প্রদেশের লোক নিয়েই আমি ঠাট্টা

বিদ্রূপ করতে পারি না, করিও না। সীমার চোখ দিয়ে সিং সাহেবকে সীমার মত করে তুলে ধরেছেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে অজান্তে পুরনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করছেন। তাই সে, সিংজী তার সম্বন্ধে কিছু বলেছে কিনা সেটা জানতে চেয়েছিল। লেখক তেমন খোলসা করে কিছু বলেন নি। সীমা বুদ্ধিমতী 'রসিকনাগরী', সে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। সিংজী ফিলিপ দুজনেই সীমা ও লেখকের খোঁজে চলে আসাতে উভয়ের কথায় ছেদ পড়ল। সীমা-ফিলিপ মাচার দিকে পাশাপাশি এগিয়ে গেল। ফিলিপের হাত সীমার কাঁধে ফিলিপ মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠল "সুন্দর, সত্যিই সুন্দর।" লেখক লক্ষ্য করেছেন সিংজী নির্বিকার। কিন্তু লেখক চিন্তিত, গতরাতের সঙ্গে এই মুহূর্তের সিংজীর একটুও মিল নেই। লেখক ভুলতে পারছেন না, ওথেলোর সেই আবৃত্তি, 'পুট আউট দ্য লাইট', একদম পাকা অভিনেতার মত বাচনভঙ্গি। গতরাতে আচ্ছন্নতায় তিনি বলেছিলেন কথাগুলো। কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই বনপরিবেশে লেখকের "মনে হয়েছিল সত্যি যেন সেই মূর জেনারেল হৃদয়ের আত্যন্তিক যন্ত্রণায় ফুঁসছেন আর কাতরাচ্ছেন।"*(পৃ: ৮৬৬, ঐ)*

সিংজী কেন এমন নির্বিকার? সিংজী লেখককে বেড়িয়ে আসার প্রস্তাব দিলেন এবং সীমা-ফিলিপও সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। অতএব ঢাকনা খোলা জীপে রওনা হওয়ার আগে লেখকের সঙ্গে সীমার আরও কিছু কথা হল। লেখক সীমার রূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বলে ফেললেন "আপনার সাজ দেখে মনে হচ্ছে সবুজ বনে, কুসুম গাছের লাল আগুন জ্বলছে।"*(পৃ: ৮৬০, ঐ)*

সীমা জানতে চায় তার রূপ কেমন দেখলেন? লেখক উত্তর দিলেন "চিরদিনের হাতছানি থাকে যে রূপে, তা-ই আপনার রূপ।"*(পৃ: ৮৬৭, ঐ)*

তিনি আরও বললেন "আপনি সকলেরই বাঞ্ছিতা। কিন্তু তার জন্য যে সাহস থাকা দরকার, আমার তা নেই।" স্বর্গের পরিবেশেই ঊর্বশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, মর্ত্যের না। আপনার মন খারাপ হবার কারণটা বোধহয় তা-ই। যা দেবতার ভোগ্য, তার দিকে কেন মানুষের দৃষ্টি পড়বে।" *(পৃ: ৮৬৭, ঐ)* সীমা লেখকের একটা হাত ধরে খিলখিল করে হেসে উঠল। সে হাতের স্পর্শ কোমল এবং স্বাভাবিক উষ্ণ। সীমা গলার স্বর নামিয়ে "সাহস রাখুন, শিল্পীদের অধিকার দেবতাদের থেকে কিছু কম না।" *(পৃ: ৮৬৭, ঐ)* সীমার একটা অন্তর্বেদনার দিক তুলে ধরা হল। আর একটা দিক হলো বুদ্ধিমতী মেয়ের রসিকতা বোধ, সূক্ষ্ম রসিকতার মধ্য দিয়ে মর্ত্যের ঊর্বশী লেখককে, লেখকের শিল্পীসত্তাকে আহ্বান জানাল এই মনোমুগ্ধকর প্রকৃতি রাজ্যে।

সিংজীর পাশে সীমা, তার পাশে ফিলিপও একদম দরজার কাছে লেখক, সবাই জীপের সামনে বসে রওনা দিলেন। সিংজীর কোলে সেই সাইড হ্যামার। ক্রমে তারা গভীর এক ভয় ধরানো জঙ্গলে প্রবেশ করতে থাকলেন। সূর্যের আলো প্রায় ঢোকে না, বাতাস ঠাণ্ডা ও ভেজা, বিশাল বেতবন, তলা দিয়ে কোনক্রমে যাওয়া যায়, ওপরটা বেতবনের বনাড়। ঢালু পাথরের সরু

পথ, পিছলে পড়তে পারে যে কোনো মুহূর্তে। সামনে দিয়ে বনমোরগ ঝটপট করতে করতে ছুটে গেল। "এটাকে বলা হয় লাকরা বন। লাকরা মানে, মুণ্ডা ভাষায়, বাঘ।"*(পৃ: ৮৬৮, ঐ)* সীমা বলল, "এতো জায়গা থাকতে, তুমি বাঘের আস্তানায় এলে কেন?"*(পৃ: ৮৬৮, ঐ)* ফিলিপ বলল, "বন্দুক থাকলেও, বাঘ শিকার কি নিষিদ্ধ না?"*(পৃ: ৮৬৮, ঐ)* সিংজী "কিন্তু নিজের জীবন বাঁচাবার কাছে, কিছুই কি নিষিদ্ধ?" *(পৃ: ৮৬৮, ঐ)* ফিলিপ ভীত নয় কিন্তু সিংজীকে বলল "তবে বাঘ এসে পড়লে বিপদ হতে পারে, তার জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার।" *(পৃ: ৮৬৮, ঐ)* সিংজী নিজের বন্দুকটা দুই উরুর মাঝখানে রেখে বললেন "তা আছি।"

সেই মুহূর্তেই বন কাঁপিয়ে বিকট হাউ হাউ ডাক। ভয়ে সীমা ফিলিপের গলা জড়িয়ে ধরল, লেখক যতটা সম্ভব দরজার দিক থেকে দেহটা সরিয়ে নিতে লাগলেন। নির্বিকার সিংজী বললেন, "এটা কোত্‌রা হরিণের ডাক।"*(পৃ: ৮৬৮, ঐ)* সবাই ফিরে যেতে চাওয়াতে সিংজী ফিরেই চললেন। কালকূট দেখলেন সীমার সুন্দর মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে গেছে। সবুজ বনে কুসুমের উজ্জ্বলতা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। বনবাংলোয় ফিরে এসেই লেখকের জন্য চমক অপেক্ষা করছিল। সুইয়া শুধু লেখককে রসুইঘরে আসার জন্য বলতে এল। সিংজী ভাগ্যবান মানুষকে ওদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। লেখক রান্নাঘরের দিকে গিয়ে দেখলেন সুইয়া, গোমারি ও বিসোয়ারি, তিনজনেই মুখে চাপা দিয়ে হাসছে, শুধু অন্দরে যাওয়ার আমন্ত্রণ। দরজার কাছে দাঁড়াতেই একরাশ সাদা বেগুনী ফুল পায়ের কাছে পড়তেই তাকিয়ে তৃপ্তি ভৌমিককে দেখতে পেলেন। আবেগে তুমি ভুলে আপনি বলতেই তৃপ্তি দুঃখ পেল একটু। লেখক সেটা বুঝতে পেরে তুমিতেই ফিরে গেলেন। সাদা বেগুনী শাড়িতে তৃপ্তিতে একটা অনন্যতা দিয়েছে, তবুও ওকে তেইশের বদলে অষ্টাদশী বলে মনে হচ্ছে। আয়রণ ওর খনির একটা গাড়ি ছোটনাগরার ওপর দিয়ে আসছিল, ওতেই চলে এসেছে। লেখক যে তৃপ্তিকে ভুলে যান নি এতেই তৃপ্তি খুশি। কিন্তু অন্য একটা ব্যাপারে শঙ্কিত। সিংজীর সঙ্গে যখন আর কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে সীমা কেন এসেছে সাহেবকে নিয়ে? সিংজী রাগী মানুষ, কখন কী করে বসে কে জানে! তৃপ্তির ভয়টা অমূলক নয় এটা লেখকও বুঝেছেন। ওইরকম একটা মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন, সূর্যালোকবর্জিত ভয়ংকর লাকরার জঙ্গলে সিংজী নিয়ে গেলেন কেন? সীমাও প্রচণ্ড ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। সেই মুহূর্তে সিংজীর মনোভাব বুঝতে না পেরে লেখকও একটু ভয় পেয়েছিলেন।

তৃপ্তি লেখককে চমকে দেবেন বলে রান্নাঘরে বসেছিল। ওদের রান্নাও একটু একটু শেখাচ্ছিল। এছাড়া সিংজীর সামনে হঠাৎ করে সীমা যেতে চায়নি, রাগী মানুষ বলে। লেখক সিংজীর মূল্যায়ন করেছেন, বাইরে থেকে যা দেখা যায় উনি ঠিক তাই নন। একজন অত্যন্ত দুঃখী মানুষ। গোমারি সুইয়া বিসোয়ারিকে সিগারেট দিয়ে এগিয়ে যেতেই বনবালারা তৃপ্তির সঙ্গে ওদের

ভাষায় কথা বলে খিল্‌খিল্‌ করে হাসতে লাগল।

লেখক লক্ষ করেছেন সুইয়াদের কথায় তৃপ্তি লজ্জিত হল। লেখকের মনে হল ছোটনাগরায় তৃপ্তির সাহায্যকারী তথা সাথী কয়ো বলেছিল যে কোথা থেকে তোমার বর ধরে নিয়ে এলে? সুইয়া সেরকমই কিছু একটা বলেছিল, কিন্তু তৃপ্তি লেখককে বলল না। বাংলোর দিকে এগোতেই সীমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সীমাই তৃপ্তিকে মনে করিয়ে দিল ছোটনাগরায় সিংজীর বাংলোয় থাকার সময় পরিচয় হয়েছিল। তৃপ্তির সঙ্গে লেখকের এই বনভূমিতে কদিন আগে পরিচয় এবং সেই পরিচয়ের সূত্রেই তৃপ্তি থলকোবাদে এসেছে। সীমা রসিকতা করে বলে উঠল যে, তাহলে, পুরুষের মধ্যেও হাতছানি থাকে। সিংজীর সঙ্গে দেখা হতে প্রথমে সিংজী চিনতে পারেন নি। তৃপ্তি মনে করিয়ে দিতেই "আয়ী তো বহুত আচ্ছা কিয়া। আও ওপর উঠকে আও। অব্‌ তো তুমত ভি মেহমান হ্যায়।" *(পৃ: ৮৭০, ঐ)* তৃপ্তিকে গম্ভীর মুখে বললেন যে তাদের সঙ্গে হুইস্কি খেতে হবে। তৃপ্তির মুখের অবস্থা দেখে হা হা করে হেসে উঠে মজা করলেন। তৃপ্তিকে মুক্তি দিলেন সুরাপান থেকে। কিন্তু রাইটার সাহেবকে ছাড়লেন না। বললেন "দেখলেন তো রাইটার সাহেব, আপনার কী রকম নসীব। আপনি এখানে আসতে না আসতেই তৃপ্তি ছুটে এসেছে।"*(পৃ: ৮৭০, ঐ)*
তারপর বলল "আমার কাছে কেউ এরকম ছুটে আসতে চায় না"*(পৃ: ৮৭০, ঐ)*
কিন্তু সীমা বলল "কেন আমি এসেছি।" *(পৃ: ৮৭০, ঐ)* সীমার কথাটা সত্যতা স্বীকার করলেন বিদ্যুতের চমকের মতো এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে। সে-ই সেক্‌স্‌পীয়রের সনেট থেকে আবৃত্তি করতে লাগলেন। "ও দ্যাট য়ু ওয়্যার য়োরসেলফ্‌। বাট্‌, লাভ, য়ু আর নো লঙার য়োরস্‌ দ্যান য়ু য়োরসেলফ্‌ হিয়ার লিভ্‌।"*(পৃ: ৮৭০, ঐ)*

সীমার মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠতেই সীমা রাগ করেছে কিনা জানতে চাইলেন। সীমা "না, তোমাকে একটু চিনি তো!"*(পৃ: ৮৭১, ঐ)* একটু কথাটা শুনে সিংজীর প্রতিক্রিয়া হল। এরপর গুরুয়াকে ডেকে গুন্‌জুকে ডেকে আনতে বলে সবাই সুরাপানে মেতে উঠল, তৃপ্তি সাক্ষী রইল। ছোট ছোট টুকরো চিত্র দিয়ে লেখক পটপরিবেশ অনুযায়ী চরিত্রগুলোর মুখে কথা বসিয়ে দিয়েছেন। সীমা-সিংজী প্রেমকাহিনী ও ফিলিপ-সীমা প্রেমকাহিনীর ফাঁকে লেখক বনবাসীদের চরিত্র, তাদের কথাবার্তা, রঙ্গরসিকতা তুলে ধরেছেন, যে ঘটনাবলী কাহিনীকে ভিন্নতর স্বাদে পৌঁছে দিয়েছে। একঘেঁয়েমির বাতাবরণ থেকে পাঠককুল মুক্তি পেয়েছে। সিংজী-সীমা-ফিলিপ এই ত্রিকোণ প্রেমের ফাঁকে তৃপ্তি যেন এক ঝলক টাটকা বাতাস। পোশাকে-আচরণে তৃপ্তি স্নিগ্ধতার পরশ বুলিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ আগে ভয়ংকর একটা অন্ধকার, স্যাঁতসেতে বেতের ঝাড় বেষ্টিত বনভূমিতে কোত্‌রা হরিণের ডাক শুনে সিংজীবাদে তিনজনেই ভীত হয়ে পড়েছিলেন। লেখক ভেবে পাচ্ছেন না কেন নিয়ে গেলেন ওই লাকরা বনে। আতঙ্কিত সীমাকে দেখতে কেমন লাগে

অথবা বাঘের মুখোমুখি হলে সীমার অবস্থা কিরূপ হবে? সেইরকমই কোনো প্রতীকী কিছু? তৃপ্তি তো লেখককে ওর আশঙ্কার কথা বলেই ফেলেছে। তাঁর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মন, লেখক তৃপ্তির মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন, সিংজীর ডেরায় অর্থাৎ বনবাংলোয় সীমার আসা ঠিক হয়নি। সিংজী ও সীমা সম্পর্কে বনবাসীদের কাছে অনেক খবরই তৃপ্তি পেয়ে থাকে যা থেকে তৃপ্তির এই আশঙ্কা লেখক তুলে ধরেছেন এবং নিজের ভাবনাকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। বনবালারা তৃপ্তির সঙ্গে লেখককে নিয়ে মজা করছে, তৃপ্তি বুঝতে পারছে বনবালাদের কথা কিন্তু লেখক কালকূট বুঝতে পারছেন না। তবে লেখক এরকম রসিকতার সম্মুখীন আগেও হয়েছেন, সেটা তুলে ধরা হয়েছে, সেইরকমই কিছু হবে। সীমা যে বহুজন বিচরণকারিণী, তার অতি আধুনিক মনেও লেখকের সঙ্গে সীমার মাত্র কদিন আগে পরিচয় হয়েছে, সেই পরিচয় সূত্রেই থলকোবাদ ছুটে এসেছে, এটা জেনে অতি স্বাভাবিক যা প্রকাশভঙ্গি হওয়া উচিত সীমার মুখ দিয়ে তাই বেরিয়ে এসেছে 'ওহ'! লেখকের চোখে সেই ভঙ্গি ও শব্দ অসামান্য বলে মনে হয়েছে। সীমার রসিকতা বোধহয় লক্ষণীয়। লেখকের রসিকতার জবাব ঠিক জায়গাতেই প্রয়োগ করেছে।

তৃপ্তির সঙ্গে দেখা হতেই সিংজীর আন্তরিক আপ্যায়ন, কৃত্রিম গাম্ভীর্য সবকিছু লেখক কালকূটের দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন কিন্তু সিংজীর মনের তল খুঁজে পাচ্ছেন না। কে বলবে 'লাক্‌রা বনে'র সেই সিংজীর মনে কী উদ্দেশ্য? বনের ছাপ বনেই কি ফেলে এসেছেন? কিন্তু ব্যথিত অন্তরটা লেখক দেখতে পেয়েছেন। তৃপ্তির থলকোবাদে ছুটে আসার কারণে সিংজীর অন্তরের প্রকাশ, সীমার উত্তরে বেদনাবোধ, সেই সঙ্গে সেক্সপীয়রের সনেট আবৃত্তি – বেদনার তুলিতে কাব্যিক মহিমা এনে দিয়েছেন সেগুলো একটু একটু তুলে ধরা হয়েছে। এবার দেখা যাক পরবর্তী সেই রুদ্ধশ্বাস পর্যায়।

সকলের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা ও গ্রাম সমূহের দেখাশোনার দায়িত্ব যার ওপরে থাকে তাকে গঞ্জু বলে। বিকালে গঞ্জু মহাদেও এলে সিংজী কাজের নির্দেশ দিলেন "তুম গাঁও-মে বাতা দো, কাল শাম কো, ইধার নাচা গানা করনে পড়েগা। খানে পিনে কা খরচ হমরা। যো যেতনা হাঁড়িয়া পিনে সক্‌তা, সিগ্‌রেট পিনে সকতা, ভাত আওর শুয়োর কা গোস্ত খানে সক্‌তা মিগেলা।" *(পৃ: ৮৭১, ঐ)* গঞ্জু মহাদেও চলে গেলে। সীমা, ফিলিপ, সিংজী রামি খেলতে শুরু করল, বোর্ড মানি, মিনিমাম দুটাকা। জুয়া-সুরাপান দুটোই চলতে লাগল। তৃপ্তি ও লেখক কালকূট বাংলোর কাছাকাছি ঘুরতে বেরোল। সুইয়াদের সঙ্গে দেখা হতে ওরা হাসতে হাসতে ঝোপের আড়ালে চলে গেল। সুইয়া কি বলেছে লেখক আবার জানতে চাইলে তৃপ্তি বলেছিল "তোমরা দীখু (সমতলবাসী) মেয়েরা তো সিগারেট খাও না, খালি চুমো খেতে শিখেছো।" *(পৃ: ৮৭২, ঐ)* বলে লজ্জায় আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল। লেখক মনে মনে তৃপ্তির জন্য বেদনার্ত হলেন, বিধবা মা

ছোট ভাইবোনদের জন্য গভীর বনে একাকী কাটিয়ে দিচ্ছে "একটি ফুলের কলি ফুটতে চায়। সেই ভ্রমর যে কোথায় আছে, যে ওর পাপড়িতে ঝাপটা দেবে, কে জানে। আমি যে নই, তা আমি জানি।"*(পৃ: ৮৭২, ঐ)* তৃপ্তি আস্তে আস্তে মুখ থেকে আঁচল সরালে লেখক হাত বাড়িয়ে তৃপ্তির একটি হাত ধরে নিচে নামতে থাকলেন।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় বাংলো চত্বর মুখরিত হয়ে উঠল। নাচের তালে উদ্দাম মাদল বেজে উঠল। সেই আওয়াজ পাহাড়-বনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। নাচের তালে সারা চত্বরে মেয়ে-পুরুষের ছায়া ও মূর্তি হ্যাজাকের আলো-আধারিতে হারিয়ে যাচ্ছে। সিংজী দুপুর থেকেই প্রচুর সুরাপান করে নাচের আসরে নেমে হৈ চৈ করছে। সীমাকে বনবালাদের সঙ্গে চেনা যাচ্ছে না। লেখক ও তৃপ্তি বারান্দায় বসে নাচ দেখছিলেন। "বারান্দার একটু দূরে কোল আঁধারে, সিংজী একলা বসেছিলেন। দু'একবার মনে হয়েছিল, তিনি যেন কিছু বলে উঠলেন, কিন্তু বুঝতে পারি নি কিছুই। একসময়ে দেখলাম ঝকঝকে সিল্কের লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরা সিংজী চত্বরে নেমে গেলেন।" *(পৃ: ৮৭২, ঐ)* একশ নারী পুরুষ মদমত্ত, নাচের উৎসব চলছে। সিংজী কোথায় হারিয়ে গেলেন সেটা লেখক দেখার চেষ্টা করছিলেন "সেই মুহূর্তে এই মদমত্ত উৎসবের সমস্ত শব্দকে ভেদ করে একটি নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ম আর্তনাদ শোনা গেল। সেই আর্তনাদ যেন চত্বর থেকে ধ্বনিত হয়ে সহসা বহু দূরের খাদের দিকে নেমে গেল। পর মুহূর্তেই পুরুষ স্বরের চিৎকার শোনা গেল, 'স্টপ! স্টপ! স্টপ! সীমা! সীমা!'

দেখলাম, নাচের ভিড়ের মধ্য থেকে সিংজী বেরিয়ে আসছেন। আসছেন বারান্দার দিকেই। তৃপ্তি হঠাৎ আমার একটা হাত চেপে ধরল। মনে হল, ওর হাত থরথর করে কাঁপছে। সিংজী বারান্দায় উঠে এলেন, শুধু শুনতে পেলাম, 'হুজ্ ব্রিদ্ ইনডিড্ দিজ হ্যান্ড্স হ্যাভ নিডলি স্টপড।' ... আবার সেই ওথেলোর কথা! কিন্তু আশ্চর্য, মদমত্ত নাচের উৎসব উদ্দাম থেকে উদ্দামতর হতে লাগল।"*(পৃ: ৮৭২, ঐ)*

লেখক বুঝতে পেরেছেন কী মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে এই মুহূর্তে। হ্যাজাকের আলো আঁধারি আলোতে নাচের উদ্দামতার মধ্য দিয়ে করুণ পরিণতি। ফিলিপের হাহাকারে বার বার আকাশ বাতাস মথিত হতে লাগল। সিংকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন সীমা কোথায়? কার আর্তনাদ? সীমার আর্তনাদের মত মনে হচ্ছে। কিন্তু সিংজী হুইস্কির পাত্রের চুমুক দিয়ে বলে যাচ্ছেন তিনি শোনেন নি, তিনি জানেন না। ফিলিপ নাচের আসরে ঝাঁপিয়ে পড়ে "বন্ধ করো, মেম্সাব্ কো মারডালা। বন্ধ করো নাচা গানা।"*(পৃ: ৮৭৩, ঐ)* নাচ থেমে গেল। সিংজী এক হাতে থ্রি জিরো থ্রি রাইফেল আর এক হাতে টর্চ লাইট বনবাসীদের নিয়ে ঝোপে ঝাড়ে ছাওয়া সুঁড়ি পথের দিকে এগিয়ে গেলেন। তৃপ্তি কেঁদে উঠে বললো সিংজী সীমাকে ছুঁড়ে খাদে ফেলে দিয়েছেন।

সীমার বনবাংলোতে ফিরে আসা তৃপ্তি মনে মনে মেনে নিতে পারে নি, আশঙ্কা ছিল এইরকমই কিছু একটা ঘটার। কাঁদতে কাঁদতে তৃপ্তি লেখকের বুকে মুখ রাখলো। মানুষ ছাড়া জঙ্গলের আর কোনো কিছুকে তৃপ্তি ভয় পায় না। লেখক তৃপ্তিকে সাহস জুগিয়ে বললেন মানুষের মধ্যেই থাকতে হবে অতএব ভয় পেয়ে বিশ্বাস হারালে চলবে না। প্রায় মধ্যরাতে সীমার মৃতদেহ নিয়ে একদল মেয়ে পুরুষের সঙ্গে ফিলিপ সহ সিংজী ফিরে এলেন। মর্ত্যের উর্বশীর সীমার রক্তাক্ত দেহ, গাছের শুকনো ডাল গলা ও তলপেট ভেদ করে গিয়েছে। সিংজী লেখককে বললেন ''রাইটার সাহেব, এই বনে আমার প্রেম। এই বনেই তার অস্তিত্ব শেষ।''*(পৃ: ৮৭৩, ঐ)* কথা শেষ করে সিংজী আবার ডেসডিমোনাকে হত্যার মুহূর্তে ওথেলোর সেই উক্তি ''ইট ইজ টুউ লেট।''*(পৃ: ৮৭৩, ঐ)* রুদ্ধশ্বাস ঘটনা বনবাংলোর রঙ্গমঞ্চে ঘটে গেল। সেই নাটকের দর্শক লেখক কালকূট ও তৃপ্তি। কী নিপুণভাবে দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কেউ বুঝতেই পারল না। ঝঞ্ঝা আসার আগে আকাশ-বাতাস যেমন হঠাৎ থম্‌কে যায় সিংজীও সারাদিন সুরার ঘোরে ওইরকমই থম্‌কে ছিলেন। তারপর দুর্বার ঝড়ের বেগে চকিতে তাঁর প্রেমকে গুঁড়িয়ে দিলেন গভীর পাহাড়ের খাদে। তাঁর প্রেমকে তিনি বনেই চিরতরে রেখে দিলেন। 'সীমা ও পুত্র' এই দু'জনের জন্য সিংজী সব কিছু বিলিয়ে দিতে পারেন। তাই তো করলেন। আর কেউ তাঁর সীমাকে ছুঁতে পারবে না, সঙ্গ লাভ করতে পারবে না। সীমা একান্ত তার।

অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে একটার পর একটা ঘটনার গ্রন্থিতে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বনবাংলোর চত্বরে 'জেনারেল' মূর তার 'ডেসডিমোনাকে' পাহাড়ের খাদে ফেলে দিয়ে নিজ হাতে হত্যা করেছে। কী নিপুণ পরিকল্পনা। লেখক তৃপ্তি সেই রঙ্গনাট্যের দর্শক। বনের জীবনযাত্রা বনের নিয়মেই বহমান। সিংজী বন্য, নির্মম, কিন্তু তার মধ্য থেকে সিংজীর হৃদয়ে বহমান ফল্গু নদীটিকে লেখক কালকূট তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বইয়ে দিয়েছেন। দুটো দুধারার প্রেম এই কাহিনীকে সমৃদ্ধ করেছে। কাহিনীর শুরুতেই কালকূট সীমা-সিংজীর এই পরিণতির সংকেত দিয়ে রেখেছেন। সুখের জন্য সিংজী প্রেমের ফাঁদ পেতেছিলেন। সারেন্ডারেঞ্জের গভীর বনের আনক্রাউন্‌ড কিং তাঁর ডেরায় বনের হরিণকে টেনে আনার জন্য প্রলোভিত করেছেন। বাঙালী লেখক এসেছেন সারেন্ডারেঞ্জের গভীর অরণ্যে। কোত্‌রা হরিণ লাকরা বনে — মরণকালে তাই শুধু তার আর্তনাদই শুনতে পাওয়া গেল। আনন্দের মধ্য দিয়ে শুরু করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বনভ্রমণের কাহিনী শেষ হয়েছে। বনবাসীদের সঙ্গে বনজীবন কাটানোর সময় শেষ, তাই তাঁকে ফিরে যেতে হবে নাগরিক জীবনে, তৃপ্তি ভৌমিক তাঁকে নাগরিক ফিরিয়ে নিতে এসেছে। ফিলিপ তৃপ্তি ও লেখক ফিরে এসেছেন। তৃপ্তিকে ছোটনাগরায় নামিয়ে দিয়ে তৃপ্তির ভাললাগাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, চোখের জলে তৃপ্তি কোনো কথা বলতে পারে নি। কিন্তু লেখক তার নিজস্ব দর্শনে তৃপ্তির

প্রেমকে সম্মান জানিয়ে বলেছেন যে তিনিও বিশ্বাস করেন 'এই বন আমার প্রেম'। গাড়ী ছেড়ে দিল। পিছনে পড়ে রইল তৃপ্তি ভৌমিক। আরোও পিছনে থলকোবাদের গভীর অরণ্যের বনবাংলোয় সিংজী একাকী বসে তার প্রেমিকাকে নিয়ে। এ যন্ত্রণা তার শুধুই নিজের। এই বনেই প্রেমের শুরু, এই বনেই শেষ। লেখক সিংজীর এই প্রেমকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

'প্রেম নামে বন' বনভ্রমণ কাহিনী উপন্যাসে পরিণত হয়েছে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে। বনপ্রকৃতির সঙ্গে বনবাসী নরনারীদের জীবনাচরণের মধ্যে এই উপন্যাসটি একটি কাব্যিক রূপ পেয়েছে।

কালকূটের অরণ্যবিষয়ক ত্রয়ী রচনা আলোচনার পর তাঁর নদী-পর্বত সমুদ্রের টানে রচিত রচনাগুলো এবার আলোচিত হবে। এই বিষয়ের রচনাগুলো হল —

১) নির্জন সৈকতে (১৯৬২)

২) স্বর্ণ শিখর প্রাঙ্গনে (১৯৬৫)

ও

৩) তুষার সিংহের পদতলে (১৯৭৫)

সমুদ্রের টানে কালকূট ছুটে গিয়েছিলেন পুরীর সমুদ্রে। সেখানে তিনি সমুদ্রের বিশালতার মধ্যে একটু নির্জনতা খুঁজতে চেয়েছিলেন। সেই নির্জনতার মধ্যে গিয়ে তিনি জীবনের কী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন সেটাই বিধৃত করেছেন নির্জন সৈকতে কাহিনীতে। আর পাহাড়ের টানে উত্তরবঙ্গের নিসর্গ প্রকৃতির মধ্যে মানবজীবনের রৌদ্রছায়ায় মানবমনের যে দিকগুলো কালকূটের অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে তাই তিনি তুলে ধরেছেন শৈলশহর দার্জিলিং-কালিম্পং-এর চিত্ত হরণকারী মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর থেকেও প্রধানরূপে তুলে ধরেছেন সেই পটপরিবেশে রঙ বৈচিত্র্যকে, আর কিছু মানবচরিত্র যা শৈলশহরের রৌদ্রছায়ার মত কালকূটের দেখা দৃষ্টিতে বিশেষক্ষণে আলোকিত হয়েছে।

কালকূটের নদী-পর্বত-সমুদ্রের টানে বিষয়ক রচনাগুলোর মধ্যে প্রথমে আলোচনা করা হবে **'নির্জন সৈকতে'**। এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে (১৩৬৮ বঙ্গাব্দে) 'জলসা' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে (১৩৬৯ বঙ্গাব্দে) 'ত্রিবেণী প্রকাশন' থেকে। উৎসর্গ করেছেন 'শ্রীযুক্তা নির্মল শশী দেবী, পূজনীয়াসু।' ভূমিকায় লেখা ছিল — "একটি ছোট সংবাদ পাঠককে দেবার জন্যই এই ভূমিকার প্রয়োজন হল। 'নির্জন সৈকতে' ভ্রমণ কাহিনীটি ১৩৬৮ সালের শারদীয় 'জলসা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অধিকাংশ শারদীয় লেখারই যা অবস্থা, অর্থাৎ স্থানের সীমাবদ্ধতা এবং সম্পাদকের তাড়ায় কোনরকমে সংক্ষেপে লেখা শেষ করা, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। স্বভাবতই গোটা বইটি এই আকারে প্রকাশের

পূর্বে, সম্পূর্ণ নতুন করেই আবার লেখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, বহু নতুন চরিত্র ও ঘটনা সন্নিবেশিত হয়েছে, কলেবর বৃদ্ধির কারণও এই। একটি নিবেদন, পত্রিকায় যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, চিত্র পরিচালক তপন সিংহ মহাশয় তার ওপরেই ছবি তৈরী করেছেন। অতএব 'নির্জন সৈকতে'র দর্শকেরাও অনেক নতুনের সন্ধান থেকে বঞ্চিত হবেন না।" *(পৃ: ১৬৮০, কালকূট রচনা সমগ্র, ৩য় খণ্ড)*

কাহিনীটির দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায় লেখকের ঘরছাড়া মন সংসারের কূটকাচালি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে ছুটে যেতে চাইছেন নির্জনতার খোঁজে। তাই তাঁর বিবাগী মন তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে হাওড়া স্টেশনে। এবার যে তাঁর ডাক এসেছে নীলাম্বুধির কাছ থেকে। "স্বপ্নে দেখেছি তার দূর দিগন্ত ছোঁয়া আকাশের হাতছানি। তার ফেনিলোচ্ছল অট্টহাসি কেঁপেছে সেই ঘেরাটোপ। ভেঙে পড়েছে তার করাঘাতে।" *(পৃ: ১৩৪, ঐ)* বঙ্গোপসাগরের কূলে নামিয়ে দেবে রাতের গাড়ি। মানুষের ভিড়ে ভিড়ময় ট্রেনের কামরায় ওঠাই এক প্রাণান্তকর অবস্থা। তবুও লেখক তাঁর সামান্য ছোট্ট পুটুলি নিয়ে নিজের দেহটাকে কামরায় ভিতরস্থ করে বসার সন্ধানে দৃষ্টি দিতে দিতে এক জায়গায় মহিলাদের মধ্যে একটুখানি ফাঁকা জায়গা দেখে কোনমতে বসে পড়লেন। তারপরেই এল সেই বিরক্তিপূর্ণ কথাবার্তা ও শেষে মহিলাদের দলনেত্রী সেজদি তাকে বলা যে 'সর কর্ যাও, ইধার জায়গা নেই।' *(পৃ: ১৩৬, ঐ)* বাংলা হিন্দী মেশানো কথায় লেখকের বাঙালী হৃদয় একটু আহত হল, অবাঙালী ভাবছে। তার জন্য কোনো অসুবিধে হচ্ছে নাকি জানতে চাওয়ায় দলনেত্রী একটু অপ্রস্তুতে পড়ে যান। শেষে দলনেত্রী জানায় যে তারা কয়েকজন মেয়েমানুষ মিলে বেরিয়েছে তাই বলেছে। কিন্তু যা ভীড়, পা ফেলার জায়গা নেই, মানুষ, চারিদিক ভেজা কাপড়, কাঁথা, মাদুরের ছড়াছড়ি। জায়গা কোথাও পাওয়া যাবে না। তারা তাকে আর উঠতেও দিলেন না, নিজেরাই আরও সরে বসে ভালো করে বসার জায়গা করে দিলেন। এরপর আলাপ পরিচয় চলতে লাগল। কোথায় যাচ্ছে, থাকবে কোথায়, কি করে, বাড়ী কোথায় ইত্যাদি ইত্যাদি। লেখক যত ভাবছেন এড়িয়ে যাবেন কিন্তু এড়ানো যাচ্ছে না। লেখক বলেছেন নিস্তরঙ্গ জলে উনি ঢিলের মতো এসে পড়েছেন তাই সেই তরঙ্গ আর ছাড়ছে না। যতটা উত্তর দেওয়া সম্ভব ততটাই শুধু দিচ্ছেন। তাদের অপ্রস্তুতি ছেড়ে রক্ষা করল কালো পাড় শাড়ী পরা অল্পবয়স্ক এক মহিলা।

লেখক কালকূট লক্ষ করেছেন তার মধ্যে একটা অন্যমনস্কতার ভাব, মহিলাদের দল থেকে একটু আলাদা। প্রসাধনহীন মুখ, আটপৌরে করে পরা শাড়ীর আঁচলটি দিয়ে নিজেকে এমনভাবে ঢেকে রেখেছে যে, দেখে মনে হচ্ছে ওর শীত করছে। মহিলা না বলে মেয়ে বলাই ভালো। দৃষ্টি অনেক দূরে রোদের ছটা যেদিকে পড়েছে। ওর কথায় অবুদি নামের বিধবা মহিলাটি মুখে অন্ধকার এনে অল্পবয়সের মেয়েটিকে কথা শুনিয়ে দিলেন যে মনের শোকে রেণুর মাথার ঠিক নেই। এ'কথায়

অন্য মহিলারা রেণুরই পক্ষ নিল। কথা বলাটা ঠিক হয়নি। লেখক এর মধ্যে পড়েও ওনাদের মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পেরেছেন, রেণু লেখকের পক্ষ নিয়ে বলায়, অবুদি লেখকের সামনে অস্বস্তিতে পড়ে রাগ করে ওই কথা বলে ফেলেছে। কথা চলাচলের ফাঁকে লেখকের প্রতি মহিলারা সদয় হয়েছেন, ভেজা জামাকাপড় ছাড়ার জন্য জোরাজুরি করতে লাগলেন। লেখকের ওই পুটুলির মধ্যে জামাকাপড় থেকে বই-পত্রিকার বহর দেখে তারা মজা করতে লাগলেন। জামাকাপড় ছেড়ে বসতে গিয়ে বাধা পেলেন। জামাকাপড় মেলে দিতে বললেন। তারাই সাহায্য করলেন। ট্রেনের কামরায় ভিজে জামাকাপড় মেলা ছিল, এখন সেইসঙ্গে লেখকের পোশাকও যুক্ত হল। লেখক ওই মহিলাদের কাছে উপদেশ ও সাহায্য কোনটাই চাননি, কিন্তু পথ চলতে গেলে এরকমটি জুটে গেলে তিনি কী করবেন। ছোট বউদি, কানের পাশে পক্বকেশ উঁকি দিচ্ছে, কালকূটের মনে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়ে বললেন যে, এভাবে দিশেহারা হয়ে ঘর ছাড়তে হয়? লেখক ট্রেন ছাড়া মুহূর্তে দৌড়ে উঠেছিলেন, সেটা ছোট বউদি লক্ষ্য করেছিলেন। তিনিই স্নেহের পরশে বললেন "দেখছি মনে মনে তুমি বড় অশান্ত বাপু। নইলে এমন পাগলের মত দৌড়ায় কেউ? লাভ কী?" *(পৃ: ১৪০, ঐ)* এই কথায় লেখক ছোট বউদির হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীকে দেখতে পেলেন। লেখক বলেছেন "বুকের মধ্যে চমকে উঠল। অবাক মানলাম ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে। ঠিকই ভেবেছিলাম। তাঁর সঙ্গে যেন আমার অনেককালের চেনাশোনা। সম্বন্ধ যেন আঁতুড় ঘর থেকেই। একটি স্নেহের ভর্ৎসনা আমি শুনলাম তাঁর হাসিমাখা কথায়। একমাত্র তিনিই জানেন, আর আমি জানি, রহস্যের মধ্যে কী সত্য যেন ধ্বনিত হল।" *(পৃ: ১৪০, ঐ)* লেখক ছোট বউদি বলে ডেকে তাকে বলে দিলেন যে, তিনি যাচ্ছেন একটু নির্জন সমুদ্রের ধারে, আর কোথাও না। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে শান্তি-অশান্তি, সুখ-দুঃখ, সব মিলিয়ে একটি আশ্চর্য রাগিণী বাজতে লাগল। হৃদয়ে পথ চলতে চলতেই ক্ষণিকের পরিচয়েই স্নেহধারার ফল্গু নদী বইতে শুরু করেছে। লেখকের মনে হচ্ছে মহাদিগন্তের যে ডাকে তিনি ঘরের বাইরে বেরিয়েছেন, সেই যাত্রায় তার আনন্দের শুভ রাগিণীর সুর বাজতে শুরু করেছে।

চলমান ট্রেনে যাত্রীরা কেউ ঝিমুচ্ছেন, কেউ ঘুমোচ্ছেন, কেউ আধশোয়া। লেখক বই পড়তে পড়তে চলেছেন। কিন্তু একটি দীর্ঘশ্বাসে চমকে উঠে পড়া থামিয়ে দেখতে পেলেন রেণুর নিকষ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকা। ওর কালো পাড়ের শাড়ীটিকে শোকের চিহ্ন বলে মনে হচ্ছে। বেণী সম্পূর্ণ এলায়িত, শাড়ীর আঁচল স্বাভাবিকভাবেই পিঠের ওপর এলিয়ে পড়েছে। লেখকের রেণুকে একটি শোকের প্রতিমূর্তি বলে মনে হচ্ছে। ছোট বউদি রেণুর মাথাটা ওর কোলের উপর টেনে নিয়ে রেণুর চোখ দুটি হাত দিয়ে চাপা দিয়ে রাখলেন। কালকূট তাঁর অন্তর্দৃষ্টি মেলে ধরেছেন — রেণুর কিসের শোক? কেন রেণুকে মূর্তিমতী শোক বলে মনে হচ্ছে? মনে মনে

লেখক বলছেন যে, "যা দেখব না ভাবি, তাই চোখে পড়ে।" *(পৃ: ১৪১, ঐ)* কিন্তু লেখক এভাবে চুপচাপ বেশিক্ষণ থাকতে পারলেন না, নাসিকাধ্বনির গর্জনে। লেখকের পাশেই একজন মুখ ভর্তি গুয়াপান নিয়ে শুয়ে নাক ডাকছিল হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই 'কন্‌টিশন গেলা' বলে চেঁচিয়ে উঠল। কামরার একপ্রান্তে চেয়ে প্রায় দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল, সেইরকমই ভাষায় ট্রেনের সেই প্রান্ত থেকে উত্তর এল, রাতের অন্ধকার আর ট্রেনের গতির শব্দ ভেদ করে। তার একটু পরেই পা তুলে উট্‌কো হয়ে সীটের উপর বসে সপ্তম সুরে গান জুড়ে দিল

"রক্ষা কেমত্ত করি, করিবা
মত্তকারী —
গতি কি এমন্ত বিচারি
রে সহচরি।" *(পৃ: ১৪১, ঐ)*

লেখক রাতের ঘুমন্ত কামরার চিত্র এঁকেছেন সযত্নে। তার মধ্যে মধ্যে কৌতুকের ছটা মিশিয়ে দিয়েছেন। সহচরি কথা, তার বিরহ এই মধ্যরাতে রক্ষা করাই দায়, তাই এই শব্দভেদী গান। পুরী স্টেশনে নেমে দাঁড়াতেই মানুষে, কুলিতে পান্ডাদের চিৎকারে সব একাকার হয়ে গেল। লেখকও এই উপকূল শহরের দিকে তাকিয়ে মনকে অতীতচারী করে ফেললেন। "চীন পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ তাঁর ভগবানের দেশ দর্শন করতে এসে যে যে শহরের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, চে-লি-টা-লো-চিং! সংস্কৃত শব্দে যার নাম চরিত্রপুর, চীনা ভাষায় ওই নাকি তার লিখন। আমি এসেছি সেই প্রাচীন সমুদ্রোপকূলের নগর চরিত্রপুরে। যার আধুনিক নাম পুরী। চৈতন্যের শেষ প্রস্থানের নীলাচল। ইতিহাসের বিস্মৃত কক্ষ হাতড়েও যার সব কথা, সব কাহিনী আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবু মানুষ মাটির তলায় ভিত্তি দেখে, পূর্ণ অবয়বকে কল্পনা করতে শিখেছে। সেই কল্পনাকে সে প্রমাণ করেছে নানান ভাবে। আর সেই প্রমাণের মধ্যে কথা বলে উঠেছে অতীত।" *(পৃ: ১৪২, ঐ)*

একের পর এক ঐতিহাসিক ঘটনা চরিত্ররা কালকূটের মনে এসে ভীড় করছে। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খৃষ্টীয় নবম শতক পর্যন্ত এই দেশে বৌদ্ধধর্মের লীলা চলেছিল। হিউ-এন-সাঙ এই দেশের নাম উ-ছা বলে লিপিবদ্ধ করেছেন। উ-ছা হল ওড্রদেশ অর্থাৎ উড়িষ্যা। তিনি এদেশের নগরে-গ্রামে, পাহাড়ে-পর্বতে-জঙ্গলে দেখেছিলেন জৈন মন্দির, বৌদ্ধস্তূপ, সংঘারাম। কিন্তু একটিও হিন্দু মন্দির দেখতে পাননি। এইকথাতে কালকূট সংশয়ান্বিত, আবার নিজেই খণ্ডন করেছেন হয়ত তাঁর চলার পথে চোখে পড়েনি, হয়ত ছিল। নইলে ইতিহাসের নানা উত্থান-পতনের মধ্যে আবার হিন্দুধর্ম ও মন্দিরের আবির্ভাব সম্ভব ছিল না। লেখকের অতীতচারী মন অতীতের ঘটনার কারণগুলো খুঁজছেন ঐতিহাসিকের জিজ্ঞাসায় নয়। একজন জিজ্ঞাসু মানবমনের জানবার আকাঙক্ষা

থেকে। তার মন আরও প্রসারিত হয় উড়িষ্যার পার্শ্ববর্তী দেশ কলিঙ্গ পর্যন্ত। খৃষ্টপূর্ব তিন শতকে নিরীহ নরনারীর রক্তবন্যা বইয়ে দিয়েছিল চন্ডাশোকের সৈন্যবাহিনী। নিষ্ঠুর, দাম্ভিক দিগ্বিজয়ী সম্রাট অশোকের হৃদয় সেই উত্তাল রক্তের ঢেউয়ে আন্দোলিত হয়ে গিয়েছিল। বেদনার অশ্রুজলে মথিত হয়ে তাঁর হৃদয়ে ফুটে উঠেছিল প্রেম-কমল। অশ্রুজলের বন্যায় লবণাক্ত স্বাদের উৎস হল হৃদয়। "সেই প্রথম ক্রূর কঠিন বজ্রনির্ভর হৃদয় হয়ে উঠল ফুলের মতো। পাপড়িতে তার অহিংসার লিখন। গন্ধে প্রেম।" *(পৃ: ১৪২, ঐ)* পুরীর প্ল্যাটফর্মে এতকাল পরেও লেখকের মনে হচ্ছে এ দেশের মাটিতে যেন আজও সেই রক্তের দাগ লেগে আছে। অশোকের পরে কত কত রাজবংশ প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি কীর্তি বর্মন, হর্ষবর্ধন, পুলকেশীরা, রাষ্ট্রকূটের দাঁতিদুর্গা, জৈন রাজা অকালবর্ষ, চালুক্যদের রাজরাজদেব। কিন্তু এদের কেউই রক্তের ছাপকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করতে পারেন নি। কালিদাসের রঘুবংশ ও পণ্ডিত কলহনের রাজতরঙ্গিনীতেও এই দেশের উল্লেখ আছে। কালকূটের অতীতচারী মনকে বর্তমানে ফেরাল ছোট বউদি। তার দু'চোখের কূলে লেখক যেন সুগভীর নীল জলধারার স্তব্ধতা দেখতে পেলেন। ব্যথায় কিনা বুঝতে পারলেন না। ট্রেনের মধ্যে রাতের আঁধারে বুঝতে পারেন নি সেই দৃষ্টি। তিনি দেখেছিলেন পরম স্নেহভরে রেণুকে কোলের উপর তুলে নিতে। কালকূটের ছোট বউদির চোখ দুটিকে আনন্দের স্বরূপ বলে মনে হল। স্টেশন থেকে বিদায় নেওয়ার পর ছোট বউদির কথাগুলো লেখকের মনকে ভাসিয়ে দিয়ে গেল। "দুঃখকে এতবড় করে দেখছ কেন? ওর মুখের ওপর বসে, বুকের ওপর চেপে, প্রাণ খুলে হাস। যাও সমুদ্রের ধারে গিয়ে, ওর সঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে হাস।" *(পৃ: ১৪২, ঐ)* কালকূটকে সকলেই একটা স্নেহডোরে বেঁধে ফেলেছে এই মহিলা দল। অবুদি বলেই ফেললেন যে, লেখকের চোখ দু'খানি একটু ভুলো ভুলো। তাই শুনে শিবিদি বলে উঠল, "আমাদের অবলা ঠাকুরুণের মতো অত নয়।" কালকূট শিবিদির কথায় অবলা ঠাকুরুণকে লজ্জাবতী লতার মতো লতিয়ে যেতে দেখলেন, এবং সানুনাসিক গলায় আদুরে কন্যাটি হয়ে গেলেন। কথার দু'একটি ছত্র একটা মানুষকে কিরকম পরিবর্তিত করে দিয়েছে লেখক সেটা ছোট ছোট কথার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। কিন্তু মনের মধ্যে জিজ্ঞাসাটা রয়েই গেল এমন অসময়ে ওরা পুরীতে কেন?

সমুদ্রে নির্জনতার মধ্যেই সময় কাটাতে চান তাই ছুটতে ছুটতে ট্রেন ধরা। পুরী পৌঁছে যাবেন কোথা? কোথায় থাকবেন, কোথায় উঠবেন। পাণ্ডাদের হাতছানি সব উপেক্ষা করে রিক্সায় চলতে শুরু করার পরেই একজন কালকূটের রিক্সা থামিয়ে তাঁর সঙ্গী হয়ে গেল। তাঁকে তার বাড়ী দেখিয়ে দিল এবং খাওয়া-দাওয়ার জন্য অগ্রিম পয়সা নিয়ে নিল। কালকূটকে কাছেই যেসব ধর্মশালা আছে সে সকলের মধ্যে থাকার জায়গা খুঁজে নিতে বলল। একা যুবককে ধর্মশালায় থাকতে দেওয়া যাবে না। দুটোতে স্থান না হওয়ার পর একটিতে সিঁড়ির নীচের ঘরে স্থান মিলল।

বিছানা মশারি কিছুই সঙ্গে নেই কালকূটের, ওগুলো ভাড়াও পাওয়া যায় না। স্নান করতে গিয়ে বৈষ্ণবীদের দলের মধ্যে পড়লেন। তারা গান করছে, স্নান করছে, মাথায় জটা এক গেরুয়াধারিণীর পা ঘষে দিচ্ছে আর এক গেরুয়াধারিণী। আর এক বাবাজী কপিকলের দড়িতে টেনে টেনে জল তুলে দিচ্ছে। গুন গুন করে গান চলছে, একটা গানের আসরে যেন চলে এসেছেন, তিনজনে মিলে একটা ভাবের রসে ডুবে আছে। যে পা ঘষে দিচ্ছে তার নাম বিন্দু, সে-ই লেখককে জানিয়ে দিল যে, খেপী মাকে চান করাবার সুযোগ পেয়েছে, অতএব একটু দেরী হবে, আর বাবাজীর দিকে চেয়ে হাসল। কালকূটের এই হাসিটি দেখে মনটি রঙিন হয়ে গেল, এমন হাসি তো একজনের দিকে তাকিয়ে একজনই হাসতে পারে। দু'জনের দুচোখে যেন অদৃশ্য তরঙ্গে দোলা লেগে গেল। নীপবনে যেন কদম ফুল ফুটে উঠল, কেকাধ্বনি শুনতে লাগলেন। বিন্দুর কথাতেই বাবাজী কুয়ো থেকে জল তুলে বাবাজীর মাথায় ঢেলে দিতে থাকলেন যতক্ষণ না কালকূটের দেহ ঠাণ্ডা হয়। দেহ ঠাণ্ডা হয়েছে কিনা খেপী মা জানতে চেয়েছিল। খেপী মায়ের কথাটা কালকূটের চর্যাপদের সন্ধ্যা ভাষার মত লাগল। তার হাসিতে তরঙ্গায়িত দেহ দেখে কালকূটের মনে হয়েছে এক সর্বনাশের রঙ্গ যেন রঙ্গিনী নারীর সর্বাঙ্গে। খেপী মায়ের দেহ হাসতে হাসতে একদিকে কাৎ হয়ে পড়েছিল। ওই ভঙ্গি দেখে লেখকের "মনে হল, কোনো বিদেশী শিল্পীর তুলিতে আঁকা, ভেনাস-এর দেহ সৌষ্ঠবের ভঙ্গি যেন এমনি দেখেছিলাম।" *(পৃ: ১৪৭, ঐ)* লেখককে দেখে খেপী মায়ের মনে হয়েছে লেখকের মনের মালসা আগুনে ভরা। খেপী মা তাঁকে পোড়াবাবা বলে ডেকেছেন আর পাঁচ নম্বর ঘরে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

লেখক খেপী মাকে যাব বলে নিজের সুড়ং ঘরে এলেন। কিন্তু মন পড়ে রইল ওইদিকেই, মানুষগুলি কেমন ভাবের ঘোরে রয়েছে অষ্টপ্রহর। গেরুয়া জটা-গান এদেশের কোথায় ওই ভাবজগতের সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জগতের অমিল। লেখক বলেছেন একে মন্দ বলা যায় না। "সবাইকে সে একখানে ডাক দিয়ে বলতে পারে, আমরা সবাই সমান। ভাবে আর বাস্তবে মিলবে, সেই তো আমার যুগের সাধন।" *(পৃ: ১৪৮, ঐ)* লেখক কালকূটের অন্তর্দৃষ্টি মেলে তুলে ধরেছেন এক দুর্লভ চিত্র, যা আমাদের সাধারণের নিত্যদিনকার দেখা কিন্তু দেখা নয় কালকূটের মতো করে।

ব্রাহ্মণ পান্ডার গৃহে গিয়ে পান্ডার গৃহিনীকে দেখে লেখকের চক্ষু চড়ক গাছ! বুড়ির দুটি পায়েই গোদ, মহাগোদ; সেই পায়ে কাঁসার খাড়ু এঁটে বসা, নাকে নোলক আর কপালে অবধি ঘোমটা। শ্যাওলা কুয়োতলার সামনের বারান্দায় বুড়ো পান্ডার গণেষধবূ জনা তিনেকের মত ভাত, ডাল তরকারি ভাজা দিয়ে গেল। ভাজা মুখে দিয়েই মনে হল আলুভাজা নয় কচুভাজা। আর তরকারির আলু মুখে দেওয়া মাত্র বুঝে গেলেন এটিও কচু আলু নয়, কচুর তরকারি, বুড়ো পান্ডা

কিছুতেই মানল না ওটা কচু বলে। বাজার থেকে সে আলুই কিনে এনেছে। কালকূট চলে আসার সময় বুড়ো জানতে চাইল রাতে ভাত না রুটি খাবেন তিনি। বুড়ো এও বলল "গরীব মানুষ বাবু তোমরাই ভরসা। গোঁসা কর না বাবু।" *(পৃ: ১৪৯, ঐ)*

লেখক কালকূট বুঝলেন যে অভাবে স্বভাবটা নষ্ট হয়ে গেছে। তা নইলে বুড়ো আলু কিনে আনার পর পুত্রবধূ কচু রান্না করবে এমন সাহস কলাবউ সদৃশ পুত্রবধূর কখনও হবে না। পুরী ভ্রমণে কোনো এক পান্ডার ঘরে কালকূট খাওয়া দাওয়া করেছিলেন তারই একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা জানানো যেতে পারে। তপন সিংহ নির্মিত 'নির্জন সৈকতে' সিনেমাটি উড়িষ্যাতে দেখানো শুরু হয়েছিল, কিন্তু দু'একদিনের মধ্যেই ছবিটি তুলে নেওয়া হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে লেখক যখন 'প্রেম নামে বন' নামক অরণ্য ভ্রমণ কাহিনীটি লিখেছিলেন সেখানে সীমা দাসের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে ঘটনাটা এইভাবে লেখক তুলে ধরেছেন। সীমা দাস বলছে "এ'দেশের লোকের ধারণা, আপনি তাদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছেন।" *(পৃ: ৮৬৫, কালকূট রচনা সমগ্র, ২য় খণ্ড)* লেখকের উত্তর ছিল "জানি, কিন্তু ভারতের কোনো প্রদেশের লোক নিয়েই আমি ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে পারি না, করিও নি। আমার দুর্ভাগ্য, উড়িষ্যাবাসী অনেকের মনে হয়েছে, আমি তাঁদের নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছি। আমি আদৌ তা করিনি।" *(পৃ: ৮৬৫, ঐ)* সীমা দাস বলেছেন "আপনার গল্পে একজন ওড়িয়া পান্ডার কথা আপনি লিখেছেন, যে চরিত্র আপনার পাঠককে শুধু হাসাবে, মজা দেবে। সেইজন্যই, ওড়িয়ারা সিনেমাটা তাদের দেশে দেখাতে দেয়নি।" *(পৃ: ৮৬৫, ঐ)* লেখকের উক্তি "আপনার কথা খুব সত্যি, এখানে সেন্টিমেন্টের প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু অসত্য কিছু বলা হয় নি।" *(পৃ: ৮৬৫, ঐ)*

লেখক এই কাহিনীর এই বিশেষ অংশটি নিয়েই তাঁর স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করে ওড়িশাবাসীর ক্ষোভ দূর করবার চেষ্টা করেছেন। অরণ্য বিষয়ক ত্রয়ী রচনা আলোচনা কালে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, মূল কাহিনী আলোচনাকালে প্রসঙ্গটি আরও একবার উল্লেখ করা হল। সুড়ং-এ লেখক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কিন্তু প্রচণ্ড গরমে আর মশাবাহিনীর কামড়ে ঘুম আর ঘুম রইল না। পেপার দিয়ে যুদ্ধ শুরু হতেই দরজার কাছে রেণু উপস্থিত। লেখক যে এই ধর্মশালায় উঠেছেন তাদের জানা ছিল না। বাগানে ফুল তুলতে গিয়ে ঘরের মধ্যে হুলস্থূল আওয়াজ পেয়ে উঁকি দিতে গিয়ে লেখকের দেখা। মশার কামড়ে আর গরমে ঘেমে নেয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় রেণু লেখককে আবিষ্কার করে ওই ছোট কুঠুরীর মধ্যে। তারপরেই কি একটা বলে চলে যায় এবং একটু পরেই অবুদি, শিবিদি, সেজদি সহ আগমন। তারা কোন কথাই শুনবে না এবং শুনল না লেখকের কোন আপত্তি। পুটুলি সহ নিয়ে চলল তাদের দোতলার ঘরে। এই ধর্মশালারই দোতলায় তারা উঠেছে, মহেন্দ্র আশ্রমে কয়েকজন এসে যাওয়ায় তারা বাধ্য হয়ে এই ধর্মশালায় উঠেছে। ছোট বউদির

সঙ্গে তারা তাঁর দুপুরের খাওয়া নিয়ে আর সুড়ং ঘরে থাকা নিয়ে মজা করে নানা কথা বলতে লাগল। খাওয়া দাওয়া সব ওদের সঙ্গে করতে হবে, ওদেরও একটা ব্যাটাছেলে সঙ্গী হবে। সকলের মধ্যে একটা সাজো সাজো রব, বাজার করবে, রান্না করবে। আনন্দের জোয়ার এসেছে যেন। লেখকের মনে হল যে, মেয়েমানুষ সধবা হোক, বিধবা হোক, তীর্থে যাক ও ঘরে থাক সব জায়গায় এক। স্নেহের ফল্গুধারা সর্বত্র বইতে থাকে। লেখক কালকূট এদের স্নেহের উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করে উঠলেন। তিনি বলেছেন "এই আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমার দুর্ভাগ্যতাড়িত জীবনে পথের মাঝে ছিল একটি এমনি প্রস্রবণ।" *(পৃ: ১৫১, কালকূট রচনা সমগ্র, ১ম খণ্ড)* ছোট বউদি বলল যে লেখকের সঙ্গ তাদের প্রয়োজন ছিল, অনেকে বলে এটি আদ্যিখেতা, কিন্তু তারা এই আদ্যিখেতা করতে ভালবাসেন এবং এটাই সকলের ভালো লাগে। ট্রেনের মধ্যে রেণুর কথায় কালকূট মনক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন সেটা ছোট বউদি জানতেন। কিন্তু ছোট বউদি রেণুর হয়ে বলে দিলেন আত্মসম্মান জ্ঞান ওর একটু বেশি, কাউকে ইচ্ছে করে দুঃখ দেয় না। কালকূট যেন তাকে ভুল না বোঝে।

বাজার করে কালকূট, ছোট বউদি ও রেণু জগন্নাথের মন্দিরের দিকে চলল। মন্দিরের সামনে এসে কালকূট থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন মূর্তিগুলোর জীবন্ত ভঙ্গি দেখে। দুপাশে দুই শার্দূল মূর্তি ও দরজায় নৃত্যরতা নর্তকীদের মূর্তিগুলো দেখে মনে হচ্ছিল শার্দূল হুঙ্কার দেবে ও নর্তকীদের নূপুরের ধ্বনি এইমাত্র যেন স্তব্ধ হয়ে থেমে গেল। মন্দিরের সিঁড়িতে পা রাখতে গিয়ে কালকূটের সারা দেহ কণ্টকিত হয়ে গেল "তাঁর সুগৌর চরণ যেন আমি দেখতে পেলাম। এই পৃথিবীতে তাঁর শেষ চরণচিহ্ন এই সিঁড়িতেই পড়েছিল। তিনি আরোহণ করেছিলেন, আর কোনোদিন অবতরণ করেন নি। এই নীলাচলেই তো নিমাইয়ের শেষ বাস, এই মন্দিরেই তাঁর দেহের শেষ লয়। আমার পা যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠতে চাইল। কুণ্ঠায় নত হয়ে পড়লাম। আমি মন্দিরের বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করতে ভুলে যাই, তবু এই সিঁড়িতে পা দিয়ে, আর একজনের পাদস্পর্শের কল্পনায় সশ্রদ্ধ কুণ্ঠায় আড়ষ্ট হয়ে উঠি। মনে মনে প্রণাম করি বারে বারে।" *(পৃ: ১৫৩, ঐ)* কালকূটের মনে নানা প্রশ্ন এসে ভীড় করে। নিমাইয়ের রক্তে কি বিশ্বপতির এই প্রাঙ্গন রক্তাক্ত হয়েছিল? আচণ্ডালে দাও প্রবেশের অধিকার দেবতার দুয়ারে, এই আহ্বান যার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল সেই পরমপুরুষ, নরদেব নিমাই কি শহীদ হয়েছিলেন! ঐতিহাসিকদের মতে নিমাই হলেন অস্ত্রহীন দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা বিপ্লবী বীর। নিমাইয়ের শেষদিনের সঙ্গে জগন্নাথের সঙ্গে যে অলৌকিকতা মিশে আছে তাতে কালকূট মাথা নত করতে রাজি নন। বরং তার কল্পিত ভাবনা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন "কুসংস্কারান্ধ উন্মত্ত নিষ্ঠুর মূর্খ, শিখা ও উপবীতধারীরা নিমাইকে পাথরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রক্তাক্ত করেছে?" *(পৃ: ১৫৩, ঐ)* কালকূট নিমাইকেই মন্দিরের দেবতা বলেছেন। ধীরে

ধীরে তাঁর মন ইতিহাসে পদচারণা করেছে। এই মন্দির বর্ণাশ্রমসৃষ্ট দেবতা জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের নয়, এ নাম আরোপিত। তাদের নাম বুদ্ধ ধর্ম সংঘ। বুদ্ধের দন্ত এখানে রাখা ছিল। সেই পুণ্য দন্ত খৃষ্ট জন্মের চারশো বছর আগে একবার পাটলিপুত্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। তারপর বৌদ্ধ যুগের কোন এক আবছা অন্ধকার সময়ে সেই পুণ্য দন্ত সিংহলে স্থানান্তরিত হয়েছিল। বৌদ্ধদের ত্রিরত্ন দেবদেবীরাই হয়তো হাত পা কাটা মূর্তি নিয়ে রয়ে গেছেন। বুদ্ধ ধর্ম সংঘ হয়েছে জগন্নাথ সুভদ্রা বলরাম। বৌদ্ধ মতে ধর্ম স্ত্রীলিঙ্গ। অতএব সুভদ্রা করতে অসুবিধা হয়নি।

কালকূট শুধু ইতিহাসে পদচারণা করেই নিরত হন নি। পুরাণ আর কপিল সংহিতার পুঁথির পাতাও উল্টে দেখেছেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁর রাণী গুন্ডিচাদেবীর অনুরোধে নাকি এই তিন দেবদেবীর মূর্তি তৈরীর নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু মূর্তি তৈরি সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বন্ধ ঘরের দরজা খুলে ফেলায় সেই মূর্তি আর সম্পূর্ণ করা যায় নি। "হাত পা বিহীন অসম্পূর্ণ অপরূপই তাঁদের রূপ, কারণ মর্তের মানুষ একবার দেখবার পর, পূর্ণতা সম্ভব ছিল না।" *(পৃ: ১৫৩, ঐ)* এই জগন্নাথের মহাপ্রসাদ সকলে হাত মিলিয়ে গ্রহণ করলেও অশুচি হয় না, জাত যায় না। কালকূট এই মন্দিরের আরও একটি বৈশিষ্ট্য আলোকপাত করেছেন। মূল মন্দির পশ্চিমে অবস্থিত আর বিগ্রহ পূর্বমুখী, যা হিন্দুমতে বিপরীত। শুধু এই মন্দিরই নয়, উড়িষ্যার প্রাচীন মন্দিরগুলোই নাকি এই একই বৈশিষ্ট্যে বিরাজমান। লেখক কালকূটের মন এতে সংশয়ান্বিত। বৌদ্ধদের ত্রিরত্নের প্রতীক হিন্দুধর্ম থেকেই আসেনি তো? কালকূট তাই বলেছেন "শুধু পাত্রাপাত্রে রূপের ভেদ যেন! একরূপে যে অনেককাল গেল। আর এক রূপে দেখি। সে কালও গত হল। এবার দুয়ে মিলিয়ে মিশিয়ে নতুনতর করি। মিলিয়ে মিশিয়ে যিনি, তিনি জগন্নাথ। ইনি বর্ণাশ্রমের হিন্দু দেবতা নন। ইনি বিশ্বপতি। বিশ্বপতির দুয়ারে মহারাজা গঙ্গেশ্বর এই সিঁড়ি দিয়েই কি আরোহন করেছিলেন, গঙ্গ াবংশের আদি রাজা এই মন্দিরের স্রষ্টা। দ্বাদশ শতাব্দীতে আরোহন করেছিলেন কবি জয়দেব। কল্পনায় জিজ্ঞাসু হয়ে উঠি তার পাশে পাশে পদ্মাবতী কি ছিলেন? পদ্মাবতীর অসক্তরাগরঞ্জিত পায়ের অরুণচিহ্ন কি এই পাথরের ধাপে আছে কোথাও?" *(পৃ: ১৫৩, ঐ)* মন্দিরের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে কত শত শত মানব-মানবীর পদচিহ্নের পদরেণুর স্পর্শে তিনি রোমাঞ্চ অনুভব করেছেন। মন্দিরের প্রাকার গাত্রে মনে হয় যেন ছায়াদের ভিড়। মূক মৌন সেইসব প্রস্তর ছায়াদের অপলক দৃষ্টি যেন লেখক অনুভব করছেন। কত শত বৎসরের সুখ দুঃখ বিধৃত কাহিনী বর্তমানের সুখ দুঃখের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সন্ধ্যারতির ঝংকার ধ্বনি কালকূটের অস্তিত্বকে দূরকালের ধ্বনির সময়ে নিয়ে গেল। মন্দির নিয়ে প্রচলিত কাহিনী, ইতিহাস ও তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনের ভাবনা লেখক কালকূট কাহিনীতে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যা কাহিনীর গতিপথকে

সমৃদ্ধ করেছে। সেই স্থান-কাল-ভাবনাকে লেখনীর মাধ্যমে বিবৃত করে পাঠককুলকেও ভাবিয়ে তুলেছেন। তাদের মনেও হাজারো প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা এসে লেখকের ভাবনাকে সমৃদ্ধ করে। এই সময়ের এই ভাবনা থেকেই হয়তো কালকূট তাঁর গবেষণামূলক রচনা 'জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য' রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এবং সেখানেও তিনি একই প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা রেখেছেন, চৈতন্যদেব তথা বাংলার নিমাইয়ের অন্তর্ধান নিয়ে।

মন্দিরের আরতি ঘণ্টা ধ্বনিত হচ্ছিল। ছোট বউদি আর কালকূট আরতি না দেখে মন্দিরের চত্বরের অন্য একটি জায়গায় গিয়ে বসলেন। রেণু একা রয়ে গেল আরতির স্থানে। বউদি রেণুর ব্যথাতুর মন-এর কাহিনী উদ্‌ঘাটন করলেন কালকূটের কাছে। রেণু যাকে ভালোবাসত তাকে রেণুর মা-বাবা কারও পছন্দ ছিল না। অন্য জাতের ছেলে। ছোট বউদির খারাপ লাগেনি ছেলেটিকে, লেখাপড়া জানা, বংশ ভালো। রেণুর সংযত আচরণে কোনোদিনও বেচাল কিছু দেখেনি ছোট বউদি। ছোট বউদির হাতেই রেণু মানুষ, তিনি যেমন করে বোঝেন, তেমনটি করে কেউ নয়। রেণুকে থাপ্পড়ও মেরেছেন। দু'বছর ধরে মা-বাবা, আত্মীয় স্বজন, পাড়া-পড়শী — সবাই অপমান, বিদ্রূপ করেছে কিন্তু তাতেও রেণু দমেনি। বাড়ীর লোকেরা রেণুর জেদের কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এবার সমস্যাটা এল অন্য জায়গা থেকে, যে ছেলের জন্য তার অপমান, লাঞ্ছনা, এতদিন ধরে প্রতীক্ষা, সেই বেঁকে বসল, বলল যে তার বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। বাড়ীর লোক উঠে পড়ে লাগল এর একটা বিহিত করার জন্য। কিন্তু আত্মসম্মানী, অভিমানী, অপমানিতা রেণু সকলের উদ্যোগকে থামিয়ে দিল। বাড়ীর লোক এরকম করলে গলায় দড়ি দেবে রেণু। রেণু ক'দিন পুরীর মহেন্দ্র আশ্রমে এসে থাকতে চেয়েছিল, তাই ওদের এই অসময়ে পুরীতে আসা। কালকূট নতুন করে রেণুকে চিনলেন। ছোট বউদির ভাষায় এটা এমন কিছু নয়, আখচার ঘটে এইসব। কিন্তু কালকূটের মনে হল রেণুর আঘাত অনেক বেশি। "আঘাত তাকে দুঃখের চেয়ে অনেক গভীরে হেনেছে। শোক লেগেছে তার। বিশ্ব চোখে নতুন রূপে দেখা দিয়েছে। তার আজন্মকালের বিশ্বাসগুলি আজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে। দুঃখ পেয়ে কাঁদবার আগে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।" *(পৃ: ১৫৪, ঐ)*

আরতি শেষে রেণুকে খুঁজতে খুঁজতে মন্দিরের কাছে গেলেন। মন্দিরের কালো পাথরের গায়ে কারুকার্য করা নরনারীর বিচিত্র লীলার ভীড়ে রেণু হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। "মাথা তার নত। নিশ্চল শরীর। মনে হল, সেও যেন পাথরের গায়ে এক বিশেষ ভঙ্গির মৌন মূক মূর্তি। যে এই শতাব্দীকে দেখছে অবাক হয়ে।" লেখকের কথায় পাথর-স্তব্ধতা থেকে যেন রেণু নেমে এল। নেমে এল ওই মন্দির গাত্রের নরনারীর মিছিল থেকে। লেখক রেণুর প্রেম-যন্ত্রণাকে মন্দিরের পাথর-প্রতিমার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। লেখক বুঝতে পারলেন কেন এই বাইশ-তেইশ বছরের

তরুণী কন্যা এত মূক, অবাক চোখে শুধু পরিস্থিতিকে তাকিয়ে দেখে। প্রেম ওকে ভাষাহীন করেছে কিন্তু আত্মসম্মানবোধ তাকে একটা অনন্যতা দিয়েছে যা সকলের থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়।

সারারাত মশার কামড় ও গরমে দাপিয়ে ভোরে রাত শেষে ধর্মশালার বাইরে যেতে গিয়ে ম্যানেজারকে দেখতে পেলেন। আলো জ্বালিয়ে বই পড়ে যাচ্ছেন। কালকূট কিছু বলার আগেই বলেই দিলেন যে, হুডকো খুলে চলে যান। এই আচরণ লেখকের অদ্ভুত মনে হল। লেখকের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে— ম্যানেজারের যেন এসব জানা। থাকতে হলে থাকুন, চলে যাবার হলে চলে যান। দীর্ঘদিনের ম্যানেজারির অভিজ্ঞতায় তিনি ঋদ্ধ। একাকী জেগে বই পড়েই যাচ্ছেন, নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন। কালকূট বাইরে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেলেন তাঁর ইপ্সিত লক্ষ্যে। একটা প্রবল গর্জন ভেসে আসছে। আকাশে বিদ্যুতেরও হানাহানি নেই তাহলে কিসের গর্জন। তাঁর মনে হল সেই গর্জন এসে পৌঁছোচ্ছে তাঁর পায়ের মাটির তলায়। আশেপাশের বাড়িগুলি স্তব্ধ, নিদ্রিত। বাঁক ফিরতেই তিনি দু'চোখ ভরে দেখলেন "আমি যেন এক সমাপ্তিতে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি যেন আর এক শুরুতে এসে পৌঁছেছি! দেখলাম, শুরু আর সমাপ্তি এখানে কোলাকুলি করে খেলছে। সেই গর্জন আমার কানে কি বিচিত্র দুর্বোধ্য ভয়ে অনেক কথা বলতে লাগল। যে গর্জন হয়ে বেজেছিল সে যে আমারই মহাদিগন্তের অট্টহাস। আঃ! এই তো এলাম তোমার দ্বারে। অস্পষ্ট অন্ধকারে মাখামাখি করে রয়েছে সে। বহুদূরে দেখতে পেলাম কেবল একটি উজ্জ্বল রেখা। যেখানে মহা অম্বর আর মহা নীলাম্বুধি, পরস্পর কাছাকাছি হয়ে যেন আবেশে মূর্ছিত প্রায়।" *(পৃ: ১৫৫, ঐ)*

"আঃ! কী অগাধ, কী বিরাট! এই তো, আছড়ে পড়া উচ্চ ঢেউয়ে সে হাসছে অট্টহাসি। দূরের তরঙ্গে শুনছি তার বাণীর ঝংকার। নিরলস গানে সে ফেনিল।

এই আমার পরম সৌভাগ্য, আমাকে যখন সে ডাক দিয়েছে, তখন সে নির্জন। তারা গেছে ফিরে, যারা পদ্মপাতায় এক বিন্দু জলের মতো টলোমলো ছুটির দিনগুলিতে এসেছি।" *(পৃ: ১৫৫, ঐ)*

"এই আমি চেয়েছিলাম। আজি নির্জনে দেখব এই চিরদিনের খেলা। এই বেলাভূমির চির-তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি দিয়ে সমুদ্রকে দেখা। আর নিয়ত সাড়া দিতে সমুদ্রের ছুটে ছুটে আসা। তাদের এই চিরদিনে কোলাকুলি, মাখামাখি, চাখাচাখি রঙ্গ।" *(পৃ: ১৫৫, ঐ)*

যে সমুদ্রের ডাকে লেখক কালকূট ঘরছাড়া তার সামনে এসে কীভাবে তিনি সমুদ্রকে দেখেছেন তাই বর্ণনা করেছেন, এর সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন তাঁর মনের আকূতি। নির্জন সমুদ্রের বেলাভূমিতে তিনি যেন একাই এই অসীম সৌন্দর্য মাধুরী উপভোগ করেছেন। কিন্তু কালকূটের ধারণা ঠিক নয়, তাঁর মত আরও অনেকেই ছুটে এসেছেন। তিনি হঠাৎ দেখলেন সমুদ্রের বালুকাবেলায় মাইকেল এ্যাঞ্জেলার সেই নগ্ন পুরুষকে। মাথায় জটা বালিতে লুটোচ্ছে। কালকূট

চোখ ফেরাতে গিয়ে ফেরাতে পারেন নি। তখন পরিষ্কার বাংলা ভাষায় শুনতে পেলেন "আমাকে কী দেখছ? যাঁকে দেখার তাঁকে দেখ।" *(পৃ: ১৫৫, ঐ)* কালকূট জানতে চাইলেন কথাটা কাকে বলছেন? উত্তরে বললেন "আর তো কারুকে দেখি না। কাকে আর বলব?" *(পৃ: ১৫৬, ঐ)*

একটা লাল কাপড়ের টুক্‌রো নাভির নীচ থেকে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে আর রুদ্রাক্ষের মালা কুড়িয়ে গলায় পরে নিয়ে বললেন "এই তো হয়ে গেল, এখন আর দেখবার কিছু নেই। বলছিলাম, সামনে এত বড় জিনিস থাকতে আমাকে দেখেই অবাক হয়ে গেলে? কেন?" *(পৃ: ১৫৬, ঐ)* তারপরে আকাশ আর সমুদ্রকে দেখিয়ে বললেন যে, ওরা তো কিছু পরে নেই। মানুষের মত নয় বলেই কি ওরা কিছু পরে না। তিনি শুধু প্রকৃতির সঙ্গে মিলতে এসেছিলেন। একবার অন্তত জীবজগতের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখার জন্যই এইসব ধরাচূড়া ছেড়ে ফেলেন। উপরের কথাগুলো থেকে বোঝা যায় কালকূট জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। প্রথম দর্শনে দেখেছিলেন এক মানুষকে আর ফিরে যাবার সময় দেখতে পেলেন আর এক মানুষকে। লেখকের চোখে ঐ সন্ন্যাসী হয়ে উঠলেন এক প্রসন্ন গম্ভীর প্রৌঢ় পুরুষ। যিনি দুচোখ ভরে দেখেন ব্রহ্মাণ্ডকে এবং নির্বিকার চিত্তে গুন গুন করতে করতে চলে যান। নির্জন সমুদ্র সৈকতের দিগন্তহীন নিরালায় এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

সমুদ্রের ধারে পান্থশালার খোঁজে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলেন চওড়া পাঁচিলের ওপরে এক যুবক কাত হয়ে শুয়ে আছে, আর এক যুবতী তার শিয়রের কাছে বসে আছে। ওদের দেখে কালকূটের মনে হয়েছে মধুচক্র যামিনীর প্রহর কাটাচ্ছে এখানেই। "যেন সমাজ নেই, কাল নেই, আছে শুধু দু'জনার মুখোমুখি বসিবার, চিহ্নহীন মুহূর্তের সমষ্টি।" *(পৃ: ১৫৬, ঐ)* ওরা দূর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে, এই হয়তো প্রকৃত নির্জনতা। কর্মশালা ছেড়ে নোঙরঘর পান্থশালায় উঠলেন। শিবিদি-অবুদি-সেজদি খুশি হল না, ছোট বউদির প্রাণে বাজলেও কালকূটের পথ আগলে দাঁড়ালেন না। শুধু রেণুকে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলিয়ে দিলেন। রেণুকে কালকূট নতুন করে চিনেছেন। তাঁর নির্বিকার কথায় কালকূট আর আহত হলেন না।

'নোঙরঘরে'র যে ঘরটি কালকূটকে দেওয়া হল তার সামনে দিগন্ত জুড়ে মহাসমুদ্রের খেলা আর অম্বরে মেঘের খেলা। লেখক তো এমনটিই চেয়েছিলেন। নোঙরঘরে মালিক মহিমবাবুই কালকূটের বিছানাপত্তরসহ যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিলেন। অথচ এঁকে কালকূটের মনে হয়েছিল "প্রায় একটি সিংহের মত রাশভারী গাম্ভীর্যের ভারে থমথমিয়ে আছে মুখখানি। কোনো মহা আবিষ্কারকের পক্ষেও সেই মুখে হাসি আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।" *(পৃ: ১৫৮, ঐ)* লেখকের মনে হয়েছে হোটেল মালিকের অত রাশভারী হওয়া হোটেল মালিকের গুণের মধ্যে মানায় না। সঞ্জয় নায়ক বলে এক চোখ কানা একজনকে কালকূটের দেখভালের জন্য দেওয়া হল। কালকূট লক্ষ

করলেন সঞ্জয় তার দেখভাল করছে কিন্তু কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। লেখক একলা থাকার জন্য এতদূরে ছুটে এসেছেন কিন্তু সঞ্জয়ের দীর্ঘশ্বাসের বাষ্প কালকূটকে ঘিরে গণ্ডী রচনা করতে লাগল। ঐ একচোখা মানুষটার কী একটা অব্যক্ত বেদনা ব্যক্ত হতে চাইছে সেটা কালকূটের কাহিনীহীনরূপের দুয়ারে ছুটে আসার মতই অপ্রতিরোধ্য। বিয়ালি ওঠবার সময় আর বিরি বোনবার কাজ, সঞ্জয়ের মন চাষবাসের জন্য উদগ্রীব। কিন্তু বিম্বাধরী তাঁকে ঘরে থাকতে দিল না। সঞ্জয় নায়ক জাতে খণ্ডাইত, ছয় মান জমি আছে কিন্তু তারা চাষা নয়, চাষা বললে খুনোখুনি লেগে যাবে।

হোটেলের চাকর সঞ্জয় নায়ক, এক চক্ষু, সেই চোখের তারায় লেখক দেখেছেন শত চোখের লক্ষ্যভেদী নিশানা, গায়ের রঙ কবেকার অন্ধকার উড়িষ্যার তিন সহস্র পূর্ববর্ষের নিশা, কিঞ্চিৎ স্থূল, উচ্চতায় প্রায় সাড়ে চার ফুট, গলার সুরটি বর্ষীয়সী স্নেহময়ী মহিলার মতো তবে ঈষৎ সানুনাসিক। ওর কালো পুরুষ অঙ্গে ললিতভঙ্গির বিচিত্র মহিমা। তেমনি বিচিত্র মহিমায় লেখকের হৃদয়তন্ত্রীকে বাজিয়ে দিল পীরিতি বিষম জ্বালার গানের কলিটি। লেখক বলেছেন "যে মহতের দ্বারে আমি সকল তুচ্ছতার উর্ধ্বে, মহাপ্রেমের লেনাদেনায় এসেছিলাম, দেখলাম, তার নাচের ফিরতি তাল এসে মিলল সঞ্জয়ের কথায়। নির্ভুল সমে এসে তাল দিল।" *(পৃ: ১৬১, কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড)* সমুদ্রের নির্জনতায় এক বিচিত্র প্রেমকাহিনী লেখকের হৃদি কুম্ভকে বেদনার রসে সিঞ্চিত করল। জগন্নাথের মন্দিরের পাথরের ভগবতীর মতো বিম্বাধরীর গড়ন, তারই মোহে পড়েছিল সঞ্জয় নায়ক। দাদা বেঁচে থাকতেই দাদার বউ বিম্বাধরীর সঙ্গে সঞ্জয় খারাপ হয়ে গিয়েছিল এক আন্ধারি রাতে উঠানের পলিগাদায়, ওখানেই বিম্বাধরীর নাকের বেসরটি হারিয়ে গিয়েছিল। এরপর তার দাদা মাঠ থেকে কাজ করে এসে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যায় এবং বিনা ব্যাধিতে পটাং করে মরে যায়। সঞ্জয়ের বিশ্বাস নাকের বেসরটি হারিয়ে যাওয়ার জন্যই তার দাদা মরে গেছে, কেননা নাকের বেসর হল স্বামীর আয়ু। গাঁয়ের লোক বলেছিল "ভূতখণ্ডিয়ায় পেয়েছিল তার দাদাকে, গাঁয়ে দোষ ঢুকেছে। তাই পঞ্চায়েতের বিচারে মহাকাল শিবের পুজো দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। আর বিম্বাধরীর সঙ্গে তাঁর কাঁচপড় হয়েছে মানে দ্বুতিয়া। সেই বিয়েতে কেবল বাঁশী বাজে, শাঁখের মত শব্দ হয়, নাম পেহেঁকালি। খণ্ডাইতের ঘরে এইরকমই নিয়ম। ঘরের বউ ঘরেই থাকে, আর এক ভাইয়ের সঙ্গে তার কাঁচপড় হয়। এই বিম্বাধরীকে নতুন বেসর পরানো হয় সঞ্জয়ের আয়ুর জন্য। মহাজনের কাছে ধার করে রূপোর বেসর কিনে দিয়েছিল সঞ্জয়। তিন সের কাঁসা দিয়ে দুটি বাউটি, খাঁটি কাঁসার পায়ের গোড়, পিতলের চুড়ি, রেশমী চুড়ি, রূপা-পিতল দিয়ে গড়া তিনটা আংটি, রূপার তারের মালা। তার অদেয় কিছুই ছিল না, উত্তারণের মেলায় গিয়ে উলকি পরেছে সারা গা ভরে। গুয়াগুন্ডিপান, মান্দ্রাজি চুটা এনে দিয়েছে। তার রূপের ছটায় সঞ্জয় মুগ্ধ, সঞ্জয় দেখত এক চোখে, সারা পাড়ার

লোক দেখত দু'চোখে।

কিন্তু মাত্র চার বছর সেই মুগ্ধতা। সঞ্জয় থাকত জমিতে জমিতে আর বিম্বাধরী যেত হাটে ফসল বিক্রি করতে। একদিন বিম্বাধরীর সঙ্গে এল গাঁয়ের মহাজনের ছামাকরণ, মানে যে হিসাব লেখাপড়া করে। সঞ্জয়ের বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে গেল, কেন নিয়ে এল ছামাকরণকে। সেদিন বিম্বাধরীর যে রূপ খুলেছিল সে রূপ সঞ্জয় এর আগে কখনও দেখেনি। ছামাকরণকে কুপিয়ে কাটতে ইচ্ছা হল। কিন্তু লাভ নেই বুঝে গেছে যে সঞ্জয়ের পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য বিম্বাধরী বেসর পরেছিল তার হৃদয় থেকে সঞ্জয় খসে পড়েছে। তার হৃদয়ের আলো পড়েছে ছামাকরণের উপরে সে কথা বলতে বলতে সঞ্জয়ের প্রৌঢ় মেয়ে মানুষের মত গলা আবেগরুদ্ধ হয়ে গেল। তারপরে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলতে লাগল "আমার ঠাঁই গেছে। কোন্ পেশাদার লুটিশে আমার পিন্ডা বাঁচবে? বাবু, আমার ঘর উঠোন কেউ নিল না, কেয়াবনের নিরালা ঠাণ্ডা ছায়ায় আমার ঠাঁই মেয়ে লুকিয়ে রইল আর একজনের বুকে তো সেই বাপ ঠাকুদ্দার ভিটা ছাড়া হতে হল। ঘরটার আলো জ্বলল, সেখানটার কী দোষ বাবু?" বছরে একবার ছেলেমেয়েকে দেখে চলে আসার সময় বিম্বাধরী কাঁদে। বিম্বাধরীর দু'ফোটা চোখের জলই ওর সম্বল। আর ছামাকরণ? খণ্ডাইতের ঘরে নিজের জাত খুইয়েছে বলে পঞ্চায়েতকে ক্ষীরপিঠা খাইয়ে অনাচারের দোষ খণ্ডন করেছে। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, বিম্বাধরীর সঙ্গেই থাকে, চাষবাস করে। শুধু মেয়ে মেনকার জন্য তার স্বস্তি নেই। দাদার মেয়ে তাকেই যে বাবা জেনেছে। করণের ঘরে অর্থাৎ লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোকেরা নিতে চেয়েছে তার জন্য অনেক টঙ্কার দরকার। তার মেয়ের জন্য আশীর্বাদ চাই বলে হাতখানি লেখকের পায়ের উপর রেখে একচোখে হাসি ফুটিয়ে তুলল।

সঞ্জয়ের বেদনায় দীর্ণ চোখের হাসিটি দেখে কালকূটের মনে হয়েছে বিশ্বজয়ের হাসি। এর রূপ আলাদা। আশীর্বাদ চাওয়ার মধ্যে স্থূলতা থাকলেও ভালবাসার পরশ আছে। মেয়ে ভালো ঘরে বিয়ে দেবার জন্য পিতার আকূতি। লেখক কালকূট এসেছিলেন জনতাহীন নির্জনে। সঞ্জয় সেই নির্জনতায় কলরোল তুলেছে। রাশি রাশি লবণাক্ত জল তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গোপনে ঝরছিল; তাই ফেনিলোচ্ছল হয়েছে, ঝাঁপ দিয়েছে লেখকের হৃদয়সমুদ্রে। কালকূট অত্যন্ত সংবেদনতার সঙ্গে নোঙরঘরের চাকর সঞ্জয় নায়কের বিচিত্র প্রেমকাহিনী তুলে ধরেছেন। এক নিষিদ্ধ প্রেমকাহিনী পূর্ণতার পথে যেতে যেতেও জটিল জীবনের ঘূর্ণাবতে পর্যবসিত হয়েছে। লেখক কালকূট তুলে ধরেছেন উড়িষ্যার এক দূর গাঁয়ের খণ্ডাইতের জীবনচিত্র। তাদের জীবনাচারের সঙ্গে প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার, এক নারীর জন্য উথালি পাতালি প্রেম সব টুকরো টুকরো চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। সঞ্জয় বিম্বাধরী আর ছামাকরণের এই সম্পর্ক লেখকের মনে প্রশ্ন তুলেছে "কী বলব এই সঞ্জয়কে? কাপুরুষ? ভীরু? পরাজিত? ওকে দেখে, ওর কথা শুনে তো সে কথা আমার

একবারও মনে হচ্ছে না।" *(পৃ: ১৬৩, ঐ)*

লেখক কালকূট তার বেদনায় দীর্ণ। তিনি বলেছেন, "খণ্ডাইতের ঘরের এই কালো খর্বকায় এক চোখ অন্ধ কৃষকটির এই অমায়িক হাসি আমার বুকে একটি টাটানো বিস্ময়ের মতো এসে বিঁধল।

মনে করেছিলাম, ওর জীবনের বাষ্প দিয়ে আড়াল করল আকাশসমুদ্রকে। এখন দেখছি, সেই উদারের সঙ্গে ওরই মিলন হল। আমি দেখছি চেয়ে চেয়ে।" *(পৃ: ১৬৪, ঐ)*

কালকূট তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টির আলোক প্রসারিত করে দিয়েছেন তাঁর পাঠককুলকে। কদিন ধরে কখনও নোঙরঘর থেকে কখনও সমুদ্রের নির্জন বালুচর থেকে সমুদ্রকে দেখলেন বিভিন্ন রূপে — কখনও সমুদ্র স্থির, কখনও লীলাচঞ্চলা, কূলে কূলে তার খেলা বেণী ঢেউয়ের চঞ্চলতায় আছড়ে পড়েছে। এরই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করলেন সমান তালে সঙ্গত করে যাওয়া আকাশকে, কখনো কালো জটা খুলে মহাভৈরব হরষে, কখনো বিদ্যুতের মালা দুলিয়ে, বজ্রে বাঁশীর সুর তুলে, কখনও দুরন্ত ঘূর্ণীর বেগে, কখনও শাদা মেঘের ওড়না উড়িয়ে। সমুদ্র-আকাশ পরস্পরের কাছে থেকেও আপন লীলায় বিরাজিত। কালকূট বলেছেন সঞ্জয়-বিম্বাধরীর জীবনটাও এমনি লীলায় লীলায়িত, কোথাও থেমে নেই, রুদ্ধশ্বাস হয়ে ওঠেনি। নোঙরঘরের মালিক মহিমবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বেশি না হলেও একদিন তার হৃদয়ের কোমলতার আভাস পেয়েছেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্র দেখতে দেখতে দৈববাণীর মত উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে শুনেছিলেন "ইয়েস্ মাই বয় ইট ইজ সো বিগ এ্যান্ড সো ডীপ, দ্যাট উই উইল কাম এ্যান্ড গো, বাট নট বি এবল্ টু ডিসকভার দি ওসন বাই টু হিউম্যান হ্যান্ডস্। ফিল ইট উইথ ইয়োর লাভ এ্যান্ড প্যাশান!" *(পৃ: ১৬৫, ঐ)* চার নম্বর ঘরের দুই বোন আর দাদার সঙ্গে আলাপ হয় নি। ছোট বোন গৌরাঙ্গীকে মাঝে মাঝে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। কোথাও যেন একটু লুকোচুরি চলছে, সঞ্জয়ের কাছেও ওরা রহস্যময় আর চখাচখি অর্থাৎ নববিবাহিত স্বামী-স্ত্রী নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত।

নোঙর ঘরে একদিন এক সন্ন্যাসী এলেন অনেকগুলি বই নিয়ে। কালকূট যত বলেন তিনি নেবেন না ততই তিনি সুর করে করে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কবিতা বলতে লাগলেন। সম্ভবত বিদ্যাপতির খেউর। রাধার দেহ বর্ণনা। শেষে কালকূট তাঁকে দুআনা, দুআনা পয়সা দিয়ে নিস্তার পেলেন। কিন্তু দু'দিন পরে আবার উদয়। এদিন কালকূটকে বললেন "এ্যা, এ্যাই, বলেছি তো, মুখখানি ভাল মানুষের মতো, ভাসা ভাসা চোখ, তুমি যে বাবা বৃন্দের কালো বেড়াল, হুঁ হুঁ।" *(পৃ: ১৬৭, ঐ)* কালকূট তাকে খেঁকিয়ানন্দ বাবু বলার সুযোগই পেয়েছিলেন। তারপর আর বলতে হয়নি। খেঁকিয়ানন্দ নিজের মত করে বলতে বলতে জয়দেবের 'সুপ্রীতি পীতাম্বর' অংশ থেকে রাধাকৃষ্ণের রতি বিহার নির্ভুল উচ্চারণে আবৃত্তি শুরু করে দিলেন। কালকূট চমৎকৃত সুললিত

ভাষা ও ছন্দের মাধুর্যে। কিন্তু খেঁকিয়ানন্দ চোখমুখের এমন ইঙ্গিভঙ্গি করছিলেন যা লেখকের সহ্য করা কষ্ট হচ্ছিল। লেখক রাগত স্বরে খেকিয়ানন্দকে চলে যেতে বলেছিলেন। জয়দেবের কবিতাকে খেউড় বলায় খেঁকিয়ানন্দ আহত হয়ে মাথা নত করে নিঃশব্দে চলে গিয়েছিলেন। লেখক নিজের ব্যবহারের জন্য একটু পরেই অনুতপ্ত হয়েছিলেন। মহিমবাবু ঘরে আবেগ মথিত কীর্তনের গান শুনে কালকূট এগিয়ে গিয়ে খেঁকিয়ানন্দকে দেখলেন চোখ বুজে আবেগ মথিত হয়ে পীরিতি বিলাপের গান গাইছেন। একজন বৈষ্ণব ওড়িয়া ভিক্ষাজীবী তারের যন্ত্রে ঘা দিচ্ছে। কালকূটের আগমনে গান থেমে গেল এবং চলে যাওয়ার উদ্যোগ করলেন। কিন্তু মহিমবাবু যেতে দিলেন না। অভিমানে আহত শিশুর মত লেখকের দিকে না তাকিয়ে ঘাড় গুঁজে রইলেন। খেঁকিয়ানন্দ আবার গান ধরলেন। তাঁর কণ্ঠ মাধুর্য ও গানের অভিব্যক্তিতে কালকূট ভাবে ডুবে যাচ্ছিলেন। কালকূট এও বুঝেছেন প্রাণের গভীরে ক্ষতের যাতনা থেকেই এমন গানের অভিব্যক্তি। কালকূট নতুন করে খেঁকিয়ানন্দকে চিনলেন, বই বিক্রির কারণে ছলাকলার আশ্রয় নিয়ে পয়সার আদায়ের ফিকিরেই তিনি ঘোরেন না। তার মধ্যে একটা শিশুসুলভ মনও কালকূটের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। অনুতপ্ত কালকূট "এখন ভাবছি জয়দেব যিনি অমন করে আবৃত্তি করতে পারেন, তাঁকে অশ্লীলতার এক ধাক্কায় সরিয়ে দেওয়া যায় না। এখন আমার মনে হল, হয় তো খেঁকিয়ানন্দের দ্বিতীয় গানটি আমাকে শুনিয়েই গাওয়া।" *(পৃ: ১৬৮, ঐ)*

চা খেয়ে খেঁকিয়ানন্দ চলে যেতে কালকূট তাঁর পেছন পেছন গিয়ে তাঁর রাগ ভাঙিয়ে আশ্রমের জন্য কিছু টাকা দিয়ে এলেন। খেঁকিয়ানন্দ যেতে যেতে কালকূটকে আশ্রমে যাওয়ার আমন্ত্রণ দিয়ে রাখলেন। কালকূট খেঁকিয়ানন্দের চোখে হাসির ঝিলিক দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি অমৃতনন্দ নামে পরিচিত। প্রথমে তাঁর আচরণে অসন্তুষ্ট হলেও গানের মধ্য দিয়ে দুঃখের উত্তরণ ঘটিয়েছিল। লেখক কালকূটের অচিনপ্রাণে চাবি ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সমুদ্রের নির্জনে কাটাতে এলে একের পর এক ঘটনা তাঁর শূন্যতার হৃদিকুম্ভ ভরিয়ে দিচ্ছে। মানব জীবনের নানা বৈচিত্র্য সমুদ্রের তরঙ্গের মতোই তাঁর কাছে উছলে পড়ছে। জীবনকে দেখছেন নানাভাবে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিমানসের চিত্র লেখকের লেখনীতে বিভিন্নভাবে উঠে এসেছে। কখনও বর্ষার মেঘের মতো, কখনও উচ্ছল সমুদ্রের মত, কখনও ঝরঝর বর্ষণের মত। সমুদ্রের নির্জনতায় এসে নির্জন প্রকৃতির সৌন্দর্য ভয়ঙ্করতার সঙ্গে মানবজীবনের সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনার তরঙ্গায়িত জীবনচিত্রের ছবি এঁকেছেন। তাঁর দেখা মানুষগুলির বিশেষ হওয়ার মুহূর্তের দুর্লভ চিত্র চিত্রায়িত করেছেন।

পরের দিন বিলাতী কোম্পানির এজেন্ট প্রণববাবু হোটেলে উঠে এলেন। প্রায় যেচেই কালকূটের ঘরে ঢুকে আলাপ সেরে নিলেন। তিনি 'নোঙরঘর' পান্থশালার নিয়মিত খদ্দের, হপ্তা বা দু'হপ্তা অন্তর অন্তর আসেন, তার জন্য একটি স্পেশাল ঘর আছে। মহিমবাবুর কাছে কালকূটের

সম্বন্ধে জানতে পেরে চলে এসেছেন। অপরিচিতের সঙ্গে তার আলাপ করতে ভাল লাগে, তাদের সঙ্গে সাময়িক একটা সম্পর্ক তারপরে যে যার জায়গায়। কালকূট প্রণববাবুর মুখ দিয়ে জীবনের একটা বড় সত্যকে তুলে ধরেছেন। পান্থশালায় পরিচয়। চেনা অচেনায় কার কী এসে যায়। আজ দেখা, কাল নেই, মনের পলিতে একদিন ঘাস গজিয়ে যাবে। ভুলব না কথাটাই অলীক। প্রণববাবু কালকূটকে কথাকার করে সম্বোধন করেছেন। তিনি বললেন, পর মতে তিনি কালকূটের মত সহিষ্ণু নন, বেহদ্দ অবিশ্বাসী। তাই তিনি নিজেকে 'জাহান্নামবাদী' বলে পরিচয় দিলেন। মানবমন-সন্ধানী কথাকার তিনি, তাঁর সঙ্গে মিশলে ঠোকাঠুকি লাগার সম্ভাবনা নেই, নির্বিকার এই ভরসাতেই প্রণববাবু এসেছেন তাঁর সঙ্গে পরিচয় করতে। লেখক কালকূটের প্রণববাবুর কথা বলার ধরণ, কথাকার বলে ডাকা, সবই বেশ ভালো লাগছে। বেশ একটা আন্তরিকতার সুর শুনতে পাচ্ছেন। দু'একদিনের মধ্যে কালকূট কোণারক যেতে পারেন এটা জানতে পেরে প্রণবাবু কথাকারকে ছাড়তে চাইলেন না। আরও কটা দিন থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। তারপরেই বললেন, "অবিশ্যি অনেক লোককেই আজ অবধি আটকেছি, ছেড়ে দিয়েছি এবং তার জন্য জুয়া খেলার মতো পণ ধরেছি। কিন্তু তাদের কথা আলাদা।" *(পৃ: ১৭১, ঐ)* লেখক কালকূট রহস্যের সন্ধান পেলেন, কিন্তু প্রণববাবু রহস্য উন্মোচন করলেন না। নোঙরকে ঘরের বারান্দা থেকে সমুদ্র দেখতে গিয়ে চখা-চখী স্বামী-স্ত্রীকে দেখতে পেলেন ঝিনুক কুড়োতে। প্রণববাবু চার নম্বর ঘরের ভাইবোনের রহস্য আবিষ্কার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এই পান্থশালায় অনেক কিছু দেখতে দেখতে নিজেই যেন পান্থশালার একটি চরিত্র হয়ে গেছেন। কথাকারের মতো তিনি লিখতে পারবেন না; কারণ দূর থেকে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখবার দৃষ্টি তার নেই। তিনি কথাকারের কাছ থেকে চলে গেলেন আত্মসমাহিত হয়ে। লেখকের চোখে ধরা পড়েছে তার এই ভাবে "যে সতীরা স্বেচ্ছায় চিতায় ঝাঁপ দিত, ঈশ্বরের কাছে তারা আত্মবলি দিত, অনেকটা তাদের মতো।" *(পৃ: ১৭২, ঐ)* প্রণববাবু আবার এলেন বেলা তিনটা নাগাদ। এক, সন্ধ্যায় ওড়িয়া নাটক শর্মিষ্ঠা দেখতে যাবেন কথাকারকে নিয়ে, দুই একটা লাল ফিতে বাঁধা পুঁটুলির রহস্য উদ্‌ঘাটনে। তীব্র অস্বস্তি অথচ কৌতূহলী হয়ে খুলেই ফেললেন পুঁটুলি। ভাজে ভাজে নানা চিঠি আর কিছু নানা বয়সের মেয়ের ফটো। কালকূট মুহূর্তেই বুঝে গেলেন ব্যাপারগুলো।দুটো চিঠি পড়েও ফেললেন। একটিতে একজন বিবাহিতা নারী, সাতবছর ঘর করার পরেও নোঙরঘরে দ্বিচারিণী হয়েছিল, নিজেকে চেনার দুঃখে আক্ষেপ ভরে প্রেমপত্র, আর একটি আঠারো বছরের তরুণীর, যে তাকে চরিত্রহীন বলে গালি দিয়েছে, তার শাস্তি কামনা করেছে। সবটুকু কোনোটিরই পড়েন নি। ফিতে বেঁধে ফেরত দিয়ে দিয়েছিলেন। ঘৃণায় নয়, রাগেও নয়। কালকূট বুঝতে পেরেছিলেন কি আছে বাকীগুলোতে। প্রণববাবুর কালকূটকে ভালো লেগেছিল তাই লেখকের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। নেশা

কাটানোর কোনো ওষুধ আছে নাকি সেটা জানতে চেয়েছিলেন লেখকের কাছে। দুরন্ত বর্ষার মতো প্রণববাবু কালকূটের কাছে এসেছিলেন। কালকূট প্রণববাবুর হৃদয়ের অন্তঃস্থলের নেশাটা ধরে ফেললেন। অসংযমী জীবনের যন্ত্রণা প্রণববাবুর হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করছে, কিন্তু প্রেমের নেশা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এক গভীর অতলে। "আমি দেখলাম, এক দুর্ভাগা আমার সামনে। নেশা যে আকণ্ঠ করেছে। খোয়ারিতে যে মরছে। সত্যি রাগ করতে পারছি কোথায়? বিতৃষ্ণা বোধেও বিমুখ হতেও পারছি নে তো। ওর চোখের চারপাশের ছায়ায় দুঃস্বপ্ন আর ক্লান্তি। যেন কক্ষচ্যুত শূন্যতায় ছিটকে দিশেহারা হয়ে ছুটছে। আমি দেখছি একটি অসহায় করুণ মূর্তি।" *(পৃ: ১৭০, ঐ)*

সন্ধ্যায় থিয়েটার দেখতে গিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। টিনের চালা ঢাকা ইট বিছানো গুদাম ঘর। প্রথম শ্রেণী, ছারপোকার কামড়ে থিয়েটার দেখা প্রাণান্তকর হয়ে উঠল। শেষ হওয়ার আগেই দুজনেই বেরিয়ে এলেন। প্রণববাবুর নেশা — শর্মিষ্ঠারূপী নায়িকা মায়া মিত্রর সঙ্গে লেখকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বাঙালী, কিন্তু বাঙলা জানে না, প্রণববাবুর বান্ধবী। কিন্তু লেখক পরিচয় করতে রাজি না হওয়ায় ফিরতে বাধ্য হলেন। নোঙরঘরের মালিক লেখকের ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন। কারণ তিনি পছন্দ করেন নি প্রণববাবুর সঙ্গে থিয়েটারে যাওয়া। দশটার মধ্যে না ফিরলে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। শরীর খারাপ করবে এটা ছিল মহিমবাবুর নিষেধের বাণী। লেখক কালকূট ছোট ছোট কথা, আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রণববাবুর নারীর নেশা ও রাশভারী মহিমবাবুর স্নেহসিক্ত মনটি তুলে ধরেছেন। দু'একটা গম্ভীর কথা, স্নেহের সুর ঝরে পড়েছে।

হোটেলে ফিরে এসে আবার প্রণববাবু ভাইবোনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের নেশায় মেতে উঠলেন। লেখককে টেনেছিলেন কিন্তু লেখক শুতে চলে গেলেন। পরদিন ভোরে ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে আর লাল কাঁকড়ার পিছু ধাওয়া করতে করতে সমুদ্রতীরে রেণুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রেণুরা মহেন্দ্র আশ্রমে উঠে এসেছে। আশ্রম কাছেই এসে পড়াতে রেণু আশ্রমে যাওয়ার আহ্বান জানাল। সেজদি, শিবিদিরা যাতে রাগ না করেন সেটা সামলানোর ভার রেণুকে দিয়েই কালকূট নিজ হোটেলে ফিরে এসে দেখলেন প্রণববাবু ও তিনজন মিলে একসঙ্গে খাবার খাচ্ছেন। আলাপ করিয়ে দিলেন ওদের সঙ্গে। শিশির সোম, মিস বিথী ও মিস মমতা। প্রণববাবু কনিষ্ঠা মমতার পাশে বসেছেন। কালকূট হাতমুখ ধুয়ে এসে দেখলেন ওরা কেউ নেই। কালকূট বুঝলেন প্রণববাবুর চোখে নিশিঘোর লেগেছে। গতকাল লেখকের সঙ্গলাভে ওর ঘোর লেগেছিল, আজ ভুলে গেছে। ওই চার নম্বর ঘরের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়ে, গতি এনেছে ওদের জীবনে। কোথায় ভেসে যাবে কে জানে। কালকূট ভাবছেন প্রণববাবুর জীবনে আর একটি ফটো ও চিঠির তালিকা বাড়বে। কত রকমের মানুষ হয়, প্রণববাবুও একধরনের প্রেম ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ। সঞ্জয় প্রণববাবুকে বুঝতে পারে না। অনেক কিছু জানে, আশঙ্কা তার মনে মনে "কী ঘটতে কী ঘটবে, পরণবোবাবুকে কেউ

একদিন প্রাণে মেরে ফেলবে। এক বগ্‌গা কি সব চলে বাবু?" *(পৃ: ১৭৯, ঐ)* লেখকের চোখ দিয়ে আশঙ্কাটা তুলে ধরেছেন। সঞ্জয় ছামাকরণের তপুর ক্রুদ্ধ হয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল মনে মনে। সবাই সঞ্জয় নয়। মানুষের মনই সব থেকে রহস্যময়। সঞ্জয় প্রণববাবু আরও ঘটনা জানে। একবার একটি বউয়ের স্বামী সমুদ্রে প্রণববাবুকে চেপে ধরে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিল, আশেপাশে অনেক লোকজন থাকাতে সেটি সম্ভব হয়নি। সঞ্জয়ের মুখ দিয়ে লেখক সাধারণ কথা নির্মম সত্যের মত বলিয়ে নিয়েছেন। "আচ্ছা বাপু, তুমি ঘর সামলাতে পারো না বাইরে লোক হাসিয়ে কী হবে।" *(পৃ: ১৭৯, ঐ)* কাহিনীর মানুষগুলোর কথাই আমাদের পারিপার্শ্বিক থেকে উঠে এসেছে। সঞ্জয় জীবনবোধে অভিজ্ঞ, বেদনার আঘাতে সে ক্ষমাশীল, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সহনশীল। সে বলবে না তো কে বলবে? উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তির মুখ দিয়েই কালকূট বলিয়ে নিয়েছেন।

লেখক কোণারকের আহ্বান শুনতে পাচ্ছেন। মহিমবাবুকে কোণারক যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বললেন। বর্ষাকাল, রাস্তা ভালো না থাকার জন্য গাড়ি যাবে না। গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে, শুধু তাই নয়, বিছানাপত্র, চালডাল ইত্যাদিও সঙ্গে নিতে হবে, তার জন্য দুদিন সময় লাগবে। লিয়াখিয়া হয়ে কোণারকের পথটিই সুবিধাজনক হবে, মহিমবাবু সেরকম ব্যবস্থাই করবেন। মহিমবাবু জানালেন যে লিয়াখিয়ার সঙ্গে চৈতন্যদেবের একটা সম্পর্ক আছে। চৈতন্যদেব কোণারকে যাওয়ার পথে ক্ষুধার্ত হয়ে এক বুড়ির কাছ থেকে খৈ নিয়ে খেয়েছিলেন। লিয়া হল খৈ, খিয়া হল খৈ। মহিমবাবু লিয়াখিয়া কাহিনীর সঙ্গে নাম মাহাত্ম্যটুকুও বুঝিয়ে দিলেন। পথে হরিণের পালের দেখাও মিলতে পারে। কালকূট খুশি মনে নির্জন সমুদ্র সৈকতে গিয়ে বসলেন, মনে মনে আরও নির্জনতম সৈকতের দেবদেউলে যাওয়ার জন্য নিজের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিলেন। কিন্তু তার নির্জনতার ঘোর কাটিয়ে দিল প্রণববাবু। বন্ধ ঘরের রহস্য ভেদ করেছেন, সেটা জানানোর জন্য তিনি উদগ্রীব। বিকারের ঘোরের মধ্যে আছেন প্রণববাবু। শুনতে না চাইলেও তিনি শুনিয়েই ছাড়লেন কালকূটকে। শিশির সোমের বোন হল মমতা, আর প্রেমিক হল বীথি। নোঙরঘরে এসে দাদা ও বীথিকে দেখে স্বর্গীয় প্রেমের কল্পনাটা মমতার ভেঙে গেছে। মন বিক্ষুব্ধ হয়ে গেছে। "এ্যাট দি সেম টাইম, মমতার নিষ্পাপ মন এই প্রথম কু-প্রভাবে আক্রান্ত হয়েছে। এবং ... নাঃ, যা বলার বলেছি। আপনাকে একটা খবর দিই, আজ সন্ধেবেলা, চার নম্বরের সবাই আর আমি চিল্কার দিকে রওনা হচ্ছি। তারপরে ওদের নিয়তির কী নির্দেশ তা জানি না। আমারটাও নয়। চলি—" *(পৃ: ১৮১, ঐ)*

সন্ধ্যেবেলা প্রণববাবু চার নম্বরের সঙ্গে চলে গেল। যাওয়ার আগে জানিয়ে গেল তিন বছরের বিবাহিত জীবনে ভয়ঙ্কর রিপালসন থেকে তার এই পরিবর্তন। ছেলেটার কথা বলতে গিয়ে কথা আটকে গেল। একটা নিশিডাকা ঘোরের মধ্যে প্রণববাবুরা চলে গেল। কালকূট

প্রণববাবুর কথার মধ্য থেকে তাঁর হৃদয়ের বেদনাটাকে টেনে তুলে ধরেছেন। এত উচ্ছলতা, উদ্যমতা, প্রেমের জন্য উদ্‌বেলিত মন, নিষিদ্ধ কিছুকে জানার জন্য মরিয়া চেষ্টা, সবকিছুর মধ্যে লুকিয়ে আছে এক না পাওয়ার বেদনা। বিয়ের আগের নির্ভেজাল খাঁটি মানুষটি রূপ ও হৃদয়ের দৈন্যে হারিয়ে গেলেন। তাই বারে বারে নারীসঙ্গ, নারী প্রেমের কুহকী মায়ায় তিনি জড়িয়ে পড়েন তার হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য। পুত্রের জন্য হাহাকার তার পিতৃহৃদয়কে ব্যথিত করে। তবুও তিনি নারীপ্রেমের স্রোতে ভেসে যান। লেখক কালকূট তাঁর কাহিনীতে প্রণববাবুর ব্যক্তিমানসকে পাঠককুলের মাঝে এমনভাবে তুলে ধরেছেন যেখানে ঘৃণা ও সহানুভূতি দুটোই একসঙ্গে উঠে আসে। কাহিনীর চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে লেখকের অন্তর্দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়। সেই প্রতিফলিত রশ্মি পাঠকের হৃদয়কেও অদ্ভুত এক অনুভূতিতে আলোকিত করে। সমুদ্রের নির্জনতায় এসে আকাশ সমুদ্রের রূপবৈচিত্র্য উপভোগ করছিলেন। সেজদি-শিবিদিরা সমুদ্রস্নানে এসে কালকূটকে ধরে ফেললেন। অভিযোগের অন্ত নেই। রেণুর মুখে খবর পেয়ে তার প্রতীক্ষায় অধীর, পটলী ভেজে রেখেছেন খাওয়াবে বলে। পুত্রস্নেহে এরা বিগলিত। শুধু ছোট বউদির স্নেহস্নিগ্ধ হাসি দুই চোখে। সকলেই স্নানে মেতে উঠলেন। কালকূটও অবশেষে যোগ দিলেন। সকলের স্নান দৃশ্যের একটা উপভোগ্য দৃশ্য চিত্রায়িত করেছেন। যার উচ্ছ্বাস, উচ্ছলতা সব এসে পাঠকের হৃদয়কে সমুদ্রের জোয়ারের মত আনন্দে ভাসিয়ে দেয়। স্নানের শেষে সবাই কালকূটের নোঙরঘরে এসে আবার স্নান করে চা খেয়ে নিজেদের আশ্রমে চলে যাওয়ার আগে কালকূট নোঙরঘরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ও লেখককে জেরা করতে করতে তার আসল পরিচয় বের করা তারপরে তাদের বিচিত্র সব অভিব্যক্তি, পরিবর্তন কালকূটের চোখে ধরা পড়েছে। কালকূট পরিচয় দেওয়ার আগেই ছোট বউদি সকলকে অবাক করে পরিচয় দিয়ে দিলেন। "নামটা শুনে একটু অবাকই হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, তোমার চেহারাটা হবে আরো বড়সড়, বয়স হবে আরো অনেক বেশী, ভারী গম্ভীর একজন পুরুষ। কিন্তু ও মা! এ যে এক ফোট্টা ছেলে! তাই একটু সন্দেহ হয়েছিল বলে চুপ করে ছিলাম। পুরী স্টেশনে দাঁড়িয়ে আমার আর সন্দেহ ছিল না, এ সে-ই। যখন দেখলাম নতুন দেশে পা দিয়েই আত্মভোলা হয়ে দেখতে লাগলে। তবু পরিচয়টা ফাঁস করলাম না, ভাবলাম, এ তবু বেশ কথা বলা যাচ্ছে। যা ইচ্ছে তাই বলছি। তারপরে আর বলা যাবে না।" *(পৃ: ১৮৬, ঐ)*
কালকূটের পরিচয় পেয়ে রেণু একটু লজ্জিত হয়ে গেলো।
অবুদির প্রতিক্রিয়া "ও কী বই লেখে ছোটবউ? নাটক নভেল নাকি?" *(পৃ: ১৮৬, ঐ)*
আরও বলল, "আগে বললে, একটু সামলে নিতে পারতাম নিজেদের। একেবারে তুই তোকারি—" *(পৃ: ১৮৬, ঐ)* সেজদি বলছেন "তা কী করব, আমরা তো ওসব পড়ি না। তুমি আগে বল নি কেন ছোটবউ।" *(পৃ: ১৮৬, ঐ)*

শিবিদির অভিব্যক্তি "ও তো গায়ে ছাপ মেরে আসে নি যে, ও বই লেখে। প্রথমে তো নেহাত ফচকেই ভেবেছিলাম, তারপরে দেখলাম, না, একটু ভালো মানুষ আছে, সহবত জানে, মনটা পরিষ্কার। তা, একটু ভালবেসেছি বলে তো আর দোষ হয়ে যায় নি।" *(পৃ: ১৮৬, ঐ)*

লেখক সমুদ্রের নির্জনে প্রকৃতিকে উপভোগ করার জন্য গিয়েছিলেন। সেই নির্জনতা তাঁকে বিভিন্ন প্রকৃতির চারজন বিভিন্ন বয়সের বিধবা নারীর সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনে বেঁধেছিল। সন্তানের স্নেহে তাঁর ওপরে সমুদ্রের ঢেউ এর স্নেহের জোয়ার কালকূটকে ভাসিয়ে দিয়েছে। ওদের সঙ্গে আশ্রম পর্যন্ত যেতেই হল পটলী ও চা খেতে। মহেন্দ্র আশ্রমে ছোট বউদির গুরু সর্বেশ্বর দেবের ফটো দেখে কালকূট চিনতে পারেন, সেই নগ্ন সাধু। তিনি পূজাপাঠ আচার আচরণের কোনো সময়, নিয়মনীতি বেঁধে দেননি ছোট বউদিকে। যা অন্তরের বিষয় তাকে কখনো সময় দিয়ে বাঁধা যায় না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা যখন ইচ্ছে তখনই করা যায়। গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে থাকলেও দেখা করা হয়নি। ফেরার সময় বালুর ঢিবির কাছে রেণুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রেণুকে অন্যদিনের থেকে একটু অন্যরকম লাগলেও বিষণ্ণ হাসিটা তখনও দূর হয় নি। বেশিক্ষণ রোদে থাকাটা অস্বাস্থ্যকর, সমুদ্রকে দূর থেকে একটু ছায়াঘন জায়গা থেকে দেখলেও একইরকম লাগবে। রেণু লেখকের কথার ইঙ্গিত ধরতে পেরে রাগ করে উঠে আশ্রমের দিকে চলে গেল। লেখক অপ্রস্তুত। রেণু মনে ব্যথা পেয়েছে কিন্তু শান্ত ছায়া নিবিড়তায় মনের আগুন নেভানোর আরোগ্য রেণুর দরকার। রেণুকে আঘাত দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল না। রেণুর ব্যথার দাগ তার নির্জন সৈকতে আহরিত পুঁজি। বিকেলে হোটেলে মহিমবাবুর বন্ধু সিদ্ধকাম বাবুর সঙ্গে আলাপ হল। শৌখিনতা তাঁর পোশাকে, আতরের গন্ধে সুবাসিত ঘরটিতে সুরার ছোঁয়া। রক্তিম চোখে মহিমবাবুর চেয়ারে হাত এলিয়ে গল্প করছেন। মহিমবাবুর বিপ্লবী জীবনের সঙ্গী, একসঙ্গে জেল খেটেছেন। জেল থেকে বেরিয়ে একসঙ্গে মারোয়ারীর ফার্মে কাজও নিয়েছিলেন। একটা বিরাট সংসারের দায়িত্ব তাঁরা দুজনেই নিয়েছিলেন। প্রণববাবুর কাছে শুনেছিলেন, যৌবনে এক নারীর কাছে হৃদয় বাঁধা রেখেছিলেন মহিমবাবু। তারই সংসার প্রতিপালনের জন্য দু-দুটি পুরুষ সাহায্য করেছিলেন। মহিমবাবুর তাই আজীবন সংসারীর ছদ্মবেশ। আর সিদ্ধকামবাবু বন্ধুকে সাহায্য করার পরে রম্ভায় গিয়ে শস্যের ব্যবসা শুরু করে দিলেন। "আমি হলাম, এস চক্রভারটি, পূর্ব আর পূর্ব দক্ষিণ অঞ্চলের বিগ গ্রেন ম্যাগনেট।" *(পৃ: ১৯২, ঐ)* উড়িষ্যা আর অন্ধ্রের সীমায় হল রম্ভা। সিদ্ধকামবাবু কালকূটকে রম্ভায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন। কথা বলতে বলতে কালকূট সিদ্ধকাম বাবুকে একটু একটু করে বুঝতে চেষ্টা করছেন। নিজেকে শুদ্ধকাম বলতে ভালবাসেন। মহিমবাবু ও সিদ্ধকামবাবুর কথোপকথনে সিদ্ধকামবাবুর মন্তব্য — "এখন বিশ্বাস করি, স্বর্গের সেই বারবধূ রম্ভার আত্মা এখনো রম্ভাতেই বিরাজ করছে। বলতে ইচ্ছা করে, অপ্সরীর ট্রাডিশনটা

যেখানে সেই পৌরাণিক যুগ থেকে অদ্যাপি সমান। আর আমিই একমাত্র মানুষ সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র হয়ে আছি।" *(পৃ: ১৯৩, ঐ)*

"পুড়ছি হে, পুড়তে বড় আনন্দ, বড় আনন্দ! সেইজন্যই বলছি ভোগের মহাশ্মশান সেটা। কিন্তু কতদিনই বা আর বাঁচব।" *(পৃ: ১৯৩, ঐ)*

মহিমবাবু বলছেন, "তুমি নিজের জন্যে পৃথিবীর কাউকেই দোষারোপ করতে পারো না।" *(পৃ: ১৯৩, ঐ)*

সিদ্ধকামবাবু বলেছেন— "আসক্তির একটা যন্ত্রণা আছে, তুমি তা বুঝবে না। ত্যাগে আমার মতিগতি নেই, তুমি জানো। আসক্তির মধ্যে আমার অশান্তির যন্ত্রণা নেই, আমার যন্ত্রণা, ভোগে অমর হবার বাসনায়। আমি আরো আগুন চাই, আরো আগুন।" *(পৃ: ১৯৩, ঐ)*

কালকূটের চোখ দিয়ে উঠে এসেছে এক অতৃপ্ত বাসনার ক্রন্দনধ্বনি। মহিমবাবু ত্যাগের প্রতিমূর্তি; তিনি সিদ্ধকামবাবুর বাক্যে বচনে অস্বস্তি বোধ করছেন। তাকে থামাতে চেষ্টা করছেন, বয়সে অনেক ছোট লেখকের কাছে প্রগলভ না হয়ে ওঠার জন্য বলছেন। কিন্তু সিদ্ধকামবাবু ভয়াবহ বাসনার ছুরিকাঘাতে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত। কামের বহ্ন্যুৎসবে তিনি পুড়ছেন। লেখক যন্ত্রণাবিদ্ধ সিদ্ধকামবাবুর ভাবনাকে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন "কে জানত, সোনার ঘেরাটোপ ছেড়ে, ছুটে আসা আমার নিরালা সৈকতে এমন বাসনার প্রতিমূর্তিকে দেখব।" *(পৃ: ১৯৪, ঐ)* সিদ্ধকাম কথা বলতে বলতে গলা শুকিয়ে যাওয়ায় গলা ভেজানোর জন্য উঠতে যাওয়ার মুহূর্তেই রেণু এসে ডেকে নিয়ে গেল। সকালের ব্যবহারের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী বলেই রেণু হাঁটতে শুরু করল। কালকূট তাঁকে আশ্রমে পৌঁছে দেবার জন্য পিছু পিছু এগিয়ে সঙ্গী হলেন ও স্বর্গদ্বারের ঘাটের কাছে চললেন। চিতা জ্বলছে। চিতার আগুন লাঠি দিয়ে খোঁচানো দেখে রেণু জানতে চেয়েছিল কী খোঁচানো হচ্ছে। লেখক জানিয়েছিল আগুন ও দেহ দুই-ই। রেণুর নিষ্ঠুর বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু কালকূটের কাছে নিষ্ঠুর বলে মনে হয়নি। জীবন্ত পোড়ানো হচ্ছে না তো। মৃত্যুকে দুঃখের চোখে দেখি বলেই নিষ্ঠুর বলে মনে হচ্ছে। "পরিপূর্ণ সৎকার, সে-ই তো ভালো, সুন্দরও বটে। আমরা আমাদের চোখের সামনে মনের চারপাশে কতগুলো মিথ্যা মায়া দিয়ে ভরে রেখেছি, যার সঙ্গে সত্যের কোনো বনিবনা নেই। তারপরে সেই মায়া যখন মিলিয়ে যায়, আমরা কষ্ট পাই। এ কষ্ট নিরর্থক।" *(পৃ: ১৯৪-৯৫, ঐ)*

কালকূট আরও বলে গেছে যা কিছু জীবনের মনের প্রাণের রসদ জোগায় তার কোনো বয়স নেই, যেমন রামায়ণ, মহাভারত, বুদ্ধের বাণী, কালিদাসের কবিতা, রবীন্দ্রনাথ। এগুলো চিরকালীন। লেখক নিজের তুলনা টেনে আনলেন। "জীবনের থেকে সাহিত্য বড় নয়, কিন্তু ওটাই আমার প্রকাশের ক্ষেত্র। তাই আমিই তো সব থেকে বেশী জানি দু দিন পরে আমার একটি লেখা

ভুলে যাবার ব্যথা কতখানি। কষ্ট হয় তো পাই, কিন্তু আমি কী থেমে থাকব? আমি থামব না, থামতে পারি নে। আর যদি আমার সেই প্রকাশের সত্ত্বাটাই মরে যায়, তাহলে তো থামা না থামার কোন প্রশ্নই নেই। তাই বলছি, আমি শুধু মানুষের কথা বলিনি, মানুষের সব কিছুর কথাই বলেছি।" *(পৃ: ১৯৫, ঐ)* লেখক কালকূট রেণুকে বলেছিল আরও একটা মৃত্যুপথযাত্রী স্বামী যিনি ছিলেন পূর্ব-মধ্য ইউরোপের রাজনৈতিক নেতা, তার জীবনের রসে পরিপূর্ণ প্রেমকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি চিরকূটে স্ত্রীকে আবার বিবাহ করতে বলেছিলেন। কিন্তু তার স্ত্রী আর বিবাহ করেননি। "তাঁর বাগান তো শূন্য হয়নি, তা পূর্ণতার শূন্যেই ভরা ছিল। কারণ, তাঁর স্বামীর ভালোবাসার মধ্যে জীবনের রস ছিল, তা মৃত ছিল না, তাই প্রয়োজন হয়নি।" *(পৃ: ১৯৫, ঐ)*

লেখক রেণুর মনের অন্ধকার বিষণ্ণতা দূর করার জন্যই এসব বলেছিলেন। রেণুর মনের অন্ধকারে আটকে থাকা বেদনা চোখের জল হয়ে ঝরে পড়ছিল। রেণু উৎফুল্লিত হয়ে উঠছিল আস্তে আস্তে। আশ্রমে ফিরে দেখা গেল সবাই রেণুকে ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে। খেঁকিয়ানন্দও ওই আশ্রমেই ছিলেন। চলে আসার সময় ছোট বউদির কোণারকে যাওয়ার কথা জেনে কোনারক যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। লেখকের আপত্তি না থাকাতে সেজদি অবুদিদের মধ্যে উচ্ছল আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। খেঁকিয়ানন্দ ফেরার সময় সঙ্গী হলেন। রেণু কেন গিয়েছিল লেখকের কাছে আর সবাই কেন ব্যস্ত হয়ে খুঁজছিল রেণুকে এটার রহস্য বের করার জন্য খেঁকিয়ানন্দ উদ্‌গ্রীব হল। লেখকের কাছে জুৎসই উত্তর না পেয়ে বলল "তুমি বলতে চাও আমি কানা? আমার চোখ নেই? যদি কোনোদিন চোখ ফোটে তো মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দেখো।" *(পৃ: ১৯৯, ঐ)*

লেখক খেঁকিয়ানন্দের কথা ভাবতে ভাবতে গেলেন। মানবমনের যা সাধারণ জিজ্ঞাসা তাই তিনি খেঁকিয়ানন্দের মুখে বসিয়ে দিয়েছেন। কাকী পিসিরা কেন ভাবছিল মেয়ে আত্মঘাতিনী হল না তো। আর কেনই বা রেণু টসটসে হাসিতে আশ্রমে ফিরল। অনায়াস ভঙ্গিতে লেখক তার ভাবনাগুলো পাঠককুলকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। "আজ যেন চোখের জলে ওর সমস্ত গ্লানি ধুয়ে গিয়েছে। আজ যেন ওর সমস্ত চোখে মুখে, যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে উজ্জ্বল আলোর ছড়াছড়ি দেখেছি আমি। কিন্তু তার মধ্যে আমি খেঁকিয়ানন্দর রহস্যের ছায়া তো কিছু দেখি নে।" *(পৃ: ১৯৯, ঐ)*

"সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। এখনো সেই কুহেলি হাসি তার যেন শুভ্র তরঙ্গে। কেমন একটা ছায়া ছায়া আবেশে আকাশ সমুদ্র একাকার। তার মধ্যে কেবল শুভ্র হাসি, বহু দূর দূরান্ত থেকে যেন আপনাকে বিস্তার করতে করতে, বিস্ফারিত হয়ে ফেটে পড়ছে। তার কুহেলি অস্পষ্টতা থাক, ছায়ার আবেশ থাক, নিরন্তর চলমানতায় কোথাও বন্ধগতি স্তব্ধতা আসে নি।" *(পৃ: ১৯৯, ঐ)*

কালকূটের প্রাণের ঝুলি পূর্ণ হয়ে উঠছে ধীরে নির্জন সমুদ্রের অনেক জটিলতার মধ্য দিয়ে।

কিন্তু নিরন্তন চলমান ওই সমুদ্রের মতো। কালকূট মানুষ নামক মদের ফেরে ঘরছাড়া। নির্জন সমুদ্রও তাঁকে একাকী থাকতে দেয়নি। মানবমন সন্ধানের নেশায় তিনি বিচিত্র সব মানব চরিত্রের সন্ধান পেয়েছেন যা ধীরে ধীরে তার মনের শূন্যতাকে পূর্ণতার পথে নিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র সৈকত ছেড়ে তাঁর মন এখন দেবদেউল কোণারক অভিলাষী। হোটেলে ফিরেই দেখলেন দুটো লোক মহিমবাবুর কাছে বসে আছে। গরুর গাড়ির গাড়োয়ান এরা। মহিমবাবুর ব্যবস্থায় দুদিন পরে গরুর গাড়িতে যাওয়া ঠিক হল।

পরের দিন বিকেলে আশ্রমে গিয়ে শিবিদিদের কোণারক যাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে বললেন। ছোট বউদি তাঁর গুরুদেব সর্বেশ্বরদেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আশ্রম থেকে বেরুবার সময় রেণুও সঙ্গী হল। রেণু যে কিছু বলতে চায় এটা কালকূট বুঝতে পেরেছিলেন। একসময় ধীরে ধীরে নির্জন সমুদ্রসৈকতে নিজের অপমান-অসম্মানের কথা বলতে থাকে। ছোট বউদি যেটা জানেন না সেটাই রেণু বলেছিল। ছোট বউদিকে যে কথা বলতে পারেনি সেই কথাই কালকূটকে বলল। প্রত্যাখ্যাতা নয়, প্রতারিতা হয়েছে রেণু। অনেক অপমান, গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে নিখিলের সঙ্গে দেখা করার জন্য। কিন্তু একদিন সব শূন্য হয়ে গেল। অনেক গুঞ্জন নিখিল সম্বন্ধে কানে এলেও প্রথমে বিশ্বাস করেনি। পরে দেখল রেণুর মত অনেক রেণু নিখিলের আছে। রেণু অনেক কেঁদেছে, পায়ে পড়েছে, এমনি করে ভেঙেচুরে না দেওয়ার জন্য বারে বারে বলেছে। ষোল বছর থেকে একটানা সাত বছর সব নিখিলময় হয়ে গেছে রেণুর। রেণু প্রতারিতা একথা কাউকে বলতে পারে নি। লেখকের ভাষা নেই সান্ত্বনা দেবার, ভাবনায় ডুবে গেলেন। "একটি অতি সাধারণ কাহিনীর ব্যথা যে অনেক সময় এত গভীর হয়ে বাজে, অস্থির করে তোলে, জানতাম না।" *(পৃ: ২০২, ঐ)* রেণু আরও বলতে লাগল তার মনে হচ্ছে "নিখিল যা-ই করুক, ভালো বা মন্দ, ওর সবটা তো ওই ভোগ করবে। আমারটাও আমারই ভোগ করতে হবে। ওকে দায়ী করে, নিজেকে কেন অপমান করছি?" *(পৃ: ২০২, ঐ)* রেণুর চোখের জলে ভেজানো সুন্দর স্বচ্ছ উজ্জ্বল হাসি দেখে লেখক রেণুকে বললেন যে এটাই তো জীবন। প্রেমে প্রতারিতা রেণু। নিখিল তার বিশ্বাসভঙ্গ করেছে, প্রেমের অমর্যাদা করেছে। কালকূট যন্ত্রণাক্লিষ্ট রেণুর বেদনাকে ও বেদনা থেকে উত্তরণকে নিজস্ব স্টাইলে বা শৈলীতে কাহিনীতে তুলে ধরেছেন।

কোণারকের পথ খুবই খারাপ ছিল। এক দেড় মাইল পায়ের পাতা জলে চুবিয়ে হাঁটতে হয়েছে। তবুও পথের সৌন্দর্যের তুলনা নেই। "লিয়াখিয়া পেরিয়ে যখন ছোট বউদিরা বালুচরে রান্নার ব্যবস্থা করেছিলেন, সে রাত্রি এক অবিস্মরণীয় রাত্রি। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে একমাত্র আকাশের মেঘ তার হাত গুটিয়ে নেওয়া বন্ধুত্ব দান করেছিল। ত্রয়োদশীর চাঁদ ছিল আকাশে। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায়, দূরের সমুদ্র পর্যন্ত প্লাবিত হয়েছিল।" *(পৃ: ২০২, ঐ)*

রেণু কপালে একটা টিপ পরেছে। গুনগুন করে গান গলায় সুর তুলেছে। রেণুর পরিবর্তনে ছোটবউদি খুশি। কালকূটের জন্যই যে এরকমটি সম্ভব হয়েছে সেটা ছোট বউদি জানাতে ভোলেন না। রেণু লেখকের সঙ্গে পথে পথে ঘোরার জন্য কালকূটের কাছে দীক্ষা নিতে চেয়েছিল। কালকূট তার স্বভাব বৈচিত্রে বলে গেলেন "আমি আজ পথে, কাল হয় তো আমাকে ঘরে ফিরে যেতে হবে।" *(পৃ: ২০২, ঐ)* "সেখানে আমার কর্ম। জীবন সেখানে আর একটা হাত বাড়িয়ে আছে। মানুষ হয়ে জন্মেছি, ঋণ যে আমার অনেক। সেই বাড়িয়ে রাখা হাতের দেনা না মিটিয়ে কোথায় যাব?" *(পৃ: ২০২, ঐ)* রেণু কালকূটের মত একাকারের সাধনাই করতে চাইল।

পরদিন কোণারকে পৌঁছোবার আগেই হরিণের পালের দেখা মিলল। দূর থেকে ব্ল্যাক প্যাগোডা দেখতে পেয়েই লেখকের মনে শাম্বের কাহিনী ভেসে উঠল। কৃষ্ণ পুত্র শাম্বর আচরণে মহর্ষি নারদ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। নারদ শাম্বকে ভুলিয়ে কৃষ্ণের ষোলশো গোপিনীদের যেখানে সুখবিলাসে মেতেছিলেন, সেখানে নিয়ে যান। গোপিনীরা শাম্বের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কামনা করেছিলেন। কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন "তোমার রূপ ও যৌবন সমস্তই কুষ্ঠ রোগে বিনাশ হবে।" *(পৃ: ২০২, ঐ)* শাম্ব কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হলেন, এবং পিতাকে সব ঘটনা খুলে বললেন। কৃষ্ণ নিজের ভুল বুঝতে পেরে আরোগ্যের পথ বলে দিলেন "অভিশাপ আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। তুমি মৈত্রেয় অরণ্য সংস্কার করে, সেখানে গিয়ে বারো বৎসর সূর্যদেবের আরাধনা কর। তিনিই তোমাকে আরোগ্য করবেন।"*(পৃ: ২০২, ঐ)* বারো বৎসর তপস্যা করার পর তাতে সূর্য তুষ্ট হয়ে শাম্বকে চন্দ্রভাগাতে স্নান করে আসতে বলেন। শাম্ব চন্দ্রভাগায় স্নান করে তাঁর পূর্ব রূপ ও যৌবন ফিরে পেয়েছিলেন। পরদিন চন্দ্রভাগার জলে একটি সূর্যমূর্তি আবিষ্কার করেন ও প্রতিষ্ঠা করেন। কালকূট নিজেই বলেছেন "সূর্যমন্দিরের সঙ্গে পুরাণের এই কাহিনী জড়িত। কিন্তু পুরাণকে বাস্তবে খুঁজে আমরা পাই নে। মানুষের বিশ্বাসকেই পাই। ইতিহাস তারই সাক্ষী দেয়।"*(পৃ: ২০২, ঐ)* তিনি আরও বলেছেন বাংলাদেশে সূর্যপূজার চল এখনও আছে। "পুরাণ থাক, ইতিহাসও থাক, সূর্য পূজার মাধ্যমে তো আমরা পবিত্র হতেই চেয়েছি। আমরা কেউ শাম্ব নই, আমরা শ্রীকৃষ্ণের অভিশপ্ত সন্তান নই।"*(পৃ: ২০২, ঐ)* কালকূট কোণারকে গিয়ে এই শাম্ব কাহিনী রচনার অনুপ্রেরণায় পরবর্তীকালে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে 'শাম্ব' কাহিনী পাঠককুলকে উপহার দিয়েছেন। কোণারকের মন্দিরের ভাস্কর্য দেখে কালকূট বলছেন "আমি নির্জন সৈকতের বুকে নিজেকে যে খুঁজতে চেয়েছিলাম, দেখলাম আমার আপনাকে দেখারই আয়না কোণারকের মন্দির গাত্র। কে বলেছিল, এ মন্দির অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ? যদি শিল্পের দেবতা কেউ থাকেন, তবে সেই সব রুচিবাগীশের জন্যে কি তিনি করুণা করে হাসেন নি!" *(পৃ: ২০৩, ঐ)* পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্নার প্লাবনে কোণারকের সৌন্দর্য রমণীয় হয়ে উঠল। কালকূট নিশি পাওয়ার মত মূর্তিগুলোর

পাশে পাশে ঘুরতে লাগলেন। মৈত্রেয় বনে ঝাউবনের বাতাস শনশন করে বইতে লাগল। লেখকের অনুভূতি "আমি যেন সহসা নিজেকে খুঁজে পেলাম। এই অপরূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলে উঠলাম, 'ভারতবর্ষ, হে ভারতবর্ষ, তোমার এত বৈচিত্র্যের মাঝখানে, তোমার আত্মাকে একটু দেখতে দাও! একটু দেখতে দাও!' সহসা সামনের নিশ্চল স্তব্ধ কিন্নরী মূর্তিকে নড়ে উঠতে দেখলাম। জ্যোৎস্না-লোকে দেখলাম, তার চোখে আলোর ঝিকিমিকি। তাঁর শাড়ির আঁচল উড়ছে, তার কেশপাশ বাতাসে দুলছে। আমি বলে উঠলাম, 'কে'?

জবাব এল, 'আমি রেণু'।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি যান নি?'

রেণু যেন অনেক দূর থেকে বলল, 'না। আপনার সঙ্গে যাব!' সহসা আমার সংবিত ফিরল। আমার মনে হল, রেণুর গলায় একটা অবান্তর স্বপ্নের সুর।" *(পৃ: ২০৩, ঐ)*

রেণু কালকূটের কাছে জানতে চেয়েছিল "ধরুন যদি সুখের আবধিও না থাকত, তবু বেঁচে থাকার কি সার্থকতা?" *(পৃ: ২০৩, ঐ)* কালকূটের মনে হল গভীর বেদনা থেকে এ প্রশ্ন করছে। তাই তিনি বললেন যে প্রতিটি মুহূর্তের কাছে নিজেকে নিয়ত উৎসর্গ করা, যাতনা থেকে আনন্দের রস আহরণ করা এটা তিনি বিশ্বাস করেন। ছোট বউদি আর রেণুকে দু'পাশে নিয়ে তারা ডাকবাংলোয় ফিরে গেলেন। কোণারক থেকে পুরী ফিরে এসে কদিন বৃষ্টির জন্য বেরতে পারলেন না। বৃষ্টি থামতেই কালকূট রম্ভায় চলে গেলেন রেণুদের কিছু না জানিয়ে। পথচলার সৌজন্যনের শপথ কালকূট নেন নি। সিদ্ধকামবাবুর আতিথেয়তায় দুদিনের জায়গায় দশদিন রয়ে গেলেন। আদিবাসীদের জীবনযাত্রা, রম্ভাদের দূর অন্দরমহল, সব ঘুরিয়ে দেখালেন। সিদ্ধকামবাবুর প্রাসাদেই দেখলেন দেবদাসী নৃত্য, তাঁর আশ্রিতা রক্ষিতা। আর সিদ্ধকামবাবু সত্যিই দেবরাজ ইন্দ্র হয়ে আছেন। কালকূট সিদ্ধকাম বাবুর সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে দেখেছেন ভোগ ও নগ্নতার চিত্র। সিদ্ধকামবাবুর নিষ্ঠুরতা, অজস্র পাখি হত্যা করে চিল্কার জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন। চিল্কার বুকে, এক পাথুরে দ্বীপে মানত করা পশুদের হত্যা না করে দ্বীপে ছেড়ে দিয়ে যায়। পাথুরে রুক্ষ দ্বীপে খাদ্যাভাবে কদিন পরে এমনিই ওরা মরে যায়। কালকূটের মনে হয়নি "সিদ্ধকামবাবুর জীবনধারণের মধ্যে মানুষ উৎসর্গীকৃত বলি বলেই প্রতিভাত হয়। আমি দেখলাম, মহাশ্মশানেই উনি বাস করছেন।" *(পৃ: ২০৪, ঐ)* ভোগের মধ্যে থেকেও সিদ্ধকামবাবুর শূন্যতাকে কালকূট অনুভব করছেন। তাঁর আন্তরিকতা ভুলবার নয়। তিনি রেণুকে শুধু একবার দেখেছেন কিন্তু নারীসঙ্গ করার ফলে রেণুর ব্যথাটা ধরতে পেরেছেন। রেণু সম্বন্ধে বলেছেন "বড় নিরপরাধ পবিত্র আর দুঃখী বলে মনে হয়েছিল।" *(পৃ: ২০৪, ঐ)*

নোঙরঘরে ফিরে খবর পেলেন যে শিবিদিরা দেখা করতে বলে গেছেন। আশ্রমে গিয়ে

শুধু রেণুর সঙ্গে দেখা হল। শিবিদিরা চলে গেছে। রেণু আর ছোট বউদি রয়ে গেছে আশ্রমে। শিবিদির একটা চিঠি রেণু কালকূটকে দিল। স্নেহপূর্ণ, অভিমানে জরজর একটা চিঠি। সময়কালে হলে কালকূটের মতই তার একটা ছেলে থাকত। কালকূট চিঠিটা আর পড়তে পারলেন না। চোখ ঝাপসা হয়ে এল। ছোট বউদি বললেন "দেখেছ তো, আমরাও তোমাদের কাঁদাতে পারি। যেমন না বলে কয়ে চলে যাওয়া এখন বোঝ?" *(পৃ: ২০৫, ঐ)* কালকূট পুরী ছাড়ার সময় পর্যন্ত সকাল বিকাল রেণুর হেফাজতে রইলেন। যেদিন চলে যাওয়া ঠিক করলেন, সেদিন আশ্রমে খবর দিতে যাওয়ার আগে রেণু হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল যে, নিখিল এসে ক্ষমা চেয়েছে। কিন্তু রেণু বলল যে সে কাকে ক্ষমা করবে? "বিশ্বাস করুন, আমি যেমন স্মরণ করতেও পারছি নে, ও একটা আমার পরিচিত ছিল। তাই আমার রাগ অভিমান কিছুই নেই, আমি কাকে ক্ষমা করব?"*(পৃ: ২০৫, ঐ)* নিখিলকে সেই কথাই বলেছে। ছোটকাকী সেটা বুঝতেই পারছেন না। কিন্তু রেণু আর নিখিলের কথা ভাববেইনা। লেখক রেণুর অনুভূতি বুঝতে পেরেছেন, সময় ওর মনের ওপর পলি ফেলেছে। তাঁর পাথরপ্রতিমার মূর্তি কোণারকের দেয়াল থেকে রক্তমাংসের প্রতিমা হয়ে বেরিয়ে এসেছিল। কালকূট পাথর প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছেন। তাঁর যাতনা থেকে আনন্দের রস সংগ্রহ করেছে রেণু। এরই মধ্যে একজন এসে খবর দিয়ে গেল অমৃতানন্দজীর দারুণ অসুখ করেছে। একটি অস্বাস্থ্যকর অন্ধকার ঘরে খেঁকিয়ানন্দ শুয়ে আছেন। খেঁকিয়ানন্দের কথায় বালিশের তলা থেকে একটি চিরকুটে লেখা ঠিকানা বের করলেন। খেঁকিয়ানন্দ ওই ঠিকানায় এই খবরটি দিতে বললেন যে পঁচিশ বছর আগে তাঁর স্ত্রীকে ছেড়ে এসেছিলেন ঈশ্বরের খোঁজে, তাঁকে তিনি খুঁজে পান নি, শুধু স্ত্রীর কথাই ভেবেছেন এবং তার মুখই মনে পড়েছে তাঁর স্ত্রীই ঈশ্বরের রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। খেঁকিয়ানন্দ বেলা চারটের সময় পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। নোঙরঘরে ফিরে ঝোলা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার মুহূর্তে রেণুকে যাওয়ার ব্যাপারটা জানালেন। রেণু বিশ্বাস করতে পারল না প্রথমে। কিন্তু তারপরেই স্নিগ্ধ সুন্দর হাসিতে জলভরা চোখে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল "চিরদিনের নিমন্ত্রণ কিন্তু রইল। শুধু এইটুকু মনে রাখলেই হবে।" *(পৃ: ২০৬, ঐ)* কালকূট মহিমবাবুকে নমস্কার করে রিকশায় উঠলেন। মহিমবাবু রেণুর হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। চোখ ঝাপসা হয়ে এল। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখলেন আকাশ সমুদ্র স্পর্শহীন হয়ে হাসছে। 'নির্জন সৈকতে'-এর কাহিনীটি এইভাবেই হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে। এতক্ষণ ধরে কাহিনীর বিভিন্ন চিত্র টুকরো টুকরো করে তুলে ধরে কাহিনীটি আলোচনা করা হল। সমুদ্রের নির্জনতার মধ্যে লেখক অন্তরঙ্গ হতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেই নির্জনতার মধ্যে অনিবার্যভাবে যে কাহিনীগুলো উঠে এসেছে সেই কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত পাত্র-পাত্রীদের তিনি নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। সঞ্জয় হোটেলের চাকর, অনেকদিন ধরে আছে, হোটেলে যাঁরা আসা যাওয়া করে তাঁদের

সঙ্গে সঞ্জয়ের একটা নিবিড় যোগ আছে। তাঁর চোখ দিয়ে হোটেলে আসা নরনারীদের চরিত্রের কিছু কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে! তার সঙ্গে সঞ্জয়ের বর্ণময় প্রেমের দুঃখময় কাহিনী যা তাঁকে গভীর জীবনবোধে সমৃদ্ধ করেছে। কালকূট শুধু সঞ্জয়ের চোখ দিয়েই চরিত্রগুলোকে তুলে ধরেন নি, সেই চরিত্রগুলোতে নিজের মানসিক চিন্তাভাবনার কথা বসিয়ে দিয়ে এই পার্থিব জগতের বাস্তব চরিত্রগুলো সৃষ্টি করেছেন। চরিত্রগুলোর অবস্থানগত চিত্রায়ন পাঠককুলের চিন্তায় ভাগ বসায়। আর ট্রেনের শুরু থেকে প্রায় শেষ অবধিই শিবিদি-অবুদিদের উচ্ছল উপস্থিতি কাহিনীর ঘটনাবলীকে মুখরিত করে তুলেছে। একদম আমাদের চেনা ছকের পিসিমা-বউদি-কাকিমাকে তুলে ধরেছেন এই কাহিনীতে। ১৯৬২ সালে চারজন বিধবা মেয়েমানুষের সঙ্গে বিশ-বাইশের এক তরুণীকে নিয়ে পুরীতে যাওয়াও সাধারণ কথা নয়। তিনি শিবিদি, বউদিদের নিয়ে এই কাহিনীতে একটি গতিময় মানবজীবন চিত্র তুলে ধরেছেন। যেখানে আছে পুত্রস্নেহের ব্যাকুলতা, কালকূটের আগমনে রান্না, বাহারে উৎসাহ, সব একবারে অতি জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন কালকূটীয় অন্তর্দৃষ্টিতে। রেণুর হৃদয়ের বেদনা মন্দিরের পাষাণ মূর্তির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। আবার তিনিই তার বেদনাকে বর্ষার বারিধারার পরে শরতের আকাশের মত মেঘমুক্ত করে দিয়েছেন। প্রকৃতি ও মানবীকে সমুদ্রের উদারতায় মিলিয়ে দিয়েছেন। তেমনি আর একটি বেদনামথিত উজ্জ্বল চরিত্র তৈরি করেছেন— খেঁকিয়ানন্দ। কথায় কথায় যিনি বিদ্যাপতি অথবা জয়দেবের রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীকে উদাত্ত কণ্ঠে ও শুদ্ধ উচ্চারণে গাইতে পারেন। তিনি আবার সুমধুর স্বরে কীর্তনে মন মাতিয়ে চোখের জলে ভাসিয়ে দিতে পারেন। তিনি মানুষের মনের ভিতরে প্রেম আছে কিনা তার তালাশ করে লেখকের বিরক্তি উৎপাদন করেন। সেই খেঁকিয়ানন্দ যে মনে মনে প্রেম ভিখারী ছিলেন, স্ত্রীকে ছেড়ে এসে ঈশ্বরকে খুঁজেছেন পত্নীপ্রেমের মধ্য দিয়ে। তিনি ঈশ্বরকে পান নি, তাঁর স্ত্রী-ই তাঁর কাছে ঈশ্বররূপে প্রতীয়মান হয়েছে, তাঁর মৃত্যুর শেষ সময়ে তিনি তার সেই প্রেম ঈশ্বরের কাছেই প্রেমের বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন কালকূটের মাধ্যমে। কী বেদনার্ত, প্রেমের আকূতি অসীম মুন্সিয়ানায় তুলে ধরে পাঠককুলকে বেদনার্ত করে তুলেছেন। ঘটনার প্রয়োজনে বহু কাহিনীকে তিনি যুক্ত করেছেন কিন্তু উপন্যাসের যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকলে কালকূটের এই সমুদ্রের টানে সমুদ্রের নির্জনতায় ভ্রমণকাহিনী সার্থকভাবে উপন্যাস হয়ে উঠতে পারত তা সম্পূর্ণতা পায় নি। কিন্তু কাহিনী হিসাবে যথেষ্ট উপভোগ্য।

প্রকৃতির টানে ঘরছাড়া কালকূটের মানবজীবন অন্বেষণ এই পর্যায়ে নদী-পর্বত-সমুদ্রের টানে ভ্রমণ বিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে সমুদ্রের টানে বেরিয়ে পরে পাওয়া অভিজ্ঞতার সাহিত্যরূপটি আলোচিত হল। এবার নদী-পর্বতের টানে তাঁর ভ্রমণ বিষয়ক রচনার মধ্যে প্রথমে আলোচনা করা হল পর্বত বিষয়ক রচনা। প্রথমে আলোচনা করা হবে 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গনে'

'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে' কাহিনীটি ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৭১ বঙ্গাব্দ) প্রথম 'জলসা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৭২ বঙ্গাব্দ) করুণা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশ থেকে কিছু পরিবর্তন করে প্রকাশিত হয়। এখানে আলোছায়ার বিচিত্র বর্ণবাহারের চিত্র সংযোজিত হয়েছে। তৃতীয় সংস্করণে রঙ বিন্যাসকে আরও বিস্তৃত করে দেখানো হয়েছে। পাহাড়ের আকর্ষণ কালকূটের সেই ছেলেবেলা থেকেই। তাই কাহিনীর শুরুতেই তিনি লিখেছেন "আজ যখন উত্তরের তরাইয়ে এসে, আকাশে উচ্চশির নীল ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, হিমালয়ের আহ্বানে যেখানে শালবীথির বাতাসে লতাগুল্ম বেষ্টিত নিবিড় অরণ্যের পাখির কাকলিতে, স্টেশনের নাম পড়ছি 'সুকনা', আমরা বাঙালীরা যার উচ্চারণ করি 'শুকনা', তখন ছেলেবেলার সেই দিনগুলোর কথা বড় বেশী করে মনে পড়ছে।" *(পৃ: ২০৮, কালকূট রচনা সমগ্র, ১ম খন্ড)* পাহাড় দেখা ও পাহাড়ে ওঠার নেশা কালকূট তথা সুরথনাথের সেই ছেলেবেলা থেকে। সেই ছেলেবেলায় ন'বছর বয়সে স্কুল পালিয়ে বলুর সঙ্গে ধানমন্ডাইয়ের মাঠে পাহাড় দেখতে গিয়েছিল। মাটি রং পাহাড় উঁচুতে উঠে গেছে। সাই-বাবলার জঙ্গলে ভর্তি। আশেপাশে দু'একটা শাল দেবদারুর গাছ, পাহাড়ের উচ্চতা ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। মাঝে মাঝে বড় বড় গর্ত, ফাটল। কোনও পাথর বা প্রস্রবণ দেখতে পায়নি। পাহাড়ের মাথায় উঠে শহরের অনেকটা, রেললাইনের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি যাওয়া, নবাবপুরের রাস্তা সব দেখেছিল। কাঁটা গাছের কাঁটায় জামা ছিঁড়ে হাত-পা ছড়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে দিদির হাতে মার খেয়েছিল, আর ওদের এক দাদা মনোতোষ বলে দিয়েছিল, রমনায় যাবার পথে পুরনো চাঁদমারির ঢিবি। মনোতোষদার কথা বিশ্বাস হয়নি। মনোতোষদা জানে না। পাহাড় নিশ্চয়ই পাহাড়। "ছেলেবেলার অনেকদিন পর্যন্ত তবু একটা সান্ত্বনা ছিল মনে, আমি পাহাড় দেখেছি।" *(পৃ: ২১৩, ঐ)* ছোট্ট বলু জানত না ব্যাপারটা, ছোট্ট সুরথনাথও সেটাই বিশ্বাস করেছিল।

কালকূটের প্রাণের মাঝখানে আছে এক রূপ-রসিকের বাস। শুধু রূপের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য তার এই পথ চলা। "আমি যে চলেছি, সকল মহানদীর জন্মভূমিতে। সকল মহানদীর স্রষ্টা হিমালয়ের, সোনার শিখর বেষ্টিত এক বর্ণাঢ্য অঙ্গনে! নদীরা সেখানে প্রস্রবণ হয়ে নেমে চলেছে, হিমালয়ের আপন ঘরোয়ানার নাচের ছন্দে, গানে সুরে।"*(পৃ: ২১৩, ঐ)*

কালকূট হিমালয়ের তৃষ্ণাকে আকণ্ঠ করে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে বসেছেন। বৈশাখের দাবদাহে ও যাত্রীভিড়ে রেলযাত্রীরা নাজেহাল। কালকূট এবার কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি জংশন ও শিলিগুড়ি দার্জিলিং যাত্রাপথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ও কামরায় যাত্রীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সঙ্গমাধুর্যে আপ্লুত। এই দীর্ঘ যাত্রাপথের সঙ্গী হয়েছেন এক বৃদ্ধ, নাম তার পরমেশ ঘোষাল। বছর চব্বিশ-ছাব্বিশের একটি মহিলা যার সঙ্গে একটি শিশু কন্যা, তিনটি যুবতী কন্যা ও একটি বছর বারোর

একটি পুত্র ও গিন্নীসহ এক বয়স্ক ভদ্রলোক। আর আছে তিনটি চব্বিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে এখনও বিদ্যার্থী। এরা সকলেই দার্জিলিং যাত্রী। ওই তিন যুবক তথা লেখকের ভাষায় তিন শ্রীমান কলকাতা থেকেই যাত্রী। হৃদয়ের উদ্দামতাকে ওরা সংহত করতে শেখেনি। ট্রেনের সবাইকেই ওরা সাহায্য করছিল, সব থেকে বেশি সাহায্য করছিল ওই প্রৌঢ় দম্পতিকে। বৈশাখের প্রচণ্ড গরমে ওরা গায়ের জামা খুলে ফেলেছিল, সংকোচের কোনো বালাই-ই ছিল না। ওদের চেঁচামেচিতে অযাচিতভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াতে অনেকেই বিরক্ত, কেউ বা বিদ্রূপের তীর ছুঁড়েছে। কিন্তু ওরা আপন খেয়ালে। প্রৌঢ় দম্পতির তিনটি মেয়ের কালো চোখের তারায় মন উচাটন। কালকূটের চোখে ধরা পড়েছে এইভাবে "ওদের প্রাণে তখন সেই প্লাবনের ঢল। ঝড়ের বেগ। প্রাণের মধ্যে ফুটছে টগবগিয়ে, ছুটছে রক্তের পক্ষীরাজ। তার চেয়েও বলি, সে যে অপ্রতিরোধ্য বন্যফুল ফোটার মতো। তাকে তুমি নির্লজ্জ বলতে পার, সে তবু ফুটবেই। তার শিরায় শিরায় আগুনের রস, রঙে আর বর্ণে, গন্ধে আর রূপে সে চমকে দেবেই। প্রকৃতির সেই যে ধর্ম।"*(পৃ: ২১৮, ঐ)* ওদের আচার আচরণ না কালকূটের হৃদয়ে খুশির ঝোরা বইয়ে দিয়েছে। তাঁর যে মনে হয়েছে যে তারই আশেপাশের মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলে ওরা, ওরা সমাজের কোনো অন্ধকার অংশ থেকে উঠে আসেনি। ওরা লুকিয়ে চুরিয়ে, গম্ভীর চালাকির মধ্য দিয়ে চলতে শেখেনি। ওদের সলজ্জ হাসির উচ্ছ্বাসে, চোখের তারায় অনুচ্চারিত ভাষায় তারাও তাল দিয়ে যাচ্ছিল। কালকূটের চোখে ধরা পড়েছে এইভাবে "এক্ষেত্রেও, তিন শ্রীমতী বোধহয় সিং দরজা। সে সিং দরজার পাল্লাও যে কখনো চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্যের বা ভ্রূকুটি চোখের কোণের অপ্রতিরোধ্য চোরা হাসিতে একটু মুক্ত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ কি?" *(পৃ: ২১৯, ঐ)* ট্রেনের কামরায় তিন শ্রীমতী আর তিন শ্রীমানের মধ্য দিয়ে অতিবাস্তব কতগুলি চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন। ট্রেনে উঠে প্রথমে যা হয়, সকলেই অচেনা অজানা, কেউ অযাচিত সাহায্য করে, কেউ স্বার্থপরের মত, নিজের সুবিধার জন্য অনেকটা জায়গা নিয়ে বসে থাকে, কখনও এর জন্যে কথা কাটাকাটিও হয়। কিন্তু তারপরে ট্রেনের গতির মতো মানবমনের গতিও পাল্টাতে থাকে। সাময়িক সম্পর্কের বন্ধনে, সহানুভূতির তারল্যে সকলেই ধরা পড়ে। জীবন ক্ষণস্থায়ী, পার্থিব জীবন এই কর্মক্ষেত্রে রেখেই চলে যেতে হবে সব নাম-যশ-কীর্তি-প্রতিপত্তিকে পিছনে ফেলে, ঠিক এই রেলের কামরার যাত্রীদের মতোই। কালকূটের সূক্ষ্ম বিচারবোধ, দৃষ্টিভঙ্গিতে বহু চেনা অথচ অপরিচিত মুহূর্ত ধরা পড়েছে। কাহিনীর সবে সূত্রপাত, এগিয়ে দেখা যাক্। এই তিন শ্রীমানের সঙ্গেই ট্রেনের ওঠার একটু পরেই অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর পেরোনোর পরই খচাখচি হয়ে গেল পরমেশ ঘোষালের সঙ্গে। তিনিও চলেছেন দার্জিলিং। যা কিছু দেখেন শোনেন প্রথমেই তার মন বিরক্তিতে বিষিয়ে ওঠে। "ওহে ছোকরারা, বলি এত হাউচাউ দাপাদাপি করার কী আছে, অ্যাঁ? এত হাউচাউ দাপাদাপি

কিসের?" *(পৃ: ২১৯, ঐ)*

এক শ্রীমানের উত্তর "দাপাদাপি করব কেন? আমরা তো কাজ করছি স্যার।" *(পৃ: ২১৯, ঐ)*

পরমেশবাবু বললেন "যথেষ্ট কাজ হয়েছে। আবার স্যার বলা হচ্ছে স্যার।" *(পৃ: ২১৯, ঐ)*

এ'কথা শুনে তিনজনে অট্টহাসিতে কামরা কাঁপিয়ে দিল। এতে পরমেশ বাবু আরও রেগে গিয়ে হাসির কারণ জানতে চাইলেন। একটি ছেলে উত্তরে বলল যে 'স্যার' বলায় রেগে যাওয়াতে হেসেছে কিন্তু কি বলবে এর পরিবর্তে সেটাও তারা ভাবছে। পরমেশবাবু 'মশায়' বলতে বলাতে ছেলেটি বলে উঠেছিল জ্যাঠামশায়। এই শোনাতে উনি ওঠে গিয়ে কালকূটকে সাক্ষী মানলেন। কালকূট ছেড়ে দেওয়ার কথা বলাতেও উনি ছেড়ে দিতে রাজি নন। উনি তার নড়বড়ে দাঁতে, জিভের ঝটকা মেরে বলেছিলেন "বাঙালী জাতটার অবস্থা একবার ভাব। কোথায় এসে আমরা দাঁড়িয়েছি।' *(পৃ: ২১৯, ঐ)* উনি বলতেই লাগলেন কিন্তু কালকূট সব কথা শোনেন নি, তবে শোনার ভান করেছিলেন। কেননা, ট্রেনে ওঠার পর থেকেই কালকূট লক্ষ করেছেন এই রগচটা বৃদ্ধ লোকটিকে। প্রথমে পড়লেন — দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় কেন আরও দুটো বেশী পাখা দেয়নি। তিনি আশেপাশের যাত্রীদের ও কালকূটকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন "নষ্টামো, বুঝলে হে, এসব খালি নষ্টামো! আরে বাবা, পয়সার বিচারই কী সব হল, আঁ? কী বল হে?" *(পৃ: ২১৪, ঐ)* কালকূট ওনার কথা সংক্ষিপ্ত উত্তর বটেই তো বলাতে উনি ক্ষেপে গেলেন। বললেন "তা তো বটেই। ও কথাটার মানে কী? ওসব বলে কিছু হবে না, বুঝলে? দাবি করতে হবে, দাবি। পাখা আরো দিতে হবেই।" *(পৃ: ২১৪, ঐ)* এমনিভাবে চলছে পরমেশবাবুর ক্ষণে ক্ষণে কথাবার্তা। উত্তর তিনি একটা কালকূটের কাছে নেবেনই। অতএব কালকূটও সমান তালে নেতিবাচক উত্তরে সঙ্গ ত করে যাচ্ছেন।

এমনিভাবেই সকরিগলি ঘাটে পৌঁছে গেলেন। এবার সেই বৃদ্ধই কালকূটকে আঁকড়ে ধরলেন। কালকূট যে পথে এসেছেন কলকাতা হয়ে সেটা বিহার প্রদেশের একটা অংশ হয়ে আছে। এপারে সকরিগলি ঘাট আর ওপারে মণিহারিঘাট। গৌড় বরেন্দ্রের ভিতর দিয়ে হিমালয়ে যাওয়ার পথটি ছিল সান্তাহার পার্বতীপুর জংশন দিয়ে। দার্জিলিং মেল ছুটত ঐ পথ দিয়ে। কালকূট এসেছেন অন্য পথে, সকরিগলিঘাটে নামতে হয়। গঙ্গার বিস্তীর্ণ চর পেরিয়ে স্টীমার, তারপরে আবার সেই বালুচর পেরিয়ে মণিহারিঘাট। প্ল্যাটর্ফম বিহীন মণিহারিঘাট স্টেশন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে গঙ্গা বালুচরে বালির ঝড় যাত্রীদের গায়ে স্ফুলিঙ্গের মত তপ্ত বালি এসে পড়ে মুখ-চোখ-হাত-পা সারা অঙ্গ ঢেকে দিচ্ছিল। ঘনকুয়াশার মত কালির কুয়াশা, চারিদিক ঢেকে সব অন্ধকার করে দিয়েছিল। প্রবল চিৎকার, কে কোথায় হারিয়ে গেছে, কার মানিব্যাগ পড়ে গেছে, কার কানের দুল খসে গেছে, কেউ কুলিকে খুঁজে পাচ্ছে না, মাল নিয়ে কোথায় চলে গেছে। এমনি

একটা বীভৎস করুণ চিত্র কালকূট পথের বিবরণীতে তুলে ধরেছেন। সেই বীভৎস দৃশ্য প্রাঞ্জল ভাষায় চিত্রায়িত করেছেন কালকূট। এমনি একটি প্রাণান্তকর মুহূর্তে পরমেশবাবু কালকূটকে আঁকড়ে ধরে "দোহাই বাবা, ছেড়ে যেও না, বে-ঘোরে মারা যাব। কী করব বল।" *(পৃ: ২০৪, ঐ)* কালকূট তাকে ছেড়ে যেতে পারেন নি এক মানবিক দৃষ্টিতে তিনি বলেছিলেন "না, ছেড়ে যাব কেন বলুন, কিন্তু আপনার মালপত্র?" *(পৃ: ২০৪, ঐ)* কুলিকে সেকেণ্ড ক্লাসে তুলে দিতে বলেছেন, এইটুকুই জানেন। কালকূট দু'একটা কথার মধ্যে দিয়ে পথিমধ্যে বালুচরে এক অসহায় বৃদ্ধের করুণ রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে ঐ সময়ের যাত্রীদের গঙ্গা পারাপারের ব্যাপারটা কী কষ্টসাধ্য ছিল সেটাও অনায়াস ভঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছেন। লেখক কিছুদিন আগেই এই বৃদ্ধের বয়সের মতই তার পিতার মুখাগ্নি করে এসেছিলেন, বৃদ্ধের আকুতির সঙ্গে নিজ পিতার মুখটি ভেসে উঠেছিল। "এক মুখাগ্নিতেই কী জীবনের একটা দিকের সব শেষ হয়?" *(পৃ: ২১৪, ঐ)* বৃদ্ধকে নিয়ে মণিহারিঘাট স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা নাড়ির দরজার কাছে পৌঁছুবার আগেই "এই যে আপনারা যাচ্ছেন দেখছি। ধরুন তো একে একটু, কুলিকে দিয়ে মালপত্র একটু তুলিয়ে নিই।" *(পৃ: ২১৪, ঐ)* লেখক হকচকিয়ে গিয়েছিলেন প্রথমে। কিন্তু কিছু বোঝার আগে বছর তিনেকের একটি শিশু দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

পরিচয়ে সূত্রটা একটু টেনে দিই। এরাও ট্রেনের সেই যাত্রী মা ও তার শিশুকন্যা। ট্রেনের মধ্যে শিশুটির সঙ্গে লেখকের ভাব হয়েছিল। লেখকের ছবিওয়ালা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আড়চোখে লেখককে দেখছিল এবং কখনও ঠোঁট ওল্টাতে ওল্টাতে, কখনও মুখের ভিতর জিভ ঠেলে ঠেলে গাল ফোলাতে লেখকের কাছে চলে আসছিল। শিশুটির মাও আড়চোখে নজর রাখছিলেন নিজ কন্যার দিকে কিন্তু মুখে কিছু না বলে জানলার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। লেখক শিশুটির হাতে হাত দেওয়াতে হাত সরিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু ম্যাগাজিন দেখা বন্ধ করেনি। এরপর একটু কথা শুরু। জানতে চেয়েছিল যে এটা তোমাল? শিশুটির ওই কথা লেখকের কানে অরণ্য স্তব্ধতায় বেজে উঠেছিল "পথিক তুমি কি পথ হারিয়েছে? আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ।" *(পৃ: ২১৫, ঐ)* আবার জানতে চেয়েছিল বৃদ্ধটি তার বাবা কিনা? বাবা নয় জানতে পেরে "তবে ও তোমাকে বকছিলো কেন?" *(পৃ: ২১৫, ঐ)* আর বকবে না জেনে লেখকের কোলে ওর দুটি হাত তুলে দিয়েছিল। নাম বলেছিল কাকুলী অর্থাৎ কাকলী। মা তাকে নিজের জায়গাতে বসতে বলে বাইরে জানলার দিকে তাকিয়েছিলেন। এটা দেখতে পেয়ে ও নিশ্চিন্তে লেখকের সঙ্গে আধো আধো স্বরে কথা বলতে লাগল। নাম কী, কী কলো? পলা কলো না? গোঁফ নেই কেন? লেখকের নাম শুনে চকিতে ওর মা একবার তাকিয়ে দেখেছিলেন কিন্তু মুখে কিছু বলেন নি। শিশুটি লেখককে বলেছিল "আমাল বাবাল গোঁফ আতে, দানো?" *(পৃ: ২১৬, ঐ)* লেখকের সঙ্গে সখ্যতা ভালই

জমেছে। এরই মধ্যে মা ডেকে নিয়ে নিজের কাছে বসিয়ে রেখেছিলেন। এবার লেখক মৃদু হাসছিলেন, শিশুটিও তাই। লেখক বলেছেন "সে হাসিটা যে দু'জনের মধ্যে রীতিমতো একটা নীরব নিভৃত ভাবের বিনিময়, আমরা দুজনেই তা বুঝতে পারছিলাম। সংসারে এমন সহজ নিবিড় প্রেম কজনেই বা চেয়ে দ্যাখে। আমি চোখ ঈশারায় ঘাড় নেড়ে, কাছে ডাকছিলাম।" *(পৃ: ২১৬, ঐ)* একটু পরেই মাকে জানিয়েছিল যে আবাল ডাক্‌তে যে। মা তাকে যেতে বলেছিলেন কিন্তু বাজে বকতে নিষেধ করেছিলেন। মায়ের কথা শুনে লাফ দিয়ে নেমে লেখকের কোলের ওপর হাত তুলে দিয়েছিলেন। মা এই দৃশ্য দেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এই হচ্ছে মা-মেয়ের পরিচয়ের সূত্র। চব্বিশ-ছাব্বিশের একটি মহিলা একা দার্জিলিং যাচ্ছে শুনে পরমেশবাবু বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি। ওনার তো সব কিছুতেই প্রথমে বিতৃষ্ণা। যখন মা শিশুকন্যাটিকে দিয়ে চলে গেলেন তখন কালকূটের মনে পরমেশবাবুর জন্য শঙ্কা হয়েছিল। কিন্তু পরমেশবাবু? লেখক বলেছেন দেখেছিলাম সবচেয়ে দুঃসময়েই বৃদ্ধের মেজাজের আর একটি রূপ ফুটে উঠেছিল। নিজের দুরবস্থার মধ্যেও একটি হাত বাড়িয়ে কাকলীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আহা বেচারী।' বোঝা মনে করতে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু এক বৃদ্ধ আর একটি শিশু। দুজনে কাউকেই আমার বোঝা মনে হয় নি।" *(পৃ: ২১৬, ঐ)*

দুটি বি-ষম বয়সের মানুষ কালকূটের বাহুগত বা হস্তগত, অসহায়। পরম নির্ভরতায় কালকূটকে তারা আশ্রয় করেছিল। এরই মধ্যে কালকূট পরমেশবাবুর খিটখিটে মেজাজের অন্তরালে একটি কোমল সহৃদয় মানুষের খোঁজ পেয়েছেন। কালকূট তাঁর লেখনীর সৃষ্টিজালে পরমেশবাবুর চরিত্রটি হিমালয়ের বনরাজির বিচিত্রবর্ণের ফুলের মতো সুবাসিত করেছেন আবার বয়সের তীব্র রশ্মির ছটা যেমন আকাশকে বহুবর্ণে রাঙিয়ে তোলে তেমনি করেই পরমেশবাবুর অন্তরটিকে রাঙিয়ে দিয়েছেন। লেখক কালকূট তারই ব্যক্ত কথা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে চরিত্রটির মুখে কথাগুলো বসিয়ে দিয়েছেন। ওই বৃদ্ধ মানুষটির মুখ দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য পাখার দাবি তিনি পরমেশবাবুর মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন। যে দাবী সেই সময়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর বহু যাত্রীরই মনের কথা ছিল। মানবমন সন্ধানী দার্জিলিং ভ্রমণে বেরিয়ে মানবজীবনের ওঠাপড়া, ঘাতসংঘাত প্রেম-দুঃখ এইগুলো তুলে এনে পাঠককুলকে উপহার দিয়েছেন। পাঠক এই বোধগুলির সঙ্গে একাত্মবোধ। একজনের বেদনা, সুখ-দুঃখ সার্বজনীন হয়ে যায়। শ্রীমান-শ্রীমতীদের নিয়ে পরমেশবাবুর কথাবার্তা ও শ্রীমানদের কথা ও শ্রীমতীদের ভাবভঙ্গি তুলে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। লেখক ওদের মাধ্যমে যে বক্তব্য যে অনুভূতি তুলে ধরেছেন, বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বিচার করলে দেখা যায় লেখক যথার্থই চরিত্রগুলো সৃষ্টি করেছেন। যৌবনের ধর্মকে কে রোধ করবে? ওরা যৌবনের ধর্ম অনুযায়ীই উদ্দামতার ঘোড়া ছুটিয়েছে। একদিকে প্রেমিক মন, অন্যদিকে পরোপকারী

মন দুটোই যে একসাথে চলেছে, তার সঙ্গে সূক্ষ্ম কৌতুকবোধ। দৃশ্যটি একদম চোখের ওপরে ভাসতে থাকে। লেখকের বক্তব্যে সায় দেওয়া যেতেই পারে। এরা তো আমাদেরই নিত্যদিনের দেখা চরিত্র। আর ওদের কথায় পরমেশবাবুর রাগ, অভিমান একই সুরে ধ্বনিত হয়। ওরকম তরুণেরা যদি জোরে হেসে ওঠে তাহলে বলবার ভাষা হারিয়ে যায়, অপমানে লাগে, তখন মুখ দিয়ে অন্য কথা বেরিয়ে আসে। আবার এই পরমেশবাবুই বালির ঝড়ে চোখে দেখতে না পেয়ে কালকূটকেই জড়িয়ে ধরে তেমনি পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দেয় ছোট্ট কাকুলী। কালকূট নিজে কথাকার, তিনিই নিজে একটি মুখ্য চরিত্র। তিনি বুঝেছেন বয়স্ক মানুষের কথায় সহমত পোষণ না করলে তারা রেগে যান, শুধু তাই নয়, নিজের মতটিকে অন্যের মুখ থেকে শুনতে চান। কালকূট তাই করে গিয়েছেন, দু'একবার নিজের মতটাকে বলবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু লাভ হয় নি। উনি তিস্তা নদীর মতো নিজের তালে চলেছেন।

মণিহারিঘাট স্টেশন পর্যন্ত আর একটু আলোচনা বাকি আছে। সেটি হল ওই প্রৌঢ় দম্পতি। ট্রেনের মধ্যে পরমেশবাবু ও শ্রীমানদের মধ্যে যে এত কিছু হয়ে যাচ্ছে তাতে তাদের মন নেই। তারা তাদের জিনিসপত্র ঠিকঠাক উঠল কিনা সেটা দেখতে ব্যস্ত, শ্রীমানরা যে তাদের মালপত্র তুলতে সাহায্য করেছে এতে তারা খুশী। পরমেশ বাবু ও শ্রীমানদের কথা কাটাকাটি হয়ে যাওয়ার পরে তাদের খেয়াল হয়েছে কী যেন একটা হচ্ছে। নিজের মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চুপচাপ বসে আছে, ব্যস তাতেই তারা নিশ্চিন্ত। মেয়েরা চোখে চোখে কথা কইছে, হাসছে এগুলো তাদের নজরেই পড়ে নি। তারা নিজেরা গল্প করতে ব্যস্ত। তাই দেখে পরমেশ বাবুর রাগ ও দীর্ঘশ্বাস দুটো কালকূট তুলে ধরেছেন বিপত্নীক পরমেশবাবু। স্ত্রীকে নিয়ে ভারতের কত জায়গা ঘুরেছেন, তারা তো এমনটি করে সুখে গল্প করেননি। পরমেশবাবুর কথার মধ্য দিয়ে লেখক তার বেদনাকে তুলে ধরেছেন। পরমেশবাবু আনমনা হয়ে গেছেন প্রৌঢ় দম্পতির খুশি খুশি ভাব দেখে। সকরিগলি ঘাটে গিয়ে এই প্রৌঢ় দম্পতির পরিবার ও শ্রীমানেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। লেখকের হাতে কাকলীকে নিয়ে তিনিও হারিয়ে যান। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় কোথাও খুঁজে পান না। এই দেখে সেই পরমেশবাবুর উক্তি "দেখ এখন, না বিইয়ে কানাইয়ের মা হয়ে বসলে কি না!" *(পৃ: ২১৬, ঐ)* এই কথায় কালকূটের হৃদয় ছি ছি করে ওঠে। কিন্তু বাতিকগ্রস্থ, সন্দেহবাতিক, খিটখিটে মানুষের মুখ থেকে এরকম কথাটাই তো বেরিয়ে আসা উচিত। এবং লেখক সেইভাবেই এই চরিত্রের মুখে তার সন্দেহের কথা বলে বসেছেন। পরে কাকলীর মায়ের সন্ধান পাওয়া যাওয়ার পরে যখন জানতে পারলেন যে উনি ফাস্ট ক্লাসে ব্যবস্থা করেছেন। এতেও ওনার রাগ হয়ে গেল। কাকলীর মাকে পরোক্ষে কথা শুনিয়ে দিলেন, বললেন কালকূটকেই "তা বটে, একে কি হয়রান হওয়া বলে? মণিহারীঘাটে রমণীয় ভ্রমণ

বলে একে! এখন উঠে এস।''*(পৃ: ২১৭, ঐ)* বৃদ্ধ খেঁকিয়ে উঠেছিলেন দেখে কালকূট লজ্জিত ও কাকলীর মা বিব্রত। কিন্তু ঘটনাতো এমনিই ঘটে, পরমেশবাবু আপন খেয়ালে চলেন। এই খিটখিটে মানুষটি রাতে ট্রেনের মধ্যে আধশোয়া অবস্থায় ঘুম জড়ানো গলায় কালকূট বলে ওঠেন ''তোমার ওই কাকলী বা মাকলী বেচারীরা এখানে থাকলে আর ঘুমাতে পেত না একটু, কী বল।'' *(পৃ: ২১৭, ঐ)* আরও বললেন ''তবে এখানে থাকলে একটা ব্যবস্থা করে দিতামই, না কী বল হে।'' *(পৃ: ২১৭, ঐ)* লেখক হেসে আগের মতই তাল দিয়ে গেলেন। কিন্তু বুঝে গেলেন অন্তঃকরণের ব্যথাটা, কাকলীদের চলে যাওয়ার দুঃখবোধ থেকে বৃদ্ধের মুখ থেকে ওই কথাগুলো বেরিয়ে এসেছিল।

শিলিগুড়ি পৌঁছে বিচ্ছিন্ন দলটির আবার এক জায়গায়, একই কামরায় ঠাঁই হল। কালকূটের পাশে কাকলী, ওর মা, মায়ের পাশে ধূসর রঙের স্যুট, লাল টাই, সাদা শার্ট, চল্লিশের নীচে একজন স্মার্ট ভদ্রলোক বসেছিলেন। কাকলীর বাবা নয়, কারণ কাকলী তো বলেছিল বাবাল গোঁফ আছে। পাশাপাশি গায়ে গায়ে বসে আছেন দুজনে, গল্প করে যাচ্ছেন। শিলিগুড়িতে ইনি কাকলীর মায়ের হাত ধরে গাড়িতে তুলে দিয়েছিলেন। কালকূটের খুব জানতে ইচ্ছে করছিল ইনি কে? কিন্তু মনের মধ্যে সেই ভাবনার উদয় ''ওই দূরান্তের পাহাড়ের গায়ে দেশান্তরগামী মেঘের মতো, আমাদের এই গাড়ির যাত্রা শেষেই, পরস্পরের কাছ থেকে আবার দূরে চলে যাব। কেউ কাউকে মনে রাখব না। হয়তো কয়েকটি মুহূর্ত, এই কোল ঘেঁষা শিশুটিকে মনে পড়বে। আবার নতুনরা এসে আবার মন দখল করবে।

নদীর তীরের মতো মন। সেখানে নিরন্তর স্মৃতি বিস্মৃতির তরঙ্গের খেলা। আসে ও যায়। পলিমাটির স্তরে স্তরে কিছু চাপা পড়ে থাকে। জোয়ারের স্রোতে ধুয়ে যায় কিছু।'' *(পৃ: ২২১, ঐ)* কালকূটের মত পরমেশবাবুরও নজর এড়িয়ে যায়নি ব্যাপারটা। তিনি বলছেন যে, কর্তাটি এদিকে থাকেন আর গিন্নিটি কলকাতায়। তাইতো একলা মেয়েমানুষ এতদূরের পথ এসেছেন। তবুও একলা এতটা দূর আসা উচিত হয়নি। মণিহারীঘাটের কী দুরবস্থা। কিন্তু ভাবনাটা ভাবনাই রয়ে গেল। ট্রেন শুকনায় পৌঁছে গেল। কালকূট কাহিনীর শুরুই করেছেন শুক্না পৌঁছনোর কথা দিয়ে। সমতল আর পাহাড়ের সংযোগস্থল শুক্না। এরপর লেখকের বহুদিনের স্বপ্নপূরণ। ''আজ যখন সত্যি হিমালয়ে আরোহণ করছি, গভীর অরণ্য ভেদ করে, আশ্চর্য স্বপ্নের দেশের মতো অবিশ্বাস্য ছোট্ট গাড়ি, পাহাড়ে ঝুকঝুক শব্দে প্রতিধ্বনি তুলে ভূগোল বইয়ের সেই বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাওয়া পাহাড়ে উঠছিল, তখন ছেলেবেলার সেই ধানমন্ডাইয়ের মাঠে পাহাড়ের কথা বেশী মনে পড়ছে। সমতলের ছেলে আমরা। পাহাড়ের কী অদম্য তৃষ্ণা! বলু যদি বেঁচে থাকতো!'' ২১৩, *ঐ)* কালকূট এর আগে বিন্ধ্যাচল পাহাড়, আরাবল্লীর রেঞ্জ দেখেছেন কিন্তু হিমালয়ের তৃষ্ণাকে আকণ্ঠ

করে পথচলার নিয়তি তাঁকে টেনে এনেছে এই পাহাড়ে। "আর আমার মনের সঙ্গে তাল দিয়ে যেন, পাহাড়ে গা রেখে এই বিচিত্র রেলগাড়ির চলমান স্রোতের মধ্যে, বিস্মিত আনন্দের কলকল ধ্বনি বাজছে। অপরূপ! দূরে নীল আকাশের গায়ে কৃষ্ণনীল পাহাড়ের সীমা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে, মেঘ সরে গিয়ে, নতুন নতুন নীল পাহাড়ের চূড়া ভেসে উঠছে! কী বিশাল! যাত্রীদের কলগুঞ্জন ক্রমে আমার কাছ থেকে যেন দূরে সরে যাচ্ছিল। অরণ্যের নিবিড়তা, অথচ মুক্ত আকাশ ও স্তব্ধ পাহাড় এবং চলমান সাদা মেঘের খেলায় আমি আস্তে আস্তে যেন একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম!" ২১৩, *ঐ)* ছোট্ট গাড়ি বিচিত্র শব্দে অরণ্য-পর্বতের দিগন্ত থেকে দিগন্তের ঘুম ভাঙিয়ে এগিয়ে চলেছি। কালকূট হিমালয় পর্বতের অরণ্যবেষ্টিত বনরাজির মধ্য দিয়ে ঝিঁঝির ডাক নিস্তব্ধতার ধ্যান ভাঙিয়ে দিচ্ছে। " ঝিল্লী মুখরিত বনপরিপূরিত পর্বত-বাহুর এই বিচিত্র যানে বসে মনে হয়, আমার সমতলের চিরচেনা রাজ্য থেকে কোন্ এক অবাস্তব লোকে এসে পড়েছি। দুপাশের গভীর বনের দিকে একটু নিবিষ্ট হয়ে তাকালেই বোঝা যায়, এ অরণ্য শ্বাপদ-শঙ্কুল! আমরা এখনো পাদদেশ তরাইয়ের অরণ্যের গভীরে। কিন্তু চলেছি কত নিঃশঙ্কচিত্তে।" *(২১৩, ঐ)*

হিমালয়ের সৌন্দর্য ও অরণ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য ও ভয়ালতার রূপচিত্র কালকূট অঙ্কিত করে তাঁর সৌন্দর্যবোধ ও কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে তুলেছেন। নিজেও চলেছেন সঙ্গে পাঠককুলকেও এই অপরূপ সৌন্দর্যের রূপমাধুর্য্যের রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর সৌন্দর্য বর্ণনার ও রূপমুগ্ধতার কয়েকটি অংশ তুলে ধরা হল। এরই সঙ্গে পাঠককুলকে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছেন এই পথ তৈরির ইতিহাসের সঙ্গে। তিনি বলেছেন যে বিদেশীরা শুধু বাণিজ্যের লোভে, লুটের আশায় সরীসৃপতুল্য হাওয়া গাড়ি আর এই রাস্তা তৈরি করেনি, শৈলবিহারের আনন্দের পুণ্যিও ছিল। সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন ছিল। তারপর গঙ্গা পার হয়ে গাঞ্জেস্ হিমালয়ান রোড, দুশো মাইল রাস্তা গরুর গাড়ি বা পাল্‌কিতে করে যেতে হত। পূর্ণিয়া, কিষাণগঞ্জ, তিতিলিয়া আর শিলিগুড়ি পার হয়ে দার্জিলিং-এর শিখরে। বিকল্প হিসাবে ঘোড়াও ছিল। তারপরে শিলিগুড়ি পর্যন্ত রেললাইন হওয়াতে শিলিগুড়ি থেকে টাঙায় করে দার্জিলিং। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার ফ্রাঙ্কলিন প্রিস্ট-এর পরিকল্পনায় দার্জিলিং হিমালয়ান রেললাইন তৈরি হয়েছিল আঠারোশো ঊনআশি সালে। আঠারোশো আশিতে তিনধারিয়া পর্যন্ত ও একাশিতে দার্জিলিং পর্যন্ত লাইন পাতা হয়েছিল। দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল, তখন অখণ্ড বঙ্গদেশ ছিল। দেশ ভাগের করাল ছায়া তাতে ছিল না। পরবর্তীকালে রাজনীতির বিষাক্ত দাঁত মানুষের প্রতি মানুষের বিজ্ঞানকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। বঙ্গদেশ দুটি রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে গিয়েছিল হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান। কাজেই সে পথ আর নেই। কালকূট যে পথে এসেছেন পথের আলোচনা আগেই করা হয়েছে। সকরিগলি ঘাট স্টেশন,

স্টীমারে গঙ্গা, মাণিহারীঘাট স্টেশন হয়ে রেলগাড়িতে শিলিগুড়ি এসেছেন। পাঠকের সুবিধার্থে তাঁর হিমালয়ের যাত্রাপথের একটা পরিচিতি দিয়েছেন সৌন্দর্যের একটি রূপরেখা আঁকতে। হিমালয় ভ্রমণে স্থানমাহাত্ম্যের সঙ্গে প্রকৃতির অরণ্যরাজির চিত্র চিত্রকরের তুলিতে এঁকেছেন। তার সঙ্গে রৌদ্রছায়ার মত মানবমনের বিচিত্র সব অনুভূতি, নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাহিনীর চরিত্রগুলো বাস্তবের চরিত্রগুলোর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে, লেখকের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

রংটং পার হয়ে যতই উপরে উঠছেন ততই পাহাড়ের গা বেয়ে চা বাগান উঠেছে। এর সঙ্গে ফার্ণ, অরণ্যের ঘাস, ফুল ছাড়াও পাথরের এক আশ্চর্য গন্ধ ফুসফুসে ঢুকেছে, ঢুকছে রক্তের শিরায় শিরায়। হিমালয়ের নেশায় মন মাতাল হয়ে যাচ্ছে। সিঙ্গলীলার এক বাহু গিয়ে গাড়ি উঠছে। লুপ বেয়ে চক্রাকারে উঠছে। সিঙ্গলীলা কাঞ্চনজঙঘায় দিয়ে মিশেছে। আবার সীমানা নির্দেশ করেছে নেপাল আর সিমিকের, সিকিম এবং দার্জিলিং-এর। আর সেলিম পাহাড়ের চূড়ায় দিগন্ত ঢেকে গিয়েছে। বাঁদিকে সেলিম পাহাড়ের আড়ালে মহানদী ঢাকা পড়ে গেছে আর ডানদিকে ঝাপসা চিকচিকে তিস্তা সমতলে বয়ে চলেছে। কিন্তু তরাই শেষ হয়নি। অরণ্য নিবিড় থেকে নিবিড়তর। প্রস্রবণের দেখা মিলছে। গভীর অরণ্যের সুমহান গাম্ভীর্য বিরাজিত। কামরার মধ্যে গুনগুন গুঞ্জনের মধ্যে অরণ্য পর্বতের স্তব্ধতা ভেদ করে সমবেত কণ্ঠে বেজে উঠল

'চল্‌রে চল্‌রে চল্‌
ঊর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌।' *(পৃ: ২২১, ঐ)*

সঙ্গে মাউথ অর্গান। সবাই তাকিয়ে দেখতে পেল সেই তিন শ্রীমান। শ্রীমতীরাও কাছেই আছে। যাত্রীদের দিকে নজর নেই কারোর। কালকূটের মনে হল ওদের গানের সুরে দোলা, বেগের ছন্দ তার প্রাণে চুঁইয়ে ঢুকতে শুরু করেছে। আর সেইসঙ্গে চারপাশের উপত্যকা, গিরি সঙ্কটের অরণ্যানী সবকিছুতেই সেই সুর ধ্বনিত হতে লাগল। ছোট্ট ট্রেনটিও যে সেই তালে দুলতে লাগল। পাহাড়ী মানুষদের চোখে পড়তে শুরুও করেছে। রেললাইনের ধারে পাহাড়ী ছোট ছোট বাচ্চারা বসে আছে, তারা সমতলের মানুষ দেখছে অবাক হয়ে। জীবন্ত মানুষের বাচ্চা বলে ভুল হয়ে যায়, শো-কেসে সাজানো দেড় ফুট দু-ফুটের রং করা পুতুল বলে মনে হচ্ছে। পাহাড়ী মানুষজনের মধ্যে কিছু চা-বাগান শ্রমিক আছে। কিছু আছে পি. ডব্লিউ. ডি., রেলকর্মী, তাদের হাতে কোদাল কুড়ুল। ট্রেনের গানের সুরের দোলায় ওদের মধ্যে কেউ কেউ দুলে উঠছে, হাততালি দিচ্ছে। আবার কেউ

কেউ নির্বিকারভাবে চলেছে। রেললাইনের সঙ্গে সঙ্গে মোটরগাড়ির যাত্রীরাও চলেছে। তারাও হাতছানি দিচ্ছে। এসব দেখে কালকূটের দোলায়িত মন ভাবছন্দে মুগ্ধ হয়ে গেল। তাঁর মনে হল হিমালয়ের অভ্যন্তরে এক চলমান উৎসবে সবাই গা ভাসিয়েছে। কামরার ভেতরেও সকলে সেই গানের সুরে দুলে উঠছে, তাল দিচ্ছে। ছোট্ট কাকলীও লেখকের কোলের ওপরে হাত দিয়ে নির্ভুল তাল দিয়ে চলছিল। কিন্তু পরমেশবাবু প্রথমে বিরক্ত "কি অধিকার আছে তোমার অন্য যাত্রীদের শান্তিভঙ্গ করবার? আমাকে বুঝিয়ে দাও।" *(পৃ: ২২১, ঐ)* "কিন্তু তুমি যে অতবড় ষণ্ডার মতো চেহারাটা নিয়ে এই ভ্যাকোর ভ্যাকোর বাজনা বাজিয়ে গাধার মতো চেঁচিয়ে চলেছো, তোমার তো একটু খেয়াল করা দরকার, না কী হে?" "অথচ তুমি বলতে যাও, অমনি তোমাকে জ্যাঠামশাই বলবে। হয়ত শেয়াল ডেকেই উঠবে।" ২২০, *ঐ)* পরমেশবাবুর শুধু রাগই নয় অভিমানও ঝরে পড়ছে সেটা কালকূট সূক্ষ্মতায় তুলে ধরেছেন তার দু'একটি নমুনা তুলে দেওয়া হল।

কালকূট পরমেশবাবুর ক্ষোভ অন্তরের বেদনাটাকে তীক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে ধরে ফেলেছেন। হিমালয়ের পরিবর্তিত রূপের সঙ্গে মানুষের মনেরও পরিবর্তন হয়। প্রকৃতি তার প্রভাব বিস্তার করে মানবমনের উপরে, সে বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে যে তাকে পরখ করছে। পরমেশবাবু শ্রীমানের দিকে ঘুরে বসাতে কালকূট প্রমাদ গুণলেন, এক্ষুণি বোধহয় বিস্ফোরণ ঘটবে। কিন্তু যা ঘটল তাতে কালকূট নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। "গানটা তো ভালোই মনে হচ্ছে, না কী বল হে?"*(পৃ: ২২১, ঐ)* আপন মনেই বলতে লাগলেন "চল্‌রে চল্‌রে চল্, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল ... হুঁ, মার্চিং সং এর মতো, না?" *(পৃ: ২২১, ঐ)* "আমি তো দেখছি ছেলেগুলোর কোনো দোষ নেই, না কী বল হে? গানটা বেশ জমাটি তালের।" *(পৃ: ২২১, ঐ)* কালকূটের কাছ থেকে জেনে নিলেন কার গান। তারপর কথাপ্রসঙ্গে উনি হিঁদুর মেয়ে বিয়ে করেছেন এই কথাও উঠল। উনি এমন একটি উত্তর দিলেন যা লেখক ভাবতেও পারেন নি। "তা, কবিদের কথা অবিশ্যি আলাদা। ছেলেমেয়েরা যদি মেমসাহেবই বিয়ে করতে পারে, তবে আর দেশের মুসলমানেরা কী ক্ষতি করেছে, না কী বল হে। তবে বাপু যাই বলো, আমাদের হাড়ে এখনো নাড়া খায়। তা সে যাক গে, পাগল হল কেন? কবিতা লিখে লিখে?" *(পৃ: ২২১, ঐ)* এক ধরনের মানসিক অসুখে ওরকমটি হয়ে গেছেন জেনে বললেন "অ। তা গানটি বেশ ভালোই বলতে হবে। বেশ একটা ..." বলেই পরমেশবাবু বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন যেখানে দিগন্তজোড়া পাহাড়, দূরান্তের নীল আকাশের সঙ্গে মেশামেশি করছে। চুনাভাটী, তিনধরিয়া, গয়াবাড়ি সব ছাড়িয়ে ট্রেন চলছে, প্রকৃতি বদলে গেছে। নাম না জানা গাছে রঙ-বেরঙের অর্কিড ঝুলছে। ঘাসফুলের সঙ্গে বিচিত্র বর্ণের ফুলের মেশামেশি। লাল গোলাপের ঝাড় দুলছে পাথরের বুকে। পাথরেও ফুল ফুটেছে দেখে লেখক বিস্মিত। লেখক এর থেকেও বেশি বিস্মিত পরমেশবাবুর

হাঁটুর ওপরে গানের তালে নিজের হাতটি পড়ছে। আর ভাবুক স্বরে বলে যাচ্ছে "বেশ, না? মানুষ কোথায় না যাচ্ছে। পাহাড়ের ওপর রেল উঠিয়ে ছেড়েছে, ভাবে একবার, আঁ?" *(পৃ: ২২২, ঐ)*

পরমেশবাবুর প্রাণেও উৎসবের দোলা লেগেছে। এরপরে লেখক শুনতে পেলেন গুনগুন "হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর, হও উন্নত শির, নাহি ভয়।" *(পৃ: ২২২, ঐ)* গানের শেষেই আবার রাগ ওই তিনটি শ্রীমতির ওপর। ওরা সুবিধের নয়। কালকূট ওনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হ্যাঁ করেছিলেন কারণ তিনি চিনতে পেরেছিলেন হিমালয়ের অঙ্গনে এসে পরমেশবাবু নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেন নি। "ওর ভিতরের প্রাণের প্রাণটির রূপ আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। আমি রাগী শিশুটিকে চিনতে পেরেছিলাম।" *(পৃ: ২২২, ঐ)* প্রকৃতির মত পরমেশবাবুর হৃদয়েও ফুল ফুটেছে। হিমালয়ের কোলে প্রকৃতি মানব একই হয়ে গেছে। কালকূট হিমালয়ের প্রাঙ্গনে এসে হিমালয়ের স্তব্ধ মৌনতার সঙ্গে উদার আকাশের উন্মুক্ত পরিবেশে আসা মানবমনের পরিবর্তন তুলে ধরেছেন।

গাড়ি কার্শিয়াং আসতেই ঠাণ্ডা জাঁকিয়ে বসল। চা খেতে নেমে দেখলেন ক্যাটারিং-এ ভিড়ের মধ্যে দুটো টেবিলে শ্রীমান শ্রীমতীরা বসে আছে। কালকূট দেখলেন সম্পর্ক শুধু চোখে চোখেই নেই, বাণী বিনিময়ে পৌঁছে গেছে। লেখক অবশ্য দেখেছেন আগের দিন দুপুরেই একজন ভুল করে এক শ্রীমতীর শ্যান্ডেল পায়ে গলিয়ে বাথরুমের দিকে যাচ্ছিল তখন যার জিনিস সেই শ্রীমতী বলে উঠেছিল যে শ্যান্ডেলটা তার। এটা নিয়ে শ্রীমান শ্রীমতীদের মধ্যে হাসির কলোরোল, ঠাট্টা, মস্করার তুফান উঠেছিল। সঙ্গে পরমেশবাবুর বিদ্রূপ "এখন স্যান্ডেল বদল করছ, এরপরে মন বদল, প্রাণ বদল, হাত বদল বাকী।" (পৃ: ২২৪, ঐ) লেখকও মনে মনে প্রাণ ভরে হেসেছিলেন। চা খেতে এসে দেখলেন আরও খুশিতে মেতেছে ওরা। ট্রেনে ওই শ্রীমতীদের মা বাবার কাছে চা পৌঁছে দিয়ে আসার কথা এক শ্রীমান বলতেই সর্বকনিষ্ঠা শ্রীমতী তাকে গবেট বলে উঠল। যাকে বলল সে কারণটা বুঝতে না পেরে কারণটা জানতে চেয়েছিল। সবাই হাসছিল আর ওই শ্রীমতী ভেংচে বলে দিল "কেন? তাহলে আমরা নেমে এসেছি কেন?" *(পৃ: ২২৪, ঐ)* তিন কন্যা চা পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে এল চা খেতে, শ্রীমানরা চা পাহারা দিচ্ছিল। কালকূট ওদের লক্ষ্য করে বুঝতে পেরেছিলেন, তিনটি তাজা বুদ্ধিদীপ্ত মগজ একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে কিন্তু মেয়েরা যথেষ্ট স্বাভাবিক, একটু বেশি বুদ্ধিরই পরিচয় দিচ্ছে। শ্রীমানরা প্রেমে পড়ে প্রেমমুগ্ধ। কিন্তু ওই শ্রীমান "আচ্ছা ও আমাকে গবেট বলল কেন?" *(পৃ: ২২৪, ঐ)* এক বন্ধু বলছে "কারণ, এটা অ্যাপ্লায়েড ফিজিকস্ নয়।" *(পৃ: ২২৪, ঐ)* আর একজন বলছে "দেখছিস, বাবা-মাকে চা দেবার নাম করে ওরা নেমে আসার চান্স নিল, আর তুই সেটাই মাটি করতে চাইছিলি।" *(পৃ: ২২৪, ঐ)* কিন্তু অ্যাপ্লায়েড ফিজিকস্ 'গবেট' বলায় অত্যন্ত দুঃখিত গলায় জানাল সে আর ওই মেয়েটির সঙ্গে

কথা বলবে না। এটা শুনেই এক বন্ধু রাতে ওদের মধ্যে যেসব কথা হয়েছে সেগুলো ফাঁস করে দিল। "সেকেণ্ড ইয়ারের সায়েন্সের ছাত্রী, তুই তো কলকাতায় ফিরে গিয়ে ওকে ওদের বাড়িতে কোচ করতে যাবি বলেছিস।" *(পৃ: ২২৪, ঐ)* অ্যাপ্ল্যায়েড ফিজিকস্ রেগে কাঁচকলা দেখিয়ে "কোচ করবে না হাতি করবে।" *(পৃ: ২২৪, ঐ)* মেয়েরা চলে আসতেই বেচারা অপ্রস্তুতে পড়ে গিয়ে ইশারায় চুপ করতে বলল বন্ধুদের। কিন্তু ততক্ষণে হাসির রোল পড়ে গেছে। মেয়েরা হাসির কারণ জেনে ওই কনিষ্ঠা আবার গবেট বলে হাসিতে লুটিয়ে পড়ল। বরুণ রেগে গিয়ে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই ওই কনিষ্ঠা তাকে বলে উঠল "আরে, শুনুন শুনুন, সত্যি রাগ করেছেন নাকি?" *(পৃ: ২২৪, ঐ)* গম্ভীর গলায় না বলেও চলে যাওয়ার চেষ্টা করতেই মেয়েটি আবার তাকে সত্যিই গবেট বলাতে বরুণ চকিতে একবার তার দিকে তাকিয়ে চলে গেল। এবার মজাটা আর মজা রইল না, মেয়েটিও গম্ভীর হয়েছে। লেখক সহজভাবে, সাবলীল ভঙ্গিতে শ্রীমান শ্রীমতীদের হাসি-মস্করার মধ্যে মান-অভিমানের চিত্রটি তুলে ধরেছেন। রৌদ্রছায়া যেভাবে পাহাড় বনভূমির ওপর খেলে যাচ্ছিল সেই প্রকৃতির পরশই লেগেছে এই তরুণ-তরুণীদের মধ্যে। এই চিত্র দেখে কালকূটের মনে হয়েছে হয়ত হিমালয় থেকে নেমে ককলকাতায় গিয়ে এরকম আরো অনেক অঙ্ক অভিনীত হবে। এর সমাপ্তি ট্রাজেডি না কমেডি আছে সেটা ওদের নিয়তিই জানে কিন্তু কালকূটের মনটা "অসীম আকাশে ডিগবাজী খাওয়া পাখির মতো খুশিতে ভরে উঠল।" *(পৃ: ২২৫, ঐ)*

পরমেশবাবু ট্রে থেকে চা নিয়ে চিনি মেশালেন না। কাকলীর মা কাকলীকে গ্লাকসো দেওয়ার জন্য গরম জলের অপেক্ষায় আছেন। ওনার কামরায় নেই, নিশ্চয়ই গরম জল আনতে গেছেন। সবাই কিছু না কিছু খাচ্ছে, তাই কাকলীকে চকোলেট খাওয়ানোর জন্য কালকূট স্টেশন থেকে একটু দূরে গিয়েছিলেন। মারোয়াড়ী দোকানদার চকোলেটের প্যাকেট বের করতে দেরী করাতে দৌড়ে এসে ট্রেন ধরতে হয়েছিল। অমনি পরমেশবাবুর বকুনি বেআক্কেলে বলে। কাকলী লেখককে দেখতে পেয়ে খুশী হয়েছিল। আবার হারিয়ে গেলে ও কাঁদবে এই কথা শুনে সঙ্গী ভদ্রলোক বললেন "খুকু দেখছি হৃদয় সমর্পণ করে বসে আছে।" *(পৃ: ২২৫, ঐ)* "এখনো জগৎটা চিনে নিতে শেখে নি তো।" *(পৃ: ২২৫, ঐ)* একথা বলে ওর মা হাসল একটু লজ্জিত হয়ে। ভদ্রলোকও হাসলেন। কালকূটও বুঝতে পেরে গেলেন "মনে হল যেন, এই দুটিই ছোটোখাটো হাসির কথায়, অন্য কোনোখানে কিছু ঘটে গেল।" *(পৃ: ২২৫, ঐ)* লেখকের হাতে চকোলেটের প্যাকেট দেখে কাকলীর মত উতলা হয়ে উঠল। লেখক ইশারা করতেই মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমাকে দিতে বলে। মা তাকে নিতে বলে লেখকের কাছে জানতে চেয়েছিলেন "ওটা আনতে গিয়েই বোধহয় ট্রেন ফেল করেছিলেন।" *(পৃ: ২২৫, ঐ)* কাকলীর খুশীতে ছোঁ মেরে নিয়ে লেখকের কোলে নিবিড় হয়ে গেল। টুং স্টেশন পার হয়েই গাড়ির গতি কমে এল, মেঘের রাজ্যে যেন প্রবেশ করল। গাছপালা সবকিছু

ঢেকে গেল। "জীবনে এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম। মুহূর্তে কামরার লোকেরাও অস্পষ্ট হয়ে গেল! আলো জ্বলে উঠল। কিন্তু ঘন কুয়াশার মত মেঘ কামরার মধ্যে এসে ঢুকল। এক হাত দূরেও কিছু দেখা যায় না। মুখ এবং হাত ভিজে উঠল।" *(পৃ: ২২৬, ঐ)* সোনাদা এসে গাড়ি থামতেই অনেকেই কুয়াশা মাখার জন্য ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। কালকূটের অনুভূতি হল মরজগতের ওপারে কোনো এক অবাস্তব স্বপ্নের দেশে যেন এসে পড়েছেন। লেপচা ভাষায় 'সোনাদা' মানে হল ভালুকের গুহা। কোনো এককালে ভালুকের উপদ্রব ছিল। সোনাদা ছাড়িয়ে যাওয়ার পরই মেঘ উধাও, আকাশ ছোঁয়া বনস্পতিরা রৌদ্রস্নান করছে, হেমন্তের রোদের মত তার আমেজ। পরমেশবাবু অবশেষে তার দার্জিলিং-এ আসার রহস্য ফাঁস করলেন। তিনি এসেছেন প্রেমের রস দেখতে। প্রেম টগবগায় না পেট করকরায় সেটাই তিনি দেখতে এসেছেন। তারই মেয়ে তার অমতে কাগজের বিয়ে করেছে। ওই রেজিস্ট্রী বিয়ের ওপরে তার যত রাগ। কালকূট মানেন গমর্ণমেন্ট আইন বলে। এছাড়া লাভও আছে খরচ-খরচা বাঁচে। কালকূটের উত্তরে একটু থতমত হয়ে সেয়ানা বলে দিলেন। এবং কালকূটের প্রশ্নের উত্তরে নিজের মেয়ের কথা বললেন। "ওসব বাপ ভাই, কেউ কিছু নয়, বুঝেছি। প্রেমিকের হাত ধরে, দুটি সই দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে বেরিয়ে পড়তে পারলেই হল।" *(পৃ: ২২৭, ঐ)* "যাব, দেখব আর মুখের ওপর হেসে চলে আসব, বুঝেছ? প্রতিশোধ যাবে বলে।" *(পৃ: ২২৭, ঐ)* কালকূট পরমেশবাবুর বিক্ষুব্ধ মনটা বোঝার চেষ্টা করলেন। ওনার মুখের দিকে আর তাকাতে পারেন নি। তবে তার এই প্রতিশোধ স্পৃহাকে বড়ই নিষ্ঠুর বলে মনে হল। পিতৃহৃদয় কন্যার অদর্শনে দেখবার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু কন্যার অবাধ্যতা পিতা মেনে নিতে পারে নি। তাই ট্রেনের যুবক-যুবতীদের কথাবার্তা, আচরণ তিনি মেনে নিতে পারেন নি। কত ধানে কত চাল, তার হিসেব প্রেম দিয়ে হয় না। তিনি মেয়ের সেই প্রেমের বসতিই দেখতে যাচ্ছেন।

ঘুম স্টেশনে কুয়াশা দেখা মিলল তবে গাঢ় নয় পাতলা। আট হাজার ফুট উঁচুতে এই স্টেশন। দার্জিলিং এখান থেকে নীচে নেমে গেছে। হালকা কুয়াশায় ঢাকা ঘুমকে ধ্যান-মগ্ন গাম্ভীর্যে মৌন বলে লেখকের মনে হল। এই অপরূপ সৌন্দর্য লেখকের মনকে এক অচেনা রহস্যময় দরজায় পৌঁছে দেয়। এরপরে বাতাসিয়া লুপ চক্রাকারে ঘুরতেই রোদের আলো ছড়িয়ে পড়ল। 'কাঞ্চনজংঘা' চিৎকার কানে পৌঁছতেই ওপরে তাকিয়ে দেখতে পেলেন শ্বেত মর্মরের মত দু'তিনটি চূড়া। উত্তরের আকাশে নীলাম্বরের বুকে সাদা মেঘের মত, কিন্তু মেঘ নয়। "শুধু মৌন শ্বেতশির তুষারের বুকে হাল্‌কা নীল ও সবুজ ও হলুদের ছোঁয়া লেগেছে ভাঁজে ভাঁজে। কিংবা ঠিক যেন সে রং ব্যক্ত করতে পারিনে। ভাষার থেকে, শিল্পীর তুলিতেই হয়ত তার রঙের ব্যাখ্যা হয়। কাঞ্চনজংঘা! বাংলার সমতলের ছেলের চিরবিস্ময়ের চির আনন্দের, চির বাসনার।" *(পৃ: ২২৭-২২৮, ঐ)*

কিন্তু গাড়ি বাঁক নিতেই কাঞ্চনজংঘা হারিয়ে গেল। পরমেশবাবুর হাত দুটি কোলের ওপরে। ওনার মনে হল কাঞ্চনজংঘার মাথাটা যেন নড়ছিল। আর কাকলীর মায়ের চোখে জল, তার সঙ্গী বিব্রত, নতমুখে নখ খুটছেন। আর কাকলী বাইরের দিকে তাকিয়ে আনন্দে উদ্ভাসিত তার মুখমণ্ডল। 'পর্বতপুরের রাণী'ই হল দার্জিলিং শহর। কুইন অব দি হিল স্টেশনস্ দেখে একটি বেদনা আনন্দবিধুর অনুভূতি জাগরিত হল হৃদয়ে। কলকাতা থেকে রেলপথে যাত্রা শুরু হয়েছিল, শেষ হল দার্জিলিং স্টেশনে এসে। এবার সহযাত্রীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পালা। কাকলী কোঁচার কাপড় ধরে টানছে। ওর মা বললেন কাকলীকে বিদায় দিতে, নইলে ও যেতে পারছে না। লেখক ওর ফর্সা গালে একটু ঠোঁট ছুঁইয়ে আদর করলেন কিন্তু কাকলী হাসল না, গম্ভীর মুখে কালকূটের ধুলোমাখা গালে একটা চুমো দিল। কালকূটের হৃদয় চুইয়ে মর্মে প্রবেশ করল সে চুম্বন। কাকলী ওদের বাড়ী যাবার আমন্ত্রণ দিয়ে দিল। আর ওর মা ওরই সঙ্গে তাল দিয়ে "সত্যি আসবেন কিন্তু, ওর হয়ে আমিও বলে রাখছি। কী যেন রাস্তার নামটা?" *(পৃ: ২২৮, ঐ)* সঙ্গী ভদ্রলোক বলে দিলেন রাস্তা নয়, স্বর্গের সিঁড়ি, 'রূপকুমার হাউস' বললেই হবে। ম্যাল থেকে সোজা পোষ্ট অফিসের দিকে এলেই হবে। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন, বিবেকরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। কাকলী ওর নিজের নাম জানিয়ে দিল সুমিতা। ওর মা জানালো সুমিতা ভট্টাচার্য। ওরা চলে যেতে কুলিকে পথনির্দেশ দিতে গিয়েই পরমেশবাবুর গলা শুনলেন, কার্ট রোড ধরে তাকে পায়ে হেঁটেই যেতে হবে, গাড়ির ব্যবস্থা নেই। কালকূটের আবার দেখা হবে কথা শেষ করার আগেই পরমেশবাবুর উত্তর "না, এখানে আর দেখা হবে না। কালকের গাড়িতেই আবার ফেরত। তোমরা শৈলবিহার কর।" *(পৃ: ২২৮, ঐ)* ট্রেনযাত্রার সাথীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হল স্বপ্নের শৈলশহর দার্জিলিং-এ এসে। এতক্ষণ ধরে যে সব চরিত্ররা লেখকের আশেপাশে ভীড় করেছিল তাদের তিনি কীভাবে চরিত্রায়ন করেছেন, বিশেষ বিশেষ ক্ষণে তাদের বিশেষ মুহূর্তের অভিব্যক্তি কালকূট বাস্তবের তুলিতে অঙ্কিত করেছেন, সমকালের তরুণ প্রজন্মের কয়েকটি তরুণ তরুণীর মধ্যে দিয়ে তাদের বাক্যালাপ, চোখে চোখে ইশারা, হাসি, মান অভিমান ইত্যাদি তুলে ধরেছেন, বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে আগের প্রজন্মের মতভেদ, দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ, সব টুকরো টুকরো চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরে আলোচনা করা হয়েছে। তরুণ প্রজন্ম উচ্ছল, উদ্দাম কিন্তু আচরণে তা নয়। যৌবনের ধর্ম অনুযায়ী তারা চলেছে, কোনো নিষেধের ভ্রূকুটি তাদের জন্য নয়, পরোপকারের জন্য প্রস্তুত, আবার প্রেমের ইশারায় তারা বিহ্বল। তারা তাদের সংস্কৃতিকেও ভুলে যায়নি। নজরুলের সঙ্গীতের সঙ্গে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরে যেমন আনাগোনা তেমনি ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা কি প্যাটবুন্, বিদেশী সুরেও আনাগোনা। সেই ছোট্ট মেয়ে কাকলীর সঙ্গে সখ্যতা, তার মান-অভিমান সব মেঘ রৌদ্রের মতো চিত্রিত করেছেন। আড়চোখের চাউনির কী মহিমা, তিনটি প্রজন্মকে তিনি তিনভাবে দেখিয়েছেন।

পথিক তুমি কি পথ হারিয়েছো? কপালকুন্ডলার এই আহ্বান যেন তিনি শুনতে পেয়েছেন কাকলীর প্রথম কথার সঙ্গে। এমনি করেই কালকূট সারেন্ডারেঞ্জে বনমধ্যে বনপথে তৃপ্তি ভৌমিকের কথায় শুনতে পেয়েছেন একটা অদ্ভুত ধরনের মোহগ্রস্ততা। এতক্ষণ ধরে দার্জিলিং যাত্রাপথের মানবচরিত্রগুলোকে চিত্রায়িত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পথের সৌন্দর্য, বনপ্রকৃতির বিশাল বিশাল মহীরূহের সঙ্গে রঙবেরঙের ফুলের সমারোহ তার সঙ্গে মৌন মহান হিমালয়ের সঙ্গে মেঘ রৌদ্রের খেলা, মেঘের চাদরে ঢেকে গিয়ে ভিজে যাওয়া এগুলো চিত্রায়িত করেছেন। হিমালয়ের সঙ্গে গভীর আত্মিক টানে তিনি শৈলশহর দার্জিলিং-এ এসেছেন। এরপরে দার্জিলিং-এর সৌন্দর্য-প্রকৃতি ও মানবমন প্রকৃতি কীভাবে চিত্রায়িত করেছেন দেখা যাক।

কুলির পিছু পিছু রাস্তার ধারে ঘাস ছাওয়া পাহাড়ের ওপর দিয়ে এগিয়ে চললেন। 'ম্যাল'-এ পৌঁছতেই বিদেশী অর্কেস্ট্রার সুরে মেয়ে গলায় হিন্দি গানের সুর। পর্বতপুরের রাণীর বুকে 'ম্যাল' হল ইংরেজদের নিবিড় বেড়াবার পথ। এখন সেখানে ফ্যাশানের শো কেসে সাজানো বড় বড় দোকান, কোডাক আর গেভার্টের পণ্য বিজ্ঞপ্তিতে গোরা মেয়ের ফটো পোষাক আর বিদেশী খাবারের ছবি। রং বেরঙের শাড়ির ওপরে ক্লোক, ওভার কোট, টুপি চাপিয়ে মেয়েরা আর পুরুষরা প্যান্ট কোটটাই পরে ম্যালে উপস্থিত এই দ্বিপ্রহরেই। এরা ছাড়াও কিছু ছেঁড়া কোট, ছেঁড়া প্যান্ট, বিচিত্রদর্শন তালিমারা আলখাল্লা, কারো খালি মাথা, কারু মাথায় জীর্ণ টুপি, পাহাড়ী বর্ষায় আর পাথরে ক্ষয়ে যাওয়া জুতো পরা কিছু ভাবলেশহীন কিছু মুখ ও ম্যালের বেঞ্চিগুলো বসে আছে। লেখকের মনে প্রশ্ন– ওরা কী করছে? মহাকালের মতো চির উন্মুক্ত চোখ, গম্ভীর মুখে ওরা বসে আছে। ওরা কী এই নির্বাক বিস্ময়ে ম্যালের এই বিচিত্র লীলা দেখে থাকে? ম্যালের প্রাঙ্গন ছাড়িয়ে যেতেই পথ নিরিবিলি হয়ে গেল। সারি সারি কুটিরগুলোকে ছেলেবেলার ঝুলোনে সাজানো বাড়িঘর পাহাড়ের মত মনে হতে লাগল।

কুলি পাকা সড়ক ছেড়ে কাঁচা সড়কে নেমে একটা বাড়ির পাশ দিয়ে আরও পঞ্চাশ ফুট নেমে গেল। গেটহীন বাড়ীর উঠানে গিয়ে থামল। এটাই 'পপ্‌লার ভিউ'। ওদের অর্ভ্যথনা জানাল মধ্যবয়স্কা, নিরাভরণা এ দেশীয় মেয়েমানুষ। তামাটে মুখের ওপর শ্যাওলার মতো ছোপ ছোপ দাগ পড়েছে। তার পাশে একটা বছর বারোর একটি মেয়ে ফ্রকের উপর শাড়ি পড়েছে। টুকটুকে লাল, বোঁচা নাক কিন্তু কালো ডাগর দুটি চোখ। 'পপ্‌লার ভিউ'-এর মালিকের কথা অনুযায়ী এরাই রান্নাবান্না করে খাওয়াবে, খরচটা দিলেই সব ব্যবস্থা করে দেবে। মায়লী এখানকার কেয়ারটেকার। স্বামী সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পরে এখানে কেয়ারটেকার হিসাবে কাজ করত। স্বামী মারা গেছে, এখন পার্বতী ও প্রেমবতীকে নিয়ে থাকে। প্রেমবতী দেওভার ভবনে কাজ করে। ওখানে এক বাঙালী দম্পতি দেউদার ভবনে এসেছে, এটা ওদেরই বাড়ী। শুভেন্দু ও ললিতা।

শুভেন্দুর ছেলেবেলার বন্ধু শ্রীমন্তও এদের সঙ্গে থাকতে শুরু করেছে। মায়লীর ছেলে বউ সহ মায়লীর সঙ্গেই থাকে কিন্তু তারা মাকে দেখে না। দুজনেই কাজ করতে বেরিয়ে যায়, দারু খেয়ে মারপিট, হল্লাচিল্লা করে। এই হল মায়লীর পরিবার। দোতলা কুটির, টিনের চালে লাল রং করা। ওপরে নিচে সামনের দুটি ঘর হল কাঁচঘর, কাঁচের দরজা দুটো আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। বাড়ির সামনের দিকটা অর্ধচক্রাকার। সামনের বারান্দা ছাড়িয়ে পেছন দিকে অর্ধবৃত্তাকার লন আর বাগান। যত্নহীন বাগানে বিলিতি ফুল ফুটেছে অজস্র। বিচিত্র বর্ণে কালকূট মুগ্ধ। লনের শেষপ্রান্তে দুটি নাতিদীর্ঘ পপ্‌লার গাছ। কালকূটের গাছ দুটোকে দ্বারী বলে মনে হচ্ছে। ছোটবেলায় পপ্‌লার গাছকে বিদ্যা গাছ বলে জানতেন, এর পাতা বইয়ের পাতায় রেখে দিতেন। লনের পরে পাহাড়ের ঢালু খাদ নেমে গেছে। আরো নিচে উত্তরে পুবে সমতল ভূমি। ওটা লেবং। ঘোড়দৌড় হয় ওখানে। লালরঙের বৃত্ত আছে, ওটাই হয়তো ঘৌড়দৌড়ের সীমানা। "লেপচা ভাষায় 'আলি' শব্দের অর্থ জিহ্বা 'আবং' মানে মুখ থেকে। আলিবং, মুখ থেকে জিহ্বা, ইংরেজিতে লেবং দাঁড়িয়েছে। আমি বুঝতে পারি নে, কিন্তু পাহাড়ী মানুষের চোখে, লেবং এর সমতল মাঠ সম্ভবত মুখের বাইরে জিভের মতো দেখায়।" *(পৃ: ২২৯, ঐ)* কালকূট পপ্‌লার ভিউ-র বাইরে উপরে তাকাতে গিয়ে একটা কালো বিশাল মুখ দেখতে পেয়েছিলেন। মাথায় কিছুটা টাক, কিছুটা উস্কোখুস্কো ঘাড় অবধি চুল। বাড়ির মালিক আগেই বলে রেখেছিলেন যে একজন অতিথির দেখা পেতে পারেন, কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। ঘরের ভিতরটাও খুব সুন্দর, কালকূটের জিনিসপত্র বের করে সব সুন্দর করে গুছিয়ে দেওয়া হয়েছে ঘরের ব্যবস্থা দেখে বহুত আচ্ছা বলতেই পার্বতী বয়স্কা তরুণীর মতো লজ্জিত ও রক্তিম হয়ে উঠল। ও কালকূটের কাছে কাছেই ঘুরছিল এবং সংবাদ বাহক, অনেক খবরই পার্বতী কালকূটকে জানিয়েছিল। মায়লীও বাদ যায় নি সংবাদ দেওয়া থেকে। মায়লীর কথায় জেনেছিলেন ওপরের বাবু চিত্রশিল্পী, একুশ দিন হল এসেছেন। সারাদিন গোল্ডি খায় আর ছবি আঁকে। বিবিজীর সঙ্গে মারপিট, ঝগড়াঝাটি হয়।

পপলার ভিউ-এর কাঁচের জানালার কাছে হিমালয়ের সৌন্দর্যকে দেখতে দেখতে গভীর এক মন্ত্রমুগ্ধতায় ডুবে গেলেন। পাহাড়ের শীর্ষে রোদের খেলা, দূরে চা-বাগান, লেবং-এর ঘোড়দৌড়ের মাঠ, ঘরের চালা সব কুয়াশায় ডুবে যাচ্ছে। আর পপলার ভিউ-এর লনে রোদে ঘাস চিক চিক করছে, ফুলে ফুলে প্রজাপতিরা উড়ে বেড়াচ্ছে, ঝিঁঝিঁ ডাকছে — তবুও চারিধার অসীম নীরবতায় ডুবে যাচ্ছে। এমন সময়ে প্রেমবতী ও পার্বতী এল। প্রেমবতী দুঘণ্টার ছুটিতে এসেছে পার্বতী জানাল। প্রেমবতী কাপডিশ নিয়ে গেল কিন্তু পার্বতী কৈফিয়তের সুরে জানিয়ে দিল যে সেই নিয়ে যেত কিন্তু দিদি এসে নিজেই নিয়ে গেল। কালকূটের সঙ্গ ছাড়ল না। তার যে কোন কাজ করে দেবার জন্য সে প্রস্তুত। কালকূট বুঝেছেন অতিথিকে আপ্যায়ন করার থেকেও পার্বতীর ছেলেমানুষি

মনে উৎসাহের আধিক্য বেশী। পরিশ্রমটা ওর কাছে আনন্দের। ''ধাক্কা দিস না লক্ষ্মীটি পড়ে যাব'' *(পৃ: ২৩২, ঐ)* নিখুঁত বাঙালী কলকণ্ঠে কালকূট ওপরে তাকাতেই দেখতে পেলেন তিনটি রং বেরঙের শাড়ি প্রজাপতির মত উড়তে উড়তে নেমে আসছে কল কল করতে করতে। কালকূট ওদের চমকে দিতে ঝাঁকাটি না দিয়ে ঘুরে নেমে আসতে বললেন। সেই তিন শ্রীমতীরা পপলার ভিউয়ের মাথার উপরে রূপকুমারীতে এসে উঠেছে। পপলার ভিউয়ে আসার সময় ওই বাড়ীটির পাশ ঘেঁষেই এসেছিলেন। কালকূট একটু এগিয়ে ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন। রূপকুমারী থেকে পপলার ভিউ-এর সৌন্দর্যে ওরা নীচে নেমে এসেছিল। লন দিয়ে আসার সময় মেজ শ্রীমতীকে জোঁক ধরাতে তীব্র চিৎকারে সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। পার্বতী তাড়াতাড়ি জোঁকটা টেনে ছাড়িয়ে দিয়ে ওদের কান্ড দেখে হাসতে লাগল। পার্বতী ওদের দেখে অবশ্য প্রথমে খুশি হয়নি। ওরা কে? কেন এসেছে? কালকূট ছোট পার্বতীর হৃদয়ে ডুব দিয়েছেন। ছোট বলেই এত জানবার আগ্রহ। মা বাজারে গেছে, সেই তো এখন কর্ত্রী, অতএব কালকূটের দেখভালের দায়িত্ব তার। জোঁকটা তেমন করে ধরতে পারার আগেই পার্বতী ছাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপরে ওরা নিজেদের কান্ডে জোরে জোরে হাসতে লাগল। প্রেমবতী পার্বতীও যোগ দিল সেই হাসিতে। ওরা পপলার ভিউয়ের ভেতরের ব্যবস্থা দেখে খুশিতে অভিভূত। মল্লিকা, মালতী দুই বোন। ইভা ওদের মাসতুতো বোন। বরুণকে যে গবেট বলেছিল তারই নাম যে ইভা এটা কালকূট আগেই জানেন। কার্শিয়াং-এর কথা যে কালকূট চা খেতে খেতে শুনে ফেলেছিলেন এটা জেনে ওরা খুব লজ্জিত হল। এবং জানাল যে এখনও মান ভাঙানোর চান্স পায়নি ইভা। ''দ্যাখো বড়দি, ইয়ার্কি করো না বলছি তাহলে আমি সব ফাঁস করে দেব।'' *(পৃ: ২৩৫, ঐ)* ইভার উক্তি। কালকূট জানতে চাইছেন ''উহুঁ ফাঁস করবার কিছু দরকার নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে উঠেছে কোথায় সে কথা কিছু বলেছে? অনেক দূরে নাকি?'' *(পৃ: ২৩৫, ঐ)*

কালকূটের কথায় তিনজনেই হঠাৎ লজ্জা সঙ্কোচে বোবা হয়ে গেল, ভালো করে তাকাতেই পারল না। কালকূট তিনটি যুবতী কন্যার ভেতরটা দেখতে পেলেন। একটা তীব্র হাসির বেগ চাপতে চাপতে হঠাৎ ফেটে পড়ল। সবাই যোগ দিল সেই হাসিতে। ওরা তাড়াতাড়ি চলে গেল। কালকূট দু'দিন পাহাড়ের রূপসৌন্দর্য সুধা পান করতেই নিজেকে মগ্ন রাখলেন। উত্তরের দিগন্ত অটুট। পার্থিব খাজাঞ্জিখানার দরজাও খোলেনি। কালকূট কোথাও যাচ্ছেন না দেখে পার্বতী ব্যস্ত।

'' 'মলে সবাই বিদেশীরা বেড়াতে যায়। আপনি কি মল চেনেন না?' *(পৃ: ২৩৫, ঐ)*

'ওরা আসবে বুঝি, তাই কোথাও যান না?' *(পৃ: ২৩৫, ঐ)*

'রূপকুমারীর দিদিদের তোমার ভালো লাগে না, না?' *(পৃ: ২৩৫, ঐ)*

'পার্বতী খালি আপনার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনাকে নিশ্চয় বিরক্ত করছে?' *(পৃ: ২৩৫,*

ঐ) 'পার্বতী বেশী জ্বালাতন করলে ধমকে দেবেন বাবু। ছেলেমানুষ আপনার কাছে একটু আশকারা পেয়েছে তাই বিরক্ত করতে সাহস পায়।' *(পৃ: ২৩৫, ঐ)*

কালকূটের সৃষ্ট চরিত্র দুটির মধ্যে কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কালকূট ও পার্বতীর সম্পর্ক। কালকূট বলেছেন "আমার এই নির্জন নিবিড়তার মধ্যে যদি মাঝে মাঝে পার্বতীর আবির্ভাব না ঘটত তবে হয়ত তার ছন্দ নষ্ট হত। এই নির্জনতায় যে এক হাহাকারের অস্তিত্ব আছে, সে হাঁ করে ছুটে আসত।" *(পৃ: ২৩৬, ঐ)* কালকূট পার্বতীর মুখ দিয়ে সেই সত্য কথাটা বলিয়েও নিয়েছেন— মলে শুধু বিদেশীদের ভীড়। বাইরের লোকই তো আনাগোনা করে মলে। কালকূটের চোখে এই সারল্যের মধ্যে একটা অচেনা ব্যথার ছায়া ভেসে উঠেছে। ওদের জন্য মল নয়।

দুদিন বাদে সকালে বাইরে যাবার প্রস্তুতি দেখে পার্বতীর প্রশ্ন — কোথা যাবেন? বেশী দেরী হবে কিনা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। কালকূটের সঙ্গে সে ম্যালে যেতে রাজি হল না কিন্তু প্রস্তাবে খুশী হল। কিন্তু বেরোনোর মুখে সেই শিল্পী ভদ্রলোক কালকূটকে ডাকতে ডাকতে নীচে এলেন। কালকূট যে লেখক সেটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। তিনি কালকূটের দু'একটা লেখা পড়েছেন। এতে কালকূট নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করলেন। কালকূটের প্রশ্ন ছিল যে উনি আঁকতেই ব্যস্ত কিনা। এই প্রশ্নের উত্তরে রক্তিম বড় বড় চোখে স্বপ্নের ঘোর এনে "ব্যস্ত? আমি আর কী জানি? শুধু আঁকতেই জানি, বসে থাকতে পারি না। জীবনটা তো নষ্ট হয়ে গেল, আর তো কিছুই জানলাম না, দেখলাম না।" *(পৃ: ২৪০, ঐ)* কালকূট শিল্পীর যন্ত্রণাবোধকে নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন। কালকূটের সঙ্গে আগেই অর্থাৎ পপলার ভিউয়ে আসার পরদিন সকালে লনে শিল্পী দম্পতির দেখা মিলেছিল। কালো অলেষ্টার গায়ে, অত্যন্ত চওড়া ভ্রূ, রক্তিম কোটরাগত ছোট ছোট চোখ কিন্তু সে চোখে বিরক্তি আর দম্ভ মেশানো। তারই বিপরীত স্ত্রীলোকটি। "একহারা ফরসা দীর্ঘ দেহিনী যুবতী মহিলার সর্বাঙ্গে একটা খোঁচানো ঔদ্ধত্য আর তীক্ষ্ণতা ছিল, মনে হয়েছিল স্থূল ভারী গলার পাশে সুদীর্ঘ ঝকঝকে সুর তরবারি।" *(পৃ: ২৪০, ঐ)* ভদ্রমহিলার আচরণ কালকূটের কেমন যেন অশ্লীল ও অভব্য বলে মনে হচ্ছিল। এই শীতে নীলশাড়ি হাতকাটা ব্লাউজ, কোট খোলা জামা পরিহিত। উলের স্কার্ফ কাঁধে ফেলা। চোখ কালকূটের দিকে কথা শিল্পীর সঙ্গে। অঙ্গভঙ্গি শ্লীল নয়। পপলার গাছে কাছেই লেখকের সঙ্গে নমস্কার বিনিময়, কথাবার্তা। নাম পরিচিতি।

'অ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আঁকি।' *(পৃ: ২৩৭, ঐ)*

'গণেন, গণেন সেন।' *(পৃ: ২৩৭, ঐ)*

নিজের নাম বলে কালকূটের নামটি জেনে বললেন "ও, তাই নাকি? ঠিক আছে।" *(পৃ: ২৩৭, ঐ)* কালকূটের ওনার কথা বলার ঢঙ ভারী অদ্ভুত লেগেছিল। "ও কে যতটা নিরেট, গদার মতো ভারী

আর ভাবলেশহীন মনে করেছিলাম, কথা তা একেবারেই নন। কথা খুব তাড়াতাড়ি বলেন। ঘন ঘন ভ্রূ কুঁচকে উঠছিল। কাছাকাছি হতে দেখেছিলাম, মুখের সমস্ত রেখাগুলো যেন প্রতিমুহূর্তে কাঁপছিল। উনি পুব দিকে মুখ ফিরিয়ে নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন।" *(পৃ: ২৩৭, ঐ)* ওনাকে দেখে কালকূটের আর আগের দিনের মত লাগছিল না। তাঁর মন শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে ভরে উঠেছিল। চিত্রকলা প্রেমিক হিসাবে গণেন সেন সম্পর্কে কালকূটের মনে একটা কৌতূহল ছিল। তাঁর আঁকা তাঁকে কল্পনার জগতে নিয়ে গেছে, সেই শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছিলেন। জগৎ ভুলে আছে শিল্পী, অন্যমনস্কতা তাঁর ভূষণ। গণেন সেনের পিছনে ভদ্রমহিলা অবজ্ঞামিশ্রিত বিদ্রূপ ও টেপা হাসিতে দেখছিলেন গণেন সেন কে? ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন না, তাঁর পাশে যে কেউ আছে সেটা যেন আর খেয়াল নেই। ভদ্রমহিলা বারে বারে নীচে যাওয়ার কথা বলছিলেন। "ডাকলে জবাব দাও না কেন বলতো? নিচে যাবে একটু?" *(পৃ: ২৩৭, ঐ)* শিল্পী রাজি নয় যেতে। তাই ভদ্রমহিলা হাত ধরে টান দিয়েছিলেন। শিল্পী ঝাঁঝিয়ে নিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। আর ভদ্রমহিলা আতঙ্কে "ওরে বাবা! এত জোরে ধাক্কা দিয়েছ, পড়ে যাচ্ছিলাম আর একটু হলে।" *(পৃ: ২৩৭, ঐ)* কালকূট মহিলার কান্ড দেখে থ হয়েছিলেন। মহিলা কালকূটকে দেখিয়েই পেছন থেকে গণেন সেন কে জিভ ভেংচে খিলখিল করে হাসছিলেন।

ওদের এই আচরণ পার্বতীর চোখের সামনে ঘটেছিল। পার্বতী খুব অসন্তুষ্ট। কালকূটের কাছে উনি খুব বড় মানুষ জেনেও তাঁর এই আচরণ মেনে নিতে পারে নি। "বড় আদমি হুই! তো দারু কিনো পিতা? মারপিট কিনো করতা?" *(পৃ: ২৩৭, ঐ)* কালকূটের কাছে এ প্রশ্নের জবাব ছিল না, শুধু ওকে বলেছিলেন উনি একজন বড় মানুষ। ওঁরা নিচের দিকে চলে গিয়েছিলেন। তার দু'দিন পরে আবার এই দেখা। ভদ্রমহিলাও শিল্পীর পেছনে ছিলেন। লেখক নমস্কার করতেই উনি প্রতি নমস্কার করলেন হাত দুটি কপালে তুলে, একদম লতিয়ে গেলেন। লেখক শিল্পীর সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চেয়েছিলেন কিন্তু কিছুই জানা হল না। ক্ষতটা ঢেকে তাড়াতাড়ি নিচের দিকে চলে গেলেন। কালকূটের মনে হয়েছে "এই দূর উত্তরের জীবনের পরম ঐশ্বর্যের মতোই নিশ্চুপ নির্বিকার। কখন তার দরজা সহসা খুলে যাবে, কেউ জানে না।" *(পৃ: ২৪১, ঐ)*

দুদিন পরে উত্তরের দরজা খুলেছিল। "খাজাঞ্চিখানার দুই শীর্ষ আকাশের উত্তরে ঝলকাচ্ছে। হয়তো সোনা ও রূপোর খাজাঞ্চিখানা দুটি। আকাশের সকল বাধা বিদীর্ণ করে একেবারে বেরিয়ে পড়েছে।" *(পৃ: ২৪২, ঐ)* উত্তরের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কালকূটের চোখে দেখা মানুষগুলোর মনপ্রকৃতির দরজাও খুলে গিয়েছিল। যা ছিল অস্পষ্ট তাই প্রকাশিত হতে থাকল। ক্রমে এগুলো করা হবে। প্রথমে গণেন সেনের আলোচনাই শেষ করা যাক। ঘৌড়দৌড়ের দিন গণেন সেনের

ঘরে ছবি দেখতে গিয়েছিলেন। "শায়া শাড়ি ব্লাউজ পায়জামা পাঞ্জাবি, মদের বোতল, ছবি, ইজেল, রঙের টিউব, আর কতগুলো আঁকা ক্যানভাস সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য দৃশ্য।" *(পৃ: ২৪৬, ঐ)* ওই মহিলাকে সাত বছর আগে শিল্পী আস্তাকুড় থেকে তুলে এনেছিলেন মডেল হিসাবে। রমলার অনেক ন্যুড ছবি আছে। কেউ কাউকে ছাড়তেও পারেন না, সহ্য করতেও পারেন না। কালকূটের চোখে শিল্পীর জীবনবোধের দৃশ্য ধরা পড়ল। কী অসহায় এই শিল্পীর জীবন। কেন রমলার আচরণ ওইরকম অশ্লীল লেগেছিল সব স্পষ্ট হয়ে যায় যে খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলো তুলে ধরে আলোচনা করা হল। এক অদ্ভুত ঘৃণা ও আকর্ষণকে কালকূট একজন শিল্পীর জীবনযন্ত্রণাকে তুলে ধরেছেন পাঠককুলের সামনে। সঙ্গে তিনি মডেল রমলাকে অদ্ভুতভাবে তুলে ধরেছেন। মারামারি করে তারা দুজনেই লেবং-এ ঘৌড়দৌড়ের মাঠে চলে যায় আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে। ম্যাল যাওয়ার মুখে গণেন সেনের ডাকে এই কাহিনীর ঘটনাবলীর আলোচনা গণেন সেনকে নিয়েই করা হল। এরপর পরে কালকূট ম্যাল-এ যাওয়ার সময় রূপকুমারীতে গিয়ে শুনলেন শ্রীমতীরা কেউ নেই। ম্যাল থেকে সরে গিয়ে জলা পাহাড়ের নির্জনতার দিকে চলে গেলেন লেখক। মেঘে মেঘে চারপাশটা ঢেকে যাচ্ছে হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের শব্দে কল্পনা থেকে জেগে উঠলেন। তিন শ্রীমান ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। ওদের সঙ্গে কথা হতেই ওরা জানাল যে বিকেলে তারা কালকূটে পপলার ভিউতে যাবে। কথা বলতে না বলতেই তিন শ্রীমান ঘোড়ার পিঠে থেকে নেমে পড়ল। একসঙ্গে ছয়টি প্রজাপতি যেন কালকূটের সামনে মুখরিত হয়ে উঠল। মল্লিকা আলাপ করিয়ে দিল হীরেনের সঙ্গে, বি. ই. কলেজের ছাত্র। আর বিজয়ের নামটাও উচ্চারণ করতে আটকে গেল। বিজয় নিজেই পরিচয় দিল। মাউথ অর্গান, গীটার আর পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ে বেড়ায় এবং শেখায়। কালকূটের বুঝতে বাকি থাকে না মল্লিকার পাপড়িতে পাখার ঝাপটা দিচ্ছে বিজয়ই। আর বরুণকে পরিচয় দেবার আগেই কালকূটের প্রশ্ন অ্যাপ্লায়েড ফিজিকস্ এ কোন ইয়ার। কালকূট জানতে চেয়েছিলেন ইভা আর গালাগালি দেয় কিনা। এই নিয়ে বরুণ ইভার খুনসুটি চলতেই লাগল। প্রতিদিনই নাকি বরুণ ইভার কোনো না কোনো কিছু নিয়ে ঝগড়া হবেই। বরুণ অ্যাপ্লায়েড ফিজিকস্ নিয়ে পড়ছে, ও একটা শিক্ষিত মিস্তিরি, কারণ ইঞ্জিনিয়রের উপরে কোনোদিনও উঠতে পারবে না। ইভার এক দাদার এই অবস্থা হয়েছে। তর্কাতর্কি চলতেই লাগল। "আমার দাদার মাথায় কিছু নেই, আর আপনার ওই নিরেট মাথায় আছে?" *(পৃ: ২৪২, ঐ)* ব্যস। ইভার মুখে নিরেট শুনেই বরুণ রেগে গেল। ইভাও কয়েকবার ওই কথাই বলতে লাগল। বরুণ ঘোড়ার পিঠে উঠে হোটেলে চলে গেল। ইভার ছলো মুখে "দেখলেন তো কীরকম ব্যবহার, এখন আর আমার সঙ্গে দেখা হলেও কথা বলবে না।" *(পৃ: ২৪২, ঐ)* কালকূট তুলে ধরেছেন আঠারো উনিশ বছর বয়সের মেয়ের প্রজাপতির মতো উড়ু উড়ু মনটা। মাত্র কদিনের আলাপেই বরুণের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন নিবিড়

হয়ে গেছে। কালকূট এই সম্পর্কের মধ্যে হৃদয়ের সৌন্দর্য খুঁজে পেলেন। কালকূট তাই বললেন বিকেলে পপলার ভিউয়ে সব মিটে যাবে। তখনই ইভা নির্দেশ করল উত্তরের খাজাঞ্চিখানা খুলে গেছে। বন্ধ দুয়ার খুলেছে। ইভাও চলে গেল ওদের দলের কাছে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে এই হিমালয়ের কোণে। ওখান থেকে ম্যালে ফিরে আসতেই কাকলীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ মান অভিমানের পালা চলল। কাকলীর মা সুমিতা আর বিবেকবাবু ছাউনির নিচে বসেই কাকলী ও লেখকের মান অভিমানের পালা দেখছিলেন। কাকলীর মায়ের অনুরোধেই ওরা যেখানে উঠেছে সেখানে গেলেন। গিয়ে দেখেন আর এক নাটক অপেক্ষা করছে। কাকলীর বাবা সুবীরবাবু এসে দাঁড়িয়ে আছেন। সুমিতা অপ্রস্তুত। কাকলীর ডাক বাবা শুনতেই পেলেন। কালকূটকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে সুমিতা ভেতরে চলে গেল। বুঝতেই পারলেন গুরুতর ঘটনা ঘটতে চলেছে, তাই কালকূট চলে যেতেই চাইলেন। কিন্তু চা না খাইয়ে ওরা ছাড়ল না। বাবার মাথা ধরেছে বলে কাকলীকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন, এবং ওইজন্য উনি কালকূটের সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না। চা খেয়ে বিবেকবাবু কালকূটকে এগিয়ে দিলেন। বিবেকবাবু উত্তরের খাজাঞ্চিখানার দরজা খুলে দিলেন। সুমিতা বিবেক কলেজের বন্ধু ছিল। সুবীর এসে যাওয়া মাত্র ওদের প্রেম ভেঙে যায়। সুবীরকে যত তাড়াতাড়ি বিয়ে করেছিল, তত তাড়াতাড়িই প্রেম ভেঙে গিয়েছিল। এখন সুবীরের মধ্যে অবিশ্বাসের জন্ম নিয়েছে। তার সন্দেহ অমূলক নয়। নিজের চোখে এসেই তা দেখেছে। কিন্তু সুমিতা-বিবেকের সম্পর্কে কোনো কলুষতা নেই। এটা সুমিতা ও বিবেক আলোচনা করেছে। এককালে ভালবাসার অনুভূতি মনকে উদাস করে ঠিকই কিন্তু এর বেশি কিছুই নয়। এছাড়া বিবেক একটি গ্রাম্য মেয়েকে ভালবাসে, সেকথা সে সুমিতাকে বলতে পারে নি, এটা তার কাছে পাপ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তবুও পারেনি তাই লেখককে বলে গেল। বিবেকবাবু একটু পরেই চলে যাবেন এমনিই ঠিক হয়ে আছে। সুমিতা-বিবেকের সঙ্গে কোনো অবৈধ সম্পর্ক নেই তবুও সুবীর-সুমিতা ডাইভোর্সটা দরকার। বিবেকবাবু চলে গেলেন। বিবেকবাবুর কথা শুনে কালকূট স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পুরো ঘটনাটা ভাবতে শুরু করলেন। সুমিতার কী অসহায় অবস্থা। উত্তরের দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেছে।

একদিন সকালে পরমেশবাবুর সঙ্গে ম্যাল-এ দেখা হয়ে গেল। আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া, কালকূট তাই চিনতে পারেন নি। কালকূট পরমেশবাবুকে চিনতে পারেন নি সেটাও অভিযোগ। পরদিনই তিনি ফিরে যাননি কারণ মেয়ে জামাইয়ের কাছে কদিন থেকে মজাটা দেখে নিতে চান। কালকূট চমকে গেলেন কথাটা শুনে। তারপরে কালকূটকে তার মেয়ের বাড়ি নিয়ে গেলেন। "মেয়ে-জামাইকে দেখে মনে হল, ধরণীর এককোণে দুটি সাধারণ কিন্তু অসাধারণ সুখী মানুষ এসে

বাসা বেঁধেছে। বাংলাদেশের মণিমুক্তোগুলো অ-সাজেতেই সাজানো যেন।" *(পৃ: ২৪৬, ঐ)* জামাইয়ের মধ্যে আত্মমর্যাদার একটি গাম্ভীর্যের ছাপ আছে। বাবা রাজ্যের বাজার করে এনেছে দেখে মেয়ে রাগ করছে দেখে পরমেশবাবু বলছেন "তা কী হয়েছে। অমন করছিস কেন খুশি। কনক খেতে ভালবাসে। তা জামাইয়ের জন্যে আনব না, কী বল হে? আজ যদি কলকাতা হত?" *(পৃ: ২৪৬, ঐ)* মেয়েকে আরও বলছেন "তোর মায়ের মতো কথা বলছিস্। কিন্তু কতকাল বাজার-টাজার করতে পাই নি, সেটা দ্যাখ।" *(পৃ: ২৪৬, ঐ)*

"দ্যাখ। ভাল্লুকটা বোধহয় উঠলো, আমার কাছে নিয়ে আয়।" *(পৃ: ২৪৬, ঐ)* উপরের যে কথাগুলো তুলে ধরা হয়েছে তা থেকে পিতা-পুত্রীর হৃদয়ের সম্পর্কটা বোঝা যায়। হৃদয়ের জমানো ব্যথাটা কখনও ধরা গলার মধ্য দিয়ে কখনও চোখের জল হয়ে বেরিয়ে এসেছে। আর দৌহিত্রকে কোলে নিয়ে স্নেহ স্নিগ্ধতায় দু'চোখ ভিজে উঠেছে। সবই প্রত্যক্ষ করেছেন কালকূট, দর্শককেও প্রত্যক্ষ করিয়েছেন কথাকার আপন শৈল্পিক দক্ষতায়। এক দরিদ্র দম্পতি আর স্নেহকাতর পিতাকে তুলে এনেছেন হিমালয়ের প্রাঙ্গনে আশ্চর্য কোমলতায়। এই কাহিনীতে কাঞ্চনজংঘার রং বেরঙের আলোর ঝলকানির মত পরমেশ বাবুর জীবনচিত্র অঙ্কিত করেছেন। যা বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে পরমেশবাবুকে অনন্য এক মহিমায় পৌঁছে দিয়েছেন। যেদিন সবাই ঘৌড়দৌড় দেখতে গেল সেদিন হঠাৎ পার্বতী ডেকে নিয়ে লেখককে বলল "বাবুজী তাড়াতাড়ি আসুন। মা দিদিকে মেরে ফেলছে।" *(পৃ: ২৪৬, ঐ)* কালকূট গিয়ে থামালেন কিন্তু মায়লী বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল যে, প্রেমবতী সর্বনাশ করেছে, ও বাচ্চা হোনেবালী। সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। কালকূট চম্‌কে উঠে জানতে চাইলেন ঘটনাটা। শুভেন্দু প্রেমবতীকে শ্রীমন্ত ও ললিতার ওপর নজর রাখতে বলেছিল। কিন্তু সেই কাজ করতে করতেই প্রেমবতী স্ত্রীর দ্বারা প্রতারিত একজন মানুষের প্রতি সহৃদয় হয়ে শুভেন্দুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। শুভেন্দুকে মানসিক শান্তি দিতে গিয়ে প্রেমবতী এই মাতৃত্ব ডেকে এনেছে। কালকূট প্রেমবতীর সারল্যে পূর্ণ হৃদয়ে দৃষ্টি দিয়েছেন। প্রেমবতী যে নিজেই করুণার পাত্রী হয়ে গেছে! মায়লী পঞ্চায়েত ডেকে এনেছিল, গুরখা লীগের কয়েকজন সদস্যও ছিল। শ্রীমন্ত ও ললিতা প্রচণ্ড ঝগড়া করল, শুভেন্দুকে কিছুই বলতে দিচ্ছিল না কিন্তু শুভেন্দু সবাইকে অবাক করে দিয়ে পিতৃত্ব স্বীকার করেছিল। ললিতা ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। "কোন্‌টা কার কাজ, তা সেই বলতে পারে, কাজটা যে করেছে।" *(পৃ: ২৪৭, ঐ)* একথা শুভেন্দু স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে। বিয়ে সে করতে পারবে না কিন্তু প্রেমবতীর সন্তানের মানুষ করার দায়িত্ব তার। সে প্রেমবতীকে দু'হাজার টাকা দিতে চায়। পঞ্চায়েত শুভেন্দুর দাবি মেনে নিয়েছিল। কালকূট পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেন নি। তিনি দেখেছেন "শুভেন্দুর চোখে আমি একটি বিচিত্র আলোর ঝলক দেখেছি। সেটা বোধহয় তার অবরুদ্ধ হতাশ পিতৃত্বের ঝলক!

প্রেমবতীকে কি সে চিরদিন ছেড়ে থাকতে পারবে?" *(পৃ: ২৪৭, ঐ)* তার মনের প্রশ্ন পাঠককুলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। একমাত্র সময়ই বলতে পারবে এর শেষ পরিণতি কি! হিমালয়ের প্রাঙ্গনে এসে বিচিত্র এই মানবমনের লীলাখেলা প্রত্যক্ষ করলেন কালকূট। বারো বছরের বিবাহিত জীবনে নিঃসন্তান শুভেন্দুর স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে তার রক্তের পিতৃত্বের গৌরব ও ব্যথা, তার সন্তানের জননীর জন্য। যাকে সে মর্যাদা দিতে পারবে না, সমাজ বন্ধনে আবদ্ধ সে!

একে একে হিমালয়ের প্রাঙ্গনে এসে মানবজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। বুঝেছেন সমতলের মানুষের সঙ্গে পাহাড়ের মানুষের চিন্তাধারার প্রভেদ। সমতলের মানুষগুলো পাহাড়ের সংস্পর্শে এসে কেমন বদলে যায়, পরিবেশ কেমন করে ক্রিয়া করে। কাঞ্চনজংঘার দরজা বেশীক্ষণ খোলা থাকে নি, কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখা দেয় দর্শনার্থীদের। সারাদিন ঘষা কাঁচের মত ধূসর আকাশ ভাবলেশহীন হয়ে থেকেছে। তিব্বতীদের ভাষায় কাং-ছেন-দ্-জাং-গা, যার থেকে আমরা উচ্চারণ করি কাঞ্চনজংঘা। কাং-ছেন-দ্-জাং-এর বাংলা মানে হল 'বরফ্-বড় খাজাঞ্চিখানা পাঁচ।' সবচেয়ে উচ্চতম শিখরটি সূর্যাস্তের রক্তিম ছটায় সোনার বর্ণ ধারণ করে বলে তাকে সোনার খাজাঞ্চিখানা বলে। দক্ষিণের চূড়া সূর্যোদয়ের আগে পর্যন্ত ধূসর, সূর্যের ঝলক লাগলেই সে রূপোলী হয়ে যায়, তাই সে রূপোর খাজাঞ্চিখানা। বাকী তিনটি চূড়াকে বলা হয় রত্ন, শস্য আর অস্ত্রের খাজাঞ্চিখানা। কাঞ্চনজংঘার পাশে আর একটি শিখরের নাম পানদিম মানে রাজমন্ত্রী। কালকূট হিমালয়ের কোলে এসে যাকে দেখার জন্য এত দুর ছুটে এসেছেন সেই কাঞ্চনজংঘা সম্পর্কে পাঠককুলকেও জানিয়ে দিলেন।

মানুষ অরণ্যে, পর্বতে সমুদ্রে নদীতে বিশ্বপ্রকৃতির সকল কিছুর মধ্যে জীবনের অর্থ খুঁজেছে, এইজন্য মানুষ এমন বিচিত্র, এমন মহৎ। তার তৃষ্ণার্ত হৃদয়কে অপার্থিবের সন্ধানে ব্যাপৃত রেখেছে। পাঁচ খাজাখানায় একক মহারাজের দর্শনের জন্য কালকূট এই হিমালয়ের অঙ্গনে এসেছেন। কিন্তু তিনি বড়ই কৃপণ, মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়েই দরজা বন্ধ। চোখ মেলে দেখবার আগেই তিনি নির্বিকার মহাকালের মতো। এই ক্ষণকালের তরে দেখা না দেখার মধ্যেই দার্জিলিং-এর দিনগুলি কাটছিল। মাঝে মাঝেই তিন শ্রীমান শ্রীমতী প্রজাপতির মতো কালকূটের বার্চহিলের রোডের বাড়ীতে গুঞ্জন তুলে যাচ্ছে। ইভা-বরুণ যথারীতিই তাদের তালে বাজছে। ঐ কাঞ্চনজংঘার মতো কখনও রৌদ্রের আলোয় সাতরঙ ছড়াচ্ছে কখনও একেবারে গম্ভীর মুখে ধূসর দরজার আড়ালে মুখ লুকিয়ে মজা করছে। কালকূট লক্ষ করেছেন ওই দলে সব থেকে প্রাণবন্ত আর সরল। সেই সরলতায় যোগ দিয়েছে আরও একজন। সে হল পার্বতী, ওদের সুরে সুর মিলিয়ে আতিথেয়তা করে। কলকাতা ফিরে যাওয়ার দুদিন আগে ম্যালে সুমিতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কাকলী দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল কূলকূটকে। কালকূট তাকিয়ে দেখলেন দার্জিলিং-এর সৌন্দর্য

সুমিতার মুখের রক্ত শুষে নিয়েছে। কালকূট তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনেক কিছুই বুঝে গেলেন। হিমালয়ের অঙ্গনে প্রকৃতি সমভাবে প্রভাব ফেলেছে সুমিতার মনে। ওই ছোট্ট শিশু কাকলীর মনেও বিষণ্ণতার ছায়া পড়েছে। ওর বাবীন সেদিনই চলে গেছে সেটা কাকলী কালকূটকে জানিয়ে দিয়েছে। বাবীনের সঙ্গে সে গেল না কেন এটা জানতে চাওয়ায় সে কালকূটকে বলল 'বাবীন আমাকে হোতেলে নিয়ে দেতে তেয়েছিল।'

বললাম, 'গেলে না কেন?' *(পৃ: ২৪৭, ঐ)*

কাকলী গম্ভীরভাবেই জবাব দিল, 'মা দায় নি।' *(পৃ: ২৪৭, ঐ)*

'মা নাই-বা গেল। তুমি তো বাবীনের কাছে যেতে পারতে।'

কাকলী একটি বড় মেয়ের মতো দূরের দিকে চেয়ে বলল, 'দু দনের কাথে থাকতে ইততে কলে।'' এবার শুধু বুকে মোচড় নয়। '' মনে হল, আমার স্বর বন্ধ হয়ে আসছে। দেখলাম সুমিতার মুখ নত। তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু মনে হল, কাকলীর কথায়, আমার থেকে তার অবস্থা ভালো না।'' সুমিতার স্বামী সুবীরবাবু চলে যাওয়া দু'জনের মনেই একটা গভীর বেদনার ছাপ পড়েছে দু'ধরনের। কালকূট সুমিতার কাছে জানতে পেরেছেন সুবীর কবে চলে গেলো সেটা সুমিতা জানে না কারণ যেদিন কালকূট তাদের বাসায় গিয়েছিলেন সেদিনই আধঘণ্টার মধ্যে সুবীর হোটেলে উঠে যায়। পরের দিন ফ্লাইট ছিল, শুধু এটুকুই জানা আছে। বিবেকও চলে গেছে সেদিনই। কালকূট ধীরে ধীরে জানলেন সুমিতার কাছে ওদের দাম্পত্য জীবনের দুর্বিষহ অবস্থা। বিশ্বাস ধূলুণ্ঠিত, কথাবার্তায় নীচতা, সন্দেহ। মেয়ের সামনে কদর্য ভাষায় কথাবার্তা বলছিল, জোর করে মেয়েকে নিয়ে যেতে চাইছিল। ওইটুকু মেয়েকে সে জিজ্ঞেস করছিল ''তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে থাকতে চাও, না আমার কাছে? ভাবুন তো বেচারীর অবস্থা। সে এই একটু আগে আপনাকে যে জবাব দিয়েছে ও দু'জনের কাছেই থাকতে চায়।'' এছাড়া সুমিতা আরও বলেছে যে, সুবীর মেয়েকে না পেয়ে ক্ষেপে উঠেছে এবং সুবীরের যে আর দ্বিতীয় জীবন নেই সেটাও সুমিতা জানে। যেমন সুমিতারও দ্বিতীয় জীবন নেই, সুমিতা ডাইভোর্স চায় না কিন্তু এই হেল্পলেস্ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায়। একটা কিছু তো স্থির হোক। উভয়ের মধ্যে শুধু ঘৃণাই অবশিষ্ট আছে কিন্তু তবুও সুবীর ডাইভোর্স দেবে না। কালকূট বুঝতে পেরে মূল সমস্যার কথা তুলে ধরলেন সুমিতার কাছে। 'এগো'র সমস্যায় ভুগছে দুজনেই। সন্তানের উপর অধিকারের বোঝা দু'জনের ঘাড়েই চেপে বসেছে। ঘৃণার চেয়েও জেদটাই দু'জনের মধ্যে বিশেষ করে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে এই জেদটুকুকে ছাড়লেই তো কাকলী মা বাবার বুক জুড়ে থাকতে পারে। কালকূট কাকলীর মায়ের কথা শুনে বুঝতে পেরেছেন মনের ভেতরে যে প্রেমের পাখি বাস করে সেটা সুবীর বা সুমিতা কারোরই মরে যায় নি। কালকূটের কথায় সুমিতা মাথা নিচু করল বেদনায়।

তারপরে "রুদ্ধ গলাতেই বলে উঠল "আপনি জানেন না, সুবীর কী রকম নিষ্ঠুর। ও ভাঙবে তো মচকাবে না।"

'আপনি মচকান।'

আমার কথা শুনে সুমিতা ভেজা চোখ তুলেই যেন চমকে তাকাল! আমি হেসে, অনুরোধের সুরে বললাম, 'খুব কঠিন জানি, কিন্তু আপনি জানেন, এ মচকানোর অর্থ কী। এ মচকানো, সত্যি কি মচকানো?' কালকূটের কথা শুনে সুমিতা জানতে চাইল কেমন করে? কালকূট বললেন "আমি যোগিনী হয়ে যাব সেই দেশে যেথায় নিষ্ঠুর হরি। সব দিয়ে দেখুন না, আসল ভাঙন মচকানোটা কার। কার হার, কার জিত।" *(পৃ: ২৪৯, ঐ)*

সুমিতা মাথা নিচু করে কাঁদতে লাগল কিন্তু কালকূটের পরামর্শকে মাথায় করে রেখে কাকলীকে বুকে চেপে ধরে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর তাঁর মন স্নিগ্ধতায় কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। স্নিগ্ধ হাসিতে বলে উঠল "কে যে কেমন করে কখন বন্ধু হয়ে ওঠে, বোঝা যায় না।" *(পৃ: ২৪৯, ঐ)* কালকূট ছোট্ট কাকলীর কথা ভেবে দুটো ভেঙে যাওয়া হৃদয়কে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি ঠিকই ধরেছেন এই বিচ্ছেদের মূলে 'এগো' কাজ করেছে। সুমিতা ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের গেজেটেড অফিসার আর সুবীর স্পোর্টসম্যান, মেকানিজম বিদ্যে শিখে এসেছিল বিলেত থেকে, একটি কারখানার ম্যানেজার। দুই ব্যক্তিত্বের লড়াই লেগেছিল দু'জনের মধ্যে, সেইজন্য নিজেদের সুপ্ত প্রেম ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, সম্পর্ক ডাইভোর্সের দিকে এগোচ্ছিল। কালকূট সুমিতার সেই সুপ্ত ভালবাসাকে জাগিয়ে দিয়েছেন।

কলকাতায় ফিরে যাওয়ার সময় কাকলী ও তার মা সঙ্গী হল। সারাদিন খাজাঞ্চিখানা উত্তরের আকাশে ঝলকাচ্ছিল। "পুব থেকে পশ্চিমে ধবলগিরি অর্ধচক্রাকারে দার্জিলিং-এর প্রাঙ্গনকে ঘিরে রয়েছে। আজ আর কারুর তেমন কৌতূহল নেই, উচ্ছ্বাস নেই। আজ তার কোথাও ঢাকাঢাকি নেই। সকল দুয়ার হাট খোলা।" *(পৃ: ২৪৯, ঐ)* শুধু পার্বতীর মনটি বিষণ্ণতায় ভরে উঠল। দার্জিলিং-এর পপলার ভিউয়ে থাকার সময় এই পার্বতীর চোখ দিয়েই কালকূট দার্জিলিং ও ওখানকার কিছু কিছু মানুষের পরিচয় পেয়েছেন। ও ছিল সমতলের আর পাহাড়ের যোগসূত্র। ছোট পাহাড়ী কন্যার সরলতার মধ্য দিয়ে দু'চোখ ভরে কালকূট দার্জিলিং-এ থাকাকালীন কিছু কিছু চিত্র তুলে ধরে কাহিনীর গতিকে সাবলীল করে দিয়েছেন। মনে হয় এই বালিকা কন্যাটির যোগসূত্রটি অতি প্রয়োজনীয় ছিল। তার নিজস্ব বক্তা, প্রতিবাদ ওই ছোট্ট পার্বতী কন্যার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন। আবার যেটা ওই বালিকার মুখে বলা অনুচিত বলে মনে হয়েছে সেটা তিনি নিজেই নিজের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু নিজের দৃষ্টিভঙ্গি এইভাবেই পাঠকের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে এসে রৌদ্রের ঝলকানিতে কাঞ্চনজংঘার শীর্ষ যেমন আলোকের

মালায় ঝলকিয়ে উঠেছে মাঝেমধ্যে তেমনি তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া মানুষগুলির জীবনে ঘটে যাওয়া মুহূর্তের খণ্ড খণ্ড চিত্র তুলে ভ্রমণ কাহিনীকে গতিশীল করেছেন। কালকূটের ভ্রমণের কাহিনীতে দেখেছি স্থানের চেয়ে মানবজীবন-এর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবনবোধের জীবন চিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে' দেখা গেল হিমালয়ের সৌন্দর্য, বন প্রকৃতি ও মানবমনের সৌন্দর্য সমতালে চলেছে। কাহিনীর শেষে দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজংঘা তার বন্ধ দুয়ার খুলেছে, সারাদিন ঝলকাচ্ছে, তেমনি এই মানুষগুলির হৃদয়ের আগল খুলে গেছে। কাহিনী গতিময় হয়েছে ভ্রমণে নয়, মানবজীবনের সুখ দুঃখের চলমানতায় যা পাঠককুল একাত্মভূত করে দেয়। ভ্রমণকাহিনী ভ্রমণে না থেকে উপন্যাসে পরিণত হয়েছে।

এরপর আলোচনা করা হবে এই পর্বের শেষ কাহিনী **'তুষার সিংহের পদতলে'**। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে (১৩৮১বঙ্গাব্দ) শারদীয়া দেশ পত্রিকায় এবং গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে (১৩৮৩ বঙ্গাব্দ ১লা বৈশাখ), আনন্দ পাবলিশার্স থেকে। গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে ছিল :

'নাম তাঁর যাই হোক
কুন্দনন্দিনী
প্রীতিনিলয়াসু।'

পাহাড়ের টানে হিমালয়ের প্রাঙ্গণে গিয়েছিলেন কাঞ্চনজংঘাকে দেখতে। সেই হিমালয় প্রাঙ্গণে গিয়ে হিমালয়ের স্বর্ণালী-রূপালী আলোছায়ার সঙ্গে মানবজীবনের আলোছায়ার যে চিত্র এঁকেছিলেন তাই 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গনে' ধরা পরেছে। কিন্তু কাঞ্চনজংঘাকে কাছ থেকে দেখতে পান নি। দূর থেকে মাঝে মাঝে তার ঝলক দেখেছিলেন। তার মন ভরে নি, তাই তিনি আবার ছুটে গেছেন দার্জিলিং-এ। তাঁর এই তৃষ্ণা বহুদিনের। বহুদিন আগে প্রায় পঞ্চাশের দশকে জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলা থেকে বেরিয়ে কোনো এক রাস্তা থেকে কাঞ্চনজংঘার হাতছানি দেখতে পেয়েছিলেন। আকাশের দিকে সেই চূড়ার চিরতৃষ্ণার ঠোঁট বাড়ানো ছিল, সূর্যালোকে যে ক্ষণে ক্ষণে তার রঙ বদলায়। মহিমামণ্ডিত তার রূপ, মৌনতাই তার মহিমা। সেই রূপ তাকে বারে বারে হাতছানি দিয়েছে, ছুটে গিয়েছেন বারে বারে দার্জিলিং-এ কিন্তু কাঞ্চনজংঘার কাছে পৌঁছানো অধরা রয়েই গেছে। 'আরব সাগরের জল লোনা' এই কাহিনী লিখতে কালকূট হাজির হয়েছিলেন আবার দার্জিলিং-এ। পাহাড়ে বসে সাগরের কথা লিখতে হিমালয়ের নির্জনতাই বেছে নিয়েছিলেন। এক পত্রিকার আনুকূল্যে তিনি জুবিলি স্যানাটোরিয়ামের তিনতলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এখানে আসার পর পূর্ব স্মৃতি তাঁকে বারে বারে পুরনো দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এক পার্বতী কন্যা যার মায়ের আশ্রয়ে তিনি ছিলেন, তার উষ্ণ বাহুবন্ধনে তিনি ধরা দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা এক পক্ষের ছিল না, কিন্তু পরিবার

সমাজ সব ঘিরেছিল কালকূটের বাধা হয়ে। ওর প্রাণের জোর সব কিছুর থেকে বেশি ছিল। পার্বতী কন্যার মায়ের কাছে এই ব্যাপারটা ধরা পড়েছিল। তিনি বড় মেয়েটির জন্য চিন্তিত ছিলেন। কালকূট তার মায়ের চিন্তিত, বিষণ্ণ মুখের কাছ থেকে পালিয়েই বাঁচতে চেয়েছিলেন। সমাজতাত্ত্বিক কালপ্যাঁচা তখন পাহাড়ে ছিলেন, তাঁকে ব্যাপারটা বলতে গিয়ে কালকূটের গলা ধরে গিয়েছিল, চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। তারপরে আবার পাহাড়ে, এক অধ্যাপিকা দিদির আশ্রয়ে রাজসিক আরামে ছিলেন। সেখানে এক সরকারী দপ্তরের সাহেব কর্মীর কাছে ওই পাহাড়ী কন্যার খোঁজ পেয়েছিলেন। ওই পাহাড়ী কন্যাটি একটি বাঙালী উচ্ছৃঙ্খল পরিবারের বলি হয়েছিল। কুড়ি বছরের বিবাহিত জীবনে যা হয়নি ওই পাহাড়ী কন্যার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের জেরে তার পিতৃত্ব ঘোষিত হয়েছিল। মাত্র দেড়-দুই হাজার টাকায় ব্যাপারটা মেটানো হয়েছিল, পার্বতী কন্যাটি অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের জেরে সমাজ পরিত্যক্তা হয়েছিল। শহরের বাইরে একটি মারোয়াড়ীর দোকানে নকরি করে। ওই সরকারী কর্মী পার্বতী কন্যাকে ভালবাসত কিন্তু প্রকাশ করতে পারে নি, তার বন্ধুত্বের জেরে পার্বতী কন্যা কালকূটের কথা তাকে বলেছিল। আরও বলেছিল তার এই খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা শুনলে কালকূট খুব দুঃখ পাবে। কালকূটের বুকের ভেতরটায় ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। কালকূট খুঁজেছিল কিন্তু তাকে খুঁজে পায় নি। তার মায়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছিল, তার মাও তার বড় মেয়ের খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও আশা বউদির নিমন্ত্রণ রাখার জন্য সন্ধ্যার হালকা কুয়াশায় স্যানাটরিয়ামের দিকে যাওয়ার পথে সেই পার্বতী কন্যার সঙ্গে হঠাৎই দেখা হয়ে যায়। সে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল জনবহুল পথের মধ্যে। ঘনিষ্ঠভাবে পথ চলতে চলতে অনেক কথা বলেছিল। অনেকেই বিশেষত খৃষ্টানরা তাকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু তার সন্তানকে কেউ চায় না। তাই সে বিয়ে না করে, অবাঞ্ছিত সন্তানের জননী হয়ে সমাজ পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। দুঃখের মধ্যেও নিজের মাতৃত্বকে গৌরবান্বিত করেছিল। কিন্তু সারল্যের মূল্য তাকে দিতে হয়েছিল। লেখককে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে দৃঢ়বদ্ধ করে চুম্বনে ভরিয়ে দিতে দিতে সে জিজ্ঞাসা করেছিল যে বইটা সেবারে লিখেছিল সেটা ছাপা হয়েছে কিনা। তার লেখা চিঠি লেখক নিশ্চয়ই পায়নি, আর কখনও লেখক দার্জিলিং-এ আসে নি, এইসব প্রশ্নও করেছিল। লেখক কোন উত্তর না দিয়ে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় গুম্‌রে ছিলেন। ওর ধারণার কোনটিই সত্যি নয়। শেষে যাবার আগে সাবধান করে দিয়ে গেল রাস্তাটা বেশি রাতে একার পক্ষে নিরাপদ নয়। লেখক যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন। ঘোর কাটতে দেখেছিলেন রাস্তায় কেউ নেই, সে বাঁকের মুখে হারিয়ে গেছে, পুরনো স্যান্ডেলের শব্দটাও আর শোনা যাচ্ছে না। কালকূট হিমালয়ের প্রাঙ্গনে বসে 'আবর সাগরের লোনা জল' লিখতে লিখতে পুরনো স্মৃতিতে বিচরণ করছিলেন। বেদনার্ত হয়েছিলেন সেই পাহাড়ী কন্যার জন্য,

সামাজিক বন্ধনের ভ্রূকুটিতে নিজেকে জড়াতে পারেন নি। এই ভাবেই কাহিনীগুলোতে পর পর কয়েকটি মেয়ে বা নারীরা এসে ভিড় করেছে। কালকূট তাঁর বৈরাগী মন নিয়ে নির্বিকার থেকেছেন, এই কাহিনীর শুরুতে যে পাহাড়ী কন্যার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন সেখানেও তিনি কোন পিছুটান রাখেন নি। পথের টান পথে রেখে দিয়ে বারে বারে নতুনের হাতছানিতে বেরিয়ে পড়েছেন।

এবারে দার্জিলিং এসে ম্যালে বেড়াতে গিয়ে নিজেরই ছোটবেলার এক পরিচিত তার থেকে বড় অথচ বন্ধুর মতো সেই দাদা-বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আয়কর অফিসার দত্তবাবুর স্ত্রী ও মেয়ে লেখক কালকূটকে চিনতে পেরেছিল। তারাই দেখিয়ে দিয়েছিল দত্তবাবুর সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হতে প্রথমে কালকূট চিনতে পারেন নি। পরে কালকূট চিনতে পারাতে দত্তবাবুর সম্মান রক্ষা হয়েছিল, অর্থাৎ স্ত্রী ও কন্যার কাছে উনি গল্প করেছিলেন তার ছেলেবেলার খেলার সাথী লেখক বন্ধুটির। পরের দিন দত্ত সাহেবের বাড়িতে গিয়ে দেখলেন ওরা সবাই কালিম্পং যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে, দু'দিন বাদে আয়কর অফিসের ক্যাম্প বসবে, ওখানে দত্ত সাহেবকে যেতে হবে! স্ত্রী-কন্যাদ্বয় ও তার ভাইও থাকবে কালিম্পং-এ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়। লেখককেও তারা "চলো চলো, কালিম্পং চলো" *(পৃ: ৯৩৬, ঐ)* বলে দলে টেনে নিল। দত্ত সাহেব তাঁকে আকর্ষিত করলেন "তোমাকে যেতে হবে তিস্তার ধার ধরে, পাহাড়ের বুকে তার উৎস সন্ধানে। তোমার পাঁচ খাজাঞ্চিখানা তো সেখানেই। কালিম্পং তোমার পথ চলার সরাইখানা, সেখানে তোমাকে যেতেই হবে। সেখান থেকে গ্যাংটক। পাঁচ খাজাঞ্চিখানার অনেকখানি কাছে পৌঁছে যাবে।" *(পৃ: ৯৩৬, ঐ)* অতএব আরব সাগরের অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি কর্তৃপক্ষের হাতে দিয়েই দার্জিলিং থেকে কালিম্পং-এর টানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কুইনস্ অব হিমালয়ের প্রাঙ্গণে পা দিয়েই যেমন চারিদিক ঝলমলিয়ে উঠেছিল, মন খুশিতে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল কালিম্পং-এর অর্ভ্যথনা তেমনি মনে হল না। বাজার, মোড়ে মোড়ে পুলিশ, ব্যস্ততা সবকিছুই দার্জিলিং-এর তুলনায় ম্রিয়মান। নেই ম্যাল, অশ্বা বাহিনী, খোকাখুকুদের তাতে উঠে হৈ হৈ করা, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কলতানের সঙ্গে রঙের খেলা। শুধু রয়েছে যেন দুটি চোখের অপলক দৃষ্টি, গম্ভীর মুখে ঠোঁটের কোণে হাসি, চুপচাপ শান্ত। বৈরাগ্যের ছায়া লুকিয়ে আছে, মন বিবাগী হয়ে যায়। রয়েছে অনেক পথের নিশানা। মানুষেরা পাঁচ-চূড়োর মতো, রঙের খেলা তাদের মুখে। পশুদের গা ঘন আর দীর্ঘ লোমে ভর্তি। দার্জিলিং থেকে কালিম্পং-এ আসার পথের একদিকে অতল গভীরে চলেছে একটি সর্পিল নদী, আর একদিকে মৌন মহান উচ্চতায় নীল সবুজের মেশামেশি। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। গান, গল্প কবিতায় সকলে মিলে গিয়েছিল প্রকৃতির প্রাণ ভোলানো রূপের সঙ্গে। এতকিছুর মধ্যেও বারে বারে কালকূটের সেই পাহাড়ী কন্যার কথা মনে হচ্ছিল যার সঙ্গে

দেখা হয়েছিল নারায়ণদার আবাসস্থল সেই স্যানাটেরিয়ামের নির্জন গভীর উৎরাইয়ে। কালিম্পং আসার পথে দত্ত সাহেব দূর থেকে আর এক পাহাড়ী মেয়ে তিস্তাকে দেখিয়ে বলছিলেন যে ওই তিস্তার সঙ্গেই তাকে যেতে যাবে। পাঁচ-চূড়োর সুলুক সন্ধানী লেখকের বহুকালের আশাপূরণ কিছুটা, ওই কালিম্পং পর্যন্ত। কেননা দত্ত সাহেবের গতি শুধু বাংলা পর্যন্ত তথা ভারত সীমা পর্যন্ত। যাকে মনের মধ্যে অনেকদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন সেই রূপ সৌন্দর্যের সুলুক সন্ধান সকালেই জানলার কাঁচে চোখ রাখতে গিয়ে পেয়ে গেলেন। স্ফটিকের ওপর সূর্যছটা পড়লে যেমন চোখ রাখা যায় না তেমনি জানলার কাঁচে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আকাশের গায়ে ধূসর রঙের উঠোনটা যেন এক পাকাপোক্ত রাজমিস্ত্রি বানিয়ে দিয়েছে। শাদায় সামান্য তুঁতে মিশিয়ে কণিক দিয়ে পঙের মতো মেজে গড়ে তুলেছে এক মহল। তাতে রূপালী লাল আর মেরুন রঙের ছড়াছড়ি। কালকূট একেবারে রূপমুগ্ধ। দত্তসাহেব জানিয়ে দিলেন একমাত্র তিস্তাই তাকে একমাত্র তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এছাড়া আর একজন পারবে সে নারী নয় পুরুষ, ব্রহ্মপুত্র নদ।

কয়েকদিন কালিম্পং-এর পথে পথে ঘুরে পাঁচ চূঁড়োর রূপসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় দিন কাটাতে কাটাতে একদিন দত্ত সাহেবের ক্যাম্পে পৌঁছে গেলেন। সেখানে পৌঁছে ফৌজী অফিসার মেজর ঘোষাল ও তার ভগ্নী কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে আলাপ হল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত শাল গাছের মত লম্বা ঘোষাল সাহেব যে একজন ফৌজী, তা তিনি দেখেই বুঝেছিলেন। কিন্তু তার পাশে একরাশ ফুল, ফুলের মালায় জড়ানো রেশমী শাড়িতে জড়ানো মহিলাকে তিনি মেজর ঘোষালের স্ত্রী বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু তা নয় তিনি তার ভগিনী কুন্দনন্দিনী। তার রূপবর্ণনা করেছেন এইভাবে রেশমী গোলাপী পাগড়ীতে তিনি গোলাপবালা, তাতে শিশির বিন্দু চিক্‌চিক্ করছে। রেশমী আঁচল লুটায় আসনের ওপর, গোলাপে মেশানো গোলাপী জামায় কাপড়ের চিহ্ন কম। তাই নিয়ে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। কপালকুন্ডলার কালীর মত চোখের বর্ণ লাল। ঠোঁট লাল, ওষ্ঠরঞ্জনী ও তাম্বুলরাগ দুটোরই সংমিশ্রণে। কাঁধ পর্যন্ত ছড়ানো কুচকুচে কালো ছড়ানো চুলের ফাঁক দিয়ে টুকটুকে লাল একখানি শিশুর মত মুখ। ঢলঢল অঙ্গে ঢুলুঢুলু দৃষ্টি। ঠোঁটের কোণে বিকচ হাসি নাসারন্ধ্র কাঁপছে। প্রতি নমস্কার করে বললেন কুন্দ কাটা গেছে, এখন শুধুই নন্দিনী। লেখকের কোন্‌টা পছন্দ। লেখকের কুন্দ পছন্দ কিন্তু কুন্দনন্দিনী নামের মধ্যে একটা ধ্বনিমাহাত্ম্য আছে। লয়টা দীর্ঘ হলেও একটা রাজকীয়তা আছে। লেখকের লেখার জন্য কুন্দনন্দিনীর পরিচয় আছে কিন্তু মেজর সাহেবের নেই। কিন্তু শ্যামা ছাড়া আর কোন নায়িকাকেই ভাল লাগে নি। কালকূট জানিয়েছিলেন তাঁর কাহিনীর চরিত্ররা নিজেদের মতোই এসে গেছেন। কুন্দনন্দিনীর প্রশ্ন ছিল 'যেমন এখন আমি কুন্দনন্দিনী'। *(পৃ: ৯৪২, ঐ)* এইভাবেই পরিচয়টা হয়েছিল। তারপরে আরো বেশিক্ষণ ধরে গল্প করার জন্য দত্ত

সাহেবের অনুমতি নিয়ে কালকূটকে নিয়ে শিলিগুড়ির পথে রওনা হলেন তিনজনে। কুন্দনন্দিনীকে শিলিগুড়িতে ওর স্বামীর কাছে পৌঁছে দিয়ে সন্ধ্যাতেই ফিরে আসবেন কালিম্পং-এ। বাঁদিকে চালকের আসনে মেজর সাহেব, তার পাশে কুন্দনন্দিনী, লেখক ধারে বসলেন। ঘন সান্নিধ্যে স্পর্শ এড়ানো গেল না। কুন্দনন্দীর আঁচল খসে এলিয়ে পড়েছে লেখকের কোলের ওপরে। একটু অস্বস্তি হচ্ছে, ইজি হয়ে বসতে পারছেন না। কুন্দনন্দিনী লেখককে আরও ডাইনে সরে যেতে নিষেধ করে নিজেই লেখকের ডান দিকে সরে বসলেন। কালকূটের কোলের ওপর কুন্দনন্দিনীর আঁচল মাতলামি করে যাচ্ছে, আঁচলটা নিয়ে কালকূট যে কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। নির্বিকার থাকার চেষ্টা করেও পাপচক্ষু বারে বারে তার বক্ষের ওপরেই গিয়ে পড়ছিল। গাড়ি শহর ছাড়িয়ে পাহাড়ের নিরালায় আসতেই কুন্দনন্দিনী কালকূটের গায়ের ওপর দিয়ে পিছনের সিট থেকে কাঁচের বোতলে ঠুং ঠাং করতে লাগলেন। তার বাম বক্ষ কালকূটকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল, রুক্ষ্ম চুল কান আর চোয়াল স্পর্শ করছে। কুন্দনন্দিনী ভ্রূক্ষেপহীন। রক্তিম পানীয় ভরা রামের বোতল হাতে নিয়ে ঠিক হয়ে কালকূটকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এসব জিনিসের সঙ্গে তার পরিচয় আছে কিনা। লেখকের যে একদম পরিচয় ছিল না তা নয় কিন্তু ভারতের থ্রি-এক্স পর্যন্ত পরিচয় ছিল। কুন্দনন্দিনী হেসে বলেছিল যে এটা সিকিমের খাঁটি কালো বেড়ালের রক্ত। এতে একটু জল ও একটু কোকস্ মেশানো হয় মুখরোচক করার জন্য। কালকূট কখনো সিকিমে যাননি, তাই সিকিমের ব্ল্যাক ক্যাট রাম সম্বন্ধেও তেমন জানা নেই --- এটা জেনে কুন্দনন্দিনী কালকূটকে তক্ষুণি ব্ল্যাক ক্যাটের স্বাদে সৌভাগ্যমণ্ডিত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। সেটা গাড়িতেই শুরু হবে নাকি জানতে চাওয়ায় কুন্দনন্দিনী খিলখিল করে হেসে উঠে জানিয়ে দিলেন যে, গাড়িতে যেতে বা হাঁটতে হাঁটতে বা আকাশে উড়তে উড়তে যেখানেই হোক, পানীয় থাকলে সেটা পান করবেনই তার কোন সময় নেই। আর কালকূটের যদি গদিতে হেলান দিয়ে বসে পান করতে ইচ্ছে করে তাহলে তার কাঁধ আছে সেখানে হেলান দিলেই হবে। এরপর ভুরু নাচিয়ে বললেন 'তার সঙ্গে গান বাজনা মাইফেল?' *(পৃ: ১৪৩, ঐ)* মেজর ঘোষাল ও মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। অগ্রজের সামনে ছোট ভগ্নীর এমনি অবারিত মুখের কপাট হাট হতে দেখে কালকূট আশ্চর্য হয়েছিলেন। কারণ পরিচয় পর্ব শেষ হতে না হতেই এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। কালকূটের মনে আরও একটা সন্দেহ উঁকি দিয়েছে কুন্দনন্দিনী স্বামী সন্দর্শনে নিচে নামছেন, এ অবস্থায় পথেই তিনি তৃষ্ণা নিবারণ করবেন, এটা কালকূট তালে মেলাতে পারছেন না। ওদিকে কুন্দনন্দিনীকে কালকূট জানিয়ে দিয়েছেন 'মাইফেল করাটাও কখনো ঘটে ওঠেনি', *(পৃ: ১৪৩, ঐ)* পানীয় বস্তুটি নিষিদ্ধ বলেই তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। মেজর সাহেব কালকূটের এই কথাকে বাহবা দিলেন। কালকূটের পানের ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার দায়িত্বটা ওদের ওপরেই দিয়ে দিলেন। পান করার অন্য কোনও

পাত্র নেই অতএব একই বোতলে মুখ লাগিয়ে সবাইকে খেতে হবে, কুন্দনন্দিনী জানিয়ে দিল তার কোনও অসুখ নেই, একই পাত্রে খাওয়া যেতে পারে। বলেই ময়না স্বরে হাসতে হাসতে কালকূটের কাঁধে মুখ লাগিয়ে দিল। কালকূট নিজেও তাল দিয়ে দিলেন যে নানা রোগে তিনি ভোগেন, কোনো গ্যারান্টি তিনি দিতে পারবেন না। লেখকের কথায় মেজর সাহেব মজা পেলেন এবং বোনকে বলে দিলেন লেখক মানুষের জবাব একেবারে যথাযথ হয়েছে। কুন্দনন্দিনী দমার পাত্র নন। তাহলে মেজদার চুমুক দেওয়া বোতলে পানে আপত্তি নেই তো? দুই ভাইবোনে কথা চলতেই লাগল। সঙ্গে কালকূটও তাল দিয়ে যাচ্ছেন। পাহাড়ী পথে গাড়ী চালাচ্ছিলেন বলে মেজর পান করতে না চাইলেও বোনের কথায় শুরুটা মেজর সাহেবই করলেন। বোনকে তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে দিতে বললেন। কুন্দনন্দিনী সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। তারপরে সিগারেট ধরিয়ে ভগ্নী দাদাকে সিগারেট ও দাদার হাত থেকে বোতলটা নিয়ে নিলেন। বোতলটা নিয়েই এক চুমুক। কালকূটের চোখে এটা শোষণ। তিনি যেন দেখলেন কুন্দনন্দিনীর গলার ভিতর দিয়ে সুরার বর্ষা বুকের ভেতরে নেমে যাচ্ছে। সুরা পান করেই বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁটে চাপ দিয়ে নাসারন্ধ্র ফুলিয়ে বড় নিঃশ্বাস ছেড়ে কালকূটের দিকে বড় বড় চোখে তাকালেন। কালকূট দেখলেন যেন জ্বলন্ত অঙ্গার কালকূটের দিকে তাকিয়ে আছে। ময়না স্বরে হাসছিল একটু কিন্তু এখন তার চোখ কোকিলের মতো লাল। সুরা নয় সুধা পান করল কুন্দনন্দিনী। লেখক তাকে সিগারেট ধরাতে সাহায্য করলেন। কালকূট কুন্দনন্দিনীকে কুন্দনন্দিনী দেবী বলে ডেকে উঠতেই প্রতিবাদ, দেবতা বলে ডাকতে বলেই ময়নাস্বরে খিলখিল করে হেসে লুটিয়ে পড়লে কালকূটের দিকে হাত দিয়ে আলতো করে চাপড় হাঁটুর ওপরে, তাঁর আঁচল ওইখানেই লুটোচ্ছে। কালকূট ক্রমশ কুন্দনন্দিনীর সুবাসে ঘায়েল হয়ে যাচ্ছেন। বলে দিল তাকে নামেতেই আপনি করে বললেন। কালকূট তার কাছে জানতে চেয়েছিলেন সকাল থেকেই এত পান করছেন কেন? উত্তরে লেখক আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ড্রিংক করতে ভালো লাগে তাই। কোন নিয়ম নেই, যতক্ষণ ভালো লাগছে ততক্ষণই পান করে যাবেন। দাদার অতিথি হয়ে ছুটির মেজাজেই আছেন।

কালিম্পং থেকে নিচে নেমে আসার পথটাতে সারাক্ষণই দুই ভাইবোন ঠাট্টা-মস্করা-হাসির মধ্যেই চলছিলেন, হঠাৎই আবহাওয়াটা গম্ভীর হয়ে গেল। পেরিয়ে আসা পথের প্রায় অনেকটাই ছায়াহীন ন্যাড়া পাহাড়ের মধ্য দিয়ে কিন্তু এখান থেকে প্রকৃতি নিবিড় থেকে নিবিড়তর। গাড়ির পিছনেও ঘন ঘন গাড়ীর আওয়াজ আর সংকেত। কুন্দনন্দিনী কালকূটের অতি নিবিড় সান্নিধ্যে এসে তাঁরই মুখে সুরা ঢেলে দেওয়ার উদ্যোগ করতেই তাড়াতাড়ি কালকূট নিজেই বোতলটা নিয়ে মুখে ঠেকিয়ে পান করলেন। কুন্দনন্দিনীর ফুলেল গন্ধ আর সুরার গন্ধ একত্রে মিশে কালকূটের নিঃশ্বাসে প্রবেশ করল, তার অন্যান্য অঙ্গ স্পর্শের কথা আর না বলাই ভাল। কালকূটের গরীব

প্রাণ দীনতায় প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েও অঙ্গারের স্পর্শে ঝংকৃত হয়ে যান। কিন্তু তাকে ভুল বোঝার অবকাশ না দিয়ে তাকে বলে দিলেন যাদের আস্তাকুঁড়ের মানুষ বলা হয় সেখানকার মানুষ তিনি। আরক্ত মুখে কুন্দনন্দিনী বলে দিলেন যে আস্তাকুঁড়ের খোঁজে তার দরকার নেই কিন্তু অনেকের মুখে মুখ ছোয়ানো ঐটি তাকে লিখে দিতে হবে। আস্তাকুঁড়ের কথা কেন জানাতে চায় না? ঘৃণা না মান কোন্‌টায় বাঁধছে? কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। কুন্দনন্দিনী সুরা লাল পানি গলায় ঢেলেই কালকূটের মনের ঠেক ঘুচিয়ে দিলেন এই কথা বলে যে আস্তাকুঁড়টা তিনিও কম চেনেন না, তিনিও ওখানকারই মানুষ, এমনকি লেখকের থেকেও বেশি চেনেন, এই কথা বলে হেসে উঠলেন কিন্তু কালকূটের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে হাসিটা ঠেক খেল। হাসির পিছনে ঘৃণা না বিদ্বেষ কোন্‌টি জড়িয়ে আছে? "কুন্দনন্দিনী যে কারণে অন্য নামে মিষ্টি, বা বলা ভালো তাঁর চোখের কোণে ধনুক ঠোঁটে কৌতুক ঝরানো রঙের হাসি। হাসিটির পিছনেই যেন এক উষ্ণ তারল্যের টলটলানি।" *(পৃ: ৯৪৬, ঐ)* মেজর ঘোষাল গাড়ি চালাতে চালাতেই ভগ্নী ও লেখককে দেখলেন দেখে লেখক বুঝতে পেরেছেন উদ্বেগে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে মেজরের, তবে ফৌজী কেতায় মুখের চেহারায় সেটা ধরা পড়ে নি। কুন্দনন্দিনীর সুরাপান ও সিগারেটে টান, দুটোই একসঙ্গে চলতে লাগল। শেষে লেখকের হাতে বোতলটা দিয়ে আর সিগারেটে টান দিয়ে বলল যে সিগারেট যখন তা পুড়বেই কিন্তু তা থেকে মজা তো লুটে নিতে হবে। বলেই নিজের সিগারেটটা কালকূটকে দিয়ে টান দিতে বললেন এবং কালকূট অগত্যা রঙ লাগা ফিল্টারে টিপ-এ ঠোঁট টিপে টান দিলেন। কুন্দ সোজা হয়ে বসতে পারছে না, দেহের ভার লেখকের ওপরে দিয়ে রেখেছে। কিন্তু তার মাথা যে কোনদিকে টলবে সেটা বোঝার উপায় নেই, তার নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে লেখকের সঙ্গে তার সংলগ্নতা মেপে নিয়ে বললেন যে "কী আসে যায়? আপনি তো মশাই কালকূট। বলেই আবার আসনের পিছন দিকে কাত হয়ে হেলে পড়লেন।" *(পৃ: ৯৪৬, ঐ)* কালকূট নিজের ভাবনায় ডুব দিলেন। কালকূট বলে কি তিনি চিরকালের পুরুষটাকে কোথাও রেখে এসেছেন? চিন্তায় ছেদ। ড্রাগনমুখো একটি ছোট তুলতুলে ব্যাগ থেকে একটি ভেজা পাতার ঠোঙা থেকে টাটকা পানের খিলি বের করে কালকূটকে দেওয়ার সময় কোকিল চোখে রহস্য করে বললেন যে স্বামী ছাড়া পরপুরুষের হাতে পান দিতে হয় না। কালকূট সংকোচে হাত বাড়াতে পারেন না। স্বামীর অধিকারে তিনি ভাগ বসাতে পারেন না। কুন্দনন্দিনী কালকূটের ভাব দেখে ময়না স্বরে হেসে উঠলেন এবং বললেন "ইস্টবেঙ্গলের লোকেরা এ রহস্য জানে না, এসব হলো আমাদের ঘটি রহস্য" *(পৃ: ৯৪৭, ঐ)*।

কালকূট ঢাকার লোক অতএব এ রহস্য তিনি জানবেন কেমন করে? এছাড়া কুন্দনন্দিনী কালকূটকে 'স্বামী' করবেন না, একথা বলেই খিলখিল করে হেসে কালকূটের মুখের কাছে পানটা দিয়ে বললেন "লবঙ্গের কুলুপ কাঠিটা খুলে পানটা খুলে নিয়ে খান" *(পৃ: ৯৪৭, ঐ)*। কালকূট

বুঝলেন 'এতো শোনাচ্ছে যেন সন্ধ্যা ভাষার মত। আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠছেও'। *(পৃ: ৯৪৭, ঐ)* তিনি ভাবছেন 'পাঁচ খাজাঞ্চিখানার প্রেমিক' তিনি ঘরেতে মন নেই অতএব পথচলার এত দায়, দিব্যি মানার তো তার কোন প্রয়োজন নেই, তিনি পানের খিলি মুখে দিলেন। কুন্দনন্দিনী হাসতে হাসতে নিজের কোলেই ঝুঁকে পড়লেন, মেজর কৃত্রিম রাগে বোনকে বললেন যে লেখক একজন 'গ্রোন আপ রসিক মানুষ'। তারপরে ইংরাজিতে লেখককে বললেন যে, 'পানের খিলির আকারটা একটা প্রতীক'। কুন্দনন্দিনী কোল থেকে তার রক্তাভা মুখখানি তুলে পানের খিলি মুখে দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু প্রতীকের ঝংকারের অনুরণন কালকূটের হৃদয়ে ধ্বনিত হতে লাগল। কুন্দনন্দিনী আবার ব্যাগ থেকে ফুলেল গন্ধের জর্দা বের করে কালকূটকে সাধলেন কিন্তু তিনি জর্দা খেতে পারেন না, বুকে আটকে যায় বলে। মেজর সাব পানই খেতে পারেন না। কিন্তু কুন্দনন্দিনী বললেন "আফিম-কোকেনটা এখনো টেষ্ট করিনি, আর চন্ডু চরস। আর বাকি কিছু রাখিনি" *(পৃ: ৯৪৭, ঐ)*। ঘুমে চোখ ঢুলে যাচ্ছে, জোর করে তাকিয়ে তাকিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন কেন কালকূট নামের মানেটা কী। লেখক উত্তরে জানিয়েছিলেন, "নিজেকে আমার যা মনে হয়েছিল, তেমন একটা নামই নিয়েছিলেন"। *(পৃ: ৯৪৭, ঐ)* কুন্দনন্দিনী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন 'প্রাণঘাতিনী বিষ 'এই নামের মানে হলে লেখক 'ঘাতক'। তিনি যেন তাকেও একটা নাম দেন, লেখার জন্য নয়, শুধু পরিচয় দেবার জন্য। তিস্তার ডাউন গেট খোলা থাকাতে মেজর সাহেব কয়েকবার সংকেত পাঠালেন। এরই ফাঁকে কুন্দনন্দিনী ঘুম চোখে কালকূটের কাছ থেকে বোতলটা টেনে নিতে নিতে বললেন যে তিনি আরও একটু নেবেন।

গাড়ি তিস্তার ওপর দিয়ে চলেছে। কিন্তু তেমন করে তিস্তাকে দেখতে পাচ্ছেন না। কুন্দনন্দিনীর হাত বোতলসুদ্ধ কালকূটের কোলের ওপর নেমে এল। মেজর সাহেব বলে দিলেন ঘুমিয়েই থাক্। কালকূট সদ্য পরিচিতা রমণীর তেমন করে কিছুই জানেন না কিন্তু তার রমনীয়তার মধ্যে কোথায় যেন একটু বেসুর ধ্বনি বাজতে লাগল। কালকূটের বেদনায় বয়ে যাওয়া নারী রঞ্জিতা রিজভি ও জেসমিনের কথা মনে হল। রঞ্জিতা সিন্ধি মেয়ে, ধর্মান্তরিতা মুসলিম। ও আরব সাগরের জলে আর রঞ্জিতা আর জেসমিন রেলগাড়ির নিচে জীবনকে শেষ করেছিল। পাহাড়ের ধার বাঁদিক দিয়ে তিস্তা সমতলের দিকে বয়ে চলেছে। গাড়ীও চলেছে তিস্তার কূল ধরে ধরে। তার শব্দ নিরন্তর কানে বেজে চলেছে। হেমন্তকাল, তবুও মাঝে মাঝেই পথ সারাইয়ের কাজ করে চলেছে নারী-পুরুষ শ্রমিকেরা। এদিকে কুন্দনন্দিনী কালকূটের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। কালিম্পং থেকে নীচে নামতে নামতে যে উচ্ছলতা, হাসি, কৌতুকে কুন্দ মেতেছিল সবই সমতলে এসে থম্‌কে গেছে ঘুমিয়ে পড়াতে। মেজর সাহেব কালকূটকে বলতে লাগলেন অজানা সব তথ্য। ওই স্বর্ণশিখর তিব্বতীদের কাছে বরফ-বড়-পাঁচ-খাজাঞ্চিখানা বলে পরিচিত এটা কালকূটের জানা ছিল। বাকীটা

মেজর জানাতে শুরু করে দিলেন। কাঞ্চনজংঘা হল সিকিমের পূর্ব আর তিব্বতের দক্ষিণ সীমান্ত। সিকিমীরা বলে খান-চেন-জোঙ্গা। তিব্বতীদের সঙ্গে সিকিমীদের অনেক বিষয়েই মিল আছে। ধর্মে দুটি দেশই বুদ্ধের শরণাগত। তিব্বতে দলাই লামা এবং সিকিমে ছোগিয়ালরা লিভিং গড। দুই দেশের রাজপরিবারের মধ্যে বৈবাহিক চল আছে।

পঞ্চাশের দশকে সিকিমের বর্তমান রাজা, তখন নামগিয়াল ছিলেন রাজকুমার। সেই সময়ে তাঁর একটা প্রতিবাদ সংবাদপত্রে বের হয়েছিল। চার্লস এভানস্ নাকি কাঞ্চনজংঘায় উচ্চতম চূড়ায় উঠে রাজকুমারের কথা রাখেন নি। রাজকুমারের সঙ্গে শর্ত ছিল চার্লস এভানস্ উচ্চতম শৃঙ্গকে অপবিত্র করবেন না। চার্লস এভানস্ রাজকুমারকে কতকগুলো ছবি দেখিয়েছিলেন, কোনটাতেই সেই পবিত্র চূড়ার ছবি ছিল না। তবুও রাজকুমার চার্লস এভানস্‌ের কৈফিয়েতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। "একজনের কাছে যা আবিস্কার বিজ্ঞানচর্চা আর একজনের কাছে তা স্বয়ং ঈশ্বরকে নিয়ে টানাটানি। নামগিয়েল মনে মনে ঈশ্বরকে ডেকেছিলেন" *(পৃ: ৯৪৯, ঐ)* রূপের ফেরে কৌতূহল থাকবেই কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসেও আঘাত করা যায় না। সিকিমের জনগণ তুষার পূজা নামে একটি বড় উৎসব পালন করে থাকে। "ওয়ারশিপ্ অব্ স্নো রেঞ্জ" *(পৃ: ৯৪৯, ঐ)* পালিত হয় প্রাসাদের মন্দিরের উঠোনে। মেজর ঘোষাল আরও বললেন সেই " স্নো রেঞ্জের আড়ালে যিনি আছেন সিকিমীরা তাঁকে বলে তুষার সিংহ। সিকিমীদের বিশ্বাস কাঞ্চনজংঘা তাদের ধনদাতা, সৌভাগ্যদাতা, মোক্ষদাতা আর চিরকাল সজাগ দৃষ্টি রাখছেন তাঁর পান্না সবুজ কেশর ফুলিয়ে। সূর্যের আলোয় নিশ্চয় তার রঙ বদলায়। কিন্তু সিকিমের মানুষের কাছে সেই তুষার সিংহের কেশরের রঙ পান্নার মত সবুজ। সেই হিসাবে বলতে পারেন সিকিম হলো তুষার সিংহের দেশ।" *(পৃ: ৯৪৯ , ঐ)* মেজরের কথা শুনে কালকূটের বিবাগী মন ছুটে যেতে চায় সেই তুষার সিংহের পদতলের কাছে। কিন্তু ওখানে যাওয়ার নানা সমস্যা। সিকিমের চুম্‌বি উপত্যকা চীনারা ছিনিয়ে নিয়ে তিব্বতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। যে কোন সময়েই চীনা বন্দুকের গুলি বুকে এসে বিঁধতে পারে। চুম্‌বি উপত্যকার অধিবাসীরা তিব্বতের অধিবাসী বলে নিজেদের মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। ভারত সীমান্তে গেলে দূরবীনের সাহায্যে চুম্‌বি উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায়। মেজরের কথা শুনে কালকূটের "আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল পান্না সবুজ রঙের কেশর ফোলানো তুষার সিংহ, যে সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ রাখছে সিকিমের আত্মাকে। মেজর ঘোষাল আমার মন পাগল করলেন। আমার সেই চিরদিনের ঘর ছাড়ার মন। কবে একটু সেই তুষার সিংহের কাছে যেতে পারব, কে জানে। পাবার আগেই আমার মন চলে যায় সেখানে। যায় অচেনা পথ খুঁজতে খুঁজতে।"*(পৃ: ৯৪৯, ঐ)*

সেভক সেতুর কাছে তিস্তা নেমেই বাঁদিকে বেঁকে গেছে, সমুদ্রের মতো তার বিস্তার।

লেভেল ক্রসিং গেট পেরিয়েই জীপ ঝড়ের বেগে ছুটতে লাগল। ঘুমন্ত কুন্দনন্দিনীর চুল হাওয়ায় উড়ে কালকূটের মুখে পড়ছে, ফুলেল গন্ধ তীব্র গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ঘুমন্ত কুন্দনন্দিনীকে মেজর সাহেব টেনে জাগিয়ে দিলেন। কুন্দনন্দিনী ঘুম থেকে উঠে ব্যাগ থেকে সানগ্লাস বের করে পরে নিলেন, সুরাপানের কারণে কোকিল চোখ ঢাকা পড়ে গেল। আর গন্ধ ঢাকবার জন্য আতর লাগিয়ে নিলেন। উচ্ছলা, চঞ্চলা কুন্দনন্দিনী একটা গাম্ভীর্যের মধ্যে ঢাকা পড়ে গেল। মহানন্দা ব্রীজ পেরিয়ে পাথর কুচি জড়ানো একটি বাড়ীর উঠোনে জীপ এসে থামতেই সাদা শার্ট আর সাদা তোয়ালের মত মোটা কলার তোলা গেঞ্জি পরে অনতি দীর্ঘ পেশী শরীর একজন ভদ্রলোক তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। মেজর ঘোষাল কুন্দনন্দিনীর স্বামী মিঃ বরেন মুখার্জীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বরেন মুখার্জী গ্রেট জেনারেল ম্যানেজার অব এ গ্রেট ইন্ডো ফরেন কোম্পানীর। কালকূট লক্ষ করলেন কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে ঘরে ঢোকার সময় কুন্দনন্দিনীর কোমরে হাত রেখে এগিয়ে গেলেন। বরেন মুখার্জী কোম্পানীর গেস্ট হাউসে উঠেছেন, রাজকীয় ব্যবস্থা। খাবার টেবিলে কুন্দনন্দিনী সবাইকে একটু খাবার সার্ভ করে খেতে বসলেন। পোশাক ছাড়েন নি, প্রসাধন ধোয়া হয়েছে মাত্র, চুল গুছিয়ে আঁচড়িয়ে এই যা। কালকূটের চোখে ধরা পড়েছে 'এ মানুষে সেই মানুষটি ঠিক নেই।' *(পৃ: ৯৫১, ঐ)* কালকূটের ধন্দের মত লাগছে। ''সেই হাসি পরিহাস নেই। সকলেই অতি স্বল্পবাক হয়ে গিয়েছেন। তালটা কাটলো কোথায়? নিজেরই অস্বস্তি হচ্ছে। কুন্দনন্দিনীর আহারে তেমন গা নেই যেন? অল্প খাদ্য নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন মাত্র।'' *(পৃ: ৯৫১, ঐ)*

খাওয়া শেষে কুন্দনন্দিনী ও মিঃ মুখার্জী উপরে চলে গেলেন, নীচে সোফাতেই বিশ্রাম নিতে নিতে মিঃ ঘোষাল কালকূটের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। তুষার সিংহের দেশের কথা শুনে কালকূটের মন পাগলপারা। জিজ্ঞাসা করলেন 'আচ্ছা, এই তিস্তা নদী কোথা থেকে আসছে?' *(পৃ: ৯৫১, ঐ)*

'উত্তর সিকিম থেকে।' মেজর ঘোষাল আরও বললেন 'বলতে গেলে তুষার সিংহের পায়ের নিচে থেকেই। আপনি যদি কখনো আসেন, আমি চেষ্টা করবো আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে।' *(পৃ: ৯৫১, ঐ)*

সামরিক বাহিনীর জোংগা গাড়িতে ওখানে যেতে হয়। গ্যাংটকে ভারতীয় পলিটিক্যাল অফিসারের একটি ছাড়পত্র জোগাড় করতে হবে। পথঘাট খুবই দুর্গম। একটি সুতোর মতো তিস্তার ধারা অনেক নিচে দেখতে পাওয়া যাবে। মেজর সাহেবের কাছে তথ্য জানতে জানতে কালকূটের মনোভাব ''আহ্, আমার মন পাগল হইল রে! তুষার সিংহের পায়ের তলায়, সুতোর মতো তিস্তা। সমতলে যে এলোকেশী রণরঙ্গিণী। বন-জনপদ ডুবানি ভাসানি। শুনেছি হস্তীযূথকে আছড়ে তলিয়ে নিয়ে যায়। কোন্‌খানে সে আপন ঘরে শান্ত থাকে? তুষার সিংহের পায়ের

নিচে?''*(পৃ: ৯৫২, ঐ)*

মেজর ঘোষালের সঙ্গে গল্প করতে করতেই কুন্দনন্দিনী জানিয়ে দিলেন যে আবার মি: ঘোষালের সঙ্গেই ফিরে যাবেন। একথা শোনার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। মি: মুখার্জী জানিয়ে দিলেন যে, কুন্দনন্দিনী টিকিট কুটি কুটি করে কমোডে ফেলে দিয়েছেন, তিনি একাই দার্জিলিং মেলে ফিরে যাচ্ছেন। মেজর ঘোষাল বোনের ছেলেমানুষিতে বিব্রত কিন্তু কুন্দনন্দিনী কিছুই না বলে সিঁড়ির দিকে চলে গেলেন। কালকূটের মনে হল তিস্তা যেন বেগে ছুটে যাচ্ছে। মি: ঘোষাল ভগ্নীপতিকে তাদের সন্তানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতের কথা নিয়ে ভাবতে বললেন, যা করার দু'জনকেই ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এসব বলতে বলতে মি: ঘোষাল কালকূটকে ডেকে নিয়ে জীপের দিকে এগিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখতে পেলেন কুন্দনন্দিনী জীপের মধ্যে সানগ্লাস পরে বসে আছেন। কালিম্পং থেকে শিলিগুড়ি নেমে আসতে আসতে কালকূট দুটি মানুষকে খুব কাছে থেকে তাদের অন্তরটা পরখ করেছেন। কালিম্পং এসেছিলেন তিস্তার ধার ধরে ধরে পাঁচ খাজাঞ্চিখানা রূপদর্শনে। কালিম্পং-এ এসে কুন্দনন্দিনী ও মেজর সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর পরই তিস্তা স্রোতধারার মত কালকূটকে প্লাবিত করে সমতলে নামিয়ে নিয়ে গেছেন। কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে প্রথম দেখা থেকেই কালকূট মোহগ্রস্ত। ''কিন্তু সত্যি বলছি, পাশের চেয়ার মনে হলো, সব মিলিয়ে একরাশ ফুল, ফুলের মালা, নানা বর্ণে ছড়ানো। এই বর্ণনায় অন্তত একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট, পাশের আসনে যিনি, তিনি রমণী। মন খুঁত খুঁত করে। রমণী আবার মহিলা বা নারীর পরিচয়ের ভাষায়, অশালীন নয় তো?''*(পৃ: ৯৩৮, ঐ)*

''শাড়ীতে তিনি এক কথায় গোলাপবালা। কিন্তু রেশমী গোলাপে, এখনো অজস্র শিশিরবিন্দু, অন্যথায় কেন চিক চিক করে? কিন্তু রেশমী গোলাপ বড় উদাস। না হলে আঁচল কেন লুটায় আসনের নিচে মেঝেয়? রেশমী গোলাপ যদি উদাস, তবে ঢলঢল অঙ্গও উদাস। গোলাপের সঙ্গে মেশানো গোলাপি জামার চিহ্ন কেন খুঁজে পাই না? বড় সংক্ষিপ্ত। কেন, হেমন্তের কালিম্পং-এ শীত নেই? বিদায় নিয়েছে! কখন, কেমন করে।'' *(পৃ: ৯৩৮, ঐ)*

''কুন্দনন্দিনীর অঙ্গরাগের ফুলেল সুবাসের থেকেও সুরার গন্ধ চড়া। তার ঝিলঝিকমিক রক্তছটা চোখেমুখেও ফুটে উঠেছিল।''*(পৃ: ৯৪০, ঐ)*

''একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? অবিশ্যি তার আগে বলে রাখি, আমি আপনার খান পাঁচেকের বেশি বই পড়িনি। নিন্দে শুনতে যদি লজ্জা না পান, তাহলে আপনার প্রথম বইয়ের নায়িকা শ্যামাকে ছাড়া কোনো নায়িকাকেই আমার পছন্দ হয়নি।''*(পৃ: ৯৪০, ঐ)*

''আমি নিজের ইচ্ছেয় কারোকে নায়িকা করিনি। চরিত্ররা তাদের নিজেদের মতোই এসেছেন, গিয়েছেন।

'যেমন এখন আমি কুন্দনন্দিনী।'

'এ সময়ের ঘটনা যদি আপনি লেখেন, নায়িকা হবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে।'

'এবার বলুন, আপনার এই কালকূট নামের কারণ কী? অবিশ্যি লেখার মধ্যে আপনি এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু —।' *(পৃ: ৯৪১, ঐ)* লেখক কালকূট কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে প্রথম দেখার বিবরণ ও কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে তাঁর কিছু কিছু কথাবার্তা তুলে ধরা হল কুন্দনন্দিনীকে বোঝার জন্য। ঝকঝকে চেহারায় চলনে বলনে সপ্রতিভভাব, চটুলতা আর হাস্যেলাস্যে কোকিল লাল মদির চোখে চাউনিতে কুন্দনন্দিনী উচ্ছল। কালকূটের কুন্দনন্দিনীকে দেখে মনে সন্দেহ হয়েছে এত সকালে কোথা থেকে সুরা পান করলেন? মেজর ঘোষাল পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে। কুন্দনন্দিনী নিজে বলেছিলেন "কুন্দটা কাটা গেছে অনেক দিনই, এখন কেবল নন্দিনী।" *(পৃ: ৯৩৯ ঐ)* লেখককে জিজ্ঞাসা করছেন "আপনার মতামতটা জানতে চাইছি। কুন্দনন্দিনী না নন্দিনী, কোন্‌টা আপনার ভাল লাগে?" *(পৃ: ৯৩৯, ঐ)*

"আপনার কাছে আমি তাহলে কুন্দনন্দিনীই থাকলাম।" *(পৃ: ৯৪০, ঐ)*

"মিষ্টি ফিষ্টি বাজে নাম। তবে দেখলাম আপনার সঙ্গে মিলে গেল আমার ঠাকুরদার সঙ্গে। তিনি আমাকে বিশেষ বিশেষ নাটুকে ঢঙে লম্বা করে ডাক দিতেন, অয়ি কুন্দনন্দিনী! এ'কথা বলেই হেসে বাঁদিকে ঘাড় এলিয়ে কালকূটের দিকে তাকিয়েছিলেন। আবার একটু পরেই ঠোঁটের কোণে হাসি টিপে "আর একজন আমাকে কুন্দনন্দিনী নামে ডাকত। কলেজে যে ছেলেটির প্রেমে পড়েছিলাম।" *(পৃ: ৯৪০, ঐ)* ঘোষাল সাহেব যোগ দিয়ে তাতে, "যদিও তোরা প্রেমটা করেছিলি চুটিয়ে, ঘোষাল বাড়ির এক হাঁকানিতেই প্রেমের দফা একেবারে গয়া।" *(পৃ: ৯৪০, ঐ)* ঘোষাল সাহেব ফৌজী স্বরে হা হা করে হেসে উঠেছিলেন। কিন্তু কুন্দনন্দিনী হাসতে পারলেন না। "এখন হাঁকানিটা মিনি পুষির থেকেও নরম হয়ে গেছে। কলেজে পড়বার সময়ও যদি ফিরে দাঁড়াতাম, ফলটা কী হতো, তা ভালোই জানি।" *(পৃ: ৯৪০, ঐ)* মুখের চেহারাটা আরো লাল হয়ে গেল এটা কালকূটের নজর এড়িয়ে গেল না। কুন্দনন্দিনীর কাজলটানা চোখের পাতা কয়েক মুহূর্তে বুজে এসেছিল এবং হঠাৎ একটা দমকা নিশ্বাসের মত হেসে উঠে জানিয়েছিলেন তিনি সিরিয়াস হননি ওই কথাটায়। কিন্তু মেজর ঘোষাল প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বোনকে সিগারেট সেধেছিলেন। কালকূটের নজরে এটা আবার বিসদৃশ লেগেছিল। মেয়েরা ধূমপান করে, হুঁকা সেবন করে এটা তার জানা, দেখা। কিন্তু দাদা বোনকে সিগারেট সাধবে এটাতে ঠেক লেগেছিল। কিছু কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কালকূট ভাইবোনের বন্ধুত্বপূর্ণ স্নেহ মেশানো সম্পর্কটি তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে হাস্যলাস্যময়ী কুন্দনন্দিনীর অন্তর্বেদনার একটি ঝলক তুলে এনেছেন। কালকূট নিজেই কুন্দনন্দিনীর মুখ দিয়ে নিজের সাহিত্যকর্মের নায়িকাদের টেনে এনেছেন। শ্যামাকে প্রধান নায়িকা বলিয়ে নিয়েছেন কুন্দনন্দিনীর মুখ দিয়ে।

শ্যামার বেদনাবোধের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর বেদনাবোধকে কালকূট ছুঁতে চেয়েছেন। তাই পরিচয়ের শুরুতেই কথাচ্ছলে শ্যামাকে এনেছেন।

কালকূটের মনের গভীরে ঢেউ। চর্যাপদের মত ভাষা, শুনতে একরকম কিন্তু বাজে অন্য অর্থে। কুন্দনন্দিনী ক্রমশ সুরা ক্রিয়ায় এলিয়ে পড়ছেন, তার উচ্ছলতা, ময়না স্বরে কথাবার্তা, সবই ক্রমশ কালকূটের কাছে অন্যরূপে ফুটে উঠেছে। মেজর ঘোষাল ভগ্নীর জন্য চিন্তিত, মুখে প্রকাশ করছেন না কিন্তু উদ্বিগ্ন চাহনিতে কালকূট বুঝতে পেরেছেন।

কালিম্পং থেকে নীচে নেমে আসতে আসতে কুন্দনন্দিনীকে বিচিত্র রূপে দেখতে দেখতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলেন। তিস্তার সেতুর উপর দিয়ে যেতে যেতে প্রথম কাছ থেকে তিস্তাকে দেখলেন কিন্তু কুন্দনন্দিনীর জন্য তেমন করে দেখতে পেলেন না। ঘুমন্ত ভগ্নীকে দেখে মেজরের উদ্বিগ্ন স্বরে স্নেহ ঝরে পড়ল "থাকতে দিন, না হলে আবার খেতে চাইবে। একটু ঘুমিয়ে নিলে নিচে গিয়ে সুস্থভাবে কথা বলতে পারবে। আপনার একটু অসুবিধা হবে।" *(পৃ: ৯৪৮, ঐ)* কালকূট মেজর সাহেবের অন্তঃস্থলে ঢুকে পড়েছেন। তার মনে শঙ্কা কাজ করছে। ভগ্নীপতির কাছে যাচ্ছে তার ভগ্নী। আকণ্ঠ সুরাপানে ভগ্নী নিজেকে স্থির রাখতে পারে নি। যতক্ষণ হাতে পানীয় ততক্ষণই কুন্দনন্দিনী পান করে যাবেন, পান করতে তার ভাল লাগে। কালকূট কুন্দনন্দিনীর এই বেদনার, দীর্ঘশ্বাসের অনুসন্ধান করতে লাগলেন তার মনের গহীনে। শিলিগুড়িতে নেমে ফিরে আসার সময়ে বুঝেও গেলেন কোথায় বেদনার সুর বাজে। মেজর ঘোষালের হৃদয়ও ব্যথিত। পাহাড়ী পথে তিস্তার গতির সঙ্গে দুরন্তগতিতে, প্রাণভরা উচ্ছলতায় তারা নেমে এসেছিলেন, তিস্তা সমতলে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিস্তার বুকের পাটায় সমুদ্রের বিস্তার, নদীতীরে ভাঙনের মতো কুন্দনন্দিনীর বুকের পাটায় বেদনার বিস্তার দেখতে পেলেন। তিস্তার পারে ভাঙনের মত কুন্দনন্দিনীর হৃদয়ের ভাঙন স্পষ্ট হয়ে কালকূটের চোখে ধরা পড়ল। নদী ও নারী কালকূটকে অন্য এক অনুভূতিতে পৌঁছে দিল।

এরপর আবার সমতল থেকে উপরে ওঠার পালা। বেদনায় বয়ে যাওয়া কুন্দনন্দিনী, গাম্ভীর্যের পর্দায় ঢাকা মেজর সাহেবের মাঝখানে বসে কালকূটের মন এক ধরনের অস্বস্তিতে ভরে উঠল। তিস্তার ঢলের কলকলানি নিয়ে নেমে এসেছিলেন আর এখন উঠছেন প্রাণের ঘরের দরজা বন্ধ করে। কুন্দনন্দিনীকে শিলিগুড়িতে রেখে লেখক ও মেজর সাহেব চলে আসবেন তাতে আসন্ন বিচ্ছেদে কালকূটের মনটাও ভারাক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু কুন্দনন্দিনী না যাওয়াতে মনের বিষণ্ণতাভাব মনের অজান্তেই কেটে গেছে। কিন্তু তিনজনেই চলেছে একে অপরের অচেনার মত, নীচে নেমে আসার সঙ্গে উপরে যাওয়ার চিত্র মিলছে না। কিন্তু কালকূট জানেন এ স্তব্ধতা সাময়িক, পারিবারিক ঝামেলার মধ্যে কালকূটের উপস্থিতি একটু অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সময়

সাপেক্ষে এ অস্বস্তি কাটিয়ে উঠবে। কিছুক্ষণ পরে কুন্দনন্দিনীই মুখ খুললেন। তিনি তিতুর কাছে দার্জিলিং-এ চলে গেলে ভালো করতেন। একথা শুনে মেজর ঘোষাল ভগ্নীকে ধমকই দিলেন। তিতু এই ঘটনায় আরও অপ্রস্তুতে পড়ে সকলকে ট্রাংককল করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। কালকূটের সামনেই ভগ্নীকে ধমক দেওয়াতে কুন্দনন্দিনী নিজেই দাদাকে বললেন যে দাদার গম্ভীর মুখ তার ভালো লাগছে না। দাদা মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কুন্দনন্দিনী যে কোনো কাজের কাজ করতে পারেন না। লেখকের সামনেই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। কলকাতায় ফিরতে চেয়েও ফিরতে পারলেন না। অগ্রজ ভ্রাতা ভগ্নীকে বলছেন যে, বরেনের দায়িত্ব তিনি বোঝেন। জেদাজেদি না করে একটা ফাইনাল ডিভিশনে আসতেই হবে। মিনির কথা ভাবতেই হবে। কুন্দনন্দিনী মুখ ভার করে থাকলে তিনিও ভালো করে গাড়ী চালাতে পারবেন না। কালকূট দুই ভ্রাতা ভগ্নীর কথার ফেরে ঢুকে পড়েছেন। দুজনেই বেদনায় সমান তালে বেজে উঠেছেন। ছোট্ট মিনির কথা ভেবে মেজর সাহেব ভগ্নীকে বকছেন, মুখ কপট গাম্ভীর্য এনে আবার এও বলছেন যে এজন্য কুন্দনন্দিনীকেও তিনি দোষ দিচ্ছেন না। কুন্দনন্দিনী কোনো জবাব না দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কালকূট বলছেন "আবার আমার প্রাণের হাওয়ায় ঠেক। আমি এখন না নিজের ঘরেতে, না থাকতে চাই পরের ঘরে। আমি এখন পথের কিন্তু থাকতে পারছি না যে। এখন আমি অন্য আকাশ তলে। তার রোদের কিরণ, মেঘের ছায়া, বর্ষার জলকে আমি এড়াবো কেমন করে। অতএব আমিও সামনের দিকে তাকিয়ে ধূমপান করি।" *(পৃ: ৯৫৩, ঐ)*

কুন্দনন্দিনী মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে করতে কালকূট কূলনাশিনী তিস্তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। হেমন্তের রৌদ্রকিরণে বিস্তর বালুচর আর তিন নীল স্রোতধারা চিক্‌চিক্ করছে। কুন্দনন্দিনী এবং তিস্তা দুজনেই কালকূটের ডানদিকে। সামনে নীল অরণ্য পাহাড়। ঝুলন্ত সেতু পার না হওয়া পর্যন্ত তিস্তা কালকূটের চলার পথের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকবে। কালকূটের মনে সেই হাতছানি "কোথা থেকে আসছো তুমি? কোথায় তোমার জন্মভূমি? তুষার সিংহের পায়ের তলায়। কবে তোমার সেই আঁতুর ঘরখানি দেখতে পাবো?" *(পৃ: ৯৫৩, ঐ)* তিস্তার সঙ্গে যেতে যেতে কালকূট কল্পনাবিলাসী হয়ে যান। জলের ধারায় কি রহস্য লুক্কায়িত আছে? কুন্দনন্দিনী কালকূটের ধ্যান ভাঙিয়ে আবার পুরোনো ছন্দে ফেরার চেষ্টা করতে লাগলেন। কুন্দনন্দিনী তার মানসিক দ্বন্দ্বের কথাই ফিরে ফিরে তুলতে লাগলেন। "আপনি তো মশাই আস্তাকুঁড় ঘাঁটা মানুষ। এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে আপনার কী আসে যায়?" *(পৃ: ৯৫৪, ঐ)* কালকূটকে জানতে চাইছেন "আস্তাকুঁড়ের কথা কেন বলছেন?" *(পৃ: ৯৫৪, ঐ)*

"কারণ, আস্তাকুঁড়ের ঘটনা বলে।" *(পৃ: ৯৫৪, ঐ)*

কালকূট নির্বিকার থাকার চেষ্টা করছেন কিন্তু কুন্দনন্দিনী তাঁকে সেই অবসরটুকুও দিচ্ছেন

না। মেজর ঘোষাল কালকূটকে বিরক্ত করতে না করছেন। কিন্তু কুন্দনন্দিনী শুনবে কেন। ধীরে ধীরে আগের ছন্দে ফিরছে সে। লেখককে কুন্দনন্দিনী বলছেন যে তিনি তাঁকে বুঝতে পারছেন না। "আপনার যে-কটা লেখা পড়েছি, সেখানে যেমন আপনাকে বোঝা যায়, সেইরকম বুঝবো?" *(পৃ: ৯৫৪, ঐ)* আরও বললেন," *(পৃ: ৯৫৪, ঐ)* "আপনার ছলনার অন্ত নেই। রাগের মুখে দিব্যি হাসতে পারেন। মিথ্যে কথা বলতে পারেন অনায়াসে।" *(পৃ: ৯৫৪, ঐ)* মেজর সাহেবও এই রঙ্গরসিকতায় যোগ দিয়ে রিয়ার ভিউ ফাইন্ডারটা ঘুরিয়ে দিতে চাইলেন কালকূটের ধরা পড়ে যাওয়া বোকা বোকা মুখটি দেখে নেওয়ার জন্য। কালকূটের চতুরালি দেখে কুন্দনন্দিনী বলে উঠলেন "সেটাও জানেন, আপনাকে বোকা বোকা লাগছে। গুরু পায়ের ধূলো দিন, এমন চতুরালি কমই দেখেছি।" *(পৃ: ৯৫৪, ঐ)* কুন্দনন্দিনী কালকূটের কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকতেই আতঙ্কিত হয়ে কুন্দনন্দিনীর হাত ধরতে গিয়ে বলে উঠলেন "দোহাই, অমন কাজটি করবেন না।" *(পৃ: ৯৫৪, ঐ)*

দুই ভ্রাতা-ভগ্নী একসঙ্গে সুর বেঁধে হাসতে লাগলেন। কালকূটের মনে হল এতে তিস্তার খলখল হাসিও যেন ডুবে যাচ্ছে। কালকূটের যে ওদেরকে অসহনীয় লাগছে না এটা শুনে কুন্দনন্দিনী তাকে কুহকী হতে মানা করলেন। কালকূট ভাবছেন দুই ভ্রাতাভগ্নী কোন সুরে বাজছেন? একবার বললেন, ছলনাকারী, একবার কুহকী একবার মিথ্যুক। তাকে চিনতে কুন্দনন্দিনীর ভুল হয়নি। কালকূট কারও কাছে মানুষ নন। লেখক হলেও কালকূট পুরুষ। আর পুরুষকে মেয়েরা ভালই চেনে। "আপনি আদৌ কারোর কাছেই নেই, সেটা ঘরের বলুন, আর বাইরেই বলুন। লিখি না বলে, আমরা কি কিছুই বুঝি না?" *(পৃ: ৯৫৪, ঐ)* মেজর সাহেবও মাঝে মাঝে কথার তীর ছুঁড়ে যাচ্ছেন। লেখক বুঝলেন ভ্রাতাভগ্নীতে ভাল মিল আছে। কুন্দনন্দিনীকে মেজর সাহেব আর সুরা পান করতে দিলেন না। তিস্তার ঝুলন্ত সেতু দেখা গেল, দেখা গেল পাহাড়ের উঁচুতে নিচুতে আলোর বিন্দু।

কালিম্পং পর্যন্ত সমান তালে বেজে চলতে লাগলেন দুই ভাইবোন। কালকূট দু'জনের অন্তঃস্থল পরখ করলেন। কুন্দনন্দিনীর হৃদয় বেদনায় পূর্ণ। সাংসারিক জীবনে মন দিতে পারছেন না। সন্তানের কথা বলে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। স্বামীর সঙ্গে ফিরে যাবেন বলে নেমেও এলেন কিন্তু কি একটা দ্বিধায় টিকিট ছিঁড়ে ফেলে ফিরে চললেন কালিম্পং। অগ্রজ ভ্রাতা মেজর সাহেব ভগ্নীর এই মনের ব্যথার সমব্যথী। তিনি প্রতিমুহূর্তে স্নেহশীল বোনের প্রতি, তার আব্দারে বাধা দেন না। কিন্তু কখনও কখনও নিজের অসন্তোষের কথা বলতে ভোলেন না। দাদা হিসাবে তার করণীয় সুপরামর্শ দিতেও ভোলেন না। লেখককে কাছের মানুষ মনে করে বোনের অপ্রীতিকর কার্যে বিরক্তি প্রকাশ করেন আবার বোনের সঙ্গে কালকূটের কথাবার্তায় তাল দিয়ে তিস্তার জলধারার স্রোতের সঙ্গে বেজে ওঠেন। বোনের বেদনাকে হৃদয় দিয়ে ছুঁতে চান। সেদিনই

রাত দশটায় দত্ত সাহেবের খাওয়ার টেবিলে একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেল। সিকিমের কথা উঠতেই কুন্দনন্দিনীর আহ্বান "এতই যখন আপনার সে দেশ দেখার ইচ্ছে, তবে আর দেরি কেন? আমাদের সঙ্গেই চলুন না?" *(পৃ: ৯৫৫, ঐ)* কালকূট এ আহ্বানকে বলেছেন আদেখল্‌কে কলা দেখানো আর পাগলকে সাঁকো নাড়া দেওয়ার কথা বলা একই কথা।

"তুষার সিংহের পায়ের তলায় তিস্তার সেই জন্মস্থান। শুনেই তো মন পাগল হয়েছিল। কিন্তু সেই যে আমার টিকিয়ে রাধাকিষেণ? কলকাতায় না ফেরবার অসুবিধের কথা তুলেছিলাম। আমাকে অবাক করে দিতে দত্ত বলেছিলেন, 'আরে রাখো তো তোমার কলকাতা। দরকার হলে, ট্রাংককলে জানিয়ে দিও, ফিরতে দু'একদিন দেরি হবে। লেখা পাঠাতে হবে? পাঠিয়ে দিও শিলিগুড়িতে, চলে যাবে এয়ার লাইনস্-এর প্যাকেটে, নয়তো এয়ার ক্যারিং-এ। মেজর ঘোষালের সঙ্গে গেলে অনেক সুবিধা। সেটা কেবল আরামে থাকার জন্য বলছি না। যেসব জায়গায় যেতে তোমার নানা বিধিনিষেধের মধ্যে পড়তে হবে, সেসব উনি ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।" *(পৃ: ৯৫৫, ঐ)* মেজর ঘোষাল তো রাজিই। বলেই ফেললেন যে কাঞ্চনজংঘায় উঠতে না পারলেও পাহাড়ের একদম গভীরে নিয়ে যেতে পারবেন। ব্যস পরদিন সকাল আটটায় যাত্রা শুরু। মানবী তিস্তার আহ্বানে তুষার সিংহের পদতলে তিস্তার জন্মস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা। মানবী তিস্তা রমণীয় সাজে সজ্জিতা, লাল পেড়ে গরদের শাড়ি পরিহিতা, প্রসাধনে ঠোঁটে চোখে রঙ। কিন্তু সবকিছু ছাড়িয়ে গেছে কালো চুলের ফাঁকে সিঁদুরের রেখা ও কপালে সদ্য সূর্য ওঠা সূর্য লাল ফোঁটা। অঙ্গ রাগে ফুলেল সুবাস আর কোলের ওপর রেশমী সুতো কাজ করা লাল টকটকে পশমী শাল। একটা স্নিগ্ধ পবিত্রতা এনে দিয়েছে যার সঙ্গে আগের দিনের দেখার মিল নেই। কালকূটের চোখে নতুন রূপে ধরা দিয়েছেন কুন্দনন্দিনী। নামের মতো পবিত্রতা ছড়িয়ে আছে। কালকূট মুগ্ধ হয়ে গেছেন, ভুলে গেছেন এই নারী সুরাপান করেন আর ধূমপানও করেন। বেদনাপূর্ণ হৃদয়ে নিজেকে শেষ করে দেবার নেশায় মেতেছেন। কুন্দনন্দিনী আপন চলার ছন্দে তিস্তার মতো খল্‌খল্ করে বাজতে লাগলেন। "মেজদা, লেখককে প্রায় লুঠ করে নিয়ে আসা হলো তাই না?" *(পৃ: ৯৫৬, ঐ)*
"মাঝে মাঝে এরকম লুঠ না করলে আমাদেরই বা চলে কী করে? চিরকালটা কি দেশের সীমান্ত পাহারা দিয়েই কাটবে? মাঝে মধ্যে তাই এরকম লুঠপাটও করতে হবে।" *(পৃ: ৯৫৬, ঐ)* "তোমার সঙ্গে থেকে লুঠের ভাগ আমিও কিছু পেলাম" কুন্দনন্দিনী হাততালি দিয়ে আনন্দে বেলে উঠলেন। কালকূট নিজের মনে উঁকি দেন। লুঠ তো তিনি নিজেই হতে চেয়েছেন। এখন তার 'মন চলো তুষার সিংহের দেশে' *(পৃ: ৯৫৬, ঐ)*। কালকূট নিজেই উত্তরে জানালেন যে লুঠ হতে যে এত আনন্দ হয় তা তাঁর আগে জানা ছিল না। তবে পেছনের টানটা ছাড়িয়ে আসাটা কঠিন ব্যাপার ছিল। লেখকদের স্বাধীনতা থাকলেও তিনি আজও বুঝে উঠতে পারেন নি স্বাধীনতা কথাটার অর্থ

কী। মেজর ঘোষাল বলেছেন কালকূটের কথাকে মান্যতা দিলেন। তিনিও বললেন "শর্তহীন স্বাধীনতা বলে কিছু নেই।" বলেই ভগ্নীকে বললেন যে তিনি এ'কথা কুন্দনন্দিনীকে বলেন নি। কুন্দনন্দিনীর বিষণ্ণতা কালকূটের নজর এড়িয়ে গেল না। তার উত্তর ছিল "ও সব স্বাধীনতার কথা জানি না। কিন্তু আমি আর জীবনে কোনো শর্তই মানতে রাজী নয়। কার শর্ত, কে মানে?" *(পৃ: ৯৫৬, ঐ)* কালকূট এই বিশেষ মুহূর্ত তুলে ধরেছেন তার অর্ন্তদৃষ্টির মধ্য দিয়ে। "কুন্দনন্দিনীর কোনো কোনো আচরণ আর কথায় মনে হচ্ছে কোথায় তাঁর বুকের একটা তার অতি বন্ধনে টান হয়ে আছে। এই মুহূর্তে তাঁকে আমার কেমন যুগপৎ বিদ্রোহিনী এবং অপরিণত বালিকার মতো লাগছে। তবু এ আবহাওয়াটা ভালো না।" *(পৃ: ৯৫৬, ঐ)*

কালকূট নিজের ভাবনাটাকে তুলে ধরেছেন সমতলে সর্বনাশী একলা তিস্তা নয়, আরো অনেক আছে তারা কেউ কেউ তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেউ সর্বনেশা। হেমন্তের এই ঋতুতে সমতলে তারা সকলেই শান্ত, অলস আর যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন কিন্তু এই হিমালয়ের বুকে সবুজ অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে তিস্তা আকাশের নীচে ঝলকাচ্ছে। মেজর সাহেব ভগ্নীর বেদনাবোধ ও প্রতিবাদী স্বর বুঝতে পেরেই কৌতুকে ফিরে গেলেন। লুঠের মালকে ভোগ করতে বললেন। অগ্রজ ভ্রাতার ভগ্নীর মন ভালো করার কী স্নেহপূর্ণ প্রচেষ্টা। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় এলোমেলো চুল, লালপাড় শাড়ীর আঁচল বক্ষ ছেড়ে গড়িয়ে নীচে। কুন্দনন্দিনীর ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে কালকূটকে প্রশ্ন "একটা কথাই খালি জিজ্ঞাসা করবো, আপনিও কি শর্তবাদী?" *(পৃ: ৯৫৭, ঐ)* কুন্দনন্দিনী কোন শর্ত মানতে রাজি নন তাই কালকূট কুন্দনন্দিনীকে হঠাৎ বলে বসেন "তাহলে দিন না আমাকে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে!" *(পৃ: ৯৫৭, ঐ)* কুন্দনন্দিনী চমকে উঠলেন এই কথায়। মেজর সাহেব বললেন এটাই স্বাধীনতা শর্তসাপেক্ষ। কুন্দনন্দিনী আহত হলেন; লেখক তাঁকে দুঃখ দিতে চাননি। একটা উদাহরণে মাত্র বোঝাতে চেয়েছিলেন--- "আপনিও শর্ত মেনে চলেন। আপনি পরের ক্ষতি করে কি নিজের স্বাধীন ইচ্ছা খাটাতে পারেন?" *(পৃ: ৯৫৭, ঐ)* শুধু তাই নয় নিজের ক্ষতিও তেমন করে করা যায় না কারণ তাতে অন্যের ক্ষতি হতে পারে। কালকূট বুঝেছেন গভীর যন্ত্রণাবোধ থেকেই কুন্দনন্দিনীর এই সিদ্ধান্ত "নিজের ক্ষতি করবার স্বাধীনতা আমার নিশ্চয়ই আছে? আমার নিজের জীবন নিয়ে আমি নিশ্চয়ই যা খুশি তা করতে পারি।" *(পৃ: ৯৫৭, ঐ)* কালকূট কুন্দনন্দিনীকে মানুষের ইন্টারনিটির কথা বোঝাতে থাকেন। সুখ দুঃখকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না। অনেক হতাশার মধ্যেও লেখকের এই কথাটা মনে আসে – "এমন মানব জমিন রইলো পতিত। আবাদ করলে ফলতো সোনা..." *(পৃ: ৯৫৭, ঐ)* ঘোষাল সাহেব লেখকের কথাটার প্রশংসা করলেন। আর কুন্দনন্দিনীর বেদনায় চোখের কোণ চিক্‌চিক্ করে উঠলো। বাঁ দিকে আলতো করে চোখে ছোঁয়ালেন। অভিমান জড়িত স্বরে বলে উঠলেন "আমার প্রসন্ন মুখ কেউ তো দেখতে চায় না।" *(পৃ: ৯৫৭, ঐ)*

মেজর ঘোষাল ইঙ্গিত বুঝতে পেরে গম্ভীর স্বরে চোখ পাকিয়ে বললেন যে বাজে কথা একটিও নয়। মেঘ-বৃষ্টি উধাও হয়ে রোদের ঝলক ছড়িয়ে পড়ল। খিলখিল করে হেসে উঠে কালো বেড়ালটা বের করতে বললেন দাদাকে। কিন্তু মেজর সাহেব দিলেন না তার আদরের বোনটিকে, পান খেয়ে সময়টা কাটিয়ে দিতে বললেন। কালকূট দেখলেন বিরল মুহূর্ত ভাইবোনের জমাটি খুনসুটির আসর।

রংপো ছাড়িয়ে সিংতাম চলে আসতেই মেজর সাহেব জানিয়ে দিলেন যে এরপর থেকে তিস্তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। তিস্তা পশ্চিম দিকে দিকছুর দিকে সরে গেছে। যে সর্বনাশীর আঁতুরঘর দেখবেন বলে ছুটে এসেছেন তার সঙ্গে বিচ্ছেদ? গ্যাংটককে গাংতো বলা হয় সিকিমে। গাংতোর পাহাড় ভেঙে কিছুটা গেলেই তিস্তার গর্জন শোনা যাবে। তিস্তাকে আবার দেখা যাবে উত্তর সিকিমে। তিস্তাকে দেখা যাবে না, তাদের চলার পথে দূরে দূরে চলেছে। মেজর সাহেব কালকূটকে ভৌগোলিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করছেন। "রংপো থেকে রংলিং, তারপরে কুলুপ থেকে নাথুলা। সিকিমের একটা সীমান্ত। ওই পথেই ভূটান যাওয়া যেত আগে, এখন চীনাদের বন্দুক বেয়নেট পথ আটকে রেখেছে। জহরলাল নেহরু যখন শ্রীমতী গান্ধীকে নিয়ে এসেছিলেন পঞ্চাশের দশকে, তখন তিনি গ্যাংটক থেকে ঘোড়া আর ইয়াকের পিঠে চেপে, ওই পথ দিয়েই ভূটান গিয়েছিলেন তখনো রাজনৈতিক আবহাওয়া এখনকার মতো তিক্ত হয়ে ওঠেনি।" *(পৃ: ৯৫৮, ঐ)* মেজর বলে চলেছেন ভারতের রোমান্টিক নায়কোচিত প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর কথা, যিনি ওই বয়সে তেরো হাজার ফিটেরও ওপর বরফের ওপর দিয়ে অনায়াসে মেয়ে ইন্দিরাকে নিয়ে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। কিংডম অব ড্রাগন খুব অবাক হয়েছিলেন। ভূটানকে কিংডম অব ড্রাগন বলা হয় সেই হিসেবে সিকিম রাজ্যকে কিংডম অব ডেনজং বলা যায়। ডেনজং হল ভ্যালি অব রাইস। সিকিম হল ভ্যালি অব রাইস। কালকূট যখন সিকিম যাত্রা করেছিলেন তখনও সিকিম ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয় নি। সিকিমের সপ্তম বার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত সরকার বহু টাকা ব্যয় করেছিলেন সীমান্ত রক্ষার সতর্কতায়। তিব্বত থেকে কিছু সাহসী অভিযাত্রী সিকিম, ভূটানে ও ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল। এরাই ভোটিয়া নামে পরিচিত। সিকিমে লেপচা আর ভোটিয়া, এই দুই মিশ্র কালচারের দেশ। নেপালীরা সিকিমে সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু এরাও বাইরে থেকেই এসেছে। এখন এরা এই সয়েলের অধিবাসী। গণতান্ত্রিক অধিকার দাবী করছে এরা। মেজর ঘোষাল পাহাড়ী রাজত্বের ইতিহাস তন্ময়ভাবে বলে চলেছেন। মুগ্ধ শ্রোতা কালকূট ও কুন্দনন্দিনী। কুন্দনন্দিনী গল্পের নেশায় মেতে উঠেছেন। সিংতাম ছাড়িয়ে এসেছেন অনেক আগেই। হঠাৎ কালকূট চেঁচিয়ে উঠলেন, রূপে মুগ্ধ "আহ্, বরফ-বড়-পাঁচ-খাজাঞ্চিখানা। আমি যেন অতি নিকটে দেখতে পাচ্ছি, সুবিস্তৃত এক তুষার সাদা উঠোন। তার ওপরে বিচিত্র রূপ কয়েকটি শৃঙ্গ, ধূসর

আর সবুজ তাদের রঙ। কারোর শীর্ষই তীক্ষ্ম না, যেন উঁচু বাড়ির মতো। স্পষ্টই তাদের ছায়া পড়েছে শাদা উঠোনের ওপর, আমি ওই উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, কল্পনা মাত্র একটা শিহরণ অনুভব করলাম। এমন রূপে এঁকে আমি আর কোথাও থেকে দেখিনি।" *(পৃ: ৯৫৯, ঐ)* আবরণহীন বিশাল মহিমময় সৌন্দর্যে কালকূট অভিভূত, চোখ ফেরাতে পারছিলেন না, তিনি বর্তমান ভুলে গেলেন। "আস্তে আস্তে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো দীপ্ত এক তুষার সিংহ। প্রকৃতই তার পান্না রঙের কেশর ফোলানো। দুটি গাঢ় নীল গোলক চক্ষু। দৃষ্টি এদিকেই" *(পৃ: ৯৫৯, ঐ)* আস্তে আস্তে আমার চোখের সামনে একটি ঢেউ খেলানো কালো পর্দা ভেসে উঠলো। পর্দা উড়ছে। তার ফাঁক দিয়ে ভেসে উঠলো দুটি কালো উজ্জ্বল তারা, রক্তিম দুটি ঠোঁট। সিংহের পদতলে সর্বনাশীর চোখ নাকি? ঠোঁট দুটি কাঁপলো। ফিসফিস স্বর শুনতে পেলাম, 'ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন নাকি।' মুখ পিছনে নিয়ে গেলাম। কুন্দনন্দিনী ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।"

কালকূটের কাছে এই তুষার চূড়ার বিরাটত্ব আর তার মহিমা রহস্যের মত মনে হল। তিনি কুন্দনন্দিনীকে বললেন যে ঈশ্বরের অনুভূতি কী তিনি জানেন না কিন্তু তার সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক পাতাতে চান। তার মনের ভিতরে কী যেন একটা বাজছে। তার ভেতরের অন্ধকারকে যেন ধুইয়ে দিচ্ছে। কুন্দনন্দিনী অবাক বিস্ময় রুদ্ধ স্বরে লেখকের মুখে ভেতরের অন্ধকার শুনে লেখককে বললেন "আহ্ তাহলে আমি কী বলবো! এসব কি মনের কৃষিকাজ!" *(পৃ: ৯৫৯, ঐ)* চোখের জলে কুন্দনন্দিনী ভাসছে।

এই অভাবিত ঘটনা দেখে মেজর সাহেব খুশিতে বলে উঠলেন 'মেটক-ছার্প, মেটক-ছার্প।' রোদের বুকে বৃষ্টি নামলে সিকিমীরা এই তিব্বতী শব্দটা বলে থাকেন। সিকিমের রাজধানীতে প্রবেশের মুখে এরকম ঘটনা হল শুভ সূচনা। 'আকাশে নেই, চোখে তো আছে। সেও বৃষ্টিই' মেজর সাহেব এই কথা বলে ভগ্নীর দিকে তাকালেন। অমনি আদুরে ভগ্নী বেরিয়ে এল। মেজদা ভগ্নীর মাথায় হাত রাখলেন, কালকূটের চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

সিকিমে তিনদিন কাটিয়ে উত্তর সিকিমে যাওয়ার জন্য যাবতীয় আইনের বেড়াজাল কাটিয়ে একটি জোংগা মেজর ঘোষালের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। এই তিনদিনে কালকূট মেজর ঘোষালের স্ত্রী ও দুই পুত্র কন্যা ছাড়াও আরও অনেকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। ফৌজী কর্তার নিরভিমান শান্ত গৃহবধূ। পুজো পার্বন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুজো, সব নিয়ম মেনে উপবাস, দুর্বা, উলুধ্বনি এগুলো তো আছেই। তার সঙ্গে ননদের সিঁথিতে সিঁদুর পায়ে আলতা পরাতেও ছাড়েন না। আর ননদকে চোখে চোখে রাখেন, বেশি সুরাপান করতে দেন না। একটি সুখী গৃহকোণ। স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার বাঙালী ম্যানেজার ও বাঙালী সাংবাদিক সহ এদের পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তিব্বতী মুসলমান হোটেলের মালিকের সঙ্গে আলাপ।

ওনার ছয় মেয়ে, বড় মেয়ে দুটি, নার্গিস ও হাসিনা কলকাতায় পড়াশুনা করে। কী অদ্ভুদ ব্যাপার— কলকাতায় এই মেয়ে দুটির সঙ্গে কালকূটের পরিচয় হয়েছিল। সিকিমে দোকানপাটের বেশিরভাগ মালিকই মাড়োয়ারী। ওই হোটেলেই দেখা হয়ে গেল টোমবের সঙ্গে। বিলিতি পোশাক তার অঙ্গে। মাথায় জাহাজী টুপি। টোমবের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আগের বছর শিলিগুড়িতে। কালকূটের বন্ধু বাদলরাজ সিন্‌হা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। দু'জনেই সামরিক কনট্রাক্টর। টোমবে লেখককে সিকিমে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, আশ্চর্যজনকভাবে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সি বি আই অফিসার মিঃ বসু কালকূটের সঙ্গে কথা বলতে চান একথা জানিয়ে টোমবে ডেকে নিয়ে গেল হোটেলের অন্য একটি টেবিলে। মিঃ বসু কালকূটকে দেখেছেন কালকূটের মফস্বল শহরে। মিঃ বসু সেই থানার অফিসার ছিলেন। কালকূট গাংটকে এসেছেন জেনে তিনি আলাপ করতে এসেছেন। মিঃ বসু সি. বি. অফিসার বলে কালকূট মনে মনে একটু সন্ত্রস্ত ছিলেন, কিন্তু মানুষটি সদাশয় ভদ্র। ছেলে কলেজে পড়ে। স্ত্রী নেই, বড় মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন, ছোট মেয়ে বিবাহযোগ্যা। মিঃ ঘোষালের জন্যই যে কালকূটের উত্তর সিকিমে যাওয়া সম্ভব হয়েছে এটা জানাতে ভুললেন না। কালকূট বিচিত্র পরিবেশে বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। আর গেছেন ভারতীয় সামরিক ব্যারাক অফিসারর্স মেসটিতে 'স্বস্তিক'। পাহাড় চূড়ায় অফিসার্স মেস। খাড়া, ন্যাড়া, মৃত্যুবাঁক পেরিয়ে জোঙায় করে যেতে হয় সেখানে। মেসের তত্ত্বাবধায়ক সামরিক ক্যাপটেন মিঃ বাসু। অফিসার্স ক্লাবের মহারাণী রূপে দেখেছেন কুন্দনন্দিনীকে। পানীয় যেন তিস্তার স্রোতকেও হার মানায়, আর কুন্দনন্দিনীর হাত থেকে পানপাত্র নামাতে দেখেন নি কালকূট, ক্লাবে আরো ফৌজী মহিলা এসেছেন, সকলের হাতেই পানপাত্র, কিন্তু কুন্দনন্দিনী অনন্যা। কালকূট দেখেছেন কুন্দনন্দিনীর ক্লান্তি নেই। পাশ্চাত্য নৃত্য-পটিয়সী। কালকূটকেও নৃত্যে আহ্বান করেছিলেন। কালকূট দেখেছেন কুন্দনন্দিনী কিভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন স্বস্তিকে। বাজনার ঝংকার, সুরার ফোয়ারা, উদ্দাম নাচে সকলের রক্তে আদিম রূপ ঝাঁপিয়ে পড়ত নিবিড় আলিঙ্গনে, চুম্বনের হিল্লোলে।

"কুন্দনন্দিনী ক্লাব ঘরের কাঁচের দরজা জানলা ঝনঝনিয়ে তুলতেন হাসির কলরোলে। আমার মনে হতো, তিস্তার ঢল নামার গর্জন শুনতে পাচ্ছি। তাঁর আরক্ত চোখের দৃষ্টি থাকতো চঞ্চল অস্থির। মাঝে মাঝে আমাকে অদ্ভুত প্রশ্ন করতেন, 'লেখক, মৃত্যুর রূপ কেমন আপনি জানেন?' অথবা, 'আপনি কিছুই জানেন না। আপনার লেখায় মৃত্যুতে কেবল শোক। সুখের কথা নেই।' কখনো বা, 'কী আপনার সেই ইন্টারনিটি? মান্ধাতা আমলের মানব জমিনের পতিত উদ্ধার? আসুন আমার সঙ্গে কৃষিকার্য করবেন, আপনি তো মশাই আসল কৃষিকাজই জানেন না।' ... যখন সেখান থেকে মেজরের কোর্য়াটারে নেমে আসা হতো, তখন তিনি সম্পূর্ণ অচৈতন্য,

স্খলিত তাঁর বসন, অঙ্গরাগে সুরার গ্লানি" *(পৃ: ৯৬২, ঐ)* কালকূট দেখেছেন লাস্যময়ী, রঙ্গরসে মনমোহিনী কুন্দনন্দিনীকে বেদনার অশ্রুজলে বয়ে যেতে। কালকূট শুনেছেন তার সেই হৃদয়ের বেদনার আর্তনাদ। অচৈতন্য অবস্থায় বলে উঠতে শুনেছেন 'যাবো না যাবো না' ধ্বনি। অশ্রুজলে ভেসে যেতে যেতে নিজেরও আঁচলে চুম্বন। কালকূট দেখছেন কী দুঃসহ মর্মবেদনায় কুন্দনন্দিনী নিজেকে শেষ করে দিচ্ছেন। কাকে চুম্বন করছেন? সন্তানকে, যে তার অবচেতনে বুক জুড়ে আছে। রঙ্গিণী পরিহাসপ্রিয়া কুন্দনন্দিনী নীল হয়ে যাচ্ছে। বেদনার ছায়া কুন্দনন্দিনীর সৌন্দর্যমণ্ডিত শিশুসুলভ মুখটিতে।

কালকূট মেজর ঘোষালের কাছে জেনেছেন এই বেদনার ইতিহাস। মি: বরেন মুখার্জীর ভুঁইফোড় আত্মপ্রকাশের মূলে ছিল কুন্দনন্দিনীর দুঃসহ অবদান। খেলার ছলে যে কাজ শুরু করেছিলেন সেটাই এখন তার গলার ফাঁস হয়ে আটকে গেছে। সেই নিচে নেমে এসে খেলার তীব্র অনভূতিই কুন্দনন্দিনীকে দগ্ধে দগ্ধে মারছে। তিনি শর্তহীন স্বাধীনতায় বিশ্বাসী; বরেন মুখার্জীকে তিনি তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে দিচ্ছেন না। হৃদয়ের দরজা তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন। আর একদিকে সন্তানের জন্য মাতৃহৃদয়ের হাহাকার। এই দুই আবর্তে পড়ে তিনি বিদ্রোহিনী হয়েছেন কিন্তু ওদিকে বরেন মুখার্জীও তার অধিকার ছেড়ে দেবেন না, কুন্দনন্দিনীকে তাঁর চাই-ই। কুন্দনন্দিনী পরিহাসপ্রিয়তার অন্তরালে যে একটা হাহাকার, বিদ্রোহিণী মনোভাব আছে সেটা তিনি শিলিগুড়ি যাওয়ার পথেই কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিলেন। তিনি যে কালকূট, সাধারণের চোখে যা ধরা পড়ে না সেখানেই কালকূটের অন্তর্দৃষ্টি ঘুরে ফিরে বেড়ায়। মানবমনের আন্তরভূমিতে তিনি কৃষিকাজ করেন। কালকূট বুঝতে পারেন কেন মেজর ঘোষালের ভগ্নীর দামালপনা আচরণ সহ্য করেন, তার সঙ্গে তাল দিয়ে যান। মেজর সাহেবের সঙ্গে সঙ্গত করেন তার স্নেহশীলা পত্নী। ঘোষাল গিন্নিও চান কুন্দনন্দিনীর জীবনটা আর কিছুতেই নষ্ট না হয়ে যায়। কালকূট বুঝেছেন কুন্দনন্দিনীর কুন্দ কেন অনেক আগেই ঝরে গিয়ে শুধু নন্দিনী হয়ে গিয়েছিল। কেন কুন্দনন্দিনী নিজেকে আস্তাকুঁড় বলে উল্লেখ করেছিল সেটা তিনি বুঝতে পেরেছেন গ্যাংটকে এসে, বিশেষত স্বস্তিকে এসে যা প্রত্যক্ষ করেছেন সেই বেদনার ফুল দিয়েই কালকূট তাঁর রচনায় কুন্দনন্দিনীকে তর্পণ করেছেন। এই গ্রন্থটিও কুন্দনন্দিনীকেই উৎসর্গ করেছেন। কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে লেখকের কথাবার্তা, মেজর সাহেবের তাতে অংশগ্রহণ করা, কখনও ভগ্নীকে কৃত্রিমভাবে শাসন করা, কখনও সিকিমের ইতিহাস বলতে বলতে অতীতে গভীরে প্রবেশ করা সব কালকূট নিপুণ চিত্রকরের মত তুলে ধরেছেন। কাহিনীর চরিত্রগুলো কাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। এই পার্থিব জগতের মানব-মানবী হয়ে বাস্তবের মাটিতে পা রেখেছে। তাদের সুখ দুঃখ, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে সবই জটিল জীবনের ঘূর্ণাবর্ত সবকিছু পাঠকের মনোলোককেও আলোড়িত করেছে।

উত্তর সিকিমে যাওয়ার যাত্রী বেড়েছে আরও দু'জন। কর্ণেল সিপ্‌পি ও শ্রীমতী সিপ্‌পি। কর্ণেল সিপ্‌পি রোগা চেহারার, দেখলে রক্তশূন্য বলে মনে হয়েছে। শ্রীমতী সিপ্‌পি তার উল্টো। কালকূট শ্রীমতী সিপ্‌পিকে দেখে বুঝতে পেরেছেন তিনি কুন্দনন্দিনীকে তেমন পছন্দ করেন না, কথা বলতেও বিরক্তি আসে। ওরা দুজন সামনের সিটে, আর পেছনের সিটে কালকূট, কুন্দনন্দিনী ও মেজর ঘোষাল। কুন্দনন্দিনী মোহময়ীরূপে দশ মিনিট দেরীতে এসে দাঁড়িয়েছেন। চলমান নীল-সুনীল গাছ যেন কালকূটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মাথায় নীল রেশমী রুমাল ও হাতে রাখা আঁচল লুটিয়ে যাচ্ছে। কালকূটের মনে ভাবান্তর --- এতো সাজ কিসের জন্য। যাচ্ছেন তো দূর পাহাড়ে, সেখানে দাগা দেবার জন্য কোন প্রাণ অপেক্ষা করছে। এসেই কুন্দনন্দিনী বাগান থেকে বৌদিকে দিয়ে একটি গোলাপী রঙের গোলাপ কুড়ি আনিয়ে নিয়েছিলেন। লেখকের স্বাস্থ্য এবং মন যেন চিরদিন পিংক থাকে --- এই কথা বলে লেখকের মোটা পশমী আবরণে গুঁজে দিয়েছিলেন। কুন্দনন্দিনী এই কুঁড়িকে আবার আদর করে পিংকি বলেছেন। পেছনে বসার জন্য সামনের দৃশ্য দেখা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে কালকূট কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ। মোরান্‌গা থেকে নিচে নেমে গেলে তিস্তার কাছাকাছি যাওয়া যায়। কালকূট মেজর সাহেবকে কথক ঠাকুরের ভূমিকায় নামিয়েছেন। তিনি বলে চলেছেন, মোরান্‌গা হল রানীর খাসমহল, শুধু মোরান্‌গা কেন প্রায় গোটা উত্তর-সিকিমই রানীর খাসমহল। ছোগিয়াল নামগিয়েলের রানী তিব্বতের রয়্যাল ফ্যামিলির মেয়ে। রানীবিয়ে এটি তো যৌতুক পেয়েছিলেন, তাই এটি রানীর খাসমহল। আর তিব্বতের রয়্যাল ফ্যামিলি বলতে বোঝায় কোনো লামার পরিবারের মেয়ে, তারাই তো লিডিংগড বা গড কিং। কুন্দনন্দিনী কাহিনী শুনেই কালকূটের হাঁটুর কাছে খোঁচা দিয়ে বললেন "নিন, পান দিন, বুঝলেন না, এটা রানীর খাসমহল। অতএব রানীর জাতের সেবা করুন।" *(পৃ: ৯৬৩, ঐ)*

কুন্দনন্দিনী বললেন তিনি যে পিংকিকে দিয়ে অভ্যর্থনা করেছিলেন তার জবাব নয়। সেবা করতে হবে পান দিয়ে। লবঙ্গটা খুলে দিয়ে পান দিলেন কুন্দনন্দিনীর নির্দেশ মতো। লবঙ্গটা কালকূটের হাতেই ছিল ওটা একমাত্র কুন্দনন্দিনীরই অধিকার, তাই নিয়ে নিলেন। কালকূট ভেতরে লজ্জিত হয়ে গেল, মুখে তাঁর বেগুনী আভা পড়ল। সানগম্‌ বলে একটা জায়গায় তুষার সিংহকে, হিমালয়ের কোলে এসে দু'চোখ ভরে দেখবেন বলে। পশ্চিম-উত্তরে তাকিয়ে চিত্রার্পিতের মত কালকূট দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর অনুভূতি চিত্রায়িত করেছেন এইভাবে, "মনে হলো আকাশের বুকে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেইসব পবিত্র চূড়া। সামনে রঙ নীল, উত্তর পাশে সাদা। সামনে বিশাল তুষার প্রাঙ্গন, যেন ঠাকুরদালানের উঠোন। এ আর এক নতুন রূপ। জগৎ স্রষ্টা কে, জানি না। তাঁকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, এমন বাসনা যদি দিয়েছিলেন তবে দু'খানি পাখা কেন দাও নি? সেই গানের মত বলতে ইচ্ছা করে, পাখি যদি হইতাম সখী, উড়ালে যাইতাম নাগর কোলে। কিন্তু

আমার সামনে যিনি বা যাঁরা, তাঁরা কেউ আমার সখী নন। তাঁরা আমার অনুভবের সুখ, হৃদয়ের সম্পদ, প্রাণের মোক্ষ। কেন ব্যথা বাজে প্রাণে, তবু হাসিতে ভরে উঠেছে মন। আমার দু'হাত উঠে এলো বুকের কাছে। নত আমার প্রাণ। কে যেন ভেতর থেকে নমস্কার করছে বারংবার। একে যদি তোমরা আত্মসম্মোহন বলতে চাও, বলো। আমি শৃঙ্গজয়ী না। আমি প্রতিমা দর্শন করছি। এরূপের আর এক নাম অনির্বচণীয়।" তুষার সিংহের পদতলে তিস্তার আঁতুর ঘরের কাছে যাওয়ার পথে তাঁর রূপ মহিমার বর্ণনা করেছেন এইভাবেই। নিজেই মন্ত্রমুগ্ধ, অভিভূত। তাঁর অপরূপ বর্ণনায় পাঠককুলও মন্ত্রমুগ্ধ। যেখানে দাঁড়িয়ে রূপ সৌন্দর্য পান করছিলেন, তাঁরই বহু নিচে ক্ষীণ একটি রেখা নিয়ে পূর্ব দিকে বেঁকে গেছে তিস্তা। সিংতাম-এর পর এখানেই আবার দেখা হল তিস্তার সঙ্গে । নিচে তবুও কালকূটের মনে হল তার বয়ে যাওয়া সুরধ্বনি তিনি তার কানের কাছেই শুনতে পেলেন। "এখনই দেখে মনে হচ্ছে, তুষার সিংহের পদতলে সে বইছে। কুন্দনন্দিনী আমার একপাশে এসে দাঁড়ালেন।" *(পৃ: ৯৬৪, ঐ)* কালকূট এত মুগ্ধ হয়ে কী দেখছেন জানতে চাইলেন কুন্দনন্দিনী। কালকূট কথাশিল্পী হলেও সেই মুহূর্তে তার কোন ভাষাই যোগায় না রূপসৌন্দর্য ব্যক্ত করার মত। বললেন "কথাও কোনো কোনো সময় হারায়, কথার যেখানে শেষ।" *(পৃ: ৯৬৪, ঐ)* তা ঠিক বলে কুন্দনন্দিনী একটু হেসে বললেন "আমার দিকে কেউ এমন করে তাকালে তাকে আর কিছু বলতে হতো না। কথা তখন শেষ।" *(পৃ: ৯৬৪, ঐ)* এই কথা শুনে কালকূট তাকালেন, কুন্দনন্দিনীও তাকিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন মুখে রক্তাভা এনে। আবার চোখ ফেরালেন কালকূটের বুকের পিংকির দিকে, সেটি আরো ভালো করে গুঁজে দিলেন। কালকূট বলছেন কুন্দনন্দিনীর ভাষার আবছা ইঙ্গিত বুঝতে তাঁর ভুল হয়নি। "মুগ্ধকে তিনি বর দিতেন হয় তো, যা কথা নয়। কথার অধিক রমণীর রমণীয়তা। তাঁর রমণীয়তা শরীরের ভান্ডে নানাভাবে পল্লবিত। সম্ভবত সকল পুরুষেরই আকাঙ্খা তাঁকে ঘিরে আছে। কিন্তু গরীব আমার প্রাণ। আমি অন্য সুধায় ফিরি।" *(পৃ: ৯৬৪, ঐ)* কালকূটের মুগ্ধতা কোনদিকে আর মানবী তিস্তা তাঁকে টানছে আর একদিকে। কালকূট তাঁর স্বভাবে বৈরাগ্যে নির্বিকার রয়ে গেলেন। মানবী তিস্তার আহ্বানে। ঠাকুর দালান দেখতে দেখতে গাড়ী থেকে যাতে পড়ে না যান তার জন্য আঁচল দিয়ে বেঁধে রাখতে চাইলেন কুন্দনন্দিনী। কিন্তু নির্বিকার রইলেন রূপসুধা পান করতে করতে।

কর্ণেল সাহেব বমি করতেই জিপ থেমে গেল এবং পরে কালকূট ও কুন্দনন্দিনী সামনে চলে এলেন। কালকূটের মনোবাসনা পূর্ণ হল, সামনে আর কোনো বাধা রইল না পাঁচ চূড়ো দেখবার, হিমারূপ মাধুর্য দেখবার। কালকূট যেহেতু অতিথি সেইহেতু কালকূট অসুস্থ হলে কুন্দনন্দিনী কোলে শুইয়ে অতিথি সেবা করতেন। অন্যের দাবী আছে কিনা তিনি জানতে চান না, এই দাবী শুধু তারই। এরপরই কালো বেড়ালের কাঁচা রক্ত পান করে জানালেন যে গলায় আর

বুকে যে জ্বালাটা লাগে তাতে তিনি বাড়তি সুখ পান। বলেই তিনি কালকূটকে টেস্ট করতে বললেন।

কর্ণেল একটু সুস্থ হলে আবার চলা শুরু হল। মংগানে গিয়ে ওষুধ কেনা হবে, সাময়িক অসুস্থতার ওষুধ মেজর সাহেব দিয়ে দিয়েছেন। কর্ণেল সাহেব ঘুমিয়ে পড়াতে গাড়ি একেবারে সিংঘিকের বাংলোয় গিয়ে থামল দুপুরের আহার সেরে নেওয়ার জন্য। কুন্দনন্দিনী কালো রক্ত পান করেই গেলেন, থামলেন না, কালকূটকে বলে দিলেন যে তাঁর লেখার সময় কেউ কলম চেপে রাখলে কেমন লাগে? কুন্দনন্দিনী নিজেকে খুঁজে পাওয়ার জন্য পান করেন। কালকূট অসহায় হয়ে কুন্দনন্দিনীর পান করা দেখতে লাগলেন, তার অগ্রজ ভ্রাতা শুধু এইটুকু করতে পারলেন জল মিশিয়ে দিতে।

কালকূট নিজের অসহায়তার সঙ্গে মেজর সাহেবের অসহায়তাও বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু ভ্রাতা যে ভগ্নীকে প্রতিমুহূর্তে নজর করছেন এটা কালকূটের বুঝতে অসুবিধা হল না। তাড়াতাড়ি জীপ থেকে নামতে গেলে কুন্দনন্দিনীর বাধা। নিশ্চয় মিসেস সুভদ্রা সিপ্‌পির জন্য। ব্যাপারটা লক্ষণীয়। এর আগেও কর্ণেল সিপ্‌পি অসুস্থ হওয়াতে কালকূট জীপ থেকে নেমে সিপ্‌পিকে দেখতে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন সেই একই জিজ্ঞাসা। এই ঈর্ষাটা আরও একবার কালকূটের নজরে পড়েছিল। সিকিমে মুসলমান হোটেলের মালিকের মেয়ে নার্গিস আর হাসিনার সঙ্গে কিভাবে আলাপ হয়েছিল সেটা জানতে কুন্দনন্দিনী আগ্রহী হয়েছিলেন। হাসিনা নার্গিসের চিন্তায় কালকূট মশগুল থাকবেন এটা তিনি মোটেই সহ্য করতে পারবেন না। কালকূট শুধু একজনকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন সেটা বলতেই কুন্দনন্দিনী বলেছিল "জানি জানি, আপনি আমাকে নিয়ে মশগুল নন বলেই একটু সুখ পেতে চেয়েছিলাম। আপনি এখন তুষার সিংহ নিয়ে মশগুল আছেন, এই তো?" *(পৃ: ৯৬০, ঐ)* কালকূটের উত্তর ছিল " এবং এক সর্বনাশীকে নিয়ে'। সেই সর্বনাশীতে যে তিস্তা এটা জেনে কুন্দনন্দিনী ভয়ের নিশ্বাস ছেড়ে বেঁচেছিলেন। কিন্তু কালকূট তাঁকে বলেই দিলেন, "অবিশ্যি আর একজনকেও মাঝে মাঝে আমার সর্বনাশী মনে হয়েছে। তবে তাঁর মধ্যে আমি আত্মসংহারের ছায়া দেখেছি, আমি ভয় পেয়েছি।" *(পৃ: ৯৬০, ঐ)* কুন্দনন্দিনী কথাটা শুনে বলেছিলেন, আত্মসংহার নয়, আত্মনাশ তার বহুপূর্বেই হয়ে গেছে। আত্মা যদি ইহকাল পরকাল হয় তাহলে দুটোই তিনি খেয়ে বসে আছেন। আত্মা অবিনাশী হলেও সেই আত্মা মেরামতের সাধ্য তার নেই। অক্ষয় হলেও সেটা তাল তোবড়া পচা জিনিস।

কালকূট লক্ষ্য করছিলেন কথা পাল্টা কথায় কুন্দনন্দিনীর দেহ-মুখের প্রকাশভঙ্গী। মুখ লাল হয়ে ওঠা, নাসারন্ধ্র ফুলে ওঠা, মুখে বিদ্রূপের ছোওয়া— সব মিলিয়ে একটা যন্ত্রণাক্লিষ্ট, হতাশাগ্রস্ত মানবী — যে মানবী একটু সুখের, একটু শান্তির ফেরে, একটু ভালবাসার ফেরে, একটু স্নেহের

ফেরে নিজেকে খুঁজে ফিরছেন। আবার এই সিংঘিকে এসেও কুন্দনন্দিনী সুরাপান করতে করতে বললেন যে আমায় নিজেকে খুঁজে পেতে দিন। আর মিসেস সিপ্‌পি-এর জন্যই কালকূট নিচে তাড়াতাড়ি নাম চাইছেন। বিদ্রূপ মেশানো কৌতুকের সঙ্গে ঈর্ষাও উঁকি দিয়েছে। কুন্দনন্দিনীকে হাত ধরে জীপ থেকে নামিয়ে দিলেন কালকূট। কুন্দনন্দিনী সহজভাবে হেঁটে বারান্দা দিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। আর কালকূট চারিদিকে পাহাড়, বরফের মধ্যে বন্দী হয়ে গেলেন। যেদিকেই তাকান সেদিকেই রূপমুগ্ধ। শৃঙ্গগুলো গায়ে গায়ে ঢেউ তুলেছে। পশ্চিমে তুষারের ঢেউ আকাশে মিলেছে। উত্তরেও তুষার শৃঙ্গমালা। শৃঙ্গের খাঁজে খাঁজে জমাট তুষারের নালাগুলো রোদের আলোকে চিক চিক করছে। চারিদিকে স্তব্ধতার মধ্যে দূর কলরোলের শব্দ ভেসে আসছে। মেজর ঘোষাল জানিয়ে দিলেন উত্তরের বাতাসের শব্দ। উত্তরের স্নো রেঞ্জের পিছনেই স্নো লায়ন। হিমালয়ে এই মহিমার বিশালত্বে একটা ভ্রূকুটি-ভয়াল ছায়া লুকিয়ে আছে বলে কালকূটের মনে হয়েছে। মিসেস সিপ্‌পি সুরার পাত্র নিয়ে কর্ণেল সিপ্‌পির পাশে বসে সুরাপান করছেন। কর্ণেল সিপ্‌পি অবশ্য পান করছেন না। মেজরও লাল পানি গেলাসে ঢেলে কালকূটকে দিয়ে নিজেও নিলেন। ভগ্নীর খোঁজে কালকূটকেই পাঠালেন। কুন্দনন্দিনী শূন্য কালো বেড়ালের বোতলটা খাটের ওপর ফেলে রেখে খাটে বসে আছেন। কালকূটকে খাটে বসিয়ে রেখে বাথরুমে গিয়ে কার সঙ্গে যেন জোরে জোরে কথা বলছিলেন। দরজা জানলা দিয়ে ভূতের মত একটা মুখ দেখালেন। মাথার ধূসর চুলে বেণী বাঁধা, গলায় একরাশ পাথরের মালা, ছেঁড়া বক্কু গায়ে, গোঁফসহ থুতনিতে একগোছা দাড়ি। লোকটি পানীয় খেতে চাইছে কুন্দনন্দিনীর কাছে। কুন্দনন্দিনী নিজের গ্লাস থেকে পানীয় লোকটির গলায় ঢেলে দিয়ে ভাগিয়ে দিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। লোকটি যাওয়ার আগে উঁচুতে হাত তুলে মনাস্টি মনাস্টি, রিম্‌পোসে, রিম্‌পোসে বলছিল। কুন্দনন্দিনী আবার সুরা পান করবার চেষ্টা করলে কালকূট নিষেধ করলেন কুন্দনন্দিনী সর্পিণীর মত ফণা তুলে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে বলে উঠলেন যে কালকূটের ইন্টারনিটি, মন তুমি কৃষিকাজ জান না এসব রাবিশ কথাবার্তা তিনি জানেন না, মানেনও না। তারপরে ঠোঁট বাঁকিয়ে আরও বললেন, "তুমি মশাই কালকূট, আমাকে আস্তাকুঁড়ের কথা শুনিয়েছিলে। কী আস্তাকুঁড় তুমি দেখেছো? আস্তাকুঁড়। আমি তোমাকে আমার সব জামা কাপড় খুলে দেখাতে পারি, একটা প্রকাণ্ড আস্তাকুঁড়। তুমি আমার ভালো করার চেষ্টা করো না। কিছু চাও তো আস্তাকুঁড় ঘেঁটে নিতে পারো।" *(পৃ: ৯৬৭, ঐ)* রাগে কুন্দনন্দিনী সারা দেহে ঝাঁকুনি তুলে বেরিয়ে গেলেন। কালকূট নিজের ভাবনায় ডুবে গেলেন অচেনা কুন্দনন্দিনীকে দেখে। তাঁর মনের মধ্যে মেজর ঘোষালের কথা আর কুন্দনন্দিনীর কথা— 'আমি আর আত্মসংহার কী করবো, আত্মনাশই হয়ে গেছে।' *(পৃ: ৯৬৭, ঐ)*

বাইরে বেরিয়ে এসে কর্ণেল ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পেলেন না কালকূট। মনের

অস্বস্তি কাটানোর জন্য রাস্তায় নেমে গেলেন। হঠাৎ সামনে সেই লেপচা লোকটি হাত ধরে ওপরের দিকে কী দেখাতে চেষ্টা করল, বলতে চাইল, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। লোকটি হাত ধরে টানতে টানতে ওপরে মনাস্টির দিকে নিয়ে চলল। মনাস্টি ছাড়িয়ে আরও ওপরে মঠের মত একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। ছোট ছোট তিন-চারটি ছেলেমেয়ে কৌতূহলী চোখে ওঁদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। লেপ্চা কালকূটকে টেনে নিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ঘরের ভিতরে একটি উনুনের উপর হাঁড়িতে কী যেন ফুটছে। কালকূটের অবাক হওয়ার পালা, ওই ঘরেরই এককোণে লোমশ চামড়ার ওপরে কুন্দনন্দনী বসে আছেন। তাঁর সামনে বাঁশের চোঙার ভিতরে কঞ্চির নল ঢোকানো। নল দিয়ে তুম্বা টানতে হয়, খাদ্য ও নেশা দুটোই মেটে। কুন্দনন্দিনী কালকূটকে পাশে ডেকে নিয়ে তুম্বা খেতে বললেন। লোমশ পশু চামড়ার ওপর উজ্জ্বল আরও একজন পুরুষ বসেছিলেন। তিনি ইংরাজীতে নিজের প্রেসাস্ জুয়েল মানে তিব্বতী লামা বলে পরিচয় দেবার পর ভাইদের ও বউ-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তিন ভাই-এর একটিই বউ। দুটি ভাই ওই লেপচার মতো সজ্জিত হয়ে উনুনের পাশে বসেছিল। কুন্দনন্দিনী প্রেসাস্ জুয়েলের কাছে জানতে চেয়েছিলেন এক বউকে নিয়ে ঝগড়া হয় কিনা স্বামীদের মধ্যে। তিনি জানিয়েছিলেন সম্পত্তির কারণে তাদের একটিই বউ থাকে, সব ভাই এককাট্টা হয়েই থাকে। তিব্বতে এ নিয়মটা আছে। একটি বউ স্বামীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেয়, বাচ্চাদের বাবাও আলাদা।

কালকূটের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল মহাপ্রস্থানের ছবি। "কোনো পণ্ডিতের সন্দেহ পঞ্চপাণ্ডব ভারতে এসেছিলেন তিব্বত থেকে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে ফিরে গিয়েছিলেন সেখানেই। স্বর্গের দুর্গম পথে, যুধিষ্ঠির ছাড়া সকলেই পথে দেহত্যাগ করেছিলেন। জানিনা তার সত্যাসত্য। কিন্তু তিন ভাইয়ের এক স্ত্রীর এই সুখী পরিবার যেন পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদীর কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। আমি কি এখন সেই দুর্গম পথেই রয়েছি? মহাভারতের আমলে বোধহয় এরকম রাস্তা আর জোঙা জীপ ছিল না।" *(পৃ: ৯৬৮, ঐ)* কুন্দনন্দিনী তিব্বতী পারিবারিক ইতিহাস জেনে বউটিকে বাঙলায় বলে উঠল "ওগো তোমার শ্রীচরণে কোটি প্রণাম, তুমি ভগবতী।" *(পৃ: ৯৬৮, ঐ)* কালকূটকে আরো বললেন তিব্বতী বউটি পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিয়ে একটুও টসকায় নি, তার শরীরটি যদি এমনটি হতো। কুন্দনন্দিনীর ভাষায় কালকূট লজ্জা পেলেন। কুন্দনন্দিনীর অনুরোধে তুম্বা টেনে কুন্দনন্দিনীকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। কুন্দনন্দিনী নামতে পারছিলেন না, কুন্দনন্দিনী তাকে জড়িয়ে ধরে নামতে লাগলেন। কালকূট ক্ষমাপ্রার্থী, আর কখনো কুন্দনন্দিনীকে ড্রিংক করতে নিষেধ করবেন না। এটা শুনেই আবার রেগে গেলেন। "আপনি আমাকে দয়া করে এই ভদ্রলোকী নিরপেক্ষ হৃদয়হীনতা দেখাবেন না" *(পৃ: ৯৬৯, ঐ)* "কালকূট, আপনি কালকূট,

আপনি তো আমার কিছুই জানেন না। আপনাকে আমি কী করে বোঝাবো।" "আপনার সেই ইন্টারনিটি, মন তুমি কৃষিকাজ জানো না। আপনার প্রাণে কি পতিত জমির উপর কোনো কৃপা হয় না? কৃষিকাজে একটু ভালবাসা নেই বুঝি? খালি উপদেশ? এই কোরো না, সেই কোরো না। কেন?"*(পৃ: ৯৬৯, ঐ)* কুন্দনন্দিনীর কোকিল চোখ জলে ভরে উঠল। তিনি দু'হাতে কালকূটকে জড়িয়ে ধরে নিজের উদ্‌গত কান্নাকে দমানোর জন্য কালকূটের ঠোঁটে চেপে ধরলেন। কালকূটের চোখের সামনে তুষার শৃঙ্গ, নীল সবুজ হালকা লালে আকাশ বর্ণময়। বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়ছে। তাঁর ঠোঁটের কষে চুঁইয়ে ঢুকছে লবণাক্ত স্বাদ। কালকূটের অনুভূতিকে বিবশ করেছে কুন্দনন্দিনীর হৃদয়ের তীব্র আকূতি আর যন্ত্রণা। কালকূট বলেছেন "ব্যথাই আমাকে ব্যাকুল করলো। এই যদি মহাপ্রস্থানের পথ হয়, তবে পিছনে রইলো আমার ইন্দ্রপ্রস্থ কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামী ময়দান। আমি কুন্দনন্দিনীকে দু'হাতে আলিঙ্গন করলাম।" *(পৃ: ৯৭০, ঐ)* কালকূট কুন্দনন্দিনীর অর্ন্তজ্বালাকে অনুভব করেছেন। মেজর ঘোষালের কাছে তার সম্পর্কে যেটুকু শুনেছেন এবং কয়েকদিন ধরে তাঁর কথাবার্তা আচার-আচরণ, রাগ-অনুরাগ এই সকল কালকূট হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। কালকূট তাঁর অর্ন্তদৃষ্টি কুন্দনন্দিনীর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রসারিত করেছেন। দেখেছেন কী এক অব্যক্ত বেদনায় কুন্দনন্দিনীর হৃদয় ছিন্নভিন্ন। কীট দষ্ট কুন্দনন্দিনী। মি: বরেন মুখার্জীর উত্থানের পেছনে কুন্দনন্দিনীকে আস্তাকুঁড়ে নামতে হয়েছিল। একদিন স্বামীর সাফল্যের জন্য এই আস্তাকুঁড়ে নেমে আসাটা তেমন কিছু মনে হয়নি। তখন স্বামীর সাফল্যই তার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সাফল্য আনতে কুন্দনন্দিনী নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন, স্বাভাবিক সাংসারিক জীবন থেকে তাঁর বন্ধনমুক্তি ঘটেছিল, বন্ধনহীন জীবনে এসেছিল উচ্ছৃঙ্খলতা, সুরাপানের জোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া। শর্তহীন স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নন, তাই স্বামীর কাছে ফিরতে চেয়েও ফিরে যেতে পারেন নি। একটিমাত্র বন্ধন ওই শিশুসন্তান। সন্তানের প্রতি অতৃপ্ত স্নেহধারা, যে নিজের আঁচলে চুম্বনে পূর্ণ করে। ভালবাসার স্পর্শ পাওয়ার আশায় তাঁর হৃদয় পিপাসিত। তাই অবচেতনে বলে ওঠেন — যাব না, যাব না কিছুতেই। নিশ্চয়ই বরেন বাবুর কাছে ফিরে না যাওয়ার কথাই বলছেন। বরেন বাবুর জন্য হৃদয়ের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। বিষের জ্বালায় তিনি কালকূটের কাছে অমৃতের পরশ চেয়েছেন। প্রথম থেকেই কুন্দনন্দিনীর আচরণে এই প্রেম আর্তি ফুটে উঠেছে, কিন্তু কালকূটের ভদ্রলোকী হৃদয়হীনতা কুন্দনন্দিনীকে ব্যথিত করেছে। কালকূট তাঁকে সুরাপান করতে নিষেধ করাতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অনেক কটু কথা বলে বাংলো ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তিব্বতী লামাদের আস্তানায়। তিব্বতী লামাদের আস্তানায় কুন্দনন্দিনীর খোঁজ পেতে সাহায্য করেছে ওই জানলায় উঁকি দেওয়া লেপ্‌চা। ওই ছোট্ট মঠের আস্তানায় কালকূটের মহাকাব্যের দ্রৌপদীর দেখা পেয়েছেন। কুন্দনন্দিনীর কাছ থেকে জেনেছেন এক নারী কীভাবে স্বামীদের সামলায় এমনি অনেক

তথ্য। নিজেও ওই একালের দ্রৌপদীর মতো হতে চেয়েছেন। ওইরকম পার্বত্য পরিবেশে এমনি একটি পরিবারের দেখা পাওয়ার প্রয়োজন ছিল কাহিনীর প্রয়োজনে। ওই পাহাড়ী পরিবেশ ও সংস্কৃতিকে কালকূট স্বল্প সময়ের জন্য এনে কাহিনীকে গতিময় করেছেন। প্রেসাস্ জুয়েল চায়না থেকে এসেছেন। কালকূটের ভাবনা চীনা অধিকারের সময় তিনি দলাই লামার দলের সঙ্গে চলে এসেছিলেন। কালকূট তাঁর আচরণের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী কিন্তু কুন্দনন্দিনী শুনবে কেন? দোষ তো সেই করেছে, তাই সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে লামাদের আস্তানায় তুম্বা পানে মেতে উঠেছেন। তিনি নিজেই ক্ষমাপ্রার্থী। তাঁর অভিমানে জরজর হৃদয়টি নিয়ে কালকূটের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। নির্বিকার কালকূট কুন্দনন্দিনীর বেদনাকে ছুঁয়েছেন। তিস্তার আঁতুড়ঘরের কাছে এসে মানবী তিস্তাকে কাছে টেনে নিয়েছেন। মনে কোনো দ্বিধা রাখেন নি, মানবী তিস্তাকে তিনি আলিঙ্গ নে আবদ্ধ করেছেন মহাকাব্যিক পরিবেশে, মহাপ্রস্থানের পথে।

সিংঘিক থেকে টুং এসে ঝুলন্ত সেতু হেঁটে পার হতে হল। তিস্তা ঝরনার মতো ধাপ ভেঙে ভেঙে নীচে নামছে। তাসিপাইকে এসে গাড়ি আটকে গিয়েছিল। উপর থেকে শতাধিক গাধা আর অশ্বতর বাহিনীর ক্যারাভান নেমে আসছে আর নীচ থেকে উপরে যাচ্ছে 'শক্তিমান' ট্রাক কনভয়। সংকীর্ণ রাস্তা, অতএব দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। রাত হতেই অসুবিধা হয়ে গেল পাহাড়ী পথ চলতে, গাড়ির হেডলাইট জ্বালা নিষেধ, টর্চ জেলে মাঝে মাঝে পথ দেখে নিতে হয়েছে। অন্ধকারে শুধু সর্বনাশী তিস্তার প্রবল গর্জন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। সামান্য এদিক ওদিক হলে জীপ গভীর খাদে। আর একবার ঝুলন্ত সেতু পার হয়ে যাওয়ার পরই গন্তব্যস্থল এসে গেল। জায়গার নাম 'ৎস্ন্থান' *(পৃ: ৯৭০, ঐ)* অনেকে 'উনথাং'ও *(পৃ: ৯৭০, ঐ)* বলে থাকেন। কুন্দনন্দিনী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তাঁকে জাগিয়ে তুলে কালকূট জীপ থেকে নামিয়ে দিলেন। প্রচণ্ড শীতে কুন্দনন্দিনীর দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক করছে আর পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে। তিস্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাংলোয় হ্যারিকেনের টিমটিমে আলো, ফায়ার প্লেসের আলোও এর থেকে বেশি। শোওয়ার ঘর একটিই, মেয়েরা ঘরে শোবেন আর পুরুষরা ড্রয়িং রুমে। কিন্তু কর্ণেল সিপ্পি সব গোলমাল করে দিলেন, অসুস্থতার জন্য উনিই আগে শোবার ঘরের খাটে শুয়ে পড়লেন। অগত্যা ব্যবস্থা পাল্টে গেল। সবাই মিলে গল্পে মেতে উঠলেন। মেজর জানালেন কাছেই তিব্বতী রিফিউজিদের একটা মনাস্ট্রি আছে, দশ বারো বছরের বালক লামাও আছে। ভগবান বুদ্ধের কাছে তাদের জীবন সমর্পিত। এরা বড় হলে বিয়ে করে না, সমকামিতা আছে। এটা নিন্দনীয় নয় মনাস্ট্রিতে। মিসেস সিপ্পি তার খাস ভাষায় লওন্ডাবাসী বলে ওঠাতে মেজর ঘোষাল বলেছিলেন সেরকম ব্যাপারটা নয়। এটা গোপনীয় ব্যাপার নয়, অতএব তেমন আলোচনাও হয় না। কিন্তু কুন্দনন্দিনী কালকূটের দিকে তাকিয়ে বললেন 'আমি এখন শুতে চাই'। কালকূট বোঝার চেষ্টা করছেন কেন কুন্দনন্দিনী

তাঁর দিকে ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে আছেন। একটু পরেই জানতে চাইলেন 'তুমি মহাভারত পড়েছ?' কালকূট কোনো উত্তর সেই মুহূর্তে না দিতে পারার জন্য তিনি বলে উঠলেন ''তোমার কোনো ধর্মবোধ নেই, যতোই তোমার ইন্টারনিটি মন থাকুক।'' *(পৃ: ৯৭১, ঐ)* কথাগুলো বলেই সোফার পিঠে মুখ গুঁজে দিয়েছিলেন। কালকূট হতভম্ব হয়ে মিসেস সিপ্‌পির দিকে তাকালেন, আর সিপ্‌পি আর কী করবেন, তিনি একটু হাসলেন। ইতিমধ্যে হ্যারিকেন নিভে গিয়ে ঘরের মধ্যে একটা তাম্রাভ অন্ধকারের পরিবেশ সৃষ্টি করল। চর্বির প্রদীপে সবাই মাংসের ঝোল ভাত খেলেন কিন্তু কুন্দনন্দিনী কিছুই না খেয়ে লম্বা সোফার মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। কুন্দনন্দিনী কেন ধিক্কারের স্বরে বললেন যে তার কোন ধর্মবোধ নেই এই ভাবনায় ভাবতে ভাবতে দুটো সোফা জোড়া দিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘুম ভেঙে যেতে দেখতে পেলেন পায়ের কাছে কে যেন শুয়ে আছে। কালকূট কুন্দনন্দিনীকে ডেকে তুললেন। ''কুন্দনন্দিনী একটি হাত বাড়িয়ে আমার হাঁটুর কাছে চেপে ধরলেন, এবং পরিপূর্ণ জাগ্রত স্বরে বললেন, 'নন্দিনী তো নয়, কুন্দ বলেছ তুমি আমাকে।'

'কিন্তু এটা ঠিক হয় নি। সোফায় ওঠা উচিত।'

'এই বেশ আছি। তুমি বরং আমার কাছে এসো।'

আমি অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি জেগেছিলেন?'

তিনি বললেন 'ঘুম আসছে না'।

তাঁর ধর্মবোধের কথা আবার মনে পড়লো।'' *(পৃ: ৯৭১, ঐ)*

কালকূট দেখলেন মেজর ঘোষাল ডাইনিং টেবিলে ঘুমোচ্ছেন। কালকূট কুন্দনন্দিনীর কম্বলশুদ্ধ শরীর লম্বা সোফায় শুইয়ে দিলেন। কুন্দনন্দিনী কালকূটকে টেনে সোফায় বসিয়ে দিলেন। কালকূটের নিজের অন্তরে দৃষ্টি ''আমি কি তুষার সিংহের পদতলে? সর্বনাশীর আতুড়ঘর কতো দূর?'' কুন্দনন্দিনী কালকূটের গায়ের ওপর কম্বল তুলে দিলেন। কালকূট তপ্ত নিশ্বাসের মধ্যে নিচু স্বর শুনতে পেলেন 'ঘুমোও। আমাকে ঘুমাতে দাও।' কালকূট যেন সর্বনাশীর প্রতিধ্বনি শুনতে পেলেন।

আবছা দিনের আলোতে কালকূট কুন্দনন্দিনীর কম্বল থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে বাইরে আসতেই 'প্রথমেই চোখে পড়ল একটি বৌদ্ধমঠ আর পবিত্র ধ্বজা। আকাশটা যেন শাদা মেঘে আচ্ছন্ন।'' *(পৃ: ৯৭১, ঐ)* কালকূটকে কেবল টানছে সেই জলপ্রপাতের শব্দ। শব্দ লক্ষ করে বন্ধ ডিস্পেসারির পাশ দিয়ে নিচে নেমে যেতেই চোখের সামনে আবার সেই বিশাল ঠাকুরদালানের নিচে তুষারের বিশাল উঠোন। পশ্চিমের পাহাড়ের কোলে শাদা আর নীল জলের ধারা, বিশাল জলপ্রপাত। ধূসর তুষার শৃঙ্গে লালের আভা পড়তেই দ্রুত তার রঙ বদলাতে লাগলো। ''সহসা আমার বুকের মধ্যে যেন কেঁপে উঠলো। আমার চোখের সামনে বিশাল এই সিংহমূর্তি পান্না সবুজ

কেশর ফোলানো। সামনের দুই পায়ের ওপর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। পিছনের দুই পায়ের ওপর শরীরের ভার। বুকের তলে সুগভীর নীল। পিঙ্গল দুই চোখে এদিকে তাকিয়ে আছেন।" *(পৃ: ৯৭২, ঐ)* কালকূটের মনে জিজ্ঞাসা, তিনি বৌদ্ধ নন, কিন্তু সেই অর্থে তিনি কি হিন্দু? নিজের অজান্তে দুই করজোর কপালে উঠে গেল। তাঁর ভেতরে কে যেন আর্তস্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। কুন্দননদনীর মুখটাই ভেসে উঠছে। মেজর ঘোষাল বললেন, তার ঠিক জানা নেই তবুও যেটুকু জানেন সেটুকুই বললেন। ওই জলপ্রপাত থেকে তিস্তা প্রথম নিচে নেমেছে। এর ওপর শুধু বরফ আর বরফ। কালকূট ভাবছেন এই তাহলে সেই জায়গা, যেখান থেকে সে সমতলে যাত্রা করেছে। এই তাঁর আতুড়ঘর "সমস্ত তুষারাবৃত পাহাড়ই তার জন্মভূমি। বহুদিনের সাধ খাজাঞ্চিখানা দেখবো। সুখ সম্পদ মোক্ষ দর্শন এবং লাভ।" *(পৃ: ৯৭২, ঐ)*

তুষার সিংহ রৌদ্রের স্পর্শে প্রকাণ্ড হয়ে উঠল। কুন্দনন্দিনী কম্বল জড়িয়ে আলুথালু বেশে কালকূটের গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন। পাগলিনী না সর্বনাশী কোন্‌টি কুন্দনন্দিনী। তুষার সিংহের মুখ লাল-নীলে মেশানো, তার কেশর উড়ছে। সর্বনাশীর রঙও মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে। হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠল, কালকূটের মনে হলে বিদায়ের ঘণ্টা বাজছে। "শিঙার গম্ভীর ধ্বনিতে ডাক শোনা যাচ্ছে। চলো, আপন পতিত জমিনের আবাদে। মানবদের ডাক পড়েছে।" *(পৃ: ৯৭২, ঐ)* তুষার সিংহের দর্শনের পরই বিদায়ের ঘণ্টা বেজেছে। কালকূট ফিরে চলেছেন তার নির্বিকার মন নিয়ে, বলেছে, "ওহে গরীব আমার প্রাণ" *(পৃ: ৯৭২, ঐ)*।

'তুষার সিংহের পদতলে' কাহিনীটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে প্রকৃতি আর মানবী একাকার হয়েছেন। তুষার সিংহের হাতছানিতে তিনি হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই ঢঙে তুষার সিংহের পদতলে এসে পৌঁছোলেন। পাহাড় থেকে সমতলে, সমতল থেকে তিস্তাই তার পথের সঙ্গী হয়েছে। তিস্তা নদী আর মানবী তিস্তা দুই-ই তাঁকে সমান তালে সঙ্গ দিয়েছে। এই কাহিনীতে যে সকল মানব চরিত্র উঠে এসেছে, গল্পের প্রয়োজনেই চরিত্রগুলোর আবির্ভাব ঘটেছে। সেই সঙ্গে উঠে এসেছে মানবজীবনের বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত। হিমালয়ের কোলে প্রকৃতিকে দেখতে দেখতে, তার অপরূপ রূপ রহস্যের মধ্য দিয়ে আসতে যে মানুষগুলোর সঙ্গে লেখকের পরিচয় হয়েছে তাদের জীবনের চিত্র আঁকতে আঁকতে তাদের জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তগুলো তুলে ধরেছেন। এই কাহিনীর দুটো অংশ একে অপরের সঙ্গে পরিপূরক। কালিম্পং-এ আসার আগেই দার্জিলিং-এর কিছু কিছু ঘটনা তিনি চিত্রিত করেছেন। অতীতচারণ করেছেন সেখানে তিনি। এক পার্বতী কন্যার সরল বিশ্বাসের কাহিনী তিনি চিত্রিত করেছেন, কালকূটের সঙ্গেও তার মানসিক সম্পর্ক হয়েছিল। কিন্তু তার গরীব প্রাণ, মান্যতা দিতে পারে নি। কালিম্পং এসে তিস্তার সঙ্গে সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর দাদার কাছে তার বেদনার ইতিহাস জানলেন। কুন্দনন্দিনীর বেদনা বয়ে যাওয়া তিস্তার স্রোতধারার

মত। কালকূট বলেছেন ''কেমন করে অস্বীকার করব আপাতদৃষ্টিতে যে রমণীকে দেখছি রক্ষিণী, সত্যিকারের ক্লাবে প্রায় স্বৈরিণী, বেশভূষা অঙ্গরাগে আর প্রসাধনে বিলাসিনী, হাস্যে লাস্যে মদিবেক্ষণা, তার জন্য আমার প্রাণে কোথায় যেন একটা মমতাবোধ জেগে উঠেছে। স্বৈরিণীর কি কোনো অনুশোচনার জ্বালা? কুন্দনন্দিনীর জ্বালাও আমি অনুভব করেছি, তাঁর কোনো কোনো কথায়, মত্ত ঘোরের ভাষায়।'' *(পৃ: ৯৬৫, ঐ)*

কালকূট কুন্দনন্দিনীর বেদনাকে অনুভব করেছেন। শেষে তুষার সিংহের পদতলে যেখানে তিস্তা প্রথম অবতরণ করেছে সেখানে নৈসর্গিক পরিবেশে লেখকের গরীব প্রাণ সাড়া দিয়েছে। বেদনায় বিদ্ধ কুন্দনন্দিনী নিজেকে কালকূটি বলে নতুন নাম দিয়েছেন। তিনিও কালকূটের কাছে অমৃতের পরশ পেয়ে শুধুই কুন্দ হয়ে ফুটতে চান। কালকূট তুষার সিংহের পদতলে 'কালকূটি'র বদ্ধ দরজায় আগল খুলে দিয়েছেন। পাঠককুলের হৃদয়ও সর্বনাশীর বেদনায় আপ্লুত হয়ে যায়। ঘটনার পটপরিবেশ অনুযায়ী মানবমানবীর চরিত্রচিত্রণে দক্ষতার ছাপ ফুটে উঠেছে। কাহিনীটি ঘটনার জাল বুনতে বুনতে উপন্যাসে পরিণত হয়েছে। কালকূটের নদী-পর্বত-সমুদ্রের টানে তিনটি কাহিনী আলোচনা করা হল। এই তিনটি কাহিনীর মধ্যে 'নির্জন সৈকতে' বহু ঘটনা চরিত্রের সমাবেশ; কাহিনী তেমন করে জমে উঠতে পারে নি। কালকূটের সঙ্গে পরিচয় পর্ব শেষ হতে না হতেই মাঝে মাঝেই বিচ্ছেদ হয়ে গেছে রেণুর সঙ্গে। এবং হঠাৎই কাহিনী শেষ হয়েছে রেণুর চিরদিনের নিমন্ত্রণের আহ্বানে। 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গনে' কাহিনীতে প্রাধান্য পেয়েছে পরমেশ বাবু ও ছোট্ট মেয়ে কাকলী। ঘটনার ঘনঘটায় এটিও উপন্যাসে উপনীত। আর শেষ কাহিনী তুষার সিংহের পদতলে, ঘটনার ঘনঘটায় চরিত্রের সূক্ষ্ম বিন্যাসে, লেখকের মনের কথা অবলীলায় চরিত্রগুলোর মুখে উঠে এসেছে। কাহিনীর গতিকে তিস্তা নদীর স্রোতধারার মত এগিয়ে নিয়ে গেছেন লেখক কালকূট। চরিত্রগুলোর অন্তর্ভাবনা — কথোপকথনের সঙ্গে পাঠককুল আন্তরিকতা অনুভব করেন। তিস্তার আঁতুড়ঘরে অর্থাৎ তুষার সিংহের পদতলে পৌঁছতে পৌঁছতে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী ধীরে ধীরে এই কাহিনীকে উপন্যাসের মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে।

এবার কালকূটের মানবজীবনকেন্দ্রিক রচনাগুলির মধ্যে যে তিনটি উপবিভাজন রয়েছে তার তৃতীয় বিভাজন 'বাউলের সহজিয়া সাধনায় মানবমনের তত্ত্বতালাশ' বিষয়ক রচনাগুলির আলোচনায় অনুপ্রবেশ করা হচ্ছে। বাউলমনের কবি লেখক কালকূট বারে বারে মানুষ নামক মদের টানে ঝোলাকাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর তৃষিত হৃদয় মানুষের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। তাঁর বাউলমন চার দেওয়ালের বন্ধন কাটিয়ে বিশাল মানবের রূপের হাটে রসের সন্ধান করতে চায়, মানুষের ভেতরের মনকে চিনে নিতে চায়। মানবমন অনুসন্ধানের ভিতর তিনি আপনাকে অনুসন্ধান করেছেন, মেলা থেকে মেলাতে, হাটে-মাঠে-বাটে। বাউলমনের অধিকারী লেখক কালকূট

অরূপকে পাওয়ার আশায় ভারতের বিশাল জনপদে পরিক্রমা করেছেন। সেই বাউলের সহজিয়া সাধনায় অরূপের তত্ত্বতালাশ করেছেন যে রচনাগুলিতে সেগুলি হল—

১) 'খুঁজে ফিরি সেই মানুষে' : এই রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের ২১শে ফাল্গুনের 'দেশ' পত্রিকায়। ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দের (১৩৮২ বঙ্গাব্দের) নভেম্বর মাসে 'মৌসুমী প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'বাঁশীর তিন সুরে' সংকলনটিতে। এই রচনাটিকে 'কোথায় পাবো তারে'র চুম্বক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

২) 'কোথায় পাবো তারে' : এটি ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে (১৩৭২ বঙ্গাব্দে) 'দেশ' পত্রিকায় ১৯শে নভেম্বর থেকে ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের মে পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে এই বৃহত্তম গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল।

৩) 'হারায়ে সেই মানুষে' : ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৭ বঙ্গাব্দে) শারদীয় 'সিনেমা জগৎ' পত্রিকায় প্রথম ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে দে'জ পাবলিশিং-এর মাধ্যমে।

৪) 'পিঞ্জরে অচিন পাখি' : ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৭ বঙ্গাব্দে) 'নবকল্লোল'-এর আশ্বিন নববর্ষ সংখ্যায় (বৈশাখ) প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে (১৩৮৯ বঙ্গাব্দে) বৈশাখ মাসে নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৫) 'ঘরের কাছে আরশিনগর' : এটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে (১৩৮৫ বঙ্গাব্দে) 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' শারদীয় সংখ্যায়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় দে'জ পাবলিশিং থেকে বৈশাখ মাসে ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে (১৩৮৬ বঙ্গাব্দে)।

৬) 'চলো মন রূপ নগরে' : ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে (১৩৮৭ বঙ্গাব্দে) শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। দে'জ পাবলিশিং থেকে মার্চ ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে (ফাল্গুন, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'খুঁজে ফিরি সেই মানুষে' — বাউলমনের কবি কালকূটের মেলার পটভূমিতে এই রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে (১৩৬৬ বঙ্গাব্দে) ৫ই মার্চ 'দেশ' পত্রিকায়। এটি কালকূটের একটি ছোট রচনা। ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে (১৩৮২ বঙ্গাব্দে) নভেম্বর মাসে 'বাঁশীর তিন সুরে' নামে একটি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল মৌসুমী প্রকাশনী থেকে। এই সংকলনটিতে 'হারায়ে ফিরি সেই মানুষে' সংকলিত হয়েছিল। জয়দেবের মেলার পটভূমিতে রচিত হয়েছে এই কাহিনী। তাঁর বাউলমন বিষয়ক রচনাগুলোর প্রথম প্রয়াস এটি। তাঁর বাউলমন ঘরের কোলে আরশিনগরের 'পড়শী'কে খুঁজে পেতে আপনাকে জানতে, পথের ধূলার ধূলি মাখতে বেরিয়ে পড়েছেন উৎসবের আঙিনায়। বাংলাদেশে মেলার মরসুম অগ্রহায়ণ থেকে বৈশাখ পর্যন্ত। গ্রামীণ মেলায় উৎসবের জোয়ার বইতে

থাকে কেননা গ্রামের মানুষের সাধারণ জীবনে বৈচিত্র্যের অবকাশ কম। তাই মেলার বৈচিত্র্যে গ্রামজীবন আকর্ষিত হয়। সবাই বেরিয়ে পড়ে, 'আপন খুঁজতে' ঘরে কেউ ঘরে থাকে না। উৎসবের আঙিনায় গ্রামীণ মেলায় গিয়ে ধর্মকর্মের সঙ্গে বনভোজন হয়ে যায়। তার সঙ্গে মেলার মজা সার্কাস দেখা, এক মানুষের তিন মাথা জলপরীর ম্যাজিক, বৈদ্যুতিক নারী, কলের গান, তার সঙ্গে বেগুনী ফুলুরি আলুবড়ার সঙ্গে মুড়ি, খাজা-গজা-পানতুয়া-সন্দেশ-রসগোল্লা পানবিড়ির দোকান, চা প্রেমীদের জন্য চায়ের দোকান, হৈচৈ সব মিলিয়ে মেলা জমজমাট হয়ে যায়। সঙ্গে চলে কীর্তন, ভজন, প্রার্থনা আরাধনা। সব মেলারই কম বেশি একই চিত্র হয়ে থাকে। ধান গোলায় উঠলেই গ্রামবাংলায় খুশির জোয়ার বয়ে যায়। লেখক কালকূটও এবার সেই মেলার উৎসবে 'আপন মনের পড়শী'কে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছিলেন জয়দেবের মেলায়। জয়দেব মানেই হল জয়দেবের পাট, কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি। তার মনে সুরের ঝঙ্কার তুলছে 'কেন্দুবিল্বসম্ভূতরোহিনীরমন'। ''যার স্মারক মেলায় 'অধর মনের মানুষের' সন্ধানীদের খোঁজে এসেছি। সেই 'পদ্মাবতী রমণ' 'পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী' স্মরণচিহ্ন আছে কোথায়। এই বুড়ো বটের ছায়াভরা দীন গ্রামখানির কোথায় সেই,

জয়দেবে মাধবর স্তুতিক বর্ণাব
পদ্মাবতী আগত নাচন্ত ভঙ্গিভাবে।
কৃষ্ণর গীতক জয়দেবে নিগদতি
রূপক তালের চেবে নাচে পদ্মাবতী।

কোন্ মন দিয়ে শুনতে পারি সেই বসন্ত-গর্জরী মালব রাগের গান, তার সঙ্গে রূপক তাল, যতিতাল, অষ্টতালী, একতালী। যে রাগ ও তালের রোলে, মোহিনী নাচের ছন্দে, নূপুরের ধ্বনি শুনে গ্রাম কেঁন্দুলির রাত্রি আতুর হয়েছে। অজয়ের খরস্রোত স্তব্ধ হয়েছে কেন্দুবিল্বের পায়ে।'' *(পৃঃ ১২৭, কালকূট রচনা সমগ্র, ১ম খণ্ড)*

কালকূট জয়দেবের পথের হদিশ করে বর্ধমান থেকে দুর্গাপুর হয়ে সংরক্ষিত বনের পথ ধরে অজয়ের তীরে দাঁড়িয়েছেন। আসার পথে শালবনে লালধূলোর ফাগের খেলা দেখেছেন। বিচিত্র পথে বিচিত্র যানে চড়ে যেতে যেতে বিচিত্র সব যাত্রীর বিচিত্র সব লীলা দর্শন করতে করতে তিনি চলেছেন অরূপকে ধরার আশায়। সবাই জয়দেবের যাত্রী নয়, 'চিন্তামণির' যাত্রীও আছেন। এই সেই চিন্তামণি যেখানে মনের মানুষকে মনের মানুষ খুঁজে চলেছে বহুকাল থেকে। এক প্রেমিক মরণের ভয় তুচ্ছ করে ঝড়ের রাতে দুর্জয় নদী পেরিয়ে গিয়েছিল। প্রেমিকার কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার জন্য। ''বোঝা গেল, শুধু জয়দেবে নয়, এ যাত্রা চিন্তামণিতেও। বিল্বমঙ্গলের সেই অধরা প্রেম চিন্তামণিরূপে যে বিরাজে সারা অধর বৃন্দাবনে।'' *(পৃঃ ১২৭, ঐ)*

মানুষ ছাগশিশু মালপত্তরে বোঝাই যাত্রীরা দলা পাকাতে পাকাতে পৌঁছে গেল রূপের হাটে। 'চিন্তামণি'র যাত্রীরা আগে নেমে গেল, পরে জয়দেবের যাত্রীরা অজয়ের তীরে। বিস্তীর্ণ অজয়ের চরে গরু-মহিষের গাড়ি চলেছে সারি দিয়ে। তার সঙ্গে মানুষ চলেছে কাতারে কাতারে। পুণ্যের ভাগটুকু, উৎসবের আনন্দটুকু স্বাধীনতার স্বাদটুকু সবাই পেতে চায়। অজয়ের বুকের জল পেরিয়ে ওপারে জয়দেবের মেলা। বাউলের মেলা। মাথায় ঘোমটা তুলে শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে, জুতা হাতে মাথায় বোঁচকা তুলে নিয়ে নদী পার হয়ে যাচ্ছে নারী পুরুষ, সঙ্গে গরু মোষও আছে। সবাই চলেছে বাউলের মেলায়। অজয়ের তীর পেরিয়ে কিছুটা এগিয়ে এলেই রাধাবিনোদের মন্দির। পোড়া ইটের ফলকে কারুকাজে ভরা মন্দির। কিন্তু ঠেক লেগেছে কালকূট বাউলের মনে। রাধাবিনোদের মন্দিরের গাত্রে রাধাবিনোদের লীলাখেলা নেই, আছে দশভূজা মহিষমর্দিনীর লীলা। পায়ের তলায় লড়াইয়ে ব্যস্ত বানর-রাক্ষস। ''লঙ্কার পাপ আর পঞ্চবটীর পুণ্য কাহিনী। এই মাটিতেই সেই কবির ঘরকন্না? এই মাটিতেই কবি লেখেন গান, প্রেমমুগ্ধ সলজ্জ চোখে দেখেন পত্নী?'' *(পৃ: ১২৮, ঐ)* বাউলের তীর্থভূমি এই জয়দেবের পাট। কালকূটের মতে পৌষ সংক্রান্তিতে জয়দেবের পাটে যে বাউল উৎসব হয় তা হল বাউল কংগ্রেস। জয়দেব স্মরণোৎসবকে কেন্দ্র করে কোন এক অতীতে এই বাউল মেলার সূচনা হয়েছিল। পরস্পরের সঙ্গে প্রাণের টান, গলাগলির টান আর প্রাণের আবেগে গানের স্রোতের অনাবিল আনন্দে ভেসে যাওয়ার টানে সংসারের যাবৎ ছেঁড়া টুকরো টুকরো কাপড়ের নানারঙের মিলমিশে আলখাল্লাধারীদের ভিড় হয় এই জয়দেবের পাটে। এই বাউল সমাবেশে প্রাণের টানে কালকূটও হাজির। কালকূট বেদনা-বটের তলায় গিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন ''ডারা-ডুপকিখুরি, কাঠ-করতালি-প্রেমজুরি-খুঞ্জনি, ওই যা বল, সব আপন তালে আপনি মগ্ন। একতারা-দোতারা বাঁয়া, লাগ-বুঙা-বুঙ্ গুপীযন্ত্র, সব পায়ের ঘুঙুরে দিচ্ছে সাড়া। গলার স্বরে আত্মহারা।'' *(পৃ: ১২৯, ঐ)* ছেঁড়াকাঁথার আলখাল্লা পরে বাউলেরা নাচে-গানে একটু অদ্ভুত খ্যাপামিতে মেতেছে। ঝুরিনামা বটের তলে আলাদা আলাদা আসরে জ্বলছে কাঠের আগুন, গঞ্জিকা সেবনও চলছে। বটের তলে বাউলের সমাবেশ আর গাছের উপরে, ডালে ডালে পাখীদের সমাবেশ। তারাও সমান তালে কিচিরমিচির বাউলের গানের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে।

কালকূট এক আসরে দেখলেন গেরুয়া বসনে ও মাথায় পাগড়ি পরে হাতে লোহার বালা পরে জয় গুরু! জয় গুরু! বলে তারাও মেতেছে গানের জোয়ারে।

''ওরে ক্ষ্যাপা,
মন আছে তোর মনের ভিতরে
তারে একবার দ্যাখ না নেড়ে চেড়ে।'' *(পৃ: ১২৯, ঐ)*

বাউল কোমর দুলিয়ে গাইতেই থাকল। 'জলের মধ্যে আগুন জ্বলা'র তত্ত্বকথা সর্বজনে না বুঝলেও

গানের সুরের দোলায় মাতোয়ারা সবাই। কালকূটের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে বাউলের হৃদয়ের অনাবিল আনন্দের জোয়ার। আপন তত্ত্বের গানে মাতোয়ারা। বাংলার দুটি দশকের মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিছুই এদের গ্রাস করতে পারে নি।

কালকূটের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সিউড়ির বুড়ো বাউলের সঙ্গে। বাউলের মেলায় মানুষের আসা-যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে উদাস চোখে কালকূটকে জানান যে বাউলের ভিড় কমে গেছে। ধীরে ধীরে হয়ত একদিন আর বাউল থাকবে না। তারপর একতারায় সুর তুলে গান গাইতে থাকে। আরো বলে যে, মানুষের নিজের মধ্যেই সব। শরীরের ভান্ড হল বেহ্মান্ড। ''জয়দেবে বাউল আঁসবেক না? নিজেকে খোঁজার জ্বালা সে থোবে কুথা?'' *(পৃ: ১২৯, ঐ)*

বুড়ো বাউলের কথায় কালকূটের ভাবান্তর হল। জয়দেবে বাউলের আসা কমে গেছে? দ্বাদশ শতাব্দীর কবিকে স্মরণ করে কোনো এক অতীতে এই বাউল মেলা শুরু হয়েছিল। উৎসে টান ধরেছে? তিনি নিজের মনে বাউল তল খুঁজছেন 'বাউল কবেকার'? 'বাউল কে'? লেখকের মনপ্রাণ আলোড়িত। তিনি জেনেছেন চৈতন্যচরিতামৃতেও তো বাউল আছে।

'আমি ও বাউল আন্ কহিতে আন কহি'। চন্ডীদাসেও বাউল আছে,

'নীবিবদ্ধ পযে খসি বিনা মূলে হয় দাসী
বাউল হঞা কৃষ্ণ পাশে ধায়। *(পৃ: ১৩০, ঐ)*

তার মনে প্রশ্ন উঠেছে তাহলে বাউল কে। তিনি বলেছেন ''তবে শুনি, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। 'সেই মানুষে ফিরি খুঁজে', তাই আমি বাউল। সে মানুষ কে? সে মনের মানুষ, সহজ মানুষ, সে রসিক, সে অচিন পাখি, সে অধরা। সেই 'সোনার মানুষ ভাসছে রসে। সেই আলোকের মানুষ আলোকে রয়' সংসারের 'এই মানুষে সেই মানুষ আছে।'' *(পৃ: ১৩০, ঐ)* কেমন করে পাওয়া যায় তাকে? 'সহজ সাধনে। সহজ ভজনে।' মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে। যেমন চন্ডীদাস আর রজকিনী। নারী আর পুরুষের প্রেমে। তাই রূপ নেই, সে অরূপ। তার ভাষা নেই, সে অনির্বচনীয়। সে শুধু অনুভবের স্পন্দন? ''এই সহজ সাধন 'রেচক পূরক স্তম্ভন দিয়ে নদী কর বন্ধন।' কিন্তু 'সে নদী অত্যন্ত গভীর, আছে কামরূপী কুম্ভীর।' 'কুল কুন্ডলিনী শক্তি রয় মূলাধারে, প্রণয়ের যোগে জাগাও তাহারে।'' *(পৃ: ১৩০, ঐ)*

বাউল মনের কালকূট বাউলের তত্ত্ব-তালাশ করেছেন চৈতন্যচরিতামৃত ও চণ্ডীদাস থেকে। তাঁর মনের জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়ে গেছেন। বাসের মধ্যে যে দস্যি মেয়েটাকে দেখেছিলেন ছাগশিশু নিয়ে চলেছে এক সীমন্তিনীর সঙ্গে চিন্তামণিতে। প্রেমের স্থানে ছাগ শিশু কেন? কালকূট বুছেছেন তার অধরা প্রেমকে খুঁজতে সে যাচ্ছে চিন্তামণিতে মানতের ছাগ শিশু নিয়ে। 'ধান উঠেছে, ছাগ কিনেছে, পাওয়ার উৎসবের এই তো সময়।' *(পৃ: ১২৮, ঐ)*

আরও বুঝেছেন নবদ্বীপে কিংবা শান্তিপুরে কেন শাক্তদের এত দব্‌দবা আর কেনই বা চন্ডীদাস স্বয়ং শক্তিরূপিনী মা বাসুলীর উপাসক। আর জয়দেবে রাধাবিনোদের মন্দিরের গায়ে শক্তিরূপিনী দশভূজা মহিষমর্দিনী। বুড়ো বাউল তাঁর সঙ্গিনীর পরিচয় দিয়েছিল এইভাবে

'চন্ডীদাসের রজকিনী
যুগল প্রেম তারি শুনি
পদ্মাবতী চিন্তামণি
বিষম রসে পাতলি খুনি
নয়ন কোণে ঝলক দিয়ে
বাঁধগা এবার তিরিবেণী।' *(পৃ: ১২৯, ঐ)*

কালকূট নদীয়া জেলার ঘোষপাড়ায় দোল পূর্ণিমার রাত্রে লিচুতলার ছায়ায় বাউল-বাউলানীদের ভিড়েও এই তত্ত্বকথারই গান শুনেছেন। 'কথাছন্দে বাঁধার তলে তলে গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ। তবুও কেন্দুবিল্বই আদি'। *(পৃ: ১২৯, ঐ)* ঘোষপাড়ার মেলা ও জয়দেবের মেলারই সমসাময়িক কালকূট বাউল সম্পর্কে আরও জেনেছেন "বাউল বেদবিরোধী, সহজিয়া মতে, 'মাটির দেহ মাটিতে মিশায়।' গানের মধ্যে রাধা কৃষ্ণ গৌর নিতাই শুধু তত্ত্বকথার প্রতীক। তার দেবতা নেই, কোনো মূর্তি নেই।" *(পৃ: ১৩০, ঐ)* কালকূট আরও বলেছেন বেদ ও ব্রাহ্মণ জলে নেমে সূর্য তর্পণ করার সময় প্রার্থনা করেন, 'ভাই তোমার তর্পণের জল যদি অতদূর সূর্যের কাছে পৌঁছায়, তবে চাষের ওই কঠিন মাঠে অমনি করে জল পাঠিয়ে দাও না।' *(পৃ: ১৩০, ঐ)*

কালকূট বুড়ো বাউলের কাছ থেকে আর এক বাউলের আসরে গেলেন। তিনজনে খুঞ্জনি, বাঁয়া-একতারা ডুপকি বাজিয়ে নেচে নেচে গাইছে

বাঁয়ে ইড়া ডাঁয়ে পিঙ্গলা,
সুষুম্না মাঝে
রজ আর তমর মাঝে
গুণ বিরাজে। *(পৃ: ১২৯, ঐ)*

সহজ সাধনের প্রকৃতি বলে কল্পনা করা হয়েছিল পদ্মাবতীকে, দেহ ব্রহ্মান্ডের পূর্ণ আধাররূপিণী শ্রীরাধিকা। "সহজ সাধনের দেহ ব্রহ্মান্ডের অরূপ রসে ডোবার ছন্দ বুঝি বেজেছিল পদ্মাবতীর নূপুরে। বাউল তাই ন্যাড়া শিমূলের রক্ত মাতনের মত রঙে রঙে মাতে এসে বুঝি জয়দেবের পাটে।" *(পৃ: ১২৯, ঐ)* কালকূট জয়দেবের পাটে এসে বাউলদের আসরে আসরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাউলের সহজিয়া সাধনকে জানতে। বাউলের আসরে আসরে বাউলমনের অধিকারী, কালকূট বাউলের তত্ত্বকথাকে বিশদভাবে জানতে, আর 'মনের পড়শী'কে চিনে নিতে চাইছেন। বটের

তলায় বাউলের আসর ছেড়ে মূল মেলা আলো ঝলমল বেদনাশা বটের তলায় চলে গেলেন। মনোহর ক্ষ্যাপার আশ্রমটি সাজানো হয়েছে ব্যাটারি সেট মাইকও বসানো হয়েছে। সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো প্রকাণ্ড ছবি দিয়ে, চূড়ো করে বাঁধা চুলে গেরুয়া পাঞ্জাবি পরিহিত ক্ষ্যাপাবাবাকে গদিতে বসে থাকতে দেখলেন। পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম, সার্জের গলাবন্ধ কোট ও মণিবন্ধে ঘড়ি ও আঙুলে আংটি। আসল আশ্রম পুরুলিয়ায়। আর একজন মধ্যবয়সি মহিলা গেরুয়া সিল্ক পরে আছেন। তাম্বুলে রাঙ্গা ঠোঁট, চোখে কাজল, হাল ফ্যাসানের ব্লাউজ, গলায় সোনার হার, চশমা চোখে। ভক্তরা মা মা বলে তাঁকে ঘিরে বসে আছে। টেপরেকর্ডার নিয়ে এসেছেন এক ভক্ত। অনেক বাউলও এসেছে, কালকূট সেই আসরে বসে পড়লেন। একের পর এক বাউল গান গেয়ে যাচ্ছে। এক নবীন বাউল বনের হরিণের মত লাফ দিয়ে নেচে নেচে গান গাইছে। তারপরে খঞ্জনি বাজিয়ে মিষ্টি গলায় গান গাইতে লাগল।

"যদি এসে থাক হরি
নিয়ে নামের তরী
আমারে নিয়ো পার ক'রো।" *(পৃ: ১৩০, ঐ)*

বীরভূমের ঝোরামাঠ বাউল আখরা থেকে সে এসেছে। সঙ্গে বাউল গোপাল ক্ষ্যাপা তাঁর সঙ্গী। চোখে মুখে সর্বদাই এক ভাবের হাসি, গোপালের চোখে চোখ পড়লে লজ্জার মাধুরী ফুটে ওঠে এটা কালকূটের নজর এড়িয়ে যায় নি। তাদের সঙ্গে আর এক সঙ্গী দোতরা বাজায়, সে দীনবন্ধু। একসময়ে তারা দিনাজপুরে থাকত। বর্তমানে হুগলীর লক্ষ্মণপুরে থাকে। কিন্তু জয়দেবে তাকে আসতেই হবে সকলের সঙ্গে দেখা হওয়ার আশায়। বিশেষ করে গোপা-রাধারাণীর জন্য। কালকূট চোখে উঠে এসেছে বাউলদের জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র। ক্ষ্যাপা বাবার মত অভিজাত বাউল, অভিজাত বাউলানী। তেমনি প্রেমময় বাউল বাউলানী। বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরতে প্রায় পুরো মেলাটা ঘুরে দেখলেন। ধান উঠেছে, হাতে পয়সা এসেছে। ঘরবাড়ী সারাবারও সময়। তাই ছুতোর মিস্ত্রিও মেলায় হাজির। দরজা জানালার সঙ্গে কাঠের কুনীক, হাতা বাটি কী নেই মেলায়। কুড়ুল, কাস্তে, কাঁসার বাসন, জামা-জুতো স-ব। মেলা ঘুরে অনেক রাতে সেই বটের তলাতেই ফিরে এলেন। ঝুরি নামা, দাড়িওয়ালা বুড়ো বাউলের মত বটের মেলা। আলোর রোশনাই নাই। চাঁদনি রাতে আলো আঁধারির মধ্যে দীনবন্ধুর গান শুনে আশ্রমের খোঁজ পেয়ে গেলেন। উষ্ণ অর্ভ্যথনায় কালকূট আশ্রমে ঢুকে গেলেন। আশ্রমে দেখলেন দীনবন্ধু-রাধারাণী-গোপাল তিনজনে মধুর রসালাপ করছে। রাধারাণী দীনবন্ধুকে ডাকতেই দীনবন্ধু 'আজ্ঞা কর' বলে উঠতেই গোপাল জানতে চেয়েছিল "দীনবন্ধু বুঝি আজ্ঞাধীন?" *(পৃ: ১৩১, ঐ)* উত্তরে দীনবন্ধু বলেছিল "না। চির-অধীন।" *(পৃ: ১৩১, ঐ)*

কালকূট ছোট ছোট দু'একটি কথার মধ্য দিয়ে একটি বাউল-আশ্রমের রসপূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন রাধারাণী-গোপালের সম্পর্কে। সারাদিন ধরে অনেক গঞ্জিকা সেবন করেছে গোপাল, গভীর রাতে তাই গঞ্জিকা টানতে বারণ করেছিল। কিন্তু গোপাল ধোঁয়া ছেড়ে জানিয়েছিল যে না টানলে সুর আসে না। দীনবন্ধু গান ধরল

"আমার এক কলসে নয়টি ছিদ্র,
কেমনে রাখি জল গো সখি,
কেমনে রাখি জল।" *(পৃ: ১৩১, ঐ)*

উত্তরে রাধারাণী গাইল —

"ও মন এবার কোন উপায় দেখিনা
অটল মানুষে ডাকতে (আমার) সরে না রসনা।" *(পৃ: ১৩১, ঐ)*

উত্তর-প্রত্যুত্তরে গানের মজলিস জমে উঠল। সব উত্তর-প্রত্যুত্তর যে যথাযথ ছিল তা নয় তবুও সব থেকে শ্রেষ্ঠ গান হয়ে বাজতে লাগতে কালকূটের হৃদয়ে

"আমার যেমন বেণী তেমনি রবে,
চুল ভেজাব না।" *(পৃ: ১৩১, ঐ)*

কালকূট এ গান বিভিন্ন সভা, সমিতিতে বহুবার শুনেছেন কিন্তু জ্যোৎস্নারাতে আলো-আঁধারি পরিবেশে, অজয়ের নিশি পাওয়া বালুর চরে রাধারাণীর গানের মত গান কখনও শোনেন নি। একটা মায়াময় গানের পরিবেশ থেকে উঠতে ইচ্ছে না করলেও রাত দুটোর সময় আসর ছেড়ে উঠতে গিয়েই রাধারাণীর পা ঠেকে যাওয়াতে কালকূট 'আহা' বলে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। গোপাল হেসে বলেছিলেন "গোঁসাই, দেহিপদপল্লবমুদারম।" রাধারাণী খিলখিল করে হাসতে লাগল। কালকূট জ্যোৎস্না রাতে অজয়ের বালুচরে এসে দেখতে পেলেন গরুর গাড়ি অজয় পারাপর করছে, ছায়ার মত নরনারী দূর চলাচল করছে। দূর থেকে ভেসে আসছে গানের সুর। 'পড়শী'কে খুঁজতে পথে বেরিয়েছিল। আখড়ায় আখড়ায় বাউল-বাউলনীর সুর শুনতে শুনতে নিজেকে চিনেছেন। গানে গানে ওদের গুহ্যতত্ত্ব থাকবেই, এটাই বাউল-বাউলানীদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য। মানুষ চিরকাল নিজেকে খুঁজবে। নিজেকে খোঁজার প্রেমের মধ্য দিয়েই সে অপরূপ রূপ দর্শন করবে। যেদিন বাউল থাকবে না সেদিনও সে নিজেকেই খুঁজবে। প্রাণের টানে তাঁকে জয়দেবের পাটে আসতেই হবে। লেখক কালকূট নিজেকে খোঁজার তাগিদে তিনি বাউলের শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি জয়দেবের পাটে এসেছিলেন। তার বিবাগী বাউলের সহজ মনের তত্ত্বতালাশ করেছেন। ছোট্ট এই রচনাটিতে কালকূট বাউলের সহজিয়া সাধনে 'এই মানুষে সেই মানুষ'কে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর বৃহৎ উপন্যাস 'কোথায় পাবো তারে'তে তিনি বাংলার বিভিন্ন মেলায় ঘুরে

তারই বিচিত্র অভিজ্ঞতা গ্রথিত করেছেন। বেদনাশা বটের তলায় জয়দেবের পাঠে আবার এসেছিলেন। তাই 'খুঁজে ফিরি সেই মানুষে' এই ছোট্ট লেখাটিকে 'কোথায় পাবো তারে'র ভূমিকা বলা যেতে পারে।

'কোথায় পাবো তারে' — এই রচনাটি ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে (১৩৭২ বঙ্গাব্দে) 'দেশ' পত্রিকায় ১৯শে নভেম্বর থেকে ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৪ বঙ্গাব্দে) মে পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। পরে ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটি কালকূটের বৃহত্তম গ্রন্থ। নদীপথে বাংলার বসিরহাট থেকে যাত্রা করে নদীসংলগ্ন গ্রামাঞ্চল ভ্রমণ করেছেন। প্রথমে তিনি নদীপথে একাই বেরিয়েছিলেন অচেনার আহ্বানে। কিন্তু সেখানেই তাঁর সঙ্গী হয়ে যায় মুরশেদ গাজী। তার সঙ্গেই তিনি চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ দিকের নদীসংলগ্ন অঞ্চলগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে থাকেন, সেই সঙ্গে বাউল ক্ষ্যাপা মুরশেদ গাজীর গানে গানে বাউলের তত্ত্বকথায় মজে যান। সেই চেনা মানুষই কালকূটের চোখ দিয়ে নতুন করে ধরা পড়ে। এইভাবে তিনি অধরাকে ধরার নেশায় মামুদ গাজী কখনও ঝিনি, অচিনদা, বিন্দু, গোপীদাস বাবাজীকে নিয়ে বাংলার বিভিন্ন মেলায়, গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেরিয়ে মেলার চিত্র, গ্রামীণ সংস্কৃতি, লোকাচার ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত মামুদ গাজীকে নিয়ে এবং এরপরে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা সহ আরও অনেক জায়গা ঘুরে বেরিয়েছিলেন। বাংলার জনপদের বিশাল জনসংখ্যার জনমানসের জীবনপ্রণালী কালকূট তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তুলে ধরেছেন নিজেকে নতুন করে দেখার আলোকে। এই বিশাল কাহিনী কয়েকটি বৃত্তে আলোচনা করব। লেখক কালকূট, ঝিনি ও মামুদ গাজী নিয়ে একটি বৃত্ত। ঝিনি, অচিনদা, বিন্দু গোপীদাস এঁদের নিয়ে একটি বৃত্ত। আর বিন্দু গোপীদাস কালকূট এদের নিয়ে আর এক বৃত্ত। এছাড়া আরও কয়েকটি বৃত্ত, সেগুলো সবই এই আলোচনায় উঠে আসবে। এখন এই কাহিনীই আলোচনা করা হবে।

লেখক এক শীতের সকালে, নীলাকাশ যখন সূর্যের আলোয় ঝকঝক, ইছামতীর জোয়ারে বাড়ন্ত, সেই ঢেউহীন নদী আরশি হয়ে গেছে, নীলাকাশ তার মুখ দেখছে সেই ঢেউহীন জলে, লেখক নৌকায় চেপে বসলেন। ইচ্ছা ইছামতীর ওপারে যে আম জাম জারুল গাম্বিল কাঁঠাল নারকেলের গাছগুলো শীতের সকালের মিষ্টি রোদ পোহাচ্ছে সেইখানে তিনি গিয়ে ঘরের কাছের গ্রামখানি আপন আলোয় দেখে নেবেন। নৌকা ছাড়ার মুখেই রঙ ওঠা গেরুয়া আলখাল্লা হাঁটুর ওপর তুলে অধর মাঝিকে ডাকতে ডাকতে ছুটে নৌকায় উঠতেই মাঝি নৌকা ঠেলে দিয়েছিল। জয় মুরশেদ বলেই লোকটি বলতে শুরু করেছিল তার কাহিনী। হরেকেষ্টর সঙ্গে তার বউয়ের সঙ্গে গাই দোয়ানো নিয়ে ঝগড়া থামিয়ে তবেই সে আসতে পেরেছে কথা বলতে বলতেই তার

ধূলোমাখা আলখাল্লা ঝাড়তে শুরু করে সন্তর্পণে। জোড়া দিতে দিতে ওটাকে লেখকের কাঁথাখাল্লা মনে হয়েছে। আর পাগড়িটি শত ছিদ্র আর গিঁটে ভরা। ঘাড় অবধি বাধার চুল সহ কাঁচাপাকা গোঁফ দাড়িতে মুখ ভর্তি। মুখখানি যেন আদ্যিকালের মুখের মত। পাগড়িটি মাথায় বাঁধতে বাঁধতে গান জুড়ে দিয়ে লেখকের মন দুলিয়ে দিল 'আমি ছিলাম কোন্ খানে / আমারে আনল কোন্ জনে।' *(পৃ: ২০২, কালকূট রচনা সমগ্র ১ম খণ্ড)* সাঁইবাবা না দরবেশ লেখক কিছুই বুঝতে পারছেন না অথচ গানের কথাগুলো মর্মে বিঁধছে। তিনি কোথায় যাবেন কেউ বলে দিচ্ছে না, শুধু একটা অধরাকে ধরার আহ্বান। গানের মধ্য দিয়ে তাঁর এই আবিলতা একটু কেটে গেল ওই লোকটিরই কথায়। বাবু কোথায় যাবেন, বাবুকে চিনতে পারছে না, এদিককার নয় বলে মনে হচ্ছে। লেখক কালকূট ওপারে যাবেন একটু ঘুরতে ফিরতে অথচ ওপারে গ্রামের নামও জানেন না। এই কথা শুনে লোকটি মাঝিকে সাক্ষ্য মেনে হেসে জানায় এমন মজার ব্যাপার সে দেখেনি। ওপারের গ্রামের নাম ইটিন্ডা, দেখার কিছু নেই, দুপাক দিলেই বর্ডার। সবাই হিল্লি দিল্লী যায় আর বাবু এলেন এই গাঁয়ে জঙ্গলে। ধানচালের কারবার না পাটের দরবারি না বর্ডারের কাজকম্মের খোঁজখবর নিতে নয়, শুধু শুধু কেউ আসে নাকি; সাঁইবাবার বার বার জিজ্ঞাসায় লেখক ফিরে তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন যে সে কেন বেরিয়েছে? বাবু, পেটের ধান্দায়। যদি বলেন কিসের মজদুরি, 'মহাপেরানীর ধান্দায়, মরশেদের নামের মজদুরি।' *(পৃ: ২৫৪, ঐ)* সাঁইবাবার কথা শুনতে শুনতে লেখক কালকূট অনেক বছর পিছনে এগিয়ে গেলেন। দেখতে পেলেন এক ছোট ছেলেকে, বয়স তার দশ। ইস্কুল থেকে ফিরে মায়ের ডাক না শুনে, খাবার না খেয়ে দৌড়। সে আজ যাবেই, দূর নদীর হাতছানি তাঁর প্রাণকে আকুলি-বিকুলি করে প্রতিদিনই। তাই সে মরিয়া হয়ে কদমতলা ছাড়িয়ে নারিন্দার পুলের দিকে ছুটতে থাকে। ঢাকা শহরের পাকা রাস্তায় ঠিকমতো চলতে পারে না, ঘোড়ার গাড়ী ছুটে চলছে, গাড়োয়ান হাঁক দেয় সরে যেতে। নারিন্দার পুল পার হয়ে, খালের পার দিয়ে ইটের ভাঁটা ছাড়িয়ে মুসলমান পাড়ার খালের ঘাটে বাধা গাব মাখানো কোষাখানি পছন্দ করে ডিঙির মালকিনের বাড়ি যায়। বুড়ি নানী ছোট ছেলেকে ডিঙি ভাড়া দিল, তার পরীক্ষা নিয়ে। খালে নেমে কাঁথা সেলাইয়ের মত জলে ফোঁড় কেটে কেটে সে এগিয়ে যায়। বুড়ি নানী সন্তুষ্ট, নগ্ন গায়ে লেগে থাকা জোঁকগুলো ছাড়িয়ে দিয়ে নানী তাঁর সোন্দর সাঁতারের প্রশংসা করে। তাকে দু'পয়সা দিয়ে নৌকো ভাড়া নিয়ে গ্যান্ডাইরা যাবে বলে নাও ভাসিয়ে দেয় অন্যদিকে। নতুন মাঝি হয়ে সে ভেসে চলে গেল বুড়ি গঙ্গার দিকে। সেখানে অথৈ জল ছাড়া আর কী আছে ছোট ছেলেটি জানে না। কী এক অচিন আনন্দ বুড়িগঙ্গার বুকে রয়েছে, তা মোহনায় না গেলে জানা যাবে না। বুড়ি নানীর কথা না শুনে বুঝতে পেরেছে কিনারে কিনারে না যাওয়ার ফল। বৈঠা তার কথা শোনে না। তবুও চেষ্টা করে পাড়ের কাছে নিয়ে লগি ঠেলে চলতে চলতে কলুটোলা ছাড়িয়ে

এগিয়ে যায়। কেউ কেউ ছোট মাঝিকে ডেকে মস্করা করে কই যাস ছ্যাম্‌রা, ও ছ্যামরা বান্দর, ওর মায় সোন্দর ইত্যাদি। রাগে জ্বলে যায় ছোট মাঝি, মনে মনে বলে পেতনীটা যেন মরে। পুল পেরিয়ে কিছুটা আসতেই সন্ধ্যা নেমে আসে। বাঁয়ে ফোজী ব্যারাক, ডাইনে মালাকার পাড়া, ওর বন্ধু বিল্টুর বাড়ি। ওদের ঘাট থেকেই ও দূরের বুড়িগঙ্গাকে অনেকবার দেখেছে। আর একটু এগিয়ে গেলেই বুড়িগঙ্গার মোহনা। কিন্তু ডিঙ্গিটাকে সে কিছুতেই আর সামলাতে পারে না। কারা যেন হাত দিয়ে ডিঙ্গি টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু ডিঙ্গিটি কিছুতেই সে সামলাতে পারে না, ডিঙ্গিটি খড়কুটোর মতো ভেসে চলে। কিন্তু ছেলেটির চোখে তখনও বুড়িগঙ্গার স্বপ্ন। প্রকৃতপক্ষে প্রকাণ্ড একটি নৌকা ডিঙ্গিটির সামনে এসে পড়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ধাক্কা লাগলে ছোট ডিঙ্গি টি খান্ খান্ হয়ে গিয়ে বড় বিপদ হতে পারত। সৌভাগ্যক্রমে বড় নৌকার মাঝিরা ছেলেটিকে উদ্ধার করে। হালমাঝি তাকে জিজ্ঞেস করে, 'কই যাইতে চাইছিলা বাসী?' 'বুড়ি গঙ্গায়।'
'বুড়িগঙ্গার কোন্‌খানে?'

'বুড়ি গঙ্গায়।' ছেলেটি এর বেশী বলতে পারেনি এবং জানেওনা, মাঝি তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'ক্যান, কী আসে হেইখানে? কিসের খোঁজে?'

'জানো না' *(পৃ: ২৫৭, ঐ)* ঘরে ফেরার পর তাকে মারধোর, বকাবকি করা হয় এমনকি মাস্টারমশাই তাকে শাস্তিও দেন। এত ঘটনার পর ছেলেটির চোখে বুড়ি গঙ্গার স্বপ্ন ভাসতে থাকে। লেখক কালকূট চলেছেন ইছামতী পার হয়ে অচেনা গ্রামের পথে। দরবেশ লেখককে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, লেখক কোথায়, কিসের খোঁজে বেরিয়েছেন। লেখক কালকূটের এই উত্তর জানা নাই, ঐ ছোট ছেলেটিরও জানা ছিল না। তখন ঐ ছোট ছেলেটির চোখে ছিল রূপের তৃষ্ণা। কালকূটের কথায় "আজও তাই দেখি, দু'চোখ ভরা তৃষ্ণা, তৃষ্ণা। কিন্তু কিসের খোঁজে, সেই অরূপের কী নাম, কে জানে। বেরিয়েছি অনেক কাল, চলেছি কালান্তরে। এখন ভাবি, এই মানুষ আর প্রকৃতির রূপের হাটে, অরূপের নাম যদি দিই, মনের মানুষ, তবে কেমন হয়।

কিছু হয় না। কেবল বলতে হয়, কোন্ মানুষে, সেই মানুষ আছে! থাকে কোথায়! চলে কোন্ আজবের কলে।" *(পৃ: ২৫৮, ঐ)*

লেখক কালকূট জানতে পারলেন যে, তিনি যাকে দরবেশ বা সাঁইবাবা বলে জেনেছিলেন আসলে তিনি মামুদ গাজী। গাজী ডুপ্‌কি ও মুংগুর বাজিয়ে গান শোনাতে শুরু করেছিল। গ্রামের অনেক মানুষ সেখানে হাজির হয়েছিল এবং লেখক কালকূটকে গাজীর সাথে দেখে তাদের মনে নানারকম প্রশ্ন জেগেছিল। গাজী গান ধরল —

'এখন আমার মনের মানুষ কোথা পাই।
যার তরে মন খেদে প্রাণো কান্দে সব্বোদাই।।

ওহে দেল-ল্-ল্-ল্' *(পৃ: ২৫৯, ঐ)*

লেখক কোথায় যাবেন সেকথা গাজী লেখকের কাছে জানতে চাইলে লেখক বললেন 'সোজা'। গাজী লেখককে জানায় সে সোজা যাবার যো নেই, কেননা মাঠ পার হলেই বর্ডার। কালকূট বর্ডারের দিকে যেতে চাইলেন না, গাজীর কথামতো হাসনাবাদের পথে পা বাড়ালেন। ইছামতী নদীতে অধর মাঝির নৌকায় উঠলেন, গাজীও লেখকের সঙ্গ ধরলেন। গাজী, মটরের আর লঞ্চের ভাড়া যাতে কালকূটের কাছ থেকে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করেছিল। গাজী বলেছিল যে "মটরের ভাড়াটা দিবেন বাবু, আর যদি হরিপদ সারেঙ না থাকে, তা হলি লঞ্চের ভাড়াটা—।" *(পৃ: ২৬১, ঐ)* কালকূট গাজীর এইরূপ আচরণে বিরক্ত হয়েছিলেন। তার মনে হয়েছিল "এতদিন জানা ছিল, একমাত্র মাতুলালয়েই এরকম আবদার করা যায়।" *(পৃ: ২৬১, ঐ)* অধর মাঝি গান গেয়ে উঠেছিল। লেখক অধর মাঝিকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তিনি দেখেছিলেন "সে অধর, সে হিসাব করেছিলাম তার ভাব ভঙ্গি দেখে। এখন যে দেখি, এ আর এক মানুষ, গূঢ় মানুষ। চোরাকে চিনতে পারিনি।" *(পৃ: ২৬১, ঐ)* অধরের ভাবলেশহীন মুখের দিকে চেয়ে লেখকের হঠাৎ মনে হল, "অধর মাঝি বোধহয় একেবারে অধর নয়।" *(পৃ: ২৬১, ঐ)* নৌকার থেকে নেমে গাজী ও কালকূট গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি এগিয়ে চলে, অবশেষে মহিলা যাত্রী তিনজন, তাদের মধ্যে একজন মহিলার মুখে বিড়ি। স্ত্রীলোকের মুখে বিড়ি — এই প্রথম দেখলেন না, এর পূর্বেও দেখেছেন। দ্বারভাঙ্গার পথে ট্রেনের ফাস্ট ক্লাস কামরায় এক ভদ্রলোক তার পরিবারসহ উঠেছিলেন, লেখকও ঐ কামরায় ছিলেন। ঐ কামরায় একটি এমন ঘটনা ঘটল যে লেখক ভুলতে পারনেনি। ঐ ভদ্রলোকের গিন্নী লেখকের কাছে সিগারেট আর দেশলাই চেয়েছিলেন। ঐ গিন্নী এও জানিয়েছিল যে, লেখক যেন তাকে তাড়াতাড়ি ঐ জিনিসগুলো দেন, ভদ্রলোক চলে আসলে আর হবে না। খেক সিগারেট বের করে দেশলাই ঐ মহিলাকে দিয়েছিলেন। সেগুলো পেয়ে মহিলার কি অবস্থা হয়েছিল, লেখক কালকূট সেই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "আঃ, আহা, জীবনে কোনদিন কোন রমণীর অমন খুশি ঝলকানো তৃপ্ত মুখ দেখেছি কিনা মনে করতে পারি না।" *(পৃ: ২৬৩, ঐ)*

অন্যদিকে লেখকের মন চলে গিয়েছে অচেনাকে চেনার কৌতূহলে, 'হাসনাবাদ' জায়গাটার চেহারা কেমন হবে, শহর হবে না গ্রাম হবে, সেখানে বেমানান লাগবে কি লাগবে না। গাজীর গলার আওয়াজ শোনা গেল, 'ওই যে দেখা যায় হাসনাবাদ এসে পড়া গেল।' *(পৃ: ২৬৪, ঐ)* কালকূট সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ঘনবসতির সীমায় যেন দিগন্ত ঠেকেছে। কাঁচা পাকা বাড়িগুলো দূর থেকে দেখে মনে হয় চাপাচাপি-ঠাসাঠাসি হয়ে আছে। আকাশের দিকে হাত বাড়ানোর নারকেল সুপারি গাছগুলো মাঝে মাঝে ফাঁক রেখেছে। গাড়ির ভিড়ও রয়েছে। নদীকূলে সারি সারি নৌকা ও নৌকার ভিড়ের মধ্যে একটা স্টীম লঞ্চও দাঁড়িয়ে আছে। লেখক কালকূট

লঞ্চের প্রথম শ্রেণীতে গিয়ে বসলেন। লঞ্চে বসেই লেখকের মনে হয়েছিল, এপার ওপার দুই দিগন্ত তাঁর জানলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে যেন। এপারের হাসনাবাদকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন বিশাল এক গঞ্জ। তাঁর আরও মনে হল, ওপার বাঙলায় এইরূপ নদীকূলের গঞ্জকেই বলে বন্দর। যে ঘাটে দূর দেশান্তর থেকে আসে নানান জলযান। এপারটাও সেইরকম। ঘাটে অনেক নৌকা আর পিছনের বাঁকের দিকে আরও কয়েকটি লঞ্চ। ওপারে রয়েছে উঁচু পাড়ের বাঁধ। এপারের ভিড়-ব্যস্ততা যেন ওপারটা গাছপালায় রৌদ্রছায়ায় মাখামাখি করে জমিয়ে রয়েছে নিবিড়-নিশ্চুপে, ঝোপে-ঝাড়ে পাখিদের কলকাকলিও যেন শোনা যায়। গাজীও লঞ্চে উঠেছে। মোটা লেন্সের চশমা পড়া প্রৌঢ় এবং ছাপা সিল্ক-এর শাড়ি পড়া তরুণী এক তাঁতের শাড়ি পরা বিবাহিতা মহিলা লঞ্চের প্রথম শ্রেণীতে উঠে বসলেন। লেখক জানতে পারলেন যে, তরুণীর নামটি 'ঝিনি' পোশাকী নাম 'অলকা'। গাজীর কাছ থেকে এও জানতে পারলেন যে, ইছামতীর জল নোনা। নোনা জল ঢুকে যাতে ফসল নষ্ট করতে না পারে, তার জন্যই ভেড়ির বাঁধ দেওয়া। ইছামতীর জলে শমন বা কামট আছে; যা কিনা বেউ জলে নামলেই আক্রমণ করে। যেটুকু পাবে সেটুকুই খুবলে নিয়ে যাবে। লেখক কালকূট গাজীর আর একটু পরিচয় পেলেন যে, গাজীর বাবা মুসলমান, সে নিজেকে মুরশেদের দাস মনে করে, মুরশেদের কাছে হিন্দু, মুসলমান কোন ভেদাভেদ নেই। সে গান ধরে—

'সব লোকে কয় তুমি কী জাত সংসারে।
আমি কই, জেতের কী রূপ, দেখলাম না নজরে।
সুন্নত দিলে হয় মুসলমান, নারীলোকের কী হয় বিধান।
বামন চিনি পৈতার প্রমাণ, বামনী চিনি কী ধরে।' *(পৃ: ২৭২, ঐ)*

গান শুনে লেখক ভাবেন, "এমন কথা শুনি নি আগে। কে বেঁধেছে এমন কথা। কে গেয়েছে সুর করে। কোথা থেকে আসে গাজীর ভাণ্ডারে। মনে হয়, এক কথাতে জগতজোড়া জাতের বিচার দিলে মিটিয়ে।" *(পৃ: ২৭২, ঐ)* গাজী একের পর এক গান ধরেই চলেছে, ঝিনি সেই গান শুনে মুগ্ধ। লেখক জানতে পেরেছেন, ঝিনি ফিলজফি পড়া মেয়ে। যে গাজীকে খুশী হয়ে এক টাকা দিয়েছিল। ঝিনিকে দেখে লেখকের মনে হয়েছে, "এও যে রূপ অরূপের খেলা। একদিকে 'দর্শন' আর একদিকে পায়ে নখের রঙ থেকে অশ্বলাঙুল কেশ বাঁধুনি। এই যোগের ভিতর দুয়ার হাতড়ে পাওয়া দায়। এ দুয়ের আনাযানা কোন্ দরোজায়। সাবধান, মানুষ চেনার রসিক তুমি নও। নাগরিকা যদি বলেছ, তবে কবুল করো, এ মেয়ে বিদূষী।" *(পৃ: ২৭৪, ঐ)* গাজী, লেখক ও নিজের জন্য কালীনগরের টিকিট দিতে বলে টিকিট বাবুকে। ইতিমধ্যে লেখক কালকূট যে লেখালেখি করেন ঝিনি ও তার পরিবারের লোকজনের জানা হয়ে গিয়েছে। অবশেষে লেখক ও গাজীর লঞ্চ থেকে নামার সময় হল এবং নামার সময় ঝিনি লেখক তাকে তার নাম-ঠিকানা লিখে দিতে

বলেছিল। তিনি অবশ্য লিখে দিয়েছিলেন।

লঞ্চ থেকে নেমে পাড়ে উঠে দেখলেন, ঝিনি হাত তুলে রয়েছে। কি যেন একটা বলছে ঠোঁট নেড়ে বোঝা যাচ্ছে না। লঞ্চটি আবার ভেসে যেতে থাকে, এবার ঐ খোপ চলে যায় দিগন্তে। সেখানে ঝিনির ছাপা শাড়ির আঁচল বাতাসে উড়ছে। লেখক ভাবছেন — তিনি ভালভাবেই জানেন এই পথের দেখা পথেই শেষ। তবুও, সুজনকে বিদায় দিতে হয় দাঁড়িয়ে থেকে। গাজী গুনগুন করে গান ধরে —

'ও সে না জানি কী কুহক জানে
অলক্ষ্যে মন চুরি করে।
কুল মান সব গেল হে
তবু না পেলাম তারে
(আমার যে) প্রেমের ছিটা নাই অন্তরে।?... *(পৃ: ২৭৮, ঐ)*

লঞ্চ থেকে নেমে বাঁধের উপর দিয়ে রাস্তা, সে রাস্তা এমন রাস্তা যে দু'জন পাশাপাশি যাওয়া যায় না। বাসে চেপে আসার সময় লেখক যে স্ত্রী লোকটিকে বিড়ি খেতে দেখেছিলেন, সেই স্ত্রীলোকটিকে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা গেল। গাজী তার স্বামীকে 'মাহাতো চাচা' বলে ডেকেছিল। মাহাতোর স্ত্রীর মুখে এখন আর বিড়ি নেই, তার মুখখানিতে ঢল ঢল ভাব রয়েছে, তার মুখের চেয়ে শরীরখানা আরো কাঁচা। মাহাতো লেখককে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, এই বাবুটি কে? গাজী তাকে জানিয়েছিল যে, সে বাবুটিকে পথে পেয়েছে, বাবুটি বেড়াতে এসেছেন। মাহাতোর লাল টকটকে চোখ, মণি দুটোও লাল মনে হয়। ঐ চোখে ক্ষণেক লেখকের দিকে তাকিয়ে হাসতে গিয়ে কেশে ফেলল, বলল — 'এই বাদার বাজারে বেড়াতি? কী বলে দেখ।' *(পৃ: ২৭৯, ঐ)* লেখক কালীনগর সম্পর্কে লেখকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে কালীনগর নামেই নগর, গাড়িঘোড়ার খোঁজ না করাই ভালো, চলাফেরা করতে হয় নদী-খাল-বিল নয়নজুলি এদের ওপর দিয়ে। মাঠে অনেক নৌকা। গোটা দুই লঞ্চও আছে। খেয়াঘাট রয়েছে। মাঠ বরাবর ওপারে বাঁধের ধরে ঘরের পর ঘর। কালীনগরে হাট বসে, মাঠে ধানের গন্ধ, গেমো জঙ্গল রয়েছে। ভাঁটার পলি পাঁক রয়েছে। সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে, এখানকার মাঠে-জলে মানুষে সমস্ত কিছুতেই যেন এক মহোৎসব আসন্ন। লেখক প্রকৃতির রূপ দেখে মুগ্ধ।

গাজী এগোতে এগোতে সকলের সঙ্গে সমাচার নেওয়া-দেওয়া করতে থাকে। গাজী বলতে থাকে হাটের দিন হলে এর রূপ অন্যরকম হত। কবরেজ মশাই-এর সঙ্গে দেখা হতেই তাকে গড় করে বলল তিনি কেন এখনো বাড়ী যান নি। কালকূট দেখলেন 'ঔষধালয় ছাপটি' আছে। তার সঙ্গে সারিবাদী সালসা আর মোদক মকধ্বজের বিজ্ঞাপনও দরজায় টাঙানো আছে। সাইনবোর্ডটি

টিনের, আলকাতরা দিয়ে আঁকাবাকা অক্ষরে লেখা। কালকূট বুঝেছেন যে ডাক্তারখানা আছে, রোগীরা ডাক্তারের কাছে ধর্ণা দিয়ে বসে আছে। এই গঞ্জের থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না। নরসুন্দরের দোকানে যত রকমের বায়োস্কোপের ছবি সাঁটা আছে। তিরিশ বছর আগের নটী হাল আমলের হিরোইনের পাশে চোখে চাক্কু মেরে তাকিয়ে আছে। এইসব অতি চেনা চিত্র লেখক কালকূট দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর মন ভিন্ জগতে চলে যায়, সবকিছু চিরচেনা বলে মনে হয়। ছোটবেলায় পূর্ব বাঙলায় দেখে এসেছেন বলে নয় 'এই ছবিতে যেন শত শতাব্দীর অতীত কথা কয়। এই হাটে যেন নিজেকে দেখা যায়। আধুনিকতার মধ্যে দূর কালের এক চেনাচেনি, নতুনের স্বাদে চাখাচাখি।' *(পৃ: ২৮১, ঐ)* একটি কালো মেয়ে কুচো চিংড়ি নিয়ে বসে আছে। মুখে তার উপোসের ছাপ। আর একজন গামছা পেতে সের দুই চাল নিয়ে বসে আছে। এ বড় গঞ্জ যেন 'দারিদ্র্যের পসরা' বলে তার মনে হয়েছে। গাজীর সঙ্গে এদের কথা হয়। লেখক কালকূট জানলেন সোরেনের বউ মাছ বিক্রি করতে এসেছে, আর সোরেন হাঁড়িয়া খেয়ে পড়ে আছে। কোন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বৌটি ম্লান মুখে মাছ বিক্রি করতে এসেছে সেটা তিনি অনায়াসভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। বেদনাকে, দুঃখকে অসীম মমতায় ব্যক্ত করেছেন। সুন্দরবনের হাতায় এই গঞ্জের মধ্যে কাঁস বাজানো মেয়ে গলায় গান ভেসে আসে 'প্রেম করে ভাই, সঙ্গে নিলে না—আ—আ—আ...।' *(পৃ: ২৮১, ঐ)* যেমন গানের বাণী, তেমনি গলাখানি, প্রতি অক্ষরেই চন্দ্রবিন্দু। সবাই গাজীকে বলে তার সঙ্গে ওটি কে? কেন এসেছে। গাজীর সে-ই এক উত্তর। 'বাবু বেড়াতি এসেছেন' চালের আড়তদার বলছে যে এখানে দেখার কিছু নেই 'খালি ধান আর চাল'। যেখানেই যাওয়া যায় না কেন, মাঠ আর জল ছাড়া কিছুই চোখে পড়বে না। আড়তদার তাকে তার দোকানে বসতে বলল। ব্যবহারে তাঁর মন গলে গেল। 'এসজন বসজন' বলে বাঙলায় একটা কথা আছে অনেকটা সেরকম বলে মনে হল। প্রাণের সুরের রেশ আছে এই ডাকে। শহরের আধুনিকতার সঙ্গে এই আপ্যায়ন মেলে না সেখানে সময়ের ফের ধরে বিচ্ছিন্নতা এসেছে। আড়তদার তাকে তামাক খেয়ে যেতে বললে গাজী জানায় 'বলি, অ বিশ্বাস মশাই, এনারা তামাক খান না, ছিরগেট খান, ছিরগেট।' *(পৃ: ২৮২, ঐ)* বিশ্বাস মশাই এটা জানেন তবু বলেন, কালকূট বলেছেন এসব 'সাবেকী শালীনতা'। হাটের পিছন দিয়ে যেতে যেতে এক ভয়ঙ্কর নাটকের সম্মুখীন হয়ে গেলেন। একজন আকাশ কাঁপিয়ে হাঁক দিচ্ছে 'না ছেড়ে দাও, ছাড়ো, আজ ওর রক্তদর্শন না করি ছাড়ব না।' *(পৃ: ২৮৩, ঐ)* কে কার রক্ত দর্শন করতে চায় কিছুই বুঝতে না পারাতে গাজী ব্যাপারটা জানতে ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে গেল। কালকূটকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। গাজীকে বকতে গিয়েও কিছু বলতে পারেন না। তার দৃষ্টি আটকে যায়। 'দেখি, এক ঘর সামনে নিচু দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে এক মেয়ে। অনাদি পাল আর তার সামলানো দল সেখানে এসে

ঠেক খেয়েছে।' *(পৃ: ২৮৩, ঐ)* তাকে দেখে কালকূটের মনে হল 'এ তো মেয়ে নয়, যেন নাগিনী ফণা তুলে ঘাড় কাত করে আছে। ছায়াটিওযদি নড়ে, জানবে তা হলেই ছোবল। সেই রকমই দেখি যেন। নয়া কাজলের কালি নয়, বাসি কাজলের কালি তার চোখে। তার সঙ্গেই দেখ, রাত জাগা ছায়া চোখের কোলে। তাইতে যেন বড় ফাঁদি চোখের চাহনিকে খরতা দিয়েছে বেশী। চোখ নয়, শান দেওয়া ছুরি। তাতে আবার আগুন দপদপায়! বাসী পানের ছোপ ঠোঁটে। সেও যেন আর এক বাঁকা ছুরি। ঠোঁট টেপা, বুকের আগুন বাঁকানো। এর থেকে নতুন খাওয়া পানের রঙে রাঙানো ঠোঁটের ঝলক আলাদা। তাতে রঙ থাকে, আগুন থাকে না। কালো কালো মুখখানির ছাঁদ এদিকে মন্দ নয়।' *(পৃ: ২৮৩, ঐ)* অনাদি চেঁচিয়েই যাচ্ছে, 'বের হয়ে আয়, ওরে হারামজাদা, দেখি তোর পীরিত কুড়কুড়ায়, না জান কুড়কুড়ায়।' *(পৃ: ২৮৩, ঐ)* মেয়েটি নির্বিকার। সে বলছে ' ডেকে তো আনি নি। নিজের মনে এসে ঢুকেছে, ইচ্ছে হলে নিজের মনেই বেরুবে।' *(পৃ: ২৮৪, ঐ)* এরপরে অনাদি দরজা ভাঙ্গতে চাইলে রুখে দাঁড়ানো নাগিনীর মত 'ঘরের দরজা মাগনা নয়। এই ঘরে যখন বাস করি, তখন তা'লে ভাঙচুর আমাকে আগলাতে হবে। তারো সবাই সাক্ষী।' *(পৃ: ২৮৪, ঐ)*

কালকূট কী বিচিত্র জীবনচিত্র এঁকেছেন, একেবারে মরমে গিয়ে ঠেকেছে। যে স্রোত ছিল তলে তলে তাতে ঢেউ তুলেছে দুলি বিলাসিনী। তিনি বলেছেন 'এ যে বাদার হাটে এসে দেখঙা পেলাম হালের বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির। এই রূপের হাটে অরূপের আলো কোথাও ধিকি ধিকি জ্বলে নাকি। তবে কি এ পীরিতি সেই পীরিতি নাকি। ধরায় ফেরে অধরা চিন্তামনি, ফাঁদ পেতেছে বিল্বমঙ্গল। দুলির কথায়, ঘুর ঠিকানায়, সেই কথাটাই বাজে যেন। আসতে বলি নি, যেতে বলব না। এতে কী বোঝ হে। ভিতর ঘরে সে আছে সে থাক।' *(পৃ: ২৮৫, ঐ)* কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, একসময় দরজা খুলে অনাদি পালের ভাই অনন্ত বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় চুরি করে যাওয়া সারমেয়টির মত। অনাদি বীর বিক্রমে ফিরে যায়। ভাই পিছনে পিছনে চলে। দুলি এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে সাপিনীর মত ভয়ংকরী হয়ে ওঠে চোখে আগুন ঝরিয়ে অনন্তকে দাঁড়াতে বলে ঘর থেকে শাড়ী, মনোহারি জিনিস, পাউডার, আলতা, টাকা বাধা রুমাল, ঠোঙা ভর্তি খাবার সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিয়ে যেতে বলল, এবং আর কখনও যেন এ'মুখো না আসে সেটাও বলে দিল। কালকূটের মনে হল 'দুলির চোখ দুটো চল্‌কানো গাঙের মতো দেখাল।' *(পৃ: ২৮৫, ঐ)* যতই দেখছেন, ততই তিনি মানবজীবনের বিচিত্র রসে ডুবে যাচ্ছেন। অদৃষ্টের কী পরিহাস! অনঙ্গের মানে লেগে গেল, সে বলে উঠল 'কী এত বড় আসপদ্দা, মুখের উপর জিনিস ফেলে দিলে! আবার তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে? তবে আমিও এই পিতিগ্‌গে করে যাচ্ছি, শালার এ মুখো আর কোনোদিন হবো না।' *(পৃ: ২৮৫, ঐ)* আর মজার ব্যাপার ঘটল এ'কথা বলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল জিনিসগুলোর উপর। লেখক কালকূট এমন একটি চিত্র দৃশ্যায়িত করেছেন যা অম্লমধুর, তার সঙ্গে

হাস্যরসও জড়িয়ে আছে। তিনি বলেছেন এরকম দৃশ্য অপরিচিতের মধ্যে ঘটেছে বলেই তিনি দেখতে পেলেন, নিজের চেনা জনপদে হলে পারতেন না। 'চেনাচিনিতেই যত গোলমাল, সে তখন পরিচয়ের নানান বেড়া তুলে দেয়। সেখানে ভদ্রলোকের সহবত ঘাড়ে আমার পাল্লার কাঁটায় এদিক-ওদিক করে। এখানে অচেনার ভিড়ে আমার সে দায় নেই।' *(পৃ: ২৮৫, ঐ)* একটা অতিনাটকীয় অথচ বাস্তব চিত্রও তুলে ধরেছেন। প্রতিটিক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে ভাষার তারতম্য, এক এক জায়গায় এক একজনের স্থান অনুযায়ী ভাষা বসিয়ে দিয়েছেন, যা এই কাহিনীকে সমৃদ্ধ করেছেন। চব্বিশ পরগণা দক্ষিণ দিকের জনমানসের জীবনপ্রণালীর রূপচিত্র এঁকেছেন, সেইসঙ্গে তুলে এনেছেন, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, আর্থসামাজিক ব্যবস্থা। দুলি অনঙ্গর মান-অভিমানে ঝগড়া, কথা কাটাকাটি চলতেই থাকে, কিন্তু তাঁর এতে দোষ লাগে না। মনটা উদাস হয়ে যায়। 'বুকের কাছে নিশ্বাস দীর্ঘতর, ভারী লাগে, আলোর বৃত্তে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ঝমক ঝমক তালে যেমন আচমকা তারের যন্ত্রে ছড়ের লম্বা টান পড়ে যায়। চোখের সামনে ভেসে থাকে কেবল বাসী কাজল-ধোয়া দুটো গাঙ-চল্‌কানো চোখ।' *(পৃ: ২৮৫, ঐ)* গাজীর চোখেও 'তার ইছামতী আরশি চোখে ছায়া। সেই যে পাজী পাজী ঝিকিমিকি, তা, নেই। আমার দিকে ফিরে বলে, 'বোঝালেন না বাবু, একে বলে মরণ। সেই যে মুরশেদ বলে না ''কল্লি কল্লি, সবই কল্লি, আ মরণ, মল্লি কবে জানলি না'', এ সেই রকম।' *(পৃ: ২৮৫-২৮৬, ঐ)* লেখক কালকূটের মনে পড়ল ভানুসিংহের পদাবলীর কথা তার আরও মনে হয়েছে দুলির সত্যি মরণ হয়েছে। হাটের মাঝে যেসব খুলে হাট করে বসে আছে নগদ পাবার আশায় সে কেন নির্বিকার ভাবে বাইরে বসে থাকে। কিন্তু দরজা খুলে অনন্ত বাইরে আসতেই তার আসল রূপটি বেরিয়ে পড়েছে। কোন জ্বালাতে সে মুখ ঢাকবে বারো বাসরের চালাতে। অত্যন্ত দরদপূর্ণ মন নিয়ে দুলির বেদনাকে তার প্রেমকে কাহিনীতে তুলে এনেছেন তিনি। চিরদিনের চেনা মেয়ে, চিরচেনা প্রেমই কেমন স্বপ্ন হয়ে উঠে এসেছে। পাঠকের হৃদয়ে দুলির জন্য মমত্ববোধ জেগে ওঠে।

গাজী এই এলাকার বহু ঘটনা জানে অতএব সে জানাল অসঙ্গত মরেছে। বলল এই দুয়ারে বহুবার কসম খাওয়াখাওয়ি, ফেলাফেলি, ছোঁড়াছুঁড়ি দেখেছে, অতএব সবই বিড়ালের আড়াই পা। পুরানো কিস্যা। কথার মধ্যে ভাষাগুলো লক্ষ করার মত। গাজী বলল তলায় তলায় বগবগায়, তাই এত জল ঘোলায়। 'মান যায় বলেই, মন খেদে মরে, তখন ঝগড়া।' *(পৃ: ২৮৬, ঐ)* 'মহামায়া হিন্দু হোটেল'-এ গাজী তাঁকে নিয়ে যায়, গাজী জানিয়েছিল যে ওটিই ভালো বেশ সাফসুরত। 'অই যে শোনলেন না, মাহাতো চাচা বললে, একবার লারণের ঘর ঘুরি যাবে। তার মানে, চাচা চাচী ওখেন থেকে ভাত খেয়ে হাঁটা দেবে।' *(পৃ: ২৮৭, ঐ)* হোটেলের সামনে যেতেই মাহাতো চাচা গাজীর কাছে জানায় যে সে খেতে এল নাকি? ভাত-ডাল-ট্যাংরা মাছের ঝোল আছে। এছাড়া আরও যেন

কী আছে সেটা দোকান মালিক নারায়ণের কাছে জানতে চাইলেন। মাহাতো চাচা মাটিতে বসে কলাই করা থালায় ধোয়া ওঠা ভাত খাচ্ছে। চাচী তাকে দেখে ঘোমটা টেনে দেয়। লেখক কালকূটের মনে ভাবনা, বিড়ি খেতে লজ্জা নেই কিন্তু ভাতের গরাস পরপুরুষের সামনে খেতে লজ্জা! কালকূটকে অভ্যর্থনা জানায় নারায়ণ, 'খালি গা, রোগা রোগা লোকটা, গলায় একগাছা পৈতা, দুই আঙুলের ফাঁকে বিড়ি। পৈতাগাছার রঙ দেখে একখানি কেঁচো ভাববার কোনো কারণ নেই। চান করার সময় মাজাঘষা না হয়, তা নয়। তবে নিত্যকার তেলে জলে একটা রঙ ধরেছে। *(পৃ: ২৮৭, ঐ)*

কালকূট হোটেলের ভেতর ঢুকলেন কিন্তু গাজী ঢুকল না, বলল যে সে যেতে পারবে না, 'হিঁন্দুর হোটেল' যে, সে বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলেন, কালো কালো ডেয়ো পিঁপড়ের সারিকে সাপ মনে করেছিলেন। চেয়ারে বসতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, কাঁচা মেঝে এবড়ো-খেবড়ো, ওতে চেয়ারের পা পড়ে যাওয়ায় এই বিপত্তি। দোকানের মালিক গম্বুজ ফাটানো বাঁজখাই গলায় ফোঁচাকে ডেকে জানতে চাইলেন যে গর্ত কেন বোজানো হয়নি। ফোঁচা ভাঙা সরু গলায় জানিয়েছিল যে সে বুজিয়েছিল। ফোঁচার চেহারা নারায়ণের বিপরীত। দানবতুল্য বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। গায়ের রংটি ফর্সা হলেও রোদে পুড়ে জলে ভিজে অথবা হোটেলের তেলে-জলে তামাটে হয়ে গেছে। বিশাল চেহারা হলেও সে এমনভাবে এসেছিল যা দেখে তাঁর মনে হয়েছে যেন 'হাতীর সামনে ব্যাঙ এসেছে'। আর নারায়ণের হুঙ্কার শুনে ফোঁচা যেন 'অজগরের সামনে ছাগলছানা'। চেহারার বৈপরীত্য ও আচরণ, কথা বলার অভিব্যক্তি লেখক কালকূট অতি বাস্তব থেকে তুলে ধরেছেন। এঁদেরকে কখনোই মনে হয়নি কাহিনীর আরোপিত চরিত্র। নারায়ণ ঠাকুর ফোঁচার উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে আরো ক্ষেপে উঠে বলল 'শালা খাবে কাঁড়ি কাঁড়ি, কাজের বেলায় নাই। ওদিকে দ্যাখ, বাবুর আমার বউটি বছর বছর বিইয়ে চলেছেন। এত ভার সইবে কে!' *(পৃ: ২৮৮, ঐ)* এই কথাতে ঘরের ভিতরে একটা হাসির রোল উঠল। মাহাতো গিন্নী, মাহাতো চাচা ও গাজী, তিনজনে দমফাটা হাসিতে বেসামাল হয়ে উঠল। 'গাজী হাসতে হাসতে বলে 'জয় মুরশেদ, কী ব্যাজ দ্যাখো দি'নি। কে দেয় সিঁদ, কারে কই চোর।'

মাহাতের হাসি আরো জোরে বাজে। বলে, 'ঘাস খেয়ি যায় ঘোড়ায়, মার খায় গাধায়, সেই গোত্তর হলি।'

কর্তার কথা শুনে গিন্নী আর একবার খিলখিলিয়ে ছলকায়। গাজী বলে, 'যা বলেছ, চাচা। ওই সেই কথা হলি, ভোলার মন, আমি কার গলাতে ঝুলবো এখন, সখী গো মদন যে তশিলদার ভারী।'

হাসিতে কাশিতে মিলিয়ে জবাব দেয় মাহাতো 'কেন, গলায় ঝুলোবার জন্যে ফোঁচাই তো

আছে। এই যে বলি গেল, বউ বছর বছর বিয়োয়। তা ফেঁচাকেই তো বাপ বলি ডাকে। ঠাকুরকে তো ডাকে না।'

আবার ঘর-ভাসানো হাসি। রহস্যের বন্ধ মুখ যেন খুলি খুলি করে।'' *(পৃ: ২৮৯, ঐ)*

একদম বন্ধ করা পরিস্থিতির উদ্ভব। তিনি একটা দুর্নীতির গন্ধ পান কিন্তু মাহাতো ও গাজীর সঙ্গে এ'বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চান না। ওদের কথাবার্তায় আস্তে আস্তে সবই বুঝতে পারেন এ হল প্রেম-পীরিতির ব্যাপার। আলোচনা তিনি শুনতে পেয়েছেন গাজী বলছে '' 'তার জো নেই। ছেলেগুলোনও কত্তা বলে ডাকে। বাপ বলি ডাকলে, ওঁয়ার আবার মান যাবে যে।'

'কী মরণ গ!'

কথা আসে ঘোমটার ভিতর থেকে, তারপরে হাসি। মাহাতো বলে, 'তা মন্দ কী বলো। ফোঁচাই ভালো আছে, মিনি মাগনায় একপাল ছেলের বাপ হয়ে ঘুরি বেড়াচ্ছে।'

ঘোমটার ভিতর থেকে হাসির সঙ্গে আবার কথা আসে, 'আহ্ ছি, কী মুখ গ!'

গাজী হা-হা করে হাসে।'' *(পৃ: ২৮৯, ঐ)* কালকূটের ভাবান্তর, গোলপাতার ছাউনির এই ভোজনাগারে 'এক রূপেতে কত রূপ। এ যেন এক মঞ্চ। এখন এক পালা, অন্য সময় আর-এক পালা। এখন এই পালাতে পাঠ আলাদা, সাজগোজ ভূমিকা বেবাক ভিন্ন। নতুন পালায় নতুন সাজ। তখন নতুন ধড়াচূড়া, ভিন্ন চরিত্র। হাস্যে রহস্যে জানা গিয়েছে, ওসব মহাজন পাচক ঠাকুর প্রেমিক নাগর, দাসী প্রেমিকা। আর ফোঁচা আয়ান তখন কী করে।' *(পৃ: ২৮৯, ঐ)* ফোঁচাকে দেখে তার অভিব্যক্তি কিছু বোঝা না গেলেও তিনি তার জন্য বেদনার্ত। তিনি দেখেছেন এক অসহায় বেদনার্ত মুখ। তিনি তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ডুব দিয়েছেন; তাঁর বেদনাকে বুঝতে চেয়েছেন একালের বেদনার সঙ্গে সেকালের আয়ানের বেদনাকে। 'সে কি তখন ঘুমায়, নাকি এই নোনা গাঙের কূলে কূলে, বাঁধে বাঁধে কোনো নিশির ডাকে ফেরে। কোন্ কূলেতে জন্ম তার, কোন্ দেশেতে বিয়ে। কোন্ ঘরের বালা তার ঘরণী হয়েছে। সেই ঘরণীর প্রাণের ঘরে কোথায় আছে তার ঠাঁই। এই জীবনের দরিয়া তার কোন্ প্রবাহে চলে।' *(পৃ: ২৮৯, ঐ)*

কালকূট ফোঁচার ভাবনায় ডুবে গেছেন এদিকে মাহাতো বলে চলেছে তাঁর শূন্যতার কথা। ফোঁচার তিনটি ছেলের একটিকে সে চেয়েছিল সন্তানস্নেহে মানুষ করার জন্য কিন্তু ফোঁচা সম্মতি দিতে পারে নি কত্তাকে জিজ্ঞাসা না করে। একটুপরেই কত্তা বলেছিল ''একেবারে মারমূর্তি হয়ে এসে হাজির, 'হেঁই তুমি কোন্ সুবাদে ফোঁচার ছেলে চাও? হতি পারো তুমি বড় জোদ্দার, টাকার মঠ থাকতি পারে তোমার ঘরে। তা বলি কি ফোঁচার ছেলেরা জলে ভেসে এসেছে। তারা কি রাস্তার কুকুর বিড়াল। বোঝো দি'নি ঠ্যালাটা। মশকরা করি একটা কথা বললাম—।'

তার কথা শেষ হয় না। ঘোমটার ভিতর থেকে হাসির সঙ্গে খুশির গলা বাজে, 'বেশ

করেছিল, ঠিক বলেছিল।'

গাজী বলে ওঠে, 'অই, এবার যা বোঝবার তা মনে মনে বোঝো, কোথায় কার টান। যা বলো তা বলো, রক্তের টান বলে একটা কথা আছে তো।'

কান পেতে আছি, মাহাতোর কথা শুনতে পাবো বলে। কোনো কথাই আসে না সেখান থেকে।' *(পৃ: ২৯০, ঐ)* শুনতে না পেলেও মন তার নারায়ণকে দেখতে পায়। 'রূপেতে নয় অরূপে ধরা পড়েছে। নাম যাদের ফোঁচার ছেলে, তাদের বাঘের মতো আগলে থাকে নারাণঠাকুর। আসলেকে চেনা হলে আর রূপের ধন্দ থাকে না। মন কী যন্ত্র দেখ, ঠাকুরটাকে ভালো লেগে যায়।' *(পৃ: ২৯০, ঐ)*

লেখক কালকূট কালীনগরের ছোট একটি হোটেলের মানুষগুলোর জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। এসেছেন মাত্র কিছুক্ষণের জন্য, তবুও যা দেখলেন, যা বুঝলেন তাই তার কাছে অধূপে ধরা পড়ল। ছোট এই গঞ্জের অলিতে-গলিতে ঘুরে বেরিয়ে এই অমূল্য সম্পদ তিনি পাঠকের জন্য সংগ্রহ করেছেন। তিনি যে 'মনের মানুষ' খুঁজতে বেরিয়েছেন। ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে তুলতে পারেন না। সামনে গাজী দাঁড়িয়ে আছে অভুক্ত হয়ে। নিজেকে ধিক্কার দিলেন এইজন্য যে কেমন করে তিনি খুলে গেলেন সঙ্গীর খাওয়ার কথা। গাজী মাছ-মাংস খায় না, নিরামিষ খাবারই খেল তবে দাওয়ায় বসে নয়। নারাণ তাকে বলেছিল যে দাওয়ায় বসে খাওয়া যাবে না, 'দশজনের খাওয়ার জায়গা, ছোঁয়া-ছুঁয়ির ভয় আছে।' *(পৃ: ২৯১, ঐ)* গাজী হাসিমুখে মেনে নিয়েছিল 'নিচি বসিই খাবো। একখান কলাপাতা দিতি বলেন। জল খাবার পাত্তর আমার ঝোলায় আছে।' *(পৃ: ২৯১, ঐ)* এক টুকরো কথাবার্তার মধ্য দিয়ে জাতপাতের কঠিন ব্যবস্থাকে তুলে ধরেছেন। ছোঁয়া-ছুঁয়ির ব্যাপারটাকে তিনি অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। গাজী গান করে 'কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান/মিল্ জুল্কে কর সাঁইজী কা কাম।' *(পৃ: ২৯১, ঐ)* মাহাতো গিন্নী এ' গান নয় আরও ভালো গান শুনতে চাইল। মাহাতো গিন্নী ও গাজীর সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক আছে সেটা তিনি ওদের কথাবার্তা, চোখের ঝিলিক, হাসি থেকে বুঝে নিয়েছেন। এবার খেতে খেতে সে 'কবীরের কিস্যা' শোনাতে থাকে। এক জোলা আর জোলানীর গল্প, তারা কোথায় কোন্ দেশে থাকে তা সে বলতে পারবে না। বলেছে, ধরে নিতে হবে আশেপাশের কোন এ গ্রাম, সে গ্রাম। নারায়ণ ঠাকুর তাঁকে বলল 'গল্পসল্প পরে ব'লো, আগে ভাত ভাঙ দি'নি, ডাল ঢেলে দিয়ে যাই।'

গাজী ভাত ভেঙে বলে, 'দ্যান, দ্যান। গপ্পখানি তো আপনাকেও শুনোবার জন্যি বলছি ঠাকুরমশাই।' *(পৃ: ২৯১, ঐ)* মাহাতো চাচীর সঙ্গে গাজীর যে 'ভাবের খেলা', সে শুনতে আগ্রহী। গাজী বলতে থাকে একদিন জোলা-জোলানী, নুরি আর নিমা, বিয়েবাড়ি যাওয়ার পথে পদ্মবনের পাশ দিতে যেতে যেতে দেখে 'ড্যাঙার কাছে সেই পাতাতে এক সোন্দর ছাওয়াল ভাসছে। দেখে

জোলানীর মন মানে না, মায়ের পেরাণ তো, বুইলে চাচী। জোলানী সে ছাওয়াল পদ্মপাতা থেকে নিজির বুকে তুলি নিলে।... আচ্ছা বাবু, বলেন দি'নি এখন, এই ছাওয়াল, মানুষের সন্তান, এঁয়ার কী জাত আছে?' *(পৃ: ২৯১, ঐ)* গাজীর দুরূহ প্রশ্নই তিনি পাঠকের মধ্যে ধ্বনিত করেছেন। তাঁর আপনমনের জিজ্ঞাসাই গাজীর মুখ দিয়ে তুলে ধরেছেন, জাতপাতের কঠিন অনুশাসনকে এইভাবে তিনি সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন তাঁর নিজস্ব রচনার শৈলীতে। কঠিন প্রশ্নকে কঠিনভাবে নয়, সহজভাবে সকলের বোধগম্য করে তুলেছেন। পাঠককে এ বিষয়ে সজাগ করে তোলার বার্তা দিয়েছেন তবে সন্তর্পণে। তাই গাজীকে দিয়ে আবার বলিয়ে নিয়েছেন "এখন এ ছাওয়াল যে মানুষির, তা মানতে লাগবে। সেই জন্যি বলি কি, মানুষির কি জাত আছে! এ সেই গানের কথা হচ্ছে, ছুন্নত আর পৈতা না দিলি, জাত বানানো যায় না।' ...

হঠাৎ কথা থামিয়ে একেবারে সুর করে সেই গানের কলি গেয়ে ওঠে, 'ছুন্নত দিলি হয় মোচলমান, নারী লোকের কী হয় বিধান। বামুন চিনি পৈতা ধরে, বামনী চিনি কী করে।' ...

পুরো গাওয়া শেষ হয় না, নারাণঠাকুরের হাঁক শোনা যায়, 'আরে খাও দি'নি আগে। পাতে রইল ভাত পড়ে, উনি এখন বামনা বামনী বোঝাচ্ছেন।' " *(পৃ: ২৯১, ঐ)*

গাজী তার দাড়িতে নাড়া দিয়ে বলে যে ফুলের কোনো জাত নাই। নামে তার কী আসে যায়? গানের সুরে বলে, 'পুজোয় লাগতি হবে, লাগতি হবে, তাইতে তোমার জাত মান।' *(পৃ: ২৯২, ঐ)* কালকূট নিজেই গাজীকে দিয়ে বলিয়েছেন আবার নিজেই চরিত্র হয়ে এর উত্তর বিশ্লেষণ করেছেন। 'কানে শোনো এক, ভিতরের ধরতাই দস্যুরা। এবার ভাবো, গাজী কোন্ বায়ে যায়।

সেই এক কথা, জাতের নাম ছাড়ো, জীবনকে পুজোয় লাগাও। *(পৃ: ২৯২, ঐ)* তিনি ভাবছেন যার জীবন কাটে দরজায় দরজায়, পথে পথে নামগান করে, সে কথা পায় কেমন করে। এইভাবেই তিনি গাজী চরিত্রটিকে এনেছেন। তিনি বলেছেন ভারতবর্ষের দরজা খুলে উঁকি দিলেও দেখা যাবে চালচুলোহীন মানুষ তত্ত্বকথা বলে। রাজার ছেলে সোনার মুকুট ছেড়ে বটতলাতে রাজার রাজা সাজে। 'আধুনিকতার সুখের বেড়া ডিঙিয়ে চলে যায়, রাঢ়ের ছাতিম গাছের তলায়। যাকে ঘর থেকে দিয়েছি সরিয়ে, একেবারে দাওয়ার নিচে, সেও ধুলোয় বসে হেসে হেসে এমন কথা বলে। কেতাব পুঁথি রাখো, এমন জায়গায় এমন জিনিস পৃথিবীর আর কে আমাকে দেবে!' *(পৃ: ২৯২, ঐ)*

কালকূট মনে মনে ঘুরে বেড়ান ভারতের অতীত ইতিহাসে। তিনি বলেন এই দেশে ধূলার কথা আগে আছে। তাই ই দেশের লোকেরা ধূলায় লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন। এই দেশ জেনেছে যে সোনার চেয়েও দামী যত মহৎ প্রাণের জন্ম হয়েছে এই ধূলাতেই। তাইতো হর্ম্যতল গাছতলাতে এসে পরম কথা শুনিয়েছে। এই কথার মধ্য দিয়েই তিনি বোলপুরে শান্তিনিকেতনের

কথা বলে রেখেছেন। পরবর্তী পথের ডাকে তিনি বেরিয়ে পড়বেন 'রূপকে অরূপ করেছে' তার সন্ধানে। গাজীর প্রশ্ন শুনে নারায়ণ ঠাকুর বিরক্তিতে বলেছিল 'যত বাজে প্যাঁচাল পাড়ে।' আর মাহাতো বলল 'তা সে আর পুজোয় লাগতি পারলাম কই।...' *(পৃ: ২৯২, ঐ)* কালকূট মাহাতোর হৃদয়তলের বেদনা দেখতে দেখতে পেলেন। গাজী তাঁর প্রাণের কোন তারে ঘা দিয়েছে যেন। গাজী সপ্ সপ্ শব্দে ভাত খেতে থাকে কিন্তু মাহাতো গিন্নী কবীর কিস্যার শেষটুকু শুনতে চায়। তাই সে আবার বলে, শিশুটি তাদের কাশী নিয়ে যেতে বলে। অতটুকু শিশুর মুখে কথা শুনে জোলা 'জিন্ পেরেত' ভেবে ভয় পেয়ে জোলানীকে ছেড়ে চলে যায় কিন্তু দূরে গিয়েও লাভ হয়নি শিশুটি আবার তার সামনে চলে আসে। তাকে বলে 'তোমার কোনো অনিষ্ট হবি না। তুমি বিবির কাছে ফিরি চল।' *(পৃ: ২৯২, ঐ)* জোলা জোলানীর কাছে ফিরে এসে শিশুটির সুন্দর মুখ দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। তারা শিশুটিকে মানুষ করতে থাকে। 'আর এই ছাওয়াল হলেন গে কবীর। তয়, যে কারণে বলা—' *(পৃ: ২৯২, ঐ)* গাজীর কথা শুনে নারায়ণ ঠাকুর বলে তার কাছে ছাপার অক্ষরে তাবৎ লেখা আছে, তাকে আর কবীরের 'বিত্তান্ত' শোনাতে হবে না।

কালকূট পাঁচকঠাকুর ও রাস্তার দরবেশের এই কথার মধ্য দিয়ে ইতিহাসকে এনেছেন। কিন্তু নিজে অর্থাৎ লেখক চরিত্র বলেছেন 'নিজের ঝোলা ঝেড়ে এইটুকু বলতে পারি সম্বত শকের ষোড়শ থেকে সপ্তদশের কোনো এক সময়ে তাঁর উদয় এবং অস্ত। পাঠান সেকেন্দর শা তখন বোধ হয় বাদশা। কাশীতে তখন হিন্দু রাজার রাজত্ব। কিন্তু জন্মবৃত্তান্তের হদিস আমার জানা নেই!' *(পৃ: ২৯৩, ঐ)* নারায়ণ বা নারাণঠাকুর এবার মুখ খোলে। রামানন্দ ঠাকুরের কথা বলে, যিনি কবীরের গুরু ছিলেন। সে বলতে থাকে ওই রামানন্দ ঠাকুরের কৃপাতেই কবীর উতরে গিয়েছিল। কিন্তু গাজী বলে 'সে কথা ছাড়েন, তার জবাব আছে। তারপর কী বলবেন, বলেন।' *(পৃ: ২৯৩, ঐ)* নারাণঠাকুর বলে চলেছে রামানন্দ ঠাকুর তার এক বামুন শিষ্যের বিধবা মেয়েকে ছেলের মা হতে বলে আশীর্বাদ করেছিলেন। গুরুদেবের আশীর্বাদে বিধবা মেয়ের ছেলে হওয়াতে তাকে লুকিয়ে অন্য জায়গায় রেখে এসেছিলেন। তাঁকেই কুড়িয়ে পেয়ে জোলা জোলানী পুত্রস্নেহে মানুষ করেছিল। সে হিন্দুর ছেলে। গাজী বলেছে হতে পারে এই ঘটনা কিন্তু কথা তো সেই একই। কিন্তু কবীরের বাপের নাম কি সে জানে? পাঁচকঠাকুর বিরক্ত, লেখক কালকূট চরিত্র গূঢ় প্রশ্নে চিন্তান্বিত। কিন্তু নারাণ পাঁচকঠাকুর বলছে তার বিশ্বাসের কথা 'দেখ তো, এই ঢেঁকিকে কী বোঝাব। শুনছ গুরুর আশীর্বাদ, তার আবার বাপ কিসের। গুরু আশীর্বাদ করেছিলেন বলেই তো ছেলে হলো। তা হলেই বোঝো, হিন্দু গুরুর আশীর্বাদ, হিন্দু বিধবার পেটে জন্ম। এখন তুমি জাত না মানো, তা হলে কী হবে।' *(পৃ: ২৯৩, ঐ)* কবীর হিন্দুর ছেলে 'নারাণঠাকুর' আবার বলল কিন্তু গাজী তাকে বলল 'জাতি পাঁতি কুল কাপড়া, এহ শোভা দিন চারি। কহে কবীর শুনি হো রামানন্দ।

এও রহে ঝকমারি।। জাতি হামারি বাণীকুল করতা ঔর মাহি। কুটুম্ব হামারে সন্ত, হ্যায় কোই মুরখ সমঝতে নহী।'' হতি পারে রামানন্দ ঠাকুর ওঁয়ার গুরু, তয়, কবীর জাতি পাঁতি ছাড়া। ওঁয়ার কথাই ওঁয়ার জাত, মনের মানুষ কুল, সাধুরা হলো কুটুম। ওঁয়ার কোনো জাত নাই। হিঁদুও না, মোচলমানও না।' *(পৃ: ২৯২, ঐ)*

লেখক কালকূট গাজীর মুখ দিয়ে নিজের বিশ্বাসে অটল রইলেন, আবার ইতিহাসকেও সাক্ষী রাখলেন। বিচারের ভার পাঠকের। আর কালকূট কবীর কাহিনীর বিতর্ক করেছেন 'সাধ্যসাধন তত্ত্বের' মতো। যেমন করে রামানন্দ ও চৈতন্য করেছিলেন তাঁদের সেই মহামূল্যবান বিতর্ক। কালকূট অপরূপ এক দক্ষতায় সেই ভাবময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন গাজীর হাটে। কিন্তু কিস্যা তো শেষ হয় নি। মাহাতো গিন্নী আরও জানতে চায়। গাজী বলে চলে কবীর মারা গেলে তার দেহ নিয়ে মারামারি লাগার উপক্রম হল হিন্দু-মুসলমান শিষ্যের মধ্যে। অবশেষে কবীর দেখা দিয়ে সমস্যার সমাধান করে দিলেন। মৃতদেহের ঢাকা খুলে সবাই দেখতে পেল শুধু ফুল, রাশি রাশি ফুল। ''তাই আদ্দেকখানি ফুল নিয়ি গেল কাশীর মহারাজা। সেই ফুল দাহ করি তার ছাই রেখি দিলা এক জায়গায়। আর বাকী আদ্দেক নিয়ি গেল দিল্লীর বাদশা। কবর দেই রাখলে গোরখ্পুরের এক গাঁয়ে। নাও, এবার তুমি কী জাতের বিচার করবে, করো।' *(পৃ: ২৯৩, ঐ)* মাহাতোও শুনছিল, শুনে মন্তব্য করল কবীর দেখা দিয়ে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে গিয়েছিলেন বলে রক্ষা। 'তা নইলি তো শরীরটাকে কেটিই দুখান করত সবাই।' *(পৃ: ২৯৩, ঐ)* মাহাতো গিন্নী বলল 'গান কিন্তু শোনাতে হবে।' কালকূট সর্বত্র লক্ষ করেছে মাহাতোর কথায় লোনা জলের টান ও তাঁর গিন্নীর কথায় তা নেই। হয়ত তারা দু'জায়গার লোক এই ভাবনা শেষে তাঁর মনে উঠে এসেছে। খাওয়ার পর মাহাতো ও তার গিন্নী দু'জনেই মাদুরে বসে বিশ্রাম নেয় এটা দেখে তুলনা শহরের সঙ্গে। ওখানে তো এমনটি নেই। খাওয়া দাওয়া শেষে পয়সা দিতে দাম মিটিয়ে চলে যাওয়া। এও এক নতুনরূপে দেখা কালকূটের। কালকূট খাওয়ার পরে সিগারেট ধরাতে ধরাতে হোটেলের বাইরের দিকে আকাশে গ্রাম-প্রকৃতি দেখতে দেখতে তাঁর মন উদাস হয়ে যায়। প্রথম শীতের ছোঁয়া এখনও বর্ষীয়ান বনস্পতিতে লাগেনি। গাঢ় সবুজে বাড়বাড়ন্ত পাতায় পাতায়, ঝোপেঝাড়ে, বেলাশেষের রোদ এসে পড়াতে পাতাগুলো চিক্ চিক্ করছে। পাখিদের কলকলানি শোনা যাচ্ছে। লেখক কালকূট এসব দেখতে দেখতে মন হারিয়ে ফেলেন। কোথা থেকে কেন এসেছেন কিছুই মনে পড়ছে না। 'যেন আমার কোনো শুরু ছিল না। শেষ কোথায়, জানা নেই। ওই যে ছায়া, ওই যে গাছ, ওই যে পাখি আলাপ করে নিবিড় নিভৃতে, কোথায় যেন, কোন্ লোকে মানুষের অস্পষ্ট দু'একটা কথা ভেসে আসে আর এই দরজায় দাঁড়িয়ে লাল শাড়ি জড়ানো আধখানা মূর্তি দেখা যায়, এইসব যেন এক অরূপ সায়র। আমি তাতে ডুবে যাই কেন, তা জানি না। সংসারের মুগ্ধ বা

অবাক হবার কিছু ছিল না এখানে। তবু সব মিলিয়ে এ যেন এক ঘোর।' *(পৃ: ২৯৪, ঐ)* তার অন্তরে কী এক সুর বাজে অদেখা অচিন লোকে 'মানুষের অধরা সীমায়। বাজে এক নামহীন সুর।' যেমন করে প্রহরের ঘণ্টা বাজে তেমন করে তাঁর হৃদয়ে সেই সুর ধ্বনিত হতে থাকে।

মাহাতোর বউ-এর হাসিতে ঘোর ভেঙে যায়। তার উদাসী মন কল্পলোক থেকে বাস্তবে ফিরে আসে। গাজী আর মাহাতো-বউ নানা গল্পে মেতে যায়। দুলি-অনন্তর কথাও বাদ যায় না। মাহাতো তার বউকে পান সাধে কিন্তু সে মজা পানে মজেছে তাই ওই পান আর মুখে দেবে না। কালকূট 'মজাপান'টা কী বুঝতে পারেন না। এরপরে গাজী জানতে চেয়েছিল কলকাতায় কেন গিয়েছিল, মামলা-মকদ্দমা না অন্য কিছু? মাহাতো গিয়েছিল তারকেশ্বরে মানতের পূজা দিতে। 'মানত তো করিই যাচ্ছি, ফল তো পাই না।' *(পৃ: ২৯৫, ঐ)* কালকূটের মনে হল কোথায় যেন একটা দুর্ভাগ্যের দীর্ঘশ্বাস পড়ছে, তাঁকে খুব অসহায় বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু মাহাতো গিন্নী আঙরি, আঙুর থেকে আঙ্‌রি, বলল 'তোমার কাজ তুমি করো। ফলের বিচার অন্যত্র।' *(পৃ: ২৯৫, ঐ)* মাহাতোর সুরে বেদনা ঝরছে, মুখখানি যেন ছায়া ঢেকে গেছে। বিষণ্ণ গলায় বলল 'সময়ের বস্তু সময়ে না এলি কি আর তাকে ধরা যায়? না কী বলো হে গাজী।' *(পৃ: ২৯২, ঐ)* গাজী উত্তরে গান ধরল 'সোঁতে বাঁধল বাঁধ গা জলে, এই কোটালে। পড়েছে মীন, ধরগা ত্বরা, পাবি না রে জল শুকালে।' *(পৃ: ২৯৬, ঐ)* গান শুনে মাহাতো বলেছিল, এই কথাটা সে আঙ্‌রিকে বোঝাতে পারে নি। তিনজনেই হঠাৎ চুপ হয়ে যায় দেখে কালকূটের মনে হয়েছে তিনি যেন বাইরের লোক। ওরা এক এক। কালকূট ভাবছেন কী বেদনা মাহাতোকে এমন উদাস করেছে। তার কি কোনো সন্তান নেই? 'কোনো একদিন ফোঁচার কাছে ঠাট্টা করে ছেলে চাওয়া, কেবলমাত্র ঠাট্টা নয় তা হলে।' *(পৃ: ২৯৬, ঐ)*

তারপরেই দেখছেন নামী কোম্পানীর পুরানো সোনার ঘড়ি ট্যাকের থেকে বের করে সময় দেখলেন। তিনি ভাবতেই পারেন নি এমন একটা ময়লা মানুষের কষি থেকে এমন একটা সোনার ঘড়ি বেরোতে পারে, তিনি গঞ্জের একটা হোটেলে শীতল পাটিতে বসে থাকতে পারেন। কালকূট তাঁকে একজন দরিদ্র চাষী ভেবেছিলেন, কিন্তু তাতো নয়। মাহাতো সম্পর্কে তাঁর মন অন্যধারায় বইতে থাকে। মাহাতো বলেই যাচ্ছে তার বেদনার কথা। বছরে চল্লিশ হাজার টাকা টাক্স দেয় অথচ তার সবই ফরসা। কিছুই রেখে যেতে হবে না। এই কথা আঙ্‌রির চোখের কোণে থাকে। মাহাতো বউকে সান্ত্বনা দেয়, তাকে সে কিছুই বলেনি, দোষারপ করেনি। সেই বেদনা কালকূট ব্যক্ত করেছেন এইভাবে, 'লাল চোখ দুটি তার জলে ভাসে না। কিন্তু দেখি, চোখের জলের থেকে তার কান্না যেন গভীর। জলেতে যে ক্ষণেক ধোয়া, যাতনা থেকে একটু মুক্তি, সেটুকুও তার নেই।

এখন ব্যথার ভারে, সেই তো অবাক মানি, এই লোককে তুমি কেবল কৃপণ ভাববে নাকি।

না কী, ভারতের এ আর এক রূপ। হয়তো সাবেকী রূপ। লক্ষ টাকা কষিতে বাঁধা, তবু আপন সমাজ পরিবার বেশবাস আচরণবিধির এদিক-ওদিক নেই। ধূলায় চলে, ধূলায় বসে, রাস্তায় কাঁদে। দূরের এই বাজার গঞ্জে, না জেনে পথ, অচিন খোঁজে, এইটুকুও দেখাজানা পাওনা ছিল আমার।' *(পৃ: ২৯৬, ঐ)* গাজী গান ধরেছে

'ফকিরের সজ্জা ধরে, নেত্য করে,
করছ ধম্মের আলাপনা
(আরে দূর হ বান্দা) তুমি যে আপন কাজে,
বেঠিক নিজে,
পরকে কী বোঝাও বল না।' *(পৃ: ২৯৬-২৯৭, ঐ)*

আঙ্‌রির গান শুনে আশ মেটে না, গাজী আবার গান ধরে

'মনের মানুষ পেলাম না, মনে মনে ভাবছি যে তাই
মনের দুখ্‌খু মনেই রইল, মনে মনে ভাবছি তাই।
বন পোড়া যায় সবাই দ্যাখে' *(পৃ: ২৯৭, ঐ)*

একটার পর একটা গান গাইতে লাগল গাজী। শেষে বলে 'আমি বলি, ছুটাছুটির দরকার কী। ভুঁয়েতে গাছ দুই খান, ফল ফলবে একখান, মনে বুঝ কর।'...

মাহাতো আর আঙ্‌রি দুজনেই যেন দৈববাণী শোনে গাজীর দিকে চেয়ে। আমার হালও তাই। লোকটার তাল ধরতে গিয়ে আমার চেয়ে থাকা সার। অথচ দেখ, মনের কোথায় তরঙ্গিয়া যায়।' *(পৃ: ২৯৭, ঐ)* কালকূট ভাবেন গাজীর কথা। ও কেমন করে আলখাল্লা উড়িয়ে এমন নিটুট হাসি হাসে? কথা একেবারে ঠোঁটের গোড়ায়। এই দাওয়ার হাওয়ায় যেন মেঘ জমেছিল তা গাজীর কথার জেরে। গানের সুরে কেটে যায়। খাওয়া শেষ করে নারাণঠাকুরও তাদের গানের আসরে যোগ দিয়েছিল। ফোঁচা এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে তার ভাগের বিড়ি নিয়ে চলে গেছে। একটি বিড়ি পেয়েই যেন ধন্য! মাহাতো নারাণঠাকুরের রান্নার হাতখানি ভালো বলাতে আঙ্‌রি ঈর্ষার চোখে মাহাতোর দিকে তাকায়। কী বিচিত্র প্রেমের খেলা, সঙ্গে সঙ্গে মাহাতো বলে ওঠে যে তাঁকে দুঃখ দেবার জন্য সে নারাণের প্রশংসা করে নি। এ'কথা শুনে আঙ্‌রি আবার কপট রাগও করে, কিন্তু গাজী নারাণঠাকুরের হাতের গুণের প্রশংসা করতে করতেই বলে ফেলে 'তয় হ্যাঁ, কাম দিয়ি ভোলাতি হয়, আমার মতন খালি ফক্কিকারি নয়।' *(পৃ: ২৯৮, ঐ)* এ'কথা শুনে নারাণ ক্ষেপে গিয়ে বলল 'ভারী খচ্চর তো লোকটা'। গাজী বেগতিক দেখে চুপ করল কিন্তু আঙ্‌রি খিলখিল করে হেসে উঠে মোহ ছাড়ল। কালকূট তাঁর হাস্যরত দেহের সৌন্দর্যকে দেখলেন এইভাবে 'এ দেহ এখনো বন। দেখলে ঠাহর হয়, এ মৃত্তিকা ভেদ করে ফসল ফলেনি ছাঁদ ছন্দ গড়েনি তাই সে

বন্য। একটু বাতাস লাগলেই এমন দুলে ওঠে, না জানি কত প্রাণে তুফান লেগে যায়। তখন টের পাওয়া যায় না, এ শরীরে এক মেয়ে কাঁদে মা হবার জন্যে। *(পৃ: ২৯৮, ঐ)* গাজী আবার গুনগুন করে গান ধরে 'যে জন প্রেমের ভাব জানে না, তার সঙ্গে কিসের লেনাদেনা...।' *(পৃ: ২৯৮, ঐ)* ডুপ্‌কিতে তালও দিতে থাকে। নারাণ ওর গান শুনে রাগ করতে থাকে এই বলে যে ওর গানের মর্ম বোঝে না। গাজী একটু বিষণ্ণ হয়ে বলে ঠাকুর তাকে দেখতে পারে না। উনি ভাবেন তাকে বুঝি সে শুনিয়ে শুনিয়ে গান করে। তা সে করে না। নিজের জন্যই সে গান গায় কিন্তু ঠাকুর মশাইকে দেখলে তার অনেক গান মনে পড়ে যায়।

মাহাতো-মাহাতো গিন্নী ভোলাখালি যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। কালকূটও যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেই মাহাতো জিজ্ঞাসা করল 'কোথায় কমনে ফিরবেন?' *(পৃ: ২৯৯, ঐ)* গাজী জানিয়ে দিল যে ন্যাজোট থেকে বসিরহাটে গিয়ে কলকাতার গাড়ি ধরিয়ে দেবে। মাহাতো জানিয়ে দিয়েছিল যে রাস্তা খারাপের জন্য গাড়ি বেশি চলে না, চারটের সময় শেষ গাড়ি চলে গেছে। রাস্তা ভাঙাভাঙি হচ্ছে দু'সপ্তাহ ধরে, তাই তো তারা লঞ্চে এসেছে। কী করে তারা ফিরবে। মাহাতো লেখক কালকূটকে তাদের সঙ্গে ভোলাখালি যেতে বলেছিল। কিন্তু লেখক কালকূট দু'ক্রোশ পথ পেরিয়ে ভোলাখালি না গিয়ে কালীনগরে নারাণ ঠাকুরের হোটেলেই রয়ে গেলেন। মাহাতো আর তার গিন্নীকে কালকূট ও গাজী কিছুটা পথ এগিয়ে দিলেন। গাজীর সঙ্গে তার খুঁনসুটি, বন্ধুত্বের সম্পর্ক সেগুলো তাঁর চোখে উঠে এসেছে। বারে বারে ভোলাখালি যেতে বলাকে কালকূটের মনভাবনা, সে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে চায়, তাঁর শূন্যতাকে ভরাতে চায়। তাঁর কাছে লেখক কালকূট ছোটছেলের মত, যা দেখেন তাই হাঁ করে দেখে। আপন খেয়ালে চলে। গাজী চাচীকে সমর্থন করে জিজ্ঞাসা করে যে তিনি খেলতে বেরিয়েছেন কীনা— ছোট ছেলেরা যেমন করে ঘর থেকে পালায় সেইরকম কীনা। এ'কথা বলাতে কালকূটের মন উদাস হয়ে যায়। ছোটবেলায় মামার বাড়ী ধলেশ্বরী থেকে তিন মাইল দূরের চারগ্রামের কথা মনে পড়ে যায়। জেদ ধরে ইন্দিরের সঙ্গে বেজের হাটে গিয়েছিল। ইন্দিরা যেন গল্প বলার যাদুকর, পথে যেতে যেতে সেই মেছো পত্নীর গল্প, ভূতের গল্প বলে কল্পনার রাজ্যে নিয়ে যায়। হাটে গিয়ে কুতুদাসের চালায় তাকে বসিয়ে রেখে যায়। দোকানে বিভিন্ন লোকের আসা যাওয়া দেখতে থাকে। একজনের মুখে সিরাজদিঘার নাম শুনে তার মন উতলা হয়ে ওঠে সেখানে পৌঁছানোর জন্য। কাউকে না বলে সে লোক দুটির পিছু নেয়। সিরাজদিঘা বন্দরে গিয়ে অনেক দোকানপাট, কেনাবেচা, লোকজন দেখতে দেখতে লোক দুটিকে হারিয়ে ফেলে, নিজেও দিক হারিয়ে ফেলে, তবুও দেখার কৌতূহল মেটে না, ধলেশ্বরী তীরে এসে মাঝির হাঁক 'নাও যায় লত্‌বদী চর, যাওনের লোক আছেন!' *(পৃ: ৩০৭, ঐ)* ডাক শুনেই তাঁর পিসীমার কথা মনে পড়ে, আর অমনি নৌকায় উঠে পড়ে। নৌকা যখন লত্‌বদী চরে

নোঙর করে তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সে পিসীমার বাড়ি চেনে না। ধূ ধূ মাঠ পেরিয়ে ওপারের গ্রামে কীভাবে যাবে? চোখে আসে। সহযাত্রীরা ছোট ছেলেটিকে কাঁদতে দেখে সে কোথায়, কার বাড়ী যাবে জেনে নিয়ে তাঁর পিসেমশাই রামকৃষ্ণ আশ্রমের মহারাজের কাছে পৌঁছে দেয়। পিসেমশাইকে সে কখনও দেখেনি, আর উনি যে মহারাজ তাও সে জানে না। পিসেমশাই সব জেনে নিয়ে তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দেন, নাড়ু, লাড্ডু খাইয়ে নিয়ে পিসীমার কাছে পৌঁছে দেন। পিসীমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যান, কীভাবে এলে এতদূর! পিসেমশাই আবার আশ্রমেই ফিরে যান। উনি কেন মহারাজ, কেন থাকেন না বাড়ীর সকলের সঙ্গে সে'কথা জানতে ইচ্ছা করে। লেখক কালকূট বলেছেন বড় হয়েও সে কারণ তিনি জানতে পারেন নি, তবে দু'জনের মধ্যে একটা শ্রদ্ধাবোধ, প্রাণের টান তিনি অনুভব করেছেন।

সাতদিন পরে মা, বাবা, মেজদা, দিদি, দিদিমা ও ইন্দিরসহ সবাই ছেলেটিকে নিতে এসেছিল, সে কেন এসেছে এ'কথা সে কাউকে বোঝাতে পারেনি বলতে পারে নি। কোন নিশির ডাকে সে এমনি করে বারে বারে হারিয়ে যায়। গাজীর কথা তাঁর মনে পুরানো দিনের স্মৃতি ভেসে আসে। লেখক কালকূট তাঁর বাল্যকালের একটি ঘটনা অনবদ্য ভাবে বলেছেন যেখানে একটা আশ্চর্য স্বপ্নময়তা তৈরী হয়েছে। তার বিবাগী মনটা অনুপম সৌন্দর্যে তুলে ধরেছেন, যা পাঠকের অনেকেরই বাল্যকালের স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছেন। বাল্যকাল তো এরকম হয়, ঘর থেকে পালাতে ইচ্ছে করে, শিশুরা পালায়, তবে সকলে তাঁর মতো করে পালায় না, সকলকে এমন করে ভাবায় না, চিন্তিত করে তোলে না। অতি সুন্দর ভাবে পিসেমশাই পিসীমা পিসতুতো ভাইবোনদের কাহিনীতে এনেছেন। তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন মায়ের চিন্তিত মনখানা। ছেলেকে চড় মেরে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। বাবা তাকে 'গরুচোর' বলেছিলেন। তার মনোভাবনা, সে তো গোরু চুরি করে নি! শিশুমনের ভাবনা লেখক কালকূট অনবদ্যভাবে তুলে ধরেছেন।

আঙ্‌রির কথায় তাঁর ঘোর ভাঙে। মাহাতোর মধ্যেও যে রস আছে সেটা ওদের সঙ্গে যেতে বুঝতে পারেন। তারা 'ভোলাখালি'তে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে বিদায় নেয়। গাজী মাহাতোর গল্প বলে। মাহাতোর তিন বিয়ে। প্রথম স্ত্রী মারা যায়, দ্বিতীয় স্ত্রীর 'চরণ দু'খানি নামি বড় চঞ্চল ছিল' সে নসরতের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। মাহাতো ভল্ল নিয়ে খুঁজেছিল কিন্তু পায় নি। নসরত ফিরে এল একাই বছরখানেনের মধ্যে। মাহাতোর বউ তাকেও ছেড়ে চলে গেছে আর এক নসরতের সঙ্গে। গাজীর মুখ দিয়ে কালকূট বলিয়ে নিয়েছেন জীবনের সত্যটুকু। নসরতের জমি জায়গা সব চলে গেছে, সে মাহাতো জমিতে নিষের কাজ করে আর তার বিবি মাহাতোর জমিতে কাজ করে।

এবার বলতে শুরু করল আকালের সময় সে সব মজুরানী কাজের জন্য এই বাদায় আসত

তাদের সঙ্গে চাচীও এসেছিল। মাহাতো ক্ষুধার্ত মেয়ে-ঝিদের ধান দিত কিন্তু উশুল করতে অন্যভাবে। এই কথা শুনে কালকূটের 'সে নিজে নষ্ট হয়েছিল, তাই অপরকে নষ্ট করত। অথচ যে মাহাতোকে দেখেছি, তাতে একবারও মনে হয়নি, আঙুরের স্বামীটি ধান দিয়ে, মেয়েদের ইজ্জত নিয়েছে। এ মানুষে সেই মানুষ আর নেই। গাজীর কথায় আরও বুঝেছি, তখন মাহাতোর প্রাণে ঘা। বিষাক্ত ঘা। দুস্‌রি চাচীর আঘাটায় যাওয়ার ঘা। সেই তার ব্যামো। শোধ নিতে নিতে চেয়েছিল নিরপরাধ মেয়ে।' *(পৃ: ৩১৫, ঐ)* আঙ্‌রিকে মাহাতোর মনে বাতাস লেগেছিল। প্রথমে থাকবার জায়গা, তারপরে ঘরের কাজ দিয়েছিল। " 'তখন দ্যাখো, মেয়েটি ঘরের ছিরি ফিরায়ি দিয়েছে। সেই থেকি আর ছাড়াছাড়ি হয় নাই।'

সমাজে বাস করি, সমাজের মন কথা বলে, 'বিয়ে থা হয়ে গেল?'

গাজী আরো হাসে। বলে, 'আর কতো বে' করবে, বাবু। দু'-দু'বার তো করিছিল। এবার বে' না করি ঘর। তো দ্যাখেন, বে' করি যা হয় নাই, এবার তা হয়িছে। দুটিরে দ্যাখলেন তো। বে' করলি কী আর এর থেকি বেশী কিছু হয়।' " *(পৃ: ৩১৫, ঐ)* কালকূট এই ঘটনার মধ্য দিয়ে মানবজীবনের আর একটা দিক তুলে ধরেছেন। বলেছেন, মানুষকে শুধু সাতপাকে নয় অন্যভাবেও বাঁধা যায়। 'যেখানে প্রাণ আছে, সেখানে সব আছে। তার চেয়ে বড় বল, আঙ্‌রি স্বামী ঘর করতে আসেনি। প্রাণের দায়ে দিশেহারা হয়ে এসেছিল। একে বলে আগমন। আসলে তার অসহায় চোখের জলে ছিল মাহাতোর আধিব্যাধি মন্ত্রৌষধি।' *(পৃ: ৩১৫, ঐ)* কালকূটের কাছে মাহাতো এক রূপে ধরা পড়ল আর আঙ্‌রি। " 'তুমি চির আয়ুষ্মতী, চির সধবা।' ... ঘরছাড়া ক্ষুধার্ত মেয়েটার চোখে ছিল ঘরের শ্রীর স্বপ্ন। হাত দিতেই সেই শ্রী ফুটে উঠেছিল।" *(পৃ: ৩১৫, ঐ)* কালকূটের মনে হতে লাগল ভোলাখালি একবার যেতেই হবে। গঞ্জের হাটে এসে এমন অপরূপতাকে দেখতে পাবেন, সেটা ভাবেন নি। বেড়াতে এসে এদের দেখে, জেনে জীবনকে আরও একভাবে প্রত্যক্ষ করলেন।

'মহামায়া হিন্দু হোটেলে' ফিরে আসতে আসতে গাজী জানতে চাইল যে, তিনি গাজীর উপরে রাগ করেছেন কি না। সে জেনেশুনে এই ভুল কাজ করে নি। কিন্তু কালকূট রাগ করেন নি, তাঁর এসব ভালো লাগছে জেনে গাজী আনন্দে গুনগুনিয়ে উঠেছিল 'মন বুঝে দ্যাখ, মনে তোমার কার উদয়। নিদ্দয় নিদ্দয় এতো বলো, এবারে সদয়।' *(পৃ: ৩১৬, ঐ)* লেখক গাজীর আনন্দকে ও এই পরিবেশে থাকাটাকে এইভাবে দেখেছেন। গাজী না থাকলেও যদি এরকম বিপর্যয়ে পড়ত তাহলে তিনি কী করতেন, গাজীকে কোথায় পেতেন? 'গাজী ভুল করেছে, সে কথা মেনেছি। এবার মানি, আমি তাকেও পেয়েছি।' *(পৃ: ৩১৬, ঐ)*

হোটেলের দাওয়ায় উঠতেই দেখতে পেলেন দুলি বসে আছে। গাজীর কথা সে জানিয়েছিল যে রাতে ভাত-মাংস পাঠাবার কথা ছিল, সেটার আর দরকার নেই। তারও শরীর ভালো না।

সেও কিছু খাবে না, তাই নারাণ ঠাকুরকে না করতে এসেছে। ঘরে কেউ নেই বলে সে চলে আসে। নারাণ ঠাকুর দুলিকে দেখে বলে 'মোচলমান' পাড়ায় রামপাখির খোঁজে সে গিয়েছিল এবং দুলির ঘরে তালা দেখে চলে এসেছে। দুলি জানায় তার মনের কথা। নারাণ ঠাকুরকে সে জানিয়েও দেয় রাতে সে খাবে না। নারাণ ঠাকুর ও দুলির কথাবার্তা শুনে কালকূট বুঝতে পারেন, বারো-বিলাসিনী হলেও তাকে সে স্নেহের চোখে দেখে। অনন্তকে দোষারপ করে আর দুলিকে বলে 'তোমার হলো এসো জন বসো জন, দশজন নিয়ে কারবার। এসব তোমার বেশী পেশ্‌রয় দেওয়া ঠিক নয়।' *(পৃ: ৩১৮, ঐ)* কালকূট দেখলেন নারাণঠাকুর শুধু হোটেলই চালায় না, দেহজীবিনীকেও উপদেশ দেয়। স্নেহের একটা চোরাস্রোতের ধারা দেখতে পেলেন। দুলি উত্তর দিয়েছিল 'আমার ঘরে তালা দিয়ে এসেছি। জানি তো, মাঝরাতে এসে ডাকাডাকি করবে। তাই বলছিলাম কি, আজ আর এখান থেকে যাবো না। ফোঁচাদার বউয়ের কাছেই রাতটা শুয়ে কাটিয়ে দেবো।' *(পৃ: ৩১৮, ঐ)* কালকূট বুঝতে পারলেন হৃদয়ের কোন বেদনা আর অভিমান থেকে দুলি এসেছে নারাণঠাকুরের কাছে। সে নারাণঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করে তার কোন অসুবিধা হবে কিনা। কিন্তু কালকূটের সেই মুহূর্তে তার মুখটা দেখতে ইচ্ছা করছিল। কুহেলী আলো অন্ধকারেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে দুলির সামনে ভারী অস্বস্তি হচ্ছে। গাজী গুনগুন করে ওঠে —

'আরে, ঘরের খিলে আঁটিসাটি
ওদিকে, গত্ত কাটে সিঁদকাটি
এ চোরা কালো বিড়াল মিশে থাকে আন্ধারে।' ... *(পৃ: ৩১৮, ঐ)*

গাজীর গান শুনে তাকে জিজ্ঞাসা করে বাবুটিকে সে কোথায় রেখে এসেছে। এতক্ষণ সে লক্ষ করেনি কালকূট। সে তাঁকে রাতে মুরগির মাংস রান্না করতে চায়, কিন্তু মাংস খেতে চান না, কারণ তিনি জেনে গেছেন কার জন্য কেনা হয়েছিল ওই মুরগী। দুলি এসেও বলেছিল। কালকূট দুলিকে প্রথম থেকেই লক্ষ করে যাচ্ছিলেন। কালকূটকে প্রথমে দেখে সে বাঁকা নজরে দেখে, তারপরে পায়রার মত ঊর্ধ্বাঙ্গে একটা বাঁক তুলে ঢেউ খেলিয়ে দিয়েছিল। তিনি বলেছেন 'জীবনযাপনের একটা চাল আছে তো। পেশা বলো, তার একটা ছাপ ফোটেই। তা সে যখন যেখানে যেমন ভাবেই হোক। চোগা-চাপকান না থাকলেও, দেখলে উকিলের বাত বোঝা যায়। বুক দেখার নল না থাকলেও ডাক্তারের ধরতাই ধরতে পারবে। দারোগার চাল বুঝবে, পণ্ডিতের বুলি ধরতে পারবে। দুলিকে তার থেকে বাদ দেওয়া যায় না। গল্পে নয়া মানুষ তার ভোজনালয়ে। জীবিকার ভাবভঙ্গি উঁকি না দিয়ে যায় কেমন করে। তা সে ঘণ্টা কয়েক আগে প্রাণের ঘরে জ্বালানি পোড়ানি যতই হোক।' *(পৃ: ৩১৬-৩১৭, ঐ)*

কালকূট মাংস খেতে রাজী হয় না দেখে গাজী বলে 'তা হলি ঠাকুরমশাই, আপনি নিজিই

সেবা করি ফ্যালেন।' *(পৃ: ৩১৯, ঐ)* গাজীর ওপরে রেগে গিয়ে বলল মেলা প্যাঁচাল যেন সে না পাড়ে, সেকি মাংস খায়? গাজী বলেছিল সে'কথা তার মনে ছিল না। কিন্তু কালকূটের ধারণা গাজী ইচ্ছে করেই বলে, মজা করার জন্য। ঘরের মধ্যে কালকূট দুলি ও ফোঁচার বউয়ের কথোপকথন শুনতে লাগলেন। দুলি বলে, 'মরণ! মুখে আগুন অমন ভালোবাসার!' আর বউ বলে, 'মানুষের ধারা বোঝা যায় না।'... *(পৃ: ৩১৯, ঐ)* কালকূট তার জীবনবোধের কথা তুলে ধরেছেন। ফোঁচার বউ-এর সেই পুরুষমানুষটা কোন জন? নারাণঠাকুর না ফোঁচা? আর দুলি কোন ভালবাসার মুখে আগুন দেয় তার নিজের না অনন্তর?

রাতে ঘুম আসছিল না। গাজী চৌকাঠের উপর ঝোলাটা পেতে মাথা রেখে গুনগুনিয়ে গান করছিল। তিনি ভাবছিলেন দেহজীবিনী দুলির ঘরে ঠাঁই আছে কিন্তু গাজীর নাই। জাতপাতের কী বিষম বেড়ি। গাজী তাঁকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। গঞ্জে তার চেনা প্রচুর লোক আছে। সে বলে, 'তা ছাড়া, একটা কথা কি বাবু হিঁদু বলেন আর মোচলান বলেন, এমন লোককে কি কেউ ঘরে থাকতি দেয়?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কেন?'

'বিশ্বাস কি বাবু, যদি চুরি-চামারি করে?'

গাজীর দিকে ফিরে তাকাই। সে আমার চেয়ারের পাশে মাটিতে বসা। হ্যারিকেনের আলো তার মুখের যে পাশে পড়েছে, সে পাশটা দেখতে পাই না। যেদিকটা পাই, সেদিকটা অন্ধকার।' *(পৃ: ৩১৮ ঐ)* কঠিন কথা সহজভাবে জিজ্ঞাসা করেছে, সেই প্রশ্ন তিনি পাঠককুলেও তুলে দিয়েছেন 'এমন একটা পথে পথে হাত পেতে গান গেয়ে ফেরা চেনা লোকই যদি আমার দরজায় এসে রাত্রিবাসের ফরমান চাইত, দিতাম নাকি?

পুছ করার দরকার কী? দিতাম না।' *(পৃ: ৩১৮, ঐ)* তিনি 'সই, সই' ডাকে সচকিত হয়ে ওঠে। দাওয়ার কাছে কে যেন ডেকে যাচ্ছে। তিনি অন্ধকারেও দেখতে পেয়েছিলেন একটি মূর্তি সন্তর্পণে গাজীকে ডিঙিয়ে বাইরে চলে গেল। তারপরে তাঁর কান্না ভেজানো আওয়াজ কানে আসতে লাগল। পুরুষের নিচু গলার স্বর 'পায়ে ধরি সই'। *(পৃ: ৩২০, ঐ)* কান্নার আওয়াজ ও কথার আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতেই গাজী বলে উঠল তিনি কিছু বুঝেছেন কিনা। দুলি আর অনন্ত ওরা। কালকূট দেহজীবিনী ও তার ভালবাসার মানুষের বিচিত্র জীবনচিত্র তুলে এনেছেন। দুলির জন্য পাঠকের রাগ হয় না, এক ধরনের মমত্ববোধ তৈরী হয়। তিনি বলেছেন এই ঘটনায় আবেগ ধরার যন্ত্র তাঁর কাছে নেই তবে 'সংসারের সীমান্তেও যে এমন ঘটে, তা জানা ছিল না। প্রান্তে, যেখানে বিধিনিষেধ, সেখানে সকলই নিষিদ্ধ, অচ্ছুৎ, সেখানেও যে এমন সাংসারিক লীলা, তা কখনো দেখিনি।' *(পৃ: ৩২০, ঐ)* তিনি বলেছেন 'আমার হাসি-ঝরা আবেগধারা অবাক মেনে

ভাবে, এত দেখা ছিল আমার একটা দিনের নিরুদ্দেশের ফেরায়! যখন আপন সুখে হাসি, কাঁদি, তখন ভাবি, জীবন এত ছোট কেন।' *(পৃ: ৩২০, ঐ)* কালকূট দেখেন ফোঁচা উঠে বসে বিড়ি ধরিয়েছে। কাঠির আগুনে কয়েকমুহূর্তের জন্য ফোঁচার চোখ দুটো দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ভাবছেন, ও কি চিন্তা করছে। সে কি তার বিয়ের কথা ভাবছিল। কালো কচিকলারবউ-এর কথা ভাবে? 'পাশের ঘরে যারা ঘুমোয়, সেইখানে কি চোখ ফেরে তার।' *(পৃ: ৩২১, ঐ)* গাজীর গানের

গুনগুনাতিতে ঘুম ভেঙে গেল।

'ওহে দীনদরদি, বলো না কেন।

তুমি যদি মন্দিরেতে করো অবস্থানো

তবে এ জগত সোমসার কার নিকেতনো।

কেউ বলে তুমি রাম, থাকো পুবে, আর পশ্চিমে আলী।

তবে কেন হিদয়সুরে খালি। ওহে দীনদরদি ---

কেউ জানে না, তুমি মনের মানুষ, মনে অবস্থানো।' ... *(পৃ: ৩২১, ঐ)*

তিনি ভাবছেন কে তার মনের মানুষ? 'তার জাত নেই, ঈশ্বর নেই, খোদা নেই। একমেবাদ্বিতীয়ম্, মনের মানুষ।' *(পৃ: ৩২১, ঐ)* গাজীর চোখ দিয়ে লেখক কালকূট অন্য এক রসের সন্ধান করেন। গাজী বলে, গুরুই সব পথ দেখান। কালকূটের প্রশ্ন, 'কিসের পথ?'

'মনের মানুষের?'

'মনের মানুষের?'

'আজ্ঞা, অই যে সেই রসের মানুষের কথা আছে।'

'সে আবার কে।'

'কেন বাবু, যাকে বলে অধর মানুষ।' *(পৃ: ৩২২, ঐ)*

কালকূট এই গূঢ় তত্ত্বকথা তেমন করে বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করেন তিনি কোথায় থাকেন? গাজী নিজের বুকে হাত দিয়ে বলে 'এই ঘরে এই ভান্ডে।' আরও বলে, মানুষের দুই ভাগ, নর আর নারী। এনাদের দুইজন ছাড়া কোনো কিছুই মেলে না। সংসার করতে হলে যেমন মিয়াবিবি লাগে তেমনি মনের মানুষ পেতে হলে পুরুষ-পিকিতির দরকার দয়। সেই অধর মানুষকে একলা ধরা যায় না। গাজীরও পিকিতি আছে। তাঁর হাসি আর শেষ হয় না। তাকে দেখে মনে হয়েছে এ যেন সেই গাজী নয়, ছোকরা ডাগর গাজী। বিয়ে তারা করেনি। গাজী দরবেশের বিয়ে আবার কী? সেই দশ-এগারো বছর আগে হাড়োয়ার মেলায় তার পিকিতির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। পীরগোরাচাঁদের দরগায় প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের বারো তারিখে মস্ত মেলা হয়, সব সম্প্রদায়ের লোক মেলায় আসে। দরগার উঠোনে বসে ডুপ্‌কি গান শুরু করেছিল। গাজী বলে যাচ্ছে 'তা বয়স প্রায় পঁচিশ-

তিরিশ হবে। গায়ে পাড় ছাড়া গেরুয়া, কপালে রসকলি, আতেলা চুল ছড়ানো। 'বুইলেন বাবু দেখি মনে হলো, গাজীর গান তারই সব থেকি ভালো লেগিছে।' তাই, সে তো আর কাছছাড়া হয় না। লজ্জার মাথা খেয়ে গাজী আর কী বলবে। যতবার চোখ তোলে, দেখে সেই বোষ্টমী আর চোখ ফেরায় না। আবার নাকি চোখ ঘুরিয়ে হেসে বলে, 'বাবাজীর গান শুনে যে মরণ ধরে গোঁ।' *(পৃ: ৩২৩, ঐ)* বোষ্টনী তাকে কলাপাতা ভরে খিচুড়ি অন্ন দিয়েছিল। গাজী একটু নিরিবিলিতে বিদ্যেধরীর ধারে গিয়ে বসেছিল। একটু পরে বোষ্টমী তার পাশে এসে বসেছিল। তার নাম বলেছিল 'তারা'। গাজী জানতে চেয়েছিল কোন তারা? নয়নতারা না আসমানতারা? তারার হাসিতে গাজীর মনে হয়েছিল বুঝি বিদ্যেধরীর জলে জোয়ার এসেছে। গাজী আরও বলেছিল, তার মনে হচ্ছে আশমানতারা, হাত বাড়ালে ধরা যায় না। আর তারা জানতে চেয়েছিল, 'আর নয়নতারা'? গাজীর উত্তর ছিল 'সে তো সঙ্গে সঙ্গে থাকে, নিজির মধ্যি।' *(পৃ: ৩২৩, ঐ)* গাজী 'নয়নতারা'কে নিয়ে মনের মানুষ ভজতে চেয়েছিল। তারা বলেছিল 'যে তোমার মনের মানুষ, সেই আমার ছিকেষ্ট।' *(পৃ: ৩২৪, ঐ)* গাজী বলে চলেছে সেখান থেকে সেই মুহূর্তে চলা শুরু হয়ে গেল, সারারাত বিশ-পঁচিশ মাইল হেঁটে বসিরহাটে চলে গেল। গাজী লাজে লাজানো হাসিতে বলে চলেছে 'আর সে চলা তো বাবু গোণের চলা। গাঙে যেমন আপনার অমাবস্যে পুন্নিমার গোণ লাগে, সেই রকম আর কী।' *(পৃ: ৩২৪, ঐ)* কালকূট শুনছেন এক বিচিত্র প্রেম কাহিনী, সূর্যোদয়ের আগে যাদের চেনাজানা ছিল না সূর্যাস্তের পর তারাই পুরুষ-প্রকৃতি হয়ে চলে গেল। কালকূট যেন সেই অল্প অল্প জ্যোৎস্নায় মায়াময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে ওদের চলে যেতে দেখছেন। এইভাবে কালকূট এই কাহিনীতে অরূপকে ধরতে চেয়েছেন। বুঝতে চেয়েছেন সেই অধর মানুষের কথা। গাজীর মুখ দিয়ে নিজ জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন। যেখানে বুঝতে পারেন সেখানে বিশদভাবে জানতে চেয়েছেন। পথে পথে ঘুরে দরবেশ গাজীর কাছে তিনি সহজ সাধনার পাঠ দিয়েছেন। তত্ত্বকথা তত্ত্বের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। তার নিজের জিজ্ঞাসাই তিনি পাঠকের হয়ে করেছেন, আবার নিজেই সমস্যার সমাধান করেছেন।

একবেলা একরাত্রি পান্থশালায় কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় একটা করুণ সুর ধ্বনিত হয়। সবাই দাঁড়িয়ে থেকে বিদায় জানায়। নারাণঠাকুর খেঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করে 'আবার আপনি উদয় হচ্ছেন কবে?' *(পৃ: ৩২৬, ঐ)* এ'কথা শুনে কালকূট বলেছেন যে, এটা আপদ বিদায় না নিমন্ত্রণের কথার ফের। গাজী উত্তর দিয়েছিল 'তা কি বলা যায় সেদিন আসব।' নারাণঠাকুর তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বলল, 'খালি বাজে প্যাঁচাল পাড়ে'। দুঃখের মধ্যেও সূক্ষ্ম একটা কৌতুক বোধ ফুটিয়ে তুলেছেন।

লঞ্চে উঠে প্রথম শ্রেণীর কামরায় ঢুকে হঠাৎ ঝিনিদের জন্য মনখারাপ হয়ে গেল। ওদের

জন্যই লঞ্চে আসতে চান নি কিন্তু তিনি এবার বুঝেছেন, 'চাই না' চাই না' কখন যেন 'চাই' হয়ে গেছে সেটা বুঝতে পারেন নি। তাই একটু মনোভঙ্গের সুর তার মনের মধ্যে বেজে উঠছিল। দিগন্ত বিস্তৃত প্রকৃতি দেখে তার মন আস্তে আস্তে ভাল হয়ে যায়। তাঁর মনে হতে থাকে মনের মানুষ ভজবে বলে নয়নতারাকে বলেছিল সেই অধর সে ধরতে পেরেছে কিনা। তিনি বলেছেন 'পুরুষ-প্রকৃতির কার্যকারণের এসব ব্যাখ্যা জানি না। সাঁই দরবেশ ফকিরদেরও যে সাধনভজনের এসব রীতিকরণ আছে, জানা ছিল না। যতটুকু জানা ধারণা, সেটা তন্ত্রমন্ত্রের কথা। কিন্তু গাজীর কথায় সেই ইশারা পেয়েছি। সেই সুরেই বেজেছে মিয়া-বিবির ঘর-করা স্রোতের টানে চলা। সাধক চলে উজানে। ব্রহ্মচর্য চাই। বলে এই পথে ফেরা ধূলিছাড়া আলখাল্লাওয়ালা গাজী।' *(পৃ: ৩২৬, ঐ)* এই ব্রহ্মচর্যে প্রেমের লেনাদেনা আছে কিনা সেটা ভাবতে থাকেন। বিদ্যাধরীর কূলের কথার এক সহজ পবিত্রতা তাঁকে ছুঁয়ে গিয়েছিল।

হাসনাবাদ পৌঁছে লঞ্চ থেকে নামার সময় ঝিনিদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রথম বাসে উঠতে না পেরে পরের বাসের অপেক্ষায় থাকেন ব্রহ্মনারায়ণ চক্কোতি মহাশয়রা। ব্রহ্মনারায়ণ চক্কোতি মশায়ের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। ঝিনি বলেছিল যে তার বাবার কথা তিনি সত্যি করে ছাড়লেন। কালকূট কিছু বলবার আগেই উনি বলেছিলেন, 'থামো হে, কথা বললেই হলো।' *(পৃ: ৩২৭, ঐ)* তার কথা শুনে মা-মেয়ে দুই সখীর মত হেসে বেজে উঠছিল। রাস্তায় যে বাস কম চলছে সেটা না জেনে তারা গেছে কেন? এটাই চক্কোতি মশাইয়ের বক্তব্য ছিল। তারা উপরে না গিয়ে কেন নিচে ছিলেন, সেটার ব্যাখ্যা করলেন। প্রথমে বললেন মা-মেয়ের ঠাণ্ডা লাগবে বলে নিচে গেছে। পরে মেয়ের প্রতিবাদে বলছিলেন 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তুই বললি, ''আসবার সময় ছাদে বসে এসেছি, যাবার সময় নিচে বসে যাবো। লোকজনের সঙ্গে বেশ নতুন রকম লাগবে।' বোঝো, লোকজনের সঙ্গে আবার নতুন রকম কী লাগবে রে বাপু। তা নয়, আসলে তোরও তোর মায়ের মতো শীত ধরেছিল।'

বিদূষী অলকা এবার ছোট মেয়েটির মতো ঠোঁট ফুলিয়ে প্রায় ভেংচি দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ ধরেছিল, তোমাকে বলেছে!' *(পৃ: ৩২৮, ঐ)* যাইহোক কেন তারা কালকূটকে দেখতে পায়নি এ নিয়ে তাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে হাস্যরসের একটি পারিবারিক চিত্র তুলে ধরেছেন।

লেখক কালকূট রাতে কোথায় কিভাবে ছিলেন সে'কথা জানতে পেরে একটু অবাক হয়ে বলেছিলেন তার সাহস তো কম নয়। যে কোনরকম বিপদ হতে পারত। টাকাপয়সা আংটি সব কিছু নিয়ে গলাটি কেটে রেখে যেতে পারত। এই বাদা অঞ্চলে জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ, আর ঘরে ঘরে ডাকাত পড়ে। গাজীকেই বা কি বিশ্বাস। ঝিনি তার বাবার কথার প্রতিবাদ করে বলেছিল যে গাজীকে উনি ভালই চেনেন বলে বিশ্বাস করেছেন। ব্রহ্মনারায়ণ তিনি 'তোকেও দেখিনি ঝিনি, এই

পড়ে পড়ে ঘুরে ছেলেদের মতো কথা বলিস তুই। এসব বলতে গেলেই বীরুর কথা আমার মনে পড়ে যায়।' *(পৃ: ৩৩০, ঐ)* কালকূট বুঝতে পারলেন এই কথাতে পরিবেশটা অন্যরকম হয়ে গেল। সেখানে অন্য সুর ভিন্ন কথা বাজতে লাগল। মেয়ে থামতে বললেও তিনি থামলেন না। 'তা নয়, দেখ একদিন বীরুও তো হেনরিকে বিশ্বাস করে তার সঙ্গে গিয়েছিল। কত বড় বিশ্বাসী বন্ধু ছিল হেনরি, তবু সেই যে গেল, আর ফিরল না।' *(পৃ: ৩৩০, ঐ)* কথা শেষ হবার আগেই ঝিনির চোখের কোণে শিশিরের বিন্দু চিকচিকিয়ে ওঠে। সবার কথা থেমে যায়। কালকূটের মনের ভেতরে ঘুরতে থাকে কে বীরু, কে হেনরি, কে ফিরে এল না, কেন ফিরে এল না। কিন্তু তাঁর মনের ভাবনা দূর করলেন ব্রহ্মনারায়ণবাবু নিজেই। তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেলের বন্ধু ছিল অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হেনরি। একইসঙ্গে চাকরি করত, বীরুর লিফ্‌টের সুযোগ আসাতে হেনরির সহ্য হয়নি, সে বীরুকে ডেকে নিয়ে মেরে ফেলেছিল এই বছর পাঁচেক আগে। হেনরি ধরাও পড়েছে, জেলও খাটছে, তবু পুত্রের শোক তিনি ভুলবেন কী করে?

কালকূট ব্রহ্মনারায়ণবাবুর যন্ত্রণাকে হৃদয় দিয়ে ছুঁলেন। তিনি বলেছেন যে, কে জানত যে এই মানুষে সেই মানুষ আছে। 'এমন হেঁকো-ডেকো হাসানে লোকটা যে নিহত আত্মজের ঘা নিয়ে বেড়াচ্ছে, একবারও তা বোঝা যায়নি। তাও শোনো, এত বড় একটা বুকের ধস খসানো কথা বলেন, তাও কেমন অনায়াসে। কেমন স্থির গলায়। *(পৃ: ৩৩০, ঐ)* এবার তিনি ব্রহ্মনারায়ণবাবুর কথার মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর এই কথার পরেও তিনি গাজীকে বিশ্বাস করবেন। 'বলব, তবু এই নিহত আত্মজের পিতার সংশয়কে যেন হীনতায় না দেখি। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। এখন আমি তাঁকে আরো বেশী চিনি। দেখছি, পথের যা কিছু পাওয়া সব কিছুতেই এক অরূপরতন আছে।

সেই এক অরূপরতন, চোখেতে তার রূপ দেখি না। তবু দেখি কোথায় যেন এক রূপের ঝোরা ঝরে যায়। *(পৃ: ৩৩০, ঐ)* অরূপের অরূপরতন নাম দিতে চান তিনি। মানুষঅরূপরতনের আরও এক নাম হল প্রাণ। তার মনে প্রশ্ন ঘুরে বেড়ায়। মা-মেয়ে-বাপ, গোটা একটা পরিবার, তাদের মাঝে বীরু নামের ছেলেটি কী রূপে ভাসে? ব্রহ্মনারায়ণবাবু জানলা দিয়ে বাইরের রোদমাখানো অথৈই সবুজের দিকে তাকিয়ে থাকেন। মায়ের মুখ ফেরানো, নিচু আর মেয়ের মুখ জানলার ওপরে ঝুঁকে রয়েছে। বীরু নামের ছেলেটি এই পরিবারে এই মুহূর্তে বেদনার ঝড়ে বয়ে যাচ্ছে। চারিধারে বিশাল কলরবের মাঝে তাঁকে ঘিরে যেন এক সিন্ধুর মৌনতা, তাঁদের দুঃখবোধ, বেদনা যে সিন্ধুর থেকে গভীরতর সেই সুরটাই তিনি তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গে সন্ধ্যার বিষণ্ণ প্রকৃতিকে এনেছেন।

তারপরে পিতাপুত্রী হেনরির সঙ্গে, তাদের পরিবারের সুখস্মৃতির মুহূর্তগুলিকালকূটের কাছে উজাড় করে দেয়। কালকূট ভাবেন 'অলকা চক্রবর্তীর প্রাণের স্রোত কোন্ তরঙ্গে দোলে। ফুল

কোথাও ফুটেছিল নাকি। অচিনে অজানায় নিভৃতে, কোথাও ফুটেছিল নাকি কুসুমকলি। হেনরি কি শুধুই হেনরি, অলি নয় মোটে?' *(পৃ: ৩৩১, ঐ)* কিন্তু তার মনের সন্দেহ দূর করেন ঝিনির কথার মধ্য দিয়ে। সে বলত "তুমি তো আর সত্যি সত্যি আমার ভাই নও।" কী যে চটে যেত ও কথা বললে। বলত, "আমি তা হলে সত্যি সত্যি তোর কী?" বলতাম, "তুমি দাদার বন্ধু।" শুনেই রেগে তেতাল হয়ে উঠত। পেছনে লেগে সহজেই ওকে চটানো যেতো। আবার ও-ও আমার পেছনে লাগত।' *(পৃ: ৩৩১, ঐ)* ঝিনির এই কথায় তার বাবাও সায় দেন, বলেন 'সত্যি, পাগল ছিল ছেলেটা অথচ কী মতি হল তার! হেনরি কোনরকম মামলা লড়েনি। নিজেকে বাঁচাতে চায়নি। যেদিন রায় বেরিয়েছিল সেদিন তার পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল 'কাকাবাবু আমাকে ক্ষমা করুন।' *(পৃ: ৩৩১, ঐ)* জেল থেকে প্রতি সপ্তাহে চিঠি দেয়, না মরে বেঁচে আছে। বীরুর হত্যাকারীর প্রতি পুরো পরিবারের কোনো বিদ্বেষ নেই, বরং ওর প্রতি একটা সহানুভূতি, মমত্বের পরশ ফুটে উঠেছে। লেখক কালকূট এক আশ্চর্য দক্ষতায় বন্ধু হত্যার কাহিনীর মধ্য দিয়ে একটি পরিবারের মূল্যায়ন করেছেন। দেখেছেন, বুঝেছেন অত্যন্ত কাছ থেকে, কী দুঃসহ দুঃখবোধ অথচ দুঃখের মধ্য দিয়েও ক্ষমাকে এনেছেন কাহিনীর উপকাহিনীকে একটা উচ্চাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন। পাঠককুলও ব্রহ্মনারায়ণ বাবুর পরিবারের সঙ্গে দুঃখে-বেদনায় একাকার হয়ে যান আবার সুখের সময়ের স্মৃতিতে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে যান। শঙ্খচুঁড় আসতেই তারা নেমে যায়, কালকূটকেও তাদের সঙ্গে যেতে বলে। এই পথের পরিচয়ের ডাকে কালকূটের হৃদয় ছলছলিয়ে যায় কিন্তু তিনি যেতে পারেন না ওদের সঙ্গে। ঝিনির মুখ দেখে তাঁর মনে হল 'গতকালের বিদায় নেবার ছবিটা মনে পড়ে। এখন তার চেয়ে বেশী অন্ধকার তার মুখে। খুশি লাগা ঝলকে হতাশার একটু ছায়া। বলতে ইচ্ছা করে, কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাতের চাঁদের মতন। পথ চলাতে এইটুকু ব্যাজ। তার ওপরে দেখ মন খারাপের বাকিটুকু লেগেছে সবু কালো ভুরুতে। এখানে লেনাদেনার বিচার নাই। তাই, দাবিটা এমন নিটোল সহজ, বলতে পারো মন খারাপের বাঁকটুকুর আর এক নাম অভিমান।' *(পৃ: ৩৩২, ঐ)* ওরা চলে যায়, একটু পরেই বসিরহাট এসে পড়ে।

বাস ছাড়ার কিছু আগে গাজীর মুখ থেকে সেই মোক্ষম কথাটি বেরিয়ে পড়ে, সেও তিন সন্তানের পিতা, এই কথা শুনে লেখক একটু অবাকই হন। তিনি তাঁর সন্তানের মিষ্টি খাওয়ার জন্য টাকাটা দিতে না দিতেই বাস ছেড়ে যায়। যেতে যেতে তিনি শুনতে পেলেন গাজীর সেই আমন্ত্রণ ফাল্গুন মাসের বারো তারিখে পীরগোরাচাঁদের মেলায় যাওয়ার জন্য। এই কাহিনীর প্রথম বৃত্ত এই পর্যন্তই।

বসিরহাটের গ্রামাঞ্চলের বনপ্রকৃতির সঙ্গে ওই এলাকার জনমানসের একটি চিত্র তুলে এনেছেন। মামুদ গাজীই মুখ্য ভূমিকা নিয়ে চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণ দিকের নদীসংলগ্ন

অঞ্চলগুলো চেনাতে, তাঁর চোখ দিয়ে সেই অঞ্চলের মানব জীবনধারা প্রত্যক্ষ করেছেন। সেখান থেকে তিনি তুলে এনেছেন সে-ই গ্রাম-বাংলার নিত্যদিনের চিরচেনা অথচ অনেকেরই না-দেখা, না-জানা জীবনচিত্র। আর মামুদ গাজীকে ভেবেছিলেন দীরদরদির খোঁজে চলে। কিন্তু তা নয়, পুরুষ-প্রকৃতির উজান টানের কথা বললেও সে নিজেকে সে-ই কঠিন সাধনার বাঁধনে বাঁধতে পারেনি। তাই সে সন্তানের পিতা। কালকূটের এইখানেই ঠেক লেগেছে। সংসারের বাইরের মানুষ সে নয়, এই সংসারেরই একজন খুঁটে খাওয়া লোক। কালকূটের কাছে সে ঝোলা ডুপ্‌কি আলখাল্লা সব কিছু নিয়ে বাংলা দেশের এক গায়ক, একেবারে সোজাসুজি মানুষ। তিনি বলেছেন 'গাজীটা সত্যি পাজী।' *(পৃ: ৩৩৩, ঐ)*

এরপর আবার ঘরছাড়া হয়েছেন তিনি। তিনি বলেছেন কে যে তাকে ডেকে নিয়ে যায়, সেই পাগলের নাম তিনি জানেন না। তিনি ঘরে থাকতে পারেন না, রওনা দেন ছাতিমতলার মেলার উদ্দেশ্যে 'পৌষ যেখানে ডাক দিয়েছে, তোরা আয় আয় আয়। সেখানে মহাঋষির স্মৃতিতীর্থে, উপাসকের আশ্রম। সেখানে আছে বটতলা, যেখানে ঋষি সূর্যোদয় দেখতেন। যবে ঋষি দীক্ষা নিয়েছিলেন, প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেইদিন তাঁর জন্মান্তর। জন্মান্তরের সেই দিনটি, সাতুই পৌষের স্মরণোৎসব। এবার সেই লীলাভূমি যাত্রা, গেরুয়া রঙে ছোপানো মৃত্তিকা দেশ বীরভূমের অন্তঃপাতী। তার সঙ্গে দেখবে চলো ঋষিপুত্রের কীর্তি। সে এক তিল তিল রূপে গড়া তিলোত্তমা নয়, বিশ্ব ঝেনে বিশ্ববিদ্যালয় গড়া। সে হল কীর্তিমানের কর্ম। মর্মের কথা আলাদা। মহর্ষির ধ্যানের বীজে সেই মরমের জন্ম, সে মরমের ধ্যানের কথা শ্রুতিগোচর গানের সুরে। সে মরমিয়ার ব্যাকুল চাওয়া, ধ্যানের চাওয়া, অরূপরতন, তার নিজের মিলে ছিল কিনা, কে জানে। আলো আলো আলো বলে আর্তররে অন্ধকারে তাঁর চোখের তীরে আলো জেগেছিল কিনা, কে জানে। সেই ক্ষ্যাপার কথা যে মনে পড়ে যায়, খুঁজে ফেরার পরশমণি যে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের হাত তো ভরে গিয়েছে সোনায় সোনায় অরূপতরনের কাব্যবিতানের মালিকায় যা গাঁথা। আমাদের চোখের তীরে তো আলোর ঝলক, চারু সম্ভারের আলোতে। তাই সেখানে যাই। মহর্ষির তীর্থে, মরমীর থানে, কর্মীর বিশ্বলোকের প্রাঙ্গণে। সেই এক ছাতিমতলা ঘিরে যার বিস্তার। উপলক্ষ, মহর্ষির দীক্ষাদিনের সাতুই পৌষ। সাতুই পৌষের মেলা। সেখানে বঙ্গ রঙ্গ করে নানা রূপে নানান্ উপচারে। একথা পাড়ায় জানা, সংবাদে শোনা। একবার দেখে আসি গিয়ে।" *(পৃ: ৩৩৪, ঐ)* তিনি যাত্রাপথের পথনির্দেশ করেছেন এইভাবে, অণ্ডাল থেকে সাঁইথিয়া যেতে গেলে রাতের ধূলায় রাঙা হতে হবে। উত্তরীয়া হাওয়ায় মানুষ-পশু-গাছপালা সব গেরুয়া রঙে রাঙানো। সাঁইথিয়া থেকে ট্রেনে যেতে হবে বোলপুর স্টেশনে। সেখান থেকে ছাতিমতলায়, অর্থাৎ শান্তিনিকেতন। এরপরে এসেছেন ভাষার বৈচিত্র্যে। অণ্ডাল ছাড়াবার পর 'কুথাক্ যাবেন?' কথায়।

তিনি বলেছেন "এ সেই 'যাওয়া হবে কম্‌নে' নয়। এখানে সুর স্বর উচ্চারণ, বেবাক আলাদা। ওখানে গানের ছলছলানি, কলকলানি, ভেজা ভেজা ভাব নেই। যেন উপচে পড়া, ঢল নামা গহীন গাছের তরতরিয়ে যাওয়া। এখানে কাঁকরে পাথরে যেন রক্তে সেঁচা মাটি, চড়াই-উৎরাইয়ে সুর। জাত আলাদা। ছন্দে একটু বাঁকাচোরা, ঠেক-খাওয়া ঠেক-খাওয়া। ভাটিয়ালির লম্বা টানের থেকে গুপগুপাগুপ্‌ গোপীমন্ত্রের গানের সুরে মিলবে ভালো। ঝুমুর বাউলের ওঠানামা এই প্রকৃতিতে আছে। কাঁদনেও সেই সুর। উজানিয়া মাঝির শোনের সুর না। সুখের তরতরানি ছলছলানি না। এখানে রসের ধারা নিচে দিয়ে বহে। ছোটে যখন ঝরণা তালে, লাফিয়ে নেচে ঘুরে ঘুরে ছোটে।" *(পৃ: ৩৩৪, ঐ)* লেখক কালকূট স্থানিক বর্ণনার সঙ্গে সেই এলাকার মানবজীবনের কৃষ্টিও তুলে ধরেছেন এক শৈল্পিক মহিমায়। বলেছেন 'নদীতে জল নেই, পুকুর ঘটঘটে, তবুও মহুয়া ফুল ফুটে গন্ধ ছড়িয়ে যায়, মৌমাছি গুনগুন করে সেই ফুলে ফুলে। আর যখন উত্তাপে রক্তমাটি ফাটে, তখন তালশাঁসে টলটলে রস। গাছে গাছে ফুল ফোটে। কথাবার্তা সবকিছুই শোনায় অন্য সুরে, 'যেন ভিতর থেকে খোঁচা খেয়ে খেয়ে গেয়ে ওঠে, শোনায় এক নতুন সুরের ছন্দে। এক ভিন্‌ রসের সন্ধান পাবে। তার নাম রাঢ়ের রস।' *(পৃ: ৩৩৪, ঐ)* আবার মাঝে তালবন দেখে বলেছেন ওখানে জলাশয় আছে, রাঢ়ে এই এক বৈশিষ্ট্য। আর গাঁয়ে পথে এই শীতে ল্যাংটা ছেলেরা খেলা করে আর বড়রা খালি গায়ে জটলা করে, মেয়েরা রেললাইনের জলাশয়ের ধারে স্নান করে কাপড় কাঁচে। রাখালেরা লাঠি হাতে ধেনু চরায়, মুগ-কলাইয়ের ক্ষেতে যেন ছোঁচাবৃত্তি না করে। এইভাবে লেখক কালকূট যেতে যেতে ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক জনজীবনের চিত্র তুলেছেন। এমনভাবে তুলেছেন এই চিত্র যেগুলো পড়তে গিয়ে পাঠককুল কখনও ক্লান্ত বোধ করবে না: বর্ণনার শৈলীতে আছে চুম্বকের মতো আকর্ষণী শক্তি। কালকূটের পাশে বসা লোকটি বলছে 'এরপরে, কস্ত গেরম, বীরভূম পড়ছে।' ভৌগোলিক বিবরণ অথচ বললেন স্থানীয় একটি গ্রামীণ মানুষের মুখ দিয়ে যে অনেকক্ষণ ধরে তাঁর হাতে খোলা বইটি বানান করে পড়ছে অথচ তার কোলের উপর বইটির প্রতি দৃষ্টি নেই। জেলা বদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি, সংস্কৃতি তিনি এঁকেছেন যে বদলে যায়, তার একটি বাস্তবচিত্র এঁকে। এইরকম বহু শিল্প সুষমামণ্ডিত বর্ণনা আছে। এখন দেখা যাক্‌ বাকি অংশ। তাঁর পাশের লোকটি জানালো 'ইটি অজয় নদী।'

গাড়ী বীরভূমে প্রবেশ করতেই একঝাঁক সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষ হাসাহাসি-দাপাদাপি করতে করতে ট্রেনে উঠল। কাউকে কাউকে একটু অসাব্যস্ত বলে মনে হয়েছে লেখক কালকূটের। পাশের লোকটি বলল যে ব্যাটারা মদ খেয়ে এসেছে। তবুও ওদের রূপবৈচিত্র্য তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। সকলেই ধোয়া জামা-কাপড় পরেছে। চুল-মাথা তেল চকচকে। মেয়েদের খোঁপায় গোঁজা ধানের শীষের মতো একটি সবুজ লম্বা ডগা। অল্পতেই তুলতুলিয়ে দুলছে। যাদের বয়স বেশী তারা অবশ্য

মাথায় গোঁজেনি তবে কিশোরীরা গুঁজেছে। এদের মধ্যেই একজন গান গেয়ে উঠল 'প্রাণে সয় না, সয় না ওহে ঠাকুরপো!' *(পৃ: ৩৩৫, ঐ)* গানের ভাষা কালকূটের শ্রবণে ঠেক খেল। তাদের হাসাহাসি-গানগাহনিতে বিরক্ত হয়ে কালকূটের বিপরীতে বসা লোকটি তাদের চুপ করতে বলল। 'একেবারে কান ঝালাপালা করে দিলে যে অ্যাঁ?' *(পৃ: ৩৩০, ঐ)* অণ্ডাল থেকেই এ লেখক কালকূটের সহযাত্রী। কোলের ওপরে নামহীন বই খোলা। তার কথা শুনে গায়কের দলের একজন বলে উঠল 'ল্যাখাপড়া করছে হে, বুঝছ না ক্যানে।' *(পৃ: ৩৩৬, ঐ)* ওদের কথা শুনে লোকটি কালকূটকে সাক্ষী মানল এই কথা বলল যে, মূর্খদের কী বোঝাবে, কিন্তু আজ বাদে কাল তাঁর শমন ধরা, সে কি করে বসে থাকবে? কালকূট কথায় কথায় জেনে গেলেন 'বাংলা মসনদ' যাত্রাপালাটি শান্তিনিকেতনের মেলায় মঞ্চস্থ হবে 'নয়ুই পৌষ', সে সিরাজের 'পাট' করবে। ''পৌষ মেলায় যাত্রা! এবার হঠাৎ লোকটাকে অনেক কাছাকছি মনে হলো। ছাতিমতলার উৎসবে যাত্রার নায়ক আমার সহযাত্রী। বাংলার মসনদের সিরাজ চলেছে সঙ্গে।'' *(পৃ: ৩৩৬, ঐ)*

তার পাশের লোকটির সঙ্গে 'সিরাজে'র বিভিন্ন যাত্রাপালার কলাকুশলীদের কথা চলতে লাগল। রামপুর হাটের টিকেটবাবু লোচন রায় একবার ফুলুট একবার বেহালা বাজাত। বুড়ো লোকটি আরও বলছে 'কী বুলব, শুনবার মতন বাজনা বসে বটে।' *(পৃ: ৩৩৭, ঐ)* আরও 'কিষ্ট চৌধুরি'কে রাম বা রাবণ দুটো মানাত, সুন্দর চেহারা ছিল গলাও ভালো ছিল। সিরাজ বলেছিল 'কিষ্টদার সব ভালো, তবে মোশন নাই, লড়তে চড়তেই সময় চলে যায়। তবে হ্যাঁ, বয়সকালে ভালোই ছিল।' *(পৃ: ৩৩৭, ঐ)* ওদের যাত্রার বিভিন্নরকম আলোচনা শুনে কালকূট অতীতচারী হয়ে নিজের ছেলেবেলায় ফিরে গেলেন। তিনি 'লোচন রায়', 'কিষ্ট চৌধুরি' কে দেখেন নি কখনও তবু তার মনে হয়েছে এরা তার খুব চেনা। 'পদ্মার ওপারে যা দেখেছি ছেলেবেলায়, অজয়ের এপারে এর চেয়েও আর কত তফাত হবে।' *(পৃ: ৩৩৭, ঐ)* যাত্রাপালার কথা শুনে দুইবাংলার যাত্রাপালার মেল করেছেন। পথে যেতে যেতে এইভাবে তিনি বাংলার পুরানো ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। সেই তুলেছেন সিরাজের আর্থিক কষ্ট। সে লোকেশেডে কাজ করে, 'কিলিনার' নাম তার অতুল দাস। 'অ্যাকটিনের আসল জিনিষ হচ্ছে দম। দম থাকবে কোত্থেকে বলেন। যা আক্কারার বাজার। আপনাকে বলেই বলছি ছেলেপিলে নিয়ে পেট ভরে খাওয়াই জোটে না।' *(পৃ: ৩৩৯, ঐ)* বাইরের দিকে তাকায়, মনে তার হার না মানা শিল্পীর জেদ। কালকূট তাঁর বেদনাকে ছুঁয়ে সম্মানিত করেছেন এইভাবে 'দানার ভাবনা পিছনে রেখে, শিল্পী এখন আসরে চলেছে। ক্লিনার কেবল পেটে বাঁচে। শিল্পী বাঁচে অধরায়। তার ধরা ছোঁয়া অনেক দূরে, যখন ভাববে, 'এই মানুষে সেই মানুষ আছে।' *(পৃ: ৩৩৯, ঐ)*

অতুল দাসের দুঃখের সঙ্গে কালকূট প্রকৃতির বিষন্নতাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। 'শীতের এই

রাঙা আকাশের আলো যখন এমনি মাখামাখি, তখন মনে হয়, চক্ষে জল নেই, তবু যেন কোথায় একটা কাঁদন লেগেছে। এমন কি, একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়তে চায় না। আর মন যেন চলে যেতে চায় কোন্ দূরে!' *(পৃ: ৩৩৯, ঐ)*

রাঢ় ভূমির এই রক্তিম বিকেলের কথা বলতে গিয়ে তিনি চলে গেছেন কয়েক বছর আগের এক রাঢ়ভূমির রূপ যেভাবে দেখেছিলেন সেইখানে 'রাঢ়ের সে রূপে ছিল এক মত্ত মাতনের ঝঞ্ঝা, সেখানেও লাল বিকাল দেখেছিলাম। কেবল রাঙা আকাশের আলোর লাল নয়। রক্ত নিয়ে হোলি খেলার লাল। ছাতিমতলার সঙ্গে যার কোথাও মিল নেই। সেখানে ধ্যানের মৌন গাম্ভীর্য ছিল না। ছিল নাচের ছন্দে মানবলীলার অকপট শিশুর খেলা। সেথায় নরের কোলে নারী ছিল অনাবরণ ঐশ্বর্যে, আদিম খেলার মাতনে। রক্তে রমণে ধাঁধিয়ে যাওয়া চোখের কোলে হাত দিতে চেয়েছি। কিন্তু তাই কি কখনো হয়! রূপ দেখবে বলে বেরিয়েছিল। সব কি তোমার মনের মতন হবে! যেমন রূপ তেমনি দেখা।' *(পৃ: ৩৩৯, ঐ)*

রাজধানী থেকে সোজা নেমেছিলেন রামপুরহাটে মলুটির রাজপরিবারের সাথে। রাজপুরুষ রায়মশাই মলুটি রাজ্যের রাজাদের ছয় তরফের, বড় তরফের বড় কর্তা। ইনিও ফুলুট-বেহালাবাদক ও লোচনবাবুর মত টিকেটবাবু ছিলেন। পরণে একটা মোটা হাফশার্ট আর মোটা কাপড় মোটা পায়ের কব্জি পর্যন্ত। হাতের কব্জিতে একটা সাধারণ ঘড়ি, পায়ে ধ্যাপড়ামুখো কালো জুতা। গায়ের রঙ চোখ ঝলসানো গোরা। বিশাল বুকের ছাতি, দু'হাতেও বেড় পাওয়া যায় না। আর ওনার গৃহিনীকে রেলকলোনিতে বলে 'টিকিট কালেক্টরের' গিন্নী, অথচ দিনকাল থাকলে ইনি বড় তরফের বড় রানী হতেন। কার্তিকের শেষ রাতে তাঁরা রামপুরহাট পৌঁছে স্টেশনের বাইরে আসতেই 'সানা' আর লারানকে ছুটে আসতে দেখেছিলেন। ওরা অপরিচিত কালকূটকেও দেখছিল। 'লারান'কে দেখিয়ে সানাকে রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন 'উটি কে বটে, চিনতে লারছি।' *(পৃ: ৩৩৯, ঐ)* তখন লারান জবাব দিয়েছিল 'অ্যাই দ্যাখ গ, বড় কত্তা আমাকে চিনতে লারছে। আমি লারান।' স্থান বদলের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাবৈচিত্র্য লক্ষ করার মত। রাজা প্রজার এমন ভাবভাষা আগে কখনো জানা ছিল না বলে তিনি মন দিয়ে কথা শুনছিলেন।

গরুর গাড়িতে চলতে চলতে আবছা অন্ধকারে চড়াই-উৎরাই, ধানের ক্ষেত, তালের জলের শব্দ যা গরুর পা চাকায় বিচিত্র সুর তুলে কালকূটকে অদ্ভুত এক স্বপ্নময় জগতে নিয়ে যায়। সানা বলদকে শাসায় 'ই দ্যাখ, দ্যাখ ক্যানে, কানার মরণ দ্যাখ গ—। অরে, ও রাস্তা ছেড়্যা যাল্ছিস কুথা, আঁ? আঁই আঁই আঁই, হোইত্তেরি...।' তারপরেই পাঁচনবাড়ির ঠাস্ ঠাস্।" *(পৃ: ৩৪০, ঐ)* বড় কর্তা এরই মধ্যে মলুটির ইতিহাস বলতে শুরু করেছিলেন, 'মলুটি কথা কোথা থেকে এল জানো? এল, মৌলীক্ষা থেকে।' *(পৃ: ৩৪০, ঐ)* মৌলাক্ষী হলেন 'রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী, যা মৌলীক্ষা

রাজবংশের দেবী, গ্রাম্য দেবীও তিনিই। ইনি তান্ত্রিক দেবী। মৌলীক্ষা থেকে গ্রামের নাম মলুটি! শোনো তোমাকে রাজবংশের কহিনী বলি!' *(পৃ: ৩৪০, ঐ)* লেখক কালকূট বড়কর্তার কথা বলার ভাষা একটু আগেই রাজা-প্রজার কথা তিনি শুনেছেন। কিন্তু যখন বিদেশীদের সঙ্গে কথা বলবেন তখন তাঁর মুখের ভাষা ছোট্ট সীমানায় বন্দী নয় সার্বজনীন বাঙালা। বড় রায়সাহেব মলুটি রাজবংশের কাহিনী বলতে থাকলেন। রাঢ়ের এক গ্রামের নারীর ব্রাহ্মণের ছেলে গরু চরাতে গিয়ে গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। মুখে রোদ পড়াতে বিশাল এক নাগ প্রকাণ্ড ফণা তুলে ছায়া দিয়েছিল। এই আশ্চর্য ঘটনা একজন দণ্ডী সন্ন্যাসী দেখেছিলেন। ছেলেটির ঘুম ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হতেই নাগটি চুপচাপ অন্যদিকে চলে গেল। সন্ন্যাসী তখন ছেলেটির সঙ্গে তাদের বাড়ীতে গিয়ে ওর মাকে বলেছিলেন যে 'আজ আমি এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি। তাই বলছি, তোমার এই ছেলে রাজা হবে। তার আগে ওকে আমি দীক্ষা দেবো। দীক্ষা দিয়ে সীমানা না বাঁধলে, ওর বিপদের সম্ভাবনা আছে। কাশীতে আমার বাস।' *(পৃ: ৩৪০, ঐ)*

দীক্ষা দিয়ে চলে যাওয়ার কিছুদিন পর সোনার শেকল ছেঁড়া একটি সোনালী বাজ ছেলেটির হাতে এসে বসেছিল। দিল্লীর বাদশার তাবু পড়েছে গ্রামের বাইরে। তারই আদরের পাখির খোঁজে লোকলস্কর সেপাই চারদিকে ছুটেছিল। ছেলেটির মামা ভাগ্নের হাতে বাজটি দেখতে পেয়ে তাকে বাদশার কাছে নিয়ে যায়। পাখি ফিরে পেয়ে বাদশা তাঁকে বলেছিল যে, সে সূর্য উঠলে যতদূর গিয়ে ফিরে আসতে পারবে ততটা জায়গাই তার হয়ে যাবে। বাদশার কথামতো খুব সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এসেছিল, বাদশা খেতে বসেছিলেন, ওই এঁটো হাতেই দস্তখতের জায়গায় ছাপ দিয়েছিলেন। ফারসীতে লেখা সেই ফরমানটা এখনও তাঁর কাছে আছে। এই কাহিনীর ভিতর দিয়ে লেখক কালকূট একটা স্বপ্নময় জগতের সৃষ্টি করেছেন, তার মন চলে গেছে বাদশা সেদিন কী খাবার খেয়েছিলেন? 'তাহলে নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণেরা সেই অস্পৃশ্য দলিল হাত পেতে নিয়েছিলেন কেমন করে? জাত যায়নি?' *(পৃ: ৩৪১, ঐ)* তিনি আরও একটি কাহিনীর কথা স্মরণ করেছেন, ঐতিহাসিক কিনা বলতে পারেন নি, তবে বইয়ে পড়েছেন। নবাব খান জাহান খাঁ-এর দরবারে নাকি দুই ব্রাহ্মণ কাজ করতেন। নবাব তাদের নিষিদ্ধ মাংস খেতে বলাতে তাঁরা জিভ কেটে বলেছিলেন 'সে খাদ্য আমাদের স্পর্শ করতে নেই, এমন কি ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং। তাতেও পতিত হতে হয়। নবাব যেন মার্জনা করেন।' *(পৃ: ৩৪১, ঐ)* নবাব মুখে কিছু না বলে চালাকি করলেন। তাঁদের যাওয়ার পথে নিষিদ্ধ মাংস রান্নার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই রান্নার খোশবুতে আকৃষ্ট হয়ে নবাবের সঙ্গে দেখতে গেলেন কি রান্না হচ্ছে। তাঁদেরই কথার সূত্র ধরে নবাব তাদের প্যাঁচে ফেললেন, তারা পতিত হয়ে গেল। কালকূট বলেছেন এইভাবেই নাকি পীরালী ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হয়েছিল।

বড়কর্তা জানিয়েছিলেন 'বাদশা'র কাছ থেকে তারা রাজা উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁদের বাড়ীঘর সব মাটির দেওয়াল খড়ের চাল। নতুন পাকা রাজবাড়ি হওয়ার পর তা ভেঙে পড়ে অনেক লোকজন মারা গিয়েছিল, তাই তারা আর পাাক বাড়ি করেনি। পূজার নাটমন্দির সব পাকা। 'মলুটি হল মন্দিরের দেশ। যত ঘর, তত মন্দির। তার চেয়ে বেশী। পাকা মন্দির, কোটি কোটি ইঁট আছে মলুটিতে। আর হাজার হাজার ইঁটে মূর্তি ফুল আঁকা আছে।' *(পৃ: ৩৪২, ঐ)* কলকলিয়ে যাওয়া জলাশয়টিকে বড়কর্তা বললেন যে, এটি হল কাঁদর। মলুটির লোকেরা সতীঘাটও চলে। সতীঘাটের কাহিনীতে তিনি বললেন রাজা রাখড়চন্দ্র সংসার ত্যাগ করে পুরীতে গিয়ে বাস করতে চাইলে রানী তার যাওয়ার আগের দিন, পূর্ণিমাতে সজ্ঞানে তুলসীতলায় দেহ রেখেছিলেন। এই কাঁদরের ধারে তাঁকে দাহ করা হয়েছিল তাই 'সতীঘাট'।

কালকূট মলুটিতে ঢুকতেই ঢুকতেই মলুটির আত্মাস্মৃতি যেন তাঁকে গ্রাস করেছিল। কাঁদরে কৃষ্ণকালো বাউরি মেয়ে স্নান করছিল। সে রায়মশাইকে প্রণাম করে জানতে চেয়েছিল 'কুন্ বাড়ির জামাই গ'? রায়মশাই 'বড় ছেল্যার বন্ধু' বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। ওর কুচকুচে কালো শরীরের গড়ন দেখে তাঁর মনে হয়েছিল 'ছাতিমতলার নন্দলালের পুরাণের ছবিতে যেমন মহেশানি উমাকে দেখেছিলাম, এ যেন তেমনি গড়ন। কিন্তু বাউরি মেয়ে তো আর আর্যকন্যা নয়। তবে অমন ঋজু অথচ নম্রতার ঔদ্ধত্যে মাখমাখি গড়ন পেয়েছিল কোথা থেকে।' *(পৃ: ৩৪৩, ঐ)* রাজবাড়ি আসার পর বড়কর্তার ছোটভাই উষ্ণ অভ্যর্থনা করলেন। তাঁকে উপরের মাটির কোঠাঘরে পাঠিয়ে দিলেন। উপরের জানলা দিয়ে দেখতে পেলেন একটি কুড়ি বাইশ বছরের ছেলে পনের-ষোল বছরের একটি মেয়ের আঁচল ধরে টেনে আসতে বলছে। মেয়েটি তবে রে বলেই ঠাস করে এক থাপ্পড় মেরে দৌড়ে পালিয়ে গেল। তিনি ভাবছেন রূপকথা দেশে এ কী সাংঘাতিক দৃশ্য। ঐ বাড়ীর আশ্রিতা আত্মীয়া তার দেখভালের ব্যবস্থা করেছিল।

মলুটি গ্রামটিকে ঘুরে দেখতে গিয়ে মলুটি মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অনেক মন্দির। 'দেবীর স্বামী মহাদেব পাশে পাশে আপনাকে ছড়িয়েছিলেন। ইঁটের গায়ে সেই সব মহাকাব্যপাঠ। বনস্পতির নিবিড় ছায়ায় পাখিডাকা কুক্-কুক্ পিক্ পিক্ কিচিরমিচির রবের মধ্যে মলুটির নিশি ঘোরে আত্মহারা হয়েছিলাম।' মৌলীক্ষার মন্দিরবেদীতে বসে সাল-তারিখের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বসে আমার প্রথম দেখা রাঢ়ের গ্রাম মলুটির দিকে তাকিয়েছিলাম। যেন এক কচ্ছপের পিঠে এক জনপদ। উত্তরে কাঁদরের উৎরাই, দক্ষিণে নদীর ঢল। পশ্চিমে পাহাড়, পুবে নিচে তরতরিয়ে ছুটে যাওয়া ভূমি।' *(পৃ: ৩৪৮, ঐ)* সংবিৎ ফিরেছিল একটি গলার আওয়াজে 'অ্যাই যে, একলাটি বস্যা আছেন দেখছি।' *(পৃ: ৩৪৮, ঐ)* চমকে তাকাতেই দেখলেন, ধনু সে-ই থাপ্পড় খাওয়া ছেলেটি মুখে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধনুর সঙ্গে কথা বলে

বুঝেছিলেন একটু বখাটে, এঁচোড়ে পাকা অথচ মনটা ভালো। সবার কাছে সদর্পে ঘোষণা করেছিল 'ওই তিপুকেই বিয়ে করবে'। কালকূট ফেরার সময় বড়কর্তাদের জামাইমশাই-এর বাড়ীতে গিয়েছিলেন। ওখানে চাটুজ্যে মশাই পুরনো দিনের রাজবংশের বীরত্বের কথা, অনেক অলৌকিক কথা বলেছিলেন। আফশোষ করছিলেন 'কোথায় গেলেন বসন্ত মুখুজ্জে, আর কোথায় এসে ঠেকেছে আজকের মলুটি।' *(পৃ: ৩৫২, ঐ)* বসন্ত মুখুজ্জে সেই ব্রাহ্মণের গরু চরানো ছেলে। দ্বিতীয়বার দীক্ষা নিয়েছিলেন বলে তার আঠারো বছর বয়সে প্রথম গুরুর অভিশাপে মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর ছেলে রামসার বীরত্বের কথা বলেছিলেন। বাদশার বিরোধিতা করে তাঁর রাগের কারণ হয়েছিলেন। পরে বাদশার প্রিয় এক ফকির ধরে সেই ক্রোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন। তারপর থেকে রামসা শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সুষি ডাকতে এসেছিল, তাই রাজবংশের অলৌকিক কাহিনী জানায় ছেদ পড়ে যায়।

অনেক রাতে ঢাকের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সবাই 'বলি'র নেশায় মেতেছে, কালকূট বলেছেন, 'যেন চতুর্দশীর অমানিশা তখনো শেষ হয়নি। ঢাকের বাজনায়, রক্তে, নৃত্যে, উল্লাসে, সময় সেখানে বাঁধা পড়েছিল। ভদ্রাভদ্র, সকলের এক দশা। বড় রায় ছোট রায়, সবাই উল্লাসের ঘোরে। তবু তার মধ্যেই পুছাপুছি কাজকর্ম সবই চলছিল।' *(পৃ: ৩৬৩, ঐ)* নাটমন্দিরের বাইরে বেরিয়ে দেখেছেন মেলা বসে গিয়েছে। সকলে একই অদ্ভুত উদ্দীপনা ও আনন্দে মেতেছে। 'পা থেকে মাথা পর্যন্ত এমনি যখন হিলহিলানো, তখন দেখ পদক্ষেপের গোনা-গাঁথা মাপ। শরীরে তিন মোচড়ে তিন ঢেউ, পায়ে পায়ে তিন ধাপ এগনো আর পিছনো, পুরুষদেরও তাই। মাদল বলো, বাঁশী বলো, রসের ধারায় মত্ত বলো পদক্ষেপে ত্রুটি ছিল না। যেন মুখোমুখি নাগ-নাগিনী পেছিয়ে যায়, এগিয়ে আসে।' *(পৃ: ৩৬৬, ঐ)* সেই মাতন কালকূটের হৃদয়েও লেগেছে। 'মলুটির নিশিডাকের শেষ ঘোর আমার বাকী ছিল। মৌলীক্ষার মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল, আমি দুলছি। নাচের তালে তালে আমি দুলছি, মাঠ দুলছে, আকাশ দুলছে।' *(পৃ: ৩৬৬, ঐ)*

পরদিন প্রতিমার বিদায়ের পালা। তিনি বলেছেন নির্জনের ব্যথা কী সেটা তিনি জানেন না তবে বুঝেছেন উৎসব শেষ হতে চলেছে। বড়কর্তা বলেছিলেন 'এইটুকুই বাবা, আর কিছু না। ব্যাস্, শেষ হয়ে গেল। এই একটা দিন সারা বছরের মধ্যে। কী দিয়েই বা কী হয়, কিছু কী আর আছে আমাদের। আচ্ছা বাবা, দেখ, দেখ। এইবার বিসর্জন ... মৌলীক্ষার মাঠে চলো।' *(পৃ: ৩৬৫, ঐ)* কালকূটের মনে হয়েছে কথা বলতে বলতে তার গলাটা যেন বুজে আসছিল। চালচিত্র প্রতিমাসহ থর থর কাঁপছিল। কালকূট সবকিছু চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। সুষি জানিয়েছিল যে মেয়েরা বিসর্জনে যায় না, তাই সে যাবে না। বলেছিল বড় মাতালের ভিড়, কখনো কখনো মারামারিও লেগে যায়। আরও কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারে না। বিসর্জনের ঘাটে একটা

আধটা মশালের আলোয় দেখেছিলেন সাঁওতালরা নাচছে। তাদের নাচের ছন্দে তার শরীরে মনে দোলা লেগেছে। তিনি বলেছেন 'দেখেছিলাম, যেন মৌলীক্ষার মন্দিরের গায়ে পুরাণের কুশীলবেরাও নাচের তালে তালে দুলছে। নাচের তালে তালে সুঠাম দেহের নাচ। উদ্ধত বুকের কম্প, গর্বিত কটির ঝম্প, ব্যাকুল বাসনার আর্তি, সবে মিলে নাচ নাচ নাচ।' *(পৃ: ৩৬৬, ঐ)* তিনি দেখেছিলেন প্রকৃতি নিরাবরণ। 'মানব সন্তান সেখানে মুখ দিয়ে প্রথম অমৃতপানে পৃথিবীতে চিৎকার করেছিল, সেই অমৃতভাণ্ড স্তন মুক্ত আকাশের নিচে। সৃষ্টির উৎসমুখ সকল উন্মুক্ত, মৃত্তিকার মত, মৃত্তিকার মুখোমুখি। পুরুষও তাই। বস্ত্র সে ছেড়ে ফেলেছিল। সৃষ্টির প্রক্রিয়া আবেগে প্রকৃতির মুখে তার ঘন বর্ষণের ধারায় গভীর চুম্বন। সৃষ্টির কারণে তার ধরিত্রীর বুকে কৃষিকাজ। যেন মানুষের সুখের শ্রম।

ছায়া ছায়া আঁধারে দেখেছিলাম, নগ্ন প্রকৃতির বুকে নগ্ন মানব-মানবী। লীলা করে দুহুঁ, দোঁহা কুহরে সীৎকারে। হাসিতে, ঝঙ্কারে, আকর্ষণে, আলিঙ্গনে। এক না, একাধিক, শতেক যুগলে। রূপে না, অরূপে। যা চোখের সীমায় শুধু থাকেনি, দৃষ্টির ওপারের অসীমে, বিস্ময় শিহরণ ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল অচেতন চেতনার ঘোরে। রূপে যা অবিশ্বাস্য বলে জেনেছিলাম, অরূপে তা-ই বিশ্বাস্য হয়ে জেগে উঠেছিল। মৌলীক্ষার মাঠের আঁধারে সৃষ্টির নগ্ন খেলা চলেছিল। মনে হয়নি, প্রার্থনা ছিল, তা-ই আত্মদান। যেন যে যাকে চেয়েছে, তাকে নিয়ে সেই তার উৎসব।' *(পৃ: ৩৬৬, ঐ)* এই নিশি ঘোর তার কতক্ষণে কেটেছিল তা তিনি জানেন না। বড়রায় তাঁকে খুঁজে বের করেছিলেন। অন্ধকারে মৌলীক্ষার মাঠ তখনো যে কী এক ঢেউয়ে দুলছিল তখনও। তিনি কাউকেই কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি। তার ভিতরটাই এমন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল যে বড়রায় তখন তাঁর হাত ছাড়েন নি। একেবারে বাড়ীতে এসে সুষিকে আলো নিয়ে উপরের ঘরে পৌঁছে দিতে বলেছিলেন।

ট্রেনে যেতে যেতে কালকূট মনে মনে অতীতে চলে গিয়েছিলেন। উন্মুক্ত প্রকৃতিকে গণমিলনের কৃষিকাজ দেখেছিলেন আধো-আলো আধো- অন্ধকার, পুরো কাহিনী বলতে গিয়ে অনেক উপকাহিনী বলে গিয়েছিলেন। ইতিহাস অলৌকিত্ব ও বাস্তবতা মিলে এক অদ্ভুত মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন। মানবমানবীর গণমিলনের উৎসবকে তিনি বলেছেন 'ধরিত্রী উর্বরা হোক, সেই তোমার পূজা। পূজার আচার অনুষ্ঠান, যা কিছু সকলই সৃষ্টির ক্রিয়ায়। যে ক্রিয়া বৃষ্টিধারার অনুকরণে ক্রিয়ায়। যে-ক্রিয়া বৃষ্টিধারার অনুকরণে বীজবপনের ভঙ্গিতে, মৃত্তিকার গভীর স্তরে প্রবেশের অক্লান্ত আনন্দ, শ্রমের প্রক্রিয়ায়। সে-ই তার আদিম কামনা, ধরিত্রী তুমি গর্ভবতী হও, শস্য দাও। যে মতো তোমার ক্রিয়া, সেই মতো আমার অনুষ্ঠান। হে মা, সেই অনুষ্ঠানে আমি সন্তান উৎপাদন করি।' *(পৃ: ৩৬৬, ঐ)* কিলিনারের ডাকে তাঁর সেই আবেশ কেটে গেল।

শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা দেখার নিমিত্ত লেখক কালকূট বোলপুর স্টেশনে গাড়ি থেকে নামলেন। সেখান থেকে রেলের ক্লিনার অতুলদাসের সহায়তায় গাড়ি করে তাঁর বন্ধুর বাড়িতে

এলেন। লেখকের বন্ধু একজন শান্তিনিকেতনের কর্মী। কিন্তু সে বাড়িটিতে লেখক একমাত্র অতিথি ছিলেন না, বাড়িটা অন্যান্য যাত্রীতে ভরপুর ছিল। শুধু বাইরের লোকেরাই এসেছেন এমনটি নয়, আশ্রমের দীক্ষান্তে শিক্ষান্তে স্নাতকোত্তর ছেলেমেয়েরা যাঁরা বিদায় নেবেন তাঁদেরও কেউ কেউ এসেছেন লেখকের বন্ধু আর বন্ধু পত্নীর সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুবাদে, প্রেম প্রীতি স্নেহ ভালোবাসার কারণে। লেখক কালকূট পৌষমেলা উপলক্ষে বন্ধুর বাড়িতে এসেছেন ৬ই পৌষ আর পরের দিন ৭ তারিখ, পৌষ মেলা। বেলা তখনও শেষ হয়নি কালকূট তাঁর বন্ধুর সাথে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি বিকালের সোনালী সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন এইভাবে, শান্তিনিকেতনের শীতের বিকালের সোনালী আলোতে কি যেন মিশে আছে যা তার ব্যাখ্যাতীত, আলোতে এমন রহস্য আছে যা কিনা তিনি আর দেখেন নি। তিনি ধরতে পারছেন না যে, মাটিতে আকাশের প্রতিবিম্ব পড়েছে না আকাশে মাটির প্রতিম্বি পড়েছে। সবকিছুই যেন সোনায় মাখানো। লাল হয়ে আসা শালের পাতায় পাতায়, শুকিয়ে আসা আমের পাতায়, জাম, আমলকী, স্বর্ণচাঁপার পাতায় পাতায় সোনালী আলোর ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। লেখক এই আলোকে একেবারে সোনালী বলতে চান না, এ যেন সোনায় রাঙা, রাঙা ছায়া। এই হল ছাতিমতলার বিকাল। আরও ভালোভাবে বলা যায় আমবাগান, তারপরে গেলেন ছাতিমতলায়, সেখানে পাথরের বেদী পাতা আছে। ধ্যানী যেখানে আসন পেতেছিলেন, মন্ত্রের বাণী লেখা আছে সে আসনের গায়ে। দুই বৃদ্ধ ছাতিম গাছ, যাদের ঘিরে পাকা আসন পাতা, সেখান থেকে শান্তিনিকেতনের গুরু, আরো অনেক কিছু। এরপর তাঁরা চলে এলেন সেই পুরানো দোতলাবাড়ির সামনে, তপোবনের সেই প্রথম কুটির, ঋষির নিবাসস্থল আর লাল উঠোনের মাঝখানে শিল্পীর বিচিত্র ভাস্কর্য। উত্তর দিকে রয়েছে লাল কাঁকর ছড়ানো রাস্তার দু'পাশে গাছ। আমগাছের নীচু ডালে ময়ূরকে দেখলেন। লেখক বুঝতে পারলেন, আশ্রমের সীমানায় ঢোকার পর প্রথম যে ধ্বনিটি শুনেছিলেন, সেটি কোথা থেকে বেজেছিল, সেটি এই ময়ূরটির কাজ।

লেখক কালকূট লিখেছেন, ''মরমীয়ার প্রাণে কবে 'বলাকা'-র পাখা মেলেছিল, 'ফাল্গুনী'-র ছন্দে বেজেছিল দোলা, তখন আর এক স্বপ্ন কর্মমতের সাধনায় রূপ নিতে চেয়েছিল, তার নাম বিশ্বভারতী। রূপ নিতে চায়নি কেবল, সৃষ্টিঘরের ঘণ্টায় তখন যুগের এক নতুন তাল বেজে উঠেছিল। রূপ পেতে চলেছিল। আর অরূপ ঝরার দুই প্রবাহে মরমীয়া যেন ভেসে চলেছিলেন, যে প্রবাহের এক নাম মানুষ, আর এক নাম ঈশ্বর। টান লেগেছিল যেন দুই স্রোতের ধারায়। সেই দুয়েতে কোথায় যে এক বাঁধাবাঁধির খেলা, চাওয়া-পাওয়া, ভালবাসাবাসি, প্রেম পীরিতি, ছোঁয়াছুঁয়ির লীলা, পারাপারের সেই সাঁকোটাই নানা রূপে দেখেছিলেন তিনি।'' *(পৃ: ৩৭০, ঐ)* লেখকের ভাবনায় সেই সাঁকোর নাম হল প্রকৃতি আর তাঁর ঈশ্বর হল মানুষ। লেখক কালকূট বলেছেন,

"মরমীয়ার সাধ, তিনি যাবেন মহাসাগরে। যেখানে সকলের মিলে মিলনলীলা। এইখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় রয়েছি সেই মহাসাগরের এক উপকূলে। শান্তিনিকেতনে সেই বিশ্বভারতের মিলমিশের মেলা। এখানে সকল ভুবন ভবনের নামে, কানে কানে। গাঁয়ের নামের স্মৃতিতে।" *(পৃ: ৩৭০, ঐ)* লেখক কালকূট তাঁর বন্ধুর সাথে গিয়ে দেখেছিলেন, উত্তরায়ণ গৃহ। তার উত্তরে শ্যামলী। উত্তরায়ণের পিছনের বাগানে ছিল গাছের ডালে নানান কলাকৌশলের কারুমিতি। নানা জাতের, নানারকম গাছ। ছোট জলাশয়, তাকে ঘিরে বিচিত্র বীথিত কুঞ্জ রয়েছে। তার পাশে রয়েছে ভুবন, বিচিত্রা। বন্ধুর কথা শুনে লেখক বুঝতে পারলেন যে এ কেবল বিচিত্রা না, রবীন্দ্র বিচিত্রা। লেখক কালকূট গুণীজনদেরও দর্শন করলেন— নায়ক, চিত্রকর, ভাস্কর, শিক্ষক, সাহিত্যিক। তিনি যত ঘরে গেলেন সব ঘরেই অতিথির ভিড়, সব ঘরেতেই মেলা। অবশেষে আকাঙ্ক্ষিত দিনটি এল ৭ই পৌষ মেলার দিন। লেখক কালকূট নয়ন ভরে সবকিছু দেখার জন্যে সকাল, সকাল ছুটলেন। সকালবেলায় প্রথম শুরু হয় ছাতিমতলায়। ছাতিমের ছায়াতলে যে বেদী রয়েছে সেখান থেকেই উচ্চারিত হয় স্তোত্র। গাম্ভীর্যপূর্ণ সুর। স্তোত্র শেষ হবার পর উপাসনার বাণী উচ্চারণ করলেন আচার্য। একটু নিচে বড় বেদীতে আসন নিয়েছেন শিষ্য-শিষ্যারা সহ সঙ্গীত ভবনের গুণীজনেরা। লাল কুচো পাথর ছড়ানো ভুঁয়ের আসন নিয়েছেন অতিথিরা, আশ্রমিক সংঘের বড় ছোট নরনারী, বালক-বালিকা এবং আমার মত সব, যারা ছড়িয়ে আছে ঘিরে। উপাসনার পর সমবেত গান হল। লেখক বন্ধুর কাছে জানতে পেলেন যে, এই অনুষ্ঠান আগে উপাসনা-মন্দিরে হত কিন্তু ক্রমে মানুষের ভিড়ের জন্য অনুষ্ঠান এসেছে গাছের তলায়, মাঠের বিস্তৃতিতে। তিনি আরও জেনেছিলেন, আগে মেলা বসত পূর্ব আর দক্ষিণ পল্লীর মাঠে, মেলা বসত উত্তরায়ণের পুব গাঁয়ের মাঠে। গানের শেষে লেখক গেলেন বিচিত্রাতে। সেখানে মরমীয়ার নানা লীলা এবং নানারকম খেলার চিহ্ন এখানে। প্রিয়জনদের দেওয়া স্মৃতি-উপহার, নানান জিনিস, পদক, পাণ্ডুলিপি, চিত্র, দেশ-বিদেশের দিগ্বিজয়ের অনেক ছবি, তার মধ্যে যেখানে তিনি ঘনিষ্ঠরূপে সেই সমস্ত পারিবারিক ছবি। যার ভিতর দিয়ে দর্শকদের চোখে আর মনে গভীর বিস্ময়, পরম কৌতূহল জাগে। কালকূট ভাবের সাগরে ডুবে গেছেন, তাঁর মনে হয়েছে "হয়তো আগেও অনেক দেখেছি, আবার দেখি আর বিস্ময় আর কৌতূহলে এই রূপেতে সেই অরূপ ছিল, লক্ষ্যেতে আলেখ। দেহরূপের এই খাঁচাতেই সেই অচিন পাখির যাওয়া আসা ছিল। যে পাখির নাম প্রাণপাখি না, কেবল অচিন পাখি। যে পাখি আলেখেতে ঝলক দেয়, তার নাম সাধকের সাধন, যার প্রসাদ নিয়ে ফিরি আমরা, নানান উপাচারে, চারু কারু একাকারে। আমি তাঁর সাধনে সাধতে চেয়েছি। আমার মতো এই জগতের অনেকে চেয়েছে। যারা চেয়েছে, তারা সবাই আমার মতন এমনি করে চেয়ে থাকবে মরমীয়ার দিকে, যাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এমনি পরম কৌতূহলে আর বিস্ময়ে।" *(পৃ: ৩৭২, ঐ)*

বিচিত্রা থেকে বেরিয়ে এবার মেলা দেখা পালা। লেখকের বন্ধু বাড়ী চলে যাওয়ায় এবার তিনি একা। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন — এই মেলাতে চারিদিকে শহুরে সাজগোজের ভিড়। নরনারী নানা সাজে ঘোরাফেরা করছে। এ মেলাতে এমন পসরা সাজিয়ে বসা পসারী পসারিণীদের বা কে কোথায় দেখেছে। আশ্রমে শিক্ষা করা যুবক-যুবতীরা দোকান খুলে বসেছে। এছাড়া নানা জেলার, নানা রাজ্যের বিচিত্র সব জিনিসের দোকান বসেছে। মেলা দেখার জন্যে ভারতের নানা রাজ্যের নানা ভাষাভাষি মানুষের আগমন ঘটেছে। এমনকি ভারতের বাইরে সাতসমুদ্রের ওপারের নরনারীও মেলায় এসেছে। গোরা-গৌরীদেরও মেলার জিনিস পত্রের উপর আকর্ষণ কম নয় তারা পসরার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কেনার জন্যে এবং কিনছেও। মেলাতে এক সাঁওতাল শিল্পী চোখ ধাঁধানো রূপোলী ধাতুর গহনা বিক্রি করছে। এছাড়া মেলাতে পুঁতির মালা রঙ্‌বাহারী পাথর দেওয়া অলংকারও বিক্রি হচ্ছে। মেলাতে যেমন ভুঁয়ে বসা দোকানদার রয়েছে তেমন চোখ ঝলকানো দোকানও রয়েছে। মেলাতে নানারকম খাবারের দোকানও রয়েছে। লেখক কালকূট মেলার দক্ষিণে এগোতে লাগলেন, হঠাৎ বাজনার শব্দ তাঁর কানে ভেসে এল, তারপরেই তিনি শুনতে পেলেন —

'এমন মানব জনম আর কী হবে।
অ-ভোলা মন, মন না কর,
ত্বরায় কর, এই ভবে।' ... *(পৃ: ৩৭৩, ঐ)*

দরাজ গলার কণ্ঠস্বর শুনে তাঁর মনে হল বুঝি কতকালের হারিয়ে যাওয়া চেনাকে খুঁজে পেয়েছেন। লেখক দেখলেন সমুখে একটা খড়ের চালে ঢাকা অনেক বড় দাওয়া, সেখানে এমন একজন মানুষ রয়েছে যার পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, কোমরে বাঁধা বাঁয়া। ডান হাতে তার একতারা, বাঁ হাতের কব্‌জিতে বাঁধা মুঙুর। বাঁয়াতে তাল পড়লেই, ঘুঙুরে ঠিনঠিনিয়ে যাচ্ছে। লেখক বুঝতে পারলেন এরই কণ্ঠস্বর তার কানে ভেসে এসেছে। মানুষটির চোখ দুটি ডাগর, নাক টিকালো, শ্যামবর্ণ, রোগাটে চেহারা। মুখে তার অল্প অল্প পাতলা দাড়ি এবং গোঁফটাও সেইরকমই। বোঝাই যাচ্ছে গেরুয়াবসনধারী এই বিবাগী নবীন। নবীনকে ঘিরে আরো কয়েকজন। পোশাকে সবার এক, চেহারায় আলাদা। তাদের মধ্যে কেউ বাজায় দোতারা, কেউ বাজায় ডারা ডুপ্‌কি খঞ্জনি। কেবল একজন দিল একটু অন্যরকম একটি মেয়ে প্রেমজুরিতে আঙুল গলিয়ে ঝনক ঝনক বাজাচ্ছে। মেয়েটি বিবাহিতা, কুড়ি-বাইশ বছরের, সে হল শ্যামবর্ণা, তার চোখ দুটি এত সুন্দর যে, হরিণীকেও হার মানায়। তার পরনে লালপাড় শাড়ি। লেখকের বাউল মন বাউল গানের সাথে একাত্ব হয়ে যাচ্ছে, লেখক যে এদেরকে চেনেন তাও নয়, তবুও তাঁর সেই এক গানের কলির মতো মনে হয়, 'তুমি কে, পাগল পারা হে। বহুদিনের চেনা বলে মনে হতেছে।' *(পৃ: ৩৭৩, ঐ)*

কেবল যে এই দলটিতে নবীন বিভাগীরা রয়েছে তা নয় বয়স্ক বিভাগীরাও আছে। রাঢ়ের বাউলদের চিনতে লেখকের কোন অসুবিধা হয় না, তিনি দেখেছেন বয়স্ক বাউলদের সাথে দু'একজন বাউলানীও থাকে।

গান শোনার জন্যে শ্রোতার সংখ্যাও ছিল অনেক। লেখক কালকূট নিচে দাঁড়িয়ে গান শুনছিলেন। হঠাৎ একজন সৌম্য প্রৌঢ় লেখককে আসরে আসতে বললেন। লেখক তাঁকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু ভদ্রলোক এমন সুন্দর কথা বলেছিলেন যা শুনলে মানুষের মনে অন্যরকম একটা দোলা লাগে, তিনি লেখককে জানিয়েছিলেন যে না চিনলে বুঝি কাউকে ডেকে নেওয়া যায় না, আরও বলেছিলেন একজন রসিক আর একজন রসিককে ডাকে। এই প্রৌঢ় মানুষ চিনতে ভুল করেননি। লেখক কালকূট এই প্রৌঢ়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হল এইরূপ— তাঁর মাথার চুল ধূসর, উলটা টানার বড় বড় চুলে উস্‌কো খুস্‌কো ভাব, দেখতে বিবাগী, বিবাগী লাগে। তার গায়ে একটি মোটা পশমের জামা, গায়ে কম্বলের মতো একটি চাদর। গায়ের রং রোদে পোড়া গৌর, চোখে মুখে হাসির চেয়ে ভিতরে রসের ছলছলানি বেশি বলে মনে হয়, তার চেয়েও বেশি যেন বুদ্ধির ঝিলিক। গোঁফ দাড়ি নেই, মুখে লম্বা চুরুট। এই ব্যক্তির বাউলদের সাথে ওঠা, বসা। লেখক জানতে পারে যে এই ব্যক্তির নাম অচিনবাবু। লেখক মনে মনে চিন্তা করেন ছাতিমতলার মেলাতে এই মানুষটি আসলে কে? বুড়োগোপী বাউলকে দাদা ও তার স্ত্রী রাধাকে দিদি বলে। বাউলদের দাদা দিদি পাতিয়েছে। আশিবাবুর সাথে লেখককে দেখে গোপী বাউল তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল লেখক তাঁর ছেলে কিনা। অচিনবাবু অবিবাহিত ছিল গোপী ভুলে গিয়েছিল অচিনবাবু বললেন, 'বে-থা নাই মানে কিন্তু 'নাই' না গ দাদা।' *(পৃ: ৩৭৪, ঐ)* বুড়ো গোপী বাউল ঘাড় দুলিয়ে বলে, 'নাই' এতে 'হ্যাঁ' বিরাজ করে, যেমন কামেতে প্রেম, অমাবস্যায় পুন্নিমা, টানাতে উজান।' *(পৃ: ৩৭৪, ঐ)* অচিনবাবু এটা শুনে গোপীর বুড়ার পায়ের কাছে হাত বাড়িয়ে তার পায়ের ধূলা নিতে যায়। লেখক দেখছেন অচিনবাবুকে, অচিনবাবুর বাউলের মতো আলখাল্লা নেই, গেরুয়া নেই, পাগড়ি নেই, তার কথাবার্তা, সাজগোজ, হাতের চুরুট দেখে মনে হয় অন্য ঘরানার মানুষ। গোপী বাউলের মতো মানুষদের সাথে তাঁর এত বোঝাবুঝি কেমন করে, এ যেন ভাবের এক ঘরেতেই বসত। শুধু তাই না, চোখেমুখে এমন মুগ্ধতা, যেন ভাবের ঘোরে দোল-দোলানা। কেন যেন লেখকের মনে হয়, 'এ মুখেও কাঁদন-ভরা হাসির ছিটা লাগানো। নাকি আমার চোখের ধন্দ কে জানে!' *(পৃ: ৩৭৪, ঐ)* লেখক কালকূটের কাছে অচিন নামটা অদ্ভুত লেগেছিল। অবশেষে লেখক বলেই ফেলেছিলেন অচিনবাবুকে যে তাঁর নামটা এমন অদ্ভুত কেন? অচিনবাবু জানিয়েছিল যে তার আসল নাম অচিন্ত্য মজুমদার, যখন থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা শুরু করেছিলেন তখন থেকে অচিন হয়ে গেছে। তিনি সরকারী চাকরি করেন। লখনউ থেকে এসেছে।

এই সময়টাতে এ জায়গায় না আসলে তিনি থাকতে পারেন না। তিনি আরও জানান আসলে তিনি আবার প্রথম জীবনে ফিরে আসেন একসময় জীবন যৌবন দুই-ই ছিল, সেটা মনে করতেই এখানে আসা।

লেখক দেখেছেন, অচিনবাবু আর গোপী বাউল দুজনের একজন আর একজনের চোখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে যাতে বোঝা যায় এই চাউনির অর্থ আছে, কি অর্থ লেখক বুঝতে পারেন না। লেখক কালকূট গোকুল, বিন্দু, সুজন এদের গান শুনেছিলেন। মোট কথা লেখক বেশ কয়েকজন বাউলের মাঝে এসে পড়েছিলেন। গোকুল বাউল গান ধরে। গোকুল গান করতে করতে নাচে সুরে সুরে। সুজন যে কিনা গোপী বাউলকে বাবা বলে ডাকে সেও দোতারা বাজিয়ে গোকুলের সঙ্গে নাচে, বিন্দু যার ডাগর কালো চোখ, সে দু'হাতে প্রেমজুরি বাজাল। বিন্দুর গলা শোনা গেল —

'অ ভোলা মন, প্রেম রতন ধন পাওয়ার আশে
তিবিনায় ঘাট বাঁধলাম কষে।' ... *(পৃ: ৩৭৮, ঐ)*

গোকুলও সেই গলাতে গলা মেলাল —

'কাম নদীর এক এক্কা এসে
হায় হায়, যায় ছাঁদন বাঁধন।
করি কেমন শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধন।' *(পৃ: ৩৭৮, ঐ)*

সুজন সুরে সুরে নাচছিল। তাকে দেখে লেখকের মনে হয়েছিল পেখম তোল ময়ূর। বিন্দু আবার সপ্তমের টানায় ধরে

'বলব কি সে প্রেমের কথা,
কাম হইল প্রেমের লতা' *(পৃ: ৩৭৮, ঐ)*

আবার গোকুল ধরে,

'কাম ছাড়া প্রেম যেথা সেথা
নাই রে আগমন।' *(পৃ: ৩৭৮, ঐ)*

লেখক কালকূট দেখেছেন যে, গায়ক-গায়িকা শুধু গান করে না, যেন এদের চোখে চোখে আর কিছু ভাষে। সেই ভাষাটা তিনি বুঝতে পারেন না। লেখক ভাবেন, গেরুয়া ছোপানো আলখাল্লা জড়ানো এই বাউল বৈরাগীরা এ কোন ধরনের কথা বলে 'কাম ছাড়া প্রেম যেথা সেথা নাই রে আগমন।' এরা এমন সুরে সুরে, হেসে হেসে স্পষ্ট করে, যেন কাম, কামনা, প্রেমের আর এক নাম। অধরা কথা তিনি ধরতে পারেন না, কেবল তানে, মানে লয়ে মজে, অবাক হয়ে শোনেন আর মনের মধ্যে কোথায় যেন, এক নাম না-জানা সুর বেজে যায়।

গোকুল, বিন্দু আরও গান গাইতে থাকে, সুজনও গান গেয়ে মাতিয়ে দেয়। এইভাবে পৌষ মেলায় বাউল গানের আসর জমে উঠেছিল, লেখক তা উপভোগ করছিলেন, কিন্তু বাউলদের নিমন্ত্রণ থেকে যাওয়ার কথা হলে আসর ভেঙ্গে যায়। বিন্দু যাবার আগে লেখকের দিকে তাকায়, তাঁর চোখের দিকে চেয়ে বলেছিল 'আমাদের গোঁসাইয়ের ভালো লেগেছে তা?' *(পৃ: ৩৮০, ঐ)* বিন্তুর ডাগর চোখের চাহনি আর গোঁসাই শব্দে লেখকেরও শ্রবণে একটু ঝলক লেগে গিয়েছিল। চোখে মুখে কতটা, তিনি নিজে দেখতে পাননি। এরপর অচিনবাবু লেখকের সাথে আলাপ করার সুযোগ পান, অচিনবাবু লেখকের পরিচয় জানতে পারেন। লেখকের পরিচয় পেয়ে অচিনবাবুর চোখে কৌতূহলের ঝিকিমিকি দেখা দেয়, তার সঙ্গে একটু বিস্ময়ের ঝিলিক। তিনি জানিয়েছিলেন, দূরে দাঁড়িয়ে গান শোনার লক্ষণ দেখেই তিনি বুঝেছিলেন রসিক রসিক ভাব। তিনি এও বললেন 'এখন তো দেখছি, বিন্দুর কথাই ঠিক, অ্যাঁ? খাঁটি গোঁসাই একেবারে।' *(পৃ: ৩৮১, ঐ)* অচিনবাবুর কাছে লেখক জানতে পারেন যে দক্ষিণে আসল মেলা বসেছে। লেখক দেখলেন ছাতিমতলায় সে মেলাটা নেই ভেবেছিলেন, তিনি দেখলেন এদিকে সেই মেলা। এখানে দেখা যাচ্ছে বাঙলা দেশের সেই চির-চেনা শিল্পীরা নিজেদের শিল্প সাজিয়ে বসেছে। কামার, কুমোর, ছুতোর এরা এসেছে বিক্রির আশায়। এ মেলার ক্রেতা-ক্রেতীও একটু অন্যরকম, গ্রাম্য মানুষ, ভিন্ন গৃহস্থী। এ মেলাই তো সেই মেলা, চিরদিনের মেলা। নাগরদোলা, বাজীকরদের খেলার তাঁবু, সার্কাসের পশু, আগুন জ্বালানো মেয়ে, একটা মানুষের তিনটা মাথা। এছাড়া চুড়ি, কপালের টিপ, ফুলেল তেল, পাথরের আঙটি, আলতা, সিঁদুর— এসবই মেলাতে পাওয়া যাচ্ছে। বেলা তিনটে বেজে গেছে, লেখক খাবার কথাই ভুলে গেল, তিনি চিন্তা করছেন যে, হয়ত তাঁর বন্ধুটি তার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতেও পারে।

লেখক কালকূটের ফেরা প্রয়োজন। লেখকের সাথে অচিনবাবুও ছিলেন। এগিয়ে যাবার জন্যে দু'পা বাড়িয়েও আর একজন তাঁর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। সে চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে তার অবাক মুখে হাসি ফুটি ফুটি করে। এ আর কেউ নয় লঞ্চের সহযাত্রী ঝিনি। ঝিনি লেখককে জানায় যে, সে লেখককে চিঠি দিয়েছিল কিন্তু কোন উত্তর পায়নি। ঝিনির সাথে আরো অনেকে ছিল। লেখক জানতে পারল ঝিনি ও তার দলবল দক্ষিণে পল্লীর একটি বাড়িতে উঠেছে। ঝিনির সঙ্গে লেখকের অনেক কথাবার্তা হয়েছিল। সে সময় তারা দু'জনেই ছিলেন। ঝিনি চলে যায়, মোড় বেঁকে যাবার আগে সে একবার ফিরে তাকিয়েছিল। তার হাসি দেখে লেখকের মনে হয়েছিল নীল আকাশে রোদের মতই। ঝিনির মুখে নীল আকাশে রোদের ঝলক দেখলেও লেখকের ভিতরটা ঝলকায়নি। কী ঘটে গেল কিছুই যেন বুঝতে পারেননি তিনি। কেবল তাঁর চোখের সামনে একটি মেয়ে, এখনো যেন পুরো চেনে না। যেন দূর কালের চেনা চেনা মনে হয়, তার স্বভাব থেকে

উপচে-পড়া কিছু আচরণ। আর কিছু কথার স'ম্যক উপলব্ধি এই মুহূর্তে লেখকের নেই।

কালকূট মেলা থেকে তাঁর বন্ধুর বাড়িতে ফিরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করলেন। বিশ্রাম নিতে গিয়ে একটু তন্দ্রার ঘোর লেগে যায়। তন্দ্রা ভাঙ্গার পর লেখক দেখলেন অন্ধকার হয়ে গেছে। লেখক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন। লেখক কালকূটের গন্তব্যস্থল ঐ বাউলগানের আসর। সেখানে পৌঁছে দেখেন গোপীদাস ভাঙ্গা, ভাঙ্গা গলায় গান গাইছে। হাতে শুধু একতারা —

'যে জন প্রেমের ভাব জানে না,
তার সঙ্গে কিসের লেনাদেনা।' *(পৃ: ৩৮৮, ঐ)*

গোপীদাস বাউলের গানটি শুনে কালকূটের মনে হয়েছিল যে, গানটা তিনি যেন কোথায় শুনেছেন, ভাবতে ভাবতেই তাঁর সামনে গাজীর মুখ ভেসে ওঠে। যে গাজীর সাথে পূর্বেই তাঁর পরিচয় হয়েছিল, যার সাথে তিনি পথে, ঘাটে ঘুরে বেরিয়েছেন, যে তাকে অনেক গান শুনিয়েছিল। গোপীদাস কালকূটকে দেখে ঘাড় দুলিয়ে ডাকে, চোখের ইশারা করে একদিকে। ইশারা লক্ষ্য করে কালকূট দেখেন, অচিনবাবু বসে আছেন তাঁর পাশে অলকা, যার অপর নাম ঝিনি চক্রবর্তী। ঝিনি তার গোটা দলটাকে নিয়েই অচিনবাবুকে ঘিরে বসে আছে। রাধা বৃদ্ধার প্রকৃতিটি গান ধরে, গোপীদাসও গান ধরল। অন্যদিকে আসরে গোকুলের পাশে বিন্দু, তার পাশে সুজন। কেউ বসে নেই গোপীদাসের গানের সঙ্গে গোকুল ডুগিতে আর ঘুঙুরে তাল দিচ্ছে, বিন্দু প্রেমজুরি বাজাচ্ছে। সুজনের দোতারার তারে তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। লেখক আসরে বসেছেন, বাউল গানের আসর মেতে উঠেছে। গান থামাতে আসর একটু আলগা হয়, ঝিনি চা খেতে যাবার কথা বলে, ঝিনি ও তার দলবল আগে, আমি ও অচিনবাবু পেছনে। মেলাতে নানা মানুষের নানা দিকে যাওয়া-আসা, কলকলানি।

কালকুটকে একসময় অচিনবাবু বলেছিলেন যে, কালকূট অহঙ্কারী আর মিথ্যুক। তিনি কালকূটের ঠিকানা নেবেন না আর চিঠিও দেবেন না। আর বলতে হল না, কালকূট বুঝে গেলেন, কোথা থেকে এই প্রসঙ্গ উঠেছে, চিঠির ব্যাপারে অচিনবাবু ঝিনির কাছ থেকেই সব শুনেছে। কালকূট ভাবলেন, ঝিনি আর অচিনবাবু এই দু'জনের মধ্যে এত কথাবার্তা কখন হল। কয়েক ঘণ্টার তফাতে তাঁর মানুষ আর তাঁর নেই। তিনিই পর, তিনি ঝিনিদের শরিক হয়ে গেছেন। বন্ধুর কালকূটের মনে পড়েছে যে, ঝিনির কান্নার কথাও তাঁর গোচরে এসেছে। সেই কারণেই অচিনবাবু বলেছেন যে, এমন মিষ্টি আর সহজ মেয়ে তিনি দেখেননি। লেখক ভাবলেন, এ দেখছি আমে-দুধে মাখামাখি আর আঁটি গড়াগড়ি যায়। কালকূট একবেলাতেই অচিনবাবুকে বুঝেছেন যে, ভাবের ইন্দ্রজাল অচিনবাবুর অচীন লীলাতেই রয়েছে। তিনি সহজেই সহজ ধরেন। ঝিনি কেবল সেই সহজে ধরা দিয়ে একজন আর একজনের ভাবের ভাবী হয়েছে।

লেখক কালকূট অচিনবাবুর ছেলেবেলার সাঁওতাল বন্ধুকে দেখলেন, তার নাম বরহম। অচিনবাবুর কাছ থেকে তিনি জানলেন, এককালে পৌষমেলায় বরহমরা অনেক বড় শরিক ছিল। মেলাটা ছিল বরহমদেরই অনেকখানি। অচিনদা বরহমদের আড্ডায় যেতে চান, সেইজন্যে সকলের কাছে বিদায় চাইবেন স্থির করলেন। ঝিনি অচিনদাকে জানায় যে তাঁর সঙ্গে তারাও যাবে। কালকূটও অচিনদাকে বলেছিল 'আমি গেলে আপনার অসুবিধে হবে?' *(পৃ: ৩৯৫, ঐ)* অচিনদা অবশ্য সম্মত হননি। কালকূট দেখলেন, হঠাৎ ঝিনি উঠে দাঁড়িয়েছে। কখন সহসা বায়ুকোণে মেঘ জমে গিয়েছে, এ যেন মন গরজনের আভাস, ঝঞ্ঝার ঝিকিমিকি বলে মনে হচ্ছে। ঝিনি বলল, 'না না, উনি কেন মিছিমিছি ওঁর অসুবিধে করে থাকবেন আমাদের কোন দরকার নেই ওকে।' *(পৃ: ৩৯৫, ঐ)* ঝিনি আবার বলেছিল 'বুঝতেই তো পারছেন অচিনদা, আমাদের সঙ্গে থাকতে ওঁর ভালো লাগছে না।' *(পৃ: ৩৯৫, ঐ)* কালকূটের কানে লেগে থাকে ঝিনির কথাগুলো। অচিনদার সঙ্গে লেখকের যাবার ইচ্ছে হয়েছিল, তাই তিনি বলেছিলেন। বরহমদের ভাবনা লেখক কালকূটের মাথায় ঘুরছিল। মনে কৌতূহলের ঝিকিমিকি, যাবেন তাদের আড্ডায়, আর কিছু তিনি ভাবেননি। কিন্তু একমাত্র কথায় ঝিনির মুখে যে তিনি মেঘ ডেকে এনেছেন, সেটা তার জানা ছিল না। পূর্বাভাসেও এমন বার্তা ছিল না যে, অচিনদাকে ছেড়ে তিনি অন্য দলে থাকবেন।

ছাতিমতলার মেলায়, এই জনারণ্যের মাঝখানে চলতে চলতে একটু না হেসে পারলেন না। এ হাসি যেন মন-টাটানো হাসি। কেন কালকূট ভুলে যান, কেবল তিনি অমৃত পান করে যাবেন। তাঁর কূলে কূলে কেবল অমৃত। তিক্ত রসের স্তোত্র কি শুধু কালকূটের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বহে যায়। নিজেকে না জেনে অলক্ষ্যে কখন তিনি পাত্র ভুলে নেন, অমৃতের আমেজে তা খেয়াল থাকে না। লেখক কালকূট ভাবেন অপমান তিনি গায়ে মাখবেন না। ঝিনির উপরে তাঁর রাগ আসে না, ঝিনিকে নিয়ে তার বৈরাগ্যের কথাই বা কী।

ঝিনিকে যে লেখক কালকূট বুঝতে পারেন না, সেটা নয়। ঝিনি যেহেতু বিদূষী সেইহেতু তাঁর একটু অবাক লাগে। তিনি ভাবেন, সংসার তার মনের অবাক দিয়ে বানানো নয়। তিনি জগতে যা অসম্ভব ভাবেন, জগতে তার সবই সম্ভব। অসম্ভব ভাবেন কেবল নিজের মনের ছক দিয়ে। অচিনদা চলেছেন, কালকূট ভাবছেন 'অচিনদা কি থামবেন না, একবার ফিরেও দেখবেন না, তাঁর পিছু ধাওয়ার হুকুম পালন হচ্ছে কি না! কাঁধ ঝুঁকিয়ে সেই যে চলেছেন আর থামবার নামটি নেই।' *(পৃ: ৩৯৬, ঐ)* অচিনদা হেঁটে চলেছেন, লেখক কালকূট তাঁর পেছন পেছন হেঁটে চলেছেন। অচিনবাবু একবারও পেছন ফিরে চাইলেন না। অবশেষে অচিনবাবু একটি রিকশা দেখে রিকশাওয়ালাকে কাছে আসতে বললেন। রিকশাওয়ালার নাম নরোত্তম। দেখা গেল উভয়ই উভয়ের পরিচিত। এইবার অচিনদা তাঁর লাল লাল চোখে, মুরন দিয়ে লেখক কালকূটের দিকে

তাকালেন। হাত তুলে কালকূটকে রিকশায় উঠতে বললেন। অচিনদার আদেশ পেয়ে তিনি রিকশায় উঠলেন। রিকশা ছুটে চলেছে, অচিনদা লেখকের সঙ্গে আর কোন কথা বললেন না। আলোর সীমানা পেরিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে রিকশা চলেছে। নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল 'যাবেন কুথা'? উত্তর এল 'বাঁশ ঝাড়ে।' নরোত্তম রিকশা দাঁড় করায়, এবার হাঁটতে হবে। নরোত্তম তার রিকশার বাতিটা সঙ্গে নিয়ে কালকূট ও অচিনদাকে পথ দেখিয়ে তাঁদের সঙ্গে হাঁটতে লাগল। অচিনদা কালকূটকে সাবধানে আসতে বললেন, কেননা রাস্তাটা কাঁকরে পাথরের ছিল। এরপর অচিনদা কালকূটের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, সে জেনেশুনে মেয়েটাকে কেন কষ্ট দিল। অচিনদা লেখককে এই কথাও বললেন, সে যেন শুধু শুধু মেয়েটাকে কষ্ট না দেয়।

অবশেষে বাঁশঝাড়ের ফাঁকে আলোর বিন্দু দেখা গেল। মানুষের অস্পষ্ট গলার আওয়াজও শোনা গেল। বাঁশঝাড়ের মাটি ঢিবির মত উঁচু। এরপর ঐ উঁচুতেই আরোহণ করা হল। উপরে উঠে গিয়ে কালকূট দেখলেন, উঠানের মত পরিষ্কার জায়গা, জায়গাটা বাঁশঝাড়ে ঘেরা। মাঝখানে লালমাটির পরিচ্ছন্ন বিস্তৃতি দেখা যায়। ঝাড় ঘেঁষে রয়েছে এক পাতার ঘর, এর সামনে রয়েছে কিছু হাঁড়ি কলসী, একে বলে কেঁড়ে। একটি টিমটিমে লণ্ঠন, আর একটি কেরোসিনের লণ্ঠন রয়েছে। মাঝখানে কাঠকুটোর স্বল্প আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। বাঁশঝাড়ের মধ্যে পানশালা লেখক এর আগে কোনদিন দেখেননি। সেখানে বরহমের দেখা পাওয়া গেল। শুন্ডি নামে একজন এই পানশালার মালিক। সেখানে ছিল যেন কষ্টিপাথরে কাটা কালো যুবতী। বরহমের কন্যা মাংরি। লেখক তার বর্ণনা করেছেন এইভাবে, 'এ যে কালোতে আলো, তা না। কালোতে আগুন। আগুন তার লাল ফুলফুল জামায়। যেথায় বুকের ঔদ্ধত্যকে সামনে দিয়ে বাঁক নিয়ে বসেছে মন্দিরে মূর্তির ভঙ্গিমায়। এক হাতে কলসীর গলা জড়িয়ে ধরে, যেন বড় আদরে তুলে নিয়েছে বাঁ উরতের ওপর। ডান পা ছড়ানো। চুলে বাঁধন আছে, তবু কপালের এক পাশে ভেঙে পড়েছে। লম্ফর লাল আলোয় মনে হয় টানা চোখে তরল আগুনের স্রোত বহে যায়। ডান হাতের ভাঁড়ে চুমুক দেয়, আর ফিক্ ফিক্ হাসে। এমন আসর আর কখনো দেখিনি।' *(পৃ: ৩৯৯, ঐ)* আসরে শরত, বরহমের বৌ আরও অনেকজন ছিল। অচিনদা লেবেল আঁটা দুটো মদের বোতল সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। সেটা ভাগাভাগি করে লেখক কালকূট আর রিকশাওয়ালা ছাড়া সবাই ভাগাভাগি করে খেল। প্রৌঢ় অচিনদাকে এই পরিবেশে এইভাবে দেখে লেখক কালকূট ভাবছেন 'কী আশ্চর্য, কোথায় এসে কোথায় বসে কী করছেন। এখনো এত ধকল সয়?' *(পৃ: ৪০০, ঐ)* এদিকে এই আসরে গান ও নাচ চলে। অচিনদা কালকূটকে তাঁর জীবনের এমন গল্প শোনালেন যেটা কিনা লেখকের মনে গভীর দাগ কেটে গেল। অচিনদা নীরজা নামে একটি মেয়েকে ভালোবাসতেন, নীরজাও অচিনদাকে খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ভালোবাসা নীরজার বাড়ির লোকজন বিশেষ করে

তার বাবা এদের জন্যে সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেনি। নীরজা অচিনদাকে একটি চিঠি দিয়েছিল যেটি পড়লে এইরূপ বোঝা যায় — অচিনদার বংশমর্যাদা তেমন নেই। আর্থিক দিক দিয়েও সে খুব একটা উঠতে পারবে বলে মনে হয় না। সে ভালো নয় যেহেতু সে প্রেম করে, নীরজার মধ্যে সে প্রেমের বিষ চুকিয়েছে। সে খারাপ। নীরজার এতবড় ক্ষতি তার বাড়ির অভিভাবকরা সহ্য করবেন কি করে। সবদিক বিবেচনা করে একটি ছেলের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির করেছেন। সবদিক থেকেই ঐ পাত্র অচিনদার থেকে বড়। কিন্তু বাহুবলেও কি ঐ পাত্র অচিনদার থেকে বড়?

অচিনদা কালকাতায় গেলেন, নীরজাদের বাড়ির আশেপাশে দু'দিন ধরে ঘোরাফেরা করেও নীরজার দেখা পেলেন না। অবশেষে অচিনদা নীরজাদের বাড়িতে ফোন করেছিলেন, অচিনদাকে নীরজাদের বাড়িতে যেতে বলা হয়েছিল, কিন্তু লাভ কিছু হয়নি ব্যথিত চিত্তে ফিরে এসেছিলেন লেখক কালকূটের মনে হয়েছিল, কেন যেন মনে হয় অচিনদা তাঁর কাছে এসেছেন আরো, তিনি অনেক বেশি চেনা আর অন্তরঙ্গ। বয়সের পার্থক্য কোন পার্থক্য নয়। এ যেন বহুদিনের এক চেনা বন্ধু তাঁর সামনে। আবার অচিনদা কালকূটকে বলেছিলেন যে বছর তেরো আগে তখন অচিনদা কলকাতায় পোস্টেড। একদিন মৃন্ময় চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি গাড়ি করে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিতে যান, সেই বাড়িতে গিয়ে নীরজাকে দেখেন। নীরজাই মৃন্ময় চৌধুরীর স্ত্রী। আবার দু'জনের সাক্ষাৎ। তারপর আসা-যাওয়া। এরপর চৌধুরী এলাহাবাদে বদলি হয়ে যায় আর অচিনদা লক্ষ্মৌতে। ছুটিতে অচিনদা যান এলাহাবাদে, নইলে ওরা আসে লক্ষ্মৌতে। এখন দুটো সংসারই নীরজা চালায়। অথবা বলা যেতে পারে তিনজনেরই একটা সংসার। নরোত্তমের রিকশা করেই ফিরেছিলেন লেখক কালকূট। অচিনদার কথাগুলো লেখককে ভাবিয়ে তুলেছিল। তিনি বলেন, 'আমি ভাবি, কোন্ নিয়তি, কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল এ কে মজুমদারকে। কে নিয়ে গিয়েছিল হে, অ-দেখার দেখায়। না পাওয়ার পাওয়ায়। অ-ধরার ধরায়। আজ অ-শেষের পালা সইতে পারা যায় না। শেষ করাও যায় কি? করতে গেলে টান লেগে যেখানটা ছিঁড়বে, সে-জ্বালা কি সইবে!' *(পৃ: ৪১২, ঐ)* পরের দিন সকালে কালকূট যখন মন্দিরে সীমায় তখন স্তোত্র, প্রার্থনা শেষে সমবেত গান বেজে উঠেছে। এরপর আমবাগানে সমাবর্তন উৎসব। গান বেজে উঠল 'আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের শান্তিনিকেতন।' আজ বর্তমান আর প্রাক্তন আশ্রমিকদের মধ্যে কোলাকুলির দিন। আজ কৃতীদের ডাকাডাকি, কৃতিত্বের ঘোষণার দিন। এখন কালকূটের লক্ষ্য বাউল সমাবেশ। আশ্রমের সীমানা পেরিয়ে রাস্তার ওপারে মেলায় পা দেবার আগেই পাশ থেকে লেখক ঝিনির গলা শুনলেন। ঝিনি বলল 'কোপাইয়ের ধারে যাবেন?' কালকূটের ঝিনির চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় 'কোথায় যেন এক সহায়হীন ব্যগ্র ব্যাকুলতা থমকে রয়েছে। কতটুকু জানি

ওকে কতটুকু বুঝি! তবু এই প্রথম দক্ষিণের স্তোত্র ভেঙ্গে রাঢ়ের ধূলায় দাঁড়িয়ে একটা যেন কষ্ট লাগা কাঁটা ফুটে যায়। আর হঠাৎ ওর বাবা-মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। যাঁদের স্নেহের মেয়েটি এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে আছে। বলি, 'চলুন যাই।' রিকশায় চেপে কালকূট ও ঝিনি কোপাইয়ের ধারে আসে। তাদের দু'জনের মধ্যে অনেক কথাবার্তা চলে। ঝিনি একসময় লেখককে জানায় যে সে বিধবা। যার সাথে তার বিয়ে হয়েছিল, সে ছিল একেবারে ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষের যেমন পড়ায় মন থাকে না কিন্তু বুদ্ধি আর পারদর্শিতা থাকে, ঐ ছেলেটির সেরকম ছিল। ঝিনর সঙ্গে তার অনেক অমিল ছিল, তথাপি ঝিনি তাকে ভালোবেসেছিল। বিয়েও করেছিল বাড়ীর কাউকে না জানিয়ে। রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু পরপর দুর্ঘটনা হল। আগে তার দাদা মারা গেল তারপর সে। ঝিনির সংসার করতে আর যাওয়া হল না।

শুভেন্দু ঝিনিকে পছন্দ করে। কালকূটও সেটা বুঝতে পেরেছেন। ঝিনি বলল, শুভেন্দু ঝিনির কাছে কি চায় সেটা নিশ্চয় লেখকের বোধগম্য হয়েছে। এর জন্য ঝিনি শুভেন্দুকে কোন দোষ দেয় না। হয়ত শুভেন্দুর দিক থেকে ও ঠিক। কিন্তু ঝিনি যে পারে না, কেন পারে না তাও জানে না। পারলে ভাল হতেও পারত। জিইনর মনে হয় সে যেন ওদের এই দলটি থেকে আলাদা। লেখক কালকূট ভাবছেন 'মানুষ দেখতে বেরিয়েছি, সে হলফ আমার নেই। কিন্তু আমার চোখের কূল জুড়ে তার মেলা। আমার সকল আস্বাদনের স্বাদে স্বাদে ভাসা। যেন, আপনি সুরা হয়ে নেশা ধরিয়ে দেয়, ভাসিয়ে নিয়ে যায়; মনে হয়, এই পরম পাওনা।' *(পৃ: ৪১৯, ঐ)* কোপাইয়ের ওপারে বিন্দু, বাউল গোকুলের প্রকৃতিকে দেখা গেল। বিন্দু ঝিনিকে বলেছিল, 'অই গ দিদিমণি, কথা যাচ্ছেন গ।' *(পৃ: ৪২১, ঐ)* বিন্দু কাঁসার বাসন মাজে আর বিন্দুর কাছে বসে সুজন বাউল মাটির হাঁড়ির পিছনে লাল মাটি লেপে। বাঁশঝাড়ের আড়ালে বাউলদের বনভোজনের আসর জমেছে। গোপীদাস বাউল ও রাধাও সেখানে এসেছে। কালকূট ও ঝিনি নদীর ওপারে আসেন। বিন্দুকে ঝিনি জানায় যে তারা কোপাই দেখতে এসেছেন। বিন্দু রসিকতা করে বলে, 'অ মা গ, ই কী কোপাই নাকি? ইতো যমুনা গ দিদিমণি। যমুনার ধারে এই গেছেন বলেন।' *(পৃ: ৪২১, ঐ)* এইকথা বলে বিন্দু কালকূটকে চোখের কোণে দেখে। খিলখিলিয়ে হাসে। সুজন হেঁকে ওঠে, 'ভালো হে ভালো। যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনে, পরবাহিনী!' *(পৃ: ৪২০, ঐ)* বিন্দুর কথা প্রথমে ঝিনি বুঝতে না পারলেও, একটু পরেই ঝিনির মুখে ছোপ লেগে যায়। তার সাজানো মুখের চকিত ছটায় চোখের পাতা বুজে যায়। কোন কথা বলে না। বাঁশঝাড়ের আড়ালে আসতেই কালকূট দেখেন জায়গাটা বনভোজনের উপযুক্তই বটে। গোপীদাস বাউল, রাধা, গোকুলদাস বাউল সকলের সঙ্গে ই সাক্ষাৎ হয়। গোপীদাস ঝিনিকে 'গোঁসাই দিদি' বলল। কোপাইয়ের ধারে বন নিরালায় এক উৎসবের তরঙ্গ বয়ে চলে। ঝিনিকে গোপীদাস 'গোঁসাই দিদি' বলেছে, 'গোঁসাই দিদি' বলতে কি

বুঝিয়েছে সে সেই জানে। কিন্তু গোপীদাসের যে চোখের নজর কালকূট প্রত্যক্ষ করলেন এবং হাসির রকম সে বড় সহজ ভাবের না। গোপীদাস দাড়ি কাঁপিয়ে হাসে কালকূটের দিকে চেয়ে, একটু ঘাড় নাড়ে। গোপীদাস সুর ধরে দেয়,

'অ ভোলা মন, মন চিতা তোর
ধ্যানে মাটি মারে।
করে রে অধরা শিকার, ধরার মরে
ভান্ডেতে চাঁদ লখে রে।' ... *(পৃ: ৪২১, ঐ)*

গান শুনে সুজন ও গোকুল একসঙ্গে 'জয় গুরু' ধ্বনি দেয়। গোপীদাস আবার গায়,

'এ চিতা দেখলে চেনা যায় না গ,
লয়ন ঢুলু গোঁফ ধসানো রে।
পীত বসনে ঢাকা দিয়ে, মোহন হেঁইসে
বড় ল্যাজ বিশিষ্ট থাকে রে।' ... *(পৃ: ৪২১, ঐ)*

গোপীদাস এমন ভাব করে যেন সে চোর ধরেছে, কালকূটের দিকে চেয়ে দারোগার মতো মাথা নাড়ে। গোপীদাস বাউল বলে 'ঘাটে-বাইটে তো কাটে বাবাজী। খাঁচায় থাকতে পারি না। তা হ্যাঁ বাবজী, এ মেলার পরে যাওয়া হবে কুথা?' *(পৃ: ৪২২, ঐ)* কালকূট বলেন, 'ইচ্ছা আছে নানুর যাবো।' *(পৃ: ৪২২, ঐ)* গোপীদাস জানায় তারাও নানুর যাবে। সে জানতে চায়, ঝিনিদিদি যাবে কিনা? ঝিনি জানায়, সে সেকথা বলতে পারে না, তার সঙ্গে অনেকজন আছে। অবশেষে রিকশায় করে ফেরার পালা। রিকশা চলেছে, কোন একজন রিকশা দাঁড়াতে বলে, গুরুগম্ভীর গলা, সে আর কেউ নয় অচিনদা। অচিনদা গাড়ি নিয়ে তার মধ্যে লিলি রাধা রয়েছে। কালকূট ও ঝিনি অচিনদার কথামত গাড়িতে উঠে বসে। কালকূট তার বন্ধুর বাড়িতে ফিরে যায়।

দশই পৌষ, লেখক কালকূট সকালে চলেছেন নানুরের পথে। চণ্ডীদাসের নানুরে। এককথায় বসাতে গেছে, চলো যাই চণ্ডীদাসে এবং চলো যাই রজকিনীর পাটে। কালকূটের কথায় 'সেই রাজ্য, নাম যার রাজী, তার প্রেম-শ্রীপাটে। যেথায় বাশুলি দেবীর থানে বসে কবি রচে রাধাকৃষ্ণ প্রেমবিরহ গান। তত্ত্ব যার রগের প্লাবনে ভাসে, মোহ রস বোঝে সেই রসিকা রজকিনী। কী রহস্য দেখ, পরমা শক্তি দেবী বাশুলি ভজে দ্বিজ। অথচ শিল্পীরূপে গাহে গান, কাঁদে মরমীয়া ধ্যানে, রাই কালা নামে। তাই শুনে অবশ বিবশ হৈয়া থাকে রজকিনী। কী রহস্য, কী রহস্য!' *(পৃ: ৪২৫, ঐ)* রসের রসিক যদি না হয়, অরসিকের ধন্দ সার। কালকূট যেন সেই অরসিক। তাঁর ভারী ধন্দ। তাই তিনি চলেন চণ্ডীদাসে, ছোটেন রজকিনী পাটে। কালকূটের অচিনদার গাড়িতে রওনা হওয়া, সঙ্গে ঝিনি, রাধা, লিলি আর বাউলের দল গোপীদাস সুজন, রাধা, গোকুল ও বিন্দু। গতকাল লেখক

কালকূট যাত্রার আসরে গিয়েছিলেন। অতুল সিরাজ সেজেছিল, সে অতুলের সঙ্গে কালকূটের ট্রেনে আলাপ হয়েছিল। তাকে সে কথা দিয়েছিল যে সে যাত্রা দেখতে যাবে।

অচিনদা ঘোষণা করেন যে 'নানুর এল'। পরম রসিকের লীলাভূমিতে নেমে ভূমির ধূলা মাথায় ঠেকায় গোপীদাসের দল। অচিনদার সঙ্গে দলবল চলতে থাকে। ছাতিমতলা পেরিয়ে তারা এলেন বাশুলীর থানে। লেখক ভাবছেন, হয়ত চণ্ডীদাস হেঁটে গিয়েছেন। তাঁর মন শিহরে যায়, তরঙ্গে দোলে। এই ধূলিতেই তাঁর পায়ের ধূলা রয়েছে। এই বাতাসে রয়েছে সেই মানুষের নিঃশ্বাস। কেমন করে তিনি কথা বলতেন, কেমন করে হাসতেন কেমনইবা দেখতে ছিলেন। কোন নিরালায় বসে ছন্দের ভাবে মগ্ন থাকত। কালকূটের চোখে পড়ে একটি উঁচু ঢিবি। ঐ ঢিবির উপরে মন্দিরের চূড়া। ঢিবির পাশ দিয়ে এগিয়ে উঁচুতে মন্দিরের চত্বরে গেলেন। তাসের দলটি ছাড়া আর কোন প্রাণী ছিল না। একদিকে বাশুলীর মন্দির, উঠানের ওপারে বাশুলীর মুখোমুখি আছে আর একটি মন্দির। কালকূট বাশুলীকেই প্রথম দর্শন করলেন। ছোট একটি কালো পাথরের মূর্তি রয়েছে। কে বাশুলী, বাসলী কে, কেই বা বিশালাক্ষী। তিনি ভাবছেন কে জানে এর উত্তর। এঁকে নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। অনেকে বলেন বৌদ্ধ, ইনি নিত্যার সহচরী। 'ডাকিনী বাশুলি, নিত্যা সহচরী, বসতি করয়ে তথা।' 'নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিল, সহজ জানাবার ওরে।' *(পৃ: ৪৩২, ঐ)* স্বয়ং চণ্ডীদাসের ছিল এই বার্তা। 'বাশুলী কহায় বলে চণ্ডীদাস গীত। আপনি আপনি চি করহ সম্বিত।' কিন্তু তিনি দেখলেন ইনি, চতুর্ভুজা বাগীশ্বরী। পাষাণের দেবী মূর্তি, বীণা পুস্তক জপমালাধারিণী। এ দেবী সকলের পরিচিতা, বিদ্যাদেবী 'ব্রজেশ্বরী।' কালকূট বলেন 'বাশুলীর আদেশেই চণ্ডীদাস প্রেম সাধেন, পীরিতি গান করেন।' 'বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে, ধোপানী চরণ সার।' *(পৃ: ৪৩২, ঐ)* লেখক ভাবেন তবে রাধাকৃষ্ণ গান বৌদ্ধ হিন্দু মেলামেলি জড়াজড়ি যদি বা দেখি, বৈষ্ণবের রূপ কোথায়।' *(পৃ: ৪৩৩, ঐ)* লেখক আবার ভাবেন, 'হয়তো এই মন্দিরে যা কিছু এই-ই সব না। কেতাবে পড়েছি, পাঁচশ বছরের সেই আদি মন্দির, কালের ধূলায় মিশিয়েছে। এ মন্দির অনেক পরে। হয়ত সেই প্রাচীন মন্দিরে, কালাচাঁদ রাইকিশোরী ছিল। অন্যথায় পদাবলীর যা কিছু, সবের নায়ক-নায়িকা তো সেই দু'জনেই।' *(পৃ: ৪৩৩, ঐ)*

গোপীদাস বাউলের কাছে লেখক জানতে পারেন যে কিরণহারে রামী আর চণ্ডীদাসের সমাধি আছে। কালকূটের মনে হল এই গ্রামই তো সেই গ্রাম, এই পথই সেই পথ, তিনি যে পথে চলছেন। এই পথেই রামী, চণ্ডীদাসের পায়ের ধূলা রয়েছে। কালকূটের খেয়াল থাকে না, কোথায় এসে পড়েছেন। ঝিনির গলার আওয়াজে তিনি থমকে দাঁড়ান। দেখেন জিনি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তিনি ঝিনির কাছে জানতে চাইলেন আর সবাই কোথায় রয়েছে। ঝিনি জানায়, মন্দিরের কাছেপিঠেই রয়েছে। কালকূট ঝিনিকে সেদিকেই যাওয়ার কথা বললেন। তিনি দেখলেন, ঝিনি

নিশ্চল হয়ে আছে। পলকহীন চোখ সরাচ্ছে না। ঝিনি কালকূটকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, এরপর তিনি কোথায় যাবেন। কালকূট জানিয়েছিল এরপর বক্রেশ্বর যাবেন। ঝিনি প্রশ্ন করে, এই দুপুরে স্নান খাওয়ার কী হবে? তিনি ঝিনিক কথা শুনে অবাক হয়েছিলেন। হেসে বলেছিলেন, সেকথা তিনি ভাবেন নি, সঙ্গীদের যা হবে তাঁরও তাই হবে। ঝিনির প্রশ্ন বক্রেশ্বর থেকে কোথায় উত্তর 'শান্তিনিকেতনে' ঝিনি জানতে চায় তারপরে কালকূট উত্তর দেন, কেঁদুলি, মকরসংক্রান্তির মেলায়। ঝিনি জিজ্ঞেস করে, তারপর কোথাও কোথাও লেখক বলেন, ভাবিনি কোথায় যাব। অবশেষে ঝিনি অচিনদার গাড়িতে চোখের জলের সঙ্গে বিদায় নেয় কালকূটের কাছ থেকে।

গোপীদাস বাউল কালকূটকে এক অচিন আবেগে ভাসিয়ে দেয়। 'এই মুহূর্তে যেন নতুন করে বুঝতে পারি, এ গোপীদাস পতিত নয়।...' *(পৃ: ৪৫৫, ঐ)* বক্রেশ্বর নদীর এপারে তাদের গাড়ী দাঁড়ায়, ওপারে বক্রেশ্বর। পাপহরা নাম শিবক্ষেত্র। মন্দিরময় দেশ বক্রেশ্বর গোপীদাস জানায় যে শিবক্ষেত্রে নানা মানুষ নানা মানসে বাসনায় এসে মানুষ মন্দির গড়ে দিয়ে গেছে। কালকূটের ভাবনা, 'এর নাম ভারতবর্ষ। তার মাঝে এক দেশ, বাঙলা দেশ। যেখানে যাবে, নানাখানে নানা বৈচিত্র্য। এলাম যেন এক মন্দিরের রাজ্যে। কারুকার্যখচিত শিল্পের মেলা নেই মন্দিরে মন্দিরে। এর রূপ আলাদা।' *(পৃ: ৪৫৫, ঐ)* সাধারণ শিবভক্তদের সামান্য নিবেদন। এখানে প্রকৃতিও একটা মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আশেপাশে জঙ্গল, বাবলা মনসা আশশ্যাওড়ার আরও নানা গাছগাছালি। কিছু প্রাচীন বটগাছ। আবার কোথাও বেড়ার কুটির, মাটির দাওয়া। কঞ্চির বেড়া, লাটপালং সেখানে উঁকি দিচ্ছে। উঁচু-নিচু পাথুরে জমি। সব মিলিয়ে যেন একটা সন্ন্যাসের বৈরাগ্যের ছাপ। ঝিল্লির আওয়াজ আর পাখির পিক্‌পিক্ চিক্‌চিক্ আওয়াজে কালকূট মুগ্ধ। তার মনে হয়েছে 'এখানেই যেন পৃথিবীর এক শেষ প্রান্ত।' রোগা লম্বা মাঝবয়সী একজন জিজ্ঞাসা করে 'কুথা থেকে আইসছেন, কী নাম?' গোপীদাস লেখক কালকূটকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় এবং বলে যে এ বাবজী পূজা-টুজা না দিয়ে একটু ঘুরে ফিরেই চলে যাবেন। কিন্তু পাণ্ডা ছাড়বার লয়, সে বলে চলে যে, তা কি করে হয়, হিন্দুর ছেলে, জাগ্রত থানে এসে পূজা না দিয়ে যাবে এটা ঠিক নয়। সে পিছু ছাড়ে না কিছুতেই, বলতে থাকে বেশতো চান করে বাবাকে দর্শন করে চলে যান। মন্দির এখনও খোলা আছে। এরপরেও বলতে থাকে বাবুর খাওয়ার ব্যবস্থা কী করেছে ইত্যাদি। কালকূট পাণ্ডাদের উপদ্রব, নাছোড়ভাব, অতিসুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। কিছুতেই তারা পিছু হটে না। কালকূটকে গোপীনাথ ছোটবড় অনেক কুণ্ডের পাশ দিয়ে নিয়ে এল এক উষ্ণময় পরিবেশে। জলাশয়ের ধারে দাঁড়ালে তাপ এসে গায়ে লাগে। 'বড় বড় বুদবুদ, জল যেন টগবগিয়ে ফুটছে। শব্দ করে, নিরন্তর বুদবুদ ফাটছে।' *(পৃ: ৪৫৬, ঐ)* জলের একেবারে তলা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। তিনি ভাবছেন ধরিত্রীর কোন্ কাল থেকে, পাতালের কোন শিরা বেয়ে এই উষ্ণ

স্রোত উঠে আসে। যার পাতাল রন্ধ্রে একদিক থেকে ঠাণ্ডা স্রোত, আর একদিকে উষ্ণ স্রোত বেরিয়ে আসে? 'নোনতা মিঠে, ঠাণ্ডা গরম, একের মধ্যেই সকলের পাশাপাশি বাস। এক ধরিত্রীর দেহের কুল, নানা রূপে রসে অকুল।' *(পৃ: ৪৫৬, ঐ)* সিঁড়ি বেয়ে কুণ্ডের জলের দিকে হাত বাড়ান তখনই কে একজন জলে হাত দিতে নিষেধ করে কারণ এই কুণ্ডের জল বেজায় গরম। তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন জংলা ঝোপের আড়াল থেকে ঝাঁকড়া চুল ও দাঁড়িগোফওয়ালা, ময়লা কাঁথা জড়ানো একজনকে। গোপীদাস তাকে 'এলেকাটা বাবাজী' বলে সম্বোধন করেছিল। গোপীদাস বলেছিল যে, সে এখনো আছে? এই কথার উত্তরে সে জানিয়েছিল যদ্দিন যার জিনিস সে না নিচ্ছে ততদিন তো থাকতে হবে। কিন্তু গোপীদাস জানাল সে ওরকম কথা কিছু বলেনি, জিজ্ঞাসা করেছিল 'বক্কেশ্বরে এখনো আছে?' এরকম করে দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা চলতে চলতে শেষে এলেকাটা বাবাজী জানিয়েছিল যে একজন হিক্কা তুলে কুণ্ডের জলে গড়িয়ে পড়ে মারা গিয়েছে। এ'কথা বলেই সে খক্‌খক্ করে হাসছিল। কালকূটের অন্তঃস্থলে রূপকথার ফুটন্ত তেলে ফেলে দেওয়ার কথা মনে পড়ছিল। তিনি আরও বলেছেন যে ওই জলে চাল-ডাল ফেলে দিলে তা ফুটতে শুরু করলেও ভাত কিন্তু হবে না। অথচ একটা মানুষ উষ্ণ জলে পড়ে শেষ হয়ে গেল! কালকূটের নানা প্রশ্ন ঘুরপাক? 'এলেকাটা' মানে জেনেছেন। রেলে কাটা পড়ে ওই বাবাজীর শাঁটুর নীচ থেকে নেই তাই ওই নাম। নতুন লোকেরা দেখে তাকে কিছু দিয়ে যেতে বলল। আরও বলল পূজা দিলে তাকে যেন একটু প্রসাদ দিয়ে যায়। কালকূটের চোখে একজন ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তি ফুটে উঠল। একটু আগেই শুনেছিলেন তার পেটে জ্বালা। 'মহামাংস' কথাটায় কালকূটের ভাবান্তর, 'মানুষের মাংসকেই তো মহামাংস বলে জানি। এলেকাটা বাবাজী কী তাই দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তির আশা করেছিল নাকি?' *(পৃ: ৪৫৬, ঐ)*

গোপীদাস 'অবধূত' কোথায় আছে জানতে চাইলে সে বিরক্তিতে বলেছিল যে তাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই, সে ওসব জানে না। অথচ গোপীদাস জানে যে 'এলেকাটা' 'অবধূতে'র চেলা। তাহলে এরকম বিরক্তি নিয়ে উত্তর কেন দিল কালকূট বুঝে উঠতে পারেন না, গোপীদাস ভৈরবীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে সেও বলল না। কালকূট গোপীদাসের মুখে একটি হাসি দেখেছে। তারা এগিয়ে চলতে চলতে শুনতে পেয়েছিলেন 'দ্যাখ গা তোমার অবধূতের কীত্তিকলাপ, শালা সাধনা কইরতে এইসেছে।' *(পৃ: ৪৫৭, ঐ)* বিরক্তির কারণটা জানবার মত উতল হল কালকূটের, গোপীদাস জানে ব্যাপারটা সেটা বুঝতে পেরেছিল বলে তাঁর মুখে তিনি 'বিটলে ছোঁড়ার বিটলেমি ঝিলিক' দেখেছিলেন। সে পরে জানাবে ব্যাপারটা এই কথা কালকূটকে বলেছিল।

কুণ্ডের জলে চাল-ডাল পড়ে আছে, কিন্তু পুরো সেদ্ধ হয়নি, খাওয়া যাবে না। গোপীদাস বলেছিল যে, 'ই থেকে বুঝে লে নিজের সাধন তত্ত্ব। সাধন সাইধবি এমনি কইরে। জলও থাইকবে,

গরমও থাইকবে, ফুইটবেও বটে, কিন্তুক আদত মালে ফুট খাবে না।' *(পৃ: ৪৫৭, ঐ)* গোপীদাসের তাঁর গুরুর কথা মনে পড়ে যায় কুণ্ডের কাছে এসে। সেও প্রথমবার যখন তাঁর গুরুর সঙ্গে এসেছিল, ভেবেছিল জলে বুঝি চাল-ডাল ফুটবে। গুরুর কথা ভেবে উদাসী গোপীদাসকে কালকূট মনে মনে তারই মত দাঁড়িগোফওয়ালা একজনকে দেখতে পান এবং বলেন 'আর ভাবি, বাউলের সেই এক তত্ত্ব কথা। কিন্তু কত বিচিত্র তার প্রতীক। কুণ্ডের উষ্ণ জলের কথায়ও তার তত্ত্বের প্রতীক জেগে ওঠে।' *(পৃ: ৪৫৭, ঐ)* গোপীদাসের সঙ্গে এগোতে এগোতে তারা 'পাকাহরা'য় এসে পৌঁছায়। এটি নদীও নয় দীঘিও নয়। দেখে মনে হয় পুবে-পশ্চিমে লম্বা আপন খেয়ালে চলা এক জলাশয়। ঘাটের সিঁড়ির কাছে এখানে-ওখানে ছেঁড়া মাদুর কাঁথা পড়ে আছে। জলাশয়ের ওপারে লকলকে আগুনের শিখা জ্বলছে। গোপীদাস জানিয়েছিল " 'শ্মশান বাবাজী। আসলে বক্রেশ্বর হলো মহাশ্মশান। যে শ্মশানের কোনো নিবিত্তি নাই, তারে বলে মহাশ্মশান। বক্রেশ্বরের চিতা কখনো নিবে না বাবাজী। যিদিনে আইসবে, যখনই আইসবে দেইখবে, চিতা জ্বইলছে।'

মহাশ্মশান। চির সংস্কারের মনে কোথায় যেন শশ্মানের নামে এক ভয় জড়িয়ে আছে। মৃত আর শবের সান্নিধ্যে মন কখনোই যেন অনায়াস হয়ে ওঠে না।" *(পৃ: ৪৫৮, ঐ)* গোপীদাসের কথা শুনতে শুনতে তার মনে কোনো জায়গা অন্ধকার থাকে না বরং সমস্ত মন জুড়ে বিস্ময়ে এক অচেনা গভীরতা, অদৃশ্য অচিন দূরত্বে ডুবে যান। 'পাপহরা'র ঘাটে দাঁড়িয়ে চিতার আগুনের দিকে তাকিয়ে ওই আগুনকে নমস্কার করার ইচ্ছা জাগে। তার কেন এমন হল, তা তিনি জানেন না। তিনি মনে মনে নমস্কার করলেন। কার চিতা তাও জানেন না। 'তবুও দেখি, আগুনের বিশাল বুকে আগুনের ব্যাকুল আলিঙ্গনে কে যেন মহাশান্তিতে নিবিড় ঘুমে অচেতন। কেন দেখি তাও জানি না। কেন প্রাণ বারংবার নমস্কারে নত, আমি জানি না। ...' *(পৃ: ৪৫৮, ঐ)* শ্মশানের ডোম মদনকে ও তার বউকে কোন এক 'সত্যি কথা' শোনবার জন্য ডাকছিল। কিন্তু মদন ডুব দিয়ে যাবে না তাই বলছিল। বউ-এর রূপ দেখে কালকূটের ওকে 'বিষহরি'র বিটি বলে মনে হয়েছিল। তার সৌন্দর্য দেখেছেন এইভাবে যে পায়রার মতো বুক ফোলানো যুবতী, কোমরে হাত দিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল যা দেখে তাঁর মনে হয় 'ছিলা-টানা ধনুকের মতো বেঁকে' আছে সে। চর্যাপদের ডোম্বিনীর মতোই যেন যুবতী নায়িকা লক্ষণাক্রান্তা।' *(পৃ: ৪৫৮, ঐ)* 'পাপহরা'র জলে স্নান করতে গিয়ে ঘাট বরাবর ওপরে নরমুণ্ডের কঙ্কালের ঢিবি দেখতে পেয়েছিলেন। গোপীদাস বাবাজী জানায় যে 'উনি অঘোরী বাবার থান। মস্ত বড় তান্ত্রিক সাধু ছিলেন।' *(পৃ: ৪৫৮, ঐ)* কিন্তু এখন আর নাই।

প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে তাঁর সু-নয়ন ক্ষ্যাপা বাবার সঙ্গে এসেছিল। যখন দু'জনে প্রথম দেখা হয়েছিল সে'দিনের কথা সে ভুলতে পারে নি। দশাশই, দিগম্বর মূর্তির কাছে আসতেই

তিনি নয়ন ক্ষ্যাপা বাবাকে 'কালো' সম্বোধন করে বলেছিলেন যে, এতদিনে তার আসার সময় হল? উত্তরে তাঁর ক্ষ্যাপাবাবা বলেছিল যে, না ডাকলে কি করে আসবেন, উনি ডেকেছেন তাই এসেছেন। তারপরে, 'উ বাবা, কী বইলব বাবাজী, দেখি দুই ক্ষ্যাপা চখে চখে চেইয়ে হাসে। যেন কতকালের পীরিত। অথচ আমার ক্ষ্যাপা বইলেছিলেন, সিই জীবনে দুজনার পেথম দেখা।' *(পৃ: ৪৫৯, ঐ)* তারপরেই ঘটল আরও রোমহর্ষক। গোপীদাস মনে মনে দিগম্বর বাবার অঙ্গের কথা ভাবছিলেন, সেটা উনি বুঝতে পেরে নয়ন ক্ষ্যাপা বাবাকে বলেছিলেন যে, ওকে দু'ঘা দিতে। তারপরে নিজের পুরুষাঙ্গখানি দেখিয়ে বলেছিলেন 'আমারটা দেখ্যা কী করবি শালো, লিজেরটাকে ঠিক করগা যা।' *(পৃ: ৪৫৯, ঐ)* তার গুরুকে বলেছিলেন, ভালো করে ধোয়াতে, নইলে দাগ যাবে না। গোপীদাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে লাগল নইলে দাগ যাবে না। এ রহস্যের ব্যাখ্যা কালকূটের জানা নেই, তার মর্মে যেতে পারেন না। তিনি মনে মনে সেই বিশাল ভস্মমাখা সাধুকে দেখতে পাচ্ছিলেন আর গোপীদাসের কথাগুলো মনের মধ্যে পাক খেয়ে মনে হচ্ছিল, বসন-ভূষণ নগ্নতা সব একাকার হয়ে গেছে। 'সেখানে মানুষের সঙ্গে দেখা এক অদেখার গভীরে।' *(পৃ: ৪৫৯, ঐ)* লেখক কালকূট নিজের বোঝা ও না বোঝা লেখক চরিত্রও গোপীদাসের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন তাঁর সেই বিচিত্র অভিজ্ঞান। নিজের বিস্ময়-বিমূঢ়তা, দুর্বোধ্য অচেনাকে এমনি করেই তিনি ব্যক্ত করেছেন। আবার গোপীদাসের মুখ দিয়েই বলিয়ে নিয়েছেন তাঁর কোনো ভৈরবীর নাম তিনি জানেন না। প্রকৃত সাধিকা হলে তবেই তিনি তাঁর সঙ্গে সাইধতেন তাও শুধু মহাযোগের সময়। যে সব ভৈরবী কেবল সঙ্গ করবার লোভে আসতেন তাদের মারমুখী হয়ে, গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দিতেন এও গোপীদাস দেখেছে। গোপীদাসের কথায় নতুন একটি দিক কালকূট পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। সাধারণের এসব তথ্য জানা নেই, সেটাই তিনি জানিয়েছেন লেখক চরিত্রের ভাবনার মধ্য দিয়ে। 'প্রকৃতি' আর 'ভৈরবী'দের মধ্যে খাঁটি আর বুজরুক থাকে? 'সাধিকার ছদ্মবেশে শরীরের সুখের খোঁজে নারী ফেরে, তা-ই কি কখনো শুনেছি! তা-ও এই বক্রেশ্বরের মহাশ্মশানের মতো জায়গায়!' *(পৃ: ৪৬০, ঐ)* কতই না বিচিত্র নর-নারী লীলা করে আঙিনার বাইরে। মাহিন্দ্রক্ষণে দু'জনের সঙ্গে দু'জনার দেখা হল তবেই সাধন হয়, গোপীদাসের মুখ দিয়ে লেখক কালকূট তার এই বিশ্বাসটুকু তুলেছেন। এরপরের ভাবনা পাঠকের। তার মনের জিজ্ঞাসা পাঠকের অন্তরেও ঘুরেফিরে।

বক্রেশ্বর মন্দিরের কাছে একটি বিবর্ণ জলাশয়, গোপীদাস জানায় কিংবদন্তীর কথা, কে একজন নাতিশীতোষ্ণ জলাশয়ে গঙ্গাকে এনেছিলেন বলে নাম শ্বেতগঙ্গা, এর জল উষ্ণ নয়। দরজার দিকে তাকাতেই থামের পাশে এক যুবতীকে দেখতে পেলেন। তার কোল ঘেঁষে একটি শিশু তাদের দু'জনের মুখে একই অভিব্যক্তি। মাও শিশুকে তাঁর মনের 'সহসা যেন এক অজন্তার

গুহাচিত্র ভেসে ওঠে চোখে। দৃশ্যটা যেন অনেকদিনের চেনা। রমণীর সীমন্তে ঝাঁপসা সিঁদূর। চুল ঘোমটার বাইরে এলানো।' *(পৃ: ৪৬০, ঐ)* তারকেশ্বর মন্দিরে তাকে সে-ই পাণ্ডা নিয়ে গিয়েছিল। গোপীদাস যায় নি। ওদের শুধু গুরু আছে। পাণ্ডা বলেছিল 'ওদের মশায় ঈশ্বরের বালাই। ওদের কথা বাদ দেন ক্যানে।' *(পৃ: ৪৬০, ঐ)* প্রদীপের আলোয় গোল করে কাটা পরিখার মধ্যে বক্রেশ্বরকে দেখতে পান। পাণ্ডা বক্রেশ্বরের বক্রতা দেখিয়ে তার হাতে ফুলবেলপাতা খুঁজে দেয়। পাণ্ডা মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে, ধূপদীপ, বেলপাতা দুধের গন্ধ তাঁকে অন্যজগতে নিয়ে যায়। তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করেন না অথচ সব ফেলেও দিতে পারেন না। দুইধারার মাঝখানে বাঁধা পড়ে যান। তাঁর মনে হতে থাকে 'আমি এখানে নেই, বর্তমানে নেই। আমি যেন হাজার বছর ধরে অনেক পায়ের চিহ্নে চিহ্নে চলেছি। আমি বহু দূর থেকে আসি আমারই ছায়ায় ছায়ায়। একা না, বহু লক্ষ কোটির সঙ্গে।' *(পৃ: ৪৬১, ঐ)* পাণ্ডার কথায় তার যুগান্তর যাত্রায় ছেদ পড়ে। তিনি মনে মনে বর্তমানকেই প্রণাম জানান 'এখন যে রূপ তুমি দেখাও, অরূপের যে স্রোতে টেনে নিয়ে যাও, সেই পথেই চলি।' *(পৃ: ৪৬১, ঐ)* তিনি নিজেকে যুগযুগান্তরে প্রচলিত স্রোতের মধ্যেই নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। পূজা শেষে দক্ষিণা নিয়ে তাঁর নাম-ঠিকানা নিয়েও তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। যজমানের প্রণামী না নিয়ে তিনি যেতে পারেন না। তাই কালকূট তাঁকে প্রণাম করার পরে উনি চলে গেলেন। এই মানুষটি তার কাছে অনেক সহজ সরল ও চেনা মানুষ হয়ে ধরা পড়েন। এরপর গোপীদাস কঞ্চির বেড়া ঘেরা একটি কুটিরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে 'অবধূত বাবাজী আছ ক্যানে গ, না কী?' *(পৃ: ৪৬২, ঐ)* লালপাড় গেরুয়া রঙের শাড়ী পরিহিতা এক মহিলা তাদের অভ্যর্থনা জানায়। গোপীদাস শরীরে ষোড়শী, মুখেতে ত্রিংশ, নাম চোখ মুখ কাটা কাটা, ঘোমটাহীন খোলা চুল গায়ে জামা নেই তবে অন্তবাস, চোখ একটু লাল। কালকূট বুঝলেন খুবই পরিচিত একটি জায়গায় নিয়ে এসেছে দুপুরের আহারের চিন্তা মাথায় রেখে। অবধূতের কথা জিজ্ঞাসা করতেই বলেছিল যে এলেকাটার পোড়ায় গেলেই দেখা যাবে একজন নূতন ভৈরবীকে নিয়ে সাধনভজনে ব্যস্ত। 'এলেকাটা'কে তাড়িয়ে দিয়ে তার ঘর দখল করে দুদিন ধরে সে ওখানেই আছে।

গোপীদাস দুটো অন্ন ফুটিয়ে নেওয়ার জন্য 'চিতেবাবাজী'কে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ভৈরবী জানিয়েছিল যে সে নিজে উনান জ্বালেনি, শরীর খারাপ ছিল বলে। কালকূট বুঝেছিলেন অবধূতনির শরীর খারাপ নয় মনোকষ্ট। নিজের আশ্রম ছেড়ে ভৈরব গেছে নতুন ভৈরবীকে সাধনভজন শেখাতে, আর সে তার আশ্রম সামলাচ্ছে। চাল আর তেল আনার জন্য গোপীদাস বাইরে চলে যাওয়ার পরে অবধূতানি কালকূটের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। সে কালকূটকে বলেছিল যে তার চোখমুখ দেখে বুঝতে পেরেছে। কালকূট নিজে মজে আর অন্যদেরও মজিয়ে দেয়। তার জায়গা অজায়গা নেই। তারপরে জানতে চেয়েছিল তিনি কী খুঁজে বেড়াচ্ছেন? তাকে অনেক

বেড়াতে হবে। এই কথাগুলো তার 'সকল নির্বাক নৈশব্দের মধ্যে একটা স্পষ্ট ঝিকিমিকির মতো' চিকচিক করতে লাগল। 'আমার কানে এখন শুধু একটি কথাই বাজে, 'অনেক বেড়াতে হবে।' ... এখন ক্রমে অবাক হই। ভাবি একথা আমাকে বলে যায়, বক্রেশ্বরের এক কুটিরবাসিনী ভৈরবী। যার শিক্ষা দীক্ষা অভিজ্ঞতা, কোনো কিছুর ওপরেই আমার কোনো আস্থা থাকার কথা না। আমি সমাজের পরিবেশের যে সীমানা থেকে এসেছি, সেখানে এ আস্থা থাকবার কথাও না।' *(পৃ: ৪৬৫, ঐ)* এরই মধ্যে ত্রিশূল হাতে কেজন মদমত্ত পুরুষ এসে কালকূটের কাছে জানতে চায় সে কে? কালকূট কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই ভৈরবীকে বলে " 'ক্যানে গ মা, নতুন ভৈরব পাকড়াও কইরেছ নাকি?'

হে বক্রেশ্বর, এ কী সম্বোধন! এ আবার কেমন প্রশ্ন। কিন্তু দেখ রাঢ়ের খোদাই করা দারুমূর্তি হঠাৎ সজীব হয়ে কেমন দুলে ওঠে। চোখের আগুন মুখে জ্বলে। ঠোঁট দু'টি বেঁকে যায় ধনুকের মতো। অথচ ঘাড় বাঁকিয়ে বড় যেন মিষ্টি সুরে, সুর করে বলে, 'হুঁ গ বাবা বেহ্মালন্দ অবধূত, সি খবরটো জানো নাই?" *(পৃ: ৪৬৬, ঐ)* এ'কথা শুনে ভৈরবী রুদ্রমূর্তি ধারণ করে বলে যে, 'আপনি হল্যেন সাধক পুরুস্ যোগী মানুস্। আমাকে খবরদার কইরছেন ক্যানে গ বেহ্মালন্দ। আমি কি আপনার যুগ্যি? আমি এখন লাগরী হইয়েছি। দ্যাখেন ক্যানে, কেমন কাঁচা বয়সের লাগর জুইটেছে আমার। আপনার মতন বুড়ো লাগর আমার আর ভালো লাগে নাই।' *(পৃ: ৪৬৬, ঐ)* এ'কথা শুনে ব্রহ্মানন্দ তাতে পাপিষ্ঠা মাগী, বেশ্যা, কুলটা বলে আর বুকের রক্ত খাবে ইত্যাদি গালি দিতে থাকে। ভৈরবী আরও রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরে। কালকূট এসব দেখে ঘাবড়ে যায়, কিন্তু অবধূতানি তাকে ভয় না পেতে বলে ঘরে ছুটে গিয়ে বর্শা নিয়ে এসে ব্রহ্মানন্দর বুকে ঠেকায়। অবধূতানির নাম যোগমায়া। তার এই রূপ দেখে অবধূতের উদ্যত ত্রিশূল নেমে যায় তার মুখে শঙ্কার ছায়া পড়ে, কিন্তু ক্রুদ্ধস্বরে ভৈরবীকে শাসাতে থাকে অস্ত্র নিয়ে ছেলেখেলা ভালো নয়। কালকূট দেখছেন ভৈরবীকে নিচু স্বরে ভয়ংকর মুখে, খুনীর মত দৃষ্টিতে বলে 'নিজে তিরশূল লিয়ে আমার বুকের রক্ত খেতে আইসছিলে, এখন আমি অস্তর লিয়ে ছেল্যেখেলা কইরছি? তোমার রক্ত দশ্শন কইরব আজ।' *(পৃ: ৪৬৭, ঐ)* কালকূট মুগ্ধ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখছেন, 'যোগো ভৈরবীকে বর্শা হাতে খোলা-চুল যোগিনী। লাল পাড় গেরুয়ার এক বেড় আঁচল, উদ্ধত বুকের ওপর থেকে অনেকখানি নেমে গিয়েছে। রোষে নিঃশ্বাসে দুলছে। চোখ দপ্‌দপে, মুখ ঝকঝকে।

এ মূর্তির নাম কী আমি জানি না। তবু অসুরের বুকে বর্শা বেঁধানো দুর্গা প্রতিমার কথা মনে পড়ে যায়।' *(পৃ: ৪৬৭, ঐ)* 'শক্তিতে ভক্তিতে জ্ঞানে তেজে' মনের ভেতরে যে সৌন্দর্য বাস করে সেই সৌন্দর্য যোগোর মুখে উদ্ভাসিত। তিনি বরাভয়দাত্রী। কালকূটের মন থেকে ভয় দূর হয়ে গেল কিন্তু দু'জনের কথার মাঝে তিনি কী করবেন বুঝে উঠতে না পেরে চুপ করে রইলেন। কিন্তু

প্রত্যক্ষ করলেন অবধূতের তেজ কমে গেছে। তিনি যোগোর রূপ দর্শনে ধ্যানমগ্ন হয়ে গেছেন। যোগো যে আলতো করে দু'একবার খোঁচাও দিয়েছিল এটা কালকূট বুঝতে পেরেছেন। অবধূত চলে যেতে যেতে বললেন যে তার মুখ যেন আর তাঁকে না দেখতে হয়। ব্যাস্ যোগো আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বলল 'তোমার মতন অবধূতের সাথে, আমাকে যেন আর না থাইকতে হয়। একদিন যেন কর্য়া এইসেছিলাম, তেমনি কর্য়া চইলে যাবো। তবু তোমার নষ্টামো ভণ্ডামো, উতে আমি থুথু দিই। উতে আমি ন্যাকার করি।' *(পৃ: ৪৬৮, ঐ)*

কালকূট কথার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন রণরঙ্গিনী যোগোর অপমানে আহত, লজ্জিত, বেদনার্ত, ক্রুদ্ধ এক মানবীর মনের কথা। এবং সোচ্চার ঘোষণা যে অবধূত যদি হেথা হোথা দশটা ভৈরবী নিয়ে সাধনভজন করতে পারে তাহলে সেও পারে। অন্তঃস্থলের ধ্বনিত বেদনা কালকূট লেখনীর ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। যোগোর কথা, মনোবেদনা সবকিছু পাঠককে আপ্লুত করে। ভৈরবীদের না জানা এক নতুন দিকে লেখক আশ্চর্য মুন্সীয়ানায় তুলে ধরেছেন। অবধূত চলে যাওয়ার সময় গোপীদাসের সঙ্গে দেখা হয়। গোপীদাস রাগ না করে তাকে যেতে বলে, চাল এনেছে সবাই মিলে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে, মনের কথা বলবে। কিন্তু অবধূত রাগে কিছুতেই থাকতে চাইলেন না, তাঁর ওখানেই কালকূটকেও নিয়ে যেতে বললেন, ওখানেই সব হবে। এ'কথা শুনে যোগো আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বলে ফেলল যে ভালোই হবে, নতুন ভৈরবীর হাতের রান্না খাবে, তাঁর হাতের রান্না তো অনেকবার খেয়েছে। কালকূট দেখছেন কোথায় ভৈরবী? এতো সাধারণ গৃহবধূর পারিবারিক ঝগড়া, কথা-কাটাকাটি। ঝগড়াকেও অতি বাস্তব কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। ভাষা এই কাহিনীর একটি অনবদ্য বিষয়। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, নিপুণ হাতে চরিত্র অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সেই ভাষা তাদের মুখে বসিয়ে দিয়ে চরিত্রগুলোকে একেবারে কাছের মানুষ করে তুলেছেন।

ভৈরবীর রাগ পড়ে গিয়েছে আর ও চোখের ভাষা অন্যরকম। কালকূটকে বলছেন 'কী চিতেবাবাজী, আক্কেল একেবারে গুড়ুম্ হয়্যা গেলছে তো? এমনটি আর দেইখেছ কখনো?' *(পৃ: ৪৬৮, ঐ)* যোগো দেখে কালকূটের মনে হয়েছে 'এই মুহূর্তে সহসা যেন তাকে গৃহস্থ বধূর মতো মনে হয়। শ্মশানের যোগিনী নয়।' *(পৃ: ৪৬৯, ঐ)* ঘরের ভেতরে খাঁচার মধ্যে যে সাপটি তার লকলকে জিভটি বার বার বের করছিল তাকে সে আদর করতে থাকে এমনভাবে যা দেখে কালকূটের মনে যেন একটি ছোট শিশুকে আদর করছে। শ্মশানের ডোম মদন মাঝে মাঝে ইন্দুর পাখি দিয়ে যায়, কিন্তু তিনদিন থেকে তার দেখা নেই, না খেতে পেয়ে খুব কষ্ট হচ্ছে এ'কথা জানায়। একটি সরীসৃপের প্রতি যোগিনী যোগোর কত মমত্ববোধ তা লেখক কালকূট তুলে ধরেছেন। রান্না করতে করতে কালকূটের সঙ্গে নানা গল্প করতে থাকেন। গল্প করতে করতে

যোগোমায়াকে তার যোগিনীর বদলে এক প্রেমিকা গৃহবধূ বলে মনে হল। অবধূতের জন্য তাঁর রাগ, ক্রোধ ভালবাসা সব একে প্রস্ফুটিত হতে লাগল। কালকূটের জিজ্ঞাসায় যোগো বলেছিল অবধূত যাবে কোথায়? কতবার এমনটি করেছে, কিন্তু তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছে এই যোগোর কাছেই। কালকূটের কথায় সে জানিয়ে দিয়েছিল, তাদের বিয়ে হয়নি। কী করে মেলাবে তাদের। সে হল তাঁতীদের বউ আর অবধূত হল ব্রাহ্মণ। যোগোকে ঘর করতে দিল না, নিজেও ঘর করল না। ঘরে তার বামনী, বিটাবিটি, ক্ষেতখামার, চাষবাস পূজা সব ছিল। 'সোন্দর' তার চেহারা আর গলাটাও ছিল 'মিঠে'। শিবঠাকুরের ছোটছেলের নামে নাম। যখন তার পনের বছর বয়স নিজেদের অতীতের কথা বলতে বলতে তার মন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কালকূট তার সে সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন এইভাবে। 'যে মুখে অন্য এক জীবনের বিস্ময় কৌতূহল, ভয়তরাসের নানা রঙ। যেমন জলের বুকে আলোছায়ার নানা ঝিকিমিকি।' *(পৃ: ৪৭২, ঐ)* যোগো তার বিচিত্র অনুরাগের কাহিনী বলে চলেছে। তার ছায়া দেখলেই তার বুক ধড়াস ধড়াস করত। আর অবধূত দিন-রাত যোগো যোগো করত বলে তার পক্ষে ঠিক থাকা সম্ভব হয় নি। সে বসে বসে গান গাইত আর তাঁর শাশুড়ীকে বলত " 'ইয়ার মধ্যে দেবীর অংশ আছে। ইয়াকে সাবধানে রেখা গ তাঁতী দিদি।' আমার শাশুড়ীকে দিদি বইলত। তা'পরেতে একদিন—।" *(পৃ: ৪৭৩, ঐ)* যোগো বলে চলেছে তার যোগিনী হওয়ার পূর্ব কাহিনী। একদিন বাড়ীতে যখন কেউ নেই, সেই সন্ধ্যাকালে 'অই গ যোগো, যোগোমতী, যোগমায়া তুই। মহামায়া তুই। আমাকে উদ্ধার কর গ। তুই আমার পূজা না লিলে আমার সব বেরথা। ধূমাবতীর আদেশ হইয়েছে, আমি তোকে ছাড়ব নাই।' *(পৃ: ৪৭৩, ঐ)* আর বলল, 'কিছু চাই না না, এ জেবনটা তোমার পূজা কর্যা সাথক কইরব।' তা'পরেই তো...।' *(পৃ: ৪৭৩, ঐ)* তারপর সেই সন্ধ্যাবেলার তিনদিন পরে 'সাঁজবেলাতেই ধূমাবতীর নাম লিয়ে ঠাকুরের সাথে ঘর ছেড়্যা গেলাম। ঘুইরতে ঘুইরতে এই বক্রেশ্বরে। সি কি ই দিনের কথা। পেরায় আঠার বচ্ছর হয়্যা যেইল...।' *(পৃ: ৪৭৩, ঐ)*

কালকূট এই বিচিত্র প্রেমকথা শুনে ভাবছেন এমন কি কোথাও ঘটে? ব্রহ্মানন্দ ছাড়া সে আর কিছু সে জানে না। তার এই ঘটনাকে পাপ বলেও মনে হয় না 'যোগোকে ভ্রষ্টা স্বৈরিণী স্বামী-সংসারত্যাগিনী অন্ধকারের প্রাণী বলে মনে হয় না। এর নাম সাধন-ভজন, তার বিচ্যুতি নেই। এক মনে এক সাধন। তবে ব্রহ্মানন্দকে সে চিনবে না কেন? সে-ই তো চেনে। *(পৃ: ৪৭৩, ঐ)* তাই তিনি বলেছেন যে চলার পথে এই মুগ্ধতাই তার প্রাপ্য। 'পথ চলাকে গড় করি, নমঃ নমঃ নমঃ। নমঃ বিচিত্র, নমঃ জীবন। বক্রেশ্বর, ঈশ্বর কোথায়, কে জানে। তার চেয়ে পথ চলার এই অপরিচয়ের পরিচয় নমঃ যোগোমতী, নমঃ নমঃ।...' *(পৃ: ৪৭৩, ঐ)* যোগোমায়া কালকূট ও গোপীদাসকে খাওয়াল কিন্তু নিজে খেল না। গোপীদাস ও কালকূট বারে বারে বলাতেও খায় নি।

হঠাৎই বলে ফেলেছিল, এলেকাটার ঘরে 'একজন' সাধন-ভজন শেখাচ্ছে, গাঁজাও চলছে, কিন্তু তার পেটে 'দানা' পড়েছে কি? কালকূট বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কালকূট এক ভৈরবীর প্রেমপূর্ণ মনটি তুলে ধরেছেন। অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে খাওয়ানো যায় কিন্তু সাতপাকের পতি না হয়েও যিনি পতির চেয়েও বড়। 'সে যে গৃহত্যাগিনী তাঁতীবউয়ের সতীত্বের সুন্দর। নারীত্বের একমাত্র নয়। জাতিকুলমান সকলই আন্। সে আর যা-ই করুক, তবু সে সেই মানুষ, যার জন্যে সব ত্যাগ, শ্মশানবাস। তাকে রেখে কি যোগোমতী খেতে পারে কখনো!' *(পৃ: ৪৭৫, ঐ)* সেইসঙ্গে কালকূট তুলে ধরে আর এক জীবনসত্য। বলিয়ে নিয়েছেন যোগোমায়াকে দিয়ে 'রোজ রোজ বেড়ে দেবো এত ভাগ্য করি নাই। আর যদি বা একবেলা দিতে পারি তা-ই বা কে ল্যায়, কে, খায়।' *(পৃ: ৪৭৫, ঐ)* কালকূটকে সঙ্গে নিয়ে গোপীদাস ব্রহ্মনন্দকে ডাকতে যায়। গোপীদাস অনেক স্তুতি করে অবধূত ও যোগো দিদি। যেখানে যে কথাটা বলার দরকার সেটাই সে বলে। অবধূতের গলায় অভিমান ঝরে পড়ে। আবার জাত্যাভিমানও একটু উঁকি দেয়। 'উ ভুল্যে যেইছে, আমি কে আর উ কে আঁ?' *(পৃ: ৪৭৬, ঐ)* গ্রাম-গৃহের সম্পর্ক কী। কালকূট সন্তর্পণে এই দুটো জিনিস তুলে ধরেছেন। আবার মনের ধন্ধও দূর করেছেন তিনি। প্রশ্নও তার উত্তরও তার। অবধূতের নিজের সাধনের উপর আস্থা, 'আমি যদি সি রকম হত্যাম তা হল্যে তোমাকে আজ একপাল বিটাবিটির হাত ধর‍্যে ভিখ্ মাঙতে যেতে হত্য। আমি যদি লম্পট হত্যাম, কে তোমাকে দেইখত, আঁ? উ নিজেকে দুর্গা ভাবে, না কালী ভাবে। উয়ার অহংকার দেইখলে আর কাছকে যেত্যে ইচ্ছা করে নাই। তা উ ছাড়া কি আর আমার শক্তি জুটবে নাই?' *(পৃ: ৪৭৬, ঐ)* নতুন ভৈরবীকে তাড়িয়ে দিয়েছে, এই খায়, সাধন-ভজন করে না। জনার্দন চক্কোতি বেগুন পোড়া আর ভাত, মদন হাড়ি ভর্তি কারণ রেখে গিয়েছিল। সে হেসে হেসে বলেছে সব খেয়ে ফেলেছি। কারুর বেচাল ব্রহ্মানন্দ সহ্য করবে না। এই কথার সূত্র ধরে গোপীদাস জানিয়েছিল যে যোগোদিদি না খেয়ে বসে আছে তার জন্য কোনোদিন তো তাকে না খাইয়ে খায় নি, তাই বসে আছে।

খাওয়া দাওয়ার পর অবধূত শিশুর মত খুশি হয়ে উঠে গান গাইতে লাগল। উদ্দেশ্য যোগোর মানভঞ্জন। তাই শুনে সে পিছন ফিরে মিটিমিটি হাসতে লাগল। লেখক কালকূট অবধূত আর যোগিনীর অপরূপ জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। না-দেখা, না জানা অনেক কিছু তিনি চলতি পথে কাছ থেকে দেখা জীবনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে তাঁর আপন রচনাশৈলীতে। অবধূত-যোগিনীর না জানা জীবিনকথা লিখেছেন অত্যন্ত দরদ দিয়ে। অবধূত গান ধরেছেন,

'ই সব ক্ষ্যাপা মায়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভোবন বিভোলা
মাগীর আপ্তভাবে গুপ্ত লীলা ---।' *(পৃ: ৪৭৭, ঐ)*

সন্ধ্যার আঁধারে বক্রেশ্বরের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল। শিবমন্দিরগুলোকে নিরেট কিম্ভূত স্থির কালোমূর্তির মত লাগতে লাগল। দিনের আলোয় যাকে দেখেছিলেন, রাতের অন্ধকারে সে বদলে যায়। গোপীদাসের সঙ্গে 'এক নরমুণ্ডমালিনী ঘোর কৃষ্ণা ভয়ংকরী, লোলজিহ্বাবদনী, নগ্না চতুর্ভুজা। বক্রেশ্বরের কালো রাত্রির সকল অন্ধকার গায়ে নিয়ে এ যেন আর এক রূপ।' *(পৃ: ৪৭৯, ঐ)* মহাশ্মশানে তিনটি চিতা জ্বলছে। এক যুবতী বধূ তার শিশুসন্তানকে নিয়ে স্থির তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত চিতার দিকে। ক্রন্দনরত এক বৃদ্ধাকে এক ডোম বলছে 'কেঁদে নিক'। পাপহরা জলের কাছে এক গেরুয়াধারী মানুষ আর এক গেরুয়াধারিণী বসে আছে। গেরুয়াধারিণী প্রৌঢ়া একদল শ্মশানবাসীর সঙ্গে কথা বলছে। পাপহরার ওপারে বক্রেশ্বর মন্দির। এরকম একটা পরিবেশে দাঁড়িয়ে কালকূটের মন অন্য এক অনুভূতিতে ভরে ওঠে। তাঁর মনে হয় তিনি যেন এক দূরকালে দাঁড়িয়ে আছেন। যে কালের হিসাব তিনি পিছন ফিরে পান না। আবার সামনে তাকিয়েও অথই পারাবার। গোপীদাস তাকে হাত ধরে আরও পুবের দিকে নিয়ে যায়। একটা গালাগালিমিশ্রিত গালি আর মারের শব্দ শুনে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লেন। গোপীদাস বাবাজী জানাল যে ঠ্যাঙা বাবা একজনকে পেটাচ্ছেন কিন্তু যাকে পেটাচ্ছেন সে আত্মরক্ষার চেষ্টা না করে বলে যাচ্ছে 'অই গ বাবা, মার, আমাকে মেরো ফ্যাল গ, আমার পাপ ঘুচুক।' *(পৃ: ৪৮০, ঐ)* এমন আকুতি কালকূট কখনো শোনেন নি। তাঁর মনে আর এই গানটি ভেসে উঠে 'আরো আরো আরো, প্রভু আরো— এমনি করে আমায় মারো।' *(পৃ: ৪৮০, ঐ)* কালকূট ভাবছেন এ কেমন বিশ্বাস, 'আপন রক্তমাংস নিগ্রহের মূল্যে এ বিশ্বাস কেমন করে আসে। আমি তো ভাবতে পারি না। তার কান্নার মধ্যে দেহের কষ্ট ফোটে না। প্রাণের যন্ত্রণা জাগে।' *(পৃ: ৪৮০, ঐ)* আবার পরক্ষণেই বলছেন 'এ' আমি তো কোনো দিন দিনও পারবো না।' *(পৃ: ৪৮০, ঐ)* তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে দুটো বৈপরীত্য উঠে এসেছে। এই মার খাওয়া মানুষটিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকারে মানুষ ভেবে অবজ্ঞাও করতে পারেন না, সে সাহস আমার নেই। তিনি কোনও তর্ক-বিতর্কের অবকাশ দেন নি। নিজেরই মনের প্রশ্ন এক চরিত্রের মুখে বসিয়ে দিয়েছেন, আর লেখক চরিত্রের মুখে সেই কথা বসিয়ে তার উত্তর দিয়ে তর্ক-বিতর্কের অবসান করেছেন। গোপীদাস বাবাজী বলল যে তাঁকে ওই প্রথম দেখল, বেশিদিন হল উনি আসেন নি। তাই শুনে কালকূট তাঁর কাছে যেতে চাইলেন না কিন্তু গোপীদাস তাঁকে জোর করে নিয়ে যায়। ওখানে আরও কয়েকজন মার খাওয়ার আশায় উদ্বিগ্ন মনে অপেক্ষা কর, দু'জন স্ত্রীলোকও আছে। ঠ্যাঙাবাবা তাঁদের চেয়েও দেখলেন না। ওনাকে দেখে মনে হচ্ছে ' যেন কিসের একটা যন্ত্রণার জ্বালা, গভীর ভাবনায় স্থির চোখ, অথচ একটা কষ্টের ছাপ। কে ইনি? কেন মারেন? কেন এদের এত বিশ্বাস?' *(পৃ: ৪৮০, ঐ)* তাঁর মনোভাবনা উঠে এসেছে এইভাবে 'ধর্মাধর্ম জানি না, বুঝি না। ভাবি কত বৈচিত্র্য এই সংসারে। কত বিচিত্র মানুষ। এমন বিচিত্র দৃশ্য যে

কোনোদিন দেখব, কয়েক মুহূর্ত আগেও ভাবিনি। আমার চলার পথের ধারে শেষ পর্যন্ত কেবল বুকের কাছে দু'হাত জড়ো করে স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকি।' *(পৃ: ৪৮০, ঐ)*

বক্রেশ্বরে রাতের আঁধারে বিচিত্র মানবরূপ দেখে যাচ্ছেন। গোপীদাস বাবাজী তাঁকে হাত ধরে ধরে এক এক এক জায়গায় এক এক রকম করে আলোকিত করছে। গোপীদাস বাবাজী তাঁকে পাতার কুটিরের দিকে নিয়ে যায়। আগুনের সামনে একজন নগ্ন পুরুষকে দেখতে পান। তারও দৃষ্টি দুরান্তে। কালকূটের ভাবনা এখানেও তার কি একটুও শীত করে না। 'দূর অন্ধকারের প্রকৃতিতে কী রূপ দেখে এমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য! যেন এই জগতে নেই। যেন জগৎ পারাবারের ওপারে অলক্ষ্যে চলে কিসের লেনাদেনা। তুমি আমি নেই সেথায়।' *(পৃ: ৪৮০-৪৮১, ঐ)* নগ্নপুরুষটি প্রণাম করে গোপীদাস বাবাজী বসে পড়ে। তাঁর অনুরোধে ভাঙা ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করে — 'মনের মানুষ খুঁইজলে কোথা মিলে?

আমি (আমি গ আমি আমি) আমি
দুখের দুখী দেইখতে পাই না,
আত্মসুখী সক্কলে।
বল, খুঁইজলে কোথা মিলে?' *(পৃ: ৪৮১, ঐ)*

নগ্নপুরুষটি বলেন 'খুঁইজতে খুঁইজতে।' গোপীদাস আবার বুকে ঠুকে গায়,

'কিন্তন আপগরজী ভাব জান্যে না
গরজে সদাই চল্যে' *(পৃ: ৪৮১, ঐ)*

একতারা, দোতারা বায়া ডুপ্‌কি কিছুই নেই অথচ গোপীদাস আত্মমগ্ন হয়ে চাপা মিঠে সুরে গান গাইছে। তিনি অভিভূত। গানে গানে দু'জনের কথাবার্তা চলতে লাগল। সেই গান শুনে নগ্ন পুরুষের মুখভরা হাসিতে চোখ থেকে জল পড়ে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়াতেই বুড়া বাউল গোপীদাস ঝাঁপ দিয়ে তাঁর আলিঙ্গন গ্রহণ করল। দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে দোলে। "দিগম্বর বলে, 'সবই খুঁইজতে খুঁইজতে মিলে হারানোটাও মিলে।'

এ ভাবের নাম কী, আমি জানি না। কিসের ভাব তাও জানি না।" *(পৃ: ৪৮১, ঐ)*

আগুনের আলোয় এক বিস্ময়কর মানবলীলা পাঠককুলের সামনে তুলে ধরে। একের পর এক রূপ বৈচিত্র্য গোপীদাসের হাত ধরে কাহিনীতে তুলে এনেছেন। ধর্মাচরণের কত রূপ। কিন্তু ধর্মের এই রূপ বৈচিত্র্য কাহিনীতে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেটা পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। তাদের মনও কালকূটের সঙ্গে বিস্ময়ের দোলায় দোলায়িত হয়ে ওঠে। গোপীদাস বাবাজী এঁকে কোনোদিনও দেখেনি। কালকূটের জন্যই এমনকি সম্ভব হয়েছে। 'এয়্যার মধ্যে শক্তি আছে, দেইখলেই মনে ল্যায়। এয়াঁর হইয়েছে, নিশ্চয় হইয়েছে, দেখ্যে বুইঝলে তো বাবাজী।' *(পৃ: ৪৮১,*

ঐ) অঘোরী বাবার সঙ্গে গোপীদাস বাবাজীর গুরুর সঙ্গেও তো এইরকম ঘটনা ঘটেছিল। এর মিলও অঘোরী বাবার মত। এই ঘটনার কথায় কালকূট বলেছেন 'বিচিত্র সেই জগতের, সেই মানুষের কথা কিছুই বুঝি না। অঘোরীবাবা, গোপীদাসের গুরু, সদ্য দেখে আসা নগ্ন ভাবানন্দ পুরুষ।' *(পৃ: ৪৮২, ঐ)* মৌনীবাবারা আশ্রম আর 'অক্ষয় বট' দেখে ব্রহ্মানন্দর আশ্রমে ফিরে এলে যোগোমতীকে অন্যরূপে দেখলেন। কপালে মস্ত একটা সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতেও টানা। ঠোঁট দুটি লাল, পা দুটো আলতা দিয়ে রাঙানো। আগুনের লাল দেখাচ্ছে। রুদ্রাক্ষের কালাটি কাপড়ের উপর বুকে তুলছে। মুখে একটু রসের গন্ধও আছে। করোটিতে কারণ বারি নিয়ে কালকূটকে পান করতে বললেন। গোপীদাস বাবাজী শরীর খারাপ হতে পারে ওকে কালকূটকে কারণ বারি খাওয়া থেকে রক্ষা করলেন। এতে ব্রহ্মানন্দ অবধূত তাকে বললেন যে 'তোদিগের ত খালি গাজায় দম মাইরলেই হয়। আর প্রকৃতি ঠাকরুণটি থাকলেই হয়।' *(পৃ: ৪৮৩, ঐ)* ব্রহ্মানন্দ করোটিতে কারণ বারি পান করার পর কালকূটকে একবার বলে দিলেন 'দেইখছিস না, কোনোদিকে লজর নাই, এক বগ্‌গা ছুইটছে। কুথাকে কী এল্য গেল্য, এ বিটার কাঁচকলাটো।' *(পৃ: ৪৮৪, ঐ)* যোগোমতী নিষ্পলক চেয়ে থেকে যেন সম্মোহন করতে থাকে। আর ব্রহ্মানন্দ বললেন 'কাণ খাস নাই। নাই খাস। তবে বাবা, ভক্তি করো, নারীর পূজা কইরবি। পাঁটার মতন পাঁটী পূজা না। বিটা যেমন মা পূজ্যে, মানুষ যেমন দেবী পূজ্যে, তেমনি। তবে হাঁ, খাঁটি নরে যেমন নারী পূজ্যে, সিটিও জাইনবি দেবী পূজার অঙ্গ।' *(পৃ: ৪৮৪, ঐ)* আরও বললেন 'তোর মন আছে, ধ্যান আছে, তা-ই তোকে বলি। তোর এই একটা ভাব আছে, নারী ছাড়া তোর দিন যাবে নাই। যিখানে যাবি, সিখানেই উয়ারা তোর কাছে আইসবে।' *(পৃ: ৪৮০, ঐ)* অবধূত এক ঘোরের মধ্যে বলে যাচ্ছেন 'ধ্যান না থাকলে হয় না শাস্ত্রে বইলছে, সুরা হল্য শক্তি, মাংস হল্য শিব। শিব শক্তির ভক্ত হল্য ভৈরব। তিনে যদি মিল্যে, তবে মোক্ষের কারণ। কিন্তু মদে মাংসে বদহজম কইরলাম, পচা ঢেকুর, মর‍্যা যেইছি বাবা।' *(পৃ: ৪৮৫, ঐ)* তারপরে যোগোকে উদ্দেশ্য করে বললেন যোগোর মত কুলস্ত্রী পেয়েও তিনি শক্তি পূজা করতে পারলেন না। এই কথাতে যোগোমতী উত্তর দিয়েছিল যে তাঁর পূজা যেন চিরকাল করে যেতে পারে। যদি তাঁর কোনো শক্তি থাকে তাহলে যেন তাই হয়।

এঁদের দু'জনের কথা শুনে কালকূটের মনে হয়েছে তন্ত্রমন্ত্র সাধনকে দূরে সরিয়ে রেখে তারা যেন হৃদসায়রে ভাসছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন মান অভিমানের পালা চলছে। ব্রহ্মানন্দ নতুন ভৈরবীর কাছে গিয়েছিল, তাই সেই অপরাধবোধ থেকে অবধূত ঐরকম বললেন আর তারই উত্তর দিয়েছে যোগোচারী। একজন তন্ত্র সাধক ভৈরবীর একসঙ্গে দীর্ঘদিন সাধন-ভজন করার পরে যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তাই তিনি একটু একটু করে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। কঠিন জিনিসের ব্যাখ্যা তিনি সর্বসাধারণের বোধগম্য করে বলেছেন। সাধক-সাধিকা এই দুইয়ে যদি

পরস্পরকে পূজা করতে পারে তবেই সকল পূজার ফল লাভ হবে। অবধূত আবার করোটিতে বারি করে নয় প্রকার কুলস্ত্রীর কথা বললেন। 'তবে হ্যাঁ, সব থ্যেকা সেরা কুলস্ত্রী জাইনবে সি-ই, যে "বিশেষবৈদগ্ধ্যযূতা সর্বা এব কুলাঙ্গনা।" ' *(পৃ: ৪৮৫, ঐ)* অর্থাৎ পরপুরুষগামিনী দিক্ষা হলে, সে-ই কুলস্ত্রী হবে। 'কুলাচারীর মতে, আগমোক্ত পতি শিবস্বরূপ, তিনিই গুরু। বিবাহিত পতি, পতি না। কুল পূজায়, স্বামী ত্যাগ করলেও নারীর দোষ নেই। এই কুলনারী সাক্ষাৎ কালীস্বরূপা।' *(পৃ: ৪৮৫, ঐ)* তারপর অবধূত যোগোমতীকে 'মহামায়া' বলে ডেকে তার সঙ্গে ষট্চক্র বিষয়ে কথা বলতে থাকেন। তিনি একে একে 'মা, মেরুদণ্ডের দুই পাশে কী আছে?' যোগোমতী বলছে, 'ইড়া পিঙ্গলা নাড়ি।' একের পর এক প্রশ্নের জবাব যোগোমতী দিতে থাকে। কালকূট অবাক হয়ে শুনতে থাকেন ষটচক্র কী, দেহের মধ্যে এত বিচিত্র জটিল যন্ত্র কী অবাধ কৌতূহহলে শুনতে লাগলেন। আর ভাবতে লাগলেন 'পরম বিস্ময় লাগে বাঙলা দেশের কোনো কে পাড়াগাঁয়ের, একটি তাঁতী বউয়ের মুখে এসব কথা শুনে। এ যোগোমতীকে এখন যেন আর চিনতে পারি না। তার গলার স্বর ভিন্ন। সে যেন অন্য জগৎ থেকে কথা বলে। দৃষ্টি স্থির, ধ্যানমগ্না, এক ধরনের সমাধিস্থ ভাব যেন। সিঁদুরের রক্তটিপসহ, এখন সে যেন ত্রিনয়নী দেবীপ্রতিমা।' *(পৃ: ৪৮৫, ঐ)* এরপর 'স্বাধিষ্ঠান পদ্মে'র কথা, 'মনিপুরে'র 'বিশুদ্ধ পদ্মের কথা' যোগোমতী আচ্ছন্ন গলায় বলতে থাকেন। 'ই পদ্মে হাকিনী শক্তি রইয়েছেন। ইয়ার উপরেতেই পরমাত্মা থাক্যেন।' *(পৃ: ৪৮৬, ঐ)* আর সহস্র দলে আছে গোলচাঁদের মণ্ডল, 'ত্রিকোণ যন্ত্র' মধ্যখানে পরম শিব। এইকথা বলতে বলতে সে নত হয়ে ব্রহ্মানন্দর পায়ে হাত দেয়। ব্রহ্মানন্দও যোগিনীর দুই হাত নিজের হাতে নেয়। তারপর যোগোমতীকে টেনে তুলে বলেন 'চল ভৈরবী একটু ধ্যানে বসি।' *(পৃ: ৪৮৬, ঐ)*

অস্পষ্ট আলোয় ধ্যানমগ্ন দু'জনকে দেখে মনে হয় তারা যেন পার্থিব জগৎ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেছেন। কালকূট বর্তমান ভুলে গেলেন। তিনিও যেন কোনো এক কালান্তরের ওপারে, বিষ্ময়াবিষ্ট রহস্যের দ্বারে, আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। গোপীদাসের ধ্যান ভেঙে যেতেই কালকূটকে ডেকে নিয়ে ছেঁড়া চাটাইয়ের ওপরে গা এলিয়ে দেন। সকালের চা মুড়ি খেতে খেতে কালকূটের সঙ্গে যোগোমতী পরিহাস করে। কালকূট তাকে বলে যে গতকাল রাতের সঙ্গে তাকে মেলাতে পারছে না। তাই শুনে যোগোমতী প্রায় হাত তুলে থাপ্পড় মারার মতো করে বলে 'তোমার প্তচাখ দুটো গেলে দেবো অমি। তোমার লজর খুব খারাপ।' *(পৃ: ৪৮৬, ঐ)* আবার বলেছে গোপীদাস 'চিতেবাবাজী' নামটা একদম ঠিক দিয়েছে। কিন্তু কালকূট বলেন 'তোমার সেই রূপ অঅমি ভুলব না। আমি কিছুই বুঝি না। কিন্তু তুমি যে এত জানো—।' *(পৃ: ৪৮৬, ঐ)* বিদায় নেওয়ার সময় ব্রহ্মানন্দও বলেন যে 'বিটাটোকে' তাঁরও ছাড়তে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু ছেড়ে তাকে দিতেই হয়। বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে বলেন 'আবার এস্য বাবা। বেঁচ্যে থাইকলে দেখা

হবে।' *(পৃ: ৪৮৭, ঐ)* অবধূতের গলায় করুণ সুর বাজে। ধীরে ধীরে তারা চন্দ্রসায়রের পাশে এসে পড়েন। পিছনের সবকিছুই ঝাপসা হয়ে যায়।

একটি দিন ও রাতে বক্রেশ্বরের বিভিন্ন স্থানের রূপচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল মানুষ-মানুষীকে তিনি অন্যভাবে, অন্যরূপে যেভাবে দেখেছেন তারই ছোট ছোট ঘটনা, ছোট ছোট কথার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। রাতের বক্রেশ্বর দেখতে দেখতে একটা মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। সেদিনের ঘটে যাওয়া ও চোখে দেখা ঘটনাগুলোকে পুরানো দিনের কোনো কোনো যোগীপুরুষের কার্যকলাপের সঙ্গে একাকার করে দিয়ে নতুনের সঙ্গে পুরানো দিনের একটা যোগসূত্র করেছেন। ব্রহ্মানন্দ ও যোগোমতীর মুখ দিয়ে 'তন্ত্র সাধন'-এর মত কঠিন তথ্যকে তিনি বলিয়ে দিয়েছেন এক অস্পষ্ট আলো-আঁধারির প্রশ্নময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। দিনের আলোয় সে স্বপ্নময় আবেশ অন্তর্হিত হয়ে পার্থিব জগতের মানব-মানবী রূপে ধরা পড়েছে লেখকের চোখে।

বক্রেশ্বর গ্রামের পাশে মটরবাস এলে কালকূট তাতে উঠে পড়েন। বাসে ওঠার আগে গোপীদাসের চোখ চিকচিক করে ওঠে। মাত্র কয়েকদিনের পরিচয়েই গোপীদাস কালকূটকে আপন করে নিয়েছেন, তাঁকে মন দিয়ে ভালোবেসেছেন, আলখাল্লা পড়া দরিদ্র একজন বাউল যার মধ্যে এমন সব গুণ রয়েছে যা অনেকেরই নেই, মানবিক গুণ তার মধ্যে বিরাজিত। এবার লেখক কালকূটের যাত্রা আবার সাঁওতাল পরগণার নির্জন বাসে। সেখান থেকে তিনি শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় গিয়েছিলেন। শুধু পৌষ সংক্রান্তি অপেক্ষা। এরপরই কেঁদুল হয়ে দক্ষিণে ফেরা। কিন্তু তিনি চিন্তায় আর কাজে মেলাতে পারেন নি। অট্টহাসের হাসি তাঁর মনে কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল। তিনি চুপ করে বসে থাকতে পারেন নি। দেবীর ওষ্ঠ পড়েছিল অট্টহাসে। বাহান্ন পীঠের এক পীঠ নামে কথিত। শোনা যায় ওষ্ঠ পড়েছিল বলেই নাম অট্টহাস। অট্টহাস গ্রামের সঙ্গে অট্টহাস ক্ষেত্রের ব্যবধান অনেকটাই। লেখক কালকূট লিখেছেন, 'বেলা শেষে, গ্রামের প্রান্তে এসে দেখি, এক তীব্র স্রোতস্বিনী। সুদীর্ঘ বাঁকে কলকলিয়ে যায়। ওপারে ধানকাটা বিশাল মাঠ। তার মাঝখানে ঘন ঝোপের বিশাল মহীরূহের বিস্তৃত অরণ্যের এক দ্বীপ ভেসে আছে যেন। ওই অট্টহাসক্ষেত্র। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না।' *(পৃ: ৪৮৭, ঐ)* তিনি মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে নৌকা করে নদীর ওপারে গিয়ে মন্দির ও দেবতা দর্শন করেছিলেন। কিন্তু তা দর্শন করতে গিয়ে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বাহান্ন পীঠের এই অট্টহাস পীঠ নির্জন গাছপালায় ভরা। সবকিছু মিলিয়ে গা-ছম ছম করা ভৌতিক পরিবেশ। কালকূট বলেছেন, 'আমার সন্ত কিছুর মধ্যে এই অট্টহাসও যেন কোন্ এক স্তরে চাপা পড়ে আছে। *(পৃ: ৪৮৯, ঐ)* লেখক কালকূট অট্টহাস সম্পর্কে তার মনোভাবনাকে ব্যক্ত করেছেন এইভাবে— 'বাহান্ন পীঠের পুরাণ কথা জানি। দেবীর ওষ্ঠ রহস্য বুঝি না। তবুও সব মিলিয়ে এক গভীর কল্পনা মনোজগতে তরঙ্গ তোলে। পৃথিবীতে

কত বিস্ময় আছে। তবু বাঙলার এমন বৈচিত্র্য আর কোথায় আছে জানি না। আকাশের নিচে. দিগন্তবিসারী মাঠের মাঝে এক অরণ্যদ্বীপ। তার মধ্যে কোন্ মানুষেরা খুঁজে পেলো দেবীর ওষ্ঠ। নাম দিয়েছে তার অট্টহাস।' *(পৃ: ৪৮৯, ঐ)*

কালকূট অট্টহাস থেকে গরুর গাড়ি করে নিরোলে গিয়েছিলেন। গরুর গাড়ির চালকের নাম নসীরাম। সে লেখক কালকূটকে জানিয়েছিল যে সে আজ রাত্রে আর ফিরবে না কারণ পথের মধ্যে কোন এক জায়গা নাকি খারাপ। অপদেবতার বাড়াবাড়ি আছে। একলা রাতেরবেলায় চলাফেরা করে দু'একজন প্রাণ হারিয়েছে। নসীরাম উচ্চস্বরে গান গেয়ে ওঠে, 'আমি ওই ভয়েতে মুদি না আঁখি।' *(পৃ: ৪৮৯, ঐ)* কিন্তু বিস্ময়কর ঘটনা হল, মুখোপাধ্যায় গৃহের বাহির দুয়ারে যখন গরুর গাড়ি দাঁড়াল তখন লেখক কালকূট ভাঙ্গা বুড়ো গলায় সেই গানই শুনতে পেলেন, 'নয়ন মুদিলে পাছে তারা-ছাড়া হয়ে থাকি। এই ভয়ে মুদি না আঁখি।' গলার স্বরেই চিনতে পেরেছিলেন স্বয়ং গৃহকর্তার গলা। পূজা মণ্ডপের অন্ধকারে তিনি বসে আছেন। দু'জনে গানের মধ্যে লেখক কালকূট একাদশী জ্যোৎস্নার কুহেলিময়তার মতই এমন একটি অস্পষ্টতা রেখেছেন যা পাঠককে ভাবিয়ে তুলেছে। এবার লেখক কালকূটের যাত্রা কেঁদুলি। কেন্দুবিল্ব। কবি জয়দেবের লীলাক্ষেত্র। বাউলের পাঁচরকম রসিকের এক রসিক কবি জয়দেব। পৌষ সংক্রান্তির দিন জয়দেবের স্মারকোৎসব। কোন বাউল যদি বলে 'জয়দেব যাবো' তার মানেই কেঁদুলি যাবে।

লেখক কালকূট নিরোল থেকে সাঁওতাল পরগণায় ফিরেছিলেন, সেখানে থেকে দুর্গাপুর হয়ে কেঁদুলির বাস ধরলেন। বাসে যেতে যেতে দেখলেন, মাইলের পর মাইল শালবন আর মাঝখান দিয়ে লালমাটির শক্ত সড়ক। শালবনের ডাল, পাতা সব লাল ধূলোয় মাখামাখি। যেন আলখাল্লা জড়ানো মহীরূহ বিবাগী হয়েছে। এই প্রাকৃতিক দৃশ্য কালকূটকে মুগ্ধ করেছে, বাসে ভিড় হলেও শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি লেখক কালকূটের কষ্টটা ভুলিয়ে দেয়। কৃষ্ণা নামে এক যাত্রীর কথায় লেখক কালকূট জানতে পারে যে, সে চিন্তামণিতে যাবে। ভ্রমণপিপাসু কালকূট ভেবেছিলেন সবাই যায় জয়দেব, এ কেন যায় চিন্তামণিতে। এর কারণটা কি? জয়দেবের যাত্রীরা অজয়ের উঁচু বাঁধের কাছে এসে নামে। বর্ধমান আর বীরভূমের মাঝখানে অজয়। লেখক কালকূট বাস থেকে নামলেন চিন্তামণি যাবার ইচ্ছাটা মনে রেখেই। কালকূট অজয় পার হয়ে পাড়ে উঠে মেলাতে দেখলেন, সারি সারি খাবারের দোকান, মনোহারি বাঁশি, পুতুল আরো কতকিছুর পসার। কিন্তু তিনি বাউলদের খোঁজ করে চলেছেন। অজয়ের ঘেঁষে, জমির উপর অনেক গাছ। গাছতলাতে বাউলদের দেখতে পেলেন। তিনি অস্থায়ী আখড়াও দেখলেন। তিনি গাছতলাতে এক জায়গায় এমন একজন বাউলকে দেখলেন, যার ভুবনমোহন রূপ, অল্পবয়স, গলার স্বর যেমন মিষ্টি তেমনি উঁচু। তার এমন গানের গলা যে পাগল করে দেয়। সে হরিণের নাচে। বাউল গান যে লেখকের খুব প্রিয়,

তার উপর অমন সুন্দর গানের গলা, সব দেখেশুনে তিনি চলতে ভুলে গেলেন, বসে পড়লেন। এরপর হঠাৎই গোকুলের বোন কুসুম এসে সেখানে হাজির। কুসুম তাকে নিয়ে যায় লেপামোছা গাছতলায়, সেখানে কয়েকজন বসেছিল তার মধ্যে একজনকে দেখে লেখক অবাক হয়ে গেলেন, চমকিত বিস্ময়ে সে যেন এক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে আর কেউ নয় ঝিনি। এই ঝিনি কালকূটকে ভালোবেসেছিল। কালকূটকে দেখে ঝিনির চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল। কালকূটও সেটা বুঝেছিলেন, তিনি খুব সুন্দরভাবে ঝিনির চরিত্রটি অঙ্কিত করেছেন। গায়ক বাউলের দিকে তাকাতেই লেখক দেখেন, স্বয়ং গোপীদাস গান ধরে— 'অ রাই, কিছুদিন মনে মনে, যতন করে শ্যামের পীরিত রাখ গোপনে।' *(পৃ: ৪৯২, ঐ)*

ঝিনির আজ সাজগোজ, বেশভূষা তেমন পরিপাটি ছিল না, সেই তুলনায় তার সঙ্গে লিলিও এসেছিল, সে অনেক বেশি ফিটফাট হয়ে এসেছিল। লেখক বলেছেন "ওর তুলনায় ঝিনিকে বৈরাগিণীই মনে হয়।' *(পৃ: ৪৯২, ঐ)* এই একটি বাক্যের মধ্যে লেখক কালকূট ঝিটির মনোবেদনা, মানসিক পরিস্থিতি ফুটিয়ে তুলেছেন। ঝিনির কথা বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন যে, 'ওর মুখের দিকে কয়েকমুহূর্ত চেয়ে হঠাৎ আমার দেখাটা বদলে যায়। ওর চোখ দিয়ে যেন ওকে দেখতে পাই আর তখন হাসির মধ্যেও একটা কষ্ট কেমন খচখচিয়ে ওঠে।ও এসেছে অনেক দ্বন্দ্বের মধ্যে ধন্দের দোলায় দুলতে। অনেক সংশয়ে হাতড়ে ফিরে প্রতি মুহূর্তে হতাশা কাটিয়ে চোখের আলোয় আশা ফুটিয়ে। ওর সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। এ এসেছে যোগিনী হয়ে এসেছে। ওর সবকিছুতেই সেই ছায়া, সেই রূপ।' *(পৃ: ৪৯৩-৯৯৪, ঐ)* এই কথাগুলো দ্বারা কালকূট ঝিনির প্রেমকে এক উচ্চপর্যায়ে নিয়ে গেছেন, ঝিনির মনোবেদনা এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যে পাঠক ঝিনির মনোবেদনার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন। ঝিনি কালকূটের কাছে জানতে চেয়েছিল যে, জয়দেবের মেলাতে সে আসবে জানলে কালকূট কি এই মেলাতে আসতেন? কালকূট জবাব দিয়েছিলেন, 'আসতাম।' ঝিনি জানিয়েছিল, তার বিশ্বাস হয় না, কেন বিশ্বাস হয় না সে জানে না, তার মনে হয় সে যেখানে থাকবে কালকূট চায় তাঁর অনেকদূর দিয়ে চলে যেতে। ঝিনির দাদার অসময়ে মৃত্যু হয়েছে, দাদার বন্ধু সেও কারাবাসে আছে, তার স্বামী যার সাথে তার আইনত বিয়ে হয়েছিল সেও অকালে মারা গেছে অথচ তার যে বিয়ে হয়েছিল সেকথা তার বাবা-মাকে জানায় নি, বাবা-মা জানেন না। এইসব ঘটনা কিছুই প্রত্যাশিত ছিল না, সব মিলিয়ে কিছু মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা তার আছে। লেখক কালকূট ঝিনির অসহায় রূপটি চিনতে পেরেছিলেন। ঝিনির মনোবেদনা লেখক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। উপন্যাসটিতে কালকূট ঝিনির এই দিকটি দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন যা কিনা পাঠকমনকে স্পর্শ করেছে। গোপীদাস বাউল কালকূটকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন জয়দেবের মেলাতে। গোপীদাস বাউলের সেই আন্তরিক আলিঙ্গনে

কালকূটের মনটা টলটলিয়ে ওঠে। তিনি বলেছেন, 'হঠাৎ মনে হয়, গোপীদাসের পায়ে হাত দেওয়া উচিত ছিল আমার। কিন্তু লজ্জা করে। আমি যে আমাকে ছাড়তে পারি না। নিজেকে ভুলতে পারি না। তাই নানা লজ্জা, নানা সঙ্কোচ।' *(পৃ: ৪৯৫, ঐ)* এই উপন্যাসে নিতাই একটি চরিত্র। যে কিনা দাগী চোর থেকে ভালো মানুষ হয়েছিল গোকুল বাউল আর তার প্রকৃতি বিন্দুর ভালোবাসায়। নিতাই লেখককে জানিয়েছিল, যে সে একজন দাগী চোর ছিল। জেলখাটা আসাম। সিঁদেল চোর। সে এখন গোকুল-বিন্দুর কাজকর্ম করে। বিন্দু ওদের ভাষায় নিতাইকে বলেছিল, চুরি যদি করতেই হয় তবে একটা জিনিস চুরি করবি, সেটা হচ্ছে 'মন'। নিতাই-এর কথাগুলো কালকূটের মনকে ভাবিয়ে তুলেছিল, তিনি অবিশ্বাস্য আশ্চর্য কাহিনী শুনলেন। নিতাইয়ের মুখের ওপরই গোকুল বিন্দুর মুখ কালকূটের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এই যুগল রূপকে তাঁর ভালো লেগেছিল। সেই ভালোলাগাটা চোখ ভরানো। এখন জানলেন, এ যেমন-তেমন যুগল না। আপন অন্বেষণে আছে।

উপন্যাসটিতে বিন্দু চরিত্রটিকে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে কালকূট ফুটিয়ে তুলেছেন। ঝিনি লেখক কালকূটকে বলেছিল যে, সে যদি বিন্দুর সঙ্গে না মিশত তাহলে জানতেই পারত না বিন্দু কী আশ্চর্য মেয়ে। লিলিও জানিয়েছিল যে, বিন্দুর কাছে নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়। সত্যি, সে কিছুই জানে না, কিছুই দেখেনি। ঝিনি কালকূটকে জানিয়েছিল যে, বিন্দু পরিষ্কার 'জয়দেবের কবিতা' বলতে পারে। সংস্কৃত উচ্চারণই কেবল কবিতা বলে, মানেও প্রায় সবই বোঝে। তাইতো কালকূট বলেছেন যে, গীতগোবিন্দের রচনা শোনা তার ভাগ্যে ঘটেনি। রাঢ়র এক সামান্য বাউল প্রকৃতি সে হেথা-হোথা আলখাল্লাধারী পুরুষের সঙ্গে গান গেয়ে গেয়ে বেড়ায়, কেবলমাত্র এক জোড়া প্রেমজুরি, গলায় কিছু গানের ডালি, সে যদি গীতগোবিন্দ বলতে পারে। ঝিনি, লিলি ও লেখক কালকূট তিনজনে মিলে মেলাতে মেলাতে যায়, নদীর ওপারে তারা চলে যায়। নিরালায় যেতে চায় ঝিনি, কিছুটা গিয়ে ঝিনি কালকূটের হাত ধরে বলেছিল 'বালি শুকনো, ওখানে একটু বসবে?' *(পৃ: ৫০৭, ঐ)* তারা বসে। মেলার আলো যেন তাদের গায়েও এসে পড়েছে। ঝিনি কালকূটকে বলেছিল, আজ সারা রাত মদন বাউলের আখড়ায় দু'জনে গান শুনবে। ঝিনি কালকূটের কাছে জেনে নিয়েছিল যে, এরপর কালকূট কোথায় যাবেন। কালকূট উত্তর দিয়েছিলেন, পীর গোরাচাঁদের মেলাতে গাজীর সঙ্গে দেখা করতে। গাজী সেই মানুষ, যার সঙ্গে সে প্রথম দেখে কালকূটকে। সেদিনের স্মৃতির মধ্যে ভুলে গেল সে। একটি কথা না বলে নদী পার হয়ে চলে আসে।

ঝিনি, লিলি ও কালকূট মদন বাউলের আখড়ায় পাশাপাশি বসেছিল। ঝিনি কালকূটের চাদরটা টেনে একেবারে পা অবধি ঢেকে দিয়েছিল। ঝিনি ক্লান্ত ছিল, লেখক তাকে শুতে বলেছিলেন। ঝিনি কালকূটের পায়ের কাছে মাথা রাখতে চাইলে কালকূট তাকে তার কোলের উপরেই রাখতে বলেছিলেন। মুহূর্তে ঝিনির মুখের পরিবর্তন হয়। 'অস্ফুটে একবার উচ্চারণ করে

'বিষ'। স্পষ্ট করে বলে 'যাবার আগে একবার ডাক দিও।' ঝিনি কালকূটের পায়ের কাছে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছিল। চাদরের ভিতর দিয়ে ওর একটা হাত কালকূটের পায়ে এসে পড়ে। শেষ রাত্রির আগেই ঝিনির চোখ বুজে গিয়েছিল। কালকূট দেখলেন 'ওর ঘুমন্ত মুখে যেন বিষণ্ণ হাসির আলোছায়া মাথা।' *(পৃ: ৫০৮, ঐ)* কালকূট আস্তে আস্তে পা থেকে ঝিনির হাত সরিয়ে দিলেন। ঝিনি তখন গভীর ঘুমে অচেতন ছিল। কালকূট বেরিয়ে আসেন। বিন্দুর কাছ থেকে ঝোলাটা নিয়ে বিদায় নেন। ঝিনি পড়ে থাকল আশ্রমে ঘুমন্ত অবস্থায়। সে জানাল না তার ভালোবাসার মানুষটিকে চোখ খুললে আর দেখতে পাবে না। সে যে বুঝেছিল এই মানুষকে বাঁধা যায় না, তবুও তার মনপ্রাণ সর্ব্বস্য তাঁর পায়ে নিবেদন করেছিল। তার কান্না, মনোবেদনা শ্রীরাধার আর বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্না আর মনোবেদনার সঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে। কালকূট মনে মনে জয়দেবকে স্মরণ করলেন। তিনি ভাবলেন তিনি কেমন দেখতে ছিলেন কে জানে, শুধু জানেন তিনি কবি ছিলেন। এ যেন অজয়ের জলে কুয়াশার মতো। তিনি শুধু জানেন জয়দেব পদ্মবতীর মন, চরণচারণ চক্রবর্তী।

জয়দেবের রাত পোহাতেই মাঘ মাস। ফেরার পথে কালকূট নবদ্বীপে যান। সেখানে ধূলট উৎসব। বৈষ্ণবদের আগমন এই নবদ্বীপে। নিমাইক্ষেত্রে গান নিবেদন করতে আসে এই সময়ে বৈষ্ণবরা। যে ধূলায় নিমাই হাঁটা চলা করেছে, গড়াগাড়ি দিয়েছে, সেই ধূলাতেই ভক্ত গায়কের গড়াগড়ি। কালকূট মাধবী দাসীর গান শুনলেন। কান্না আর বিরহের গান। গান শুনলে চোখে জল চলে আসে। সুদেব গোস্বামীর গান শুনলেন। তিনি ধূলায় গড়িয়ে, গড়িয়ে গান করেছিলেন। তাঁর গান ছিল, নিমাই-হারা, নদীয়াবাসীর গান, পুত্রহারা শচীমাতার গান, স্বামীহারা বিষ্ণুপ্রিয়ার গান। 'হাজার চাঁদে আলো করুক, নদের আকাশে আর চাঁদ নাই।' *(পৃ: ৫১০, ঐ)* কালকূট বলেছেন 'মন্দিরে মন্দিরে আখরায় গান শুনি। ধূলট উৎসব না দেখলে, এ গান না শুনলে নবদ্বীপের মরমে যে রস বহে, তা জানা যেতো না।' *(পৃ: ৫১০, ঐ)* লেখক কালকূট এই উপন্যাসটিতে নবদ্বীপের ধূলট উৎসব সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সংক্ষেপে হলেও তিনি যতটুকু ব্যক্ত করেছেন তার প্রসারতা কম নয়। নিমাই নবদ্বীপ ছেড়ে চলে গেছেন, শচীমাতার বুক ফাঁকা করে, শচীমাতার কান্না, হাহাকার, স্বামী চলে গেছে না বলে কয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্না, তার মনের হাহাকার মনোবেদনা যা চিন্তা করলে চোখে জল রাখা যায় না। নিমাইহারা নদীয়াবাসী, তাদের হাহাকার, কান্না পাঠকমনকে স্পর্শ করে। যে পথ দিয়ে নিমাই হাঁটাচলা করেছেন সে পথে তাই ভক্তবৃন্দের গড়াগড়ি তারা আজও নিমাইকে স্মরণ করে। এই উৎসবের শেষে তিনি 'পীর গোরাচাঁদের মেলায়' যাবেন। গাজী নিমন্ত্রণ, ১২ই ফাল্গুন মেলা। কিন্তু তার আগে মাঘের পূর্ণিমায় কুলীন গ্রামের শ্যামের মন্দিরের উৎসব দেখে যান। দেখতে পান ভক্ত হরিদাসের স্মৃতিমন্দির, বিশাল একটা গাব গাছের

নীচে সে মন্দির। গাব গাছটিকে দেখে তাঁর মনে হল 'যুগ-যুগান্তর' ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কুলীন গ্রামের পর নৌগ্রামে জলেশ্বরের ক্ষেত্র দেখে যেতে ভোলেন না। শিবরাত্রির দিন বছরের কয়েকদিন উৎসব হয় সেখানেই। সে-ই বসিরহাট থেকে চলা শুরু করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রং রূপের সঙ্গে সেখানকার কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও পথ চলতে তাঁর দেখা হয়ে যাওয়া মানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন "মানুষ সেখানে আর এক জগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছে। দেখি, পথ চলি, দেখি। 'তবু ভরিল না চিত্ত।' ভরবেও না। কিসের খোঁজে ফেরা, তার সন্ধান যে জানেনি, তার ভরাডুবির কোনো কথা নেই। শুধু এই এক, দেখি, চলি আর দেখি, নানা মানুষ। ভাবের পটে, ছবির মতন। এত বিচিত্র, বিস্ময়কর, অভয় মন-প্রাণের শূন্যতার কথা ভুলে যাই। বৈরাগ্য আমার নেই, আমি বৈরাগী না। তাই অনেক শূন্যতার মধ্যেও যে বিচিত্র বিস্ময়কে দেখি, তার সামনে দাঁড়িয়েই সহসা স্তব্ধ হয়ে যাই। বুকের কাছে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে পড়ি।" *(পৃ: ৫১০, ঐ)*

এরপর আবার বসিরহাটগামী বেড়াচাঁপার কাছে নামেন। 'এবার হাড়োয়ার পথে। আমার গাজীর নিমন্ত্রণ।' *(পৃ: ৫১০, ঐ)* মনে ইচ্ছা সেখানে গাজীর সঙ্গে দেখা করে 'যাবো দূর দক্ষিণে, দূর দরিয়ার কূলে। সুন্দরবন, সাগরসঙ্গমে।' *(পৃ: ৫১০, ঐ)* গাজীকে অনেকবার বলেছেন যে 'গাজীটা পাজী' আসলে সে হল 'রসের পেয়াজিতে পাজী'। তাঁর সারা মন গাজীর রসে পূরিত। সারাটি পথ জুড়ে গাজীর কথা মনে করতে করতে গেলেন। বাসে কালো আলখাল্লা, কালো পায়জামা, মাথায় কালো টুপি, গলায় গুচ্ছের কাঁচপাথর পুঁথির মালা আর হারপরা এক মুসলমান ফকির তাঁর সঙ্গে আলাপ জুড়েছিল। পীরচাঁদের কাহিনী শুনিয়েছিল। মক্কা থেকে এসেছিলেন তিনি, অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। বালান্ডার রাজা চন্দ্রকেতু মুসলমান হতে চাননি বলে তিনদিনের মধ্যে সর্বনাশ করেছিলেন। হাতিয়াগড়ের রাজা আকানন্দকে তিনি যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন আর তাই ভাই বাকানন্দর কাছে তিনি হেরে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিলেন। ভার্গবপুরের কানু আর কিনু ঘোষ তার সেবা করেছিলেন। কিন্তু তিনি মারা গিয়েছিলেন। 'তাঁর হাড় যেখানে কবর দেওয়া হয়, তার নাম হাড়োয়া, আর ভার্গবপুর নয়। তাঁর অলৌকিকতার জন্যে, হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁকে পুজে। এই হলো ইতিবৃত্ত।' *(পৃ: ৫১১, ঐ)* দূর থেকে একটা ধ্বনির কিছু অংশ শোনা যাচ্ছে " 'হজরত শাহ সৈয়দ পীর গোরাচাঁদ রাজী!' ... কিংবা, 'আশ্বাস আলী রাজী রহমতুল্লাহ।' " *(পৃ: ৫১১, ঐ)* গন্তব্যস্থানে নেমে তাঁর বারবার কালীনগরের কথা মনে হয়। হাটের মধ্যে ঢুকে পড়ে জনস্রোতের চাপে কোনদিকে যান বুঝতে পারেন না। মসজিদের কাছে এসে এক জায়গায় একতারার শব্দ কানে আসতেই তার বুকটা ধড়াস করে ওঠে গাজীর জন্য। গান চলছে 'অহে, সাঁই আমার যখন খেলে, কী খেলা।' ... *(পৃ: ৫১১, ঐ)* সমাধিক্ষেত্রের দরজা দিয়ে ভেতরের দিকে এগিয়ে যান। গাছেরতলায় মস্ত খোলা আঙিনায় তার নীচে গুচ্ছে গুচ্ছে বসে সবাই ভজনা করছে সেই ধূলি

আলখাল্লা, ডারা-ডুপ্‌কি খঞ্জনী একতারা নিয়ে। সমাধির মূল দরজার কাছে ভীড় দেখে জানতে চাইছেন "'ওখানে কী হচ্ছে?' 'ওখানে সবাই পুজো-হাজোত দিচ্ছে। পীরের হাজোত দেয় না? তাই দিচ্ছে।'" *(পৃ: ৫১১, ঐ)* হঠাৎ তাঁর মনে হল, তিনিও পীরের পুজো দেবেন। মনে মনে আরও ভাবছেন পীরের পূজা কতখানি হবে তা তিনি জানেন না কিন্তু 'গাজী আর নয়নতারাকে ডালি ধরে দিতে পারব। গাজীর নয়নতারার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সেটাই উপহার।' *(পৃ: ৫১২, ঐ)* হাড়োয়ার মেলা এত বিশাল যে তিনি ভাবতে পারেন নি। তার মনে হচ্ছে এই মেলায় দোকানদার যারা দোকান খুলেছে তাদের অধিকাংশই মুসলমান। বার বার তাঁর মনে কালীনগরের স্মৃতি উঁকি দিচ্ছে। কোথাও পীরচাঁদের উঠতি আখ্যায়িকা নিয়ে আসর জমিয়েছেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পায়ে ঘুঙুর পড়ে ঘুরে ঘুরে নেচে গান করে 'সজনী তর ভরা কলসী ছপছপায়ে পড়ে গো।' ... *(পৃ: ৫১২, ঐ)* কিন্তু সবই তো দেখছেন কিন্তু গাজীকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না। 'নিমন্ত্রিত ঘুরে ফেরে, নিমন্ত্রণকর্তার দেখা নেই কেন। পারাপারের ঘাটের কাছে আসি। সবখানেই কিছু দরবেশ, ফকির বাবাজী বৈরাগীদের দেখা পাওয়া যায়। কেহ গায় বসে, কেহ ঘুরে ঘুরে। আমার গাজীটা কোথায়!' *(পৃ: ৫১২, ঐ)* শেষ ঘাটে গিয়ে বুড়ো মাঝির কাছে নৌকার খোঁজ করলেন দক্ষিণের দিকে যাবেন বলে। ফাল্গুন মাস, বাতাস উঠে যাবে বলে ভালো মাঝির দরকার এই কথা বলে সে সত্য মাঝিকে ডেকে আনল। তাকে দেখে কালকূটের মনে হল 'বয়স বেশী না, তবে 'খাটোর ওপরে শরীরখানি যেন পাথরে খোদাই', বলিষ্ঠ দেহ, উস্‌কো খুস্‌কো চুল। বয়সের তুলনায় একটু গম্ভীর। সে এসে জিজ্ঞাসা করে কোথায় যাবেন তিনি? বনে-সাগরে যাবেন কালকূট বলেন। সে নির্বিকার ভাবে বলে 'চলেন। হিসাব করি যা হয় দিবেন। তবে কিছু চাল-ডাল তরিতরকারি এখান থেকেই কিনে নিতি হবে। দুইজন মাঝি আর আপনি। তিনজনের খাবার। মিঠে জল জালায় করে নেবো।' *(পৃ: ৫১২, ঐ)* জোয়ার আরো দু'তিন ঘণ্টা আছে, ভাটা পড়লে যাবে। লেখক কালকূট জেনে নিলেন তার নাম সত্য বাউল, এরা গুণীন বাউল। কালকূটের ওকে বাউল বলেই মনে হয়েছে। তার সঙ্গে কথা বলেই গাজীকে খুঁজতে থাকেন, কোথাও না পেয়ে ভাবতে থাকেন কোনো কারণে কি গাজী আসতে পারে নি। বড় সড়কে গিয়েই থম্‌কে দাঁড়িয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই "উদগত চোখের জলে রুদ্ধ স্বরে ঝিনি বলে ওঠে, 'ঘুম ভাঙিয়ে ডাক দিয়ে এলেও তোমাকে আটকে রাখতাম না।'" *(পৃ: ৫১৩, ঐ)* উদ্‌ভ্রান্ত ঝিনির চোখের জলে ভাসছে। এই ফাগুনের চড়া রোদে ওর রঙটা পুড়ে গেছে, সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হাড়োয়ার ধূলা। 'এই প্রথম ওকে আমি কাপাসী রঙ-হীন সাদা কাপড়ে দেখলাম। জামাটাও তা-ই। কাপড়ের পাড়ে পর্যন্ত কোনো ঔজ্জ্বল্য নেই। হালকা বাসন্তী রঙের পাড়। হাতের গোল, কাপড়ের ব্যাগটাই যা একটু নাগরিকতা রক্ষা করেছে। হাতে গলায় অলঙ্কার না থাক, হাতের ঘড়িটারও কি দরকার নেই।' *(পৃ: ৫১৩, ঐ)* ঝিনি একাই এসেছে,

সে জানায় যে 'তুমি আসবে বলেছিলে---গাজীর নিমন্ত্রণে। তাকে আমারও একটু দেখতে ইচ্ছে করল, তাই চলে এসেছি।' *(পৃ: ৫১৩, ঐ)*

কালকূট গাজীর আমন্ত্রণে মেলায় এসে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ঝিনি জানিয়েছে সেও খুঁজেছে কিন্তু কোথাও খুঁজে পায়নি. সে কালকূটকে দেখলে তাঁকেও খুঁজে পাবে। দু'জনে আবার সমাধির কাছে গেলে ঝিনি বলে সে এখানেও কালকূটকে খুঁজে গিয়েছে। কালকূট বললেন 'আমিও খুঁজেছি।'। তাদের খোঁজা দেখে একজন বুড়ো দরবেশ জানায় যে সে তাঁকে চেনে। 'গলাখানি বড় সোন্দর ছিল। জয় মুরশেদ।' *(পৃ: ৫১৩, ঐ)* কালকূট জানতে চান, 'সে কি আসেনি? বুড়ো দরবেশ উদাস গলায় বলে, আসবে কেমন করে, তার মোক্তারনামা সব যে শেষ হয়ে গেছে। কালকূটের বুকটা উড়াস করে ওঠে। এ'কথার মানে জানতে চান, ''বুড়ো বলে, 'সে তো আর নাই বাবু। এই মাঘ মাসের মাঝামাঝি সে তো ডানসায় ডুবি মরেছে।'

'ডানসায়?'

'ডানসা গাঙে নৌকা থেকে জলে পাড়ি গিছল আর ওঠে নাই।'

মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের সামনে সব যেন অন্ধকার বোধ হয়।'' *(পৃ: ৫১৩, ঐ)* কালকূট শোকস্তব্ধ। লেখক কালকূট বসিরহাটে বসে ওঠা থেকে গাজীকে খুঁজছেন, তাঁর মনপ্রাণ কেবল 'গাজী' 'গাজী' করছিল, তাঁর মনের চাওয়া এই পরিণতি! লেখক কালকূট অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে তাঁর মনের খোঁজা পাঠকের মনে সঞ্চারিত করেছেন। তারই মত গভীর উদ্বেগে পাঠককুলও চোখ রাখতে বাধ্য হয় 'গাজীকে কেন খুঁজে পাচ্ছে না?' সে কোথায়? কোথায় তাকে খুঁজে পাবেন লেখক কালকূট। তাঁর দেখা কেউ পায় না। সে তার রসের পেঁয়াজীতে সবাইকে ডুবিয়ে দেয়। কালকূটের সঙ্গে পাঠকের সুরও ধ্বনিত হয়। 'পাজী পাজী, সত্যি গাজীটা যে এত বড় পাজী, তা কোনো দিন বুঝতে পারিনি। নিমন্ত্রণ জানিয়ে সে পালিয়ে যায়।' ... আমি যেন তার সেই পাজী মুখটা দেখতে পাই। কালো মুখের ভাঁজে ভাঁজে পাজীর হাসি। গহীন দরিয়া চোখে পাজীর ঝিলিক।' *(পৃ: ৫১৩, ঐ)* পাগলিনী হয়ে 'নয়নতারা' গাছেরতলায় বসে আছে। পীরের পূজার সময় তার কাছে প্রসাদ চেয়েছিল, কালকূট ধমকে তাকে সরিয়ে দিয়েছিলেন নয়নতারাকে প্রসাদ দেবেন প্রথম দেখার উপহার হিসাবে!

কার টানে এসেছিলেন, কাকে খুঁজতে এসেছিলেন, আর কী পরিণতি হল। একটা জমাটধরা বেদনায় বুকটা ভার হয়ে যায়। লেখক কালকূট ছিরগেটের প্যাকেটটা তার হাতে দিয়ে বলেছিলেন 'এগুলো তার জন্যই রেখেছিলাম তুমি রাখো।' সে নেয়, ভাবলেশহীন মুখ, চোখে তার জল। এমন নয়নতারার কথা কালকূট কখনও ভাবেননি। কালকূট তার 'ছাওয়াল-পাওয়াল'দের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সে তাদের রেখে এই হাড়োয়ার মেলায় এসেছে। বলেছিল 'একবার না এসে পারলাম

না!' গাজীর চোখে ঝিলিক হানা বৈষ্ণবী গায়িকা প্রকৃতি কালকূটকে ডেকে জানতে চেয়েছিল 'আপনি কে?' সে বলেছিল 'ছিরগেট গুলান নিয়ে কী করব বাবু, সে তো নাই।' *(পৃ: ৫১৪, ঐ)* কালকূট নিচুস্বরে কোনমতে 'তার নামে রেখে দিও' বলে আর না দাঁড়িয়ে ঘাটের দিকে ছুটে যায়। বেদনায় কালকূট আর দাঁড়াতে পারেন না, এছাড়া তাঁকে যে সাগর-বন হাতছানি দিচ্ছে। আর দাঁড়াবার সময় নেই। ঘাটে নেমে যাওয়ার আগে ঝিনি জামায় টান দেয়। জিজ্ঞেস করে কোথায় যাচ্ছেন? দক্ষিণে যাবে শুনে ঝিনি চমকে ওঠে। আবার কবে দেখা হবে তাও তিনি বলতে পারেন না। ঝিনি অভিমানরুদ্ধ গলায় বলে 'যদি না জানো, তবে কেমন করে বলবে। তবে আর কোথায় দেখা হবে। তবু দেখ—।' *(পৃ: ৫১৪, ঐ)* ওর গলা ধরে আসে তবুও কালকূটের কথাতে বলে তাঁর জানতে ইচ্ছে করে তাকে মনে থাকবে কিনা। কালকূটের 'মনে থাকবে' কথাটা শুনে 'ঝিনি যেন সাপের ছোবলের মত আর্তনাত করে উঠে, 'উঃ, কী ভীষণ বিষ। মনে হয় অমৃতের মতো গলায় ঢেলে দিই, দিয়ে জুড়িয়ে যাই। তবে, একটা কথা।' *(পৃ: ৫১৪, ঐ)* ঝিনি আবার বলে, তাকে যেন একটু মনে রাখে এই কথাটা বলে তাঁর জামাটা ছেড়ে দিয়ে ''ও বলে, 'আমি আর একবার নয়নতারার কাছে যাই।'

ওর এই শেষ কথাটা যেন, সহসা কেমন এক তীব্র ভয়ংকর সুরে বেজে ওঠে। যেন মনে হয়, নয়নতারা আর ঝিনি, একাকার হয়ে গিয়েছে। তারা যেন দু'জনে এক।'' *(পৃ: ৫১৪, ঐ)*

কালকূটকে ঝিনির ডাক, বেদনা সবকিছুকে উপেক্ষা করে আবার গহীন সাগরে চলে যান। বন তার বিশাল সজীবতা আর সমুদ্র তাকে তাঁর অসীম গভীরতা নিয়ে হাতছানি দিয়েছে। তিনি তার সেই অজানার আহ্বানে তার ভেতরের আমি খুঁজতে বেরিয়ে পড়েন দক্ষিণের সমুদ্রের দিকে। ঝিনি বিরহিনী রাধার মতো কালকূট বিদায় ঝিনি দাঁড়িয়ে থাকে। তাঁর হৃদয়ের অর্ন্তগহীনে বেদনার ঢেউ চলছে সমুদ্রের ঢেউ-এর। চোখের জলের স্বাদনোনা, সমুদ্রের জলের মত সেই বেদনার অনুভূতি। বিদ্যাধরীর লবণাক্ত জল চুঁইয়ে তার জিভে লাগে। তাঁর চোখ ঝাপসা। ঝিনিকে আর দেখতে পান। তিনিও বেদনার্ত তবুও তিনি নির্বিকারভাবে ঝিনির কাছ থেকে বিদায় নেই। ঝিনির প্রেমকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন না আবার সমাজ জীবনের বাইরে পথের দেখা স্থায়ীত্বও দেন নি। পথচলতি জীবনের বন্ধনটুকু পথে রেখে চলে যান। মন তার দরবেশ গাজীময়। গাজী হঠাৎ ডাংসার চলে ডুবে মরে নয়নতারার নয়নহারা হয়েছে কিন্তু লেখকের মনহারা হয়নি। তিনি সে-ই মামুদ গাজীকে খুঁজে বেড়ান '' 'ক্ষ্যাপা, তুই না জেনে তোর আপন খবর / যাবি কোথায়।' ... সত্য মাঝির নৌকা নামে বিদ্যাধরীর স্রোত বেয়ে।'' *(পৃ: ৫১৪, ঐ)*

এইভাবেই এক বসিরহাট থেকে শুরু করে, মৌলীক্ষা শান্তিনিকেতন, নানুর-নলহাটি বক্রেশ্বর অট্টহাস হয়ে জয়দেব কেঁদুলি মেলা হয়ে নবদ্বীপের ধূলট উৎসবের পথ বেয়ে তিনি হাড়োয়ায়

এসে সঙ্গী মামুদ গাজীর সঙ্গে যাত্রা শুরু করে এই বাংলার বিভিন্ন জনপদ-নদী-বন্দর-মন্দির-মসজিদ ঘুরে বেড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ঐসব অঞ্চলের সঙ্গে পথচলতি মানুষের সঙ্গে পরিচিতির সঙ্গে তাঁদের জীবনাচার চিত্র তুলে ধরেছেন এই বৃহৎ কাহিনীতে। সব কাহিনীতে যা দেখা যায় এবারও তাই, বহির্বিশ্বের ডাকে তার প্রেমকে নির্বিকারভাবে পিছনে ফেলে রেখে পথে বেরিয়ে পড়েন আত্মানুসন্ধানের জন্য। বহু ঘটনা, বহু টুকরো টুকরো ঘটনাচিত্রের সমাবেশ এবং বহু মানুষের উপস্থিতিতে ও বহুরকমের ভাষা বৈচিত্র্যে এই কাহিনী ধীরে ধীরে উপন্যাসে পরিণত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

কালকূটের ইতিহাস পুরাণ মহাকাব্য কেন্দ্রিক রচনাবলীর বিষয়গত বিশ্লেষণ

ইতিবৃত্তের পথ ধরে কালকূট কখনও কখনও মনভ্রমণে বেরিয়েছেন। ''ভ্রমণে এলাম আমি। আকাশ বিহারে গেল কবুতরেরা!'' *(পৃ: ৯৭৭, কালকূট রচনা সমগ্র, ২য় খণ্ড)* কীটদষ্ট পুঁথির ধুলা সরিয়ে মনের ডানায় কাঁপন ধরিয়ে কবুতরদের মনের আনন্দে নীলাকাশে উড়ে যাওয়ার মতোই এই 'মনভ্রমণ'। ঝোলা কাঁধে নিয়ে কোনো যানবাহনে চেপে বসার দরকার নেই। প্রাণে একবার বাঁশী বেজে উঠলেই কালকূটের উচাটন মন ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়তে চায়। ''আমার এক কথা, ভ্রমি অনুরাগে। আমার হলো অনুরাগের ভ্রমণ।'' *(পৃ: ৯৭৫, ঐ)* অনুরাগের ভ্রমণের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, ডানায় কাঁপন লেগে যায়। ''নিষ্পত্র গাছপালা আর বরফের দেশ ছেড়ে পাখিরা যেমন পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে যায় চিরবসন্তের দেশে।'' *(পৃ: ৯৭৫, ঐ)* কালকূট তাই মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়েন 'মনভ্রমণে', ইতিহাসের পথ ধরে কখনও পৌঁছে যান ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত স্থানে, আবার কখনও ইতিবৃত্তের পথ ধরে পুরাণ মহাকাব্যের যুগে। সেই সময়কার খ্যাতিমান পুরুষ ও নারীদের ছায়ায় ছায়ায় বিচরণ করেছেন ও কালকূটীয় সূক্ষ্মদৃষ্টিতে মানব মনের সন্ধান করেছেন। সেই সময়ের ঘটনাবলীকে একালের দৃষ্টিতে দেখতে ও বুঝতে চেয়েছেন। তাই তিনি কতকগুলি শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ জানতে চান।

'ইতিবৃত্ত' ও 'ইতিহাস' এই দুটো কথার মধ্যে একটু ধন্দ লেগে যাচ্ছে। অতএব আগে ধন্দটা দূর করা দরকার। ''বলে তো যাচ্ছি ইতিবৃত্ত। বিষয়টা কী? পণ্ডিত বলেছেন, ইতিবৃত্ত শব্দের অভিধা ইতিহাস শব্দের অনুরূপ হওয়ায় তা হিস্টরি অর্থে অচল। হিস্টরির সংস্কৃত অর্থ ইতিবৃত্ত। ইতিহাস শব্দের অর্থ, সংস্কৃতে আর বাঙলায় ভিন্ন। পুরাণের বিচারে ভুলের সম্ভাবনায় ভরা। ইত অর্থে যা গত হয়েছে, বৃত্ত, এই অর্থে বর্ণনা। ইতিবৃত্ত, এই পারিভাষিক প্রয়োগে ভুলের সম্ভাবনা নেই।'' *(পৃ: ৯৭৮, ঐ)* 'ইতিহাস' ও 'ইতিবৃত্ত'-এর ধারণাটা স্পষ্ট হওয়ার পর তিনি ঠিক করেছেন যে, ''পুরাণের ইতিবৃত্তের পথই আমাকে খুঁজে নিয়ে যেতে হবে। পুরাণকারের কথা আগেই বলেছি, তাঁদের ইতিবৃত্তের লক্ষণ বা উপাদান হল সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ মন্বন্তর, বংশানুচরিত। সর্গ বোঝায় বিশ্বের সৃষ্টি, প্রতিসর্গ প্রলয়। রাজা ঋষি প্রধান ব্যক্তিগণ দেবতা দৈত্যগণের বংশের উৎপত্তি স্থিতি বিলোপ আর বংশানুক্রম। মন্বন্তর মনুকাল। কাল গণনার জন্যই যুগকাল আর মনুকাল পুরাণকারেরা ধরে নিয়েছেন।'' *(পৃ: ৯৭৮, ঐ)* পুরাকালে প্রত্যেক রাজার ইতিবৃত্তাকার থাকতেন। 'মাগধ' নামে

এরা পরিচিত ছিলেন। সূতগণ এঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন রাজবংশের বিবরণ সংগ্রহ করে বিবরণী লিখতেন। তাঁদের বিবরণই পুরাণের মূল ভিত্তি। কালকূটের চোখে ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার একজন 'সূত'। "সূত ঋষিগণকে বলেছেন, আপনাদের দ্বারা পুরাণ কথনে প্রণোদিত হয়ে আমি নিজেকে পবিত্র আর অনুগৃহীত বোধ করছি। আমার স্বধর্ম, দেবতা আর ঋষিগণের, অমিত তেজসম্পন্ন রাজাদের, খ্যাতনামা মহাত্মাদের বংশবৃত্তান্ত জানা এবং ধারণ করে রাখা। কিন্তু বেদে আমার অধিকার নেই। অথচ পুরাণ বেদসম্মিতম্।" *(পৃ: ৯৭৮, ঐ)*

সূতরূপী কালকূট আরও বলেছেন, "বেদের আগে পুরাণ। আমি আদি পুরাণে যা শুনেছি, মহাত্মা ঋষিগণ যা বলেছেন, পরাশরপুত্র গুরু দ্বৈপায়ন অতি কষ্টে যা নির্ণয় করে গিয়েছেন, ঠিক যেমনটি শুনেছি, তেমনটি আপনাদের শোনাই। আমাকে (আমাদের) বলা হয়েছে, অতিশয় বিশ্বাসভাজন বিদ্বান লোমহর্ষণ সূত। আমি যে কথা যেমন ভাবে শুনেছি ঠিক সেই ভাবেই বলি; আমার স্বধর্মের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য সত্যব্রতপরায়ণতা, বিশ্বস্ততা। আমি নির্ভীক, ক্ষমতাবানদের ভয় করি না। রাজনৈতিক কারণে কোনো নেতা রাজা বা বংশের কাছ থেকে ঘুষ খাই না। আমি সাধারণের উপযোগী আর লোকহিতার্থে ভাষাকে যথাসম্ভব সরল করি।" *(পৃ: ৯৭৮, ঐ)* লেখক কালকূট আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বলেছেন যে ইতিহাস লেখক ও সূতদের বিবরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। ইতিহাস লেখকগণ অনেকসময় রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অতিরঞ্জন এমনভাবে করতেন যে মিথ্যা সহজে ধরা পড়ত না। কিন্তু সূতগণের অতিরঞ্জন সহজেই ধরা পড়ে। কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন রাম পনের বছর বয়সে সীতাকে বিয়ে করলেন, সাতাশ বছর বয়সে বনে গেলেন, বিয়াল্লিশ বছর বয়সে আবার অযোধ্যায় ফিরে রাজ্যে অভিষিক্ত হলেন। তারপর? তারপরেই রাম একাদশ সহস্র বছর রাজত্ব করে স্বর্গারোহণ করলেন। পুরাণের অতিরঞ্জনগুলোর আড়ালে কোন সত্য বা রহস্য আছে তা তিনি খুঁজতে প্রয়াসী হয়েছেন। সন্দেহ আর অবিশ্বাস এই এগারো হাজার বছর নিয়ে। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে দেখলেই পুরাণের অতিরঞ্জনটি ধরা পড়ে। মহত্ত্ব বীরত্ব সুকৃতি অতুলনীয় কীর্তির গৌরব করতে হলে একটু অতিশয়োক্তি হয়ে যায়, আশীর্বাদ করতে হলে 'হাজার বছর পরমায়ু হোক' বলা হয়। পুরাণের অতিরঞ্জনের চাবিকাঠি হল এই 'হাজার' উপলক্ষণ প্রয়োগ। হাজার বছর কেউ বাঁচে না। রামের এগারো বছর রাজত্বের আশ্চর্য ঘটনাবহুল কীর্তিকে 'হাজার' উপলক্ষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। কাজেই ইতিবৃত্তের পথ ধরে এগোতে হলে এই অতিরঞ্জনগুলো বুঝে নিতে হবে। আমরা কালকূটের মানসিক পরিভ্রমণের রচনাগুলোকে বিশদভাবে পর্যালোচনা করতে করতে এগিয়ে যাব, অবশ্যই পুরাণের সাহায্য নিয়ে।

কালকূটের ইতিহাস-পুরাণ-মহাকাব্য কেন্দ্রিক রচনার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে,

কালকূট ইতিবৃত্তের পথ ধরে কখনো কখনো মানসিক পরিভ্রমণ করেছেন। ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত স্থানে পরিভ্রমণকালে কালের ধুলো সরিয়ে ইতিহাসের পথ ধরে কখনো চলে গিয়েছেন পুরাণ-মহাকাব্যের যুগে। আবার কখনো চলে গিয়েছেন বহুকাল ধরে প্রচলিত মিথ বা কল্পিত অলৌকিক সব আবরণে ঢেকে দেওয়া কাহিনিগুলোকে এ'কালের দৃষ্টিতে দেখবার জন্য তিনি মনভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাঁর যাত্রাপথকে দীর্ঘায়িত করে কখনো চলে গেছেন প্রাচীনতর ইতিহাসের পথে, কখনো ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে, যেখানে তিনি পুরাণকালের খ্যাতিমান বীরপুরুষদের ছায়ায় ছায়ায়, কখনো এক সংগ্রামী মানুষের উত্তরণের পথে কখনো বিপন্ন মানুষের উত্তরণের পথে, কখনো তমসার তীরে এক প্রেমিক পুরুষের সন্ধানে, কখনো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে এক ঐতিহাসিক রানীর সন্ধানে, কখনো উপস্থিত হয়েছেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষদিনে এক বীর সেনাপতির জ্বলে ওঠার সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করতে, কখনো মধ্যুগের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে চৈতন্যকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বস্তুবাদী দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করতে নবদ্বীপ থেকে নীলাচল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছেন।

একালের দৃষ্টিতে কালকূটের ইতিহাস-পুরাণ-মহাকাব্যকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণের রচনাগুলি হল —

'বাণীধ্বনি বেণুবনে', 'শাম্ব', 'জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য', 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি', 'প্রাচেতস', 'পৃথা', 'অন্তিম প্রণয়', 'প্রেম কাব্য রক্ত'।

কালকূটের এই পর্বের রচনাগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় অনুসারে ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করেছি। উক্ত রচনাগুলির মধ্যে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-ইতিহাস বিভিন্ন বিষয় রয়েছে। প্রত্যেকটি রচনার পৃথক আলোচনায় এই বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি দেওয়া হবে। এখন এই উক্ত রচনাগুলির বিষয়গত বিশ্লেষণে অনুপ্রবেশ করা যাক্ —

এই পর্বের রচনাগুলির মধ্যে ইতিহাস ও পুরাণকে কেন্দ্র করে রচনা 'বাণীধ্বনি বেণুবনে', পুরাণ ও মহাভারতকে কেন্দ্র করে রচনা 'শাম্ব', মহাভারতকে কেন্দ্র করে রচনা 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি', 'পৃথা' ও 'অন্তিম প্রণয়', রামায়ণকে কেন্দ্র করে 'প্রাচেতস' এবং জীবনী ও ইতিহাসকে কেন্দ্র করে 'জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য' ও 'প্রেম কাব্য রক্ত'।

কালকূট ইতিহাস-পুরাণ পথে চলতে গিয়ে প্রথম লিখেছিলেন **'বাণীধ্বনি বেণুবনে'**। আগেই উল্লিখিত হয়েছে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৬ বঙ্গাব্দ) 'সিনেমা জগৎ' পত্রিকায়। পরে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে (১৩৭৭ বঙ্গাব্দে) মার্চ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে মৌসুমী প্রকাশনী থেকে। সময়ের ক্রমপর্যায়ে এটিই প্রথমে আলোচনা করা হচ্ছে।

'কালকূটের চোখে সমরেশ' ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে (২৩শে বৈশাখ, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ) রচনায়

দেখেছি কালকূটের আর এক সত্তা সমরেশ বসুকে। "অভিভাবকের সজাগ দৃষ্টি, গুরুমশায়ের রক্তচক্ষু, কালনাগিণীর ফণার মতো লিকলিকে দোদুল্যমান যষ্টি, তার চেয়ে তীব্র বিষবৎ তার দংশনের যন্ত্রণা, কোনো কিছুই ধরে রাখতে পারে নে" *(পৃ: ৫১৬, কালকূট রচনা সমগ্র, ১ম খণ্ড, বাণীধ্বনি বেণুবনে)* — কালকূট বারে বারে ঘর ছেড়েছেন। কালকূটের 'বাণীধ্বনি বেণুবনে' উপন্যাসে দেখা যায় তিনি ঝোলা কাঁধে আবার বেরিয়ে পড়েছেন। ফকিরের সেই 'ইঁদুরমোহন বাঁশি' তাঁকে ঘরে থাকতে দেয়নি, বেরিয়ে পড়েছেন অরূপ রূপের সন্ধানে। "মাঘ মাসের উত্তরিয়া বাতাসে আকাশের নীলে, রোদের ঝলকে" *(পৃ: ৫১৬, ঐ)* ডাক এসেছিল প্রকৃতির কাছ থেকে, মাঘ মাসের তিথি নক্ষত্র দেখে। আর এমন নিমন্ত্রণের ডাক পেয়ে লেখক কালকূট ঘরে থাকতে পারেন নি। পথে বেরিয়ে পড়েছেন— "উপলক্ষ রামের বিবাহ, সবাই বরযাত্রী।" *(পৃ: ৫১৬, ঐ)* যুগান্তরের এই বিয়ের নিমন্ত্রণ একালে অন্যান্য ভারতবাসীর সঙ্গে কালকূটও 'রাম বিবাহের বরযাত্রী' হয়েছেন। চেপে বসেছেন এক বিচিত্র রেলগাড়ীতে, চাকার ওপরে লোহার পাতের চারপাশে বাঁশের রেলিং দেওয়া বগী, মাত্র দুটো বগী ছাদওয়ালা। চলেছেন দ্বারভাঙ্গার সীমান্ত ইস্টিশন জয়নগর থেকে জনকপুরে মাত্র আঠারো মাইল দূরের পথ। পুরানো দিনের মতে মিথিলা সীমান্ত থেকে জনকরাজার রাজ্য। এই আঠারো মাইল পথে বিচিত্র সব 'বরযাত্রী'দের সঙ্গে রেলে যেতে যেতে কালকূটের অনুসন্ধানী মন বুঝে নিতে চাইছে কিসের জন্য এত মানুষ 'রামের বিবাহের বরযাত্রী' হয়ে নেপাল রাজের অধীনে জনকপুরে রাম-সীতার মন্দির সংলগ্ন জায়গায় যেতে চাইছে। সেই কতকাল আগে মিথিলায় রাম-সীতার বিয়ে হয়েছিল। যেখানে কালকূট যাচ্ছেন সেখানে সত্যিই কি বহুকাল আগে রাম-সীতার বিয়ে হয়েছিল?

কালকূটের মনে প্রশ্ন — "সত্যি কি এই সেই জনক রাজার রাজ্য? জানকী এই দেশের মেয়ে? যে সীতার নামে, সারা ভারতবর্ষ আভূমি প্রণত। কেমন দেখতে ছিলেন সেই কন্যাটি? আজকের নেপালি চেহারার সঙ্গে কি তার কোন মিল আছে? বাল্মীকি তো তা লেখেননি। তাঁর যে বর্ণনা, সে রূপের তো কোনো তুলনা হয় না। এ যুগের নেপাল-দুহিতাদের নিন্দা করি না। তাদের এক রূপ, জানকীর আর এক রূপ। সত্যি কি সেই কন্যা অযোনিজাতা, জনকরাজের হলকর্ষণের সময়ে, হলের অগ্রভাগে তাঁকে পাওয়া গিয়েছিল?" *(পৃ: ৫১৯, ঐ)* এইসব ভাবতে ভাবতে কালকূটের জিজ্ঞাসু মন জানতে চাইছে এই কাহিনির পেছনে কিসের প্রতীক, কি ইঙ্গিত বহন করছে? সে কালের সেই বিয়ে, সেই কাহিনির সবটাই রূপকথা বলে মেনে নেওয়া যায় না। যদি রূপকথাই হবে তাহলে নেপালরাজ এত আয়োজন করেছেন কেন? জয়নগর থেকে জনকপুরে যাওয়ার জন্য বিচিত্র রেলগাড়ির ব্যবস্থা করেছেন। হাজার হাজার বরযাত্রী তাতে চেপে বসেছেন। কালকূটও এই ট্রেনেই রামবিবাহের বরযাত্রী হয়েছেন। ইস্টিশন মাস্টারের বদান্যতায় তিনি আপার

ক্লাসের যাত্রী, বিশেষ বরযাত্রী। অন্যান্য বরযাত্রীদের ভীড়ে ঠাসাঠাসি কামরাগুলিতে বরযাত্রীরা রঙ্গ রসে মেতে উঠেছে। নপুংসকেরাও চলেছেন এই বিবাহযাত্রায়! নেপাল রাজ্যে বিবাহযাত্রায় নপুংসকেরা অশুভ নয়। এছাড়া নাচুনীরা ''কামানো গালে পর্যাপ্ত পাউডার, চোখে কাজল, রঙীন শাড়ি, নানা অলঙ্করী, হাতে রেশমি রুমাল *(পৃ: ৫১৭, ঐ)* নিয়ে বিচিত্র সাজে সেজে বরযাত্রী হয়ে নাচ-গানও শুরু করে দিয়েছে। ভাবটা এমন যে যদি নাচ-গান না হয় তাহলে বিবাহের আনন্দ কিসের। তাদের ''মাজায় দোলা, বুকে মোচড়, কটাক্ষে ঝিলিক আর হাস্যখানি খুনীবৎ, 'দেখবে চলহ নয়া দুলহা দুলহিন।' এর মধ্যে যদি কোনো নর-নারীকে মত্তবৎ দেখা যায়, তার জন্য মনে করার কিছু নেই। বিবাহে চলিলা শ্রীরামচন্দ্র।'' *(পৃ: ৫১৭, ঐ)*

বিবাহের বরযাত্রী-যাত্রিণীরা খুশিতে মেতে উঠেছে। একটু নেশা করলেও ক্ষতি নেই। বরযাত্রীরা শুধু এই বিচিত্র ট্রেনেই যাচ্ছে না, তারা 'গোর শকত বা পায়দলে'ও চলেছে। পদযাত্রীদের সঙ্গে রেলযাত্রীদের ঠাট্টা মস্করা সবই চলছে। রেলযাত্রী না পদযাত্রী কারা আগে পৌঁছবে তার ঠিক নেই, তবু সকলে যাচ্ছে জনকপুরে, যেখানে রাম-সীতার বিশাল মন্দির আছে। যেখানে বিবাহের উৎসবে সকলে মেতে উঠেছে, মেলা লেগেছে পথে পথে, গাঁজার গন্ধে মেলা ভুরভুর করছে। রামের বিবাহকে উপলক্ষ্য করে জনকপুর হয়ে উঠেছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এক মিলনক্ষেত্র। মন্দিরে সানাই বাজছে অন্য সুরে, আদিম সরল সুরের স্বর বাজছে। গম্ভীর সুরে ঢাক বাজছে। নাটমন্দিরের চারপাশে প্রকৃতির আমন্ত্রণে এই মহামিলন-ক্ষেত্রে হাজার হাজার বরযাত্রী একত্রিত হয়েছেন। এরা শুধু বরযাত্রী নয় বীরযাত্রীও বটে। ''ধনুক ভাঙ্গা পণ নিয়ে যে আমাদের যাত্রা, তারপরে বিবাহ।'' *(পৃ: ৫২১, ঐ)* রাম, লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে প্রথমে হরধনু দেখতে গিয়েছিলেন এবং পরে রাম হরধনু ভেঙ্গেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বীরযাত্রী ছিলেন আশ্রমিক ঋষিগণ। লেখক কালকূট 'ভাঙ্গা হরধনু যেখানে পড়ে আছে' *(পৃ: ৫২১, ঐ)* সেখানে জনকপুর থেকে বীরযাত্রী হয়ে যেতে চান। এইজন্যই কালকূটের ভাবনায় 'বরযাত্রী' ও 'বীরযাত্রী' কথা দুটি উঠে এসেছে। সেকালের বীরযাত্রীদের সঙ্গে একালের যাত্রীদের মিলিয়ে দিয়েছেন। মনে মনে লেখক যেন যুগান্তরের রামের বিবাহের বীরযাত্রী ও বরযাত্রী হয়ে চলেছেন।

রাম-সীতার মন্দিরেই বিবাহ উৎসবের আয়োজন। এই কাহিনীর মধ্যে কিসের প্রতীক তারই অন্বেষণে কালকূট অতীতে ডুব দিয়েছেন। একালের দৃষ্টিতে তাঁর প্রশ্ন জেগেছে — যে পথে তিনি একালে বরযাত্রী হয়েছেন এটা কি সেই যুগের পথ? যে পথে অযোধ্যা থেকে রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করতে যাত্রা করেছিলেন, সীতাকে বিবাহ করে কি এই পথেই অযোধ্যায় পৌঁছেছিলেন? তাঁর অনুগামী রাজপুরুষ ও অনুগামীরা কেমন ছিলেন? কেমন তাঁরা দেখতে ছিলেন? বাদ্যধ্বনির সুর কেমন ছিল, কেমন গান গাওয়া হয়েছিল? রামচন্দ্রের সঙ্গে যে সব অশ্ব-সওয়ারী এসেছিলেন

তাঁদের কতদিন লেগেছিল অযোধ্যা থেকে জনকপুরে আসতে। বর্তমানের এই বিপুল সমারোহের আলোয় এসব ভাবতে ভাবতে কালকূট মনভ্রমণে পাড়ি দিয়েছেন সেই সুদূর পৌরাণিক যুগে বিবাহের উৎসবে। তিনি রামের বিবাহের বরযাত্রীদের অনুসরণ করেছেন। — "সুসজ্জিত হাতি-ঘোড়া, সঙ্গে অগণিত লোক-লস্করের এক মিছিল চলেছে, ঘণ্টা বাদ্য আর শঙ্খধ্বনি করছে সবাই।" *(পৃ: ৫১৯, ঐ)*

এখন দেখা যাক্ রামায়ণে অর্থাৎ রাজশেখর বসুর বাল্মীকি রামায়ণের সারাৎসার। এই সারানুবাদটি রাজশেখর বসু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র মোহন তর্কতীর্থ মহাশয়ের অনেক উপদেশে রচনা করেছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণের সময় তিনি অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য কাব্যসাংখ্যপুরাণতীর্থ মহাশয়ের সাহায্যে সংশোধন করেছিলেন। রাজশেখর বসু বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে প্রকাশিত বাল্মীকি-রামায়ণ অনুযায়ী সর্গ ও শ্লোক সংখ্যা অনুসরণ করছেন। আলোচ্য অংশে রাজশেখর বসুর বাল্মীকি-রামায়ণের সারানুবাদ, নবম মুদ্রণ (১৩৯০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) সংখ্যা অনুসরণ করা হচ্ছে। এই বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যাক্, কিভাবে শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহের বরযাত্রীরা অযোধ্যা থেকে মিথিলায় এসেছিলেন এবং রামচন্দ্রই বা কিভাবে মিথিলায় এসেছিলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্র রাজদর্শনে অযোধ্যায় এসেছিলেন একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। অযোধ্যাধিপতি দশরথকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন— "মহারাজ, আমি এক যজ্ঞ আরম্ভ করেছি, কিন্তু মারীচ আর সুবাহু নামে দুই কামরূপী শক্তিশালী রাক্ষস নানাপ্রকার বিঘ্ন করছে, যজ্ঞবেদীর উপর মাংস ও রক্ত বর্ষণ করছে। যজ্ঞকালে শাপ দেওয়া অকর্তব্য সেজন্য আমি ক্রোধ সংবরণ করেছি। আপনি আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র কাকপক্ষধর মহাবীর রামকে যজ্ঞের দশরাত্রির জন্য দিন, তিনি সেই রাক্ষসদের বিনাশ করবেন।" *(পৃ: ১৯, বাল্মীকি রামায়ণ, সারানুবাদ রাজশেখর বসু, নবম মুদ্রণ ১৩৯০ বঙ্গাব্দ)*

বিশ্বামিত্রের এই প্রার্থনা শুনে রাজা দশরথ প্রথমে রামকে যেতে দিতে রাজি হননি। পরে বিশ্বামিত্রের ক্রোধের কারণে ও বশিষ্ঠ মুনির অনুরোধে রাম-লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। তাঁরা প্রথম রাত্রি সরযূ নদীর দক্ষিণ তটে, দ্বিতীয় রাত্রি জাহ্নবী-সরযূর সংগমস্থলে কন্দর্পের আশ্রমে এবং গঙ্গার দক্ষিণ তটে, শ্বাপদসঙ্কুল ঘোর অরণ্যে তারকাকে বধ করে তৃতীয় রাত্রি যাপন করেছিলেন সেখানেই। চতুর্থ দিনে সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশ করে সেই আশ্রমে রাত্রিবাস করেন। যজ্ঞের জন্য পরদিন থেকে ছয় দিন ছয় রাত্রি বাস করেন সেখানেই। ষষ্ঠ দিবসে "মারীচ, সুবাহু ও তাদের অনুচরগণ ভীম মূর্তি ধারণ করে বেদীর উপর রুধির বর্ষণ করতে লাগল। রামচন্দ্র শরাসনে মানবাস্ত্র সন্ধান করে মারীচের বক্ষে আঘাত করলেন। মারীচ অবচেতন হয়ে ঘুরতে শত যোজন দূরে মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত হয় তারপর রাম আগ্নেয়াস্ত্রে সুবাহুকে এবং বাষব্যাস্ত্রে অপর রাক্ষসদের বধ করলেন।" *(পৃ: ২৬, ঐ)* নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপনের পরের দিন প্রভাতে তাঁরা আবার

পথ চলতে শুরু করেন। তবে অযোধ্যার দিকে না ফিরে মিথিলার দিকে চলতে শুরু করেন। বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য ঋষিগণ বলেছিলেন যে, "মিথিলার রাজা জনক এক যজ্ঞ করবেন আমরা সকলেই সেখানে যাব, তোমরাও চল। সেখানে এক অদ্ভুত ধনু দেখবে। দেব গন্ধর্ব অসুর বা রাক্ষস তাতে জ্যারোপণ করতে পারে না, মানুষ তো দূরের কথা। অনেক রাজা ও রাজপুত্র চেষ্টা ক'রে বিফল হয়েছেন। দেবগণ ফলস্বরূপ এই ধনু জনকের পূর্বপুরুষকে দিয়েছিলেন, জনক তাঁকে স্বগৃহে রেখে গন্ধধূপাদিদ্বারা অর্চনা করেন।"

বিশ্বামিত্রের সিদ্ধাশ্রম থেকে তাঁরা উত্তরদিকে চলতে লাগলেন। ঋষিগণ একশত শকট নিয়ে তাঁদের সঙ্গে গেলেন। এছাড়াও আশ্রমের মৃগ এবং পক্ষিগণও তাদের অনুগামী হয়েছিল, কিছুদূর গিয়ে সূর্যাস্ত হলে তাঁরা আশ্রমেই ফিরে যান। সিদ্ধাশ্রমের ছয় দিন ছয় রাত্রি বাদ দিয়ে যাত্রাপথের দিন গুণলে দেখা যায় যে, তারা সিদ্ধাশ্রমে যেদিন পৌঁছেছিলেন সেদিন ছিল পথচলার চতুর্থ দিন। সিদ্ধাশ্রম থেকে শোন নদীর তীর পর্যন্ত পঞ্চম দিন। সেখানেই রাত্রিবাস করেছিলেন। ষষ্ঠ দিনে শোন নদীর তটদেশ অতিক্রম করে মধ্যাহ্নকালে জাহ্নবী তীরে তর্পণ, হোম ও হবি ভোজন করার পরে বিশ্বামিত্রের মুখে পৃথিবীতে গঙ্গাবতরণের আশ্চর্য কথা শুনেছিলেন। তাদেরই পূর্বপুরুষদের সেই কথা ভাবতে ভাবতে রাত্রি শেষ হয়ে গিয়েছিল। সপ্তম প্রভাতে নৌকাযোগে গঙ্গার উত্তর তীরে এসে পৌঁছেছিলেন। বিশালার রাজা সুমতি তাঁর উপাধ্যায় ও বান্ধবগণের সঙ্গে এসে মুনিবরকে সংবর্ধনা জানান। রাজা সুমতির যথোচিত আতিথেয়তায় বিশালাপুরীতে রাত্রিবাস করে পরের দিন অর্থাৎ যাত্রাপথের অষ্টম দিনে মিথিলায় প্রবেশ করেছিলেন। প্রথমে গৌতম ঋষির পুরাতন নির্জন আশ্রমে ঢুকে অহল্যাকে শাপমুক্ত করে তাদের আতিথ্য গ্রহণ করে সেখান থেকে জনকের রাজ্যের দিকে যাত্রা করেছিলেন। উত্তর-পূর্ব মুখে চলতে চলতে অবশেষে জনকরাজার যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন। শুধু তাঁরাই নন, শত শত শকটে ঋষিগণ এসেছেন, এসেছেন বহু সহস্র ব্রাহ্মণ। রামের অনুরোধে বিশ্বামিত্র একটি নির্জন জলসমন্বিত স্থানে তাঁদের রাত্রিবাসের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। বিশ্বামিত্রের আগমন সংবাদ পেয়ে রাজা জনক তাঁর পুরোহিত শতানন্দ ও ঋত্বিকদের নিয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন।

অযোধ্যা থেকে সিদ্ধাশ্রম পর্যন্ত এবং সিদ্ধাশ্রম থেকে মিথিলা পর্যন্ত কখনো তাঁরা পায়ে হেঁটে, কখনো নৌকাযোগে বিপদসঙ্কুল পথে এগিয়ে চলেছেন। সিদ্ধাশ্রম থেকে সঙ্গী হয়েছিলেন আশ্রমের ঋষিগণ। এঁরাই বীরযাত্রী। অষ্টম প্রভাতে বিশ্বামিত্রের নির্দেশে জনকরাজ রাম লক্ষ্মণকে সেই দৈবধনু দেখিয়েছিলেন। রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের আজ্ঞায় "সেই ধনুর মাঝখানে ধ'রে মঞ্জুষা থেকে তুলে নিলেন এবং তাতে অবলীলায় জ্যারোপণ ক'রে আকর্ষণ করলেন। বজ্রনিনাদের তুল্য শব্দে ধনু ভেঙে গেল। মহাপর্বত বিদীর্ণ হ'লে যেমন হয় সেইরূপ ভূমিকম্প হল, বিশ্বামিত্র জনক এবং

রাম-লক্ষ্মণ ভিন্ন সকলেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।" *(পৃ: ৫৫, ঐ)* এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখে জনকরাজা অভিভূত হয়ে বিশ্বামিত্রের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। "আমার দূতেরা অবিলম্বে রথারোহণে অযোধ্যায় যাবে এবং সকল সংবাদ জানিয়ে রাজা দশরথকে এখানে নিয়ে আসবে।" *(পৃ: ৫৬, ঐ)* রাম লক্ষ্মণ সহ বীরযাত্রীরা মিথিলায় রয়ে গেলেন। জনকের দূতেরা রথারোহণে পথে তিন রাত্রি কাটিয়ে ক্লান্ত বাহনসহ অযোধ্যায় উপস্থিত হয়ে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং বশিষ্ঠ সহ অন্যান্য মন্ত্রীগণও প্রস্তাবিত বিবাহে সম্মতি জানিয়েছিলেন। "পরদিন প্রভাতে দশরথের আজ্ঞায় ধনাধ্যক্ষগণ প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে সুরক্ষিত হয়ে মিথিলায় যাত্রা করলেন। বশিষ্ঠ বামদেব জাবালি প্রভৃতি বিপ্রগণ বিবিধ যানে অগ্রসর হলেন। রাজা দশরথ রথে চললেন, পশ্চাতে চতুরঙ্গিণী সেনা গেল। চারদিন পরে সকলে বিদেহ দেশে উপস্থিত হলেন।" *(পৃ: ৫৬, ঐ)* রাম বিবাহের বরযাত্রীদের স্বয়ং রাজা জনক স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন এবং সকলের রাত্রি যাপনের সুব্যবস্থা করেছিলেন।

পরের দিন রাজা জনকের আমন্ত্রণে রাজা দশরথ তাঁর পুত্রসহ সদলে উপস্থিত হয়ে ইক্ষ্বাকু বংশের কুলদেবতা ভগবান বশিষ্ঠর মাধ্যমে রাজা জনক, বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য ঋষিগণের অনুমতি নিয়ে রাজা দশরথের কুলপরিচয় দিয়েছিলেন। ভগবান বশিষ্ঠ কুলপরিচয় দেওয়ার পরে রাজা দশরথের দুই পুত্র রাম ও লক্ষ্মণের জন্য রাজা জনকের কাছে তাঁর দুই কন্যাকে দান করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। রাজা জনকও নিজের কুলপরিচয় দেওয়ার পরে পরম প্রীতির সঙ্গে এই কথা বলেছিলেন, "রামকে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরকন্যার ন্যায় রূপবতী বীর্যশুল্কা সীতা, এবং লক্ষ্মণকে আমার কনিষ্ঠা কন্যা ঊর্মিলা দান করব। এখন রাম-লক্ষ্মণ বিবাহের পূর্বকৃত্য গোদান ও পিতৃকার্য সম্পাদন করুন। আজ থেকে তৃতীয় দিবসে উত্তর ফালগুনী নক্ষত্রে বিবাহ হবে।" *(পৃ: ৫৮, ঐ)* এরপরে বিশ্বামিত্রের অনুরোধে জনকরাজের ভ্রাতা কুশধ্বজের দুই অনুপমা সুন্দরী কন্যাদের সঙ্গে রাজকুমার ভরত-শত্রুঘ্নের বিবাহ দিতে রাজা জনক সম্মতি দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে জনকরাজ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজকে সাংকাশ্যাপুরী থেকে দূত পাঠিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। কুশধ্বজ ছিলেন জনকরাজের যজ্ঞের রক্ষক। একই দিনে রাজা দশরথের চার পুত্রের বিবাহ নির্দিষ্ট হয়েছিল। যুগান্তরের বিয়ের কথা ভাবতে ভাবতে ভাবনায় ছেদ পড়ল কালকূটের।

ট্রেনটা হঠাৎ থেমে গেল, কালকূটের অতীতে পদচারণা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বাস্তবের মাটিতে এসে ঠেকল। এবার একালের দৃষ্টিতে কালকূট মহাকাব্যের রাম বিবাহের বরযাত্রীদের দেখছেন। তাঁর সেই দৃষ্টিকে, ভাবনাকে অনুসরণ করে বলা যায়, সেই যুগান্তরের বিয়েকে উপলক্ষ্য করে জনকপুরে রামসীতার মন্দিরে বিবাহোৎসব হচ্ছে। প্রকৃতির আমন্ত্রণে এই বিবাহোৎসব। পৌষের

শেষ, মাঘের উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে রামের সঙ্গে বিবাহ সীতার। জনকরাজের আযোনিজা, বীর্যশুল্কা কন্যা সীতা। যিনি ক্ষেত্রশোধনকালে হলরেখা থেকে উত্থিতা। পৃথিবী কন্যা সীতা, অতএব প্রকৃতিই নিমন্ত্রণ করেছে এ বিবাহোৎসবে যোগ দিতে — "এ নিমন্ত্রণ আসে, মাঘের উত্তরিয়া বাতাসে আকাশের নীলে, রোদের ঝলকে। যখন মূল ফসল গোলায়, গোয়ালের নয়া বাছুরের গা চাটে গাভী। এ নিমন্ত্রণ আসে, ঝরা পাতায়, উঠানের মাঝখানে পায়রার দলের পাখা-ঝাপটায়। প্রকৃতির এই খুশি ভরা নিমন্ত্রণের ডাক যায়, ভারতবাসী জনে জনে ঘরে ঘরে, নর-নারী নির্বিশেষে; দেশে দেশান্তরে।" *(পৃ: ৫১৬, কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড)*

প্রকৃতির সঙ্গে মানবের এক মিলনোৎসব। রামের বিবাহ উপলক্ষে যে মেলা ও উৎসব সেখানে যাওয়ার জন্য পাহাড়ী মানুষের যে ঢল নামে তা দেখতে সেই পুরাণ অতীতকে মনোভূমিতে উপস্থিত করতে করতে কালকূট যাত্রা করেছেন। বিচিত্র এক রেলগাড়িতে চড়ে তিনি যোগ দিতে চলেছেন সেই উৎসবে। আঠারো মাইল পাড়ি দিচ্ছেন — কখনো ঘণ্টায় দুই মাইল, কখনো পাঁচ মাইল গতিতে। রেলযাত্রী, পদযাত্রী, গোরুশকট সকলেই যে বরযাত্রী। যেমনটি এসেছিলেন যুগান্তরের বিয়ের বরযাত্রীরা। রাজা দশরথ এসেছিলেন চতুরঙ্গিনী বাহিনী ও প্রচুর লোকলস্কর নিয়ে। কালকূটের চোখে ধরা পড়েছে এ'কালের বরযাত্রীদের সঙ্গে অতীতের বিবাহের বরযাত্রীদের সাদৃশ্য।

কালকূট কখনো চলে যাচ্ছেন মনভ্রমণে, কখনো চলে এসেছেন বাস্তবের পটভূমিতে। বরযাত্রীদের স্নানাহারের জন্য একটুক্ষণ বিরতি। কালকূট স্টেশন মাস্টার মশায়ের বিশেষ যাত্রী। বিশেষ অতিথিকে আপ্যায়নের সুযোগ যখন পাওয়া গেছে তখন এ সুযোগ কাজে লাগাতে সচেষ্ট স্টেশন-মাস্টার মশায়। তিনি ট্রেনটি থামিয়ে কালকূটকে নিজের রেল কোয়ার্টারে নিয়ে এসেছেন। আত্মীয় পরিজন থেকে তরাইয়ের দূর নির্জনে নিজের কোলের বাচ্চাটিকে নিয়ে পরিবারের সঙ্গে এই রেল কোয়ার্টারেই থাকেন তিনি। রেল নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকেন, পরিবারের ওই দুটি মানুষের সময় আর কিছুতেই কাটতে চায় না, তাই স্টেশন মাস্টার মশায় কিছুক্ষণের জন্য হাঁকে ডাকে নিঝুম বাড়িটিতে জাগিয়ে তুলেছিলেন এই বলে যে এমন লোকের (কালকূটের) মত লোক সহজে পাওয়া যায় না। পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পরই তাড়া দিয়ে দিলেন — "তাড়াতাড়ি রান্না বসিয়ে দাও। যা হোক দুটো গরম ডাল ভাত, তার বেশি এখন কী হবে।" *(পৃ: ৫২০, ঐ)* বরযাত্রায়, কালকূটের জন্য পথের মাঝে অন্ন ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা। রাম-সীতার বিবাহ। বিশেষ বরযাত্রীর জন্য সামান্য অথচ আন্তরিকতায় পূর্ণ মানবিক পরিবেশ। একটি সযত্ন হাতের বেড়ে দেওয়া অন্ন'তে রসনার আর ক্ষুধা-তৃপ্তির অমৃতে কালকূটের রসের ঘরে ঢেউ উঠেছিল।

স্টেশন মাস্টারমশাই ঘণ্টা দেড়েকের জন্য একটু হাঁকে-ডাকে বাড়িটিকে জাগিয়ে আবার

যাত্রা শুরু করেন জনকপুরের দিকে। কথা বলতে বলতে ভট্টাচার্য মশাই (স্টেশন মাস্টার)-এর ব্যথাতুর স্নেহাশিস মিশ্রিত অন্তরটিকে কালকূট দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন তিনপুরুষ ধরে নেপাল সরকারের চাকুরে এক পরিবারকে। সেই কবে তার পূর্ব পুরুষরা রুজি-রোজগারের জন্য দেশ ছেড়েছিলেন কিন্তু ছাড়তে পারেন নি খুল্লেঁর টান। কিন্তু তবুও তার বুক থেকে চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে দেখেছেন। 'যদ্দিন পাকিস্তান হয়নি তদ্দিন বাড়ি ঘর-দোর সবই ছিল। নেপালরাজের চাকরি হলেও নিয়মিত যাতায়াত ছিল। শত হলেও বংশের ভিটা, না গিয়ে কি থাকা যায়।' দেশভাগের যন্ত্রণার সঙ্গে জিইয়ে রেখেছেন তাঁর পূর্বপুরুষের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, পিতৃভূমির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য। নিজের কৃষ্টিকে বাঁচিয়ে চলেছেন কিন্তু তার বড় ছেলেমেয়েরা পূর্বপুরুষের অস্তিত্বের রক্ষা করার পরিবর্তে নেপালি সংস্কৃতি নির্ভর করেই নেপালি হয়ে যেতে চায়, এজন্য ভট্টাচার্য মশায় বেদনার্ত। তার বেদনাহত মুখটিও কালকূটের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে।

কালকূট যুগান্তরের বিবাহের বরযাত্রীদের সঙ্গে বর্তমানের বরযাত্রীদের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সঙ্গে। বিশ্বামিত্র ছিলেন রামের বিবাহের প্রধান উদ্যোক্তা। এখানে সন্ধ্যার একটু আগেই বরযাত্রীরা জনকপুরে পৌঁছে গেছেন। কালকূট ভট্টাচার্য মহাশয়ের ব্যবস্থা করা রাত্রিবাসের জন্য জায়গাটিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে রাম-সীতার মন্দির দর্শনে বেরিয়ে পড়েছেন। মন্দিরের বিশাল চত্বরের সামনে নাটমন্দিরের চারিপাশে খিলেন করা পাথরের থাম আলো-আঁধারে কেমন যেন মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। যা দেখে কালকূটের মনে হয়েছে "জনকপুরের রাম-সীতার মন্দিরকেও আমার কেমন যেন আদিম বলে মনে হচ্ছে।" *(পৃ: ৫২১, ঐ)* ভীড়ের জন্য মন্দিরে 'রাম-সীতা' দর্শন না করে শুধু মেলা দেখেছিলেন এবং তারপরে কালকূট কানের যন্ত্রণায় ক্রমশ অসুস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি রাত্রিবাসের জায়গায় ফিরে এসেছিলেন। একালের বরযাত্রী কালকূট নেপালি পিতা-কন্যার দ্বারা আপ্যায়িত হয়েছিলেন। কিন্তু অসুস্থতার কারণে একালের বরযাত্রী কিছুই খেতে পারলেন না। পিতাপুত্রীর আয়োজনে কোন ত্রুটি ছিল না, রুটি-মাংস করেছিল। বরযাত্রীর সেবা তো কনে পক্ষকে করতে হবে অতএব মেয়েটির বাবা মধ্যবয়স্ক সেই নেপালি পুরুষটি কালকূটের জন্য দুধ নিয়ে এসেছিল।

কালকূটের চোখে — এরা কন্যার দেশের লোক, তাঁর ভাবনায় এসেছে — বরযাত্রীদের সেবা-যত্ন তো কনেপক্ষের লোকদের করতেই হবে। সারারাত ধরে বছর পনেরোর লাল টুকটুকে ফর্সা মুখের মেয়েটি, ফ্ল্যানেলের কাপড় হ্যারিকেনের মাথায় ধরে গরম সেঁক দিয়েছিল। ধীরুমায়া মেয়েটির নাম। মৈথিলী হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করেছিল ব্যথা কমেছে কিনা। এত ব্যথা-যন্ত্রণার মধ্যেও কালকূটের মন চলে গিয়েছে সেই কোন্ এক অতীতে, — সত্যি কোনো বরযাত্রীর এমন দুর্দশা হয়েছিল কিনা, তাই জানতে।

নেপালরাজের জনকপুর কালকূটের কাছে বিদেশ, এখানে এসে স্টেশন মাস্টার ভট্টাচার্য মশায়, এমন পিতা-কন্যার কাছে আতিথেয়তা, সেবাযত্ন — কৃতজ্ঞতায় কালকূটের রসের কলস ভরে উঠেছে। আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে ধীরুমায়ার গরম সেঁক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর গায়ের হাল্কা পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ, চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ শুনতে শুনতে কালকূট চলে গেলেন সেই দূরকালের রামের বিবাহের রাত্রির বুকে। "উৎসব শেষের ভোর রাত্রে, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তখনো কোনো এক অসুস্থ মানুষ যেন ব্যথার ঘোরে রয়েছে, কার নিরন্তর হাতের সেবায়, উৎসবের হাতের সাজে ঠিনঠিন করে বাজছে। নিদ্রিতরা কেউ তা শুনতে পাচ্ছে না।" *(পৃ: ৫২৩, ঐ)*

বর্তমান থেকে অতীত, অতীত বর্তমানে অনায়াস যাতায়াত, সেকালকে দেখছেন একালের দৃষ্টিতে; সেকাল-একালকে কিছু কিছু ঘটনার সঙ্গে মিলিয়েও দিয়েছেন। বিবাহোৎসবের মেলা থেকে ধীরুমায়া লাল-নীল কাঁচের চুড়ি পরেছিল, তারই ঠিনঠিনে চুড়ির আওয়াজে আধো ঘুম আধো জাগরণে অতীতের উৎসব-শেষের রাত্রিতে পৌঁছে গেছেন। আবার যন্ত্রণায় কাতর কালকূট চোখ মেলতেই বাস্তবে আগমন। ধীরুমায়ার সেবা যত্নে কালকূটের বুকের মাঝে ঢেউ লেগে যাচ্ছিল, চোখ দিয়ে জল চলে আসছিল — "শিশু বয়স থেকে যৌবন, সেই এক নারী। যে আমাকে মায়ের বেশে, আমাকে এমন করে শান্তি দিয়েছে। ভগ্নীর বেশে, প্রিয়া প্রেমিকের বেশে। সর্বরূপে সে সংস্থিতা। ধীরুমায়া, এই ধীরুমায়াতেও সে সকলের সবখানি নিয়ে আমার সামনে বসে আছে।" *(পৃ: ৫২৪, ঐ)* কালকূটের চোখে ধরা পড়েছে ধীরুমায়ার উদ্বিগ্ন মনটি। কারও নির্দেশে সে এমন সেবা করে নি, করেছে আপন মনের নির্দেশে। বিষকাটালি গাছের পাতার রসের প্রলেপ নিঃসঙ্কোচে কালকূটের গলায়, কানে লাগিয়ে দিয়েছে। মাকে ডেকে এনে এক অচেনা অসুস্থ পুরুষকে সারারাত ধরে সেবা যত্ন করা, আরোগ্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা — কালকূটের মনে হয়েছে, এসব ভিতর থেকে প্রীতির অনুভূতি না এলে করা যায় না।

পরের দিন সকালে বিবাহোৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই বিবাহের বরযাত্রী সবার আগে ফিরে চললেন দ্বারভাঙ্গায়। এমনি করেই রামবিবাহের পরদিন প্রভাতে বিশ্বামিত্র মুনি হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যেখানে তার ভগিনী কৌশকী নদী হয়ে বইছে সেখানে যাওয়ার জন্য, ভগিনীর পাশে পাশে থেকে তাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য একাকী রওনা হয়েছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছিলাম— অযোধ্যা থেকে রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে বীরযাত্রী হয়েছিলেন বিশ্বামিত্র; তাঁরই অনুমতিক্রমে রাম-লক্ষ্মণাদির বিবাহ পর্ব সম্পন্ন হয়েছিল। সেকালের বিয়ের সঙ্গে একালের বিয়ের মেলবন্ধন এমনিভাবেই ঘটিয়েছেন।

কালকূটের চোখ দিয়ে সেকালের বিবাহোৎসবকে একালের চোখে দেখছি। সেই কালকূটই অসুস্থতার কারণে দ্বারভাঙ্গা ফিরে চললেন। দ্বারভাঙ্গায় যাবেন চিকিৎসার কারণে, আর এক

বরযাত্রী লেখকের আলয়ে। বরযাত্রী লেখকের ছোট ভাই বিশিষ্ট চিকিৎসক। বিশ্বামিত্র ও কালকূট দুজনেই বিশেষ যাত্রী, দুজনেই বিবাহোৎসব ছেড়ে ফিরে গেলেন। কালকূটের ফিরে যাওয়ার পথে চোখ রাখলে একটি বেদনাঘন দৃশ্য প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। ধীরুমায়া প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে নি বড়াসাবই বাবাই (স্টেশন মাস্টার মশায়) যে কালকূটের যাওয়ার জন্য ট্রলিতে বিশেষ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তার চোখে মুখে উদ্বেগ ও হতাশা একইসঙ্গে ফুটে উঠল।

ধীরুমায়ার মা ও ধীরুমায়াকে বিদায় জানিয়ে ভট্টাচার্য্য (স্টেশন মাস্টার) মশায়কে প্রণাম করে ট্রলিতে উঠে বসতেই ট্রলিতে ঠেলা পড়ল। ধীরুমায়ার বিষণ্ণ বেদনাহত মুখ, ভট্টাচার্য্য মশায়ের স্নেহাসিক্ত মুখ, বিবাহোৎসবের সব কৌতূহল আর কোলাহল সব পেছনে ফেলে রেখে ট্রলিতে চলতে লাগলেন, আর তাঁর চোখে নেপাল তরাইয়ের সবুজ দিগন্তবিসারি ফুটে উঠল; তাঁর মন ছুটে চলল আড়াই হাজার বছর আগের শাক্য প্রাসাদের খোঁজে। ''কোথায় সেই নগর, রাজবর্ত্ম, হর্ম্যমালা, যার মাঝখান দিয়ে গৌতমীর পুত্র চলেছেন, অশ্বচালিত রথে। আর যেতে যেতে শোক মৃত্যু জরা বার্ধক্য, যার প্রাণে তোলপাড় করে তুলেছে, এ দুঃখের নিষ্কৃতি কিসে।'' *(পৃ: ৫২৮, ঐ)* ক্রমশ তিনি চলতে লাগলেন অতীতের পথে পথে, গণতান্ত্রিক রাজ্য বৃজি, লিচ্ছবি, গুরু আলাড় কালামের সঙ্গে যেখানে দেখা হয়েছিল, সেই বৈশালী রাজ্যে। মন ছুটে চলেছে অনুপ্রিয়, ''যেখানে রাজপুত্র নিরাসক্ত চিত্তে গা থেকে খুলে দেয় রাজবেশ, শিরোভূষণ, গায়ে তুলে নেয় সন্ন্যাসীর চীরবস্ত্র।'' *(পৃ: ৫২৮, ঐ)* কালকূট সেই অতীত পথে উঁকি দিয়ে দেখতে চাইছেন কারা ছিল তখন সেখানে? কারা দাঁড়িয়ে সেই দুঃষহ দৃশ্য দেখে চোখের জলে ভেসেছিল।

ইতিহাসের পথে হাঁটতে হাঁটতেই তিনি বর্তমানে ফিরে এসেছেন। তিনি কল্পনায় আবার মিলিয়ে নিচ্ছেন একটি দৃশ্য, রাজপুত্রের চীরবস্ত্র গায়ে তুলে নেওয়ার সময়ে 'অনুপ্রিয়' নামে কঠিন স্থানে কোনো মায়ের কান্না বেজে উঠেছিল কিনা 'ওরে গৌতম, আমার গৌতম রে ...' *(পৃ: ৫২৮, ঐ)* যেমন করে কান্নার রোল উঠেছিল শচীমাতা অঙ্গনে 'ওরে নিমাই, নিমাই রে ...' *(পৃ: ৫২৮, ঐ)* পুত্রের চীরবস্ত্র ধারণ যে মায়ের কাছে বেদনাদায়ক সেটা কালকূটের চোখে চিরন্তন হয়ে ধরা পড়েছে। 'অনুপ্রিয়' আর 'নবদ্বীপ' — মায়ের যন্ত্রণা একাকার, পুত্রের বৈরাগ্য। নেপাল তরাইয়ের আর এক পর্ব কালকূটের চোখের সামনে জেগে রইল, ফকিরের ইঁদুরমোহন বাঁশি তাকে ডাকতে লাগল আড়াই হাজার বছর আগের চিহ্ন, ঘটনা অথবা আরও আগে মহাভারতের যুগের নায়কদের ছায়ায় ছায়ায় চলতে।

কালকূট দ্বারভাঙ্গায় এসে সুস্থ হয়ে চলে এলেন পাটলিপুত্রে — ''অবৈদিক, অনার্য শৌর্য বীর্য ঐশ্বর্যে অধিষ্ঠিত মগধ সাম্রাজ্য।'' *(পৃ: ৫২৮, ঐ)* রাজগৃহ মগধ যুগের একটি পরিচিত নাম। ''আর বাণীধ্বনি বেণুবন সহসা আমার চোখে জেগে উঠল, অনুপ্রিয় থেকে সোজা যিনি সন্ন্যাস

জীবন নিয়ে এসেছিলেন রাজগৃহের বেণুবনে।" *(পৃ: ৫২৮, ঐ)* দ্বারভাঙ্গা থেকে কালকূটকে পাঠিয়ে দেওয়া হল পাটনায়। বরযাত্রী লেখকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাটনায় সরকারি আমলা, তাঁর কাছে। তিনি তাঁকে রাজগৃহে নিয়ে গিয়ে থাকার জায়গা খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে বার্মীজ বৌদ্ধ মন্দিরের অতিথি নিবাসে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। শান্ত আর নিরিবিলি পরিবেশ, খানিকটা খোলা ছাদের বারান্দাওয়ালা সাদা দোতলা বাড়িটাকে দেখে কালকূটের মনে হয়েছে বাড়িটা যেন পিছনের সবুজ পাহাড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একালে যন্ত্রচালিত যানে রাজগৃহের পথে যেতে যেতে বাহক চালিত ডুলিতে তিনি দেখেছেন একটি নারীর মুখ। পান খাওয়া ঠোঁট, চোখে কাজল, কপালে মেটে সিঁদুরের টিপ, নাকে নোলক পরা। ডুলির কাপড় দিয়ে ঢাকা ঢাকনাটি সামান্য ফাঁক করে ডুলিতে চলেছেন। যন্ত্রচালিত যানের অপরিচিত মুখটি দেখেও ঢাকনাটি নামিয়ে নেয়নি দেখে কালকূটের মনে হয়েছে এদেশে এখনো 'মগধী বাতাস' আছে। মন চলে গেছে বহুদূরে — রাজা বিম্বিসারের যুগে; এবার কালকূট পদচারণা করছেন রাজা বিম্বিসারের সেই সুদূর অতীতের রাজত্বকালে। তিনি দেখছেন সে যুগের সম্পন্ন গৃহপতির নারীদের। তারা চলেছেন ডুলিতে, গোচক্রযানে, রাজগৃহের রাজপথ দিয়ে, কাপড়ের ঢাকনা একটু ফাঁক করে একালে দেখা ডুলির নারীটির মত। নগরীর নারীদের পথ চলায় কোনো নিষেধ নেই। নটীরা দিনেরবেলায় বেশি পথে আসে না, কিন্তু নটীদের পথে আসতে কোনো বাধা নেই। রাজগৃহে নটীরা যথেষ্ট সমাদৃত। পথে পথে শ্রেষ্ঠী, গৃহপতি, ধনী, বণিকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকল ধর্মের লোকই নগরের পথে বাধাহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দূরের গাছতলায় কিছু যুবা অলসভাবে মৌরীয় পান করছে, রাজপ্রাসাদের কাছে বলে নারীদের দেখে তারা বাচালতা প্রকাশ করছে না। কালকূটের চোখে উঠে আসছে সেকালের এক সমৃদ্ধ ও শিল্প-উন্নত নগর রাজগৃহের সমাজচিত্র, নগর জীবন।

আকাশের বুকে জেগে থাকা পাহাড়ের রেখা দেখে কালকূটের মন বারে বারেই অতীতচারী হয়ে ওঠে। বরযাত্রী লেখকের সরকারি আমলা অনুজ যন্ত্রচালিত যানে কালকূটকে নিয়ে রাজগীরের পথে বের হয়েছেন। পথে যেতে যেতে তিনি কালকূটকে একালের রাজগীরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। যেহেতু ঐতিহাসিক স্থান, সেহেতু বর্তমানের সঙ্গে অতীতের স্মৃতি বিজড়িত চিহ্ন সকলও কালকূটের চোখে পড়ছে।

ছোট ছোট টিলার মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে চলতে চলতে দেখছেন পাথরের পর পাথর সাজানো টিলাগুলো। মনে মনে চলে গেলেন আড়াই হাজার বছর আগের যুগের সেই নগর প্রাকারে— যেখান দিয়ে আট কি ছয় অশ্ব পাশাপাশি চলতে পারত। ছটাগিরি, বিপুলগিরি এমনি কতগুলি পাহাড় দিয়ে সুরক্ষিত হল রাজগৃহ নগর। নগর প্রাকারের দরজায় সৈনিকের ডাক,

ভেরীর নাদ কালকূট শুনতে পেলেন। তিনি অনুসরণ করলেন গৌতমকে, অনুপ্রিয় থেকে গৌতম নগরের প্রবেশদ্বার দিয়ে নগরে প্রবেশ করলেন। কালকূটের সূক্ষ্ম নজরে ধরা পড়লেন মহারাজ বিম্বিসার। রাজা বাতায়ন দিয়ে অলস নয়নে নগরকে দেখছিলেন, হাতির পিঠে শ্রেষ্ঠী চলেছে, প্রাসাদের দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টি রেখে। রাজাকে দেখতে না পেলেও রাজার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নগরবাসী। গর্বিত সেনা অশ্বসওয়ার চলেছে অসি ঝনঝনিয়ে, ধনী গৃহপতি নগরবাসিনীরা চলেছে অশ্বরথে। কালকূটের চোখে মহারাজকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাল। কিসের জন্য তাঁর চোখে অবসাদের ছায়া। কালকূট উঁকি দিলেন অন্দরমহলে। আম্রপালীর যৌবনের লীলা তাঁর মনে ছায়া ফেলে নি। তাহলে? মহারাণী কোশলার সঙ্গেও তাঁর মনোমালিন্য হয়নি। কালকূট ভাবছেন, রাজপুত্র অজাতশত্রু কি ষড়যন্ত্র করছে? কাশী অঙ্গরাজ্য নিয়ে সে তো সুখেই আছে। যদিও রাজা জানেন সেই ভবিষ্যত বাণী 'অজাতশত্রু পিতৃহন্তা হবে।' কালকূট আধুনিক যুগের মানুষ, চলেছেন যন্ত্রযানে, কিন্তু মন অতীতচারী, তাই যেতে যেতে মহারাজের দীর্ঘশ্বাসের শব্দটাও যেন তিনি শুনতে পেলেন। অন্তর্দৃষ্টিতে দেখলেন মহারাজ মৃত্যুভয়ে ভীত নন। রাষ্ট্র রাজনীতি তিনি ভালই জানেন। সবদিকেই তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ম। অন্যায় দেখলেই কঠোর হাতে ব্যবস্থা নেন। এই দীর্ঘশ্বাস কিসের জন্য, কিসের জন্য মনের মধ্যে এত হাহাকার। এসব লক্ষ্য করতে করতে কালকূট দেখতে পেলেন মহারাজের দৃষ্টিতে আলো ফিরে আসছে। বুকের রক্তে একটা নতুন জোয়ারের ঢেউ লেগেছে একটা মানুষকে দেখে—

"দীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত বুক, গৌরবর্ণ, কোমল মুখে জ্যোতি। এই রূপ দেখে এই মুখ দেখে সমস্ত হতাশা যেন কোথায় দূর হয়ে গেল। বুকে আশা জাগল। বাতায়ন থেকে বাতায়নে, ঘুরে ঘুরে দেখলেন, সন্ন্যাসী কোন্‌দিকে যান।" *(পৃ: ৫২৯, ঐ)* পরে অনুচরকে নির্দেশ দিলেন সন্ন্যাসীর গতিবিধি দেখে এসে তাঁকে জানাতে। রাজার অন্তর বলে উঠল— "উনি আমার হাহাকার মেটাবেন, শূন্যতাকে পূর্ণ করবেন।" *(পৃ: ৫২৯, ঐ)* কিন্তু উনি কে?' অতীত পথে মনভ্রমণ করতে করতেই কালকূট বাস্তব জগতে ফিরে এলেন। যন্ত্রযানের হুসহাস শব্দে মনের পরিভ্রমণ বাধা পেল, তাই কালকূট অতীতের রাজগৃহ থেকে আধুনিককালের রাজগীরে ফিরে এলেন।

এতক্ষণ ছিলেন অতীতের নাগরিক জীবনে, এখন দেখছেন আধুনিককালের নাগরিক-নাগরিকাদের। বর্তমান রাজগীরের পথে পথে নতুন মানুষের মেলা। নানা বেশে, বিচিত্রতায় ভরা। কেউ এসেছে স্বাস্থ্য উদ্ধারে, কেউ এসেছে উষ্ণ কুণ্ডে স্নান করে চর্মরোগ-বাতরোগ সারাতে, কেউ এসেছে নতুন দেশ দেখতে, কেউ এসেছে রাজগৃহ দেখতে। কে কি করতে এসেছে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, যেমন বোঝা যায় নি আড়াই হাজার বছর আগের নগর রাজগৃহে। নানা বেশে নানা মানুষ, কে সাধু কে চোর, কিছুই বোঝা যায় না। কালকূট ইতিহাসের ঘটনা থেকে

মানব-মানবীদের তুলে এনেছেন বর্তমানের আলোকে তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙক্ষা ইত্যাদি মানবিক দিকগুলো তুলে ধরেছেন। কালকূটের কলমের ছোঁয়ায় অজস্র ঘটনার পরতে পরতে সেইকালের সমাজ জীবন, কৃষ্টি সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত করে অতীতের চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

অতীতের রাজগৃহে পদচারণা করতে করতেই আধুনিককালের রাজগীরে পদচারণা করছেন। কোথাও থাকবার ঠাঁই পাচ্ছেন না। অতীত ও বর্তমানে দ্রুত পদচারণা করতে করতে অবশেষে ঠাঁই পেয়েছেন এক বার্মীজ বৌদ্ধ মন্দিরের অতিথি নিবাসে। যদিও একথা অনেক আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবু আরও একবার করা হল। বার্মীজ বুদ্ধ মন্দিরের পরিবেশ কালকূটের ভাল লেগেছিল। "বুদ্ধের এক অতি প্রিয়তম, রাজগৃহে, তাঁর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে, জীবনযাপনও পরম ভাগ্যের। অনেক চীনা সাধক হাজার বছর আগে এসে শুধু এই রাজগৃহের ধূলা নিয়ে গিয়েছেন। তাতেই আপন জন্মভূমিকে পুণ্যস্থান করে তুলেছিলেন।" *(পৃ: ৫৩০, ঐ)*

অতিথি নিবাসের দোতলার জানলা দিয়ে তাকালেই রাজগৃহে নালন্দার রেলপথ, ছোট ছোট বাড়ি, লোকজনের চলাফেরা, রাজগীর বাজার, শহরে যাবার বড় রাস্তা। সেখানে গাড়ি চলছে। বেণুবন নামে বাঙালি খাবারের হোটেলটি দেখা যায়। সব মিলিয়ে কালকূটের কাছে ভালো আশ্রয়। এখানে এসে খোলা ছাদে গিয়ে আবার রাজগৃহের দিকে তাকিয়ে চারিদিকে পাহাড়ের মালা দেখতে দেখতে সেই রাজগৃহ নগর খুঁজতে লাগলেন। পাহাড়ের গায়ে গায়ে আর নিচের সমতলে সেই রাজগৃহ ছিল যার নাম গিরিব্রজ।

'রাজগৃহ' নাম নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা আছে। কালকূট অত কূট কচালে না গিয়ে বলেছেন "আমি মনে করি রাজা যেথায় বাস করেন, রাজধানী করেন তারই নাম রাজগৃহ।" *(পৃ: ৫৩১, ঐ)* আমরা কালকূট অনুসৃত পথেই রাজগৃহকে দেখব। এই রাজগৃহের আদ্যিকালের রাজা ছিলেন জরাসন্ধ। কালকূট এবার জরাসন্ধের সন্ধানে চলে গিয়েছেন মহাভারতের যুগে। তার পূর্বপুরুষদের ছায়ায় ছায়ায় ভ্রমণের জন্য আরও দূরকালে, হিসাবের বাইরে সেই শতাব্দীতে। গিরিব্রজ রাজগৃহের প্রতিষ্ঠাতা কে? আর্য না অনার্য। আক্রমণ করেছিল পশ্চিমোত্তর থেকেই। আর্যরা হরপ্পা-মহেঞ্জদড়ো থেকেই এই তথ্য-এর হদিশ দেয়। কালকূটের জিজ্ঞাস্য গিরিব্রজ রাজগৃহের প্রতিষ্ঠাতা কারা? আর্যদের কাছে মার খাওয়া মানুষেরা, যারা আর্যদের কাছে ছিল অসুর দানব দস্যু দাস, তারাই কি প্রতিষ্ঠাতা। ইতিহাস মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, কালকূট বহু দূরকালের আলোছায়ার অস্পৃষ্টতায় স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। বৌদ্ধদের সেই মহাগোবিন্দ মানুষটি না মান্ধাতা কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শুধু এটুকু দেখতে পেয়েছেন — জরাসন্ধ মহাপরাক্রান্ত রাজা। প্রবল কৃষ্ণদ্বেষী। যেহেতু পাণ্ডবরা কৃষ্ণ অনুরাগী, অতএব পাণ্ডবদের জরাসন্ধ শত্রু মনে করতেন। জরাসন্ধের ছায়ায় ছায়ায়

কালকূট চলেছেন। দেখছেন কৃষ্ণের সঙ্গে বিরোধিতা করার জন্য নিজের দুই কন্যার সঙ্গে কংসের বিবাহ দিতে। কংসের মৃত্যুর পরে বিপুল সৈন্য নিয়ে মথুরা আক্রমণ করে কৃষ্ণের কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে। জরাসন্ধ এত কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন যে, ফেরার পথে কৃষ্ণ অনুরাগী যত রাজাকে পেয়েছিলেন, তাদের সবাইকে বেঁধে নিয়ে এসে রাজগৃহের কারাগারে বন্দী করেছিলেন। কিন্তু জরাসন্ধ নিজে বীর ছিলেন। তাই বীরের প্রতি সম্মান তিনি দেখিয়েছিলেন। এ গুণ তাঁর আছে। কর্ণের বীরত্বের সংবাদে তিনি কর্ণের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় ব্রতী হয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। কর্ণকে জরাসন্ধ মালিনীনগরী দান করে তাঁর বীরত্বকে সম্মানিত করেছিলেন। কালকূট সেকালের বীরপুরুষ জরাসন্ধকে মহাকাব্য থেকে তুলে এনে আধুনিক দৃষ্টিতে বাস্তব মানুষের মানসিক পর্যায়গুলো তুলে ধরেছেন।

কালকূট মনভ্রমণে দেখছেন অতীতের সেই যে গভীর রাতটিকে — রাজগৃহ গিরিব্রজের নগর দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। স্বর্ণাভ কেশর ফোলানো দ্রুতগামী অশ্ব টানা রথে, নগরের বাইরে তিনজন ব্যক্তি গুপ্ত পথে রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করে কোনরকমে রাত্রিবাস করছেন। পরের দিন প্রকাশ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই তিনব্যক্তি। কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম। তারপর ভীম জরাসন্ধকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ডাক দিয়েছিলেন। কালকূট জরাসন্ধের বুকের গভীরে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। মনে মনে বুঝতে চাইলেন 'নিয়তির সংকেত ঝিলিক দিয়ে' উঠল কিনা। কৃষ্ণ-ভীম-অর্জুন মাত্র তিনজন এসেছিলেন, কিন্তু জরাসন্ধের সৈনিকেরা তাঁদের আক্রমণ করেনি। বীরের ধর্মই পালিত হয়েছে। বীরের ডাকে সাড়া দিয়ে রণভূমি তৈরির আদেশ দিয়েছিলেন জরাসন্ধ। বীরকে বীরের মতই মরতে হবে, বাঁচতে হবে বীরের মতই। কালকূট সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধকে একালের দৃষ্টিতে বলেছেন, ''শক্তির পরীক্ষা না, জীবন হননের প্রতিজ্ঞা। কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে না, একটি বিশেষভাবে তৈরি রণভূমি।'' *(পৃ: ৫৩২, ঐ)* সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে শেষপর্যন্ত ভীম, দুই পা ধরে মাঝখান ছিঁড়ে ফেলেছিলেন জরাসন্ধকে। মহাপরাক্রান্ত বীর যোদ্ধা জরাসন্ধের পুরুষকারের সঙ্গে দৈব সহায় ছিল না। মহাভারতে পুরুষাকারকে খুব বড় স্থান দেওয়া হয়েছে। দৈবকেও অস্বীকার করা হয়নি। এ'ঘটনাতেও সেই পুরুষকার ও দৈবর সংযোগ দেখা যাচ্ছে। জরাসন্ধ বীরের নাম শুনলে অস্থির। তাই তিনি শক্তির পরীক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন, দৈব তার সহায় ছিল না। কালকূট অতীত পথে যত এগোচ্ছেন ততই মহাকাব্যিক বিভিন্ন কাহিনি উপকাহিনিগুলো একালের দৃষ্টিতে দেখে সাহিত্যের ছোঁয়ায় জীবন্ত করে তুলেছেন। কালকূটের অতীতের রাজগৃহ ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে চলছে একালে রাজগীর ভ্রমণ সমানতালে। জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু সকলেরই তীর্থক্ষেত্র রাজগীর।

সাতধারার উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করলে ব্যাধি থেকে মুক্তিই শুধু পাওয়া যায় না, পুণ্যও হয়। অতএব স্নানের জন্য পুরুষে-পুরুষে, মেয়েতে-মেয়েতে ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলি। কার কোঁচা খুলে গেল

আর কার শরীরে শাড়ি নেই কারও লক্ষ্য নেই। কালকূট প্রাচীর ঘেরা সাতধারায় স্নানের জন্য ঢুকতে না পেরে উষ্ণ কুণ্ডে এসেছিলেন। কিন্তু সেখানকার অবস্থা আরও করুণ অতএব আবার সাতধারাতে এলেন। এক গৌরবর্ণ, বিশালবপু খানিকটা সরে গিয়ে জায়গা করে দেওয়াতে কালকূট ধারায় গা পেতে দিয়ে প্রথমে ছিট্‌কে সরে এসেছিলেন, ভীষণ গরম। পরে আস্তে আস্তে সইয়ে নেওয়ার পরে রক্তে একটা নতুন স্পর্শের স্বাদ পেয়েছিলেন। আরামের অনুভূতিতে মজে ছিলেন। স্নানের পরে না খেয়ে অতিথি নিবাসে গেলে আবার বাইরে বেরোতে হবে খাওয়ার জন্য। অতএব সাতধারা থেকে নীচে নামতে কালকূটের চোখে পড়ল তাঁর ডানদিকে গিরিপ্রাকারের মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। বিপুলগিরি, বৈভারগিরি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এই দুই পাহাড়ের কোল ঘেঁষেই ছিল নগরপ্রাকার। এদিক থেকে মেয়েরা এক আধজন পুরুষসঙ্গী নিয়ে শুকনো কাঠ মাথায় নিয়ে আসছে। 'কালো উদ্ধত শরীরে বেড় দিয়ে আছে, কোমর থেকে বুক অবধি, একটিমাত্র ছোট কাপড়। তাতে যত লজ্জা রক্ষা হয়েছে, একটা আদিম সৌন্দর্য ছলকে পড়ছে যেন তার বেশি।' *(পৃ: ৫৩৪, ঐ)* এদের দেখে কালকূট ভাবছেন এরা কারা? সেই রাজগৃহ-গিরিব্রজ যুগের সময় থেকে বংশ রক্ষা করে আসছে, না নতুন জনগোষ্ঠীর ঢেউয়ে পরিত্যক্ত রাজধানীর জঙ্গলে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

ভ্রমণের গতি এগিয়ে চলে। কেউ যেখানে যেতে চায় না সেখানেই যাওয়ার জন্য কালকূটের কাছে ডাক আসে। রেললাইনের ধারে, শহরের শেষসীমায় এক মস্ত বস্তি। স্থানীয় অধিবাসীদের আস্তানা। ঘরগুলো সব পাতা দিয়ে ছাওয়া। একটি কালো যুবতী একটি বড় কলসী নিয়ে বসে আছে, তাকে ঘিরে কিছু নর-নারী। বলিষ্ঠ তাদের চেহারা। দেখলে মনে হচ্ছে কালো মাটি দিয়ে তাদের শরীর গড়া। তাদের হাত পা নড়ায় ধুলো উড়ছে, তাদের গা থেকে ধুলো ঝরছে। তাদের সকলের হাতে বা হাতের কাছে একটি করে মৃৎপাত্র। কালো যুবতীটি তাতে কী যেন ঢেলে দিচ্ছে। যুবতীটি রসবতী শুণ্ডিনী। এটা কালকূট বুঝতে পেরেছেন। ভারতবর্ষের যে কোন জায়গাতেই দেখা যায়। জনে জনে রস দেয়, মূল্য আদায় করে, মিষ্টি হেসে কালো চোখে ঝিলিক মারে। শুধু রসখোররাই নয়, অনেকে গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে বসে কথাবার্তা বলছে, কোথাও উনুন জ্বলছে, হাঁড়িতে কিছু ফুটছে, কোনো মা খোলা বুকে ছেলের মুখে স্তন গুঁজে বসে আছে, অর্ধনগ্ন যুবক-যুবতী দূরে পাহাড়ের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছে। কালকূট এদেরই কাউকে হয়ত কাঠকুটো কুড়িয়ে আনতে দেখেছিলেন। দু'জন নরনারী ব্যস্ত ইঁদুরের ছাল ছাড়িয়ে তার মাংস টুকরো টুকরো করে কাটতে। কেমন একটা আদিমতার ছোঁয়া। ইঁদুর-ভুক বস্তিতে ভদ্রজনেরা আসে না বললেই চলে। তাই কালকূটকে দেখে বস্তির নর-নারীদের কালো চোখে, কৌতূহলের জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছে, এটা কালকূটের সন্ধানী চোখে ধরা পড়েছে। তাঁর মনে হয়েছে 'রাজগীরের এই ছোট শহরের সঙ্গে,

কোথাও তাদের মিল নেই। মনে হয়, এরা যেন সেই রাজগৃহের আমল থেকে, এমনি করে এখানে রয়েছে।' *(পৃ: ৫৩৫, ঐ)*

আধুনিককালের সমাজ বিচ্ছিন্ন একটি জায়গা, বিচ্ছিন্ন মানুষের দল। কালকূট মনে মনে খুঁজছেন এমনই একটি জায়গা যেখানে রাজগৃহে 'আমার ডাক যেখান থেকে, সেখানকার সঙ্গে যাদের যোগসূত্র, তাদের যেন খুঁজে পাই।' *(পৃ: ৫৩৫, ঐ)* আধুনিক সমাজের আলোর বৃত্তে এরা তেমন করে আসতে পারে নি। কালকূটের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে একটা আদিমতার ছোঁয়া এদের সর্বাঙ্গে লেগে রয়েছে। নীলপাহাড়, সবুজ জঙ্গল আর রক্তিম পাথরের সঙ্গে মেলানো যেতে পারে কিন্তু আধুনিককালের রাজগীর শহরের সঙ্গে এদের কোথাও মেলানো যায় না। তাঁর কেবলই মনে হয়েছে সেই রাজগৃহের আমল থেকে এমনি আদিমতার সঙ্গে তারা এখানেই রয়েছে। এসব ভাবতে ভাবতে রেললাইন ধরে হাঁটছিলেন। আচমকা 'হেই' শব্দে একটি নারী কণ্ঠের ডাক শুনে পেছনে তাকাতে দেখতে পেলেন ''চোখের কালো তারায় কৌতুকের বিজলী হানা, দৃষ্টি নিবিড়।'' *(পৃ: ৫৩৫, ঐ)* কালকূট ভেবেছিলেন বস্তির কেউ তাকে ডাকছে কিন্তু বস্তির কেউ না। তার চোখের দিকে তাকিয়ে কালকূটের মনে হয়েছে ''কোথায় একটা বহু দূরের দিগন্ত সেখানে জেগে রয়েছে।'' *(পৃ: ৫৩৫, ঐ)*

তার শরীরের দিকে তাকাতে গিয়ে কালকূটের বুকের কাছে ঝনঝনিয়ে উঠেছিল, রাজগীরের লাল মাটির মত এর গায়ের রং। শরীর যেন রক্তিম পাথর কেটে তৈরি। মাঝারি লম্বা, ক্ষীণ কটি, সুনিতম্বিনী। সামান্য একটা লাল কাপড় দিয়ে কোনরকমে বুকটা ঢেকেছে। বিবর্ণ পুরনো শাড়িটা কোনমতে জড়িয়ে বুকের উপর দিয়ে বাঁ কাঁধে তুলে দিয়েছে, ছোট সংক্ষিপ্ত কাপড়ের ওপরে জেগে উঠেছে তার বলিষ্ঠ উরু আর জংঘা। নাভিদেশ মসৃণ। রুক্ষ্ম পিঙ্গল চুলে সিঁথি আছে কী নেই বোঝা যায় না, কিন্তু পিছনে এলো করে গুটিয়ে বাঁধা এটা বোঝা যায়। মুখে, কপালে আর গালে ছাপকা ছাপকা দাগ। দেখে মনে হচ্ছে যেন পাথরে শ্যাওলা লেগেছে। আর হাতে কয়েকটা কাঁচের চুড়ি। যৌবন তার শরীরে, চকিতে চকিতে, নানারূপে ঝিলিক দিচ্ছে। ঢেউয়ের মতো উঠছে, ভাঙছে না, ফণার মত দুলছে। ভালো করে নারীটিকে দেখতে গিয়ে কালকূটের গায়ে যেন কাঁটা লাগলো। ''তার রক্তিম স্তনান্তরের মাঝখানে যেন কাঁপছে। কোমর সে একটু পিছনে টেনে রেখেছে, উরু সামনের দিকে। হঠাৎ মনে হল, হাজার হাজার বছরের, একটা দিনের বুক থেকে, সে উঠে এসেছে। হাজার হাজার বছর আগের ধুলো তার গায়ে, মুখে দাগ পড়ে গিয়েছে বহু বছরের সময়ের। আমি তাড়াতাড়ি তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে, নিজের পথে হাঁটতে লাগলাম। নিশ্চয়ই আমাকে ডাকেনি। আমি একে চিনি না।'' *(পৃ: ৫৩৬, ঐ)*

কয়েক পা এগিয়েই কালকূট বুঝতে পারেন পেছনে পায়ের শব্দ। বর্মী বৌদ্ধ মন্দিরের

টিলার কাছাকাছি আসতেই আবার সেই শব্দ— হেই। আবার পেছন ফিরে তাকাতে দেখতে পেলেন তাঁর একদম পেছনে, কটিদেশে একটা বাঁক নিয়ে, কোন এক প্রাচীন মূর্তির ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সেই নারী হাসছে। কালকূটের প্রশ্নের উত্তরে সে পরিচিত জনের মতো বলেছিল "তুমি কি আমাকে পয়সা দেবে?" *(পৃ: ৫৩৬, ঐ)* আর কালকূটের মনে হয়েছে— "এ তো ভিখারিণীর চাওয়ার ধরণ নয়। পয়সার দরকার তাই চেয়েছে। তার গলার স্বর বাজছে যেন, অন্য যুগ থেকে, বহুকালের ওপার থেকে। এমনি একটা সুরে মাখানো, একটা নিঃশ্বাসের বাতাস ভরা, নিচু আর দুর থেকে ভেসে আসার মতো।" *(পৃ: ৫৩৬, ঐ)*

তার আচরণে তাকে ভিখারিণী বা পাগলিনী বলেও মনে হল না কালকূটের। মায়াবিনীও সে নয়, কারণ ছায়া পড়েছে মাটিতে। কিছু পয়সা তার হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতেও পারছেন না। নারীমূর্তিটি লেখককে কিছুতেই ছাড়ছে না। সে ডাকছে — হেই, মানুষ' *(পৃ: ৫৩৬, ঐ)* বলে। টিলার উপরে উঠতে উঠতে কালকূটের কানের কাছেই কেউ যেন ডেকে উঠল 'হেই, আদমি' *(পৃ: ৫৩৬, ঐ)* বলে। কালকূট তার ডাক শুনে পিছনে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন মন্দিরের গেটের কাছে। এত কাছ থেকে মেয়েটি তাকে ডাকছে যে মেয়েটির গায়ের গন্ধ তার নাকে এসে লাগল। সেই গন্ধেরও রঙ রূপ আছে—গন্ধটি যেন মাটি আর দুপুরের রোদে ঘাস লতাপাতা থেকে যেরকম গন্ধ বের হয় ঠিক সেই গন্ধ মেয়েটির গা থেকে বেরোচ্ছে। কালকূট তাড়াতাড়ি দরজার কাছে আসতেই কালকূটকে মেয়েটি স্পর্শ করে আবার ডাকল 'মানুষটা, আমার কথা শোন।' *(পৃ: ৫৩৭, ঐ)* কালকূট চমকে পিছনে তাকালেন কিন্তু শুনতে পেলেন না তার কথা। কালকূটের দেখভাল করবার লোকটি হল বেচন, যে সেই মুহূর্তে এসে পড়েছিল বলে। বেচন মেয়েটাকে এর আগে কখনো দেখেনি, তবে খারাপ মেয়ে বলে ভাবতেও রাজি নয়। কোনো অপদেবতা হয়তো মেয়েটিকে ভর করেছে অথবা হয়তো অপদেবতা। বেচনের চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাব দেখে কালকূট বুঝতে পেরেছেন, একটা গভীর শ্বাস থেকেই সে বলছে এই কথা যে শাপ লাগতে পারে। বেচনের কথার সূত্র ধরে কালকূটের মনে হচ্ছিল "ও যেন হাজার হাজার বছর আগের কোনো এক যুগ থেকে উঠে এসেছে।" *(পৃ: ৫৩৭, ঐ)*

আবার কালকূট অতীতে পাড়ি দিলেন। কালকূট রাজগৃহ-গিরিব্রজ-নগরীর উৎসব মুখর একটি দিনে মনে মনে পাড়ি দিলেন। তিনি দেখতে পেলেন সমাজ (উৎসব) হচ্ছে। শুণ্ডিনীরা মৌরীয়, মাধ্বি পরিবেশন করছে। বড় বড় ভোজনালয়ে প্রচুর মাংসের আয়োজন। নগরের নানা দিগন্তে নৃত্য-গীত চলেছে। কুঞ্জে কুঞ্জে বিহার, সোহাগ আলিঙ্গন প্রেমকুহর।' *(পৃ: ৫৩৭, ঐ)* হচ্ছে। রেললাইনের ধারের বস্তিতে দেখা রসবতী শুণ্ডিনী ও তার পরিবেশ আর হাজার বছর আগের সমাজের (উৎসবের) একটি দিনের সঙ্গে কালকূট একালের দৃষ্টিতে মিলিয়ে নিতে নিতে ভাবনাকে

আরও প্রসারিত করে দিলেন। হাজার বছর আগের সেই উৎসব মুখর দিনে, তিনি দেখতে পেলেন "তার মধ্যে, একজন, এক যুবতী তার পুরুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, 'হেই আদমি, আদমি!' হাজার হাজার বছরের সেই উৎসবমত্ত দিন থেকে, আজ সহসা উঠে এসেছে। তার মুখের ওপর বহুকালের দাগ, শরীরে ধুলো, পোশাক বিবর্ণ হতে হতে, এখন রঙ রূপ কিছুই বোঝা যায় না। আমার গায়ের মধ্যে শিরদাঁড়ার কাছে, আবার একটা অনুভূতি সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল।" *(পৃ: ৫৩৭, ঐ)*

দেখা যাচ্ছে হাজার হাজার বছর আগের যুবতীটির ডাক শুনে কালকূটের যে অনুভূতি হয়েছিল, বর্তমানে যে মেয়েটি রেললাইনের ধার থেকে পিছু নিয়ে ডাকতে ডাকতে তাঁকে স্পর্শ করছিল, সেই মেয়েটির স্পর্শেও কালকূট শিহরিত, একই রকমের অনুভূতি। অতীতের অনুভূতি ও বর্তমানের অনুভূতি একাকার। সহসা লেখক কথকের অতীত ভাবনায় ছেদ পড়ে। তিনি বাস্তবে ফিরে আসেন। তাঁর মনে পড়ে যায় তিনি গিরিব্রজ-রাজগৃহে এসেছেন একজনের পায়ের চিহ্ন খুঁজতে। মহানির্বাণের পথ ধরে রাজ ঐশ্বর্য ছেড়ে এখানে এসেছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রথম এখানেই ঠাঁই নিয়েছিলেন। তিনি মনভ্রমণে সেই সব পুরনো দিনে তাঁর পদচিহ্ন বিজড়িত স্থানে যেতে ও খুঁজতে এসেছেন। তাই তিনি তাঁর পিছু নেওয়া মেয়েটির ভাবনা বর্তমানের মন থেকে সরিয়ে অতীত মনভ্রমণে যেতে চান। তাই তিনি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলেন। দরজা খুলে ঘরে ঢুকবার আগেই লক্ষ্য করলেন ডানদিকের ঘরটিতে মানুষ এসেছে। লালচে ফর্সা, নরুণ চেরা চোখ, মুড়ানো মাথা, গলায় সোনার চেনের সঙ্গে ছোট বুদ্ধমূর্তি থেকে অনুমান করলেন তিব্বতী বলে; পুরুষ দুটির সঙ্গে পরিচয় হতেই তাঁর অনুমান সত্যি হল। পুরুষ দুটির সঙ্গে বছর উনিশের একটি মিষ্টি পুতুলের মত চেহারার মেয়ে এসেছে। তাঁর সঙ্গে আলাপ হল, তিব্বতী পোশাকের বদলে রঙিন সিল্কের কলার ব্লাউজ আর জ্যাকেট পরিহিতা, চুল ঘাড় অবধি, ভুরু চোখ কাজল-আঁকা, চোখ দুটি সুন্দর, নিতান্ত নরুণ চেরা নয়, সব মিলিয়ে এক আধুনিকা তরুণী।

কালকূটের চোখে রাজগীর হল ইতিহাস আর তার আগের ইতিহাসের এক সঙ্গম। এ'কালের দৃষ্টিতে তিনি দেখছেন। দেশবিদেশ থেকে নানা মানুষের আনাগোনা, সেই হাজার হাজার বছর আগেও এসেছিলেন চীনা সাধকেরা। কালকূট যাকে খুঁজতে রাজগীরে এসেছিলেন সেই সাধকেরাও এসেছিলেন সেই বুদ্ধের কাছে, তাঁর খোঁজে। তাঁরা রাজগৃহের ধুলো নিয়ে গিয়ে নিজ জন্মভূমিকে করে তুলেছেন পুণ্য স্থান। এ'কালে কালকূটের ডানদিকের ঘরে তিব্বত থেকে যারা এসেছেন তারা বৌদ্ধ। বোঝা যাচ্ছে বুদ্ধের পদচিহ্নের খোঁজে এরাও এসেছেন। কালকূটের মনে কয়েক হাজার বছর আগের অতীত জেগে উঠছে বারে বারে।

ঘরে ঢুকে পোশাক ছাড়ার আগেই তিব্বতী মেয়েটি কালকূটের ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর

পড়ে থাকা ম্যাগাজিন গুলোর ওপরে ঝুঁকে পড়ে জানতে চেয়েছিল— কালকূট কোন্ বইটা পড়বেন? কালকূটের বইগুলো সব পড়া হয়ে গিয়েছে, আর দরকার নেই। তাই ম্যাগাজিনগুলো সব দিয়ে দিলেন মেয়েটিকে। তরুণীটি ফিল্ম ফ্যাশন আর অন্যান্য নিউজ ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে চলে যাওয়ার পরে কালকূট দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। মনভ্রমণ অনেকক্ষণ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে 'হেই আদমি' ডাকে। এখন পরিসর পেলেন ভাবনা সরিয়ে রেখে আবার মনভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন রাজগৃহ নগরে, হাজার হাজার বছর ওপারে, বিম্বিসারের কক্ষে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন— রাজা বিম্বিসার সেই সন্ন্যাসীর খবরের জন্য অপেক্ষা করছেন, অনুচরের কাছে খবর পেলেন যে, সন্ন্যাসী উত্তর দ্বার দিয়ে নগরের বাইরে চলে গেছেন। শুনেই মহারাজের চোখে-মুখে আবার হতাশার ছায়া নেমে এসেছে। সন্ন্যাসী রাজগীরে ক'দিন থেকে বৈশালী চলেছেন। বৈশালীতে গুরু আলাড় কালামের কাছে কিছুদিন শিক্ষা নিলেন। তারপর রাজগৃহে ফিরে উদ্রকের কাছে শিক্ষা নিলেন। অনুচরদের কাছে খবর পেয়ে এবার রাজা বিম্বিসার আর সময় নষ্ট করেন নি, সেই অনুচরদের সঙ্গে করেই তিনি সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করতে পাণ্ডব পাহাড়ের গুহায় চলে আসেন। মহারাজ বিম্বিসার নত নমস্কারে তার পরিচয় জানতে চান।

সন্ন্যাসী রাজা বিম্বিসারকে তাঁর বংশ পরিচয় দিলেন এইভাবে, ''কপিলাবস্তু শাক্যবংশীয় প্রধানের সন্তান তিনি, নাম তাঁর গৌতম।'' *(পৃ: ৫৩৮, ঐ)* রাজা বুঝলেন— ''এমন দীর্ঘদেহ শ্রীমণ্ডিত চেহারা সন্ন্যাসী কোথা থেকে পেয়েছেন। তারই সঙ্গে, বোধিলাভের আকাঙক্ষা আর এক রূপ দান করেছে এই মুখে।'' *(পৃ: ৫৩৮, ঐ)* রাজা অনুরোধ জানালেন তপস্যায় সিদ্ধিলাভের পর যেন তিনি রাজগৃহে এসে থাকেন। কালকূটের মন বুদ্ধকে অনুসরণ করল। তিনি দেখছেন বুদ্ধ বোধিলাভের পর শুরু করেন ধর্মপ্রচার। অবৈদিক, অব্রাহ্মণ্য ধর্মপ্রচারে বিরূপ সমালোচনার ঝড় উঠল ব্রাহ্মণদের মধ্যে; তথাপি সমস্ত জাতির মধ্য থেকেই কেউ কেউ বোধিপ্রাপ্ত বুদ্ধের বাণীতে মুক্তির সন্ধান পেতে লাগল। শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন উরুবেলের কাশ্যপ গোত্রীয় জটিল জটাধারী সম্প্রদায়ের কয়েকজন ব্রাহ্মণ। এরপরে মহারাজ বিম্বিসারের অনুরোধ রাখতে বুদ্ধ রাজগৃহে ফিরে চললেন। নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে, তিন ক্রোশ দূরে বিম্বিসারেরই একটি ছায়াশীতল তালবন আছে, সেখানে উঠলেন। ''সংবাদ পাওয়া মাত্র বিম্বিসার লট্‌ঠিবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। কয়েকদিন পরেই, রাজগৃহের বহু অধিবাসী পুরঃসর, তাঁকে অভ্যর্থনা করে রাজগৃহে নিয়ে আসেন। নগরে না, সেখানে সংঘের কার্যকলাপ, ধ্যানের আলোচনার সুবিধা নেই। নগরের বাইরে, যেখানে নিবিড় নির্জনতা, অথচ নগরের খুব সামনে, সেই বেণুবন আরামে। যেখানে কলন্দক নিবাপের মতো মিষ্টি পবিত্র জলের পুষ্করিণী। ছায়ানিবিড় বাতাসে, পাখির কুজন''। স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে বুদ্ধের হাতে জল ঢেলে দিয়ে বেণুবন দান করেন।'' *(পৃ: ৫৩৮, ঐ)*

বিম্বিসার গৌতম দু'জনেই প্রায় সমবয়সী ছিলেন। কালকূট ইতিহাসের ঘটনাবলী ও চরিত্রগুলোকে সূক্ষ্ম তুলির আঁচড়ে জীবন্ত করে তুলছেন এ'কালের আধুনিক মনের দৃষ্টিতে। চরিত্রগুলোর সুখ-দুঃখ, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে মানবিক করে তুলেছেন। ইতিহাসের চরিত্রগুলো কালকূটের নিপুণ হাতের তুলিতে সাহিত্যের রূপ পাচ্ছে। তিনি অতীত থেকে বর্তমানের আলোতে ব্যক্তি চরিত্রগুলোর বাস্তব মানুষের মানসিক পর্যায়গুলো তুলে এনেছেন। ইতিহাস ধীরে ধীরে সাহিত্যের রূপ নিচ্ছে। সেই দূর অতীতের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে। কালকূট দেখছেন দু'জন সমবয়সী ব্যক্তিকে। একজন রাজা ও একজন সন্ন্যাসী। মহারাজ বিম্বিসারকে বুদ্ধ শ্রেণীদ বলে ডাকতেন। বুদ্ধ শুধু বেণুবনেই থাকছেন তা নয়। গৃধ্রকূট পাহাড় থেকে দূরের প্রকৃতি আর নগরের ছবি দেখতে পাওয়া যায় বলে গৃধ্রকূট পাহাড় বুদ্ধর খুব প্রিয় ছিল। তিনি রাজগৃহ সীমার মধ্যেই কখনো সপ্তপর্ণী গুহা, কখনো শীতবন ইত্যাদি নানা জায়গাতে থাকতেন। বহুলোক তাঁর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করছে দেখে অনেকে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠছেন। মনভ্রমণে লেখক দেখছেন, শিষ্য ভাঙাভাঙির খেলা শুরু হয়েছে। মৌদ্‌গল্যায়নকে গুণ্ডারা ঋষিগিরি পাহাড়ের গুহার কাছে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলল। বণিক অনাথপিণ্ডদ, গুণী চিকিৎসক, জীবক প্রভৃতি তাঁর শিষ্য হয়ে গেলেন। বিম্বিসারের পত্নী মদ্রকন্যা ক্ষেমা ভিক্ষুণী হয়ে গেলেন। ব্রাহ্মণ কন্যা মত্রিকা, শুভা, সারিপুত্রের বোনেরা, চালা, উপচালা ইত্যাদি ভদ্রমহিলারা ভিক্ষুণী হয়ে গেলেন। গোলমাল শুরু হল দেবদত্তকে নিয়ে — বুদ্ধের জ্ঞাতিভ্রাতা এবং শিষ্য; দেবদত্ত অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনের পক্ষপাতি, বুদ্ধ কোন 'অতি' কে প্রশ্রয় দিতে নারাজ। ফলে মতভেদ সৃষ্টি হল। ঈর্ষার জ্বালায় দেবদত্ত ক্রমশ বুদ্ধের নীতি থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুকে উত্যক্ত করতে লাগলেন। ফলে বুদ্ধের দিকে মাতাল হাতিকে ছুটিয়ে দিলেন অজাতশত্রু, কিন্তু বুদ্ধের সামনে মাতাল হাতি দাঁড়িয়ে পড়ল। আবার হত্যার চেষ্টা চলল। গৃধ্রকূট গুহার কাছে বুদ্ধ যখন পায়চারী করছিলেন, তখন দেবদত্ত পাহাড়ের বড় পাথর গড়িয়ে দিয়েছিলেন, পাথরটি আর একটি পাথরে আটকে গিয়েছিল তাই বুদ্ধকে হত্যা করতে পারেন নি। অবশেষে এইরকম সময়ে অজাতশত্রু ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে একদিন পিতাকে বন্দী করে ফেললেন। কালকূট দেখছেন ঈর্ষায় মানুষের হিংস্রতা কী ভীষণ রূপ পায়। বন্দী পিতা পুত্রের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন "যেখানেই থাকি, দিনান্তে তাঁকে যেন একবার দেখতে পাই।" *(পৃ: ৫৩৯, ঐ)* বেদনার তুলিতে বিম্বিসারের সেই সময়ের মানসিক পর্যায়গুলো এঁকেছেন।

কালকূট একালের রাজগীরে সেকালের গিরিব্রজ রাজগৃহের চিহ্ন সকল টাঙায় করে দেখতে দেখতে চলেছেন। কালকূটের দক্ষিণ দিকে রাস্তার চারপাশে গভীর চওড়া জঙ্গল। তাঁর মনে হয়েছে 'মাগধী রাজধানী' গিরিব্রজ রাজগৃহের নগর এই সমতলে গড়ে উঠেছিল। কালের আঘাতে

ধ্বংসপ্রাপ্ত সে নগর, এখন শুধু জঙ্গল, কিছু কিছু চিহ্ন পড়ে রয়েছে। কালকূটের ধারণা — এই জঙ্গলের মধ্যে অথবা আশেপাশে এখনও অনেক চিহ্ন মানুষের চোখের আড়ালে লুকিয়ে আছে। তিনি চলেছেন বাণগঙ্গার পথে, রাজগৃহ নগরের দক্ষিণ সীমানায়। খানিকটা আসতেই ছোট একটি বোর্ড দেখতে পেলেন। ইংরাজিতে লেখা রয়েছে "বিম্বিসারকে অজাতশত্রু এখানে বন্দি করে রেখেছিলেন। এখান থেকে তিনি গৃধ্রকূটে বুদ্ধকে দর্শন করতেন।" *(পৃ: ৫৩৯, ঐ)* কালকূট এই লেখা পড়তে পড়তেই মনভ্রমণে সেই কালের সেই সময়ে উপস্থিত হয়ে গেলেন। দেখলেন, "পাহাড়ের ওই চত্বরে আকাশের পটে এসে দাঁড়ালেন এক মূর্তি। আজানুলম্বিত বাহু, সৌম্য, বুকের গেরুয়া খণ্ড খানিকটা সরে গিয়েছে, মুণ্ডিত মস্তকে আবরণ নেই।" *(পৃ: ৫৩৯, ঐ)* কালকূট মনশ্চক্ষে সেই অতীতের মানুষ দুটিকে দেখলেন— তাঁর দুই চোখ চিক্‌চিক্ করছে। আর একজন সেই দিকে তাকিয়ে আছেন, তিনি রাজা বিম্বিসার। চোখের কোণে কালি জমেছে। মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছে, সারা মুখে দাঁড়ি। মলিন বেশে দাঁড়িয়ে আছেন, চোখে জলের ধারা বইছে। সন্ধ্যা প্রায় নেমে এসেছে। মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে শুনতে পেলেন। রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে দেখলেন মহিষী কোশলা বন্দি স্বামীর কথা ভাবছেন। হয়তো কাঁদছেন, কারণ তাঁরই পুত্র অজাতশত্রু স্বামী বিম্বিসারকে বন্দী করেছে। সহসা কালকূট শুনতে পেলেন বুদ্ধের কণ্ঠস্বর, তিনি তাঁর বন্ধু শ্রেণীদকে বলছেন "বন্দীত্বের থেকে, তুমি একে তপস্যার চোখে দেখ। সেই হবে শ্রেয়ঃ।" *(পৃ: ৫৪০, ঐ)* রাজা বিম্বিসার করজোড়ে পাহাড়ের ওপরে বুদ্ধের দিকে চেয়ে বারে বারে বলছেন "শক্তি দাও, শক্তি দাও, শক্তি দাও, হে বুদ্ধ।" *(পৃ: ৫৪০, ঐ)* রাজা বিম্বিসারের সেকালের প্রার্থনা কালকূটের মনের মধ্যে সঞ্চারিত হল। তিনি একালে টাঙায় করে গৃধ্রকূট পাহাড়ের দিকে এগোতে থাকলেন মনে মনে স্মরণ করে— 'শক্তি দাও, শক্তি দাও'। *(পৃ: ৫৪০, ঐ)*

গৃধ্রকূট পাহাড়ে উঠে কালকূট প্রথমে বিম্বিসারের কারাগারের দিকে তাকিয়ে শিহরিত হলেন। তারপরে চারিদিকে তাকিয়ে ক্ষয় ধরা ইটের প্রাচীর মেঝের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এসে পা ফেলে চলতে লাগলেন। পা ফেলতে গিয়ে মনে মনে তিনি কুণ্ঠিত "এখানে যে তাঁর পায়ের ধুলো রয়েছে।" *(পৃ: ৫৪০, ঐ)* দেখতে পেলেন হাতীর মতো একটা বিশাল পাথর। মনে মনে প্রশ্ন দেবদত্তর গড়িয়ে দেওয়া পাথর কি এটা। একালে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কালকূটের এক বিচিত্র অনুভূতি জাগল, চোখে জল আসতে চাইল; হাতটা মাথায় ঠেকিয়ে তিনি পাহাড় থেকে সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে নেমে এলেন। পাহাড়ের মাথায় রোদ ঝিকমিক করছে। কালকূট বাণগঙ্গার পথে এগিয়ে চললেন। বাণগঙ্গার সেতুর কাছে এলেন। সেখানে একটিমাত্র আলোয় কালকূট বুঝে নিতে চাইছিলেন অতীতে কোনদিকে লট্‌ঠিবন, নগরের দক্ষিণ দেউড়ির সীমা, নগরের প্রাচীর ছিল। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন বহির্নগরের দরজার কাছে। রাস্তা তৈরির শ্রমিকদের তাবুতে হ্যারিকেনের আলো

জ্বলছে, তারা রান্নার আয়োজন করছে। অতীত আর বর্তমানের কত প্রভেদ।

এই সময়ে বহির্নগরের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বহির্নগরের দরজা থেকে অন্তর্নগরের দরজা পর্যন্ত উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে দ্বাররক্ষীরা পালা করে পাহারা দিচ্ছে, কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। এমন সময়ে কানের কাছে 'হেই আদমি' শব্দ বেজে উঠতেই কালকূটের অতীত বর্তমান এক হয়ে গেল। তাঁর মনে হল হাজার হাজার বছর আগের 'সমাজ' রাত্রে তিনি যেন কোনো এক বিদেশী বণিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, কোনো এক নটীর গৃহে মাধ্বী সেবনে আত্মহারা হয়ে গেছেন। কেউ যেন তাঁকে নগরের পথে পথে, অন্ধকার পথে যেখানে উৎসবের আলো জ্বলেনি, নগর পরিখার ধারে ধারে খুঁজে ফিরছে। কালকূট স্বল্পালোকে দেখতে পেলেন, সেই রক্তিম পাথরের শ্রীময়ী দীপ্তিময়ী নারীমূর্তি, একটা অমানুষিক রূপ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার সংক্ষিপ্ত বাস, পীন-বক্ষ, কালকূটের ভিতরের অন্ধকারকে চমকে দিচ্ছে।

কালকূটের চোখে চোখ রেখে বহু দূরের স্বরে বলেছিল "আমি গিরিয়াকের সোন্‌পাতিয়া।" *(পৃ: ৫৪১, ঐ)* রাজগৃহের কাছেই গিরিয়াক। "মলমাসের উৎসবে নগরে যারা নাচ-গানের আসর বসিয়ে দিত।" *(পৃ: ৫৪১, ঐ)* সম্পূর্ণ অবৈদিক অব্রাহ্মণ্য উৎসব, 'গিরগ্‌গ সমাজ' তার নাম। গিরিয়াকের সোন্‌পাতিয়া কালকূটের টাঙায় চেপে শহরে যেতে চায়; কালকূট তার মনে মনে স্পর্শ অনুভব করে। সঙ্গে নিতে চাইলেও নিতে পারেন না। টাঙাওয়ালা তাকে ভাগিয়ে দেয় মাথার ওপর চাবুক ঘুরিয়ে। কালকূটের মনে হল চাবুকটা যেন সোন্‌পাতিয়ার গালে পড়ল। পরদিন টাঙায় করে বেণুবন এসে অঞ্চলটা ঘুরে দেখলেন। বেণুবন বাঁশবনে ঘেরা বাগান। একালের বেণুবন দেখতে দেখতে মন চলে গেল সেকালের বেণুবনে। বুদ্ধের সামনে বিম্বিসার, সারিপুত্ত, অনাথপিণ্ডদ, মৌদ্‌গল্যায়ন, ক্ষেমা, থেরী বসে আছেন, বুদ্ধের বাণী উচ্চারিত হচ্ছে।

তারপরেই কালকূটের চোখে ভেসে উঠল অজাতশত্রুর মুখটি। তিনি দেখতে পেলেন, গভীর অনুশোচনা আর ব্যথায় তার কপালে সর্পিল রেখা ফুটে উঠেছে। তিনি পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করেছেন। নিজ পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে অজাতশত্রু আতঙ্কিত হচ্ছেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বৃজি, লিচ্ছবিদের তাঁর অধীনে আনতে পারছেন না। বুকের মধ্যেকার হাহাকার আর অপূর্ণতার বেদনা অজাতশত্রুকে অস্থির করে তুলেছে। শান্তি চান তিনি। একদিন মনের অনুশোচনায় পিতৃহন্তার বেদনাকে প্রশমিত করতে তিনি নিজের পাঁচশত হাতী নিয়ে চললেন বেণুবনে, "সমহিষী অজাতশত্রু তাঁর দর্শন প্রার্থী।" *(পৃ: ৫৪২, ঐ)* বুদ্ধকে হত্যা করতে চাওয়া সেই পিতৃহন্তা অজাতশত্রু "বুদ্ধের পায়ের কাছে নত হয়ে বসলেন। প্রণিপাত করে বললেন, যা জানি না, তাই জানান। যা পাইনি তাই দিন। মুক্তির উপায় দিন।" *(পৃ: ৫৪২, ঐ)*

কালকূট দেখছেন রাজা অজাতশত্রুর অন্তঃস্থলে জমে থাকা হাহাকার-বেদনা-অসহায়তাকে

কী অনায়াস ভঙ্গিতে ইতিহাস থেকে তুলে এনে এ'কালের দৃষ্টিতে তাঁর চরিত্রের মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর যন্ত্রণাবোধ, অস্থিরতাকে একটা মানবিক রূপ দিয়ে ইতিহাসকে সাহিত্য করে তুলেছেন। প্রতিটি ঘটনার পরবর্তী ঘটনাকে জানবার জন্য পাঠকমনকে আগ্রহী করে তুলেছেন, সমব্যথী করে তুলেছেন। এখন দেখা যাক, পরবর্তী পর্যায়ে কালকূট কী দেখছেন। বুদ্ধ অজাতশত্রুকে কাছে টেনে নিলেন। তাঁর চোখে বিম্বিসারের মুখখানি ভেসে উঠছে। তিনি বললেন "শান্তি বোধ করার চেষ্টা কর। একে আয়ত্ত করতে হয়। পুত্রকে অন্য কোথাও রাখো। বৃজি লিচ্ছবিদের ঐক্য যতদিন আছে, ততদিন ধ্বংস করা যাবে না। আত্মস্থ হও, স্থির চিন্তা কর।" *(পৃ: ৫৪২, ঐ)*

বুদ্ধর সহজ কথা, অথচ কী গভীরতাপূর্ণ। কালকূট দেখছেন বুদ্ধের সহজ কথায় অজাতশত্রুর দৃষ্টি খুলে গেল। বুদ্ধের শিষ্যত্ব নিয়ে ফিরে এসে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী কাজগুলো উদ্যমের সঙ্গে করে যেতে লাগলেন। ভেদবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে গণতান্ত্রিক নেতাদের মধ্যে বিবাদ বাধালেন। বুদ্ধের বাণীতে কালকূট নিজেও আপ্লুত। তাঁর কানে শুধু "বুদ্ধের উদাত্ত স্বরের বাণী ধ্বনিত হচ্ছে, আমি যেন তাই শুনতে পাচ্ছি।" *(পৃ: ৫৪২, ঐ)*কালকূট দেখে চলেছেন অতীতের সেই স্থানগুলি যা উজ্জ্বল ইতিহাস তৈরি করেছে। এবার কালকূট চললেন সপ্তপর্ণী গুহার দিকে— সিপ্পলি গুহা থেকে সপ্তপর্ণী পর্যন্ত অনেক ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। অজাতশত্রু বৌদ্ধ সংগীতের জন্য যে মণ্ডপ করে দিয়েছিলেন তারই ভগ্নাবশেষ ছড়িয়ে আছে। নিচের দিকে দূরে কর্ষিত ক্ষেত্র, রক্তিম আকাশ দেখতে দেখতে কালকূট যেন অতীতের সমবেত বৌদ্ধ সংগীত শুনতে পেলেন। পদ্মের গন্ধে ভরে উঠছে বাতাস।

এমন সময়ে গুহামুখের কাছে সেই 'সোন্‌পাতিয়া'। কৌতুকশূন্য চোখে সে তাকিয়ে আছে। খোলা চুল বুকের কাছে এসে পড়েছে, পীনবক্ষের সেই উত্তাল ঔদ্ধত্য আর নেই। তার গালের পাশে একটি সরু রক্তাভ দাগ, আঘাতের চিহ্ন। দেখে মনে হচ্ছে এক বৌদ্ধ শ্রমণী। সে তাঁকে (কালকূটকে) গুহার মধ্যে যাবার জন্য ডাকল। মুহূর্তের মধ্যে কালকূটের স্নায়ুসমূহ অবশ হয়ে আসতে লাগল এবং 'এস' বলে হাত বাড়িয়ে কালকূটকে গুহার দিকে নিয়ে চলল। এ অবস্থায় কালকূটের অনুভব এমনতর— "মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত চেতনা যেন লুপ্ত হয়ে গেল। আমি দেখলাম, গুহার মধ্যে আলো। প্রদীপের কর্পূরতেলের গন্ধ মিলেছে, পদ্মগন্ধের সঙ্গে। সঙ্গীত বাজছে আমার কানে। আমার সামনে এক শ্রমণী, তার চোখে গভীর এক ব্যথার ছায়া, অথচ স্নিগ্ধ কিরণ উপচে পড়ছে যেন। সে আমাকে আকর্ষণ করল। আমি তার সঙ্গে গুহার মধ্যে পা বাড়ালাম। সেই মুহূর্তেই একটা চিৎকার শুনলাম, 'খবরদার, খবরদার।' " *(পৃ: ৫৪২, ঐ)*

বেচন দুজনের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে কালকূটকে গুহামুখ থেকে টেনে ধরেছে। কালকূটকে মহাকাল থেকে বর্তমানে এনেছে বেচন। মনভ্রমণে কালকূট যেখানে খুশি সেখানেই গিয়েছেন। কিন্তু

বাস্তবের যাত্রাপথে বারে বারেই বাধা পড়েছে। ইতিহাস এবং তার আগের ইতিহাসে অনেক সময় যেতে পারেন নি। কালের ধুলো সরিয়ে সবকিছু দেখতে পারেননি, পথ খুঁজে পাননি। বাস্তব ভ্রমণেও তিনি মহাকালের ধ্বংসস্তূপের চিহ্ন খুঁজতে খুঁজতে মহাকাল বা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সপ্তপর্ণী গুহামুখ ধরে। সেখান থেকে বেচন তাঁকে বাস্তবে ফিরিয়ে এনেছে। তাঁরা আবার চলেছেন 'সোনভাণ্ডারের' দিকে। সেখান থেকে রণভূমি। জরাসন্ধকে এই রণভূমিতেই ভীম হত্যা করেছিলেন। কুস্তিগীরেরা এখানকার মাটি নিয়ে যায় তাদের আখড়ার মাটির সঙ্গে মেশানোর জন্য।

ফেরার পথে গেলেন মনিয়ার মঠে। চারপাশে অজস্র ধ্বংসাবশেষ ছড়ানো। উপেক্ষিত এই মঠটি খনন করে, বৌদ্ধ জৈন শৈব দেবালয় ছাড়াও, নাগনাগিনীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। কালকূট জেনেছেন "মহাভারতে আছে রাজগৃহে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মণিনাগ। যক্ষ-যক্ষিণীর পূজাও হত।" *(পৃ: ৫৪৩, ঐ)* এই মঠ দেখতে বিশেষ কেউ আসে না। কিন্তু কালকূটকে এই অবহেলিত মঠটিই টেনেছে। অনেকটা গোলাকার ইঁটের গাঁথুনি তোলা বিচিত্র গঠনের একটি মন্দির। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হয়। ভেতরে যাওয়া যায় না, পথ রুদ্ধ। কালকূট খুঁজে বেড়াচ্ছেন ধ্বংসাবশেষ। "কোথায় ছিলেন মণিনাগ? তাঁর বিগ্রহ কোথায় স্থাপিত ছিল? বন্ধ কেন?" *(পৃ: ৫৪৩, ঐ)* এরকম নানা প্রশ্ন তাঁর মনে উঁকি মারতে লাগল। তিনি আবার শুনতে পেলেন ঘণ্টাধ্বনি। মন্দিরে দেখতে পেলেন, সোনার প্রদীপে আলো জ্বলছে, আর রাজগৃহের বধূরা পূজার নানা উপাচার নিয়ে এসেছে। কলসী থেকে দুধ ঢেলে মন্দিরের সিঁড়ি ধুয়ে দিচ্ছে ও গুণ গুণ স্বরে গান করছে তারা। এমন সময়ে 'পরদেশী' ডাকটা শুনে কালকূট চমকে উঠলেন। দেখলেন সোন্‌পাতিয়া আবার সেই কৌতুকের দৃষ্টি নিয়ে বন্ধ গবাক্ষের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। রক্তিম পাথরের পীনবক্ষ প্রায় সম্পূর্ণ খোলা রেখে, কালকূটের বুকের মধ্যে থর থর কাঁপন ধরিয়ে বাতাস লাগা স্বরে আহ্বান করছে।

"পরদেশী, মণিনাগ দেখবে?" *(পৃ: ৫৪৩, ঐ)* কোথায় আছে তা কালকূট জানতে চাইলে সে নিচের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল, তারপরে সে কালকূটের পাশে দাঁড়িয়ে বুকের কাছ ঘেঁষে তাঁর হাত ধরে নিচের দিকের সিঁড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে চলল। কালকূট যেন হাজার হাজার বছর ওপারে চলে গেলেন, বাদ্যসঙ্গীত ফুলের গন্ধ মন্ত্রোচ্চারণ সব তিনি শুনতে লাগলেন। সোন্‌পাতিয়া তাঁকে টেনে নিচের অন্ধ কুঠুরির প্রবেশের মুখে নিয়ে এল। কালকূট অনুভব করলেন—

"তার হাতের বাঁধন শক্ত হল। তার নিঃশ্বাস আমার গায়ে মুখে লাগছে। শরীরের স্পর্শ আর উত্তাপ অনুভব করছি।

সোন্‌পাতিয়া নিচু হয়ে ঢুকতে গেল। আমাকে তার সঙ্গে আকর্ষণ করল। ভিতরের কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। নিবিড় অন্ধকার।

সেই মুহূর্তেই পিছনে চিৎকার শুনলাম, 'বাবুজী, বাবুজী মত যানা।'

সোন্‌পাতিয়া আমাকে আরও জোরে টানল, আর তখুনি পিছনে অন্য হাতের কঠিন স্পর্শ আমাকে টেনে ধরল।" *(পৃ: ৫৪৩, ঐ)*

অতীত আর বাস্তবের টানাটানিতে কালকূটকে বাস্তবেই ফিরে আসতে হল। তিনি বুঝলেন সোন্‌পাতিয়া তাঁর হাত ছেড়ে দিল। টাঙাওয়ালা তাঁকে বাইরে টেনে নিয়ে এল। তিনি ডাকলেন সোন্‌পাতিয়াকে, কিন্তু দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলেন না, সোন্‌পাতিয়াকেও দেখতে পেলেন না। চিরকালের মত সে কালকূটের কাছ থেকে মণিনাগের গহ্বরে হারিয়ে গেল। টাঙাওয়ালা তাকে দেখতে পায়নি। কালকূটের কথা শুনে টাঙাওয়ালা অবাক হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল। কালকূটের মনে হল সে তার কথা বিশ্বাস করছে না। টাঙাওয়ালা কাউকেই দেখতে পায়নি। কিন্তু সোন্‌পাতিয়া যে তাঁরই হাত ধরে মণিনাগের গহ্বরে হারিয়ে গেল। কালকূট নিজেই অসহায়; এতক্ষণ যার নির্দেশে মণিনাগ দেখতে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে গহ্বরে ঢুকছিল সেই সোন্‌পাতিয়ার কোন অস্তিত্ব নেই — একে কি বিশ্বাস করতে হবে। তাই বিস্ময়ে বলেছেন "এই আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে, এমন অসহায়ভাবে একথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? আমি আবার অন্ধকার গহ্বরের দিকে তাকালাম।" *(পৃ: ৫৪৩, ঐ)*

একটা অদ্ভুত ঘোরলাগা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কালকূট তাঁর 'বাণীধ্বনি বেণুবনে'র কাহিনিকে শেষ করেছেন। দুটো বৃত্তে তিনি তাঁর কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। প্রথম বৃত্তটি হল 'রামবিবাহের বরযাত্রী' হয়ে নেপালরাজের অধীন জনকপুরে যাওয়া, সেখানে যেতে যেতে স্টেশনমাস্টার, বিভিন্ন ধরনের বরযাত্রী, নেপাল দুহিতা ধীরুমায়া, তার মা-বাবা এবং নেপালের প্রকৃতি এসব নিয়ে। আর দ্বিতীয় বৃত্তটি হল রাজগীর বা রাজগৃহ ভ্রমণ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দুটো কাহিনি দু'রকম। কিন্তু গভীর ভাবে দেখলে বোঝা যায় প্রথম কাহিনিটি দ্বিতীয় কাহিনির পরিপূরক। আড়াই হাজার বছর পূর্বে নেপাল তরাইয়ের কপিলাবস্তুতেই ছিল শাক্যমুণি গৌতমের প্রাসাদ। তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করেই তিনি গিরিব্রজ-রাজগৃহে কখনো মনভ্রমণে, কখনো বাস্তব ভ্রমণে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ব্যক্তিমানস, সমাজজীবন, রাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি, ঈর্ষা ইত্যাদি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন কখনো অতীতের মনভ্রমণে, কখনো বর্তমানের বাস্তব ভ্রমণে। ইতিহাসের পথ ধরে ইতিহাস থেকে চরিত্রগুলো তুলে এনে এ'কালের দৃষ্টিতে সেকালের চরিত্রগুলোর একটা মানবিক রূপ দান করেছেন। সামাজিক পট-পরিবেশ সব কিছু তুলে এনে সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে একে বাস্তব রূপ দিয়ে উপন্যাসের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর ভ্রমণ শুধু ভ্রমণ কাহিনীতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি; অতীত ও বাস্তবে তাঁর অনায়াস পদচারণা। অতীতের সঙ্গে বাস্তবকে মেলাতে তিনি সোন্‌পাতিয়াকে এনেছেন, হাজার হাজার বছর আগের কোনো মন্দির গাত্র থেকে সে যেন বারে বারে বিভিন্ন রূপে কালকূটকে দেখেছে। মহাকালের পথে যে সকল চিহ্ন, কাহিনি হারিয়ে গেছে তা দেখাতে, চিনে

নিতেই সোন্‌পাতিয়ার নানাস্থানে আগমন। কালকূট অতীত জানতে আগ্রহী, তাই সোন্‌পাতিয়া তাঁকে বারে বারে মহাকালের পথে নিতে যেতে চাইছে, নিয়ে যেতে চাইছে নিবিড় অন্ধকারের অতল গহ্বরে যেখান থেকে আর ফেরা যায় না; কিন্তু তাঁর বাস্তববোধ কখনো বেচন, কখনো টাঙাওয়ালা রূপে মহাকালের গহ্বর থেকে ফিরিয়ে এনেছে। ইতিহাসকে বর্তমানের দৃষ্টিতে তুলে ধরতে, সাহিত্যের প্রয়োজনে কালকূট সোন্‌পাতিয়াকে এনেছেন। 'বাণীধ্বনি বেণুবনে' ভ্রমণকাহিনি থেকে ধীরে ধীরে উপন্যাসের পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

এবার আর এক ভ্রমণের পথে চলা যাক্। কালকূট আবার চলেছেন মনভ্রমণে আর এক দর্শনে 'বাসুদেব অঙ্গনে'। কিন্তু বাসুদেব অঙ্গনে কেন? তিনি কি বৃষ্ণি গোষ্ঠীর নেতা বার্ষ্ণেয় সেই বাসুদেবের সান্নিধ্যে যাচ্ছেন কি? "দ্বারাবতী আমার যাত্রা বটে। বাসুদেবেরই সান্নিধ্যে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে যাত্রা, সেই উদ্দেশ্যের তিনি একটি পার্শ্বচরিত্র মাত্র।" *(কালকূট রচনা সমগ্র শাম্ব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮৩)* কিন্তু বাসুদেব প্রতিষ্ঠিত দ্বারাবতী তিনি যাবেন কেমন করে? "শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত দ্বারকার, দ্বারকার কুশস্থলী সুদৃঢ় পুরী? সেই রমণীয় রৈবতক পর্বত, কাননাদি ও সুমিষ্ট মনোহর জলাশয়, কোথায় ছিল সে সব?" *(পৃ. ৯৮৬, ঐ)* পথঘাটের নিশানা জানা নেই। "পথ চিনে যাওয়ার হাজার হাজার বছরের কাঁটা। কাঁটা না কালের স্তর। অথচ ঠিক ঠিক পথে যাচ্ছি কি না, সে সংশয়ে হোঁচট খাচ্ছি বারে বারে। কিন্তু সংশয় না ঘুচিয়ে উপায় নেই। দিক্‌নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে অতএব পথ বন্ধন করো। যার নাম যুক্তিতে হদিস।" *(পৃ. ৯৭৮)* কালকূট বলেছেন যে পথের হদিস বার করতে হবে স্বয়ম্ভুর মনুকাল থেকে। কারণ 'পুরাণের আদিবিন্দু আছে। তাকে বলে মানবকল্পের আদিবিন্দু। স্বয়ম্ভুর মনুকাল, পাঁচ হাজার নশো আটান্ন খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এই আদিবিন্দুর অতীতে আর কিছু নেই। থাকলেও তা ইতিবৃত্তে আসেনি।' পুরাণকাররা যুগমানের দ্বারা কাল নির্ণয় করেছেন। সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত পুরানের কাছে এই পাঁচ বিষয় ইতিহাসের মূল উপাদান। হিস্টরি সংস্কৃত অর্থ ইতিবৃত্ত। ইতিহাস শব্দের অর্থ সংস্কৃতে আর বাঙলায় ভিন্ন। ইত অর্থে যা গত হয়েছে, বৃত্ত, এই অর্থে বর্ণনা অর্থাৎ ইতবৃত্ত। লেখক কালকূট তাই বলেছেন 'পুরানের ইতিবৃত্তের পথই আমাকে খুঁজে নিয়ে যেতে হবে।' কাল গণনার জন্যই যুগকাল আর মনুকাল পুরাণকারেরা ধরে নিয়েছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে দ্বারাবতী বা দ্বারকা যাওয়া বিস্তর ঝকমারি। তবু এত ঝকমারি সত্ত্বেও কালকূট কেন যাচ্ছেন বাসুদেব অঙ্গনে? তিনি চলেছেন তাঁর মনের মতো নায়কের সন্ধানে। যিনি নিজে নিপীড়িত, নির্যাতিত কিন্তু চরম দুঃখের সময়েও বিশ্বাস হারান না। এক সংগ্রামী ও সংবেদনশীল মন নিয়ে যিনি নিরন্তর উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করেন ও নিজের অটুট বিশ্বাসকে একদল বিশ্বাসহীন, উদ্যমহীন হতাশাগ্রস্ত মানুষের মধ্যে জাগ্রত করে এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে

মুক্তির পথে অগ্রসর হন, সেই সংগ্রামী চেতনাসম্পন্ন সংবেদনশীল মানবদরদীই কালকূটের মনের মতো নায়ক। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে কালকূট তাঁর মনের মতো নায়ক খুঁজে বেড়িয়েছেন, কিন্তু ঠিক যেমনটি চেয়েছেন তেমনটি পাননি। তাই তিনি জাতীয় ইতিবৃত্তের পথ ধরে মনভ্রমণে বেরিয়ে উপস্থিত হয়েছেন বাসুদেব অঙ্গনে, দ্বারকায়। কিন্তু ঠিক বাসুদেব সান্নিধ্যে নয়। ''আমি শাম্ব দর্শনেই বেশি ব্যাকুল। পিতাপুত্রকে একসঙ্গে দেখতে চাই। বেশি চাই, অপরূপশক্তি এবং বীর শাম্বকেই। কৃষ্ণ ছাড়া নাম নেই, কিন্তু শাম্ব আমাকে আকর্ষণ করেছেন বেশি।'' পিতাপুত্রকে একসঙ্গে দেখতে চাইলেও আসল উদ্দেশ্য 'শাম্ব দর্শন'। কৃষ্ণ-পুত্র 'শাম্ব' নারদের রোষের কারণে পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে কঠোর তপস্যার দ্বারা রোগমুক্ত হয়েছিলেন। তিনি শুধু নিজেই রোগমুক্ত হন নি, রোগগ্রস্ত মানুষদের রোগমুক্তির পথের সন্ধান দিয়েছিলেন অর্থাৎ সুচিকিৎসা'র ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ঘটনাই কালকূটকে শাম্বর প্রতি আকৃষ্ট করিয়েছে। মনের মতো নায়কের গুণাবলী তিনি 'শাম্বের' মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন। তাই অতীতের মনভ্রমণে বেরিয়ে দ্বাপরের সন্ধ্যাকালে দ্বারকায় পৌঁছে কালকূটীয় সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পিতা পুত্রের মনের গহীনে ডুব দিয়ে তাঁদের মানসিক অবস্থাকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। বুঝতে চেষ্টা করেছেন জটিল নারদ চরিত্র ও মনকে। এঁদের ঘিরে মানুষের মনের খবর নিতে নিতে ও চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীকে একালের দৃষ্টিতে সৌরসাধনার মধ্য দিয়ে রোগমুক্তি ঘটবে — মনের এই অটুট বিশ্বাস ও 'সংগ্রামী চেতনা'র মধ্য দিয়ে শাম্বর কালের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি তে দেখেছেন। তাই জাতীয় ইতিবৃত্ত থেকে 'শাম্ব'কে, নিজের মনের মতো নায়ককে, মনের তুলিতে রূপ দিয়ে নূতন রূপে বাংলা সাহিত্যে নিয়ে এলেন 'উত্তরণের প্রতীক' হিসাবে।

১৩৮৪ বঙ্গাব্দে (১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে) সালে শারদীয় দেশ পত্রিকায় উত্তরণের প্রতীক হিসাবে **'শাম্ব'** কে আলোকিত করলেন। ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে (১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে) ১লা বৈশাখ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে। ১৩৮৭ বঙ্গাব্দে (১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে) 'শাম্ব' উপন্যাসের জন্য কালকূট 'আকাদেমী পুরস্কার'-এ পুরস্কৃত হন। গ্রন্থের ভূমিকায় কালকূট লিখেছিলেন—

''শাম্ব কাহিনী, বিশেষতঃ তাঁর পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হওয়া, শাপমোচন ও মুক্তি, বহুবিধ ঘটনা তত্ত্ব তথ্যের জালে আবৃত। আমি তার অনেক বিষয়ই বাহুল্যবোধে ত্যাগ করেছি। কেবল তাঁর প্রতি পিতার অভিশাপের কারণ, এবং শাপমোচন বিষয়কেই আমি যথাসম্ভব সহজভাবে বলতে চেয়েছি। কৃষ্ণ যেমন আমার কাছে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহামানব, তেমনি শাম্বকেও আমি প্রাচীনতম কালের একজন আশ্চর্য প্রভাবশালী ত্যাগী, ''বিশ্বাসী'' উজ্জ্বলতম ব্যক্তিরূপে দেখেছি।

'ইতিহাসে অনেক সময়েই, পরবর্তীকালে অনেক ঘটনা স্থূলহস্তাবলেপ প্রক্ষিপ্তভাবে প্রবেশ করে। যেমন শাম্বর সৌর উপাসনার মধ্যে অনেকে ''তন্ত্র''-এর সন্ধান পেয়েছেন বা প্রমাণ করার

চেষ্টা করেছেন। আমি তা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি নি। মুষল-প্রসব বা পর্ব এবং যদুবংশের ধ্বংসের সঙ্গে তার যোগাযোগ কতখানি যুক্তিযুক্ত, আমি সে-বিষয়ও এই কাহিনীতে উপস্থিত করা প্রয়োজনবোধ করিনি। আমি একটি ব্যক্তির কথাই বলতে চেয়েছি, যিনি অতি দুঃসময়েও বিশ্বাস হারান না, যিনি দৈহিক ও মানসিক কষ্টের ভিতর দিয়েও, নিরন্তর উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করেন। শাম্ব আমার কাছে এক সংগ্রামী ব্যক্তি। বিশ্বাস এখানে আমার বক্তব্য বিষয়, এবং বিপন্ন ব্যক্তির উত্তরণকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখাতে চেয়েছি, দেখতে চেয়েছি কালের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। কালকূট, ১লা বৈশাখ ১৩৮৫। এই গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে লেখা হয়েছিল, শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় শ্রীচরণেষু সংস্কৃত মহাসিন্ধুর অকূলে বসে এই সামান্য বিন্দুকে সাহিত্যে উপস্থিত করা আমার পক্ষে অতি দুঃসাহসের কাজ হয়েছে। আপনার মত সংস্কৃত সিন্ধু বিশারদ থাকতে এই কাজ আমার মনকে প্রতিমুহূর্তে সঙ্কুচিত করছে। তথাপি আমার এই সামান্য রচনা আপনার পাদস্পর্শে ধন্য হোক— এই প্রার্থনা।

কৃষ্ণ-পুত্র 'শাম্ব'কে নূতন রূপে বাংলা সাহিত্যে নিয়ে আসার বীজটি তাঁর মনের মধ্যে বোনা হয়েছিল ১৪/১৫ বছর আগে কোণারকের সূর্যমন্দিরে গিয়ে। 'নির্জন সৈকত' গ্রন্থে ১৩৬২ বঙ্গাব্দে (১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে) কালকূট লিখেছেন— "...দূর থেকে যে মুহূর্তে কোণারক চোখে পড়ল, প্রথমেই একটা আইডিয়া মনের মধ্যে ভেসে উঠল ব্ল্যাক প্যাগোডা। দূর থেকে কালো রঙের এক স্তব্ধ বিশাল কালো প্রস্তর স্তূপের মতো সূর্যমন্দিরকে দেখতে পেলাম। মনের মধ্যে ভেসে উঠল, সেই পৌরাণিক কাহিনী; কৃষ্ণের ঔরসে জাম্ভবতীর গর্ভজাত পুত্র, সুপুরুষ শাম্বের সঙ্গে কোনো কারণে দেবর্ষি নারদের বিবাদ হয়। দেবর্ষি নারদ তাঁর কৌশল অনুযায়ী শাম্বর ওপর প্রতিশোধ নেন। তিনি একদিন শাম্বকে নানান কথায় তুষ্ট করে ভুলিয়ে এমন জায়গায় নিয়ে যান, যেখানে কৃষ্ণের ষোলশ গোপিনী স্নানবিলাসে রত ছিলেন। শাম্বকে সেখানে পৌঁছে দিয়েই, নারদ অবিলম্বে কৃষ্ণকে খবর দেন। এদিকে গোপিনীরা শাম্বের রূপে মুগ্ধ হয়ে, সকলেই তাকে কামনা করতে থাকেন। এই সময়ে কৃষ্ণ উপস্থিত হন এবং শাম্বকে দেখেই ক্রোধে ভয়ংকর হয়ে অভিশাপ দিলেন, 'তোমার রূপ ও যৌবন, সমস্তই কুষ্ঠ রোগে বিনাশ হবে।' শাম্ব সেই মুহূর্তেই আক্রান্ত হলেন। তিনি পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন। শাম্বর কাছে সব শুনে কৃষ্ণর বোধোদয় হল। কিন্তু একবার অভিশাপ দিয়ে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। বললেন, 'অভিশাপ আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।' তুমি মৈত্রেয় অরণ্য সংস্কার করে, সেখানে গিয়ে বারো বৎসর সূর্যদেবের আরাধনা কর। তিনিই তোমাকে আরোগ্য করবেন।' শাম্ব তাই করলেন। বার বৎসর কঠিন তপস্যার পর সূর্যদেব তুষ্ট হয়ে দেখা দিলেন। শাম্বের সর্বাঙ্গ তখন গলিত মথিত। সূর্যদেব তাঁকে চন্দ্রভাগা নদীতে ডুব দিয়ে আসতে বললেন। চন্দ্রভাগাতে স্নানের পর শাম্ব আবার তাঁর পূর্ব রূপ ও যৌবন ফিরে পান।

পরদিন আবার স্নানের সময়, চন্দ্রভাগাতে স্বচ্ছ জলে তিনি একটি সূর্যমূর্তি আবিষ্কার করেন। সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তিনি একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

সূর্য মন্দিরের সঙ্গে পুরাণের এই কাহিনী জড়িত। কিন্তু পুরাণকে বাস্তবে খুঁজে আমরা পাইনে। মানুষের বিশ্বাসকেই পাই। ইতিহাস তারই সাক্ষী দেয়। ইতিহাস বলে, খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতবর্ষে প্রথম সূর্য উপাসনার শুরু। উত্তরাঞ্চল থেকে একদা ভারতের নানান অঞ্চলে সূর্য পূজা ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিকদের ধারণা বৈষ্ণব ধর্মের উত্থান থেকেই সূর্য পূজার প্রচার কমে আসে। তবু জানি, এখনো বাংলা দেশে মাঘী সপ্তমীতে মেয়েরা সাতটি পাতা মাথায় নিয়ে অবগাহন স্নান করেন। সাতটি পাতা সাতটি অর্কের প্রতীক। সূর্যের সপ্তরশ্মির সপ্ত অর্ক।

পুরাণ থাক, ইতিহাস থাক, সূর্য পূজার মাধ্যমে তো আমরা পবিত্র হতেই চেয়েছি। আমরা কেউ শাম্ব নই, আমরা কৃষ্ণের অভিশপ্ত সন্তান নই। কিন্তু ইহকালের যে ক্ষণিক জীবন নিয়ে আমাদের সংসার যাত্রা, সেখানে ব্যাধি আমাদের প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী, মানুষ তার ক্ষণিক জীবন নিয়ে তাই সূর্যের পবিত্র কিরণকে প্রার্থনা করেছে।" *(পৃ: ২০২, নির্জন সৈকতে, কালকূট রচনা সমগ্র, ১ম খণ্ড)* এই লেখার মধ্য দিয়ে কালকূটের দুটো ভাবনা স্পষ্ট হয়েছে। পুরাণকে বাস্তবে কালকূট খুঁজে পাননি, কিন্তু মানুষের 'বিশ্বাস' কে খুঁজে পেয়েছেন। সূর্য পূজার মাধ্যমে পবিত্র হওয়া যায়, ব্যাধি মুক্তির জন্য সূর্যের পবিত্র কিরণ মানব জীবনে অপরিহার্য। এই ধারণার বীজটিই ক্রমে ক্রমে কালকূটের নিরাসক্ত বাউল মনে ডালপালা বিস্তার করে শাম্বানুসন্ধানে পৌরাণিক পথে চলতে প্রেরণা যুগিয়েছে।

কুষ্ঠ রোগ কালকূটের মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। কেননা, যে সময়ে কালকূট শাম্বানুসন্ধানে যাত্রা করেন সেই সময়েই কালকূটের আর এক সত্তা 'সমরেশ বসু' 'মহাকালের রথের ঘোড়া'র সওয়ারী। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সমরেশ বসু লিখেছিলেন 'মহাকালের রথের ঘোড়া' ও ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'গন্তব্য'। সেই সময়ে কুষ্ঠ রোগ নির্মূল করার জন্য দেশব্যাপী প্রচার অভিযান চালানো হয়েছিল। কুষ্ঠ অভিশাপ নয়, সময়মতো চিকিৎসা করলে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া যায়। এই সচেতনাবোধ জনমানসে জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল। 'কুষ্ঠ' সম্বন্ধে কৌতূহল কালকূটরূপী সমরেশ বসু তথা সুরথের সেই কৈশোরকালেই জন্মেছিল। কৈশোরের বন্ধু 'সেন্টু' কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছিল, একথা পূর্ববর্তী অধ্যায় 'কালকূটের ব্যক্তিসত্তার পরিচয়-এ' জানানো হয়েছে। সুরথনাথ ওরফে সমরেশ বসু সেন্টুর দৈহিক পরিবর্তনগুলো খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অনুভব করেছিলেন 'ওর' ব্যথা-বেদনা ও নিঃসঙ্গতাকে। এই 'সেন্টু'ই 'কালকূট' তথা 'সমরেশ বসু' কে প্রভাবিত করেছিল। 'সুরথনাথে'র দুই সত্তা 'সমরেশ' ও 'কালকূট' তাই হয়ত দুইভাবে স্মৃতি তর্পণ করেছেন 'সেন্টু'কে। এখন 'দেশ' পত্রিকার 'সমরেশ

বসু স্মরণে' (১৪ই মে, ১৯৮৮) সংখ্যায় আনন্দ বাগচীর স্মৃতি তর্পণে ''সমরেশঃ আদরা বনাম খসড়া''য় একটু চোখ বোলানো যাক— ''আর সুরথ সেই কৈশোরেই খুঁজে পেয়েছিল কুৎসিত ভয়ঙ্করের তলায় সুন্দরকে। এই দেখার সূত্রপাত হয়েছিল সেই বয়সের একটি ঘটনা থেকে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের একটি ছাত্র সুরথদের বাড়ির সামনে দিয়ে রোজ যাতায়াত করত। সুন্দর ঝকঝকে চেহারা, নাম সেন্টু। সুরথের দিকে সে ফিরেও তাকাতো না, কথা বলা তো দূরের কথা। সেই ছেলেটির যখন কুষ্ঠ হল, বাড়ির একতলার ঘরে সে নির্বাসিতের মত দিন কাটাত। সংক্রামক রোগের ভয়ে তার বন্ধু বান্ধব কেউ তার কাছে যেত না। ছেলেটির চেহারা তখন বিকৃত আর বীভৎস হয়ে উঠেছে, আঙুলের গাঁটগুলো খসে পড়তে শুরু করেছে। সুরথের মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল খবরটা শুনে। সে লুকিয়ে লুকিয়ে চলে যেত ছেলেটার ঘরে। তার কাছে বসে বসে গল্প করত। সেন্টু অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাঁচেনি। কিন্তু সুরথের মনের মধ্যে সে চিরকাল বেঁচেই ছিল। অন্তত 'শাম্ব' রচনার কাল পর্যন্ত নিশ্চয়ই। ভয়ডরহীন এই দুঃসাহস, নির্বিকার ভালবাসা, ঘৃণাহীন আসক্তি সুরথকে সমরেশ করে তুলেছে।'' *(৪৪/১ দেশ পত্রিকা, সমরেশ বসু স্মরণে, ১৪ই মে, ১৯৮৮)*

তাহলে দেখা যাচ্ছে 'সেন্টু'ই 'মহাকালের রথের ঘোড়া' ও 'শাম্ব' রচনায় প্রভাবিত করেছে সমরেশ বসু ও কালকূটকে। বাস্তববাদী প্রতিবাদী লেখক সমরেশ বসু 'কুষ্ঠ'— কে দেখছেন নিঃসঙ্গতার প্রতীক হিসাবে। 'মহাকালের রথের ঘোড়ার' নায়ক কমরেড রুহিতন কুরমির কুষ্ঠ হয়েছিল। অতি বিপ্লবীদের নীতিহীন কার্যকলাপ, রাজনৈতিক মত-পার্থক্যের কারণে খুনোখুনি, নীচতা এইসব কমরেড রুহিতন কুরমি জেল থেকে বেরিয়ে মেনে নিতে পারে নি। তীব্র স্বাতন্ত্রবোধ ও কুষ্ঠরোগের কারণে কুরমি 'কৃষক আন্দোলন' থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। অপমানিত, অবহেলিত হয়ে কুরমি বাস্তবের মাটিতে ফিরে এসেছিল। সমরেশ বসুর দৃষ্টিতে 'কুষ্ঠ' রোগ শুধু কুরমির দেহেই বাসা বাঁধে নি। বাসা বেঁধেছে সমাজ মানসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে; বিশ্বাসহীনতা, নীতিহীনতা, নিষ্ঠুরতা, শঠতায় সমাজ মানসে পচন ধরেছে। হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও সহমর্মিতা ফিরিয়ে আনতে সময় লাগবে, তাই কমরেড কুরমির আন্দোলন সার্থকতার পথ খুঁজে পায় নি। বন্দুকের নলের সামনে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ার আগে আন্দোলনকে সফল করার স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্ন দেখেছিল মানুষের হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে ফিরিয়ে এনে, সমাজের নিপীড়িত, অবহেলিত মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। নিঃসঙ্গ কুরমির একক সংগ্রামে রথের চাকা বসে গিয়েছিল। মহাভারতের কর্ণ-এর মতো কমরেড কুরমি ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু শাম্বর একক সংগ্রাম-এর রথ বিজয় পতাকা উড়িয়েছিল। একদল সমাজচ্যুত, নিপীড়িত, অবহেলিত, আশাহত মৃতপ্রায় মানুষের মনে 'বাঁচার ইচ্ছে'কে জাগরিত করে ও তাদের

ঐক্যবদ্ধ করে আশ্চর্য এক অভিযানের পথে চালিত করেছিলেন। কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে 'অভিশাপমুক্ত' অর্থাৎ 'কুষ্ঠ'-র মতো কালব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়া যাবে এই বোধ ও বিশ্বাস সকলের মনের মধ্যে উজ্জীবিত করে 'রোগমুক্তির' পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। নিজেকে ও সংগ্রামী সাথীদের 'রোগমুক্ত' করে ও 'রোগমুক্তি'র প্রতিকারের ব্যবস্থা করে সেই আশ্চর্য অভিযানের সার্থক উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন। কালকূট পুরাণ-মহাভারতের 'শাম্ব' চরিত্রকে এ'কালের দৃষ্টি ও মানসিকতায় মানবিক রূপ দিয়ে বাংলা সাহিত্যে নিয়ে এসেছিলেন। বঞ্চিত, আশাহত, অবহেলিত মানুষের 'বিশ্বাস' ও 'আশ্রয়' স্থল হল 'শাম্ব'। একক সংগ্রামী নায়ক শাম্বর রোগমুক্তির অভিযান এ'কালের কুষ্ঠরোগমুক্ত অভিযানের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কালকূট সৃষ্ট 'শাম্ব' প্রশংসিত হয়েছিল। ১৯৮০ তে 'শাম্ব'র জন্য কালকূট 'আকাদেমি পুরস্কার'-এ পুরস্কৃত হয়েছিলেন। 'সেন্টু' কালকূট তথা সমরেশ বসুকে এই উত্তরণে সাহায্য করেছিল।

'সমরেশ বসু' ও 'কালকূট' এই দুই সত্তার এই দুটি রচনার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র লক্ষ করা যাচ্ছে। সমরেশ বসুর প্রসঙ্গ এখন থাক, আমরা 'কালকূট'কে অনুসরণ করি। যে পথে মনভ্রমণে কালকূট 'বাসুদেব অঙ্গনে' যাত্রা করেছেন আমরা সেই যাত্রাকালেরই অনুসারী হলাম। কালকূট চলেছেন দ্বারাবতীর পথে। কিন্তু কতকাল আগের পথ দিয়ে দ্বারকা যেতে চাইছেন সেটাই দেখতে হবে। ১৯৭৭ সাল থেকে ঠিক কত বছর আগের দ্বারকা? আধুনিক ইতিহাসের কলি গণনার বিচারের সঙ্গে পৌরাণিক মত মিলছে না। রীতিমতো ধাঁধায় পড়ে গেছেন। সাহেবরা বলে গেছেন পুরাণ মানে মাইথোলজি, ইতিহাস নয়। কালকূট তাই কাঁধের ঝোলা নামিয়ে মনভ্রমণে ইতিহাসের প্রমাণ খুঁজতে দ্বারাবতীতে, কৃষ্ণ অন্বেষণে। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো এইজন্য যে, সময়ের যে হিসাব তিনি দিয়েছেন সেটা ১৯৭৭ সাল থেকে অর্থাৎ 'শাম্ব' রচনার কাল থেকে। আমরাও সময়ের হিসাবটা ওই ১৯৭৭ সাল থেকেই করব। ফিরে যাই 'কালকূট'-এর সময়ের হিসাবে। কালকূট কীটদষ্ট পুঁথির পাতার ধুলো সরিয়ে দেখেছেন, কৃষ্ণের জন্মকালকে। ''তাঁর জন্মকালের হিসেবে সময়টা এক হাজার চারশো আটান্ন খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এই হিসাবটা আধুনিক ঐতিহাসিক কাল গণনা। পুরাণের অষ্টাবিংশ যুগ, কলির সন্ধ্যা। কেউ বলেছেন দ্বাপরান্তর। যীশু খ্রীষ্টের মতো যদি কৃষ্ণ জন্মাব্দ বা কৃষ্ণাব্দ গণনা হতো, তা হলে এই যীশু জন্মের ঊনিশশো সাতাত্তর সালকে বলা যেতো তিন হাজার চারশো পঁয়ত্রিশ সাল।'' *(পৃ: ৯৭৭, ঐ)* অর্থাৎ (১৪৫৮ + ১৯৭৭) = ৩৪৩৫ সাল। কালকূট কাল নির্ণয়ে সজাগ।

''ইতিহাস প্রমাণ চায়। তাই প্রমাণ দিই। কাঁধ থেকে ঝোলাটা রেখে, এবার মন চল যাই দ্বারাবতী। সেখানে কে আছেন? বাসুদেব। যাদব শ্রেষ্ঠ, তিনি কেবল নরপতি নন, কালান্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।'' *(পৃ: ৯৭৭, ঐ)* বিশেষ কাল নির্দেশে আরো অতীতে যাত্রা করেছেন। বিতর্ক

এড়িয়ে স্বর্গত আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিক মহাজন এবং আরও অনেক বিদগ্ধজনের রচনার পথ ধরে চলেছেন। তিনি বলেছিলেন, ''দেখছি, শ্রীরাম ছিলেন দুই হাজার একশো চব্বিশ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে; তাহলে রামাব্দ ধরতে হয় চার হাজার একশো এক সাল। আর রামাব্দ থেকে কৃষ্ণ ছিলেন ছেষট্টি বছরের ছোট।'' *(পৃ: ৯৭৭, ঐ)* অর্থাৎ (২১২৪-১৪৫৮) ৬৬৬, এই হিসাবে হয়।

কিন্তু যাত্রার আগে কালকূটের বাউল মনে গুনগুনিয়ে উঠেছে 'বাগানে পাঁচজনা মালী/যে যাঁর ঠাঁইয়ে বস্যে আছেন পাঁচ মাথার মোড় আগুলি।' *(পৃ: ৯৭৭, ঐ)* এই পাঁচজন মালীর কথায় ধন্ধ আছে বটে, কিন্তু দ্বন্দ্ব নাই এই পাঁচজন মালীর। এঁরা হলেন বাউলের প্রতীক পঞ্চেন্দ্রিয়। কালকূট বলেছেন বাউল গানের মধ্যে দিয়েই 'মূলে যাবার প্রস্তুতি' নিয়েছেন। 'পুরাণ যে ইতিহাস' তা পুরাণকারদের যুক্তি দিয়েই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। ''পুরাতনস্য কল্পস্য পুরাণানি বিদুর্বুধাঃ। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পুরাণকে প্রাচীনকালের বিবরণ জ্ঞানেই অবগত আছেন।'' *(পৃ: ৯৭৭, ঐ)* খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখেছেন পুরাণকার যুগমানের দ্বারা কাল নির্ণয় করেছেন, তাঁদের বি-সি, এ-ডি নেই। খ্রীষ্ট জন্মকালকে যারা কালবিন্দু হিসাবে ধরেছেন, কৃষ্ণজন্মকালকে তারা খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বলে মেনে নিতে রাজি নন। ''ইংলণ্ডের ইতিবৃত্তে চোখ রেখে কালকূট দেখেছেন কেউ কেউ নিওলিথিক ও পৌলিওলিথিক অধিবাসীদের দিয়ে ইতিবৃত্ত শুরু করেছে। আরও অতীতে এগিয়ে দেখেছেন ওয়েলস্ ভূতত্ত্ব থেকে শুরু করেছেন। কিন্তু হিসাবের কালবিন্দু যীশুর জন্মকাল থেকে। পুরাণের কালবিন্দু নেই; ''তার আদিবিন্দু আছে। তাকে বলা হয়েছে মানবকল্পের আদিবিন্দু। স্বয়ম্ভুর মনুকাল, পাঁচ হাজার ন'শো খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এই আদিবিন্দুর অতীতে আর কিছু নেই। থাকলেও তা ইতিবৃত্তে আসেনি।'' *(পৃ: ৯৭৮, ঐ)*

লেখক চরিত্র দ্বারাবতী যাওয়ার জন্য হাজার হাজার বছরের কাঁটা অর্থাৎ কালের স্তর সরিয়ে মনপবনে এগিয়ে চলেছেন কিন্তু পথও ঠিক পথ কিনা জানা নেই। তাই দিঙনির্ণয়ের সাথে সাথে পথ বন্ধনও করেছেন। তাই দ্বারাবতী যাওয়ার পথ বন্ধন করার আগে জানতে চেষ্টা করেছেন দেবতা কারা, স্বর্গ কোথায়? দিবি আরোহণই বা কী? কালকূট পুরাণ-এর অতিরঞ্জন, অলৌকিকতা, বিভিন্ন ঘটনাবলী এ'কালের দৃষ্টিতে যুক্তি দিয়ে হদিস করার চেষ্টা করেছেন। 'দিবি আরোহন' কথাটাকে তিনি বলেছেন 'এর নাম জ্ঞান, দিবি আরোহণ, মানুষেরই দেবত্ব লাভের কথা।' *(পৃ: ৯৭৮, ঐ)* তিনি আরও বলছেন যে, উত্তম মানুষ প্রথমে মানুষ রূপেই পূজিত হয়েছিলেন, তারপরে দেবতায় উন্নীত, তারপরে তাকে জ্যোতিষ্ক রূপে কল্পনা করা হয়েছে। এরপর দেবতার পরিচয় দিয়েছেন। এ'কালের পটভূমিতে তিনি নতুন এক ধারণার কথা পাঠককুলকে শোনালেন। তিনি নিজেকে সূত বলে পুরাণকালের বাহন বলে অভিহিত করেছেন। তিনি পুরাণ

অনুসরণ করে বলে চলেছেন যে তিনি মনুবংশীয়দেরকে একমাত্র 'মানুষ' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। অন্যান্য জাতি হলেন, দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, সর্প, নাগ, সিদ্ধ, যক্ষ, রক্ষ ইত্যাদি। আরও বলেছেন, স্বয়ম্ভু মনুর আদিবিন্দু থেকে ব্রহ্মাই হলেন সৃষ্টিকর্তা। 'সিসৃক্ষোর্জ ঘানাৎ পূর্বমসূরা জাজ্ঞিরে ততঃ ততঃ পুরা' এই শ্লোকটি অনুসরণ করে বললেন যে, ''তিনি প্রথমে অসুরদের সৃষ্টি করেছিলেন, শ্লোকটা তাই শোনালাম। তারপর দেবতা, পরে পিতৃগণ, মানুষ, যক্ষ রক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব। ঋক্‌বেদে কোনো কোনো জায়গায় ইন্দ্রকে অসুর বলা হয়েছে। অনেকটা, তোমরা যখন কারোকে বলো লোকটা অসুর সেইরকম ভাবে। অসুরেরা ছিলেন অতি শক্তিশালী জাতি। দেবতাদের কোনো কোনো জাতিবর্গ পরবর্তীকালে নিজেদের অসুর বলেই পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন।'' *(পৃঃ ৯৭৯, ঐ)* লেখক কালকূটকে অনুসরণ করে বোঝা যাচ্ছে যে অসুরেরা দেবতাদের জ্ঞাতি ও বন্ধু হলেও দেবতাদের 'ইন্দ্রত্ব' নিয়ে অসুরদের সঙ্গে দেবতাদের বিবাদ বিসম্বাদ প্রায় লেগেই থাকত। বর্তমানে জ্ঞাতি জ্ঞাতিতে যেমন ঝগড়া-মারামারি খুনোখুনি দেখি এতো সেইরকমই।

কালকূট নিজেই 'সূত'-এর ভূমিকায় আমি কী বলি জানো? পুরাণের সাহায্য ছাড়া বেদের অর্থ কখনো সুগম হয় না। আমি সূত, আমি যদ্দৃষ্টং বর্ণনা করি; যথাশ্রুতি বলি, ঋষি লেখেন। আমি বলি, যে পুরাণ জানে না, বেদ তার কাছে প্রহৃত হবার আশঙ্কা করেন।'' *(পৃঃ ৯৭৯, ঐ)* সূতরূপী কালকূট বলে চলেছেন ''আমি তোমাকে একজন ইন্দ্রের কাহিনী বলব। বিভিন্ন ইন্দ্রের কীর্তি এঁর তাঁর ঘাড়ে চেপে অনেক সময়েই গোল বাঁধিয়েছে। আমি যাঁর কথা বলছি এঁকে বলা হতো, বৃত্রহন্তা বজ্রধারী, পুরন্দর ইন্দ্র। বিরাট যোদ্ধা ছিলেন। পুরন্দর অর্থে যিনি পুরী ধ্বংসকারী। অসুরদের অনেক নগর ধ্বংস করেছিলেন।'' *(পৃঃ ৯৭৯, ঐ)* একাধিক ইন্দ্রের পরিচয় অর্থাৎ স্বর্গের যিনি রাজা হবেন তিনি 'ইন্দ্র' নামে অভিহিত হবেন। পুরাণ থেকে তিনি তার মত করে আধুনিক দৃষ্টিতে তিনি পাঠকের সঙ্গে ইন্দ্রের পরিচয় ঘটিয়েছেন। এর থেকে বোঝা যায় বর্তমানে যেমন প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি প্রভৃতি বলা হয়ে থাকে তখনও বলা হত। পুরাণের অতিরঞ্জন বা উপলক্ষণকে অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তিনি পর্যালোচনা করেছেন, তাঁর দেখার দৃষ্টি আর পাঁচটি সাধারণ মানুষের মতো নয়। তিনি সময়ের দর্পণে চোখ রেখে পুরাণের উপলক্ষণগুলোকে চিহ্নিত করেছেন। তা হলে বোঝা যাচ্ছে 'ইন্দ্র' একাধিক। 'ঋক্‌বেদ সংহিতার অনুবাদক রমেশচন্দ্র দত্ত মানুষ ইন্দ্রের দেবত্ব বিষয়ে অনেকগুলো ঋকের অনুবাদ করেছেন। আমি কয়েকটি তোমার সামনে তুলে ধরছি 'হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, ত্বরান্বিত হয়ে স্তোত্র গ্রহণ করতে এসো। এই সোম অভিনবযুক্ত যজ্ঞে আমাদের অন্ন ধারণ কর।' *(পৃঃ ৯৭৯, ঐ)*

'হে সোমপায়ী ইন্দ্র, আমাদের অভিনবের নিকট এস, সোম পান কর। তুমি ধনবান, তুমি হৃষ্ট হলে গাভী দান কর।' *(পৃঃ ৯৭৯, ঐ)* রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদ অনুসরণকারী সূতরূপী

কালকূট বলে চলেছেন বজ্রধারী ইন্দ্র প্রথমে অহিকে (মেঘকে) হনন করেছিলেন, পরে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন এবং বহনশীল পার্বতীয় নদীসমূহের (পথ) ভেদ করে দিয়েছিলেন। ইন্দ্র নিজের বজ্র নিজে হেনে ভয় পেয়ে শ্যেন পাখির মতো নবনবতি নদী ও জল পার হয়ে গিয়েছিলেন। ইন্দ্র শুষ্ণ (অসুরদের) সঙ্গে যুদ্ধে কুৎস ঋষিকে রক্ষা করেছিলেন। অতিথি বৎসল (দি বোদাসের রক্ষার্থে) শম্বর (নামক অসুরকে) হনন করেছিলেন। মহান অর্বুদ (নামক অসুরকে) পদদ্বারা আক্রমণ করেছিলেন। অতএব দস্যু হত্যার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি। এরকম বহু সূক্ত তিনি উল্লেখ করেছেন। ত্বষ্টা তার বল বৃদ্ধি করেছেন ও সেই বল দ্বারা তিনি বজ্র তীক্ষ্ম করেছেন। 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র দধীচির (মূলে ঋষির নাম নেই) অস্থি দ্বারা বৃত্রগণকে নবগুণ নবতিবার বধ করেছিলেন।' সূতরূপী কালকূট ক্রমশঃ মূলে প্রবেশ করেছেন। তিনি বলছেন, 'আমি সূত, পুরাণকারের একমাত্র বাহন, আমি বলি, এই যে আশ্চর্য বলবীনশালী পুরুষ, স্বাভাবিক দিবি আরোহণের ফলে, ইনিই আন্তরীক্ষ দেবতা কল্পিত হন। যেমন তাঁদের অনেকের পরে রাম বা কৃষ্ণ ভগবান হয়েছিলেন।' *(পৃ: ৯৭৯, ঐ)* তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে কর্মের দ্বারাই মানুষ দেবত্বে উন্নীত হয়, পরবর্তীকালে জ্যোতিষ্ক। কালকূটের দৃষ্টিতে যুক্তিগুলো মেনে নেওয়া যায়। নবদ্বীপের নিমাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও ভগবান হয়েছেন। দুজনেরই 'দিবি আরোহণ' ঘটেছে, দুজনেই দেবত্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন। 'দিবি আরোহণ' — এগুলো দেব-দেবতাদের ব্যাপার, অলৌকিকতার জটাজালে আবদ্ধ। কিন্তু কালকূট পুরাণের ব্যাখ্যা করেছেন এ'কালের দৃষ্টিতে। অলৌকিক ব্যাপার নয়, বাস্তব জীবনেই এমনটি সম্ভব, প্রমাণস্বরূপ মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। তিনি এইভাবেই দেবতাদের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে ত্বষ্টাপুত্র বৃত্রকে ইন্দ্র নিহত করেছিলেন। কিন্তু তার অগে ইন্দ্রকে বৃত্র আঠারবার পরাজিত করেছিলেন। অতএব স্বর্গের সম্রাট ইন্দ্রের এই পরাজয় অত্যন্ত অসম্মানজনক ও হৃদয়বিদারক ছিল। তিনি অত্যন্ত যুক্তি সহযোগে স্বর্গের স্থান নির্দেশ করেছেন। তিনি তো আগেই বলেছেন 'প্রমাণ চাই'। অতএব দেখা যাক সূতরূপী কালকূট কীভাবে প্রামাণ্য তথ্য যুক্তিসহ বর্ণনা করেছেন। "আমি সূত, স্বর্গের ঠিকানা আমার জানা আছে। ভারতের উত্তরে হিমালয়। হিমালয়ের উত্তরে হেমকূট, তার দক্ষিণে কিমপুরষবর্ষ। হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ। হরিবর্ষের উত্তর সীমা নিষধ পর্বত। নিষধের উত্তরে 'ইলাবৃতবর্ষ'। ইলাবৃত্তের উত্তর সীমা নীলাচল।" *(পৃ: ৯৭৯, ঐ)*

ব্যাসদেব বিরচিত কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারতেও স্বর্গের বর্ণনা এইভাবে আছে "হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণে ভারতবর্ষ, উত্তরে হৈমবতবর্ষ, হেমকূট পর্ব্বকের উত্তরে হরিবর্ষ, নিষধ পর্ব্বতের উত্তরে ইলাবৃত বর্ষ, নীলপর্ব্বতের উত্তরে শ্বেতবর্ষ, শ্বেত পর্ব্বতের উত্তরে হৈরণ্যকবর্ষ, তাহার পর ঐরাবতবর্ষ — এই সাতটি বর্ষ শবাসনাকার ধারণ করিয়া ভূপৃষ্ঠে সন্নিবেশিত আছে।

(পৃ: ৮৭৪, মহাভারত ১ম খণ্ড)

কালকূট এরপরেই আধুনিক ভৌগোলিক যুক্তি দিয়েছেন — এই ইলাবৃতবর্ষ, মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত। আধুনিক পামির পূর্ব তুর্কীস্থান ইলাবৃতবর্ষের অন্তর্গত। এই ইলাবৃতবর্ষেরই অপর নাম 'স্বর্গ'। একজন কবি লিখেছেন — "কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতেই সুরাসুর।" *(পৃ: ৯৮০, কালকূট রচনা সমগ্র, ২য় খণ্ড)* তিনি আরও বলেছেন "এই কবিও স্বর্গ নরকের একটা কল্পনা করেছিলেন, কিন্তু ভৌম স্বর্গের ভৌগোলিক অবস্থান জানতেন না।" *(পৃ: ৯৮০, ঐ)*

মহাকাব্য-পুরাণ অনুসারী হয়েই তিনি এই যুক্তি প্রামাণ্য হিসাবে পেশ করেছেন পাঠক দরবারে। তিনি বলেছেন 'পুরাকালে এই ইলাবৃতবর্ষ অতি সমৃদ্ধ স্থান ছিল।' *(পৃ: ৯৮০, ঐ)* প্রাকৃতিক দুর্যোগে নদনদী শুকিয়ে স্বর্গের সভ্যতা লুপ্ত হয়েছিল। তেত্রিশ কোটি দেবতার বসবাসের জন্য স্থানাভাব হচ্ছিল, অতএব দেবগণের 'ভারতবর্ষে আগমন' ঘটেছিল। "দেবগণ আধুনিক তুর্কীস্থান থেকে কাশ্মীরের পথে পাঞ্জাব, পাঞ্জাব থেকে বিন্ধ্যাচলের উত্তর দেশ পর্যন্ত অধিকার করেন। তারপরে বিন্ধ্যের দক্ষিণেও অগ্রসর হন। বলতে গেলে, আস্তে আস্তে তাঁরা সারা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে পড়েছিলেন।" *(পৃ: ৯৮০, ঐ)* দেবগণ কীভাবে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিলেন তার একটা ভৌগোলিক বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন "আমি এইভাবে ভাগ করি, ইলাবৃতবর্ষ কাশ্মীর বিন্ধ্যোত্তর ভারত এবং দক্ষিণাপথ পর্যায়ক্রমে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, মর্ত, পাতাল নামে পরিচিত। ভারতীয়দের পূর্ব পুরুষরা প্রথমে কাশ্মীর বা অন্তরীক্ষে এসে বাস করেন তাই তার অপর নাম পিতৃলোক।" *(পৃ: ৯৮০, ঐ)* তিনি আরও বলেছেন যে, দেবতাদের একটি শাখা ভারতে এসে 'মানব জাতি হলেন', কারণ ইন্দ্রের প্রতিভূর নাম হল মনু বা প্রজাপতি। রাজা হয়ে বেণরাজা প্রথম ইন্দ্রের বশ্যতা অস্বীকার করেন। ইলাবৃতবর্ষ তাদের আদি বাসস্থান বলে ঐ স্থান পবিত্র তীর্থভূমি বলে বিবেচিত হয়ে গেল। যুধিষ্ঠিরের সময়েও স্বর্গে তীর্থযাত্রার প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে নানাপ্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে স্বর্গের পথ দুর্গম হয়ে পড়ে। স্বর্গ পুণ্যাত্মাদের বাসস্থান এবং দেবযান নক্ষত্রবীথি বলে কল্পিত হয়েছে।

দ্বারাবতী যাওয়ার পথের হদিস তিনি কালের পুঁথি হাতড়ে বেড়িয়েছেন। মৎসপুরাণে দেখেছেন, একজন 'ইন্দ্র' সামরিক কারণে বজ্র দ্বারা স্বর্গের পথ রুদ্ধ করে দেওয়ার ফলে স্বর্গের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। লেখক কালকূট তাঁকে হীনচেতা বলেছেন। প্রাকৃতিক কারণই হোক আর সামরিক কারণই হোক পাহাড়ে ধ্বসের ফলে দেবযান পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই পথই ছিল মধ্য এশিয়া আর ভারতে যাতায়াতের বণিক পথ; দেবযান পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে বদ্রীনারায়ণ ও মানস সরোবরের পথে অনেকে পুণ্যতীর্থে স্বর্গে যেতো। যুধিষ্ঠিরও এই পথেই স্বর্গে গিয়েছিলেন।

এই পথে পড়ে শিবের রাজত্ব, কৈলাস। বর্তমানে তিব্বত বলে পরিচিত। তিব্বত চিরকালই ভূত প্রেতের নাচের জন্য বিখ্যাত। দ্বারাবতী যাওয়ার জন্য বিস্তর পথের কাঁটা সরাতে সরাতে পথের হদিস করতে বহু অতীতে চলে এসেছেন মনে মনে। সেই ভ্রমণে এসে সেই পথ খুঁজে নিচ্ছেন বর্তমানের ভৌগোলিক দৃষ্টিতে। স্বর্গের হদিস তিনি পেয়ে গেছেন। এবার স্বর্গ থেকে আরও এগিয়ে চলেছেন, তিনি এবারে ব্রহ্মলোক ও বিষ্ণুলোকের অবস্থান নির্ণয় করেছেন। — 'স্বর্গেরও উত্তরে কুরুতে ছিল ব্রহ্মলোক আর বিষ্ণুলোক।' দেবতারা নিজেদের সেই লোকের অধীন বলে মনে করতেন। লেখক এ'কালের প্রেক্ষাপট থেকে অনেক কালের অতীতের প্রেক্ষাপটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি বলেছেন 'এখন তুমি এই দুই লোকের সন্ধানে কাসপিয়ান সাগরের কূলে কিংবা সাইবেরিয়ায় যেতে পারো। সন্ধান মিললেও মিলতে পারে।' *(পৃ: ৯৮০, ঐ)* কাসপিয়ান সাগরের কূল আর সাইবেরিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বিষ্ণুলোক ও ব্রহ্মলোকের সঙ্গে মিলে যায়। এইজন্যই সূতরূপী কালকূট একথা বলেছেন। বর্তমানের নিরিখে তিনি সেকালকে দেখছেন এ'কথা আগেই বলেছি।

স্বর্গের নেতা বা অধিপতি ইন্দ্র। কালকূট পুরাণের অধরা বিষ্ণুলোক-ব্রহ্মলোককে বাস্তবে নিয়ে এসেছেন। ভৌগোলিক অবস্থান যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। উত্তরে কুরুতে ব্রহ্মলোক-বিষ্ণুলোক থাকলে পথ দুর্গম হলেও সেখানে যাওয়া যায়। ভৌগোলিক অবস্থানটা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে আসে। আর মানচিত্র খুলে বসে বর্তমানের নিরিখে কালকূটের বক্তব্যের সত্যতাও পরখ করে নেওয়া যায়। পুরাণের মর্ত্য ও পাতালকে তিনি একালের দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। 'ভারতের বিন্ধ্যাচলের উত্তরভাগের নাম পৃথিবী বা মর্ত্য। পৃথু রাজার রাজ্যই পৃথিবী। বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণভাগ পাতাল। পাতালকে আমি ভূবিবর বলেছি, দক্ষিণ দেশও বলেছি।'

কালকূট পাতালের সাতটি ভাগের স্থান নির্দেশ করেছেন। ''অতল — ময়পুত্র মহামায়ার রাজত্ব। বিতল— হাটকেশ্বর হর। সুতল— বৈরোচন বলি। তলাতল— ময় ত্রিপুরাধিপতি। মহাতল— সর্পজাতি। রসাতল — দানবজাতি। পাতাল — নাগজাতি। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ — সুতল।''

সূতরূপী কালকূট পুরাণের ইতিবৃত্ত প্রমাণের একটি আশ্চর্য ঘটনা শুনিয়েছেন। দিলীপের ছেলে ভগীরথ। 'জানো তো ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করেছিলেন। আসলে তোমাদের ভঙ্গিতে বললে বলতে হয়, ভগীরথ একজন ইরিগেশনের বীর এঞ্জিনীয়র যিনি গঙ্গাকে খাল কেটে সুদীর্ঘ পথে সাগরে মিশিয়েছিলেন। সগর বংশের এইটি একটি মহান কীর্তি।' *(পৃ: ৯৮০, ঐ)* সগর খাল কাটিয়ে গঙ্গাকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন। লেখক কালকূট ভগীরথের গঙ্গা আনয়নকে পাঠকের সামনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তুলে ধরলেন। এই কাহিনীর আড়ালে যে উপলক্ষণগুলো আছে সেগুলো খুঁজে বের করে নতুন রূপে এই অত্যাশ্চার্য ঘটনাকে ব্যাখ্যা করলেন। এখন দেখা যাক

তিনি কীভাবে ঘটনাগুলো পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন গঙ্গাকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করার জন্য 'প্রথমে বংশধর পুত্র অসমঞ্জ এবং আরো ষাট হাজার অশ্বারোহী পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন। লক্ষ্য রেখো, অসমঞ্জ 'বংশধর পুত্র', বাকীরা কেবলই 'পুত্র'। এটাই আমাদের— সূতদের বৈশিষ্ট্য। ষাট হাজার খননকারী কর্মীকেও আমরা সগর পুত্র বলে উল্লেখ করলাম, কিন্তু বংশধর পুত্র বললাম না।' *(পৃ: ৯৮০, ঐ)* তাহলে দেখা যাচ্ছে সূতরূপী কালকূট বর্তমানের দৃষ্টিতে এই যুক্তিতে উপনীত হয়েছেন, 'বংশধর' পুত্র অসমঞ্জই সগর রাজার পুত্র, আর ষাট হাজার পুত্র শুধুই পুত্র। সগররাজা যজ্ঞ অশ্বের সন্ধানে বংশধরপুত্র অসমঞ্জসহ ষাট হাজার খননকারীকে পাঠিয়েছিলেন।

সূতরূপী কালকূট সমকালের দৃষ্টিতে পুরাণের ইতিবৃত্তকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সগর রাজা খাল কাটিয়ে ভিন্ন পথে যে গঙ্গাকে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন। প্রায় পঁচাশি বছর ধরে চেষ্টা করেছেন সগররাজার বংশধরগণ। ভগীরথ গঙ্গাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে সাগরের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। লেখক কালকূট জানেন এতকালের বিশ্বাসে আঘাত হানলে কি হতে পারে। তাই তিনি যখন বলেন— ভগীরথকে ইরিগেশন এঞ্জিনীয়র, 'আমি জানি পুরাকালে অনেক ব্যক্তি খাল খনন, পূর্তাদি কাজে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জানি গঙ্গাকে খনিত খাল ভাবতে তোমার বিশ্বাসে আঘাত লাগছে।' *(পৃ: ৯৮১, ঐ)* বিশ্বাসে আঘাত লাগারই কথা। তবু কালকূটের একালীয় দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করা যায় না। কারণ গঙ্গাকে সুউচ্চ হিমালয়ের গঙ্গোত্রী থেকে কঠিন পার্বত্য পথে সমতলে নামিয়ে এনে বাংলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে মিলিয়ে দেওয়া সহজ কথা নয়। খনন ও পূর্তাদি কাজে বিশেষ পারদর্শী অর্থাৎ সেচ সম্পর্কে বিশেষ কারিগরী জ্ঞান সগর বংশধর ভগীরথ-এর ছিল এবং অনেক অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে ও বহুলোকের প্রচেষ্টায় তিনি এই মহৎ পুণ্য কর্মে সফলতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর এই মহৎ কর্মেই দিবি আরোহণ ঘটেছিল।

কালকূটের প্রশ্ন সগর রাজা প্রেরিত ষাট হাজার অশ্বারোহী পুত্র মারা গেল কীভাবে? আর কপিল? তিনিই বা কে? "সগর অশ্বচোরের সন্ধানে যাদের পাঠালেন, তারা ঘোড়ার খুরের চিহ্ন দেখে, কপিলের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকেই চোর ভেবে ধরতে গিয়ে কপিলের অগ্নিপিঙ্গল বর্ণের দিকে তাকিয়েই অভিশপ্ত হয়ে মারা গেল।" *(পৃ: ৯৮০, ঐ)* লেখক কালকূট তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরাণের বৈশিষ্টকে ধরিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, বাঙালীরা দক্ষিণের ম্যালেরিয়ার কথা কখনো ভুলবে না। বিভীষিকাময় সেই জ্বরে চোখ হলদে হয়ে যায়, যকৃতের দোষ ধরা পড়ে। পিঙ্গ লবর্ণ কপিলের ইঙ্গিত আছে। সেইখানেই। "ঘোড়াগুলো চরে বেড়াচ্ছিল, ষাট হাজার খননকারী মরে পড়েছিল।" *(পৃ: ৯৮০, ঐ)* প্রমাণস্বরূপ তিনি বাণরাজ্যের মাহেশ্বর জ্বরের কথা উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণ একবার বলরাম ও প্রদ্যুম্নকে নিয়ে বাণরাজ্য থেকে অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করতে গিয়ে মাহেশ্বর

জ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। মাহেশ্বর জ্বরকে তিনি ব্যাধিই বলেছেন যে ব্যাধি ভয়াবহ দৈত্যের থেকেও ভয়াবহ। আর বাণরাজ্যকেই বর্তমানে আসাম বলা হয়। তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই কাহিনীর উপলক্ষণগুলো পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। "এক এক অস্বাস্থ্যকর স্থানে সংক্রামক রোগের স্থানে সগর সন্তানদের মৃত্যুর খবর তোমরাও জানো। মীরজুমলার দুই লক্ষরও বেশি সৈন্য আসামে গিয়ে জ্বরে মারা গিয়েছিল।" *(পৃ: ৯৮০-৯৮১, ঐ)* তিনি পুরাণে উপলক্ষণগুলো পাঠককে বুঝতে সাহায্য করেছেন। ধর্মীয় মানুষের প্রচলিত বিশ্বাসে তিনি ঘা দিয়েছেন লেখকের যুক্তিতে সায় দিয়ে সন্ধানী দৃষ্টি মেললে ব্যাপারটা স্পষ্ট ধরা পড়ে। শ্রীমদ্ভাগবত ভাগবতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে ষাট হাজার পুত্র মহাত্মাকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে ক্রোধে শূন্য হয়ে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। 'দেবরাজ ইন্দ্রের প্রভাবে তাদের বুদ্ধিবিনষ্ট হয়েছিল তাই তাঁরা একজন মহাপুরুষকে অশ্রদ্ধা করেছিলেন। তার ফলে তাঁদের নিজেদের শরীরের অগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত হয়েছিলেন।' (শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্ধ - ৯, অধ্যায় ৮, *)

শ্রীমদ্ভভাগবত স্কন্ধ ৯, অধ্যায় ৮ এ বলা হয়েছে 'কেউ কেউ বলেন, মহারাজ সগরের পুত্ররা কপিলমুনির চোখ থেকে নির্গত ক্রোধাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু মহাজ্ঞানীর তত্ত্ববেত্তা পুরুষেরা সেই কথা অনুমোদন করেন না, কারণ কপিল মুনির দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়। অতএব সেই দেহে তমোগুণজনিত ক্রোধের প্রকাশ হতে পারে না। ঠিক যেমন নির্মল আকাশ কখনও পৃথিবীর ধূর্রির দ্বারা কলুষিত হতে পারে না।' (শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্ধ ৯, অধ্যায় ৮)

সূতরূপী কালকূট পুরাণের বৈশিষ্ট্যকে ধরিয়ে দিয়ে বলেছেন গঙ্গা বা ভাগীরথী যে স্থানে সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেই গঙ্গাসাগর সেই সময়ে দুর্গম, নীচু জলা-জঙ্গলপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর সংক্রামক রোগের স্থান ছিল। কালকূট ইঙ্গিত করেছেন 'যকৃতের দোষ', 'চোখ হলদে আর বিভীষিকাময় জ্বর'-এর দিকে। আমরা এই রোগকে বলি কামলা রোগ বা জণ্ডিস। পুরাণের বৈশিষ্ট্যগুলো বা উপলক্ষণগুলো সরিয়ে দিয়ে সূতরূপী কালকূটের বক্তব্যকে একালের দৃষ্টিতে মেনে নেওয়া যায়। আগামী দিনে দ্বারাবতী যাওয়ার জন্য ধুলি ধূসরিত পথের হদিস করতে করতে কালকূট প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন মাঝে মাঝেই। মূল খুঁজতেই তাঁর এই প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া। পুরন্দরের কথা বলতে গিয়ে কালকূট কতকগুলো সুক্তর কথা শুনিয়েছিলেন সেগুলির ব্যাখ্যাও তিনি করেছেন। বৃত্র ইন্দ্র ও তার প্রজাবর্গকে উৎপীড়ন করবার জন্য পাহাড় ধসিয়ে চারটি নদীপথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ইন্দ্রের শক্তিমত্তাকে তিনি যেন মনভ্রমণে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইন্দ্র বৃত্রকে হনন করে বজ্রাঘাতে পর্বতকে বিদীর্ণ করে মানস সরোবরের কাছে বিপাশা আর শতদ্রু এই দুটি রুদ্ধ নদীপথ খুলে দিয়েছিলেন। কালকূট বলেছেন, 'এই নদী দুটির তোমরা আধুনিক নাম দিয়েছ, বিয়াস, সট্‌লেজ।' *(পৃ: ৯৮১, ঐ)* তিনি বলেছেন পরবর্তীকালে অর্বাচীন সূতগণের দ্বারা এই দুটি নদীই

চারটি হয়েছে, তারপরে সাতটি। এ থেকে বোঝা যায় অর্বাচীনেরা চিরকালই ছিল, এখনো আছে, কিন্তু জ্ঞানীরা ভিতর থেকেই সত্যকে অনুসন্ধান করেন। সূতরূপী কালকূট নিজেও সেই সত্যকে অনুসন্ধান করে নিজ উপলব্ধিকে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন, বজ্র, ইন্দ্রের আয়ুধ, বন্দুকের মতো এই অস্ত্র ছিল সুদূরপাতী। এই অস্ত্রের জন্য ইন্দ্র বিষ্ণুর কাছে গিয়েছিলেন। বিষ্ণু বলেছিলেন, অস্থিময় বজ্রের দ্বারা বৃত্র নিহত হবে এবং আরো বলেছিলেন 'সুরাধিপ, সেই জীব শত হস্ত প্রমাণ, মধ্য ক্ষীণ, দুই পার্শ্বে স্থূল ছয়কোণ অর্থাৎ পলযুক্ত ভীষণাকৃতি হওয়া চাই।' *(পৃ: ৯৮১, ঐ)* তিনি আরো বলেছিলেন, 'সরস্বতী তীরে যে বিশাল দধীচি আছেন তিনি এর দ্বিগুণ।' *(পৃ: ৯৮১, ঐ)* ইন্দ্র সরস্বতী তীরে গিয়ে দধীচির দেখা পেয়েছিলেন।

কালকূট অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দধীচির ব্যাখ্যা করেছেন। দধীচিকে তিনি বিপ্র বলেছেন। তিনি বলেছেন পুরাণের এটি বৈশিষ্ট্য। "যে প্রাণীর দ্বারা দেব ও মানবজাতির ইষ্ট হয়, আমরা সেই প্রাণীকেও ঋষিতুল্য জ্ঞান করি।" *(পৃ: ৯৮১, ঐ)* ইন্দ্র দধীচির অস্থি প্রার্থনা করতে গিয়ে বলেছেন— হে বিপ্র আপনি ভিন্ন এত বিশাল প্রাণী আর দেখি না। দধীচির করোটির মস্তকের মত দেখতে ছিল এবং সেই মস্তক ইন্দ্র শরণাবতে সরোবর থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের স্কন্ধ ৬, নবম অধ্যায়ে ৫২ নং শ্লোক-এ আছে —

"স বা অধিগতো দধ্যঙ্ভশ্বিভ্যাং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
যদ্ বা অশ্বশিরো নাম তয়োরমরতাং ব্যধাৎ।। ৫২ ।।"

শ্রীমদ্ভাগবত, ৬ষ্ঠ স্কন্ধ, নবম অধ্যায়, শ্লোক নং ৫২

অর্থাৎ "সেই দধ্যঞ্চ ঋষি, যিনি দধীচি নামেও পরিচিত, স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যালাভ করে সেই ব্রহ্মজ্ঞান অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দান করেছিলেন। কথিত আছে যে দধ্যঞ্চ অশ্বশির ধারণ করে তাঁদের সেই মন্ত্র ধারণ দান করেছিলেন। তাই সেই মন্ত্রকে বলা হয় অশ্বশির। দধীচির কাছ থেকে সেই মন্ত্রলাভ করে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জীবন্মুক্ত হয়েছেন।" শ্রীমদ্ভাগবত, ৬ষ্ঠ স্কন্ধ, নবম অধ্যায়, শ্লোক নং ৫২ এর অনুবাদ।

তাহলে এই গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে দধীচি অশ্বশির বিশিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। সূতরূপী কালকূট পাঠকদের উপরে সূক্ষ্ম একটি প্রশ্ন রেখে দিয়েছেন— 'তোমার চোখের সামনে কি প্রাচীন প্রাণী ডাইনোসোরাসের ঘোটক জাতীয় করোটি ভেসে উঠেছে? উঠলে আমি কোনো মন্তব্য করবো না।' *(পৃ: ৯৮১, ঐ)* কিন্তু তিনি একটি তথ্য দিয়েছেন সেটা হল 'তোমাদের আধুনিক ভূবিজ্ঞানীরা পূর্ব তুর্কীস্থান আর তার নিকটবর্তী প্রদেশসমূহে, প্রাগৈতিহাসিক জীবের কঙ্কাল, কিছুকাল আগেও আবিষ্কার করেছেন। প্রাগৈতিহাসিক কাল বলতে আমি স্বয়ম্ভুমনুকালের পূর্বের কথা বলি।' *(পৃ: ৯৮১, ঐ)*

দেব ও মানবজাতির ইস্টকারী প্রাণীকে লেখক 'ঋষিতুল্য জ্ঞান' করছেন। তিনি এর স্বপক্ষে যুক্তিও দিয়েছেন যে 'আধুনিককালের ইতিহাস লেখকগণের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মূলত তফাত এইখানে।' *(পৃ: ৯৮১, ঐ)* দধীচির অশ্ব করোটির মত বিশাল মস্তক দিয়ে বজ্রাস্ত্র তৈরি করে বৃত্রের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠেছিল, অগ্নি ও ধুম্রজালের সৃষ্টি হয়েছিল। পর্বত ধসিয়ে দিয়ে অবরুদ্ধ নদীপথ খুলে গিয়েছিল। আকাশের মত উঁচু হয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। আর স্বয়ং ইন্দ্রদেব ভয়ে বহুদূরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পুণ্য করেছিলেন জলমোচন করে। লেখক কালকূট দ্বারাবতীর রাস্তা খুঁজতে সুদূর অতীতে তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছেন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তুলে ধরেছেন পুরন্দর ইন্দ্রর সেই পুণয কীর্তিকে তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক দিকগুলো তার আশ্চর্য কথকতার ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। পাঠকহৃদয়ে পুরাণের কাহিনীর উপলক্ষণ, অতিরঞ্জনের অর্ন্তনিহিত দিকগুলো তুলে ধরেছেন। বিজ্ঞান মনস্কতা জাগিয়ে তুলেছেন পাঠকহৃদয়ে। ইন্দ্র কর্মের দ্বারা দিবি আরোহণ করেছিলেন। তাই পরবর্তীকালে তিনি জলবর্ষণকারী অন্তরীক্ষদেব বলে পরিচিত হয়েছেন।

লেখক সূতরূপী কালকূট আরও একটি দিক আলোকিত করেছেন সেটি হল যজ্ঞ। সেই সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বর্ধনা সভাকে বলা হত 'যজ্ঞ'। যজ্ঞে ইন্দ্রকে আহ্বান করা হোত এবং তাঁকে প্রথম পাদ্য অর্ঘ সোম ও অন্ন নিবেদন করা হোত ও তাঁর স্তুতি করা হোত। ''একসময়ে গৃৎসমদ বলেছিলেন যে, 'লোকে এখন ইন্দ্রকে অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে। জনগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তিনি আরও বলেছিলেন, 'যিনি শত্রু বিনাশ করেন, যিনি বিশ্ব নির্মাণ করেছেন, তিনি ইন্দ্র।' *(পৃ: ৯৮১, ঐ)* সূতরূপী কালকূট পুরাণের ইতিবৃত্তীয় সংকেত ও ইঙ্গিতগুলো তুলে ধরে কিভাবে মানুষ তার পুণ্য কর্মের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে দেবত্বে উন্নীত হন তার ব্যাখ্যা করেছেন। ''আমি একজন সূত হিসাবে দেখলুম, ভারতীয়রা যা প্রাণ ধরে রক্ষা করে, তার সঙ্গে ধর্মের একটা সম্পর্ক থাকে। পুরাণ তাদেরই জাতীয় ইতিবৃত্ত, কিন্তু আমি যদি কেবলমাত্র 'ইতিবৃত্ত' বলি, তা হলে তারা রক্ষা করবে না। অতএব আমি বললাম, পুরাণ ধর্মপুস্তক। যেহেতু পুরাণ ধর্মপুস্তক, এই পুস্তক প্রতিদিন পাঠ করা, লিখে দান করা অথবা অপরকে শোনানোর মত পুণ্য আর কিছু নাই। সেইজন্যই 'পুরাণ' এখনও বর্তমান আছে।'' *(পৃ: ৯৮১-৯৮২, ঐ)* মূল কাহিনীতে প্রবেশের পূর্বে একটু বলে নেওয়া দরকার, লেখক কালকূট 'শাম্ব' কাহিনীতে নিজেকে দুইরূপে প্রকাশ করেছেন। একদিকে তিনি সূতরূপী লেখক কালকূট, আর একদিকে লেখক চরিত্ররূপী কালকূট। লেখক চরিত্র কালকূটকে ব্যাখ্যা করেছেন যাতে সূতরূপী লেখক কালকূট বলেছেন যে, আমরা আমাদের জাতীয় ইতিবৃত্ত ভুলতে বসেছি। তাই তিনি ইতিবৃত্তের পথে চলে ইতিবৃত্ত, পুরাণের 'অতিরঞ্জন', 'উপলক্ষণ' গুলোর আড়ালে কী সংকেত, ইঙ্গিত আছে সেগুলোর হদিশ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি যা

জেনেছেন, যা বিশ্বাস করেছেন, সেইসব তথ্যই লেখক চরিত্ররূপী কালকূটকে তথা পাঠককূলকে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যেহেতু কালকূট নিজে চরিত্র হয়ে চলেছেন দ্বারাবতী জাতীয় ইতিবৃত্তেরই একটি অধ্যায় তুলে ধরতে যাচ্ছেন তাই লেখক বলেছেন "প্রকৃত ইতিবৃত্ত, নর ও দেবের ইঙ্গিত, তোমার দরকার ছিল। "এখন তোমার দৃষ্টি স্বচ্ছ ও সহজগম্য হবে। আমার মনে হয়, পরেও আমাকে তোমার দরকার হবে। ডেকো, আসবো। তোমার যাত্রা শুভ হোক।" *(পৃ: ৯৮২, ঐ)*

কালের ধুলোকে সরিয়ে কালকূট চরিত্র এগিয়ে চলেছেন দ্বারকানগরীর পথে, বাসুদেব অঙ্গ নে। শাম্ব দর্শনে। বাসুদেব সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে করতে তাঁর যাত্রাপথকে সুদৃঢ় করছেন। তিনি দেখেছেন বাসুদেব যেখানেই গমন করতেন গমনের আগে শঙ্খ নিনাদের দ্বারা জ্ঞাতি, বান্ধব আর নগরবাসীকে জানিয়ে যেতেন। তাঁর রথের সারথি আয়ুধাগার থেকে বিশেষ অস্ত্র গদা, শাঙ্গপানি এবং চক্র তাঁর রথে তুলে রাখতেন দুর্মদ অরি নিধনের জন্য। তিনি ছিলেন বৃষ্ণি গোষ্ঠীর নেতা বার্ষ্ণেয়। যাত্রাপথের ধুলো উড়িয়ে দেখা যাচ্ছে যযাতি ও শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর পুত্র যদু ও তুর্বসুর। যদুর বংশধরেরা কালে কালে সাত্বত, অন্ধক, ভোজ নানা শাখায় ছড়িয়ে গিয়েছিলেন। সাত্বতদের বৃষ্ণি নামেও অভিহিত করা হোত। শরিকানার ভাগাভাগি থাকলেও নিজেদের মধ্যে যদুবংশ দীর্ঘকাল সদ্ভাব বজায় রাখতে পেরেছিলেন। "এক্ষেত্রে বয়সে বৃদ্ধ না হয়েও, যদু বংশের রাজসিংহাসনে আরোহণ না করেও যিনি সমগ্র গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ সংহত করে রাখতে পেরেছিলেন, তৎকালের লোকেরা তাঁকে বিশেষণ দিয়েছিলেন বৃষ্ণিসিংহ যিনি আমাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ নামে পরিচিত।" *(পৃ: ৯৮২, ঐ)* কৃষ্ণের দিবি আরোহণ ঘটেছিল। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নামে পরিচিত। শাম্ব সন্ধানী লেখক চরিত্র বাসুদেব অঙ্গনে পৌঁছে গেছেন। বিস্তর তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন এবং সেই তথ্য তিনি পাঠকমহলে পৌঁছে দিয়ে মূল কাহিনী সম্পর্কে আগ্রহান্বিত করে তুলেছেন। তিনি বলেছেন কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি বাসুদেবেরই সান্নিধ্যে যেতে চাইছেন সেই উদ্দেশ্যে বাসুদেব একটি পার্শ্বচরিত্র। "কিন্তু তিনি দ্বারকানগরীর প্রতিষ্ঠাতা স্রষ্টা, তাঁর জীবিতকালের মধ্যে তিনিই প্রধান পুরুষ, সেইজন্য তাঁকে ছেড়ে আমার উদ্দেশ্যকেই প্রতিষ্ঠা করতে পারি না যে। অতএব বাসুদেবায়ঃ শরণং।" *(পৃ: ৯৮৩, ঐ)* অতএব তিনি বাসুদেব সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অবহিত করেছেন। তিনি বলছেন বৃষ্ণিবংশীয়রা যুদ্ধকৌশলে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। এরা ছিলেন সত্যবাদী, ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানরত মহাত্মা, বিত্তশালী, কিন্তু অহংকারী নয়। এরা যুদ্ধে অপরাজেয়। আরও তথ্য ভেসে উঠতে দেখেছেন, "শূরসেনদের মথুরাবাসী বলা হয়। জ্ঞানী বৃদ্ধরা বলেছেন, 'এরা দীর্ঘদেহী, ক্ষিপ্রকারী আর নৌচালনাপটু।' আমার চমক লাগলো 'নৌচালনাপটু' শব্দটিতে।" *(পৃ: ৯৮২, ঐ)*

সূতরূপী কালকূট 'নৌচালনাপটু' সংবাদটির উপর লক্ষ্য রাখতে বলেছেন। পুরাণের ইতিবৃত্ত প্রমাণের জন্য একটি উপলক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। 'দ্বারাবতী'র পথে এগোতে অর্থাৎ দ্বারাবতী

পৌঁছানোর সময় 'নৌচালনাপটু' কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং দ্বারাবতীর অবস্থান সম্বন্ধেও একটু সংকেত দিয়ে রেখেছেন কালকূট। দ্বারাবতী গমনের পথের অলিগলি খুঁজতে গিয়েই কালকূট চরিত্র আর এক 'বাসুদেবের কথা' ইতিবৃত্তীয় ঘটনায় খুঁজে পেয়েছেন। বঙ্গ পুণ্ড্র কিরাতদেশের অধিপতির নামও বাসুদেব। ভূমণ্ডলে তিনি 'মহাবল পরাক্রান্ত পৌণ্ড্রক' নামে পরিচিত অর্থাৎ তিনি 'পৌণ্ড্রক বাসুদেব' নামে পরিচিত ছিলেন। পৌণ্ড্রক বাসুদেব কৃষ্ণের বীরত্ব, বুদ্ধি আর কৌশলকে ঈর্ষা করতেন। কৃষ্ণকে সকলে 'পুরুষোত্তম' বিশেষণে ভূষিত করেছিল বলে ঈর্ষায় সে নিজেকেও পুরুষোত্তম বিশেষণে ভূষিত করে থাকতে ভালবাসত। এমনকি মোহবশত সে বাসুদেবের চিহ্নসমূহও সর্বদা ধারণ করে থাকত। 'পৌণ্ড্রক বাসুদেব' ছিলেন জরাসন্ধের অনুগত ও প্রাগজ্যোতিষপুরের অসুররাজ নরকের বন্ধু। কৃষ্ণ প্রাগজ্যোতিষপুরের অধিপতি দর্পী নরককে হত্যা করেছিলেন ও নরকের লালসালয় থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন ষোল হাজার রমণীকে। পুরাণকাররা কেউ কেউ হিসাবটাকে ষোল হাজার একশো বলেছেন। কালকূট বলছেন— "প্রাচীন ইতিবৃত্তে প্রক্ষিপ্ত কিছু থাকাটা আশ্চর্যের না, ইতিপূর্বে স্বয়ং সূত আমাকে এ কথা শুনিয়েছেন। তবে ষোল হাজারের সঙ্গে একশো জোড়া আর না জোড়াটা যাহা বাহান্ন তাহা তেপ্পান্নর মতোই মনে হয়।" *(পৃ: ৯৮৩, ঐ)* যাই হোক নরককে কৃষ্ণ হত্যা করেছিলেন বলে পৌণ্ড্রক বাসুদেব ক্ষেপে উঠেছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করার মত একটা বিষয় তাঁর চোখে ধরা পড়েছে, সেই তখন থেকেই যদুবংশের যশস্বী বার্ষ্ণেয়কে নিয়ে মোহের সঞ্চার হয়েছিল, তাই নামের অনুকরণ, আয়ুধ আর চিহ্নসমূহ ধারণের পাগলামি। লেখক কালকূট এই অনুকরণকে তাঁর আধুনিক দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন এবং অতীত-বর্তমানের মেলবন্ধন করেছেন। পৌণ্ড্রকের এই অনুকরণ ইতিবৃত্তীয় সত্য। এই সত্যকে তিনি দেখেছেন এইভাবে 'এখন দেখছি, কীর্তিমানদের অনুকরণ করার ইচ্ছা আর অভ্যাসটা নিতান্ত একালের না। রূপোলী পর্দার অমুক কুমারকে আপাদমস্তক নকল করার মতো স্পৃহা হাজার হাজার বছর আগেও ছিল। রকমফেরটা অবিশ্যিই মানতে হবে। আমাদের কালে রূপোলী পর্দার নায়ক নকলবাজরা নিজেদের সাচ্চা বলে চালাবার চেষ্টা করে না।" *(পৃ: ৯৮২, ঐ)*

পৌণ্ড্রক বাসুদেবের এই পাগলামি লেখক কালকূট নতুনভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি ইতিহাসের পাতা থেকে ধূলা উড়িয়ে পরতে পরতে লেখা থেকে তুলে এনেছেন এই সত্য যে কৃষ্ণ বিরোধিতাই তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্য সিদ্ধ করবার জন্য সে পাঞ্চাল রাজ্যে গিয়েছিল দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায়। সে খবর পেয়েছিল যে কৃষ্ণ আসছেন সেই সভায়, অতএব যেন তেন প্রকারেণ গণ্ডগোল পাকিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে লেগে যাওয়া তার উদ্দেশ্য ছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশী তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের জন্য। "অর্জুন যে মুহূর্তে পাঞ্চালীকে লাভ করে, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কামারশালায় গিয়ে উঠেছিলেন, কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বলরামকে সঙ্গে করে সেখানে

গিয়েছিলেন। প্রথম পরিচয়েই কুন্তীকে— তুমি আমার পিসিমা। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন আমার পিসতুতো ভাই।" *(পৃ: ৯৮৩, ঐ)* লাভবান হয়েছিলেন সেই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ জীবনে পান্ডবদের চোখে দেখেন নি কখনো। জতুগৃহে পাণ্ডবরা পুড়ে মারা যান নি, এইরকম একটা কানাঘুষো শুনেছিলেন। স্বয়ংবর সভায় তাঁর তীক্ষ্মদৃষ্টিই তাঁকে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়ে দিয়েছিল। পৌণ্ড্রক বাসুদেব জরাসন্ধের অনুগত হওয়া সত্ত্বেও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন ও উপস্থিত হয়েছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের ইচ্ছা কৃষ্ণই জাগিয়ে তুলেছিলেন। ইতিবৃত্তের পরতে পরতে ধূলা সরিয়ে পুরাণকালের ঘটনাবলীকে যেন প্রত্যক্ষ করতে করতে দ্বারাবতী পথ খুঁজছেন। সূতরূপী লেখক কালকূট তাই বলেছেন, "ইতিবৃত্তের প্রতিটি পংক্তিতে আমি দেখছি, লিখিত ভাষার গভীরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বাসুদেবের মহিমময় ভবিষ্যৎ কীর্তির ইঙ্গিত। মুখ ফুটে না বললেও যুধিষ্ঠিরের অন্তরে রায়সূয় যজ্ঞের বাসনা তিনিই জাগিয়েছিলেন। অতএব অনুমতি প্রার্থনা মাত্রই, যজ্ঞের সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে জরাসন্ধ বধ নিশ্চিত হতে হবে।" *(পৃ: ৯৮৩, ঐ)* লেখক চরিত্র কালকূট ইতিবৃত্তের পথ ধরে অতীত পরিক্রমায় এগিয়ে যাচ্ছেন দ্বারাবতীর দিকে। জবারাবতীর জ্ঞানী ও ধীর, মুকুটবিহীন সাম্রাজ্যের অধিপতি বাসুদেব মহাবল জরাসন্ধের ভয়ে যদুবংশের প্রধানগণকে নিয়ে সুদূর পশ্চিম সমুদ্রোপকূলে এক রমণীয় দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জরাসন্ধ কেমন শক্তিশালী ছিলেন আর সেই রমণীয় দ্বীপ কেমন ছিল সেটা কালীপ্রসন্ন সিংহর অনূদিত মহাভারত ১ম খণ্ডে ২৪৩ ও ২৪৪ পৃষ্ঠায় বিবৃত করা আছে। সেকালের পরাক্রান্ত রাজন্যবর্গ ও বীরগণ জরাসন্ধের আশ্রয় নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে যবনাধিপতি বৃদ্ধ ভগদত্ত, পশ্চিমভাগ ও দক্ষিণসীমার অধিপতি পুরুজিৎ, বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাতদেশের অধিপতি পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বিদ্যাবলসম্পন্ন ও শত্রুনিসূদন ভীষ্মক, মহাবল পরাক্রান্ত হংস ও ডিম্বক, চেদিরাজ শিশুপাল ইত্যাদি ইত্যাদি। তার মধ্যে হংস ও ডিম্বককে অস্ত্রের দ্বারা নিহত করা যাবে না। জরাসন্ধ্রর জামাতা ছিলেন মথুরাপতি কংস।

কংসকে কৃষ্ণ ও বলভদ্র বধ করেছিলেন। কৃষ্ণ রাজসূয় যজ্ঞাভিলাসী মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন "তাহাতে কংস ভয় নিবারিত হইল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরেই জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জ্ঞাতিবন্ধুগণের সহিত একত্র পরামর্শ করিলাম যে, যদি আমরা শত্রুনাশক মহাস্ত্র দ্বারা তিনশত বৎসর অবিশ্রাম জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না।" *(পৃ: ২৪৪, মহাভারত ১ম খণ্ড, বেদব্যাস বিরচিত কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত)* দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কৃষ্ণ ধারণা করে নিয়েছিলেন যে হংস, ডিম্বক ও জরাসন্ধ একত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে এঁদের সম্মুখ সমরে কখনও পরাজিত করা যাবে না। কিন্তু হংস ও ডিম্বক উভয়েই যমুনার জলে

প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। জরাসন্ধ তাঁর অনুগত দুই বীরপুরুষের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে নিজরাজ্য মগধে ফিরে যাওয়াতে কৃষ্ণসহ মথুরাবাসীরা কিছুদিন নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পেরেছিলেন। কিন্তু জরাসন্ধের কন্যাদ্বয় পিতার কাছে গিয়ে পতিহন্তাকে সংহার করতে অনুরোধ করে। এই খবর পেয়ে মথুরাবাসীরা কি করেছিল সেটা যদুপতি কৃষ্ণের মুখেই শোনা যাক। "আমরা পূর্বেই জরাসন্ধের বলবিক্রমের বিষয় স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম। তখন আমরা আমাদের বিপুল ধনসম্পত্তি বিভাগ করিয়া সকলে কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান করিব, এই স্থির করিয়া স্বস্থান পরিত্যাগপূর্বক পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম। ঐ পশ্চিমদেশে রৈবতোপশোভিত পরম রমণীয় কুশস্থলীনাম্নী পুরীতে বাস করিতেছি। তথায় এরূপ দুর্গসংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বৃষ্ণিবংশীয় মহারথিগণের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে।" *(পৃ: ২৪৪, মহাভারত ১ম খণ্ড, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত)* কালকূট সমকালের দৃষ্টিতে পুরাণকে বিশ্লেষণ করেছেন, পুরাণের সংকেত ও ইঙ্গিতগুলো যুক্তি দিয়ে বুঝে নিয়ে পুরাণ পথে চলেছেন। কৃষ্ণ মথুরানগরী ত্যাগের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। জরাসন্ধকে কিভাবে নিধন করা যায় সেই পরিকল্পনাটি তিনি তখন থেকেই করে রেখেছিলেন। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুমতি প্রার্থনা করতেই কৃষ্ণ জরাসন্ধ বধের পরিকল্পনাটি প্রয়োগ বা সদ্ব্যবহার করার সুযোগটি কাজে লাগিয়েছিলেন।

সূতরূপী লেখক কালকূট আরও বলেছেন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কেন এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি ইতিবৃত্তের সংকেত বুঝে নিয়ে এই পুণ্যভাবনায় উপনীত হয়েছেন যে মহাবল জরাসন্ধ কৃষ্ণ বধে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন। জরাসন্ধ তার কারাগারে ছিয়াশি জন রাজাকে বন্দী রেখেছিলেন। একশ পূরণের জন্য আর চৌদ্দজন বাকি ছিল তার এই চৌদ্দজন শত্রুর মধ্যে একজন ছিলেন মুকুটবিহীন সাম্রাজ্যের অধিকারী বৃষ্ণিসিংহ। জরাসন্ধ যে জামাই হত্যার প্রতিশোধ নেবেন এ বুদ্ধিমান কৃষ্ণের বুঝতে বাকি ছিল না, তাই তিনি মথুরা ত্যাগের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং জরাসন্ধ বধের পরিকল্পনাটি করেছিলেন। এবং তিনি কীভাবে তাঁর স্বীয় ইচ্ছা যুধিষ্ঠিরের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন তা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে এইভাবে দেখা যায়। "হে মহারাজ! যদি আপনার রাজসূয় করিবার মানস থাকে তবে অগ্রে জরাসন্ধ কর্তৃক বদ্ধ ভূপালগণকে মোচন ও দুরাত্মা জরাসন্ধের বধের নিমিত্ত যত্ন করুন, নচেৎ আপনি কোনক্রমে রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন না। হে কুরুনন্দন! আমার এই মত।" *(পৃ: ২৪৪, মহাভারত ১ম খণ্ড, বেদব্যাস বিরচিত কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত)* এই গ্রন্থেই আরও দেখা যায় যে, এই কথা শুনে রাজসূয় যজ্ঞে নিরুৎসাহী যুধিষ্ঠিরকে অর্জুন উৎসাহিত করেছিলেন এই কথা বলে যে যজ্ঞ করার উদ্দেশ্যে জরাসন্ধকে বিনাশ ও অন্যান্য ভূপতিগণকে কারাগার থেকে উদ্ধার করে আনা, এটিও একটি মহৎ কর্ম। যুদ্ধাদিচেষ্টা রহিত ব্যক্তিকে লোকে নির্গুণ জ্ঞান করে। কৃষ্ণ অতি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অর্জুনের মধ্যে সাম্রাজ্যলাভের জন্য

শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রাম করার ইচ্ছাটি জাগিয়ে দিয়েছিলেন। এবং এরপরেই অর্জুনের কথার সূত্র ধরেই কিভাবে জরাসন্ধকে পরাজিত ও বধ করতে হবে ধীরে ধীরে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে নিজমনে সযত্নে পরিকল্পিত পরিকল্পনাটি ব্যক্ত করেছিলেন।

'দ্বারাবতী' অভিমুখী কালকূটের মনে সংশয় জেগেছে। যদিও দ্বারাবতী যাওয়ার জন্য তার জরাসন্ধ বধ কাহিনীতে যাওয়ার দরকার নেই তথাপি তিনি তাঁর মনে উদয় হওয়া সংশায়িত জিজ্ঞাসার জন্য একটু জরাসন্ধ বধ কাহিনীতে দৃষ্টিপাত করেছেন। তাঁর ভাবনাকে পাঠকমনেও সঞ্চলিত করেছেন মহাসমরের বদলে। কৃসণ জরাসন্ধকে ভীমের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন না কি স্নাতকের বেশে ভীম-অর্জুনসহ মগধ রাজপ্রাসাদে ঢুকে গুপ্তহত্যা করেছিলেন? অত্যন্ত সূক্ষ্ম অর্ন্তদৃষ্টি মেলে ধরে তিনি বলেছেন 'না, প্রাচীন ইতিবৃত্তকে আমি এতোটা অপরিচ্ছন্ন বলে বিক্ষিপ্ত ভাবতে পারি না।' *(পৃ: ৯৮৪, কালকূট রচনা সমগ্র ২য় খণ্ড)* তার মনে সংহয় জেগেছিল এইজন্য যে জরাসন্ধ তার রাজপুরীতে কৃষ্ণকে হাতের কাছে পেয়েও কেন ছেড়ে দিয়েছিলেন? তাঁরা ছলনার আশ্রয় নিয়ে রাজপুরীতে ঢুকেছিলেন এবং পরে নিজেদের পরিচয় দিয়ে তাদের তিনজনের যেকোনো একজনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন। অতএব এই পর্যন্ত কালকূট চরিত্র যে পথে চলেছেন তাতে গুপ্তহত্যার হদিশ পাওয়া যায় নি। তিনি অতীতচারী হয়ে যেন দেখছেন দ্বন্দ্বযুদ্ধের সেই ভয়াবহ পরিণতি। তার চোখে জরাসন্ধকে সত্যবদ্ধ রাজা বলে মনে হয়েছে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিনি রাজী হয়েছিলেন, বীরের যা ধর্ম, তাই তিনি করেছিলেন। কৃষ্ণকে হাতের কাছে পেয়েও তিনি ভীমকেই বেছে নিয়েছিলেন। কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের ইংরেজি 'SRI MADBHAGVATAM' গ্রন্থের বাংলা সৎস্করণের অনুবাদক শ্রীমদভক্তিচারু স্বামীর শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ, অধ্যায় ৭২-এ বিষয়টি ব্যক্ত আছে।

জরাসন্ধ শুধু বীরপুরুষই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদের দানের প্রতি দৃঢ়সঙ্কল্প। অতিথিরা 'ব্রাহ্মণ নহি ক্ষত্রিয়' একথা বুঝতে পেরেও দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রত্যাশী অতিথিদের প্রার্থনা পূরণ করতে রাজি হয়েছিলেন। চিরশত্রু কৃষ্ণকে হাতের কাছে পেয়েও জরাসন্ধ কৃষ্ণ-এর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাজি হননি, কারণ জরাসন্ধের কাছে কৃষ্ণ ছিলেন ভীরু, তাঁর ভয়ে কৃষ্ণ মথুরাপুরী ছেড়ে সমুদ্রবেষ্টিত রৈবতক পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং অর্জুনকে তিনি তাঁর সমতুল্য বলে মনে করেন নি, কারণ অর্জুন তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট ও খুব শক্তিশালী নয়। জরাসন্ধ শক্তিমান বীরপুরুষ ছিলেন, তাই তিনি ভীমকেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন। লেখক কালকূট চরিত্র তার সংশয় দূর করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও এইরকমই বলা আছে। অতএব লেখকের সঙ্গেই সহমত হওয়া যেতে পারে। গুপ্তহত্যা নয়, দ্বন্দ্বযুদ্ধ। স্বল্পপরিসরে কালকূট চরিত্র জরাসন্ধের মানসিক ধীরতাকে প্রকাশ করেছেন। তিনি মূল কাহিনীতে প্রবেশের পূর্বে অর্থাৎ দ্বারাবতী প্রবেশের আগে বাসুদেব

সম্পর্কে জেনে নিয়েছেন। সূতরূপী কালকূট লেখক চরিত্র কালকূটকে এই তথ্য দিয়েছেন কালের পুঁথির বিস্তর ধূলো ঘাটাঘাটি করে। কালকূট একালের দৃষ্টিতে সেকালকে দেখেছেন। তিনি বলেছেন দ্বন্দ্বযুদ্ধের রীতিটা শুধু সাহেবদের মধ্যেই ছিল না, সেকালেও ছিল।

লেখক চরিত্র প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন কৃষ্ণ কি জানতেন জরাসন্ধ প্রথমে ভীমকেই আহ্বান করবেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে। কৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে লড়বার অবকাশ তিনি আর পাননি। 'ভীমই প্রথম এবং শেষ' প্রতিদ্বন্দ্বী, তার হাতেই জরাসন্ধ নিহত হয়েছিলেন। জরাসন্ধ বধের জন্য কৃষ্ণ তার কূটকৌশলকে কাজে লাগিয়েছিলেন। তাই লেখক বাসুদেবকে বলেছেন যে তিনি তুলনাহীন। তিনি এইভাবে বলেছেন "সব দেখছি, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভা, পাণ্ডবগণের পরিচয় লাভ, তোমার দূরদৃষ্টি, তোমার মাহাত্ম্যকেই বৃদ্ধি করেছিল। শত্রুকে তো নিধন করাই শ্রেয়ঃ।" *(পৃ: ৯৮৮, কালকূট রচনা সমগ্র, ২য় খণ্ড)* লেখক চরিত্র কালকূটের পুরাণ অনুসরণে দ্বারাবতীর পথ খুঁজতে খুঁজতে দূরকালের মগধরাজ্যে গমন করেছিলেন। মুকুটবিহীন সাম্রাজ্যের অধিপতি বৃষ্ণিসিংহের কূটকৌশলের ফলেই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সূচনা হয়েছিল। তিনি অতীতচারী হয়ে বৃষ্ণিসিংহের মনোজগতে প্রবেশ করেছেন। তিনি যেন দেখছেন সেই সভায় 'পৌণ্ড্রক বাসুদেব' সহ কৃষ্ণবিদ্বেষী রাজা-মহারাজা সকলেই উপস্থিত হয়েছেন একটা গোলমাল পাকানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু কৃষ্ণর মনোলোকে কী আছে? সেটাও তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, যুধিষ্ঠির পূজা ও পাদ্যঅর্ঘ্য তাঁকেই দেবেন অতএব একটা গোলমালের শঙ্কা তিনি আগেই করেছিলেন। সেই আশঙ্কায় তিনি যজ্ঞস্থল রক্ষা করার জন্য শৃঙ্গ দিয়ে তৈরি ধনুক, যার নাম শাঙ্গপানি ও গদাচক্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর শঙ্কা অমূলক ছিল না। সভামধ্যে 'পূজা' পাবার সম্মাননীয় পদটির জন্য কৃষ্ণের নাম ভীষ্ম প্রস্তাব করেছিলেন। এই অগ্রপূজার প্রস্তাবটি সভাস্থ সকলে মেনে নিতে পারেন নি, কৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকে পূজা করার সম্মান দেওয়ায় শিশুপাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বয়স্ক জ্ঞানীদের কঠোরভাবে তিরস্কার করেছিলেন এবং কৃষ্ণ পূজা শেষ হতেই যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ পণ্ড হয়েছে এটা দেখানোর জন্য বা প্রমাণ করবার জন্য শিশুপাল কৃষ্ণনিন্দা করতে শুরু করেছিলেন। কৃষ্ণ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেও তখনই তাঁর ওপরে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন নি। অত্যন্ত মৃদুস্বরে পাণ্ডবদের সামনে উপস্থিত রাজন্যবর্গকে শিশুপালের পূর্ব অপরাধের কাহিনীগুলো বলতে শুরু করেছিলেন। তার সব থেকে বড় অপরাধ ছিল যাদবদের অনিষ্ট সাধন; কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে দ্বারকাপুরী পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু শিশুপালের মা ছিলেন কৃষ্ণের পিতৃষ্বসা বা পিসিমা, তাঁরই অনুরোধে কৃষ্ণ শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহে শিশুপালের শত অপরাধ পূর্ণ হওয়ায় কৃষ্ণ নিজের তীক্ষ্ণধার চক্র দ্বারা শিশুপালের মস্তকটি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। 'পৌণ্ড্রক বাসুদেবে'র কথা বলতে গিয়েই লেখক চরিত্র অতীতচারী হয়ে মগধরাজ্য হয়ে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসভায় উপস্থিত হয়ে যেন

সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি শিশুপালেরও মনোবিশ্লেষণ করেছেন। কৃষ্ণের দূরদৃষ্টিই যথার্থ। কৃষ্ণবিদ্বেষী অন্যান্য মহীপালদের প্ররোচনায়, ক্রোধে, অহংকারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তার মতো মহীপতি থাকতে কৃষ্ণ কেন পূজা পাবেন? আর কৃষ্ণর মনোজগৎ? তিনি আগেই প্রস্তুত তাঁর সকল আয়ুধ নিয়ে। শুধু তাই নয় অত্যন্ত সুকৌশলে কীভাবে তিনি ঘটনার মোকাবিলা করেছিলেন সেটা আগেই বিবৃত করা হয়েছে। অতএব যে আশায় পৌণ্ড্রক বাসুদেব রাজসূয় যজ্ঞে গিয়েছিলেন সে উদ্দেশ্য সেবারও সফল হয়নি, কিন্তু হাল ছাড়েন নি। তিনি নিজেকে বিশ্বের কাছে প্রমাণ করতে চান, "পুরুষোত্তম বাসুদেব বলে।" অপরকে নকল করতে 'নকল বাসুদেব' ভালবাসতেন, তাই একদিন শিশুপালের মতই কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে দ্বারকাপুরী আক্রমণ করেছিলেন তাঁরই মত কিছু কৃষ্ণবিদ্বেষীকে নিয়ে। সারারাত্রি ধরে যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল। কৃষ্ণ এসে পড়েছিলেন রাত পোহাতেই। 'নকল বাসুদেব' এবার আর রেহাই পেলেন না। তিনি কৃষ্ণের হাতেই নিহত হয়েছিলেন।

কালকূট চরিত্রের মনভ্রমণের দৃষ্টিপথে 'আসল' বাসুদেবের দ্বারাবতীর পথ বারে বারেই হারিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু পথের হদিশ তাঁর জানা চাই। সূতের মুখে শুনে তিনি পথ পরিক্রমা শুরু করেছিলেন স্বয়ম্ভু মনুকাল থেকে রচিত ইতিবৃত্তের বর্ণনা থেকে। গাণিতিক ব্যাখ্যা করে কাল গণনা করেছেন এইভাবে, ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ধরলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল এক হাজার চারশ ষোল খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এই হিসাবে বলা যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় কৃষ্ণের বয়স বিয়াল্লিশ বছর ছিল। আদি কালবিন্দু থেকে একে একটি যুগ বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি তীক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ইতিহাসের বিচারক শ্রীমদ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষাও করেন নি। তাঁর সিদ্ধান্তে এই উনিশশো আটাত্তর খ্রীষ্টাব্দ থেকে ধরলে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল, ৫০৭৮ বছর আগে। "তাঁর মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে যুধিষ্ঠিরের বয়স ৭২, অর্জুন ৭০, নকুল সহদেব ৬৯। কৃষ্ণকে যদি অর্জুনের সমবয়সী ভাবা যায় বা অন্যমতে এক বছরের কনিষ্ঠ, তা হলে সেই সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তর অথবা উনসত্তর।" *(পৃ: ৯৮৫, ঐ)* সূতরূপী কালকূট ইতিবৃত্তের আশ্রয় নিয়ে সন্দেহ ও তর্ককে সযত্নে এড়িয়ে চলেছেন। ইতিবৃত্তীয় লক্ষণে দেখা যায় যে কৃষ্ণের জন্মকালে দ্বাপরের অংশে ক্ষয় ধরেছে। কৃষ্ণের জীবিতকালের মধ্যেই কলির যাবতীয় লক্ষণগুলো প্রকটিত হতে শুরু করেছিল। বেদব্যাস তাঁর মা সত্যবতীকে বলেছিলেন যে যুগক্ষয়ের সমস্ত লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অমঙ্গলের ছায়া সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, ঘোর দুর্দিন আসন্ন। "মানুষের বিশেষত সন্ধ্যবংশীয় রাজপুরুষের চরিত্র নষ্ট হতে বসেছে। জ্ঞাতিগণ পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। এ সবই ধ্বংসের লক্ষণ।" *(পৃ: ৯৮৫, ঐ)* সেই সুদূর অতীতের অনুসন্ধানী সূতরূপী কালকূট বলেছেন, "যদি মনে করি দ্বাপরের অংশক্ষয়কালে, কৃষ্ণই দ্বাপরের শেষ পুরুষ, তবে তাঁর আলোর বৃত্তেই যাত্রা

করি। সেই আলোর বৃত্তের ঠিকানা দ্বারাবতী।" *(পৃ: ৯৮৫, ঐ)* দ্বারাবতীর পথে এগিয়ে চলতে চলতে মথুরা থেকে পশ্চিমসমুদ্রোপকূলে চলেছেন। কিন্তু কালকূটের মনে সন্দেহ উপস্থিত। রৈবতক পর্বতের উপরে বাসুদেবের নির্বাচিত দেশটি এখন কোথায়? কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের জুনাগড় রাজ্যের জুনাগড় শহরটি? না কি গির্ণারের পর্বতমালাই রৈবতক? "রৈবতক পাহাড়ের ওপরে কুশস্থলী নামে যে সুদৃঢ় পুরী তৈরি করিয়েছিলেন সে স্থান কি আজকের গুজরাটের দ্বারকা?" *(পৃ: ৯৮৫, ঐ)* কালকূট সূতরূপী লেখক পুরাণের সংকেত থেকেই এই সন্দেহ দূর করেছেন এবং একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। "পুরাণকারেরা প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প, নদীসমূহের গতি পরিবর্তন ইত্যাদি সবই প্রত্যক্ষ করেছেন। এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে, এ তো আমরা একালেও কম দেখলাম না। তা প্রলয়ঙ্কর না হতে পারে, কালে কালে অতি ধীরে ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। এ অভিজ্ঞতা প্রাচীন ইতিবৃত্তের সঙ্গে আজকের ভৌগোলিক স্থানগুলোর প্রভেদেই আমরা পেয়েছি।" *(পৃ: ৯৮৫, ঐ)*

তাঁর মনে হয়েছে ঋষিগণ অগ্নুৎপাত দেখেই এই কল্পনা করেছিলেন, অনন্ত তাহলে ভূগর্ভস্থ অগ্নি। ঋষিদের মতে এই অগ্নিজাত শক্তিই পৃথিবীর উপরিভাগস্থ কঠিন স্তর ধারণ করে আছে। ভূগর্ভস্থ সেই আগুনের হাজার জিহ্বার সঙ্কোচন প্রসারণেই ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির উৎপাত হয়। বাসুকীনাগের কল্পনার সঙ্গে এর কোনো অমিল নেই। আগ্নেয়গিরি থেকে যে ভস্মরাশি ছড়িয়ে যায়, তাকেই বলা হয়েছে সুবাসিত হরিদ্রা বা কপিলবর্ণের হরিচন্দনের রেণু। ইতিবৃত্তের উপলক্ষণগুলোর সংকেত বুঝে তিনি বলেছেন "ভূকম্প আর অগ্ন্যুৎপাতের আনুষঙ্গিক বজ্রধ্বনিকে সঙ্কর্ষণের স্বস্তিক চিহ্নের দ্বারা উপলক্ষিত হয়েছে। মাটি ফেটে চৌচির হওয়া ধ্বংসকে, লাঙল আর মুষলের ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা।" *(পৃ: ৯৮৫, ঐ)*তিনি আরও লক্ষ্য করে একটা স্পষ্ট মত প্রকাশ করেছেন, "যাহাকে আরাধনা করিয়া পুরাণর্ষি গর্গ জ্যোতিঃতত্ত্ব আর সকল নিমিত্ততত্ত্ব অবগত হয়েছিলেন; সেই গর্গই ছিলেন ভূকম্পবিৎ।" *(পৃ: ৯৮৫-৯৮৬, ঐ)* প্রকৃতিকে জয় করেছিলেন ভূকম্পবিদ গর্গ। পুরাণের ব্যক্ত করার ভঙ্গি ও ভাষা আলাদা। বিজ্ঞানী প্রকৃতিকে জয় করেছিলেন কিন্তু সেই বিজ্ঞানীকে পুরাণে অবতার কল্পনা করা হয়েছে। পুরাণ বলছে যে, বলরামও সর্বদাই ঘূর্ণিত লোচন মদোন্মত্ত থাকতেন, ক্রোধে হুংকার দিতেন বলে তাঁর বিক্রমকে সবাই ভয় করতেন। কালকূট চরিত্র দ্বারকার পথে চলেছেন কৃষ্ণের আলোয় পথ চলতে। তিনি যেন পুরাণকালের বহুঘটনাকে প্রত্যক্ষ করে রথী-মহারথীদের ছায়ায় ছায়ায় পথ চলেছেন। এবার সেই পথে তিনি কৃষ্ণভ্রাতা বলভদ্রর সম্মুখীন। বলভদ্র বৃন্দাবনে মদিরাপানে বিহ্বল ও ঘর্মাক্ত হয়ে স্নান করার জন্য যমুনা নদীকে তাঁর কাছে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু যমুনা বলভদ্রের কথা না শুনে আপন মনে নিজ প্রবাহে বয়ে চলেছিল। এই ঘটনায় বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে লাঙল দিয়ে যমুনাকে আকর্ষণ করে

বলেছিলেন "রে পাপি, আসবে না? এবার যাও দেখি, কেমন যেতে পারো? যমুনা আসতে বাধ্য হলেন।" *(পৃ: ৯৮৬, ঐ)* এ ঘটনাকে লেখক কালকূট বলেছেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে যমুনা দিক পরিবর্তন করেছিল। অর্থাৎ ভূমিকম্পের ফলে যমুনার দিক পরিবর্তন হয়েছিল ও সেকালের বৃন্দাবন নদীগর্ভে মিলিয়ে গিয়েছিল। অতীতচারী লেখক চরিত্র পুরাণের উপলক্ষণগুলোর সংকেত বুঝে নিয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন। এখন আমরা যমুনার ধারে মথুরার কাছে যে বৃন্দাবন দেখি এ বৃন্দাবন সেই বৃন্দাবন নয়। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেছেন "কংসদূত অক্রুরের সঙ্গে কৃষ্ণ আর বলরাম যে বৃন্দাবন ও মথুরায় গিয়েছিলেন তার ইতিবৃত্তীয় বর্ণনা অন্য এক ভৌগোলিক চিত্রের পরিচয় দেয়। বিমল প্রভাতে, অক্রুরের সঙ্গে কৃষ্ণ আর বলরাম অতি বেগবান অশ্বসমূহযুক্ত রথারোহণে যাত্রা করলেন! মধ্যাহ্নে এসে উপস্থিত হলেন যমুনার ধারে। সেখানে স্নানাদি সেরে আবার রথে উঠলেন। অক্রুর বায়ুবেগবান অশ্বগণকে অতি দ্রুত চালিয়ে অতি সায়াহ্ন অতীত হলে মথুরায় পৌঁছেছিলেন।" *(পৃ: ৯৮৬, ঐ)*

মোটামুটি ভোর থেকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, এই দীর্ঘ সময়, দীর্ঘ পথ তারা অতিক্রম করেছিলেন। বৃন্দাবন থেকে যমুনা ও যমুনা থেকে মথুরা, প্রায় আশী মাইল দূরত্ব। আরো একটা কথা এখানে অনিবার্যভাবেই পাঠকও লেখকের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন যে, নৌ-ব্যবস্থা ভাল ছিল। অশ্বযুক্ত রথসমূহ নিশ্চয়ই নৌকাযোগে পারাপার করার ব্যবস্থা ছিল। লেখক চরিত্র মনভ্রমণে যত দ্বারাবতীর পথের হদিশ করতে করতে ইতিবৃত্তীয় উপলক্ষণগুলোর সংকেতের আড়ালে কী কী বৈজ্ঞানিক সত্য, ভৌগোলিক অবস্থায় ও পরিবর্তন প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে সেগুলোর সঙ্গে নিজে জ্ঞানলাভ করে পাঠককূলকেও সমৃদ্ধ করেছেন। "নৌচালনাপটু কথাটা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। মনে রেখো।" সূতরূপী কালকূট 'মথুরাবাসী'রা যে নৌচালনায় পটু একথা বারে বারে মনে করিয়ে দিচ্ছেন পুরাণের কোনো উপলক্ষণকে বোঝানোর জন্য। শ্রীমদ্ভাগবতে ও বৃন্দাবন থেকে মথুরার দূরত্বের যে চিত্র পাই তাও তাতেও দেখা যায় —

স্ত্রীণামেবং রুদন্তীনামুদিতে সবিতর্যথ।
অক্রূরশ্চোদয়ামাস কৃতমৈত্রাদিকো রথম্ ।। ৩২।।

শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধ ১০, অধ্যায় ৪

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে আরও দেখা যায় যে, অক্রুর বায়ুবেগে ভ্রমণ করতে করতে যমুনার তীরে তিনি রথ থামিয়েছিলেন যাতে কৃষ্ণ বলরাম আচমনক্রিয়া অনুষ্ঠান ও জলপান করতে পারেন। অক্রূর এই সময়ে জলমধ্যে চতুর্ভুজ বাসুদেবকে দর্শন করেছিলেন। এরপরে মথুরার দিকে রথ চালিয়ে অপরাহ্নে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে তিনি মথুরায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

বলরামকে সঙ্কর্ষণের অবতার রূপে কল্পনাটা পরবর্তীকালে পুরাণকাররা বলরামের প্রকৃতি

আচরণ আর বীরত্বের সঙ্গে একটা তুলনা দিয়েছিলেন। ওটাই ওঁদের বৈশিষ্ট্য। দ্বারাবতীর পথের হদিস করতে গিয়ে কালকূট চরিত্র আর একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা বলেছেন। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়টাও ছিল বলরাম কেন্দ্রিক। কালকূট যাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য বাসুদেব অঙ্গনে চলেছেন সেই 'শাম্ব'কে নিয়েই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল। এই শাম্ব ছিলেন কৃষ্ণের পুত্র জাম্ববতী তনয়। তিনি দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। তাই বীর শাম্ব স্বয়ম্বর অনুষ্ঠান থেকে বলপূর্বক লক্ষ্মণাকে অপহরণ করেছিলেন। কর্ণ, দুর্যোধন, আরো অনেক কুরুবীরেরা শাম্বকে যুদ্ধে পর্যুদস্ত করে পরাজিত করে বন্দী করেছিলেন। বলভদ্র নিজে শাম্বকে ফিরিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু দুর্যোধন রাজী না হয়ে তাঁকে নানা কটু কথা শুনিয়ে অপমান করেছিলেন বলে হলায়ুধ ক্রোধে মত্ত ও আঘূর্ণিত হয়ে পায়ের গোড়ালি দিয়ে বসুধা বিদারিত করেছিলেন। "তিনি মদলোলাকুলকণ্ঠে বললেন কুরুকুলাধীনা হস্তিনানগরীকে, কুরুগণসহ উৎপাটিত করে ভাগীরথী মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবো। বলে মুষলায়ুধ বলরাম কর্ষণার্বোমুখ লাঙ্গল হস্তিনাপুরীর প্রাকারে বিঁধিয়ে টান দিলেন।" সহসা হস্তিনানগর ঘূর্ণিত হতে দেখে ভীত সন্ত্রস্ত কৌরবগণ বলভদ্রকে শান্ত করার জন্য তৎক্ষণাৎ সাম্ব ও লক্ষ্মণাকে নিয়ে এসে তাঁদের সামনে উপস্থিত করলেন। "সেই থেকে হস্তিনা নগরীকে যারাই দেখেছেন, দেখেছেন গোটা নগরীটি যেন মোচড়ানো। ঈঙ্গিত একটাই, সেই ভূমিকম্প! যদুবীর বলরামকে সেই কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে গ্রথিত করা।" *(পৃ: ৯৮৮, ঐ)* বর্তমানের পটভূমিকায় লেখক কালকূট চরিত্র সেকালের ঘটনাবলীকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখে যুক্তি দিয়ে কারণ নির্দেশ করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা বলতে গিয়ে বলভদ্রের কথা এসে পড়ছে। সেই বৃন্দাবন যমুনাগর্ভে এবং বলভদ্র যে হস্তিনানগরীকে ভাগীরথীতে ছুঁড়ে ফেলার ভয় দেখিয়েছিলেন, সে-ই হস্তিনানগরী যুধিষ্ঠিরের সাতপুরুষ পরের রাজা নিচস্তর রাজ্যকালে হস্তিনাপুরী গঙ্গাগর্ভেই চলে যায়। লেখক কালকূটের সঙ্গে সহমত হওয়া যেতে পারে। বর্তমানে যমুনার দিকে ঢালু হয়ে পড়া হস্তিনাপুর অঞ্চলটি বর্ষায় এখনও প্লাবিত হয় এবং সেইসঙ্গে বহুকাল পূর্বে বলরামের হস্তিনাপুর আকর্ষণের কাহিনীটি মনের ভিতর উঁকি দেয়।

দুটো ঘটনার সঙ্গে বলভদ্রকে পুরাণকাররা জুড়ে দিয়েছিলেন। পুরাণকারদের এটাই তো বৈশিষ্ট্য এ'কথা লেখক স্পষ্ট করে নির্দেশ করেছেন। পুরাণকাররা এই দুটো ঘটনাকে ভগবান বলভদ্রের চেহারা, চরিত্র ও বীরত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। 'দ্বারাবতী'র যাত্রাপথের হদিশ করতে করতে কালকূট দ্বারাবতীর প্রায় কাছেই চলে এসেছেন। কালকূট শাম্বের আকর্ষণে দ্বারাবতীর পথে মানসভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। পুরাণের সেই বীরপুরুষকে খুঁজতে তিনি আধুনিককালের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ইতিবৃত্তের পথে হালের মানচিত্র খুলে বর্তমানের দ্বারকার একটি পথনির্দেশ দেখে নিয়েছেন। রেলপথ বা আধুনিক রাস্তায় নয়, মথুরা থেকে দ্বারকা একেবারে সোজা দক্ষিণ-

পশ্চিমে নেমে যাওয়া। পাহাড়-পর্বত-নদনদীর উপর দিয়ে সরলরেখা টেনে দেখেছেন সাড়ে ছ'শো মাইলের মত দূরত্ব। বর্তমানের এই দ্বারকাকে পুরাণের সেই দ্বারকা বলা যাবে না। কৃষ্ণের দ্বারকাকে প্রাচীন বৃন্দাবনের মতোই খুঁজে নিতে হবে পশ্চিম সাগরের জলের তলদেশে। আসল রৈবতক কচ্ছের কাছাকাছি কোথাও কোথাও হয়তো কিঞ্চিৎ সাগরের উপরে মাথা তুলে রয়েছে। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয় অর্থাৎ প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প। সিন্ধুদেশে অনেকবার প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়ে গেছে এ'কথা পুরাণকাররা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মহর্ষি উতংক বলেছিলেন, সংবৎসরান্তে ধুন্ধু অত্যাচার করে। এই ধুন্ধু ছিলেন বলরামেরও আগের অবতার। মহর্ষি উতংকের আশ্রম ছিল সিন্ধুদেশে। মহর্ষি উতংক তাঁর আশ্রমের কাছে একটি গুপ্ত বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ অগ্নিময় স্থান দেখেছিলেন। সেই স্থান থেকে আগুন, বালি, ভস্ম, পাথর, ধোঁয়া হয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মহীতল কাঁপিয়ে দিত। উতংকের কথায় সেই সময়ের রাজা কুবলায়শ্ব (৩৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) একুশ হাজার লোক দিয়ে সেই ভূকম্পন পীড়িত কেন্দ্রটিকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সকলেই মারা যায়।

লেখক কালকূট চরিত্রকে অনুসরণ করে দেখা যাক্, তিনি দ্বারাবতীর খোঁজে পশ্চিমসাগরের কাছে উপস্থিত। "তাঁর দৃষ্টিতে আধুনিককালের আঠারোশো ঊনিশ খৃষ্টাব্দে দেখছি কচ্ছপ্রদেশের দু'হাজার বর্গমাইল সমুদ্রের গর্ভে চলে গিয়েছিল, আর প্রায় পঞ্চাশ হাজার মাইল লম্বা, দশ মাইল চওড়া ভূমি নতুন করে জেগে উঠেছিল। কচ্ছের রান্ বা রন্ বলে বিশাল এক জলাভূমি রয়েছে। রান্ বা রন্ গুজরাতী ভাষার একটি শব্দ। যার অর্থ নোনা জলময় অস্বাস্থ্যকর স্থান।" *(পৃ: ৯৮৭, কালকূট রচনা সমগ্র, ২য় খণ্ড)* এই ভৌগোলিক পরিবর্তনটিও লক্ষণীয় কারণ কালকূট চরিত্র বলছেন "আমার যাত্রাটা একেবারেই অত্যাধুনিককালে। কৃষ্ণ এবং যাদবগণের প্রতিষ্ঠিত দ্বারকাপুরী সঠিক স্থান নির্ণয়ে এই ঘটনাটি আমার যাত্রাপথকে সুদৃঢ় করেছে। কিন্তু আধুনিককালের এই দু'হাজার বর্গমাইল সমুদ্রের গর্ভে চলে যাওয়ার অনেক আগেই নিশ্চয়ই প্রাচীন দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে ডুবেছিল। সিন্ধু এবং কচ্ছপ্রদেশের এইসব অঞ্চল প্রায়ই প্রলয়ে ওঠা নামা করেছে, এটা বোঝা যায়। তবে কৃষ্ণ জীবিত থাকতে তাঁর দ্বারকা এবং রৈবতক পর্বতের উপর সুদৃঢ় কুশস্থলীপুরী সমুদ্রগর্ভে যায়নি। গেলে পুরাণকারদের লেখনীতে তা নিশ্চয়ই পাওয়া যেত।" *(পৃ: ৯৮৭, ঐ)* তিনি সমকালের দৃষ্টিতে অতীতের দ্বারকার পথ খুঁজে নিয়েছেন। তার এই ধারণার সঙ্গে সহমত হতে পারা যেতেই পারে। কেননা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত মহাভারতের 'মৌসলপর্ব'-এ দেখা যায় — "দ্বারকাবাসী লোকসমুদয় নগর হইতে নির্গত হইলে পর মহাত্মা অর্জুন উহাদের সহিত বিবিধ রত্নপরিপূর্ণ নগরের যে যে অংশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন সেই সেই অংশে অচিরাৎ সমুদ্রজলে প্লাবিত হইতে লাগিল।" *(পৃ: ১১৭৩, মহাভারত ২য় খণ্ড, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত)*

শ্রীমদ্ভাগবতেও এই তথ্য পাওয়া যায়।

"দ্বারকাং হরিণাং ত্যক্তত্বং সমুদ্রোহপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্ ।।২৩।।"

(শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্ধ ১১, অধ্যায় ৩১ *)

"হে রাজন, পরম পুরুষোত্তম ভগবান যেই মাত্র দ্বারকা পরিত্যাগ করলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর নিবাসস্থান প্রাসাদটি ব্যতীত সমস্ত দিক সমুদ্রের জলে প্লাবিত হয়।" (শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্ধ ১১, অধ্যায় ৩১ *) দ্বারকানগরী প্লাবিত হওয়ার আগে দ্বারকা নগরী পরিত্যক্ত হয়েছিল। দ্বারকানগরীর নিদর্শন পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় লেখক কালকূট চরিত্র বলেছেন সেই নগরীকে খুঁজে নিতে হবে পশ্চিমসাগরের জলের তলদেশে। তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবে দ্বারকানগরীর ডুবে যাওয়ার কারণ নির্দেশ করেছেন। কেন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় নি তার স্বপক্ষে নিজ মত ব্যক্ত করেছেন। পাঠককুলও তাঁর এই বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনাকে মেনে নিয়েই লেখক চরিত্র কালকূটের সঙ্গে দ্বারাবতীর সন্ধানে মনে মনে যাত্রা করেন। পুরাণের যে হিসাব থেকে কৃষ্ণের জন্মকাল, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল বের করেছেন সেই হিসাব থেকেই তিনি বলেছেন যে, বাসুদেব একশো পাঁচ বছর বেঁচেছিলেন। পুরাণের এই মতটিকেই মেনে নিয়ে কালকূট অগ্রসর হয়েছেন। এই একশো পাঁচ বছরে জীবনের একেবারে শেষদিকে বাসুদেব যাদবদের আচরণে অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। জ্ঞাতিদের অর্ধেক সম্পত্তি দান করে তাদেরই অনুগ্রহে দাসের মতো জীবনধারণ করেছিলেন। সত্যবাদিতা, বিত্তশালী হয়েও অহংকার না করা, বৃদ্ধদের আজ্ঞা পালন করা, বিপদের সময়ে সমর্থ ব্যক্তিদেরও উদ্ধার করা, জ্ঞাতিদের অবজ্ঞা না করা ইত্যাদি যে মানবিক গুণগুলোর জন্য যাদবদের জগৎজোড়া খ্যাতি ছিল, সেগুলো ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়েছিল। নিজেদের আত্মকলহে তারা ধংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। মথুরা ত্যাগের পঁচাত্তর বছরের মধ্যেই তাঁরা ধংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। দ্বারকানগরী পরিত্যক্ত হয়েছিল। অবশিষ্ট যাদবেরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। পুরাণকারদের বর্ণনা থেকে তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি মেলে ধরেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আসন্ন প্রলয় সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তারই নির্দেশে তাঁর দেহাবসানের পরে অবশিষ্ট বৃদ্ধ, রমণীগণ ও বালকগণকে নিয়ে অর্জুন দ্বারকানগরী ত্যাগ করেছিলেন। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কৃষ্ণের অনুমান নির্ভুল ছিল। কৃষ্ণের দ্বারকা সমুদ্রের মাঝখানে মূল ভূখণ্ড থেকে বেশ দূরে রমণীয় কোনো দ্বীপে ছিল, তাই মহাবল জরাসন্ধ ঐ অগম্য দ্বীপে আক্রমণ করতে যেতে পারেন নি। দ্বারকায় যাতায়াতের একমাত্র যোগসূত্র ছিল নৌযান। মথুরাবাসীরা নৌচালনায় পটু এই কথাটা এইজন্যই তিনি বার বার মনে রাখতে বলেছিলেন। "অশ্বসমূহযুক্ত রথসমূহ নিয়ে যে কোনো সময়েই মূল ভূখণ্ডে পৌঁছে দেবার জন্য নৌবাহিনী তৈরি থাকতো।" *(পৃ: ৯৮৭, কালকূট রচনা সমগ্র, ২য় খণ্ড)*

বিস্তর খোঁজাখুঁজি, তিনি কালকূট দ্বারকাকে খুঁজে পেয়েছেন; বহু বছরের জমে থাকা ধুলো সরিয়ে তিনি অতীতের দ্বারাবতী অর্থাৎ বাসুদেব অঙ্গনে পৌঁছে গেছেন। শাম্বর অভিশপ্ত হওয়ার সেই স্থান ও সময়কে প্রত্যক্ষ করতে চাইছেন। কাহিনীর শুরুতেই কালকূট চরিত্র নারদ সম্পর্কে একটা পরিচিতি দিয়ে রেখেছেন। "নারদ মুনি দ্বারকায় চলেছেন। পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে, প্রভাসতীর্থেই ভ্রমণে এসেছিলেন। এত কাছে এসে দ্বারকায় গিয়ে একবার যাদবদের সঙ্গে দেখা না করে ফিরে যাওয়াটা তাঁর যথার্থ মনে হলো না।" *(পৃ: ৯৮৭, ঐ)* কালকূটের অনুসন্ধানী মনও চলেছে দ্বারকার দিকে। নারদ মুনি চলেছেন ঢেঁকি সদৃশ রথে; সঙ্গে আছেন তাঁর কয়েকজন শিষ্য, যারা তাঁর জ্ঞানমুগ্ধ। তিনি বুঝতে পেরেছেন — "ইনিই সেই নারদ। ইনিই যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতি, অর্থনীতি, ভেদনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতি সমূহ বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। ইনি সমগ্র বর্ষগুলো পরিভ্রমণ করেছেন।" *(পৃ: ৯৮৭, ঐ)* ফলে দেবতা-অসুর-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ-সর্প-এর জীবনধারণ প্রণালী দেখেছেন। এইসব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য রাজা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের উপদেশ দিতে পারতেন কেবল যুদ্ধ ছাড়া। যুদ্ধবিদ্যা না জানলেও শত্রু দমনের কূটকৌশল, নগররক্ষা, গুপ্তচরদের বিষয়ে তীক্ষ্ম নজরদারি, গৃহে-অন্তঃপুরের আচরণবিধি ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। আর ছিল ন্যায়-অন্যায় বিষয়ে তীক্ষ অন্তর্দৃষ্টি। তাঁর কাছে যা অনাচরণীয় বা অন্যায় বলে মনে হোত তা তিনি বিহিত না করে ছাড়তেন না। এইজন্যই মহর্ষি নারদ সম্পর্কে সকলের মনেই একটা ভয়ের ভাব ছিল। মহর্ষি নারদ বেশ প্রসন্নমনেই দ্বারকার পথে চলেছেন। প্রভাসতীর্থে গিয়ে যাদবদের গূঢ়পুরুষদের আচার-আচরণ ও ভক্তি পরায়ণতায় তিনি আপ্লুত। বাইরের শত্রুদের দ্বারা আক্রমণের ভয় না থাকলেও গুপ্তচরেরা সদা সতর্ক, তাঁরা মহর্ষিকে চিনতে পেরে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিল। যাদবদের দ্রুতগামী নৌযানে মহর্ষিকে তাঁর শকটসহ দ্বারাবতীতে পৌঁছে দিয়েই নৌচালকেরা তীরবর্তী যাদবদের অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে "তাঁর আগমনবার্তা জানিয়ে দিল।"

মথুরাবাসীরা যে নৌচালনায় পটু একথা মহর্ষিকে অনুসরণ করতে গিয়েই লেখক বুঝতে পেরেছেন। অতিথিপরায়ণ যাদবেরা নৌকারোহণ থেকে কিভাবে আপ্যায়িত করেছেন মহর্ষিকে সেটা একটু কালকূটকে অনুসরণ করলেই বুঝতে পারা যাবে। — "মহর্ষি তীরে পা দিতে না দিতেই, ভোজক, অন্ধক ও বৃষ্ণি শাখার যাদবদের গৃহে গৃহে সাড়া পড়ে গেল।" *(পৃ: ৯৮৮, ঐ)* পার্বত্য নগর প্রাকারের এবং প্রবেশদ্বারের রক্ষীরা প্রথমেই আভূমি প্রণাম করে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিল। তিনি আসা মানেই, নানা দেশের নানা সংবাদ জানা, বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা। মহর্ষি দ্বারাবতীতে এসেছেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় দশ বছর পরে, যখন কৃষ্ণের বয়স বাহান্ন বা সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয়ের বিচারে ঊনআশি। যাদবদের বাইরের শত্রুর আর ভয় নেই; পাঞ্চালরাজ,

পাণ্ডব, যাদবরাই ভূ-ভারত শাসন করছেন। সর্বত্র মহর্ষি সম্মানিত ও আপ্যায়িত হলেন। কালকূট চরিত্র অন্তর্দৃষ্টি মেলে ধরেছেন মহর্ষির অন্তর্গহীনে। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে সকলকে আশীর্বাদ ও কুশল খবর নিতে নিতে বৃষ্ণি বংশাবতংসাবতার বাসুদেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। খবর পেয়ে স্বয়ং বাসুদেব ছুটে এসে নতশিরে হাত বাড়িয়ে আহ্বান করে বলছেন, ''মহর্ষি, আমার অশেষ সৌভাগ্য, বিশ্ববিহারী আপনি দয়া করে আমাকে দর্শন দিয়েছেন। আসুন, উপযুক্ত আসন গ্রহণ করুন।'' *(পৃ: ৯৮৮, ঐ)*

মহর্ষি ও তাঁর সঙ্গীরা বাসুদেব ও বৃষ্ণিবংশীয় যাদবদের আচরণে অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠেছেন। কিন্তু মহর্ষির ভ্রূকুটি তীক্ষ্ম। তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে বাঁদিকে কিছু দূরেই একটি ছায়াঘন, বিবিধ বর্ণাঢ্য ফুলের কেয়ারি ও লতাপাতায় আচ্ছন্ন, কানন মধ্যে অপরূপ রূপবান কৃষ্ণপুত্র শাম্ব একবারের অধিক মহর্ষির দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ পেলেন না। কেন, এত ব্যস্ততা কিসের! কালকূট তো কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে দর্শনের আশাতেই অতীতের দ্বারাবতীতে এসে পৌঁছেছেন এবং মহর্ষির ভ্রূকুটি অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি তাঁর ঈপ্সিত নায়ককে দেখতে পেলেন। দ্বারাবতীর মনোরম কানন মধ্যে কাননবিহারিণীদের একজনের মদির চোখের দিকে তাকিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন অপরূপ রূপবান শাম্ব। শাম্বের রূপ বর্ণনা করেছেন এইভাবে, ''শাম্ব খালি গা। তাঁর অতি উজ্জ্বল দেহে বক্ষভাগ রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। গলায় কবচযুক্ত মুক্তাহার, কানে কুন্ডল, দুই নিবিড় আয়তচোখ সুরাসবের গুণে রক্তিম। সকলের সঙ্গেই তিনি নানা প্রণয় সম্ভাষণে লিপ্ত ছিলেন।'' *(পৃ: ৯৮৯, ঐ)* এইরকম একটি মুহূর্তেই মহর্ষি নারদ কুশস্থলীপুরীতে এসেছেন। মহর্ষির আগমনবার্তা তাঁর কানেও পৌঁছেছে এবং প্রণয়লীলা ও প্রাণ হিল্লোলিত চাতুর্যপূর্ণ কথাবার্তায় এতই মগ্ন ছিলেন যে, মহর্ষির প্রতি সৌজন্যটুকু দেখাতেও ভুলে গেলেন। শাম্ব কোন্ কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য তাঁকে দেখেও দেখলেন না — এই চিন্তা মহর্ষির অন্তরে আগুন জ্বেলে দিয়েছিল। কালকূট মহর্ষির অন্তর্জ্বালা লক্ষ্য করছেন। তাঁর প্রতিটি নিশ্বাস যেন বিষানল শিখাযুক্ত হয়ে শাম্বকে আঘাত করতে চাইছে। নিজেকে অপমানিত বোধ করে ভাবতে লাগলেন, বৃষ্ণিকুলের এই রূপবান বংশধরটিকে কীভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়।

মহর্ষির ক্রোধের কারণে তিনি শাম্ব সম্পর্কে কৌতূহলী হয়েছেন। তিনি মহর্ষির থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে শাম্বর কুঞ্জে অবস্থানের কারণটা অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছেন। সেইসঙ্গে মানসিক দিকটাও। প্রেম-প্রণয়লীলায় মত্ত থাকার ফলেই এমন ভুল করে ফেললেন শাম্ব। সুরাসবেও শাম্ব আচ্ছন্ন ছিলেন, তাই শাম্ব মহর্ষির আগমনের কথাটি ভুলে গিয়েছিলেন। মহর্ষি মনে মনে ক্রমশ ক্ষিপ্ত হয়ে কৃষ্ণপুত্র, রূপবান শাম্বকে শিক্ষা দেবার উপায় খুঁজতে শুরু করেছিলেন। যাদবদের দ্বারা সম্মানিত ও আপ্যায়িত মহর্ষি যদুপতি কৃষ্ণের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন অন্তর্জ্বালাকে চেপে

রেখে। তিনি তো সেকালের সাংবাদিক। নানা দেশ, জনপদ, আশ্রম, তপোবন, রাজা ও ঋষিদের বিস্তর সংবাদ তিনি কৃষ্ণকে পরিবেশন করেছিলেন। মহর্ষি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে চলেছেন ভোজ ও অন্ধকবংশীয়দের কাছে শাম্ব সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে। তিনি তাঁদের আতিথেয়তাও গ্রহণ করেছেন, আবার কথার ফাঁকে দু-একটি প্রশ্ন করেও শাম্ব সম্বন্ধে জেনে নিচ্ছেন। সমগ্র দ্বারকায় যাদবগণের মধ্যে শাম্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত। শাম্বর বিরুদ্ধে যদুবংশকে বিবাদে প্রবৃত্ত করা সম্ভব নয়। কালকূট নারদমুনির ভাবান্তর লক্ষ্য করছেন। বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহর্ষি ভেবে দেখলেন একমাত্র কৃষ্ণকে বিচলিত করতে পারলেই শাম্বকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব; পুত্রের বিরুদ্ধে পিতাকে কুপিত ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারলেই মহর্ষির মনস্কামনা সিদ্ধ হতে পারে।

মহর্ষি দ্বারকানগরী ছাড়বার আগে বাসুদেবের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করেছিলেন। পিতাপুত্রের সম্পর্কে ভাঙন ধরানোর জন্য। কিন্তু মহর্ষি এই নিন্দনীয় কাজটি করেছিলেন শাম্বকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। তিনি কৃষ্ণকে বলে দিলেন— "আপনার বংশে একটি গ্লানিময় পাপের ছায়া দেখে আমি বড় বিচলিত বোধ করছি।" *(পৃ: ৯৯০, ঐ)* তিনি সরাসরি তির্যগযোনি সম্ভূত অনার্যকন্যা জাম্ববতীময় শাম্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। কৃষ্ণ শাম্ব সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ মানতে চান নি কিন্তু মহর্ষি কৃষ্ণকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন "যে ষোল হাজার রমণীকে উদ্ধার করে, আপনি ভর্তাস্বরূপ তাদের গ্রহণ করেছেন, যাদের প্রতি প্রেমবশতঃ স্যমন্তক মণি আপনি ধারণ করতে পারেন নি, সেই ষোল হাজার রমণী শাম্ব সঙ্গলাভে ব্যাকুল। শাম্বই তাদের ধ্যান জ্ঞান। এ কি পাপ নয়?" *(পৃ: ৯৯০, ঐ)* কৃষ্ণ মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হলেও পরমুহূর্তে মনে দ্বিধা কাটিয়ে দৃঢ়স্বরে বলেছিলেন যে পাপ হলেও তিনি তার অভিযোগ বিশ্বাস করেন না। "শাম্বের সদাচার পিতৃভক্তি প্রশ্নাতীত। আমার ষোল সহস্র স্ত্রী সহচরী রমণীদের বিষয়েও আমার মনে কোনো দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব নেই।" *(পৃ: ৯৯০, ঐ)* তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে তাঁর পুত্রগণ ব্যতীত যাদবদের অনেকেই এই ষোল হাজার রমণীদের প্রার্থনা করেন। এই রমণীরা দ্বারকায় যদৃচ্ছ বিচরণকারিণী। কিন্তু মহর্ষি তাঁকে বোঝাতে বদ্ধপরিকর। তিনি কৃষ্ণের কথার উত্তরে জানিয়ে দিলেন যে তিনি সবই জানেন কিন্তু 'আপনি পুত্রগণ ব্যতীত বললেন। কিন্তু শাম্ব আপনার পুত্র।' *(পৃ: ৯৯০, ঐ)* কৃষ্ণ তাঁর বিশ্বাসে অটল থেকে মহর্ষিকে জানিয়ে দিলেন যে শাম্বও ষোল হাজার রমণী সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ তিনি বিশ্বাস করেন না। আর মহর্ষি যদি প্রমাণ দিতে পারেন তাহলে তো বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাপারে প্রশ্নই থাকে না। চাক্ষুস ঘটনাই সেখানে বিশ্বাস। ছোট ছোট কথাবার্তার মধ্য দিয়ে লেখক কালকূট অতীতের এক বিশেষক্ষণ তুলে ধরেছেন। মানবমনকে তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। কৃষ্ণ ও মহর্ষির হৃদয়তল যেন তিনি দেখতে পেয়েছেন মনভ্রমণে গিয়ে। তাই এমন করে তাঁদের মুখে নিজ অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা সংলাপগুলো বসিয়ে দিয়ে অতীতের চরিত্রগুলোকে

এই পার্থিব জগতের সমকালের মানবচরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। এইখানেই লেখক কালকূট তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর।

মহর্ষি কৃষ্ণের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আঘাত দিয়েছিলেন। কালকূটের মনভ্রমণে স্থান, কালের সঙ্গে চরিত্র সংযুক্ত হয়েছে। ভ্রমণ বৃত্তান্তের সঙ্গে একটি কাহিনী ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছে। প্রতিহিংসাপরায়ণ একজন মহর্ষির সঙ্গে একজন স্নেহশীল পিতার কথোপকথনে এই চিত্রই ক্রমশ প্রতীয়মান হয়ে উঠছে। পিতা কৃষ্ণ পুত্র শাম্ব সম্বন্ধে গুরুতর অভিযোগ শুনে প্রথমে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলেও পরমুহূর্তেই দৃঢ়তার সঙ্গে যুক্তি দিয়ে মহর্ষির অভিযোগকে খণ্ডন করেছেন। মহর্ষি নিতান্ত ভারাক্রান্ত মনে প্রমাণের সুযোগ এলে আবার তিনি আসবেন এই কথা বলে দ্বারকা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। লেখক চরিত্র যেহেতু তাঁদের মনোজগতে বিচরণ করছেন সেই তিনি যে বুঝতে পারলেন মহর্ষি চলে যাবার পরে কৃষ্ণ বিচলিত ও চিন্তিত। মহর্ষি কেন শাম্ব সম্বন্ধে এইরকম গুরুতর অভিযোগ করেছেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপেই বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য থাকে। নিশ্চয়ই কোনো কারণে মহর্ষি শাম্বের উপরে রুষ্ট হয়েছেন অথবা রমণীগণ কেউ কেউ তাঁকে হাস্য পরিহাস করে কুপিত করে তোলেন নি তো? পুরাণের ব্যক্তিচরিত্রগুলো এই পৃথিবীর মানুষের সুখ-দুঃখ, চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে ক্রমশ একীভূত হয়ে যাচ্ছে। সেকালের কীর্তিমান মহামানব কৃষ্ণও চিন্তিত। কয়েকদিন শাম্বকে নজরে রাখলেন কিন্তু বিশেষ কিছুই নজরে পড়ল না; শাম্ব যে নারীসঙ্গ ও প্রণয়লীলায় একটু বেশি অসক্ত এটা তাঁর নিন্দনীয় বলে মনে হয় নি। পিতার মনে নানা ধরনের চিন্তা ঢেউ খেলে যাচ্ছে। তবু তিনি কৃষ্ণ স্থির বিশ্বাসে উপনীত হলেন যে, সঙ্গীতাচার্য মহর্ষি কখনোই অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবেন না। অতএব জনার্দন অল্পকালের মধ্যেই মহর্ষির অভিযোগের কথা বিস্মৃত হলেন। কিন্তু জনার্দন ভুললে কি হবে, মহর্ষি ভুলতে পারেন নি শাম্বের অবহেলা, ভুলতে পারেন নি কৃষ্ণের অবিশ্বাস। কালকূটের চরিত্র ও মনে প্রশ্ন জেগেছে মহর্ষি ক্রুদ্ধ হয়ে এতবড় একটা গুরুতর অভিযোগ তুললেন কেমন করে? এবং তিনি তাঁর সেই মনের জিজ্ঞাসাকে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন।

দ্বারকায় ইতিপূর্বে মহর্ষি অনেকবার এসেছেন। যাদবদের বিভিন্ন গৃহে গিয়ে তিনি শুনেছিলেন ষোল সহস্র রমণীগণ শাম্বকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে অভিলাষপূর্ণ প্রণয়ালাপ করছে! অভিযোগের বাস্তব ভিত্তি ছিল এইটুকুই। মহর্ষি দ্বারকা ফিরে এসেছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই হয়ত তাঁর অনুগামী কোনো শিষ্য বিশেষ মুহূর্তে মহর্ষিকে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। মহর্ষি দ্রুত দ্বারকায় এসেই আগে গেলেন রৈবতকের পর্বতের গহনে কৃষ্ণের প্রমোদ কাননে। নারদ দূর থেকে দেখলেন কৃষ্ণ তাঁর মহিষী ও ষোল সহস্র রমণীগণসহ জলকেলিতে সুখে মগ্ন। তিনি জানতেন রৈবতকের প্রমোদ কাননে ও জলাশয়ে একমাত্র পুরুষ কৃষ্ণ ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার নেই। মহর্ষি নগরের প্রাসাদে

ফিরে এসে শাম্বকুঞ্জে গিয়ে সহচরী বেষ্টিত শাম্বকে দ্বিধা ও সংকোচের সঙ্গে বলেছিলেন, "শাম্ব, তোমাকে সুখে বাধা দিতে চাই না। বাসুদেব এখনও রৈবতকের প্রমোদকাননে রয়েছেন। সেখানে তিনি তোমাকে স্মরণ করেছেন।" *(পৃ: ৯৯১, ঐ)* পিতা স্মরণ করেছেন শোনামাত্র তিনি দ্রুতগতি হয়ে প্রমোদকাননে উপস্থিত হলেন। মহর্ষিও তাঁর পিছু পিছু উপস্থিত। মহর্ষিকে দেখামাত্র তাঁকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সকল নারী জল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নারদকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গিয়ে শাম্বকে তাঁদের প্রস্ফুটিত যৌবন দেখাতেই অত্যুৎসাহী হয়ে উঠল, সকলের কামোচ্ছাস অত্যন্ত প্রকটিত হল। "অতিমাত্রায় সুরাসবপানে, মত্ততাপ্রসূত, তারা শাম্বর প্রতি অতিপ্রার্থিনী হয়ে তাদের উজ্জ্বল রূপলাবণ্যরাশি অনাবৃত করল।" *(পৃ: ৯৯২, ঐ)*

মহর্ষিকে অনুসরণ করে কালকূট কৃষ্ণ-শাম্ব-নারদমুনির মনঃজগতে ঢুকে পড়েছেন কালকূটীয় দৃষ্টিতে ঘটনা পরম্পরাকে অনুধাবন করতে। কালকূট দেখছেন, মহর্ষি যে মিথ্যা বলতে পারেন একথা শাম্ব ভাবতেই পারেন নি এবং মহর্ষি যে তাঁরই পিছু পিছু প্রমোদকাননে শাম্বকে শিক্ষা দিতে আসছেন সেটাও বুঝতে পারেন নি। এমন অসময়ে কেন কৃষ্ণের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে কিছু বলবার আগেই ঘটে গিয়েছিল সেই অঘটন। যে ঘটনার জন্য শাম্ব মোটেই দায়ী ছিলেন না। 'নারদের সঙ্গে কৃষ্ণে একবার দৃষ্টি বিনিময় হলো। পরমুহূর্তেই মর্মাহত বাসুদেব ক্রোধে ও গ্লানিতে জ্বলন্ত চোখে রমণীদের দিকে তাকালেন। নারদকে তাঁর আর কিছুই জিজ্ঞেস করার ছিল না।' মহর্ষি তো এই বিশেষ মুহূর্তটির জন্য দ্বারকায় ফিরে এসেছিলেন। মহর্ষি যা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, তা তিনি অতি নির্মমভাবেই করেছেন। শেষ পরিণতি দেখবার জন্য তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। মর্মাহত কৃষ্ণ ক্রোধে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে রমণীদের ধিক্কার দিয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন "তোমরা আমার রক্ষিত হয়েও অতি নিকৃষ্ট আচরণ করেছো, অতি প্রমত্তা হয়ে তোমরা যেমন পণ্যাঙ্গনাদের ন্যায় ব্যবহার করেছো, আমার মৃত্যুর পরে তোমরা তস্করদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হবে।" *(পৃ: ৯৯২, ঐ)* এই নিদারুণ অভিশাপবাণী শুনে জলকেলি ও কলহাস্যে মুখরিত প্রমোদকাননে মুহূর্তেই নেমে এসেছিল বিষাদমাখা অন্ধকার ও তীব্র হাহাকারে পূর্ণ বিলাপ। ঘটনার আকস্মিকতায় শাম্ব বিস্ময়ে হতবাক হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। এক তীব্র যন্ত্রণা ও দুঃসহ অপমানে কৃষ্ণের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে কৃষ্ণ নিরপরাধ অসামান্য রূপবান প্রিয় পুত্রকে নির্মম অভিশাপ দিয়েছিলেন, "তোমার এই রমণীমোহন রূপ নিপাত যাক। কুষ্ঠরোগের কুশ্রীতা তোমাকে গ্রাস করুক।" *(পৃ: ৯৯২, ঐ)* কী কঠিন অভিসম্পাত। প্রচণ্ড অর্থবহ। তীব্র ঈর্ষা থেকে বেরিয়ে এসেছে এই অভিশাপ। রমণীমোহন বাসুদেবের হৃদয় যন্ত্রণাকে পার্থিব মানুষের হৃদয়যন্ত্রণা দিয়ে চিত্রিত করেছেন লেখক কালকূট বলেছেন, "আমি শাম্বকে দর্শনেই বেশি ব্যাকুল। পিতা পুত্রকে একসঙ্গেই দেখতে চাই। বেশি চাই অরূপকান্তি এবং বীর শাম্বকেই।" *(পৃ: ৯৮৬, ঐ)* পিতাপুত্রকে

একসঙ্গে দেখলেন। তাহলে তিনি কি এই ঘটনার সাক্ষী হতেই হাজার বছরের কালের ধূলা সরিয়ে দ্বারাবতীতে এসেছিলেন। সাক্ষী হতেই শুধু নয়, ঘটনা পরম্পরায় একালের দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণের জন্যই উপস্থিত হয়েছেন। পিতার এই কঠিন উক্তিতে আতঙ্কিত ও শিহরিত শাম্ব নতজানু হয়ে বাসুদেবের পায়ের কাছে বসে পড়ে, কাতর স্বরে তাঁর আগমনের কারণ জানিয়েছিলেন।

অভিশাপ ভয়ে কম্পিত ও ভেঙে পড়া পুত্রের আকুল প্রার্থনায় পিতা কৃষ্ণ এক গভীর মৌনতায় ডুবে গিয়েছিলেন; পুত্রের আকৃতিতে ঘটে যাওয়া ঘটনার আত্মবিশ্লেণে ডুবে গিয়েছিলেন। বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন শাম্বের অপরাধ কতটুকু? পিতাপুত্রকে একসাথে এক কঠিন সঙ্কটময় মুহূর্তে দাঁড় করিয়ে নারদ মুনি সে স্থান পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য তো সফল হয়েছে। কৃষ্ণ লক্ষ্য করেছেন ব্যাপারটা, তথাপি তিনি ওই মুহূর্তে নিরপরাধ বেদনার্ত পুত্রকে ছেড়ে পিতাপুত্রের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টিকারী মহর্ষিকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এগিয়ে যেতে পারেননি। লেখক কালকূট তাঁর লেখনীর যাদুতে এক বেদনার্ত মানবিক চিত্তবিকাশ ঘটিয়েছেন। অভিশাপের ঘটনাকে একালের দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে শাম্বর দেহের রোগলক্ষণ। সুতরূপী কালকূট শাম্বর রূপের বর্ণনায় প্রথমেই রোগের লক্ষণ দিয়ে রেখেছেন এবং কৃষ্ণকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি শাম্বকে দেহের বিম্বফলের ন্যায় রক্তাভ ও স্ফীত অংশগুলোকে দেখিয়ে বলেছিলেন, ''তোমার কোষ্ঠীর কাল অনুযায়ী, তোমার ব্যাধির প্রকটরূপ প্রকাশের সময় আসন্ন।'' *(পৃ: ৯৯০, ঐ)* সান্ত্বনা দিয়েছেন এইভাবে ''তোমার জন্মলগ্নেই এই কুৎসিত ব্যাধি তোমার ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে। আমি অতি ক্রোধে তা উচ্চারণ করেছি মাত্র।'' *(পৃ: ৯৯২, ঐ)* শাম্ব যে প্রকৃতপক্ষে অপরাধী নয়, এটাও একজন পিতা হিসাবে জানিয়েছিলেন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায়। তিনি বুঝতে পারছেন মহর্ষি নারদকে যথাযোগ্য সম্মান দেখানো হয় নি। রোগমুক্তির চিকিৎসা পদ্ধতি বৃষ্ণিসিংহের জানা ছিল না। তাই তিনি পুত্রকে বলেছিলেন যে, তাঁর ব্যাধি প্রকটিত মহর্ষির কাছে যাওয়া উচিত এই কারণে যে, ''তাঁর অভিজ্ঞতা আমাদের থেকে অনেক ব্যাপক। সম্ভবত তিনিও চান, তুমি তাঁরই দ্বারস্থ হবে। আমি তোমাকে সেই উপদেশই দিচ্ছি, তুমি যথাসময়ে মহর্ষির সন্ধানেই যেও।'' *(পৃ: ৯৯৩, ঐ)*

পুরাণের পিতা-পুত্রের কথোপকথন একালের পিতা-পুত্রের কথোপকথনের নিরিখে এগিয়ে চলেছে। পিতার কথা শুনে শাম্ব অকম্পিত স্বরে ঘোষণা করলেন, — ''পিতা যা অমোঘ এবং অনিবার্য হয়ে জীবনে নেমে আসে তাকে আমার ভাগ্য বলে মানি। এই অভিশাপ আমার অদৃষ্ট। আমার ভাগ্যের এই অমোঘ অনিবার্য পরিণতি জেনেও আমি নিশ্চেষ্ট থাকব না। প্রয়োজন হলে, মুক্তির জন্য আমি এই সসাগরা পৃথিবী, দেবলোকে, অন্তরীক্ষে সর্বত্র যাব। আমাকে আপনি বিদায় দিন।'' *(পৃ: ৯৯৩, ঐ)* পুত্র নিজ ইচ্ছা-শক্তিকে জাগরিত করতে চাইছেন। শুধু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে

থাকলেই ভাগ্যের এই অমোঘ ও অনিবার্য পরিণতি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। রোগ, রোগমুক্তির উপায় খুঁজতে হবে। কালকূট একালীয় দৃষ্টিতে পিতার মুখ দিয়ে রোগের কথা বলেছেন। আবার পুত্র পিতার কথা পুরোপুরী মেনে নেন নি, তিনি শাম্বকে দিয়ে সেকালের দৃষ্টিতে 'অভিশাপ' বলিয়েছেন। অভিশপ্ত শাম্ব আত্মমগ্ন হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে অন্তঃপুরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে অতিকায় সুবর্ণদর্পণে নিজ প্রতিবিম্বকে লক্ষ্য করতে করতে বুঝতে পারলেন যে পিতা মিথ্যা বলেন নি। নাসা, কর্ণ, ভ্রূ ইত্যাদি স্থানে স্থানে স্ফীত হয়ে উঠেছে দেখে তাঁর মনে ভাবনা উঠে এসেছে, এ'সব কি পিতার অভিশাপ দেওয়া মাত্রই হলো? নাকি পিতার কথায় তাঁর এখন চোখে পড়ছে। সংশয়ের দোলায় দোলায়িত শাম্ব তবুও পত্নী লক্ষ্মণাকে বলেছিল যে অভিশাপ জিজ্ঞাসার অতীত। এ অমোঘ অনিবার্য। এ ভাগ্যের পরিহাস নয়, নির্দেশ। একে অমান্য করা যাবে না। এই ব্যাধি তাঁকে দ্রুত গ্রাস করবে তাই তিনি পূর্ণগ্রাসের পূর্ব পর্যন্ত নগরীর বাইরে থাকবেন ও তারপরে মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার কাছে রোগমুক্তির নির্দেশ চাইবেন। অন্তঃপুরে পত্নী লক্ষ্মণা দুর্যোধন কন্যা, অশ্রুভেজা ও প্রেমপূর্ণ নয়নে তখনও শাম্বর ব্যাধির লক্ষণগুলো বুঝতে পারেননি। শাম্বকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন পিতার অভিশাপ পুত্রকে স্পর্শ করে না, স্নেহেরই আর এক অভিব্যক্তি। লক্ষ্মণার কথায় শাম্বর মনে জমে থাকা অভিমান ও বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে অত্যন্ত করুণভাবে এবং ষোল হাজার রমণীর কামনাতাড়িত আচরণ শাম্ব যে নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন এটাও অকপটে স্বীকার করেছেন। শাম্ব বেদনার সঙ্গে জানিয়েছেন পিতা পুত্রের সম্পর্কজনিত ক্রোধ নয়, বৃষ্ণিসিংহাবতারের পৌরুষে আঘাত লেগেছে। কিন্তু তাঁর স্ত্রী এ যুক্তি মেনে নিতে পারেন নি। নিরপরাধ শাম্বকে বৃষ্ণিসিংহের অভিশাপ দেওয়া ঠিক হয়নি একথা লক্ষ্মণা বারে বারে বলেছেন। লেখক কালকূট অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে শাম্ব ও লক্ষ্মণার মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো তুলে ধরেছেন। লেখক কালকূট চরিত্র শাম্ব দর্শনে গিয়ে শাম্বর মনবেদনা ও মানসিক দ্বন্দ্বগুলো তুলে ধরেছেন। পিতার প্রতি অভিমানাহত হয়েও পত্নীকে গম্ভীর গলায় বলেছেন যে মহাপুরুষের অভিসম্পাত প্রশ্নের অতীত। তবু যদুকুলের কুমারগণ তাঁদের পিতার সমালোচনা শুনতে অভ্যস্ত নয়। ''পিতার অভিশাপ অলঙ্ঘনীয়। তিনি আমাকে মুক্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন। এখন সেই পথেই আমার যাত্রা।'' *(পৃ: ৯৯৪, ঐ)* একজন রোগমুক্তিকামী মানুষের অন্তরের দৃঢ়তা লেখক কালকূট তুলে ধরেছেন। পত্নী লক্ষ্মণা অশ্রুসজল চোখে ক্রন্দন, মিনতি কোনো কিছু তাকে গৃহাঙ্গনে বেঁধে রাখতে পারেনি। ছোট ছোট গদ্যের মধ্য দিয়ে লেখক এই মানবিক দিকগুলো তুলে ধরেছেন পুরাণের এক অভিশপ্ত নায়কের মুখ দিয়ে। তার দৃঢ়চেতা মনকে তুলে ধরেছেন এইভাবে 'লক্ষ্মণা, অভিশাপমুক্ত হয়ে আমি আবার ফিরে আসবো।' *(পৃ: ৯৯৪, ঐ)* লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে চান শাম্ব। লক্ষ্মণার অন্তরে প্রবেশ করে লেখক তার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন সেই গৃহত্যাগের কারণ।

রূপবান শাম্বের মনবেদনাকে পাঠককুলের কাছ পৌঁছে দিয়েছেন লক্ষ্মণার অন্তরের বেদনা দিয়ে। লক্ষ্মণা বুঝেছেন রূপবান শাম্ব পথে বের হলে রমণীরা ব্যাকুল হয়ে তাঁকে দেখতে ছুটে আসেন, সেই তিনি কুৎসিত বিকলাঙ্গ হয়ে কেমন করে নগরী মধ্যে বাস করবেন? তাই অতি দুঃখেও লক্ষ্মণা অতিপ্রার্থিনী হয়ে স্বামীসঙ্গ কামনা করলেন। শাম্ব তার প্রার্থনায় সায় দিয়ে মনে মনে বললেন ''হায় অভিশাপ! কুরুকুলের এই অবিস্মরণীয় রমণীরত্নের সঙ্গে সঙ্গম প্রমোদেও কোন সুখানুভূতির লেশ নেই। জীবনপ্রবাহ কি আশ্চর্য স্বপ্নবৎ! যে আত্মা অতি দুজ্ঞেয়, সেই আত্মানুসন্ধানেই জীবনকে আহরণ করতে হয়। আমার সমগ্র ধারণা এখন সেই ধারণার বশবর্তী।' *(পৃ: ৯৯৪, ঐ)*

'পিতার অভিশাপে' পুত্রের মানসিক পরিবর্তন। তিনি আত্মানুসন্ধানে ব্রতী হলেন। নগরপ্রাকারের বাইরে দিনে আলোয় তিনি সমুদ্রোপকূলবর্তী বালুকাবেলায় তেমন আসতেন না। উপকূলবর্তী পর্বতের গুহাকন্দরে বাস করতেন ও আশেপাশের বৃক্ষেও ভগ্নপ্রস্তর মৃত্তিকায় যেসব ফলমূল পেতেন তাই দিয়েই ক্ষুণ্নিবৃত্তি করছেন। আর তৃষ্ণা মেটাতেন পর্বতের ক্ষীণ প্রস্রবণধারার মিষ্টি জল দিয়ে। নগররক্ষীর যখন নগরীর বাইরে অশ্বচালনা করে নগরীর বাইরে আসত তখনও বেরোতেন না। সূর্যাস্তের পর বালুকাবেলায় বেরিয়ে এসে দ্বারপালদের ঘণ্টাধ্বনি, মন্দিরের মঙ্গল শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি শুনতে শুনতে কল্পনায় নিজের অতীত রঙিন জীবনে ফিরে যেতেন। নাগরীদের গুঞ্জন ও হাসি, নাগরদের পুরুষদের দেখে তাদের চোখের ঝিলিক, অঙ্গভঙ্গি, সুরাসবপানে রাজপুরুষদের প্রমত্ততা, নাগরী পণ্যাঙ্গনাদের অতি রুচিশীল সঙ্গীত মুখরিত অঙ্গনে গমন সব তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতো। অখণ্ড অবসর, ভাবতে না চাইলেও ভাবনাগুলো তাঁর মনকে দোলায়িত করে তুলত। তিনি যেন দেখতে পেতেন, প্রবাসী ইন্দ্রপ্রস্থবাণী বা পাঞ্চাল অধিবাসীরা ও অন্যান্য দেশের নাগরিকগণ দ্বারকানগরীর প্রমোদ বিহারে বেরিয়েছেন। ভাবতেন নিজ গৃহাঙ্গ ন ও অন্তপুরের কথা। সেখানে আলো জ্বলছে তো লক্ষ্মণা অন্ধকারে মুখ ঢেকে বসে নেই তো? মাতৃগণ মনোকষ্টে ও পিতা বিমর্ষ ও বিচলিত হয়ে নেই তো? তার অদর্শনে ভ্রাতা ও বন্ধুগণ ভগ্নমনোরথ হয়ে আছে হয়তো। এসব নানা ভাবনায় তাঁর মন আন্দোলিত হয়।

শাম্বের মনোভাবনার মধ্য দিয়ে লেখক কালকূট সেকালের দ্বারকার সমাজচিত্র, দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল, ধর্মীয় পরিবেশ সবকিছু টুকরো টুকরো চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরে একটা স্থানিক চিত্র তুলে ধরেছেন। লেখক কালকূট চরিত্র শাম্ব দর্শনে চলতে গিয়ে যে এ'কালের পটভূমিকায় সেকালের জীবনায়নকে মিলিয়ে দিয়েছেন। চলেছিলেন মনোভ্রমণে, ভ্রমণের যেসব বৈশিষ্ট্য থাকে সেসব থেকে তিনি সবে এসে অন্য এক বৈশিষ্ট্যে তাঁর ভ্রমণকাহিনী পাঠককুলের সামনে উপস্থাপন করেছেন। দূরকালের মহাকাব্যিক বা পুরাণের চরিত্রগুলোকে তিনি বর্তমানের দৃষ্টিতে আলোকিত করেছেন। তাদের সুখ-দুঃখ, মানসিক ভাবনা এ'কালীয় বোধ নিয়ে নতুনভাবে

তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গেই সেই সময়ের ভৌগোলিক চিত্র, সামাজিক পরিবেশ, জীবনযাত্রার প্রণালী সূক্ষ্মভাবে তুলে এমনভাবে তুলে ধরেছেন যা ভ্রমণকাহিনী থেকে স্বতন্ত্ররূপে পাঠকের লেখক কালকূটের সেই রচনাশৈলীই বিশেষভাবে পাঠকের চোখে উঠে এসেছে। নগরীর বাইরে গুহাকন্দরে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে কাটাতে "বৎসর পূর্তির পূর্বেই কুষ্ঠরোগের গ্রাসে অতি কুৎসিত ও বিকলাঙ্গ রূপ ধারণ করলো।' *(পৃ: ৯৯৪, ঐ)* কীভাবে মহর্ষির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে বুঝতে না পেরে একদিন দ্বারকায় ফিরে গিয়ে শাম্ব পিতার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। শাম্বর কুৎসিত চেহারার দিকে কেউ ফিরেও তাকাল না। ভিক্ষার্থী ভেবে কেউ কেউ ঘৃণা ও কৃপাবশে তাঁর প্রতি দূর থেকে মুদ্রাদি নিক্ষেপ করলেন এবং শাম্বকে তা সংগ্রহ করতে না দেখে তার মস্তিষ্কের সুস্থতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। চারুদেষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি ইত্যাদি যাদব শ্রেষ্ঠগণও তাকে চিনতে পারলেন না। একমাত্র পিতা কৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করামাত্র চিনতে পেরেছিলেন। শাম্বর কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত মূর্তি দেখে কৃষ্ণ মুহূর্ত মধ্যে অত্যন্ত বিচলিত ও বিষণ্ণ হয়ে তাঁকে তাড়াতাড়ি কুশস্থলীর এক কক্ষে নিয়ে গেলেন। শাম্ব পিতার কাছে আরোগ্যলাভের উপায় জানার জন্য মহর্ষির খোঁজ করেছিলেন। মহর্ষি যেন শাম্বর প্রতীক্ষাতেই দ্বারকায় এসেছিলেন ঠিক সেইদিন, কৃষ্ণ মহর্ষিকে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন শাম্বর কাছে। শাম্বর শারীরিক ভঙ্গিও লেখক কালকূট চরিত্রে দৃষ্টি এড়ায়নি। সূক্ষ্ম মানবিক বোধগুলো তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পুরাণকাল ও একালকে একীভূত করে দিয়েছেন। পুরাণের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, মান-অভিমান প্রত্যেকটি অত্যন্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লেখক কালকূটের দৃষ্টিতে উঠে এসেছে।

কুষ্ঠ রোগীর যন্ত্রণা মানসিক বোধ, একাকীত্বের যন্ত্রণা কীভাবে কালকূটের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে পরবর্তী অংশে অর্থাৎ শাম্বর রোগমুক্তির পথে এগিয়ে চলার সাথে ক্রমশ বুঝতে পারা যায়। কালকূট তথা সমরেশ বসু তাঁর জীবনেই দেখেছেন কুষ্ঠরোগী সেন্টুকে এবং এই চরিত্রটিকে তিনি যেভাবে অনুভূতিতে ধরে রেখেছিলেন। সেন্টুর জীবন যেভাবে তাঁকে জীবন সম্পর্কে গভীর ভাবনায় মোহিত করেছিল সেই জীবনদর্শন ও আত্মদর্শন থেকেই শাম্বের অন্তঃকরণের ব্যথা বেদনাজীর্ণ মনটিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। যেখানে শাম্ব বাইরে স্থিতধী, কোন কষ্টেই তার কোন বিকার নেই, কোনো ক্ষোভ বা বিষণ্ণতার বহিঃপ্রকাশ নেই, অথচ অন্তরে অন্তরে ব্যথায় দীর্ণ একটি মানুষ। শাম্ব মহর্ষিকে প্রণাম করছেন অত্যন্ত কষ্ট করে। তাঁর চলাফেরা সুস্থ মানুষের মতো নয়। মহর্ষির রাগ কমে এসেছিল, শাম্বকে আশীর্বাদ করে নিরালায় ব্যাধিমুক্তি বিষয়ে আলোচনা করার জন্য কৃষ্ণের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। মৃদু অথচ দৃঢ়ভাবে শাম্ব মহর্ষিকে জানিয়েছিলেন যে যদুবংশের পুত্র যেহেতু তিনি, সুতরাং তাঁর পক্ষে কখনই ইচ্ছাকৃত মহর্ষিকে অবহেলা করা সম্ভব নয়। তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য ও অত্যন্ত বিনীতভাবে

বলেছিলেন "আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে উপদেশ দিন এখন আমার কী কর্তব্য? পিতা বলেছেন, আপনি আমার আরোগ্যলাভের উপায় বলে দিতে পারেন।" *(পৃ: ৯৯৫, ঐ)* মহর্ষি রোগমুক্তির পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন অত্যন্ত সমবেদনাপূর্ণ মন নিয়ে। তিনি তাঁকে 'বৃষ্ণিব্যাঘ্র' বলে সম্বোধন করে সূর্যালোকে যেতে বলেছিলেন। আরো বলেছিলেন যে, সূর্যদেব একমাত্র অনাবৃত দর্শিত ঈশ্বর, তিনি সকল দেবতা ও পিতৃপণের ঊর্ধ্বে। বিশ্বের রক্ষাকর্তা ও নিয়ন্তা। ইনিই সকল শক্তির উৎস, ইনিই দ্রষ্টা ও সময়ে ধ্বংসকারী। মহর্ষি নারদ পরম সন্তোষে শাম্বকে বলে চলেছেন "তোমার একমাত্র পুজ্য দেবতা এই সূর্য। ইনি সমস্ত অমঙ্গল ও ব্যাধি ধ্বংস করেন, সেইজন্য সকল দেবতাগণ তাঁকে মান্য করেন। তুমি সেই সূর্যলোকে যাও।" *(পৃ: ৯৯৫, ঐ)*

শাম্ব মহর্ষির কাছে সূর্যালোকের পথের সন্ধান জানতে চেয়ে বলেছিলেন 'আমি যে কোনো প্রকার নিগ্রহ সহ্য করে তাঁর করুণাভিক্ষা করতে সেখানে যাবো।' *(পৃ: ৯৯৫, ঐ)* একজন বেদনাহত, সঙ্কুচিত, অভিমানাহত, অভিশপ্ত যদুকুলশ্রেষ্ঠ যুবা বীরপুরুষের সঙ্গে বহু অভিজ্ঞতালব্ধ, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন, বিচক্ষণ, সঙ্গীতাচার্য মহর্ষির দীর্ঘদিন পরে কথোপকথন চলছে। মুনির ক্রোধ প্রশমিত হয়েছে। বৃষ্ণিব্যাঘ্রকে তিনি রোগমুক্তির পথের সন্ধান দিচ্ছেন। এই কথোপকথনের মধ্যে ফুটে উঠেছে একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তীব্র উদ্‌গ্রীবতা। পিতা পুত্রকে রোগমুক্তির জন্য মহর্ষির শরণাপন্ন হতে বলেছিলেন; এই সংবাদটুকু মহর্ষির কানে নিশ্চয়ই পৌঁছেছিল। মহর্ষি সর্বব্যাপী। মহর্ষি যেহেতু সেকালের সাংবাদিক সেইহেতু তিনি গোপনে শাম্বর রোগপ্রকট হওয়ার খবর রেখেছিলেন এবং যথাসময়ে কুশস্থলীপুরীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য একটাই নিরপরাধ শাম্বকে ক্ষমা করা ও রোগমুক্তির পথের সন্ধান দেওয়া। হয়ত তার আরও উদ্দেশ্য ছিল বৃষ্ণিব্যাঘ্রকে দিয়ে কুষ্ঠরোগ-এর ভয়াবহতা থেকে মর্ত্যের মানুষের রোগমুক্তি ঘটানো। এই কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে কুষ্ঠব্যাধি থেকে নিরাময়ের জন্য পথের সন্ধান করা হচ্ছে। মহর্ষি যেহেতু বহুক্ষেত্র ভ্রমণ করেছেন তাই একমাত্র তিনি জানতেন কোথায় ও কোন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে গেলে এই ভয়াবহ কুৎসিত ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়া যাবে, নিশ্চিত মৃত্যুপথ যাত্রীদের জীবনের সম্মান দেওয়া যাবে। মহর্ষি নারদ রোগমুক্তির পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন অত্যন্ত সমবেদনাপূর্ণ মন নিয়ে। "তুমি এখান থেকে উত্তর সমুদ্রতীরে গিয়ে উত্তর পূর্বে গমন কর। তুমি যাবে মহানদী চন্দ্রভাগা তীরে, সেখানে মিত্রবনে সূর্যক্ষেত্র বর্তমান। সেখানে পরমাত্মা রূপে অত্যুজ্জ্বল পুরুষ রূপ নিয়ে রয়েছেন। তুমি সেইখানে গমন করো।" *(পৃ: ৯৯৫, ঐ)* তিনি একথাও জানালেন, 'কোনো কারণে কোনো সংকটে পড়লে তুমি আমার সন্ধান করো, আমি তোমার সঙ্কট মোচনের উপায় বলব।" *(পৃ: ৯৯৫, ঐ)*

মহর্ষি নারদ মিত্রবনে সূর্যকে কীভাবে বিভিন্ন দেবতারা বেষ্টন করেছিলেন তাঁর একটি

পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরেছিলেন শাম্বর কাছে। দেবতা, যক্ষ এবং অপ্সরারা সূর্যের চারপাশে রয়েছেন। ঋষিগণ সেখানে বেদপাঠ ও সূর্যের স্তব করছেন, ত্রিসন্ধা তাঁর পূজা করছেন। সূর্যকে ঘিরে আছেন আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুতগণ ও অশ্বিনীগণ। তাঁর পাশেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র। রুদ্রে সঙ্গে তার পত্নী রজনী ও নিক্ষুভা। আর পিঙ্গলা সর্বদা মঙ্গল-অমঙ্গল লিখে চলেছেন। দ্বারপাল রূপে বিরাজ করছেন দণ্ডনায়ক, বজনা, স্তোশা, কালমাস এবং পক্ষী। কথুশৃঙ্গে আছেন ভিত্তমন ও নগ্নদিণ্ডি। লেখক কালকূটের সূর্য সম্বন্ধে এই বর্ণনা শাম্ব পুরাণের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। রঘুবংশীয় রাজা বৃহদ্বলকে বশিষ্ঠ মুনি পরব্রহ্ম সম্পর্কে বলেছেন 'সূর্যই পরব্রহ্ম। সূর্য থেকে বড় কেউ নেই। সূর্যই অদিতির বারটি ছেলে হয়ে জন্মান।' বিরাট পুরুষের তপস্যা করছেন। *(পৃ: ৭৬১, পৌরাণিকা, অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পর্ব ২)*

এছাড়া অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই 'পৌরাণিকা'তে ৭৬১ পৃষ্ঠায় আরও দেখা যায় ''সূর্যের স্ত্রী রাজ্ঞী - দ্যু - সংজ্ঞা - প্রভা এবং নিক্ষুভা - পৃথিবী - ছায়া। দ্বারপাল পিঙ্গল, দেবক ও দন্ডনায়ক। সা-পু (৭/২৩) শ্লোকে আছে সহস্রশীর্ষ, সহস্রপাৎ - হিরণ্যগর্ভ - রবি এবং ইনিই প্রলয় পয়োধি জলে শুয়েছিলেন। সূর্যই এরপর বরাহ রূপ ধরে জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার এবং তারপর ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মরীচি, দক্ষ ও বশিষ্ঠ নয়জন মানসপুত্র/প্রজাপতি সৃষ্টি করেন। ক্রমে এরপর মরীচির ছেলে কশ্যপ ও দক্ষের মেয়ে অদিতির বারটি পুত্র হয়ে জন্মান। আকাশে সূর্যের মধ্যেই সেই সহস্র শীর্ষ পুরুষ অবস্থিত (৭/৩৬)। সূর্য ত্রিমূর্তি ও তিন বেদ। চন্দ্রাদি গ্রহগণ সূর্য সম্ভব।'' আবার শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে প্রতিমাসে প্রদর্শিত সূর্যদেবের বিভিন্ন ব্যক্তিগত পার্ষদ ও সপ্তকদের কথা তাঁদের নাম ও কার্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। সমস্ত জীবের পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর অনাদি জড় শক্তির মাধ্যমে এই সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন। শ্লোক ৩০-এ বলা হয়েছে

''এক এব হি লোকানাং সূর্য আত্মাদিকৃদ্ধারিঃ।
সর্ববেদক্রিয়ামূলমৃষিভির্বহুবেদিতঃ ।।৩০।।

(শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্ধ ১২, অধ্যায় ১১ *)

অর্থাৎ ''পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি থেকে অভিন্ন সূর্যদেব সমস্ত জগতের একমাত্র আত্মা এবং তিনিই তাদের আদি স্রষ্টা। বেদে নির্দেশিত সমস্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ারও উৎস হচ্ছেন তিনি এবং বৈদিক ঋষিগণ তাঁকে নানা নামে ভূষিত করেন।''

'বিষ্ণুপুরাণ'-এ বলা হয়েছে —

''সূর্যদেবের আরাধনা গন্ধর্ববেরা তার সম্মুখে গান করেন, নিশাচরেরা সেই রথ অনুসরণ করেন এবং বালখিল্য ঋষিরা সূর্যদেবকে বেষ্টন করে স্তব করেন। চোদ্দজন পার্ষদের সাতটি দল সারা

ব্রহ্মাণ্ডে যথাসময়ে হিম, তাপ এবং বৃষ্টির আয়োজন করেন।" (শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্ধ ৫, অধ্যায় ২১ *)

কালকূট পুরাণের ঘটনা ও চরিত্রকে নিয়ে আধুনিক মনস্তত্ত্ব যুক্ত করে চরিত্রগুলিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ব্যথা-বেদনা, অভিমান-প্রেম-প্রীতি, জীবন সংঘাত-জটিলতা, দ্বন্দ্ব-মথিত অন্তঃকরণ সবকিছু প্রকাশ করেছেন। চরিত্র হয়ে উঠেছে আধুনিক ভাবনার অনুসারী, পুরাণ অতীতের সঙ্গে বর্তমান যুক্ত হয়ে গেছে। কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত গলিত দেহ পুত্রের রোগমুক্তির জন্য অনির্দিষ্ট পথে যাত্রাকালে ভারাক্রান্ত উদ্বিগ্ন পিতা কৃষ্ণ বন্ধুর পথের কষ্ট লাঘব করার জন্য ব্যথিত চিত্তে জানান— "এত দূরবর্তী পথ তুমি অশ্বচালিত রথ অথবা অশ্বারোহণ ব্যতিরেকে কেমন করে যাবে? ক্ষুধা তৃষ্ণা ছাড়াও পথ চলতে আরো নানা রকমের প্রয়োজন থাকে।" *(পৃ: ৯৯৬, কালকূট রচনা সমগ্র, ২য় খণ্ড)* উত্তরে পিতা কর্তৃক অভিশপ্ত পুত্র শাম্ব তীব্র অভিমান অন্তরে চেপে রেখে বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতকে জানিয়ে পিতৃ-সাহায্য থেকে নিজেকে নিরত রাখলেন। বললেন তাঁর আর সে-সবে কোনো প্রয়োজন নেই। কবচ কুণ্ডল অঙ্গুরীয়াদি সবই খুলে রেখেছেন। সর্বাঙ্গে জড়াবার বস্ত্র তাঁর আছে। পাদুকা পায়ে চলতে পারেন না বলে সেটিও ত্যাগ করেছেন। এই বিকট, কুৎসিত চেহারা নিয়ে রথারোহণ বা অশ্বারোহণে গেলে, গ্রাম জনপদে বিস্ময় ও অবিশ্বাস উৎপাদন করবে। লোকে বিদ্রূপ করবে। গ্রাম জনপদের ভিক্ষান্নে তিনি দিনযাপন করতে পারবেন কেননা পূর্ব জীবনের সঙ্গে তাঁর আর কোন সম্পর্ক নেই।

আজ শাম্ব ভয়ঙ্কর ব্যাধির ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ নন। এই ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে যে কঠিনতম পথের সন্ধান পেয়েছেন সেখানে পৌঁছতে চান রূঢ়-কঠিন-সর্পিল বাস্তবের পথ বেয়ে। তাঁর কথা শুনে পিতা কৃষ্ণ কিছুক্ষণ নির্বাক হয়েছিলেন। পরে পুত্রকে মাতার সঙ্গে দেখা করে যেতে বলেছিলেন। মাতার সঙ্গে দেখা করার কথা শুনে মনটা খুশিতে ভরে উঠলেও পরক্ষণেই মুখ বেদনায় ভরে উঠেছে এই ভেবে যে ব্যাধিগ্রস্ত কুৎসিত শাম্বকে দেখে মা দুঃখ পাবেন। তাই তিনি পিতার কাছ থেকেই যাত্রার অনুমতি নিয়ে কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করে তাড়াতাড়ি নগরীর পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন। যেতে যেতে মানবমনের বিচিত্র সব ভাবনা তার মনের দরজায় ভিড় করছিল। রোগগ্রস্ত-কুৎসিত-বিকলাঙ্গ শাম্বকে দেখলে স্ত্রী লক্ষ্মণার মানসিক পরিবর্তন ঘটবে, তার ঘৃণার উদ্রেক হবে, একথা বুঝতে পেরেই আর কারও সঙ্গে দেখা না করে বেদনার্ত মনে দ্রুত বেরিয়ে পড়েছিলেন। নগরীর পথে যেতে যেতে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। সমুদ্রমধ্যে পার্বত্যদ্বীপ বিশিষ্ট এই ভূমির অধিকাংশ রাজপথই চড়াই-উৎরাই-বন্ধুর। এই বন্ধুর পথে রোগগ্রস্ত শরীরে চলতে শাম্বর অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। দ্বারকানগরীর রাজপথের বিবরণ কালকূটীয় বৈশিষ্ট্যে দিয়েছেন। কালকূট তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বা স্টাইলে সেকালের অর্থাৎ দ্বারকা নগরীর সমাজজীবনকে শাম্বর চোখ দিয়ে তুলে ধরেছেন। নগরীর প্রাসাদের অলিন্দে ও গবাক্ষে

রমণীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পথ চলতি নাগরিকদের লক্ষ্য করছেন ও যদুবংশের কুমারদের কাউকে কাউকে বিশেষভাবে দেখছেন এবং নিজেদের মধ্যে হাস্য পরিহাস করছেন। কিন্তু যে শাম্বকে দেখে এক সময়ে নগরীর রমণীরা কামনা করত তাঁকে কেউ চিনতেই পারল না। একজন কুষ্ঠরোগীর প্রতি তাকিয়ে কেউ তার দৃষ্টিকে অকারণ বিস্মিত করতে চায় না। নাগরিকদের আচরণে শাম্ব মনে মনে দুঃখ পেলেও সেই দুঃখকে প্রাধান্য দিতে চান নি। একজন রোগগ্রস্ত মানুষের মনোবেদনা ও দৈহিক যন্ত্রণাবিদ্ধ শাম্বকে লেখক কালকূটের দৃষ্টি দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

কুশস্থলী পুরী থেকে ফেরার সময়ে অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। ক্ষুধার্ত শাম্ব দরিদ্র মানুষ ও প্রাণীদের সঙ্গে যদুবংশের কুল-রমণীদের কাছ থেকে পূজার ফল ও মিষ্টান্ন নেওয়ার জন্য ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত শাম্বকে দেখে তারা সকলেই আকুঞ্চিত মুখে শিহরিত হচ্ছিলেন এবং স্পর্শের আশঙ্কায় দূর থেকে মিষ্টান্ন নিক্ষেপ করছিলেন। লেখকের দৃষ্টিতে দুটো জিনিস উঠে এসেছে। কৃষ্ণপুত্র ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দেওয়া ও যদুকুল রমণীদের ঘৃণা জড়িত দৃষ্টি ও আচরণ। শাম্বের দুঃখ ও মনস্তাপে পূর্ণ হৃদয়যন্ত্রণা পাঠককুলের হৃদয়কেও বেদনামণ্ডিত করে তোলে। তবুও আত্মজিজ্ঞাসার দ্বারা তিনি নিজেকে নির্বিকার রেখেছিলেন। একজন কুষ্ঠরোগীকে দেখে পূর্বে তিনি কিরূপ আচরণ করতেন সে কথা স্মরণ করেই তিনি নির্বিকার হতে পেরেছিলেন। তাঁর কাছে পূজারিণীদের আচরণই স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল তারা তাঁর থেকে অনেক বেশি উদার। ''অতীতে সুস্থাবস্থায় কুষ্ঠরোগীর বীভৎস চেহারা দেখে, তাঁর মনেও বিকার ঘটত, দৃষ্টি আহত ঘৃণায় শিহরিত হতো এবং সংস্পর্শ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতেন।'' *(পৃ: ৯৯৭, ঐ)*বর্তমানেও এই চিত্র দেখা যায়। কুষ্ঠরোগীকে দেখলে একালের লোকজনও ওই একই আচরণ করে থাকেন। কালকূট অত্যন্ত চেনা জগৎ থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজের দৃষ্টিকে শাম্বর দৃষ্টিতে প্রসারিত করেছেন। তিনি শাম্বের চোখ দিয়ে দেখছেন ও মন দিয়ে ব্যক্ত করছেন। দুইকালের সমাজজীবন কুষ্ঠরোগীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, সব সব কিছু একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। এখন চোখ রাখা যাক শাম্বর যাত্রাপথের ঘটনাবলীর দিকে। ফল মিষ্টান্ন খেয়ে অপরাহ্নে ভূখণ্ডকে শাম্ব পৌঁছেছিলেন নৌকা আরোহণে, সকলের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে নিরাপদ দূরত্বে তাঁকে থাকতে হয়েছিল। ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা অথচ অত্যন্ত মাটির কাছাকাছি, লেখক কালকূটের দৃষ্টি এড়ায় নি। সংবেদনশীলতায়, মানবিক গুণে শাম্বর অভিযান উপন্যাসের দিকে গতিশীল হচ্ছে।

কুষ্ঠ রোগীর কাছে মাঝি ও খেয়া পারানির অর্থ দাবি করে নি, তাঁকে করুণা করে নৌকায় তুলেছিল সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে। শাম্ব নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের তীর ধরে উত্তর দিকে চলতে শুরু করেছিলেন। তিনি সমুদ্রতীর ধরে মন্থরগতিতে তপ্ত বালুতে পা ডুবিয়ে পথ চলছেন। অন্ধকার

রাতে নির্জন সমুদ্রতীর ধরে চলতে শাম্বর অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগকে অনিবার্য জেনেও রোগমুক্তি অভিলাষী শাম্ব এগিয়ে চলেছেন। একটা দুর্বার ইচ্ছাশক্তিতে শাম্ব এগিয়ে চলেছেন। শাম্ব বীর ছিলেন, তাঁর অন্তরে ভয়ের লেশমাত্র ছিল না, কিন্তু রোগের প্রভাবে শারীরিকভাবে তিনি হীনবল হয়ে পড়েছিলেন। একজন অভিশপ্ত মানুষ তাঁর অভিশাপের বোঝা একাই বহন করে। শাপমোচনের প্রয়াসে একাই সংগ্রাম করে। তবু জগৎ সংসারে তার পরিচয় তিনি মানুষ; মানব জীবনধর্মের এই নিয়ম, সংসারের বাইরে একাকী থেকেও সংসারের সীমান্তে দাঁড়িয়ে জীবনের ঘ্রাণ গ্রহণ করে। লেখক অত্যন্ত সংবেদনশীল মন নিয়ে শাম্বের অন্তরলোকে উঁকি দিয়েছেন। একজন নিঃসঙ্গ রোগগ্রস্ত অভিশপ্ত মানুষের মানসিক অবস্থা ও সংগ্রামী চেতনাকে অত্যন্ত সাবলীলভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। শাম্বর চেতনা, বেদনাবোধ ও মুক্তিসংগ্রামে এগিয়ে চলার দৃঢ়তা পাঠকের হৃদয়মনকে স্পর্শ করে। পাঠককুলও শাম্বর সংগ্রামের সঙ্গী হয়ে যায় মনের অজান্তে। লোকালয়ের সন্ধান পেতেই অবসন্ন শাম্ব ধীবর পল্লীর সীমানায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ধীবর পল্লীতে একটা শান্তির পরিবেশ বিরাজ করছে; শিশুরা কুটিরের ভেতর ঘুমোচ্ছে। রমণী এবং পুরুষরা ঘরকন্না, জাল সেলাই, গোটানোতে ব্যস্ত। তারা নানা ক্রীড়া-কৌতুকও করছে। কিন্তু শাম্বের সেই বিকট মূর্তি দেখে তাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটল, শান্তি বিনষ্ট হল। রমণীরা কুটিরে ঘুমন্ত সন্তানদের আড়াল করার জন্য দরজায় দাঁড়ালো। গৃহপালিত কুকুরেরা দূর থেকে তাঁকে চারিদিকে ঘিরে প্রচণ্ড চিৎকার জুড়ে দিল। রাতের অন্ধকারে আবছা আলোয় ধুলো বালি মিশ্রিত বিকট দর্শন একজন ব্যক্তিকে দেখলে যে মানসিক অবস্থা ও পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাই ধরা পড়েছে কালকূটের চোখে। ধীবরপল্লীর সামাজিক চিত্র ও মানুষগুলো মানসিক অবস্থা কিভাবে উঠে এসেছে ও উপন্যাসের দিকে কাহিনী এগিয়ে চলেছে তা দেখা যাক।

কালকূট লক্ষ্য করেছেন যে, সংগ্রামী মানুষের সংগ্রামী চেতনা ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছে। শাম্ব ধীবর নারী-পুরুষদের প্রথমেই সম্বোধন করেছেন, 'ভাই, বন্ধুগণ' বলে। প্রথম কথাতেই ধীবর নর-নারীদের মন জয় করে ফেলেছেন। "আমি মানুষ, ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ। ব্যাধিই আমাকে কুরূপ কুৎসিত করেছে। তোমাদের নারী-পুরুষ সবাইকেই বলছি, আমাকে ভয় পেও না।" *(পৃ: ৯৯৭, ঐ)* শাম্বর কথাবার্তা শুনে তাদের মন থেকে ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল। তারা বলাবলি করছিল "রাজরাজড়া বা ঋষিগণ যেভাবে কথা বলেন, কথাবার্তা সেইরকম।" *(পৃ: ৯৯৭, ঐ)* তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে তিনি দ্বারকা থেকে এসেছেন ও রোগমুক্তির সন্ধানে 'পূর্বোত্তরের চন্দ্রভাগা নদীর ধারে মিত্রবনে'র সন্ধানে চলেছেন— যে পথের হদিশ তেমন স্পষ্ট করে জানা নেই, সবই তাকে খুঁজে নিতে হবে। ধীবর নারী-পুরুষদের সঙ্গে অনেক কথাবার্তার পরে তাদের সন্দেহ দূরে করে ভীত সন্ত্রস্ত পরিবেশকে স্বাভাবিক করে নিয়ে আসার পরে ক্ষুধার্ত শাম্ব প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সেই

ধীবর পল্লীতে খাদ্য, পানীয় ও আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। শাম্বের কথাবার্তায় ধীবর রমণী ও পুরুষদের তাঁকে 'ধীমান ও শ্রীমান' বলে মনে হয়েছিল। তাদের মধ্যে যিনি বর্ষীয়ান তিনি শাম্বকে বলেছিলেন "তুমি খাদ্য পানীয় সবই পাবে। তুমি এখন বস। আমরা প্রথমে ভয় পেলেও, এখন আর তা নেই।" *(পৃ: ৯৯৮, ঐ)* বর্ষীয়ান ধীবর পুরুষের কথার মধ্যে দিয়ে অতিথিপরায়ণতার রূপটি বেরিয়ে এসেছে। শাম্বকে প্রথমে দেখে ধীবরপল্লীতে যে তাণ্ডবের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসতেই তাদের বাস্তব বোধ ফিরে এসেছিল। রোগমুক্তির জন্য অভিযানের প্রথম দিনের পথ চলা এভাবেই শেষ হয়েছিল। শাম্ব ক্রমাগত এভাবেই চলতে চলতে একসময়ে সিন্ধু দেশের অভ্যন্তরে নদী পার হতে গিয়ে ঋষিতুল্য ব্যক্তির কাছে মিত্রবনের সূর্যক্ষেত্রের খোঁজ পেয়েছিলেন। ঋষিতুল্য ব্যক্তি তাকে বলেছিলেন "আমি শুনেছি, মিত্রবন নামে এক সূর্যক্ষেত্র পঞ্চনদীর দেশ আছে। আরো শুনেছি, আন্তরীক্ষের পাদদেশে কোথাও সেই স্থান বর্তমান। তোমার ন্যায় চর্মরোগীরা সেখানে যায় আরোগ্যলাভের জন্য।" *(পৃ: ৯৯৮, ঐ)* অনির্দিষ্টের পথে চলতে গিয়ে একটু আলোর দিশা দেখতে পেয়ে শাম্ব দিক পরিবর্তন করে নূতন উদ্যমে পথ চলা শুরু করেছিলেন পূর্বোত্তর মুখে। নদনদী অরণ্য-পাহাড় সব কিছু পেরিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে সহনীয় করে তিনি এগিয়ে চলেছিলেন। নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য কাউকে দোষারোপ করেননি। শাম্ব গ্রাম জনপদে এসে লাঞ্ছিত হয়েছেন বালকদের দ্বারা। "বালকেরা তাঁর গতিভঙ্গির বিকৃতিকেই কেবল অনুকরণ করেনি, প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করে তাড়া করেছে। তাদের সঙ্গে সারমেয়কুলও তাকে এক মুহূর্তও স্থির থাকতে দেয় নি।" *(পৃ: ৯৯৮, ঐ)*

একজন মুক্তিকামী মানুষের একাকী চলার সংগ্রামের ইচ্ছা কীভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে কালকূটের মানসভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে শাম্বকে অনুসরণ করলেই বোঝা যাবে। জনপদে তিনি লাঞ্ছিতও হয়েছেন। চোখ ফেটে জল এলেও সহ্য করবার শক্তি অর্জন করেছেন। সুখ এবং দুঃখকে একত্রে গ্রথিত করে, সর্বদাই নির্বিকার থেকে শুধু ভবিষ্যতের কথাই ভেবে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন। মহর্ষি নারদ কথিত সেই অত্যুজ্জ্বল পুরুষের মূর্তিই কেবল কল্পনা করেছেন শাম্ব। কালকূট মানসচক্ষে শাম্বর অন্তরভূমিকে প্রত্যক্ষ করতে করতে তার সঙ্গে তারই ঈপ্সিত লক্ষ্যে দিকে এগিয়ে চলেছেন। সাত সাতটি ঋতু অতিক্রম করে সুখ-দুঃখকে একত্রে গ্রথিত করে শাম্ব তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। চন্দ্রভাগা নদীতীরে পৌঁছে তাঁর অন্তরে গভীর আনন্দের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছিল। চন্দ্রভাগার তীরে পৌঁছেও তার সন্দেহ দূর হয়নি। তাই তিনি নদীর ওপারে গমনাগমনকারী যাত্রীদের বারে বারে ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞাসা করছিলেন "সিন্ধুনদ থেকে উৎপন্ন এই কি সেই চন্দ্রভাগা নদী?" *(পৃ: ৯৯৮, ঐ)* যাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাদের সকলেরই দেহের গড়ন দীর্ঘ। তারা রসিক ও আমুদে মানুষ। তাদের কাছে জেনেছিলেন যে এই নদীটির নামই চন্দ্রভাগা — এটি তারা

জানেন। সূর্যাস্তকালে সূর্যের শেষ রক্তাভ তাদের মাথায় এসে যেমন পড়েছে তেমন নদীর বুকে এসেও পড়েছে। নদীর পাড় উঁচু, কিছু কিছু কুটির ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যা দেখে শাম্ব মনে হয়েছে নিশ্চয়ই এই নদীতে বন্যা হয়, তাই জনবসতি কম। জনবসতি কম ঠিক, কিন্তু নদীর তীরে ফসল ফলানো হয়েছে। এমন একটি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে শাম্ব আসন্ন সন্ধ্যায় উপস্থিত হলেন। লেখক কালকূট মানসচক্ষে শাম্বের অন্তর্লোক পর্যবেক্ষণ করছেন। 'চন্দ্রভাগা! শাম্ব যেন বারে বারেই শুনতে চাইছিলেন। কিন্তু মিত্রবন কোথা? নদীর এপারে না ওপারে? এইটিই পঞ্চনদীর দেশ তো?' *(পৃ: ৯৯৯, ঐ)* শাম্বের হৃদয়ের ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা সবকিছুই ফুটে উঠেছে শাম্বর কথার মধ্য দিয়ে। 'মিত্রবন' কোথায় এই পথ নির্দেশ একমাত্র মাঝিই দিতে পারবে এই মনে করে শাম্ব তখন মাঝির শরণাপন্ন হলেন। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত শাম্ব মানুষের চোখেমুখে যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে দেখেছেন এখানেও তার অন্যথা হল না। কালকূট মনভ্রমণে শাম্বর সঙ্গে চলতে চলতে যেন মানসচক্ষে মাঝি ও শাম্বের কথোপকথন শুনতে পাচ্ছেন, দেহ ও মনের অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছেন। শাম্ব কিছু মাঝিকে বলার আগেই রোগগ্রস্ত শাম্বকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে চোয়াল শক্ত করে মাঝি বলে উঠল, "ওহে, তোমাকে আমি শেষ খেয়ায় পার করব। এখন নিতে পারব না।" *(পৃ: ৯৯৮, ঐ)*

কালকূট মাঝির কথার মধ্য দিয়ে তার মানবিক, ধর্মীয় বোধটুকুকে তুলে ধরেছেন। নৌকার অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে কালকূটকে নৌকায় তুলে নিলে অন্যযাত্রীদের অসুবিধা হবে; যাত্রী পারাপার করাই তার কাজ, এখন তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবে আর শেষ খেয়ায় সে তার ধর্মীয় মানবিক বোধে একজন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত মানুষকে পার করবে। অতএব মাঝির কথা শুনে শাম্ব বিনীতভাবে বলেছিলেন আগে বা শেষে যখনই মাঝি তাঁকে পার দেবে তাতেই শাম্ব সার্থক জ্ঞান করবে। কালকূট শাম্বের একাকী চলার দীর্ঘ সংগ্রামের পথের টুকরো চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। তাঁর সেই লেখনীর টানই, তুলির টানে পৌঁছে গেছে। তিনি এ'কালের মন নিয়ে পুরাণের কালকে মানসচক্ষে ধরতে চেয়েছেন। সেকালের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীকে একালের দৃষ্টিতে বিচার বিবেচনা করে লেখনীর মাধ্যমে ভাষা দিয়ে সেকালের মানুষের অন্তরভূমিতে প্রবেশ করে তাঁদের মনের ভাষা, মুখের অভিব্যক্তি, সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ী তুলে ধরেছেন। একটি রোগমুক্তিকামী মানুষের আরোগ্যলাভের জন্য কঠোর কৃচ্ছসাধনের প্রতিটি মুহূর্ত কালকূট সমবেদনার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন তাঁর লেখনীর টানে। অপরদিকে একজন কুষ্ঠরোগীর প্রতি রাজপুরুষ, রাজবধূ, কন্যা থেকে সাধারণ মানুষ, বালক-বালিকা এমনকি সারমেয়কুলের কি ধরনের আচার আচরণ করে তার চিত্রের পাশাপাশি তাকে উপেক্ষা করে শাম্বের কৃচ্ছসাধনের পথে এগিয়ে যাওয়া এবং সেই সঙ্গে তাদের অন্তর্লোকে প্রবেশ করে তাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন

কালকূট। তাই চন্দ্রভাগার তীরে পৌঁছে নৌকার যাত্রীদের চোখের দৃষ্টি ও মুখের অভিব্যক্তি দেখেও শাম্ব আহত হননি; কেননা, এরকম ঘটনার সম্মুখীন তাকে বহুবার এই রোগমুক্তির জন্য দীর্ঘ চলার পথে হতে হয়েছে। তিনি সুখ-দুঃখকে একত্র করে নির্বিকার ভাবে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছেন। চন্দ্রভাগার তীরে পৌঁছে মিত্রবনে যাওয়ার জন্য তার মন উতলা হয়ে উঠেছে। মাঝি শাম্বের নম্র ও ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মিত্রবনের পথ নির্দেশ দিয়েছিল। সন্ধ্যাকালে খেয়া পার হয়ে ওপারে গেলেই মিত্রবন। শাম্ব মাঝির মুখ থেকে 'মিত্রবনে'র পথ নির্দেশ পেয়ে আনন্দিত হয়ে বললেন, "ভাই, পঞ্চনদীর দেশের মাঝি, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।" *(পৃ: ৯৯৯, ঐ)* মাঝি শাম্বের কথা শুনে এতই প্রসন্ন হয়েছিল যে তার চোখেমুখে করুণার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল। কালকূট মাঝির অন্তরের ভাবনায় ডুব দিয়েছেন। মাঝি ভাবছে এপারে কোনও গ্রাম নেই, তার ওপরে রাতে যক্ষরা বাতাসে ভেসে বেড়ায়, যদি শাম্ব ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে বনে হিংস্র পশুরা তাকে খেয়ে ফেলতে পারে। তার চেয়ে ওপারে গ্রাম আছে, তাঁকে খেয়া পার করে দিলে শাম্ব গ্রামের কোথাও আশ্রয় পাবে। এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে মাঝি তার আশঙ্কার কথা বলে ফেলে আবার তাকে শেষ খেয়ার জন্য অপেক্ষা করতে বলল। একদিকে ধর্মবোধ ও আর একদিকে শাম্বের কাছ থেকে পাওয়া সম্মানের জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ। একজন কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত যাত্রীকে সে দিনের শেষে পার করে দেবে। কালকূট মাঝির কর্মের মধ্য দিয়ে মাঝির ধর্মবোধকে তুলে ধরেছেন। পুরাণে যে কর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তিনি মাঝির পারাপারের কাজের মধ্য দিয়ে পুরাণকালের মাঝিকে তুলে ধরেছেন।

মাঝির পথ নির্দেশ মেনে নদীর চারটি বাঁক পেরিয়ে এসে ছোট ছোট টিলাযুক্ত একটি জায়গা দেখতে পেয়েছিলেন। সেই টিলাগুলোর গায়ে ছোট ছোট গুহা। যেগুলো দেখে শাম্বের মনে হয়েছে গুহাগুলো মানুষের তৈরি। গুহাগুলোর পাশে ঝোপঝাড়ের মাথাগুলো একসঙ্গে লতাগুল্ম দিয়ে শক্ত করে বেঁধে প্রবেশের জন্য একটি প্রবেশ মুখ রেখে কুটিরের মত তৈরি করা হয়েছে, শুধু হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকা যায়। শাম্ব দেখতে পেলেন কাঠের আগুনের লেলিহান শিখা। ওই আগুনের আলোতে যাদের মূর্তি স্পষ্ট হয়ে তাঁর চোখে ধরা পড়ল তারা সকলেই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত। কিন্তু এদের দেখে মুহূর্তের মধ্যে শাম্বর মনে আনন্দের ঝিলিক খেলে গেল, তিনি মিত্রবনে এসে গেছেন। তাই শাম্ব তাদের কাছে আরও জানতে চেয়েছিলেন "সেই সূর্যক্ষেত্র কোথায় যেখানে গ্রহরাজ পরমাত্মন্ অবস্থান করছেন?" *(পৃ: ৯৯৯, ঐ)* হাস্য পরিহাসের মধ্য দিয়ে একজন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তরও দিয়েছিল যে গ্রহরাজ-টাজ সে কিছুই দেখেনি, তবে মান্ধাতা আমলের একটা মন্দির আছে ওটাকেই সকলে সূর্যক্ষেত্র বলে। রাজার মত একটা জুতা-জামা পরা মূর্তিটাই নাকি সূর্যমূর্তি। তারা চান করে রোজ একবার সেই মূর্তিকে গড় করে আর একজন পুরুষ বলল 'অপ্সরা মূর্তি বেশ সুন্দর, আমি

রোজ তার গায়ে গা ঘষি।' *(পৃ: ১০০০, ঐ)*

কালকূট মানসচক্ষে এ'কালের দৃষ্টি নিয়ে পুরাণের কালের একদল কুষ্ঠরোগীদের আস্তানায় রোগীদের মানসিক অবস্থা, বাঁধনহীন সামাজিক ব্যবস্থা ও ক্রমশ পচে-গলে ক্ষয় হয়ে যাওয়া আশাহত, হতমান ও অবিশ্বাসী মৃত্যুপথ যাত্রীদের অবলোকন করছেন। কালকূট শাম্বের অন্তর্লোকে ডুব দিয়ে মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছেন মিত্রবনে বসবাসকারী কুষ্ঠরোগীদের সঙ্গে কথাবার্তা কালে শাম্বের মনের গহীনে আলোড়ন তোলা মনোবেদনাগুলো এবং শুনতে পাচ্ছেন সেই বেদনামিশ্রিত প্রশ্নগুলোর সুর ঝংকার। কী ভয়ংকর অসহায় ছিল সেই সমাজ পরিত্যক্ত, রোগমুক্তিতে আশাহীন, কেবলই মৃত্যুর প্রহর গোনা মানুষগুলো। কালকূট মানসভ্রমণে সেই সমাজচিত্র তুলে ধরেছেন তার অনবদ্য ভাষামাধুর্য্যের ছোঁয়ায়। শাম্ব যেখানে পৌঁছেছে সেখানকার মানুষগুলির জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার চিত্র দেখে নেওয়া যাক্। একজন বলল, "আমরা সংসারও করি। এই সব মেয়েছেলেরা প্রতি বছরই পোয়াতি হয়, আর বাচ্চা বিয়োয়।" *(পৃ: ১০০০, ঐ)* এইসব কথা শুনে ভগ্নকেশ বিবর্ণ পুচ্ছহীন রক্তচক্ষু রমণী সবাই হেসে উঠে। তার মধ্য থেকেই একজন বলল, "আমাদের বাচ্চাগুলো প্রথমে ফুটফুটে হয়ে জন্মায়। চার-পাঁচ বছর বয়স হলেই ওরা আস্তে আস্তে আমাদের মতন হয়ে যায়।" *(পৃ: ১০০০, ঐ)* আর একজন রমণী তার বুকের ফুটফুটে বাচ্চাটিকে দেখিয়ে বলেছিল, "ওর বাবারও কুষ্ঠ ছিল, দু'দিন হলো মরে গেছে। আমার ছেলে যখন একটু বড় হবে, তখন ওরও কুষ্ঠ হবে। কিন্তু সে সব নিয়ে আমি ভাবি না। রাত হলেই পুরুষের সঙ্গে ছাড়া আমি থাকতে পারি না। তুমি নতুন এসেছো, এখন থেকে আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো।" *(পৃ: ১০০০, ঐ)*

ছোট ছোট ঘটনা চিত্রের মধ্য দিয়ে কালকূট ব্যাধিগ্রস্ত মানুষগুলোর জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁর দরদী, মর্মস্পর্শী অনুভূতি দিয়ে। তাঁর সেই মানবদরদী অনুভূতিগুলো তিনি শাম্বের জীবনবোধের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। শাম্ব রোগমুক্তির কারণে একক সংগ্রামে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে পৌঁছেছেন সূর্যক্ষেত্রে তথা মিত্রবনে। সেখানকার কুষ্ঠরোগীদের ইতর কথাবার্তা ও রঙ্গ পরিহাস শাম্বকে চিন্তিত করে তুলেছে। এদের কোন সামাজিক বাঁধন নেই, কোন বংশপরম্পরা নেই, দূর-দূরান্ত থেকে রোগমুক্তির কারণে মিত্রবনে এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু রোগমুক্তি দূরে থাক, রোগমুক্তির কোনো আশা না দেখে তারা মৃত্যুকেই অবধারিত মনে করেছে এবং জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ; রোগমুক্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত অবিশ্বাস তৈরি হয়ে গেছে। জীবনের সম্পর্ক-বোধের জায়গাগুলো নেই। তারা জীবন সম্পর্কে আশাহত, অবিশ্বাসী। তারা মনে মনে এত আহত যে তাদের সোজা হয়ে দাঁড়াবার মত বলিষ্ঠতা বা দৃঢ়তা নেই। ভিক্ষা করে যেটুকু খাদ্য পাওয়া যায় সেটুকু দিয়েই তারা জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে চায়। শাম্ব নিজে পিতার দ্বারা অভিশপ্ত, অমোঘ তাঁর পরিণতি। তার হৃদয় ব্যথায় কাতর হয়ে উঠল এইসব ব্যাধিগ্রস্ত শিশুদের দেখে। কালকূট মনশ্চক্ষে শাম্বের

ভাবান্তর লক্ষ্য করেছেন "এদের মুক্তির কি কোনো উপায় নেই? তাঁর নিজের মুক্তিরই বা কী উপায়? মহর্ষি নারদোক্ত বৃত্তান্ত তো কখনো মিথ্যা হবার নয়। তিনি কি প্রকৃতই মহর্ষি নারদ কথিত সেই সূর্যক্ষেত্র মিত্রবনেই এসেছেন? অথচ এই স্থান, এইসব হতমান অবিশ্বাসী ব্যাধিগ্রস্তদের দেখে তা মনে হয় না।" *(পৃ: ১০০১, ঐ)* শাম্বর কথাবার্তা শুনে তাদের মনে হয়েছে যে এঁর কথাবার্তা 'রাজপুরুষের মত', আবার কারো কারো মনে হয়েছে 'ঋষিদের মত'। আবার এর বিপরীতমুখী দিকটাও লেখক তুলে ধরেছেন ছোট ছোট ইতর অশ্লীল কথাবার্তার মধ্য দিয়ে। দীর্ঘদিন কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে থাকতে থাকতে তাদের জীবনযাত্রা নোংরামিতে পূর্ণ হয়ে গেছে মনের অজান্তেই। তবুও তার মধ্যে শাম্ব তাদের মানবিক দিকও দেখতে পেয়েছেন। শাম্ব কোথা থেকে এসেছে তা তারা জানতে চেয়েছে। শাম্ব উত্তর দিয়েছেন যে 'কোথা থেকে এসেছি' সে কথা বলার দরকার নেই কেননা অতীতকে ভুলে যাওয়াই শ্রেয়। শাম্বর কথায় তারাও সায় দিয়ে বলেছে 'কিন্তু তোমার কথাবার্তার ধরণ-ধারণগুলো বড্ড জ্ঞানীগুণীদের মত লাগছে। বলি, তোমার কি ক্ষুধা তেষ্টা বলে কিছু আছে? থাকলে আমরা দিতে পারি।' *(পৃ: ১০০০, ঐ)* এই কথা শুনে এদের মধ্যে সবচেয়ে তরুণী নারীটি তার বাচ্চাটিকে শাম্বর কোলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে একটি পাত্রে বিভিন্ন রকমের তন্ডুলের সঙ্গে শাক সেদ্ধ করা খাবার এনে শাম্বকে দিয়েছিল। নতুন অতিথি এসেছে, নীলাক্ষি তাকে আপ্যায়ন করেছে অতএব তার দাবীই সর্বাগ্রে। তারা এই ব্যাপারটি ইতর-অশ্লীল কথাবার্তায় মেতে উঠল। ছোট শিশুটিকে নিয়ে বিব্রত শাম্বকে তারা বলেছিল যে নীলাক্ষির ছেলে তার নতুন বাপকে এখনও চিনে উঠতে পারেনি। 'ওহে ছেলের বাপ, ছেলেকে একটু আদর করছো না কেন?' *(পৃ: ১০০০, ঐ)* কেউ কেউ শাম্বর আচরণ দেখে বললো যে তার ঘরে কি বউ ছিল না? ছেলেমেয়ে ছিল না? সে তো মোটেই ঘরকন্না জানে না। সে কি রাজ-রাজড়ার ছেলে? আবার ঐরকম শারীরিক কষ্টের মধ্যেও প্রীতিপূর্ণ কথাও লেখক তুলে ধরেছেন। নীলাক্ষি বলেছে 'ওহে প্রাণ, তোমাকে যা দিয়েছি, তা খাও। আমার এখনো কিছু রাখা আছে, সকালে তাই খাবো। তোমার খিদে না মিটলে যেটুকু রেখে দিয়েছি, তাও তোমাকে দিয়ে দেবো।' *(পৃ: ১০০১, ঐ)* আর একজন রমণী তাঁকে নীলাক্ষির দেওয়া খাবারটা খেতে বলল কিন্তু একটু রসিকতাও করলো। 'নীলাক্ষি তোমাকে পেয়ে খুশী। তোমাকে খাইয়ে আরো খুশী। তুমি তোমার দানটা রাত্রে ভালো করে দিও, নীলাক্ষিকে সুখী করো।' *(পৃ: ১০০১, ঐ)* এই কথায় সকলে হৈ হৈ করে উঠলো। রাতের আগুনের শিখায় ওদেরকে তাঁর ভয়ংকর প্রেতমূর্তির মতো মনে হোল। নীলাক্ষি শাম্বর হাঁটুতে একটা চাপড় মেরে খিলখিল করে হেসে উঠে 'তার পুচ্ছহীন রক্তাভ চোখে অতিপ্রার্থনীয় উল্লাসে ইশারা করলো। শাম্ব যেন অন্তরে হলেন। এই শিহরণে কোনো সুখ বা কামোচ্ছ্বাস নেই। এই শিহরণ তাঁর কাছে পূর্ব জীবনের স্মৃতিযুক্ত, অথচ ভয়জাত। তিনি অভিশপ্ত, কারণ তিনি রমণীমোহন ছিলেন। সেই

অভিশানের ফল তিনি বহন করছেন।' *(পৃ: ১০০১, ঐ)*

ভিন্নমুখী চিন্তাধারা নীলাক্ষিসহ তার সাথীদের চিন্তাধারার সঙ্গে শাম্বর চিন্তাধারা। আশাহীন জীবনে নীলাক্ষিদের বন্ধনহীন, মৌনাচারে শাম্ব চিন্তিত, শঙ্কিত। গৃহ থেকে বিদায়ের পূর্বে পত্নীর ধর্ম রক্ষার্থে তিনি শেষবারের জন্য রমণ করেছিলেন, ভোগের কামোদ্দৃপ্ত উচ্ছ্বাসে তৃপ্ত হবার জন্য নয়। অতএব তিনি যে নীলাক্ষির আশা পূরণ করতে পারবেন না বলেও বললেন 'কিন্তু আমি ক্ষুধার্ত, আমি কি তবু এই অন্ন খেতে পারি?' *(পৃ: ১০০১, ঐ)* শাম্বর কথা শুনে তারা আবার হৈ হৈ করে উঠলে ও নীলাক্ষি তাকে আগে পেটের খিদে মেটাতে বলেছিল। তারপরে অন্য খিদের কী হয় তা পরে ভাবা যাবে। ছোট ছোট বাক্যের মধ্যে সমাজ বহির্ভূত এক রোগগ্রস্ত মানবগোষ্ঠীর জীবনায়ন তাঁর লেখনীতে উঠে এসেছে। শাম্বর চোখ দিয়ে লেখক সেই জীবনযন্ত্রণাকে তুলে এনেছেন। তাদের মানবিকতাবোধ, সুখ-দুঃখবোধ, আশা-নিরাশার দোলা সব লেখক তুলে ধরেছেন তার কথকতার গুণে, সেকাল-একাল একাকার হয়ে গেছে। শাম্ব তার দীর্ঘ চলার পথে এইরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন কখনও হননি, এদের দেখে তাঁর এই অভিজ্ঞতাই অর্জিত হল! তিনি মনে মনে এই ব্যাধিগ্রস্ত, আশাহত মানুষগুলির মুক্তির উপায় খুঁজতে লাগলেন। তিনি তাদের ব্যাধিমুক্ত নতুন জীবনের সন্ধান দিতে চান। শাম্ব তার অন্তরে 'ব্যাধি থেকে আরোগ্যেই মুক্তি' এই বিশ্বাসে অটুট থেকে নীলাক্ষির দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করলেন।

নীলাক্ষির দেওয়া খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হৃদয়ে তিনি তাদের কাছে মন্দিরের বিগ্রহ সম্পর্কে জেনেছিলেন যে মন্দিরে কখনও পুজো হতে দেখে নি এবং মন্দিরের পুব দিকে একজন মুনি-পুরুষের আশ্রম আছে। তিনিও পূজা করেন না। এ কথার পাশাপাশি তিনি শুনতে পেলেন অন্য একজনের ব্যঙ্গধ্বনি — সেই মুনি বেহ্মচর্য্যি পালন করতে, উপোস করতে বলেন এবং রোজ ভোরবেলা স্নান করে সূর্যের দিকে মুখ করে বসে থাকতে বলেন, আর নদীর ধারে চাষ করতে বলেন। কিন্তু তারা এসব করবে কেন? 'আমরা কি এখানে ঘর সংসার করতে এসেছি? আমরা সবাই একদিন পচে-গলে মরে যাব।' *(পৃ: ১০০২, ঐ)* কুষ্ঠরোগীদের শারীরিক অবস্থা, শেষ পরিণতি ও তাদের মানসিক যন্ত্রণাবোধগুলো নিপুণভাবে লেখক তুলে ধরেছেন। সেই কথা শুনে অনেকেই ভয় পেয়ে কেঁদে উঠলো। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। কেউবা অন্ধকারের দিকে চলে গেল। আর শাম্ব তাদের কথা শুনে মনে মনে সেই মুনি ঋষিকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হলেন, কিন্তু রাতের অন্ধকারে অচেনা জায়গায় যাওয়া সমীচীন হবে না জেনে মনের ইচ্ছাকে দমন করলেন। রাত্রি গভীর হতে প্রায় সকলেই যে যার মৃত্তিকা গুহায় বা পাতার কুটিরে চলে গেল। কিন্তু নীলাক্ষি ছেলে কোলে নিয়ে সহবাস কামনায় গভীর প্রত্যাশা নিয়ে বসে থাকল। তিনি তাকেও ছেলেকে নিয়ে ঘুমাতে যেতে বললেন কিন্তু নীলাক্ষি আশাহত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'আর তুমি? তুমি কী

করবে, কোথায় থাকবে?' *(পৃ: ১০০২, ঐ)* সে তার শঙ্কার কথা জানিয়েছিল। সারারাত বাইরে থাকলে নেকড়েরা তাকে ছিঁড়ে খাবে। এছাড়া একজন পুরুষ না থাকলে তার সব ফাঁকা ফাঁকা লাগে। নীলাক্ষির পুরুষসঙ্গী মাত্র দুদিন আগে মারা গেছে। তাকে সে ভুলে গিয়েছে কিনা এ'কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলেছে 'কেন ভুলে যাবো? তাকে আমার ভালোই মনে আছে। আমি তার জন্য অনেক কেঁদেছি। কিন্তু আমাদের জীবনে ওসব শোক-দুঃখের কী দাম আছে? তুমি শুনলে না, আমরা রোজই একটু একটু করে পচে-গলে মরে যাচ্ছি? তোমার মত নতুন যারা আসে তারা সবাই কয়েকদিন এইরকমই ভাবে।' *(পৃ: ১০০২, ঐ)* কী অসহনীয় বেদনাবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন লেখক শাম্ব ও নীলাক্ষির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। কালকূট মনশ্চক্ষে শাম্বের সেই মুহূর্তের অনুভূতিকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। ধরতে চেয়েছেন এক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত তরুণীর জীবনযন্ত্রণাকে।

শাম্ব নীলাক্ষির আবেদনে সাড়া দিতে পারে না। নীলাক্ষির প্রতিটি অভিজ্ঞতা সত্য, যন্ত্রণা সত্য। কিন্তু শাম্ব রোগমুক্তির কল্পনা নিয়ে সূর্যক্ষেত্র মিত্রবনে এসেছেন। নীলাক্ষি শাম্বর এমন ব্যবহার আশা করেনি। অভিমানে আহত হয়ে শাম্বকে বলেছিল, সে যখন সুস্থ ছিল তখন ঋষিপুরুষরাও তার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যেত। তাকে ধিক্। পরে ডাকলে আর কখনও আসবে না বলে ক্রুদ্ধ হয়ে সে রাত্রি শেষের অপেক্ষা করতে থাকলেন একাকী, অগ্নিকুণ্ডলী জ্বেলে। নীলাক্ষিকে ফিরিয়ে দিয়ে আশাহত, ব্যাধিগ্রস্ত মানুষগুলোর বন্ধনহীন যৌনাচারের সমাজজীবনের কথা ভাবছিলেন। কুষ্ঠরোগ থেকে কোনওদিন নিরাময় পাওয়া যেতে পারে এই বিশ্বাসটাই নীলাক্ষির চলে গেছে। তিনি অত্যন্ত সমবেদনার সঙ্গে সেকালের পটভূমিকায় শাম্ব ও নীলাক্ষি সহ পারিপার্শ্বিক চরিত্রগুলোর মুখে নিজের মনের মধ্যে বয়ে যাওয়া কথাগুলিকে ভাষা দিয়ে চরিত্রগুলিকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন।চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে লেখকের আধুনিক মনস্কতা সেকালের পটভূমিকায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং লেখকের বক্তব্য কখনই কালকে ছাপিয়ে যায় নি, সেইকাল-এর পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রগুলো যেমনটি হওয়া দরকার লেখক সেইভাবেই তাদের চিত্রিত করেছেন এবং বলিষ্ঠ বক্তব্যের ছাপ রেখেছেন চরিত্রগুলোর মুখে তারই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কথা বসিয়ে।

শাম্ব নিজে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়েও এদের মতো বিশ্বাস হারাননি। তিনি মুক্তি অভিলাষী। মুক্তিপথে তিনি একক সংগ্রামী। এই অসহায় ব্যাধিগ্রস্ত মানুষদের দেখে শাম্ব ভাবছেন "এদের মুক্তির কি কোনো উপায় নেই? তাঁর নিজের মুক্তিরই বা কী উপায়।" *(পৃ: ১০০১, ঐ)* শাম্বের একক মুক্তির চেতনা গণমুক্তির চেতনা তথা বিশ্ব জনমুক্তির চেতনায় রূপান্তরিত। শাম্বর ভাবনাকে লেখক পুরাণকাল থেকে বর্তমানকালের ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে শাম্ব চরিত্রের একটি উচ্চতর মাত্রা এনে দিলেন। শাম্বর এই রোগমুক্তির ভাবনাকে বর্তমানের আন্তর্জাতিক রোগমুক্তির ভাবনায় তুলে ধরেন। 'কুষ্ঠরোগ' নির্মূল করতে হবে, কুষ্ঠরোগীদের মনে এই বিশ্বাস

জাগিয়ে তুলতে হবে যে কুষ্ঠরোগ অভিশাপ নয়, এই রোগ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

পরদিন অতি ভোরে চন্দ্রভাগায় শীতল জলে স্নান করে মন্দিরে মন্দিরে পৌঁছে গেলেন। শাম্বর দেখা মন্দিরটিকে কালকূট এইভাবে বর্ণনা করেছেন — "একটি বৃহৎ রথের ন্যায় মন্দিরের গঠন। দ্বার আছে, কিন্তু কোনো প্রাচীরের দ্বারা মন্দিরটি বেষ্টিত নয়। রথের ন্যায় মন্দিরের চারদিকে চারটি দ্বার, পিঙ্গলা-দন্ডনায়ক, রাজ্ঞা ও স্তোশ্রা, কালমাস-পক্ষীন, ভিওমান ও নগ্নদিন্ডি, দ্বারপালগণ রয়েছেন। অপ্সরাগণ রথের বিভিন্ন অংশে নৃত্যে সঙ্গীতে ও বাদ্যযন্ত্রাদি বাদনের অপরূপ ভঙ্গিতে রয়েছেন। তাছাড়া দেবতাগণ, যক্ষ, গন্ধর্বগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীগণ, মারুতগণ সকলেই যথাস্থানে অবস্থান করছেন। মাথার ওপরে ছত্র, সেই আশ্চর্য পুরুষ মূর্তি অবস্থান করছেন। শিরস্থান তার মস্তকে, কোমর বন্ধনরূপে রয়েছে অভিয়ঙ্গ, পদতলের কনুইয়ের উর্ধ্ব পর্যন্ত পাদুকা শোভা পাচ্ছে।" *(পৃ: ১০০৩, ঐ)* শাম্ব মন্দিরের চারিধার একবার ঘুরে এসে নদীতীরে দেখলেন অভূতপূর্ব দৃশ্য। কালকূট শাম্বর চোখ দিয়ে প্রকৃতি সহ মানুষকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। কালকূট শাম্বের দেখাটা তুলে ধরেছেন এইভাবে — "দেখলেন, পূর্বাকাশব্যাপী রক্তাভার মধ্যে বিশাল সিন্দুর গোলকের ন্যায় সূর্য উদিত হচ্ছেন। একজন উজ্জ্বলবর্ণ পুরুষ, তাঁর সারা গায়ে জল, শুভ্র কেশ ও গুম্ফ ও শশ্রু বিন্দু বিন্দু জলে চিকচিক করছে।" *(পৃ: ১০০৩, ঐ)* তিনি নদীতীরে দাঁড়িয়ে চোখ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে করজোড়ে দুইহাত সূর্যের দিকে প্রসারিত করে আছেন। শাম্ব ভাবছেন, কী করে ওই তেজোদীপ্ত পুরুষ অপলক দৃষ্টিতে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছেন? মহর্ষি নারদের সবই তো মিলে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ঋষি পুরুষ তাঁর সূর্য বন্দনা শেষ করে মন্দিরের দিকে না গিয়ে উত্তরদিকে এগিয়ে গেলেন। শাম্ব যেন ধীরে ধীরে এক অদৃশ্য আকর্ষণে তার পেছন পেছন রমণীয় কাননের মধ্যে এগিয়ে চলেছেন। শাম্ব মনে মনে যখন যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত, আর তাঁকে অনুসরণ করবেন কিনা এমনই সময়ে সাধু পুরুষটি পিছন ফিরে তাকালেন। শাম্ব আর অগ্রসর না হয়ে সেখান থেকে নতজানু হয়ে তাঁকে আভূমি প্রণাম করে ক্ষমা চেয়ে নিলেন 'মহাতপাঃ' বলে। মুনি ঋষিকে অশেষ তেজ প্রভাবযুক্ত বলে তাঁর মনে হয়েছে।

সাধুটি অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ম নজরে শাম্বকে দেখে কিছু বুঝবার চেষ্টা করলেন ও শেষে শাম্বকে অনুসরণ করতে বললেন। একজন সদ্যস্নাত উপাসক যে শাম্বকে সাদরে আহ্বান জানাতে পারেন একথা ভাবতেই পারেন নি। দীর্ঘদিনের চলার পথে এই প্রথম একজন সাধুপুরুষ তাঁকে সমাদরে আহ্বান করলেন, এতদিন শুধু ঘৃণা, বিদ্রূপ, অবহেলা, পীড়ন সয়ে এসেছেন। তাই সাধুর আহ্বানে শাম্ব তাঁর অন্তরে গভীর আস্থা অনুভব করে মহান সাধুপুরুষটিকে অনুসরণ করতে লাগলেন। সেই সময়ে দূরে চন্দ্রভাগায় বহু মানুষের কোলাহল শুনতে পেয়ে শাম্ব বুঝতে পেরেছিলেন যে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত নারী-পুরুষ-বালক-বালিকারা বোধহয় স্নান করছে। মহান সাধুটির পরামর্শ মত শাম্ব

দক্ষিণ-পূর্ব মুখ করে এই তপোবনের মধ্যে কোথাও মুক্ত রৌদ্রে বসে রইলেন। এক মহত্তর আনন্দের উপলব্ধি তাঁর মনকে আন্দোলিত করতে লাগল। মনে মনে অনুশোচনা হতে লাগল দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ তনয় শাম্ব এতদিন ভোগ, বীরত্ব, শত্রুনিধন, ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন— এ সবই জানতেন; কিন্তু এর বাইরেও যে এক জীবন আছে তপোবনমধ্যে নিরালায় বসে একাকী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করার মধ্যে যে একটা আলাদা অনুভূতি, আনন্দ আছে তা শাম্ব আগে কখনও বুঝতে পারেন নি।

এক রমণীয় তপোবনে বসে শাম্বের মধ্যে শুদ্ধাচারের একদিক, সৌন্দর্যমণ্ডিত একদিক ভেতরে ভেতরে কাজ করে যাচ্ছিল। কালকূট যেন তাঁর মনশ্চক্ষে সেই শাম্বর অন্তরভূমিকে প্রত্যক্ষ করছেন। 'এই নাও, এই ফলমূলাদি খাও, যৎসামান্য মিষ্টি খেয়ে জলপান করো।' *(পৃ: ১০০৪, ঐ)* ঋষির ডাকে শাম্ব ভাবাবেশ মুক্ত হয়ে সামনে ঋষিকে দেখতে পেয়ে গ্রহরাজকে আভূমি প্রণাম করে ঋষির দিকে ফলমূলাদি নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন। ঋষি তাকে খাদ্য অন্যদের মতো ছুঁড়ে না দিয়ে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে জলপূর্ণ পাত্র সহ খাদ্য পরিবেশন করে তার পাশে বসে রইলেন। শাম্বর হৃদয় এই ব্যবহারে অভিভূত হয়ে গেল, তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসতে লাগল। কালকূট তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে ধরলেন সেই সুদূর অতীতে। তিনি যেন দেখছেন শাম্বর অন্তরভূমিকে, রোগাক্রান্ত হওয়ার পরে দীর্ঘ পথ অতিক্রমকালে কেউ তাকে এমন যত্ন করে খাদ্য পরিবেশন করেনি। শুধুই মানুষের ঘৃণা, অবহেলা উপহাসের মধ্য দিয়ে তাদের ছুঁড়ে দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করেছেন। আর দুরন্ত বর্ষায়, তীব্র শীতে গোয়ালের বা বর্হিবাটির দাওয়ায় তাঁর চলার পথের অধিবাসীরা তাঁকে থাকতে দিয়েছেন। কিন্তু শাম্ব তাদের ওপর রাগ করেন নি। নিজেকে শাম্ব সেই অধিবাসীদের জায়গায় দাঁড়িয়ে ভেবেছেন কুষ্ঠরোগীর প্রতি তার ব্যবহারও এমনটিই হত। শাম্বর খাওয়া শেষ হলে ঋষির জিজ্ঞাসায় শাম্ব শুধু পরিচয় দিয়েছিলেন "এখন আমার একমাত্র পরিচয়, আমি অভিশপ্ত। শাপমোচনের দ্বারা মোক্ষ লাভই আমার লক্ষ্য।" *(পৃ: ১০০৫, ঐ)* মহর্ষি নারদের নির্দেশ মতো গতরাত্রিতে সূর্যক্ষেত্রে এসে চন্দ্রভাগার তীরে এসে ঐ হতমান, মুহ্যমান, মৃতপ্রায়, অবিশ্বাসী রোগগ্রস্ত মানুষদের সঙ্গে রাত্রি কাটানোর কথা, তাদের কথাবার্তা, জীবনযাত্রা এবং ঋষিপুরুষ সম্বন্ধে তাদের ধারণা সব ধীরে ধীরে ব্যক্ত করলেন।

কালকূট মানসভ্রমণে যেন দেখছেন প্রভাযুক্ত ঋষির সঙ্গে কথা বলে শাম্বর মনে এক গভীর শান্তি ও অনির্বচনীয়তা এনে দিয়েছে। তিনি মহাত্মা ঋষির কাছে জেনে নিয়েছেন যে ঋষির বেদে অধিকার থাকলেও ওই মন্দিরে বিগ্রহ পূজা নিষেধ, কেননা তিনি "দেবলক ব্রাহ্মণ"। তিনি জানেন প্রাচীনকাল থেকেই এই স্থান "সূর্যলোক নামে খ্যাত। আমি প্রতিদিন গ্রহরাজেরই পূজা করি।" *(পৃ: ১০০৫, ঐ)* তিনি আরও জানালেন যে যখন গ্রহরাজের মূর্তি কল্পিত হয়নি তখন একটি রক্ত

মণ্ডলাকার অঙ্কনদ্বারা সর্বত্র গ্রহরাজের উপাসনা হত তিনিও তাই ওইভাবেই গ্রহরাজের পূজা করেছেন। "এই গ্রহরাজ সর্বদেবমান্য, সর্বভূতমান্য, সর্বশ্রুতিমান্য" একথা বেদে বলা আছে। তিনি আরও বলেছেন যে "গ্রহরাজ আদি ও অনন্ত। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা এবং নিয়ন্তা। তিনি ভয়ংকর কিন্তু শান্ত। তিনি প্রচণ্ড অগ্নিময়, কিন্তু জীবের জীবনধারণের কারণ।" *(পৃ: ১০০৫, ঐ)* বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে তিনি পরিচিত, একটি নাম হল 'বিবস্বান'। শাম্ব শুনেছিলেন যে ভারতবর্ষ ও ইলাবৃত বর্ষের মধ্যস্থল পর্বতের অন্তরীক্ষবাসী গন্ধর্বরাজ বিবস্বানের কথা। তাঁর পুত্র কন্যাদের নাম বৈবস্বত মনু, যম, যমী, সাবর্ণি মনু ও অশ্বিনীদ্বয় এবং ইক্ষ্বাকু বিবস্বানেরই বংশধর। পরবর্তীকালে ইক্ষ্বাকু রাজের বংশধররা সূর্যবংশ নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। প্রভাযুক্ত ঋষি শাম্বের জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে আরও জানালেন যে, গন্ধর্বরাজের মহাবলশালীতা ও তেজোদীপ্তময়তাকে লোকে সূর্যসম মনে করতেন। ফলে পরবর্তীকালে বিবস্বান বললে সূর্য অথবা রাজাকে বোঝাতে। তিনি গ্রহরাজকে বিবস্বান বলে অভিহিত করেছেন। গ্রহরাজের বর্তমান মূর্তি কল্পিত, বিবস্বানের ন্যায়ও হতে পারে। বিশ্বকর্মা সম্প্রদায়ের শিল্পীরা মানুষের কল্পনাকে রূপ দান করেছেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। এই স্থান গ্রহরাজের মূলস্থান অর্থাৎ অস্তচলমানস্থান কারণ " তিনি যখন এই ভূমণ্ডলের অন্য পৃষ্ঠে আলোকদান করেন, তখন এখানে তার শেষ কিরণের একটি গুণ কার্যকরী হয়।" *(পৃ: ১০০৬, ঐ)*

এছাড়া আরো দুটি স্থান ও কাল বিভাগ আছে। একটি পূর্বাঞ্চলে, লবণদধি অঞ্চলে তিনি প্রথম আবির্ভূত হন পূর্বোত্তর কোণে, এইজন্য তাকে কোণাদিত্য বলা হয় এবং তিনি উত্তর-পশ্চিমে অস্তাচলে যান। আর যমুনার দক্ষিণ ভাগে দ্বারকার নিকটবর্তী স্থানে তিনি মধ্যাহ্নে অবস্থান করেন। কালপ্রিয় নামে অভিহিত। মহাব্যাধি থেকে মুক্ত হতে হলে সম্বৎসরকে তিনভাগে ভাগ করে এই তিন স্থানে অবস্থান করতে হবে অর্থাৎ গ্রহরাজের প্রভাব অঙ্গে ধারণ করতে হবে। শাম্ব প্রভাযুক্ত ঋষির কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে রোগমুক্তির জন্য এই ত্রিক্ষেত্রে গমনের আগে আরও কিছু নির্দেশ তাঁর কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলেন। দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ তীর্থ ও নদনদীতে গ্রহরাজ অতি ক্রিয়াশীল থাকেন, অতএব দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ দিনে সেইসব নদনদীতে স্নান ও রশ্মিযুক্ত হলে ব্যাধির আরোগ্য ঘটে। শাম্ব অতি আগ্রহান্বিত হয়ে ঋষি মহাপুরুষের কাছ থেকে দ্বাদশ তীর্থ ও নদনদীর নামগুলো জেনে নিলেন। তার মধ্যে একটি চন্দ্রভাগা এছাড়া সবই উত্তর অংশে, বিন্ধ্যপদে ও দক্ষিণের উত্তরাঞ্চল সীমানায়। এসব তীর্থক্ষেত্রে একদিন করে থাকতে গেলেও ছয় ঋতু অতিক্রম করে সাত ঋতুতে শাম্বকে এই চন্দ্রভাগার তীরে ফিরে আসতে হবে এবং ফিরে আসার পরেই তিনি ব্যাধিমুক্তির পরবর্তী পর্যায় সম্বন্ধে বলবেন। প্রভাযুক্ত ঋষি আরও একটি অতিরিক্ত নির্দেশ দিলেন যে প্রতি মাসের শুক্লা তিথিতে গ্রহরাজের প্রভা উজ্জ্বলতর হয়, সেইদিন উপবাসে

থাকতে হবে।

শাম্ব আর একটি অনুমতি নিয়ে নিলেন রোগমুক্তির অভিযানে এই কথা বলে 'আমি এক হতভাগ্য, ওরা যেন আরো অধিক হতভাগ্য। আমি ওদের জন্য এই বিচলিত বোধ করছি, কেবলই মনে হচ্ছে, ওরাও কি দ্বাদশ স্থানে যেতে পারে না? আরোগ্য লাভ করতে পারে না? আমি কি ওদের সঙ্গে আহ্বান করতে পারি না?' *(পৃ: ১০০৬, ঐ)* শাম্বের কথা শুনে ঋষি অপলক দৃষ্টিতে তাঁর ব্যাধিগ্রস্ত বিশাল শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকাতে শাম্ব অন্যায় হয়েছে মনে করে ক্ষমা চাইতে গেলেন। তাঁর বুঝতে ভুল হয়েছিল, তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর কথা শুনে। তিনি বললেন 'তুমি যে-ই হও, আমার বিশ্বাস, তোমার শাপমোচন ঘটলে, তার সঙ্গে কোনো মহৎ কর্মেরও সাধন হবে। অন্যথায় এ চিন্তা তোমার মনে উতি হতো না' *(পৃ: ১০০৬, ঐ)* অস্তগামী আদিত্যের পূজা সাঙ্গ হলে ঋষির অনুরোধে তাঁর কাছ থেকে অন্ন গ্রহণ করে সেই টিলা অঞ্চলে ফিরে গেলেন অবিশ্বাসী মানুষদের রাজী করাতে তাদের রোগমুক্তির উপায়ের পথের কথা বলে, বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলে পরদিন পূর্বের আকাশে রক্তাভ ছড়িয়ে পড়তে পড়তেই শিশু থেকে বৃদ্ধ নানা বয়সের সত্তর জনের একটি দলকে নিয়ে চন্দ্রভাগার তীর ধরে উত্তরের দিকে যাত্রা করেছিলেন। অতীতচারী কালকূট মানসচক্ষে যেন শাম্বর সেই রোগমুক্তির আলোকপথে যাত্রাকে প্রত্যক্ষ করছেন। কালকূটের দৃষ্টিতে উঠে এসেছে মানবমনের সেইসব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি। শাম্ব নিজে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত তথাপি সেই আশাহত, মৃতপ্রায় মানুষদের রোগমুক্তির জন্য দ্বাদশ তীর্থে নিয়ে যাওয়ার জন্য কম বেগ পাননি। তবুও তিনি চেষ্টা করেছেন; শুধু তাদের রোগমুক্তির জন্য নয়, এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর তথা মানবসমাজকে কুষ্ঠ নামক মহাব্যাধির পাপ থেকে মুক্ত করতে এই কঠিনতম যাত্রা শুরু করেছিলেন। কুষ্ঠ মানবজীবনের অভিশাপ নয়, ব্যাধি, এর থেকে আরোগ্য লাভের নানা উপায় আছে। শাম্বর এই যাত্রাপথে প্রথম সঙ্গিনী হতে চেয়েছিল নীলাক্ষি। লেখক কালকূট শাম্বর মনের গভীরে ডুব দিয়ে যেন দেখছেন শাম্বর মনলোককে। যে রমণী পূর্বদিন রাতে অতিপ্রার্থিনী হয়ে শাম্বকে প্ররোচিত করছিল, ব্যর্থ হয়ে কটু কথা বলছিল, সেই নারীই কেমন করে শাম্বর যুক্তিগুলোকে মেনে নিয়ে তাদের শিশু সন্তানদের বেঁচে থাকার ও নিজেদেরও বেঁচে থাকার ইচ্ছাশক্তিকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলছিল। অন্যদের মধ্যে এবং শাম্বের নির্দেশ অনুযায়ী তারা প্রয়োজনীয় সামগ্রী ঝোলায় বেঁধে নিয়ে দীর্ঘ যাত্রাপথের দিকে চলা শুরু করেছিল। শাম্বর মনে হয়েছে এই প্রস্তুতিও এক যুদ্ধযাত্রার মত, যেমনটি তারা কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামের সময় করেছিলেন। কিন্তু এ যুদ্ধ আলাদা, অস্ত্রবল-বাহুবল নয়, শুধু মানবিক আবেদনেই শাম্ব এই আশাহত, মৃতপ্রায় মানুষগুলোকে রোগমুক্তির পথে যাত্রা করিয়েছিলেন। মানবজীবনের সেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবনাগুলোকে কালকূট অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছেন।

দ্বাদশ মাস পরে সত্তর জনের বিরাট দলটি ছোট একটি চৌদ্দ জনের দল হয়ে ফিরে এসেছিল। সবাই প্রাণত্যাগ করেনি, কিছু কিছু লোক বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে রয়ে গেছে, সুদীর্ঘ পথ পরিভ্রমণের কষ্ট স্বীকার করতে পারেনি। কিন্তু যারা ফিরেছে তাদের অন্তরে এক আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা, প্রশান্তি লক্ষ্য করা গেছে। শাম্বসহ সকলের চেহারায় একটা পরিবর্তন হয়েছে। সব থেকে বেশি রূপ-লাবণ্যের সঞ্চার হয়েছে নীলাক্ষির মধ্যে। নীলাক্ষির সন্তান মারা গিয়েছিল। তবুও সে অন্যদের মত তাঁকে অভিসম্পাত করেনি। শাম্ব সিন্ধু চন্দ্রভাগার সঙ্গমের জলে একটি দারুনির্মিত মূর্তি পেয়েছিলেন যেটা দেখতে মিত্রবনের গ্রহরাজের মত। মিত্রবনের ঋষি এতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মিত্রবনের রমণীয় কানন মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে বলে রোগমুক্তির প্রয়োজনীয় তথ্য শাম্বকে জানিয়েছিলেন। গ্রহরাজের পূজার অধিকার আছে শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণদের। তাঁরা সূর্যোপাসক। আরও বলছিলেন যে, "এই ব্যাধিকে দেহ থেকে আমূল ধ্বংসের চিকিৎসাবিধি একমাত্র তাঁরাই জানেন। সূর্যালোকের বিবিধ স্থান, কাল তাঁরাই নির্ণয় করেছেন, কারণ তাঁরা জানেন, গ্রহরাজই এইসব ব্যাধির নিরাময় করতে পারেন।" *(পৃ: ১০১০, ঐ)* তিনি পথনির্দেশ দিয়েছিলেন এইভাবে যে, মিত্রবন থেকে অন্তরীক্ষ অতিক্রম করে দেবলোক ইলাবৃতবর্ষের নিকটবর্তী কোনো স্থানে শাকদ্বীপের অবস্থান। কিন্তু এই ব্যাধির নিরাময় করার জন্য শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণদের ভারতবর্ষে নিয়ে আসতে হবে। তাঁদের ভরণপোষণের দায়িত্বও নিতে হলে অর্থেরও প্রয়োজন হবে। এই বাস্তব সমস্যার কথা চিন্তা করে শাম্ব নিজ পরিচয় দিয়েছিলেন 'মহাত্মন জন্মসূত্রে আমি বাসুদেব পুত্র। যদুবংশের বৃষ্ণিশাখার বংশধর।' যে কল্পারম্ভের দ্বারা তিনি কম ও মোক্ষলাভের পথে চলেছেন তাঁর গৌরব এছাড়া আর কিছু নেই। সুখী ও বিলাসের জীবন তাঁর কাছে স্মৃতিমাত্র। এইসব কথা বলে ঋষিসহ সকলের কাছে বিদায় নিয়ে দ্বারকায় গিয়ে স্ব-অর্জিত ধনসম্পদ নিয়ে আসার জন্য শুক্লা সপ্তমী তিথির পরদিন বেগবান অশ্বে রওনা দিয়েছিলেন।

দ্বাদশ তীর্থে প্রাকৃতিক চিকিৎসার ফলে শাম্ব অশ্ব চালনায় সমর্থ হয়ে উঠেছিলেন, অতএব একপক্ষকালের মধ্যে দ্বারকায় পৌঁছেছিলেন। বাসুদেব পুত্র দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। মাতা জাম্ববতী ও অন্যান্য মাতৃগণ সোহাগ স্নেহরসে সিক্ত করেছিলেন। শাম্বর গৃহে উৎসবের আয়োজন শুরু হয়েছিল। কিন্তু শাম্ব মাত্র এক রাতের জন্য এসেছেন জেনে শোকের ছায়াও নেমে এসেছিল। বাসুদেব এই সংবাদ পেয়ে উদ্বেগে ছুটে এসেছিলেন, কিন্তু শাম্বের কল্পের কথা শুনে আর বাধা দিতে পারেননি। মাতৃগণও দুঃখের মধ্যেও বাসুদেবের কথাই মেনে নিয়েছিলেন। আর লক্ষ্মণা কেঁদে ভাসিয়ে বলেছিলেন, 'স্বামী, আমি কী নিয়ে এই দ্বারকায় থাকবো? কেন থাকবো? কতোকাল থাকবো?" *(পৃ: ১০১১, ঐ)* মাতৃগণসহ পতি বিরহিণী লক্ষ্মণার বেদনা লেখক তাঁর কালকূটীয় অন্তর্দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন; সেইসঙ্গে শাম্বের অন্তর্বেদনা ও মানসিক চিন্তাধারাও। শাম্ব

তাকে নানা বাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন যে, ভ্রাঁর এখনো মুক্তি ঘটেনি। তাঁর স্বামীকে আর কখনো পূর্বের মতো ফিরে পাবে না। 'তোমাকে বলেছিলাম, অভিশাপ প্রশ্নের অতীত। এখন তুমি একমাত্র আমার অমোঘ নিয়তির সঙ্গেই মিলিত হতে পারো।' *(পৃ: ১০১১, ঐ)* লেখক কালকূট সেকালের মানবমনের মণিকোঠায় উঁকি দিয়েয়েছেন এবং ছোট ছোট অমূল্য চিন্তাভাবনা ও কথোপকথন তাঁর নিজস্ব চিন্তনের ভঙ্গিতে পাঠককুলের কাছে চিত্রায়িত করেছেন। সুদূর অতীতকে জলছবির মত বর্তমানের নিরিখে ব্যক্ত করেছেন। লেখক কালকূটের অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে পারিবারিক জীবনের জলছবি। কান্না-হাসি-বেদনার অবিমিশ্র সংসারবীণায় সুর তুলেছেন তিনি। দীর্ঘদিন অদর্শনের পরে পিতা-মাতা-স্ত্রী-আত্মীয় পরিজনের মানসিক দিকগুলো, আবেগগুলো তুলে ধরেছেন এ'কালের দৃষ্টিতে। পুত্র এসেই চলে যাবে শুনে সেকালের শ্রেষ্ঠপুরুষ, বৃষ্ণি সিংহও নির্বিকার থাকতে পারেন নি। কিন্তু কঠিন কর্মসাধনায় ব্রতী পুত্রের জন্য গর্বিতও হয়েছেন। যদুকুলের শ্রেষ্ঠ বীরচূড়ামণির মানসিক দিকও তুলে ধরেছেন। লেখক কালকূট মনভ্রমণে শাম্ব দর্শনে গিয়ে পিতাপুত্রকে একসঙ্গে দেখতে চেয়েছেন। এই কাহিনীতে এই নিয়ে তিনবার পিতাপুত্রকে একসঙ্গে দেখা গেছে। তিনবার তিনরূপে দেখা গেছে। কাহিনীর এই বিশেষ মুহূর্তগুলো এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেগুলো থেকে চরিত্রগুলোকে মহাকাব্যিক বা পৌরাণিক চরিত্র বলে মনে হয়নি। আমাদের চারপাশে প্রতিদিনের দেখা চরিত্রগুলোরই যেন বাস্তব রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। একালের সঙ্গে মহাকাব্যিক বা পৌরাণিক কাল মিলিয়ে দিয়েছেন, তাঁর লেখা এইখানেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত। দ্বারকার সকলের শুভকামনা ও সম্মতি প্রার্থনা করে একরাত্রি দ্বারকায় বাস করে পরদিন সুবর্ণ, মণিমুক্তা ইত্যাদি নিয়ে রথে করে মিত্রবনের দিকে রওনা দিয়েছিলেন। পথে বিশ্বকর্মা সম্প্রদায়ের শিল্পীদের কাছে মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা জানিয়ে যাবতীয় অর্থ ও রথ তাঁদের পারিশ্রমিক হিসাবে দান করে নিজে অশ্বারোহণে মিত্রবনে পক্ষকালের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

মিত্রবনের ঋষির নির্দেশে দ্বারকা থেকে এসে অষ্টমী তিথিতে পদব্রজে শাকদ্বীপ যাত্রা করেন। পঞ্চনদীর সমতলভূমি থেকে হিমালয়ের পাদদেশে। সেখান থেকে দুর্গম অন্তরীক্ষের পার্বত্যপথ বনভূমি পেরিয়ে অন্তরীক্ষে পৌঁছে মুগ্ধ। গন্ধর্ব রমণী ও পুরুষরা দেখতে খুব সুন্দর, তাঁদের আচরণও খুব ভাল। কেউ তাঁকে অঙ্গ বিকৃতির জন্য ঘৃণা করেনি, খাদ্য ও আশ্রয় দিয়েছে আবার সাবধান করে দিয়েছে "ইলাবৃতবর্ষের অধিবাসীদের সঙ্গে অসুরদের প্রায়ই যুদ্ধ চলছে। শাম্ব যেন সাবধানে চলাফেরা করে।" *(পৃ: ১০১১, ঐ)* এরপর উত্তর-পশ্চিমের নির্দিষ্ট পথে চলতে গিয়ে অসুরদের সীমানায় পৌঁছে সর্বত্র নিজ পরিচয়, গন্তব্য ও গন্তব্যস্থলে যাত্রার কারণ ব্যক্ত করতে হয়েছে। স্বর্গের মানুষদের পদধূলি নিয়েছেন, তাঁদের ব্যবহারে খুশি হননি। পথ চলতে চলতে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতে হতে শাম্ব তাঁর নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে গেছেন। শাকদ্বীপে

পৌঁছানোর আগে এই যে দীর্ঘপথ লেখক কালকূট শাম্বের চোখ দিয়ে তুলে ধরেছেন তা এক স্বপ্নময় আবেশ তুলে ধরেছেন। ভ্রমণের কাহিনীতে স্থানিক বৈশিষ্ট্য, ওখানকার জনজাতির রীতিনীতি সবই তুলে ধরেছেন একটার পর একটা দৃশ্য তৈরী করে। এরপরে শাকদীপে পৌঁছে তিনি সুস্পষ্ট করেছেন সেখানকার রীতিনীতি। এখন দেখা যাক কীভাবে বিবৃত করেছেন। দশ ঋতু অবসানে শাকদ্বীপে পৌঁছে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দীর্ঘকান্তি মিশ্রিত চোখের রঙের অধিবাসীদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। দীর্ঘচলার পথের অবসান। অধিবাসীদের বেশবাসের মিল মিত্রবনের গ্রহরাজের মত। মগ সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ এক ব্রাহ্মণের পাদ্যার্ঘ গ্রহণ করে তাঁকে তাঁর পরিচয় দিয়ে করুণ ও বিনীতভাবে নিজ অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর কথায় সন্তুষ্ট হয়ে বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বিষয়টি নিয়ে সকলের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। শাম্ব বিষয়টি আলোচনা করে তাঁদের কাছে এই প্রস্তাবটি রেখেছিলেন, 'আমি আপনাদের গৃহ, গার্হস্থ্য জীবনধারণের সমস্ত ব্যবস্থাদি করবো। কর্ষণযোগ্য ভূমি ও গাভী দান করবো। আপনারা আঠারো জন ব্রাহ্মণ, আপনাদের পরিবারবর্গ নিয়ে চলুন। আমাদের বিশাল দেশে এই মহাব্যাধির অতি প্রাদুর্ভাব হয়েছে। আপনারাই একমাত্র এই মহাব্যাধির আমূল ধ্বংস করতে পারেন। আমার ব্যাকুল প্রার্থনা আপনারা রক্ষা করুন।' *(পৃ: ১০১২, ঐ)* শাম্ব কীভাবে এই দুরূহ কাজটি সম্পাদনের জন্য নিজ আর্তি জানিয়ে তাঁদের আহ্বান করেছিলেন সেটা লেখক কালকূট অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বুদ্ধির সঙ্গে কথা বলা যে একটি শিল্প সেই শিল্পবোধের পরিচয়ই এখানে পাঠকের চোখে ধরা পড়েছে। শাম্বর ব্যবহার ও আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে মগব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তখনই তাঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এরপর আঠারোটি পরিবার ও তাদের অশ্ব পার্বত্য গর্দভ ও বিরাটাকৃতি ছাগ সঙ্গে নিয়ে শাম্ব অতি দ্রুত অর্ণবচালিত রথে মিত্রবনে ফিরে এসেছিলেন। ফলে মিত্রবনে ফিরে আসতে আসতে চিকিৎসার ফলে শাম্বর রূপের অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। 'তাঁর উজ্জ্বলবর্ণে চারিপার্শ্বের প্রকৃতি, নদী, নরনারী, সকলই যেন প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। এই রূপই শাম্বর সেই প্রকৃত রূপ। তাঁর রূপদর্শনে সকলে মোহিত হয়ে তাঁকে স্পর্শ করার জন্য ব্যাকুল হলো।' *(পৃ: ১০১২, ঐ)* তাঁর রূপের এই পরিবর্তনে নীলাক্ষি তাঁকে প্রণাম করে 'বিবস্বান' নামে অভিহিত করেছিল। শাম্ব এই ডাকে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন যে এক মহাপরাক্রান্ত রাজা ও গ্রহরাজ ছাড়া আর কাউকেই ওই ডাকা যায় না। কিন্তু শাম্বর পরিবর্তিত রূপ দেখে তার তাঁকে ওই নামে ডাকতে ইচ্ছা হয়েছিল। তখন শাম্ব বলেছিলেন 'তুমি আমাকে শাম্ব নামে সম্বোধন করবে।' *(পৃ: ১০১২, ঐ)* নীলাক্ষি সেটা বলতে রাজী না হয়ে বলেছিল 'না, তোমাকে আমি এখন থেকে বৃষ্ণিরত্ন বলে ডাকবো।' *(পৃ: ১০১২, ঐ)* নীলাক্ষি ও শাম্বের বন্ধুত্বের বন্ধনে ধরা পড়েছে। একটা শ্রদ্ধা মেশানো

বন্ধুত্বের সুর ধ্বনিত হয়েছে নীলাক্ষির কণ্ঠস্বরে। শাম্ব মিত্রবনে ফিরে এসে দেখতে পেয়েছিলেন 'এক বিশাল রথের ন্যায় মন্দির অনেকখানি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।' *(পৃ: ১০১২, ঐ)* শুধু অগ্নিহোত্র ভিত্তি স্থাপন তাঁর জন্য বাকি ছিল। মিত্রবনের ঋষির সঙ্গে আলোচনা করে শাম্ব ছয়টি পরিবারকে মিত্রবনে স্থাপন করে বাকী বারোটি পরিবারের ছয়টি পরিবারকে যমুনার দক্ষিণ তীরে অগ্নিহোত্র গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে বিশ্বকর্মার বংশধরদের কালপ্রিয় স্থানে একটি মন্দির স্থাপন করতে বলেছিলেন। এবং অবশিষ্ট ছয়টি ব্রাহ্মণ পরিবারকে নিয়ে উদয়াচলের ওড্রদেশে লবণদধির তীরে উপস্থিত হয়ে প্রাচী নদীর শাখানদী চন্দ্রভাগার তীরে প্রতিষ্ঠা করলেন। বিশ্বকর্মার বংশধরদের সেখানেও একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে বলে একটি অগ্নিহোত্র গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। লেখক কালকূট এই বিশাল কর্মকাণ্ডকে মহাযজ্ঞ বলেছেন। বিরোধ আলস্য দূরে সরিয়ে বিশ্বকর্মাগণ সবাই মেতে উঠল এই মহাযজ্ঞে।

একবছর পরে মিত্রবনে ফিরে এসে দেখলেন সে স্থানটি ছোটোখাটো নগরীর রূপ নিয়েছে, নাম হয়েছে শাম্বপুর। শাম্ব সুখী হলেন এই দেখে যে মগ ব্রাহ্মণদের চিকিৎসায় সকলেই আরোগ্যলাভ করেছে। মিত্রবনের ঋষির নির্দেশে চারমাস করে মূলস্থান-মিত্রবন, কালপ্রিয়-কালনাথক্ষেত্র, উদয়াচলের সমুদ্রতীরে কোণবল্লভক্ষেত্র শাম্ব আদি চোদ্দজনকে নিয়ে দ্বাদশ বৎসর এইভাবে গমনাগমন করতে লাগলেন। তিনটি মন্দিরই দ্বাদশ বৎসর শেষে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হল। নীলাক্ষি কোণাদিত্যের পূজা করবে বলে সমুদ্র ও চন্দ্রভাগা তীরের মধ্যবর্তী স্থলে থেকে গেল শাম্বর অনুমতি নিয়ে। সে মন্দিরের অপ্সরা মূর্তি নয়, মানুষ, অতএব শাম্ব তার মহামৈত্র। বৎসরে একবার তার দেখা যেন সে পায় এই অনুরোধ সে জানালো। শাম্ব দেখেছিলেন 'নীলাক্ষির ঘনকৃষ্ণপক্ষ্মযুক্ত নীলচক্ষুদ্বয় অশ্রুকণায় চিকচিক করছে।' *(পৃ: ১০১২, ঐ)* সেই মুহূর্তে শাম্বের অনুভূতি ভাবনা লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। নাসক্ত থাকলেও ভেতরে ভেতরে একটা আবেগে ভেসে যাচ্ছিলেন। স্মৃতিপথে যা উদায় হয়েছে তাই বলে ফেললেন 'নীলাক্ষি, মিত্রবনের প্রথম এবং দ্বিতীয় রাত্রের কথা আমি ভুলিনি। তুমিও আমার অতি শক্তিময়ী মমতাময়ী মৈত্র। তুমি বিনা আজ এ সার্থকতা সম্ভব ছিল না।' *(পৃ: ১০১২, ঐ)* অকপট স্বীকারোক্তি মহামৈত্র-র কাছে। নীলাক্ষি শাম্বর পদযুগল স্পর্শ করে বলেছিল 'তবে আজ থেকে এই কোণাদিত্যক্ষেত্রর নাম হোক মৈত্রেয় বন।' *(পৃ: ১০১৩, ঐ)* মিত্রতার বন্ধনের সম্মান দিয়ে এই নাম শাম্ব মেনে নিয়েছিলেন এবং নীলাক্ষির কপালে হাত রেখে বলেছিলেন 'মৈত্রেয় কখনো মৈত্রেয়কে মিথ্যা বা দ্বিধাসূচক কথা বলে না।' লেখক কালকূট অতীতভ্রমণে গিয়ে রোগমুক্তির অভিমানে উত্তরণের সংগ্রামে অটল বিশ্বাসী একক সংগ্রামী নায়ক শাম্বর সঙ্গে প্রথম যে নারী সঙ্গী হতে রাজী হয়েছিল সেই শক্তিময়ী নারীকে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখেছিলেন তারই একটা কাব্যিক রূপ দিয়েছেন। শাম্বর সেই কথা

শুনে 'নীলাক্ষি অশ্রুপূর্ণ চোখে হাসলো। মৈত্রেয়বনে বাতাস শনশন নিস্বনে প্রবাহিত হচ্ছে। কোণাদিত্য যেন তাকেই স্নেহপূর্ণ লোচনে অবলোকন করছিলেন।' শাম্ব এবং কোণাদিত্য একাকার। শাম্বই তাঁর কর্মের গুণে নীলাক্ষির কাছে কোণাদিত্য হয়ে গেছেন। এই নীলাক্ষিই তাকে 'বিবস্বান'ও বলেছিল। লেখক কালকূট কালের পুঁথির ধূলা সরিয়ে এক কর্মযোগীপায়কে সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। তাঁর সেই নায়ক মানব কল্যাণের জন্য, কুষ্ঠরোগ দূর করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর এই সংগ্রামী চেতনাকে সফলতায় পৌঁছে দিতে সঙ্গী হয়েছিল একদল আশাহত মৃত্যুপথযাত্রী কুষ্ঠরোগী। শুধু নিজের মুক্তি নয়, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত সকল মানুষের জন্য তাঁর একক লড়াই, অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও কষ্ট সহিষ্ণুতাই তাঁকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। লেখক কালকূটও সমকালের কুষ্ঠ অভিযানের সঙ্গে অতীতের একনায়কের প্রায় একক অভিমানকে পাঠককুলের সামনে আলোকিত করেছেন এক সংগ্রামী চেতনায়।

মহর্ষি নারদ মিত্রবনে এসে শাম্বর পাদ্যার্ঘ নিয়ে তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে সে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করতে চায় কিনা? শাম্বর উত্তর ছিল এইরকম, "মহর্ষি, আমার আর ঐশ্বর্যপূর্ণ দ্বারকায় রাজকীয় ভোগের কোনো বাসনা নেই। আমি এই মিত্রবনে, কালপ্রিয় ক্ষেত্র ও মৈত্রেয়বনে এক অপরূপ আনন্দে অতিবাহিত করছি। মগ ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হয়েছে, ব্যাধিগ্রস্তরা চিকিৎসিত হচ্ছে এবং তিন স্থানের তিনকালের আলোকে স্নান করছে। অভিশাপ কী, ব্যাধি কী, আমি তা জেনেছি, অতএব এখন যা দেখছি, এর তুল্য আনন্দ আমার আর কিছু নেই।" *(পৃ: ১০১৩, ঐ)* শাম্বর উত্তর শুনে মহর্ষি আনন্দিত হয়ে শাম্বের প্রতিষ্ঠিত গ্রহরাজকে পূজা করলেন এই সম্বোধন করে "হে সর্বদেবমান্য, সর্বভূতমান্য, সর্বশ্রুতিমান্য, হে শাম্বাদিত্য! আপনি সন্তুষ্ট হোন, আমার পূজা গ্রহণ করুন।" *(পৃ: ১০১৩, ঐ)* শাম্ব শিহরিত হলেন, মহর্ষি, গ্রহরাজ ও শাম্বাদিত্যকে একই নামে পূজা করলেন। মহর্ষি শাম্বকে স্পর্শ করে বললেন, 'হ্যাঁ, আজ থেকে এই বিগ্রহের আর এক নাম শাম্বাদিত্য। এই নামেই তিনি এখানে পূজিত হবেন।' *(পৃ: ১০১৩, ঐ)* অশ্রুপূর্ণ নয়নে শাম্বকে আশীর্বাদ করে মন্দিরের বাইরে চলে গেলেন, শাম্ব নিজ মহৎকর্মের মধ্য দিয়ে একাই আরোহণ করেছিলেন। শাম্ব অভিশাপের দিন অশ্রুমোচন করেননি। কিন্তু মহর্ষির কথা শুনে তার চোখের জল বাঁধ মানল না। অশ্রু মহর্ষির চোখে কিন্তু মুখে এক অনির্বচনীয় হাসি। এইবাবেই কাহিনীর শেষ হয়েছে। মহর্ষি নারদের কারণেই শাম্বের অভিশপ্ত হওয়া এবং মহর্ষির নির্দেশিত পথেই 'অভিশাপ মুক্ত' হওয়া। এর মধ্য দিয়ে এক মহৎ বার্তা দিতে চেয়েছেন তিনি, কুষ্ঠ অভিশাপ নয়, উপযুক্ত চিকিৎসা করালে কুষ্ঠ রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

কালকূট অতীত চারণার মধ্য দিয়ে পুরাণের একটি কাহিনীকে নূতনভাবে চিত্রায়িত করেছেন। বাসুদেব তনয় শাম্ব কীভাবে একক সংগ্রামের মধ্যে, কঠোর কল্পের মধ্য দিয়ে, জীবনের নানা

যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে নিজেকে উত্তরণের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। রোগমুক্তি তথা শাপমুক্তির পথ-সন্ধানী একক সংগ্রামী এক মানব যিনি শুধু নিজের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেন নি, জগতের এক বিশাল কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত মানুষের রোগমুক্তির পথ খুঁজেছেন! বাঁচার অধিকার সবার আছে এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি আশাহত, মৃতপ্রায় মানুষগুলোর মনে বাঁচার আশা জাগিয়ে তুলে তাদের সংঘবদ্ধ করে শাপমুক্তির তথা রোগমুক্তির পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ও ইপ্সিত লক্ষ্যে নিজেও পৌঁছেছেন, তার সংঘবদ্ধ দলের সদস্যদেরও পৌঁছে দিয়েছেন।

কাহিনীর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, শাপগ্রস্ত হওয়ার পরে বাসুদেব তনয় শাম্বের মানসিক যন্ত্রণা, উপলব্ধিগুলো কালকূট তাঁর অতীতচারণার মধ্য দিয়ে যেন দেখতে পেয়েছেন। তিনি মানবমনের গহীনে ডুব দিয়েছেন, সেখান থেকে তুলে এনেছেন রোগগ্রস্ত এক মানবের যন্ত্রণামথিত জীবনচিত্র। কুষ্ঠরোগকে কালকূট বর্তমানে অর্থাৎ তাঁর কালের নিরিখে ব্যক্ত করেছেন। তিনি নিজের দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিক চিন্তাধারায় কাহিনীর চরিত্র সংলাপের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। অসংযত জীবনযাপনের জন্যই যে কুষ্ঠরোগ দেহে বাসা বেঁধেছে সেটা শাম্ব বুঝতে পারেন নি, কিন্তু পিতার চোখে রোগের লক্ষণগুলো আগেই ধরা পড়েছে। "বিম্ব ফলের ন্যায় তোমার দেহের এই রক্তাভ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে স্ফীত, কিছু আর স্বাভাবিক নেই। শরীরের এই লক্ষণগুলো তোমার চোখে পড়েনি। তথাপি আমি স্বীকার করি, তোমাকে দেখে রমণীদের যৌবনোচ্ছ্বাসে ক্রুদ্ধ হয়েই তোমাকে অভিসম্পাত দিয়েছি।" পিতার মুখনিঃসৃত বাণী শোনার পরই শাম্ব দর্পণে নিজেকে লক্ষ্য করে দেখেছেন যে পিতার কথাই ঠিক, বহুকাল পূর্বেই কুষ্ঠব্যাধি তাঁকে গ্রাস করেছে। রোগমুক্তির সন্ধানে বেরিয়ে শাম্ব যে সকল স্থানে যেভাবে পৌঁছেছেন, সমস্যায় পড়েছেন সেগুলো কালকূট টুকরো টুকরো চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। ব্যক্ত করেছেন শাম্বের সেই সকল মুহূর্তের মনোবেদনা সেই সময়কার অধিবাসীদের সমাজজীবন শিশু-বালকদের আচরণ সব কিছু কালকূট তুলে ধরেছেন। মুক্তিসন্ধানী এক ব্যাধিগ্রস্ত এক মানব মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছেন, কালকূট সেই কাহিনীকে চিত্রায়িত করছেন সেই সময়কার সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে যা ধীরে ধীরে এই কাহিনীকে উপন্যাসে পরিণত করেছে।

পাঁচশো বছরের ইতিহাসের ধূলিকণা সরিয়ে সত্যের স্বরূপ সন্ধানের জন্য কালকূটের এবারের যাত্রা একটি দুষ্টু বালকের সন্ধানে। সে শুধু দুষ্টুই নয়, কালকূটের চোখে পরিহাস প্রিয়, অতিমাত্রায় রাগী, পড়াশুনায় পারদর্শী, তার্কিক, দাম্ভিক ও রমণীমোহন প্রেমিক। শচীদেবী জগন্নাথ মিশ্রের কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বম্ভর, মায়ের দেওয়া 'নিমাই' নামেই পরিচিত যিনি, তাঁরই সন্ধানে কালকূট চলেছেন। কেমন করে কোন্ হৃদয়বিদারক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিমাই নিজের তীব্র অন্তর্বেদনাকে 'আত্মসঙ্গোপণ করে' মাকে বলেছিলেন 'সংসার অনিত্য মা—' *(পৃ: ১৫২০, ঐ)*। এবং এই 'আত্মসঙ্গে

াপণে'র মধ্য দিয়েই 'এক মানুষের মধ্যে আর এক মানুষের ঐতিহাসিক জন্ম হয়েছিল।' — তারই সন্ধানে তিনি চলেছেন।

এই ঘটনাকে নিজ মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন কালকূট। নিমাই-এর নবজন্মের ইঙ্গিত তিনি পেয়েছেন তাঁর অনিত্যতার উপলব্ধিতে। মানব চৈতন্য কেমন করে 'জ্যোতির্ময় চৈতন্য'-এ পরিণত হয়েছিলেন সেইকথা কালকূট তাঁর মানস ভ্রমণের মধ্যে চৈতন্যের জীবনকথাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

জীবনী যেভাবে তথ্যবহুল হয় তা নয়; কালকূট চরিত্রটির অন্তর্গহনে ডুব দিয়ে তথ্যের সঙ্গে তার অন্তরকথাকে মিশিয়ে একটি জীবনকে জ্যোতির্ময়তা দান করেছেন। একটি সাধারণ মানুষ কীভাবে অসাধারণ হয়ে উঠছে সেই কথা তিনি তাঁর মানস পরিক্রমার মধ্য দিয়ে — 'প্রেম নিত্য', 'প্রেম নিত্য অনিত্য সংসার' ও 'প্রভু, কার হাতে তোমার রক্ত' — এই তিনটি পর্যায়ে তুলে ধরেছেন। 'প্রসাদ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় যথাক্রমে ১৩৮৬, ১৩৮৭ ও ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে তিনটি অধ্যায়ে প্রকাশিত হয় 'ভ্রমর' ছদ্মনামে। পরে ১৩৯৩ বঙ্গাব্দে (১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে) একত্রে **'জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য'** নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড' থেকে।

'প্রেম নিত্য' এই অধ্যায়টিতে কালকূট নিমাই-এর জন্মের সময় থেকে নিমাই-এর নবজন্মের উপলব্ধি পর্যন্ত তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। ইতিহাসের পথ ধরে নিমাই-এর জীবনকে দর্শন করার জন্য কালকূট নিমাই-এর জন্মের সময়কালের মাহ্মুদ শাহী বংশের জালালুদ্দিন ফতেহ্ শাহ-এর কিছু আগের নবদ্বীপে যাত্রা করেছেন। বঙ্গ-গৌড়ে সেই সময় হল সুলতানী আমল। ১৪৮৩-১৪৯১ সাল ফতেহ্ শাহ রাজত্ব করছেন। নবদ্বীপে সেই সময় অরাজকতা ও অস্থিরতার পরিবেশ। একদিকে চলছে বিদ্যাচর্চার পরিবেশ। জগজ্জয়ী পণ্ডিত-অধ্যাপক-ছাত্রদের সমাবেশ। এঁদের মধ্যে আছেন বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, স্মার্ত রঘুনন্দন, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, রুদ্ররায় তর্কবাগীশ, রামভদ্র সার্বভৌম প্রমুখ। এঁরা সকলেই বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি তথা মানবজাতির গৌরব।

ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপে যেসব বাঙালী মনীষীদের দ্বারা বাঙালী সভ্যতার যে তিনটি ধারা 'নব্যন্যায়', 'নব্যস্মৃতি' ও 'বৈষ্ণবধর্ম' উৎকর্ষ লাভ করেছিল, সেই তিনটিই, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অর্থাৎ 'বাঙাল ব্রাহ্মণদের মনীষার দ্বারা ঘটেছে।' সূক্ষ্মদৃষ্টিতে কালকূট বলছেন এঁরা বৈষ্ণব নন। জয়ানন্দের তথ্য অনুযায়ী বৈষ্ণব ধর্মের মূল প্রবর্তক শ্রী চৈতন্যের পূর্ব পুরুষরা উড়িষ্যার রাজা ভ্রমরের ভয়ে শ্রীহট্টে পালিয়ে গিয়েছিলেন। অতএব শ্রীচৈতন্যও শ্রীহট্টের অধিবাসী এবং অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস ও নিমাই-এর দাদামশাই নীলাম্বর চক্রবর্তী, রামপণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত এঁরাও

শ্রীহট্টবাসী। আর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রামের। এঁরা সকলেই বাঙালদেশের লোক, বহিরাগত। কালকূট ইতিহাসের পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন, দেখেছেন নিমাইয়ের জন্মের আগে, হরিদাসকে ফুলিয়ায়, শান্তিপুরের কাছে, নিত্যানন্দকে রাঢ়ে একচাকা গ্রামে ও ত্রিহুতে পরমানন্দপুরীকে। এঁরা সকলেই বৈষ্ণব শিরোমণি।

নিমাই-এর জন্মের বহুপূর্বেই নানা দেশ থেকে বহু বিদ্যার্থীরা আসত এইসব গুণী পণ্ডিত অধ্যাপকদের কাছে বিদ্যারস সংগ্রহে। এই হল নবদ্বীপের একদিক।

আর একদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন কালকূট। সেখানে ধর্ম-কর্ম সবই চলছে। ধর্মের নামে চলছে তামসিক কাণ্ডকারখানা। বিষ্ণুর নাম ভুলেও করে না। সমাজের অশিক্ষিত ধনী ব্যক্তিরাই এইসব তামসিক কাণ্ডকারখানা নিয়ে মেতে আছে, তা কালকূটের সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে বৃন্দাবন দাসের কাব্যের মধ্য দিয়ে। কালকূট আরও সামাজিক অনাচার দেখেছেন। বিবাহিতা স্ত্রীরা স্বামীর কথা মানছে না। সতীদাহের মত ভয়ঙ্কর প্রথা চালু আছে। সেই সময়ে যুবতী বিধবা নারীরা মাছ-মাংস খাচ্ছে। সামাজিক অবক্ষয়ের একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়। ব্রাহ্মণ মাত্রই ম্লেচ্ছ জাতির শত্রু, ক্ষত্রিয়রা নেই, যে কয়েকজন আছে তারা শক্তিহীন। নিমাইয়ের জন্মের সময়কালে নবদ্বীপে বৈষ্ণবের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। অদ্বৈত আচার্য তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর কাছেই সবাই আসতেন বৈষ্ণব ধর্ম আলোচনা করার জন্য। আর শ্রীনিবাসেরা চার ভাই, গভীর রাত্রে উচ্চস্বরে হরিনাম করতেন। এই হল বৈষ্ণবদের পরিস্থিতি। উচ্চস্বরে হরিনাম করাটাও নিরাপদ ছিল না। যবনরা তো অত্যাচার করতই, অন্যান্য ব্রাহ্মণরাও বৈষ্ণবদের উৎখাত করতে চাইত। কারণটা কালকূট বুঝতে পেরেছেন; নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা ভাবতেন, 'এ ব্রাহ্মণরা গ্রামের অমঙ্গল করবে।' *(পৃ: ১৫২৫, ঐ)* যবনদের অত্যাচারের ভয়ে ব্রাহ্মণরাও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল।

বৈষ্ণবরা এই অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণদের 'পাষণ্ডী' বলতেন। আর যবনরা পাষণ্ডী নামে আগেই পরিচিত ছিল। বৈষ্ণবদের ওপরে অত্যাচারের কথা শুনে অদ্বৈত আচার্য রাগে অগ্নিমূর্তি হয়ে দিগম্বর হয়ে বলেছিলেন যে, কৃষ্ণ এলে সব আর্তজনকে উদ্ধার করবেন। তিনি নিজে সবাইকে কৃষ্ণভক্তি কী, তা বোঝাবেন। তাতেও যদি না হয় তাহলে তিনি 'চার হাতে চক্র নিয়ে পাষণ্ডীদের গলা' কাটবেন। অদ্বৈত আচার্যের উক্তি থেকে কালকূট এই যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পাষণ্ডী আর যবনরাজের ভয় দূর করার জন্যই অদ্বৈত আচার্যের কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণের মত একজন অবতারের প্রয়োজন। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ অদ্বৈত আচর্য-এর প্রার্থিত নন।

কালকূট দেখেছেন — নিমাই-এর জন্মের আগেই যবনদের অত্যাচারে ভীত কৃষ্ণ ভক্তদের মধ্যে অগ্রণী ভক্ত অদ্বৈত আচার্য বারে বারে সিংহের মতো হুঙ্কার দিতেন, 'সংহারিমু' বলে এবং আশার বাণী শোনাচ্ছেন বৈষ্ণবদের — 'তিনি আসবেন, তিনি আসছেন।' অদ্বৈত আচার্য 'কৃষ্ণের

অবতার চান' জীব উদ্ধারের জন্য। কালকূটের ভাবনায় এটি সামান্য কথা নয় — ''জীবের উদ্ধার মানেই, এর সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্ধারের সংকল্প প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি সমস্ত ভয় ত্রাস অত্যাচার থেকে উদ্ধার পেতে চেয়েছেন।'' *(পৃ: ১৫২৬, ঐ)*

নিমাই-এর জন্মের আগেই নবদ্বীপে অদ্বৈত আচার্য এ'রকম একটা প্রস্তাবনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন যবন হরিদাস। যিনি মুসলমান হয়েও কৃষ্ণনাম করেন ও গঙ্গ াস্নান করেন। এই কথা শুনে মুলুকপতি হরিদাসকে ডেকে বোঝাবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে বাইশ বাজারে চাবুক মেরে মেরে প্রাণ নিতে হুকুম দিয়েছিলেন। এই নির্দেশ পালনের পরে তাঁকে মৃত মনে করে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি বেঁচে উঠেছিলেন।

এই হরিদাসের সঙ্গে অদ্বৈত আচার্যের সখ্যতাকে কালকূট বলছেন, এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। একজন ব্রাহ্মণ আচণ্ডাল উদ্ধারের জন্য কৃষ্ণকে অবতাররূপে প্রার্থনা করছেন। আর তাঁর সঙ্গ ী হয়েছেন যবন হরিদাস। এই মেলবন্ধন নিঃসন্দেহে সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমি। নিমাইয়ের জন্মের সময় সুলতান ছিলেন ফতেহ্ শাহ। কালকূট দেখেছেন কী প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন তিনি। ফতেহ্ শার রাজত্বকাল থেকে আরও একটু অতীতে গিয়ে দেখেছেন, সেখানে অত্যাচারের মাত্রা আরও বেশি। ফতেহ্ শাহর আগের দু'জন সুলতান ঘোর হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন।

তিনি ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখেছেন, ফতেহ্ শাহর আমলে পিরল্যা গ্রামের সব ব্রাহ্মণরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের মত ব্যক্ত করেছেন, পিরল্যা গ্রামের সবাই স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি এ'কথা বলেছেন 'গৌড়ের সুলতানদের আমলে হিন্দুদের জোর করে মুসলমান-করণের ঘটনা বাস্তবিকই ঘটেছিল।' *(পৃ: ১৫২৪, ঐ)* এইজন্য পিরল্যা গ্রামের ব্রাহ্মণ যবনরা নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উচ্ছন্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এইজন্য ইতিহাসে 'পিরল্যা গ্রাম' 'বিষম' আখ্যা পেয়েছে। এই ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণেরা ফতেহ্ শাহর কানে 'লাগানি-বাজানি' করে দিয়েছিল — 'শোনা যাচ্ছে গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে।'

হিন্দু রাজা হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দিতে পারেননি, তাই এই কথা শুনে ফতেহ্ শাহ্ ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন— দেব দেউল ভাঙা, তুলসী উপড়ানো, বট অশ্বত্থ কাটা, ব্রাহ্মণের টিকি কাটা, থুথু দেওয়া, পৈতা ছিঁড়ে দেওয়া, কপালে তিলক দেখলে রক্ষা নেই, গঙ্গাস্নানে গেলে প্রাণ-জাতি যাওয়া ইত্যাদি— অত্যাচারের শেষ নেই। বাসুদেব সার্বভৌম নিমাই-এর জন্মের কয়েক মাস আগে জাতি-ধর্ম নাশের ভয়ে উড়িষ্যায় হিন্দু রাজ্যে চলে গেলেন। কালকূট দেখছেন— ইতিহাসের অগ্রিম পত্রে অন্যান্য ব্রাহ্মণদের তুলনায় বৈষ্ণবদের উপরে যবনরাজের অত্যাচারের মাত্রাটা একটু বেশি ছিল। বৈষ্ণবরা উচ্চস্বরে নামকীর্তন করে, এটিই তাদের দোষ।

কিন্তু কালকূটের দৃষ্টিতে এই তথ্যটি যথার্থ বলে মনে হচ্ছে না। কারণ বাসুদেব সার্বভৌম

যখন উড়িষ্যায় চলে গিয়েছিলেন, তখন তো তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না। ইতিহাসের পথে চলতে গিয়ে কালকূটের ভাবনায় এই সত্যটি উঠে এসেছে— "রাজার অত্যাচার সব ব্রাহ্মণদের উপরই সমান। কারণ গৌড়ের বাদশা আর তাঁর 'মুলুকপতি' মুসলমান 'অমাত্যগণ' ব্রাহ্মণদের সন্দেহের চোখে দেখছেন, বিশেষ করে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের। তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধিকে সহজে এড়িয়ে যাওয়া চলে না। আসলে, এক্ষেত্রে ইতিহাসের পটভূমিকায় যাঁরা বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই বৈষ্ণব। তাঁরা কেবল পাণ্ডিত্য অধ্যাপনা বিদ্যাচর্চা নিয়েই মগ্ন ছিলেন না। তাঁরা এবং তাঁদের নেতা 'আচণ্ডাল উদ্ধার'-এর পরিকল্পনা করেছিলেন।" *(পৃ: ১৫২৭, ঐ)*

ফতেহ্ শাহ-এর ব্রাহ্মণ তথা হিন্দুদের প্রতি এই ভয়ানক অত্যাচার একদিন হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল। কালকূট বৈষ্ণব কবিদের বর্ণনায় এর কারণ অনুসন্ধান করে দেখেছেন— সুলতান ফতেহ্ শাহ্কে মা-কালী স্বপ্নে ভয় দেখিয়েছিলেন। মৃত্যুভয়ে পরদিন ফতেহ্ শাহ্ ঘোষণা করেছিলেন— "নবদ্বীপে সবাই সুখে থাকুক। রাজকর চাই না, সকলে চাষ-আবাদ করুক।" *(পৃ: ১৫২৫, ঐ)* আরও বলেছিলেন, নবদ্বীপের লোকদের অধিকার আছে তাদের নিজধর্ম পালনের ইত্যাদি ইত্যাদি।

দয়ানন্দ তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, "নবদ্বীপের নতুন জন্ম হল। শরৎকালের রাত্রিশেষে পুষ্প বৃষ্টি হল। মহা-মহাজন যাঁরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিলেন, তাঁরা আবার ফিরে এলেন।" *(পৃ: ১৫২৫, ঐ)*

কালকূটের মনে এখানেই সংশয়। বৈষ্ণব কবিরা কালীকে দিয়ে ফতেহ্ শাহ্কে শায়েস্তা করালেন! এই কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজ অনুমান ব্যক্ত করেছেন এইভাবে — হয়তো, "নবদ্বীপের প্রজাদের দুর্দশা দেখে ফতেহ্ শাহ্ অন্য কোন কারণে তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন।" *(পৃ: ১৫২৫, ঐ)* এর বেশি কিছু তিনি বলেন নি। নিমাই জন্মের আগে কালকূট সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকগুলো ইতিহাসের ধুলো ঝেড়ে বিভিন্ন তথ্য থেকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দেখে তাঁর মানসভ্রমণের যাত্রাপথকে আলোকিত করতে চান। তিনি মানবশিশুকে দেখতে যাচ্ছেন এবং সেকালের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীকে এ'কালের দৃষ্টিতে তুলে ধরতে চাওয়ার জন্য নিমাইয়ের জন্মের সময়কাল থেকেও আরও দূরকালে তাঁর যাত্রাপথকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

আরও একটু তথ্য নির্ভর হওয়ার জন্য কালকূট ইতিহাসের ধুলিকণা সরিয়ে এড়ু মিশ্রের কারিকা, অনেক বৈষ্ণব কবিদের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে ও ভৌগোলিক সীমারেখা ও ভাঙাগড়ার সুলুক সন্ধান করতে করতে তাঁর যাত্রাপথকে আরও অতীতে নিয়ে গেছেন। সেনরাজাদের রাজধানী ছিল নবদ্বীপ। নরহরি কবিরাজ তাঁর নবদ্বীপ পরিক্রমায় একবার বলেছেন, 'নদীয়া পৃথক পৃথক গ্রাম নয়। নবদ্বীপে নবদীপবেষ্টিত যে হয়।' *(পৃ: ১৫২২, ঐ)* আবার তিনিই আরও বলেছেন যে নবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম, পৃথক পৃথক কিন্তু গ্রাম একটি।'

'নবদ্বীপ' কোথায় — তার স্থান নিরূপণ করতে কালকূট ভৌগোলিক তথ্যানুসন্ধান করেছেন

ও সেই ভৌগোলিক সীমারেখা ও তার ভাঙাগড়ার দিকে তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত করে এগিয়ে গেছেন তাঁর ঈপ্সিত মনভ্রমণের স্থান-কালে। অগ্রদ্বীপের পরেই শুরু নবদ্বীপের। মাঝখানে কটকদ্বীপ বা কাটোয়া। নবদ্বীপের শুরু মাঝদিয়া অঞ্চল নিয়ে মধ্যদ্বীপ, এর কিছু দক্ষিণে গঙ্গার পূর্বপারে সীমান্তদ্বীপ। মাঝখানে একটি জায়গার নাম ধর্মদহ তারপরে গঙ্গার পশ্চিম পারে রুদ্র দ্বীপ, এর সীমান্তবর্তী স্থানগুলো হলো পূর্বস্থলী, শঙ্করপুর, রুদ্রভাঙা।

রুদ্রদ্বীপ ছেড়ে একটু দক্ষিণে অন্তর্দীপ, জলের চক্রাকার প্রবাহের অন্তর্ভাগে এর অবস্থিতি। 'আর অন্তর্দীপেই প্রাচীন নবদ্বীপ রাজধানী ছিল।' এরই পশ্চিম পারে মোদ্রদ্রুম দ্বীপ। কেউ বলেন মায়াপুর আবার কেউ বলেন মিঞাপুর। মিঞাপুর নামটা দেওয়া হয়েছিল হয়তো পাঠান সুলতানদের আমলে সেনরাজাদের আমলে মোদ্রদ্রুম দ্বীপের এই গ্রামটি ছিল। সেনরাজাদের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বিশেষ কালকূটের চোখে পড়েনি, একমাত্র বল্লালদীঘি চোখে পড়েছে। মোদ্রদ্রুম দ্বীপের দক্ষিণে জহ্নুদ্বীপ বা জাননগর। এর দক্ষিণে ঋতুদ্বীপ। ঋতুদ্বীপ থেকে গঙ্গার অপর পারে গোদ্রুম দ্বীপ। এরও দক্ষিণে সমুদ্রগড় ইত্যাদি অঞ্চল নিয়ে বোলদ্বীপ। কালকূট নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে এগিয়ে চলেছেন। কালকূট এই সম্বন্ধে নিজের ভাষা ব্যক্ত করেছেন এইভাবে—

"আজ আমার গন্তব্যস্থল নবদ্বীপ। তার সীমানাটা মোটামুটি দেখে নিলাম। নবদ্বীপ থেকে নদীয়া নামের উৎপত্তি কোন সন্দেহ নেই। নদীয়া নামে শহরের যে পরিচয়, তাও দেখতেই পাচ্ছি, আজকের নবদ্বীপ নগর নয়। প্রাচীন রাজধানী অন্তর্দ্বীপ হলেও, দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে মায়াপুর পর্যন্ত নগর ছড়িয়ে আছে। এখানে নগরের চেহারাটা আমার তেমন চোখে মনে— কোথাও তেমন ধরতে চাইছে না। কারণ, প্রাসাদ-অট্টালিকা, সুলতানি জাঁকজমক, রাজপথে রাজকীয় যানবাহন, অশ্ব হাতী কিছুই চোখে পড়ছে না, তবে তার এ এমন কি নগর!" *(পৃ: ১৫২৩, ঐ)*

তাই কালকূট আবার চৈতন্যমঙ্গলের আদিকবি বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের নবদ্বীপ বর্ণনায় চোখ রাখলেন। তিনি বলেছেন 'নবদ্বীপ হেনগ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।' এখান থেকেই কালকূট সুলুক সন্ধান করে এগিয়ে চলেছেন সেই সময়ের 'নবদ্বীপে'। চোখে পড়েছে 'মুলুকপতি' বা 'অধিকারী' বা 'কাজী'র ইমারত, অবস্থাপন্ন কিছু গৃহস্থের চোখে পড়বার মত কোঠাবাড়ি, টোল, বিদ্যালয়, মন্দির। এই-ই হল নবদ্বীপের আসল চেহারা। কালকূটের চোখে নবদ্বীপের এর থেকেও বড় পরিচয় হল, 'এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।' ... এরকম স্নানপর্ব কালকূট মনভ্রমণেই গিয়ে লক্ষ্য করেছেন। আর নবদ্বীপবাসীরা গৌরবে প্রত্যক্ষ করেছেন কবিদের অনুসরণ করে, 'লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়।'

কালকূট নিজেই দেখে এ সম্বন্ধে বলেছেন, "এখানে হিন্দুর সংখ্যাই বেশি, আর সরস্বতীর

দৃষ্টিপাতও এখানে বিলক্ষণ অতি গম্ভীর ও বিস্তৃত। বাঙালী ব্রাহ্মণ প্রতিভা আর মনীষার বিকাশ, নবদ্বীপের একটা বিরাট অধ্যায় জুড়ে। নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি, নব্যতন্ত্র সংকলন সমস্তই এই কালের ইতিহাস। নবদ্বীপকে নগরের রূপ দিয়েছে তার পাণ্ডিত্যের ইতিহাস।'' *(পৃ: ১৫২৩, ঐ)* কালকূট পুরানো দিনের পুঁথি ও ভৌগোলিক বিবরণের সাহায্য নিয়ে এ'কালের দৃষ্টিতে দেখা সেকালের 'নবদ্বীপে'র ভৌগোলিক অবস্থান, সেইকালের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজপট অর্থাৎ পরিবেশ, সেইকালের মানুষের সামাজিক জীবনযাত্রা, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভাবনা প্রত্যক্ষ করতে সেইকালের মানুষের অন্তরলোকে উঁকি দিয়েছেন। সেখানে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন বৈষ্ণবদের মনে একটা সমাজ পরিবর্তনের— 'আচণ্ডাল উদ্ধারে'র একটি বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ হয়েছে এবং সেই সূত্র ধরেই 'জীবের উদ্ধারে'র সামাজিক পরিবর্তনের 'আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠেছিল।'

কালকূট দীর্ঘ সময়কাল ধরে বিভিন্ন স্থান মানস ভ্রমণ করতে করতে ও সেইকালের জনমানুষের অন্তরলোকের খোঁজ নিতে নিতে একেবারে নিমাই-এর জন্মস্থানে ও জন্ম সময়ে উপস্থিত হয়েছেন। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ফাল্গুনী পূর্ণিমা আর চন্দ্রগ্রহণের সময়, যখন গোটা নবদ্বীপ সংকীর্তনে মুখরিত, তখনই শচীদেবী জন্ম দিলেন ''ভবিষ্যতের নতুন ইতিহাস স্রষ্টা নেতা ও অবতার সন্তানকে।'' *(পৃ: ১৫২৩, ঐ)*

কালকূট সদ্যোজাত শিশুটিকে দর্শন করলেন এইভাবে, 'ফাল্গুন শোভন নিশি হিমকর জ্যোতি' তখন 'চন্দ্রমা-গ্রাহয়ে রাহু' সেই সময়ে 'প্রভু শুভজন্ম, পৃথিবীতে হেনকালে।' তিনি আরও বলেছেন ''রূপ লাবণ্যে অমিয় গোরাচাঁদ, এসব হল আমাদের মানুষের চোখে দেখা। অতুলন বিশ্ববিমোহন। কিন্তু কবিদের কথা আলাদা।'' *(পৃ: ১৫২৪, ঐ)*

এখন দেখা যাক্ কালকূট কবিদের কথা আলাদা কেন বললেন। কবি লোচন দাস বলেছেন, 'তিলফুল জিনি নাসা উন্নত', গোরা অঙ্গ, চারু গালের জ্যোতি, অরুণ অধর! আজানুলম্বিত বাহু, সুন্দর চিবুক, বিশাল বক্ষ, সিংহের মত গ্রীবা, হস্তীর মত স্কন্ধ। আজানুলম্বিত বাহু। কদলীর মতো বিশাল নিতম্ব আর উরু। চরণ দুটি অরুণ কমল, পায়ের তলে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন অর্থাৎ কৃষ্ণের পায়ের তলে যে চিহ্ন ছিল। লোচন দাসের নিমাইয়ের রূপ বর্ণনায় কালকূটের মনে সংশয় উপস্থিত যে 'সদ্যোজাত শিশুর এমন রূপ কি করে সম্ভব?' কালকূট বলছেন, কবিরাজ গোস্বামী নিমাইয়ের যুবককালের যে সৌন্দর্যের কথা বলেছেন, সেই যুবককালের সৌন্দর্যই হয়তো ভাবাবেগে সদ্যোজাত শিশুর ওপরেই আরোপ করেছেন। কালকূটের মনে হয়েছে নিমাই ভবিষ্যতের অবতার, এটা প্রকাশের জন্য লোচন দাস হয়তো বলেছেন, 'সভার মনে হইল এই নাগরীর প্রাণ।' ... অর্থাৎ রমণীদের মনে হয়েছে বৈকুণ্ঠ থেকে শ্রীকৃষ্ণ এসে জন্ম নিয়েছেন। আদিরসের কবি লোচন দাস অনেক কবির সঙ্গে শিশু নিমাইকে দেখে বলেছেন, 'মহারাজ রাজাধিপ লক্ষণ বিরাজে।'

কালকূট বলেছেন, কবিরাজ গোস্বামী নিমাইয়ের জন্ম সম্বন্ধে নতুন কথা শুনিয়েছেন, সেটা হল, ''তের মাস হয়ে গেল, তবু শচীর সন্তান প্রসব হল না, এতে জগন্নাথ মিশ্র উদ্বিগ্ন হলেন।'' *(পৃ: ১৫২৪, ঐ)* কালকূট বলছেন তিনি বুঝতে পারছেন না এই তথ্য কবি কেন বলেছেন, যা আর কোনও কবি বলেন নি। কবিরাজ গোস্বামীর হিসাবে ১৪০৬ শকে মাঘের শেষে নিমাই শচীমাতার গর্ভে এসেছিলেন। আর জন্ম নিলেন ১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসে, পৌর্ণ মাসী সন্ধ্যাকালে নিমাই জন্মের সেই শুভক্ষণ এলো। শুধু এই তথ্যটি ছাড়া আর সব তথ্যই ঠিক আছে। কালকূট পুঁথির পাতার ধুলো ঝেড়ে আর জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে বের করতে পারেন নি। কালকূট দেখেছেন, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, নিমাইয়ের জন্মমাত্র বলেছেন, 'অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন তাহারাও ভজিবে শিশুর চরণ।' ... কবিরাজ গোস্বামী ও তাঁর কাব্যে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকেই অনুসরণ করেছেন।

এঁদের কাব্যে যবনদের প্রতি একটা বিরূপতার ছাপ কালকূট লক্ষ্য করেছেন। নিমাইয়ের জন্মের পরে তাঁর দাদামশাই নীলাম্বর চক্রবর্তী প্রথমে দৌহিত্রকে দেখতে এসে জন্মের লগ্ন দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, 'লগ্নে মহারাজ লক্ষণ।' আরও বললেন গৌড়ে ব্রাহ্মণের রাজা হওয়ার কথা। এই ছেলেই সেই রাজা কিনা সেটা পরে জানা যাবে। কালকূট নীলাম্বর চক্রবর্তীর এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন, নীলাম্বর চক্রবর্তী নিমাই সম্পর্কে ঠিক কী বলতে চেয়েছেন বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো তিনি 'রাজা'র কথাই বলেছেন কিন্তু তিনি শাসক রাজা নন, ভিন্ন রাজা। শিশুর পায়ের তলে 'ধ্বজ বজ্র শঙ্ক চক্র মীন' এসব চিহ্ন দেখে বললেন, 'সবই মহাপুরুষের লক্ষণ।' কালকূট নীলাম্বর চক্রবর্তীর এই 'মহাপুরুষ' কথাটিকেই আলোকপাত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে চৈতন্যজীবনীকাররা নিমাইয়ের অতীত সম্বন্ধে অনেক গুণগান করেছেন।

নিমাই জন্মের চার মাস পরে পণ্ডিতজনের অনেক বিবেচনার পরে তাঁর নাম রাখা হল বিশ্বম্ভর। এই শিশুই তো পরবর্তীকালে বিশ্বের দায়িত্বভার নেবে, তাই এই নাম। কিন্তু কালকূট বলেছেন তাঁর নবদ্বীপ যাত্রার পূর্ব থেকেই তিনি শুনে এসেছেন — মাতা শচীদেবী প্রতিবেশীদের পরামর্শে ছেলের নাম রাখলেন নিমাই। কালকূট এর ব্যাখ্যা করেছেন — 'নিম + আই = নিমাই, আই শব্দের অর্থ মা, তিক্ত-মা'। শচীদেবীর আটটি সন্তান মারা গেছে। বিশ্বরূপ নবম এবং এই শিশুটি দশম সন্তান। এই শিশুটি তাঁকে ছেড়ে যাবে না, এই বিপরীত প্রত্যাশায় এই নাম 'নিমাই'। আর টুকটুকে ফর্সা ছেলেকে দেখে সকলের মুখে মুখে সে গৌর, গোরা, গৌরাঙ্গ। এই তো হল নাম পর্ব।

এবার শিশুর লীলাপর্ব। অন্নপ্রাশন হল শিশুর বয়স যখন ছ'মাস তখন। শিশুর সামনে একটি থালায় ধান, পুঁথি, সোনা, রূপা ইত্যাদি দেওয়া হল। শিশুটি 'ভাগবত' পুঁথিটি থালা থেকে

তুলে নিয়ে গায়ে-মুখে মাখতে লাগল। সকলে বলল— এই শিশু মস্ত পণ্ডিত হবে। কিন্তু নিমাইয়ের মা-বাবা এই ঘটনায় কতটা সন্তুষ্ট সে বিষয়ে কালকূটের মনে ভাবনার উদয়। একেই মহামারী দুর্ভিক্ষের জন্য শ্রীহট্ট থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল, তার উপরে সংসারটি সচ্ছল নয়। তার উপরে বড় ছেলে বিশ্বরূপের মতিগতিও ভাল নয়, সারাদিন পুঁথিপত্র নিয়ে থাকলে সংসারে সচ্ছলতা আসবে কোথা থেকে। কালকূট তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে জগন্নাথ মিশ্রর মনের ভিতরে যে সমস্যাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে সেগুলো বুঝতে পারলেন। জগন্নাথ-শচীদেবী একটু স্বস্তি পেলেন শুধু এই কথা ভেবে, 'ছেলে হবে হয়তো মস্ত পণ্ডিত।'

কালকূট দেখছেন, নিমাইয়ের বাল্যলীলা। জগন্নাথ মিশ্রর ঘর শিশুর রূপে আলোকিত। এর মধ্যে কালকূটের নজরে এসেছে শিশুটি ভয়ডরহীন, বড়ই দুরন্ত। সকলের প্রিয় একটি দুরন্ত মানবশিশু তাঁরই জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটল, যা অনেকের কাছে অলৌকিক বলে মনে হল। একদিন শচীদেবী উঠোনে কাজ করছিলেন, তাঁর সাথে অন্যান্য প্রতিবেশিনীরাও ছিল। নিমাই হামাগুড়ি দিয়ে খেলছিল। হঠাৎ একটি বিষধর সাপ তাঁর কাছে এসে যাওয়ায় অবোধ শিশু জীবন্ত খেলনা মনে করে তাকে থাবা দিয়ে ধরামাত্র সাপটি তাঁকে দংশনের বদলে মাথা নীচু করে রইল। তারপর কান্নাকাটি আর লোকজনের ভীড় দেখে সাপটি পালিয়ে গেল।

নিমাই হাঁটতে শিখেছে। হাততালি দিলে সে নাচে, কিন্তু 'হরি হরি' বললে তালে তালে নাচে। একদিন জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে ঘর থেকে বই এনে দিতে বলেছিলেন। নিমাই ঘরের মধ্যে ঢুকতেই ঘরের মধ্যে সুমধুর নূপুরের আওয়াজ শুনে জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী উভয়েই সচকিত হয়ে উঠলেন যে ছেলের পায়ে তো নূপুর নেই, তাহলে নূপুর বাজে কোথা থেকে। নিমাই পিতাকে বই এনে দিয়ে বাইরে খেলতে যাওয়ার পরে তাঁরা ঘরে ঢুকে দেখলেন যে ঘরের মেঝের সবখানে, ধ্বজ বজ্রপতাকা অঙ্কুশের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। দু'জনের গায়ের মধ্যে যেন একটা শিহরণ খেলে গেল। তার সঙ্গে একটা অলৌকিক আশঙ্কাও।

কালকূট নিমাইয়ের জীবনের এই তিনটি ঘটনা এইভাবে দেখেছেন যে পশুপক্ষীর বুদ্ধি বলে কিছু নেই, আছে 'প্রবৃত্তি'। জাত সাপটি প্রবৃত্তিবশতই হয়ত নিমাইয়ের হাতের স্পর্শে বিপদের আশঙ্কা করেনি তাই মাথা নীচু করেছিল। তার কাছেও ঘটনাটি একটি খেলার মতো হতে পারে। ভক্তের চোখে এটি একটি লীলা খেলাই মনে হল। আর হাততালি দিয়ে 'হরি হরি' বললে তালে তালে নাচা যায়, শিশু নিমাই 'হরি হরি' ও হাততালির মধ্যে ছন্দ খুঁজে পেয়েছে। তৃতীয় ঘটনাটিতে জগন্নাথ ও শচীদেবী দু'জনেই শিহরিত! মা-বাবা তো তাঁদের মানবশিশুকেই চান। অলৌকিক কিছু না। তাঁরা চান তাদের সন্তান যেন গৃহত্যাগী না হয়।

এইরকম কিছু কিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে শিশু নিমাই বড় হয়ে উঠছিল। দাদা বিশ্বরূপ ছাড়া

সে কাউকেই মান্য করে না। দাদার সঙ্গে সর্ব অঙ্গে ধুলো মেখে উলঙ্গ নিমাই দাদাকে অদ্বৈত আচার্যের বাড়ি গিয়ে ডেকে নিয়ে আসত। দাদার সঙ্গে আসার সময় দাদার কাপড়ের কোঁচা ধরে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসত। কালকূট বলছেন স্বয়ং অদ্বৈত আচার্য, যিনি ''কৃষ্ণ অবতারের জন্য সর্বদাই অপেক্ষা করেছেন, তিনি কিন্তু বালক নিমাইকে দেখে আদৌও কিছু ভাবছেন না। তাঁর চোখের সামনে দিয়েই নিমাই ঘোরাফেরা করে।'' *(পৃ: ১৫২৯, ঐ)* নিমাই দু'একটি ঘটনা ছাড়া কাউকে কিছু ভাববার অবকাশই দেননি। ''এমন দুর্জয় দুষ্টু ছেলে নবদ্বীপে কে কবে দেখেছে?'' *(পৃ: ১৫২৯, ঐ)* কালকূটকে অনুসরণ করেই দেখা যাক্ নিমাইয়ের দুর্জয় দুষ্টামিগুলো —

নিমাই দাঁড়িয়ে হেঁটে বাইরে যেতে শুরু করেছে তখন থেকেই এই উৎপাত শুরু। নিমাই পাড়ায় ঘুরে সব বাড়িতেই যায়। খই, কলা, সন্দেশ যা দেখে তাই হাত পেতে চায়, কেউ না বলতে পারে না। সব সে নিজে খায় না, সঙ্গীদের দেয়, গরিব স্ত্রীলোকদের দিয়ে দেয়, যারা হাততালি দিয়ে 'হরি নামে'র গান করে। সকাল-দুপুর-রাত, কিছু সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে বাড়ির বাইরে বাইরে টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল, সেই তাদের চালক। তার নেতৃত্বে খাবার চুরি, খাবার না পেলে হাঁড়ি-কুড়ি ভেঙে খানখান করা, ঘুমন্ত শিশুকে জাগিয়ে, কাঁদিয়ে দিয়ে প্রতিবেশীদের উত্যক্ত করতে লাগল। নিজের সমবয়সী ছেলেদের ধরে মারতে লাগল।

শচীদেবীর কাছে নালিশ জানালে, তিনি একদিন ছেলেকে বকাঝকা করে শাসন করলেন, তখন নিমাই বাড়ির থালা-বাসন, যা কিছু হাতের কাছে পেল, সব ভেঙে তছনছ করে দৌড়ে পালিয়ে যায়। গঙ্গার ধারে গাছতলায় বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করে, বাড়ি ফেরার নামই নেই। শচীদেবী ধরতে গেলে ছুটে পালিয়ে যায়। নিমাই যে অন্যায় করছে এই বোধটাও তার আছে। নিমাইয়ের দুরন্তপনায় অস্থির হয়ে সকলের পরামর্শে জগন্নাথ মিশ্র যজ্ঞ স্বস্ত্যয়ন করালেন। শচীদেবী ভাবলেন নিয়মিত গঙ্গাস্নান করালে ছেলে ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু ফল কি হল দেখাই যাক কালকূটের চোখ দিয়ে। নিমাই খেলতে খেলতে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা এঁটো নোংরা মালসা হাঁড়ি, সে সব তুলে নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি খেলতে লাগল। শুচিবায়ুগ্রস্থ মাতার নিষেধ শুনলই না। 'তোর কি অশুচি বোধ নেই?' এই কথার উত্তরে নিমাই বলল, 'কে বলল এসব অশুচি? এসব অশুচি নয়।' যেগুলো অশুচি নয়, সেগুলোকে নিমাই ঘেন্না করতে যাবে কেন? শুচি-অশুচি নিয়ে মায়ের সঙ্গে তর্ক বেঁধে যায় নিমাইয়ের। শচীদেবী নিমাইকে বকতে বকতে মারতে গেলেন, আর নিমাই হাতের কাছে ইঁটের টুকরো তুলে নিয়ে মায়ের দিকে ছুঁড়ে মারল। মা কপালে আঘাত পেয়ে রাস্তার উপরে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। মাকে জ্ঞান হারাতে দেখে নিমাই কান্নাকাটি জুড়ে দিয়ে বলতে লাগল যে আর ওরকম করবে না।

কালকূট বলছেন নিমাই অবস্থার গুরুত্ব বুঝলেই এরকম কান্নাকাটি করে কিন্তু ভুলতে সময়

লাগে না। কিন্তু 'শুচি-অশুচি' বোধ সম্বন্ধে তার জিজ্ঞাস্য? তিনি বুঝেছেন নিষিদ্ধ কাজেই নিমাইয়ের ঝোঁক বেশী। তার মনে হয়েছে "নিমাইয়ের কাছে যেন পুরীষচন্দনে ভেদাভেদ নেই, সে এমনই ময়লা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে।" *(পৃ: ১৫৫৩, ঐ)*

কালকূট নিমাইয়ের দুষ্টুমির স্পর্ধা দেখছেন। মুরারি বৈদ্য কয়েকজনের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করতে করতে যাচ্ছেন। নিমাই খেলছিল বন্ধুদের সঙ্গে। হঠাৎ নিমাই হাত-মুখ-নাক ঘুরিয়ে মুরারি বৈদ্যকে ভেংচাতে লাগলো। মুরারি বৈদ্য প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তাঁকে পাজি ছেলে, অকাল কুষ্মাণ্ড, মা-বাবা কি দেখে না, এসব নানা কথায় গালাগালি করলেন। এর পরিণতি! পরদিন যেই মুরারি বৈদ্য খেতে বসেছেন, অমনি কোথা থেকে নিমাই ছুটে এসে তাঁর ভাতের থালায় পেচ্ছাব করেই পালিয়ে গেল। সামান্য একটু সময়। মুরারি বৈদ্য হতভম্ব! এমন দুষ্টুমি কেউ কখনো দেখেছে। নিমাই শুধু দুষ্টুই নয়, অত্যন্ত ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন। বাবা খেতে বসেছেন, হঠাৎ বাবার পৈতা খুলে নিয়ে পালিয়ে গেল দাদামশাইয়ের বাড়ি। কেন এসেছে সেটি না বলে বলল যে দাদামশাইকে না দেখলে তাঁর ভালো লাগে না। যখন নিমাইয়ের গর্হিত কাজটি তিনি জানতে পারলেন তখন নিমাই ধারে কাছে নেই। অন্যায় করেছে এটা বুঝতে পেরেই অন্য বুদ্ধি ধরল। নিমাই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করল, তার শরীর মন ভালো না। এবং বাড়ীর লোকজনদের এও জানিয়েছিল যে জগদীশ আর হিরণ্য ঠাকুরের বিষ্ণুপূজার প্রসাদ না খেলে নিমাই বাঁচবে না। তারপর একাদশীর সকালে বিষ্ণু পূজার সেই প্রসাদ খেয়ে সুস্থ হয়ে গেল। এই ঘটনাটিকে কালকূট বলেছেন, "বোঝা গেল, সে শুধু দুরন্ত নয়, অতিশয় চতুর।" *(পৃ: ১৫৩০, ঐ)* পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি ঘটনাই কালকূট সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অনুভব করেছেন যে বুদ্ধিতে আর চাতুর্যে তার সঙ্গে কেউ পেরে ওঠে না। এই লক্ষণটিও আসলে নিমাই চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য।

অল্পবয়সেই নিমাইয়ের বুদ্ধির প্রসারতা কালকূটের নজরে এসেছে। তিনি দেখেছেন সব কিছুতেই সে ব্যতিক্রম। জগন্নাথ মিশ্র নিজে নিমাইয়ের হাতেখড়ি দিলেন। বাবার কাছে লেখা শিখে খুবই তাড়াতাড়ি স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ লেখা আয়ত্ত্ব করে ফেলল। এরপরে বন্ধুদের সঙ্গে সুদর্শন পণ্ডিতের গৃহে সুন্দর করে ব্যঞ্জনবর্ণ লিখল। গুরু মহাখুশি কিন্তু ছাত্রটি তো সহজ নয়। কালকূটের চোখে মানসভ্রমণে ঘটনাগুলি প্রতীয়মান হয়ে উঠছে।

নিমাই গুরুমশাইকে জিজ্ঞাসা করছে, ক, খ, গ, ঘ — এসব কেন বলে? গুরুমশাই মোটেই খুশি হলেন না, তিনি উত্তর দিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের জানার ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। সে এর 'আদি অন্ত কি' জানতে চায়। এমন তার্কিক ছেলেকে রাগ করে গুরু পিটিয়েই দিলেন। কালকূট দেখলেন নিমাই তর্কটা মনে মনে রেখে দিল। এবং অল্পদিনের মধ্যে দ্বাদশ ফলা অক্ষর আয়ত্ত করে ফেলল। এরপরই শুরু হল গঙ্গার ঘাটে দুরন্তপনা। পড়া শেষ করেই গঙ্গার ঘাটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলা,

সাঁতার শেখা, সেখান থেকে বাড়ি ফেরা। কালকূটের চোখে এটা অস্বাভাবিক নয়। গ্রামের ছেলেমেয়েদের কাছে সাঁতারটা জলচর প্রাণীর মতই স্বাভাবিক।

ব্যতিক্রমটা কোথায়? সেটাই দেখা যাক! কালকূট সেই অতীতে বিচরণ করছেন — গঙ্গার ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করছে। কালকূট নিমাইয়ের দুরন্তপনার একটি জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন। তাঁর সঙ্গে কৌতুকরস মিশিয়ে ইতিহাসের পাতা থেকে চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তুলেছেন। সেকালের গঙ্গার ঘাটের ঘটনাবলীকে দৃশ্যায়িত করে তুলেছেন। গঙ্গায় ঝাঁপ, তারপরে চিৎ সাঁতার, ডুব সাঁতার, এমনি সাঁতার, জলক্রীড়া করেই যায় নিমাই ও তার দলবল। বয়স্ক লোকের গায়ে জলের ছিটা লাগে। বারণ করলে নিমাই শোনে না, বেশি বললে গায়ে মুখে কুলির জল ছিটিয়ে দেয়। ব্রাহ্মণরা স্নান করে উঠে দেখে তাদের উত্তরীয় নেই, জলে দাঁড়িয়ে ধ্যান করছে, পায়ের জল ছিটিয়ে ধ্যান নষ্ট করে দেয়। পুরুষদের জায়গায় মেয়েদের কাপড় আর মেয়েদের জায়গায় পুরুষদের ধুতি রেখে এসে দূর থেকে মজা দেখে নিমাই। কোন ব্রাহ্মণ জলে দাঁড়িয়ে পুজো করছে, কোমরের কাছে সুড়সুড়ি। নিমাই কাপড় খুলে নিয়ে গেছে। জলে দাঁড়িয়ে সেই ব্রাহ্মণের কি অবস্থা! নিমাই খিল খিল করে হাসছে। কেউ স্নান করে উঠে শিবলিঙ্গ পুজো করছে, নিমাই শিবলিঙ্গ নিয়ে পালিয়ে গেল। কোন ব্রাহ্মণ নদীর পাড়ে বিষ্ণু পূজার ফুল নৈবেদ্য সাজিয়ে গঙ্গায় ডুব দিতে নেমেছে। অমনি নিমাই চুপিসারে দুর্বা-ফুল ছড়িয়ে ফেলে, চন্দন নিজের গায়ে মেখে, নৈবেদ্য খেয়ে নিজেই পূজার আসনে বসে মন্ত্র আওড়াতে শুরু করে দিল। মার মার বলে ছুটে আসতেই নিমাই সহ সঙ্গীরা মুঠো মুঠো বালি ছুঁড়ে মারে। বেশি গালাগাল করলে পরে প্রতিশোধ নেয়। স্নানরত ব্রাহ্মণের ঘাড়ে লাফ দিয়ে উঠে বলে 'আমি মহেশ। তোমার কাঁধে চেপে নিলাম।'

কালকূট নিমাই ও তার দলবল সহ দুরন্তপনার চিত্রগুলো অনায়াস গতিতে তুলে ধরেছেন। নিমাইয়ের হাত থেকে বালিকারাও রক্ষা পায় না। শাড়ি চুরি করে, মুখে যা আসে তাই বলে। ওদের মুখে কুলকুচির জল ছিটিয়ে দেয়। পূজার দূর্বা-ফুল সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়, কিছু বলতে গেলে বালি ছিটিয়ে দেয়, ওক্‌রা গাছের কাঁটাফল চুলে ঢুকিয়ে দেয়। ছ-বছরের ছেলে, তার সমবয়সী বালিকাকে বলছে, তোকে বিয়ে করবো। বালিকারা শচীদেবীকে গিয়ে নালিশ করে। ''ছেলেকে ডেকে বারণ কর। এসব কাজ নদীয়ায় চলে না। শ্রীহট্টে চলতে পারে।'' *(পৃ: ১৫৩১, ঐ)* জগন্নাথ মিশ্র ব্রাহ্মণদের নালিশ শুনে নিমাইকে মারতে গেলে বালিকারাই আবার নিমাইকে খবরটা দিয়ে দেয়।

কালকূটের চোখে এই বৈপরীত্য চোখে পড়েছে। কালকূট তাঁর অন্তর্দৃষ্টি মেলে ধরেছেন। ''আসলে মনে মনে সব বালিকাই নিমাইকে পছন্দ করে। পছন্দ অবশ্য প্রেমঘটিত বলা যায় না। কিন্তু একটা কথা ভুললে চলবে না। এই সেই যুগ যখন মেয়েদের শিশু বয়সেই বিয়ে হয়। জীবনের

অভিজ্ঞতা তারা অল্প বয়সেই অনেকখানি আয়ত্ত করে নেয়।" *(পৃ: ১৫৩২, ঐ)*

কালকূট নিমাইয়ের দু'বছর বয়স পর্যন্ত দুর্জয় দুরন্তপনা মানসভ্রমণে অবলোকন করে অতীত থেকে বিভিন্ন চরিত্রগুলো তুলে এনেছেন, এবং ঘটনাবলীকে বাস্তবোচিত করে তুলেছেন। চৌদ্দশো নব্বইয়ের কাছাকাছি গঙ্গার ঘাটে নিমাইয়ের দৌরাত্ম্যের ঘটনাবলী দেখতে দেখতে সেই সময়ে গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থীদের কার্যকলাপ এ'কালের দৃষ্টিতে তুলে এনেছেন। শুধু গঙ্গার ঘাটের দৃশ্য নয়, নিমাইয়ের বাল্যকাল থেকে গুরুগৃহে যাওয়া পর্যন্ত নিমাইয়ের বিভিন্ন দুরন্তপনার সঙ্গে সে সময়ের সমাজচিত্র ও নিমাইয়ের পারিবারিক চিত্র তুলে ধরেছেন। পরিহাস প্রিয় দুষ্টু বালকের সন্ধানে গিয়ে তার দুষ্টামির সঙ্গে সঙ্গে তার চাতুর্য-ক্ষুরধার বুদ্ধি, জেদী মনোভাব, শুচি-অশুচি, ধর্মাধর্মবোধ, অজানাকে জানার জন্য তার্কিক মনোভাব, দুর্বিনীত, গুরুজনে ভক্তিশ্রদ্ধার লক্ষণ, ভয়ডরহীন মনোভাব— সবকিছু কালকূট তুলে ধরেছেন। তিনি দেখেছেন একটি সাধারণ মানবশিশু কিভাবে জ্যোতির্ময়তার পথে এগিয়ে গেছেন।

কালকূট আরও দেখেছেন নিমাই একমাত্র তাঁর দাদা বিশ্বরূপ-এর কাছেই শান্ত, নম্র। নিমাই-এর ছ'বছর পূর্ণ। বিশ্বরূপের ষোল বছর বয়স। সারাদিন পুঁথিপত্র ও বিষ্ণুভক্তি নিয়ে থাকে। সংসারে মন নেই। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে সংসারী করবার জন্য পাত্রীর সন্ধান করতেই বিশ্বরূপ সাঁতরে গঙ্গার ওপারে, কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে চলে গিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে নিলেন, শ্রীশঙ্করাবণ্য নাম দিলেন কেশব ভারতী।

দাদার গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই নিমাইয়ের দুরন্তপনা কমে গেল। গুরুগৃহে সূত্র পাঠ আর সেই সূত্রকেই অন্যরূপে বিচার। এ'কাজ সহজ নয়, তীক্ষ্ম মেধাবী বলেই নিমাই এ বয়সেই এই কাজটি করেছিল। কিন্তু নিমাইয়ের এই পরিবর্তনে মা-বাবা খুশি হলেন না! নিমাই শাস্ত্রজ্ঞানে সবাইকে পরাজিত করে জগজ্জয়ী হবে, আশে-পাশের লোকের এই কথাগুলোতে তাঁরা শান্তি পেলেন না। বিশ্বরূপের ছায়া নিমাইয়ের মধ্যে দেখে জগন্নাথ মিশ্র নিমাইয়ের পড়াশোনা বন্ধ করে দিলেন।

কালকূট নিমাইয়ের অন্তর্বেদনা অনুভব করেছেন। বয়স তার কম হলে কি হবে, তাঁর বোঝার ক্ষমতা ছিল, আর তা সমবয়সী ছেলেদের থেকে আলাদা। দাদার গৃহত্যাগ নিমাইকে মনে মনে প্রচণ্ড দুঃখী করে তুলেছিল, তাই সে নিজেকে মগ্ন রেখেছিল লেখাপড়ার মধ্যে। পিতার নিষেধে নিমাইয়ের সেই বেদনা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ভিতরে ভিতরে ফুলে উঠছে। কালকূটের নজর এড়িয়ে যায় নি ব্যাপারটা। কালকূট এই ঘটনাকে এইভাবে দেখেছেন, তিনি ধীরে ধীরে নিমাইয়ের মধ্যে যে এক মহাশক্তি বিরাজমান তারই বহিঃপ্রকাশ দেখছেন। "সকল মানুষের মধ্যেই এই শক্তি অবস্থান করে, সে শক্তিকে কাজে লাগাতে চায়। পথ না পেলেই বিপথে যায়। আর নিমাইয়ের মতো দুর্জয়

শক্তিমান ছেলের তো কথাই নেই।'' *(পৃ: ১৫৩২, ঐ)*

হলও তাই, কালকূট এটাকে নিমাইয়ের দৌরাত্ম্যের দ্বিতীয় অধ্যায় বলেছেন। নিমাই পড়াশোনায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে একরকম দস্যিবৃত্তি আরম্ভ করল। রাতের অন্ধকারে, অন্য বালকের সঙ্গে দু'জনে কম্বলে আপাদমস্তক ঢেকে ষাঁড়ের মত ছুটে লোককে ভয় দেখায়, হাতের কাছে যা কিছু পায় সব ভেঙে তছনছ করে, লোকের বাড়িতে দরজায় শেকল টেনে দিয়ে চলে যায়, শেষে একদিন আবার বাড়ির সামনে বর্জনীয় হাঁড়ি-মালসা, অবশিষ্ট প্রসাদের উপর বসে রইল। মায়ের নিষেধে গম্ভীর চালে একটি বলিষ্ঠ কথা বলে উঠল নিমাই — ''বিষ্ণুর রান্নাবান্নার পাত্র, এ কখনো খারাপ হতে পারে? এসব ছুঁলে বরং শুদ্ধ হয়, কেননা, এতো শুদ্ধ স্থান।'' *(পৃ: ১৫৩২, ঐ)* একথার মধ্যে যে শুধু চাতুর্য নয়, চিন্তারও ছাপ আছে, তা যেন কালকূট ধরে ফেলেছেন। তাই তিনি বললেন, সেই সময়ের সমাজ পটভূমিতে দাঁড়িয়ে, ''নবদ্বীপে কারোরই সেই দূরদৃষ্টি নেই, এই বালকই ভবিষ্যতে অস্পৃশ্য অঙ্গের উপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।'' *(পৃ: ১৫৩৩, ঐ)* জগন্নাথ মিশ্র বাড়ি ফিরে নিমাইয়ের দৃঢ়তা ও জেদ দেখে বুঝলেন এটা নিমাইয়ের সহজাত সংস্কার। ছেলেকে পড়াশোনার অনুমতি দিতেই হল।

ন'বছর বয়সে 'যজ্ঞসূত্র' ধারণ করলেন, মাতামহ দিলেন গায়ত্রী মন্ত্র। তিনদিন শূদ্রের মুখ দেখা নিষেধ, মৌনব্রতী। কিন্তু নিজের বন্ধুদের যথাযথ আপ্যায়ন করতে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন। এই হল নিমাইয়ের নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকা। পিতার কথায় নিমাই নিজের গুরু নিজেই ঠিক করেছিল, এটি কালকূটের কাছে একটি বিশিষ্ট ঘটনা বলে মনে হয়েছে। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে নিমাই ছাড়া মুরারি গুপ্ত, কমলাকান্ত, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি মেধাবী ছাত্ররা আসতেন। নিমাই গুরুর ব্যাখ্যা খণ্ডন করেই ক্ষান্ত হলেন না, খণ্ডন করে আবার সেই ব্যাখ্যাকে নিজের সূত্রে স্থাপন করলেন। এ সহজ কথা নয়, তীক্ষ্ম মেধাবী না হলে এসব করা সম্ভব নয়। তাই গুরু তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিলেন। নিমাই কূট তর্কে এতই পারদর্শী হয়ে উঠলেন যে, তার সঙ্গে এঁটে ওঠা মুশকিল। কূট তর্ককে 'ফাঁকি' বলে। এছাড়া এগারো বছর বয়সে 'সূত্রের টিপ্পনী' করে। অত্যন্ত মনোযোগী ও মেধাবী বলেই এমনটি সম্ভব করেছেন। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের জ্ঞানের কুশলতায় আনন্দ পেলেও মনে মনে ভয় পান। একদিন শচীদেবীকে বলে ফেললেন, ''ব্রাহ্মণী, আমি স্বপ্নে দেখলাম, ''নিমাই যেন শিখা মুণ্ডন করেছে।'' *(পৃ: ১৫৩৩, ঐ)* সন্ন্যাসীর লক্ষণ — শচীদেবী এ'কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন।

নিমাই গঙ্গাদাস অধ্যাপকের গৃহে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে চলেছে। একদিন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সামনেই বলে উঠল, ''কোন্ ব্যাটা আছে, আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করবে? তাকে দেখাও, তাঁর কাঁধে চেপে মাথায় গাট্টা মারব।'' *(পৃ: ১৫৩৩, ঐ)* এই দাম্ভিকতাপূর্ণ কথা শুনে গুরু সহ্য

করতে না পেরে খুঁটি তুলে নিয়ে নিমাইকে আঘাত করেছিলেন। নিমাই রাগে কাঁদতে কাঁদতে পুঁথি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। জগন্নাথ মিশ্র পরদিন আবার নিমাইকে গুরুগৃহে দিয়ে গুরুকেই অনুরোধ করে এসেছিলেন একটু মানিয়ে নেওয়ার জন্য। বড় জেদী ছেলে, নিজের কথা ছাড়া কারো কথা মানতে চায় না। ছোটবেলা থেকেই নিমাইয়ের নিজের চিন্তাধারার উপর আস্থা বেশি। এর কিছুদিন পরে পিতার মৃত্যু নিমাইয়ের জীবনে একটা বিরাট আঘাত হানল। এ অবস্থায় নিমাই মাকে সান্ত্বনা দিলেন, ''মা চিন্তা করো না। আমি যখন আছি, তোমার সবই আছে।'' *(পৃ: ১৫৩৩, ঐ)* কিন্তু নিমাই তেল, আমলকি, চন্দন আর মালা স্নানের সময় দিতে না পারায় মায়ের উপর রাগ করে ঘরের জিনিস সব ভেঙে ফেলল। তাতেও রাগ কমল না, 'মাটিতে পড়ে আছাড়ি পিছাড়ি খেতে লাগল।' কালকূট বলছেন এই দুরন্ত ক্রোধ পরে আরও দুর্বার হয়ে দেখা গেছে। এই 'রাগ' একটি বিশেষ লক্ষণ।

নিমাইয়ের বয়স বাড়ার সঙ্গে দৌরাত্ম্যপনা আগের থেকে কমে এসেছে। গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থিনী কুমারীদের প্রতি তার উৎসাহ বেড়েছে। মেয়েদের উত্যক্ত করা কমেনি। মেয়েদের তাঁকেই পুজো করতে বলে, তাহলে তাদের ভালো বর, ঘর হবে; অনেক সন্তানের জননী হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখা যায়, এতে মেয়েরা রাগ করলেও তাকে পছন্দ করে। এই নিমাই-ই গঙ্গার ঘাটে বল্লভাচার্যের কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। লক্ষ্মীর রূপ দেখে নিমাইয়ের সাধ মেটে না, এমন দুর্বার আকর্ষণ। কবিরা বলেছেন লক্ষ্মীর 'লাবণ্য কেশ ভ্রমর গুঞ্জরে।' *(পৃ: ১৫৩৪, ঐ)* কালকূট বলেছেন কবিতায় লেখায় তিনি দেখেছেন ''কোন কবিই নিমাইয়ের সঙ্গে লক্ষ্মীর দু'বারের বেশী দেখা করান নি।'' *(পৃ: ১৫৩৪, ঐ)* কিন্তু কালকূটের সন্ধানী মন এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট নয়। তিনি বলেছেন, নিমাইয়ের মত ছেলের সাথে ঘাটে দেখা না হলেও পাড়ায় কি দেখা হত না? ঘাটে কি তারা নিয়মিত স্নান করতে যেতেন না? কিন্তু যুগলক্ষণকে কবিরা ত্যাগ করতে পারেন নি। যে যুগে যা নিয়ম, সেটাই মেনে চলা।

কালকূট মানসচক্ষে নিমাই-লক্ষ্মীকে কয়েকবার দেখেছেন। একদিন, লক্ষ্মী শঙ্কর পুজো করে বারে বারে নমস্কার করে বর প্রার্থনা করছেন— নবদ্বীপচন্দ্র করুন পাণিগ্রহণ। চোখ মেলে তাকিয়েই দেখল নিমাই সামনে দাঁড়িয়ে হেসে বলছে, 'এতদিনে তোমার বিধি প্রসন্ন হল'। *(পৃ: ১৫৩৪, ঐ)* আর একদিন, গঙ্গার ঘাটে লক্ষ্মীর পুজোর সময় আবার নিমাই উপস্থিত। দুজনেই উল্লসিত। নিমাই লক্ষ্মীকে বলল, 'আমিই মহেশ্বর, আমাকে পুজো কর; তোমার অভীপ্সিত বর দেব।' *(পৃ: ১৫৩৪, ঐ)* আর লক্ষ্মী অমনি নিমাইয়ের 'অঙ্গে দিল পুষ্পচন্দন/মল্লিকার মালা দিয়া করিলা বন্দন।' *(পৃ: ১৫৩৪, ঐ)* এই ঘটনাকে কবিরা বলেছেন 'সাহজিক প্রীতি' কিন্তু কালকূটের চোখে এই ঘটনা, 'এ যে একেবারে গান্ধর্ব বিয়ে হয়ে গেল। লক্ষ্মীর সাহস কম নয়!' সেইসময়

পরিপ্রেক্ষিতে কালকূটের চোখে বারো বছরের লক্ষ্মী নিতান্ত বালিকা নয়।

এরপরে নিমাই নিজেই বনমালী আচার্যকে নিজের বিয়ের ঘটকালি করবার জন্য তার মা শচীদেবীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। একটু পরেই নিমাই বাড়িতে ঢুকে মায়ের কাছেই জানতে চাইলেন বনমালীকে কেন তিনি খুশি করে দিলেন না? মা এই কথার ইঙ্গিত ধরতে পেরে পরের দিনেই বনমালীকে ডেকে এনে নিমাইয়ের বিয়ের দিন পাকা করে ফেললেন। কালকূট বলেছেন, ঐতিহাসিকরা বলেছেন অতিরিক্ত মেধাসম্পন্ন বালকদের বিয়ের ইচ্ছা খুব তাড়াতাড়িই জাগে, নিমাইয়ের বেলাতেই তার ব্যতিক্রম হল না। ষোল বছর বয়সে বিয়ের কথা শুনে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়েছিলেন আর ষোল বছর বয়সেই নিমাই প্রেমে পড়ে বিয়ে করেন। সালটা ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দ। হোসেন শাহ্‌র রাজত্বকাল। নিমাই সুখী। তরুণ অধ্যাপক, ছাত্রদের শাস্ত্র পড়াতে ব্যস্ত থাকলেও বৈষ্ণব দেখলেই তার পিছনে লাগেন। অধ্যাপকদের দেখলে 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা করেন। বৈষ্ণবদের বিদ্রূপ করেন। শ্রীবাসকে তাই জিজ্ঞাসা করেন 'ধীরে ধীরে কৃষ্ণনাম করলে কি পুণ্য হয় না? নেচে কেঁদে ডাক ছাড়তে হবে কেন?' *(পৃ: ১৫৩৫, ঐ)* মুকুন্দকে 'ফাঁকি' ধরে বলে মুকুন্দ নিমাইকে দেখলেই পালায়।

অদ্বৈত আচার্য সব শোনেন কিন্তু নিমাইকে কিছু বলেন না। সবাইকে 'কৃষ্ণ' নয়নগোচর করাবেন। এমনই দিনে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী নদীয়াতে অদ্বৈত আচার্যর বাড়িতে উঠলেন। এইরকম একদিন পথে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। গোপীনাথ আচার্য ঈশ্বরপুরীকে তার নিজের গৃহে নিয়ে যাচ্ছেন। নিমাইও গেলেন। ঈশ্বরপুরী পণ্ডিত ব্যক্তি কিন্তু নিজেকে 'শূদ্রাধম' বলেন। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে নিমাইয়ের মানসিক পরিবর্তন হচ্ছে এটা কালকূটের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। ঈশ্বরপুরী তার নিজের লেখা পুঁথি 'কৃষ্ণচরিত' একটু দেখে দিতে বলেছিলেন। তার কিছু ত্রুটি আছে কিনা। নিমাই কোন ত্রুটি খুঁজে পেলেন না এবং বইটি ফেরৎ দিয়ে দিলেন। একদিন ঈশ্বরপুরীর কাছে ব্যাকরণ নিয়ে কূট তর্ক হল। ঈশ্বরপুরী নিমাইকে বললেন 'যে ধাতুকে তুমি পরস্মৈপদী বললে, আমি তাকেই আত্মনেপদী বলে সাধন করছি।' *(পৃ: ১৫৩৫, ঐ)* এই প্রথম নিমাই শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজয় মেনে নিল। কিন্তু এই ঘটনা নিমাইয়ের অবচেতন মনে যে একটা বিরাট পরিবর্তন এনে দিল তা সেই সময়ে কেউ বুঝতে পারে নি। ছাত্র পড়ানোও চলছে কিন্তু বৈষ্ণবদের দেখলে 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা থেকে নিজেকে বিরত রাখলেন না। নিমাইয়ের মত পণ্ডিত যুবকের এই আচরণে শ্রীবাস, মুকুন্দ, গদাধর প্রমুখ খুব কষ্ট পেতেন — বৈষ্ণবের ছেলে, কৃষ্ণের নাম নেয় না।

পাশাপাশি নিমাই অন্য এক ধরনের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁতী, গোয়ালা, বেনে, মালাকার, তাম্বুলি, শঙ্খবণিক, নগরের এমন কোনো পাড়া নেই, ঘর নেই, যেখানে নিমাই যায় নি তাদের সঙ্গে কথা বলেনি। কালকূট বলছেন, এইটিই ভবিষ্যতের লক্ষণ, কিন্তু কেউ ব্যাপারটা

গুরুত্ব দিচ্ছে না। এরই মধ্যে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে শাস্ত্রীয় কূট তর্কে পরাজিত করাতে তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। এরকমই সুসময়ে নিমাই নিজেদের দেশ শ্রীহট্টে যাওয়ার আগে লক্ষ্মীকে বললেন, তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত সে যেন বাপের বাড়ি না যায়। এবং জানতে চাইলেন 'এবার তুমি কি চাও বল।' লক্ষ্মী কিছুই চাইল না বলল, মনে মনে প্রার্থনা করব তুমি সার্থক হও। তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে, ফিরে এসো। লক্ষ্মীর অশ্রুসিক্ত চোখ দেখে নিমাই তার 'যজ্ঞোপবীত' গলা থেকে খুলে লক্ষ্মীকে দিয়ে বলেছিলেন 'এর থেকে বড় কিছু তো আমার নেই। এই স্মৃতি নিয়ে তুমি কালযাপন কর। আমি কাজ শেষ হলেই ফিরে আসব। আমার জন্য অপেক্ষা করে থাক।' *(পৃ: ১৫৩৬, ঐ)* অধ্যাপক নিমাই পূর্ববঙ্গে গিয়ে প্রচুর খ্যাতি পেলেন, এইদিকে বিরহিণী প্রেমিকা-বধূ স্বামীর দেওয়া অমূল্য উপবীত মালা চন্দনে পুজো করছে, উপবীত-পাদুকায় স্বামীর স্পর্শ, কাঠের পাটাতনে স্বামীর প্রতিচিত্র আঁকার চেষ্টা করে ও মনে মনে বলে 'বড় কষ্ট গো প্রভু, কবে আসবে তুমি।' *(পৃ: ১৫৩৬, ঐ)* —নিমাই এলেন না। এরূপ অবস্থায় একরাত্রে কালসাপ লক্ষ্মীকে দংশিত করল। লক্ষ্মীর মা-বাবা, আত্মীয় পরিজন সবাই এলেন; ওঝা, ধন্বন্তরী এলেন, কিন্তু ফল কিছুই হল না। লক্ষ্মী স্বামীর দেওয়া উপবীত নিয়ে গঙ্গার ঘাটে মরতে চাইলেন। লক্ষ্মীর চোখে নিমাইয়ের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে দেখা হওয়া থেকে সব দৃশ্য ভেসে উঠছে। মনে মনে বলল, ''ওগো, এ যে সাপের দংশন নয়, তোমার বিরহ সর্পরূপে দংশন করল। হায়, তোমাকে যে আর দেখতে পাব না।'' *(পৃ: ১৫৩৬, ঐ)*

শেষমুহূর্তে স্বামী-দংশন আর হল না। এই ঘটনার কিছুদিন পরে বহু ধনরত্ন সহ নানাধি জিনিসপত্র নিয়ে এসে মায়ের পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে বললে 'মা, তোমার জন্য এসব নিয়ে এসেছি।' *(পৃ: ১৫৩৬, ঐ)* দিগ্বিজয়ী নিমাইকে সবাই দেখতে এসেছে, কিন্তু কারও মধ্যে কোন উচ্ছ্বাস নেই; সবাই বিষণ্ণ, গম্ভীর। এসব দেখে নিমাই বিচলিত হয়ে মাকেই ডাকলেন, 'মা তুমি ঘরে কেন? তোমার মুখে হাসি নেই কেন? কি হয়েছে?' *(পৃ: ১৫৩৬, ঐ)* কেউই জবাব দিতে সাহস পায় না। ''শেষ পর্যন্ত একজন ব্রাহ্মণ বললেন, 'পণ্ডিত, তোমার পত্নী গঙ্গাপ্রাপ্ত হয়েছেন।' 'গঙ্গাপ্রাপ্ত'! নিমাই যেন আর্তনাদ করে উঠল।'' *(পৃ: ১৫৩৬, ঐ)*নিজের কানকে হয়তো বিশ্বাস করতে পারছেন না। শচীদেবী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লক্ষ্মীর সর্পদংশনে মৃত্যুর কথা বললেন। কালকূট এই মুহূর্তটিকে যেমনভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন সেইভাবেই দেখা যাক্।

শচীদেবীর কথা শুনে ''নিমাই পাথরের মূর্তির মতো স্থির। যেন দেহে প্রাণ নেই। অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করে রইল। মাত্র দুটি বছর। লক্ষ্মী, কোথায় গেলে আমাকে ছেড়ে? বুক ফাটছে, কিন্তু মুখে উচ্চারণ করল, 'মাগো, সংসার অনিত্য।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললো, 'হায়, কোথায় আমি, কোথায় লক্ষ্মী, কোথায়ই বা এই অর্থ? এ যে সকলই অনর্থ মা। মানুষের জীবন

পদ্মপত্রে জল। নইলে লক্ষ্মী কেন আমাকে ছেড়ে যাবে।" *(পৃ: ১৫৩৬, ঐ)* ১৫০১ থেকে ১৫০৩ মাত্র দুটি বছরে প্রেমপূর্ণ সুখী সংসারের পরিসমাপ্তি! লেখক কালকূট মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন, "সকলের চোখে জল। 'নিমাই আত্মসঙ্গোপনে তখন জীবনের কথা ভাবছে।' মনে মনে বলল, 'লক্ষ্মী, সংসার অনিত্য, কেউ কারো নয়। তুমিই সেই জ্ঞান দিয়ে গেলে। তুমি নেই, এবার তবে কার অন্বেষণ করব?' সেই অন্বেষণের কথা ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়।" *(পৃ: ১৫৩৬, ঐ)*

নিমাইয়ের জীবন দর্শনের জন্য কালকূট ইতিহাসের পথ ধরে মনভ্রমণে নবদ্বীপে এসেছেন। আধুনিককালের মানুষ কালকূট, সেই দৃষ্টি দিয়ে তিনি নিমাইয়ের শিশুকাল থেকে নিমাইয়ের অন্তর থেকে চৈতন্যরূপ ধারণের মুহূর্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছেন। দেখেছেন কীভাবে একটি সাধারণ দুরন্ত মানবশিশু ধীরে ধীরে তার দুরন্তপনা পরিহাসপ্রিয়তা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, নিজ সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা, স্পষ্টবাদিতা, দুর্বিনীত স্বভাব, পাণ্ডিত্য দিয়ে অন্তর থেকে চৈতন্যে রূপান্তরিত হয়েছেন। কালকূট দেখেছেন নিমাই-লক্ষ্মীর মানবিক প্রেমকে। কী গভীর ছিল তাদের প্রেমের সম্পর্ক, সুখের ছিল সংসার জীবন। লক্ষ্মী সুখী ছিল প্রেমিক ও পণ্ডিত স্বামী পেয়ে। সেই প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলের মধ্যে একজন হঠাৎই সর্প দংশনে ধরাধাম থেকে বিদায় নেন। প্রেমিক স্বামী প্রবাস থেকে ফিরে এসে যখন তীব্রভাবে দেহ-মনে প্রেমিকা পত্নীর সঙ্গ লাভ করতে চেয়েছিলেন সেই তীব্র আবেগের সময়েই নিমাইকে 'পত্নী গঙ্গাপ্রাপ্ত' এই মর্মান্তিক কথাটা শুনতে হয়েছিল। প্রবাস থেকে ফিরে এসে নিমাই আনন্দ উৎসাহের সঙ্গে মায়ের সঙ্গে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে গল্প করছিলেন, 'বাঙালদের ভাষা' নিয়ে কৌতুক করছিলেন, এগুলোও করছিলেন অনেকটা কিশোরী পত্নী লক্ষ্মীকে শোনানোর জন্য। কেননা তিনি ভাবছিলেন লক্ষ্মী আড়াল থেকে লুকিয়ে তাঁকে দেখছে ও তাঁর কথাবার্তা, হাস্যরস উপভোগ করছে। আনন্দঘন প্রেমপূর্ণ হৃদয় থেকে নিদারুণ দুঃখে উপনীত হয়েছিলেন নিমাই। 'সংসার অনিত্য!' বলেছেন ঠিকই, কিন্তু প্রেম নিত্য, এটাও তিনি বুঝেছেন। এই প্রেমই নিমাইকে মানব চৈতন্য থেকে জ্যোতির্ময় চৈতন্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

কালকূট অত্যন্ত সাবলীলতার সঙ্গে নিমাইয়ের জীবন দর্শনে বেরিয়ে প্রতিটি মুহূর্তকে বাস্তবতার সজীবতা দান করেছেন ও লেখনীতে দৃশ্যায়িত করেছেন। নিমাইয়ের মনবেদনাকে অশ্রুজলে কালকূট চিত্রায়িত করেছেন। কাহিনীকার যুগ-কাল অনুযায়ী তারই নিজস্ব উপলব্ধি, বক্তব্য চরিত্রগুলোকে দিয়ে বলিয়ে নিয়ে, বাস্তবোচিত করে কাহিনীকে উপন্যাসের পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। লক্ষ্মীর প্রতি প্রেমই নিমাইকে মহৎ করেছে, তার অন্তরে এমন গভীরতর ক্রিয়া করেছে যে লক্ষ্মীর বিরহ তাকে চৈতন্যে রূপান্তরিত হওয়ার পথ আলোকিত করেছে।

'প্রেম নিত্য' অংশে কালকূট নিমাইয়ের জন্মের সময়কাল থেকে অনেক অতীতেও মনভ্রমণ করেছেন। কালকূট দেখেছেন, লক্ষ্মীর মৃত্যুসংবাদটি কী নিদারুণ ছিল বেদনায় দীর্ণ ছিল। মনের

ভিতরে যন্ত্রণায় হৃদয়তন্ত্রী টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ হল 'মাগো, সংসার অনিত্য'। আঘাত মানুষকে মহৎ করে। নতুন পথের অন্বেষণে দিশা দেখায়, জন্য, যে-পথ তাঁকে মানব চৈতন্য থেকে শ্রীচৈতন্যতে পরিণত করেছিল।

কালকূট নিমাইয়ের শ্রীচৈতন্য রূপ ধারণের পথই অনুসরণ করেছেন। তিনি মানসচক্ষে যা দেখেছেন, যা উপলব্ধি করেছেন তাই তিনি লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। 'প্রেম নিত্য, সংসার অনিত্য' — এটি ১৯৮৭ সালে শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই অধ্যায়ে কালকূট অতীতচারী হয়ে প্রথম অধ্যায়ের কিছুটা পুনরাবৃত্তি করেছেন পাঠকের সুবিধার জন্য। এখানে সংক্ষেপে নিমাই জন্মের পূর্বের এবং জন্মের সময় থেকে লক্ষ্মীর বিরহে নিমাইয়ের ভাবান্তর পর্যন্ত আরও একবার পরিক্রমা করে নিয়েছেন। আচণ্ডাল উদ্ধারের জন্য সমাজ সংস্কারের বৈপ্লবিক পথে নিজেকে ব্রতী করেছেন। লেখক কালকূট বলেছেন ষোড়শ শতাব্দীতে অন্ত্যজ, অবহেলিত মানুষদের জাগরণ তো নিঃসন্দেহে সমাজবিপ্লব।

এখন দেখা যাক্, সেই সমাজ বিপ্লবের কিছু আগের কালের সমাজপ্রেক্ষিত ও জনমানস, রাজনৈতিক ও সামাজিক পট-পরিবেশ। এই সময়কালে নবদ্বীপে সুলতানরাজ চলছিল। হিন্দু সমাজের দুর্গতি চলছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নীচ অন্ত্যজ বর্ণের হিন্দুদের ঘৃণা করে, এদের ছায়া মাড়ালেও অশুদ্ধ, ধর্মে কোথাও ঠাঁই নেই, মন্দির স্পর্শ করারই অধিকার নেই। সব কিছু উচ্চবর্ণের ভোগ দখলে, নীচ চণ্ডাল — অন্ত্যজরা তাদেরই সেবারত। নিজের সমাজের কাছে লাঞ্ছিত, অপমানিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। ধর্মান্তরিত হিন্দুরা যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন রাজপদে নিযুক্ত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বখ্‌তিয়ার খিল্‌জির একজন দাস গৌড়ের সিংহাসনেও বসেছিল। এই ঘটনার মধ্যে রাজনীতিও ছিল। কিন্তু সকলেই স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়েছিল এমনটি নয়। জোর করে ভয় দেখিয়েও ধর্মান্তরিত করা হচ্ছিল। দলে দলে হিন্দুরা মুসলমান হয়ে যাচ্ছিল, এটা বৈষ্ণবরা মেনে নিতে পারছিল না। তাঁরা এর জন্য পাষণ্ডীদের দায়ী করেছিল। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, যারা মদ-মাংস ও সমস্ত নীতিবোধ হারিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করছিল, নবদ্বীপের সারস্বত অবদানের কোন মূল্যই এই পাষণ্ডীদের ছিল না। অনেক পণ্ডিত গুণীজনেরা যবনরাজের অত্যাচারে পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্য উড়িষ্যায় চলে গিয়েছিলেন। নিমাইয়ের জন্মের আগেই গৌড়বঙ্গে রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল 'বিপ্র রাজা গৌড়ে হইবেক হেন আছে।' অতএব যবনরাজের মনেও এইরকম একটা বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু যবনদের হটিয়ে একবার গণেশ রাজা হয়েছিলেন সেই কারণে হিন্দুদের প্রতি তথা ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা তীব্র হয়েছিল। কালকূটের চোখে ধরা পড়েছে এই রটনার পিছনে রাজনীতি জড়িত আছে, যবনরাজ্যে এইরকম একটি রটনা সহজ কথা নয়, কিন্তু এটি ঘটানো হয়েছিল

গোপনে কিছু মানুষের দ্বারা। বাইরে থেকে কিছু কৃষ্ণভক্ত বা বৈষ্ণব এসে রাতে শ্রীনিবাসের বাড়িতে উচ্চস্বরে নামকীর্তন করে। যবনরাজ্যে উচ্চস্বরে নামকীর্তন করাও কম দুঃসাহসের কাজ নয়। কিন্তু কয়েকজন বৈষ্ণব এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন। শুধু তাই নয়— রাজভয়, পাষণ্ডীর অনাচার ও অত্যাচার থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য অদ্বৈত আচার্য প্রথম হুঙ্কার দিয়েছিলেন, 'সংহারিমু' বলে সমাজ পরিবর্তনের ডাক দিলেন। পতিতের উদ্ধার অর্থাৎ অন্ত্যজ হিন্দু, যবন, নারী, এমনকি বেশ্যার উদ্ধারের জন্য ডাক দিলেন। সবাইকে একই পতাকার তলে সংগঠিত করার জন্য ধীরে ধীরে আন্দোলনের ভিত্তি ভূমি গড়ে তুললেন। এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন অদ্বৈত আচার্য এই আন্দোলনে প্রথমেই পেয়ে গেলেন যবন হরিদাসকে। যবন হরিদাস সমাজ পরিবর্তনে ও অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের পথে রুখে দাঁড়ানো এই আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা। তিনি মুসলমান হয়ে জন্মেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আচার আচরণে ছিলেন বৈষ্ণব। এমন কৃষ্ণ ভক্তকে কাছে পেয়ে অদ্বৈত আচার্য তাঁকে প্রাণের অধিক করে রাখলেন। হরিদাসকে অদ্বৈত আচার্য প্রথম বৈষ্ণব ধর্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন ও তাঁর হাতে গীতা তুলে দিয়েছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

সেইকালের সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। কালকূট বলেছেন "রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে, হরিদাস বৈষ্ণব হয়ে একটা প্রচণ্ড আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন। প্রমাণ, তাঁর শাস্তি। কাজীর আদেশে হরিদাসকে রাইবা বাজারে চাবুক মারতে মারতে অর্ধমৃত করে ফেলা হয়েছিল। সকলে তাঁকে মৃত মনে করে কাজীর আদেশেই গঙ্গায় ফেলেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে হরিদাস বেঁচে যান। লোকে এটাকে অলৌকিক ঘটনা বলে মনে করল। পাষণ্ডীরা হরিদাসকে বৈষ্ণব হতে দেখে, ভয়ঙ্কর রেগে গেছিল। তারা হরিদাসকে যা তা বলে কটু কাটব্য করছিল। ধর্ম যে রসাতলে যেতে বসেছে, হরিদাস তাদের কাছে বড় প্রমাণ।

এইরকম পরিমণ্ডলে কালকূট নিমাইকে জন্ম থেকে যৌবনের উন্মেষে পদার্পণ করতে দেখলেন। আর নিমাই ছেলেবেলা থেকে যা বিশ্বাস করত তাই করত, কারো কথা শুনত না, একমাত্র দাদা বিশ্বরূপ ছাড়া। কালকূট সব লক্ষ্য করেছেন, দৃঢ়তা ছিল তাঁর মজ্জাগত স্বভাব। এসব থেকে কালকূট এর অন্তর্নিহিত কথাটি বুঝতে পেরেছেন। তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি মেলে ধরেছেন নিমাইয়ের চলার পথে। কালকূট দেখেছেন "নিমাই প্রথম থেকেই, সেইকালের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিল। এই অন্তর্নিহিত মানবিক অবস্থাটিকে কি আজকের বিপ্লবীরা, বিপ্লবাত্মক বলবেন? হয়তো এখনই তা বলবার সময় আসেনি। এ বিবেচনার কথা ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক।"

লক্ষ্মীর সঙ্গে বিবাহের পরে নিমাইয়ের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল — সেটি হল

ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে পরাজয়। ঈশ্বরপুরীর ভক্তিকথা তাঁর হৃদয়ে গভীর দাগ কেটেছিল। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় নি। কিন্তু অন্তরে তাঁর পরিবর্তনের ঢেউ উঠেছিল। আর দ্বিতীয় ঘটনা হল লক্ষ্মীর মৃত্যু। কালকূট নিমাইয়ের মানসিক দিকগুলো অবলোকন করেছেন একালের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। কালকূটের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সাধারণ মানবিক খুঁটিনাটি দিকগুলো যেভাবে নজরে এসেছে সেগুলো চরিতকাররা সেভাবে দেখেননি। যেহেতু চরিতকাররা যখন লিখতে শুরু করেছেন তখন তাঁরা নিমাইকে অবতাররূপে ভেবেই লিখেছেন। কালকূট বলছেন, তাই তাঁরা ''মানবমনের কষ্ট যে নিমাইয়েরও থাকতে পারে, এটা তাঁরা ভক্তির প্রাবল্যে হয়তো লক্ষ্য করতেন না। অথচ আমি দেখেছি, নিমাইয়ের মুখচ্ছবির কী করুণ রূপ। একি বায়ুব্যাধি, না বিরহের শোক, আমি দেখছি, প্রাকৃতের প্রেম এক অপ্রাকৃতের গভীরে গিয়ে মিশেছে। ব্যাধি না, প্রাকৃতের বিরহ যাতনা এক অপ্রাকৃতের সন্ধানে রত। এক প্রেমকে ভুলতে হলে, আর এক প্রেম চাই। এটা মানুষের অবচেতনের বিষয়। সেখানেই তার মুক্তি।'' *(পৃ: ১৫৪০, ঐ)*

যখন নিমাইয়ের শোকাচ্ছন্ন মন মুক্তির জন্য নতুন প্রেমের আঁধার খুঁজছে ঠিক সেই সময়েই বৈষ্ণবদের মধ্যে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে। তাঁরা একজন অবতার চাইছেন। সেই অবতার বৃন্দাবনের কৃষ্ণ নয়। তাঁরা চাইছেন চক্রধারী কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণকে। যিনি এসে মানুষের মন থেকে রাজভীতি দূর করবেন ও সকল পাষণ্ডীদের বিনাশ করবেন ও আচণ্ডাল উদ্ধারের নেতৃত্ব দিতে পারবেন। কৃষ্ণের অবতার হতে হলে তাঁকে কৃষ্ণভক্ত হতেই হবে এবং তাঁকে সকলের কাছে নেতৃত্বের উপযুক্ত বলে গ্রাহ্য হতে হবে। তাঁর ভাবদর্শন এমন উচ্চমার্গে হবে যে তাঁর নেতৃত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

কালকূট ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শুরুতে মনভ্রমণে এসেছেন। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণের মনের অবস্থা কেমন হতে পারে সেটা বুঝতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি মেলে ধরেছেন। তিনি দেখেছেন, তাঁদের ধারণা ''অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন পুরুষ ছাড়া কেউ অবতার হতে পারেন না। অলৌকিক শক্তি জন্মায় কেমন করে? যাঁর মধ্যে সেই শক্তি আছে, যে শক্তি দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রকাশ করতে পারেন। তার জন্য দরকার ত্যাগ, ভক্তি, ধ্যানযোগ।'' *(পৃ: ১৫৫৪, ঐ)*

কালকূট লক্ষ্মীর মৃত্যুর পরে নিমাইয়ের মানসিক অবস্থা অবলোকন করছেন। লক্ষ্মীর প্রেমানুভূতি নিমাইয়ের অন্তরের শান্তি বিনষ্ট করেছে। প্রেমাস্পদকে পাওয়ার জন্য হৃদয়ের গভীরে তীব্র আন্দোলন চলছে। কালকূটের নজরে এসেছে নিমাইয়ের আচরণের কিছু কিছু পরিবর্তন। নিমাই আবার ছাত্র পড়াতে গিয়ে ছাত্রদের অনুরোধ করছেন কপালে তিলক ধারণ করতে, আর সন্ধ্যাবন্দনা করতে। তাঁর বাল্যকালের বায়ুব্যাধির উপসর্গ আবার দেখা দিয়েছে। ছাত্ররা তাঁর মাথায় বিষ্ণু তেল মাখিয়ে দিচ্ছে। মায়ের অনুরোধে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রর কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে

বিয়ে করে ফেললেন। কিন্তু হৃদয়ের গভীরে ডুব দিয়ে দেখলেন সেখানে লক্ষ্মীই অধিষ্ঠিতা। বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে ফিরে তাকালেন না। শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে মনোযোগের চেষ্টা করলে নিমাই বিকট হুঙ্কার আর চিৎকার করে ওঠেন, বিষ্ণুপ্রিয়া ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। পরিহাসপ্রিয়তা, ঔদ্ধত্য কিছুই নেই নিমাইয়ের মধ্যে, আছে অন্যমনস্কতা। বৈষ্ণবদের দেখলে আর ডেকে ডেকে 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা করেন না, নির্বিকার।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ের পর, ১৫০৫ থেকে ১৫০৮ এ কয়েক বছর কেটে গেল। পিতা মারা যাওয়ার ১৩ বছর বাদে নিমাই গয়ায় চললেন বাবার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিতে। এই সময়ে চারিদিকে পাষণ্ডীদের অত্যাচার।

অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপে এলেন। হরিদাসও নবদ্বীপে এসে অদ্বৈত আচার্য-র সঙ্গে মিলিত হলেন। অদ্বৈত আচার্যের গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে নিত্যানন্দর গভীর সখ্যতা। নিত্যানন্দ তখনও নবদ্বীপে আসেন নি, বৃন্দাবনে অবস্থান করছেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের কার্যাবলী অদ্বৈত আচার্য মারফৎ মাধবেন্দ্র পুরীর কানে পৌঁছত। গয়া যাওয়ার পথে নিমাইয়ের জ্বর হওয়াতে বদ্যির সন্ধান না করে বিপ্রের পাদোদক পান করেছিলেন রোগ নিরাময়ের জন্য। গয়ায় পিণ্ডদানের পর পাদপদ্ম দর্শনের জন্য চক্রবেড়ের ভিতরে গিয়ে নিমাই আচ্ছন্নতায় ডুবে গেলেন। এই সময়েই দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে নিমাইয়ের গয়ায় দেখা হয়ে গেল। এই পর্যন্ত কালকূটের অন্তর্দৃষ্টিকে অনুসরণ করলে দেখা যায়, কালকূট দেখেছেন এই বায়ুব্যাধিটি নিমাইয়ের বাল্যকাল থেকেই ছিল, এর প্রথম উপসর্গ দেখা দিয়েছিল, নিমাইয়ের উপনয়নের সময় ন'বছর বয়সে। কিন্তু এবারের বায়ুরোগের ধরণটি আলাদা। শান্ত, গম্ভীর ভাবে বিভোর। কালকূটের মনে সন্দেহ— বায়ুব্যাধি নয়, লক্ষ্মীর বিরহেই নিমাইয়ের এই অবস্থা। তিনি ছাত্রদের দিচ্ছেন আচরণ বিধির শিক্ষা। ছাত্রদের কাছে তিনি নতুনভাবে পরিচিত হচ্ছেন। 'নিমাইয়ের শোকাচ্ছন্ন মন, মুক্তির উপায় হিসাবে, একদিকে যখন নতুন প্রেমের আশ্রয় খুঁজছে, তখনই ভবিষ্যতের আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে।'

কিন্তু লক্ষ্মীর প্রতি তীব্র প্রেমানুভূতির জন্য নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়া বিমুখ ছিলেন। লক্ষ্মীর বিরহকে চরিতকাররা কৃষ্ণবিরহ রূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কালকূট মানবিক দিকগুলোতে দৃষ্টি দিয়েছেন। তাঁর চোখে লক্ষ্মী বিরহে নিমাই এতই মগ্ন ছিলেন যে, বিষ্ণুপ্রিয়ার সাহচর্য তাঁকে শান্তি দিতে পারে নি। তাই এই বিরূপতা। তাঁর মন প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃতের দিকে ধাবিত। কালকূট লক্ষ্য করেছেন নিমাই বৈষ্ণব ধ্যান ধারণাকে বিভিন্ন কূট প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই করে নিতে শুরু করেছেন বহু পূর্ব থেকে ''আসলে নিজেরই ভবিষ্যৎ পথকে একটি সুসংহত রূপ দিচ্ছিল।'' কিন্তু বৈষ্ণবরা নিমাইয়ের আচরণকে বুঝতে পারেন নি। পরিহাসপ্রিয় নিমাই বৈষ্ণবদের 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা করে দেখেছেন এর মূলতত্ত্বে যেতে চাইছেন। লক্ষ্মীর বিরহ নিমাইয়ের অবচেতন মনকে তোলপাড়

করে দিয়েছে; নির্বিকার তিনি।

নিমাইয়ের গয়া গমনের সময়ে হরিদাস ও অদ্বৈত আচার্য নবদ্বীপে এসেছেন। কালকূটের মনে হয়েছে এসবের মধ্যে যোগসূত্র আছে। তিনি ইতিহাসের পাতায় খোঁজ করে কিছু জানতে পারেন নি। নিমাই কারও কাছে বলেছিলেন কিনা ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তিনি গয়া মুখে আসছেন। তবে বৃন্দাবন দাসের রচনায় তিনি দেখেছেন, নিমাই মনে মনে এইরকম ভেবেছিল, সে পরভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। তার আগে একরা গয়া ঘুরে আসবে। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে নিমাইয়ের গয়াতে দেখা হওয়ার ঘটনাটিকে কালকূটের পূর্বপরিকল্পিত ঘটনা বলে মনে হয়েছে। 'ঈশ্বরপুরী না এলে, নিমাইয়ের অবতারত্ব প্রকাশের প্রথম প্রয়োজন মিটতে পারে না।' *(পৃ: ১৫৪৫, ঐ)*

কালকূট দেখছেন নিমাই ও ঈশ্বরপুরীর গয়াতে দেখা হওয়ার মহাক্ষণটিকে। নিমাইয়ের অবচেতনে অলৌকিক শক্তি অবস্থান করছিল। আবার অন্তরে 'সংসার অনিত্য' এই বোধ এবং 'ঈশ্বরপুরীর ভক্তিবাদের কাছে পরাজয়' দুটোই জাগ্রত ছিল। নিমাইয়ের অবচেতনে আন্দোলনের সুপ্ত স্বরূপটি কীভাবে প্রকাশিত হয় সেটাই কালকূট সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। কথোপকথন লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে—

ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে নিমাইয়ের দেখা হতেই নিমাই বলল ''তুমি আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত রস পান করাও , এই দান চাই।'' *(পৃ: ১৫৪৫, ঐ)*

ঈশ্বরপুরী বললেন, 'আমি তো দেখি, তুমি নিজেই ঈশ্বরের অংশ। তোমাকে দেখেও সুখ।'

কালকূট নিমাই ও ঈশ্বরপুরীর ছোট ছোট অথচ গভীর অর্থপূর্ণ কথাগুলো সময় উপযোগী করে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

পিতার শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাওয়ার পরেই ঈশ্বরপুরী নিমাইকে 'দশাক্ষর মন্ত্রে' দীক্ষা দিলেন। মন্ত্র গ্রহণের পরই নিমাইয়ের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিল। ভাবাবেশ দেখা দিল। তাঁর গয়া যাত্রার সাথী সঞ্জয় মুকুন্দকে বলে দিলেন যে তিনি আর সংসারে ফিরে যাবেন না। মথুরায় যাবেন। 'সেখানেই আমার প্রাণনাথ আছেন।' *(পৃ: ১৫৪৫, ঐ)*

কালকূট দেখছেন, এখানেই সমস্যা সৃষ্টি হল। নিমাই মথুরায় গেলে আন্দোলনের সব আয়োজন পণ্ড হয়ে যাবে, নবদ্বীপে সবাই অর্থাৎ অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিতসহ তাঁর তিনভাই, যবন হরিদাস ও বিশিষ্ট বৈষ্ণবরা অপেক্ষা করে আছেন। বৈষ্ণব চরিতকাররা বলেছেন, দৈববাণী হল, 'লোক নিস্তারিতে তুমি এসেছ। মথুরায় নয়, তুমি নবদ্বীপে ফিরে চল।' *(পৃ: ১৫৪৫, ঐ)*

কালকূট বলছেন, 'দৈববাণী বাইরের নয়। অন্তরের নির্দেশ।' *(পৃ: ১৫৪৫, ঐ)* সঞ্জয় মুকুন্দের কান্নাকাটিতে নিমাই মাঘ মাসে অনেকে বলেছেন পৌষ মাসে ফিরে এসেছিল।

এখানে এসে কালকূট একটু সংশয়ে পড়েছেন। কেউ বলেছেন নিমাই সপার্ষদ রাজগীর

গিয়েছেন গয়া থেকে ফেরার পথে। এবং ওখানেই তাঁর মন্ত্রদীক্ষা হয়। আবার লোচনদাস বলেছেন, গয়া যাওয়ার পথেই ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে নিমাইয়ের দেখা হয় এবং সেখানেই 'গোপীনাথ মহামন্ত্র' নিমাইকে দান করেন।

আর একজন চরিতকার বলেছেন 'গোপাল মন্ত্র দশাক্ষর' দান করেছেন। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে, একটা মাধুর্য, অপরটা বাৎসল্য। নিমাই কখনও কৃষ্ণকে ডাকছেন, ধ্যানমগ্ন উচ্চ ভাব দশা। লেখক এর সঙ্গে তুলনা করেছেন কবির সৃষ্টির সঙ্গে। কবি তাঁর ধ্যান মগ্নতায় যা দেখতে পান তা অন্যেরা দেখতে পায় না।

এখানেও নিমাইয়ের সেই দশা চলছে। প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃত রূপান্তরিত হচ্ছে। প্রাকৃত হল লক্ষ্মীর জন্য বিরহ, আর অপ্রাকৃত কৃষ্ণ হয়ে রাধার জন্য বিরহ, রাধা হয়ে কৃষ্ণের জন্য বিরহ। কালকূট নিমাইয়ের চৈতন্যে রূপান্তরিত হওয়ার মুহূর্তগুলো প্রত্যক্ষ করছেন। এতদিন বৈষ্ণবদের 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা করে যা জানতে চেয়েছেন তারই অন্তর্নিহিত কথাটি নিমাইয়ের মুখ থেকে বেরিয়ে এল — ''পেয়েও জীবন কানাইকে হারালাম।'' এই 'জীবন কানাই'কে নিমাই দেখেছেন গয়া থেকে ফেরার পথে কানাইয়ের নাট্যশালা গ্রামে। ''তমালের মত এত শ্যামল সুন্দর বালক, নবগুঞ্জার সঙ্গে মনোহর কুন্তল। তার মাথার উপরে বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছের শোভা ঝলমল মণির দিকে চোখ রাখা যায় না। হাতে তার মোহন বাঁশি। সে হাসতে হাসতে আমার কাছে এলো। আমাকে একবার আলিঙ্গন করেই পালিয়ে গেল।'' *(পৃ: ১৫৪৬, ঐ)* নিমাইয়ের সঙ্গীরা কেউ জীবন কানাইকে দেখতে পায় নি। এই ঘটনায় কালকূট বলেছেন — ''অনুভব করছি, আমার আধুনিক যুক্তিগ্রাহ্য মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছে। আমার সময় এবং সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ধারণার কথা আগেই বলেছি। নিমাইয়ের মানসিক অবস্থা দেখেছি। সে যা দেখেছিল তা সম্পূর্ণ সত্য। সে মিথ্যা দেখেনি, মিথ্যা বলেও নি।'' *(পৃ: ১৫৪৬, ঐ)* কালকূট মনভ্রমণে প্রত্যক্ষ করেছেন, নিমাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই 'পেয়েও হারালাম এই বেদনায়' কেঁদেছে। নিমাইয়ের ব্যবহারেও পরিবর্তন, সে বিনীত হয়েছে। একদিকে অপ্রাকৃত দর্শন আর একদিকে ব্যবহারের পরিবর্তন, দুটোই লোকচক্ষু প্রত্যক্ষ করছে।

শূদ্রাধম ঈশ্বরপুরীর কাছে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা লাভ ও 'কৃষ্ণ দর্শন' দুটো নিমাইয়ের জীবনে ঘটেছে। কালকূট দেখেছেন, নিমাইয়ের বিনীত অন্তরলোক। কালকূট নিমাইয়ের এই আচরণকে আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের নতুন পথ বলে মনে করেছেন। ঈশ্বরপুরীই নিমাইয়ের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির উদয় ঘটিয়েছে, একথা নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের কাছে একটি 'গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ'।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়িতে বৈষ্ণবরা নিমাইয়ের রূপ, বাচনভঙ্গির বিনয়ে সকলেই অভিভূত হয়ে গেলেন। 'কৃষ্ণ কোথায় গেল' বলতে বলতে ভাবাবেশে আবিষ্ট, কখনও মূর্ছা দুটোই

হতে লাগল। বৈষ্ণবরা দেখছেন নিমাই 'কৃষ্ণ বিরহে ভূতলে পড়েছেন। অবতারত্ব প্রকাশের আগে এই পরিবর্তন অবশ্যই দরকার। এ পরিবর্তন সকলের চোখে ধরা পড়া। নিমাই একমাত্র সেই পুরুষ যার দর্শন ঘটেছে। তার মধ্যে আগে সবাই অপ্রাকৃত লক্ষণসমূহ দেখুক।' *(পৃ: ১৫৪৭, ঐ)* তাঁর ভাবাবেশ কিছুতেই যাচ্ছে না।

কালকূট বলেছেন নিমাইয়ের মগ্ন চৈতন্যের দ্বিতীয় স্তর চলছে। যেন কোন আঘাত নিমাইকে উন্মাদ করে তুলেছে। এমনকি ভাবের ঘোরে বিষ্ণুপ্রিয়াকেও মারতে যাচ্ছে। কোন কিছুতে আকর্ষণ নেই। সুস্থ থাকলে সব কিছুই স্বাভাবিক। বৈষ্ণবদের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে নিমাই তাঁর শিক্ষকগুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করে এলে। গুরুর কথা অনুযায়ী ছাত্রদের পড়াতে বসলে। এবার নিমাই ছাত্রদের যে কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন তার সঙ্গে প্রচলিত ব্যাখ্যার মিল নেই। এর মধ্যে কোন শাস্ত্রীয় তর্ক বিচার নেই। আবিষ্ট হয়ে তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। সম্বিৎ ফিরতেই বুঝতে পারছেন "প্রচলিত ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ ভেঙে দিয়ে কৃষ্ণ-ভজনে ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের সমান অধিকার ঘোষণা করে এক সাম্যবাদী নতুন সমাজ বিন্যাসের ইঙ্গিতই সে দিচ্ছিল। ছাত্ররা ভাবী নেতার তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারছিল না।" *(পৃ: ১৫৪৭, ঐ)* নিমাই মাকেও বিপ্লববাদের কথা বললেন, 'মা, চণ্ডাল যদি কৃষ্ণনাম করে, তবে সে চণ্ডাল নয়। ব্রাহ্মণ যদি অসৎ পথে চলে, সে ব্রাহ্মণ নয়।' *(পৃ: ১৫৪৭, ঐ)* ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ ভেঙে দিয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করো সাম্য-ব্যবস্থা কথা শুনে শচীদেবীর অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। তাঁর আরও মনে হয়েছিল, তাঁর ছেলে প্রচলিত হিন্দুমতের বিদ্রোহ করছে। কালকূট দেখছেন নিমাই ধীরে ধীরে অন্য মানুষে পরিবর্তিত হচ্ছেন। ছাত্র পড়াতে গিয়ে শাস্ত্রের অসারতার কথা বলে নবদ্বীপের অধ্যাপকদের গালি দিলেন।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ফলেই দেশ-সমাজ ছারখার হয়ে যাচ্ছে। নিমাই বলছেন 'এ শিক্ষার মূল্য কী?' নতুন শিক্ষা পদ্ধতির কথা না বলে 'সকলকে নামের তত্ত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, আগে সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনের কথা বললেন। অত্যাচার অনাচারের মাঝখানে, নিয়ম মাফিক শাস্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি আর পুরনো শিক্ষা পদ্ধতি ত্যাগ করতে বলল।' *(পৃ: ১৫৪৭, ঐ)*

ছাত্ররা কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা বুঝতে না পেরে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের শরণাপন্ন হল। গঙ্গাদাস পণ্ডিত নিমাইয়ের ব্যাখ্যাকে ভুল বললেন না, কিন্তু ব্যাকরণের যোগ্য টীকাকারের মত পড়াতে বললেন। নিমাইয়ের অহংবোধ জেগে উঠল আবার। কৃষ্ণপ্রেম, বায়ুরোগ সব চলে গেল। তাঁর সূত্রের ব্যাখ্যাকে কে স্থাপন করবে? নবদ্বীপে এমনকি কেউ আছেন যিনি তাঁর সূত্র ব্যাখ্যার দোষ ধরতে পারবেন?

ঐদিনই রাত্রের চার দণ্ড পর্যন্ত ছাত্রদের ব্যাকরণ আর ন্যায় পড়াতে লাগলেন। গঙ্গার অদূরেই

নিমাইয়ের বাবার বন্ধু রত্নগর্ভ আচার্যের ভাগবত পাঠের আওয়াজ কানে যেতেই হঠাৎ নিমাই মূর্ছা গেলেন। মূর্ছা কেটে গেলেই আবার শুনতে চাইলেন।

প্রথমে আবেশ তারপরে মূর্ছা। কৃষ্ণপ্রেম আর বায়ুরোগ মিলেমিশে একাকার। কবিরাজ গোস্বামী এই বায়ুব্যাধিকে স্বেচ্ছাকৃত ছলনা বলেছেন। পরের দিন ভোরে আবার ছাত্র পড়ানো শুরু। ধাতুকে একেবারে কৃষ্ণের সর্বব্যাপী শক্তির উৎস হিসাবে ব্যক্ত করলেন। প্রচলিত সংজ্ঞা থেকে আলাদা। ছাত্ররা চায় প্রচলিত শিক্ষা, উপাধি, নিমাইয়ের ভবিষ্যৎ আন্দোলনের অংশীদার হতে চায় না।

নতুন তত্ত্বে ছাত্রদের নিজের নতুন পথে আনতে পারছেন না দেখে দশদিন পরে বড় দুঃখে তাঁদের বললেন, আজই শিক্ষা শেষ, আর কোনও পাঠ আমার কাছে নেই। তোমাদের যার কাছে ইচ্ছে, তাঁর কাছে গিয়ে পড়াশোনা কর, আমি নির্ভয় দিচ্ছি।'

সকলকে কৃষ্ণনাম নিতে অনুরোধ করে চোখের জলে নবদ্বীপের তরুণ অধ্যাপক, যিনি নানা বিষয়ে পণ্ডিত, সম্মানিত অধ্যাপক, ব্যাকরণের মৌলিক টীকাকার, বিদ্যার গরিমায় দাম্ভিক, তিনি চোখের জলে পুঁথি ডোর বেঁধে অধ্যাপক জীবন ত্যাগ করলেন।

কালকূট এতক্ষণ পর পর ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিলেন। অত্যন্ত করুণ দৃশ্য। তাঁর ছাত্ররা তাঁর নতুন পথে চলল না, একসঙ্গে কৃষ্ণনাম করার ইঙ্গিতও বুঝতে পারল না। কালকূট গয়া থেকে ফিরে আসার পরে চারমাস সময় নিমাইকে ও তাঁকে জড়িয়ে যেসব ঘটনাবলী উদ্ভুত হচ্ছে ও তার পারিপার্শ্বিক জনমানসের একটি চিত্র অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর অতীত ভ্রমণকে দৃশ্যায়িত করেছেন। তুলে এনেছেন সেইকালের সমাজের টুকরো টুকরো চিত্র।

তিনি দেখেছেন দীক্ষালাভের পর নবদ্বীপে ফিরে এসে নিমাইয়ের মগ্নচৈতন্যে উচ্চমার্গের ভাবাদর্শ। লক্ষ্মীর বিরহই তাঁকে কৃষ্ণপ্রেমে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর অবচেতনে যে আন্দোলনের লীলা চলছিল তাই কৃষ্ণপ্রেমে বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে ধীরে ধীরে। তাঁর কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়েছে। এই ঘটনা বৈষ্ণবদের মধ্যে অন্তত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। নিমাইয়ের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির ছিঁটেফোঁটাও তাঁরা দেখতে পাননি। বরং নিমাই বৈষ্ণবদের বিভিন্নভাবে নাকাল করেছেন। কিন্তু এই নিমাই-ই নবদ্বীপের বিশিষ্টজনের সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছেন জেনে প্রধান-অপ্রধান সব বৈষ্ণবরা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়িতে জমায়েত হয়েছিলেন। নিমাইয়ের মত পণ্ডিত অধ্যাপক বৈষ্ণব সমাজে যোগদান করছেন। বৈষ্ণবরা নিমাইয়ের রূপ-বাচনভঙ্গি সবকিছু দেখে অভিভূত। শ্রীবাস পণ্ডিত সবচেয়ে বেশি খুশি, তাঁর বাড়িঘর পাষণ্ডীরা ভেঙে ফেলতে চেয়েছেন, অধিকরাতে উচ্চস্বরে নামকীর্তন করে বলে।

বৈষ্ণবরা পাষণ্ডীদের অত্যাচার প্রতিহত করতে পারবেন। তাঁরা অবতারের অপেক্ষা

করছেন। কুরুক্ষেত্রের চক্রধারী কৃষ্ণের মত অবতার তাঁরা চান। কালকূট ইতিহাসের পদযাত্রায় এসব লক্ষ্য করেছেন। বৈষ্ণবদের এই আন্দোলন প্রথমে সহিংস ছিল। তারা পাষণ্ডীদের মুণ্ডু ছিঁড়তে চেয়েছেন। কালকূট বৈষ্ণবদের প্রতিহিংসামূলক মনোভাব লক্ষ্য করেছিলেন। যবনভীতি ও পাষণ্ডীদের অত্যাচার, এই দুটো বিপদ থেকে বাঁচতেই তাঁরা প্রতিহিংসামূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন। যোগ্য নেতা চেয়েছিলেন। নিমাইয়ের মধ্যে অবতারের ভাব প্রকাশিত হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। যুগ পরিবর্তনের সময় সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতা যুগ পরিবর্তনের কর্ণধারদের চোখে পড়ে। কালকূট একালেও দেখেছেন, যাঁরা দেশের সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন চেয়েছেন তারা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমূলে উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন।

কালকূট ইতিহাসের পথে হাঁটতে গিয়ে ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে দেখেছেন তরুণ অধ্যাপক কৃষ্ণপ্রেমে নিমজ্জিত হয়ে নবদ্বীপের মাটিতে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের সামনে ঘোষণা করলেন প্রচলিত শাস্ত্রীয় বিচার-তর্ক সব আমার। সকলকে কৃষ্ণ নামে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজ পরিবর্তনের আহ্বান করেছিলেন। ভবিষ্যতের ইতিহাসের নায়কের ইঙ্গিত তাঁর ছাত্ররা বুঝতে পারে নি। তারা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করে উপাধি পেতে চায়। নতুন কিছু করার দুঃসাহস তাদের নেই। কালকূট অতীতের ছাত্রদের মনোবৃত্তির সঙ্গে একালের তরুণ ছাত্রদেরও মেলাচ্ছেন। এখানেও দেখেছেন দলীয় রাজনীতি ছেড়ে মৌলিক পরিবর্তনের দিকে তরুণরা আসছে না। এ'কালের দৃষ্টি দিয়ে সেকালকে দেখছেন, সমাজ-পটপরিবেশ মানুষজন সবই আলাদা, তবুও আন্দোলনের বা বিকল্পের রূপ, সুর প্রায় একই। কালকূটের চোখে তথা সেই সময়কালের মানুষজনের চোখে নিমাইয়ের প্রতিটি আচরণই অস্বাভাবিক লাগছে। বায়ুব্যাধির সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেম যুক্ত হয়েছে। পাষণ্ডীদের দেখলেই তাড়া করে ছুটে যান। কালকূট নিমাইয়ের উত্তেজিত মনোভাবকে বলেছেন — 'ইতিহাসের অনেক বড় প্রতিভার মধ্যেই দেখা গেছে, সাধারণ মানুষের মত অবস্থা তাদের থাকে না। উত্তেজনা মাত্রই অসুস্থতা। প্রতিভার মধ্যেও সর্বদাই একটা উত্তেজনা অথবা অতি শান্ত, অস্বাভাবিক ভাব দেখা যায়।' *(পৃ: ১৫৪৮, ঐ)*

নিমাইয়ের আহ্বানে তাঁর ছাত্ররা সাড়া না দিলেও বৈষ্ণব সমাজ সাড়া দিয়েছিলেন। বৈষ্ণবরা তো এরকম একজন নেতার অপেক্ষায় ছিলেন যিনি অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন, পতিতের উদ্ধারকারী অবতার। বৈষ্ণবদের সঙ্গে সাড়া দিল 'মূর্খ নীচ দরিদ্র আচণ্ডাল' মানুষেরা। নিমাইয়ের অধ্যাপনা জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর এক নতুন জীবন শুরু হল। কালকূটের চোখে ধরা পড়েছে নিমাইয়ের প্রতিটি কাজ একটি বিশেষ ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে — কৃষ্ণভক্তি, আবেশ, মূর্ছা যাওয়া, বিনীত মনোভাব। গঙ্গার ঘাটে হাজার লোকের সামনে নিমাই তার পরিবর্তিত রূপ দেখাচ্ছেন।

গঙ্গার ঘাটে নিমাই নিজে স্নান করতে গিয়ে প্রতিদিন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদের প্রণাম করেন, কারো ভেজা কাপড় নিংড়ে দেন, কারো বস্ত্র উত্তরীয় হাতে তুলে দেন, কারো হাতে পূজার উপকরণ সাজিয়ে দেন। এক নতুন মানুষকে গঙ্গার ঘাটে প্রতিদিন হাজার মানুষ দেখছেন। বৈষ্ণবরা তাঁকে আশীর্বাদ করছেন 'কৃষ্ণশক্তি দিয়ে তুমি পাষণ্ডী সংহার কর।' *(পৃ: ১৫৪৯, ঐ)* বৈষ্ণব প্রধানদের আশীর্বাদের উত্তরে নিমাই বলছেন 'আপনাদের কথা সত্য হবে। পাষণ্ডীরা কী ছার করবে, আপনারা সুখে কৃষ্ণনাম করুন, আপনারাই জগৎ উদ্ধার করবেন, আপনারাই কৃষ্ণের অবতার সৃষ্টি করবেন। আমি আপনাদের সেবক।' *(পৃ: ১৫৪৯, ঐ)* নিমাই বিনীত অথচ নিজেকে পাষণ্ডী সংহারের জন্য কৃষ্ণের অবতার বলে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে এবং সকলকে প্রকারান্তরে বলে দিচ্ছে 'আমিই সে আমিই সে। পাষণ্ডী সংহার করব আমি।' *(পৃ: ১৫৪৯, ঐ)*

কালকূট যে নিমাই চরিতকারদেরকে অনুসরণ করে নবদ্বীপে এসেছেন তার ব্যাখ্যা থেকে বলেছেন — সম্ভবত মে মাসের কোন এক উজ্জ্বল প্রভাতে নিমাই মনে মনে বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। তবুও একবার গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে অদ্বৈত আচার্যর সঙ্গে দেখা করলেন। অদ্বৈত আচার্য গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ দিয়ে নমস্কার করে নিমাইকে আরাধনা করলেন, 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।' *(পৃ: ১৫৪৯, ঐ)* নিমাই আরও বিনীত হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন 'আমাকে আপনার হৃদয়ের মনোমত রূপেই জানবেন। আপনাকে দর্শন করে ধন্য হলাম, আপনার কৃপায় আমি কৃষ্ণনাম করি।' *(পৃ: ১৫৪৯, ঐ)* 'বিশ্বম্ভর, তুমি আমার সকলের থেকে বড়। বৈষ্ণবদের ইচ্ছে, তোমার সঙ্গে কৃষ্ণকীর্তন করে।' *(পৃ: ১৫৪৯, ঐ)* আচার্যর এই নির্দেশ নিমাই স্বীকার করে প্রথমে নিজের বাড়িতেই সারারাত্রি ধরে কয়েকদিন কীর্তন করলেন। এই সংকীর্তনের নেতৃত্ব দিলেন নিমাই স্বয়ং। লেখক কালকূট বলেছেন এ ঘটনা ঐতিহাসিক। এরপরে শ্রীবাসের বাড়িতে কীর্তন চলতে লাগল।

সারারাত্রি কীর্তনের ফল হল মারাত্মক। প্রচার হয়ে গেল, দু'নৌকা ভরতি সৈন্য শ্রীবাসকে ধরতে আসছে। নিমাই বুঝতে পারলেন, বৈষ্ণবরা ভয় পেয়ে গেছে। নিমাই নির্ভীক ভাবে গঙ্গা তীরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এবং তার অবতারত্ব একে একে প্রকাশ করে সকল ভয় দূর করতে লাগলেন। একদিন গঙ্গা তীরে গরুদের জলপান, দৌড়াদৌড়ি দেখে নিমাইয়ের ভাবাবেশ হল। যমুনা-পুলিন-গঙ্গা-পুলিনে একাকার হয়ে গেল এবং 'আমিই সে আমিই সে' বলে হুঙ্কার দিতে লাগলেন। অদ্বৈত আচার্য তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য শান্তিপুরে বসে আছেন এসব কথা বলতে বলতে শ্রীবাসের বাড়িতে গিয়ে দরজায় লাথি মেরে শ্রীবাসকে বললেন "কী করিস শ্রীবাস তুই, কার পূজা করিস? যার পূজা করিস, তাকে দেখ। দরজা খোল।" *(পৃ: ১৫৫০, ঐ)* শ্রীবাস দরজা খুলে বীরাসনে বসে থাকতে দেখলেন নিমাইকে — "একেবারে চতুর্ভুজ — শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।"

(পৃ: ১৫৫০, ঐ) নিমাইয়ের মধ্য দিয়ে শ্রীবাসের কৃষ্ণদর্শন হল। লেখক বলেছেন যে এ হল মানসিক অবস্থার 'একজনের অবতারত্বে প্রকাশ, আর একজনের নতুন প্রাণ-সঞ্চারের আশ্বাসের দর্শন!'' *(পৃ: ১৫৫০, ঐ)* নিমাই শ্রীবাসের ভয় দূর করলেন, জানালেন যদি রাজার নৌকা এনে তিনিই নৌকায় উঠে রাজার গোচরে যাবেন। ভাবাবেশ কাটতেই নিমাই লজ্জিত হলেন এবং ঘটনাটা গোপন রাখতে বললেন। শ্রীবাসের বিধবা ভ্রাতৃবধূ নারায়ণীকে কৃষ্ণনাম নিতে বলে নিমাই চলে গেলেন। এই নারায়ণীই চৈতন্যভাগবত স্রষ্টা বৃন্দাবন দাসের মা।

একদিন বরাহভাবের শ্লোক শুনে মুরারিকে তাঁর বরাহমূর্তি দেখালেন ও বরাহমূর্তিকে স্তব করতে বললেন ও তাঁকে নির্ভয় হতে বললেন। এইভাবে নৃসিংহ মূর্তি, বরাহ মূর্তি দেখিয়ে নিমাই রাজভয়, পাষণ্ডী ভয় দূর করতে লাগলেন। বৈষ্ণবরা ভয়শূন্য হয়ে হাটে-ঘাটে-মাঠে কীর্তন করতে শুরু করল।

এরপর ১৫০৯ খ্রী: জুন মাসের শেষ ও জুলাই-এর প্রথমে বৃন্দাবন থেকে নিত্যানন্দ এসে উঠলেন নন্দন আচার্যের বাড়ি। নিমাই পাষণ্ডীদের অত্যাচার ও যবনরাজ ভীতি দূর করার জন্য একজন সাহসী, শক্তিশালী সহচর খুঁজছিলেন। নিমাই-নিত্যানন্দ দু'জনে দু'জনকে দেখে মুগ্ধ। নিত্যানন্দ পূর্ণিমাতে 'ব্যাস-পূজা' শ্রীবাসের বাড়িতে করবেন জেনে নিমাই-ই নিত্যানন্দকে শ্রীবাসের বাড়িতে নিয়ে এলেন। নিমাই সেখানে ভাবাবেশে বলল 'মদ আন মদ আন। বারুনী দাও বারুনী দাও।' বারুণীর বদলে দিলেন গঙ্গাজল, নিমাই তাই মদের মত পান করে 'হল আর মূষল' চাইলেন। নিত্যানন্দ 'হল আর মূষল' দিলেন। এই ঘটনায় নিত্যানন্দ-এরও ভাবান্তর হল। তিনি ''তাঁর এতকালের দণ্ড আর কমন্ডলু ভেঙে ফেললেন।'' *(পৃ: ১৫৫১, ঐ)*

নিত্যানন্দ ব্যাস পূজার সময় বিধিমত মন্ত্র পাঠ করলেন না, তিনি মালা পরালেন নিমাইকে। নিমাই ভাবাবেশে 'নিত্যানন্দকে ষড়ভূজ মূর্তি দেখাল। হাতে তার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম এবং হল ও মূষল। সেই মূর্তি দেখে নিত্যানন্দ মূর্ছা গেলেন।' *(পৃ: ১৫৫১, ঐ)* লেখককের বক্তব্য এ ঘটনা শুধু নিত্যানন্দই দেখলেন।

নিমাই তাঁর পার্ষদ অবতার রূপে নিত্যানন্দকে স্বীকার করে নিলেন। নিজে কৃষ্ণ অবতার, নিত্যানন্দ বলরাম অবতার। তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের শক্তি আছে এটা নিমাই বুঝতে পেরেছিলেন। এছাড়া তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ও বন্ধু। তিনি অবধূত। একই সঙ্গে ভোগ ও ত্যাগের অনুসরণ করতে পারেন কিন্তু কোনটিতেই আসক্ত হন না। তাঁর ষড়ভূজমূর্তি দেখিয়ে তাঁর আন্দোলনের প্রধান সহচর করলেন। লেখক বলেছেন 'পুরাণে বলরাম সর্বদাই আরক্ত ঘূর্ণিত চোখ।' নিত্যানন্দের বর্ণনায়ও একজন চরিত্রকার লিখেছেন, ''ঘূর্ণিত লোচন বারুণী মদে মত্ত।'' *(পৃ: ১৫৫১, ঐ)*

লেখক বলেছেন নিমাই নিজেকে অবতার কৃষ্ণরূপে বিশ্বাস করানোর জন্য এমন আচরণ

করেছিলেন। এবং অদ্বৈতর কথার উত্তর দিয়েছিলেন এইভাবে 'কার সত্য তোমার অঙ্গীকার।' *(পৃ: ১৫৫২, ঐ)* শুধু তাই নয়, মা শচীদেবীর কাছে নিয়ে গিয়ে নিত্যানন্দকে নিজের ছেলের মত পালন করার কথা বললেন। এরপর রামাইপণ্ডিতকে দিয়ে অদ্বৈত আচার্যকে নবদ্বীপে নিয়ে এলেন এই কথা বলে 'তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন।' অদ্বৈতাচার্য সস্ত্রীক নবদ্বীপে এসে নিমাইকে দূর থেকে দেখেই নমস্কার করতে লাগলেন। গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের জ্যোতির্ময় জ্যোতি ছাড়া তিনি আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। স্তব করতে লাগলেন 'নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় জগ্ধিতায়' বলে।

নিমাইয়ের আবেশ হল। তিনি অবতার রূপে অদ্বৈত আচার্যর মাথায় পা তুলে দিলেন ও তারপরে আচার্যকে নৃত্য করতে বললেন। অবশেষে নৃত্যরত অদ্বৈত আচার্যকে বর দিতে চাইলে আচার্য বর চাইলেন 'এবার তুমি স্ত্রী শূদ্র আদি মূর্খদের ভক্তিরসে প্লাবিত কর। আচণ্ডাল নাচুক তোমার গান গেয়ে।' *(পৃ: ১৫৫২, ঐ)*

আচণ্ডালকে উদ্ধারের আন্দোলনে দলমত নির্বিশেষে এক মহানাম 'কৃষ্ণনামে' উদ্বুদ্ধ হতে হবে অর্থাৎ বৈষ্ণব সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি তাম্বুলি-মালাকার ইত্যাদি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন রুচির লোককে একত্রিত করতে লাগলেন। লেখক বলেছেন অদ্ভুত তার কৌর্শ ও আকর্ষণী শক্তি ছিল। এটাই ছিল তার নেতৃত্বের বিশেষত্ব। আন্দোলনের নতুন সূত্রপাত হল।

কালকূট তাঁর ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় গিয়ে দেখাতে চাইছেন— একটি সাধারণ অতি দুষ্টু বালক কিভাবে জগৎ বিখ্যাত অধ্যাপকে পরিণত হয়েছিলেন, তারপর প্রাণাধিকা পত্নী লক্ষ্মীর মৃত্যুতে এক তরুণ প্রেমিক-স্বামীর মনোজগতে কি বিস্ফোরণ ঘটেছিল। লক্ষ্মী-প্রেমে আপ্লুত নিমাই ধীরে ধীরে নিজেকে প্লাবিত করেছেন কৃষ্ণপ্রেমে। সেই কৃষ্ণপ্রেমই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে মানব সেবায়, এক কৃষ্ণ নামে আচণ্ডাল তথা নারী, শূদ্র, যবন উদ্ধারের কাজে। আর এইসব ঘটনাবলীকে আপাতদৃষ্টিতে বিচার করলে প্রথমে খুবই সাধারণ বলে মনে হলেও সাধারণ নয়।

'আচণ্ডাল উদ্ধার' করতে হলে সকলের সামনে যোগ্য নেতৃত্বের পরিচয় দিতে হয়, জনমানসে নিজের একটি প্রচ্ছন্ন ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে হয়, নিজের কাজকর্মেই কথাবার্তা, আচার ব্যবহার সব কিছু সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলতে হয়। শুধু তাই নয় প্রচলিত নিয়ম-নীতি, ধর্মীয় নীতি, অনুশাসন-এর বিরুদ্ধে যেতে গেলে দুঃসাহসের প্রয়োজন হয়। দেখা যাচ্ছে যে নিমাই গঙ্গার ঘাটে প্রতিদিন হাজার লোকের সামনে নিজের পরিবর্তিত স্বভাব প্রদর্শন করেছেন। পরিবর্তিত বিনয়ী স্বভাবে নিমাই ধীরে ধীরে সকলের প্রিয় হয়েছেন, বিশেষত, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদের। তাঁদের আশীর্বাদ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন 'আমিই সে আমিই সে' বলে।

নিমাইয়ের আগে বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্বে ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। তিনি নিমাইকে পরীক্ষা করছিলেন, সত্য নিমাই অবতার কিনা। সন্দেহের নিরসন ঘটিয়ে নেতৃত্বের দায়িত্ব থেকে নিজেকে

মুক্ত করে নিমাইয়ের কাছে সেই নেতৃত্বের দায়িত্ব সমর্পণ করলেন।

কালকূট দেখেছেন সব কিছু নিমাই কেমন সুপরিকল্পিতভাবে প্রতি কাজে ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছেন। এবার সংগঠনের রূপরেখায় তিনি তার আন্দোলনকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন দেখা যাক্।

যবনভীতি আর পাষণ্ডী অনাচার দুটোই চলছে আন্দোলনের পাশাপাশি। কীর্তনের মাত্রা আরও বেড়ে চলল শ্রীবাসের বাড়িতে অথবা চন্দ্রশেখরের বাড়িতে। দরজা বন্ধ করে কীর্তন। বৈষ্ণব পুরুষ মহিলা সবাই নাচেন। পাষণ্ডীরা কৌতূহলী ও ক্রুদ্ধ হয়ে রাজদরবারে খবরটা দিতে উৎসাহী হল বৈষ্ণবদের শাস্তি দেবার জন্য। এদিকে শ্রীবাসের বাড়িতে নিমাইয়ের অভিষেক হল। কলাগাছের খোলা বেচা শ্রীধরকে নিমাই বাংলা ভাষাতেই স্তব করতে বললেন। লেখক বলেছেন বাংলা ভাষার এই মূল্য আগে কেউ বোঝেনি কিন্তু নিমাই বুঝেছিলেন, 'সংস্কৃত না বাংলা চাই।'

১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে নিমাইয়ের অভিষেক হল বাংলা ভাষায় শ্রীধরের স্তব দিয়ে। নিমাইয়ের উচ্ছিষ্ট নারায়ণীকে দেওয়া হয়েছিল। নারায়ণী সেই উচ্ছিষ্ট ভোজন করেছিলেন। কালকূট বলেছেন বৃন্দাবন দাস তার মায়ের সম্পর্কে লিখেছেন। আর কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

'নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন
তাঁর গর্ভে জন্মিল শ্রীদাস বৃন্দাবন।।' *(পৃ: ১৫৫২, ঐ)*

নিমাই অভিষেকের দিন শ্রীবাস, অদ্বৈত আচার্যকে বর দিলেন; নিত্যানন্দ বরদানের উর্ধ্বে। নিত্যানন্দর কৌপীন ছিঁড়ে ছিঁড়ে সকলকে দিলেন ও তাঁর পাদোদক সকলকে পান করালেন। এক কথায় নিত্যানন্দকে মাথায় করে রাখলেন, তাঁর স্থান নির্দিষ্ট করে রাখলেন। আর যবন-হরিদাসকে বর দিলেন 'আমার শরীর থেকে তুমি বড়, তুমি আমি এক জাতি। তোমাকে যখন বাইশ বাজারে চাবুক মারা হয়েছিল, তুমি আমাকে স্মরণ করেছিলে। আমি তখনও নিজেকে প্রকাশ করেছিলাম।' *(পৃ: ১৫৫৩, ঐ)*

হরিদাস এই দিন, এই মুহূর্তেরই অপেক্ষা করছিলেন। নিমাই এরপর নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে ঘরে ঘরে 'কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ শিক্ষা কর' এই কথা বলে ভিক্ষা করতে বললেন। নবদ্বীপের পথে পথে, ঘরে ঘরে মুসলমান বৈষ্ণব ও একজন হিন্দু কীর্তন করতে পাঠানো অতি দুঃসাহসের কাজ। নিমাই সেই দুঃসাহসই দেখালেন। নবদ্বীপের হিন্দু সমাজে ভূমিকম্পের মত ঘটনা। নিমাইয়ের জীবনদর্শনের পথে চলতে গিয়ে দেখেছেন জগাই-মাধাই রাজ অনুকূলে নবদ্বীপে অত্যাচার-অনাচার করে বেড়ায়। মদ খেয়ে মাতলামি করে। নিত্যানন্দও হরিদাসকে নিয়ে তাঁদের কৃষ্ণ-কথা শোনাতে গিয়ে রক্তচক্ষু দেখলেন। তাঁরা ফিরে এসে নিমাইকে সব জানালে নিমাই তাদের কাটতে চাইল।

কিন্তু নিত্যানন্দ 'গোবিন্দ নাম' ওদের দিয়ে বলাবেনই এইরকম সংকল্প নিয়ে একদিন রাতে নগর সংকীর্তন করতে বেরিয়েছিলেন। পথে জগাই-মাধাইয়ের সঙ্গে দেখা। নিত্যানন্দ নিজেকে অবধূত বলে পরিচয় দিতেই মাধাই মদের মাটির মটকা নিত্যানন্দ মাথায় ছুঁড়ে মারলেন। নিত্যানন্দের মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে এ খবর পেয়েই নিমাই সদলবলে ছুটে আসেন। 'চক্র-চক্র-চক্র— দাও আমাকে।' *(পৃ: ১৫৫৩, ঐ)* তাঁর হাতে চক্র এসে গেলে সেই চক্র দিয়ে তিনি তাদের কাটতে যান। কিন্তু নিত্যানন্দ তাদের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন এই কথা বলে— 'মাধাই মেরেছে, কিন্তু জগাই রেখেছে।' নিমাই ক্রোধ সংবরণ করে জগাই-এর বুকের ওপর পা তুলে 'শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম' নিয়ে নিজের অবতারত্ব দেখালেন। আন্দোলন-সংগঠনের মধ্য দিয়ে, নিত্যানন্দর মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব ধর্মের সহিংস নীতিবাদ থেকে অহিংস নীতিবাদে রূপান্তরিত হল।

আন্দোলন আরও জোরদার করার জন্য নাটকের আশ্রয় নিলেন নিমাই। নিজে রুক্মিণী বেশে নাচলেন। নাচতে গিয়ে আদ্যাশক্তির বেশও দেখালেন। তাঁর ভাবাবেশ হল। চণ্ডীরও অবতার নিমাই, এটাও লোকে দেখল। আন্দোলনের জন্য এটাও এক ধরনের প্রচার সেটা লেখক কালকূটরে মনভাবনায় এড়িয়ে যায়নি।

অদ্বৈত আচার্য আবার নিমাইকে পরীক্ষা করার জন্য শান্তিপুরে চলে গিয়ে ভক্তিপথ ছেড়ে জ্ঞান পথ শাস্ত্রচর্চা শুরু করলেন। নিমাই ক্ষিপ্ত; নিত্যানন্দকে নিয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যর কাছে কৈফিয়ত চাইলেন 'বল জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়।' *(পৃ: ১৫৫৪, ঐ)* অদ্বৈতাচার্য 'জ্ঞান বড়' বলতেই নিমাই তাঁকে কিল মারতে শুরু করলেন।

অদ্বৈত দুর্বাসার মত শাপও দিলেন না, ভৃগুর মত বুকে লাথিও মারলেন না। বললেন 'আমি তোমার শুদ্ধ দাস' *(পৃ: ১৫৫৪, ঐ)* আচার্যর পরীক্ষা সফল। ভক্তি পথের শাস্ত্র ব্যাখ্যায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্বয়ং অদ্বৈত আচার্য, তিনিই প্রকৃত প্রধান নেতা।' লেখক কালকূট অদ্বৈত আচার্যর বক্তব্যকে বোঝাতে 'দুর্বাসা' ও ভৃগুকে টেনে এনেছেন। আচার্য অন্যমতের।

নিমাই অদ্বৈতাচার্যকে নিয়ে নবদ্বীপে ফিরে এসেই সকল বৈষ্ণবকে মন্ত্র দিলেন, 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।' *(পৃ: ১৫৫৪, ঐ)* কীর্তনের সাফল্যে বৈষ্ণবদের আনন্দ বেড়ে যাচ্ছিল। তার মধ্যে কৃষ্ণ-অবতার নিমাইকে পেয়ে তার ভয়হীন। নিমাইয়ের নেতৃত্বে এসব হচ্ছে এই খবর পেয়ে একদিন সন্ধ্যায় চাঁদ কাজী শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মৃদঙ্গ, শঙ্খ, কীর্তনের আওয়াজ শুনে তাঁর লোকজন দিয়ে বৈষ্ণবদের প্রতি খুবই অত্যাচার-অনাচার করাল। নিমাই পণ্ডিতের নাম করে ভয় দেখায় 'কোথায় সেই নিমাই আচার্য? দেখি সে কী করে।' *(পৃ: ১৫৫৪, ঐ)*

নিমাই ঘটনার গুরুত্ব আগেই বুঝতে পেরেছিলেন; তবুও অপেক্ষা করছিলেন বৈষ্ণবদের

আর্তি শোনার জন্য। নিমাই সকল নবদ্বীপবাসীর সামনে গিয়ে সংকটের মোকাবিলা করতে চাইলেন। তিনি সকলের কাছে মিলিত অভিযানের জন্য ডাক দিলেন, ''আজ বিকেলে তোমরা সকলে আমার বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হবে। প্রত্যেকে হাতে একটি মশাল নিয়ে আসবে।'' *(পৃ: ১৫৫৫, ঐ)*

কালকূট দেখেছেন— কী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জনগণ বন্ধ ঘরের কীর্তনকে কীভাবে নগরের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। অভিযানের শুরুতে একটি সুপরিকল্পনাও করে নিয়েছিলেন এবং হাজার মশাল সহ মহামিছিল নাম-কীর্তন করতে করতে চাঁদকাজীর বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। সকলের আগে অদ্বৈত আচার্য, মাঝখানে হরিদাস, তারপরে বিভিন্ন গোষ্ঠী সম্প্রদায় শেষে নিমাই নিত্যানন্দ গদাধর। সামনে নিমাই সবার আগে গিয়ে হুঙ্কার 'কোথায় সেই চাঁদ কাজী? ঝটিতি ধরে নিয়ে এস, ওর মাথা কাটব আমি।' *(পৃ: ১৫৫৫, ঐ)*

চাঁদকাজী পালিয়ে গিয়েছিল, ক্রোধে নিমাই অন্দরমহলও তছনছ করে আগুনে জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু নিত্যানন্দ করুণা প্রকাশ করে এইভাবে, নিমাই-এর ক্রুদ্ধমূর্তিকে শান্ত করলেন 'কাজীর যা শাস্তি দেবার দিয়েছ, এরপরে যদি সে অত্যাচার করে, তবে সকলের প্রাণ নিও। আজ ছেড়ে দাও।' এটি ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের কথা।

কালকূটের নজরে এসেছে এটিও, নিত্যানন্দই বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে করুণা, ক্ষমা প্রচলন করেছেন। জগাই-মাধাই উদ্ধারের আগে পর্যন্ত বৈষ্ণবদের নীতি ছিল সহিংস, — 'পাষণ্ডী সংহার'।

নিত্যানন্দ অবধূত, বারো বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। বিশ বছর বৌদ্ধদের সংস্পর্শে কিছুদিন ছিলেন। কালকূট বলছেন 'করুণা' শব্দটি বৌদ্ধদের একেবারে নিজস্ব। যেহেতু নিত্যানন্দ বৌদ্ধদের সংস্পর্শে ছিলেন, তাই তাঁর মাধ্যমেই 'করুণা' শব্দটি বৈষ্ণব ধর্মে এসেছে। লেখক কালকূট নিমাইয়ের সঙ্গে তিনি নিত্যানন্দকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। নিমাই-এর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ মূর্তিকে তিনিই শান্ত করেছেন করুণার কথা বলে।

নবদ্বীপের মাটিতে দাঁড়িয়ে সকলকে 'কৃষ্ণ মন্ত্র' জপ করার জন্য আহ্বান করলেন। সেই নবদ্বীপে দাঁড়িয়ে এই দুঃসাহস দেখানো সহজ কাজ নয়। প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ! এই কথাই লেখকের দৃষ্টিতে উঠে এসেছে।

সেকালের হিন্দুসমাজকে কালকূট সূক্ষ্মভাবে দেখেছেন। নিমাইয়ের উদাত্ত আহ্বানে পাষণ্ডীরা যে রেগে গিয়ে রাজা বা কাজীর কাছে অভিযোগ করবেই এটাও নিমাই বুঝতে পেরেছিলেন। নিমাই চাঁদকাজীর হুঙ্কারের অপেক্ষায় ছিলেন এবং তৈরী হয়েছিলেন এই মহাক্ষণটিরই জন্য। তারপর সেই মহাসংকীর্তনের মহা বিস্ফোরণ কালকূট তাঁর লেখনীতে চিত্রায়িত করেছেন। তাঁর সেই মশালসহ মহাসংকীর্তন-এর মিছিল একালের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখার

চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন এই মশাল মিছিলের প্রবর্তক নিমাই আচার্য। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়াতেই এই মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কালকূট দেখেছেন কত সুপরিকল্পিতভাবে নিমাই তাঁর মহা উত্তরণের পথে এগিয়ে গেছেন।

কিন্তু নিমাই ক্রুদ্ধ হলে অনেকসময় নিজেকে সংযত রাখতে পারেন না। নিমাইয়ের ভাবাবেশ এলে তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। এরকম ভাবাবেশ অবস্থায় তাঁর ছেলেবেলায় বন্ধুর সঙ্গে গোপীকে ডাকা নিয়ে মতান্তর হয়। রাগে তিনি তাঁকে মারতে যান। ১৫১০ সালের ঘটনা এটি। নিমাইয়ের বন্ধুটি তাঁর অন্য বন্ধুদেরও একত্রিত করে। সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নিমাইকে অবতার বলে মানবে না, মারতে আসলে এরাও মারবে।

নিমাই পতিতের উদ্ধারের সংকল্প নিয়েছেন, অথচ সকলের মন জয় করতে পারেননি। নিত্যানন্দকে বলেই বসলেন 'আমি জগৎ-উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাস চাই।' কালকূট নিমাইয়ের মনের গভীরে ডুব দিয়েছেন, দেখছেন, হৃদয় তোলপাড় হচ্ছে বন্ধুদের আচরণে। সন্ন্যাসী হলে তো আর কেউ মারতে আসবে না, সকলেই সন্ন্যাসীকে নমস্কার করে। নিত্যানন্দ সন্ন্যাসের কথা শুনে সকলের পরামর্শ নিতে বললেন। কালকূটের দৃষ্টিতে মনে হয়েছে এটি 'গণচেতনা'। নিমাই প্রথমে মুকুন্দ, তারপরে গদাধরের কাছে গেলেন। কিন্তু কেউই রাজি হলেন না। যাঁর কাছে বললেন, তিনিই প্রতিবাদ করলেন। নিমাইয়ের সেই এক কথা ''যদি জগৎ উদ্ধার চাও, আমার সন্ন্যাসে বাধা দিও না। লোকশিক্ষা নিমিত্তই আমার সন্ন্যাস।'' *(পৃ: ১৫৫৬, ঐ)*

কেশব ভারতী এই সময়েই নবদ্বীপে এসে পড়েছেন। তাঁকে দেখেই মনের অনুতাপে সন্ন্যাস নেওয়ার ইচ্ছা জেগেছিল। পড়ুয়া বন্ধুরা বিরূপ কেন? সন্ন্যাসীর মধ্যেই লোকে মহত্ব দেখতে পায়। এ বেদ বিরুদ্ধ নয় যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন। বললেন 'লোকশিক্ষা নিমিত্তই আমার সন্ন্যাস।' *(পৃ: ১৫৫৬, ঐ)* অতএব সন্ন্যাস নেবেন এই স্থির প্রতিজ্ঞায় রইলেন। এরপর তাঁর মা, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর আর মুকুন্দকে তার সন্ন্যাস নেওয়ার কথা নিত্যানন্দকে বলতে বললেন।

শচীমাতা এ সংবাদ শুনেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন— 'বিশ্বরূপের ঘা এখনও শুকায়নি, আবার তুই? তুই কি সব ভুলে গেলি? বলেছিলি না মা, দাদা সন্ন্যাস নিক, আমি তোমাদের সেবা করব, গৃহস্থ ধর্ম করব, সংসার বৃদ্ধি করব। তার ওপরে আমার এই বিষ্ণুপ্রিয়া অনাথিনী হবে। বাবা রে, এভাবে ছেড়ে যাসনে। তোকে দেখেই যে সব ভুলে আছি।' *(পৃ: ১৫৫৬, ঐ)* আর বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়ের পায়ে একটি নতুন গামছা দিয়ে পা ধরে বলল, 'তুমি যেখানে যাও, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি কী — কী নিয়ে থাকব বল?' *(পৃ: ১৫৫৫, ঐ)* কিন্তু সবই নিরর্থক। সংকীর্তনের দায়িত্ব বিষ্ণুপ্রিয়ার উপরে চাপিয়ে দিয়ে আবার সেই এক কথাই বললেন, 'সংসার অনিত্য প্রিয়া। কেউ কারু নয় গো। আমাকে বিদায় দাও তুমি।' *(পৃ: ১৫৫৬, ঐ)*

কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্না বেড়েই যাওয়াতে নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে চতুর্ভুজ মূর্তি দেখালেন। তাতেও বিষ্ণুপ্রিয়া দমল না। তখন নিমাই রাতে অনন্ত বিনোদ ক্রীড়ায় বিষ্ণুপ্রিয়াকে বুকে নিয়ে রস অবসাদে দুজনেই নিদ্রা গেলেন। রাত্রিশেষে বাইরে বেরিয়ে এসে মাকে প্রণাম করে গৃহত্যাগ করলেন। আর মা শচীদেবী নির্বাক হয়ে বসে রইলেন।

আর বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুম ভেঙে উঠে মর্মান্তিক সংবাদটি শুনেই আর্তনাদ করে কাঁদতে লাগলেন। 'আমি শুনতে চাই তোমার ভাগবত পাঠ। আর — আর এ কি শেল দিয়ে গেলে নারীর প্রাণে, একটি সন্তানও আমার শূন্য বুকে নেই। ...' *(পৃ: ১৫৫৬, ঐ)*

নিমাই কেশব ভারতীর সঙ্গে গঙ্গার ওপারে কাটোয়ায় গিয়ে ২৯শে মাঘ দিনের শেষে শিখা অন্তর্ধান করালেন। মন্ত্র গ্রহণের পরে দণ্ড কমণ্ডলু হাতে নিলেন। নিমাই-এর নতুন নামকরণ হল 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। নবীন সন্ন্যাসী বেদান্তের সার সম্বন্ধে বললেন 'এ সকল যা কিছু দেখছ, সবই মিথ্যা। প্রকৃতির ছায়া মাত্র, বেদে তাই বলে।'

তিনদিন রাঢ় দেশে কাটিয়ে ফুলিয়ায় হরিদাসের কাছে গেলেন, সেখান থেকে শান্তিপুরে। শচীমা দ্বাদশ দিবস উপবাসে থেকে শান্তিপুরে নিমাইকে দেখতে গেলেন। নিমাই মাকে বললেন, 'তোমার শরীর আমার শরীর এক' এবং 'সর্বদাই তোমার কাছে আছি।' আর ভক্তদের বললেন সহসা সন্ন্যাস নিলেও তাদের প্রতি উদাসীন থাকবেন না, জীবিতকাল পর্যন্ত তাদের ছেড়ে যাবেন না। অদ্বৈত আচার্যের পরামর্শে শচীদেবী নিমাইকে নীলাচলে গিয়ে থাকতে বললেন। চৈতন্য মায়ের কথাই মেনে নিলেন এবং ১১ই ফাল্গুন শ্রীচৈতন্য নীলাচলের পথে যাত্রা করলেন।

'প্রেম নিত্য, সংসার অনিত্য' এই অধ্যায়টিতে কালকূট নিমাইয়ের সন্ন্যাসের সিদ্ধান্তটি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিমাই তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের পরিকল্পনাটি করেছেন। নিত্যানন্দ তাঁকে বাস্তবোচিত সময় উপযোগী পরামর্শ দিয়েছেন। পরিচিত জন কেউ রাজি হবেন না এ'কথা নিমাইয়ের মতো তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারবেন না, এমনটি হবার কথা নয়। কিন্তু নিমাই নিজের বিশ্বাসেই চলেন, এ'কথা আমরা কালকূটের চোখ দিয়ে দেখেছি।

অদ্বৈত গোঁসাই গৃহস্থ, তিনি কখনও সম্মতি দেবেন না জানতেন বলেই তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি জানান নি। কালকূট নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণটিকে এইভাবে দেখেছেন যে নিমাই পড়ুয়াদের মারতে গিয়েছিল বলে মনে অনুশোচনা হয়েছিল। ''মনের অনুতাপের জন্যও কেশব ভারতীকে দেখে সন্ন্যাসের ইচ্ছা হয়েছিল।'' *(পৃ: ১৫৫৬, ঐ)*

যদিও নিমাই বলেছেন 'লোকশিক্ষা' চাই; তথাপি কালকূটের মনে হয়েছে এখানেও 'নেতৃত্বই আসল কথা' বন্ধুরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করছে কেন? সন্ন্যাসী হলে তো মানবে, এই বোধ থেকেই

সন্ন্যাসের সিদ্ধান্ত।

মায়ের চোখের জল, প্রিয়ার চোখের জল, অনুরোধ — কিছুই তাঁকে টলাতে পারে নি। বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রেমরসে ভুলিয়ে ঘুমন্ত বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার যন্ত্রণা কালকূট অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার মর্মান্তিক আর্তনাদ বুদ্ধদেব-পত্নী গোপার থেকেও বেশি। বুদ্ধদেব যখন গৃহত্যাগ করেছিলেন তখন তাঁর স্ত্রী গোপার বুকে সন্তান রাহুল ছিল, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার তো সন্তানও নেই!

কালকূট নিমাইয়ের চৈতন্যরূপে ক্রমবিকাশের রূপটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। একটি আঘাত একটি প্রাণচঞ্চল নবীন প্রেমিক স্বামীকে মানব প্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে প্রভাবিত করেছিল। নিমাই লক্ষ্মীর প্রেমকে ভুলতে পারেননি। লক্ষ্মীর সঙ্গে নিমাই মানবিক প্রেমই করেছিলেন। লক্ষ্মী ছিল নিমাইয়ের প্রেমিকা, পত্নী। তাই তিনি পূর্ববঙ্গে যাওয়ার আগে তাঁর উপবীতটি লক্ষ্মীকে দিয়ে বলেছিলেন তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে। লক্ষ্মী সর্পাঘাতে গঙ্গাপ্রাপ্ত হয়েছে — এ'কথা নিমাই কল্পনাতেও মনে আনেননি। মানব নিমাইয়ের লক্ষ্মী বিরহের যন্ত্রণাকে কালকূট বেদনার তুলিতে এঁকেছেন। লক্ষ্মী-বিরহই নিমাইকে ধীরে ধীরে চৈতন্য হওয়ার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। প্রাকৃতে লক্ষ্মীপ্রেমই অপ্রাকৃতে কৃষ্ণ প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু তিনি ভোলেন নি সেই কথা— 'মাগো, সংসার অনিত্য'। শেষ পর্যন্ত এই অনিত্যতাই তাঁকে গৃহত্যাগে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

কালকূট চৈতন্যের জীবন পরিক্রমায় একটি কথাই বারে বারে বলেছেন — লক্ষ্মী প্রেমই তাঁকে এই জ্ঞান দিয়েছে — 'সংসার যে মিথ্যা'। নিমাইয়ের জীবন দর্শন করার জন্য কালকূট মনোভ্রমণে গিয়ে সেকালের নবদ্বীপ ও তার জনমানসকে সাহিত্যের উপযোগী করে তুলে ধরেছেন। তাঁর কাহিনীও শুধু ভ্রমণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। স্থান, কাল ও সময়ের সঙ্গে উঠে এসেছে একটি জীবন, যাঁকে ঘিরে উঠেছে সেকালের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও চরিত্র, যা কাহিনীকে উপন্যাসের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। উপন্যাসে পূর্ণতা দিয়েছে। কালকূট তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানব নিমাইয়ের 'জ্যোতির্ময় চৈতন্য' হওয়ার পথকে আলোকিত করেছেন।

কালকূট মনভ্রমণে নিমাই-এর জীবন পরিক্রমা দর্শনের জন্য কাটোয়ায় উপস্থিত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণের সেই মর্মন্তুদ দৃশ্য নিজেও অবলোকন করলেন এবং পাঠককুলকে সেই দৃশ্যের সঙ্গে , ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিত করালেন।

কালকূট এবার শ্রীচৈতন্যের নীলাচলের সঙ্গী। শ্রীচৈতন্যের জীবনপথকে মনভ্রমণে অনুসরণ করে কালকূট ''প্রভু, কার হাতে তোমার রক্ত'' এই অধ্যায়টি লিখেছেন। এটি ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৮৮ বঙ্গাব্দে) সালের শারদীয় 'প্রসাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'ভ্রমর' ছদ্মনামে। পরে 'প্রেম নিত্য', 'প্রেম নিত্য, অনিত্য সংসার' এবং 'প্রভু, কার হাতে

তোমার রক্ত', এই তিনটি রচনা একত্রে 'জ্যোর্তিময় শ্রীচৈতন্য' নামে ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে (১৩৯৩ বঙ্গাব্দে মাঘ মাসে) মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ পত্রটি লেখা হয়েছিল স্বর্গীয় মাতৃদেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে। এই অধ্যায়ে কালকূট শ্রীচৈতন্যের নীলাচল যাত্রা থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনভ্রমণে প্রত্যক্ষ করা ঘটনাবলীকে লেখনীর মাধ্যমে পাঠককুলের সামনে তুলে ধরেছেন।

পাঠককুলের যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয়, পড়তে গিয়ে যাতে তথ্য খোঁজার জন্য হাতড়ে ফিরতে না হয় সেইজন্য শ্রীচৈতন্যকে ধরতে গিয়ে নিমাইয়ের ছেলেবেলা ও সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে যাত্রা পর্যন্ত আর একবার পাঠককে সেই স্থানগুলিকে ঘুরিয়ে এনেছেন। সেই সঙ্গে সেই সময়কার সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশ ও জনজীবনযাত্রা আপন সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন।

শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচলে যাত্রা করেছিলেন সেই সময় উড়িষ্যা ও বাংলার মধ্যে যুদ্ধের সংকেত। তখন বাংলা তথা গৌড়ের রাজা ছিলেন হোসেন শাহ আর উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্র। কালকূট ইতিহাসের পথে হাঁটতে গিয়ে দেখেছেন — হোসেন শাহের রাজত্বের আগে হাবশীরা অনেককাল রাজত্ব করেছিল। 'বিয়াজউস সুলতান ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে কালকূট তাঁর চলার পথ খুঁজে নিয়েছেন। হোসেন শাহ তাঁর পিতা আশরফ আলহোসেনী ও তার ভাই য়ুসুফের সঙ্গে সুদূর তুর্কিস্থান থেকে বাংলাদেশের রাঢ়ে চাঁদপুরা মৌজায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। রাজা হওয়ার আগে তিনি হাবশী সুলতান মোজফর শাহের উজীর ছিলেন। অত্যন্ত ঘৃণিত আর লোভী সুলতানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন রাজকোষের অর্থ বেতন কমিয়ে দিতে। এজন্য সৈন্যদের কাছে সুলতান বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এদিকে বুদ্ধিমান হোসেন শাহ সাধারণ লোকদের বলতেন সুলতান অত্যন্ত নিষ্ঠুর, তাঁর ব্যবহার কর্কশ। তাঁর সুপরামর্শ সুলতান কর্ণপাত করেন না। দ্বৈত ভূমিকা অর্থাৎ রাজনীতির কূট চাল। হোসেন শাহ্ মুজাফর শাহকে হত্যা করেছিলেন। এই কাজে তাকে সাহায্য করেছিলেন রাজ্যের অমাত্যগণসহ বাইরের আরও অনেকে।

রাজ্যের প্রধান অমাত্যগণ একটি পরিষৎ রচনা করে হোসেন শাহ্কে রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন। রাজা নির্বাচনের ক্ষেত্রে হোসেন শাহ্ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস নাগাদ। রাজা হয়েই হোসেন শাহ্ প্রথমে উড়িষ্যা ও আসাম দখলের পরিকল্পনা করেছিলেন। হিন্দু রাজ্য এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্য মানে শত্রু রাজ্য। হোসেন শাহ্র মুদ্রায় আছে "অল ফতেহ্ অল কামরু ওঅ কামতে ওঅ জাজনগর ওঅ ওরিসে। অর্থাৎ কামরু কামতা জাজনগর উড়িষ্যা বিজয়ী উপাধিযুক্ত হয়েছেন।" *(পৃ: ১৫৫৯, ঐ)*

কালকূট চৈতন্যের সঙ্গে হাঁটতে গিয়ে পাঁচশ বছর আগের বিস্তর পুঁথি কালের ধুলো ঝেড়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন ও এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, "কিন্তু কথাগুলো একটু অতিরঞ্জিত। উড়িষ্যা আর

আসাম দখলের জন্য হোসেন শাহ্ অনেকবারই চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পূর্ণ সার্থক কখনও হতে পারেন নি।'' *(পৃ: ১৫৫৯, ঐ)* ১৪৯৪ সাল থেকে ১৫১২ পর্যন্ত হোসেন শাহ্ উড়িষ্যাকে বারে বারে আক্রমণ করে গেছেন।

অতএব সেই সময়ে অর্থাৎ ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে শত্রু রাজ্য উড়িষ্যায় বাংলার কেউ যাচ্ছে না— এ'কথাই জানিয়েছিলেন ছত্রভোগের সীমান্ত রক্ষী রামচন্দ্র খান। কালকূট বর্তমানের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বলছেন, কলকাতা থেকে পঁচিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হল ছত্রভোগ সীমান্ত। ডায়মন্ড হারবারের অন্তর্গত।

শ্রীচৈতন্য যখন ছত্রভোগ সীমান্তে এসে বাধাপ্রাপ্ত হলেন সেই সময়ে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি ও মন্ত্রী গোবিন্দ ভোইকে গৌড়ের সীমান্তরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে উড়িষ্যার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে চলে গিয়েছিলেন। তিনি বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন।

এরকম সময়েই হোসেন শাহ্ উড়িষ্যার উত্তরভাগ আক্রমণ করেছিলেন। গোবিন্দ ভোই ফটকের কাছে একবার বাধা দেওয়ার নামমাত্র চেষ্টা করেছিলেন। যুদ্ধে হেরে গিয়ে সারঙ্গগড়ে আশ্রয় নিয়েও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারেন নি। 'হোসেন শাহ্ জগন্নাথের বিগ্রহ ধ্বংস করতে পারে এই সন্দেহ করে দ্রুত পুরীতে ফিরে আসেন। জগন্নাথ দেব পুরুষোত্তমকে পুরীর মন্দির থেকে বের করে, দোলায় চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিল চড়াইগুহা পর্বতে এবং সেখানেই তাকে লুকিয়ে রেখেছিল। এদিকে হোসেন শাহ্ তখন পুরুষোত্তমে হাজির হয়ে মন্দির ধ্বংস করতে আরম্ভ করলেন।' কালকূট ইতিহাসের পথে চলতে গিয়ে দেখেছেন— ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ্ উড়িষ্যা আক্রমণ করে দেবদেউল বিগ্রহ ধ্বংস করে অনেক ক্ষতি করেছিলেন। সেই সময়ে উড়িষ্যার রাজ্যভার দেওয়া হয়েছিল গোবিন্দ ভোইকে।

কালকূট দুটি ঘটনার মধ্যেই গোবিন্দ ভোই-এর হাত রয়েছে বলে মনে করেন। রাজার বিশ্বাসভাজন হলেও গোবিন্দ ভোইকে লেখক বলেছেন 'একে বলা যায়, উড়িষ্যার মীরজাফর!' *(পৃ: ১৫৫৯, ঐ)* কালকূট ইতিহাসের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে মনভ্রমণে গিয়ে সেই সত্যটাকে অন্বেষণ করেছেন। দেখেছেন কী কদর্য হিংসা, কুচক্রীপণা, বিশ্বাসহীনতা ও হত্যার রাজনীতি।

প্রতাপ রুদ্র খবর পেয়ে বিজয়নগর কাঞ্চী জয়ের আশা ত্যাগ করে 'অত্যন্ত রোষ-ক্রুদ্ধ চিত্তে পুরী ফিরে এলেন' এবং হোসেন শাহকে তাড়া করে নিয়ে গেলেন একেবারে গঙ্গাতীরে 'চৌমুহরি' নামক স্থানে। প্রতাপরুদ্রের প্রতাপের কাছে হোসেন শাহ টিকতে না পেরে মান্দারণ দুর্গে আশ্রয় নিলেন। প্রতাপরুদ্র গড় অবরোধ করে হোসেন শাহ্কে বেকায়দায় ফেলেছেন। গোবিন্দ ভোই হোসেন শাহ্র সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রতাপরুদ্রের দুর্বলতাগুলো হোসেন শাহ্কে দেখিয়ে দিলেন

এবং নিজে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন। কালকূট মনভ্রমণে দেখেছেন সে মর্মান্তিক গ্লানিময় যুদ্ধ। রাজা প্রতাপরুদ্র শুধু পিছুই হটলেন না, পালাতে বাধ্য হলেন। রাজা হওয়ার বাসনাতেই গোবিন্দ ভোই এমন গর্হিত কাজ করেছিলেন। অবশ্য ভবিষ্যতে তা সে হতে পেরেছিল। 'সে ইতিহাস যেমন করুণ তেমনি কলঙ্কিত' *(পৃ: ১৫৫৯, ঐ)* বলে মনে হয়েছে কালকূটের। কালকূটের দৃষ্টিতে উঠে এসেছে ক্ষোভ "অথচ দেখছি, এই লোকটির প্রতি উড়িষ্যার ঐতিহাসিকেরা এক রহস্যময় কারণে কখনও বিরুদ্ধ কথা বলেন নি। ক্রমে ক্রমে রহস্যের দ্বারোদঘাটন হবে।" *(পৃ: ১৫৫৯, ঐ)* যাইহোক্, প্রতাপরুদ্র গোবিন্দ ভোই-এর ষড়যন্ত্র সবই বুঝেছিলেন, তবুও তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁরই কাছে লোক পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিলেন "তুমি আমাকে সরিয়ে কাকে রাজা করছো? গোবিন্দ ভোই বুঝলো, তাই তো! হোসেন শাহ্ উড়িষ্যা জিতে নিতে পারলে, তাকে কি রাজা করবে আদৌ? বোধহয় না। তখন সে সামনে এসে দর্শন দিল।" *(পৃ: ১৫৬০, ঐ)* প্রতাপরুদ্র তাঁকে ভর্ৎসনা না করে সমাদর করে কনকস্নান করিয়ে তাঁকে বিদ্যাধর পদে অধিষ্ঠিত করলেন। প্রতাপরুদ্রের বিরোধীদের সঙ্গে গোবিন্দ ভালোভাবেই আঁতাত গড়ে তোলাতে বাধ্য হয়ে হোসেন শাহ্ ফিরে গেলেন। এরকম একটি অশান্ত রাজনৈতিক পরিবেশে নিমাই-নিত্যানন্দ-মুকুন্দসহ ছত্রভোগে উপস্থিত। অতীতচারী কালকূট দেখেছেন কিভাবে রামচন্দ্র খান রাতের আধারে নৌকাযোগে নিমাইকে নদী পার করে উড়িষ্যার সীমায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। একদিকে ডাকাতের ভয় আর একদিকে শত্রুপক্ষের ভয়। তবুও তাঁরা নৌকায় উঠে নামকীর্তন করতে করতে উড়িষ্যার সীমায় পৌঁছেছিলেন। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দ দাসের মুখ থেকে এ'কথা শুনে নিয়ে তাঁর চলার পথকে আলোকিত করেছেন। উড়িষ্যায় পৌঁছে সুবর্ণরেখায় স্নান করতে নামার সময় জগদানন্দর হাতে তাঁর সন্ন্যাসের দণ্ডটি দিয়েছিলেন। জগদানন্দ ভিক্ষায় যাবেন বলে দণ্ডটি দিয়ে গেলেন নিত্যানন্দর হাতে। "আমি যে দণ্ড হৃদয়ে বহন করি, চৈতন্য মহাপ্রভু তা কেমন করে বহন করবেন। এই বলে তিনি দণ্ড ভেঙে ফেললেন।" *(পৃ: ১৫৬০, ঐ)*

কেন যে নিত্যানন্দ দণ্ডটি ভেঙে ফেললেন কালকূট কোথাও তার কারণ খুঁজে পাননি। শুধু মনে হয়েছে নিমাইয়ের সন্ন্যাস নেওয়ার দুঃখেই দণ্ডটি ভেঙেছেন। এতে নিমাই ক্রুদ্ধ হয়ে জগন্নাথ দর্শনে একাই গিয়েছিলেন। পুরুষোত্তমে যাওয়ার আগে জাজপুরে এসে কাউকে না বলে একদিন উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। কালকূট এখানে সমস্যায় পড়েছেন। কেন গেলেন পরম বৈষ্ণব কমললোচনের গৃহে? নিজের পূর্বপুরুষের ভিটের খোঁজেই কি গিয়েছিলেন? এরকম নানা জিজ্ঞাসা মনের মধ্যে ভীড় করতে থাকে তার। নিমাইয়ের পূর্বপুরুষরা আগে জাজপুর থেকে রাজা কপিলেন্দ্রদেবের ভয়ে কয়েকপুরুষ আগে শ্রীহট্টে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পূর্বপুরুষের ভিটার খোঁজেই কি গিয়েছিলেন। কালকূট মনভ্রমণে গিয়েও এর প্রকৃত কারণ খুঁজে পাননি। জগন্নাথ দর্শনে গিয়ে

জগন্নাথ কোলে নেওয়ার ইচ্ছা মনে রেখে চৈতন্য লাফ দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং সেই সময়ে পাণ্ডারা মারমুখী হয়ে ওঠে। সেইসময়ে বাসুদেব সার্বভৌম জগন্নাথ দর্শনে এসে নবীন সন্ন্যাসীকে উদ্ধার করে তাঁকে নিজের গৃহে নিয়ে আসেন। পরে নিত্যানন্দ প্রমুখ মন্দিরে এসে ঘটনাটি জানতে পেরে বাসুদেব সার্বভৌমর গৃহে যান। বাসুদেব সার্বভৌম তাঁর ছেলে চন্দনেশ্বরকে দিয়ে নিত্যানন্দকে জগন্নাথ দর্শনে পাঠান ও দর্শন সেরে সমুদ্র স্নান করে তাঁরই গৃহে ফিরে আসতে বলেন।

কালকূট মনভ্রমণে 'গোবিন্দর কড়চা' অনুসরণ করে বাসুদেব সার্বভৌমর সঙ্গে চৈতন্যদেবের ঐতিহাসিক বিতর্ক প্রত্যক্ষ করেছেন। কালকূট প্রত্যক্ষ করছেন কীভাবে চৈতন্য জগৎ-বরেণ্য পণ্ডিত, বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনতে চেয়েছিলেন বাসুদেব সার্বভৌম তের প্রকারের ব্যাখ্যা করে চুপ করে গেলে চৈতন্য হেসে বললেন যে, এমন কিছু বলবেন না, যাতে মনে হয়, সব যেন মেঘে আচ্ছাদিত। 'ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্যকিরণের মতো। আপনি নিজের মত ব্যাখ্যা করছেন।' *(পৃ: ১৫৬১, ঐ)* জগৎবিখ্যাত পণ্ডিত চৈতন্যকে শাঙ্কর-বেদান্তী মনে করে কদিন ধরে বেদান্ত ব্যাখ্যা করে শোনালেন। তাই চৈতন্য ভাগবতের মহিমা বোঝাবার জন্য 'শ্রীমূর্তি ষড়ভূজ' ধারণ করলেন। ''আপনি আমাকে কী বোঝাচ্ছেন? সংকীর্তন করাই আমার অবতারত্ব। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে চেয়ে দেখুন, আমি ছাড়া আর কেউ নেই।'' *(পৃ: ১৫৬১, ঐ)* সার্বভৌম 'শ্রীমূর্তি ষড়ভুজ' দেখে চৈতন্যের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন; বুঝলেন — কোথায় তাঁর ভুল হয়েছিল। 'দাস্য ভক্তি নয়, উদ্ধার ও বিনাশ চাই। এই হল চৈতন্যের মূলতত্ত্ব। তুমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তুমি আমাকে উদ্ধার কর।' *(পৃ: ১৫৬১, ঐ)* সার্বভৌমকে জয় করে মাত্র চব্বিশ বছরে চৈতন্য চললেন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে — 'নিজের কথা সবাইকে শোনাতে হবে। স্ত্রী-শূদ্র-আদি মূর্খকে উদ্ধারের জন্যই এই সন্ন্যাস।' *(পৃ: ১৫৬১, ঐ)*

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে চৈতন্য নিলেন শুধু 'গোবিন্দ কর্মকার'কে। গোবিন্দ কর্মকার কড়চা লিখেছিলেন। সার্বভৌমর কথা অনুযায়ী গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে রায় রামানন্দের সঙ্গে দেখা হতেই দু'জনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন। রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে রসতত্ত্বের সাধনাঙ্গের একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করলেন। রামানন্দ যখনই থামেন তখনই চৈতন্য বলেন 'আগে কহ আর'। রায় রামানন্দ অবাক হয়ে বললেন 'ত্রিজগতে রাধা প্রেমের কোন উপমা আর নেই।' *(পৃ: ১৫৬১, ঐ)* রামানন্দ রায় চৈতন্যকে 'কৃষ্ণের স্বরূপ কি? রাধার স্বরূপ কি? রস কোন তত্ত্ব? প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ?' *(পৃ: ১৫৬১, ঐ)* — এসবও ব্যাখ্যা করে শোনালেন। অবশেষে রামানন্দের অনুরোধে চৈতন্য নিজের স্বরূপ দেখালেন। ''রসরাজ মহাভাব দুই একই রূপ।'' *(পৃ: ১৫৬২, ঐ)* — রামানন্দ অভেদাত্মক যুগলরূপ দেখে পাগলের মত ধরতে গেলেন, কিন্তু পারলেন না, অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

কালকূট গোদাবরী তীরে চৈতন্য ও রায় রামানন্দের এই আশ্চর্য লীলা প্রত্যক্ষ করলেন। 'গোদাবরীতীরে এই প্রথম চৈতন্য কৃষ্ণ অবতার থেকে রাধার দিকে মুখ ফেরালেন, এখন তিনি রাধার অবতার।' *(পৃ: ১৫৬২, ঐ)* এরপর, সেখান থেকে 'ত্রিমন্দ' নগরে গিয়ে বৌদ্ধদের পরাজিত করলেন। মথুরার পথে পাঠান মুসলমানরা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হল। বিভিন্ন শাখার শৈবশাক্তরা বৈষ্ণব হলেন। চৈতন্য নিজেও শিব পূজা, শক্তি প্রণাম করেছেন। মুসলমানদের যখন বৈষ্ণব করছেন তখন কোরান ব্যাখ্যা করছেন। কালকূটের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ঘটনাগুলো এইভাবে উঠেছে, ''কোন শাস্ত্রকেই তিনি ছোট করছেন না।'' ১৫৬২ লেখকের দৃষ্টিতে এটিই তার লক্ষ্যভেদের একমাত্র উপায়। কুখ্যাত দস্যু পন্থভীল, নারোজীকে দস্যুবৃত্তি ও বেশ্যাকে বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিয়ে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করিয়েছেন।

এরপরে দাক্ষিণাত্য থেকে মহানদী পার হয়ে আমেদাবাদ থেকে সোমনাথে, গুজরাটে, বরোদা নগরে। ওপারে গেলেন মহাভারতের সেই প্রভাস, দ্বারকা থেকে রৈবতক পর্বত হয়ে বিন্ধ্যগিরি। এরপরে আবার গোদাবরী তীরে গোমতীতে। রামানন্দকে 'কর্ণামৃত' ও 'ব্রহ্মসংহিতা' দুটি দিয়ে নীলাদ্রি চললেন। রায় রামানন্দ চৈতন্যের পিছু পিছু এলেন। ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে মাঘ মাসে প্রায় সন্ধ্যার সময় ধূলাপায়ে জগন্নাথ মন্দিরে গেলেন। জগন্নাথকে দেখেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কালকূট ধর্ম প্রচারক তথা পরিব্রাজক চৈতন্যকে প্রায় দু'বছর ধরে অনুসরণ করেছেন, সর্বত্র সঙ্গী হতে পারেন নি, তথাপি যেসব স্থানে যাওয়া সম্ভব সেইসব স্থানেই তিনি মনভ্রমণে গেছেন। চৈতন্যকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে চৈতন্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন আর ফিরলেন ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসে। চৈতন্যের দীর্ঘসময় ধরে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা কালকূটের কাছে অভিনব লেগেছে। তিনি বলেছেন ইতিহাসের গতিপথে এ এক বৈপ্লবিক ব্যাপার। মাত্র চব্বিশ বছরের বাঙালি যুবকের এমন দুঃসাহসের ভ্রমণ!

কালকূট চৈতন্যের ধর্মপ্রচার ও পরিভ্রমণকালে লক্ষ্য করেছেন, চৈতন্য সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক দুঃসাহসিক সমাজ পরিবর্তনের কাজ করেছেন। সেই সঙ্গে কিছু সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। 'বলি ছাড়াও কালী পূজা' প্রবর্তক চৈতন্য। দাক্ষিণাত্যের দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। পুরীতে যখন তিনি দাক্ষিণাত্যের ভ্রমণের কথা বলছেন, তখনও পুরীতে দেবদাসী প্রথা বর্তমান ছিল, এটাও তিনি সমর্থন করেন নি।

কালকূটের চোখ দিয়ে এই সত্য উঠে এসেছে যে, চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য জয় এই কাজটি নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক কিন্তু তাঁর ভক্তরা তেমন গুরুত্ব না দেওয়াটা কালকূট মেনে নিতে পারেন নি। তিনি অনুভব করেছেন চৈতন্য যে সমাজ বিপ্লবের কাজ করেছিলেন সেই সমাজ বিপ্লবের মশালটি

জ্বালিয়ে রাখার জন্য তাঁর পরে আর কেউ ছিলেন না। সেজন্য একে ভবিষ্যতের লুপ্ত ইতিহাস হয়েই থাকতে হয়েছে। বাসুদেব সার্বভৌমের কথায় রাজা প্রতাপরুদ্র কাশী মিশ্রের বাড়িতে চৈতন্যের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজার সঙ্গে চৈতন্যের দেখা হয়নি সে সময়ে কিন্তু রাজা চৈতন্যের খবরাখবর সবকিছুই নজরে রাখতেন। ১৫১৪ খ্রীস্টাব্দে বিজয়া দশমীর দিন সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে চৈতন্য নীলাচল ত্যাগ করেছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র এই খবর জানতে পেরে রাজা তাঁর আজ্ঞাপত্র পাঠালেন "যে-পথ দিয়ে প্রভু যাবেন, গ্রামে গ্রামে নতুন আবাস তৈরি কর। লোকজন সঙ্গে যাও। খাবার আর অন্যান্য সামগ্রী থাকবে প্রচুর। সবসময় যেন প্রহরা থাকে। সীমান্ত প্রদেশের শাসনকর্তা মহাপাত্র, হরিচন্দন, মঙ্গরাজকে বিশেষ সংবাদ প্রেরণ করলেন প্রভুর প্রতি দৃষ্টি রাখতে। কোনো প্রকার অন্যথা যেন না ঘটে। ঘাটে ঘাটে নৌকা রাখো। তোরণ স্তম্ভ তৈরি কর পথে পথে। কটকের ওপরে চৌদার গ্রামে বিশেষ নতুন বাসস্থান তৈরি হোক।" *(পৃ: ১৫৬৩, ঐ)*

রাজগৃহের মহিষীরা হাতীর পিঠে চেপে চিত্রোৎপলা নদীর ঘাটে প্রভুর সঙ্গে দেখা করলেন। রাজার নির্দেশে রায় রামানন্দ চৈতন্যের সঙ্গে বালেশ্বরের চোদ্দ কিমি দক্ষিণে ভদ্রক পর্যন্ত এলেন। তারপরে রেমুনা। রেমুনার মন্ত্রেশ্বরে যবন-অধিকারে 'দুষ্টনদ' আছে। যবন অধিকারী সংকীর্তন শুনে নিজে চৈতন্যের অধীন হলেন ও ডাকাতের ভয়ে দশ নৌকো লোক দিয়ে পিছলদায় পৌঁছে দিলেন। সেখান থেকে নৌকো করে পানিহাটি; তারপর গঙ্গার ওপর দিয়ে কুমারহাট, ফুলিয়া, শান্তিপুর। তারপরে মালদহের রামকেলী গ্রামে কানাইয়ের নাটশালায় গিয়ে পৌঁছলেন।

জায়গাটি গৌড়ের হোসেন শাহের রাজধানীর কাছে। চৈতন্য রামকেলী আসার আগেই হোসেন শাহ্ চৈতন্যের নাম শুনেছিলেন। হোসেন শাহ্ রূপ, সনাতনের কাছে এ বিষয়ে খবর নিলেন। সনাতন জবাব দিলেন — 'তিনি আপনার চিত্তের চৈতন্যস্বরূপ। চিন্তা করলেই প্রমাণ পাবেন তিনি খোদা কৃষ্ণ সবাইকে মানেন।' *(পৃ: ১৫৬৩, ঐ)*

হোসেন শাহ্ উত্তর শুনে সনাতনকে বললেন 'তোমরা ঘোষণা করে দাও, কোনো কাজি বা কোটাল যদি তাঁকে বিরক্ত করে তবে তার জান আমি খতম করবো।' *(পৃ: ১৫৬৩, ঐ)*

রামকেলীতে চৈতন্যের সঙ্গে রূপ ও সনাতনের দেখা হওয়াকে কালকূট বলেছেন, 'ইতিহাসের দিক থেকে এটি একটি বিরাট ঘটনা। সৈন্য ও রাজস্ব বিভাগের দুই প্রধান মন্ত্রী, কৌপীনধারী একজন সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা লুটিয়ে দিলেন। বৈষ্ণবধর্মেরও ইতিহাসের নতুন বাঁক নিল।' *(পৃ: ১৫৬৩, ঐ)* রূপ ও সনাতনের গোপন চিঠি পেয়েই যে চৈতন্য রামকেলীতে এসেছিলেন এটা কালকূটের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। চৈতন্যের রামকেলীতে কাজ শেষ, তিনি বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করার আগে শচীমাতা একাই দেখা করতে এলেন। মায়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিনি ঝাড়খণ্ড হয়ে বৃন্দাবনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। বৃন্দাবনে গেলেন ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর

অথবা অক্টোবর মাসে এবং ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে নীলাচলে ফিরে এলেন মথুরা না গিয়ে। বৃন্দাবন থেকে ফেরার সময় প্রয়াগে শ্রীরূপ ও তাঁর ভাই বল্লভের সঙ্গে দেখা হওয়াতে শ্রীচৈতন্য দশদিন তাঁদের রসতত্ত্ব শোনালেন। কিন্তু রূপ বা সনাতন কেউই চৈতন্যের সেই রসতত্ত্বের ব্যাখ্যার মর্ম বুঝতে পারেন নি। তাই তাঁরা মীরাবাঈ-এর কাছে ভিক্ষা নিতে যেতেন না, মহিলার কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করা যায় না বলে। পরে মীরাবাঈ তাঁদের রসতত্ত্বের ব্যাখ্যা করে তাদের নতি স্বীকার করান। ''মীরাবাঈ তার স্বক্ষেত্রে রাধাতত্ত্বেই কৃষ্ণভজনা করতেন। আর চৈতন্য নবদ্বীপ-লীলার পথে, কৃষ্ণ অবতারত্ব ছেড়ে রাধাতত্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন।'' *(পৃ: ১৫৬৪, ঐ)* জীব আর ব্রহ্ম এক এ'কথা চৈতন্য বলেননি, তবে শ্রীচৈতন্য শাঙ্কর বেদান্তের মায়াবাদ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বেদান্তের দার্শনিক মতবাদ গ্রহণ করেন নি। পরে 'প্রকাশানন্দের সঙ্গে বেদান্ত বিচার করে, শঙ্করের অদ্বৈত মতবাদ খণ্ডন করেছেন। এখানেই তার ভ্রমণ শেষ।'' *(পৃ: ১৫৬৪, ঐ)* চৈতন্য তাঁর নিজস্ব ধর্ম ও নীতিশিক্ষা প্রণয়ন করে সনাতনকে বলেছিলেন— ''আটটি শিক্ষা মনে রেখো। অবৈষ্ণবের সঙ্গ ত্যাগ। বহু শিষ্য কখনো করবে না। বহু গ্রন্থ পাঠ করবে। ব্যাখ্যা করবে না। ধর্মের হানি করে সম শোকাদি বশ হবে না। অন্য দেবতা শাস্ত্র ইত্যাদি নিন্দা করবে না। বিষ্ণু বা বৈষ্ণব নিন্দায় গ্রাম্য কথায় কান দেবে না। কোনো প্রাণীকেই কথায় উদ্বিগ্ন করবে না।'' *(পৃ: ১৫৬৪, ঐ)*

কালকূটের দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, নবদ্বীপ লীলায় বৈষ্ণবদের আন্দোলনে অহিংস ভাব দেখা যায়নি। কিন্তু চৈতন্যের ধর্ম ও নীতি শিক্ষা অহিংসবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম থেকেই এটা এসেছে বোঝাই যায়।

চৈতন্য নিজে নীলাচলেই রয়ে গেলেন কিন্তু গৌড়ে নিত্যানন্দকে পাঠিয়ে দিলেন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য। নিত্যানন্দ গণসংযোগের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম পরিচালনা করেছিলেন। চৈতন্যের প্রতিটি কথাই তিনি মেনেছিলেন। তিনি রাঢ় গৌড়ের ঘরে ঘরে শ্রীচৈতন্যের মূর্তি গড়ে পূজা করতে বললেন। পতিত উদ্ধারও চলছে। লেখক বলেছেন ''তাঁর প্রেমতত্ত্ব প্রচারই বাংলাদেশে বৈষ্ণবতত্ত্ব টিকিয়ে রেখেছে।'' *(পৃ: ১৫৬৪, ঐ)*

আর আঠার বছর চৈতন্য নীলাচলে থেকে ''বৃন্দাবনের সঙ্গে যোগ রেখে একটা আদর্শ ও তত্ত্ব বজায় রাখছিলেন।'' *(পৃ: ১৫৬৪, ঐ)* এছাড়াও দর্শনশাস্ত্র, রসতত্ত্ব, নাটক ইত্যাদি প্রণয়নের ওপর বৈষ্ণবধর্মের সিদ্ধান্ত নিরূপণ করে চলেছেন। ''এ দুটি ধারাই একত্রে মিলে মহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নামে প্রচারিত হয়েছে।'' *(পৃ: ১৫৬৪, ঐ)*

চৈতন্য কঠোর সন্ন্যাসব্রত পালন করছেন। নিত্যানন্দ-এর প্রচার আলাদা। কঠোর সন্ন্যাস ধর্মের কোন বালাই নেই। লেখক বলছেন অতীত ভ্রমণে গিয়ে তিনি অনেককে বলাবলি করতে শুনেছেন 'এতো শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করা হচ্ছে না, এ তো দেখছি অবধূত নিত্যানন্দের বৈষ্ণবধর্ম

প্রচার। *(পৃ: ১৫৬৪, ঐ)* নিত্যানন্দের এইরকম প্রচার চৈতন্যের কানে আসাতে তিনি নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ''তুমি কী ভেবে এ'রকম ধর্ম প্রচার করছো। উত্তরে নিত্যানন্দ বলেছিলেন কাঠিন্য কীর্তন কলিযুগে ধর্ম নহে।'' *(পৃ: ১৫৬৫, ঐ)* চৈতন্য নিত্যানন্দকে ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু ছোট হরিদাসকে লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিয়েছিলেন, এটা কালকূট মেনে নিতে পারেন নি। ছোট হরিদাস চৈতন্যের জন্য শিখি মাইতির ছোট বোন মাধবী দেবীর কাছ থেকে এক মণ 'শুক্ল চাল' এনেছিলেন এই অপরাধে চৈতন্য তার মুখ দর্শন করতে চান নি। একবছর ছোট হরিদাস অপেক্ষা করেছিলেন ক্ষমা পাবার আশায়, অবশেষে প্রয়াগে গিয়ে ত্রিবেণীতে প্রাণ দিয়েছিলেন।

অতীত পথে চলতে গিয়ে ছোট হরিদাসের প্রাণত্যাগে কালকূট মনে ভীষণভাবে আঘাত পেয়েছিলেন, তিনি তাঁর কোন দোষ দেখতে পাননি। চৈতন্য বললেন সাড়ে তিনজন আছে যারা চৈতন্যের মত রাধা অবতাররূপে সাধন করে। শিখি মাইতি, রায় রামানন্দ ও স্বরূপ গোঁসাই। এই তিনজন এবং মাধবী দেবী অর্ধেক। মোট সাড়ে তিনজন। মাধবী দেবী পরম বৈষ্ণবী, বৃদ্ধা তপস্বিনী। কালকূট নিজেও এর কারণটি অনুসন্ধান করেছেন। চৈতন্য কঠোর সন্ন্যাস ধর্মকে আদর্শ বলে প্রচার করতে চেয়েছিলেন। হরিদাস বৈষ্ণব প্রকৃতির কাছে 'শুক্ল চাউল' ভিক্ষে করেছিলেন বলে এই শাস্তি পেতে হয়েছিল। হরিদাসের মৃত্যু চৈতন্যদেবকে ব্যথিত করেছিল, তাই তাঁর মৃত্যুর পরে বলেছিলেন, 'হরিদাস কাহা তাঁকে আনহ এখানে।' *(পৃ: ১৫৬৫, ঐ)*

কালকূটের একটি বিষয় ভালো লাগেনি। একটি ওড়িয়া পিতৃহীন ব্রাহ্মণ কুমারে সঙ্গে প্রতিদিন চৈতন্য কথা বলতে ভালবাসতেন। তাঁর বিধবা মা যুবতী ও সুন্দরী ছিল। দামোদর এ ব্যাপারটি ভালো চোখে দেখে নি। দামোদর এ বিষয়ে প্রতিবাদ করাতে চৈতন্যর সম্বিৎ ফিরে এসেছিল। তিনি বলেছিলেন 'তুমি অতিশয় নিরক্ষর ব্যক্তি বলেই আমাকে বাক্যদণ্ড দিতে পারলে। ভয় পেলে না' *(পৃ: ১৫৬৫, ঐ)* এরপরই দামোদরকে নবদ্বীপে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর মায়ের দেখাশুনা করার জন্য। কালকূটের মনে হয়েছে এ তাঁর নির্বাসন। দামোদর চৈতন্যকে ছেড়ে কোথাও যেতে চায় নি, কিন্তু তবু তাকে যেতে হলো।

যবন হরিদাসের পুরী নগরীতে প্রবেশাধিকার ছিল না। স্বর্গদ্বারের কাছে থাকতেন, চৈতন্য তাঁকে ভোগ পাঠাতেন নিয়মিত। সনাতন চৈতন্যকে দর্শন করার জন্য পুরীতে এসে যবন হরিদাসের আশ্রমে উঠলেন। তিনি দীর্ঘদিন হোসেন শাহ্-র কাছে দবীর খাস নামে কর্মরত ছিলেন বলে নিজেকে শূদ্র ভাবতেন। তাঁর শরীরে 'কন্ডরসা' হয়েছিল। তিনি চৈতন্যকে আলিঙ্গন করে বাধা দিয়েছিলেন তার দেহে কন্ড-ক্লেদ আছে বলে। সনাতন মনে মনে প্রায়শ্চিত্তের জন্য জগন্নাথের রথের চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চৈতন্য তা জানতে পেরে বলেছিলেন 'তোমার দেহ তুমি আমাকে সমর্পণ করেছ, তোমার দেহ এখন আমার। তোমার শরীরে আমার

বহু সাধন প্রয়োজন আছে। তুমি দেহ বিনাশ করতে পার না।' *(পৃ: ১৫৬৫, ঐ)*

নীলাচলে বসে চৈতন্য খবর পেয়েছিলেন নিত্যানন্দ গৌড়ে শূদ্রের আশ্রয়ে থেকে বিলাসিতার মধ্য দিয়ে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। চৈতন্য মেনে নিয়েছিলেন নিত্যানন্দের ধর্ম প্রচারের পদ্ধতিকে। কালকূট দেখেছেন, চৈতন্যর দূরদর্শিতা, ভেবেচিন্তেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিত্যানন্দ সম্পর্কে। সুলতানী রাজত্বের সঙ্গে থেকে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করা সহজ কথা নয়। শ্রীরূপ ও সনাতনের প্রচারের সঙ্গে মথুরা-বৃন্দাবন-দিল্লি আর আগ্রার ইতিহাস জড়িত। আর উড়িষ্যার প্রচারের সঙ্গে রাজা প্রতাপ রুদ্রের ইতিহাস জড়িত। বিবেচনা করে চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সমাজ পরিচালনা করেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়ে। ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করার পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য রাজা প্রতাপ রুদ্র স্বয়ং ছুটে এসেছিলেন। এই সাক্ষাতে দু'জনের মধ্যে একটি প্রগাঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল।

প্রতাপ রুদ্রের সঙ্গে হোসেন শাহ্‌র থেকে বেশি যুদ্ধ হয়েছে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেবের। কখনো পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছেন, কখনো যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। কিন্তু শান্তি ফেরেনি। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে গৌড় আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে চৈতন্যের কাছে পরামর্শ চাইলেন রাজা প্রতাপ রুদ্র। তিনি তাঁকে গৌড় আক্রমণ না করে বিজয়নগর আক্রমণ করতে বললেন। হোসেন শাহ্ আসামের কিছু অংশ জয় করে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছেন তাই তিনি গৌড় আক্রমণ করতে নিষেধ করলেন। কালকূট চৈতন্যের এই সিদ্ধান্তকে এইভাবে দেখেছেন — "এ ঘটনা থেকে আমি আর এক ঐতিহাসিক চৈতন্যদেবকে দেখতে পাচ্ছি। দিব্যোন্মাদ-লক্ষণ দেখা দেবার আগে পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য রাজনীতিতেও অংশ নিয়েছেন। এবং তিনি মোটেই যুদ্ধ বিরোধী ছিলেন না। অহিংসা ধর্ম এসেছে তারপরে।" *(পৃ: ১৫৬৬, ঐ)* রাজা প্রতাপ রুদ্র পরাজিত হয়ে সন্ধি করলেন। নিজ কন্যার সঙ্গে কৃষ্ণদেবের বিবাহ দিলেন। আর কৃষ্ণদেব রাজা প্রতাপ রুদ্রের এক মহিষীকে শাশুড়ি জ্ঞানে বন্দীমুক্ত করে দিলেন। চৈতন্যদেবের বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টিতে রাজা প্রতাপরুদ্র লাভবান হয়েছিলেন। অন্ততঃ বিজয়নগরের সঙ্গে যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পেলেন।

কালকূট দেখেছেন চৈতন্যের এই পরামর্শ একজনের ভালো লাগে নি। কালকূট কাহিনীর শুরু থেকে এই লোকটির ওপরে তর্জনী তুলে আছেন। এর পেছনে কিছু কারণও তিনি দেখতে পেয়েছেন এবং তা তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁর মনভ্রমণের কাহিনীতে চিত্রায়িত করেছেন। বৃন্দাবন দাসের রচনা, গোবিন্দদাসের কড়চা সহ ঐতিহাসিক বহু গ্রন্থ অনুসন্ধান করে তিনি গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোই-এর দিকে আঙুল তুলেছেন। গোবিন্দ বিদ্যাধরের রাগ আর ঘৃণা, সবই চৈতন্যের ওপর পড়তে লাগল। কারণ আছে। এই ঐতিহাসিক কারণটি কেউ লিখে রাখেন নি; কারণ, সম্ভব ছিল না এই জন্য যে, গোবিন্দ বিদ্যাধর চেয়েছিলেন, হোসেন শাহ্‌র সঙ্গে যদি প্রতাপরুদ্র

যুদ্ধ করেন, তাহলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। হোসেন শাহ্‌র সঙ্গে গোবিন্দ বিদ্যাধর হাত মিলিয়ে উড়িষ্যার সিংহাসন লাভ করার সুযোগ পেতেন। চৈতন্যদেব ভেবেছিলেন, কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় ঘটলেও, হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর সন্ধি হবে। কিন্তু হোসেন শাহ রাজাকে ধ্বংস করে দিতেন। উড়িষ্যা গোবিন্দ বিদ্যাধরের অধীনে চিরকাল গৌড়ের করদ-রাজ্য হয়ে থাকত। গোবিন্দ বিদ্যাধর তখন থেকেই ভাবছিলেন, চৈতন্যের ওপর প্রতিশোধ তোলা যায় কেমন করে। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ মারা যাওয়ার পর থেকে রাজা প্রতাপরুদ্রকে আর যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় নি। কাজেই রাজা প্রতাপরুদ্র বেশিরভাগ সময়ই চৈতন্যদেবের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে সময় কাটাতে লাগলেন। তাঁদের সঙ্গে থাকতেন ওড়িয়া বৈষ্ণব জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ দাস প্রমুখ।

বিদ্যাধর ভোই ব্রাহ্মণ আর বৌদ্ধদের মধ্যে হিংসার ও বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে লাগলেন। ধীরে প্রচার চালাতে লাগলেন— "ওকে রাজ্য ছাড়া কর। রাজার কাছ থেকে ওকে সরাতে হবে।" মন্দিরের পাণ্ডাদের প্রতি ও বৌদ্ধসংঘগুলির প্রতি রাজার কোনো সুদৃষ্টি বা কৃপা নেই এ'কথা বলে পাণ্ডাদের আর বৌদ্ধদের মনে চৈতন্যের প্রতি ঘৃণা ছড়াতে লাগল। কালকূটের কিছু চোখ এড়িয়ে গেল না; তিনি দেখলেন, শুনলেন — চক্রান্তের কলকাঠি নাড়ছেন আড়াল থেকে গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোই। তাঁর চোখ এড়িয়ে গেল না রাজা প্রতাপ রুদ্রও। রাজার অনুচরবৃন্দ সজাগ দৃষ্টি রাখত এ বিষয়ে।

যবন হরিদাসের অসুস্থতার খবর পেয়ে শ্রীচৈতন্য প্রভু তাঁকে দেখতে গেলেন। হরিদাস বললেন "আমি তোমার সামনে দেহ রক্ষা করবো; এই আমার ইচ্ছা।" *(পৃ: ১৫৬৬, ঐ)* পরদিন হরিদাসকে ঘিরে সকলে নামকীর্তন শুরু করলেন। "শ্রীচৈতন্য রায় রামানন্দ আর সার্বভৌমকে হরিদাসের জীবনী-কথা শোনাতে লাগলেন।" *(পৃ: ১৫৬৬, ঐ)* হরিদাস শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণ মস্তকে রেখে বারে বারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামোচ্চারণের মধ্য দিয়েই প্রাণত্যাগ করলেন। হরিদাসকে সমুদ্রের জলে ধুইয়ে সমুদ্রের বালির তলায় সমাহিত করা হল। হরিদাসের সৎকারের পর সিংহদ্বারের কাছে চৈতন্য ধুতির আঁচল পেতে প্রথমবার ভিক্ষা করলেন মহোৎসবের জন্য! স্বরূপ গোঁসাই শ্রীচৈতন্যর কাছ থেকে ভিক্ষার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিলেন। শ্রীচৈতন্য হরিদাস সম্পর্কে বলেছেন— "তিনি নিজের ইচ্ছায় চলে গেলেন। আমার এমন শক্তি ছিল না, তাঁকে ধরে রাখি। তাহলে বোঝ, তিনি কতো বড় সাধক ছিলেন। একে বলে ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু।" *(পৃ: ১৫৬৬, ঐ)* হরিদাসের দেহরক্ষার পরই চৈতন্যের জীবনে পরিবর্তন হল। রায় রামানন্দ চৈতন্যকে বললেন, 'তুমি রাধার ভাবে ভাবিত হয়ে, নিজের দেওয়া রস নিজেই আস্বাদন করবার জন্য অবতার হয়েছো।' *(পৃ: ১৫৬৬, ঐ)* কালকূট রামানন্দের কথাটির মর্ম উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন গভীরভাবে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ

গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামী দু'জনকেই অনুসরণ করে বুঝেছেন "এটি এক শ্রেণির দেহতত্ত্বের সাধনা। এ সাধনায় পুরুষ-প্রকৃতি দুজনের প্রয়োজন নেই। একজনের মধ্যে রাধা কৃষ্ণ নাম সাধন।" *(পৃ: ১৫৬৭, ঐ)* শ্রীচৈতন্য দিব্যোন্মাদ হয়েছিলেন, কিন্তু সকল বাহ্যজ্ঞান হারাননি। এ অবস্থাতেই জগদানন্দকে দিয়ে মায়ের জন্য প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়ে মাকে আশ্বাস দিতেন যে, 'নীলাচলে আমি তোমার আজ্ঞাতেই আছি। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে নেই।' *(পৃ: ১৫৬৬, ঐ)* এটিতে কখনও ভুল হয়নি। লেখক কালকূট তাঁর অতীত ভ্রমণ থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "১৫২২ থেকে ১৫৩৩, আমৃত্যু তাঁর এই দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্তমান ছিল। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন, তাঁকে ঘিরে যে কুটিল ষড়যন্ত্র ঘটছিল, সে-বিষয়ে তিনি কিছু জানতেন না? তা হলেও তাঁকে ভুল বোঝা হবে। সবই জানতেন। প্রকাশ করতেন না।" *(পৃ: ১৫৬৭, ঐ)* তিনি আরও বলেছেন এবিষয়ে প্রতাপরুদ্রও একেবারে অন্ধকারে ছিলেন না।

চৈতন্যের এ দিব্যোন্মাদ অবস্থা একদিনে হয়নি। লেখক কালকূট দেখেছেন, একদিন এক দেবদাসী জয়দেবের গীতগোবিন্দের গুর্জরি রাগের 'রতিসুখ সারে গতম্ অভিসারে মদনমোহন বেশং' পদটি গাইছিল। গানের বাণীটি শুনেই, প্রথম দিব্যোন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। 'যমুনা ভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। রাত্রে, ঘোরের মধ্যে সিংহদ্বারে চলে গিয়েছেন। পার্ষদরা কানে কৃষ্ণ নাম শুনিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। কালকূটের দৃষ্টিতে উঠে এসেছে দিব্যোন্মাদ অবস্থা দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়ার ঘটনাটি। সেটি হল অদ্বৈতাচার্যের পাঠানো একটি গূঢ় পত্র। পত্রটি এইরকম—

প্রভুকে কহিয় আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার।।
বাউলকে কহিও লোকে হৈল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।।
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।। *(পৃ: ১৫৬৭, ঐ)*

এসব কথার অর্থ কালকূটের কাছে ঠিক স্পষ্ট নয়। তবে এই সময়ে অর্থাৎ ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে গৌড়ে চণ্ডাল মুসলমান মিলনে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দের ধর্ম প্রচার অদ্বৈত আচার্যের মনে হয় পছন্দ হয়নি, তাই কালকূটের মনে হয়েছে ঐ তর্জায় নিত্যানন্দকে কটাক্ষ করা হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থও কালকূট অনুসন্ধান করে জেনেছেন 'এখন তুমি লীলা সম্বরণ কর। কেননা, লীলার যে প্রয়োজন তা শেষ হয়েছে। লোকে প্রেমধর্ম পেয়ে আউল বাউল অর্থাৎ পাগল হয়েছে'। *(পৃ: ১৫৬৮, ঐ)* কালকূটের মনে সন্দেহ হয়েছে দুইরকমেরই অর্থে। অদ্বৈত আচার্য নিত্যানন্দের প্রচারে অসন্তুষ্ট হবেন কেন? তিনিই প্রথম হুঙ্কার তুলেছিলেন "স্ত্রীশূদ্র মূর্খ আদি

তাদেরে'' উদ্ধারের জন্য। তাহলে? আর গূঢ় অর্থে, এটা বা কী করে সম্ভব, অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যকে তাঁর লীলা সম্বরণ করতে বলবেন? কালকূটের যুক্তিবাদী মন বিশ্বাস করতে চায় না। তবুও শেষ পর্যন্ত একটা ধারণায় পৌঁছান যে— 'শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রথার প্রচারই অদ্বৈত চাননি।' *(পৃ: ১৫৬৮, ঐ)* লেখক প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন পাঠক অন্তরে ''অদ্বৈত আচার্য কি শ্রীপাদ নিত্যানন্দর জনপ্রিয়তায় অসূয়া বোধ করছিলেন? অসম্ভব নাও হতে পারে।'' *(পৃ: ১৫৬৮, ঐ)*

কালকূট বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠ করে এই সত্যটিতে উপনীত হয়েছেন— 'দিব্যোন্মাদ মানে, শ্রীচৈতন্য পাগল হয়ে যান নি।' *(পৃ: ১৫৬৮, ঐ)* সাধারণ অবস্থায় যে সকল গ্রন্থ পাঠ শুনে তিনি আনন্দ বোধ করতেন দিব্যোন্মাদ অবস্থায়ও তিনি সে সকল গ্রন্থ পাঠ শুনেই আনন্দ লাভ করতেন। লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন ''সহজীয়া বৈষ্ণবরা দাবী করতেন, সার্বভৌম কন্যা ষষ্ঠীর সঙ্গে চৈতন্যের সহজলীলা চলতো। সেইজন্য ষষ্ঠীর বর খারাপ কথা বলত, এবং স্বয়ং ষষ্ঠীর মাতা বলতেন, জামাই না থেকে বরং আমার ষষ্ঠী রাড়ি হউক।'' *(পৃ: ১৫৬৮, ঐ)* কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই উদ্ধৃতিতে সত্যতা কতটুকু আছে তা কালকূট জানেন না। তিনি অনেক তথ্যের ধুলো ঝেড়ে প্রকৃত সত্যকে সামনে আনতে চেয়েছেন কিন্তু সবই অস্পষ্ট। কালকূট ছোট ছোট হরিদাসের আত্মহত্যাকে আবার তুলে ধরে নিজ পাঠককুলে সঞ্চালিত করে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এইভাবে— ''চৈতন্যদেব এত বড় শাস্তি দিলেন? অথচ তিনি নিজেই ষষ্ঠীর সঙ্গে সহজিয়া রস আস্বাদন করেছেন, এ আমি মেনে নিতে পারছি না।'' *(পৃ: ১৫৬৮, ঐ)*

অবশেষে কালকূট চলে গেলেন ''মুক্তিদাতার শেষ দিনটিতে। ইতিহাসের অতি নির্মম ঘোর কুটিল সেই দিন! যেদিন শ্রীচৈতন্য অন্তর্ধান করলেন। গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোই অনেক দিন থেকেই এই দিনটির অপেক্ষায় ছিল।'' *(পৃ: ১৫৬৮, ঐ)*

চৈতন্য জগন্নাথের সঙ্গে লীন হয়ে গেছেন। একথা অনেকেই বিশ্বাস করেন না। তাহলে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যেত এটা কালকূটের জিজ্ঞাস্য। কেউই তা পায়নি। ''তাই এই আকস্মিক অন্তর্ধানে গুপ্তহত্যার কথাই বারে বারে মনে আসে। অথচ গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোইর কথা কেউ তুললেন না। ওড়িয়া ঐতিহাসিকরাও এ বিষয়ে নীরব।'' *(পৃ: ১৫৬৮, ঐ)*

চৈতন্যের জগন্নাথে লীন হওয়া বলে রাজা প্রতাপরুদ্রকে প্রবোধ দেওয়া ছাড়া, হত্যাকারীদের আর কোনো রাস্তা ছিল না। প্রতাপরুদ্রের জীবিতকালেই শ্রীচৈতন্য দেহরক্ষা করেছেন। রাজার শোক অসহ্য হওয়ায় তিনি 'চৈতন্য চকোদয়' নাটক লিখে অনুষ্ঠিত করা হয়। মহাপ্রভুর ভূমিকায় সুদক্ষ 'সুন্দর অভিনেতা' তার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শ্রীচৈতন্যকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। কালকূটের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে প্রতাপরুদ্র পুরী ত্যাগ করে কটকের প্রাসাদে গিয়ে তাঁর অনুচরবৃন্দ দিয়ে

বিস্তর অনুসন্ধান করিয়েছিলেন। তাঁর নিজের জীবনও বিপন্ন হতে পারে এটা জেনেও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পুরীতে পাঠিয়ে, সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়েছিল। "কিন্তু চার মাসের মধ্যেই কি তাঁকে হত্যা করা হয়নি? উড়িষ্যার ইতিহাসে কি তার সাক্ষী নেই? প্রতাপরুদ্রের পুত্রের হত্যাকারী কে? এমন কেউ, যে উড়িষ্যার রাজসিংহাসনে আরোহন করতে চায়।" *(পৃ: ১৫৬৮, ঐ)* কালকূটের মনে অনেক প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে। তাঁর সেই প্রশ্নগুলোই, না পাওয়া উত্তরগুলোই পাঠককুলের সামনে তুলে ধরেছেন 'সে কে? গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোই? তবে কি সেই মহাপুরুষকে হত্যা করিয়েছিল? শুধু মহাপুরুষকে না তার প্রিয় নবদ্বীপের পার্ষদদেরও।" *(পৃ: ১৫৬৮, ঐ)*

চৈতন্যের আকস্মিক কথায় কালকূট বলেছেন "আমি ইতিহাসের পথে যাত্রা করেও, অসহায়! অতএব আমি আমার শেষ কথাটি প্রশ্নের আকারে রেখে যাবো।" *(পৃ: ১৫৬৮, ঐ)* কালকূট সেই নিমাই মিশ্রের সন্ধানে নবদ্বীপ থেকে নীলাচলে গিয়েছিলেন; যিনি আচণ্ডাল স্ত্রী যবনাদির, সকলের মুক্তির জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। কালকূট ইতিহাসের পথে মনভ্রমণে যাত্রা শুরু করার আগে বিস্তর কাগজের পুঁথি ঘেটেছেন, নিমাই তথা চৈতন্যের জীবনাদর্শকে ভালো করে দেখবার জন্য। 'প্রভু, কার হাতে তোমার রক্ত'। জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্যের জীবন দর্শনের শেষ খণ্ড। 'প্রেম নিত্য', 'প্রেম নিত্য, সংসার অনিত্য' এই দুটি খণ্ডে নিমাই-এর জীবন দর্শনের দুটি পর্ব আলোচনা করা হয়েছে। এটি হল নবদ্বীপ থেকে নীলাচলে গিয়ে থাকাকালীন চৈতন্যের জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক। অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। কালকূট এ'কালের মানুষ। পাঁচশ বছর আগের ঐতিহাসিক পথে হাঁটতে গিয়ে নীলাচলে প্রভুর জীবনের বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন ঘটনা সেই সময়কালের মানুষের জীবন প্রণালী, সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ তদুপরি সেই সময়কালের মানুষের মনোভাবনা সবকিছু কালকূট মনভ্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন দিক যুক্তিপূর্ণ তথ্য দিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন; তাঁর সেই চিন্তাভাবনা, আধুনিক মনের দৃষ্টিতে পদাবলী কালির আঁচড়ে তুলে ধরেছে। তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যসহ ও বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পদ রচয়িতাদের তথ্য অনুসরণ করে পাঁচশ বছর আগের একজন সাধারণ মানব নিমাই কীভাবে, কোন ভাবনায় ভাবিত হয়ে অন্তরের কোন্ মর্মবেদনার দুঃখকে প্রশমিত করতে কৃষ্ণপ্রেমে মজেছিলেন এবং ধীরে ধীরে মানব চৈতন্য কীভাবে জ্যোতির্ময় চৈতন্যে রূপান্তরিত হয়েছিলেন তারই এক জীবনালেখ্য তিনি পাঠককুলের সামনে তুলে ধরেছেন।

চৈতন্য জীবনীকার কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীদাস বৃন্দাবনের 'চৈতন্যভাগবত' ও গোবিন্দদাসের কড়চা অনুসরণ করে অতীতের পথে মনভ্রমণ করেছেন। কালকূট পূর্ববর্তী দুটি অধ্যায়ে বলেছেন নিমাইয়ের লক্ষ্মীর প্রতি প্রেম ও বিরহই কৃষ্ণ বিরহে রূপান্তরিত হয়েছিল। গভীর অন্তর্বেদনাতেই মথিত হয়ে "নিমাই অন্তর থেকে এই প্রথম শ্রীচৈতন্যরূপ ধারণ করল," "অথচ এই

গভীরতর বিকাশ কেউ দেখতে পেল না।" *(পৃ: ১৫৫৬, ঐ)* তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতে তিনি পূর্ববর্তী অধ্যায় অর্থাৎ 'প্রেম নিত্য, সংসার অনিত্য'-র এই বিষয় অর্থাৎ নিমাই-এর মধ্যলীলার যাত্রাপথে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীতে পাঠককুলকে আর এক বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

গৌড়রাজ হোসেন শাহ্‌র সময়ে রাজনৈতিক সামাজিক ধর্মীয় আচার-আচরণে কালকূট তাঁর দৃষ্টি বুলিয়ে দিয়েছেন। হোসেন শাহ্ সুশাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে রচিত 'মনসামঙ্গলে' বিজয়গুপ্ত হোসেন শাহ্‌র প্রশস্তি গেয়েছেন এইভাবেঃ

"সুলতান হোসেন শাহ্ নৃপতি তিলক
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি ।।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী ।।
রাজার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে নিত
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্‌রোড়া ওজসিম
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পুবে খণ্ডেশ্বর (ঘন্টেশ্বর)
মধ্য ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ।। *(পৃ: ১৫৫৯, ঐ)*

অনেক হিন্দু কবি আর পণ্ডিতরা হোসেন শাহের প্রশস্তি করেছেন। কিন্তু কালকূট একালের চোখে হোসেন শাহ্‌কে দেখেছেন। তিনি ১৮ বছর ধরে পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্য উড়িষ্যা ও আসামকে স্থির থাকতে দেননি। ক্রমাগত আক্রমণ করে গেছেন। উড়িষ্যার দেবদেউল ভেঙেছেন ও বিগ্রহ নষ্ট করেছেন। উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও সেনাপতি তথা গোবিন্দ ভোইয়ের সঙ্গে উড়িষ্যা দখলের জন্য হীন কুপরামর্শ করেছেন। আরও দৃষ্টান্ত আছে, সুলতান হওয়ার আগে হুসেন শাহ্ তথা সৈয়দ হুসেন গৌড় অধিপতির অধিকারী সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে কাজ করতেন। একদিন দীঘি কাটার ব্যাপারে ত্রুটির জন্য তিনি হুসেন শাহ্‌কে চাবুক মেরেছিলেন। সুলতান হওয়ার পরে তাঁর বেগম তাঁর পিঠের দাগ দেখে সুলতানের কাছে সব জেনে ক্রোধে সুবুদ্ধি রায়কে বধ করতে বলেছিলেন। কিন্তু হুসেন শাহ তাঁর একজন যোগ্য উচ্চপদে অধিষ্ঠিত রাজকর্মচারীকে হত্যা করতে রাজি হননি কিন্তু ঐ বেগমের কথাতেই সুবুদ্ধি রায়ের মুখে খাপরার জল অর্থাৎ বদনার জল দেওয়ার ব্যবস্থা করান।

ছোট ছোট কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সেই সময়কালের ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীদের সাহিত্যের রক্তমাংসের পাত্র-পাত্রীর রূপ দেন। সেইসঙ্গে পাত্র-পাত্রীর মুখে কালোপযোগী ভাষা তাদের মুখে বসিয়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারায় প্রসূত কথাবার্তা বসিয়ে দেন। তাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সেকালের সামাজিক পটপরিবেশ তুলে ধরেছেন।

চৈতন্য যখন নীলাচলে যাত্রা করেছিলেন যখন হুসেন শাহ্ উত্তর উড়িষ্যা আক্রমণ

করেছিলেন সেই সময়ে উড়িষ্যারাজ দক্ষিণে বিজয়নগরে কৃষ্ণদেবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। গৌড় সীমান্তের দায়িত্ব ছিল গোবিন্দ ভোই-এর উপর। উড়িষ্যার সিংহাসনের উপর লোভ তাই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। নিজের দেশকে অন্যের হাতে তুলে দিতেও বাধেনি। কিন্তু হুসেন শাহ্‌কে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেও পারেন নি। পুরুষোত্তমকে ধ্বংস করতে পারে এই আশঙ্কায় পুরুষোত্তমকে সরিয়ে ব্রাহ্মণ আর বৌদ্ধদেরও প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন।

কালকূট সেকালের এই ঘটনাকে একালের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন— "ধর্মান্ধতা এমন বস্তু, তখন দেশপ্রেম উড়ে যায়। আমরা এ যুগের মানুষরা আজও দেখি দলের প্রতি আনুগত্যের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো দেশপ্রেম ভুলতে বসেছে। তাদের কাছে দল হলো একরকমের ধর্ম, এবং সেখানেই তাদের ধর্মান্ধতা। অথচ পুরীর ব্রাহ্মণ আর বৌদ্ধরা ভেবে দেখলো না, প্রতাপরুদ্র হেরে গেলে, জগন্নাথদেবকেও হারাতে হবে।" *(পৃ: ১৫৬০, ঐ)* চৈতন্য বাংলা-উড়িষ্যা সীমান্ত অঞ্চল ছত্রভোগে যখন পৌঁছেছিলেন তখন দুটি দেশের মধ্যে ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা। সেই সময়ে চৈতন্য নদীপথে কীর্তন করতেন ও পদব্রজে তাঁর পার্ষদসহ পুরুষোত্তমে পৌঁছিয়েছিলেন। কালকূট প্রথম থেকে গোবিন্দ ভোই-এর উপরে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন; বিশ্বাসঘাতক সে, বিশ্বাস কী করে করবেন? লেখক দেখেছেন গোবিন্দ ভোই-এর মনের কদর্যতা। তাঁর মনে হয়েছে নিমাই ছত্রভোগ সীমান্ত দিয়ে পুরুষোত্তমে আসছেন জেনেও বাধা দিতে পারেন নি রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য এবং তিনি যদি বুঝতেন এই তরুণ সন্ন্যাসীই কালক্রমে প্রবলশালী হয়ে রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রিয়পাত্র হবেন তবে তিনি চৈতন্যকে পুরুষোত্তমে আসতে দিতেন না। রাজা প্রতাপরুদ্র শুধু বড় যোদ্ধাই ছিলেন না, অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। তাইতো তিনি গোবিন্দ ভোইকে লোক পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিলেন, "তুমি আমাকে সরিয়ে কাকে রাজা করছো? গোবিন্দ ভোই বুঝল, 'তাই তো'।" এইরকম ছোট ছোট প্রয়োজনীয় সাধারণ অথচ বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তার মধ্য দিয়ে কালকূট রাজা প্রতাপরুদ্র ও গোবিন্দ ভোইকে তাঁর কথা সাহিত্যের অংশীদার করেছেন।

চৈতন্য নীলাচলে পৌঁছে জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে জগন্নাথকে কোলে নিয়ে লাফ দিতে গিয়ে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ দর্শনে এসে মারমুখী পাণ্ডাদের হাত থেকে চৈতন্যকে রক্ষা করে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন নিজ অনুচরদের সাথে। রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন। কালকূট বাসুদেব সার্বভৌমকে তাঁর দৃষ্টিপথে এনেছেন অত্যন্ত রাজসিকভাবে। কথাবার্তা, চালচলনে একটা শ্রদ্ধা যুক্তভাবে চিত্রিত করেছেন। তিনি অতিথিপরায়ণও বটে। বাসুদেব সার্বভৌম এত কম বয়সে চৈতন্যের সন্ন্যাস নেওয়াটা মেনে নিতে পারেন নি। তিনি তাকে বুঝিয়েছেন তারই একটা কথপোকথন আগেই বলা হয়েছে।

সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালকূটের কাছে বৈপ্লবিক। কালকূট

চৈতন্যের সঙ্গে ভ্রমণে চলতে গিয়ে তাঁর মনের একটি ছোট্ট অথচ গুরুত্বপূর্ণ আশাকে জিইয়ে রেখেছিলেন। দাদা বিশ্বরূপের সন্ধান পাবার জন্য তাঁর মন উৎসুক ছিল; দাক্ষিণাত্যের একটি মন্দিরে বিশ্বরূপ মারা গিয়েছিলেন। চৈতন্য সেখানে গিয়েছিলেন বিশ্বরূপের মৃত্যুর পরে। কালকূটের চৈতন্যকে অনুসরণ করতে করতে চৈতন্যের ভ্রমণের পাশাপাশি যেসব মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে, যে ধর্মের যেসব কূট আলোচনা হয়েছে সেগুলোও তাঁর কাহিনীতে তুলে এনেছেন। তাঁর ভ্রমণের কাহিনীকে গতিময় করেছেন। মানব চৈতন্যের জ্যোতির্ময় চৈতন্যে রূপধারণের যাত্রাপথের যেসব ঘটনাবলী কালকূট চিত্রিত করেছেন তা ধীরে ধীরে কথাসাহিত্যের রূপ নিয়েছে।

নবদ্বীপে তিনি ছিলেন কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণের অবতার। নবদ্বীপের বৈষ্ণবরা চৈতন্যকে রাধা অবতারের দিকে মুখ ফেরাতে দেয় নি। কিন্তু গোদাবরী তীরে গিয়ে রায় রামানন্দের কাছে তিনি রাধার অবতারের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। চৈতন্য ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠিয়েছিলেন প্রচারের জন্য। নিত্যানন্দ নবদ্বীপে যে ধর্মপ্রচার করেছিলেন সেই গৌড়ীয় ব্যাখ্যার সঙ্গে চৈতেন্যর রাধা অবতারের কোন মিল নেই। রামানন্দ নিজেকে শূদ্র ভেবে সঙ্কুচিত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যকে আলিঙ্গন করতে। কিন্তু চৈতন্য তাঁকে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন "কি ব্রাহ্মণ, কি সন্ন্যাস, শূদ্রাদি সবই এক। যে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সে-ই গুরু হতে পারে। জাতের বিচার নেই।" *(পৃ: ১৫৬২, ঐ)* তিনি তো আচণ্ডাল উদ্ধারের জন্য সমাজ পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন। প্রচার করেছেন স্ত্রী-পুরুষ সমান। আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে চৈতন্য সমাজ পরিবর্তনের জন্য বৈপ্লবিক আহ্বান করেছিলেন। তার সেই উত্তাপ আহ্বান তিনি সারা ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে উত্তর প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বৌদ্ধ-পাঠান-মুসলমান-শাক্ত-শৈবদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। কুখ্যাত দস্যু পন্থভীল আর নারোজীকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। বেশ্যাদেরও উদ্ধার করেছিলেন বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করিয়ে।

কালকূটের মনে এইখানেই একটি সংশয়ের দ্বন্দ্ব চলেছে। "চৈতন্যদেব যে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার চেয়েছিলেন, আজ আর তার কিছুই নেই। এখন যেন মনে হয় আসল বৈষ্ণব ধর্ম চলে গিয়ে, আবর্জনা আর জঞ্জালের স্তূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।" *(পৃ: ১৫৬২, ঐ)*

দাক্ষিণাত্য বিজয় করে চৈতন্য নীলাচলে ফিরে এসেছিলেন। চৈতন্যর দাক্ষিণাত্য বিজয়কে ভক্তরা তেমন গুরুত্ব দেয়নি, তার অলৌকিকত্ব চেয়েছিলেন এটা অনুভব করে কালকূটের মনে হয়েছে "ভবিষ্যতের পক্ষে এটাই হলো এক রকমের ব্যর্থতা। যদি সবাই দাক্ষিণাত্য জয়ের বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো, তবে অনেকে সে পথে যাত্রা করতো। সে তো দূরের কথা, তেমন আমল না দেওয়াতে, ভবিষ্যতের ইতিহাসে বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীচৈতন্যের অবদানের মূল্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা নিজেরাই কোনোদিন বুঝতে পারেন নি।" *(পৃ: ১৫৬২, ঐ)*

সন্ন্যাস নেওয়ার পঞ্চম বর্ষে নিমাই বৃন্দাবনে যাত্রা করলেন। এ সংবাদ পেয়ে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর যাওয়ার পথে পথে তোরণ, ঘাটে ঘাটে, গ্রামে গ্রামে বিশেষ ব্যবস্থা এ'কথা পূর্বেই চৈতন্যর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। তবু পুনরায় উল্লেখ করা হল লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরার জন্য। রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যের জন্য এত আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করায় কালকূট দেখেছেন এ ব্যাপারটি একজন ভালো চোখে দেখছে না। লোকটি ভুরু কুঁচকে রুষ্টমুখে সবকিছু দেখছে। তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে। কেন রাজার এত শ্রদ্ধাভক্তি কিসের এই বাঙালি সন্ন্যাসীটির ওপর? তার মনে ক্রূরতা জেগেছিল। লোকটি যে চৈতন্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠছে সে খবর জানেন না তা নয়। লেখক বলিষ্ঠ ভাষায় তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র জানতেন, গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে এবং নিজের হাতও রক্তাক্ত করতে পারে। তবু তার উপায় ছিল না, গোবিন্দ বিদ্যাধরকে সরাতে। কালকূট দৃষ্টি রেখেছেন, গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোই-এর মনের ভিতরে উঁকিও দিয়েছেন। ধর্মীয় সংঘগুলো গোবিন্দ ভোই-এর প্রতি সদয়, তাঁদের ক্ষেপিয়ে তুলে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। রাজ্যের চারিদিকে গুপ্তঘাতক আর গুপ্তচর ছড়িয়ে রেখেছিলেন। চৈতন্যের প্রতি রাজার এত শ্রদ্ধাভক্তি তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। মনে মনে "শ্রীচৈতন্যের প্রতি সে বৈরী মনোভাব আর ঈর্ষা পোষণ করতে লাগল। আর এটা ঘটনা সকলের অলক্ষ্যে। কিন্তু আমার চোখে আঙুল দিয়ে ইতিহাস দেখিয়ে দিল। কারণ ইতিহাসের গতি বড় নির্মম, আর বিস্ময়কর আঁকাবাঁকা ক্রূর কঠিন নির্দয়।" *(পৃ: ১৫৬৩, ঐ)*

রাজা প্রতাপরুদ্রকে যুদ্ধ বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেটা পালন করে প্রতাপরুদ্র তাঁর রাজ্যে দক্ষিণ দিকে শান্তি স্থাপন করেছিলেন। এটা বিদ্যাধর ভোই মেনে নিতে পারেন নি। তিনি মনে মনে প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছিলেন। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানে লেখক তাঁর দিকেই অঙ্গুলি তুলেছেন।

কালকূট চৈতন্যের চলার পথে পথে দেখেছেন চৈতন্য কীভাবে শ্রীচৈতন্য প্রভু হয়ে গেলেন। তাঁর অন্তলীলা দর্শনের সাথে সাথে সেকালের সমাজ জীবন, রাজনৈতিক জীবন, প্রতিহিংসা, বিশ্বাসহীনতা, গুপ্তহত্যা সব প্রত্যক্ষ করেছেন। চৈতন্যের জীবন দর্শনের সাথে সাথে সেকালের রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবিও তুলে ধরেছেন। চৈতন্যের জীবনকাহিনী জীবনীসাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাঁর সাবলীল লেখার মধ্য দিয়ে কথাসাহিত্যের রূপ নিয়েছে। জীবনী সাহিত্য না হয়ে কথাসাহিত্যের পথে উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

চৈতন্যের অন্তর্ধান বিষয়ে কালকূট অনেক তথ্য, সংকেত খোঁজাখুজি করেছেন। বৃন্দাবন দাস, কবিরাজ গোস্বামী এঁরাও কেউ চৈতন্যের তিরোধান বিষয়ে কিছুই লেখেন নি। জয়ানন্দ

বলেছেন, 'আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয় নাচিতে/ইটাল বাজিল বাম পাত্র আচম্বিতে/সেই লক্ষ টোটায় শয়ন অবশেষে।' *(পৃ: ১৫৬৮, ঐ)* তারপরেই গরুড়ধ্বজ রথে চড়ে শ্রীচৈতন্যদেবের চলে যাওয়াকে কালকূট মেনে নিতে পারেন নি। তিনি তার জিজ্ঞাসা পাঠকমনেও তুলে দিয়েছেন। সেই দিনটি কি '১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন?' লেখক চৈতন্যের সন্ধানে যে ইতিহাসের পথ ধরে যাত্রা শুরু করেছিলেন সে পথে হরিদাসের সমাধি আছে পুরীতে কিন্তু চৈতন্যের কোন সমাধি পুরীতে নেই। তার মনে আরও প্রশ্ন — চৈতন্যদেবের পারিষদবর্গ সব কোথায় গেলেন? কিছুই জানতে পারেন নি? তাঁদের সমাধি কোথায়? কবি লোচনদাস বলেছেন, গুন্ডিচা বাড়িতে শ্রীচৈতন্যদেব তিরোহিত হয়েছেন। কালকূট বলছেন সেখানেও তাঁর সমাধি নেই। একজন আধুনিক পণ্ডিত অনুমান করেছেন পায়ে ইট বিঁধে ক্ষত হয়েছিল। তারপর জ্বরে ভুগে ভুগে শ্রীচৈতন্য গদাধর পণ্ডিতের আশ্রয়ে দেহরক্ষা করেন। গদাধর পণ্ডিতের আশ্রমেও সমাধি নেই। অবশেষে কালকূট ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হন। ''ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, রাজা প্রতাপরুদ্র জীবনে রাজকার্যে অমনোযোগী হয়ে, মহাপ্রভুর সঙ্গে কেবল ধর্মচর্চা করাতে, রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রাজা যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করে, প্রভুর কৃপাপ্রার্থী হয়ে ধর্মে মন দিয়েছিলেন। এতে রাজ অমাত্যরা অসন্তুষ্ট হয়েছিল। এদিকে জগন্নাথ দেবের পাণ্ডারা দেখলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ দেব অপেক্ষা মহাপ্রভুকেই অধিক সম্মান দিচ্ছেন, অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছেন। সুতরাং মহাপ্রভুকে গোপনে হত্যা করলেই রাজ্য রক্ষা পায়, আর জগন্নাথদেবের প্রতি রাজার ভক্তি ফিরে আসবে। গুপ্ত হত্যার কারণ সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক।

কিন্তু সেটাও অনুমান কী। আসল ঘটনা কি ঘটেছিল? আমি সেই ভয়ানক অন্ধকারের ইতিহাসকে আলোয় দেখতে চাই।'' *(পৃ: ১৫৬৮, ঐ)*

কালকূট ইতিহাসের পথে যাত্রা করেও কোন তথ্যই খুঁজে পাননি। তবে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের দিনের কিছু প্রশ্ন তিনি পাঠককুলের কাছে রেখেছেন।

''আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে বেলা তৃতীয় প্রহরে রবিবারে কি জগন্নাথদেবের মন্দিরের সকল দরজা বন্ধ ছিল? এবং রাত্রির নবম প্রহর পর্যন্ত বন্ধ ছিল? এই দীর্ঘসময়, এরকম অভূতপূর্ব ঘটনা কি ঘটেছিল? সেইসময়ে মহাপ্রভু কি তাঁর পার্ষদদের নিয়ে মন্দিরের মধ্যে ছিলেন? অথবা তাঁদের জোর করে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?'' *(পৃ: ১৫৬৯, ঐ)*

কালকূট উড়িষ্যার ঐতিহাসিকদের কাছে আবেদন করেছেন প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করতে। 'চৈতন্য বাঙালি মায়ের গর্ভে জন্মালেও পৈতৃক পরিচয়ে তিনি ওড়িয়া ছিলেন।' *(পৃ: ১৫৬৯, ঐ)*

কালকূট অবশেষে শচীমাতার দিকে চোখ ফিরিয়েছেন। স্বামী মারা গেছেন, বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেছে। সর্বাপেক্ষা প্রিয় নিমাই ইতিহাস সৃষ্টি করে গেল; কালকূটের ধারণা একমাত্র

শচীমাতাই তাঁর হৃদয়ে অনুভব করতে পারবেন "কে বা কারা, তোমার নিমাইকে চিরকালের তরে কোথায় রেখে দিয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে খুঁড়ে আর আমরা তাকে পাবো না।" *(পৃ: ১৫৬৯, ঐ)*

"নিমাই! তুমি শ্রীচৈতন্য হও, আর যেই হও, আমার চোখে তুমি মহাপ্রেমিক। লক্ষ্মীর মৃত্যুই তোমাকে পথের দিশা দিয়েছিল। কিন্তু তাদের হাতে তোমার রক্ত লেগে রইল? আমরা কি সেইসব রক্তাক্ত হাতে এখনও পূজার ডালি সাজিয়ে দিই?" *(পৃ: ১৫৬৯, ঐ)*

কালকূট গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোই আর মন্দিরের পাণ্ডাদের দিকে এই ঘটনার জন্য দায়ী করেছেন। কিন্তু এত সবের মধ্যে কালকূট নিমাই থেকে শ্রীচৈতন্যে রূপান্তরিত হওয়া, শ্রীচৈতন্য যে জ্যোতির্ময় চৈতন্যে রূপান্তরিত হয়েছেন তার প্রেরণা দাত্রী হিসাবে লক্ষ্মীকে চিহ্নিত করেছেন। লক্ষ্মীর মৃত্যুই নিমাই-এর মধ্যে 'প্রেম নিত্য', 'প্রভু, কার হাতে তোমার রক্ত' এই বোধগুলো জাগিয়ে তুলে মানবচৈতন্যকে জ্যোতির্ময় চৈতন্যে রূপান্তরিত করেছে, মহান প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে লক্ষ্মীর বিরহে।

কালকূট নিমাইকে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন— "এই জগৎ উদ্ধারিতে ফিরে এস নবরূপে। পাপ ও অবিচারের ভারে অসহনীয় পৃথিবী আজ তোমার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।" *(পৃ: ১৫৬৯, ঐ)*

কালকূটের সত্যসন্ধানী, যুক্তিবাদী মন আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছে। জীবনী সাহিত্যকে জীবনী সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মনভ্রমণের মধ্য দিয়ে কাহিনীকে উপন্যাসের পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছেন। স্বয়ং নিমাই, শ্রীচৈতন্য রূপে, কৃষ্ণের অবতার হয়ে ধীরে ধীরে জ্যোতির্ময়তার দিকে এগিয়ে গেছেন, কালকূটের কাহিনীও ধীরে ধীরে উপন্যাসের দিকে এগিয়ে গেছে।

যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' লিখতে গিয়ে কালকূট ওরফে সমরেশ বসু পুরাণপথে মনভ্রমণে এবার চলেছেন মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত রণভূমিতে — "আমি সেদিন কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত, ৫০৮৩ বছর আগের অগ্রহায়ণ মাসের সেদিন অমাবস্যা। আমি উপস্থিত হয়েছি, শুক্লা ত্রয়োদশীর দিনই। সেই যুদ্ধারম্ভের দিনে।" *(পৃ: ১৩১২, কালকূট রচনা সমগ্র, ৩য় খণ্ড)* আসলে যুদ্ধের প্রথম দিনে উপস্থিত হতে না পারলে শেষ দিনের ইতিহাস অস্পষ্ট থেকে যাবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রতিটি ঘটনা মুহূর্তকে তিনি যেন মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন ও বর্তমানকালের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই মহাযুদ্ধের ঘটনাবলী বিচার বিশ্লেষণ করে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। মহাযুদ্ধের কারণগুলি অনুসন্ধান করেছেন, সেই যুদ্ধে রথী, মহারথীদের জয়-পরাজয়-মৃত্যু-হর্ষ-বিষাদ সবকিছু প্রত্যক্ষ করতে করতে তিনি এগিয়ে চলেছেন, — "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ দিনের রাত্রে। যে রাত্রে ঘটেছিল এক ভয়াবহ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। সেই হত্যাকাণ্ডের নায়ক দ্রোণাচার্য পুত্র অশ্বত্থামা। কিন্তু সেই রাত্রে যাবার আগে, মূলের কিছু ঘটনা জটিল জালের ভিতর

থেকে বের করে আনতে পারলে অনেক কিছুই পরিষ্কার হতে পারে। তবে, যা কিছু উদঘাটন সবই যুক্তি-তর্ক সাপেক্ষ।" *(১৩০৬, ঐ)*

'সেই হত্যাকাণ্ডের' কাহিনি শোনাতেই কালকূট এবারের অতীত ভ্রমণ করে লিপিবদ্ধ করেছেন 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' তে। ১৯৮২ সালের শারদীয়া সংখ্যায় 'প্রসাদ' পত্রিকায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৮৪ সালের আগস্ট মাসে এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই কাহিনিতে দেখা যায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ দিনের করাল রাত্রিটি ছিল অগ্রহায়ণ মাসের ঘোর অমাবস্যার রাত্রি। কুরু-পাণ্ডবের অস্ত্রশিক্ষা গুরু দ্রোণাচার্য পুত্র অশ্বত্থামা তাঁর পিতৃহন্তারক ধৃষ্টদ্যুম্ন তথা পাঞ্চালদের প্রতি মনে মনে তীব্র ঘৃণা আর ক্রোধ নিয়ে পাণ্ডব শিবিরে সেই রাতের অন্ধকারে নিশাচর প্রাণী পেচক বা উলুকের ন্যায় ঘুমন্ত, অস্ত্রহীন, রথহীন, বাহনহীন রাজপুরুষ যোদ্ধাদের হত্যা করেছিলেন। অশ্বত্থামা সর্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত অবস্থায়, ভয়ংকর এক প্রাণীর মত প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে জ্বলতে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ আর বিরাটরাজার পুত্র-পৌত্র সকল, সৈন্য সকল, হস্তী-অশ্ব সকলকে নির্বিচারে হত্যা লীলায় মেতেছিলেন। এই হত্যালীলায় দ্রুপদ রাজার দৌহিত্র, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায় নি।

কালকূট মানস ভ্রমণে সবই প্রত্যক্ষ করেছেন। দেখেছেন কী তীব্র মনোবেদনা অশ্বত্থামার অন্তরে। হত্যালীলায় মেতে ওঠার আগে অশ্বত্থামার মানসিক অবস্থা কেমন ছিল তা কালকূটের ভাষায় দেখে নেওয়া যাক্— "আমি এখন অস্ত্রহীন, দুর্বল, অসহায়। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে সহস্র ফণা আগুনের শিখার মত দংশন করছে। আমার পিতার চিরশত্রু পাঞ্চালদের আমি কখনই নিষ্কৃতি দেব না। যে আমার যোগে সমাহিত পিতার শিরচ্ছেদ করেছে, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে আমি কখনই নিষ্কৃতি দেব না। আমি সমস্ত পাঞ্চালদের বিনাশ করবই।" *(পৃ: ১৩২৩, ঐ)* কালকূট অশ্বত্থামার মানসিক যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি দেখেছেন, অশ্বত্থামা তাঁর মাতুল কৃপাচার্য ও কৃপবর্মার কোন উপদেশ, অনুরোধ কোন কিছু মানতে চাননি। কোন্‌টা ধর্ম আর কোন্‌টা অধর্ম, সেটা অশ্বত্থামা ভালো করেই জানেন। কালকূট তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছেন, সেই হেমন্তের করাল রাতে কৃপাচার্য অশ্বত্থামাকে তার ক্রোধ সংবরণ করার জন্য বলেছেন— "অশ্বত্থামা, তুমি কল্যাণকর বিষয়ে আত্মদমন করে আমার কথা শোন। নইলে পরে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে। ঘুমন্ত, অস্ত্রহীন, রথহীন, বাহনহীন, শরণাগত আর মুক্তকেশ ব্যক্তিদের হত্যা করা অত্যন্ত অধর্ম। পাঞ্চালগণ আজ একটু পরেই কবচ খুলে, মরার মত ঘুমাবে। যে তাদের ঐ অবস্থায় হত্যা করবে, সে পামর ছাড়া কিছু নয়।" *(পৃ: ১৩২৩, ঐ)*

উত্তরে কৃপাচার্যকে ক্রোধোন্মত্ত অশ্বত্থামা বলেছেন "পাণ্ডবদের দ্বারা ধর্মের সেতু শতভাবে ছিন্নভিন্ন হয়েছে। ধর্মের কথা আর আমি শুনতে চাই না। আপনি কেন সেই অধার্মিক পামরদের

নিন্দা করছেন না? আমি কোন কথা শুনব না। আজ আমি এই রাত্রে, পিতৃহন্তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করব। তাতে যদি আমাকে কীট অথবা পতঙ্গযোনিতে জন্মাতে হয়, ক্ষতি নেই। আমাকে আটকাবে, এমন ক্ষমতা আজ ভূমণ্ডলে কারোর নেই।" *(পৃ: ১৩২৩, ঐ)* কালকূট প্রতিহিংসাকামী অশ্বত্থামার অন্তরে অনেক আগেই উঁকি দিয়েছেন। কালকূটের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে অশ্বত্থামার অন্তর্বেদনা। ন্যায় যুদ্ধে তাঁর পিতা দ্রোণাচার্য প্রাণত্যাগ করেছেন তাতে তাঁর শোক নেই। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর পিতার শিরচ্ছেদ করেছেন অন্যায়ভাবে— যখন তাঁর পিতা যোগবলে প্রাণত্যাগ করেছেন তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন জাত ক্রোধ বশতঃ তাঁর পিতার গলা কেটেছিল। লেখক কালকূটের চোখে অশ্বত্থামার যন্ত্রণাটা ধরা পড়েছে। কালকূট অশ্বত্থামার সেই শোক জর্জরিত কথা যেন শুনেছেন— "আমি থাকতেই যখন আমার পিতার এমন অবস্থা হল, তখন অন্য লোকে আর কি জন্য পুত্র কামনা করবে? ধৃষ্টদ্যুম্ন জানে না আমি কে।" *(পৃ: ১৩২০, ঐ)* দ্রোণাচার্য-এর শিষ্য পাণ্ডবরা অকৃতজ্ঞের মত গুরুকে কূটযুদ্ধে হত্যা করতে দ্বিধা করে নি। অশ্বত্থামার মনে শোকের ঝড় আর প্রশ্ন উঠেছে— "তা হলে ন্যায় সত্য ইত্যাদির কী মূল্য আর রইল?" *(পৃ: ১৩১৯, ঐ)*— দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা বীর যোদ্ধা। ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও ক্ষত্রিয়ের মত জীবনযাপন। তাঁর পিতা দ্রোণের সৈনাপত্যে পাণ্ডব-পাঞ্চালরা যখন ধ্বংস হতে বসেছিল, সেই সময়ে কৃষ্ণ কূট কৌশল গ্রহণ করেছিলেন দ্রোণাচার্যকে হত্যা করার জন্য। তাঁর পিতাকে হত্যা করার জন্য পাণ্ডব-পাঞ্চালরা অতি নীচ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। কালকূট অশ্বত্থামার মনে মনে আউড়ে যাওয়া বেদনামথিত হিংসা জরজর কথা শুনতে পেয়েছিলেন। কালকূট শুনছেন অশ্বত্থামা বলছেন পাণ্ডবদের সম্বন্ধে " তাদের (পাণ্ডবদের) শঠতার কোন তুলনা নেই।" *(পৃ: ১৩২২, ঐ)* পাণ্ডবদের কূট-কৌশলে অশ্বত্থামা ক্ষিপ্ত হয়ে কৃতবর্মাকে প্রশ্ন করেছিলেন। — "ক্ষত্রিয়ের হয়ত তাই উচিত কাজ, শত্রু অতি বলশালী হয়ে উঠলে কূটযুদ্ধের আশ্রয় নেওয়া তাঁদের কাছে অপরাধের নয়। এই যদি সত্য হয়, আর তা বাসুদেবের পরামর্শক্রমে, তবে আর পাপ-পুণ্যের কী অবশিষ্ট রইল?" *(পৃ: ১৩১৯, ঐ)* কালকূট অশ্বত্থামার যন্ত্রণার মূল সুরটাকে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখেছেন অমাবস্যার আগের দিন, দুপুরে শল্যরাজ নিহত, তার সঙ্গে দুর্যোধন মাতুল শকুনিও। এই ঘটনার পরে দুর্যোধন যখন দেখলেন তাঁর পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই, সৈন্য সামন্ত সব প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। দুর্যোধনও বিপদ আসন্ন বুঝে নিজের ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পুবদিকে দ্বৈপায়ন হ্রদে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য। মনে ক্ষীণ আশা— যদি পাণ্ডবদের হাত থেকে বাঁচতে পারেন, তবে আবার সৈন্য সংগ্রহ করে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে নিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে আর একবার শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবেন।

কালকূট দেখছেন এগারো অক্ষৌহিণী সেনানায়কের কী করুণ মানসিক অবস্থা। সকলকে

মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া হয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদের মধ্যে জলস্তম্ভ করে তার মধ্যে লুকিয়ে আছেন। ভারতকথায় 'হ্রদ মধ্যে জলস্তম্ভ' এমনটিই বিবৃত আছে। তিনি এতে তাঁর আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছেন। "সম্ভবত দ্বৈপায়ন হ্রদ অর্থাৎ দ্বীপযুক্ত হ্রদে এমন কোনো গোপনীয় জায়গা ছিল, যেখানে লুকিয়ে থাকলে সহজে দেখা বা ধরা যায় না।" *(পৃ: ১৩১৪, ঐ)*

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এমনই যে, পলায়নরত কুরুপতি দুর্যোধনের হ্রদে প্রবেশের পূর্বে সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সঞ্জয় অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে দুর্যোধনের খবর দিয়ে দিল। সাত্যকি সঞ্জয়কে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু কোথা থেকে ব্যাসদেব এসে হাজির হয়ে সঞ্জয়কে হত্যা করতে নিষেধ করাতে সঞ্জয় বেঁচে গিয়েছিলেন।

অমাবস্যার আগের দিন, শল্যরাজ নিহত হওয়ার পর থেকে অমাবস্যার দিন অপরাহ্ন পর্যন্ত কৃষ্ণসহ পাণ্ডবরা ও তাদের গুপ্তচরবৃন্দ সকলে হন্যে হয়ে দুর্যোধনকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। না পেয়ে অবশেষে চিন্তিত মনে শিবিরে ফিরে গেছেন। সেই অবকাশে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা যখন দুর্যোধনকে ডেকে কথা বলছিলেন, তখন ভীমের জন্য মাংস-জোগাড়ে-ব্যাধরা হ্রদের আর এক প্রান্তে মাংস ধুয়ে পরিষ্কার করছিল। তারাই প্রথম জানতে পেরেছিল — দুর্যোধন কোথায় লুকিয়ে আছেন। কেন না তারা দুর্যোধন ও অশ্বত্থামার কথা শুনতে পেয়েছিল। ব্যাধরা এ খবর জানতে পেরেই প্রথমে ভীমের শিবিরে উপস্থিত হয়ে দুর্যোধনের সংবাদ দিল। পাণ্ডব শিবিরে দাবানলের মত খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। কৃষ্ণসহ পঞ্চপাণ্ডব, সৈনিকরা, নিষাদ ও যত চাষাভুষো সকলে দুর্যোধনের কী গতি হয় তা দেখবার জন্য দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে উপস্থিত হলেন। এমন সময়ে নানা তীর্থ ঘুরে বলরামও সেখানে উপস্থিত হলেন।

কালকূট অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে দুর্যোধনের শেষ গতির আগের মুহূর্ত চিত্রিত করেছেন। কালকূটকে অনুসরণ করলেই ঘটনাবলী বোঝা যাবে। যুধিষ্ঠির ক্ষাত্র ধর্মের গুণগান করেও দুর্যোধনকে নানা ভাষায় কটুক্তি করে ডাকতে লাগলেন। ভাষাগুলো একটু লক্ষ্য করা যাক্। —"এখন আমরা শুধু তোমাকেই চাই। আমরা শত্রুর শেষ রাখতে চাই না। তুমি বেরিয়ে এসো।" *(পৃ: ১৩১৬, ঐ)*

"আমি এমন *(পৃ: ১৩২২, ঐ)* মূর্খ নই তোমাকে জীবিত রেখে সিংহাসনে গিয়ে বসব। তুমি রাজ্য দেবার কে? তুমি যুদ্ধ চেয়েছিলে, আজ তোমার সেই যুদ্ধের আশ মিটিয়ে ছাড়ব।" *(পৃ: ১৩১৬, ঐ)* "তুমি যদি প্রকৃতই ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসজাত সন্তান হও, তবে উঠে এসে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।" *(পৃ: ১৩১৬, ঐ)* আরও কথা "দুরাচার নিকৃষ্ট কাপুরুষ।" *(পৃ: ১৩১৬, ঐ)*

কালকূট দেখলেন, অবশেষে দুর্যোধন উঠে এসেছিলেন ভেজা গায়ে। একা রণক্লান্ত, আহত, ক্ষতবিক্ষত শরীরে যুদ্ধনীতি পরিবর্তন করতে বলেছিলেন। এত কদর্য ভাষায় যুধিষ্ঠির গালাগাল

করেও দুর্যোধনকে সুযোগ দিয়েছিলেন, মাটিতে দাঁড়িয়েই লড়াই হবে। পাণ্ডবদের মধ্যে যেকোন একজনকে বেছে নিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে হারাতে পারলেই "তোমার রাজ্য আবার তোমাকে ফিরিয়ে দেব।" *(পৃ: ১৩১৬, ঐ)*

দুর্যোধন সুযোগটা নিয়ে গদাযুদ্ধে ভীমকে আহ্বান করেছিলেন। গদাযুদ্ধে দুর্যোধনই সেরা। প্রায় পরাজিত করেই ফেলেছিলেন। যদি না কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন "উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞার" *(পৃ: ১৩১৬, ঐ)* ইশারা না করতেন। ইশারা বুঝেই ভীম সুযোগ বুঝে দুর্যোধন উঁচুতে লাফ দেওয়া মাত্র তাঁর গদা ছুঁড়ে দুর্যোধনের হাটু ভেঙে দিলেন। তিনি আর উঠতে পারলেন না। এরপর ক্রুদ্ধ ভীম বা'পায়ে দুর্যোধনের মাথায় আঘাত করলেন এই বলে "তুই রজঃস্বলা দ্রৌপদীকে সভার মধ্যে এনে উলঙ্গ করেছিলি। আমাদের গরু বলেছিলি এই নে তার জবাব।" *(পৃ: ১৩১৬, ঐ)* নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড কালকূট প্রত্যক্ষ করছেন অতীত অন্বেষণে। যুধিষ্ঠির এই ঘটনাতে প্রতিবাদ করেছিলেন "ভীম এটা ঠিক কাজ হল না। এটা অধর্ম।" *(পৃ: ১৩১৬, ঐ)* এই অন্যায় যুদ্ধে বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমকে মারতে ছুটে গিয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁকে শান্ত করলেন। মৃত্যুপথযাত্রী দুর্যোধন শরীর সামান্য তুলে কৃষ্ণকে ডেকে বললেন, "ওহে কংসের দাস-তনয় অনার্য কৃষ্ণ, তোমার কথাতেই ভীম অন্যায় যুদ্ধে আমার উরু ভেঙেছে। তুমিই এই অধর্ম যুদ্ধের সংকেত দিয়েছ, তোমার কি একটু লজ্জা করছে না? তোমার অন্যায় পরামর্শেই, আমাদের পক্ষের বীরেরা একে একে মারা গেছেন। তুমি নীচাশয়, পিতামহ ভীষ্মের সামনে শিখণ্ডীকে এগিয়ে দিয়েছিলে। 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' এই মিথ্যা কথা শোনাবার পরামর্শ দিয়ে তুমিই দ্রোণকে নিরস্ত্র করেছিলে।" *(পৃ: ১৩১৭, ঐ)*

কৃষ্ণ দুর্যোধনকে লোভী, দুরাত্মন, ষড়যন্ত্রীকারী ইত্যাদি বললেন। তবু 'অন্যায় যুদ্ধে জয়ী' এই কথাটা পাণ্ডবরা ভুলতে পারলেন না। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের এর সপক্ষে নানা যুক্তি দিলেন "কূট যুদ্ধ ছাড়া তোমাদের জয়লাভের কোনো আশা ছিল না।" *(পৃ: ১৩১৭, ঐ)* ভীম দুর্যোধনকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করে কিছুমাত্র অন্যায় করে নি। কালকূট সবই মহাভারতের পাতায় তাঁর অন্তদৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করলেন। দুর্যোধন রক্তাক্ত কলেবরে দুই জানু ভেঙে মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছেন আর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন। এরকম জীবিত-মৃত অবস্থায় দুর্যোধনকে ফেলে রেখে পাণ্ডব-পাঞ্চালরা কৃষ্ণসহ শিবিরে ফিরে গেলেন।

এরপরে, অন্ধকার নেমে এসেছে, এমন সময়ে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা এই তিনজনে ধুলুণ্ঠিত রাজা দুর্যোধনকে এ'রকম অসহনীয় অবস্থায় দেখে অশ্বত্থামা নিজে কান্না সংবরণ করতে পারলেন না। মৃত্যুপথযাত্রী দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে সান্ত্বনা দিলেন এই বলে "সংসারে কিছুই বিনাশ-শূন্য নয়। আমিও নই। আমি সকলকে দুঃখে টেনে এনেছি। তাঁরা যেভাবে নিহত হয়েছেন, আমিও সেইভাবে নিহত হয়েছি। আমার মনে আর কোনো দুঃখ নেই। তোমরাও দুঃখ করো না।"

(পৃ: ১৩১৭, ঐ) লেখক কালকূট, অভিমানী-দর্পিত মৃত্যুপথযাত্রী দুর্যোধনের বেদনাহত কথা, মানসিকতা অত্যন্ত সাবধানে, মমতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এ'কালের দৃষ্টিতে দেখছেন এবং দুর্যোধনের বাক্যটি কালকূটের অন্তরে অনুরণন তৈরী করেছে "এতেও আমি শান্তি পাচ্ছি।" *(পৃ: ১৩১৭, ঐ)* কিন্তু যাকে বলা হয়েছে, অর্থাৎ অশ্বত্থামা, তিনি কি শান্তি পেয়েছিলেন? অথবা স্বয়ং দুর্যোধন?

কালকূটকে অনুসরণ করে ব্যাপারটা দেখা যাক্। কালকূটের দৃষ্টিতেই ঘটনাগুলো, চরিত্রগুলো বুঝতে চেষ্টা করি। ইতিহাসের ঘটনার চরিত্রগুলো কালকূটের লেখনীর তুলিতে বর্তমানের বাস্তব মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন, সে'কালের চরিত্রগুলোকে এ'কালের দৃষ্টিতে দেখছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। পটভূমি সেকাল, মহাভারতের কাল, অর্থাৎ ১৯৮২ সাল থেকে ৫০৮৩ বছর আগের কালকে এ'কালের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে নতুনভাবে চরিত্র ঘটনাবলী পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। বেদনার তুলিতে কালকূট দুর্যোধন ও অশ্বত্থামার মানসিক অবস্থাগুলোকে তুলে তার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর লেখার যাদুতে অতীত ভ্রমণ শুধু ঘটনাতে সীমাবদ্ধ থাকছে না, একটা ধারাবাহিক গতিতে কাহিনীর দিকে এগিয়ে চলেছে যেখানে বেদনা, শোক-দুঃখ-প্রতিহিংসা, নিষ্ঠুরতা, ভয়ংকরতা কালে কালে নদীর বহতা স্রোতের মতো বদলে যাচ্ছে, নদীর প্রতিটি বাঁকের মতো কাহিনির প্রকৃতি বিচিত্রতায় ভরে উঠছে।

দুর্যোধনের কথায় অশ্বত্থামা নিজেকে শান্ত করতে পারলেন না। বললেন, "মহারাজ, পাণ্ডবরা আমার পিতাকে যখন কূটযুদ্ধে হত্যা করেছিল, তখন যত কষ্ট পেয়েছি, এখন তোমার অবস্থা দেখে তার থেকেও বেশি কষ্ট পাচ্ছি। যাই হোক, আমি তোমার কাছে দান, ধর্ম, সুকৃত সত্য দ্বারা শপথ করছি, কৃষ্ণের সামনেই আজ আমি সমস্ত পাঞ্চালদের হত্যা করব। তুমি আমাকে অনুমতি দাও।" *(পৃ: ১৩১৭, ঐ)*

কালকূট দেখছেন প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে অশ্বত্থামার হৃদয়ে। ভূলুণ্ঠিত দুর্যোধনকে দেখে শোকে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা এই দুইজনকে সঙ্গী করেই অশ্বত্থামা প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠতে চেয়েছিলেন। এদিকে দেখা যাক্, অশ্বত্থামার কথা শুনে দুর্যোধনের মনের প্রতিক্রিয়া কী? মৃত্যুপথযাত্রী দুর্যোধন কৃপাচার্যকে বললেন "আচার্য, আপনি জলপূর্ণ কলস নিয়ে আসুন।" *(পৃ: ১৩১৭ ঐ)*

কালকূট মৃত্যুপথযাত্রী দুর্যোধনের দুরাশা অবলোকন করলেন। জীবনের দীপ প্রায় নির্বাপিত, তবুও শেষ তেলটুকু নিয়ে পুনরায় জ্বলে উঠে লড়তে চান তিনি। পরিণাম লোকক্ষয়। এগারোটি অক্ষৌহিণীর সেনানায়ক দুর্যোধন। আর আজ? কৌরব শিবির শূন্য! ভাগ্যের কী পরিহসে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা। লেখক কালকূট যেন দেখছেন মৃতপ্রায় দুর্যোধন কৃপাচার্যকে

বললেন "দ্বিজ শ্রেষ্ঠ আচার্য, আপনি যদি আমার উপকার সাধনের ইচ্ছা করেন, তবে এখনই অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করুন।" *(পৃ: ১৩১৭, ঐ)* আরও বললেন, ধর্মজ্ঞরা বলেছেন যে, "ক্ষত্রিয় ধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণদের যুদ্ধ করা দোষের নয়।" *(পৃ: ১৩১৭, ঐ)*

কালকূট, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ সেনাপতির অভিষেক পর্ব প্রত্যক্ষ করলেন। অশ্বত্থামা সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হয়ে শেষবারের মত দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠলেন সেনাপতির দায়িত্ব ও নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য। কৃপাচার্য, কৃতবর্মা দুজনেই ঘোড়ায় উঠে অশ্বত্থামাকে অনুসরণ করতে লাগলেন। রাত্রির অন্ধকারে অশ্বত্থামাকে কালকূট পৈশাচিক ও অন্যায় হত্যার রঙ্গমঞ্চে নিয়ে যেতে চাইছেন। তাঁকে অনুসরণ করে দেখা যাক্। কিন্তু সেই পৈশাচিক হত্যার সময় আসতে কিছু দেরি আছে। সেই অবকাশে লেখক কালকূট, মূলের কিছু ঘটনা অর্থাৎ মহাভারতের ঘটনাকে জটিল জালের ভিতর থেকে তুলে আনতে চেয়েছেন। তাঁকে অনুসরণ করে সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক্। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম দিনেই কালকূট কুরুক্ষেত্রে পৌঁছে গেছেন। মহাযুদ্ধের সময়কাল সম্বন্ধে, মহাভারত রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। কিন্তু কালকূট কোন বিতর্কে যেতে চাননি। যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তারিখ, সন ধরে মহাভারতের কাল নির্ণয় করেছেন কালকূট তাঁকেই অনুসরণ করেছেন। মহামহোপাধ্যায় মহাভারতের রচনা থেকেই উল্লেখ করেছেন— "ইতিহাসমিদং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ।" *(পৃ: ১৩০৬, ঐ)* কালকূট বলেছেন, এই কথা থেকেই বোঝা যায় যে, "মহাভারত একটি ইতিহাসগ্রন্থ। উপন্যাসের মত কল্পিত কাহিনী নয়। এ'কথাও জানা যায়, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুরের মৃত্যুর পরে, বেদব্যাস এই ইতিহাস রচনা করেছিলেন।

মহাভারতেই উক্ত হয়েছে যে দ্বাপর আর কলির সন্ধিক্ষণে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল। কালকূট মনভ্রমণে বেরিয়েছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দিনগুলিতে। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সঠিক সময় ও যুগ নির্দেশ করতে না পারলে কালকূট সঠিক সময়ে, ঠিক যুগে পৌঁছতে পারবেন না। তাই তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যুগ ও সময় নির্দেশ করেছেন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী মকরচ্ছকারকে অনুসরণ করে। মকরচ্ছকারের মতে — ৩১৭৯ বছর অতীত হওয়ার পরে শকাব্দ শুরু হয়েছিল। কালকূট হিসাব করেছেন এখন চলছে ১৯৩৪ শকাব্দ (১৯৮২ খ্রী:)। এখন ৩১৭৯ কল্যব্দের সঙ্গে, ১৯৩৪ যোগ করলে দাঁড়ায় ৫১১৩ বছর। তাহলে কলিযুগ আরম্ভ হয়েছিল ৫১১৩ বছর আগে। কলিযুগ "শুরুর কিছু আগে বা সেই বছরেই বা কিছু পরে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়েছিল।" *(পৃ: ১৩০৬, ঐ)* এটা বুঝতে পারা যায় লেখকের বক্তব্য থেকে, আবার কালকূট নিজেই বলেছেন যে, "আমি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যে সময় উল্লেখ করেছি বা শ্রীমদ হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশের হিসাব অনুযায়ী, এই হিসাব ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ৫০৮৩ বঙ্গাব্দ দাঁড়ায়।" *(পৃ: ১৩০৭, ঐ)* বিভিন্ন মত

ও সিদ্ধান্তের বিতর্কে না গিয়ে তিনি এই হিসাবকে মনে রেখেই মনভ্রমণে এসে আরও বিস্তারিত তথ্য জানবার জন্য আরও আগের অতীতে পদচারণা শুরু করলেন। কালকূটের মনে প্রশ্ন জেগেছে আর্যরা কবে ভারতে এসেছিলেন? তিনি এর একটা প্রামাণিক তথ্য পেয়ে যান সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার থেকে। তিনি বলছেন যে, সিন্ধু সভ্যতার লক্ষণীয় বিষয় ছিল এরা অনার্য ছিলেন। আর্যরা এদেরই অসুর বলতেন। ''আর্যরা এসে এই সভ্যতাকে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, সার্থকও হয়েছিলেন। বস্তুত আর্যরাই ছিলেন প্রকৃত বর্বর। এঁরা চাষ করতে জানতেন না।'' *(পৃ: ১৩০৬, ঐ)* এরা ইন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন অসুরদের নগরগুলো ধ্বংস করতে, অশ্ব যেন কখনো না পায়। সিন্ধু সভ্যতার অনার্যরা চাষ করতে জানতেন, উন্নত ধরনের নগর তৈরি করেছিলেন। তাদের শস্যাগার, স্নানাগার ছিল। অস্ত্রশস্ত্র, বঁড়শি, রোজকার ব্যবহারের নানা জিনিস তৈরি করতে জানতেন। সমুদ্রগামী নৌকায় বাণিজ্যও করতেন। নানান দেবদেবীর পূজা করতেন। মাতৃকাদেবীর পূজা করতেন। শিব ছিলেন প্রধান দেবতা। কালকূট বলেছেন ''নৃতাত্ত্বিক ভাবনার দিক থেকে দেখতে গেলে, তন্ত্রের উদ্ভব এখান থেকেই।'' কিন্তু তারা জানতেন না ঘোড়ার ব্যবহার। তাদের লিপি ছিল, তারা লিখতে পড়তে জানতেন। কিন্তু আর্যরা দুধ-ফল খেয়ে জীবন কাটাতেন, তাদের ভাষা থাকলেও লিপি ছিল না, আর লিপি থাকলেও শুধু ব্রাহ্মণেরাই জানতেন। এ সম্বন্ধে যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তাই কালকূট বলেছেন, ''প্রমাণের অভাব, এই কারণে আমরা বলতে পারি না, প্রায় ৬০০০ বছর আগে বেদ লিখিত হয়েছিল কিনা। এ সম্ভাবনার কথা মনে আসছে এই কারণে, ব্যাসদেব নিজের হাতে সম্ভবত প্রথম ভারতকাহিনী লেখেন নি। লিখেছিলেন ব্যাসদেবের মুখ থেকে শুনে গণেশ। আর এই গণেশ ছিলেন অনার্য শিক্ষিত ব্যক্তি।'' *(পৃ: ১৩০৬-০৭, ঐ)* তিনি শুনেছেন গণেশকে বিঘ্নকারী বিনায়ক নামেও ডাকা হত। আর্যরা গণেশের উপর প্রসন্ন ছিলেন না, তাই প্রথমে তাঁর মাথায় সাপের ফণা বসিয়েছিলেন। তখন গণেশ হলেন দ্বিজিহ্ব। পরে হাতির মাথা বসিয়েছিলেন। কালকূট বলছেন ''অথচ ইনিই পরবর্তীকালে সিদ্ধিদাতা গণেশ।'' *(পৃ: ১৩০৭, ঐ)*

তাঁর মনে আরও প্রশ্ন, ''সেই যুগে অনেক বৈদিক পণ্ডিত থাকা সত্ত্বেও, একজন অনার্য রমণীর গর্ভজাত অজ্ঞাতকুলশীল কেন ভারত কথা লিখেছিলেন। বৈদিকদের ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবতামণ্ডলীতে গণেশ স্থান পেয়েছিলেন শেষ দিকে।'' *(পৃ: ১৩০৭, ঐ)*

যাই হোক, কালকূটকে অনুসরণ করে আরও জানা গেল, সিন্ধু সভ্যতা যখন চরমে উঠেছিল তখনই ভারতে এসেছিল আর্যরা। ''সময়টা সম্পর্কে কেউ খুব একটা স্থির নন। ইংরাজি খ্রীষ্টাব্দের ৩০০০ হাজার বছর আগে হতে পারে। ৬০০০ ও হতে পারে।'' *(পৃ: ১৩০৭, ঐ)*

যাই হোক কালকূট মানসচক্ষে অতীত ভ্রমণে বেরিয়ে দেখছেন, আর্যরা ভারতে প্রাগার্য সভ্যতাকে ধ্বংস করে তাদের হীন ও বর্বর সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে

নিজেরাই মাথা নত করেছিল সিন্ধু সভ্যতার কাছে। আর্য-অনার্য সংশ্লেষণের মধ্যে দিয়েই পরবর্তীকালে হিন্দু সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল। এবং এই সংশ্লেষণের প্রথম দিকে রামায়ণ ও পরবর্তীকালে মহাভারত রচিত হয়েছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও মহাভারতের রচনাকাল নির্ণয় করতেই কালকূটের এই অতীতে পদচারণা। তিনি দেখেছেন— আর্যরা ক্রমেই অনার্যদের দেবদেবী, কৃষি, মন্দির, নগর ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কালকূটের বক্তব্য "তাহলে হিন্দু সভ্যতার জন্মলগ্নেই ভারতকথার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই কারণেই গণেশকে লিপিকার হিসাবে মেনে নিয়ে তাঁকে সিদ্ধিদাতা বলে নত হতে হয়েছিল। এই অনুমানের সঙ্গে সময় ও যুগের হিসাবও পাওয়া যায়।" *(পৃ: ১৩০৭, ঐ)* ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যদি ৫০৮৩ কল্যব্দ হয়; "তাহলে সিন্ধু সভ্যতার পতন প্রায় ৫০০৯ বছর আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল।" এই সময় নিরূপণ করার সঙ্গে সঙ্গে কালকূট আরও কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। তিনি নির্ণয় করতে চেয়েছেন— মহাযুদ্ধের শেষে যুধিষ্ঠির কত বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যুধিষ্ঠিরের বয়স ৭২, ভীম ৭১, অর্জুন ৭০, নকুল ও সহদেব ৬৯। ভীম ও দুর্যোধন সমবয়সী — যেদিন দুপুরে ভীম জন্মেছিলেন, সেদিনই রাত্রে জন্মেছিলেন দুর্যোধন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ১৮ দিনের দিন যুদ্ধে জয়লাভ করে পরের দিন পৌষী শুক্লা প্রতিপদে যুধিষ্ঠির রাজা হন। কালকূট মহাভারত রচনার সময় নিরূপণ করার জন্য দ্বাপরের শেষে কলিযুগে এগিয়ে আসেন। তিনি দেখেছেন, রাজা হওয়ার ৩৬ বছর পরে যুধিষ্ঠির পরীক্ষিতের হাতে রাজ্যভার দিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গী হন চার ভাই ও পত্নী দ্রৌপদী। পরীক্ষিত ৬০ বছর বয়সে তক্ষকের দংশনে মারা যাওয়ার পরে তাঁর তিনি কৃষ্ণকে একটু অন্য ভাবে দেখেছেন। গোপবালাদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ছিল। সবচেয়ে বেশি মেলামেশা ছিল ঘোষ শাক্ত আয়ানের স্ত্রী শাক্ত রাধার সঙ্গে। তার কারণ কালকূটের চোখে ধরা পড়েছে এইভাবে, "কৃষ্ণের শক্তিমত্তা, তরুণদের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা। কালীয়দহে তিনি হত্যা করেছিলেন দানবতুল্য ময়ালকে। বধ করেছিলেন তাড়কা নাম্নী রাক্ষসীকে। সবের মধ্যে রূপকথার কিছু হদিশ আছে।" *(পৃ: ১৩০৯, ঐ)*

কালকূট মনে করেছেন — কৃষ্ণের মৃত্যুর সঙ্গে হয়ত নিষাদ বা ব্যাধদের কোনো বিবাদ ছিল। সেই কারণেই হয়ত তীর মেরে তাঁকে হত্যা করেছিল। তিনি কৃষ্ণকে নিষাদদের দলত্যাগী বলে মনে করেছেন।

প্রচলিত ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে নতুন ভাবে কৃষ্ণকে পাঠকের সামনে এনে তাঁদের মনেতে দোলায়িত সংশয়ে ভরিয়ে তুলেছেন। কালকূট কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের সময় থেকে আরও অতীতে মনভ্রমণে চলে গেছেন। যে পৈশাচিক ঘটনার রঙ্গমঞ্চে তিনি পাঠককুলকে উপস্থিত করাতে চান, সেই ঘটনাকে যথার্থভাবে উপস্থাপন করবার জন্যই তাঁর এই

অতীত থেকে অতীতে পদচারণা। কালকূটকেই অনুসরণ করে দেখা যায় মহাভারতের সৌপ্তিক কাণ্ডে অশ্বত্থামার এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের কথা বিবৃত হয়েছে। সুপ্ত থেকে সৌপ্তিক বা সৌপ্তিক থেকে সুপ্ত। "মানুষের সুপ্তাবস্থাকে বলা হয় ঘুমন্ত। এইরকম ঘুমন্ত অবস্থায় পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের জন্য অশ্বত্থামা ভারত ইতিহাসের এক কলঙ্কিত চরিত্র। তপস্যার বলে, অশ্বত্থামা নাকি ছিলেন অবধ্য।" *(পৃ: ১৩০৮-৯, ঐ)*

কালকূট বলছেন, অশ্বত্থামার অমরতার মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে, তা নইলে — "স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, যাঁকে কলির অবতার বলা হয়েছে, তিনিও অশ্বত্থামাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে গিয়ে, তাঁকে হত্যা করতে পারেন নি।" *(পৃ: ১৩০৯, ঐ)* এই ঘটনায় যাওয়ার আগে তিনি তিনটি বিভিন্ন গভির দিকে নজর দিয়েছেন। "এক. ভীষ্ম ও কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বিরোধ। দুই. দ্রৌপদীর লক্ষ্যভেদ স্বয়ংবর সভায় কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের মিলন; কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকে অনেকেই কুরু-পাঞ্চাল যুদ্ধ বলে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এটি তৃতীয় ও বিখ্যাত বিষয়। এর নেতা হলেন দ্রোণ।" *(পৃ: ১৩১১, ঐ)* শাস্ত্রজ্ঞ ভরদ্বাজ মুনির ছেলে। ভরদ্বাজের সখা ছিলেন রাজা পৃষত। পৃষতের ছেলে দ্রুপদ। "দ্রোণ আর দ্রুপদ ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করতেন।" *(পৃ: ১৩১১, ঐ)* কেন কালকূট এই তিনটি বিচিত্র ধারায় যেতে চাইছেন, তাঁকে অনুসরণ করলেই বুঝতে পারা যাবে।

কালকূট প্রথমে চলেছেন মহারাজ শান্তনুর রাজত্বের সময়ে। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ মহর্ষি পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি সত্যবতীর কানীনপুত্র। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণের আসল মানে হল "কোন দ্বীপবাসী বংশের কালো কালো ছেলে।" *(পৃ: ১৩০৯, ঐ)* অর্থাৎ ব্যাসদেব কোন দ্বীপবাসী নরগোষ্ঠীর কালো ছেলে। ব্যাসদেব অনার্য। আর ভীষ্ম মহারাজ শান্তনু ও গঙ্গার সন্তান। পুরোপুরী আর্য সন্তান। কালকূট দেখেছেন, মহারাজ শান্তনুকে, গঙ্গা তাঁকে ছেড়ে চলে যাবার অনেকদিন পরে গন্ধকালী অর্থাৎ সত্যবতীকে বিয়ে করেছেন। গন্ধকালীর কালো অঙ্গের রূপে ও যৌবনের যাদুতে শান্তনু পাগল, কিন্তু তিনি সত্যবতীকে বিবাহ করতে পারছেন না। বিশেষ শর্তের কারণে। "তার ছেলে ছাড়া, রাজা শান্তনুর সিংহাসনে দেবব্রত বসতে পারবেন না।" *(পৃ: ১৩০৯, ঐ)* দেবব্রত একথা জানতে পেরেই সত্যবতীর শর্তে রাজি হয়ে পিতার বিয়েতে ঘটকালি করলেন। দেবব্রত একদিকে বিশাল সুন্দর সুপুরুষ ব্যক্তি, অপরদিকে ভয়ঙ্কর বা ভীষণ— "ভীষ্ম নামের মানেই ভীষণ।"

মহারাজ শান্তনুর ঔরসে অনার্যা রমণী সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ আর বিচিত্রবীর্য জন্ম নিলেন। চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হলেন। আর বিচিত্রবীর্য অতিরিক্ত নারীসঙ্গ-এর জন্য তাঁর দুই পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে পারলেন না। যক্ষ্মারোগে মারা গেলেন। সত্যবতী সমস্যায় পড়ে গেলেন। এখানে লেখক কালকূট সত্যবতীর সমস্যাগুলো বুঝতে

চেষ্টা করেছেন— সত্যবতী প্রমাদ গুণলেন এই ভেবে যে রাজা শান্তনুর সিংহাসনে কে বসবে? সত্যবতী নিজেই ভীষ্মকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন — "তিনি কখনো বাবার সিংহাসনের দাবি করবেন না।"*(পৃ: ১৩১০, ঐ)* অথচ সত্যবতী ছলনার সাহায্য নিয়ে ভীষ্মকে বললেন— "বিধবা বউদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে।" ভীষ্ম যে রাজি হবেন না তা বুদ্ধিমতী সত্যবতী জানতেন। লেখকের চোখে এটা একটু চেষ্টার ভান। তারপরে নিজ কানীনপুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণকে দিয়ে "দুই বিধবা ভ্রাতৃবধূর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করলেন।"*(পৃ: ১৩১০, ঐ)* কালকূট অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সত্যবতী, ভীষ্ম ও কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ-এর মনের গভীরে ডুব দিয়ে দেখছেন — কী বিচিত্র গতিপ্রকৃতি এঁদের। কালকূট দেখেছেন সত্যবতীকে। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী অনার্য নারী। তিনি জানতেন ভীষ্ম কখনই রাজি হবেন না। শুধু সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন সত্যবতী। নিজ কানীনপুত্র বেদ বিভাগকার ব্যাসদেব মায়ের কথাতেই ব্রহ্মচর্য বিসর্জন দিয়ে দিলেন।

কালকূট ভারত ইতিহাস থেকে চরিত্রগুলো তুলে এনে সেকালের পটভূমিতে রেখে একালের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রয়োজনীয় ভাষা, মনের চিন্তা দিয়ে চরিত্রগুলোকে এ যুগের রক্তমাংসের বাস্তব চরিত্র করে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই প্রয়াস কতটা বাস্তবের রূপ পেয়েছে সেটা দেখা যাক্। কালকূটের দৃষ্টিতে ভীষ্ম ধরা পড়েছেন এইভাবে — ভীষ্ম বিচক্ষণ, বীরযোদ্ধা, প্রতিজ্ঞায় অবিচল, কর্তব্যে নিষ্ঠাবান। তথাপি কালকূটের মনে প্রশ্ন — শতশৃঙ্গ পর্বতে পাণ্ডু তার দুই পত্নীসহ কেমন আছেন, কি করছেন, কিছুই কেন তিনি জানেন না? "পাণ্ডুর পাঁচটি ক্ষেত্রজ সন্তানের কথা কিন্তু, ব্যাসদেব জানতেন। কালকূটের অন্তর্দৃষ্টিতে ব্যাসদেব সম্পর্কে অন্তর্ভাবনা — "পঞ্চপাণ্ডবের দিকেই যেন তাঁর টান বেশি। কেন এমনটা হবে? জারজের প্রতি জারজের সমবেদনা। বিদুরকেও বোধহয় তিনি ভালবাসতেন।" *(পৃ: ১৩১০, ঐ)* কালকূটের দৃষ্টিতে পাঠকের চোখে উঠে এসেছে যে ব্যাসদেব বনে বনে, দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়াতেন বলে তিনি সব জানতেন। তাইতো তিনি মা সত্যবতীকে 'দিনকাল খারাপ' বলতে পেরেছিলেন। ব্যাসদেব ত্রিকালজ্ঞ, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। তথাপি কালকূটের চোখে ধরা পড়েছে ব্যাসদেব পক্ষপাত দুষ্ট। দুর্যোধনদের তিনি পছন্দ করেন না। তিনি নিজে ইতিহাসকার, অতএব সমস্ত ঘটনাবলী তাঁরই জানা উচিত। কিন্তু তিনি দূরে দূরে থাকবার ভান করেছেন। কিন্তু কালকূট সেই সত্যগুলো তুলে এনেছেন। তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে কাহিনীর ইঙ্গি তগুলো থেকে আসল সত্যটি বুঝতে পারার চেষ্টা করেছেন। ব্যাসদেব পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহপরায়ণ, এটা বুঝতে পারা যায় বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে। কালকূট অতীতভ্রমণে ব্যাসদেব ও পাণ্ডবদের পাশে চলতে চলতে তাঁদের কথাবার্তা, উপদেশ সবকিছু যেন শুনেছেন, দেখেছেন। জতুগৃহ থেকে পালানোর সময়ও পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে তিনি তাঁদের উপদেশ দিলেন— "তোমরা একচক্রাপুরীতে যাও।" *(পৃ: ১৩১০, ঐ)* এরপরে আবার দেখা এবং তাঁর নির্দেশ— "তোমরা

পাঞ্চাল রাজার দেশে যাও।" *(পৃ: ১৩১০, ঐ)* ব্যাসদেব জানতেন, কুরু পাঞ্চালদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল নয়। ভবিষ্যতে যুদ্ধ লাগলে যুদ্ধে ভীষ্ম জড়াবেন। লেখক কালকূট দেখছেন দূরদর্শী বেদব্যাসকে, কত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যাসদেব স্বীয় কার্যগুলি ইচ্ছাগুলিকে বাস্তবের দিকে নিয়ে গেছেন। আর ভীষ্ম? পাণ্ডবদের জন্ম কথা জানতে পারলেন না কেন এই প্রশ্ন কালকূটের মনে উঁকি দিয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র তো ভীষ্মের উপদেশ নিয়েই রাজকার্য পরিচালনা করেন। কালকূটের জিজ্ঞাসার সঙ্গে সহমত হয়ে বলাই যায়, ভীষ্ম পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মের খবর পেলেন না কেন? ভীষ্ম তার 'ব্রহ্মচর্য' পালনে স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ভীষ্ম ব্যাসদেবের উপরে প্রসন্ন ছিলেন না, নিজে কখনও তা প্রকাশ করেন নি। কালকূটের মনের সন্দেহ পাঠক মনেও ছড়িয়ে যায়।

ব্যাসদেব কানীনপুত্র হয়ে ব্রহ্মচর্য নষ্ট করেছিলেন মাতৃ আজ্ঞায়, তিনিই পুরাণ ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেছেন। কালকূটের আধুনিক দৃষ্টিতে ভীষ্ম ও কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণের মানসিক বিরোধই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রস্তুতির মূল কারণ হিসাবে ধরা পড়েছে। কালকূটের মানসভ্রমণে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে, যুদ্ধ চলাকালে পাণ্ডবদের ব্যাসদেব প্রায়ই উপদেশ দিয়েছেন, পাণ্ডবদের দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছেন অনেক পুরানো দিনের কথা বলে। তিনি এই ধারণায় উপনীত হওয়ার আরও একটি কারণ দেখিয়েছেন। যেদিন ভীষ্ম পরাজিত হয়ে শরশয্যা নিলেন সেইদিন কৌরব-পাণ্ডব উভয় শিবিরেই শোকের ছায়া নেমে এসেছিল, সবাই বিষণ্ণ। কিন্তু কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ হননি। তাঁকে দেখে কালকূটের মনে হয়েছে "তিনি এই দিনটির জন্য অনেক কাল অপেক্ষা করেছিলেন।" *(পৃ: ১৩১৩, ঐ)* কালকূট নিজ বক্তব্যের স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখিয়েছেন।

"উনি যেন কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধে কোন অস্ত্রই গ্রহণ করেন নি, এমনভাবে দেখিয়েছেন। আসলে তিনি অস্ত্রধারণ না করেও সবসময় কৌরব পক্ষের বিরোধিতা করেছেন।" *(পৃ: ১৩১৩, ঐ)* এইজন্য কালকূটের চোখে যুযুৎসুও "কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণের তুলনায় সৎ ব্যক্তি ছিলেন।" *(পৃ: ১৩১৩, ঐ)* যুযুৎসু পাণ্ডবদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ্যে জানিয়েছেন। বিদুরও পাণ্ডবদের সহায়তায় সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি কিন্তু তার জন্য ভান করেন নি।

কালকূটের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এমনই কতকগুলো বৈষম্যমূলক ঘটনা চোখে পড়েছে যার জন্য তিনি স্বীয় বক্তব্য পাঠকের কাছে তুলেছেন। ব্যাসদেবের বৈষম্যমূলক আচরণের স্বপক্ষে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, কালকূটের চোখ দিয়ে বিশেষভাবে দেখলে তাঁর যুক্তিগুলোকে অকাট্য বলেই মনে হয়। ব্যাসদেব ত্রিকালজ্ঞ, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা তাঁকে কালকূট বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু 'তিনি' পক্ষপাতিত্ব দোষ মুক্ত নন এ'কথা বলে সমালোচনাও করেছেন। কালকূট কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দ্বিতীয় কারণ অনুসন্ধানের জন্য মানসভ্রমণে পর্যবেক্ষণ করে যে তথ্য উপস্থাপিত করেছেন তা দেখা যাক্।

কালকূট এবার চলেছেন জরাসন্ধ ও কৃষ্ণের গতিবিধি লক্ষ্য করতে তিনি যেন দেখছে। কংসকে

হত্যার পরে কৃষ্ণ তার চিরশত্রু জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা ছেড়ে মথুরাবাসীদের সকলকে নিয়ে সমুদ্রের মধ্যে একটি রমণীয় স্থান দ্বারকায় চলে যান। জরাসন্ধ সেখানে আর যেতে পারেন নি। দ্বারকা আক্রান্ত হয়েছে বারে বারে। নিষাধরাজ "একলব্য থেকে শুরু করে পৌন্ড্রের বাসুদেব নামধারী কৃষ্ণের মত গদাপদ্মচক্রধারী, দ্বারকা বিনাশ করতে পারেনি।" *(পৃ: ১৩১০, ঐ)* কৃষ্ণও বসে থাকেননি। কৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করে তাঁর ষোল হাজার রমণীকে উদ্ধার করেছেন। ঠিক এই রকম সময়ে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের দেখা হয়ে গেল। লক্ষ্যভেদী অর্জুনের বীরত্ব আর ভীমের বাহুবল দেখে কৃষ্ণ মনে মনে ঠিক করলেন পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে হবে, এছাড়া কুন্তী কৃষ্ণের পিসি তাহলে পাণ্ডবরা কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই। কুন্তী কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ভগিনী। তাই কালকূট কৃষ্ণের মনে ভাবনাগুলো হল — "এই বীরদের সাহায্য নিয়েই তাঁকে জরাসন্ধ হত্যার পরিকল্পনা করতে হবে।" *(পৃ: ১৩১০, ঐ)* — এই ভাবনা থেকে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের আদর আপ্যায়ন শুরু করে দিয়েছিলেন। এছাড়া দ্রৌপদীর সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ক মধুর ছিল এটা কালকূট লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু কালকূটের মনে প্রশ্ন দ্রৌপদী কার ঔরসজাত ও কার গর্ভজাতা কন্যা। তাঁর গায়ের রঙ কালো, বৈদ্যুর্যমণির মতো।

কালকূট ইতিহাসের ধুলো সরিয়েও এ তথ্য খুঁজে পান নি। ইতিহাসবিদ ব্যাসদেব দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত রহস্যে ঢেকে রেখেছেন। সন্তান কামনায় দ্রুপদ যজ্ঞ করেছিলেন, যজ্ঞের শেষে গর্ভধারণের জন্য দ্রুপদমহিষী পৃষতী দুই যাজ্ঞিক ভ্রাতা যাজ ও উপযাজের সামনে আসেন নি। কালকূট এ ঘটনা দেখে অনুমান করেছেন রাণীর দুই যাজ্ঞিকের হয়ত পছন্দ হয় নি, তাই সামনে আসেন নি। কিন্তু তবুও দ্রুপদ রাজার সন্তান হয়েছিল। যজ্ঞকুণ্ড থেকে প্রথমে "একেবারে অস্ত্রশস্ত্রধারী বর্মাবৃত, কিরীটধারী। ইনি ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং তারপরেই পরমা সুন্দরী এক কালো মেয়ে — দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদী উঠে এসেছিলেন। যজ্ঞকুণ্ডে জন্ম বলে দ্রৌপদীর আর এক নাম যাজ্ঞসেনী।" *(পৃ: ১৩১০, ঐ)* কালকূটের মনে মনে সন্দেহের উদয় হয়েছে যে এঁরা দ্রুপদ রাজার পুরোহিতের সন্তান নয় তো?" এর উত্তর একমাত্র ব্যাসদেবই দিতে পারতেন, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি নীরব। দ্রুপদ রাজার যজ্ঞকুণ্ড থেকে মিথুন সন্তান ওঠার বদলে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদী উঠেছিলেন। কালকূট বলছেন যে, "উঠে এসেছিল আসলে একটি হিজড়ে — নপুংসক। সে কখনো পুরুষ, কখনো মেয়ে। পুরুষ হলে ধৃষ্টদ্যুম্ন, মেয়ে হলে দ্রৌপদী। কিন্তু শিখণ্ডীকে আমরা নপুংসক চরিত্ররূপেই পেয়েছি।" কালকূট আরও দেখেছেন শিখণ্ডীকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শুরুর দিন। ভীষ্ম রণযাত্রায় নপুংসক শিখণ্ডী দেখেছিলেন। কালকূট প্রবল পারাক্রান্ত ভীষ্মের মনোজগতে ঢুকে পড়েছেন। নপুংসকের মুখদর্শন মাত্রই অযাত্রা, অমঙ্গল এই ভাবনায় ভীষ্ম ভাবিত — "পরাজয় অনিবার্য।"

কালকূট দেখেছেন, ভীষ্ম শিখণ্ডী দর্শনেই অস্ত্র ত্যাগ করে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন। এতে

কৌরবদের পরাজয় অনেকটা নিশ্চিত হয়েছিল। নপুংসক দেখানো হয়েছিল সুপরিকল্পিত ভাবেই। প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা পাণ্ডবদের মধ্যে কেউই ছিল না বলেই অগত্যা তাঁরা ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। এইরকম আরও ঘটনাবলী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল তা মানসলোকে অবলোকন করে কালকূটের মনে হয়েছে এ যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ নয়। "কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষই অনেক অন্যায় করেছেন।"*(পৃ: ১৩১২, ঐ)* কিন্তু কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ "নিজে ভারতকথার স্রষ্টা, এ যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলেছেন।" *(পৃ: ১৩১২, ঐ)* তাই কালকূট বলেছেন হাজার হাজার বছর আগে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণের— "সেই কথারই তো পুণরুক্তি আজও আমরা শুনতে পাই, প্রেমে ও সমরে মিথ্যা কথায় কিছু অন্যায় নেই।" *(পৃ: ১৩১২, ঐ)* দ্রোণাচার্যকে হত্যার জন্যই এই উক্তি করে ব্যাসদেব কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ পাণ্ডবদের বোঝাতে চেয়েছেন।

কালকূটের কাছে এই ঘটনাগুলোকে নীতিবিরুদ্ধ যুদ্ধ বলে মনে হয়েছে। ধর্মযুদ্ধে নিয়ম মেনে চলা হয়নি, যে ঘটনার রঙ্গমঞ্চে কালকূট পাঠককূলকে নিয়ে যেতে চাইছেন সেই ঘটনা অবলোকন করলে কালকূটের দৃষ্টিভঙ্গির সত্যতা আরও গভীরভাবে প্রত্যয় হবে। তাঁর দৃষ্টিতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তৃতীয় ও বিখ্যাত বিষয়ে চোখ রেখে দেখা যাক্, তাঁর অনুসন্ধানী মনের প্রতিফলন।

কালকূট বলেছেন, "এর নেতা হলেন দ্রোণ।"*(পৃ: ১৩১১, ঐ)* তিনি মানসভ্রমণে দ্রোণাচার্যকে দেখছেন। শাস্ত্রচর্চার সঙ্গে অস্ত্রবিদ্যা অধ্যয়ন, দুটোই একসঙ্গে করছেন। পরশুরাম মুনি নিজের সমস্ত ধন দান করছেন, একথা শুনে দ্রোণ যখন পরশুরাম মুনির কাছে গেলেন, তখন পরাশর মুনি নিজের শরীর আর অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া সবকিছু দান করে দিয়েছেন। দ্রোণাচার্য পরশুরাম মুনির কাছে অস্ত্রশস্ত্রই দান হিসাবে চেয়েছিলেন এবং পরশুরাম তাঁকে তাই দান করেছিলেন। তিনি "সেই সঙ্গে অস্ত্র প্রয়োগের সংকেত, নিয়ম আর মন্ত্র ধনুর্বেদকে দিলেন।"*(পৃ: ১৩১১, ঐ)*

অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে দ্রোণাচার্য। দ্রুপদের কাছে গেলেন বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে। কিন্তু দ্রুপদ তাঁকে সখা বলে স্বীকার করতে চাইলেন না। অপমানিত হয়ে দ্রোণাচার্য মনে মনে ঠিক করলেন "যেমন করেই হোক, দ্রুপদকে পরাজিত করতেই হবে। কিন্তু তার জন্য দরকার শক্তিমানের সহায়তা।"*(পৃ: ১৩১১, ঐ)* কালকূট বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দ্রোণাচার্যকে সেকালের পটভূমিতে অবলোকন করছেন। দেখলেন ঈর্ষার বীজ বপন হতে। দ্রোণাচার্য শক্তিমানের সহায়তা পেয়ে গেলেন, পেলেন কৌরব গোষ্ঠীকে। তিনি কৌরব-পাণ্ডবদের অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত করে তুলতে লাগলেন; দ্রোণাচার্য রাজা শান্তনুর আশ্রিত কৃপীকে বিবাহ করেন। কৃপীর ভাই কৃপও কৌরব বালকদের অস্ত্র শিক্ষা দিতেন। দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য দুজনেই ব্রাহ্মণ অথচ ক্ষত্রিয়ের মতো আচার ব্যবহার।

দ্রোণাচার্যের প্রিয় শিষ্য অর্জুন, কারণ "অর্জুন লক্ষ্যভেদে সকলের থেকে বেশি অব্যর্থ"।

(পৃ: ১৩১১, ঐ) দ্রোণাচার্যের অর্জুন প্রীতিই দুর্যোধনের মনে প্রবল ঈর্ষার সঞ্চার করেছিল। এছাড়া দুর্যোধন মনে মনে কোনদিন পাণ্ডবদের ভাই বলে মেনে নিতে পারেন নি। পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে সহসাই তাঁরা হস্তিনাপুরীতে এসেছিলেন পাণ্ডু ও মাদ্রীর শবদেহ নিয়ে। কালকূট সেই মুহূর্তও অবলোকন করেছেন। সত্যবতী ও ভীষ্ম কেউই কেন পাণ্ডু-পুত্রদের জন্মের খবর পেলেন না, এ প্রশ্ন কালকূটের মনে। বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেকালের নরনারীর সমাজ পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করছেন। কালকূটের এ প্রশ্ন শুধু তাঁর মনেই নয় সত্যবতী, ভীষ্ম ও নগরবাসী সবার মনে। তবে দুর্যোধনেরই বা কেন মনে হবে না, পাঁচটি বালক তাঁদের বংশের কেউ না। পাণ্ডু পুত্রদের জন্মের খবর হস্তিনাপুরে আসেনি কেন ? এতো গোপন করার ব্যাপার নয়। কালকূট দেখেছেন দুর্যোধনকে, "তিনি চিরকাল ধরে এই অবিশ্বাস মনে মনে পালন করেছেন। আর ধীরে ধীরে এই অবিশ্বাস থেকে সন্দেহ। সন্দেহ থেকে ঈর্ষা। ঈর্ষা থেকে ক্রোধ ও ঘৃণা। পরিণাম যুদ্ধ আর ভয়ংকর লোকক্ষয়।" *(পৃ: ১৩১৪, ঐ)*

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কালকূট সেই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলির অন্তরস্বরূপে যেভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন তা প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আবার দ্রোণাচার্যের কাছেই ফিরে আসা যাক্। দ্রোণাচার্য দূরদর্শী, তিনি নিজপুত্র অশ্বত্থামার সঙ্গে অর্জুনের সখ্যতা স্থাপন করে দিয়েছিলেন। অর্জুনকে তিনি অশ্বত্থামার থেকে কোন অংশেই অস্ত্রবিদ্যা কম শেখান নি। কালকূটের চোখে দ্রোণাচার্যের কূট চাল ধরা পড়ে গেছে। দ্রোণাচার্য অশ্বত্থামাকে বিশেষভাবে অস্ত্রশিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেন নি অর্জুনের বুদ্ধিমত্তার জন্য। অর্জুন দ্রোণাচার্যের কূটবুদ্ধি বুঝতে পেরেই অস্ত্রশিক্ষাকালে অশ্বত্থামার সঙ্গে থেকেছেন সবসময়ে। অর্জুন প্রিয় শিষ্য। শেষপর্যন্ত তাকেই তিনি সব থেকে বেশি মারণাস্ত্রের ব্যবহারে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। গুরুদক্ষিণা হিসাবে দ্রোণাচার্য শিষ্যদের কাছে চেয়েছিলেন — "তোমরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে জীবন্ত ধরে নিয়ে এস। সেই হবে আমার শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা।" *(পৃ: ১৩১১, ঐ)* কালকূট দেখছেন দ্রোণাচার্যকে — কীভাবে তিনি তাঁর ঈর্ষার বীজ শিষ্যদের মধ্যে সংক্রামিত করলেন। শিষ্যরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে জীবন্ত ধরে এনেছিলেন। এর মধ্যে সব থেকে বেশি কৃতিত্ব ছিল অর্জুনের। বন্দী পাঞ্চালরাজ দ্রোণকে সখা বলে মেনে নিতে বাধ্য হলেন। দ্রোণাচার্য শর্ত দিলেন "তুমি থাকবে গঙ্গার দক্ষিণ অংশে আমি গঙ্গার উত্তর অংশে দুই তীরে দুই রাজা।" *(পৃ: ১৩১১, ঐ)* পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ বন্দিদশা থেকে মুক্ত হলেন। কিন্তু বৈরিতা থেকে কি মুক্ত হলেন?

"কুরু-পাঞ্চালের মধ্যে, এই যে শত্রুতার বীজ বপন করা হল, এর ফলও হয়েছিল সুদূর প্রসারী। কেবল রাজনীতির খেলায়, ভবিষ্যতে পাণ্ডব বীরেরা দ্রুপদের পক্ষ নিয়েছিলেন। আর

দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন হত্যা করেছিলেন দ্রোণাচার্যকে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। আর দুর্যোধনরা আগের মতই পাঞ্চালরাজের সঙ্গে শত্রুতা করেছিলেন। পাণ্ডবরা তো তখন তার জামাই। পরস্পর আত্মীয়। এই ঘটনার মধ্যে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণকে পরিষ্কার না দেখা গেলেও অদৃশ্যে কাজ করেছিল।"*(পৃ: ১৩১১, ঐ)* কালকূটের যুক্তির যথার্থতা মেনে নেওয়া যায়, ভারতকথায় এই দুজনের হাত কোথাও স্পষ্টভাবে কোথাও অদৃশ্যভাবে কাজ করে গেছে।

কালকূট দেখেছেন — পাণ্ডব শিবিরে দ্রোণকে অন্যায়ভাবে নিধনের জন্য ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। সেই ষড়যন্ত্র অব্যর্থ হবে এ'কথা মহাভারতকার জানতেন; কারণ তিনি ত্রিকালজ্ঞ, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। এটা জেনেই তিনি যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা বলতে উৎসাহিত করেছেন। এই ঘটনা দেখে কালকূট ভাবছেন, — ভারতকথা রচয়িতার এই যুদ্ধ কেমন করে ধর্মযুদ্ধ হয়। অথচ তিনি নিজে বলছেন— যে, এ যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ।

কালকূটকে অনুসরণ করে দেখা গেল, কালকূট কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উপলক্ষ্যগুলি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করেছেন বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। বিভিন্ন দিক থেকে চরিত্রগুলোকে সেইকালের সমাজ পরিপেক্ষিতে, ঘটনা পরস্পরার মধ্যে রেখে বর্তমানের নিরিখে তাদের চিত্রায়িত করেছেন। চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে নিজের উপলব্ধি, আধুনিক মনের ভাবনা, ব্যথা-বেদনা, সুখ-দুঃখ, ঈর্ষা-ক্রোধ, প্রতিহিংসার কথা ব্যক্ত করেছেন। চরিত্রগুলো আর ইতিহাসের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি। ঘটনার পর ঘটনা, কাহিনীর পর কাহিনী-উপকাহিনী দিয়ে মূল ঘটনায় যাওয়ার আগে তার কার্যকারণকে যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ স্বচ্ছ চোখে দেখলে ভাই-ভাইপোর লড়াই বলে মনে হলেও কালকূটের দৃষ্টিভঙ্গিতে তা নয়। ব্যাসদেব আর ভীষ্ম ভাই। দুজনেরই পিতা আলাদা, মাতা আলাদা। তবু ভাগ্য তাদের ভাই-ভাই সম্পর্কে উপস্থিত করেছে। দ্রুপদ আর দ্রোণ ভাই নয়, কিন্তু তাঁর অস্ত্রশিক্ষার মধ্য দিয়েই দুর্যোধনের মনে ভীম-অর্জুনের উপর ঈর্ষার সৃষ্টি হয়েছে। সেই ঈর্ষার বশেই তিনি গুরুর বিরোধিতা করে কর্ণকে রাজ্য দান করে দ্রোণাচার্যের শিষ্য করতে চেয়েছিলেন। আর কৃষ্ণ? দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতেই তিনি মনে মনে পাণ্ডবদের পক্ষ নিয়ে নিলেন একটি উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে। এঁদের সাহায্য নিয়েই ভবিষ্যতে জরাসন্ধকে বিনাশ করবেন ও বিশাল সাম্রাজ্য সৃষ্টি করবেন। কালকূট মনে করেছেন "এই উপলক্ষ্যগুলিই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছিল।"

অতীতের দীর্ঘ পথ, ঘটনা-পরম্পরা পরিক্রমা করার পরে কালকূট 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি'-র পাঠককে নিয়ে এসেছেন অগ্রহায়ণের হৈমন্তিক অমাবস্যার করাল রাত্রির অন্ধকারে। দুর্যোধনের নির্দেশে কৃপাচার্য 'অশ্বত্থামা'কে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেছেন। অশ্বত্থামা অনেকক্ষণ আগে যাত্রা শুরু করেছেন, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাও 'সেনাপতি'কে অনুসরণ করেছেন। অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য

ও কৃতবর্মা দুর্যোধনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চলেছেন।

কালকূট দেখতে পেলেন মাংসভুক পশুরা দুর্যোধনকে তাদের থাবা, দাঁত বসিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এমন সময়ে "দূরে, অন্ধকারে, পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালেন, অনার্য রমণীর সেই জারজ পুত্রটি। এ ঘটনার তিনি তো শেষ দর্শক।" *(পৃ: ১৩১৮, ঐ)* কালকূট ভাবছেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অনার্য মাতা সত্যবতীর সন্তান। ভীষ্ম শান্তনুর ঔরসে দেবী গঙ্গার পুত্র, আর্য সন্তান। কৃষ্ণ দুর্যোধনের কথা অনুযায়ী "কংস-দাস-তনয়", তিনি তো কংসের বন্দীরই ছেলে, এবং তাঁর গায়ের রঙ কালো। এমনকি দ্রৌপদী, পাঞ্চাল রাজকন্যা, তিনিও কালো। পাঞ্চালরাজের ঔরসজাত কন্যা তিনি নন।

ভীষ্মের সঙ্গে দ্বৈপায়ণের কোন অন্তর্বিরোধ ছিল কিনা কালকূট বুঝতে পারছেন না। ব্যাসদেব কি আর্য কুরুকুল থেকেও তাঁর মতো অনার্যদের ধর্মচর্চা বেশি বড় এটাই দেখাতে চেয়েছেন? নাকি কৃষ্ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ, মহাভারতের এই দু'জন কালো পুরুষের কোন গভীর কারসাজি ছিল কুরুকুলকে ধ্বংস করতে? নাকি দুর্যোধনের সন্দেহই ঠিক, যে পাঁচটি ঋষি বালক, যাঁরা কৌরবদের কাছে সিংহাসন দাবি করেছিল, তাঁদের বস্তুত জন্মই হয়েছিল কুরুকুলকে ধ্বংস করতে। ভারত কথাকার ব্যাসদেব এসব ঘটনাবলীতে অস্পষ্টতা রেখেছেন, কালকূট সংশয়ান্বিত। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে 'স্বয়ং ঐতিহাসিক যেখানে ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাঁর পক্ষে কি করেই বা ইতিহাসকে অবিকৃত রাখা সম্ভব ছিল?" *(পৃ: ১৩১৮, ঐ)* কৃষ্ণ যতগুলো কূট পরামর্শ দিয়েছেন, মহাভারতকার একবারও সে কৃষ্ণকে নিষেধ করেন নি। বরং পাণ্ডবপক্ষকে উৎসাহিত করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন। এই ত্রিকালজ্ঞ, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ব্যাসদেবকে তাই কালকূটের মনে হয়েছে তিনি পক্ষপাতদুষ্ট। দুর্যোধনের জন্মের সময় অনেক অশুভ সংকেত দেখা দিয়েছিল, তাই দেখে তিনি মাতা সত্যবতীকে অগ্রিম সংকেত করেছিলেন "সামনে অশুভ দিন আসছে।" *(পৃ: ১৩১৪, ঐ)* তাই, "আজ অগ্রহায়ণের শেষ দিনে, অমাবস্যার অন্ধকারে, দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে সেই অশুভ দিনের সমাপ্তি দেখছেন। ... ঐতিহাসিকের অবিচলিত চোখে, কুরুকুলের শেষ সন্তানের ভয়ংকর অবসান দেখছেন।" *(পৃ: ১৩১৮, ঐ)*

অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা এই তিনজন ভয়ংকর হত্যার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের জন্য রওনা দিয়েছেন। কালকূট অনুসরণ করলেন তাঁদের। তাঁরা প্রথমে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থলের দিকে দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে পাণ্ডব-পাঞ্চালদের জয়ধ্বনি, উল্লাসধ্বনি শুনতে পেলেন। মনের মধ্যে ভয়ংকর ক্রোধ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সেই শব্দে একটু শঙ্কিত হয়ে আবার উত্তরদিকে ফিরে এসে নিকটস্থ লতাজাল সমন্বিত একটি বনের গভীরে প্রবেশ করলেন। তিনজনেই ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত আর পিপাসিত। ঘোড়াগুলোকে চরতে দিয়ে তাঁরা আচমন করে সান্ধ্য উপাসনা সেরে নিলেন। জলপান করে শান্ত হয়ে বসলেন এক বিরাট বটগাছের কাছে। ক্ষতবিক্ষত শরীরে, বন্ধু-আত্মীয়দের "শুক্লা ত্রয়োদশীর

দিন থেকে আজ পর্যন্ত, যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে নানারকম আলোচনা করতে লাগলেন।" *(পৃ: ১৩১৮, ঐ)* তাঁদের আলোচনায় বারে বারেই "কৃষ্ণের প্ররোচনায় পাণ্ডব পাঞ্চালদের কূটযুদ্ধের কথাই ঘুরে ফিরে আসতে লাগল।"*(পৃ: ১৩১৮, ঐ)* কালকূট তাদের আলোচনা ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি দেখেছেন প্রচণ্ড ক্রোধে আর শোকে অশ্বত্থামা কখনও শিশুর মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছেন। পাণ্ডব-পাঞ্চালদের কূটযুদ্ধ ও অন্যায়ভাবে তাঁর পিতার হত্যার দৃশ্য অশ্বত্থামাকে ক্রমশ অসহিষ্ণু ও ভয়ংকর করে তুলেছে। অশ্বত্থামা বলছেন, তাঁর পিতা পাঁচদিনে পাণ্ডব-পাঞ্চালদের ধ্বংসকে অনিবার্য করে তুলেছিলেন মৃত্যুরূপী কালান্তক যমের মত, যা দেখে পাণ্ডব-পাঞ্চালরা রণে ভঙ্গ দেবার কথা ভাবছিল। সেই সময়েই ভীম নিজে অবন্তী থেকে আগত অশ্বত্থামা নামে একটি হস্তীকে গদাঘাতে হত্যা করে "বারে বারে আমার পিতার সামনে এসে চিৎকার করে বলেছে আমি স্বহস্তে অশ্বত্থামাকে হত্যা করেছি। আমার পিতা ভীমকে বিশ্বাস করেন নি।"

যুধিষ্ঠিরের মত সত্যপরায়ণ ব্যক্তি কেমন বাসুদেবের প্ররোচনায় অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিলেন। কালকূট যেন অতীত বিচরণের মধ্যে অশ্বত্থামার সেই বুক চাপড়িয়ে কান্না ভেজা ঘৃণাভরা কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলেন — "পিতাকে আমার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শোনাবার পরেই তাঁর রথের চাকা নেমে গিয়েছিল, ভূমি স্পর্শ করেছিলেন।" *(পৃ: ১৩১৯, ঐ)* এবং যুধিষ্ঠিরের মুখ থেকে সেই মিথ্যা কথা শুনেই, পুত্রশোকে তাঁর পিতা বিচেতন হয়ে অস্ত্রশস্ত্র সমূহ ত্যাগ করেছিলেন। পিতৃশোকে বিহ্বল অশ্বত্থামা কৃপাচার্যকে বলেই চলেছেন কৃষ্ণ জানতেন-- পাণ্ডবদের থেকে পাঞ্চালদের সঙ্গেই দ্রোণাচার্যের জাতক্রোধ বেশি ছিল তাই কৃষ্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকেই দ্রোণাচার্যকে হত্যার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন বারে বারে দ্রোণাচার্যকে শোনাচ্ছিল "আপনার একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামা যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতে নিহত হয়ে পড়ে আছে।" *(পৃ: ১৩১৯, ঐ)* এ কথাও তাঁর পিতা বিশ্বাস করেন নি অশ্বত্থামা কান্না জড়ানো গলায় বলেছেন, কৃষ্ণই একমাত্র জানতেন -- দ্রোণাচার্যের "সংসারে তাঁর পুত্র ছাড়া আর অন্য কিছুর মূল্যই বড় নয়।"*(পৃ: ১৩১৯, ঐ)* কৃষ্ণ এই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছিল কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করে। অশ্বত্থামা দেখেছেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর রথের শ্বেত অশ্বসমূহ দ্রোণাচার্যের রথের শ্বেত অশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে দ্রোণাচার্যকে বিভ্রান্ত দিলেন কিন্তু দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নের চালাকি বুঝতে পেরে অশ্বগুলিকে হত্যা করে তাঁর চলার পথ মুক্ত করেছিলেন। আর ভীম তাঁর ভরদ্বাজ রথের ন্যায় অবিকল একটি রথে আরোহণ করে দ্রোণাচার্যের দিকে ছুটে বলতে লাগলেন — "আপনার পুত্র সমরশয্যায় মৃত হয়ে পড়ে আছে। যুধিষ্ঠিরের মতো সত্যবাদীর কথায়ও আপনার চেতনা হচ্ছে না?"*(পৃ: ১৩২০, ঐ)* ভীমের কথা শুনে দ্রোণাচার্য শেষবারের জন্য অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন, যোগবলে প্রাণত্যাগ করার জন্য। অশ্বত্থামার প্রতিটি বাক্যে পিতার জন্য শোক বিহ্বলতা ঝরে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন কী ভয়ংকর প্রতিহিংসা তাঁর মনের

মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছে। শত্রু বলশালী হলে কূটযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া যদি অপরাধ না হয়, তাহলে পাপ-পুণ্যে, সত্য-ন্যায় এগুলির মূল্য কি? অশ্বত্থামার অন্তরমথিত যন্ত্রণা ক্রমশ অশ্বত্থামাকে অসহিষ্ণু, ক্রুদ্ধ করে। অশ্বত্থামা তাঁর নিজের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ছুটে গিয়েছিলেন দ্রোণাচার্যের কাছে, তিনি বলেছেন "আমি স্বচক্ষেই দেখেছি, পিতা যোগবলে তাঁর তনু ত্যাগ করেছেন। তখন সেই নির্দয় নিষ্ঠুর পাপাচারী ধৃষ্টদ্যুম্ন কী করেছিল?" *(পৃ: ১৩২০, ঐ)*

কৃপাচার্য অশ্বত্থামার কথাকে সংযোজিত করে বলেছিলেন সকলের নিষেধ সত্ত্বেও নিকৃষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্ন উদ্যত খড়্গহাতে জাত ক্রোধবশত: দ্রোণাচার্যকে হত্যা করে তাঁর মুণ্ডু ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। অর্জুনের অনুরোধ "আচার্যকে জীবিতাবস্থায় নিয়ে এসো" এটাও শোনেন নি।

দ্রোণ হত্যায় ভীম উল্লসিত হৃদয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে জড়িয়ে বলেছিল আর মাত্র কর্ণ ও দুর্যোধনকে হত্যা বাকী। এঁদের হত্যা করতে পারলেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে 'সমরবিজয়ী' বলে আবার সম্মান করবেন। তবুও এত দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও অশ্বত্থামা সাত্যকির মধ্যে মনুষ্যত্বের সন্ধান পেয়েছেন। সাত্যকিই ধৃষ্টদ্যুম্নকে "নরাধম, পাঞ্চাল কুলাঙ্গার" বলে পাণ্ডবপক্ষেরই বন্ধুকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে এনে উভয়ের বিবাদ থামিয়েছিলেন। অশ্বত্থামার চোখে এদের বিবাদ এখানেও সেই বাসুদেবেরই হাত। অন্যায়ভাবে পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা 'নারায়ণ অস্ত্র' প্রয়োগ করেছিলেন পাণ্ডবদের ধ্বংস করতে। কালকূট অতীতের সেই যুদ্ধক্ষেত্রে 'নারায়ণ অস্ত্র' প্রয়োগে দেখছেন "সেই আগুনের মত অস্ত্রে, আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়েছিল, দাবানল যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, পাণ্ডব সেনারা সেইভাবে বিনাশ হচ্ছিল, অর্জুন যুদ্ধে উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন।" *(পৃ: ১৩২০, ঐ)*

যুধিষ্ঠির অর্জুনকে যুদ্ধে উদাসীন থাকতে দেখে অনেক স্বয়ং যুধিষ্ঠির তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঞ্চাল সৈন্য, সাত্যকিকে অন্ধক ও বৃষ্ণি সৈন্যদের নিয়ে পালাতে বলেছিলেন। অর্জুনের উদাসীনতা তাতেও কাটেনি তখন স্বয়ং বাসুদেব এগিয়ে এসেছিলেন, পরামর্শ দিয়েছিলেন, অশ্বত্থামার এই অস্ত্র নিবারণ করার এই একমাত্র উপায় আছে। "সকলে অস্ত্র ত্যাগ কর, এমনকি মনেও যুদ্ধ করার ইচ্ছা রেখো না।" *(পৃ: ১৩২১, ঐ)* ভীম অস্ত্র ত্যাগ না করায় অশ্বত্থামার অস্ত্র প্রভাবে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। ভীমের রক্ষার জন্য, অর্জুন সেই অগ্নির ন্যায় অস্ত্রের প্রভাব বরুণাস্ত্রে পরিবর্তিত করেছিলেন ও ভীমকে বাসুদেব ও অর্জুন জোর করে রথ থেকে নামিয়ে অস্ত্র ত্যাগ করিয়েছিলেন।

'নারায়ণ অস্ত্রে'র যুদ্ধের ভয়ংকরতার সঙ্গে একজন শোকার্ত ভয়ংকর মানবিক মুখ কালকূট অতীত থেকে তুলে এনেছেন, সেইসঙ্গে যুদ্ধের ভয়াবহতা। পাণ্ডবদের অস্ত্রত্যাগেও ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা থেমে থাকেন নি। ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করেছিলেন। কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মার মধ্যে পরস্পর

অমিতবলশালী অশ্বত্থামার সঙ্গে পাণ্ডবপক্ষের সকল বীরদের কী অবস্থা হয়েছে, কৌরবপক্ষের বীর কর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন এঁরা কিভাবে অশ্বত্থামাকে সাহায্য করতে ছুটে এসেছিলেন, ভীম যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়েছিলেন বলে অশ্বত্থামা শঙ্খ বাজিয়েছিলেন, সবকিছুই আলোচনা চলতে লাগল। আর কালকূট অতীতের ঐসব বীরযোদ্ধাদের সেকালের উপযোগী কথা বলিয়ে নিয়ে এই পার্থিব জগতের রক্তমাংসের মানবিক চরিত্রে রূপ দিলেন। তাঁদের ব্যথা-বেদনা, প্রতিহিংসা, সুখ-দুঃখ সবকিছুই তিনি অতীত তুলে নিয়ে এনে বর্তমানের আলোকে আলোকিত করলেন। মহাভারতের একটি প্রতিহিংসাপরায়ণ, বীভৎস চরিত্র অশ্বত্থামার মনের অন্তর্বেদনা, ভাবনা-চিন্তা সবকিছু একালের দৃষ্টিতে তুলে ধরে কথক ঠাকুরের মত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষদিনের দিকে কাহিনীকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। কালকূট যেন শুনতে পাচ্ছিলেন তাঁর অতীত পদচারণাকে।

অশ্বত্থামা ক্রমেই গলার স্বর চড়াতে চড়াতে অরণ্যের অন্ধকার রাত্রিকে কাঁপিয়ে তুলতে লাগলেন। তাঁর প্রচণ্ড হুঙ্কারে বনের পাখিরাও ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল এবং পশুরা আরো দূরে চলে গেল।

অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা তিনজনেরই আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের দিনগুলোর, বিশেষত, দ্রোণাচার্যের সৈনাপত্যে দ্রোণাচার্যের বীরত্ব, যুদ্ধ-নৈপুণ্যর কথাই উঠে এসেছে। কালকূট নিজে যেন দ্রোণাচার্যের যুদ্ধ নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করছেন। যুদ্ধকালীন সময়ে বহু ঘটনাবলী কালকূট পর্যবেক্ষণ করেছেন। কিন্তু অমাবস্যার গভীর অন্ধকার রাতে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার আলাপ-আলোচনা আর একবার শুনলেন। যুদ্ধকালীন সময়ে দ্রোণ হত্যার কারণে অশ্বত্থামার তীব্র ক্রোধে জ্বলে উঠে 'নারায়ণ অস্ত্র' প্রয়োগও দেখেছেন। কী বিধ্বংসী ছিল সেই অস্ত্রের প্রয়োগ। অর্জুনকে যে অব্যর্থ অস্ত্র ছুঁড়েছিলেন তার ভয়াবহ অগ্নিশরজালে স্বয়ং বাসুদেব সহ অর্জুন অতি উত্তপ্ত ধূমরাশির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন তাও দেখেছেন।

অশ্বত্থামার অস্ত্র প্রয়োগ ব্যর্থ হয়েছিল কৃষ্ণের কূটবুদ্ধির জন্য, আর দ্রোণাচার্যর ভয়ংকর মারণাস্ত্র সকল প্রয়োগ ও যুদ্ধনৈপুণ্য সবই ব্যর্থ হয়েছিল বাসুদেবের কূটবুদ্ধির ফলেই। কালকূট অত্যন্ত সহানুভূতি, সহমর্মিতার সঙ্গে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্যর আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে তাঁদের মনের বিশেষত অশ্বত্থামার মানসিক অবস্থাগুলোকে অবলোকন করেছেন এবং বেদনা, রাগ, অভিমান, প্রতিহিংসা, অস্থিরতা ইত্যাদি নিপুণভাবে কথাকারের মতো লিখে চলেছেন। কথাকারেরা গল্প কাহিনী সুন্দর করে সুরের মাধ্যমে শ্রোতার কর্ণকুহরে পৌঁছে দেন। কালকূট নিপুণ গল্পকার, তিনি যেভাবে ইতিহাস থেকে চরিত্র, ঘটনাগুলোকে তুলে এনে একালের উপযোগী করে বর্ণনা করেছেন, তাতে চরিত্র, ঘটনাগুলো মহাভারতের চরিত্র হিসাবেই রয়ে যায়নি। তাঁদের দুঃখ-বেদনা-

প্রতিহিংসা-নিষ্ঠুরতা এমনভাবে পর্যবেক্ষন করেছেন যে তাঁর কাহিনীতে একালের দৃষ্টিতে চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে নিজের উপলব্ধির কথা, বিশ্বাসের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। মহাভারতের চরিত্রগুলো পার্থিব জগতের মানব-মানবীতে পরিণত হয়েছে লেখকের লেখনীর টানে।

অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হয়ে। সেই দায়িত্ব তিনি পালন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রতিশোধকামী সেনাপতি।

গভীর বনমধ্যে যুদ্ধালোচনা করতে করতে অনেক রাত্রিতে কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য ভূমিশয্যায় শুয়ে পড়ামাত্র গভীর নিদ্রায় ডুবে গেলেন। কালকূট দেখছেন কী গভীর যন্ত্রণায় অশ্বত্থামা চিৎকার করে কেঁদে উঠছেন। যেখানে অশ্বত্থামা বসে আছেন, তার অদূরেই ছিল একটি সহস্র শাখা বিশিষ্ট বটগাছ। পাতা ঝরে যাওয়ায় বায়সদের বাসাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সহসা অশ্বত্থামা দেখতে পেলেন গরুড়ের মত পিঙ্গলবর্ণ একটি পেচক, অন্ধকারে তার চোখ জ্বলজ্বল করছে, বৃহৎ তার চঞ্চু আর ধারালো নখ। সে আস্তে আস্তে বায়সদের বাসাগুলি আক্রমণ করে কারো মাথা, কারো ডানা, কারো পা ছিন্ন করতে লাগল। সেই উলুক প্রায় সবাইকে হত্যা করে চলে গেল, মৃতদেহগুলি গাছের নীচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইল।

কালকূট অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে অশ্বত্থামা অন্তর গভীরে ডুব দিয়ে অশ্বত্থামার মানসিক পরিবর্তন দেখলেন, এই দৃশ্য দেখে অশ্বত্থামার মনে হল "ঐ উলুক সহসা রাত্রের অন্ধকারে সবেগে উপস্থিত, শত্রু নিধন করে, তাকেই যেন উপদেশ দিয়ে গেল, বৈরী নির্যাতন করতে হলে, এভাবেই করতে হয়। এভাবেই শত্রুর বিনাশ করতে হয়। বিশেষ শত্রু যখন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়, নিরস্ত্র থাকে, তখনই তাকে আচমকা আক্রমণ করে মারা উচিত।" *(পৃ: ১৩২১, ঐ)* পাণ্ডবরা বলশালী, তিনি যুদ্ধের নিয়ম মেনে তাদের সঙ্গে পেরে উঠবেন না অতএব অর্ধ রাত্রি সময়ে নিদ্রিত শত্রুদের বিনাশ করবেনই এই ভেবে তিনি কৃতবর্মা ও তাঁর মাতুল কৃপাচার্যকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কী ভাবে নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবেন সেই কথা বললেন।

কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা তাঁকে অনেক বোঝালেন, এ নিন্দনীয় হত্যাকার্য থেকে বিরত হওয়ার জন্য।

এরপর কৃপাচার্য অশ্বত্থামাকে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের কাছে গিয়ে পরামর্শ নেওয়ার কথা বললেন। আরও বললেন পরদিন ভোরে সুস্থভাবে সবল হয়ে অবশিষ্ট সৈন্যদল আবার যুদ্ধ করবেন। কৃপাচার্য-র কথা শুনে অশ্বত্থামার ক্রোধ আরও বেড়ে গেল।

অতীতচারী লেখক কালকূট অশ্বত্থামার তীব্র ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ দেখলেন। কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা তাঁকে এই দুরন্ত প্রতিশোধের ক্রুর প্রতিজ্ঞা থেকে প্রতিহত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা সেই পিতৃহত্যার প্রতিশোধের ক্রুর প্রতিজ্ঞায় অনড় রইলেন এবং "আমাকে আটকাবে

এমন ক্ষমতা আজ ভূমণ্ডলে কারোর নেই।" *(পৃ: ১৩২৩, ঐ)* — এই কথা বলে অশ্বত্থামা উঠে মৃত কাকগুলোকে আর একবার দেখে ঘোড়ায় উঠে বসলেন। কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য আহ্বান করলেন — "তোমাদের ইচ্ছা হয় বর্ম ধারণ কর, কার্মুক আর খড়্গ নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।" *(পৃ: ১৩২৩, ঐ)*

কালকূট দেখছেন, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা অশ্বত্থামাকে থামাতে পারলেন না, অবশেষে তাঁরাও অশ্বত্থামার সঙ্গী হলেন, "কারণ — "আজ অশ্বত্থামা সেনাপতি। অন্ধকার ঘোর নিশীথে, তিনজনকে যজ্ঞকুন্ডে প্রজ্জ্বলিত আহুনীয় দক্ষিণ ও গার্হপত্য অগ্নিত্রয়ের মত দেখাতে লাগল। তিনজন অরণ্য ছেড়ে, ঘুমন্ত নিস্তব্ধ পাণ্ডব শিবিরের দিকে এগিয়ে চললেন।"*(পৃ: ১৩২৩, ঐ)*

তাঁরা পাণ্ডব শিবিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হলেন। এই সময়ে অশ্বত্থামার চোখের সামনে ভেসে উঠলেন চন্দ্র আর সূর্যের মত এক মহাকায় পুরুষ যার বাহুতে সর্পের বলয়। গলায় সর্পোপবীত, ভীষণ তাঁর চেহারা— "তাঁর মুখ নাক আর সহস্র চোখ থেকে ভয়ঙ্কর তেজরাশি নির্গত হচ্ছিল, আর সেই তেজরাশির মধ্যে অসংখ্য শঙ্খগদাচক্রধারী হৃষিকেশ প্রাদুর্ভূত হতে লাগলেন।" *(পৃ: ১৩২৩, ঐ)* অশ্বত্থামা এই দৃশ্য দেখে সেই তেজদীপ্ত পুরুষকে এক প্রদীপ্ত আগুনের শিখার মত রক্ষশক্তি ছুঁড়ে মারলেন। এরপর বিশাল নীলবর্ণ, সোনার হাতলযুক্ত এক খড়্গ, ইন্দ্রধ্বজের মত এক গদা ইত্যাদি অস্ত্র সকল মারতে লাগলেন। কিন্তু সেই পুরুষকে কিছুই করতে পারলেন না। "তিনি দেখলেন সেই মহাকায় পুরুষের শরীর থেকে বিনির্গত অসংখ্য হৃষিকেশ আকাশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে।"

কালকূট দেখছেন সেই ভয়ঙ্কর রাতের অশ্বত্থামাকে। শঙ্কিত অশ্বত্থামা মাতুল কৃপাচার্যর কথা অনুযায়ী তাঁর পুরুষকারের সঙ্গে দৈবকে যোগ করার জন্য অশ্ব থেকে নেমে সেখানেই শিবের আরাধনা করতে বসে গেলেন। প্রার্থনা করলেন এই বলে যদি তিনি আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারেন, তাহলে তিনি তাঁর শরীরের পঞ্চভূত শিবকে উপহার দেবেন।

কালকূট অতীতের যুদ্ধক্ষেত্রে পদচারণায় যেন শুনতে পেলেন অশ্বত্থামার সেই প্রার্থনা। তিনি আরও লক্ষ্য করছেন — এত যে ঘটনা অশ্বত্থামার চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে তা কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা দেখতে পেলেন না। কালকূট তাঁর আধুনিক যুক্তিতে বলছেন, এ সবই অশ্বত্থামার অবচেতন মনের ঘটনা। অবচেতন মনের ঘটনা না হলে তো কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য ওই মহাকায় পুরুষকে দেখতে পেতেন।

কালকূটের দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে অশ্বত্থামার অবচেতন মনের ক্রিয়াকাণ্ড। অশ্বত্থামার চোখের সামনে একটি কাঞ্চনময় বেদীতে হুতাশনের আবির্ভাব হল। তারপরে অদ্ভুত ও বিচিত্র দর্শন বিচিত্র অঙ্গদধারী তাঁর কাছে আসতে লাগল। তাদের কারো কারো দেহের আকার কুকুর, বেড়াল, বরাহ,

উষ্ট্র, ঘোড়া ইত্যাদি পশুর মত, মুখ মানুষের মত। তারা শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ভেরী ইত্যাদি বাজাতে লাগলেন।

কেউ শুনতে পেল না তাদের বাজনার শব্দ। তারা ভয়ঙ্কর মূর্তিতে অশ্বত্থামার দিকে ধেয়ে এল কিন্তু অশ্বত্থামা ভয় পেলেন না। বরং তিনি নিজে ওই বেদীতে গিয়ে বসলেন এবং নিজেকে নিবেদন করে প্রার্থনা করতে লাগলেন। হুতাশনে প্রবেশ করে দু'হাত তুলে নির্বিকার রইলেন। অবশেষে রুদ্র তাঁর সামনে এসে বললেন "কৃষ্ণের সম্মান রক্ষা আর তোমার বলবীর্য পরীক্ষার্থে আমি পাঞ্চালদের মায়াবলে রক্ষা করছিলাম। কিন্তু পাঞ্চালরা কালগ্রস্ত হয়েছে। আজ আর তাদের জীবন রক্ষা করা যাবে না।" *(পৃ: ১৩২৪, ঐ)* এই কথা বলে ভূতভাবন মহাদেব অশ্বত্থামাকে একটি সুনির্মল খড়্গ দান করে নিজে অশ্বত্থামার শরীরে প্রবেশ করলেন।

কালকূট বলছেন, এইসব ঘটনা অশ্বত্থামার অবচেতন মনে ঘটেছিল পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশের পূর্বে, অবচেতন মন থেকে উত্তরণের শক্তি আয়ত্ত করেছিল। তিনি বলছেন, সাধারন মানুষ যেমন দ্রব্যগুণের দ্বারা নিজের মনকে শক্তিশালী করে, বেপরোয়া করে, তিনি মানসিক ক্ষমতার দ্বারা সেই বেপরোয়া ভাব অবলম্বন করলেন।" *(পৃ: ১৩১৪, ঐ)*

এই মানসিক শক্তি আয়ত্ত করে অশ্বত্থামা পাণ্ডব শিবিরের প্রধান দ্বারে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে পাহারায় রেখে নিজে পিছনের গুপ্ত দ্বার দিয়ে শিবিরের মধ্যে প্রবেশ আলো জ্বলছে, অশ্বত্থামা দেখলেন সকলেই নিদ্রামগ্ন রয়েছে। তাঁরা তাদের কবচ খুলে রেখেছে, নিরস্ত্রও বটে। প্রথমে ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়নকক্ষ খুঁজে বার করলেন। রমণীরা নানাভাবে শায়িতা, কারোও বস্ত্র অবিন্যস্ত, কারও অলঙ্কার খুলে পড়েছে। চারিদিকে ছড়ানো পুষ্পমাল্য, তারা সুখে নিদ্রা যাচ্ছে। তারপরেই দেখলেন ধৃষ্টদ্যুম্নকে — অকুতোভয়ে নিশ্চিন্তে গভীর নিদ্রামগ্ন। কালকূট লক্ষ্য করছেন অশ্বত্থামাকে। ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখামাত্র অশ্বত্থামার মূর্তি ভয়ঙ্কর হল। পদাঘাতে তাকে জাগিয়ে দিলেন। আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চোখ মেলে তাকাতেই অশ্বত্থামার ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখতে পেলেন। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু অশ্বত্থামার রুদ্রমূর্তির সঙ্গে পেরে উঠলেন না। ঘুম চোখে এই ভয়ঙ্কর মূর্তির সামনে নিজেকে প্রতিহত করতে ভুলে গেলেন। বিহ্বলতা কাটিয়ে ওঠার আগেই "অশ্বত্থামা তাঁর এক পা ধৃষ্টদ্যুম্নের বুকের উপর চেপে আর এক পা দিয়ে তাঁর গলা চেপে ধরে সজোরে নিষ্পেষণ করতে লাগলেন।" *(পৃ: ১৩২৪, ঐ)*

দ্রুপদ পুত্র তাঁর শাণিত নখ দিয়ে অশ্বত্থামার পা ক্ষতবিক্ষত করতে করতে তাঁকে বলেছিলেন যে অশ্বত্থামা তাকে যেন অস্ত্র দ্বারা সংহার করেন, তাহলে সে পবিত্রলোকে যেতে পারবে। কালকূট দেখছেন পাণ্ডব সেনানায়ক অশ্বত্থামার অর্তকিতে আক্রমণে নিজেকে রক্ষা করতে পারছেন না। তিনি ক্ষত্রিয়, অস্ত্রাঘাতেই মরতে চান। কিন্তু অশ্বত্থামাকে নিষ্ঠুরতা পেয়ে বসেছে।

প্রচণ্ড ক্রোধে তাঁর হৃদয়ে হত্যার বাজনা বাজছে। ক্রূর হেসে বললেন "আচার্য হন্তা কুলাঙ্গার, কোন পবিত্রলোকে তুই যেতে পারবি না। তোকে আমি শস্ত্র দ্বারা হত্যা করব না।" *(পৃ: ১৩২৪, ঐ)* কালকূট দেখছেন, অশ্বত্থামার মনে হত্যার আগুন জ্বলছে। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতায় দুই পায়ে পিষে ধৃষ্টদ্যুম্নকে হত্যা করে, আনন্দে সিংহনাদ করে অন্যান্য শত্রু সংহারের জন্য ধৃষ্টদ্যুম্নের কক্ষ কালান্তক যমের মত ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে গেলেন।

সেই মূর্তি কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে পাঞ্চাল রমণীরা বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল ও রক্ষকরা ভয়ে চিৎকার করতে লাগল। অন্যান্য বীরেরা তাঁদের চিৎকারে ধৃষ্টদ্যুম্নের শিবিরে এসে জানতে পারল সেই ভয়ানক হত্যার ঘটনা। "সে কি মানুষ বা অন্য কোন নিশাচর প্রাণী, তা আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না।" *(পৃ: ১৩২৪, ঐ)* এই কথা শুনেই শিবিরের অন্যান্য যোদ্ধারা অশ্বত্থামাকে ঘিরে ধরল, কিন্তু অশ্বত্থামার রুদ্র রূপের কাছে কেউই যুদ্ধ করতে পারল না। সকলেই বিনষ্ট হল। এরপর উত্তমৌজাকেও ধৃষ্টদ্যুম্নের মতোই বুকে ও পায়ে চেপে নিষ্পেষিত করতে লাগলেন। তাঁকে নিষ্ঠুর ভাবে পায়ে চেপে হত্যা করে যুধামন্যুকে হত্যা করতে গেলেন। যুধামন্যু অশ্বত্থামাকে গদা দিয়ে বুকে আঘাত করলেন। দ্রোণপুত্র ঝটিতি সেই আক্রমণ প্রতিহত করে যুধামন্যুকে সেই একইভাবে চেপে ধরে পায়ে পিষে মারলেন।

কালকূট সুদূর অতীতের এক পিতৃহারা বীরযোদ্ধাকে দেখছেন, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে প্রচণ্ড জিঘাংসায় অশ্বত্থামা হত্যালীলায় মেতে উঠেছেন। ভয়ঙ্কর তাঁর মূর্তি, দুর্নিবার তাঁর হত্যার উন্মাদনা। যাকে সামনে পাচ্ছেন তাঁকেই নির্বিচারে হত্যা করছেন, কখনও পাঞ্চাল শিবিরের শায়িত বীরদের, কখনও হস্তী, অশ্ব, কেউ রেহাই পাচ্ছে না। সকলের রক্তে তাঁর সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত।— "খড়্গহাতে কালান্তক যমের ন্যায় সেই রক্তমাখা মূর্তি দেখে, তাঁকে ভীষণ এক প্রাণী বলে মনে হল। সকলে তাদের সামনে বিরাট এক রাক্ষস উপস্থিত ভেবে, ভয়ে চোখ নামিয়ে বসে রইল।" *(পৃ: ১৩২৪, ঐ)*

কালকূট পাঠককুলকে হত্যালীলার রঙ্গমঞ্চে নিয়ে এসেছেন। এক ভয়ঙ্কর পৈশাচিক হত্যা লীলার দৃশ্য দেখাতে একের পর এক পর্দা তুলছেন। শোকে ও প্রতিহিংসায় অশ্বত্থামা অমিত বলশালী হয়ে উঠেছেন অগ্রহায়ণের অমাবস্যার করাল রাত্রিছায়ে। রাত্রির অন্ধকারের "সেই পেচকের" কাকেদের হত্যার মত অশ্বত্থামা একের পর এক পাঞ্চাল বীর সৈন্য, অশ্ব, হস্তী সব নির্বিচারে হত্যা করে যাচ্ছেন, পৃথিবীর ভয়ঙ্কর ঘাতক হয়ে উঠেছেন। সাক্ষাৎ কৃতান্তের মতো পাঞ্চাল শিবিরের চারপাশে ঘুরছেন হত্যালিপ্সায়। ঘুরতে ঘুরতে দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র ও অবশিষ্ট সোমকগণকে দেখতে পেলেন। দ্রৌপদীর পুত্ররা শিখণ্ডীসহ অশ্বত্থামাকে শরজালে নিপীড়ন করতে লাগলেন। কিন্তু অগ্রহায়ণের এই অমাবস্যার রাতে অশ্বত্থামা অবধ্য। সুবর্ণ নির্মিত খড়্গ নিয়ে

"সর্বপ্রাণ দ্রৌপদীপুত্র প্রতিবিম্বের কুক্ষিদেশ ছেদন করে নিহত করলেন। তখন সুতসোম প্রাস দ্বারা অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করলেন। অশ্বত্থামা রুদ্র হয়ে সুতসোমের তলোয়ার ধরা হাতসহ পার্শ্বদেশে খড়্গাঘাত করে ছেদন করে নিধন করলেন।" বীভৎসভাবে অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পুত্রদের হত্যা করছেন। নকুলপুত্র শতানীকের গলা কেটে ফেললেন ও মহাবীর শ্রুতবর্মার মুখ খরগদ্বারা বিকৃত করে দিয়ে হত্যা করলেন। অতঃপর দ্রৌপদীর শেষ পুত্র শ্রুতকীর্তি শর বর্ষণ করা মাত্র অশ্বত্থামা তার শিরচ্ছেদ করলেন। শিখণ্ডী অশ্বত্থামার ললাট লক্ষ করে অস্ত্র নিক্ষেপ করামাত্র অশ্বত্থামা তাঁকে কেটে দু'টুকরো করে ফেললেন। পাঞ্চালদের প্রতি ক্রোধে অশ্বত্থামা একটির পর একটি হত্যা করে যাচ্ছেন। কালকূট অশ্বত্থামার অন্তরের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছেন। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে অশ্বত্থামা পাঞ্চালদের প্রতিই ক্রুদ্ধ আর ঘৃণা পোষণ করছেন বেশি। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের সঙ্গে দ্রোণাচার্যর শত্রুতা ছিল বেশি। ঘটনা প্রবাহে সেই শত্রুতা দ্রোণাচার্য পুত্র অশ্বত্থামার মনে প্রবল হয়ে প্রতিহিংসার রূপ নিয়েছে।

এরপরে তিনি বিরাটরাজার অবশিষ্ট সৈন্যদল, সুহৃদ, সকল পুত্র পৌত্রদেরও নিধন করতে লাগলেন। সাধারণ সৈন্য এই ঘটনাকে ভৌতিক ঘটনা বলে মনে করে যে যেদিকে পারছে পালাতে শুরু করেছে। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই! দ্বারের কাছে কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য দাঁড়িয়ে আছেন। কৃতান্তের মত তাঁরা প্রাণ নিয়ে কাউকে বাইরে আসতে দিচ্ছেন না। একসময়ে তারা শিবিরের তিনটি স্থানে আগুন ধরিয়ে দিলেন।

কালকূট সেই ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন এইভাবে— "শিবির আলোকময় হওয়াতে, অশ্বত্থামা যেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন। হত্যায় হত্যায় রক্তের বন্যা বয়ে যেতে লাগল। অনেকে আগুনে পুড়ে মরতে লাগল। রমণীরা লজ্জা ত্যাগ করে নগ্নাবস্থায় ছুটতে লাগল।"*(পৃ: ১৩২৫ ঐ)* মৃত্যুভয়ে সৈন্যরা দ্বারপাল, রক্ষীরা অশ্বত্থামাকে "অন্য ভয়ানক শক্তি ভেবে পালাচ্ছে।" *(পৃ: ১৩২৫, ঐ)*

হত্যার বিভীষিকাময় চিত্র কালকূট যেভাবে অতীতের সেই ভয়ঙ্কর দিনটিকে ফিরিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই ভাবেই হত্যার বিভীষিকাকে, ভয়ঙ্করতাকে নিপুণ লেখনীর গুণে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই ভয়ঙ্কর হত্যালীলার প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তখন পাণ্ডব যোদ্ধাগণ দেখলেন, "রক্তবদনা, লোহিতনয়না, রক্তমালানুলেপনা, রক্তবস্ত্রধারিণী, কালরাত্রি কৃষ্ণবর্ণা অসংখ্য অশ্ব, কুঞ্জর, অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র, মুক্তকেশ মহারথীদের ভীষণ পাশে আবদ্ধ করে প্রস্থানে সমুদ্যত।" কালকূট জেনেছেন— এইরকম একটি স্বপ্ন পাণ্ডবরা যুদ্ধের প্রতিরাত্রেই দেখতেন। বিভীষিকাপূর্ণ হত্যার ঘটনা মহাকাব্যে বিধৃত আছে, কিন্তু কালকূট সেই বিভীষিকাপূর্ণ হত্যার ঘটনা বর্ণনে মহাকাব্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। অন্যায়ভাবে পিতৃহত্যা ও দুর্যোধনকে নিহত করার জন্য অশ্বত্থামা কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিলেন লেখক কালকূট তাঁর মানসিক অবস্থার প্রতিটি মুহূর্ত লক্ষ্য

করেছেন; তার যন্ত্রণাকে, প্রতিহিংসাকে, হত্যার উন্মাদনাকে আশ্চর্য দক্ষতায় মানবিক করে তুলেছেন।

কী প্রচণ্ড শোক, ঘৃণা, ক্রোধ, প্রতিহিংসাপরায়ণতা অশ্বত্থামার মনে সঞ্চিত হয়েছিল একে একে বিভিন্ন উক্তি, প্রতি-উক্তির মধ্য দিয়ে কালকূট তুলে ধরেছেন। তিনি মানসভ্রমণে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রতিটি স্থানে গেছেন এবং তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা ঘটনাবলীতে তাঁর আধুনিক, অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' লেখার মধ্য দিয়ে। অতীতের দৃশ্যাবলীকে আধুনিক দৃষ্টিতে দেখে তাকেই অনবদ্য দক্ষতায় লেখনীর দ্বারা চিত্রে পরিণত করেছেন। পাঠককুলের সামনে অতীতের সেই ভয়াবহ দৃশ্যকে উপস্থাপিত করেছেন। শুধু একটি অমাবস্যার অন্ধকারময় করাল রাত্রির জিঘাংসাকে একালের আঙ্গিকে রূপ দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর যুক্তিবাদী মন নিয়ে অতীতের ঘটনাবলীকে দেখেছেন এবং তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তাই লেখনীর যাদুছন্দে ফুটিয়ে তুলেছেন।

একটি অন্ধকার কালো রাত্রির পৈশাচিক হত্যার পিছনে অশ্বত্থামার তীব্র মানসিক যন্ত্রণাকে কালকূট পরতে পরতে অনুভব করেছেন। অমাবস্যার মধ্যরাত্রি থেকে রাত্রি শেষ হওয়া পর্যন্ত, মাত্র কয়েকটি ঘণ্টা বা প্রহরের জন কৌরবপক্ষের শেষ সেনাপতি যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, পাঠককুলকে সেই ঘটনার রঙ্গমঞ্চে নিয়ে এসেছিলেন কালকূট। এই ঘটনাই গল্পকারের বলার গুণে তা ভ্রমণকাহিনী থেকে উপন্যাসের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। এখন দেখা যাক্ কালকূটকে অনুসরণ করে, কালকূট আর কী দেখলেন হত্যারঙ্গনাট্যর শেষ অঙ্কে।

অশ্বত্থামার হত্যালীলা শেষ! প্রত্যুষে সারা অঙ্গ হত্যার রক্তে রক্তাপ্লুত। কালকূট দেখেছেন অশ্বত্থামার মুখে প্রশান্তির ছাপ। নিজেকে পরম সৌভাগ্যমণ্ডিত মনে করে আহ্লাদিত হয়ে কৃপাচার্য আর কৃতবর্মাকে বললেন "আমি দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, সমস্ত পাঞ্চাল, সোমক আর মৎস্যগণকে ধ্বংস করেছি আর বিলম্বের দরকার নেই। এখন কুরুরাজ দুর্যোধনের কাছে যাব। তিনি জীবিত থাকলে তাঁকে এ সংবাদ দেব।" *(পৃ: ১৩২৫, ঐ)*

দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে এসে অশ্বত্থমা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা দেখলেন, দুর্যোধন রক্তবমি করছেন। মাংসভুক পশুরা তাঁকে ছিন্নভিন্ন করেছে। তিনজনেই ঘোড়া থেকে নেমে দুর্যোধনের পরিণতি দেখে শোক প্রকাশ করলেন এবং শোনালেন সেই পরম বার্তা 'পাঞ্চালদের নিধন'। অশ্বত্থামা তাঁর সেনাপতির দায়িত্ব ও প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন। মৃত্যুপথযাত্রী দুর্যোধন পাণ্ডব-পাঞ্চালদের নিধনের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে বলেছিলেন যে তিনি তাদের ইন্দ্রতুল্য জ্ঞান করছেন এবং তাদের সঙ্গে স্বর্গেই আবার দেখা হবে। অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করার পরই — "দুর্যোধন চিরদিনের জন্য চোখ বুজলেন।" *(পৃ: ১৩২৫, ঐ)* এরপর

অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য সেই স্থান পরিত্যাগ করে নগরের দিকে চলে গেলেন। কালকূট দুর্যোধনের মৃত্যু দৃশ্যকে বেদনা ও প্রতিহিংসার তুলিতে দৃশ্যায়িত করে তুলেছেন। কী নিদারুণ সেই মৃত্যুদৃশ্য!

এরপরই কালকূট পাণ্ডব শিবিরে চোখ রেখেছেন। সহদেব দ্রৌপদীকে সেই হত্যাক্ষেত্রে নিয়ে আসতেই দ্রৌপদী নিজ পুত্রদের মৃতদেহ দেখে সংজ্ঞাহারা। জ্ঞান ফিরে পেতেই ক্রুদ্ধ দ্রৌপদী রাগ করে যুধিষ্ঠিরকে বলেই ফেলেছিলেন যে পুত্রদের কালকবলে নিক্ষেপ করে কীভাবে তিনি রাজ্যভোগ করবেন? অশ্বত্থামাকে সংহার না করলে তিনি প্রয়োপবেশন করবেন। অশ্বত্থামা বহুদূর পালিয়ে গেছে তাঁকে যে সম্ভব নয় এ'কথা দ্রৌপদী বুঝতেই চাইলেন না। জেদ ধরে দ্রৌপদী অবশেষে ভীমকেই অনুরোধ করতে লাগলেন পুত্রহত্যাকারী অশ্বত্থামাকে হত্যা করার জন্য। ভীম শোকাতুরা জননীর কথা ফেলতে পারলেন না, তিনি অশ্বত্থামাদের ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন ধরে এগোতে থাকলেন।

এখানে কালকূটের দৃষ্টিতে একটি উঠে এসেছে সেটি হল দ্রৌপদীর প্রতি ভীমের অনুরাগ। তাঁর বিশাল চেহারা, গদাযুদ্ধে নিপুণতা সবকিছু ছাপিয়ে এখন নরম, কোমল অনুরাগী মন উঁকি দিয়েছে বারে বারে। দ্রৌপদীই ভীমকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন ভীমের সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা, ভীম দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করে নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছিলেন। অতএব ভীম এবারও এগিয়ে চললেন কিন্তু কৃষ্ণ জানতেন। ভীম অশ্বত্থামার সঙ্গে পেরে উঠবেন না, কারণ অশ্বত্থামার কাছে "ভয়ঙ্কর অস্ত্র আছে", এতে অশ্বত্থামার মৃত্যু তো দূরের কথা, বরং ভীমেরই মৃত্যু হবে। তাই কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির আর অর্জুনকে নিয়ে রথ ছোটালেন ভীমের পিছু পিছু। অশ্বত্থামা ব্যাসদেবের আশ্রমে গিয়ে গঙ্গার তীরে বসেছিলেন। ব্যাসদেব ও নারদ স্নান করছিলেন। ভীমকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে অশ্বত্থামা উঠে দাঁড়ালেন। আরও দেখলেন তাঁর পেছনেই স্বয়ং বাসুদেব উপস্থিত অর্জুন আর যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে। "পাণ্ডবরা ধ্বংস হোক" এই কথা বলে অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন তৎক্ষণাৎ দ্রোণপোদিষ্ট দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে বাধ্য হলেন ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিহত করার জন্য। ব্যাসদেব ও নারদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন — "ক্ষত্রিয় বীরেরা কখনো তাদের দিব্যাস্ত্র ত্যাগ করে মুনিঋষিদের জীবন বিপন্ন করেনি।" *(পৃ: ১৩২৫, ঐ)*

অর্জুন তাঁদের ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে তার দিব্যাস্ত্র ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র ফেরাতে না পেরে মুনির শাপের ভয়ে ভয়ার্তচিত্তে বললেন — "আমি ব্রহ্মাস্ত্র প্রত্যাহার করতে পারছি না। আপনারা বিহিত করুন। নইলে পাণ্ডবগণসহ সকলের মৃত্যু হবে।" *(পৃ: ১৩২৬, ঐ)* ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী ব্রহ্মাস্ত্র বর্তমানে পরমাণু বোমার মতই। যা মানবকুলকে ধ্বংস করে দেয়, ধ্বংস করে মানবের সৃষ্টিকে। প্রকৃতিকে করে দেয় বন্ধ্যা। অশ্বত্থামা সেইরকম ব্রহ্মাস্ত্রই প্রয়োগ করেছিলেন।

এর আগেও তিনি প্রায় এরকম মানব বিধ্বংসী 'নারায়ণ অস্ত্র' সহ আরও কিছু দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন, যা পাণ্ডবশিবিরে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। স্বয়ং বাসুদেব ও অর্জুন তাঁর আগুনের গোলার মত অস্ত্র প্রয়োগে প্রচণ্ড ধূমরাশির মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন। এবারও অশ্বত্থামা সেই প্রাণঘাতী, পরিবেশ ধ্বংসকারী দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন, যাকে প্রতিহত করার পদ্ধতি তিনি জানতেন না। কালকূট বারে বারে বলেছেন, ইতিহাসকার প্রচ্ছন্নভাবে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। কালকূটের বক্তব্যকে সমর্থন করে বলা যায় এবার ব্যাসদেব পাণ্ডবদের নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রক্ষা করলেন পরোক্ষে। লেখনী তো ইতিহাসকারের হাতে। তাই এবারে ক্রুদ্ধ ব্যাসদেব অশ্বত্থামাকে বললেন— "তোমার দিব্যাস্ত্র পাণ্ডবদের হত্যা করতে সমর্থ না হলেও, পাণ্ডবদের গর্ভবতী রমণীদের গর্ভনাশ হবে। তাই হোক্, কিন্তু তোমার মাথার মণি পাণ্ডবদের দিতে হবে।" *(পৃ: ১৩২৬, ঐ)* যে মণি তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই 'সহজমণি' দিতে অশ্বত্থামা রাজি হলেন না। তিনি শুধু ব্যাসদেবের কথা রাখতে অর্থাৎ ব্যাসদেবেরই সাহায্যে তার দিব্যাস্ত্র প্রয়োগের ব্যাপক ধ্বংসের প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করলেন। কিন্তু "পাণ্ডবদের গর্ভবতী রমণীদের গর্ভনাশ করলেন।" *(পৃ: ১৩২৬, ঐ)*

কৃষ্ণ এবার তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন ও বলে দিলেন দ্রোণাচার্য পুত্রকে "তুমি যা ভেবেছ তা কখনো হবে না, উত্তরার গর্ভ কখনো নষ্ট হবে না। তার গর্ভজাত পুত্র জন্মাবে, মৃত্যু হবে, কিন্তু সে আবার বেঁচে উঠবে, এই হল ভবিতব্য। অতএব তুমি, সময় থাকতে তোমার মাথার মণি পাণ্ডবদের দান কর।" *(পৃ: ১৩২৬, ঐ)* ব্যাসদেবও কৃষ্ণকে সমর্থন করলেন। অশ্বত্থামা সারাজীবন ব্যাসদেবের সঙ্গে অরণ্যে বাস করবেন মনে মনে এই অঙ্গীকার করে 'সহজমণি' দান করতে বাধ্য হলেন। ভীমের নিশ্চিত মৃত্যু রদ করতে কৃষ্ণ, অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে রথ ছুটিয়েছিলেন ভীমের পিছু পিছু। দ্রৌপদী এই 'সহজমণি' নিয়েই প্রাণে বেঁচে থাকতে চান। কালকূট রঙ্গনাট্যের শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন পাঠককুলকে।

'সহজমণি' হারা অশ্বত্থামা গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন। অতীতের রঙ্গভূমিতে যেন কালকূট দেখছেন-- "হত্যার উন্মাদনার পরে তাঁর চোখ থেকে অবিরল জলধারা গড়িয়ে পড়ছে।" *(পৃ: ১৩২৬, ঐ)* কালকূট শেষবারের জন্য তাঁর মুখ থেকে শুনতে পেলেন "রক্তের পিপাসা শেষ হোক, জীবন ধন্য হোক। আমি আজীবন এই পৃথিবীর মাটিতে, মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ লাভ করতে চাই।" *(পৃ: ১৩২৬, ঐ)*

অতীত পদচারণায় কালকূট অনুতপ্ত অশ্বত্থামার শেষ প্রার্থনা শুনেছেন। কালকূট অশ্বত্থামাকে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। অনেক যুক্তি-তর্ক দিয়ে নিজেই নিজেকে বুঝিয়েছেন এবং যা বুঝেছেন তাই নিজের লেখার মধ্য দিয়ে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। এক পৈশাচিক

হত্যাকারীকে মহাকাব্যের কল্পলোক থেকে এই পৃথিবীর বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে এনেছেন। কোন্ গভীর শোক থেকে, এই ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী পিপাসার সৃষ্টি হয়েছিল, মনভ্রমণে গিয়ে সেই কারণগুলো অনুসন্ধান করেছেন। অনুসন্ধান করে কালকূট এই কাহিনির এক জায়গায় বলেছেন যে — কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উভয়পক্ষের প্রচুর রথ, অশ্ব, হস্তী আর অস্ত্রসম্ভারের সমাবেশ দেখেছেন। তিনি বলেছেন, "যে সব অস্ত্র সেই সময়ে আমি দেখেছি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেই সেইসব অস্ত্র নিঃশেষিত হয়েছিল। যদি তা না হত, পরবর্তীকালে যারা ভারত আক্রমণ করেছে, তারা জয়লাভ করতে পারত কিনা সন্দেহ। যেসব বীরপুরুষ সবংশে নির্বংশ হয়েছে, তাঁদের বংশধরেরা যদি বেঁচে থাকতেন, তবে ভারতের ইতিহাস অন্যরকম হবার সম্ভাবনা ছিল। সেইজন্য আমি মনে করি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই হিন্দু ভারতকে একেবারে দুর্বল করে দিয়েছিল।" *(পৃ: ১৩১২, ঐ)*

হিন্দু সভ্যতা সম্পর্কে কালকূটের ভাবনা পূর্বেই জানা হয়েছে। তবু কালকূটকে অনুসরণ করে আরও একবার উল্লেখ করা যায় "হিন্দু বস্তুত কোন জাতি নয়। আর্য-অনার্য সংশ্লেষণে উদ্ভুত একটি সভ্যতা।" *(পৃ: ১৩১২, ঐ)* এই 'হিন্দু ভারতে' কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতকে দুর্বল করার শেষ অঙ্কের নায়ক ছিলেন অশ্বত্থামা। দুর্যোধন মৃত্যুপথযাত্রী হয়েও অশ্বত্থামাকে কৌরব পক্ষের সেনাপতি নির্বাচিত করেছিলেন।

অমাবস্যার ঘোর করাল রাত্রে অশ্বত্থামার হত্যালীলা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে পাণ্ডব-পাঞ্চাল পক্ষের বহু বীর যোদ্ধাই বিজয় গৌরবে জয়ধ্বনি করতে করতে তাঁরা নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গিয়ে বহুরাত্রি পর্যন্ত উল্লাস-আনন্দে মত্ত হয়েছিলেন।

তারপর? তারপরের কাহিনী জানানোর জন্যই কালকূট সকলকে অগ্রহায়ণের শেষ দিনে অমাবস্যার করাল রাত্রির অন্ধকারে হত্যারঙ্গমঞ্চে নিয়ে এসেছেন। অশ্বত্থামা মৃত্যুরূপ বিভীষিকা হয়ে পাণ্ডব-পাঞ্চাল-সোমক-মৎস্যদের যোদ্ধা, সৈন্য, অশ্ব, হস্তী, রথ সব বিনষ্ট করেছিলেন। নিজের কাছে অবশিষ্ট শেষ 'ব্রহ্মাস্ত্র'টিও তিনি প্রয়োগ করেছিলেন পাণ্ডবসহ পৃথিবীকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি ব্যাসদেব ও কৃষ্ণের জন্য। কিন্তু শস্যশ্যামলা প্রকৃতি তথা গর্ভবতী নারীকে করে দিয়েছিল ঊষর, বন্ধ্যা।

হিরোসিমা-নাগাসাকিতে যে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তার প্রকৃতিও তো অশ্বত্থামার 'নারায়ণ অস্ত্র', 'ব্রহ্মাস্ত্র'র মতো। হিরোসিমা-নাগাসাকির মাটি বন্ধ্যা হয়ে গেছে। সেখানে মানুষেরা বিকলাঙ্গ বীভৎস হয়ে গেছে। নারীরা বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন। এমনটিই তো হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। শেষদিন অর্থাৎ অমাবস্যার করাল রাত্রির প্রত্যুষে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ ও সংবরণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেষ হয়েছিল।

এখানে কালকূটের অনুমান থেকে একথা বলা যেতে পারে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে "এই দুটি

পুরুষের'' যথেষ্ট অবদান ছিল, দুজনের প্রচ্ছন্ন মদত ছিল। এই দু'জনের পরামর্শে পাণ্ডবরা কূটযুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। এই কাহিনী শেষ হয়েছে ''এই দুই পুরুষের'' উপস্থিতিতে। শেষ বিধান তো এই দুজনই দিয়েছেন। অর্থাৎ একজন ইতিহাসবিদ স্বয়ং ব্যাসদেব ও অপরজন কৃষ্ণ। দুজনেই কৃষ্ণকায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এঁরা কেউই অস্ত্র ধরেন নি। ব্যাসদেব নিজের বিপদকালে সংকটমুহূর্তে পাণ্ডবদের লেখনীর মাধ্যমে সহায়তা করেছেন এবং কৃষ্ণ তাঁর কূটবুদ্ধি দিয়ে অস্ত্র না ধরে অর্জুনের রথের সারথি ও পাণ্ডবদের মিত্র হয়ে যুদ্ধ জয়ে সহায়তা করেছেন।

কালকূট তাঁর মানসভ্রমণে মহাকাব্যের এক ঘৃণিত, জঘন্য হত্যাকারী, কৌরব পক্ষের শেষ সেনাপতির জীবন সন্ধানে ও এই হত্যাকাণ্ডের কারণ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। বর্তমানের আঙিনায় দাঁড়িয়ে সেকালের এক বিখ্যাত বীর যোদ্ধা, পিতা দ্রোণাচার্যের অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত এক বিখ্যাত অস্ত্রবিদ অশ্বত্থামার মূল্যায়ন করেছেন।

ভ্রমণ কাহিনীকে বিভিন্ন কাহিনী উপকাহিনীর মধ্য দিয়ে সেকালের সামাজিক পটপরিবেশের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের রূপ দিয়েছেন। এক পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অশ্বত্থামার হৃদয়ের প্রশান্তি ও অবশেষে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে এই পৃথিবীর মাটিতে ও মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ লাভ করতে চাওয়ার প্রার্থনা নিয়ে কালকূট তাঁর কাহিনীকে উপন্যাসের পূর্ণতা দিয়ে শেষ করেছেন।

কালকূট তথা সমরেশ বসু ইতিহাস-পুরাণ-মহাকাব্যকেন্দ্রিক রচনাগুলোর মধ্যে অন্যতম **'প্রাচেতস'**। মহাকাব্যকেন্দ্রিক এই রচনাটি ১৯৮৩ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। ১৯৮৪ সালে গ্রন্থ আকারে এটি প্রকাশিত হয় কলকাতা দে'জ পাবলিশার্স থেকে।

লক্ষণীয়, কালকূটের অন্য সত্তা সমরেশ বসু এই সময়ে লিখেছেন 'বিজন বিভুঁই', 'আকাঙ্ক্ষা', 'মন মেরামতের আশায়' ইত্যাদি উপন্যাস। সমরেশের অন্যতম সত্তা কালকূট এবার মনভ্রমণে চলেছেন তমসার তীরে এক প্রেমিক পুরুষের সন্ধানে, যাঁর মুখ থেকে প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল আদি কবির সেই প্রথম শ্লোকটি

''মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমঃ অগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদ্ একম্ অবধী কাম মোহিতম্।।''

(পৃ: ১২৯৮, কালকূট রচনা সমগ্র, ৩য় খন্ড)

এই আদি কবি বাল্মীকিই হলেন প্রাচেতাস। তাঁরই সন্ধানে এই মানসভ্রমন। তমসার তীরে আসার পথ দেখিয়েছিলেন মহাকবি কালিদাস। তিনি রঘুবংশ কাব্যে 'প্রাচেতস' কথাটি উল্লেখ করেছেন। কালকূট প্রথম রামায়ণ রচয়িতার সন্ধানে বেরিয়েছেন, কালের ধুলো সরাতে সরাতে তিনি পথের সন্ধান করছেন। রামায়ণ মহাভারত রচনা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর গণ্ডগোল

আছে। "কোন্ কবি আগে, কোন্ দেশ সর্বাপেক্ষা পূর্বে রামকাহিনি রচনা করেছিলেন এই বিতর্কিত বিষয়টি আমি সম্পূর্ণ ত্যাগ করব। আমি আমার দেশের চিরকালের যা বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের পথ ধরে চলব।"*(পৃ: ১২৮১, ঐ)*

ইতিবৃত্তের পথে চলতে চলতে কবি কালিদাসের কাছে তিনি এসেছেন। তিনি রঘুবংশ রচয়িতা। তিনি কালকূটকে বলেছিলেন, "রামায়ণ রচয়িতার একটি নামই তো তোমরা শুনেছ। তবে জেনে রাখ, ও আমারও পরে।"

কালকূট নিজের বিশ্বাসে পথ চলেছেন বলেই মহাকবি কালিদাসকে দিয়ে উক্তিটি করিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু প্রাচেতসের কথা বাল্মীকি রামায়ণে উল্লেখ আছে। রাজশেখর বসুর বাল্মীকি রামায়ণে সীতার রসাতলে প্রবেশ (উত্তরকাণ্ড) সর্গে (৯৫-৯৭) দেখতে পাওয়া যায— "আমি প্রচেতার (১) দশম পুত্র, কখনও মিথ্যা বলেছি এমন স্মরণ হয় না।" *(পৃ: ৪৪৭, বাল্মীকি রামায়ণ ৯ম মুদ্রণ)* এই উক্তিটি। রাজশেখর বসু মহাশয় বাল্মীকি রামায়ণের সারানুবাদ করেছেন বোম্বাই নির্ণয় সাগর থেকে প্রকাশিত বাল্মীকি রামায়ণ থেকে। কালকূট নিজের বিশ্বাসে চলেন, অতীতের দীর্ঘপথ দীর্ঘ সময় ধরে পরিক্রমা করে কালিদাসের নির্দেশিত পথে তমসার তীরে এসেছিলেন একজন প্রেমিক মানুষের সন্ধানে। কালকূট দেখেছেন প্রিয়তমার কাছ থেকে গভীর দুঃখে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের পাপ কাজের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে আলোকের সন্ধানে চলা এক মানবকে। ক্রৌঞ্চ মিথুনের ক্রৌঞ্চকে নিহত হতে দেখে, সেই বেদনা বাণী রূপ পেয়েছিল তার সত্তার থেকে।

কালকূট এই ভ্রমণে যে কোন বাঁধাধরা ছকে চলেন নি সে সম্পর্কে নিজে বলেছেন— "দিনক্ষণ দেখে কাজ যদি বা করেছি, ভ্রমণে যেতে তার বিচার করি নি।"*(পৃ: ১২৭৪, কালকূট রচনা সমগ্র, ৩য় খন্ড)* তিনি বলেছেন— আমাদের দেশের কালচারে দিনক্ষণের বিধিনিষেধ বেশি — যেমন, ভাদ্রমাসের প্রথম দিনটি, 'যাত্রা নাস্তি'। কারণ ঐদিন গুরু অগস্ত্য তাঁর শিষ্য বিন্ধ্য পর্বতের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সূর্যকে অবারিত করতে। বিন্ধ্য নত মস্তকে গুরুকে প্রনাম করেছিলেন । বিন্ধ্য পর্বতকে গুরু অগস্ত্য বলেছিলেন "এমনটিই থাকো। যতোদিন ফিরে না আসি।" গুরু অগস্ত্য আর কোনোদিনই ফিরে আসেন নি, বিন্ধ্য পর্বতও আর মাথা তুলে সূর্যের গতি অবরোধ করতে পারে নি। এর নাম 'অগস্ত্য যাত্রা'। শাস্ত্রের বিধান প্রয়োজনে গড়েপিঠে নিতে আমাদের বাধে নি। সংসার যাত্রায় ভাদ্র ও পৌষ মাসের প্রথম দিনটি ছিল 'যাত্রা নাস্তি'। কিন্তু কালক্রমে সেটাও বদলে গিয়েছে। এখন শুধু ভাদ্র মাসের প্রথম দিনটি 'যাত্রা নাস্তি'। দ্বিতীয় দিন থেকে যেখানে খুশি সেখানে যাওয়া যায়। শুধু মাসটি শেষ হবার আগেই ফিরে আসতে হবে, নইলে অগস্ত্য যাত্রা! এত নিয়ম মেনে কি যাত্রায় উন্মুখ মন বাইরে বেরতে পারে তাই কালকূট বলেছেন — "আমরা ভাদ্রের প্রথম দিনেও যাত্রা বজায় রাখি। শ্রাবণের শেষে, আকাশ যখন শুকু শুকু, ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে নীল

আকাশের হাসি, নদী গহন গভীর কূল ছাপাছাপি, মনের দরজা তখন নিষেধের অর্গল খুলে দেয়। শরতের হাতছানি পেয়ে, আর দিনক্ষণের বিচার করি না। মনে থাকে না।"

কালকূট তাঁর অর্ন্তদৃষ্টি সেই সুদূর অতীতে মেলে ধরেছেন। তিনি দেখছেন, অগস্ত্য বিন্ধ পর্বতের মাথা নত করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। অগস্ত্য ভ্রমণ-বিলাসী ছিলেন। কালকূট নিজেও ভ্রমণবিলাসী। তিনি চলেছেন পুরাণ-ইতিবৃত্তের পথে। অগস্ত্য মুনিকে পথে পেয়ে যাত্রার সুলুক সন্ধানটা জেনে নিতে চান। কালকূটের ভ্রমণ পথে উনি অর্থাৎ অগস্ত্য দাঁড়িয়ে আছেন যে, তাই তাঁর মনে হয়েছে— "অথবা তিনি একা নন. একাধিক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পরিচয়ের আর সময়ের একটা সঠিক ক্ষণ পেলে, আমার যাত্রা সুগম হয়। সেই কারণে, এবার প্রথম পদক্ষেপেই তাঁর কথা মনে এলো।"*(পৃ: ১২৭৪, ঐ)*

কালকূটকে অনুসরণ করে দেখছি তাঁর মনে প্রশ্ন অগস্ত্য সম্বন্ধে — "অগস্ত্য কি একটি গোত্র বা গোষ্ঠী?" *(পৃ: ১২৭৪, ঐ)* ইনি অযোনিজ। আদিত্য যজ্ঞে মিত্র (সূর্য) ও বরুণ ঊর্বশীকে দেখে কামাতুর হয়ে শুক্রপাত করেছিলেন যজ্ঞকুম্ভে। সেই যজ্ঞকুম্ভ থেকে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্ম হয়। কালকূটের মনে প্রশ্ন — তাহলে যজ্ঞকুম্ভটি কোন্ রমণীর গর্ভ, মিত্র-বরুণ-ই বা কোন্ পুরুষদ্বয়? পুরাণ এরকম অনেক মহাপুরুষের জন্মবৃত্তান্তকে ধোঁয়াশা করে রেখেছে। কালকূটের অন্বেষণকে অনুসরণ করে দেখা যায় — ভাগবতে বলা হয়েছে অগস্ত্য পুলস্তের পুত্র। তাঁর এ সংশয় কেটে যাচ্ছে, যখন তিনি দেখছেন যে, অগস্ত্য অনেক নামে পরিচিত। কুম্ভে জন্মেছেন বলে তাঁর নাম কলসী সূত, কুম্ভসম্ভব, ঘটোদ্ভব, কুম্ভযোনি। মিত্র-বরুণের পুত্র--, মৈত্রাবরুণি। সমুদ্র পান করেছিলেন তাই পীতাব্দি; বাতাবিকে বিনষ্ট করেছিলেন তাই বাতাবিদ্বিট। ঊর্বশীর সঙ্গে সম্বন্ধ-সূত্র থাকায় উর্বশীয়, বিন্ধ্য পর্বতকে নত করেছিলেন তাই তিনি বিন্ধ্যকূট, মহাতেজা বলে তিনি আগ্নেয়, ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষ ছিলেন বলে তিনি মান — এরূপ বহু নামে অগস্ত্য এইভাবে বিচরণ করে গেছেন। কিন্তু একটা বিষয়ে কালকূট আবার সংশয়ান্বিত— পুলস্ত্য, তাই কালকূট পুরাণ ও আমাদের দেশের ইতিবৃত্ত ধরে এগোচ্ছেন। ব্রহ্মার কাছ থেকে প্রাপ্ত ব্রহ্মপুরাণ পুলস্ত্য তুলে দিয়েছিলেন পরাশরকে। পরাশর সেই পুরাণ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করেছিলেন। কিন্তু কালকূট এই পুলস্ত্যের সন্তান বলে অগস্ত্যকে পাচ্ছেন না। তিনি দেখতে পাচ্ছেন পুলস্ত্যকে, ইনি সুমেরু পর্বতের কাছে তৃণবিন্দু মুনির আশ্রমের কাছে তপস্যা করছেন। তাঁকে তিনি এক অদ্ভুত শাপ দিয়েছিলেন — যে কন্যা বা রমণী তাঁর চোখে পড়বেন, তিনি গর্ভবতী হবেন। কিন্তু তৃণবিন্দু মুনির কন্যা হর্বিভূ নির্ভয়ে পুলস্ত্যের একাগ্রমনে বেদপাঠের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তাঁর দিকেই চেয়ে রইলেন। কালকূট বলেছেন— "এখান থেকেই সম্পর্কের মূলটা ধরা যায়"*(পৃ: ১২৭৫, ঐ)*, কিন্তু ইতিহাস এখানে নীরব। তৃণবিন্দু মুনির আশ্রমের কাছে পুলস্ত্য তপস্যা করতেন; কালকূটের

ধারণা পুলস্ত্য হর্বিভূকে লক্ষ্য করতেন, হর্বিভূ নির্ভয়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন বেদপাঠরত পুলস্ত্যের দিকে। পুলস্ত্যের হৃদয় গলেছিল। হর্বিভূকে পুলস্ত্য বিবাহ করেছিলেন তাঁর পিতা তৃণবিন্দুর অনুরোধে। হর্বিভূর গর্ভে বিশ্রবা জন্মেছিলেন। এই বিশ্রবা কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রমুখের জন্ম দিয়েছিলেন। আবার প্রশ্ন কালকূটের মনে— পুলস্ত্য কি একজন? অগস্ত্য পুলস্ত্যের পুত্র কিনা সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপার। অগস্ত্য ভ্রমণবিলাসী, তাই কালকূট অগস্ত্যকে অনুসরণ করলেন। অগস্ত্য ভ্রমণ পথে যেতে যেতে একটি গুহার কাছে দেখলেন, কিছু ব্যক্তি অধোমুখে লম্বমান হয়ে ঝুলছেন। এঁরা অগস্ত্যের পূর্বপুরুষ। অগস্ত্য অকৃতদার; অতএব বংশরক্ষা না করার জন্য তাঁর পূর্বপুরুষদের মুক্তি নেই। অগস্ত্য তাঁদের বংশরক্ষার আশ্বাস দিয়ে সমস্ত সুন্দরী নারী জাতির সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ অংশ দিয়ে অতি রূপসী কন্যা সৃষ্টি করে তাঁকে বিদর্ভরাজের কাছে পালন করতে দিলেন। কালকূটের মনে প্রশ্ন — এভাবে নারী সৃষ্টি করা যায়?— "সকল সুন্দরী রমণীর, সবটুকু ছেঁকে, লোপাট করে," এই সুন্দরী কন্যা সৃষ্টি বলে তাঁর নাম লোপামুদ্রা। লোপামুদ্রা বড় হলে, অগস্ত্য আবার বিদর্ভে এসে এই সুন্দরীকেই বিবাহ করতে চাইলেন।

কালকূট পুরাণ পথে অতীতের এক অভূতপূর্ব ঘটনাকে চাক্ষুষ করছেন। প্রশ্নের জাল তাঁর মস্তিষ্কে ছড়িয়ে যাচ্ছে। পুরুষের ঔরস আর নারীর গর্ভ ছাড়া কোনো প্রাণীর জন্ম হতে পারে না। সে পাঞ্চালীই হন, আর লোপামুদ্রাই হন, আর অগস্ত্যই হন। ঘটনাগুলোকে কালকূট এ'কালের দৃষ্টিতে দেখতে চাইছেন, বুঝতে চাইছেন— ভ্রমণবিলাসী অগস্ত্য কি লোপামুদ্রাকে কুড়িয়ে পেয়েছেন, নাকি কারো গৃহ থেকে চুরি করেছেন? "অথবা প্রকৃতপক্ষে লোপামুদ্রা বিদর্ভরাজারই কন্যা ছিলেন? যেমন 'সীতা' এক অযোনিজ কন্যা। বাস্তবিকই কি তাই? বৃহৎ পণ্ডিত এক তাঁর অভিধানে 'সিতা' শব্দের অর্থ করেছেন 'মনোরমা স্ত্রী'। শব্দকল্পদ্রুমের অনুযায়ী লাঙলের এক অর্থ হল লিঙ্গ। অজ্ঞাত কুলশীলাকে যদি নায়িকার স্থান দিতে হয়, কবি কল্পনায় তাঁকে অযোনিজ বলার অসুবিধা কোথায়।"*(পৃ: ১২৭৬, ঐ)*

যে মেয়েকে অগস্ত্য পালন করতে দিয়েছিলেন যৌবনে তাঁকে বিবাহ করতে চাওয়া, সেকালেও এই বিরল ঘটনাটি ঘটেছিল। কালকূট বলেছেন— শুধু সেকালে নয় একালেও এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। বিদর্ভরাজ প্রথমে রাজি না হলে পরে বিবাহ দিতে রাজি হয়েছিলেন,— "কেন ক্ষত্রিয়রা তখনও ব্রাহ্মণের প্রতি ভয় পোষণ করতেন। ব্রাহ্মণরা বিস্তর সন্ধানী পুরুষ ছিল। মগজটাও ছিল সাফ।"*(পৃ: ১২৭৬, ঐ)*

এমতাবস্থায় লোপামুদ্রা নিজে অগস্ত্যের বরণীয়া হতে চেয়ে আরোপ করলেন — অগস্ত্যের পুত্রলাভের ইচ্ছা লোপামুদ্রা তখনই পূরণ করবেন যখন অগস্ত্য তাঁকে তার পিতার মতো রাজকীয় শয্যা ও রাজকন্যার মত বসনভূষণ এনে দেবেন। তিনি তাঁর চীর ও কষায় বাস অপবিত্র করবেন

না। কালকূট অতীতের সেই ঘটনাবলীকে দেখছেন আর ভাবছেন লোপামুদ্রার এ কেমন শর্ত?

অগস্ত্যের সেই সামগ্রী আনবার জন্য তিনজন রাজার কাছে গিয়ে হতাশ হয়ে বাতাবি দানবের ভাই ইল্বলের কাছে গেলেন। তিনি মেষরূপী বাতাবিকে কেটে ব্রাহ্মণদের খাওয়াতেন এবং খাওয়ার পরেই বাতাবি ব্রাহ্মণের পাকাশয় ভেদ করে বেরিয়ে আসতেন। তাঁরা দুই ভাইয়ে এইভাবে ব্রাহ্মণদের হত্যা করতেন। কালকূট পুরাকালে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাবলীকে এ'কালের দৃষ্টিতে দেখছেন— "তবে এমন খাদ্য খাওয়ানো যায়, যা বিষাক্ত হয়ে পাকাশয় ছিন্ন হয়ে মারা যেতে পারে। কিন্তু মেষ কেমন করে পেট থেকে ফুঁড়ে বেরোবে? বেরোতে পারে। সেরকম মেষের মাংস তাহলে খাওয়াতে হবে। টোটকা ব্যাপারটাকে আমরা যতোটা ছোট করে দেখি, তা বোধহয় উচিত না। টোটকা মানেই ঔষধ। ঔষধ বিষও হতে পারে।" *(পৃ: ১২৭৬, ঐ)* কূলকূটের বিজ্ঞান-সচেতনতামুখী ভাবনা।

অগস্ত্যের আগমনে ইল্বল খুশি হয়ে বাতাবিকে কেটে খাওয়ালেন। কিন্তু এবার বাতাবি আর অগস্ত্যের পেট ফুটো করে বের হতে পারল না; কারণ অগস্ত্য জানতেন পেটে কী ধারণ করলে জীবন্ত বিষ হজম করা যায়, তাই তিনি সেই তুকটি করে এসেছিলেন। বিষ হজম করার টোটকার গুণে অগস্ত্যের শক্তি বেড়ে গিয়েছিল, তিনি তাঁকে হত্যায় উদ্যত ইল্বলকে হত্যা করেছিলেন এবং তার সব ধনরত্ন লুটে নিয়েছিলেন। দাবী পূর্ণ হওয়ায় লোপামুদ্রা অগস্ত্যের পুত্রলাভের ইচ্ছাকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। তিনি পুত্রবতী হলেন সাত বছর পরে।

হাজার হাজার বছরের ধুলো ঝেড়ে কালকূট ইতিবৃত্তের পথে চলেছেন। ইতিহাসের পাতায় সবকিছু লেখা নেই, যেটুকু পাওয়া যায় তার থেকে বুঝে নিতে হবে। মহাভারতের বনপর্বে আছে অগস্ত্যের ছেলের নাম ইধ্মবাহ। আরও এক জায়গায় আছে দৃঢ়স্যু, ইনি পূর্বপুরুষদের মুক্ত করেছিলেন। ইধ্মবাহ আর দৃঢ়স্যু আছে কিনা কালকূটের জানা নেই। তিনি মহাভারতের কথাটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। অগস্ত্য যেহেতু তাঁর কীর্তির চেয়ে মহৎ, শরৎকালে অর্থাৎ "ভাদ্র মাসের সতেরো বা আঠারো তারিখে তাঁর আকাশে আবির্ভাব হয়।" *(পৃ: ১২৭৭, ঐ)* মনভ্রমণে কালকূট অতীতের পথে অগস্ত্যকে অনুসরণ করেছিলেন এইজন্য যে, তাঁর পরিচয় আর সময়ের সঠিক ক্ষণটা জানা প্রয়োজন; তাহলে তাঁর যাত্রাপথ সুগম হয়। তিনি চলেছেন তমসার তীরে এক প্রেমিক পুরুষের খোঁজে। অতএব তাঁর খোঁজে এলে ভ্রমণবিলাসী অগস্ত্যকে জানা দরকার। কেননা, "বনবাস কালে দাশরথি অগস্ত্যের আশ্রমে গিয়েছিলেন। তিন রামের এক রাম দাশরথি রাম— কারণ ইনি দশরথের পুত্র। অবতার হয়েছিলেন।" *(পৃ: ১২৭৭, ঐ)* কালকূট অগস্ত্যের সন্ধানে এসে জানতে পেরেছেন— "অগস্ত্য ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়ের মতো অনেক অস্ত্র শস্ত্রও রাখতেন, তিনি রামকে বৈষ্ণব ধনু, অক্ষয়তুণীর এবং আরও নানারকম অস্ত্র দান করেছিলেন।" *(পৃ: ১২৭৭, ঐ)*

কালকূট মনভ্রমণে যেতে চান ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দাশরথি রামের সময়ে। কিন্তু সময়কে জানতে তিনি আরও একটু পিছিয়ে অগস্ত্যের কাছে গিয়েছেন। কালকূট তাই বলেছেন, "আসল কথাটা ভুলে, অগস্ত্যের কাহিনী ফেঁদে বসেছি। কথাটা ছিল আমার ভ্রমণের। নানারকম ভ্রমণে গিয়েছি! ... আমার ডানায় রয়েছে, বিশ্বভ্রমণের কম্পন।" *(পৃ: ১২৭৭, ঐ)* কালকূট নিরন্তর পথের ডাক শুনেই চলেছেন। তাঁর ভেতরের মূল তৃষ্ণাটা কিসের তার হদিশ তিনি পাননি। বাইরের হাতছানিতে তিনি যখনই বেরিয়ে পড়েছেন তখনই কয়েক পা ফেলেই তিনি দেখতে পেয়েছেন — একজন চির নীরব মানুষকে। ছিন্নকন্থা জড়িয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছেন গাছের তলায়। মাথায় জটা, সেই জটাতে শুকনো পাতা, পাখির বিষ্ঠা লেগে রয়েছে। গোঁফ দাঁড়িতে মুখটা ঢাকা, কিন্তু একটা আশ্চর্য কোমলতায় পূর্ণ। সে যে-বৃক্ষের নীচে বসে, তেমনি একটা বৃক্ষের মতো তাকে দেখাচ্ছে।

কোন কথা না বলে হঠাৎই সে গুণগুণ করে গান গেয়ে ওঠে —

"ও তুই যাবি কোথা / ভুলেছিস তা। /তোর কি ঠেকারে বাইরে ঠেকার / না জানলি তারে আর বার / ঝোলা রেখে বসগে হোথা।..." *(পৃ: ১২৭৭, ঐ)*

কালকূট তার চলার পথে আপনভোলা ভবঘুরে মানুষটিকে দেখে আকৃষ্ট।

প্রকৃতির রূপ রসের মধ্যে ফিরতে ফিরতে এমনি মানুষের সঙ্গ পাওয়া কালকূটের মতে সেরা রস। সেই মানুষটি তার ঝুলি থেকে চাল ডাল বারমেশালি বের করে চুলায় আগুন জ্বেলে থেকে জল এনে চুলায় চাপিয়ে আপন মনে একতারাটি নিয়ে গুণ গুণ করে গান করে। চাল ডাল ফুটে গেলে সেটা নামিয়ে একটি পাতায় কালকূটকে পরিবেশন করে ও একটিতে নিজে খায়। সঙ্গে একটি সারমেয়ও এসে জোটে, পাখিরা সারমেয়ের ভয়ে কাছে আসতে পারে না। ভোজন শেষে গাঁজার কলকে পরিপাটি করে সাজিয়ে তাতে দম দেয় ও কালকূটকেও সঙ্গী করে। আলখাল্লা ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে লাঠি দিয়ে চুলা, হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে কোন কথা না বলে পথে চলে যায়। পথ চলতে গিয়ে কালকূট এইসব মানুষদের সঙ্গী করে ভিন্ন তালে বেজে ওঠেন। সংসারের এই বিচিত্র খেলায় মেতে ওঠেন। তিনি বলেন— "এই মাতামাতিটাই আমার জীবনে এনে দেয় কলঙ্ক। ভাবের ঘরে ধরা দিয়ে পালিয়ে আসবার পথ খুঁজি।" *(পৃ: ১২৭৮, ঐ)* সংসারের বিধি যথাযথ পালন না করার জন্য তাকে মিথ্যুক অপবাদ নিতে হয়। কালকূট মিথ্যুক নন; তাই তিনি বলেছেন— "আমি রূপনগরের পথিক। বিশ্ব বিধাতার ডাক সেখানে। তবে এ বিশ্বাস আমার আছে, যে আমাকে মিথ্যুক বলেছে, সে নিজেও জেনেছে আমি আছি প্রকৃতির সত্তায়। সে অভিমান করে, কিন্তু বাস্তবিক আমাকে ভুল বোঝে না। কেননা, সেও কি জানে না, আমি কোন্ অপরিচয়ের সন্ধানে ছুটে চলেছি।"

অতীত পথে চলতে গিয়ে দেখা অগস্ত্যের সঙ্গে, আর এ'কালের পথে চলতে গিয়ে দেখা সেই নীরব নিশ্চুপ মানুষটির সঙ্গে। দু'জনকেই অনুসরণ করেছিলেন। পথের দিশা খুঁজতে অনেক দূরে চলে গিয়েছেন। ইতিবৃত্তের পথ ধরে খুঁজতে খুঁজতে প্রথম যার হদিশ পেয়েছেন, তার নাম বৈবস্বত মনু। কবে তিনি ইলাবৃতবর্ষ থেকে এসেছিলেন, সেই সময়টাকে ধরবার জন্য কালকূট মনভ্রমণে পিছন ফিরে হাঁটতে লাগলেন, সেই অনেক দূর, অনেক দূরের পথ, গেলেন ইলাবৃতবর্ষ। ইলাবৃতবর্ষই হল স্বর্গ, ইন্দ্র রাজত্ব করছেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে, কালকূটের এ'কালের দৃষ্টিতেই স্বর্গকে দেখা। আজকের পূর্ব তুর্কীস্থানেই ছিল দেবতা জাতির বাস। দেবতা জাতির চেহারাগুলো অনেকটা এ'কালের তুর্কীস্থানের তুর্কীদের মতো। ইলাবৃতবর্ষে যেই রাজা হন না কেন, তিনিই ইন্দ্র নামে পরিচিত। ইলাবৃতবর্ষ থেকে মনুর নেতৃত্বে একদল লোক ভারতবর্ষে নেমে এসেছিল। তাঁরা হিমালয় অতিক্রম করে বিন্ধ্যাচলের সীমানায় এসে ঠাঁই নিয়েছিল। শর্ত ছিল একটা, ভারতবর্ষে মনু নামে যে মানুষ জাতি থাকবে তাঁরা ইন্দ্রের অধীনে থাকবেন। কালকূট এরই মধ্যে অন্তরীক্ষেও কুবের জাতিকে দেখে এসেছেন। অন্তরীক্ষ হল এ'কালের কাশ্মীর পামির উপত্যকায়। এঁরা নৃত্য-গীতপরায়ণ, আবার যুদ্ধ বিশারদ।

কালকূট দেখেছেন বেণ্ রাজা ইন্দ্রের বশ্যতা স্বীকার করতে না চাওয়ায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে স্বর্গে নিয়মিত যাবার পথটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষ অন্যপথে স্বর্গে যাবার পথ তৈরি করল মানস সরোবরের পাশ দিয়ে; ভূত-প্রেত ভরা সেই রাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন অনার্য মহাদেব। যে সময়ের মধ্য দিয়ে কালকূট চলেছেন তার একটা ভৌগোলিক বিবরণ তিনি দিতে দিতে চলেছেন। ইলাবৃতবর্ষের দেবতা জাতি সঙ্কটে পড়লেই বৈকুণ্ঠে ছুটে গিয়েছেন— এটা কালকূটের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। তিনি বলেছেন বৈকুণ্ঠ অঞ্চলই হল উত্তর কুরু অর্থাৎ রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চল। উত্তর কুরু থেকে আর্যরা ইলাবৃতবর্ষে অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার পূর্ব তুর্কীস্থানে এসেছিলেন, সেখান থেকে ভারতবর্ষে। আধুনিককালে কালকূট সাইবেরিয়া, রাশিয়া, মধ্য এশিয়ার আর্য সভ্যতার চিহ্ন দেখে এসেছেন; উত্তর ইওরোপের অনেক জায়গায় দেখে এসেছেন অশ্বমেধ যজ্ঞের নিদর্শন। তিনি ভাবছেন প্রাচীন যুগে হরিয়ুপীয়া হয়ত আধুনিককালের ইওরোপীয়। তারপরে লিথুনিয়ায় সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে আশ্চর্য মিল দেখলেন এ'কালের ভ্রমণে গিয়ে। মিল খুঁজে পেলেন নদীর নামে 'নেমুনা', 'তাপ্তি', 'শ্রোবতি', 'নর্বুদে' এগুলো ভারতে যমুনা, তাপ্তি, সরস্বতী, নর্মদা নামে পরিচিত। জাতির নামেও মিল — দিইব, দেবুক, ইন্দ্র, বরুণ, পুরকন্যা। আর্যরা ভারতবর্ষে নেমে আসার পরে সেইসব নামগুলোই আবার ব্যবহার করেছেন। তারপরের ইতিহাস ধোঁয়াশাতে ঢাকা; তাই বুঝতে পারছেন না— পৃথুর নাম থেকেই পৃথিবী ভারতবর্ষ। কালকূট 'শাম্ব' সন্ধানে ইতিবৃত্তের পথে মনভ্রমণে গিয়ে এ'কালের দৃষ্টিতে বলিষ্ঠভাবে বলেছেন— "গঙ্গা যে

একটি তৎকালীন রাজবংশের দ্বারা খনিত জলধারা, সেটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। এরা রাজা বটে, আসলে কানে একটু খটকা লাগলেও, এ বংশে ইরিগেশন এঞ্জিনিয়ার জন্মেছিল। 'বাহু' নামে রাজার ছিল প্রথম পরিকল্পনা। আর সেই পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে দেখেছি, তার পরবর্তী বংশধর 'সগর' কে।" *(পৃ: ১২৭৯, ঐ)* সগর রাজা এবং তাঁর ষাট হাজার পুত্র গঙ্গাকে হিমালয় থেকে নামিয়ে আনতে গিয়েছিলেন। কালকূট দেখেছেন— ষাট হাজার শ্রমিককে শ্রমিক না বলে পুত্র বলা হয়েছে। আধুনিক দৃষ্টিতে অতীতের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষনে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ষাট হাজার ছেলে কপিল মুনির আশ্রমে মুনির অভিশাপে মারা যান নি। এই প্রসঙ্গে কালকূট ভাবছেন— "এই কপিল মুনি কে? বর্ণ কি তাঁর কপিশ। তিনি কি ব্যাধি? সেটাই সম্ভব।" এরকম নানা প্রশ্ন তাঁর মনে। রাজা সগর নীচু বাংলার দক্ষিণে পৌঁছেছিলেন। সেখানে জন্ডিস রোগের প্রকোপ বেশি ছিল, তিনি দেখেছেন সেই রোগেই ষাট হাজার পুত্র মারা গিয়েছিল। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সেকালের ঘটনাবলীকে যুক্তিগ্রাহ্য, সময়োপযোগী করে তুলেছে।

পুরাণের বিষয়েও যে তৎকালের বাস্তবের ঘটনাবলী ছিল সেই সত্যতা প্রমাণের জন্য ইতিহাসে ঘটে যাওয়া এরকম একটি যুক্তিপূর্ণ উদাহরণ দিয়েছেন: গৌড়ের বাদশা আসাম জয় করতে গিয়ে এক লক্ষ সৈন্যকে হারিয়েছিল। কালাজ্বরের প্রকোপে সবাই মারা পড়েছিল। এ'কালে কালকূট সগর রাজার খোঁজে এ'কাল থেকে সময়ের হিসাবে চার হাজার ন'শো আশি বছর আগে চলে গেছেন। রাজা তার ষাট হাজার পুত্র নিয়ে গঙ্গাকে হিমালয় থেকে নামিয়ে আনতে সগর ঘোর বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর ষাট হাজার সৈন্য তথা পুত্র মারা গিয়েছিল ন্যাবায় অর্থাৎ জণ্ডিসে। এ'কালের দৃষ্টিতে পুরাণ মহাকাব্যের ঘটনাকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তুলে ধরে বাস্তবের আলোকে নিয়ে এলেন। এরপর তিনি সেই প্রাচীন সময় থেকে এগিয়ে আসতে আসতে দেখতে পেলেন যে, সগর রাজার ছেলে অসমঞ্জ পারেন নি। তাঁর ছেলে অংশুমান, তার পুত্র দিলীপকে "তার বংশধর ভগীরথই সেই ইঞ্জিনিয়ার, যাঁকে দেখলাম গঙ্গাকে বহিয়ে দিলেন সমুদ্রের সঙ্গে। সেই কারণেই গঙ্গা হিমালয়ের সীমায় গঙ্গা। দক্ষিণের এদেশে তিনি ভাগীরথী। তাঁর কালটা দেখছি দু'হাজার আটশো তেত্রিশ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এখন থেকে চার হাজার আটশো দশ বছর আগে। ভগীরথ সার্থক হয়েছিলেন।" *(পৃ: ১২৭৯, ঐ)* এই পাঁচ পুরুষের গঙ্গাকে হিমালয় থেকে সমতলে নামিয়ে আনার প্রতিজ্ঞাকে, দীর্ঘ কষ্টকর পথ ও দীর্ঘ সময় ধরে কালকূট অতীতচারী হয়ে এই গঙ্গ াবতরণ যাত্রায় সঙ্গী হয়েছেন।

কালকূট বলেছেন যে ইতিহাসের পথে চলতে গিয়ে তিনি জেনেছেন— এই রাজবংশ হল ইক্ষ্বাকুবংশ। ইক্ষ্বাকুবংশের ইতিহাস বিশদভাবে জানার জন্য তিনি শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের শরণাপন্ন হয়েছেন। বিষয়টি তাঁর গোলমেলে লাগছে, ঠিকমত বুঝে নিতে না পারলে তাঁর যাত্রাটা

ঠিক পথের হদিশ দেবে না। তিনি বৈবস্বত মনুকে প্রথম মনু বলে এগিয়েছিলেন, কিন্তু তাও নয়। আদি ও প্রথম মনু স্বায়ম্ভুব মনু। তাঁর সময় নিরূপণ করেছেন ৫৯৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের কালের নিরিখে তিনি সময়কে ধরতে চেয়েছেন। ১৯৩০ সাল থেকে পাঁচ হাজার একত্রিশ বছর আগে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল। একজন সর্বজ্ঞ কালকূটকে স্বায়ম্ভুব মনুর কাল নির্দেশ করেছেন এইভাবে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বৃহদ্বলের মৃত্যু হয়েছিল এক হাজার চারশো ষোল খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। এর সঙ্গে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দকে যোগ করলে হয় তিন হাজার তিনশ ছেচল্লিশ বৎসর। কলির শুরু কাল। স্বায়ম্ভুব মনুর কাল থেকে মাত্র ন'শো সাতাশ বছর পরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল— কালকূট এই হিসাবকেই যথার্থ মনে করে আবার মনভ্রমণে যাত্রা শুরু করেছেন সুদূরের পথে দাশরথি রামের কাছে। মহাভারতেই তিনি রামকাহিনী শুনেছেন। লেখক জেনেছেন যে, দাশরথি রামের সময় দু'হাজার একশ চব্বিশ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। তাহলে রামের সময় থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ব্যবধান, সাতশো আট বৎসর। কালকূটের মনে হয়েছে স্বায়ম্ভুব মনু আরও পূর্বকালের মানুষ, সিদ্ধান্তবাগীশের সঙ্গে হিসাব তার মিলছে না। তবুও তিনি এই সাত'শ আট বছরের ব্যবধানের মধ্যে তাঁর কালের যাত্রাপথ সীমাবদ্ধ রাখতে চান। "আমি যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাঁকে পাবো এই সময়েরই কোনো কালের মধ্যে।" *(পৃ: ১২৮০, ঐ)* পুরাণে আমাদের ইতিবৃত্ত থেকে পথ খুঁজে নিতে কালকূটকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন রাম। "বৈদিক রচনায় রামকাহিনীর বীজ রয়েছে। অতএব স্বীকার করতেই হয়, রামায়ণ কাব্য হলেও এর পশ্চাতে রয়েছে একটি সুদূর প্রাচীন ইতিবৃত্তীয় কাহিনী। ঋক্‌বেদে রামকে 'ভদ্র' (দস্রঅশ্বী) সীতাকে 'ভদ্রা' উভয়ে পাশাপাশি এগিয়ে গেলেন। পিছনে প্রেমিক (না সত্যঅশ্বী/লক্ষ্মণ) চলেছে। সমুজ্জ্বল জ্যোতি নিয়ে স্থির হয়ে অগ্নি (দশরথ) জ্যোতির্ময় আভা নিয়ে রামকে বিদায় দিলেন।" *(পৃ: ১২৮০, ঐ)* ঋক্‌বেদের এই ব্যাখ্যা কালকূট বর্তমানের এক প্রবীণ পণ্ডিতদের কাছে পেয়েছেন। বৌদ্ধ জাতক কাহিনীতেও রামকথা আছে।

কিন্তু রামায়ণে বা রাম রাজত্বে কী ঘটছে তা দেখতে তিনি এই দীর্ঘ অতীত থেকে অতীতের পথ অতিক্রম করেন নি। তিনি চলেছেন একটি নির্দিষ্ট সময়ে, ভিন্ন পথে। তবুও রামকথার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় কালকূটের দরকার। বর্তমানে প্রবীণ প্রাজ্ঞ ভাষাবিদ্ ঐতিহাসিকের বয়ানকে অনুসরণ করেই তিনি তাঁর যাত্রাপথের ধুলা আস্তরণ ভেদ করে এগিয়ে চলেছেন কালকূট যেতে চান "আদিকাব্যের আগে— অনেক আগে থেকেই রাম-কাহিনী লোকের মুখে মুখে শোনা যেত। আমি কার সন্ধানে যাত্রা করেছি? কবির না প্রেমিকের সন্ধানে? তা কি হয়? যিনি প্রেমিক, তিনি কবি। আমি চলেছি সেই প্রেমিকের সন্ধানে। জানি, তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবু, চলো হে সুদূরের পিয়াসী, সেখানে আছে তোমার প্রাণের পুরুষ।" *(পৃ: ১২৮১, ঐ)*

কালকূট বলেছেন কোন্ কবি আগে, কোন্ দেশ সর্বাপেক্ষা পূর্বে রামকাহিনী রচনা করেছিলেন সেই বিতর্কিত বিষয় পরিত্যাগ করবেন এবং "আমি আমার দেশের চিরকালের যা বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের পথ ধরে চলব।" *(পৃ: ১২৮১, ঐ)*

সেই বিশ্বাসের পথ ধরে কিছুটা এগিয়ে মত পরিবর্তন করলেন কালকূট; আবার চলে এলেন আরো আধুনিককালে— উজ্জয়িনীতে, মহাকবি কালিদাসের সময়ে। সেখান থেকে কালকূট যেন পরামর্শ পেলেন— "তুমি কেন বৃথা সাতশ আট বছরের মধ্যে ঘুরে মরছো? তুমি ফিরে যাও রাঘবের সময়ে। ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয় যে রাম রঘুবীর, সে যখন লঙ্কাযুদ্ধে ব্যস্ত, তখন তুমি যাও তমসা নদীর তীরে। তমসার তিনটি ধারা। যে ধারাটি উত্তর থেকে প্রবাহিত হয়ে, পশ্চিম স্পর্শ করে দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে, সেখানে গেলে তাঁর দেখা পাবে। তাঁর সারা অন্তর ভরা গ্লানি। দু'হাতের রক্ত ধুয়েও, রক্তের দাগ নিশ্চিহ্ন করতে পারছেন না। বুকে তার কঠিন শেল— প্রেমের শেল। তখনও আদি কাব্যের সেই অভূতপূর্ব, অশ্রুত সেই শ্লোক উচ্চারিত হয়নি। তিনি রামেরই সমবয়সী। যাও, সেখানে যাও। তোমার প্রেমের পাত্রকে খুঁজে পাবে। নিজের কানে সব শুনবে। অভীষ্ট পূর্ণ হবে।" *(পৃ: ১২৮১, ঐ)*

মহাকবি কালিদাসের থেকে বহু দূরান্তরের পথনির্দেশ পেয়ে তিনি গেলেন আদিকবি বাল্মীকি যিনি প্রচেতাস নামে পরিচিত ছিলেন প্রথম জীবনে তাঁর সন্ধানে — সেই দু'হাজার একশ চব্বিশ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। চৌদ্দ বৎসর বনবাসকাল শেষ হতে বাকি মাত্র দু-তিন মাস। রাবণ সীতাহরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গেলেন। যুদ্ধ চলছে দেশের একপ্রান্তে, সেই সময়টাতে কালকূট মনভ্রমণে পৌঁছে গেলেন তমসার তীরে প্রাচেতসের কাছে। দেখলেন প্রাচেতসকে। "যার নামে নগর, লোকালয় আর অরণ্যের মানুষ ঋষি মুনি সকলে কাঁপে, যার পেশী আস্ফালিত শরীরের ধ্বংসোদ্যোগী মারমুখী চেহারা দেখে অজ্ঞান হয়, সেই ভয়ংকর দস্যু প্রাচেতস, তাঁর ঋজু বিশাল শরীর নিয়ে, যেন গভীর বিষণ্ণতায় ডুবে গিয়েছে।" *(পৃ: ১২৮২, ঐ)* কালকূট দেখছেন তাঁর দীর্ঘ আয়ত রক্তবর্ণ চোখের দৃষ্টি কেমন যেন আচ্ছন্ন, তার কালো কুঞ্চিত কেশদাম ধুলি ধূসরিত, জটাপূর্ণ, সিংহের মতো। কোমরে চীরের ওপরে বাঘের ছাল ছড়ানো, কিন্তু পেশল শরীরের উর্ধ্বাঙ্গে কোন পোশাক নেই। কোন অলঙ্কারও নেই। কালকূটের নজরে এসেছে আরও অনেক কিছু। পাদুকাবিহীন ধূলাচ্ছন্ন পা। কোমরে মহিষ চর্মের বন্ধনীতে শাণিত কুঠার গন্ডারের খাপে ঝোলানো নেই, কাঁধে ধনুক, পিঠে তুণীর দান, হাতে কৃপাণ, কোনো কিছুই ঝোলানো নেই। দীর্ঘ শরীরে লতাগুল্ম ছড়ানো, শুকনো পাতা, ফুলের পাপড়ি মাথায়, শুশ্রূত মুখে একটা অন্যমনস্ক অভিব্যক্তি। যেমনটি এ'কালে কালকূট তাঁর ঘর থেকে বাইরে বেরোনোর কয় পা পরেই ছেঁড়া কন্থা জড়ানো নীরব মানুষটিকে দেখে থাকেন, তেমনই ভাবলেশহীন অভিব্যক্তি এই ভয়ংকর দস্যু প্রাচেতসের।

কালকূটের মনে হল প্রাচেতস যেন গভীর বিষণ্ণতায় ডুবে আছে। কিন্তু তার বিষণ্ণতায় ভরা শ্মশ্রুসমন্বিত মুখ কোমলতায় পূর্ণ। কিন্তু কালকূট জেনেছেন— বেশ কিছুদিন ধরে এরকম অবস্থা চলছে। এর কারণ তার অনুগামী বিশ্বস্ত দস্যুদলও বুঝতে পারছে না। বসন্তকালে প্রকৃতি অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়েছে, ময়ূরেরা ডাকছে, আর হরিণেরা প্রাচেতসের আশেপাশে নির্ভয়ে বিচরণ করছে, তমসার কৃষ্ণনীল জলে বুনো হাঁসের দল ভেসে বেড়াচ্ছে, যূথপতি অন্যান্য হস্তীদের গায়ে শুঁড় দুলিয়ে নিশ্চিন্তে চলে বেড়াচ্ছে।

প্রাচেতস এসব কিছু দেখছে না, শুনছে না। কিংশুক ব্যতীত অন্য বৃক্ষরাজি ফুলে ফুলে অপরূপা, লতাগুল্ম তাদের মহাসমারোহে জড়িয়ে ধরেছে। দ্বিপ্রহরে মৃদু গন্ধ ফুলের ও বনানীর। অতি সর্পিল নদী তমসার স্রোতের ধারায় সূর্যকিরণ পড়েছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন কৃপাণের ঝটিকা যুদ্ধ হচ্ছে। অর্থাৎ চারিদিকে যৌবন চঞ্চলা প্রকৃতির সমারোহ।

কালকূট দেখছেন— প্রাচেতসের কানে কোনও শব্দ পৌঁছচ্ছে না; তিনি অন্যমনস্ক, গভীর একটা বেদনাবোধ তার চোখের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রাচেতসের অনুগামীরা মৃগ শিকার করে সামনে ফেলে রেখেছে, কয়েকটি হংস শিকার করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছে। অনুগামীরা অনার্য, কিরাত বংশীয়, গায়ের রং কালো নয়, উজ্জ্বল তাম্রাভ আর ধূসর মিশ্রিত। প্রত্যেকেই দীর্ঘাঙ্গ, পেশিবহুল শক্ত চেহারার মানুষ। এসেছে হরিয়ুপীয়ার দিক থেকে, প্রাচেতসের সঙ্গীরা কিরাত বংশীয়। কিন্তু প্রাচেতস? উনি ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদের সন্তান। ভৃগুবংশীয় চ্যবন গোষ্ঠীর সন্তানরা সারা বিশ্বজুড়ে বীণা বাজিয়ে গান গেয়ে মনোরঞ্জন করে ঘুরে বেড়ায়। কালকূট যে সময়ে তমসার তীরে অন্যমনস্ক অথচ কোমলতায় ভরা প্রাচেতসের উদাস চোখের দৃষ্টি দেখেছেন, সেই সময় থেকে আর একটু অতীতে এগিয়ে গিয়েছেন প্রাচেতসকে বিশেষভাবে জানবার জন্য। কালকূটের সেই অতীত ভ্রমণে চোখে পড়েছে— প্রাচেতস ছোটবেলায় বীণা বাজিয়ে, গান গেয়ে লোকের মনোরঞ্জন করে বেড়াতেন। বাল্যকালেই কিরাতদের সংস্পর্শে এসে ভৃগুবংশীয় চ্যবণদের পথ পরিত্যাগ করে বীণা বাজানো হাতে কুঠার তুলে নিয়েছিলেন এবং তিনি কালকূটের চোখে ধরা পড়েছেন এইভাবে যে — প্রাচেতস নামের মধ্যে আছে মৃত্যু শঙ্কা আর হত্যার ধ্বনি। যতো বীরপুরুষই হোক, অপ্রস্তুত অবস্থায় তারও নাড়ি ত্যাগের অবস্থা হয়। তার দস্যুদলকে নির্দেশ দিয়েছেন আগে আক্রমণ। ভয়ঙ্করতা ও নির্মমতা দিয়ে সকলের সামনে রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে হবে। তাদের সেই ভয়ঙ্কর উন্মত্ত শমনসদৃশ বিভীষিকাপূর্ণ মূর্তি দেখে শত্রুপক্ষ ভয়ে অবশ হয়ে পড়া মাত্র অবাধে লুণ্ঠন চালাতে হবে।

তার এই ভয়ঙ্কর বিভীষিকাতে ভীত তপোবনের মুনি-ঋষিরা গোপনে ভৃগুবংশীয় এই ভয়ঙ্কর মানুষটিকে কুলাঙ্গার বলছেন। নগরপাল, নগরবাসী সবার কাছে ত্রাসস্বরূপ। এমনকি রাজাদের

কাছেও তারা ত্রাসের কারণ। রাজাদের যত সৈন্য সামন্ত থাকুক না কেন প্রাচেতস ও তার দস্যুদলের ঝটিকা আক্রমণের কাছে তারা বিহ্বল হয়ে পড়েন। কোনো এক ভ্রাম্যমান রাজা তার সৈন্যসামন্ত সহ প্রাচেতসের কাছে পরাজিত হয়ে সমুদয় ধনরত্ন দিতে বাধ্য ছিলেন তথাপি তিনি প্রাচেতসের কাছে সকাতরে প্রার্থনা করেছিলেন, "হে প্রাচেতস, তুমি আমার এই ভ্রাম্যমান রাজ্যের সমস্ত ভার নাও। রাজার পরেই মন্ত্রী, সচিব ও সেনাপতির পদ তোমার থাকবে। তোমার দলবল নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে যোগদান কর।" *(পৃ: ১২৮৩, ঐ)*

কালকূট প্রাচেতসকে অনুসরণ করে অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে তাঁকে দেখছেন, মুগ্ধ হচ্ছেন দস্যুপতির স্বাধীনচেতা ও ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন উত্তরে। এ'কালের দৃষ্টি দিয়ে কালকূট মহাকাব্য থেকে চরিত্রগুলোকে তুলে এনে তাঁদের মুখে কথা দিয়ে সেকালের সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রগুলো জীবন্ত করে তুলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিঁখুত কালির তুলিতে রেখায় তুলেছেন সেই সময়ের একটি দস্যু দল ও তার দলপতির চিন্তাধারা, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনমানসের প্রতিচিত্র। এখন দেখা যাক কালকূট কী দেখছেন, কী ভাবছেন ও তাঁর ভাবনাকে লেখক কীভাবে চিত্রায়িত করছেন। কালকূট ফিরে এসেছেন প্রাচেতসের উত্তর দেবার মুহূর্তটিতে। রাজার উত্তরে প্রাচেতস বলছেন যে, রাজ আজ্ঞাবাহী একজন পদস্থ ব্যক্তিও হবেন না। তিনি ভৃগবংশীয় সন্তান, তবু বাধ্য হয়েছেন এই দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করতে। তাই তিনি বিবেক বস্তুটিকে ত্যাগ করে এই অসৎ ও পাপের কাজ বেছে নিয়েছেন। আদেশ পালন করতে শেখেন নি। তারা দস্যুবৃত্তি করে যে সম্পদ আহরণ করে তাতে তার দলের প্রত্যেকের সম অধিকার। —"রাজা যদি প্রজার শ্রমের বিত্তে বাঁচতে পারে, আমি দস্যুবৃত্তি করে কেন বাঁচবো না। এ জিজ্ঞাসা আমার মনে বালক বয়সেই জেগেছিল এবং আমি এই উজ্জ্বল বর্ণ বীর কিরাতদের সঙ্গে সেই বয়স থেকেই মিশেছি। কিন্তু কেবল ক্রৌঞ্চ পন্নগ ইত্যাদি পক্ষী শিকারে আমার রুচি হয় নি। আমি তাদের নিয়ে দল গঠন করেছি, দস্যুদল।" *(পৃ: ১২৮৩, ঐ)* দেখা যাচ্ছে, কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে এবং কোন জীবনযাত্রার পরিস্থিতি থেকে প্রাচেতস দস্যুবৃত্তিকে বেছে নিয়েছিল।

কালকূট দেখছেন আরও একটি বিষয়। — প্রাচেতসের নির্মমতা — অতি ভয়ঙ্কর শমনসদৃশ উন্মত্ততা, বিবেকহীনতা; কিন্তু কোথাও একটু যেন রয়ে গেছে সুপ্ত কোমলতা; প্রিয়তমা নারীর প্রেমের পরশে তার হৃদয় উদ্‌বেলিত — এটা কালকূটের গভীর নজর এড়িয়ে যায় নি। সেই ভ্রাম্যমান রাজার সঙ্গের স্ত্রীলোকেরা যখন অনুরাগ ভরা দৃষ্টিতে এই নরাধম দস্যুটির দিকে তাকিয়েছিল, তখন রাজা তা দেখতে পেয়ে নারীদের সম্পর্কে সম্মানহানিকর উক্তি করেছিল। "স্ত্রীলোকেরা অনঙ্গশরে নিপীড়িত হলে, নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হয়ে থাকে।" *(পৃ: ১২৮৩, ঐ)*

এই রুচিহীন উচ্চারণ রাজার মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়ার পরে প্রাচেতস, সেই নরাধম

দস্যু রাজার কথার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন— "আপনি কেবলই ভোগ করেছেন, স্ত্রীলোক আপনার কাছে ভোগের বস্তু। আপনি কদাপি কোনো রমণী প্রেমে আর্ত হন নি। সে রমণী বারাঙ্গ না অনার্যা যা খুশি হতে পারে, প্রেমই নারীকে বোঝবার জানবার একমাত্র উপায়। রাজারা তা জানেন না।" *(পৃ: ১২৭৭, ঐ)* *(পৃ: ১২৮৩ -- ৮৪, ঐ)*

কালকূট ঠিকই প্রাচেতসের প্রেমপূর্ণ কোমল ও প্রতিবাদী মনটিকে দেখতে পেয়েছেন। জীবনের উপলব্ধি থেকে প্রচেতসের মুখ দেখে কালকূট এই ভাবনা ধরতে পেরেছেন। কালকূট প্রাচেতসের বালককালের সময় থেকে ক্রমশ যৌবনকালের দিকে এগিয়ে এসেছেন। বুঝতে চেয়েছেন কেন চ্যবণ গোষ্ঠীর সন্তান রক্ত মেখেছেন দু'হাতে! সমাজজীবনে কোন্ শূন্যতা, কোন্ না — পাওয়ার বেদনা থেকে, এমন নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর দুস্যুবৃত্তি বেছে নিয়েছেন। কালকূট আরও দেখেছেন— বিষণ্ণতা প্রাচেতসকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। সঙ্গীদের বলেন যে, "কেবল মনে হয়, আমি বড় ক্লান্ত, আমাকে থামতে হবে এবং আমার মায়ের মুখ মনে পড়ে। আবার বাবার মুখ মনে পড়ে। আমি আমার অতি শৈশবে ফিরে যাই। আর আমার চারধারে কারা যেন অট্টহাস্য করে। মানুষের বুকে কুঠার হেনে দু'হাতে রক্ত নিয়ে উল্লাসে খেলা করে। যেমন আমি করি। যা আমি করি তা আমাকে কেন এভাবে মনে করিয়ে দেয়, কে দেয়, আমি কিছুই বুঝি না। কেবল আমার মন অত্যন্ত ক্লান্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়ে।" *(পৃ: ১২৮৪, ঐ)* বারণী, মাধ্বী পানে ডুবে থেকেও প্রাচেতস বুঝতে পারে তার অন্তরেই কেউ যেন অবস্থান করে তাকে পরিবর্তন করাতে চাইছে। কিন্তু কালকূট দেখেছেন — প্রাচেতস-এর অন্তরের কষ্টটি ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি সঙ্গীদের বলছেন — "ঐ যে দেখছো আকাশের বর্ণ লাল, সূর্য অস্ত যাচ্ছে, বনানী ক্রমে কৃষ্ণ রঙ হচ্ছে, আমি সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবি। কে এই প্রকৃতির এই আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। দেখ, কী সুন্দর।" *(পৃ: ১২৮৪, ঐ)* প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাচেতসের মন পরিবর্তন হচ্ছে। নিষ্ঠুর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সুন্দর এসে উঁকি দিয়ে তাঁকে পরিবর্তনের ডাক দিচ্ছে বারে বারে। তাঁর সঙ্গীরা প্রকৃতির এই পরিবর্তনেও যেমন অবাক হয় না, তেমনি তাদের দলপতির এই মানসিক পরিবর্তনেও অবাক হয় না। ভাবে দলপতি প্রলাপ বকছে; এটাই তো নিয়ম — "সূর্য অস্ত গেলে, আকাশ লাল হবে।" *(পৃ: ১২৮৪, ঐ)* কালকূট ছোট ছোট সাধারণ কথার মধ্য দিয়ে দস্যু দলপতি ও দলের সদস্যদের মনের কথা এ'কালের উপযোগী করে লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মহাকাব্যের কালের মানব-মানবীরা এ'কালের এই মাটির পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে। কালকূট দস্যুদলের লোকেদের মানসিকতা বুঝতে চেষ্টা করছেন। কালের দৃষ্টিতে তারা দস্যুবৃত্তি করে গৃহ ও সংসার প্রতিপালন করে সুখে আছে। এর বাইরে তারা ভাবতে রাজি নয়। কিন্তু প্রাচেতস তো শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যেই সুন্দরতা খুঁজে পাচ্ছেন; প্রাচেতসের এই

পরিবর্তিত ভাবের আগের বছর পুরু দেশে যাওয়ার সময় প্রাচেতস তার অশ্বের বলগা টেনে ধরেছিলেন, "এক ঋষিপত্নী তার স্তন খুলে সন্তানকে পান করাচ্ছে, শিশুটি মায়ের চিবুকে তার কচি হাত ঠেকিয়েছিল, আর মা হাসছিল।" *(পৃ: ১২৮৪, ঐ)* তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল "কী সুন্দর!" *(পৃ: ১২৮৪, ঐ)* কিন্তু তার সঙ্গীরা হেসে কুটিপাটি হয়েছিল। কিন্তু প্রাচেতস অনেকক্ষণ যাত্রা থামিয়ে রেখেছিলেন, পরে অন্যমনস্ক হয়ে অশ্ব চালনা করেছিলেন। কালকূট দেখেছেন প্রাচেতসের অন্তর বেশ কিছুদিন থেকে পরিবর্তনের দিকে ঝুঁকেছে। তাই তিনি মা-শিশুর চিরন্তনের সম্পর্কের মধ্যে সুন্দরকে দেখতে পেয়েছেন। পূর্বে তিনি বহু মায়ের বুক থেকে শিশুকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। তার সঙ্গীসাথীরা এ'কথা স্মরণ করালে তিনি ব্যথায় দীর্ণ হয়েছেন। সেই দস্যুদলপতি প্রাচেতস অরণ্য মধ্যে গভীর রাত্রে প্রবল শীতে, চারপাশে আগুনের কুণ্ডলী জ্বালিয়ে নিদ্রাহীন, তিনি তার সঙ্গীদের বলে চলেছেন "আমি শুনতে পাচ্ছি, গাছের একটা পাতা শিশিরে ভেসে গিয়ে, আর একটা পাতায় পড়ছে। এরকম অনবরত টপ্ টপ্ শব্দে পড়ছে। ভাবি, এই প্রকৃতি কি কাঁদছে? দূর থেকে যে ঝর্ণার শব্দ আসছে— ঐ শুনতে পাচ্ছ, কুলুকুলু শব্দ, সে শব্দেও কান্নার আভাস? আমি বুঝতে পারি না।" *(পৃ: ১২৮৪, ঐ)*

জীবন যন্ত্রণার মানসিক অস্থিরতার বাস্তব চিত্র কালকূটের মন প্রাচেতসের সঙ্গে চলতে চলতে দেখতে পেয়েছেন। তিনি শুনতে পাচ্ছেন তাঁর সেই অন্তরের জেগে উঠা অস্তিত্বের কথা। "আমাকে অন্ধ করতে পারো কিন্তু বধির করো না হে। তাহলে এই অপূর্ব শব্দ আমার কানে ঢুকবে না। আমার ভিতরটাকে এই শব্দ যেন ভিজিয়ে দিচ্ছে। কেন? আমার মধ্যে কে তুমি এমন করে শব্দে অবগাহন কর? আমি তোমাকে চিনি না, জানি না। তোমাকে দেখতে পাই না। কে তুমি এক অজানা রহস্যময় আমার মধ্যে বিরাজ কর। আমি প্রাচেতস, কুখ্যাত ভয়ঙ্কর এক দস্যু। প্রাণে আমার মায়া নেই, দয়া নেই...।" *(পৃ: ১২৮৪, ঐ)* লেখক তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে প্রাচেতসের অন্ধকার জগৎ থেকে আলোয় ফেরার মুহূর্তগুলোকে অবলোকন করছেন। প্রতিটি মুহূর্তের মানব জীবনের যন্ত্রণা এ'কালের দৃষ্টিতে এ'কালের মানব জীবনের যন্ত্রণার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন।

হৃদয়ের ব্যাকুলতায় অন্যমনস্কভাবে প্রাচেতস তমসার তীরে চলে এলেন। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে নিজেই ভেসে চলল অতীতের ঘটে যাওয়া এক রাত্রিতে। গান্ধার দেশের এক কোটিপতি সওদাগরের গৃহে প্রাচেতস তাঁর দস্যুদল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সওদাগর পূর্বসাগর পাড়ি দিয়ে গৃহে ফিরে এসেছিলেন প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে এবং পুত্রের বিবাহোপলক্ষে কন্যার গৃহ থেকেও বিস্তর মুদ্রা, অশ্ব, গাভী, অলঙ্কার এবং বহুতর সুন্দরী দাসী। নবদম্পতির শয়নকক্ষে স্বয়ং প্রাচেতস প্রবেশ করে নববধূর সকল অলঙ্কার, গৃহের সব মুদ্রা একজন সঙ্গীর মাধ্যমে সব লুট করেছিল। তারা প্রথমে তা দিতে চায়নি, তাই সে ধারালো কুঠার দিয়ে সওদাগর পুত্রের বাম বাহু কাঁধ থেকে ছিন্ন

করে দিয়েছিল। তখনই নববধূ রক্তাপ্লুত স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল "হত্যা করো না দস্যু। আজ আমাদের বিবাহের প্রথম দিন।" *(পৃ: ১২৮৫, ঐ)* নববধূ প্রাচেতসের উদ্যত কুঠারের সামনে স্বামীকে আড়াল করে নিজের অনাবৃত শরীর তুলে ধরেছিল এবং স্বামীর জীবন ভিক্ষা করেছিল, বিনিময়ে সব ধনরত্ন নিয়ে যেতে বলেছিল। আরও বলেছিল "সম্ভবত এখনও আমার স্বামীকে বাঁচাতে পারবো। ঐ হাত দিয়ে রজনীর প্রথম প্রহরেও সে আমাকে আলিঙ্গন করেছিল।" *(পৃ: ১২৮৫, ঐ)* এরপর প্রাচেতস কুঠার নামিয়ে নিয়ে সদলবলে গৃহত্যাগ করে নগরের নটী বারাঙ্গনাদের প্রাসাদে উপস্থিত হয়েছিল। স্বয়ং রাজনর্তকী প্রাচেতসকে হাত ধরে তার গৃহে নিয়ে গিয়েছিল। এই রাজনর্তকী ও বারাঙ্গনারা রাজার আশ্রিতা ও পালিতা। রাজার দায়িত্ব তাদের রক্ষা করা।

রাজনর্তকীর গৃহে মাধ্বী পান করতে করতে প্রাচেতসের কোনো জ্ঞান প্রায় ছিল না বললেই চলে। চোখের সামনে ভেসে উঠছিল সেই নববধূর ক্রন্দনরত মূর্তি, প্রাচেতসের উদ্যত কুঠারের আঘাতে মৃত্যুকে বরণ করতে চেয়েছিল। অন্যান্য ঘরে সেই নবদম্পতির প্রতি প্রাচেতস কী আচরণ করেছিল, উদ্যত কুঠারে একটি হাত কাঁধ থেকে কীভাবে ছিন্ন করেছিল সেই ঘটনা বলাবলি করছিল। প্রাচেতসের অর্ধ-আচ্ছন্ন মনে সে বর্ণনা আঘাত হানছিল। রাজনর্তকী কপট ছলনায় প্রাচেতসের পক্ষ নিয়ে বলেছিল যে তিনি ঠিক কাজই করেছেন। নববধূ বাধা দিয়ে ঠিক করেনি, কিন্তু ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাচেতস নর্তকীর এই ছলনা বুঝতে পেরেছিল। স্বামীর প্রাণ ভিক্ষার জন্য বেদনাভরা আকূতির কথা শুনে নর্তকীর চোখের কোণ দুটি চিকচিক করে উঠেছিল। তবুও সেই নর্তকী হেসেছিল কিন্তু কথা বলতে পারে নি। পুরুষের একটি ছিন্নহাত তার অন্তরে যন্ত্রণার বীণায় বেদনার সুর তুলেছে। তার ভিতরের সত্তা তাকে কঠিন হাস্যে বিদ্রূপ করছে। কালকূট তার হৃদয় যন্ত্রণার কথা শুনছেন— "তুমি নবদম্পতির সেই সুখী অর্ধনগ্নাবস্থা দেখে, ঈর্ষাকাতর হয়েছিলে। বঞ্চিত তুমি, অতএব তুমি পুরুষটির দুটি হাতই ছিন্ন করতে চেয়েছিলে। যে দু'হাত দিয়ে সে তার বধূর প্রিয় অঙ্গের সুখ উৎপাদন করে।" *(পৃ: ১২৮৬, ঐ)*

নর্তকীর সকল কৌশল সে রাত্রে ব্যর্থ হয়েছিল। অন্যমনস্ক, বেদনার্ত, অনুতপ্ত দস্যু দলপতি প্রাচেতসের মধ্যে তীব্র কাম উন্মাদনা জাগরিত করতে পারে নি। কালকূট প্রাচেতসের অন্তরের গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অনুভব করেন যে, দস্যু দলপতি যখন তার উদ্যত কুঠারে প্রাণঘাতী রক্তপাত ঘটান, তখন সেই রক্তপাতের পরেই ভেঙে পড়েন। কিন্তু নিজের যন্ত্রণার কথাকে স্বীকার করেন না। তার প্রিয়তমাকে পৃথিবীর সমুদয় ধনরত্ন দিয়ে সুখী করতে চায়। তাই রাজনর্তকীর সঙ্গ সুখের মধ্যে থেকেও নববধূর আকূতি ভরা প্রাণভিক্ষার চিত্র তাকে বিব্রত করলেও পরক্ষণেই রক্তের তৃষ্ণায় মেতে ওঠেন। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ তার বিবেকহীন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

কালকূট প্রাচেতসের মনোজগতে ঘোরাফেরা করছেন। দেখছেন কী বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত তার জীবন, তিনি বুঝতে পারেন না নিজেকে, চিনতে পারেন না নিজের সত্তাকে, অথচ সেই সত্তাই তাকে বারে বারে ডাকছে দস্যু জীবন থেকে অন্য জগতের দিকে ফিরে তাকাতে, নিজেকে চিনতে বলছে— প্রাচেতস, ভৃগুবংশীয় চ্যবণ গোষ্ঠীর সন্তান, যাদের রক্তে তার জন্ম তাদের দেখতে বলছে।

প্রাচেতস ও তার সঙ্গীরা ভুবর্লোক থেকে ফিরে এসেছে, সাতদিন হল। সেখানে সে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল একজনকে। মাথা পেতে সে প্রাচেতসকে কিছু বলেছিল। তার সঙ্গীরা কিছুই শুনতে পায় নি, শুধু উদ্যত কুঠার নামাতে দেখেছিল। প্রাচেতসের কথাই শুধু তার সঙ্গীরা শুনতে পেয়েছিল, "শোন ঋষি, আমি আজ তোমার প্রাণ ফিরিয়ে দিলাম। কিন্তু তুমি যা বললে, তা যদি সত্য হয় প্রমাণ না হয়, আমার কথাই যদি সত্য হয়, তবে আমি আবার ফিরে আসবো। তোমার প্রাণ নেবো। তুমি যদি মিথ্যা বলে থাকো, যেখানেই পালাও, আমি তোমাকে ঠিক খুঁজে বের করবো, তোমাকে হত্যা করবো।" *(পৃ: ১২৮৭, ঐ)* ঋষির উত্তর সঙ্গীরা শুনতে পেয়েছিল। "তুমি আমাকে এখনই হত্যা করতে পারো। কিন্তু যা সত্য, আমি তাই বলেছি।..." *(পৃ: ১২৮৭, ঐ)* কিন্তু কী সত্যি কথা ঋষি প্রাচেতসকে বলেছিল তা তারা প্রাচেতসকে জিজ্ঞাসা করেও জানতে পারে নি। ঋষি প্রাচেতসের মনে একটা সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা নিরসন না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিরুত্তর থাকবেন বলে স্থির করেছেন।

ভুবর্লোক থেকে ফেরার পথে তারা অন্তরীক্ষের কাছে বাহীকদের দেশে গিয়েছিল। অন্তরীক্ষের কাছে বাহীক দেশ। আর্যরা সেখানে যায় না। কিন্তু প্রাচেতসরা দস্যু, তাদের গম্যাগম্য স্থানভেদ কিছুই নেই। বাহীক রমণীরা তাদের স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কার সব দান করতে প্রস্তুত একটি শর্তে — তাদের সঙ্গে মৈথুনে রত হতে হবে। প্রাচেতস অন্যবারের মতো এবার কোন রমণীর সঙ্গে মিলিত হয় নি, বাহীক রমণীরা তার চীর বাঘছাল অপহরণ করে তাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারে নি। উদাসীন, অন্যমনস্ক প্রাচেতস শুধু সুরা পান করেছে, আর ব্যস্ত হয়েছে গৃহে ফেরার জন্য। যেখানে তার পিতামাতা ও প্রিয়তমা পত্নী ছায়া আছে। ছায়া অনার্যা, গৌরী ও রূপসী নারী। হরিয়ুপীয়া থেকে আগত কিরাতদের কন্যা। অনার্যা রমণীদের আচরণ কিছুটা বাহীকদের মতো। তারা নিজেদের ভাষা ভুলে গিয়েছে। অনার্য বধূরা বাহীকদের মতো স্বেচ্ছাচারিণী নয়।

কালকূট প্রাচেতসকে অনুসরণ করে আবার ভুবর্লোক থেকে তমসার তীরে ফিরে এসেছেন। প্রাচেতস অন্যমনস্ক, চোখের দৃষ্টিতে আচ্ছন্নতা, কিন্তু ভেতরে ভেতরে অস্থির। প্রাচেতসের এই অস্থিরতা, বিহ্বলতার কারণগুলো এ'কালের দৃষ্টিতে দেখবার জন্য এই সময় থেকে আর একটু

অতীতের সময়ে চলে গিয়েছিলেন লেখক কালকূট প্রাচেতসের পিছনে ফেলে আসা জীবন ও দস্যু দলপতি প্রাচেতস ও মনের অবচেতনে দস্যু জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আর এক মানুষ হয়ে ওঠার সন্ধিক্ষণে দাঁড়ালেন। দস্যু জীবন থেকে পরিবর্তিত মহান কবিকে জানবার জন্যই তাঁর এত দীর্ঘসময় ধরে দীর্ঘ পথে চলাফেরা।

কালকূট লক্ষ্য রাখছেন প্রাচেতসকে; প্রথম কয়েকদিন অস্থির, অন্যমনস্ক। বাক্‌রহিত প্রাচেতস ক্রমেই যেন আর এক মানুষ হয়ে উঠছে। সে শুধু মাধ্বী পান করেছে। এরপরে মাধ্বী পানও বন্ধ করে দিনের শেষে একবার ফলমূল খেয়েছে। কাছেই এক ঋষি দম্পতির তপোবনে বসে বিশ্রাম করে আর বাকি সময় কেবল পাগলের মত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। আবার কখনো তমসার স্রোতে ভাসতে ভাসতে চলে যায় দূরান্তরে। জলচর হংস-হংসীরা তার সঙ্গে খেলা করার জন্য নিকটে ভেসে আসে। মাথার কেশ, মুখের দাড়ি বিন্যাস করে না। বসন্তের অরণ্যের গাছের ফুল-পাতা তার দেহে লেগে থাকে। লতাপাতা তার জটার মতো চুলে বৃক্ষকে আলিঙ্গন করার মতো জড়িয়ে থাকে। কোন কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

সেই ঋষি, ভুবর্লোকে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, যে তাকে কঠিন সত্যের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে, সব ঘটনাবলী তার চোখের সামনে বারে বারে ভেসে উঠে। তমসার স্রোতের মতোই নিমেষে মিলিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎই সে তমসার স্রোত থেকে মুখ তুলে কঠিন মুখে অশ্বের পৃষ্ঠে লাফিয়ে উঠে অশ্ব চালিয়ে গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে ছোট ছোট খাড়ি লাফ দিয়ে পার হয়ে কিরাতপল্লীতে এসে পৌঁছাল। দস্যু পল্লীর একটি অগোছালো, অপরিচ্ছন্ন কুটির প্রাঙ্গণের সামনে এসে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করল। কুটির প্রাঙ্গণে তার বৃদ্ধ পিতামাতা দ্বিপ্রহরের খাবার না খেয়ে মাধ্বী পান করছে। তার স্ত্রী ছায়া, অন্য দুই যুবতী দস্যু পত্নীর সঙ্গে মাটিতে ঘর এঁকে খুঁটি সাজিয়ে ক্রীড়া করছে আর মাধ্বী পান করছে। গৃহপালিত পশুদের খাদ্য-পাত্রগুলি নোংরা হয়ে পড়ে আছে আর শূকরেরা কাদায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। কালকূটের চোখ দিয়েই মূর্ত হয়ে উঠলো মহাকাব্যের দস্যুপল্লীর একটি কুটির প্রাঙ্গণ।

দুস্যু দলপতি প্রাচেতস কঠিন মুখে পিতামাতার কাছে জানতে চাইল— তারা দ্বিপ্রহরের খাবার না খেয়ে মাধ্বী পান করছে কেন? চ্যবণ গোষ্ঠীর মানুষেরা কেন বীণা বাজিয়ে যাযাবরের ন্যায় গান গেয়ে ফিরে নিজেদের অন্ন সংগ্রহ করছে না? পিতার উত্তর ছিল, বয়স হয়ে যাওয়ায় তারা যাযাবরের ন্যায় বীণা বাজিয়ে অন্ন ভিক্ষা করতে পারে না। এছাড়া তারা বলছে— "তোমার মত উপার্জনক্ষম সবল পুত্র থাকতে আমরা কেন এ বয়সে যাযাবরের মতো ফিরব? আমাদের আশ্রয় খাদ্য পানীয় জোটানো তোমার কর্তব্য।" *(পৃ: ১২৮৯, ঐ)* প্রাচেতস কিভাবে উপার্জন করছে, তা তাদের দেখবার বা জানবার কথা নয়। সে তাদের প্রতিপালন করছেনা, এই উত্তরই

ক'দিন ধরে তারা দিয়ে চলেছেন। উত্তেজনায় প্রাচেতস রুদ্ধস্বরে আবার জিজ্ঞাসা করল "এইজন্য যে, তোমরা আমার সকল সৌভাগ্যের ভাগ নিতে পারো। অথচ আমার পাপের ভাগ নিতে পারো না? এ কেমন যুক্তি।" *(পৃ: ১২৮৯, ঐ)* তার

পিতার উত্তর ছিল, "যুক্তি নেই, এটা ধর্ম। তোমার সকল সৌভাগ্যের ভাগ নিতে পারি। কিন্তু পাপের ভাগী হতে পারি না। ... যেমন নগরের বেশ্যারা রাজার পালিতা, তাদের পাপের ভাগ রাজা স্বয়ং বহন করেন। তারা করে না। তারা নিষ্পাপ।" *(পৃ: ১২৮৯, ঐ)* ভৃগুবংশজাত প্রাচেতসের পিতা বীণা বাজানোর বদলে মাধ্বীপাত্র তুলে নিয়েছে হাতে এবং বিচারবোধ শূন্য হয়ে কিরাতদের মতই কথা বলছে। পরিবেশ মানুষের শুভবুদ্ধিকে কত নিম্নগামী করে তুলতে পারে কালকূট সেটাই চিত্রিত করেছেন।

প্রাচেতসের অর্ন্তদৃষ্টি খুলতে চলেছে। বেশ্যারাও পাপ করে না, তাদের পাপের ভাগী রাজা, যিনি তাদের রক্ষক ও পালক। প্রাচেতসের পিতা একথাও জানিয়েছিল "কিন্তু আমাদের পালন না করা তোমার আর একটি পাপ।" *(পৃ: ১২৮৯, ঐ)* এবং তারা তাকে অভিসম্পাত করবেন মৃত্যু অনিবার্য জেনে। কালকূট অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অতীতের কিরাতপল্লীর কথাবার্তা, সমাজচিত্রকে চরিত্রগুলোকে বর্তমানের আলোতে আলোকিত করেছেন।

প্রাচেতস পিতার যুক্তি মানতে পারে না। প্রাচেতস মনে মনে মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু কিসের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চায় তা সে জানে না। সে স্ত্রী ছায়ার কাছে যায়, যাকে নিজে প্রেমিকারূপে, পত্নীরূপে পছন্দ করেছিল। প্রাচেতস ছায়ার বাবা-মায়ের কাছে আর্যের মত প্রার্থনা করে ও সম্মতি নিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে এসেছিল, আর বৈবাহিক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিল তার পিতা। বিবাহ পরবর্তী জীবনে সে দূর-দূরান্ত যেখান থেকেই আসত, সকলের আগে ছায়াকে আলিঙ্গন করত। এবার পিতামাতার গৃহ থেকে এসেছিল ছায়ার কাছে। প্রাচেতস দস্যু হলেও ছায়ার কাছে সে পূজ্য, সে তার স্বামী। এই যুক্তি ছায়া তাকে 'আর্যপুত্র' বলে সম্বোধন করেছিল। প্রাচেতস ছায়ার যুক্তি মানে নি, কঠিন স্বরে বলেছিল "আমি কেমন করে তোমার পূজ্য হতে পারি। আমি যদি তোমার পূজ্যই হবো, তবে আমার সকল সুখ দুঃখ পাপতাপের ভাগী তুমি হতে। কিন্তু তুমি তা নও।" *(পৃ: ১২৮৯, ঐ)* তীব্র ক্রোধ ও অভিমান প্রাচেতসের গলার স্বরে ফুটে উঠেছে। সংসারে কেউ কারো পাপের ভাগী হতে পারে না, ছায়াও রাজি নয় স্বামীর পাপের ভাগী হতে। প্রাচেতসের কাছে এ সংসার বৃথা, মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে। স্ত্রীর ভরণপোষণ প্রাচেতসের কর্তব্য, এটাই অশ্রুসিক্ত নয়নে ছায়া বলে ফেলেছিল। সেই ছায়া প্রাচেতসকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, এটা বুঝতে পেরে তার স্বর সহসা রুদ্ধ হয়ে আসে। ছায়ার জন্যই পাপ করেছে, সমস্ত সংসারকে ত্যাগ করতে পারে কিন্তু ছায়াকে ত্যাগ করতে পারে না। অথচ ছায়া কত অনায়াসে বলে ফেলে যে জীবনের

কঠিনতম সংঘাতের সন্ধিক্ষণে প্রাচেতস এসে দাঁড়িয়েছে! পিতা, মাতা, প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছে তীব্র আঘাত পেয়ে তার হৃদয় ভেতরে ভেতরে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে থাকে। ক্রুদ্ধ হয়ে নির্দয় বিদ্রূপে প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষায় শাণিত কৃপাণের ঝলকে হেসে উঠে ছায়াকে বলেছিল ''আমি কেন আমার পাপের দ্বারা তোমার জীবনকে নষ্ট করবো না? আমি তোমাকে সেই আদেশই করবো—'' *(পৃ: ১২৯০, ঐ)* কালকূট কী নিদারুণ বাস্তববোধ থেকে ইতিহাস-মহাকাব্য থেকে চরিত্রগুলো তুলে এনে কালোপযোগী সংলাপের মধ্য দিয়ে তাদের মানবিক রূপ দিয়ে কাহিনীকে অন্য এক সাহিত্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সব কিছু কালকূট তুলে ধরেছেন।

কালকূট দেখছেন যন্ত্রণাবিদ্ধ প্রাচেতসকে। দুহাতে মাথা চেপে ধরেছে, আরক্ত চোখের কোণে যেন হীরা চিকচিক করছে, ছায়াকে বলছে, ''আমার সমস্ত জীবন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আর কারোর জীবনে আমার কী প্রয়োজন? আমি যদি ভুবলোকে না যেতাম, আমার সঙ্গে সেই ঋষি ব্যক্তির দেখা না হতো, তিনি যদি আমাকে না বলতেন, তা হলে আমি চিরকাল মূঢ় অন্ধকারেই থেকে যেতাম।'' *(পৃ: ১২৯০, ঐ)* ছায়াকে আরও জানাল যে, সেই ঋষিকে তিনি জানেন না, অপূর্ব কণ্ঠস্বর, তাকে বলেছিলেন এই সত্যটি, 'এ তোমার একলার পাপ।' *(পৃ: ১২৯০, ঐ)* পিতা-মাতা-স্ত্রী কেউ পাপের ভাগী হতে স্বীকার করবে না। ঋষির বাক্যে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য ছুটে এসেছিল। ঋষি মিথ্যা বলেন নি। মনের ভিতরে নানা প্রশ্ন ''তাহলে সারাজীবন আমি কী করে আসছি? কোন অন্ধকারে আমি আছি? সংসারের সব সুখের স্বপ্ন আমার ভেঙে গিয়েছে। এখন আমার একমাত্র চিন্তা, আমার এই একলার পাপ থেকে আমি কেমন করে মুক্ত হবো? আমি যে একা।''*(পৃ: ১২৯০, ঐ)* জীবনের কঠিন সত্যের মুখোমুখি প্রাচেতস, যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হৃদয়, চোখের পাতা ভিজে উঠেছে।

পাপমুক্তির পথের নির্দেশ সেই ঋষির কাছে পাওয়া যেতে পারে ভেবে প্রাচেতস অশ্ব, কুঠার, কৃপাণ সব কিছু ত্যাগ করে পায়ে হেঁটে সেই ঋষির কাছে যাওয়া স্থির করল। ছায়াও তাকে ঐ ঋষির কাছে যেতে বলল; প্রাচেতস বুঝে গেল যে ছায়াও প্রকারান্তরে প্রাচেতসকে ত্যাগ করছে।

প্রাচেতস যাওয়ার আগে নিজেকে ছায়ার বাহু-ডোর থেকে মুক্ত করে, তার মস্তক আঘ্রাণ করে চুম্বন করল এবং বলল ''ছায়া, যদি আর কোনোদিন ফিরে না আসি, জানবে আমি পথে চলেছি।'' *(পৃ: ১২৯১, ঐ)* বিদায় লগ্নে প্রাচেতস শেষবারের জন্য ছায়ার প্রতি একবার প্রেমার্ত দৃষ্টিপাত করে মুক্তির পথে চলবার জন্য পা বাড়াল। ভয়ঙ্কর বিভীষিকা, যমসদৃশ দস্যু দলপতি প্রাচেতস এখন অন্ধকারময় পাপের জগৎ থেকে মুক্তির জন্য আলোর পথের সন্ধানে বেরিয়ে

পড়ল।

কালকূট অপূর্ব দক্ষতায় বাল্যকাল থেকে মুক্তির পথে চলার মুহূর্ত পর্যন্ত দস্যু দলপতি প্রাচেতসের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, সুখ-দুঃখ, রক্তপাতজনিত কারণে অনুতাপ, হাহাকার, সবকিছু সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। মহাকাব্যের এক চরিত্রকে একালের দৃষ্টিতে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে, পাপের পথ থেকে, আলোর পথে, মুক্তির পথে নিয়ে চলেছেন।

প্রাচেতস মুক্তির লক্ষ্যে ভুবলোকের পথে পশ্চিম সাগরের দিকে চলতে লাগল, গন্ধমাদনের নিম্নভূমি রোমক দেশের এক বণিক প্রাচেতসকে পশ্চিমসাগর পার করে দিল। মাত্র একমাসের মধ্যেই প্রাচেতস ভুবলোকে পৌঁছে গেল এবং সেই ঋষির খোঁজ করতে লাগল, কিন্তু কেউ খোঁজ দিতে না পারায় বাধ্য হয়ে প্রাচেতস তার দস্যুবৃত্তি সংক্রান্ত ঘটনা তাদের কাছে বিবৃত করল। তখন সকলে সেই ঋষিকে চিনতে পেরে জানাল যে "তিনি নারদবংশীয় মুনি। তিনি স্বর্গ-মর্ত্য ঘুরে বেড়ান। এখন তিনি ইলাবৃতবর্ষে আছেন, অথবা মেরু পর্বতের রম্যকবর্ষ; তা কেউ বলতে পারে না। অথবা হয়ত নিষধবর্ষ বা কিম্পুরুষবর্ষেও থাকতে পারেন। পৃথিবীতে যাওয়াও বিচিত্র না।" *(পৃ: ১২৯১, ঐ)* সুতরাং প্রাচেতস চিন্তান্বিত — কোথায় পাওয়া যাবে ঋষিকে। সেই নারদবংশীয় ঋষির দর্শন পাওয়া তার চাই, কারণ একথা তাঁকে জানাতেই হবে যে, তিনি সত্য বলেছিলেন।

আবার পশ্চিমসাগর পাড়ি দিলেন এবার পীতবর্ণের মৎসজীবী মানুষদের সাহায্যে। পশ্চিমসাগরের এই অংশ ভারতবর্ষ থেকে ভুবলোকে যাবার মাঝখানে। দুই দেশের তটরেখা। প্রাচেতস হিমালয় অঞ্চলের লোকালয়গুলোর মধ্য দিয়ে চলতে চলতে সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানুষের জীবন যাপনের চিত্র, বর্ষাকালে হিমালয়ের বুক থেকে উপচে পড়া গৈরিক ঠাণ্ডা জলের ধারা, চারিদিকে প্লাবন, সমতল অঞ্চলগুলি বিচিত্রধারায় চাষবাস ঐসব দেখতে দেখতে নিজের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ করতে এগিয়ে চলেছে। হিমালয়ের ওপরে অনেকগুলি নগর, প্রাচীরবেষ্টিত নগরগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বিভিন্ন জ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে করতে তার ইপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলতে লাগল। বণিকদের কাছ থেকে দেশ-বিদেশের সংবাদ— যেমন, কোথাও যুদ্ধবিগ্রহ চলছে কিনা, কোথাও প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছে কিনা, তাতে কতটা ক্ষতি হয়েছে, এরকমই সব সংবাদ পাওয়া যায় এটাও প্রাচেতস প্রথম জানতে পেরেছে। অযোধ্যাপতি রাম রাবণকে হত্যা করে, তাঁর পত্নীকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন এই সংবাদও প্রাচেতস জানতে পেরেছে। নতুন অভিজ্ঞতা তার, বণিকরা সমাজের অন্য কাজও করে, অথচ সে ধন সামগ্রী নির্মমভাবে লুণ্ঠন করেছে, তাদের হত্যা করেছে। এসব কথা ভেবে সে গোপনে অশ্রুপাত করছে।

প্রাচেতস কিম্পুরুষ বর্ষে যখন পৌঁছল তখন শরৎকাল। প্রকৃতি অপূর্ব সৌন্দর্যে সেজে উঠেছে। এখানকার একটি ছোট নগরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় প্রাচেতস চমকে উঠলেন, "সেই

ঋষি পুরুষ চলেছেন এবং তাঁকে ঘিরে রাজপুরুষগণ। নানা বাদ্য বাজছে।" *(পৃ: ১২৯১, ঐ)* প্রাচেতস ছুটে গিয়ে তার পায়ের ওপরে পড়ল। ঋষিকে খোঁজা শেষ!

আকস্মিক এই ঘটনায় ঋষি অবাক দৃষ্টিপাত করে জানতে চাইলেন, "কে তুমি? কী চাও?" *(পৃ: ১২৯০, ঐ)* প্রাচেতস নিজে পরিচয় দিলেন 'নরাধম দস্যু প্রাচেতস' বলে। এবং একবছর আগে তিনি প্রাচেতসকে একটি কথা বলেছিলেন সেটিও জানিয়ে দিলেন। একবছর আগের দেখা মানুষটির এত পরিবর্তন হয়েছে যে তাকে ঋষি প্রথমে চিনতে পারেন নি। তবে তিনি যে একটি কথা বলেছিলেন সেটি তাঁর স্মরণে আছে। ঋষির কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রাচেতস তাঁর কম্পমান দুর্বল শরীরে সত্য স্বীকার করলেন, "প্রভু আপনি আতি সত্য বলেছিলেন।" *(পৃ: ১২৯২, ঐ)* তাঁর কাছে এই সত্যটুকু স্বীকার করার জন্য সে পদব্রজে ভুবলোক, সেখান থেকে ইলাবৃতবর্ষের পথে যেতে, এই কিম্পুরুষবর্ষে এসেছেন। নারদীয় ঋষি দুই চোখের অপার করুণা নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন। ঋষি রাজ অতিথি, একটি শুভ কাজ করতে এসেছেন, প্রাচেতসও ঋষির মতো রাজ অতিথি হলেন। মনভ্রমণে কালকূট যেন ওখানকার নগরবাসীর আলোচনা শুনতে পাচ্ছেন— প্রাচেতসের মতো দস্যুর কথা ইলাবৃতবর্ষে দেবতা জাতিরাও জানে, তাহলে কিম্পুরুষবর্ষের লোকেরা জানবে না কেন? রাজগৃহে সেই ঋষির মতোই উষ্ণ অভ্যর্থনা পেল। পরের দিন প্রভাতে প্রাচেতস সেই ঋষিকে প্রণাম করার পরে স্বীকার করলো, তার সেই হৃদয় ভেঙে যাওয়ার কথা। পিতা-মাতার সঙ্গে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী ছায়াও তার পাপের ভাগীদার হতে অস্বীকার করেছে। ছায়ার পরামর্শেই প্রাচেতস ঋষির কাছে এসেছে, সেই সত্যকে স্বীকার করার জন্য। কালকূটের লেখনীতে ফুটে উঠছে এক পরিবর্তিত মানুষের ছবি। প্রাচেতস অশ্রুপূর্ণ চোখে, করজোড়ে নারদবংশীয় ঋষির কাছে নিবেদন করছে "প্রভু, আপনি আমার সকল অন্ধকার জগতের, একটি জগতকে আলোকিত করেছেন। আপনি আমার সকল অন্ধকার জগতকে আলোকিত করুন।" *(পৃ: ১২৯২, ঐ)* প্রাচেতসের বংশপরিচয় জানতে পেরে ঋষি বলেছিলেন, "ঋষি প্রচেতাও ভৃগুবংশীয় মুনি। অতএব প্রাচেতস তুমি হতেই পারো।" *(পৃ: ১২৯২, ঐ)* প্রাচেতস বিনম্র শিরে নারদীয় ঋষির কাছে প্রার্থনা করছে "আমাকে মুক্তির উপায় বলুন।" *(পৃ: ১২৯২, ঐ)* কালকূট অতীতের পথে ভ্রমণ করতে গিয়ে এই অভূতপূর্ব মুহূর্তটি অবলোকন করলেন। পাপের রক্তে শুধু তার হাতই রক্তাক্ত হয় নি, হৃদয়ও রক্তাক্ত।

সত্যের শক্তি একবার যখন জাগ্রত হয়েছে, তখন সেই শক্তিই তার সকল অন্ধকার জগতকে আলোকিত করবে। ঈশ্বর প্রাচেতসের মধ্য দিয়ে কোনো বিশেষ অভিপ্রায়কে প্রকাশ করতে চাইছেন। নইলে এই শক্তি জাগ্রত হত না। ঋষির জানা নেই কেমন করে, কী করে তা ঘটবে। বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে প্রাচেতসকে আবার স্বস্থানে গমন করতে বললেন।

শরৎকালে হিমালয়ের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আর পাখির কলরব শুনতে শুনতে, রক্তাক্ত পায়ে সে দ্রুত ফিরে চলেছে। লতাগুল্ম তার দেহে জড়িয়ে গেছে। মৃগকুল তাকে ভয় না করে তার দেহের জড়িয়ে যাওয়া লতাগুল্ম মুখে টেনে নিচ্ছে। কিন্তু মুহূর্তেই তার চোখে ভেসে উঠল সেই বুক কাঁপিয়ে কুঠারের কোপ, এ সেই পুরানো স্মৃতি তাঁর চোখে ভেসে উঠতেই আর্তস্বরে চিৎকার করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে "আমার দৃষ্টি থেকে সেই চিত্র চিরতরে সরিয়ে নাও।" *(পৃ: ১২৯৩, ঐ)* ঈশ্বরের কাছে কাতর প্রার্থনা — "হে প্রভু, আমার অন্ধকার কাঁপছে, না আমার পাপ আমাকে গ্রাস করতে আসছে? প্রভু, তোমার ধ্রুব বাণীকে সত্য কর।" *(পৃ: ১২৯৩, ঐ)*

অগ্রহায়ণ আর পৌষমাস হল বেদের হেমন্ত ঋতু। প্রাচেতস হেমন্তের মাঝামাঝি, তমসার উত্তর-পশ্চিম অববাহিকায় এসে পৌঁছলেন। এরই মধ্যে তার দেহ আরও শীর্ণ হয়েছে। মাথার চুল জটার ন্যায় কাঁধ ছাড়িয়ে গেছে। আগেই দেখেছি কালকূট মনভ্রমণে বেরোলেও সঠিক স্থানে পৌঁছবার ভৌগোলিক অবস্থান জেনে নিয়েছেন। কালকূট যেহেতু প্রাচেতসকে অনুসরণ করে এই সত্যে পৌঁছেছেন যে তিনি প্রাচেতসের সময় নির্দেশ করে সেই সময়ের লোকালয়, জনপদ, বনভূমি, কর্ষিত ক্ষেত্র, সবকিছুর থেকে একটা সম্যক জ্ঞান প্রাচেতসকে ঋদ্ধ করছে। কালকূট প্রাচেতসের চলার পথকে পরিচিত করাচ্ছেন এইভাবে, — "যা ছিল প্রাচীনের চীন, সেই নেপাল থেকে সে এসে পৌঁছল কিরাত অঞ্চলের প্রান্তসীমায়। জনলোক বা ভদ্রাশ্ববর্ষ — বর্তমান চীন, ভারতের উত্তর পূর্বাংশে। প্রাচেতস পৌঁছোলো কিরাত অঞ্চলের পশ্চিমে। হিমালয় অতিক্রম করে, সে যতই নিচে নেমে এল, হেমন্তের নিস্পত্র চিত্র মোটেই অরণ্যকে তার নিবিড়তা থেকে ততোধিক পত্রহীন বৈরাগ্যের রূপ দিতে পারে নি। তথাপি পায়ের নিচে অজস্র পাতা, বৃক্ষের ডালপালা পথ বলে আলাদা কিছু রাখে নি।" *(পৃ: ১২৯৩, ঐ)* প্রাচেতস জেনেছেন যে হিমালয়ের তুলনায় সমতলে হেমন্ত ঋতুতে ফল বৃক্ষে বৃক্ষে ধরে, বর্ষার প্রচণ্ড গতিতে হস্তিযূথ ভেসে চলে যায় ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বর্ষা শেষে মাংসাশী ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণীরাও শিকারে বেরিয়ে পড়ে, প্রাচেতস এটা আগেই জানত যে, এসময়টা ব্যাধ ও কিরাত ক্ষত্রিয়দের মৃগয়ার সময়; কিন্তু কোনো তপোবনের পাশ দিয়ে গেলে তপোবনের মুনি-ঋষিরা আর তাকে ভয়ঙ্কর দস্যু প্রাচেতস বলে চিনতে পারছেন না। তাঁরা প্রাচেতসকে ঋষি ভেবে, গন্তব্য ও কুশল জিজ্ঞাসা করেন। প্রাচেতস তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়ে দেন যে, সে কোনো পুণ্যবান ব্যক্তি নয়, সে তার পাপের ফলশ্রুতির অন্বেষণে আছে। তাপসগণ বিস্মিত হয়ে প্রাচেতসের কথা শোনেন এবং উত্তরও দেন। আপনার প্রিয়তমা পত্নী হয়তো অতি নিষ্ঠুরা। তারা জানতে চায়, কোথা থেকে প্রাচেতস এসেছেন, স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ কি?

প্রাচেতস জানায় যে সে এই পৃথিবীরই লোক। কিন্তু যিনি এই ধ্যান দিয়েছিলেন তিনি স্বর্গ

ও পৃথিবী ভ্রমণকারী একজন নারদবংশীয় ঋষি। তার প্রিয়তমা স্ত্রী অনায়াসেই প্রাচেতসকে সেই নারদবংশীয় ঋষির কাছে যেতে বলেছে মুক্তির উপায় সন্ধানে। দুঃখে তার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু নারদবংশীয় ঋষি বলেছেন, "আমার সকল অন্ধকার জগৎ আলোকিত হবে। কেমন করে জানি না। তার বাণী সত্য হবে, এই আশা নিয়ে আমি হিমালয়ের ওপার থেকে প্রত্যাগমন করছি।" *(পৃ: ১২৯৪, ঐ)*

প্রাচেতসের হৃদয়মথিত যন্ত্রণা ছোট ছোট সংলাপের মধ্যে দিয়ে বলিষ্ঠ ভাবে তুলে এনেছেন কালকূট। অন্তর্লোকে উঁকি দেন যেন কালকূট। তাই তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে স্থানের কথার থেকে মানব জীবনের কথাই বেশি করে ব্যক্ত হয়। তিনি প্রাচেতসের মুখ থেকে সেইসব কথা বলিয়ে নিয়েছেন যা সময়োচিত। লেখকের মনের ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি সব কিছু প্রকাশ পায় বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে গড়েপিটে সাহিত্যের রূপ দেন। ইতিহাস/মহাকাব্য/পুরাণ থেকে চরিত্রগুলোকে তুলে এনে এ'কালের দৃষ্টিতে সৃষ্টি করেন একালের সাহিত্যের চরিত্র করে তুলেছেন। এখানেও তাই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী চরিত্রগুলো কাহিনীতে গতি পাচ্ছে, জীবন্ত হয়ে উঠছে। কিন্তু তাপসদের তাকে দেখে মনে হয়েছিল "বরং আপনাকে অনেক পুণ্যবান মনে হয়। আপনি কেন আমাদের সঙ্গে প্রাকৃত ভাষায় কথা বলছেন? আপনি কি আমাদের সঙ্গে ছলনা করছেন? আমরা আপনার কাছে শিক্ষা চাই।" *(পৃ: ১২৯৪, ঐ)*

প্রাচেতস দেবভাষা চর্চা করবার সুযোগ নেননি এবং চেষ্টাও করেন নি। দস্যুবৃত্তির পেশা বেছে নিয়ে ভয়ঙ্কর পাপসমূহই তাকে গ্রাস করেছে। কেউ তার পাপের ভাগী নয়। বড়ো একলা হয়ে গেছেন প্রাচেতস। কালকূট দেখছেন পাপ থেকে মুক্তির জন্য প্রাচেতস অস্থির, অশান্ত হয়ে উঠছেন। অথচ তাপসগণ প্রাচেতসকে বলছেন — "নারদবংশীয় ঋষি মিথ্যা বলেন নি; আপনার সকল অন্ধকার জগৎ আলোকিত হবে। অথচ আমরা দেখছি, আপনাকে কোনো অন্ধকারও স্পর্শ করে নি। আপনার জীবনে প্রিয়তমার আঘাত যেন মহতী দুঃখের স্বাদ পেয়েছে।" *(পৃ: ১২৯৪, ঐ)*

তাপসদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রাচেতস ক্রমশ তমসার নতুন বাঁকের দিকে মোড় নিয়ে পশ্চিম থেকে দক্ষিণে চলতে চলতে একটা বিশাল বটবৃক্ষের কাছে এসে দাঁড়ালেন। এখান থেকেই সে তার দস্যু সঙ্গীদের ত্যাগ করেছিলেন। শুধু বানরেরা সভা বসিয়েছে এবং হরিণ-হরিণীরা নির্ভয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রাচেতস জানেনা যে, লতাগুল্ম তাঁর শ্মশ্রুতে শিকড় তৈরি করতে শুরু করেছে এবং তার শুধু মুখই নয়, মাথার লম্বা জটার চুল ঢেকে দিয়েছে লতাগুল্ম। কালকূট ভাবছেন যে, এ অবস্থায় বল্মীকেরা অনায়াসে বাসা তৈরি করতে পারে, তখন হয়ত তাকে বল্মীকের ঢিবির মত দেখাবে। কালকূট এখানে তাঁর আধুনিক ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন। প্রাচেতসের দেহ বল্মীকের মাটিতে

ঢেকে গিয়েছিল। কালকূট এ'কালে পথ চলতে গিয়েও এ'রকমই একজন মানুষের দেখা পেয়েছেন তার বাড়ির কাছে। এ'কথা আগেই বলা হয়েছে। কালকূটের বাস্তবের দেখা মানুষটির সঙ্গে অতীতে, মহাকাব্যের যুগের প্রাচেতসের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন। কল্পনাকে বাস্তবোচিত করে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাচেতস তমসার ক্ষীণ জলধারা অতিক্রমের সময় সারা গায়ে কাদামাটি মেখে নিলেন যন্ত্রণাবিদ্ধ দেহকে ঠাণ্ডা করার জন্য। ছায়ার কথা ভাবতে ভাবতে সে কুটিরের দিকে চলতে লাগলো। "ছায়া তাকে দেখলে, অভাগিনী কেঁদে আকুল হবে। অনেক দিনের বিরহ কেবল না, একটা উদ্বেগ নিয়ে সে প্রাচেতসের জন্য অপেক্ষা করছে। উদ্বেগের কারণ, প্রাচেতস সেই নারদবংশীয় ঋষির সাক্ষাৎ পেল কিনা, এই দুশ্চিন্তা। প্রাচেতস সব কথাই ছায়াকে বলবার জন্য উন্মুখ হয়ে চলেছে।"*(পৃ: ১২৯৪, ঐ)*

প্রাচেতস দ্বিপ্রহরের আগেই তার অভীষ্ট স্থান কিরাত পল্লীতে পৌঁছেছিল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে পল্লীতে, নানা উল্লিসিত চিৎকার প্রাচেতসের কানে ভেসে আসতে লাগল। প্রাচেতস মনে করতে পারছে না, "আজ কি বিশেষ কোনো উৎসবের দিন?" *(পৃ: ১২৯৪, ঐ)* নিজের কুটির প্রাঙ্গণের সামনে এসে হঠাৎ প্রাচেতস থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। — এক নারী, এক পুরুষের আলিঙ্গনে, সুরা পান করে প্রমত্তা। এ নারী আর কেউ নয়, তারই স্ত্রী ছায়া, অন্যপুরুষের আলিঙ্গনে আবদ্ধা। ব্যথিত চিত্ত প্রাচেতস সেই বিদায়ের ক্ষণটি ভাবছে— "সে যে আমার কোনো পাপের ভাগ নিতে চায় নি? তবে? আজ সে কিসে লিপ্ত? তার বিশ্বাসের সেই মর্যাদা কোথায়?"*(পৃ: ১২৯৪, ঐ)* তার জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। তার মাতা শুয়ে আছেন আর তার পিতা সুরা পান করে তার মাতাকে প্রহার করছে। অসহনীয় নারকীয় দৃশ্য!

বিস্ময়বিমূঢ় চিত্ত প্রাচেতসের খেয়াল নেই; এমন মানুষকে দেখতে অনেকেই সামনে এগিয়ে এসেছে; ছায়াও এসেছে। কিন্তু "কৃশ তনু, জটাজুট শ্মশ্রুবাণ, লতাগুল্মের আবরণে ঢাকা মুখ মাথা; পতঙ্গেরা যেন মধুলোভে বিচরণ করছে সেখানে, চীর ও বল্কলধারী প্রাচেতসকে কেউ চিনতে পারল না। ছায়াও না।"*(পৃ: ১২৯৪, ঐ)* প্রাচেতস ছায়ার দিকে চেয়েছিল, ছায়াও তাকে দেখছিল। কিন্তু সত্যিই সে আর তার অতীতের প্রিয়তমকে চিনতে পারছিল না। ছায়া পুরুষটিকে বলছিল— "এই ঋষিকে জিজ্ঞাসা কর, ইনি কি প্রাচেতসকে কোথাও দেখেছেন? যার বিশাল আজানুলম্বিত বাহু, সিংহের মত বিশাল বক্ষ, ক্ষীণ কটি, ভয়ঙ্কর রুদ্র পুরুষ— তাকে দেখেছে কিনা?" *(পৃ: ১২৯৪, ঐ)*

কালকূট প্রাচেতসের হৃদয় যন্ত্রণার উপলব্ধিগুলো নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ছায়ার কথা শুনে প্রাচেতসের বক্ষ ভেদ করে করুণ আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে চাইল কিন্তু নিজেকে সংযত করে স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে করুণ হাসি হেসেছিল। কিন্তু লতাগুল্ম দিয়ে মুখ ঢাকা, তাই তারা প্রাচেতসের

মুখে হাসির কোনো অভিব্যক্তি দেখতে পেল না। কেবল প্রাচেতসের মাথা নাড়া দেখতে পেল। প্রাচেতস দেখতে পেল সুরাপানে আরক্তমুখে ছায়া পাশের পুরুষটিকে আলিঙ্গন করল এবং বলতে শুনল, "তবে আর কী প্রয়োজন এই ঋষির কাছে দাঁড়িয়ে থাকার। সে আর কোনকালে ফিরে এলেও, তার পাপের সঙ্গে আমার পাপের আর কোন ভাগাভাগি হবে না। সংসারে আমরা যে যার পাপ নিয়ে আছি। ফিরে চলো ঘরে।"*(পৃ: ১২৯৫, ঐ)*

প্রাচেতস ছায়ার আগেই পিছন ফিরেছিল। সে আর স্থির থাকতে পারছে না, তার হৃদয়তন্ত্রে সমস্ত সত্তার মধ্যে একটি ধ্বনি নিঃশব্দে বেজে চলেছে "ছায়া, ছায়া ছায়া!"*(পৃ: ১২৯৫, ঐ)* কী নিদারুণ বক্ষবিদীর্ণ করা দুঃখবোধ কালকূট তাঁর অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে তুলে এনে সেকাল একালকে বেদনার স্রোতে একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। মহাকাব্যের মানব-মানবীদের একালের মানব-মানবীতে পরিণত করেছেন কালকূট তাঁর লেখনীর তুলিতে। প্রাচেতস সেখান থেকে প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে দ্রুত চলতে লাগল। উদগত-আর্তকান্নাকে রোধ করতে পারলেও চোখের জলের ধারাকে রোধ করতে পারে নি। বহুদিন পূর্বে ছেড়ে আসা সেই বটবৃক্ষতলে মুখ থুবড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। "হে নারদবংশীয় ঋষি, কোন্ অন্ধকার জগতের আলো তুমি আমাকে দেখালে? এত গভীর অন্ধকারে যে আমি আর কখনও পড়িনি। কোথায় আমার আলোকিত জগৎ? আমার বিশ্বাস? আমার প্রেম? আমার স্নেহ? আমার ছায়া? যে-ছায়া আমাকে তোমার সন্ধানে পাঠিয়েছিল, সে নিজে আজ কোথায়? প্রভু, কেন বলে দাওনি, আমি যেন এখানে না আসি? যা দেখেছি এ সবই তো প্রতিশোধ? তোমার অজানা কিছুই নেই, বাহীকদের নগ্ন স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আমি যেমন নির্লজ্জ সহবাস করেছি, সেই দৃশ্যই আমাকে ছায়ার মধ্যে দেখতে হলো।" *(পৃ: ১২৯৫, ঐ)*

প্রাচেতস মৃগী রুগীর মত আচ্ছন্ন হয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে জ্ঞান হারাল। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরল। পূর্বের হত্যালীলার স্মৃতি ভেসে উঠল — সেই দস্যুপতি নরনারীদের হত্যা করছে। নারকীয় রক্তাক্ত ঘটনা, মানুষ - পশুপক্ষী হত্যার দৃশ্য ভাসতে লাগল, আবার কাঁপতে কাঁপতে মূর্ছা গেল। বেশ কয়েকদিন এরকম চলতেই থাকল। অন্যদিকে প্রাচেতসকে কিম্পুরুষ বর্ষ থেকে বিদায় দিয়ে নারদবংশীয় ঋষি ইলাবৃতবর্ষে ফিরে যেতে পারেন নি। প্রাচেতসের মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তিনি প্রাচেতসকে অনুসরণ করেছিলেন এটা কালকূটের নজর এড়িয়ে যায়নি। প্রাচেতস দ্রুত কোন্ পথে তমসার তীরে ফিরে এসেছে সেটা ঋষি বুঝতে পারেননি। কিন্তু কালকূট ঋষিকে লক্ষ্য করেছেন, তাঁকেও তিনি অনুসরণ করেছেন। ঋষি কিরাতপল্লীতে গিয়ে প্রাচেতসের খোঁজ নিয়ে সব কিছু জানতে পেরেছেন। ঋষি সর্বাঙ্গে ধুলা-কাদা লিপ্ত ও ধুলাচ্ছন্ন চীর ও বল্কলে ভুলুণ্ঠিত ও মূর্ছিত প্রাচেতসকে স্পর্শ করে ডাকলেন। সেই ডাক শুনে প্রাচেতসের লতাগুল্মের আড়ালে জোনাকি বিন্দুসদৃশ চোখ দুটি স্নিগ্ধ কিরণে জ্বলে উঠল মুহূর্তের জন্য। তারপরেই

সহসা ঝড়ে দুর্বাদলের কেঁপে ওঠার মত তার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল। 'জোনাকি স্নিগ্ধ চক্ষুর কোটর' থেকে জলের ধারা বইতে লাগল। কালকূটের কর্ণ সতর্ক, শুনতে পেলেন প্রাচেতসের হাহাকার মিশ্রিত রুদ্ধ স্বর, "প্রভু, কোন্ অন্ধকারের জগৎ আমার কাছে আলোকিত হলো?" *(পৃ: ১২৯৫, ঐ)*

"তোমার যা কিছু বাকি ছিল, সেই মহতী দুঃখের।" *(পৃ: ১২৯৫, ঐ)* ঋষি তাকে সম্বোধন করলেন, "প্রাচেতস, হে তপোধন —" *(পৃ: ১২৯৫, ঐ)* বলে। প্রাচেতস ঋষি মুখে 'তপোধন' সম্বোধন শুনে হাহাকার করে বলে উঠল যে, সে তপোধন নয়, সামান্য মানুষ। "দুঃখ মহতী কেমন করে হয়, আমি জানি না। আমার বক্ষ বিদীর্ণ হচ্ছে।" *(পৃ: ১২৯৫, ঐ)* ঋষি তাকে আলিঙ্গন করে বললেন যে, "বিদীর্ণ হচ্ছে অন্ধকারের শক্ত দেহ।" *(পৃ: ১২৯৫, ঐ)* তিনি কিরাতপল্লী থেকে জেনে এসেছেন হৃদয় ভেঙে যাওয়া দুঃখের আঘাত নিয়ে প্রাচেতস ফিরে এসেছে। তার এই দুঃখে উপলব্ধির প্রয়োজন ছিল। এই দুঃখবোধই প্রাচেতসকে কদিন ধরে মূর্চ্ছা ও কম্পন, স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে তার অতীত ঘুরিয়ে এনেছে। তিনি অনুকম্পা করে তপোধন সম্বোধন করেন নি। "অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে যে মহতী দুঃখ, তাই তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার মুক্তি আসন্ন। ..... সে জন্ম নিচ্ছে তোমার ভিতরে।" *(পৃ: ১২৯৫, ঐ)* কালকূট শুনতে পাচ্ছেন ঋষির সেই দৃঢ় স্বর, "একবার চেয়ে দেখ প্রাচেতস, একবার নিজের ভেতরে দেখ।" *(পৃ: ১২৯৫, ঐ)*

ঋষি প্রাচেতসের অন্তরের সত্তাকে জাগ্রত করাতে চাইছেন। তিনি আবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, সেই বণিক পুত্র, যার বাম বাহু স্কন্ধ থেকে ছিন্ন করেছিল, সে বেঁচে আছে। আর আচ্ছন্নতার সঙ্গে উচ্চারণ করলেন, সেই বারাঙ্গনা, যাকে প্রাচেতস তার সব কথা বলেছিল কিন্তু ভোগ করতে চায় নি, সে এখনও তার পথ চেয়ে বসে আছে।

ঋষি পরমবন্ধুর মতো প্রাচেতসকে আরও জানিয়েছিল যে, তার পত্নী ভাবে— প্রাচেতসের মধ্যে দস্যুর অধিক এক দানব ছিল, কিন্তু সে অভিশাপ দিচ্ছে না। সেই বারাঙ্গনার কাছে রাজা প্রাচেতসের সন্ধান জানতে চাওয়াতে জবাবে সে জানিয়েছিল যে, দস্যুপতি একজন দুঃখী পুরুষমাত্র। কবে যে তার দেখা পাওয়া যাবে তার জানা নেই। দস্যুপতি সম্বন্ধে ধারণা বদলে গেছে নববধূর, সেই বারাঙ্গনার। প্রাচেতসের জয়গান এইভাবেই শুরু হয়েছে অনেক আগেই। ঋষির কাছে এসব কথা শুনে প্রাচেতসের চোখে জলের ধারা বইল। নারদবংশীয় ঋষির কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করল, "আমার রক্তাক্ত হাত, ধনরত্নের দগ্ধ হাত, ভিন্ন রমণীর রমণের ক্লেদ, সব ধুয়ে মুছে শীতল স্বাভাবিক হোক। আমি বুঝতে পেরেছি প্রভু, ছায়ার এই মূর্তি দেখা আমার বাকি ছিল।" *(পৃ: ১২৯৬, ঐ)*

"পেরেছো? বুঝতে পেরেছো?" *(পৃ: ১২৯৬, ঐ)* হাসতে গিয়ে ঋষির কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হল চোখের জলের ধারায়। "জয় হোক আলোকে, জয় হোক সেই মহতী দুঃখের, যা অন্ধকারকে বিদীর্ণ

করে। এবার ওঠ প্রাচেতস।''*(পৃ: ১২৯৬, ঐ)*

একজন মুক্তিকামী অনুতপ্ত দস্যুপতির অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে আলোয় ফেরার চেষ্টা। আর একজন নারদবংশীয় ঋষির সেই মুক্তিকামী মানুষটির অন্তরের সত্তাকে জাগ্রত করে তাকে আলোর পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা— দুটি মানুষই চোখের জলে সিক্ত হচ্ছে, তারা পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ, তমসার তীরে এক বিরল দৃশ্যের এক ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলোকন করলেন কালকূট। সঠিক কাল ও সময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্যই কালকূট হাজার হাজার বছর আগের স্বয়ম্ভু মনুকাল থেকে পরিভ্রমণ করতে করতে দু'হাজার একশ করতে করতে চব্বিশ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তমসার তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

প্রাচেতস দেখলেন শুকনো পাতায় বনভূমি ঢেকে গিয়েছে। পরিষ্কার নীলাকাশ, রৌদ্রের তাপে মিঠে আমেজ। শীত ঋতু ধীরে এগিয়ে আসছে। প্রাচেতস দূরে তাকিয়ে ঋষিকে জানিয়েছিলেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রকৃতির সৌন্দর্যে সে আকৃষ্ট। জগতের এই সৌন্দর্য না থাকলে, বহুকাল পূর্বেই তাকে আত্মহত্যা করতে হত। প্রকৃতির প্রতি তার এই আকর্ষণ তার দস্যুসঙ্গীরা তাকে বিদ্রূপ করত। প্রকৃতির প্রতি প্রাচেতসের আকর্ষণ, এই তথ্য ঋষি জেনে বললেন, ''এই প্রকৃতি বেদ রচয়িতাদের আকর্ষণ করেছে। তোমাকেও চিরকাল ধরে করে আসছে।'' *(পৃ: ১২৯৬, ঐ)* ঋষির মুখ থেকে প্রাচেতস আরও শুনলেন— ''তুমি ইতিহাসের সেই ব্যক্তি, যে সমাজের ধারাকে নতুন সংকেত দান করতে চলেছে। এটি ঈশ্বরেরও অভিপ্রায়— তাই তুমি এখন ইতিহাসের আঙিনায় প্রাচেতস, প্রকৃতি তোমার একমাত্র সম্পদ। এই প্রকৃতি এবার তোমার কণ্ঠে সঙ্গীতের জন্ম দেবে। তোমার স্বরে এখনই তার ইঙ্গিত শোনা যাচ্ছে। তোমার রক্তে সেই ভৃগুজ বংশের স্ফূর্ত সঙ্গীত জন্ম নিচ্ছে। আমি নিশ্চিত, তোমার অন্ধকার জগতে আলোর বিকাশ ঘটছে। তোমার প্রিয়তমাকে আমি দেখেছি— ছায়াকে। ছায়া কারো দ্বারা অপহৃতা হয়নি। কিন্তু সীতা রাবণের দ্বারা অপহরণের পরে রামের যে অবস্থা হয়েছিল, তোমার মধ্যে আমি সেই অবস্থা দর্শন করলাম। পরম দুঃখ, পরম হারানোই ইতিহাস সৃষ্টি করে। তোমাকে ঈশ্বর এখন কী সৃষ্টি করতে চলেছেন জানি না।''*(পৃ: ১২৯৬, ঐ)*

নারদবংশীয় ঋষি প্রাচেতসের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এই কথা বলে যে, ঈশ্বরের নির্দেশক্রমেই হয়ত প্রাচেতসের সঙ্গে তার আবার দেখা হবে। এরপরে প্রাচেতস তমসার জলে অবগাহন করে বীর বল্কল শুষ্ক করে তপোবনের সন্ধানে যেতেই তাঁর সঙ্গে পরিচিত তাপসদের দেখা হয়ে গেল। তাপসগণ তাকে আগুনও দিলেন এবং তার আহার ও থাকবার ব্যবস্থাও করে দিলেন। তাপসরা প্রাচেতসের সমস্ত শরীর মুখমণ্ডলে দেবতার অধিষ্ঠান দেখতে পেয়েছেন।

ভিতর থেকে নির্জনতার আকাঙ্ক্ষায় দুদিন তপোবনে অতিবাহিত করে, প্রাচেতস সেই দিকে চলতে লাগল। অবিবাহিত দু'জন তাপস প্রাচেতসকে অনুসরণ করল। কালকূটও চলেছেন

তাপসদের সঙ্গে সঙ্গে। প্রাচেতস তাদের জানিয়ে দিল যে সে চলেছে, "দৃষ্টি মুগ্ধকর আরণ্যক নির্জনের সন্ধানে।" *(পৃ: ১২৯৭, ঐ)* সে বেদ উচ্চারণ করতে পারে না, মন্ত্রও জানে না। শুধু জানে প্রাকৃতভাষা। যথার্থ বাক্‌হীন। কিন্তু তাপসদ্বয় তার সঙ্গী হওয়ার বাসনা ত্যাগ করল না। তারা প্রাচেতসের কোন বিরক্তির কারণ না হয়ে শুধু সঙ্গী হওয়ার প্রার্থনা করল তার কাছে। তারাও তার সঙ্গে আরণ্যক নির্জনতা উপভোগ করতে চায়।

উত্তরের দিকে এগিয়ে তমসা নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে চলতে লাগলেন। উত্তরের কন্‌কনে বাতাস তার নখদন্ত বের করে আঘাত হানছে অরণ্য পশু ও মানুষকে। তুষার হিমেল স্তব্ধতার মধ্যে তাঁর হৃদয় আকুলি বিকুলি করছে, কী যেন ধেয়ে আসতে চাইছে প্রবল বেগে। কী ঘটছে তার ভিতরে, বুঝতে পারছে না। আলোর স্পর্শ এখনও পায়নি। ভিতরে সবই অন্ধকার।

প্রাচেতসের অনুগামীরা অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে রাতের হিমেল বাতাসের স্পর্শ থেকে নিজেদের রক্ষা করেছিল এবং পরে প্রাচেতসের অনুমতি প্রার্থনা করেছিল গৃহ নির্মাণ করার জন্য।

তমসার পার্বত্য অঞ্চলে তাপসদ্বয়ের নির্মিত কুটিরে প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও অরণ্যরাজির মধ্যে পশুপক্ষীদের আনন্দোচ্ছল ক্রীড়া, কলতান দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে সুখহীন আনন্দ-ধ্বনিহীন হৃদয়ে এক দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে প্রাচেতস দিনাতিপাত করছে। কালকূটের দৃষ্টি এবার সেই বনমধ্যে প্রাচেতসের কুটিরে। একদিন এই অনুতপ্ত মুক্তিকামী মানুষটির দুঃসহ হৃদয়-যন্ত্রণা দুটি পাখির মিলনের মুহূর্তে বিরহের বেদনার সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়ার সেই মহাক্ষণটির সাক্ষী হয়ে রইলেন কালকূট। কালকূট এ'কালের মানুষ, এ'কালের চিন্তা-ভাবনা, যুক্তিগ্রাহ্যতা সবকিছু দিয়ে সেইকালের ইতিহাসের আঙিনায় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিটির ব্যক্তিমানসকে দৃশ্যায়িত কীভাবে করলেন সেটাই এখন অবলোকন করব।

অন্তরের অস্থিরতার মধ্যেও প্রাচেতস শান্ত হয়ে কুটিরের বাইরে বসেছিল। অপরাহ্নের পড়ন্ত বেলা পশ্চিম আকাশ লাল রঙে ছেয়ে গেছে। প্রাচেতসের কাছে একটি বৃক্ষে দুটি ক্রৌঞ্চ আপন সুখে মৈথুনে রত। প্রাচেতস এই দৃশ্য দেখামাত্র কেমন একটা পাষাণ-বিগলিত ধারা তাকে উদ্বেল করে তুলল। ছায়াকে স্মরণ হল। রমণের ঘনাশ্বাস দশা যেন তার মধ্যে উপস্থিত হল। সে সুখে সেই ক্রৌঞ্চ মিথুনের মৈথুন দৃশ্য দেখছিল এবং তার ভিতরের সকল অনুভূতি তখন একাগ্র হয়ে যেন সেই আনন্দ উপভোগ করছিলেন।

পর মুহূর্তেই চক্ষের পলকে কী ঘটে গেল। সে দেখল, ক্রৌঞ্চের শরীরের উপরিভাগে সুতীক্ষ্ম তীর বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এল। ক্রৌঞ্চী চিৎকার করে উড়ে গেল। ক্রৌঞ্চ তখন পাখা ঝাপটিয়ে বৃক্ষতলে পড়লো। চকিতের জন্য তার পাখায় রক্তের ছিটা ছিটকে পড়লো। ঝলকে উঠলো রৌদ্রঝলকে। প্রাচেতস দেখল, এক নিষাদ দ্বিতীয়বার তীর নিক্ষেপের আগে নিহত ক্রৌঞ্চকে

ধরবার জন্য ছুটেছে। প্রাচেতসের ভিতরের গভীর মর্ম থেকে তীব্র হাহাকারের ভাষায় বেরিয়ে এলো, প্রথমে অনুদাত্ত স্বরে। তারপরে স্বরিত স্বরে। তারও পরে উদাত্ত স্বরে;

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমঃ অগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদ্ একম্ অবধী কামমোহিতম।।" *(পৃ: ১২৯৮, ঐ)*

এই মহাক্ষণটিকেই কালকূট অবলোকন করেছিলেন। কী অবলীলায়, অনায়াস গতিতে তিনি মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীকে চিত্রার্পিত দৃশ্যের মতো তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীর তুলিতে। প্রাচেতসের হৃদয়ের রুদ্ধ কপাটের আগল ভেঙে তার ভিতর আলোকিত হয়ে গেল। তার ভিতর থেকে ছন্দোবদ্ধ অজ্ঞাত এক ভাষা বেরিয়ে এল, "এই ভাষা যেন তার হৃদয়ের তট প্লাবিত করে বেরিয়ে এল। আর শুনতে পেলো সেই বিরহকাতর ক্রৌঞ্চী আকাশে উড়ে যেন নিজের ভাষায় চিৎকার করে ডাকছে, ক্রৌঞ্চ — ক্রৌঞ্চ — ক্রৌঞ্চ।" *(পৃ: ১২৯৮, ঐ)* কৌঞ্চীর শূন্যে বিলাপ শুনতে শুনতে প্রাচেতস উন্মাদের মতো নিষাদের দিকে ধেয়ে গেল, কিন্তু ধরতে পারল না। কিন্তু প্রাচেতস বারে বারে নিজেকে ও প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল "আমি কী বললাম। কী ভাষা? কী এর অর্থ?" *(পৃ: ১২৯৮, ঐ)* তরুণ তাপসদ্বয় দেবভাষা সামান্য জানেন, কিন্তু তারাও প্রাচেতসের বাণীর ভাষা ও মর্মার্থ বুঝতে পারল না।

নিজের উচ্চারিত বাণীর মর্ম খুঁজতে খুঁজতেই কয়েকদিন কেটে গেল। মনের মধ্যে নতুন সৃষ্টির আনন্দ ও নিহত ক্রৌঞ্চ-র বিয়োগ ব্যথা— দুটো একসঙ্গে অনুভূত হচ্ছে। এমন সময়ে একদিন হঠাৎ উপস্থিত হলেন সেই ঋষি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রাচেতসের মধ্যে কিছু ঘটতে চলেছে তাই তিনি ফিরে এসেছিলেন। এবং এসেই প্রাচেতসের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করে বললেন যে — "তোমার সকল জগতের অন্ধকার দূর হয়েছে, আলোকিত হয়েছে তোমার সকল সত্তা।" *(পৃ: ১২৯৮, ঐ)* ঋষি দর্শন পেয়ে প্রাচেতস জানিয়েছিলেন যে, কামাসক্ত ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর মধ্যে ক্রৌঞ্চকে তীরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেখে উদাত্ত স্বরে তার মুখ দিয়ে এক ভাষা বেরিয়ে এসেছে যে ভাষার অর্থ তিনি জানেন না। ঋষি সেই বাণী শুনতে চাওয়ায় প্রাচেতস "মা নিষাদ ... উচ্চারণ করলেন।

ঋষি আনন্দিত স্বরে, দু'হাতে আলিঙ্গন করে বললেন যে "অনুষ্ঠুভ ছন্দে শ্লোকছন্দ বাণী এই প্রথম উচ্চারিত হল। এ তোমারই সারাজীবনের কথা, এই ভাষায় রূপ পেয়েছে।" *(পৃ: ১২৯৯, ঐ)* কালকূট শুনতে পেলেন, ঋষি প্রাচেতসকে আরও বলছেন যে অতীতে অনেক দম্পতিকে প্রাচেতস বিচ্ছিন্ন করেছেন, নিজে তার প্রিয়তমার কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বড়ো দুঃখে। "এইজন্য ক্রৌঞ্চ মিথুনের একজনকে নিহত হতে দেখে, সেই বাণী রূপ পেল তোমার সত্তার থেকে — তুমি আদি কবি হে প্রাচেতস।" *(পৃ: ১২৯৯, ঐ)*

ঋষি কথা শুনে প্রাচেতসের সারা দেহ আনন্দ ও দুঃখে কাঁপতে লাগলো, কম্পিত স্বরে "কবি আমি, কবি!" উচ্চারণ করতে লাগলেন। ঋষি তাকে আরও গভীরভাবে আলিঙ্গন করে বলছেন "কবি তুমি হে আদি ও অনন্তের" আরও বললেন, "বেদের ছন্দে প্রধান হল গায়ত্রী, ত্রিষ্ঠুভ ও জগতী। তারপরে অনুষ্ঠুভ। তুমি অনুষ্ঠুভ শ্লোকছন্দ বাণী প্রথম উচ্চারণ করেছো। এখন বুঝেছি, ঈশ্বরের এই অভিপ্রায় ছিল, তোমার দ্বারা সিদ্ধ করিয়ে নেওয়া। এই ঘটেছে হে প্রাচেতস, ঈশ্বর তোমাকে দিয়েছেন সেই সম্মান, সেই মহিমা, বিশ্বের প্রথম কবি তুমি। এবার বল, কাকে তুমি দান করবে এই বাণী। স্বর্গলোকে যাবে দেবতার স্থানে? সেখানে তোমার স্থান হবে চিরকালীন। দেবতারা সুখী হয়ে তোমাকেই পূজা করবেন!" *(পৃ: ১২৯৯, ঐ)*

প্রাচেতস তার বাণীকে সেই মহিমা দিতে চায়, "যা মানুষের হৃদয় ভাসিয়ে তারপর যাবে স্বর্গলোকে।" *(পৃ: ১২৯৯, ঐ)* যে সকল মানুষ চিরদুঃখী, যাদের ভাষায় নতুনত্ব নেই, তারা পাবে নতুনের অর্থ, তাই তার কাছে "মানুষ সকল কিছুর আগে।" ঋষির কাছে জানতে চায় শ্লোকছন্দ বাণীতে সে কী রচনা করবে? ঋষি তাকে আদি কবি বলে সম্বোধন করে জানতে চান, আদি কবির কী ইচ্ছা? উত্তরে আদি কবি বলে যে, "আপনার সেই কথা দুঃখ মানুষকে করেছে মহৎ। আমার শ্লোকছন্দবাণী — যা রচিত হয়েছে দস্যুর মুখ থেকে, তা মানুষের সেবার লাগুক, তারপরে ধ্বনিত হোক মর্ত্য হতে স্বর্গে, স্বর্গ হতে দূরে, দূরান্তরে, মহর্লোকে।" *(পৃ: ১২৯৯, ঐ)* "যার কথা রচনা করবে তুমি, সে নিজে এসে ধরা দেবে তোমার কাছে।" *(পৃ: ১২৯৯, ঐ)* এই কথা বলে ঋষি বিদায় নিয়ে নিলেন মহর্লোকে যাওয়ার জন্য যেখানে সবাই তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। এ পর্যন্ত কালকূটকে অনুসরণ করার পরে একটু অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক।

রাজশেখর বসুর সারানুবাদ বাল্মীকি রামায়ণ *(নবম মুদ্রণ, ১৩৯০ পৃ: ১-৩-এ)* একটু দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, নারদ বাল্মীকিকে রামের পূর্বপুরুষ থেকে রামের অযোধ্যায় ফিরে এসে রাজ্য গ্রহণ পর্যন্ত ঘটনা সংক্ষেপে বলার পরে দেবলোকে চলে যান। এখানে কালকূটের মনভ্রমণের সঙ্গে একটু পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। দেখা যাক্ রাজশেখর বসুর অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণের সারানুবাদ। নবম মুদ্রণ, ১৩৯০/৪-৫ পৃষ্ঠায় দৃষ্টি দিয়ে। নারদ দেবলোকে চলে যাওয়ার পরে ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটি বধ করার দৃশ্য দেখে যে শ্লোকবদ্ধ বাণী বাল্মীকির মুখ থেকে নির্গত হয়েছিল সেই শ্লোকোৎপত্তির বিষয় ভাবছেন আশ্রমে বসে, এমন সময়ে তাঁর আশ্রমে স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা আগমন করলেন। ব্রহ্মাকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করার পরে ব্রহ্মা কুশল প্রশ্নাদি করেছিলেন বাল্মীকিকে। কিন্তু বাল্মীকি ক্রৌঞ্চের দুঃখে শোকার্তত হয়ে মনে মনে পূর্বোক্ত শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন। তখন ব্রহ্মা বুঝতে পেরে হেসে বাল্মীকিকে বলেছিলেন "তোমার এই ছন্দোবদ্ধ বাক্য শ্লোক নামেই খ্যাত হবে তাতে সংশয় নেই, আমার ইচ্ছাবশেই

তোমার মুখ দিয়ে এই বাণী নির্গত হয়েছে। এখন তুমি সমগ্র রামচরিত রচনা কর। তুমি নারদের কাছে যেমন শুনেছ তদনুসারে রাম লক্ষ্মণ সীতা ও রাক্ষসদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন কর।" *(৫ পৃ:, বাল্মীকি রামায়ণ)* যতকাল তোমার রচিত রামের আখ্যান প্রচারিত থাকবে ততকাল তুমিও আমার জগতের ঊর্ধ্ব ও অধোলোকে বাস করবে।" *(৫ পৃ:, বাল্মীকি রামায়ণ)* ব্রহ্মা এই কথা বলে অন্তর্ধান করলেন। বাল্মীকি রামের ইতিবৃত্ত জানবার জন্য যোগাসনে বসলেন। তারপরে সুললিত ছন্দে শ্লোকগাথা রচনা করতে লাগলেন। নারদ ও ব্রহ্মা দুজনেই এসেছিলেন বাল্মীকির কাছে। *(৫-৬ পৃ:, বাল্মীকি রামায়ণ)*

রাজশেখর বসুর অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণ থেকে আবার কালকূটকেই অনুসরণ করলাম। কালকূটের দৃষ্টিকে অনুসরণ করেই প্রাচেতসের কবিসত্তার জন্মের মহালগ্নে পৌঁছনো গেছে। এখন অপেক্ষা নতুন সৃষ্টির। দেখা যাক কালকূট মনভ্রমণে গিয়ে কীভাবে ঘটনাগুলোকে চিত্রিত করেছেন। কালকূট যেহেতু আপন খুশিতে পথ চলেন অতএব কালকূটও তার লেখনীর তুলিতে চলার গতিপথের ঘটনাবলী দৃশ্যায়িত করতে থাকলেন একটু অন্য দৃষ্টিতে। প্রাচেতসের অনুষ্ঠুভ ছন্দে শ্লোকছন্দ বাণী উচ্চারণের সময় থেকে নারদবংশীয় ঋষি মহর্লোকে বিদায় পর্যন্ত কিছু কিছু উদ্ধৃতি তুলে দেখানোর চেষ্টা করা হল ভাষার স্রোতধারাকে কতভাবে বাঁকে বাঁকে নতুন রূপে প্রবাহিত করেছেন। দস্যু থেকে মহতী মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনী অনেকটা তমসার মতোই, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, প্রতি বাঁকে বাঁকে বিচিত্রতায় পূর্ণ, পরিবর্তনের সাঙ্গে সর্পিল গতিতে এগিয়ে চলেছে।

প্রাচেতসের কুটির যেখানে তৈরি হয়েছে সেখানে ভরদ্বাজ সহ আরও অনেক মুনিরা কুটির নির্মাণ করে সুখের সংসার পেতেছেন। কিন্তু এই মুনি জনপদে প্রাচেতসই একমাত্র একা। তার উচ্চারিত শ্লোকছন্দ বাণী সর্বদা তার হৃদয়ে জাগরুক। "সৃষ্টির আদি তাকে প্রতি মুহূর্তে যেন আলোকিত জগতের সংকেত করছে। সে সংকেত অস্পষ্ট ধরা দেয় না। তার ব্যাকুলতা বাড়ছে। ঋষির কথা সে ভোলেনি। মানুষই হবে তার রচনার বিষয়।" *(১২৯৯ পৃ:, কালকূট রচণা সমগ্র, ৩ খন্ড)* কালকূট বলেছেন যে, প্রাচেতসের "সারা বুকে এখনও বিষের জ্বালা, কালকূট সম। মানুষের অমৃতধারায় ডুব না দিলে, এ বিষের হাত থেকে মুক্তি কোথায়।" *(১৩০০ পৃ:, ঐ)*

তিনি দেখেছেন যে, মনের এরূপ চিত্ত চাঞ্চল্যের মধ্যেও ছায়ার কথা ভুলতে পারে নি প্রাচেতস। অন্য পুরুষকে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে বলতে শুনেছে, "সে আর কোনকালে ফিরে এলেও, তার পাপের সঙ্গে আমার পাপের আর কোনো ভাগাভাগি হবে না।" *(১২৯৫ পৃ:, ঐ)* সেই পরম দুঃখই তাকে ছায়ার প্রতি ক্ষমাশীল করেছে। "সেই পরম অনির্বচনীয় সে যাতনাই মিশে গেছে শ্লোকছন্দের আনন্দে। ঋষি বলেছিলেন, রামের সীতা হরণ রাবণ কর্তৃক। সেই নিষ্ঠুর যাতনার কথা। নিষাদ কর্তৃক নিহত ক্রৌঞ্চের মতোই নিদারুণ ও হাহাকার তুল্য।" *(১৩০০ পৃ:, ঐ)*

কালকূট আদি কবির প্রার্থনা তুলে ধরেছেন এইভাবে — "দাও হে কবির প্রতিমা, আরাধ্যা, আমাকে দাও সেই উচ্চ ভাবদশার সৃষ্টির প্রেরণা। কে সে, কার কাহিনী লিপিবদ্ধ করবো। আমি, যা সব মানবলোকে তার দুঃখ থেকে, সত্যকে উদ্ভাসিত হতে দেখবে। এই মর জগতে তাকে শাক্তি দেবে। মানুষ চিরকাল তাই প্রার্থনা করে এসেছে। সেই প্রার্থনা কি পূর্ণ করতে পারবে না প্রাচেতস? পূর্ণ হবে নাকি প্রাচেতসের প্রার্থনা?" *(১৩০০ পৃ:, ঐ)*

কালকূট তমসার তীরে প্রাচেতসকে লক্ষ্য করেছেন, তীব্র মানসিক যাতনার মধ্যে একদিন প্রাতঃকালের একটু পরে তমসার অরণ্যে প্রাচেতস একাকী ভ্রমণ করছিল, সেই সময়ে কয়েকটি মুনিবালক ছুটে এসে তাকে জানাল রাজপুরুষের মতো এক ব্যক্তি রাণীর মত একজনকে তমসার তীরে রেখে চলে গেছেন। কালকূটও প্রাচেতসের পিছু নিলেন তাঁকে দেখতে। কালকূটের চোখ দিয়ে পুরো ঘটনাটা অবলোকন করি। প্রাচেতস দেখলেন "বিশ্বের অপরূপ সৃষ্টি এক নারী যার রূপের বর্ণনা যেন কাব্যেরই অন্তর্গত। কিন্তু রাজমহিষীরূপে যতখানি বিলাসী রূপে তাকে দেখা যাবে ভেবেছিল, তা না। অথচ তার দেহের বর্ণ বৈদূর্যমণির মত। আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু, যেন লক্ষ্মী প্রতিমা। কিন্তু সারা অঙ্গে গর্ভবতী লক্ষণ। সে গর্ভবতী বলেই যেন, তাকে আসন্ন ফলভারে সুশোভন ধরিত্রীর মতো দেখাচ্ছে। বাস্তবিকতার সঙ্গে ডালিতে রয়েছে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার, ধনরত্নরাশি। যা প্রমাণ করে যে সামান্য রমণী না। বা নিতান্ত মুনিপত্নীও না।" *(১৩০০ পৃ:, ঐ)*

কালকূটের চোখ দিয়ে প্রাচেতসের মনের ভাবনাগুলো প্রকাশিত হয়েছে। আদি কবির হৃদয়ের সুপ্ত কলিগুলি প্রস্ফুটিত হচ্ছে কীভাবে তা কালকূটকে অনুসরণ করলেই দেখতে পাওয়া যাবে। প্রাচেতসের মনে হল — তাঁকে যেন কেউ নির্বাসনে রেখে দিয়ে গিয়েছে। তমসার তীরের ধুলায় চঞ্চল হৃদয়ে তার কাছে গিয়ে নিবেদন করেছিল যে সে প্রাচেতস, তার গোত্র নাম বাল্মিকী এবং সে জানতে চেয়েছিল, "তুমি কে ? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, স্বর্গের পরম সৌভাগ্যের সিংহাসন থেকে তুমি নেমে এসেছো, পৃথিবীর ধুলায়। ... কেন কাঁদ তুমি। কী তোমার দুঃখ। বলতে পারো কি আমাকে? কে তুমি? " *(১৩০০ পৃ:, ঐ)* গর্ভবতী রমণীর ক্রন্দনের মধ্যে সে শুনতে পেয়েছিল, "আমি অযোধ্যার রাজা রঘুপতি রামের পত্নী সীতা।"*(১৩০০ পৃ:, ঐ)* প্রাচেতস বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে সীতার দিকে তাকাল, তার হৃদয় কম্পিত হতে থাকল সীতার মুখের বাণী শুনে। প্রকাশভঙ্গীতে দেখি একালের কথা, "কী শুনি আমি! সংসারে এমনও ঘটে, অযোধ্যার রাজা রঘুপতি রামের পত্নী, তমসার তীরে ধুল্যাবলুণ্ঠিতা। অশ্রুজলে ভাসে প্রাচেতসের আশ্রমের সংলগ্ন ভূমিতে পড়ে? কে তোমাকে রেখে গেলেন এখানে এমনি করে? কার আজ্ঞায়, কিছুই না বুঝি। দয়া করে বল দেবী সুমুখী।" *(১৩০০ পৃ:, ঐ)*

উত্তরে সীতা বললেন, "আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। রাজ আজ্ঞায় পরিত্যক্ত হয়েছি আপনারই

আশ্রয়ে।'' *(১৩০০ পৃ:, ঐ)* প্রাচেতসের বিস্ময়ের শেষ নেই। রাজা রামের কাছে সে কোনদিনও যায় নি, তাহলে রাজা তার কথা জানলেন কী করে। তবুও অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে প্রাচেতস সীতাকে বলল, ''হে দেবী, দয়া করে উঠে এসো, আমার গরিব আশ্রয়ে। আমি সামান্য মানুষ মাত্র, মুনি নই, নই তপোধন। আছি এক গভীর প্রত্যাশায়।'' *(১৩০০ পৃ:, ঐ)* সীতা উঠে দাঁড়িয়ে একবার তমসার ওপারে তাকাল এবং রুদ্ধস্বরে বলল যে লক্ষ্মণের রথের ধূলা এখনও দেখা যাচ্ছে, সে ছিল দুঃখের দিনের কাণ্ডারী আর সুখের দিনের সখা। সে যাবার সময়ে বড় কেঁদেছিল, কিন্তু নিরুপায় হয়েই অগ্রজের আজ্ঞা পালন করেছিলেন। লক্ষ্মণের অসহায়তা সীতা বুঝতে পেরেছে, তবুও এই কথাটির মধ্য দিয়ে সীতার সঙ্গে দেবর লক্ষ্মণের চিরন্তন মধুর সম্পর্কটি প্রকাশিত করে দিলেন কালকূট। কত অনায়াসলভ্য নিপুণতার সঙ্গে রোদনরতা সীতার অন্তরটি দেখিয়ে দিলেন। নিজ কুটিরে মুনি পত্নীবালাদের কাছে সীতার বিশ্রামের ও থাকার ব্যবস্থা করে প্রাচেতস সীতাকে বলল যে পরে সব কথা সে শুনবে। কেননা তাঁর মনে হয়েছে যে এই দিনটির জন্য সারাজীবন প্রতীক্ষায় আছেন প্রাচেতস। তবুও সীতা পুরনো দিনের স্মৃতি মনে করে অঝোর অশ্রুধারে বলেছিলেন ''আমি সেই দশগ্রীব রাক্ষসের অঙ্গ সংলগ্ন, সে আমাকে নিয়ে চলেছে ঊর্ধপানে। আমি শুনেছি, রঘুপতি রাম আমার বিরহে বক্ষে আঘাত করে হাহাকার করে কেঁদেছেন। আজ সেই তিনিই আমাকে মুনির আশ্রমে নির্বাসন দিয়েছেন।'' *(১৩০১ পৃ:, ঐ)*

সীতার কথা ও কান্না শুনে মুনিপত্নীরাও তাদের চোখের জল রোধ করতে পারলেন না। তাঁদের সঙ্গে কিছুকাল কাটানোর কথা বলে প্রাচেতস বাইরে চলে গেল। প্রাচেতসের গৃহে ঠাঁই পাওয়ার পরে মুনিপত্নীদের সঙ্গে অশ্রুসজল চক্ষে সীতার যে বাক্যালাপগুলো হয়েছিল সেগুলো কালকূট গভীর পর্যবেক্ষণের সাঙ্গে চিহ্নিত করেছেন। প্রাচেতস গৃহের বাইরে অপেক্ষা করছেন। সীতার বিশ্রাম নেওয়ার পরে সীতার মুখ থেকে সবকিছু শুনবেন বলে। এই সময়ে কুটিরের ভিতরে মুনিপত্নীদের কাছে অসহায় সীতা বলছে যে, ''আমি গর্ভবতী নারী। আপনাদের আশ্রয়ে এসেছি। আপনারাই আমার একমাত্র সহায়।'' *(১৩০১ পৃ:, ঐ)* মুনিপত্নীদের বাক্যালাপ লক্ষণীয়। তাঁরা বলছেন, ''এ সময়ে রাজা কোন্ অন্তঃকরণে তোমাকে ত্যাগ করেছেন, আমাদের জ্ঞানে অগম্য। এ সময়ে নারীর সহায় নারী। তবু স্বামীই সকল সংকটের গতি।...''*(১৩০১ পৃ:, ঐ)* স্থান-কাল অনুযায়ী চরিত্র ও তার মুখের ভাষা — এসব থেকেই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি, দূরদর্শিতা সব কিছু প্রকাশিত হয়। এখানেও কালকূট মুনিপত্নীদের কথোপকথনের মাধ্যমে তাঁর এ'কালের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। চরিত্রগুলো সেকালের কিন্তু তিনি একালের মানসিকতায় যুক্তিনিষ্ঠ করে তুলে ধরেছেন। মুণিপত্নীরা আরও জানালেন যে, ''প্রাচেতসই আমাদের এখানে প্রধান। তাঁকে কেন্দ্র করেই আমরা এখানে এই তমসার তীরে রম্য কাননে আশ্রমে বাস করছি। তিনি সর্বদাই আপন

চিন্তায় মগ্ন। কী তাঁর ধ্যানজ্ঞান, আমরা কিছু জানি না। আজ তোমার আগমনের পর এই প্রথম দেখলাম, তিনি যেন এক অভূতপূর্ব উদ্যমে জেগে উঠেছেন।" *(১৩০১ পৃ:, ঐ)* সীতা নিজে মুনিবালকদের দিয়ে প্রাচেতসকে আহ্বান জানাল। প্রাচেতস এই আহ্বানের প্রতীক্ষায় ছিল। সত্বর গৃহাভ্যন্তরে সীতার কাছে এসে 'দেবী' সম্বোধনে বলল যে তার অন্তর দুঃখে পূর্ণ হলেও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। "আমার সারাটা জীবন এই দিনটির অপেক্ষায় ছিল। আমি এই তপোবনে, মুনিপত্নীদের গর্ভবতী রূপ দেখেছি। কিন্তু তোমার মতো এমন বিশালবতী, গম্ভীর অথচ মানবীর এমন গর্ভবতী রূপ যেন আর কখনও দেখিনি। ... তোমার যদি কোনো কষ্ট না হয়, কোনো বাধা না থাকে, তবে তোমার সকল বৃত্তান্ত আমাকে বল। আমি ধন্য হই।" *(১৩০১ পৃ:, ঐ)*

প্রচ্ছন্ন বিস্ময় ও সংশয়ে সীতা জিজ্ঞাসা করেছিল, "তপোধন কি আমার বৃত্তান্ত কিছুই অবগত নন?" *(১৩০১ পৃ:, ঐ)* প্রাচেতস হেসে বলেছিল যে, সীতার সবকিছুই তিনি জানেন। তার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে কারও কোনো কৌতূহল নেই, জনকের অযোনিজ কন্যা জানকী এইটুকুই সবাই জানে। হরধনু ভঙ্গ করে অযোধ্যার ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাম সীতাকে বিবাহ করেছেন। তারপরে দুঃখের কাহিনী — রাবণ সীতাকে হরণ করেছেন, রামের দ্বারা অপযশ, চিতার আগুনে পুড়ে মরার ইচ্ছা— সব, সব কিছুই তিনি জানেন। "কিন্তু নতুন করে, আবার কেন, কীভাবে রাম তোমাকে ত্যাগ করলেন, আমাকে সেই মর্মন্তুদ ঘটনাবলী শোনাও"। *(১৩০১ পৃ:, ঐ)* সীতা তপোধনের অন্তরের বাসনা শুনে নিজেকে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলেন। অশ্রুপূর্ণ চোখে তার আপন দুঃখ যাতে ভেসে না যায় তার জন্য ভালো করে আসন গ্রহণ করলেন। কিছুক্ষণের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করে স্থির হয়ে রইলেন।

প্রাচেতসও ধ্যানমগ্ন চিত্তে যেন দেবীর পূজায় সীতার সামনে উপবেশন করলেন। সীতা বলতে শুরু করলেন তাঁর নতুন জীবনের কাহিনী, গতকাল সীতা আহ্লাদিত চিত্তে রামের কাছে নিবেদন করেছিলেন যে, যেহেতু তিনি গর্ভবতী তাই বনে গিয়ে মুনিপত্নী ধনরত্ন ও বস্ত্রালঙ্কার দিয়ে আবার ফিরে আসতে চান। প্রভাতে সীতা মুনিদের তপোবনে যাবেন। স্বয়ং লক্ষ্মণ নিয়ে যাবেন, এটাই ছিল রামের আদেশ। লক্ষ্মণ সুমন্ত্রর রথ সাজিয়ে নিয়ে এসে বিষণ্ণ মুখে কেবল একটা কথা বলেছিল— "জানকী তুমি রথে আরোহণ কর। যেথা যাত্রা করার, সেথায় আমি তোমাকে নিয়ে যাব।" *(১৩০২ পৃ:, ঐ)* তমসার ওপারে সুমন্ত্রর সুখশয্যা পাতা রথ থেকে নামার পরে, লক্ষ্মণ ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রজানুরঞ্জক রাম সীতাকে ত্যাগ করেছেন। কারণ প্রজারা বিশ্বাস করে না যে, সীতা রামের সৎ সতী। তাদের অভিযোগ, "আমি দীর্ঘকাল রক্ষঃকুলমণি রাবণের অন্তঃপুরে বাস করেছি। আমি গর্ভবতী। এমন রানীকে নিয়ে যদি রাজা অন্তঃপুরে রাখেন, তবে প্রজারা ভাববে রাজাও অসৎ। তিনি স্ত্রীকে বিশ্বাস করে, প্রজাদের অবিশ্বাসভাজন হতে চলেছেন। অতএব

লক্ষ্মণ যেন আমাকে নদীর এপারে, মুনির আশ্রমে ত্যাগ করে চলে যায়।" *(১৩০২ পৃ:, ঐ)*

সীতার দুঃখপূর্ণ জীবনের কথা শুনতে শুনতে প্রাচেতসের সঙ্গে লেখক কালকূটের মনও ব্যথায় ভরে উঠেছিল। রামের আহ্লাদিনী সীতা রামের কাছে কী চেয়েছিলেন, আর কী পেলেন! রথ থেকে নামার পরে অস্পষ্টতার মধ্যে লক্ষ্মণ ঘোষণা করেছিলেন যে, রাম সীতাকে লোকনিন্দার ভয়ে পরিত্যাগ করেছেন। কী হৃদয় বিদারক দৃশ্য! কালকূট অশ্রুজলে সিক্তা শোকাভিভূতা, অপবাদের অপমানে অপমানিতা, ভূলুণ্ঠিতা সীতাকে দেখেছিলেন! বেদনার রসে সিক্ত করে কালকূট সেই বিষাদপূর্ণ ঘটনা তুলে এনেছেন আপন লেখনীতে।

প্রাচেতস সীতার নিজমুখে তার জীবনের কথা তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। সীতার প্রশ্ন শুনে যেন তার ধ্যানমগ্নতা থেকে উঠে এসে বলল "অন্তর আর দেহ নিয়ে শুচিতার প্রশ্ন উঠেছে। মানুষ, এখানেই মানুষ। প্রজানুরঞ্জক রাজা হিসাবে রাম একদিন অবতার হবেন, এই হলো সংসারের বিধান। কিন্তু তুমি যে অন্তরের দিক থেকে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হওনি, এ সত্য তুমি কোনদিন প্রমাণ করতে পারবে না। দেবী, আমি জানি, তুমি ধর্ষিতা, কিন্তু সে দোষ তোমার না। তোমাকে রাবণের পৈশাচিক ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারার পাপ চিরকাল মানুষের সমাজকে বহন করতে হবে। যথার্থ সতীত্ব দেহের ঊর্দ্ধে, নারীর হৃদয়ের শক্তিতে অবস্থান করে। এই শক্তির মহিমা বুঝতে মানুষের বহুকাল গত হবে। অবতার রামের জন্য মানুষ যেমন চিরকাল গৌরব গান করবে, তোমার জন্যও সমস্ত মানবী চিরকাল তোমাকেই অনুসরণ করবে।" *(১৩০২ পৃ:, ঐ)* "না, না হে তপোধন, আমি সামান্য ধর্ষিতা নারী, আমাকে কেন মানবীরা সম্মান করবে?" *(১৩০২ পৃ:, ঐ)* এই বলে সীতা অশ্রুপূর্ণ চোখে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রাচেতসকে প্রশ্ন করেছিলেন। আধুনিককালের লেখক কালকূট, আধুনিক মন নিয়েই সব কিছু বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সেকালের কথাকারের থেকে আলাদা হবেই। তাই তিনি প্রাচেতস ও সীতা --- উভয়ের মুখ থেকেই সীতা 'ধর্ষিতা' এই গুরুতর বাক্য উচ্চারণ করিয়েছেন।

এখন দেখা যাক কালকূট মূলকাহিনিকে কতটা অনুসরণ করে প্রাচেতস ও সীতা উভয়ের মুখে 'ধর্ষিতা' শব্দটি ব্যবহার করিয়েছেন। সীতার অগ্নিপরীক্ষার সময় থেকে এগিয়ে যাওয়া যাক্। রাজশেখর বসুর বাল্মীকি রামায়ণ (পৃ: ৩৭৮-৩৭৯, ৯ম: মুদ্রণ ১৩৯০) যুদ্ধ কাণ্ডে দেখা যাচ্ছে যে, যুদ্ধ শেষ। রামের আদেশে রাক্ষসরাজ সীতাকে রাক্ষসবাহিত শিবিকায় বসিয়ে রামের কাছে নিয়ে আসছিলেন। পথের দুইপাশে রাক্ষস-যোদ্ধৃগণ ও বনবাসীগণ বানর-ভল্লুকদের বেত্র দ্বারা অপসারিত করছিল বিভীষণের কঞ্চুকউষ্ণীষ ধারা পুরুষরা। এসব দেখে রাম বলেছিলেন যে, "গৃহ বস্ত্র প্রাচীর বা লোকাপসারণ এই সকল রাজকীয় আড়ম্বর নারীদের আবরণ নয়, চরিত্রই নারীর আবরণ" *(পৃ: ৩৮০, ঐ)* এবং তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আদেশ দিয়েছিলেন "সীতা বিপদগ্রস্ত ও কষ্টে পতিত, এখন

তাঁর দর্শনে দোষ হবে না, বিশেষত আমার সমীপে। অতএব উনি শিবিকা থেকে নেমে পদব্রজে আসুন, এই সমস্ত বনবাসী বানর ভল্লুকাদি আমার সমীপে সীতাকে দেখুক।" *(পৃ: ৩৮০, ঐ)* সীতা লজ্জায় যেন নিজের দেহে লীন হয়ে বিস্ময়ে ও আনন্দে পতিমুখ দর্শন করলেন। সীতাকে দেখে রাম তাঁকে বললেন যে "আমি যুদ্ধে শত্রু জয় করে তোমাকে উদ্ধার করেছি, পৌরুষ দ্বারা যা করা যায় তাই আমি করেছি। আমার ক্রোধ ও শত্রুকৃত অপমান দূর হয়েছে, প্রতিজ্ঞা পালিত হয়েছে।" (পৃ: ৩৮০, ঐ, যুদ্ধকান্ড)

এসব কথা শুনে সীতা মৃগীর ন্যায় বিস্ফারিত ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে রামকে দেখতে লাগলেন। তিনি শুনলেন রাম তাকে বলছেন "... তুমি জেনো এই রণপরিশ্রম — এ তোমার জন্য করা হয় নি। নিজের চরিত্র রক্ষা, সর্বত্র অপবাদ খণ্ডন এবং আমার বিখ্যাত বংশের গ্লানি দূর করবার জন্যই এই কার্য করেছি। তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়েছে, নেত্র রোগীর সম্মুখে যেমন দীপশিখা, আমার পক্ষে তুমি সেইরূপ কষ্টকর। তুমি রাবণের অঙ্কে নিপীড়িত হয়েছ, সে তোমাকে দুষ্ট চক্ষে দেখেছে, এখন যদি তোমাকে পুনঃগ্রহণ করি তবে কি করে নিজের মহৎ বংশের পরিচয় দেব? যে উদ্দেশ্যে তোমাকে উদ্ধার করেছি তা সিদ্ধ হয়েছে, এখন আর তোমার প্রতি আমার আসক্তি নেই, তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও। আমি মতিস্থির করে বলছি — লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব বা রাক্ষস বিভীষণ, যাঁকে ইচ্ছা কর তাঁর কাছে যাও, অথবা তোমার যা অভিরুচি তা কর। সীতা, তুমি দিব্যরূপা মনোরমা, তোমাকে স্বগৃহে পেয়ে রাবণ অধিককাল ধৈর্যাবলম্বন করে নি।" (পৃ: ৩৮২, ঐ)

বহুলোকের সামনে রামের মুখে এই রোমহর্ষক অশ্রুতপূর্ব কথা শুনে সীতা লজ্জায় যেন নিজের গাত্রে প্রবিষ্ট হলেন। তিনি অশ্রুজল মুছে গদগদ স্বরে রামকে বললেন যে, নীচ ব্যক্তি স্ত্রীলোককে যেমন ভাবে বলে রামও সেইভাবে তাকে কেন বলছেন? সীতাকে বর্জনের কথা তিনি হনুমানকে দিয়ে আগেই জানালেন না কেন? আরও বললেন আমি তখনই জীবন ত্যাগ করতাম, তোমাদের অনর্থক কষ্ট পেতে হত না। পরাধীন বিবশ অবস্থায় রাবণ আমার গাত্র স্পর্শ করেছিল, এই দোষ আমার ইচ্ছাকৃত নয়—

"মদধীনং তু যৎ তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ততে।
পরাধীনে গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরী।।
সহ সংবৃদ্ধভাবেন সংসর্গেণ চ মানদ।
যদি তেহহং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনাস্মি শাশ্বতম্।। (১৬৬।৯-১০)
অপদেশেণ মে জনকান্নোৎপত্তির্বসুধাতলাৎ।
মম বৃত্তং চ বৃত্তজ্ঞ বহু তে ন পুরস্কৃতম্।।

ন প্রণামীকৃতঃ পাণির্বালো মম নিপীড়িতঃ।
মম ভক্তিশ্চ শীলং চ সর্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্।।" (১১৬।১৫-১৬)
(পৃ: ৩৮২, ঐ)

— "আমার অধীন যে হৃদয় তা তোমারই ছিল; কিন্তু যখন আমি নিজের কর্ত্রী নই তখন পরায়ত্ত দেহ সম্বন্ধে কি করতে পারি? আমাদের দীর্ঘকাল সংসর্গ হয়েছে, পরস্পরের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, এতেও তুমি আমাকে না বুঝে থাক তবে আমার পক্ষে তা চিরমৃত্যু। জনকের নামে আমার পরিচয়, বসুধাতল থেকে আমার উৎপত্তি, এসব তুমি গ্রাহ্য করলে না; তুমি চরিত্রজ্ঞ; কিন্তু আমার মহৎ চরিত্রের সম্মান করলে না। বাল্যকালে তুমি আমার পাণিগ্রহণ করেছিলে, তাও মানলে না, আমার ভক্তি চরিত্র সবই পশ্চাতে ফেলে দিলে।" (পৃ: ৩৮২-৩৮৩, ঐ)

স্বামী অপ্রীত হয়ে সর্বসমক্ষে সীতাকে ত্যাগ করেছেন, অতএব তিনি অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার জন্য লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করতে বললেন। লক্ষ্মণের প্রস্তুত করা চিতায় প্রবেশের পূর্বে রামকে প্রদক্ষিণ করে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে সীতা যুক্ত —করে অগ্নিকে বললেন, "যদি আমার হৃদয় চিরকাল রাঘবের প্রতি একনিষ্ঠ থাকে, ইনি যাকে দুষ্টা মনে করেন সেই আমি যদি শুদ্ধচরিত্রা হই, তবে লোকসাক্ষী অগ্নিদেব আমাকে রক্ষা করুন।" (পৃ: ৩৮৩, ঐ) এই কথা বলে সীতা নিঃশঙ্কচিত্তে সর্বসমক্ষে দীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করলেন। সীতা অগ্নিতে প্রবেশের পর "মূর্তিমান অগ্নি বাল্যরুণ প্রভা রক্তাম্বরধরা অম্লান মাল্য ভূষিতা সীতাকে ক্রোড়ে নিয়ে চিতা থেকে উঠলেন এবং রামের হস্তে তাঁকে সমর্পণ করে বললেন, রাম, এই তোমার বৈদেহী, ইনি বাক্য মন বুদ্ধি বা চক্ষু দ্বারা সৎ পথ থেকে ভ্রষ্ট হন নি। ইনি যখন রাবণের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ ছিলেন তখন রাক্ষসীরা এঁকে বহু তর্জন করেছে এবং প্রলোভন দেখিয়েছে, কিন্তু এঁর অন্তঃকরণ তোমাতেই নিবিষ্ট ছিল, রাবণকে ইনি চিন্তাও করেন নি। আমি তোমাকে আজ্ঞা করছি, এই নিষ্পাপ বিশুদ্ধ স্বভাবা মৈথিলীকে অসঙ্কোচে গ্রহণ কর।" (পৃ: ৩৮৪, ঐ)

রঘুপতি রামচন্দ্র, সীতা ও অগ্নিদেব, এই তিনজনের বাক্যালাপ পর্যালোচনায় দেখা যায়, কালকূটের চোখ এড়িয়ে যায় নি সেকালে ঘটে যাওয়া সীতার জীবনের বিপর্যয়গুলো। সীতা রামের কাছে স্বীকারোক্তি করেছে "পরাধীন বিবশ অবস্থায় রাবণ আমার গাত্র স্পর্শ করেছিল, এই দোষ আমার ইচ্ছাকৃত নয়।" *(পৃ: ৩৮২,ঐ)* অথবা "আমার অধীন যে হৃদয় তা তোমারই ছিল; কিন্তু যখন আমি নিজের কর্ত্রী নই তখন পরায়ত্ত দেহ সম্বন্ধে কি করতে পারি" *(পৃ: ৩৮২,ঐ)* কাব্যকার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি হৃদয়ের প্রাধান্যকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। সীতার মুখ দিয়ে সেই কথাই উচ্চারণ করিয়েছেন। অগ্নিতে প্রবেশের পূর্বেও মুখে সেই একরকমের উক্তি, "যদি আমার হৃদয় চিরকাল রাঘবের প্রতি একনিষ্ঠ থাকে, ইনি যাকে দুষ্টা মনে করেন সেই আমি যদি

শুদ্ধচরিত্রা হই, তবে লোকসাক্ষী অগ্নিদেব আমাকে রক্ষা করুন।" *(পৃ: ৩৮৩,ঐ)*

এখানেও সীতা দেহের শুচিতার কথা বাদ দিয়ে হৃদয়ের একনিষ্ঠতা, শুদ্ধ চরিত্রের কথা বলে প্রার্থনা করেছিলেন। এবং অগ্নিদেব চিতা থেকে উঠে এসে রামের হাতে সীতা সমর্পণ করে বলেছিলেন "ইনি বাক্য মনবুদ্ধি বা চক্ষু দ্বারা সৎ পথ থেকে ভ্রষ্ট হন নি। কিন্তু এবং অন্তঃকরণ তোমাতেই নিবিষ্ট ছিল, রাবণকে ইনি চিন্তাও করেন নি।" *(পৃ: ৩৮৪,ঐ)*

কাব্যকার এখানেও সেই অন্তঃকরণের শুচিতাকে সৎ পথ বলে ব্যক্ত করেছেন। কাব্যকার সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নিজ উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন সীতার নিজমুখে "পরাধীন বিবশ অবস্থার" কথা স্বীকার করিয়ে। কালকূট একালের আধুনিক মন দিয়ে তার উপলব্ধি সীতা ও প্রাচেতসের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন। কালকূটকে অনুসরণ করে আবার এগিয়ে চলা যাক্। প্রাচেতস ও সীতার কথোপকথন স্থলে।

প্রাচেতসও অশ্রুসজল চক্ষে সীতাকে বলছেন, "দেবী, মানবীই একমাত্র জানে, তার সত্য কোথায়, তার শক্তি কোথায়। আজ যে রাম তোমাকে ত্যাগ করেছেন, তার মূল্য তাঁকে অন্যভাবে দিতে হবে। তবু মনে রেখো, রামও মানুষ। সে যে তোমাকে ত্যাগ করেছে, তারও মনস্তাপ বড় কম না।" *(পৃ: ১৩০২, ঐ)* প্রাচেতস আরও বলেছেন, "মানুষ যেখানে যত খাঁটি সেখানে, তাকে চোখের জলে বারে বারে পরীক্ষা দিতে হয়। পরম দুঃখের মধ্য দিয়ে অমৃতের দুয়ারে যেতে হবে।" *(পৃ: ১৩০২, ঐ)*

সীতা তাঁর এই অনিচ্ছাকৃত পাপ ও অসম্মান থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় প্রাচেতসের কাছে জানতে চাইল। কালকূট যেন শুনতে পেলেন প্রাচেতস সীতাকে বলছেন, তার সন্তানেরা মানুষ হবে কিন্তু সীতা পূর্বের সম্মান ও আপনার স্থান পাবে না বলে আত্মহত্যা করবেন। এই নির্মম সত্য প্রাচেতসই বললেন এই কারণে যে "মিথ্যা অগৌরবে তোমার আত্মনাশই মানবীদের চিরকালের পথ প্রদর্শক হয়ে থাকবে।" *(পৃ: ১৩০২, ঐ)* প্রাচেতস আরও বলে চলেছেন যে একদিন রাম অবতার হবেন, তারপরে, হাজার হাজার বছর পার করে মানুষ সীতার "আত্মনাশের অনুসন্ধানের দ্বারা, নিজের সত্তাকে দেখতে পাবে। আমার কাজ, আজ থেকে তুমি আমাকে আবার পূর্বাপর সমস্ত কাহিনী বলবে, আমি শুনবো, আর তাই লিখে রেখে যাবো আমার কবিতায়। জানবে, এই কবিতাই তোমার চির পরিচয়কে ধরে রাখবে, মানব-মানবীকে সকল অমঙ্গলের বিরুদ্ধে জাগরিত করবে। তবে আমি সেইদিন সার্থক হবো —।" *(পৃ: ১৩০২, ঐ)*

প্রাচেতস রুদ্ধস্বরে বললেন, দেবী, আর একবার ক্রৌঞ্চের মিলন মগ্ন ক্রৌঞ্চীকে নিষাদ বধ করবে। সেই দিনটি, যেদিন তুমি আমাকে ত্যাগ করে যাবে, সেইদিন আমার কাব্য সার্থক হবে।"

সীতা বিগলিত চোখে জানতে চেয়েছিল সীতার বিহনে তপোধনের কী কষ্ট। প্রাচেতস

ঝাপসা দুই চোখে বলতে লাগলেন "প্রজানুরঞ্জক রাজা অবতার হবেন, কিন্তু তার কারণ সকল তুমি। রাবণ তোমাকে অপহরণ ও ধর্ষণ করে, সবংশে নিহত হয়েছে। তুমিই তার কারণ। প্রজাপুরঞ্জক রাম তোমাকে ত্যাগ করে অবতার হবেন। তার করণও তুমি। আমরা রাবণের চিতা দেখেছি, রামের অন্তরের চিতা দেখি নি। কিন্তু জানি, সেখানে আগুন জ্বলছে। এখন আমি ভবিষ্যস্রষ্টা। দেবী, নিষাদ যেমন করে ক্রৌঞ্চকে বধ করে, ক্রৌঞ্চীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, আমাকে সত্য বলতে হবে, সেইভাবে তোমাকে বিপরীত রূপে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে আমার কাছ থেকে। সেইদিন থেকে আমার সর্বস্ব হবে, তোমার কারণে যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, তাকে কাব্যের আলোকে পরিচিত করা — সেই কাব্য--গান গেয়ে আমার সারা জীবন কাটবে। ঈশ্বরের কী অভিপ্রায় আমার দ্বারা সিদ্ধ হবে জানি না। যদি সত্য আমি আদি কবি, তবে এই শেষ গতি আমার সার্থকতা। সেই কারণেই, আজকের দিনটি আদি কবির সর্বাপেক্ষা, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক্ষার দিন। তুমি মোহহীন চিত্তে নিজেকে প্রকাশ কর। আমি মোহহীন চিত্তে শুনি।"

সীতা মোহহীন চিত্তে আবির্ভাব কাল হতে প্রাচেতসের নিজেকে প্রকাশ করতে লাগল। কালকূট দেখছেন আদি কবির রচনায় সীতা তমসার অতি সর্পিল গতির মতো অবিরাম স্রোতের কুলুকুল ধ্বনির মতো প্রকাশিত হতে লাগল। মনভ্রমণে গিয়ে কালকূট যা দেখলেন, তা তার বলিষ্ঠ বাস্তববাদী যুক্তিবাদী মন পুরাণ মহাকাব্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সংকেত গুলোকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন। এবং যা উপলব্ধি করলেন তাই বিভিন্ন কাহিনি উপকাহিনীর মধ্য দিয়ে সেকালের ঘটনাবলীকে একালের আধুনিক মনের দৃষ্টিভঙ্গিতে চিত্রায়িত করে উপন্যাসের পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং ধীরে ধীরে ভ্রমণকাহিনী আর ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তমসার তীরে এক মহান প্রেমিক পুরুষের সন্ধানই কালকূটের ভ্রমণকাহিনীকে অর্থাৎ ভাবনাকে উপন্যাসের পূর্ণতার আঙিনায় পৌঁছে দিয়েছে।

কালকূট **'পৃথা'** রচনা করেন ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৯২ বঙ্গাব্দে) শারদীয় সংখ্যায় 'প্রসাদ' পত্রিকায় এটি প্রথম প্রকাশ পায় এবং পরে ১৩৯৩ ১লা বৈশাখ 'মণ্ডল বুক হাউস' থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এবারও কালকূটের মানসভ্রমণ আবার জাতীয় মহাকাব্য মহাভারতের যুগে এবং মূল লক্ষ্য পাণ্ডব-জননী 'পৃথা' তথা কুন্তী চরিত্রের অন্তর্গহনে ডুব দেওয়া। কালকূট এই রচনার অভিমুখ নির্দেশ করেছেন এভাবে— "এবারও আমার যাত্রা সেই প্রাচীনতর ইতিহাসের পথে। আমার সন্ধানের লক্ষ্য এক ঐতিহাসিক রাণীর ইতিহাসের পথ ও ঐতিহাসিক রাণী, এই কথায় কেউ কেউ আপত্তি করতে পারেন। কারণ আমাদের পুরাণ যে আমাদেরই জাতীয় ইতিবৃত্ত, এ বিষয়ে অনেকের সংশয় থাকতে পারে। কিন্তু আমি দেখছি, আমাদের প্রাজ্ঞ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ, পুরাণের বিবিধ অলৌকিক আবরণ মুক্ত করে ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।"

(পৃ: ১৩৮৩, কালকূট রচনা সমগ্র, ৩য় খণ্ড)

কালের ধুলোর আস্তরণ সরিয়ে ইতিহাসের পথ ধরে কালকূট চলেছেন মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে, পঞ্চপাণ্ডবেরও জন্মের আগের কালে, যদু বংশের রাজা শূর সেনের আমলে। শূর সেন কন্যা পৃথাকে তাঁর পিসতুতো ভাই রাজা কুন্তিভোজকে দত্তক দিয়েছিলেন। কুন্তিভোজের পালিত কন্যার নতুন নামকরণ হয়েছিল কুন্তী। এই কুন্তীকে দর্শন করতেই কালকূটের এবারের মনভ্রমণ। কুন্তীকে ঘিরে বহুকাল ধরে মানুষের মনে নানা প্রশ্ন, নানা মন্তব্য বারে বারে উঁকি দিয়ে গেছে। তাই কালকূট মনে করেছেন— "যার বাস্তব সত্তার ওপর বহুতর কল্পিত আর অলৌকিক সব আবরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, ইতিহাসের পথ ধরে সমস্ত কুহেলিকা আর কল্পিত অজ্ঞানতা থেকে তাঁকে আমি দেখবো।" *(পৃ: ১৩৮৪, ঐ)* এই অনন্যা, অবিস্মরণীয়া রমণীর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে এ'কালের দৃষ্টিতে দেখবার জন্য ও তাঁকে বিশদভাবে বুঝবার জন্য কালকূট কুন্তীর জন্মের আরও আগের কালে, সংহিতা যুগে তাঁর যাত্রাপথকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

কালকূট সংহিতা যুগে পৌঁছে দেখলেন, তাঁকে ইতিহাসের পথে, আরও একটু পিছনে ফিরতে হচ্ছে। — "অর্থাৎ স্বর্গ আর দেবতাদের যে-রাজ্য ও রাজত্বের ইতিহাস পেয়েছি, তাকে আবার একটু নতুন করে দেখে নিই। তা হলে, ইতিহাসের যে-লগ্নে, যে-মহারাণীর সন্ধানে চলেছি, তার স্থানকালের ভিতটা শক্ত হবে।" *(পৃ: ১৩৮৪, ঐ)* স্বর্গ আর দেবতাদের রাজ্যের অবস্থানটি আমাদের প্রাজ্ঞ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ, পুরাণের বিবিধ আবরণ মুক্ত করে, ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই পথে হাঁটতে গিয়ে বুঝতে পেরেছেন যে, স্বর্গ সে কোনো আকাশের মহাশূন্যে অবস্থিত স্থান নয়, একান্তভাবেই মানুষের নানা নামের জাতির যাতায়াতের পথেই একটি সুন্দর স্বাস্থ্যকর প্রাচীন পাদভৌম স্থান। তবে স্থানটি ঠিক কোথায় ছিল, তা নিয়ে পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কিছু বিতর্ক আছে।

কালকূট নিজেই এই বিতর্কের সপক্ষে বলেছেন। তিনি পুরাণ পথে হাঁটতে গিয়ে দেখলেন যে পুরাণ ব্যাখ্যাকারদের মধ্যেই অনেকে ইলাবৃতবর্ষকে 'স্বর্গ' বলে অবহিত করেছেন। ইলাবৃতবর্ষে স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে পূর্ব তুর্কীস্থানের একটি বৃহৎ জনপদকে নির্দিষ্ট করেছেন। কালকূট পাণ্ডবদের স্বর্গে যাওয়ার দুর্গম পথটি ধরেই মনভ্রমণে চলেছেন। তিনি মহাহিমগিরি অতিক্রম করে মহাবালুকার্ণবে এসে পৌঁছলেন। স্থানগুলোকে একালের পাঠকবর্গের অসুবিধা হবে বলে বর্তমানের ভৌগোলিক নির্দেশটা কালকূট যুক্তিনির্ভর তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। মহাহিমগিরি হল হিমালয়, আর তিব্বতের বিশাল মরুভূমিই হল মহাবালুকার্ণব। এই মহাবালুকার্ণব পার হয়ে কালকূট উঠলেন মেরুপর্বতে। এই মেরুপর্বত অতিক্রম করতে গিয়ে যুধিষ্ঠির ছাড়া দ্রৌপদীসহ সকলে মৃত্যুমুখে

পতিত হন। মেরুপর্বতের উপরে স্বর্গ নামে জনপদ ছিল, আর সেখানে দেবতা নামে জাতির বাস। মেরুপর্বত বর্তমানে আলটাই পর্বত নামে পরিচিত। সময়ের আবরণ সরিয়ে, কল্পিত ঘটনা বা কাহিনীকে যুক্তিনির্ভর তথ্য দিয়ে কালকূট অতীতকে বর্তমানের আলোয় এনেছেন। স্বর্গে যাওয়ার পথনির্দেশ অনুসরণ করে স্বর্গের খোঁজ এবং ভৌগোলিক বিবরণও পাওয়া গেল। আরও নতুন কিছু তথ্য কালকূটের অন্তর্দৃষ্টি থেকে বুঝে নেওয়া যাক্। এবার স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর ও সামাজিক ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন কালকূট।

স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর বা রাজা হলেন ইন্দ্র। স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ লেগে থাকার কারণগুলো কালকূট নির্দেশ করেছেন। দেবতারা অসুরদের বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। কশ্যপের এক স্ত্রী অদিতি, তাঁর পুত্ররা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য আরো অনেকে। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হলেন ব্রহ্মা এবং কনিষ্ঠ ইন্দ্র। আর চন্দ্র ছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদিদের খুল্লতাত।

কশ্যপের অপর স্ত্রী দিতির গর্ভজাত সন্তানরা হল অসুর। দেবতারা আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 'স্বর্গ' নামে সুন্দর স্থানটি দখল করে তাঁরা রাজ্য স্থাপন করেছিলেন ও অসুরদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন। অসুররা বাধ্য হয়ে 'মন্দ' নামে একটি নিকৃষ্ট প্রকৃতির প্রদেশে চলে গিয়েছিলেন। সেইজন্য তারা প্রায়ই স্বর্গ আক্রমণ করে দেবতাদের হারিয়ে স্বর্গ দখল করে নিত।

ইতিবৃত্তীয় পথে চলতে গিয়ে কালকূট ইতিবৃত্তীয় বিকৃতি বা ধোঁয়াশাগুলোকে অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর তথ্য দিয়ে ভাঙতে ভাঙতে, এগিয়ে চলেছেন অভীষ্ট পূরণের পথে। ব্রহ্মা হলেন দেবমানব ও প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা। কালকূট এই বিকৃত তথ্যকে নতুনভাবে উন্মোচন করলেন। — "ব্রহ্মা ছিলেন দেবতাদের সর্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর কাছে বহুতর জাতির অধিবাসীরা, নানান সংকটে ও বিপর্যয়ে পরামর্শ নিতে আসতেন।" *(পৃ: ১৩৮৩, ঐ)* কালকূট তাঁর যুক্তিবাদী দৃষ্টি দিয়ে ব্রহ্মলোকের ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ করেছেন। ব্রহ্মা সপারিষদ বাস করতেন মেরুপর্বত অতিক্রম করে উত্তর কুরুবর্ষে। কালকূট সেই ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে বললেন "আধুনিককালে সেই কুরুবর্ষ এখন রাশিয়ার সাইবেরিয়া।" *(পৃ: ১৩৮৩, ঐ)* সাইবেরিয়ায় ছ'মাস দিন, ছ'মাস রাত্রি। — "ব্রহ্মলোকের বছর এক দিন ও এক রাত্রি। ব্রহ্মলোক যেন এমনই অলৌকিক স্থান, এবং ব্রহ্মা এমন একজন দেবতা, তাঁর এক বছর এক দিন ও এক রাত্রি" *(পৃ: ১৩৮৩, ঐ)* — ব্রহ্মলোক সম্পর্কে যে আশ্চর্যময় কল্পনা প্রচারিত তা তিনি ভৌগোলিক অবস্থান ও দিনরাত্রির সময় নির্দেশ করে যুক্তিনির্ভর করে তুলেছেন। তিনি আরও বলেছেন — "আগস্ট-সেপ্টেম্বরে যাঁরা রাশিয়ার আধুনিক শহর লেলিনগ্রাডে যান, তাঁরা রাত্রের অন্ধকার দেখতে পান না। দরজা জানালার পর্দা টাঙিয়ে, ঘরে আলো জ্বেলে, রাত্রি তৈরি করতে হয়।" *(পৃ: ১৩৮৩, ঐ)*

কালকূট ইতিহাসের ধূলিকণা সরিয়ে জেনে নিয়েছেন যে, সেই মহাকালের কালবিন্দু গণনার সময়ের আগে থেকে ব্রহ্মা পারিষদদের নিয়ে জ্ঞানেরই চর্চা করছেন। কালকূট আরও কিছু জেনেছেন যে, ব্রহ্মা ছিলেন দীর্ঘজীবী। কুরুবর্ষের প্রধান ও পালক যিনি হতেন তিনি 'ব্রহ্মা' নামে পরিচিত হতেন। কতজন ব্রহ্মা রাজত্ব করেছেন এ তথ্য তিনি ইতিহাসের ধারক সূতগণের কাছে পাননি। ইতিহাসের সে-লগ্নে, যে মহারাণীর সন্ধানে চলেছেন, তাঁর ভিতটাকে শক্ত করার জন্য তিনি স্বর্গ আর দেবতাদের যে রাজত্ব ও রাজত্বের ইতিহাস পেয়েছেন তাকে আবার একটু নতুন করে দেখে নিতে চাইছেন।

স্বর্গলোকে সব মানুষ ও প্রাণীর যাতায়াত ছিল। কালকূটের মানসদৃষ্টিতে বেরিয়ে স্বর্গলোক দেখা; সেখানে অনেকগুলি পৃথক পৃথক রাজ্য ছিল, সেইসব রাজ্যের অধিপতিরা ছিলেন দেবতা জাতির। — "নামগুলো সবই বংশানুক্রমিক, বা যখনি যিনি নেতা হয়েছেন, তিনিই সেইসব ভিন্ন ভিন্ন উপাধি গ্রহণ করতেন। আর তাঁদের নামানুসারেই রাজ্যের নাম হতো, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, সূর্যলোক, যমলোক, চন্দ্রলোকা। বরুণ কি ছিলেন সমুদ্র তীরবর্তী রাজ্যের অধিপতি? সাগরতলবাসী জলদেবতা হলে, তাকে এই গ্রহের নিম্নভাগে দেখতে হয়।" *(পৃ: ১৩৮৪, ঐ)* ইতিহাসের ধূলির আবরণ সরিয়ে ব্রহ্মলোকের মতো সূর্যলোকে কতজন অধিপতি ছিল সে হদিশ লেখা কালকূট করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু তথ্যসূত্র ধরে তিনি অতীত পথে এগিয়ে গেছেন। সূর্যের সুয়োরানীর ছেলে মনু পেয়েছিলেন স্বর্গরাজ্যের একটি ভালো অংশ, আর দুয়োরানীর ছেলে যম পেয়েছিলেন স্বর্গের দক্ষিণ প্রান্তে একটি খারাপ স্থান— জলাভূমি; নরক সে রাজ্যের নাম। কালকূট এখানে রূপকথার সঙ্গে ইতিহাসের মিল খুঁজে পেয়েছেন। কালকূট দেখেছেন পুরাণে যমকে ধার্মিক ও সুশাসক বলা হয়েছে। তিনিই প্রথম অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রবর্তন করেছিলেন বলে নরকের অধিপতিমাত্রই 'মৃত্যুকারী' বলে পরিচিত হতেন। "কিন্তু আধুনিককালে একশ্রেণির মিথ্যুক যেমন নরকের পরিকল্পনা করেছে, যেখানে পরলোকগত জীবের পাপ-পুণ্যের দণ্ডদাতা রূপে যমকে দেখিয়েছে, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্য নেই। যম, এবং যমলোকের অধিপতি সকল যমেরই, মৃত্যু হয়েছে মানুষের মতো। যেহেতু তিনি মৃত্যুদণ্ডের প্রবর্তন করেছিলেন, সেই হেতু তাঁকে ঐভাবে কল্পনা করা হয়েছে।" *(পৃ: ১৩৮৪, ঐ)* কালকূট আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন,— নরক হল নিকৃষ্ট জলাভূমি। অতীতের অলৌকিক ও অবাস্তব ব্যাপারগুলোকে খণ্ডন করে তাকে যুক্তিনিষ্ঠ করে তুলতে চেয়েছেন।

পুরাণের ঐতিহাসিকদের অনুসরণ করে তিনি এই সত্যে উপনীত হয়েছেন যে, সাধারণ মানুষ, সে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব যে জাতিরই হোক, তাদের নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে চেতনা ছিল না, থাকলেও ধর্ম বিষয়ে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সেই কারণেই পুরাণ, বেদ ইত্যাদির

রচয়িতারা তাঁদের সব রচনাকে ধর্মগ্রন্থ বলে চিহ্নিত করতেন এবং রক্ষা করতে বলতেন। সাধারণ মানুষ যদি ধর্মগ্রন্থরূপে রোজ পূজা পাঠ না করতেন "তাহলে আমরা আমাদের প্রাচীন জন্মদাতা ও তাঁদের ইতিহাস হারিয়ে ফেলতাম।" *(পৃ: ১৩৮৪, ঐ)* পরবর্তীকালে অন্যান্য পণ্ডিতদের হাতে পড়ে পুরাণ সত্যিই অলৌকিক আর অবাস্তবতায় ঢেকে গিয়েছে ও প্রকৃত তথ্য বিকৃত হয়ে গেছে।

কালকূট পুরাণ-ইতিহাসের অলৌকিক ও অবাস্তব ব্যাপারগুলো থেকে সত্যকে খুঁজতে খুঁজতে পথ চলেছেন। তিনি দেখছেন, — স্বর্গলোক অত্যন্ত সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল এবং অধিবাসীরা দীর্ঘজীবী ছিলেন বলেই স্বর্গলোক 'অমৃতভূমি' ও দেবতারা অমর। তিনি বেদ থেকে এই তথ্য পেয়েছেন। আর ইতিহাসের পাতা থেকে ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ করেছেন। — "সুমেরু — অর্থাৎ আলটাই পর্বতের সানুদেশে 'দ্যাবা' বা মঙ্গোলিয়া, হিমালয়ের সানুদেশে 'ভূ'— অর্থাৎ পৃথিবী বা ভারতবর্ষ, মানুষের আদি জন্মভূমি। মঙ্গোলিয়া সমস্ত জীবের প্রথম জন্মভূমি। সেই কারণেই , প্রাচীনতর দেখছি মানবের কাছে, মঙ্গোলিয়া ছিল, 'পিতৃলোক' আর বৈদিক যুগের মানুষের কাছে ভারত ছিল 'ভূলোক'।" *(পৃ: ১৩৮৪, ঐ)*

যে রাণীকে দর্শন করতে কালকূট এত বিস্তর পুঁথি ঘাটছেন, সেই রাণীর কাছে ঠিক সময়ে পৌঁছানোর জন্য তিনি আরও একটু সময় নিচ্ছেন যাতে পথ চিনে নিতে তাঁর ভুল না হয়, রীতি-নীতি-ব্যবস্থা সব কিছু ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে সুদূর অতীতে চলেছেন। কী কারণে স্বর্গলোকের বাসিন্দারা ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তার যথার্থ ইতিহাস কোনটি? — কালকূটের মনে প্রশ্ন জেগেছে। এক জায়গায় আছে মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব বিমাতার অত্যাচারে রাজ্যচ্যুত হয়ে ব্রহ্মলোকে আশ্রয় নেন এবং বিষ্ণুর কৃপায় ধ্রুব ব্রহ্মলোকে একটি ছোট রাজ্য পান। কিন্তু সেই রাজ্যসহ সমগ্র ব্রহ্মলোক প্রবল তুষারপাত ও প্রলয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। ব্রহ্মলোকের দেবতারা সকলেই 'সূর্য' অর্থাৎ 'নর সূর্যের' উষ্ণ দেশে আশ্রয় নেন। সূর্যলোকও পরিপূর্ণ হয়ে গেলে তখন চন্দ্র অর্থাৎ 'নর চন্দ্রের' রাজ্যে আশ্রয় নেন। অনেকে ব্যক্ত করেছেন— প্রাকৃতিক দুর্যোগে সূর্যলোক, চন্দ্রলোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় দেবতারা দক্ষিণে সরে এসে ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইতিহাসের পাতায় এই তথ্যগুলো পেয়ে কালকূটের মনে প্রশ্ন জেগেছে, — "এটাই কি যথার্থ ইতিহাস?" *(পৃ: ১৩৮৪, ঐ)*

ইতিহাসের পাতায় যে তথ্য আছে তা অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ তথ্য দিয়ে কালকূট তাঁর বিশ্বাসকে প্রত্যয় করার চেষ্টা করেছেন। কালকূট পুরাণ পথে চলতে গিয়ে কালের অলৌকিকতাকে, অবাস্তবতাকে ভেঙে আধুনিক দৃষ্টিতে সত্যকে প্রকাশ করেছেন। — "যজ্ঞের শিরোরোগ সর্বদাই বিদ্যমান। ভানুর কুষ্ঠ, বরুণের জলোদর, পুষার দন্তবৈকল্য, ইন্দ্রের ভূতস্তম্ভন, চন্দ্রের প্রবল ক্ষয়রোগ, দক্ষ প্রজাপতির প্রবল জ্বর, এ সকলই দেবতাদের রোগ নির্দেশ।" *(পৃ: ১৩৮৫, ঐ)* দেবতাদের রোগের সংকেতগুলো

বুঝে নিয়ে কালকূট বলিষ্ঠ ভাষায় সতর্কতার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। কালকূট ইতিহাসের পথে যেতে যেতে দেখছেন —অতীত ও বর্তমানের যা কিছু কীর্তি রচিত হয়েছে তা মানুষ নামে জাতিরই কীর্তি, কেউ কেউ তাদের কাজের মধ্য দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন নানা উপাধিধারী দেবতা জাতির মানুষরা। "তাঁদের শৌর্য বীর্য যেমন ছিল, তেমনই ছিল, রোগ শোক মৃত্যু।" *(পৃ: ১৩৮৫, ঐ)* ইতিহাসের এইসব অধ্যায় মনে রেখে কালকূট এগিয়ে চলেছেন, কারণ যে অনন্যা অবিস্মরণীয়া রমণীর সন্ধানে তিনি চলেছেন তাঁকে দর্শন করতে গিয়ে কোনরকম আচ্ছন্নতা যেন তাঁর দৃষ্টিকে ঢেকে না দেয়। বহু প্রাচীনকালের মানবজাতির ইতিহাসের সামান্য ইতিহাস কালকূট পেয়েছেন, তা থেকে তাঁর সন্ধানী মন মরণশীল দেবতাদের দেখা পেয়েছেন। "নিখিল ভূমণ্ডলস্থ শুভাশুভ সমুদয় পদার্থ, কাল হতে সৃষ্টি হচ্ছে। আবার কালেতেই লোকসকল লয়প্রাপ্ত হচ্ছে এবং আবার কাল হতেই উৎপন্ন হচ্ছে। সমগ্র জীব নিদ্রিত হলেও কাল জাগরিত থাকেন। কালকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। কাল অপ্রতিহত রূপে সর্বভূতেই সমভাবে বিরাজ করছেন। বর্তমান ভূত, ভবিষ্যৎ, সকল বস্তুই কাল নির্মিত।" *(পৃ: ১৩৮৫, ঐ)*

যে অবিস্মরণীয় রমণীকে এ'কালের দৃষ্টিতে বিশদভাবে বুঝবার জন্য কালকূট তাঁর যাত্রাপথকে আরও প্রাচীনতর যুগে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, সেই প্রাচীনতর যুগ থেকে পরিক্রমা করতে করতে সংহিতা যুগের দিকে এগিয়ে এলেন।

সংহিতা যুগে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সেকালের সামাজিক রীতিনীতিকে। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দূরদৃষ্টিকে তিনি এ'কালের দৃষ্টিতে পরখ করেছেন। কালকূটকে অনুসরণ করে এ'কথা বলা যেতেই পারে— সংহিতা যুগের বুদ্ধিজীবীরা একটি জিনিস ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে রিপু দমন নারী ও পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তারা নিয়ম করেছিলেন যে, সমস্ত রকমের দৈহিক মিলনে উৎপাদিত সন্তানদের বৈধতা দেওয়া হবে। আর এই বৈধতা দানের জন্যই দ্বাদশ রকমের সন্তান জন্ম, আট রকমের বিবাহ পদ্ধতিকে সমাজে স্থান দেওয়া হয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পন্থাও গ্রহণ করা হয়েছিল। যেমন, "স্বামী অথবা নিকট সম্পর্কের আত্মীয়-আত্মীয়ার নির্দেশে, অনুবর্তন হলো ক্ষেত্রজ সন্তানের। মহাভারতের আদি খণ্ডে দেখছি, স্বায়ম্ভব মনু নির্দেশ করছেন, মানুষেরা নিজের বীর্য ভিন্ন, অন্যের কাছ থেকেও ধর্মফলদায়ক শ্রেষ্ঠ সন্তান লাভ করতে পারে। কোনো ব্যক্তি কোনো কন্যাকে বিয়ে করার জন্য শুল্ক দিয়ে অনেকদিনের জন্য বিদেশে চলে গেলে, সেই কন্যা শুল্কদাতার উপকার করার জন্যেই, অন্য পুরুষের দ্বারা গর্ভধারণ করে, সন্তানের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু তার জন্যে সেই কন্যাকে কেউ বিবাহ করতে পারবেন না। একমাত্র কন্যার পিতা যদি আগের বরপক্ষকে শুল্ক ফিরিয়ে দেন, তবে কন্যাকে অন্য পাত্রে বিবাহ দিতে পারেন (মহাভারত অনু)।" *(পৃ: ১৩৮৫, ঐ)*

কালকূট সংহিতা যুগে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সমাজে স্বীকৃত বিবাহের নিয়ম সম্বন্ধে মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব থেকে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তিনি 'ভারত' গ্রন্থ দেখেছেন, সে সময় স্বামীর অবর্তমানে দেবরকে পতিত্বে বরণ করা যেত। এমনকি অতিথির মনোরঞ্জনের জন্য গৃহস্বামিনী আত্মসমর্পণ করলেও সেটাকে দোষের বলে মনে করা হত না। আর কোনো রমণী ঋতু রক্ষার্থে কোন পুরুষকে অনুরোধ করলে যদি সেই পুরুষ তার ঋতু রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, তবে সেই পুরুষই ভ্রূণ হত্যার দায়ে পাতক হত। কালকূট যত মহাভারতের পাতা উল্টেছেন ততই বিবাহের নিয়ম-রীতিগুলো সম্বন্ধে পরিচিত হচ্ছেন, ততই তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরে উঠছে। যে মহারাণীর কাছে পৌঁছানোর জন্য তাঁর রহস্যে আবৃত জীবনপঞ্জী দেখছেন, ততই রহস্যগুলো উন্মোচিত করার জন্য দিশা খুঁজে পাচ্ছেন। তিনি দেখছেন যে সংহিতা যুগে রমণীরা অনাবৃত ছিল। পুরুষদের মতই তাদের অবাধ যৌন স্বাধীনতা ছিল।

নারীদের অবাধ যৌন স্বাধীনতা থাকলেও কালকূট লক্ষ্য করেছেন যে তার মধ্যেও বেদবিৎ মহাত্মাদের একটি সূক্ষ্ম, পরিশীলিত সতর্কবার্তা ছিল। "ঋতুস্নান থেকে ষোল দিনের মধ্যে স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সংসর্গ করলে অধর্ম হয়। ষোল দিন পরে সংসর্গ করলে কোনো অধর্ম হয় না। এর সঙ্গে যেন নারী দেহে সন্তানোৎপাদনের একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে।" *(পৃ: ১৩৮৬, ঐ)* কালকূট যেহেতু এ'কাল থেকে সংহিতা যুগে গিয়েছেন, সেইহেতু তিনি এ'কালের দৃষ্টিতেই বেদবিৎ মহাত্মাদের নিষেধ বাণীর গূঢ় অর্থটি ধরার চেষ্টা করেছেন। সাধারণত ঋতু স্নানের বাহাত্তর ঘণ্টারও সামান্য বেশি সময়ে নারীদেহের জরায়ুতে আবির্ভূত ডিম্বানুটি বেঁচে থাকে। সেই সময়ে স্বামী সংসর্গ ঘটলে নারী সন্তান সম্ভবা হয়। এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানটুকু বেদবিৎ মহাত্মাদের ছিল এটা জানতে পেরে কালকূট বিস্মিত। তিনি বলছেন, — "এখানে দেখছি বেদবিৎ মহাপুরুষেরা ঋতুস্নান থেকে ষোল দিন পর্যন্ত, অন্য পুরুষের সংসর্গ নিষেধ করেছেন। যার একটিই মাত্র যুক্তি থাকতে পারে, অন্য পুরুষে সংসর্গ সম্ভব, কিন্তু অন্য পুরুষের সন্তান ধারণ নিষিদ্ধ।" *(পৃ: ১৩৮৬, ঐ)* কালকূট 'ভারত' গ্রন্থে অতীতের বিষয় আরো দেখেছেন, রমণীগণ ইচ্ছামত গমন ও বিহার করতে পারত। যেমন, "কোনো কন্যা কুমারী অবস্থায় পুত্রবতী হলে, পুত্রসহ-ই তার বিবাহের ব্যবস্থা বিধিসম্মত করা হয়, এবং বিবাহিত স্বামীকেই সেই পুত্রকে নিজের ঔরসজাত পুত্রের মতোই লালন পালন অবশ্য কর্তব্য। এটি হলো আসলে কানীনপুত্রকে মেনে নেওয়ারই একটি নির্দেশ। মহা ইতিবৃত্ত, মহাভারতের বনপর্বের পাতা খুলে দেখছি, বেদের উল্লেখ করে, স্পষ্টই বলা হয়েছে, অবিবাহিতা রমণীগণ, যাকে ইচ্ছা তাকেই কামনা করতে পারে বলেই তাদের, 'কন্যা' বলা হয়। 'কন্যা' হচ্ছে স্বতন্ত্রা। পরতন্ত্রা নয়। স্বেচ্ছানুসারে কাজ করাটাই স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। আর বিবাহাদি নিয়মগুলো, মানুষের শুধু কল্পনা মাত্র। আমি যে-রমণীর সন্ধানে চলেছি, তাঁর সম্পর্কে এখানে

একট বিশেষ সংকেত পেলাম।" *(পৃ: ১৩৮৫, ঐ)*

কালকূট মনভ্রমণে বেরিয়ে সংহিতা যুগে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখলেন। সেখানে গিয়ে তিনি জানলেন, দৈহিক শুচিতা সম্পর্কে কোনো গুরুত্ব আরোপ করা হত না, সংহিতা যুগের এটাই বৈশিষ্ট্য। সে যুগে নরনারীর কর্তব্য বলতে বোঝাত, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান, তপ, সত্য, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, শৌর্য, বীর্য, ত্যাগ ইত্যাদি কিন্তু দৈহিক শুচিতার কথা বিশেষভাবে কিছুই নির্দিষ্ট করা ছিল না। কালকূটের চোখে পাতিব্রত্য গুণটি ধরা পড়েছে এইভাবে যে "পাতিব্রত্যকে যদি সতীত্ব জ্ঞান করি, তাহলে নারীর বিবিধ গুণের মধ্যে এটি হলো দ্বাদশ গুণ।" *(পৃ: ১৩৮৬, ঐ)*

কালের প্রভাবে সমাজের প্রয়োজনে সমাজের রীতি-নীতি বদলে যায়। তাই ধীরে ধীরে সর্বজনভোগ্য নারীরা ক্রমশ গৃহস্বামীর ভোগ্যারূপে রূপান্তরিত হতে লাগল। এটিও কালকূটের নজর এড়িয়ে গেল না। কালকূট মহাভারতের উদ্যোগপর্বে দেখছেন, "কামশূন্য জীব কখনও জন্মায়নি, জন্মাবে না। এমনকি, জীবন্মুক্ত মহাত্মারাও কামার্ত হলে, প্রতিনিবৃত্তি হয় না।" *(পৃ: ১৩৮৬, ঐ)*— এই বিবৃতিটি দেওয়া আছে। কালকূট মহাভারতের পাতা ওলটাতে ওলটাতে পৌঁছে গেলেন সেইস্থানে, যেখানে ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত। কৃষ্ণকে দেখে কালকূট যেন ভীষ্মকে স্তব করতে শুনলেন— "যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুদয় কামময়, যিনি সমস্ত জীবকে কামমদে উন্মত্ত করে থাকেন, সেই কামাত্মাকে নমস্কার।" *(পৃ: ১৩৮৬, ঐ)* কালকূট দেখেছেন — মনুকে নিয়ে আমাদের সমাজে নানা নিষেধ আছে, কালকূট দেখেছেন মনুও বলেছেন যে, মাংস ভোজন, মদ্য পান, স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গে দোষ নেই।

ইতিবৃত্তের পথে হাঁটতে গিয়ে আবার ফিরে এসে কালকূট আধুনিককালের জ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁদের নির্দেশিত পথে চলতে গিয়ে দেখলেন যে, একমাত্র প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজেই নারী-পুরুষের অবাধ যৌন স্বাধীনতা ছিল। "রাহুল সাংস্কৃত্যয়নের, 'ভোল্‌গা থেকে গঙ্গায়' মাতৃতান্ত্রিক সমাজের চিত্র দেখেছি। দেখেছি কারোরই পিতৃপরিচয় ছিল না। মাতৃপরিচয়ও গ্রাহ্য ছিল না। অতএব মা ও কন্যা, একটি পুরুষের সংসর্গ লাভের জন্য, পরস্পর লড়াই করে, একজন, আর একজনকে হত্যা করে, সেই পুরুষকে লাভ করছে। সংহিতা যুগ বলে যে সময়কে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা আদি মাতৃতান্ত্রিক সমাজের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়।" *(পৃ: ১৩৮৬, ঐ)* কিন্তু এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষরা যখন দৈহিক বলে বলীয়ান হয়ে সম্পদের অধিকারী হল, সংঘাত বাঁধল তখনই। রমণীরা তাদের সন্তানদের জন্য সব সম্পদ দাবী করলে পুরুষ জানতে চেয়েছিল "কে তোমার সন্তানের জন্মদাতা? তুমি তো স্বেচ্ছাবিহারিণী। তোমার সন্তানের জন্য আমার সম্পদ দাবী করতে হলে, তোমাকে কেবল আমারই অঙ্কশায়িনী হতে হবে।" *(পৃ: ১৩৮৬, ঐ)*

স্বেচ্ছাবিহারিণীরা পুরুষের স্ত্রীরূপে বন্দি হল। সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রমাণ করবার জন্য বিবাহ প্রথার প্রচলন হল— মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তিত হতে বহুকাল লেগেছিল। এই বিবাহপ্রথার মধ্যে কালকূট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও খুঁজে পেয়েছেন।

আবার কালকূট সংহিতা যুগেই ফিরে এলেন। পৃথার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে সেই সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এ'কালের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করার জন্য আধুনিক মনের মানুষ কালকূট পৃথার জন্মকালের থেকে বহু প্রাচীনকালে গিয়ে মনের অনুপ্রবেশ ঘটালেন। তিনি যুক্তি দিয়ে সমস্ত ঘটনাকে বুঝতে চেয়েছেন।

সংহিতা যুগে দেখা যাচ্ছে নারী-পুরুষের অবাধ যৌন স্বাধীনতা একটা সময়কাল পর্যন্ত সেই স্বাধীনতায় স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সমভাব ছিল।

ধীরে ধীরে সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে ও পুরুষ নারী অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায় নারীর যৌন স্বাধীনতাকে 'দৈহিক শুচিতা'র আবরণে ঢেকে দেওয়ার জন্য রীতি-নীতি তৈরি করা হল। এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন উদ্দালক ঋষির ক্ষেত্রজ পুত্র শ্বেতকেতু। তিনি নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে, যে রমণী ভর্তাকে অতিক্রম করে ব্যাভিচারিণী হবে তার ঘোর দুঃখদায়ক ভ্রূণহত্যা সদৃশ পাপ এবং যে পুরুষ কৌমার ব্রহ্মচারিণী পতিব্রতা ভার্যাকে পরস্ত্রীরূপে সম্ভোগ করবে তারও সেই পাপই হবে এবং যে পত্নী স্বামীর দ্বারা পুত্র লাভে দায়ভাগিনী হয়ে স্বামীর অবাধ্য হবে তারও সেই পাপই হবে। শ্বেতকেতু পক্ষপাত শূন্য অনুশাসন করেছিলেন কিন্তু পুরুষরা নিয়ম মানত না। এই নিয়মকেই আরও পরিবর্তিত করলেন দেবগুরু বৃহস্পতির ভ্রাতুষ্পুত্র উতথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা। তিনি নিয়ম বেঁধে দিলেন নারীকে যাবজ্জীবন কেবলমাত্র স্বামীর অধীন হয়ে থাকতে হবে, পুরুষান্তরে গেলে তাকে পতিত হতে হবে। পতিহীনা নারীদের সম্পত্তি ভোগের অধিকার থাকবে না, ভোগ করলে অকীর্তি হবে। যতদিন যাচ্ছে ততই দেখা যাচ্ছে যে সমাজে অবারিতাদের অর্থাৎ নারীদের নিয়মের বেড়াজালে অন্তরীণ করা হচ্ছে এবং গড়ে উঠছে 'সমাজব্যস্থা'। আর এর সামাজিক নিয়মের মধ্য দিয়ে সংহিতা যুগ অতিক্রম করে পৌরাণিক যুগের শুরু হয়েছিল। প্রায় একশ বছর তো লেগেছিলই; হিসেব মত সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এর থেকেও বেশি সময় লেগেছিল। আর পুরাণের কালে দৈহিক শুচিতাই যেন ক্রমে ক্রমে চরিত্রের সংজ্ঞা হয়ে উঠতে লাগল। কালকূট সংহিতা যুগ থেকে পুরাণের যুগ শুরু হওয়ার স্তরে পৌঁছে গেছেন। এখানে এসে তিনি একটু সংশয়ে পড়েছেন— 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' কোন্ সময়ে রচনা হয়েছিল— "ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় একটি নির্দিষ্ট সূত্র সন্ধানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রামায়ণ, মহাভারত এ দুটিই কি ইতিহাস? অথবা রামায়ণ কাব্য মাত্র? আমি ইতিহাসের যে পথ পরিক্রমায় যাত্রা করেছি, দেখেছি রামায়ণও ভারতের ইতিবৃত্তের মধ্যেই গণ্য হয় এবং রামায়ণ-মহাভারত একাধারে

মহাকাব্য ও ভারতের ইতিবৃত্তও বটে।" *(পৃ: ১৩৮৭, ঐ)*

এরপরেই কালকূটের মনে মনে জিজ্ঞাসার উদয় হয় যে, রামায়ণ মহাভারতের রচনাকালের সঙ্গে, সংহিতা যুগের ব্যবধান কতটা? "ইতিহাসের পাতায়, ধুলাস্তর সরিয়ে, আমি দ্বাপর ও পুরাণের কালের যে ঐতিহাসিক সময়ের সন্ধান পাচ্ছি, সংহিতা যুগের সন্ধান সেখানে পাচ্ছি না।" *(পৃ: ১৩৮৭, ঐ)* লেখক কালকূট আরও বলেছেন যে 'মহাভারত যেমন পুরাণ এবং একইসঙ্গে পঞ্চম বেদ বলে অভিহিত হয়, আমার ইতিহাস পরিক্রমা সেই মহাভারত রচনারও পূর্বে।" *(পৃ: ১৩৮৭, ঐ)* বাংলা সংসদ অভিধানে 'যুগ'-এর অর্থ বলতে কালকূট বুঝেছেন যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি — এই চার যুগই পৌরাণিক কাল হিসাবে চিহ্নিত। কিন্তু সংহিতা যুগ বলে কোনো নির্দিষ্ট যুগকে নির্দিষ্ট করা হয় নি। পণ্ডিতেরা সংহিতা আর পৌরাণিককালকে আলাদা করে দেখিয়েছেন। কারণ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, সংহিতা যুগেরও পরের কাল। সংহিতা যুগ থেকে পৌরাণিক যুগে পদচারণা করতে গিয়ে কালকূট সত্য যুগের মানবী, সীতাকে দেখেছেন। কালকূট নিজেই বলেছেন, সত্যযুগ ছাড়া সীতার মত সতীর আবির্ভাব অসম্ভব ছিল। আবার পঞ্চকন্যার এক কন্যা হলেন পৃথা, এই পৃথার সময়েই কালকূটের যাত্রা। গৌতম পত্নী অহল্যার ঘটনা পৃথার আগে, অহল্যার ঘটনা ঘটেছিল রামায়ণের যুগে। আর এককন্যা হলেন মন্দোদরী। তিনিও রামায়ণের যুগেরই মহিলা। তিনি বলেছেন "পৌরাণিক কালকে এই ভারতের মানুষ নামক জাতির, কাল বিভাগকেই বলা হয়। স্বর্গবাসী দেবতা জাতির সেরকম কোনো ইতিবৃত্ত আমরা পাই না।" *(পৃ: ১৩৮৯, ঐ)*

পঞ্চকন্যার আর এক কন্যা হলেন তারা। ইনি স্বর্গরাজ্য বাসিনী সুরগুরু বৃহস্পতির অতি সুন্দরী পত্নী। কোনো এক স্বর্গরাজ্যের অধিপতি, রাজপদবীতে তিনি চন্দ্র নামে অভিহিত, তিনি সুন্দরী তারাকে রথে তুলে বলাৎকার করেছিলেন। ফলে সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। তারা সকল মূল্যবোধের ওপরে স্থান দিয়ে এই সত্য প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর পুত্রটির জন্ম হয়েছে চন্দ্রের ঔরসে।

সময়ের কোনো নির্দেশ না থাকলেও কালকূট এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন যে — স্বর্গেও যে নারীর দেহ শুচিতা বিষয়টি ছিল। পৌরাণিক কালে, সত্য যুগে রামায়ণে সীতাকে দেহ শুচিতার প্রশ্ন ওঠায় অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। তারার যুগও কালকূট বের করতে পারেন নি। কিন্তু কুন্তী ও দ্রৌপদী মহাভারতের যুগের। — "আমার যাত্রা কুন্তীর জন্মলগ্নে অর্থাৎ পৃথার। পৃথার জীবনে এমনসব ঘটনা ঘটেছে, সেইসব ঘটনার সঙ্গে যুগ ও কালের মহিমা একান্তভাবে যুক্ত। সেইসঙ্গেই সকলপ্রকার অলৌকিক অবাস্তবকে প্রক্ষিপ্ত আবর্জনার ন্যায় ত্যাগ করা বিধেয় বলে মনে করি।" *(পৃ: ১৩৮৯, ঐ)*

ইতিবৃত্তের পথে কালকূট পৌরাণিক কালে যদুবংশের রাজা শূর সেনের রাজ্যে যাত্রা করেছেন তাঁর কন্যা পৃথাকে দর্শন করার জন্য। কালের পুথিতে ধূলার আস্তরণ সরিয়ে কালকূট কখনো পথের হদিশ পেয়ে যথার্থ পথেই চলেছেন, আবার কখনো বিভ্রান্ত হচ্ছেন; তবুও পৌঁছতে চান পৃথার কাছে। পৃথা যে যুগে জন্মেছেন, সেটা দ্বাপর যুগ। এ বিষয়ে কালকূটের কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি হিসাব পাচ্ছেন না। ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় কালকূট সন্ধান করেছেন এক একটি কালের আয়ু কত বৎসর? ইতিহাসের পাতার ধূলা সরিয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়কাল হিসাব করেছেন। তিনি দেখেছেন যে, দ্বাপর ও কলিযুগের মধ্যবর্তী একশো বৎসরের অনধিক সময়ের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল— "সংখ্যাহনাদেশে শতম্।" *(পৃ: ১৩৮৮, ঐ)* সেই হিসাবে দ্বাপর ও কলির অন্তরকাল বলে ধরা যেতে পারে। "সেই কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সময় থেকে আজ পর্যন্ত ভারতে একটা কথা প্রচলিত আছে দ্বাপরের শেষে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়েছিল।" *(পৃ: ১৩৮৮, ঐ)* এই যুদ্ধের অনেক আগেই পৃথার জন্ম হয়েছিল। যদুবংশের রাজা শূর সেনের রাজ্য মথুরায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় কৃষ্ণের বয়স ছিল ৬৯, ভীম ও অর্জুনের বয়স ৭১ ও ৭০। আর যুধিষ্ঠিরের বয়স ছিল ৭২।

তা যদি হয়, তাহলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়কাল ধরে এগোলেই কলি যুগের সময় বের করা যাবে। অতএব, কৃষ্ণের জীবিত কাল পর্যন্ত পাপ প্রবর্তক কলির প্রবেশ ঘটে নি। অতএব কালকূটের অতীত পরিক্রমায় কৃষ্ণও চলে এলেন। কৃষ্ণ ছিলেন সেই সময়ে 'ধর্ম প্রবর্তক'। ধর্ম প্রবর্তক সম্বন্ধে কালকূট প্রচলিত বিশ্বাস থেকে সরে এসে বললেন— "ধর্ম প্রবর্তক বলতে বোঝায়, প্রকৃত নীতিধর্মের প্রচারক। কৃষ্ণ সেই অর্থে, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, কূটনীতি সমস্ত বিষয়েই ছিলেন অতি প্রতিভাধর, দূরদর্শী ব্যক্তি। তাঁর সময়ে, তাঁর মতো যে কোনো বিষয়ে, নীতি নির্ধারক আর কেউ ছিলেন না। যদুবংশকে রক্ষা থেকে, পাণ্ডবদের যথাযোগ্য পরিচয় ও উত্থানের নেতৃত্ব, জরাসন্ধ বধ, প্রাগজ্যোতিষপুর জয়, বহু বিষয়েই তিনি এমন সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার জনক, সাধারণ মানুষ তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবানরূপে পুজো করেছে। তার থেকে যারা বয়সে অনেক বড় ছিলেন, ভীষ্ম, বেদব্যাস, ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী, গান্ধারী সকলেই তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ প্রার্থনা করতেন।" *(পৃ: ১৩৮৮, ঐ)*

এই কৃষ্ণের জন্মকাল নিয়েও লেখক কালকূট হিসাব মেলাতে পারছেন না। ইতিহাসের পরিক্রমায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে পৌঁছে সময়কাল হিসাব করলেন— অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীর দিন, ভরণী নক্ষত্রে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। আর শেষ হয়েছিল পরবর্তী অমাবস্যাতে। পরের দিন ছিল পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ, সেইদিনই যুধিষ্ঠির রাজা হয়েছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরাব্দের শুরুও সেইদিন থেকেই। সেই পৌষ মাসের শুক্ল প্রতিপদ থেকে

পঁয়তাল্লিশ দিন পরে, মাঘী পূর্ণিমার দিন থেকে কলিযুগ অর্থাৎ কল্যব্দের শুরু। কালকূট ইতিহাসের পাতা থেকে দেখছেন, ''কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর যখন অতীত হয়েছিল, তখন শকাব্দ আরম্ভ হয়েছিল। শকাব্দের হিসাবটা আমরা জানি। এখন এই ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে, শকাব্দ হল ১৯০৭। তাহলে, কলি — অর্থাৎ কল্যব্দের ৩১৭৯ এর ১৯০৭ যোগ করলে দাঁড়ায় ৫০৮৬ কল্যব্দ। তার অর্থ, পাঁচ হাজার ছিয়াশি বছর আগে কলিযুগের শুরু হয়েছিল। বর্তমান সময়কেও কলিযুগই বলা হয়।'' *(পৃ: ১৩৮৮, ঐ)*

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষদিন থেকে পঁয়তাল্লিশ দিনে, মাঘী পূর্ণিমায় কলি প্রবেশ করেছিল। তার ছত্রিশ বছর পরে যদি কৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ হয়। প্রচলিত বিশ্বাস, প্রবাদ, জনশ্রুতি, অবাস্তব, অলৌকিকতা সবকিছু দিয়ে পুরাণ-ইতিহাস-মহাকাব্যের মূল ঘটনাবলীর বিশেষ অংশকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কিছু সংকেত দেওয়া হয়েছে; সেই সংকেতের সূত্র ধরে কালকূট মূল ঘটনাবলী তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ তথ্য দিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি 'এক ঐতিহাসিক মহারাণীর' জন্মের সময়ে যেতে চাইছেন। সেই রানী অর্থাৎ পৃথার জীবন নানা অলৌকিকতায় পূর্ণ। তিনি সেইসব অলৌকিকতা, সংকেত খুঁজতে এত পথ পরিক্রমা করে এলেন। এত বিচিত্রতাপূর্ণ জীবনের যথার্থ মূল্যায়ন করতে হলে ''সামাজিক মূল্যায়ন ব্যতীত পৃথা, তথা কুন্তীর জীবনের সমস্ত ঘটনাকে যুক্তি দিয়ে বোঝা সম্ভব না।'' *(পৃ: ১৩৮৮, ঐ)*

কালকূটের ইতিহাস পরিক্রমা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরও আগে, কারণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এক পক্ষের নায়করা হলেন পঞ্চ পাণ্ডব, তাদেরও জন্মের আগে কালকূটকে বিচরণ করতে হবে। ''আর সেই পৃথা নাম্নী কন্যার উদ্দেশ্যেই' আমি চলেছি।'' *(পৃ: ১৩৮৭, ঐ)*

কতকালের ধুলোপড়া পুথির পাতার পর পাতা উলটিয়ে পথ নির্দেশ খুঁজে নিচ্ছেন, যাতে যথাসময়ে যথাস্থানে তিনি পৃথাকে দেখতে পান, তাঁর কাছে পৌঁছতে পারেন। আর একালের দৃষ্টি দিয়ে তাঁর সামাজিক মূল্যায়ন করতে চান। কালকূট মহাভারত রচনার কাল ও সময় নির্দেশ করে বিভ্রান্তি দূর করেছেন। মহাভারতের আদিপর্বে ৫৮ সংখ্যক শ্লোক থেকে — ''ধৃতরাষ্ট্র, পান্ডু, বিদুর জন্মে, বৃদ্ধ হয়ে স্বর্গবাস করলে, মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করেছিলেন। ইতিহাসের এক পর্বে দেখছি স্পষ্টই উল্লেখ করা হয়েছে পরীক্ষিতের মৃত্যুরপরে, জন্মেজয়ের সর্প সত্রের পর্বে, প্রকৃত মহাভারত রচিত হয়েছিল।'' *(পৃ: ১৩৮৯, ঐ)* কালকূট নিজের বিশ্বাসকে যুক্তিনিষ্ঠ করার জন্য ঐতিহাসিকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তিনি কালকূটের সামনে বিষয়টি প্রচারে তুলে ধরেছেন— ''৬১ কল্যব্দে বেদব্যাস মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন এবং তিন বছরে তা শেষ করেন।'' *(পৃ: ১৩৮৯, ঐ)*

কালকূট মনভ্রমণে দ্বাপরে শান্তনু ও সত্যবতীর কাছে উপস্থিত; দেখলেন, মহারাজ শান্তনু সত্যবতীর রূপে মুগ্ধ ও তিনি সত্যবতীর পাণি প্রার্থী। সত্যবতী মহারাজকে বিয়ে করার জন্য

একটি শর্ত দিয়েছিলেন। —"ভীষ্ম বা তাঁর পুত্র বা তাঁর বংশধর কেউ শান্তনুর সিংহাসনের দাবীদার হতে পারবেন না।" *(পৃ: ১৩৮৯, ঐ)* ভীষ্ম জানতে পেরেছিলেন পিতার এই মনোবেদনা। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি নিজে যেমন রাজ্যের দাবী করবেন না, তেমনি বিবাহও করবেন না। কিন্তু ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস। কালকূট দেখেছেন— সত্যবতীর পুত্র বিচিত্রবীর্য অল্পবয়সেই ক্ষয়রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হলে। বংশরক্ষার কারণেই সত্যবতী পুত্র ভীষ্মকে অনুরোধ করেছেন বিচিত্রবীর্যের দুই বিধবা পত্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভীষ্ম রাজি না হওয়াতে সত্যবতী তখন নিজ কানীনপুত্র বেদব্যাসকে ডেকে এনে তাঁর দুই বিধবা পুত্রবধূর গর্ভে পুত্র উৎপাদনের জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। বেদব্যাস মাতৃআজ্ঞায় তাঁরই ঔরসে বিধবা ভ্রাতৃবধূর গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডু জন্মালেন। মহাভারতের অতি পরিচিত প্রসঙ্গ কালকূট মনভ্রমণে প্রত্যক্ষ করলেন। কালকূট লক্ষ্য করেছেন সত্যবতী ও ভীষ্মের বাক্যালাপের মধ্য দিয়ে দু'জনের অন্তরলোককে। — "বেদব্যাসের জন্মরহস্যের কথা, ভীষ্ম সত্যবতীর কাছ থেকে শুনেছিলেন; শুনেও তিনি সেই কানীনপুত্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। এতে প্রমাণ হয়, ভীষ্ম কানীনপুত্রের প্রতি কোনোরকম ঘৃণার ভাব প্রকাশ করেন নি।" *(পৃ: ১৩৯০, ঐ)* এরকম একটা সম্পর্ক দ্বাপর যুগেই সম্ভব বলে মনে হল কালকূটের। সে সময় 'কানীনপুত্র' নিন্দনীয় ছিল না।

ভীষ্ম যখন ব্যাসদেবের কথা শুনেছিলেন ও তাঁকে দেখেছিলেন, সেইসময় ভীষ্ম যৌবনের প্রান্তে এসে পৌঁছেছিলেন। এরপরে ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডুর সন্তানেরা বড় হয়ে কুরু ও পাণ্ডব নামে বিভক্ত হয়েছিলেন। অবশেষে তারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অতএব ইতিহাসের অনিবার্য গতিতে প্রায় একশ বছর সময়কাল-সমাজ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছিল।

কালকূটকে অনুসরণ করে দ্বাপর যুগের সমাজব্যবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আবার এই ভীষ্মই পরিবর্তিত যখন কর্ণ উপস্থিত ভীষ্মের শরশয্যার কাছে। ভীষ্ম কানীনপুত্র কর্ণকে অত্যন্ত অবজ্ঞাসূচক উক্তি করছেন "ধর্মলোপে জন্ম।" এখন তাহলে কানীনপুত্র সম্পর্কে এইরকম উক্তির কারণ খুঁজেছেন। কালকূট বলছেন, "তবে কি, একশো বছরের মধ্যেই, কানীনপুত্র সম্পর্কে সমাজে নতুন চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল? সমাজ পরিবর্তনের ঘটনাটি যদি এই সময়ের মধ্যে ঘটে থাকে, তবে সংহিতা ও পৌরাণিককালের সন্ধিস্থলের প্রসঙ্গ আসবে কেন? দ্বাপরের আগে, সত্য ও ত্রেতা অতিক্রম করেছিল। আর বস্তুতপক্ষে যা দেখছি, মহাভারতের রচনাকাল তো কলিযুগে। তখন দ্বাপরও অতিক্রান্ত।" *(পৃ: ১৩৯০, ঐ)*

পণ্ডিতদের বিভিন্ন মত অনুসরণ করতে গিয়ে কালকূট আবার বিভ্রান্ত। মহাভারতের দ্রোণ পর্ব, ৪৭ অধ্যায়, অনুসরণ করে এক ইতিহাসবেত্তা হিসাব করেছেন, রামের তেত্রিশ পুরুষ পরে তাঁর বংশধর বৃহদ্বলকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যু বধ করেছিলেন। আবার আর এক সূত্রে

কালকূট দেখছেন,— গৌতমপুত্র শতানন্দ, জনক রাজার কুলপুরোহিত, যিনি রামের বিয়েতে পৌরহিত্য করেছিলেন। শতানন্দের যমজ পৌত্র পৌত্রী হল কৃপ ও কৃপী। কৃপীর সঙ্গে গুরু দ্রোণাচার্যের বিয়ে হয়। সেই রামের বিবাহ থেকে দ্রোণাচার্য পর্যন্ত দীর্ঘ তালিকাতে কালকূট বারে বারে পথভ্রষ্ট হচ্ছেন।

কালকূট সময় ও কাল সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করে বলেছেন— সংহিতা যুগে বা আধুনিক ইতিহাসের নৃতাত্ত্বিক বিচারে মাতৃতান্ত্রিক যুগে নারী যেরকম মুক্ত স্বাধীন ছিল, পরবর্তীকালে অর্থাৎ পৌরাণিক যুগে এ ব্যাপারটি কলঙ্কিত বলে গণ্য হত। সীতাকে পর্যন্ত পাতালে প্রবেশ করতে হয়েছিল 'সতীত্ব' প্রমাণের জন্য। সংহিতা যুগের নিয়মকানুন দ্বাপর যুগেও কিছু কিছু অবশিষ্ট ছিল। নারীর যৌনাচার পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নিন্দনীয় হলেও সমাজে তখনও 'ক্ষেত্রজ পুত্র'-এর প্রচলন ছিল। কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধের পরে, কুন্তীর ক্ষেত্রজ সন্তান জন্মানোর পরে আর কোন ক্ষেত্রজ পুত্রের সন্ধান পাননি। বরং কালকূট এই সত্যটুকু আহরণ করেছেন যে,— কালকূট সেই বাক্যালাপ পেয়ে গেছেন। কিন্তু কুন্তী প্রথমে নিজ পতি পাণ্ডুর অনুরোধে ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্ম দিতে রাজি হননি। পাণ্ডু কুন্তীকে রাজি করানোর জন্য বলছেন যে— "সমাজে এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং এ ব্যবস্থাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হত। অতএব, কুন্তীর এ বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকা উচিত নয়।" *(পৃ: ১৩৯১, ঐ)* পাণ্ডুর এ যুক্তিও কালকূটের বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। কালকূট ভাবছেন যে পাণ্ডু নিজেই বিধবা মায়ের গর্ভে, কানীনপুত্র বেদব্যাসের ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন। অতীতের সমাজের কথা না বলে কুন্তীকে তিনি নিজের ক্ষেত্রজ পরিচয়ের কথা কেন বলেন নি।

কুন্তী একটি কানীনপুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। কালকূট তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গে বলছেন— "ইতিহাসের অত্যন্ত বিখ্যাত চরিত্র, মহাবীর কর্ণ তাঁর নাম। সেই ইতিহাসের কাহিনীতে আমি গমন করব।" *(পৃ: ১৩৯১, ঐ)* কিন্তু কর্ণের পরে কোন কানীনপুত্রের সন্ধান কালকূট পাননি। পৃথা যে সময়ে কানীনপুত্র ও ক্ষেত্রজ পুত্রদের জন্ম দিয়েছিলেন, সেই সময়ে এইসব ঘটনা সমাজ বহির্ভূত কাজ বলে গণ্য হতে শুরু করেছিল; আর সেইজন্যই পৃথার সন্তান জন্মের ঘটনাগুলোকে অলৌকিকতায় ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তাই মানব-মন সন্ধানী কালকূট বলেছেন, — "কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রেই কোনো অলৌকিকতা ছিল না। সেইসব সবিস্তারে বিচারের পর, পৃথার সম্মানে আমি প্রথম যাব মথুরায়।" *(পৃ: ১৩৯২, ঐ)*

পৃথার জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলীকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্মোচিত করার আগে কালকূট মনভ্রমণে সেইসব মুনি-ঋষির জন্মের সত্য উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হলেন— যাঁদের জন্ম অদ্ভুত ও অলৌকিক, অর্থাৎ মুনি-ঋষিদের অলৌকিক জন্মের ঘটনাবলীর সাহায্যে পৃথার জীবনে অলৌকিক

ঘটনাবলীকে বাস্তবের আলোকে আলোকিত করা। কালকূট প্রথমেই দ্রোণের জন্মকাহিনীর দিকে মনোনিবেশ করলেন। দ্রোণের পিতা মহর্ষি ভরদ্বাজ একদিন গঙ্গাস্নানে বিবসনা ঘৃতাচীকে দেখলেন এবং কাম উন্মাদনায় ঘৃতাচীর সামনেই তাঁর বেতঃস্খলন হয়ে গেল। বেতঃস্খলন হওয়ামাত্রই মহর্ষি তা 'দ্রোণী'র মধ্যে স্থাপন করলেন এবং তা থেকে দ্রোণের জন্ম। দ্রোণ শব্দের অর্থ হল জলের গামলা। এই রকমের জন্মের অনেক ঘটনা মহাভারতে রয়েছে।

ইতিহাসের এক অধ্যায়ে পরাশর মুনির বক্তব্যে পাওয়া যায় — "জন্মনিবন্ধন মহর্ষিদের অপকৃষ্ট হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাঁরা তপোবলেই আত্মার উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন। বিশেষতঃ তাদের পিতারা, যে-কোনো স্থানে তাঁদের উৎপাদন করে, তপোবলে তাঁদের ঋষিত্ব বিধান করেন। আমার পিতামহ বশিষ্ঠ, বিভাণ্ডরুপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ, বেদ, তান্ডা, কৃপ, কাক্ষীবাণ, কমঠ, সবক্রীত, দ্রোণ, আয়ু, মতঙ্গ, দ্রুমদ ও মাৎস্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন, তপোবলে ঋষিত্ব লাভ করে বেদবিদগ্রগণ্য ও দমগুণ সম্পন্ন হয়েছিলেন।" *(পৃ: ১৩৯২, ঐ)*

কালকূট পরাশর মুনির বক্তব্যকে লক্ষ্য করে বুঝতে চেয়েছেন যোনি শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ 'উৎপত্তিস্থান'। অর্থাৎ অপকৃষ্ট যোনি বলতে হয়ত অপ্সরা বা অনামী স্ত্রীলোকদের কথাই বলা হয়েছে, সেই কারণেই কুম্ভযোনি বা দ্রোণী ইত্যাদি নামের সাহায্যে আসল সত্যকে আড়াল করা হয়েছে। কালকূট এ সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন এইভাবে, যে ভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক, নরনারীর দৈহিক মিলন ছাড়া লোকসৃষ্টি একটি অসম্ভব বিষয়। এবং এটি "সাধারণ মানুষকে বিপথগামী করার জন্যই, মহাভারত বা পুরাণে যারা প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রবেশ করিয়েছে, তারাই এই বিভ্রান্তি সৃষ্টির মূলে।" *(পৃ: ১৩৯২, ঐ)* কালকূট নিজের যুক্তির স্বপক্ষে আরও বলেছেন যে, ভারত ইতিহাসের আদি খণ্ডেই তিনি দেখেছেন যে — "বামাগণ, আত্মার সনাতন পবিত্র জন্মক্ষেত্র ঋষিদিগের এমন ক্ষমতা নাই যে, স্ত্রী ব্যতিরেকে প্রজা সৃষ্টি করিতে পারেন।" *(পৃ: ১৩৯২, ঐ)* কালকূট আরও বলেছেন যে, পুরুষ ব্যতীত, স্ত্রীজাতি গর্ভধারণ করিতে পারে না।

এই কুম্ভযোনিতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ মুনির জন্ম হয়েছিল। পরাশর ও ব্যাসদেব অনার্য কন্যার সন্তান। ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব ম্লেচ্ছ কন্যা শুকীর গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। কালকূট ভারত ইতিহাসের পথে পরিভ্রমণ করতে করতে এইসব গুণীজনদের জন্ম রহস্যের সম্মুখীন হয়েছেন এবং তাঁর সমসাময়িককালের যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে অনুভব করে ব্যক্ত করেছেন। প্রতিভা ও জ্ঞান এবং তপোবলের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়, কোন বংশধারায় জন্মায় না! সেকাল থেকে একালের এই প্রথার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন।

অনেক পথ পরিক্রমা করে বিভিন্ন মুনি-ঋষিদের অদ্ভুত ও অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করে কালকূট পৃথার সন্ধানে মথুরায় উপস্থিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণ দ্বারকায় যদু বংশকে প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন। কালকূট জানাচ্ছেন— "ইতিহাসের সূত্র ধরেই কৃষ্ণের পিসীমাতা পৃথার জন্ম যে মথুরাতেই হয়েছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই।" *(পৃ: ১৩৯২, ঐ)* কালকূট ইতিহাসের পথ ধরে যদুবংশের রাজা শূর সেনের আমলে উপস্থিত হয়েছেন। শূরসেনের কন্যা 'পৃথা'। তিনি তাঁর পিস্‌তুতো ভাই কুন্তিভোজকে নিজ কন্যা 'পৃথা'কে কন্যারূপে দান করেছিলেন। অশ্বনদী তীরবর্তী রাজ্যের রাজা কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা পৃথার নতুন নামকরণ হল কুন্তী। কুন্তীর যৌবনকালের সৌন্দর্য কালকূটের চোখে— "দীর্ঘনয়না, রূপ-যৌবনশালিনী, স্ত্রী সুলভ গুণবতী, গম্ভীরস্বভাবা, মহাব্রতা ও ধর্মশীলা। অনেক নৃপতিই সেই তেজস্বিনী নারীকে পত্নীরূপে পাবার জন্য বিশেষ উৎসুক ছিলেন।" *(পৃ: ১৩৯২, ঐ)*

কালকূট শিশুমনস্তাত্ত্বিক হিসাবে উঁকি দিয়েছেন কুন্তীর মনের গহীনে। পিতা কর্তৃক কন্যার স্থানান্তর হওয়ায় কুন্তী মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত; শৈশবেই পিতা-মাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত বলে মনমরা হয়ে থাকেন। কিন্তু অল্পবয়স থেকেই অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বলে মনের দুঃখের কথা রাজপরিবারের জ্যেষ্ঠদের কখনও জানতে দেন নি। কুন্তীভোজের পালিতা কন্যা হিসাবে কুন্তী মনে মনে অসুখী ছিলেন। নিজের অন্তর্বেদনার কথা কাউকে বলতে পারেন নি। কালকূট দেখেছেন কুন্তীর মধ্যে একটা অনন্য মনোভাব আছে।

কালকূট তাঁর চরিত্রের আরও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। "তাঁর চরিত্রের কথা নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হলেও, তিনি যে ক্রমেই একটি জটিল নারী হয়ে উঠছিলেন, তার প্রথম প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁর প্রথম যৌবনেই। অথচ অন্যান্য বিশেষণে ভূষিত করে, তাঁর চরিত্রের জটিলতার দিকটিই নানাভাবে আবৃত রাখা হয়েছে।" *(পৃ: ১৩৯৩, ঐ)*

শৈশবে পিতৃমাতৃ স্নেহবঞ্চিত এই মনোবেদনা কুন্তীর মধ্যে কত গভীর ছিল, তা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে প্রকাশ পেতে দেখেছেন কালকূট। মহাভারতের কাহিনীতে কালকূট কুন্তীর মুখে শুনেছেন "আমি দুর্যোধনকে বা নিজেকে দোষ দিই না। আমার পিতাকেই আমি নিন্দা করি। বদান্যরূপ প্রখ্যাত ব্যক্তি যেমন নিজের ধন অপরকে অক্লেশে বিলিয়ে দেন, আমার পিতাও সেইরূপ আমাকে কুন্তিভোজের কন্যারূপে সমর্পণ করেছিলেন। আমি শৈশবে যখন বন্দুক ক্রীড়া (পুতুল লাটিম খেলা) করতাম, তখনই তোমার পিতামহ, আমার পিতা, তাঁর সখা কুন্তিভোজের হাতে আমাকে দত্তক কন্যারূপে সম্প্রদান করেন। হে পরন্তপ, (কৃষ্ণ) সেই আমি পিতার দ্বারা পিতৃস্নেহ বঞ্চিত ..."। *(পৃ: ১৩৯৩, ঐ)*

কালকূট কুন্তীর মনের ভিতরে ডুব দিয়ে তাঁর শৈশবকাল থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল পর্যন্ত পিতৃস্নেহ-বঞ্চিত দুঃখের, বেদনার ধারায় বয়ে যাওয়া পৃথাকে তুলে আনলেন তাঁর সাবলীল লেখনীর ধারায়। কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও হৃদয় দিয়ে কুন্তীর বেদনাকে অনুভব করেছেন এবং

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন।

রাজা কুন্তিভোজের কাছে যেসব মুনি-ঋষিরা আসতেন তাদের অভ্যর্থনা করতেন রাজা স্বয়ং, কিন্তু "কুন্তীকে তিনি সব মুনি ঋষিদের সেবায় নিযুক্ত করতেন।" *(পৃ: ১৩৯৩, ঐ)* কুন্তীর যৌবনের উন্মেষকালে ঋষি দুর্বাসা রাজা কুন্তিভোজের কাছে এসে প্রথমেই বললেন যে, তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করে রাজার গৃহে কিছুদিন বাস করতে চান; কিন্তু তাঁর আরও কতগুলি শর্ত আছে তা হল— "সব সময়ে যেন, আমার গৃহে শয্যা, আসন প্রভৃতি ব্যবহার্য বস্তু সুশৃংখল ভাবে প্রস্তুত থাকে। এর কোন অন্যথা যেন না হয়।" *(পৃ: ১৩৯৩, ঐ)* তাঁর অভিপ্রায়ের বিপরীত কোন আচরণ রাজা বা রাজার প্রতিনিধি যেন না করে, এই শর্তও রাখলেন। দুর্বাসার এরূপ শর্ত রাখার ব্যাখ্যা তিনি ইতিবৃত্তে পান নি। কিন্তু কালকূট তাঁর মনের ভাষাটি ব্যক্ত করেছেন এইরূপে যে, "সম্ভবত: দুর্বাসা জানতেন, কুন্তিভোজের গৃহে একটি পরম রূপসী কন্যা আছে, সে নাকি মুনি ঋষিদের সেবায় বিশেষ যত্নশীলা। অতএব তাঁর মতো একজন পরম রূপবান, সূর্য সদৃশ তেজস্বী মহর্ষিই বা কেন কুন্তীর সেবা গ্রহণ করবেন না?" *(পৃ: ১৩৯৩, ঐ)* তাই কালকূটের মনে হয়েছে যে, কুন্তীর সেবা পাওয়ার জন্যই তিনি এসেছিলেন এবং সেই জন্যই কুন্তিভোজের কাছে ঐ শর্তগুলি রেখেছিলেন। কালকূটের চোখে মুনির অভিসন্ধিগুলি ধরা পড়েছে। তিনি বলেছেন দুর্বাসার প্রথম আবির্ভাবই এমন একটি সংকেত যা হল "তিনি কুন্তীর সেবা পাবার জন্যই এসেছিলেন।" *(পৃ: ১৩৯৩, ঐ)*

মহর্ষি দুর্বাসা অত্যন্ত কোপন স্বভাবের ব্যক্তি বলে পরিচিত। তাঁকে দর্শন করা মাত্রই লোকের মনে ভয় ধরে যেত। তাই দুর্বাসার কথা শুনে রাজা কুন্তিভোজ মনে মনে ভাবলেন যে, এই যথেচ্ছচারী ও কোপন স্বভাব মহর্ষিকে গৃহে রেখে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করা অত্যন্ত কঠিন; তবুও সব জেনেই রাজা কুন্তিভোজ দুর্বাসাকে জানান যে, তাঁর কন্যা কুন্তী সেই মহর্ষিকে সেবা করবে। তিনি আরও বললেন, "আমার মনে হয় আমার সেই কন্যার শীলবৃত্ত দ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হবেন।" *(পৃ: ১৩৯৩, ঐ)*

কালকূট সুদূর অতীতের সেই কথাগুলি যেন শুনছেন ও দেখছেন সেই অতীত ঘটনা সকল। কুন্তিভোজ কুন্তীকে বলছেন যে, এক মহাতপস্বী ব্রাহ্মণ তাঁর গৃহে থাকতে চেয়েছেন, তাঁকে সেবার ভার কুন্তীকে দেওয়া হয়েছে। সে যেন একাগ্রচিত্তে সেই মহর্ষির আরাধনা করে। পিতা কুন্তীভোজ কন্যাকে আরও বললেন, "আমি তোমার বাল্যকাল থেকেই তোমার অসাধারণ সেবার মনোভাব অবগত আছি। ব্রাহ্মণগণ, গুরুবর্গ, বন্ধুবর্গ, মিত্রবর্গ, সম্বন্ধিবর্গ এবং মাতৃবর্গ, এমনকি দাসদাসীগণের প্রতিও তোমার অসাধারণ সানুকম্প দৃষ্টি আছে। ... হে শোভনাঙ্গী। তোমার সাধ্বিবৃত্তির জন্য সমস্ত ভৃত্যজনও তোমার প্রতি আকৃষ্ট।" *(পৃ: ১৩৯৩, ঐ)* কুন্তিভোজের কথায় জানা গেল,—

এতগুলি গুণে গুণান্বিতা কুন্তী।

কুন্তীভোজ আরও বললেন যে কুন্তী যদি এই মহাতপস্বী কোপন স্বভাব ব্রাহ্মণকে সেবায় তুষ্ট করতে পারেন তাহলে কুন্তী বহু কল্যাণ লাভ করবে। কুন্তীর ওপরে ভরসা করে কুন্তিভোজ মহর্ষি দুর্বাসার মত কোপন স্বভাব মুনিকে সেবার ভার দিয়ে দিলেন। কালকূট এ যুগের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছেন কুন্তীর মনের ভাব। কুন্তী অনায়াসেই সম্মতি দিয়ে দিলেন; শুধু তাই নয়, পালক পিতাকে আশ্বস্ত করে বলে দিলেন— "আমি যখন এই ব্রাহ্মণের সেবায় রত হব, তখন উনি যদি নিয়ম রক্ষা না করে, ভোরবেলা, সন্ধ্যাবেলা, গভীর রাত্রে, যখন খুশি আগমন করলেও আমি একটুও রাগ করবো না। উনি কোনো নিয়ম না মানলেও, আমি কখনও ওঁর সেবা ছেড়ে অন্যত্র যাবো না। আমি যা করলে সন্তুষ্ট হবেন, আমি তাই করব। আপনি ব্রাহ্মণকে যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমি তা পালন করবো।" *(পৃ: ১৩৯৩, ঐ)* কুন্তির কথায় দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু মহাভারতে কিছু স্থূলবুদ্ধি বা মতলবী মানুষ, দুর্বাসার সঙ্গে কুন্তির সাক্ষাতের সময়ে, কুন্তীকে নিতান্তই বালিকা বলে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু কালকূট কুন্তীর কথাগুলো এমন বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন, কুন্তীকে এমনভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, কালকূটের পর্যবেক্ষণই ঠিক। কালকূটের মনে প্রশ্ন জেগেছে কুন্তী কী আগে দুর্বাসাকে দেখেছিলেন? না দেখলেও নাম অন্ততঃ শুনেছিলেন।

কুন্তীর দৃঢ়প্রত্যয়মূলক কথা শুনে হৃষ্টচিত্তে পিতা কুন্তিভোজ কুন্তীকে মহর্ষির সামনে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন এই বলে যে, তাঁর কন্যা কুন্তী চিরকালই সুখে লালিতা। যদি কোনো অপরাধ সে করে ফেলে, তাহলে মহর্ষি যেন তাঁকে ক্ষমা করেন। কালকূট এসব কথায় ভাবছেন যে, এটা কীরকম ব্যাপার হল— মহর্ষি ভিক্ষা করে খাবেন, কিন্তু থাকবেন সুধা-ধবলিত প্রাসাদে। আর তাঁর সেবা করবেন রাজকন্যা কুন্তী! কালকূট আরও আশ্চর্য হচ্ছেন কুন্তীর প্রতি দুর্বাসার ব্যবহার দেখে।

কালকূট তাঁর আধুনিক দৃষ্টি নিয়ে দুর্বাসা ও কুন্তীর প্রতিমুহূর্ত লক্ষ্য করেছেন। সেবারতা কুন্তীকে দুর্বাশা নানারকম অপ্রিয় গালাগালি দিতেন, যে খাবার নিয়ে কুন্তী মহর্ষিকে পরিবেশন করতেন, তার নিন্দা মহর্ষি করতেন। কিন্তু এই গালাগালি, ধিক্কারসূচক কথাবার্তায় কুন্তীর মনোভাব লক্ষণীয়— কুন্তী একটুও রাগ করতেন না। তিনি জানতেন "এমন মহর্ষির সেবা করে, তিনি যে ফল পাবেন, তার তুলনা নেই। তিনি শিষ্যের (শিষ্যা নন) মতো, পুত্রের (কন্যা নন) মতো, ভগিনীর মত দুর্বাসার সেবা করছেন।" *(পৃ: ১৩৯৪, ঐ)* কুন্তী অপরাহ্ন, অধিক রাত্রে বা ভোরবেলা সর্বদাই দুর্বাসার পছন্দমত ভোজ্য সায়ন আসন ইত্যাদি দিয়ে সেবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। কুন্তিভোজ প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় কুন্তীর কাছে জানতে চাইতেন যে,— ব্রাহ্মণ তার সেবায়

পরিতুষ্ট হচ্ছেন কি না? কুন্তীর উত্তর "ব্রাহ্মণ যারপরনাই আনন্দিত হচ্ছেন।" *(পৃ: ১৩৯৪, ঐ)*

এখানেই কালকূটের মনে সংশয় উপস্থিত। এমন একজন প্রজ্জ্বলিত বহ্নিস্বরূপ (সূর্য) মহর্ষিকে সেবা করা আর আগুনে হাত দেওয়া একই কথা। তবুও কুন্তীর ধৈর্য ও শান্তশীলতা লক্ষণীয়। কুন্তী এমন কী আচরণ করতেন, আর মহর্ষিই বা কেন এত আনন্দিত হতেন? কালকূট কুন্তীর বক্তব্য তুলে ধরেছেন, —

"... তমহং পর্য্যতোষয়ম্।
শৌচেন ত্বাগসস্ত্যাগৈঃ শুদ্ধেন মনসা তথা
কোপস্থানেস্বপি মহৎস্বকুপন্ন্য কদাচন।" *(পৃ: ১৩৯৪, পৃথা)*

দুর্বাসা প্রায় একবছর কুন্তীর সেবা গ্রহণ করে পরম তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে কুন্তী জানান যে, তিনি পিতার আদেশে মুনির সেবা করেছেন, তাঁর বরের প্রয়োজন নেই; এই কথা বলার পরেও মুনি কুন্তীকে দেবতাদের আহ্বান করার জন্য মন্ত্র প্রদান করলেন এবং বললেন, "এই মন্ত্রের দ্বারা তুমি যে কোনো দেবতাকে আহ্বান করবে, তিনি সকামী বা অকামীই হোন, মন্ত্র প্রভাবে ভৃত্যের ন্যায় তোমার বশবর্তী হবেন।" *(পৃ: ১৩৯৪, ঐ)*

কালকূট বর দান ব্যাপারটার অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজেছেন। এত রকমের বর থাকতে দুর্বাসা "অথর্ববেদবিহিত মন্ত্র সব দান করলেন।" কেন? দেবতাদের ভৃত্যের মত ডাকার জন্য এই বর দেওয়ার অর্থ কী? কালকূট নিজস্ব বিশ্লেষণের ভাবনা ছেড়ে এবারে ইতিবৃত্তের পাতায় চোখ রাখলেন। ইতিবৃত্তে প্রক্ষিপ্ত অলৌকিক সংবাদে, ব্রাহ্মণের বিচিত্র মতিগতির সন্ধান তিনি পেয়েছেন, কালকূটের মতে "এঁরাই আমাদের প্রাচীন ইতিবৃত্তকে ব্রাহ্মণ্য মহিমার দ্বারা (মুর্খতা!) এমনভাবে মিথ্যায় আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, যাতে সত্য কখনও প্রকাশ না পায়। আর ব্রাহ্মণরা যে কী ভয়াবহ শক্তিশালী ছিলেন, তার প্রমাণের জন্য যা মনে এসেছে, তাই লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।" *(পৃ: ১৩৯৪, ঐ)*

একজন ব্রাহ্মণ কুন্তীর জীবনের অলৌকিকত্ব প্রমাণের জন্য ঋষি দীর্ঘতমার কথা বলেছেন। কালকূট যখন সংহিতা যুগের নিয়ম-বিধি জানতে সেই কালে মনভ্রমণ করেছিলেন, তখন তিনি দীর্ঘতমাকে পেয়েছেন। সমাজের প্রয়োজনে ও নিজ স্ত্রী প্রদোষীর উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে বিবাহ বন্ধনকে দৃঢ় করবার জন্য কিছু রীতি-নীতির নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ নিজে বেদবিদ হয়েও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করায় তাঁর স্ত্রী ও পুত্রগণ অন্ধ দীর্ঘতমাকে ভেলায় করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। গঙ্গার তীরবর্তী এক ধার্মিক রাজা বলি তাঁকে দেখতে পেয়ে নিজগৃহে আশ্রয় দেন এবং নিজ স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য নিয়ে আসেন।

রাজা সুদেষ্ণাকে ঋষির কাছে গমন করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু রানী সুদেষ্ণা, অন্ধ ও বৃদ্ধ দীর্ঘতমার কাছে না গিয়ে তার এক শূদ্রাণী পরিচারিকাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

দীর্ঘতমা এগারোটি সন্তান সেই শূদ্রযোনিতে উৎপাদন করেছিলেন। রাজা অনেকদিন পরে এই তথ্য জেনে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন ও পরে রানী সুদেষ্ণাকে অনুরোধ করে দীর্ঘতমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। এবার দীর্ঘতমা রাণীকে ভোগ না করে তাঁকে স্পর্শ করে বলে দিয়েছিলেন "তোমার অত্যন্ত তেজস্বী পাঁচ পুত্র হবে। তারা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র ও সুহ্ম বলে পরিচিত হবে এবং তাদের নামানুসারে অঙ্গ বঙ্গাদি দেশ প্রসিদ্ধ হবে।" *(পৃ: ১৩৯৪, ঐ)*

কালকূট স্পর্শ, এই অলৌকিক ব্যাপারটির জন্য ইতিবৃত্তের পাতাগুলি উল্টে গেছেন। কারণ এর আগেও কালকূট মুনি-ঋষিদের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করে একটি সুগভীর দৃঢ় বক্তব্য রেখেছেন।

কালকূট আরও বলেছেন অলৌকিকতায় বিশ্বাসী পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন, ঋষি স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিলেই স্ত্রীলোকটি সন্তানসম্ভবা হয়। আর কুন্তীর সঙ্গে সূর্যের সহযোগিতায় কর্ণেরও জন্ম এইভাবেই হয়েছিল বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন। "আর সেই সূর্য যে আকাশ থেকেই নেমে এসেছিলেন, সে-বিষয়েও এইসব পণ্ডিতের মনে সন্দেহ নেই। হে সূর্য। তুমি আকাশ থেকে নেমে, একবার এইসব পণ্ডিতের দেহ স্পর্শ করে যাও।" *(পৃ: ১৩৯৫, ঐ)* কালকূট এসব অলৌকিক ব্যাপারে আলোচনা করলেন কুন্তীর জীবনের ঘটনাগুলোকে অলৌকিকতা থেকে মুক্ত করে যথার্থ বাস্তব রূপ খুঁজে পেতে।

কুন্তী কুমারী অবস্থায় রজঃস্বলা হওয়াতে খুব লজ্জিত। তিনি প্রাসাদ মধ্যে রমণীয় শয্যায় বসে কবচকুণ্ডল যুগলে শোভিত দিব্য জ্যোতি সূর্যদেবকে দেখে দুর্বাসার দেওয়া মন্ত্র দ্বারা তিনি সূর্যদেবকে আহ্বান করে বসলেন। সূর্য সত্যি সত্যি সামনে উপস্থিত, সূর্যদেব তাঁকে বর দেওয়ার জন্য উৎসুক হলেন। কুন্তী সূর্যদেবকে স্পষ্ট করে বলে দিলেন—বাবা-মার অজান্তে, সন্তানের জন্ম দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সূর্যদেব এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে, কুন্তীর "কন্যকাবস্থা নষ্ট হবে না। তুমি যেমন সন্তান চেয়েছ, সেই রকমই আমি উৎপাদন করব। আর তুমি যে কবচকুণ্ডলসহ বীর সন্তান চেয়েছো, তাই আমি দান করব।" *(পৃ: ১৩৯৫, ঐ)* কুন্তী রাজি হতে সূর্যদেব তাঁর নাভিদেশ স্পর্শ করা মাত্র কুন্তী তেজঃ প্রভাবে অচেতন হয়ে পড়লেন, আর সূর্যদেব যোগবলে গর্ভধান করলেন। এর ফলে কুন্তীর কন্যকাবস্থা নষ্ট হল না। কালকূট এই অলৌকিক-অবাস্তব-মিথ্যা কাহিনী সম্পর্কে বলেছেন, "নারীকে যারা নিতান্ত দেহ শুচিতার বিচারে কেবলমাত্র পুত্রোৎপাদনের যন্ত্র মনে করেন, তারাই ঐসব অলৌকিক অসম্ভব ব্যাপারকে লোকের মধ্যে প্রচার করেন এবং মানুষকে সত্য সন্ধানে বঞ্চিত করেন।" *(পৃ: ১৩৯৫, ঐ)*

কালকূট এখন ইতিহাসের ধূলাচ্ছন্ন পাতার আড়ালে কুন্তীর সেই আরাধ্য পুরুষটির খোঁজ

করছেন। তাই কুন্তীর চরিত্র ব্যাখ্যার সঙ্গে পুরুষটির আচরণের বিষয়ে প্রশ্ন রাখছেন— "কুন্তী চরিত্রের দ্বারা আমি মোহিত। আমি দেখছি শৈশবের সেই বালিকা, তাঁর তারুণ্যে এসেই, এমন এক তেজঃপুঞ্জপূর্ণ তপস্বীর, সমস্ত রকম স্বেচ্ছাচারী ব্যবহারেও অসুখী হন নি, রাগ করার যথেষ্ট কারণ থাকলেও, রাগ করেন নি, এবং যিনি কুন্তীর কাছে রাত্রে ভোরে সন্ধ্যায় যখন খুশি আসতেন, কখনও গঙ্গাজল দিতেন, তবু কুন্তী তাঁর বাধ্য থাকতেন, এ সবই কি কুন্তীর বাল্য থেকে প্রাপ্ত, দুঃখের মধ্য থেকে, নতুন জীবনকে জানার ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় না?"

কালকূটের মনে হাজারও প্রশ্ন। কুন্তি দুর্বাসার সেবা করেছেন প্রায় এক বছর। কুন্তীর সঙ্গে দুর্বাসার ব্যবহারে কুন্তীর মানসিক অবস্থা অবলোকন করছিলেন কালকূট। তাঁর মনে যে প্রশ্নগুলো জেগেছে, সেগুলো বাস্তবিক পক্ষে যথার্থই, কেননা একালের মানুষ তিনি। সেকালের ঘটনাবলীকে একালের মানসিকতাতেই দেখবেন। কালকূট বারে বারে মুনি-ঋষির বিভিন্ন রকম জন্ম রহস্য নিয়ে এক বাস্তবনিষ্ঠ, প্রামাণ্য, যুক্তির উপস্থাপন করেছেন এবং বারে বারে বলেছেন, নরনারীর দৈহিক মিলন ব্যতিরেকে সন্তান জন্ম সম্ভব নয়। তাহলে? কুন্তীর সন্তান তথা কানীনপুত্র কর্ণের জন্ম রহস্য উন্মোচনে কালকূট উদ্যোগী হয়েছেন, অলৌকিকতার আচ্ছন্নতাকে সত্যের আলোকে আনতে। তিনি শুধু কুন্তীকেই দেখছেন তা নয়, তিনি দেখছেন দুর্বাসাকেও। এই কোপন স্বভাব, যথেচ্ছাচারী ঋষিটির অন্তঃস্থলে কালকূট উঁকি দিয়েছেন। তিনি সেখানে দুর্বাসাকে অন্যরকম দেখছেন। দুর্বাসা মধুরভাষী এবং দেখতেও অসাধারণ তেজবহ্নি স্বরূপ সুপুরুষ, বয়সে তরুণ। পরাশর যদি সত্যবতীর কন্যকাবস্থা দূষিত না করে সত্যবতীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে পারেন, তবে দুর্বাসাই বা সেরূপ ঘটনাটি করবেন না কেন? দুর্বাসাকে দেখে মুগ্ধ হওয়ার কথা, বহ্নিশক্তিমান যুবাপুরুষ বা যুবা মহর্ষি তিনি। আর কুন্তী ছিলেন দৃঢ়, অনন্যতার মনোভাবে দৃপ্ত। কালকূট বলছেন— সূর্যদেবের মুখ দিয়ে কুন্তীকে বলানো হয়েছে, "তোমার পিতামাতা অন্যান্য গুরুজন তোমার প্রভু নহেন।" *(পৃ: ১৩৯৫, ঐ)* তা যে ছিলেন না, সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

কালকূট ইতিবৃত্তের পথে চলতে চলতে কুন্তী ও দুর্বাসার সম্পর্ককে খুঁজছেন, — "ইতিহাসের অপরিচ্ছন্ন অস্পষ্টতায়, আমি বাস্তব দৃশ্যটি দেখতে পাচ্ছি না, তথাপি আমি যেন কুন্তীর অন্তরের মধ্যে দুর্বাসাকেই অঙ্কিত দেখেছি। কিন্তু ইতিহাস এ বিষয়ে এমনই নীরবতা অবলম্বন করেছে, আমি সুস্পষ্ট রূপে কিছুই দেখছি না।" *(পৃ: ১৩৯৫, ঐ)* তবুও কালকূট নিজের এই অনুমানকে বর্তমানের নিরিখে যাচাই করার জন্য ইতিহাসের অস্পষ্টতায় স্বর্গলোকের এক রাজ্যের অধিপতি সূর্যকে অশ্ব নদীর তীরে কুন্তিভোজের রাজ্যে ভ্রমণ করতে দেখলেন। সেখানে ধাত্রী ও সখীগণ সহ কুন্তীও ভ্রমণ করছিলেন। "সহসাই দুজনের সঙ্গে চারি চক্ষের মিলন। চক্ষের মিলনই তাঁদের দেহ মিলনে আকৃষ্ট

করলো। কিন্তু কুন্তী তখন রজঃস্বলা কুমারী। পরস্পরের মধ্যে মিলনে, সন্তান জন্ম অবশ্যম্ভাবী। অথচ দুজনেই তখন দুজনের প্রতি প্রেমাবিষ্ট। স্বভাবতই ধাত্রী ও সখীদের সাহায্যেই, কুন্তী রাজা সূর্যকে রাজ-অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন।" *(পৃ: ১৩৮৩, ঐ)*

কুন্তীর সঙ্গে যাঁর মিলন হয়েছিল, তা যে অন্তঃপুরেই ঘটেছিল এ বিষয়ে কালকূটের কোন সন্দেহই নেই। কালকূট বলছেন, সমস্ত ঘটনাটিকে এমন একটি রূপ দেওয়া হয়েছে যে, — "কুন্তী তাঁর রমণীয় প্রাসাদের শয্যায় উপবেশনপূর্বক নবোদিত সূর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করামাত্র সূর্যের কবচকুণ্ডলযুগল মণ্ডিত দিব্যমূর্তি দর্শন করলেন। দুর্বাসাও ছিলেন সুধাধবল প্রাসাদে। স্বর্গরাজ্যের অধিপতি সূর্য হয়তো কুন্তীর রূপৈশ্বর্যের কথা শুনেই, কুন্তিভোজ রাজার রাজ্যে এসেছিলেন। সাক্ষাৎ যদি ধরে নেওয়া হয়, অশ্ব নদীর তীরেই হয়েছিল, এবং সেখানেই দুজন দুজনকে দেখে মুগ্ধ হন, তা হলেও কুন্তীর সেই সাহস ছিল, প্রেমিককে তিনি অন্তঃপুরে নিয়ে যাবেন।" *(পৃ: ১৩৯৫, ঐ)*

কালকূট আধুনিককালের মানসদৃষ্টিতে স্বর্গলোকের রাজা সূর্যকে অশ্বনদীর তীরে কুন্তিভোজের প্রাসাদে দেখতে পেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, — "আকাশের সূর্য যে মানুষের বেশে নেমে আসতে পারে না, যে কোনো জীবই তা অনুমান করতে পারে।" *(পৃ: ১৩৯৬, ঐ)* এছাড়া কালকূট ইতিবৃত্তের পথে মনভ্রমণে স্বর্গলোক থেকে ঘুরে এসেছেন, তিনি দেখেছেন স্বর্গলোক থেকে এই মর্ত্য ভারতে, সর্বদাই দেবতা ও মানুষ জাতির আনাগোনা ছিল। অতএব কালকূট নতুন করে কুন্তীর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ব্যাখ্যা করলেন, প্রিয় সূর্যসম ব্যক্তিটি কে? স্বয়ং দুর্বাসা না একজন স্বর্গলোকের রাজা সূর্য। "কুন্তীর সেই পুরুষ স্বয়ং দুর্বাসাই ছিলেন।" *(পৃ: ১৩৯৬, ঐ)* এ'কথা বলার পরেই কালকূট নিজেই বলেছেন— তাঁর ইতিবৃত্তীয় পথে চলার এই অধ্যায়টিকে, তাঁর এ'কালের আধুনিক যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্যকে অনেকেই সংশয়ের চোখে দেখতে পারেন।

কিন্তু কালকূট এই সিদ্ধান্তে এসেছেন অনেক সংকেত ও ঘটনার অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে। কুন্তীর জীবনের এই অধ্যায়টি নিয়ে কালকূট যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা করেছেন। মূল কারণগুলো খোঁজবার চেষ্টা করেছেন। একটা কারণে তিনি আবার বিস্মিতও হয়েছেন। দুর্বাসা বা পরাশর মুনি তপোবনে অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তাঁরা কুমারী কন্যাদের বরণ করেও তাদের কন্যকাবস্থা দূষিত করতেন না, কিন্তু সন্তান উৎপাদন করতেন। কালকূট বলেছেন — সন্তান উৎপাদন বন্ধ করার কৌশল কি তাঁরা জানতেন না? তাই যদি জানতেন, তাহলে এই সমস্যাই তৈরি হত না। কালকূট বলছেন, সম্ভবত সন্তান জন্মদানই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। সেদিক থেকে দু'জন কানীনপুত্রের কথা তিনি প্রাচীন ইতিবৃত্তে পেয়েছেন তাঁরা দু'জনেই বিশাল ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাসের কথা আগেই বলেছেন, এখন বললেন, কুন্তীর কানীনপুত্র কর্ণ-এর কথা।

সংহিতা যুগে কুমারীর গর্ভধারণ নিন্দনীয় ছিল না, যেহেতু রমণীদেরও যৌন স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সমাজের রীতিনীতি বদলে গিয়েছিল "নতুন যুগে, কুমারীর গর্ভধান সমাজে দোষণীয় বলে গণ্য হত। কুন্তীর গর্ভবতী হওয়া তারই প্রমাণ।" *(পৃ: ১৩৯৬, ঐ)*

কালকূট নিজেই দেখেছেন কুন্তীকে; তিনি অন্যান্য কন্যাদের থেকে আলাদা ছিলেন। এক জটিল শৈশবকালের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছিলেন; তিনি দৃঢ়চেতা। "কুমারী অবস্থায় পুরুষের যৌন সাহচর্য ভোগ করার সাহস তাঁর ছিল।" *(পৃ: ১৩৯৬, ঐ)* কালকূটের মনে এ ভাবনার উদয় হয়েছে এ ঘটনার জন্য কুন্তী কেন প্রাতস্মরণীয়া? কালকূট নিজেই এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখেই তিনি এগিয়ে চলেছেন, ভবিষ্যতেই জানা যাবে "এ ঘটনার জন্য কেন তিনি প্রাতঃস্মরণীয়। ভারতীয় রমণীগণের মধ্যে গণ্যা হয়েছিলেন।" *(পৃ: ১৩৯৬, ঐ)* তিনি ভবিষ্যতের দিকেই দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলেছেন কুন্তীর সন্তান জন্মের ক্ষণে। তিনি অতীতচারণে যা দেখেছেন একালের দৃষ্টিতে তাই তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীতে।

গর্ভবতী কুন্তী সন্তানকে হত্যা করার মত নিষ্ঠুর রমণী ছিলেন না। তাঁর এই গর্ভধারণ ব্যাপারটি শুধু তাঁর ধাত্রীই জানত তা নয়, তাঁর সখী, দাসদাসী ও বিশেষ বিশেষ অনুচর, এরা জানত। তিনি এর সপেক্ষে প্রামাণ্য যুক্তি দিয়ে সমস্ত ঘটনাটি তুলে ধরেছেন এইভাবে— "যথাকালে কুন্তী কনকোজ্জ্বল কুন্ডল ও বর্মধারী, সিংহনেত্র ও বৃষস্কন্ধ এক পুত্র প্রসব করলেন। ধাত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা করে, লোকলজ্জা ভয়ে মধুচ্ছিষ্টবির্লিপ্ত অতি বিস্তীর্ণ ও আচ্ছাদন সম্পন্ন এক মঞ্জুষা, অর্থাৎ কাষ্ঠপিঞ্জর মধ্যে সেই পুত্রকে সংস্থাপনপূর্বক, কাঁদতে কাঁদতে অশ্বনদীতে নিক্ষেপ করলেন। এবং পরে তিনি সহজাত কবচ দ্বারা পুত্রকে অনায়াসে চিনতে পারবেন, এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করলেন। মঞ্জুষামধ্যগত বালক প্রবাহবেগে, অশ্বনদী, চর্মন্বতী, যমুনা ও ভাগীরথী স্রোতস্বতীতে বাহিত হয়ে সুত রাজ্যের অন্তবর্তী চম্পা নগরীতে উপস্থিত হলো।" *(পৃ: ১৩৯৬, ঐ)*

এরপরে সন্তানের জন্য মাতৃহৃদয়ের অশ্রুসজল চক্ষে প্রার্থনা, — অন্তরীক্ষগত, পৃথিবীগত এবং দেবলোকগত প্রাণিগণ হতে তার সন্তানের যেন মঙ্গল হয়। জলচর প্রাণিগণও তার সন্তানের কল্যাণ করে। পরিরাজ বরুণদেব ও অন্তরীক্ষপতি পবনদেব তাকে রক্ষা করুক। কালকূট যেন হৃদয় দিয়ে শুনছেন নদীতে সন্তান ভাসিয়ে দেওয়া এক সদ্য মা হওয়া রমণীর করুণ হৃদয়ের প্রার্থনা। সকলের কাছে প্রার্থনা তাঁর সন্তানের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য। "তোমার পিতা ভাস্করদেব তোমাকে সর্বত্র রক্ষা করুন। আদিত্য, বহ্ন, রুদ্র, সাধ্য, মরুৎ এবং দিকপতিগণ তোমার কল্যাণবিধান করুন। তোমার সহজাত দিব্য কবচ ও কুণ্ডল দেখে, আমি যেন পরেও তোমাকে চিনতে পারি। যে দেবকুমার, যে-নারী তোমাকে স্তন পান করাবেন, তাঁর সৌভাগ্যের সীমা নেই।

তোমার ন্যায় পদ্মপলাশলোচন শিশুকে যিনি কোলে নেবেন, যা-ভাগ্যবতী যৌবনে হিমাচলবাসী সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী, তোমাকে নিজের পুত্র বলে পরিচয় দেবেন, না জানি তিনি কতোই পুণ্যবতী।'' *(পৃ: ১৩৯৬, ঐ)*

কালকূট অত্যন্ত দরদের সঙ্গে কুন্তীর যন্ত্রণাপূর্ণ হৃদয়খানিকে তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন, ''কুন্তীর জীবনে, এই সন্তানধারণ যেমন সুখের হয়েছিল, সন্তানটিকে সামাজিক কারণে ত্যাগ করাও ততোধিক দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছিল। কন্যা বলে, সেই তিনি প্রথম পুত্রের জননী প্রিয়তম সেই পুত্রকেই তাঁকে ত্যাগ করতে হলো। এটি তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা করুণ একটি বিষয়।'' *(পৃ: ১৩৯৬, ঐ)* তারপর মঞ্জুষাটি ভাসতে ভাসতে চম্পানগরীতে উপস্থিত হল। সেই সময়ে অধিরথ নামে সূত ও তার পত্নী রাধা গঙ্গার ধারে ভ্রমণ করছিলেন। মঞ্জুষাটি ভাসতে ভাসতে একেবারে রাধার কাছে এসে পড়ল। অধিরথ পত্নী কৌতূহল দমন করতে না পেরে মঞ্জুষাটি হাত দিয়ে ধরে অধিরথকে ডেকে বললেন, ''তুমি একবার এখানে এসে এই মঞ্জুষাটি প্রত্যক্ষ কর। এটি দেখে আমার মন কেন চঞ্চল হচ্ছে।'' *(পৃ: ১৩৯৭, ঐ)*

অধিরথ শুধু রাধার কথায় নয়, নিজেও কৌতূহলী হয়ে মঞ্জুষাটি উন্মোচিত করে তার মধ্যে একটি অচিরপ্রসূত শিশুকে শায়িত দেখলেন। শিশুটিকে দেখে অধিরথ অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে রাধাকে বললেন ''প্রিয়ে, আমি এমন অদ্ভুত রূপলাবণ্যযুক্ত শিশু কদাপি দর্শন করিনি। মনে হচ্ছে শিশুটি দেবপুত্র। দেবগণ আমাদের অনপত্য দেখে, অনুগ্রহ করে পুত্রটি দান করেছেন। এই নাও, এই পুত্র অদ্য হতে তোমার। তোমার ক্রোড়েই সে পূর্ণ-চন্দ্রের মতো বর্ধিত হবে।'' *(পৃ: ১৩৯৭, ঐ)*

রাধা অত্যন্ত উৎফুল্লচিত্তে ও স্নেহবিগলিত প্রাণে শিশু গ্রহণ করে লালন-পালন করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণেরা কবচকুণ্ডলযুক্ত শিশুটির নাম বসুসেন রাখলেন, এছাড়াও 'বৃষ' নামেও তাকে ডাকা হত। কিন্তু শিশুটি সূতপুত্র নামেই বেশি পরিচিত হতে লাগল।

এত ঘটনার পরও কালকূটের দৃষ্টি একটি সামান্য ঘটনার উপর পড়ল, যা থেকে তিনি মন্তব্য করলেন ''প্রকৃত ঘটনার সমস্ত বাস্তব রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে। অধিরথের গৃহে, নিজের সেই শিশুপুত্রটি কেমনভাবে মানুষ হচ্ছে, কুন্তী চর প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হতে লাগলেন।'' *(পৃ: ১৩৯৭, ঐ)* তাঁর শিশুপুত্রটি যে বুন্দেলখণ্ড থেকে এতগুলো নদী পার হয়ে ভাগীরথী তীরে চম্পানগরীতে উপস্থিত হয়েছে সেটা কুন্তী ভালোভাবেই জানতেন। কুন্তীর এই ঘটনাই কালকূটের সত্যানুসন্ধানের পথ সহজ করে দিয়েছে।

তিনি যে ঘটনাকে প্রথমে নির্দেশ করে দেখছেন সেটি হল, অধিরথ যে মঞ্জুষাটি যন্ত্রদ্বারা খুলেছিলেন সেটি ছিল একটি নিশ্চিদ্র আধার। এই নিশ্চিদ্র আধারে কোনো শিশুর এই দীর্ঘ নদীপথ

অনাহারে আসা কি সম্ভব? তিনি নিজেই এই সংশয়ের উত্তরে বলেছেন, যে তিনি কারো বিশ্বাসে আঘাত করতে চান না কিন্তু "যেখানে প্রত্যক্ষ যুক্তির ক্ষেত্র আমাদের সামনে উন্মুক্ত রয়েছে, সেখানে আমি কেন অকারণ অলৌকিক পথে যাবো?" *(পৃ: ১৩৯৭, ঐ)* মঞ্জুষা শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল কাষ্ঠপিঞ্জর। কুন্তী বিশেষ কারিগর দিয়ে এই মঞ্জুষাটি তৈরি করিয়েছিলেন, সেটা একধরনের ছোট নৌকাই। চালক তো ছিলই। এছাড়া চালকবিহীন মঞ্জুষাটি ভেসে যেতে দেখলে নদীতীরবর্তী মানুষই হোক আর নদীপথে নৌকাযোগে যাতায়াত রত মানুষই হোক,— চোখে পড়তই। তাই কালকূট বলছেন যে এসব যুক্তিরও উর্ধ্বে, "কুন্তী চর প্রমুখাৎ স্বীয় পুত্রের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হলেন।" *(পৃ: ১৩৯৭, ঐ)* একথার অর্থ— ভাগ্যের হাতে কুন্তীও তাঁর সদ্যজাত শিশুপুত্রটিকে ভাসিয়ে দেননি। এ বিষয়টি কালকূট দীর্ঘকাল চিন্তাভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "কুন্তীর নিজের উদ্যোগে, সদ্যজাত শিশুকে অত্যন্ত সাবধানে যত্নের সঙ্গে অধিরথের নিকটে পাঠানো হয়েছিল। তাছাড়া আমি আগেই দেখেছি, দাস-দাসী, ভৃত্যসকল তাঁর অত্যন্ত অনুগত ছিল। লোকবলও তাঁর ছিল। বিনা তত্ত্বাবধানে নিশ্চিদ্র একটা মঞ্জুষা মধ্যে, সদ্যজাত শিশুকে জেনেশুনে তিনি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেননি।" *(পৃ: ১৩৯৭, ঐ)*

কিন্তু কুন্তীর সঙ্গে এই সুদূর রাজ্য চম্পানগরীর অধিরথের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ হয়েছিল? কালকূট ইতিবৃত্তের পথে অনুসন্ধান করে জানাচ্ছেন— "অধিরথ ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের সখা। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে পরিচয় সূত্রেই, রাজা কুন্তিভোজের সঙ্গে অধিরথেরও পরিচয় হবার সুযোগ থাকতেই পারে। আর কুন্তিভোজের সঙ্গে যদি অধিরথের পরিচয় ঘটে থাকে, তাহলে কুন্তীর সঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁর পরিচয় হয়েছিল।" *(পৃ: ১৩৯৭, ঐ)*

কুন্তী যেদিন থেকে গর্ভবতী হয়েছিলেন সেদিন থেকেই ভবিষ্যতের নিজ সন্তানটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। নিজেকে অন্তঃপুরে গোপনীয়তার মধ্যে রেখেই, সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করে চর মারফৎ পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে রাধাকে উদ্দেশ্য করে পত্র পাঠিয়েছিলেন। রাধাও পত্রের উত্তর কুন্তীকে দিয়েছিলেন। কালকূট বলেছেন "রাধার কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেলে, কুন্তী কদাচ তার সদ্যোজাত পুত্রকে চম্পানগরীতে পাঠাতেন না।" *(পৃ: ১৩৯৭, ঐ)* চর মারফৎ সংবাদের পর সব কিছু কুন্তী পূর্ব পরিকল্পনা মত গোপনে এই ব্যবস্থাটি সম্পন্ন করেছিলেন। মঞ্জুষার চালকের উপরেই দায়িত্ব ছিল শিশুটিকে খাওয়ানো ও দেখাশোনা করার। পানীয় জল, মধু ইত্যাদি ব্যতিরেকেও তীরবর্তী অনুগামী চরের কাজ ছিল পথিমধ্যে জনপদ হতে দুগ্ধ সংগ্রহ করা। একজন অনুচরই যে তীরে মঞ্জুষাটির অনুসরণ করেছে, তাও না। নতুন অনুচর আসামাত্র পুরানো অনুচর গিয়ে সংবাদের প্রতীক্ষায় সদা সশঙ্কিতা কুন্তীকে গিয়ে সংবাদ দিত। এইভাবেই কুন্তী কর্ণের যৌবনের

চেহারা অনুমান করেই কবচ ও কুণ্ডলযুগল তৈরি করিয়ে শিশু পুত্রটির শয্যার পাশে রেখে দিয়েছিলেন এবং এটিও অধিরথ ও রাধাকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনার পর ঘটনা বিন্যাসে দেখা যাচ্ছে কুন্তীর লোকবল যথেষ্ট ছিল, তারা বিশ্বস্ত ও অনুগত।

কুন্তী কুমারী মাতা হওয়ায় কর্ণের জন্মের বিষয়টিকে লোকসমাজে অপ্রকাশিত রাখার বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছিল। কালকূটের জিজ্ঞাসা — সেই চেষ্টা কতটা কার্যকরী, অধিরথ ছাড়া আর কে কে জানতেন? তিনি দেখছেন নিজের দূরদৃষ্টি দিয়ে — ব্যাসদেব, ভীষ্মদেব এবং বাসুদেব — এঁরা প্রত্যেকেই সমস্ত বিষয়টি জানতেন। বাসুদেব জেনেছিলেন পরে, কারণ কর্ণের পরে তাঁর জন্ম। কর্ণের জন্ম রহস্য সম্বন্ধে জনশ্রুতি প্রচলিত থাকবেই। দুর্যোধন কর্ণের জন্ম রহস্য সম্পর্কে কিছু জানলেও স্পষ্ট বলেছেন যে, "যেমন, হরিণীর গর্ভে বাঘের জন্ম হওয়া একান্তই অসম্ভব, কবচ ও কুণ্ডলধারী সর্বলক্ষণ সংযুক্ত সূর্যসঙ্কাশ মহাবীর কর্ণও তদ্রূপ সামান্য ব্যক্তির ঔরসে বা সামান্য নারীর গর্ভে জন্মান নি।" *(পৃ: ১৩৯৮, ঐ)* দুর্যোধন আরও এক জায়গায় মদ্ররাজ শল্যকে বলেছেন যে, কর্ণের যদি কিছুমাত্র দোষ থাকত, তাহলে পরশুরাম তাঁকে দিব্যাস্ত্রজালসকল দান করতেন না। এই কারণেই দুর্যোধন কর্ণকে সূতপুত্র বলে বিবেচনা করেন না, — "আমি মনে করি, ইনি ক্ষত্রিয়কুলপ্রসূত দেবকুমার, মহৎ গোত্রসম্পন্ন। উনি কখনই সূতকুল সম্ভূত নন।" *(পৃ: ১৩৯৮, ঐ)* দুর্যোধনের এসব দৃঢ়বাক্য থেকে মনে হয়, কর্ণের জন্ম রহস্য তিনি জানতেন; পরশুরাম কিছু না বলে থাকলেও দ্রোণাচার্য বলতে পারেন। দুর্যোধন এক জায়গায় বলেছেন যে কর্ণ 'ক্ষত্রিয়কুল প্রসূত দেবকুমার।' কালকূট দুর্যোধনের এই সংকেতটি বলছেন, — "দুর্যোধনের কথায় এটাই যেন প্রমাণ হয়, স্বর্গরাজ্যের অধিপতি সূর্যের ঔরসেই কর্ণের জন্ম হয়েছিল।" *(পৃ: ১৩৯৮, ঐ)*

আবার যুধিষ্ঠিরের মনেও কর্ণের জন্ম নিয়ে নানারকম সন্দেহ ছিল। কর্ণ অর্জুনের হাতে নিহত হওয়ার পরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, — দ্যূতক্রীড়ার সময় কর্ণ দুর্যোধনের পক্ষ নিয়ে অনেক কটু কথা বলেছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড রাগ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কর্ণকে কিছুই বলতে পারেন নি এইজন্য যে, "ঐ মহাবীরের পা দুটি, আমার মা কুন্তীর চরণযুগলের মত দেখতে ছিল। আমি চরণযুগলের এই সাদৃশ্যের আগে অনেকবার জানবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনোদিনই তার সন্ধান পাই নি।" *(পৃ: ১৩৯৮, ঐ)* শুধু তাই না, কর্ণের সহজাত কবচ ও কুণ্ডল দেখে যুধিষ্ঠিরের মনে হয়েছিল, ঐ ব্যক্তিকে যুদ্ধে নিহত করা অসম্ভব, তাই যুধিষ্ঠির কর্ণের ভয়ে তেরো বছর ভালো করে ঘুমোতে পারেন নি। তার মনে সন্দেহ ছিল যে, কর্ণ সূতোকুলোদ্ভুত সন্তান নন। কালকূট যুধিষ্ঠিরের মনের গহীনে ডুব দিয়ে দেখতে পেয়েছেন যে, — "কর্ণের চরণযুগলের সঙ্গে নিজের জননী কুন্তীর চরণযুগলের বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যে-সন্দেহ তার মনে উদিত হতো, নিজের জননী সম্পর্কে

তেমন সন্দেহ করা পাপ বলে মনে করতেন।" *(পৃ: ১৩৯৮, ঐ)*

কালকূট বলছেন যে "ইতিহাসের পথ পরিক্রমায়, আমি কুন্তীর জীবনের কন্যাকাবস্থার সবই প্রত্যক্ষ করলাম।" *(পৃ: ১৩৯৮, ঐ)* তবুও অস্পষ্টতা রয়েই গেল একটি বিষয়ে। ইতিহাসের সংকেত মতো, দুর্বাসাকে তিনি কর্ণের পিতা বলে মনে করেছেন। স্বর্গ রাজ্যের সূর্যের সঙ্গে কুন্তীর দেবরাজ সূর্যের রূপেরও কোনো বর্ণনা তিনি পাননি। অথচ দুর্বাসার রূপের বর্ণনায় বারে বারেই এই গ্রহের সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তিনি দুর্বাসার আর একটি রূপের বর্ণনায় বলেছেন "রুদ্রস্বরূপ দুর্বাসার দেহপ্রভা গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান থাকতে এবং তিনি প্রতপ্ত সুবর্ণসদৃশ জটাভারে সুশোভিত ছিলেন।" *(পৃ: ১৩৯৮, ঐ)*

দুর্বাসার রূপের যে বর্ণনা কালকূট এখানে উল্লেখ করেছেন, তার সঙ্গে সহমত পোষণ করে পুরাকালের মহাভারতের মধ্যে মনভ্রমণ করে কালকূট বুঝেছেন যে, কুন্তী সেই সূর্যসদৃশ রূপবান ধর্মীয় দুর্বাসাকে সেবা করে নিজে সুখী ছিলেন এবং দুর্বাসাকেও যারপরনাই আনন্দ দিয়েছেন। কালকূট আরো বলেছেন, কুন্তীর নারী জীবনের বৈচিত্র্যও এটাই। ইতিহাসের যে পঞ্চকন্যাকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, তার মধ্যে কুন্তীই কুমারী মাতা ও ক্ষেত্রজ সন্তানের মাতা। এই পঞ্চকন্যার মধ্যে "কুন্তীর জীবনই যেন সর্বাপেক্ষা জটিল ও দুঃখী।" *(পৃ: ১৩৯৮, ঐ)* এরপর কালকূট কুন্তীর জীবনের আর এক অধ্যায়ে যাত্রা করতে চেয়েছেন।

কালকূটের যাত্রা কুন্তীর পরবর্তী জীবনের পথে। কাহিনীর প্রয়োজনে যতটুকু প্রকাশ করা দরকার ততটুকু আগেই প্রকাশ করেছেন, এবার বাকীটুকু প্রকাশ করলেন। কুন্তী কৃষ্ণকে বলেছিলেন— " শ্বশুরকুলেও ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রাদির দ্বারা আমি লাঞ্ছিত হয়েছি। কৃষ্ণ! আমার মতো দুঃখীর বেঁচে থাকার আর কী প্রয়োজন?" *(পৃ: ১৩৯৮, ঐ)*

কালকূট লক্ষ্য করছেন কুন্তীর উক্তিগুলো— কোথাও পাণ্ডুর নাম করেন নি। কৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র; তাই হয়ত নিজের দাম্পত্য জীবনের কথা, কন্যকাবস্থায় পুত্রলাভ ও পুত্রত্যাগ, কোনটিই বলতে পারেন নি। কৌরবসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার সময়ে ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের আচরণে তিনি মানসিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। কিন্তু "শ্বশুরের দ্বারাও লাঞ্ছিত হয়েছি" এই গুরুতর অভিযোগটি কুন্তী কী কারণে করেছিলেন, তারই কারণ খুঁজতে কালকূট আবার এক নতুন অধ্যায়ে যাত্রা শুরু করলেন। এই অধ্যায়েই তার জবাব নিহিত আছে।

চম্পানগরীতে অধিরথের কাছে কর্ণকে পাঠিয়ে কুন্তী কিছুটা আশ্বস্ত হলেও সন্তান ত্যাগের কষ্ট তাঁর হৃদয়ে বহমান ছিল। রাজা কুন্তিভোজের কন্যা অসাধারণ সুন্দরী, একথা চারিদিকে ভালোই প্রচারিত ছিল। তাই বিভিন্ন রাজ্যের পরাক্রান্তশালী রাজারা কুন্তীকে বিয়ে করার জন্য

প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। এতে কুন্তিভোজ মহা ফ্যাসাদে পড়ে আত্মীয়-পরিজন, বান্ধব ও অমাত্যগণের সঙ্গে পরামর্শ করে কুন্তীর বিয়ের জন্য স্বয়ংবর সভার আয়োজন করলেন।

কালকূট এই স্বয়ংবর সভায় কুরুবংশের রাজা পাণ্ডুকেও দেখতে পেলেন; ইতিহাসের পাতায় বর্ণিত পাণ্ডুর রূপের বর্ণনার সঙ্গে স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত পাণ্ডুর রূপ মিলিয়ে নিলেন কালকূট— "সূর্য সদৃশ স্বীয় অনুপম প্রতাপ দ্বারা সমস্ত ভূপতিগণের প্রভা ম্লান করে দিয়ে বসে আছেন। তাঁর কারণ প্রতাপ সিংহের মতো, বক্ষদেশ কর্ষণ সদৃশ প্রশস্ত, নয়নযুগল পদ্মসদৃশ মহারাজ পাণ্ডুকে দেখলে, স্পষ্ট বোধহয়, যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র স্বর্গ ছেড়ে কুন্তীকে পাবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন।" *(পৃ: ১৩৯৯, ঐ)*

কুন্তী সেই মহাতেজাপুরুষকে দর্শন করে তাঁর গলাতেই মালা দিলেন। মাল্যদানের সময় কুন্তীর ডানচক্ষু কেঁপেছিল কিনা কিংবা কোনো অশুভ ভাবনা এসেছিল কিনা, কালকূট এটাই ভাবছেন এবং আরও চিন্তার গভীরে ডুবে যাচ্ছেন। পাণ্ডুর যে রূপের বর্ণনা ইতিহাসের পাতা থেকে মনভ্রমণে কালকূট প্রত্যক্ষ করলেন, সত্যিই কি সেইরকম সূর্যসম কান্তি ছিল? কিন্তু জন্মের সময় থেকেই 'ইনি একজন পাণ্ডুবর্ণের পুরুষ।' তাহলে এর কতটা সত্য? সেই সত্যানুসন্ধানে ইতিহাসের পথ ধরে কালকূট হেঁটে চলেছেন। — ব্যাসদেবের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হয়ে জন্মেছিলেন, কারণ তাঁর মাতা ব্যাসদেবকে দেখে ভয়ে চোখ বুজেছিলেন; আর পাণ্ডুকে গর্ভধারণের জন্য ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হতে গিয়ে ভয়ে তাঁর জননী পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন তাই তাঁর গর্ভের সন্তানও পাণ্ডুবর্ণ হয়ে জন্মেছিলেন। দুটো ঘটনাই যুক্তিযুক্ত ঘটনা বলে কালকূটের মনে হয়েছে। তাই কালকূট বলছেন— "আপাততঃ ত্রুটির সন্ধান করতে গিয়ে, আমি এই মুহূর্তে কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। তবে, আমি একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ, ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডু স্বাভাবিক সুস্থপুরুষ ছিলেন না।" *(পৃ: ১৩৯৯, ঐ)*

ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব নিয়ে কেউ কেউ তাঁর বিষয় ও স্নেহান্ধতাকে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু কালকূট বলছেন যে, এগুলো হল ইতিহাসের পাতাকে দূষিত করার চেষ্টা। ধৃতরাষ্ট্র প্রকৃতই অন্ধ ছিলেন। কিন্তু কার ত্রুটির জন্য তাঁর এই অন্ধত্ব? কালকূট নিজেই প্রশ্ন করছেন, — অম্বিকার, না, ব্যাসদেবের। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ক্ষেত্রজ সন্তান ছিলেন। ব্যাসদেবের ঔরসে তাঁদের জন্ম হয়েছিল। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পিতা বিচিত্রবীর্য তাঁর দুই পত্নীর তুলনায় বয়সে ছোট ছিলেন এবং এটাও পরিষ্কার যে, তিনি অত্যন্ত কামুক ছিলেন। কালকূট বলছেন, — "ইতিহাস বলছে, বিচিত্রবীর্য দুই পত্নীর সঙ্গে অতিরিক্ত দৈহিক সম্ভোগের কারণে, যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন। বিচিত্রবীর্য নামের মধ্যে কি বিশেষ কোনো অর্থ আছে? রূপবান সুপুরুষকে কি বিচিত্রবীর্য বলা যেতে পারে?" *(পৃ: ১৩৯৯, ঐ)*

এই জিজ্ঞাসার মধ্যেও আরও কিছু জিজ্ঞাস্য তাঁর মনের আনাচে-কানাচে উঁকি দিয়েছে।

তিনি বলছেন যে, "ইতিহাসের নীরবতার অর্থ এই না, ইতিবৃত্তের অন্তরালের ঘটনাবলীকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা থাকবে না। বিচিত্রবীর্য কি অন্যান্য নারীতেও আসক্ত ছিলেন? যৌনব্যাধি পৃথিবীর মানব সমাজে এক প্রাচীন অভিশাপ। বিচিত্রবীর্য যদি কোনো ব্যাধি তাঁর দুই পত্নীকে দান করে থাকেন, সেটা খুব একটা আশ্চর্যের বিষয় নয়।" *(পৃ: ১৩৯৯, ঐ)*

আরও দুটি বিষয় কালকূটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বেদব্যাস যে দাসীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, সেই বিদুর স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ ছিলেন। বেদব্যাস এক শূদ্রাণীর গর্ভে তাঁর পুত্র শুকদেবের জন্ম দিয়েছিলেন। দু'জনে সুস্থ ছিলেন। অথচ ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডু অস্বাভাবিক ত্রুটিপূর্ণ দুটি সন্তান।

কালকূট ইতিহাসের পাতা থেকে সংকেতের সূত্র ধরে ও যে ঘটনা সম্বন্ধে ইতিহাস চুপ, সেই সংকেতের সূত্র ধরে অনুক্ত বিষয়গুলোকে যুক্তি দিয়ে, নিজেকে প্রশ্ন করে ও সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তার যথার্থতা প্রমাণ করতে করতে পৃথা তথা কুন্তীর জীবনানুসন্ধান করেছেন। বিস্তর অনুশীলনের পর, ভাবনাচিন্তার পর গুণীজনদের সঙ্গে সেই বিষয়ে আলোচনার পর তিনি তাঁর আধুনিক সাহসী মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বহুকালের অজ্ঞানতার অন্ধকারকে তিনি একালের দৃষ্টিতে নতুন করে উপস্থাপিত করেছেন। প্রচলিত বিশ্বাস, অলৌকিকতা — এগুলোর পিছনে কী সত্য লুকিয়ে আছে, সেগুলো সন্ধান করে ক্রমশ আসল সত্য ঘটনাকে উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর নিজের বিশ্বাসই ব্যক্ত করেছেন তাঁর লেখনীতে। যাঁরা অলৌকিকতায় বিশ্বাসী তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসের পথে চলুক, কিন্তু তিনি চলেছেন তাঁর আপন বিশ্বাসে।

আবার কালকূটের সত্যানুসন্ধানের পথ অনুসরণ করা যাক্।

ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হলেও পুত্রোৎপাদনে অক্ষম ছিলেন না। গান্ধারীও ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গর্ভধারণ করেছিলেন ও পিণ্ড প্রসব করার পরে তা থেকে সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। এছাড়াও দাসীর গর্ভে দুটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। কিন্তু পাণ্ডু? এখানেই লুকিয়ে আছে সমস্যা।

এই সমস্যা কালকূট 'অন্তিম প্রণয়' কাহিনীতে ব্যক্ত করেছেন। 'অন্তিম প্রণয়' আলোচনা করার সময় বিস্তর এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবুও এখানে কিছু উল্লেখ না করলে যে মহারানীর অলৌকিক জীবনের সত্য সন্ধানে চলেছেন কালকূট, সেই সত্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হবে না। কালকূটের মনে অনেকগুলি প্রশ্ন? পাণ্ডু রাজা হয়েছিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন বলে। কিন্তু পাণ্ডু যে ত্রুটিহীন পুরুষ ছিলেন না, পাণ্ডুর রূপ ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে পাণ্ডুবর্ণের যোগাযোগ ঘটায় পাণ্ডু যথার্থই দেখতে কেমন ছিলেন সে সম্বন্ধে সঠিক করে কিছু বলা হয় নি। এছাড়া কুন্তী কি শুধু পাণ্ডুর রূপেই মুগ্ধ হয়েছিলেন? অথবা কুন্তী শুধু এইটুকু জানতেন, সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ

নরপতি পাণ্ডু তিনি তার গলাতেই মাল্যদান করেছিলেন? কালকূটের মনে হয়েছে— "সম্ভবত এটাই সত্য। তিনি যদি পাণ্ডু সম্পর্কে আরও কিছু জানতেন, তা হলে হয়ত সেই শুভ দিনে, শুভ মুহূর্তটিতে পাণ্ডুর গলায় মালা পরাতেন না।" *(পৃ: ১৩৯৯, ঐ)* কালকূট নিজেই ইতিহাসের পাতা থেকে মনে মনে প্রামাণ্য যুক্তিগুলো খুঁজে নিয়েছেন এবং এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য তিনি পাণ্ডুর জীবনের কয়েকটি পাতায় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন। বীরযোদ্ধা পাণ্ডুকে মাল্যদান করার পরে মহারাজ বেদবিহিতানুসারে কুন্তীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিয়ে দিলেন। কালকূট দেখছেন, পাণ্ডু কুন্তীকে বিবাহ করে "অসংখ্য ধ্বজা পতাকাযুক্ত সৈন্য সমভিব্যহারে হস্তিনায় প্রবেশ করলেন। তার মানে, স্বয়ংবরে যাবার সময়, পাণ্ডু সৈন্য সামন্ত নিয়েছিলেন। এ বিয়ের উৎসবে, হস্তিনার কোন রাজপুরুষকেই দেখছি না! আবার, তারপরেই দেখছি ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র সবাই বেশ উৎসাহের সঙ্গে, পাণ্ডুকে আবার রাজা শল্যের ভগ্নি মাদ্রীর বিয়ে দিলেন।" *(পৃ: ১৪০০, ঐ)* কুন্তী আর মাদ্রীকে বিয়ে করার পরে পাণ্ডু হস্তিনা প্রাসাদে কতদিন বসবাস করেছিলেন তা সঠিক ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি কিছুকালকে মেনে নিয়েছেন এই যুক্তিতে, কিছুকাল বললে একমাস হতে পারে, একমাসের বেশিও হতে পারে আর কমও হতে পারে। পাণ্ডু বাহীক-পাঞ্জাব দুহিতা মাদ্রীকে বিয়ে করেছিলেন কুন্তীকে বিয়ে করার কতদিন পরে? তিনি বলেছেন এই দুটি বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ ইচ্ছা করে প্রচ্ছন্নতা বজায় রেখেছেন। শুধু একটি জিনিস কালকূট স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন যে, "কুন্তী আর মাদ্রীর মতো দুটি পত্নীর সঙ্গে, পাণ্ডুর মিলন ঘটে নি। অথবা, যদি ধরেও নিই, মিলন ঘটেছিল, তবু এমন প্রত্যাশা করা যায় না, সেই সময়ের মিল নেই কুন্তী বা মাদ্রী গর্ভবতী হবেনই।" *(পৃ: ১৪০০, ঐ)*

এরপরে কালকূট দেখছেন, পান্ডু দুই পত্নীকে রেখে, বহু সৈন্য সামন্ত নিয়ে দিগ্বিজয়ে বের হয়ে প্রথমেই জয় করলেন দর্শন দেশ। তারপরে মগধ, মিথিলা, কাশী, সুম্ব ও পুণ্ড্র জয় করেন। তারপর আরও অনেক দেশ জয় করে কুরুবংশের গৌরব বৃদ্ধি করে হস্তিনায় ফিরে এসেছিলেন। যুদ্ধ জয়ে যে-সব ধন-দৌলত সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলো ভীষ্ম, সত্যবতী, ধৃতরাষ্ট্র, নিজের মা ও ছোটভাই বিদুরকে দান করেছিলেন। তিনি দেখছেন, এগুলো সব স্পষ্ট করে বলা আছে। কিন্তু দেশ জয় করে ফিরে এসে, রাজ্য শাসন করার পরিবর্তে মহারাজ পাণ্ডু কেন দুই পত্নীকে নিয়ে হঠাৎ বনে গমন করলেন, এ বিষয়ে ইতিহাস একেবারে নীরব। কালকূট বলছেন, "এখন পাণ্ডুর হঠাৎ বনে গমন একেবারে যুক্তিহীন। অথবা, বুঝতে হবে, হস্তিনা নগরী ও প্রাসাদে এমন কোনো ঘটনা ঘটেছিল, পাণ্ডু রাজ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ কারণটি যদি বাদ দিই, তবে কি বুঝবো পাণ্ডু বৈরাগ্যবশতঃই বনবাসে গিয়েছিলেন?" *(পৃ: ১৪০০, ঐ)*

কালকূট মহাভারতের ঘটনাকে একালের চোখে একালের যুগোপযোগী কথক ঠাকুরের মতন বলে চলেছেন। ঠিক কথক ঠাকুরের মত বলা নয়, লিখে চলেছেন সেকালের নায়ক-নায়িকাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীকে। তিনি প্রচ্ছন্ন, সমস্ত ঘটনাকে একালের আঙ্গিকে ইতিহাস থেকে তুলে এনেছেন। তাঁদের হৃদয়ের গভীরে ডুব দিয়ে তুলে এনেছেন সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনায় পরিপূর্ণ হৃদয়ের কথা।

পাণ্ডু দুই পত্নীসহ বনে যাওয়ার পরই সেই অতি পরিচিত কিমন্দক ঋষির কথা। কিমন্দক কুটিরে যেহেতু জায়গা নেই, সেইহেতু জঙ্গলের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী হরিণের বেশ ধরে রমণে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছে একটি অযৌক্তিক কাহিনীর অবতারণা। কিমন্দক হয়ত কোনো হরিণীর সঙ্গে পশু মৈথুনে লিপ্ত হয়েছিলেন। পান্ডু মৃগয়ায় বেরিয়ে সেই অবস্থায় দুজনকেই তীরবিদ্ধ করে হত্যা করেছিলেন। কিমন্দক পাণ্ডুকে অভিশাপ দিয়েছিলেন ''পাণ্ডুও যখন স্ত্রী সঙ্গ মে লিপ্ত হতে যাবেন, তখন তাঁর মৃত্যু ঘটবে।'' *(পৃ: ১৪০০, ঐ)*

কালকূট বলছেন যে, ইতিহাসে অভিশাপের ঘটনাগুলোকে ঐশী শক্তির দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে। কিমন্দক মুনির ঘটনা, পাণ্ডুর মৃগহত্যা ও অভিশাপ, সব কিছুই কালকূটের অবাস্তব ও সাজানো বলে মনে হয়েছে। এবং তিনি এটাও বলেছেন অবশ্যই এর পেছনে কোনো উদ্দেশ্য আছে।

দেখা যাক্, কালকূট কোন উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেছেন।

পাণ্ডু যখন কুন্তী ও মাদ্রীর মতো 'দুই হস্তিনীর মধ্যে বিশাল হস্তীর ন্যায়' মহানন্দে ভ্রমণ করেছিলেন তখন হস্তিনাপুরে পর পর অনেকগুলো ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল। বিদুরের বিয়ে হয়ে গেছে। ধৃতরাষ্ট্রের দাসীর বা বেশ্যা পত্নীর গর্ভে ছেলে হল। গান্ধারী প্রসব করলেন এক কন্যা। পাণ্ডুর অভিশাপের ঘটনাটি এতগুলো ঘটনার পরে ঘটেছিল। কালকূটের মনে হয়েছে এই ঘটনাটি হয়ত প্রক্ষিপ্ত, নতুবা স্বয়ং ব্যাসদেব কুরুবংশের রাজাকে ক্লীব দেখাতে চান নি বলেই এরকম কাহিনীর উপস্থাপনা করেছেন। কালকূট ইতিহাস থেকে প্রামাণ্য তথ্য খুঁজে বলছেন, ''কোনো সন্দেহ নেই, পাণ্ডু যতই বলশালী পুরুষ হোন, তিনি ছিলেন অসুস্থ কেবল মৃত শুক্রের ধারক ছিলেন না। তাঁর এমন কোনো ব্যাধি ছিল, যে ব্যাধির কারণে নারী সঙ্গমে লিপ্ত হলেই, মৃত্যু ছিল অবধারিত। অভিশপ্ত হবার আগে দুই পত্নীকে গর্ভবতী করার মতো সময় তিনি অনেক পেয়েছিলেন। কিন্তু পারেন নি। ইতিহাস অলক্ষ্যে থেকে, নীরবেই তার প্রমাণ দিচ্ছে। ভবিষ্যতে কুন্তীর 'শ্বশুরকুলের লাঞ্ছনা'র কথাতেই তার প্রমাণ রয়েছে।'' *(পৃ: ১৪০০, ঐ)* কুন্তীর শ্বশুরকুলের মধ্যে ভীষ্মদেব, ব্যাসদেব, ধৃতরাষ্ট্র এঁরা সকলেই পড়েন। 'শ্বশুরকুলের লাঞ্ছনা' কুন্তীর এই গুরুতর অভিযোগের

কারণ সন্ধানেই সেই সময়ের অনেকটা পথ এগিয়ে আসা হল। কালকূট কিভাবে দেখেছেন।

কুন্তীর বিয়ের পরই পাণ্ডুর অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করেছিলেন। স্বয়ংবর সভায় যে বীরপুরুষকে তিনি মাল্যদান করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে কুন্তীর এই প্রত্যাশা নিশ্চয়ই ছিল স্বামী সহবাসে তিনি সুখী হবেন। তিনি অতিমাত্রায় দেহ-মনে পুত্রার্থিনী হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই প্রত্যাশিত মিলন ঘটেনি। উপরন্তু তাঁর বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই বাহীক কন্যা মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিয়ে হয়ে যাওয়াতে কুন্তী যারপরনাই অবাক ও দুঃখিত হয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজ পাণ্ডু মাদ্রীর সঙ্গেও সহবাসে লিপ্ত হননি। পাণ্ডু যুদ্ধ যাত্রা করেন ও ফিরে এসে দুই পত্নীসহ বনে গমন করেন। কালকূট এর কারণস্বরূপ বলছেন যে, কুন্তী বনবাসকালেই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাণ্ডু প্রকৃতপক্ষে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। বাইরে থেকে যিনি দেখতে সূর্যসম উজ্জ্বল বলশালী, মৃগয়ায় গিয়ে যিনি অক্লেশে বাঘ-সিংহ হত্যা করেন, সেই তিনি স্ত্রী সহবাসে অক্ষম। কালকূটের চোখ দিয়ে কুন্তী, মাদ্রী ও পাণ্ডুর বিবাহিত জীবনের বহু তথ্য অবলোকন করা গেল। "শ্বশুরের দ্বারাও লাঞ্ছিত হয়েছি," এই গুরুতর অভিযোগের একটিই অর্থ কালকূটের কাছে, তা হল এই যে, "ভীষ্ম, বেদব্যাস, এমনকি তাঁর ভাসুর ধৃতরাষ্ট্রও জানতেন, পাণ্ডুর বিবাহ অনুচিত। তাঁর স্ত্রী গ্রহণ করা নিষ্ফল হবে। এসব জেনেও তাঁরা পাণ্ডুকে কুন্তীর স্বয়ংবর সভায় যেতে নিষেধ করেন নি। উপরন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শল্য ভগ্নি মাদ্রীরও ক্ষতি করেছিলেন।" *(পৃ: ১৪০০, ঐ)* কালকূট বলছেন, তিনি দেখেছেন, পাণ্ডুর সঙ্গে বনবাসকালে কুন্তী, মাদ্রী বৈধব্য জীবনযাপন করছিলেন এবং কিমন্দকের ঘটনা একটি কল্পিত অবাস্তব কাহিনী মাত্র। পাণ্ডু কুন্তীর কাছে স্বীকার করলেন যে, সত্যিই তিনি জন্ম থেকেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। স্ত্রী সঙ্গমে লিপ্ত হলেই তাঁর মৃত্যু হবে। তিনি সব রাজপোশাক হস্তিনায় পাঠিয়ে দিয়ে শতশৃঙ্গ পর্বতে গিয়ে মুনি-ঋষিদের তপস্যা করবেন। কিন্তু তাঁর মত এই সাত্ত্বিক জীবনযাপন কুন্তী ও মাদ্রীকে করতে হবে না। কিন্তু কুন্তী পাণ্ডুর শেষ কথা মানেন নি। তারাও পাণ্ডুর মতোই জীবনযাপন করতে, তপস্যা করতে ও ব্রহ্মচর্য পালন করতে চাইল।

সাধারণভাবে দেখা গেল এই কুন্তী-মাদ্রী-পাণ্ডুর জীবনযাপনের একদিক। কিন্তু এর গূঢ় অর্থ কি? কালকূট সেই গূঢ় রহস্যটি বের করতে চান, শুধুই বৈরাগ্য নিয়ে দুই পত্নী সহ বনে গমন নয়। পাণ্ডু জানতেন তাঁর শারীরিক অক্ষমতার কথা; তিনি হস্তিনাপুরের রাজা, অথচ বংশধরের অভাবে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রই কুরুবংশের রাজা হবে, এইটি পাণ্ডু মনে মনে মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদে থেকে সন্তান পাওয়ার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অর্থাৎ ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করা সম্ভব ছিল না। ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর সঙ্গীরা ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনে বাধা দিতেন। সমাজ থেকে

তখন ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্মদান প্রথা উঠে গিয়েছিল। কুন্তী-মাদ্রীর পরে আর কোনো রাণীই ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্ম দেন নি।

পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্ররাই তাঁর নামে কুরুবংশের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে। এই চিন্তা করেই পাণ্ডু শতশৃঙ্গ পর্বতে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন। পাণ্ডুর মনের কথা জানতে পেরে শতশৃঙ্গ পর্বতের ঋষিরা বলেছিলেন যে, "যাঁর পুত্র নেই, তিনি পিতৃঋণে আবদ্ধ থাকেন। অতএব পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য তাঁর পুত্রোৎপাদন অবশ্য কর্তব্য।" *(পৃ: ১৪০১, ঐ)* শুধু তাই নয়, এর নিদানের পথও বলে দিলেন যে, "তিনি প্রাচীন মতানুসারে ক্ষেত্রজ পুত্র লাভ করতে পারেন।" *(পৃ: ১৪০১, ঐ)* কালকূট বলছেন, পাণ্ডুর তো এটাই লক্ষ্য ছিল, হৃষ্টচিত্তে পাণ্ডু প্রথমে কুন্তীকে অনুরোধ করলেন ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য। কিন্তু "কুন্তী কানীনপুত্রের জননী। তিনি জানতেন, সমাজে সেটি একটি গর্হিত অন্যায় কাজ, সেই কারণে তিনি পুত্র স্নেহ থেকে বঞ্চিত। ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনও অনুচিত।" *(পৃ: ১৪০১, ঐ)* তাই কুন্তী প্রথমেই বললেন যে, পাণ্ডু যেন তার সঙ্গেই সঙ্গ মে লিপ্ত হন। পাণ্ডুর সঙ্গে তিনিও স্বর্গে যাবেন। কিন্তু কালকূট বলছেন, "একথা কুন্তী আদৌ বলতেই পারেন না। পুত্র লাভের জন্য স্বামী প্রাণ হারাবেন, তিনি তা কখনও চান নি। বরং তিনি বহু পূর্বের কুরু বংশেরই রাজা ব্যুষিতাশ্বের জীবনের ঘটনা বলেছিলেন।" *(পৃ: ১৪০১, ঐ)*

ব্যুষিতাশ্বের ঘটনাটি এরকম, — বিশাল রাজ্যের অধিকারী ব্যুষিতাশ্ব অপুত্রক অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। তাঁর মহিষী ভদ্রা প্রাণত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আকাশবাণী শুনে ব্যুষিতাশ্ব তাঁর শবদেহে আবির্ভূত হয়ে ভদ্রার গর্ভে তিনজন শাল্ব ও চারজন মদ্রের জন্ম দিয়েছিলেন। কুন্তী এই কাহিনী শুনিয়ে পান্ডুকে বলেছিলেন "আপনি এভাবে আমার গর্ভে পুত্রোৎপাদন করে, আমার সতীত্ব রক্ষা করুন।" *(পৃ: ১৪০১, ঐ)*

পান্ডু এ কাহিনীটি যে অবাস্তব এ'কথা কুন্তীকে বোঝাবার জন্য পাণ্ডু বললেন যে, ব্যুষিতাশ্ব দেবতুল্য মানুষ, তাঁর পক্ষে যেটা সম্ভব সেটা পান্ডুর পক্ষে সম্ভব নয়। একথা বলে তিনি কুন্তীকে সংহিতা যুগের কথা শোনালেন যে "নারী পুরুষ যদৃচ্ছা স্ব স্ব জাতিতে মিলিত হলে কোনো দোষ হতো না! উত্তর কুরুতে (সাইবেরিয়া) এখনও সে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। *(পৃ: ১৪০১, ঐ)* এরপরে তিনি তখন নিজের জন্মের কথাও শুনিয়েছিলেন। কুন্তী শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে পাণ্ডুকে জানালেন কুমারী অবস্থায় দুর্বাসাকে সেবা করার জন্য তার কাছ থেকে পাওয়া বিশেষ মন্ত্রের কথা। সেই মন্ত্রবলে তিনি যে কোনো দেবতাকে ডেকে নিজের অভিলাষ পূরণ করতে পারেন সেটাও জানিয়েছিলেন। কিন্তু কর্ণের জন্মের কথা ঘুরাক্ষরেও প্রকাশ করনে নি। জীবনে কোন কালেই স্বামীর কাছে তিনি তা প্রকাশ করেন নি।

এইখানে এসে কালকূট ইতিহাসের পাতা উল্টে কুন্তীর জীবনের বড় বেদনাদায়ক অবস্থাকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করলেন। কন্যাকাবস্থায় পুত্রের জন্ম দিয়ে তাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল কিন্তু "আজ স্বামী বর্তমান থাকলেও অন্য পুরুষের দ্বারা তাঁকে গর্ভধারণ করতে হবে। পুত্রের জন্ম দিতে হবে।" *(পৃ: ১৪০১, ঐ)*

কুন্তী পাণ্ডুর অনুরোধে ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম দিতে রাজি হয়েছেন। এখানে কালকূট একটি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন যে, "কুন্তী পাণ্ডুকে ভালবাসেন, অথবা করুণা করেন, সেটা ভাববার বিষয়।" *(পৃ: ১৪০১, ঐ)* কুন্তীর ব্যক্তিত্ব যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে বোঝা যায়, তিনি কোন্ দেবতার সঙ্গে মিলিত হবেন, তা তাঁরই ইচ্ছাধীন। "আরও একটি বিষয় আমি দেখেছি, কুন্তী যখনই কোনো পুরুষের সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয়েছেন, সেখানে পাণ্ডুর উপস্থিতি নেই। পাণ্ডুর কোনো ভূমিকাও নেই। তাঁর একটিই ভূমিকা। পুত্রটি হবে তাঁর ক্ষেত্রে। পরিচিত হবে তাঁরই সন্তান রূপে।" *(পৃ: ১৪০১, ঐ)*

কুন্তী ধর্মকে আহ্বান করেছেন তাঁর গর্ভে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের জন্য। এই ধর্ম কে হতে পারেন? কালকূট বলছেন, "ইতিহাসের পাতা থেকে ধূলার আস্তরণ সরালেই, এই ধর্মাত্মাকে আমি দেখতে পাই।" *(পৃ: ১৪০১, ঐ)* যিনি এই ধর্মাত্মাকে জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি সেই ধর্মাত্মার মায়ের গর্ভে তাঁকে উৎপাদন করেই বলেছিলেন, "হে কল্যাণি! তোমার গর্ভে যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ আসছেন, তিনি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও ধর্মাত্মা হবেন।" *(পৃ: ১৪০১, ঐ)* কালকূট বলছেন, "এই পুরুষের নাম বিদুর। ইনিই ধর্ম। আমি জানি, ইতিবৃত্তের প্রচ্ছন্ন ধারাকে যারা বুঝতে অক্ষম, তাদের কাছে, ধর্ম যে স্বয়ং বিদূর, এ তত্ত্ব মেনে নেওয়া কঠিন। কিন্তু বহু ঘটনার দ্বারাই এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।" *(পৃ: ১৪০১, ঐ)*

কুন্তী বিদুরকে সংবাদ দিয়ে হস্তিনাপুর থেকে শতশৃঙ্গ পর্বতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কালকূট এর সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন এই বলে যে, বিদুরকে শতশৃঙ্গ পর্বতে ডেকে আনার পরে যেসব ঘটনা ঘটেছিল সেই অনুধাবন করলেই সমস্ত বিষয়টির ঐতিহাসিক বাস্তবতা প্রমাণিত হবে।

দেখা যাক্, কোন্ কোন্ ঘটনাবলী কালকূট আলোকপাত করেছেন, অতীত ভ্রমণে গিয়ে নিজে এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। কালকূটের দেখা সেই ঘটনাগুলি হল — বিধবা রাণী কুন্তী একমাত্র বিদুরকেই ভরসা করতেন। তাইতো কালকূট দেখছেন, দুর্যোধন যখন বিষপান করিয়ে ভীমকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন তখন কুন্তী তাঁর আশঙ্কা আর অন্তরের সন্দেহের কথা বিদূরকে বলেছিলেন। একথায় বিদূর কুন্তীকে আশ্বস্ত করেছিলেন এই বলে যে, "কুন্তী যেন মনে রাখেন স্বয়ং ব্যাসদেব বলেছেন, পাণ্ডবগণ সকলেই দীর্ঘায়ু। ভীম অবশ্যই ফিরে আসবেন।" *(পৃ: ১৪০২, ঐ)*

কিন্তু কুন্তী যেন তার সন্দেহের কথা আর কারো কাছে প্রকাশ না করেন। জতুগৃহে ষড়যন্ত্রের কথা বিদুর আগেই সাংকেতিক ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, সে ঘটনাও কালকূট দেখেছেন। বিদুরের সতর্কবাণীর জন্য কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডব জতুগৃহের আগুনে পুড়ে মরার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। এছাড়া হস্তিনাপুরের রাজসভায় সেই কলঙ্কিত ঘটনার সময়, কালকূট মানসচক্ষে দেখেছেন, একমাত্র বিদুরই দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করেছিলেন, আর সব রথীমহারথীরা নীরব ছিলেন।

পাণ্ডবদের বনগমনের পর ধৃতরাষ্ট্রের কপট কথা ও আচরণে বিদুর মনে দারুণ কষ্ট পেয়েছিলেন এবং তিনি কাম্যকবনে পাণ্ডবদের কাছে চলে গিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র নিজে ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চেয়ে বিদুরকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বনবাস থেকে ফিরে এসে পাঁচটি গ্রাম পাণ্ডবরা চাইলেন। সঞ্জয়কে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, "আপনি মহামতি বিদুরকে বলবেন, আমরা তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করছি। বলবেন, যুধিষ্ঠির যুদ্ধ চায় না। তিনি যেন এই সংকটকালে ধৃতরাষ্ট্রকে সুপথে চলার উপদেশ দেন, শান্তির কথা শোনান।" *(পৃ: ১৪০২, ঐ)*

কালকূট দেখেছেন, সেই সময়ে কৃষ্ণ এসেছেন হস্তিনায় শান্তির পরামর্শ দিতে। কৃষ্ণ অতিথি হলেন মহামতি বিদুরের। এই কৃষ্ণকেই কুন্তী বিদুর সম্পর্কে বলেছেন, "সেই দ্যুতক্রীড়ার সভায় উপস্থিত সকলের মধ্যে আমি একমাত্র বিদুরকেই প্রশংসা করি। ধর্ম বা বিদ্যার দ্বারা মানুষ আর্য হতে পারে না। চরিত্রেই আর্যত্ব লাভ করা যায়। কৃষ্ণ! সেই মহাবুদ্ধি গম্ভীর মহাত্মা বিদুরের চরিত্রই অলঙ্কার। এবং তা ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে।" *(পৃ: ১৪০২, ঐ)*

কালকূটের প্রদর্শিত ঘটনাগুলি দিয়েই বিদূরের গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা গেল। কৃষ্ণ থেকে শুরু করে, পাণ্ডবদের যাঁরা ঘোরতর শত্রু, তাঁরাও সকলে বিদুরকে মহামতি, ধর্মজ্ঞ বলে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ থেকে পনেরো বছর পরের হস্তিনারাজ্যে মনভ্রমণে দেখলেন,— দিনটি ছিল কার্তিক পূর্ণিমার দিন; গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর, সঞ্জয় এবং ধৃতরাষ্ট্র বনে গমন করলেন। সকলেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর কুরুক্ষেত্রে রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে বাস করছিলেন। "যে ধৃতরাষ্ট্রকে একসময় বিদুর অনেক উপদেশ দিয়েও তাঁকে সৎপথে ফেরাতে না পেরে কটু কথা বলেছেন, তাঁর সেবায় ও তপস্যায় বল্কল ও চীরধারী বিদুর অত্যন্ত কৃশ হয়ে গিয়েছিলেন।" *(পৃ: ১৪০২, ঐ)*

এর কিছুদিন পরে পাণ্ডবরা সপরিবারে ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে গিয়ে বিদুরকে দেখতে পেলেন। তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে জানতে পারলেন— "বিদুর কুশলেই আছেন। তিনি এখন ঘোর তপস্যায় নিরত। আহার বস্ত্রাদি ত্যাগ করে, বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে জীবনধারণ করছেন, তাঁর শরীর অতিমাত্রায় কৃশ ও অস্থিচর্মসার হয়েছে।" *(পৃ: ১৪০২, ঐ)*

যুধিষ্ঠির একাই বিদুরের খোঁজে বের হয়ে গভীর বনের মধ্যে, নগ্ন, মলিন এবং বনের ধূলিতে সমাচ্ছন্ন বিদুরকে দেখলেন। তাঁকে কখনও দেখা যায়, কখনও যায় না। রাজা যুধিষ্ঠির সেই বনের মধ্যে চিৎকার করে তাঁকে ডাকতে লাগলেন, — 'আমি তোমার অতি আদরের রাজা যুধিষ্ঠির' এবং তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির দেখলেন "তখন বিদুর এক গাছে হেলান দিয়ে যুধিষ্ঠিরের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। বিদুর যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি সংযুক্ত করে, যোগবলে যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করলেন। যুধিষ্ঠির দেখতে পেলেন গতায়ু বিদুরের শরীর সেই গাছেই ঠেকে আছে। তাঁর দেহে বিদুরের অনুপ্রবেশে, যুধিষ্ঠির নিজেকে অধিকতর বলবান বলে অনুভব করলেন।" *(পৃ: ১৪০২, ঐ)* যুধিষ্ঠির তখন বিদুরকে দাহ করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। কিন্তু দাহ করা হল না। কে যেন তাকে নির্দেশ দিলেন যে, বিদুরের দেহ দাহ করা যাবে না, কারণ বিদুর যতিধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার দেহ অগ্নিসংস্কার হবে না। এরজন্য রাজা যুধিষ্ঠির যেন শোক না করেন। যুধিষ্ঠির আশ্রমে ফিরে এলেন এবং সমস্ত ঘটনা বললেন, তাঁর কথা শুনে সকলেই অবাক হয়ে গেলেন।

কালকূট বিদুরের সম্পর্কে বলছেন যে, "ইতিহাসের এই মহান বৃত্তান্ত থেকে, আমি জানলাম বিদুরের এমন ভাবে তিরোভাবের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এখানেই সেই তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যুধিষ্ঠির ধর্মের পুত্র বলে খ্যাত। বিদুরও ধর্মের অংশ থেকেই উৎপন্ন হয়েছিলেন। এখানে ধর্ম ধর্মে লীন হয়েছে বটে। আমি দেখছি, পিতা পুত্রের দেহের মধ্যে অনুপ্রবেশ করলেন।" *(পৃ: ১৪০২, ঐ)* ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন সংকেত থেকে কালকূট তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের প্রামাণ্য স্বরূপ দৃষ্টান্ত, ঘটনাবলী, ইতিহাস থেকেই তুলে এনেছেন। অকাট্য যুক্তি। এরপরেও কালকূট বলেছেন, তাঁর এই বক্তব্যে ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন সংকেতকে যারা বুঝতে অক্ষম, অলৌকিকতাকে যারা বিশ্বাস করে, তাদের পক্ষে তত্ত্ব মেনে নেওয়া কঠিন। কেউ কেউ কুন্তীর সঙ্গে বিদুরের মিলনে, যুধিষ্ঠিরের জন্ম সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবে। জ্ঞানকে বিসর্জন দিয়ে অজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

স্বয়ং মহাভারতকার প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করেননি, এ'কথা কালকূট বলছেন না। কুন্তীর কন্যকাবস্থায় গর্ভধারণ সেই সময়ে সমাজে কলঙ্কিত বলে গণ্য হত, তাই কুন্তীর সন্তানের জন্মকথা গোপন ও সন্তান পালনের গোপন ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সে কথাও ঐতিহাসিক ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সমসাময়িক সামাজিক ব্যবস্থার প্রভাব ইতিহাসের উপরে পড়েছিল। প্রকৃত ঘটনার মধ্যে কতকগুলো অলৌকিক কাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। কালকূট আরও বলেছেন "কুন্তীর ক্ষেত্রজ পুত্রের কাহিনীকে এমন একটা অলৌকিকতা দান করেছেন, যেন ওসব দেবদেবীর ব্যাপার। সাধারণ নরনারীর জীবনে ওসব ঘটতে পারে না।" *(পৃ: ১৪০২, ঐ)* কালকূট আরও

বলেছেন ''কুন্তীর জীবনের বৈশিষ্ট্যই হলো, সংহিতা যুগের নারীর জীবনে যা ঘটতো, তাঁর জীবনে তারই 'পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল'। সেজন্য গোপনীয়তার প্রয়োজন হয় তো ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক সবসময়েই সেই গোপনীয়তার মধ্যে, সত্যের একটি সংকেতও দিয়ে রাখেন।'' *(পৃ: ১৪০৩, ঐ)* তিনি ইতিহাসের সেই সংকেতের মধ্য দিয়েই ঐতিহাসিক মহারাণীর জীবনের অলৌকিকতাগুলো খুঁজে বের করতে ব্রতী হয়েছেন এবং একটার পর একটা অকাট্য যুক্তি দিয়ে অবাস্তবতায় ঢেকে দেওয়া ঘটনাগুলো বাস্তবের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কালকূট প্রথমে কুন্তীর কানীনপুত্র জন্মের অলৌকিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি ইতিহাসের সংকেত মত দুর্বাসাকেই কর্ণের পিতা বলেছেন। এখন দেখা যাক দুর্বাসা কুন্তীকে অথর্ববেদ থেকে কী মন্ত্র দান করেছিলেন, এ সম্পর্কে লেখক কালকূটের আধুনিক মনের ভাবনা কি?

কালকূট বলছেন ''সেই মন্ত্রের মূল যদি কিছু থাকে, তবে তা হল একটি দৃঢ়তাসূচক উপদেশ। অথবা কুন্তীকে আত্মসচেতন করে তোলাই ছিল দুর্বাসার উদ্দেশ্য।'' *(পৃ: ১৪০৩, ঐ)*

দুর্বাসা কুন্তীকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, ''তোমার রূপ, সততা, ব্যক্তিত্ব, যে কোনো পুরুষকেই আকর্ষণ করতে সক্ষম। আমার কথা কখনও মিথ্যা হবার নয়।'' *(পৃ: ১৪০৩, ঐ)*

একথার প্রমাণ তো কালকূট আগেই দেখিয়েছেন, — তেজস্বী, মহামতি দুর্বাসা কুন্তীর প্রতি বিশেষভাবে প্রসন্ন। তাঁর মতো আরও পুরুষরা যে কুন্তীর প্রতি আকর্ষণবোধ করবেন, এটাই স্বাভাবিক।

কুন্তী যে তাঁর 'পারসব' দেবর বিদুরকে শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁকে যথার্থ 'ধর্ম' বলে বিশ্বাস করতেন। তাই পাণ্ডু যখন কুন্তীকে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন করার অনুরোধ জানালে কুন্তী সম্মত হয়েছিলেন এবং পুত্রার্থিনী হয়ে তিনি বিদুরকে প্রার্থনা করেছিলেন।

নীতিজ্ঞানসম্পন্ন বিদুর কুন্তীর দুঃখের কথা জানতেন, তাই তিনি কুন্তীর প্রার্থনা মতো তাঁর গর্ভ সঞ্চার করেছিলেন। কালকূট কুন্তীর হৃদয়ের গভীরে উঁকি দিয়ে বুঝেছেন কুন্তী সুখী হতে পারেন নি। একবার দেহদান করাও যা, শতবার করাও তাই। এবং বিদুরের প্রতি তাঁর যত আকর্ষণই জন্মাক, তাঁকে চিরকালের জন্য নিজের কাছে রাখা সম্ভব ছিল না। রাজকার্যের জন্য কুন্তীর কাছ থেকে নিয়েছিলেন। কালকূট মনভ্রমণের মধ্য দিয়ে যুধিষ্ঠিরের জন্ম ইতিহাস প্রত্যক্ষ করলেন। কুন্তী ভেবেছিলেন যে, পাণ্ডু একটি পুত্র পেয়েই সন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু তা নয়। আঁতুড়ে যুধিষ্ঠিরকে দেখেই তাঁর আর একটি পুত্রের পিতা হবার আকাঙ্ক্ষা হল। অতএব কালকূটকে ইতিবৃত্তের পথ সন্ধানে নতুন করে যাত্রা শুরু করতে হল। ভারত ইতিহাসের আদি অধ্যায়ে কালকূট দেখেছেন, ''পাণ্ডবগণ, পাঁচজন বিভিন্ন ইন্দ্রের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছিলেন। এই পাঁচজন

ইন্দ্রের মধ্যে প্রথমের নাম বিশ্বভূক। দ্বিতীয় ভূতনামা। তৃতীয় শিবি। চতুর্থ শান্তি। পঞ্চম তেজস্বী।" *(পৃ: ১৪০৩, ঐ)*

তিনি একটু সংশয়ান্বিত। আশ্রমবাসিক পর্বে দেখেছেন, যুধিষ্ঠির ধর্মের অংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীম বায়ু দ্বারা ও অর্জুন ইন্দ্রের পরিবর্তে পুরাতন নর ঋষির দ্বারা উৎপন্ন হয়েছেন। নকুল ও সহদেব যথারীতি সেই অশ্বিনী কুমারদ্বয় হতে উৎপন্ন হয়েছে। সব ঠিকই আছে। কিন্তু অর্জুন ইন্দ্রের বদলে পুরাতন নর ঋষির দ্বারা উৎপন্ন হয়েছেন কেন? তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছেন অগ্নিপুরাণে। অগ্নিপুরাণের বর্ণনায় দেখেছেন যে, পঞ্চপাণ্ডব হিমালয়ের শক জাতীয় ঋষিদের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছেন। আধুনিক ঐতিহাসিক এ বিষয়ে কোন সংকেত দিতে পারেন নি।

ভারত ইতিহাসেই কালকূট দেখেছেন যে, ঋষি নর ও নারায়ণ গন্ধমাদন পর্বতে ছিলেন। স্বর্গলোক বা ব্রহ্মলোক যখনই অসুররা আক্রমণ করে অত্যাচার করত তখন এঁরা স্বর্গলোক বা ব্রহ্মলোকে গিয়ে অসুরদের যুদ্ধে পরাজিত করে, তাঁদের বিতাড়িত করতেন। "নারায়ণ মূর্তি কৃষ্ণ ও অর্জুনের সঙ্গে খাণ্ডবদাহের সময় বহুতর প্রাণী বধ করেছিলেন। এই কৃষ্ণই সেই নারায়ণ। এই অর্জুনই সেই নর। নারায়ণ ঋষি বহুতর গুণে, নর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।" *(পৃ: ১৪০৩, ঐ)* কালকূটের মনে হয়েছে নরনারায়ণের কাহিনীটি হয়ত প্রক্ষিপ্ত। ভারতকথায় উল্লেখ আছে পাঁচজন ইন্দ্রের দ্বারা পাণ্ডবদের জন্ম হয়েছিল। কালকূটের মনে হয়েছে এটিও প্রক্ষিপ্ত। পাঁচজন ইন্দ্রের দ্বারা পাণ্ডবদের জন্মের কথা কালকূট সত্যি বলে মেনে নিতে পারেন নি। তাই কালকূট ইতিবৃত্তের পুরানো ধারাটিকেই অনুসরণ করেছেন। এখন দেখা যাক পরবর্তী ঘটনা। যুধিষ্ঠিরের জন্মের পর, পাণ্ডু কুন্তীর কাছে আর একটি যোদ্ধা বলশালী পুত্রের জন্য অনুরোধ করাতে দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম দিতে রাজি হয়েছিলেন।

শতশৃঙ্গ পর্বতে অনেক বিদ্বান বিচক্ষণ, নানা বিদ্যায় পারদর্শী ঋষিদের মধ্যে অনেকেই কুন্তীর প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ অনুভব করতেন। এদিকে প্রচলিত কাহিনিতে দেখা যাচ্ছে যে, কুন্তী বায়ুকে আহ্বান করেছিলেন একটি বলশালী পুত্র লাভ করার জন্য এবং সেই বায়ু 'মৃগারোহণপূর্বক' আগমন করেছিলেন। মহাবল বায়ুর মতন একজন দেবতা ব্যক্তি হরিণে চেপে আসেন কেমন করে?— এসব ভাবতে ভাবতেই স্বর্গলোকের পথে কালকূট মনভ্রমণ করেছেন, সেই পথ তো দুর্গম ও অপ্রশস্ত। দ্রুতগামী রথে সেই পথ দিয়ে আসা যাবে না। অশ্বারোহণে এলেও অনেকদিন লেগে যাবে। যুধিষ্ঠিরের জন্মের দু'মাস পরেই কুন্তী আবার গর্ভবতী হয়েছিলেন। অনুচর পাঠিয়ে এই দু'মাসে বায়ুকে আহ্বান করলে শতশৃঙ্গ পর্বতে হয়ত পৌঁছানো সম্ভব ছিল; তবুও কালকূটের

মনের সন্দেহ দূর হয়নি। তাঁর অনুমান শতশৃঙ্গ পর্বতের কোনো বলশালী, বিদ্বান ঋষিকেই কুন্তী আহ্বান করেছিলেন ভীমের জন্ম দিতে। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের জন্ম সম্বন্ধেও যথেষ্ট পরিচ্ছন্নতা নেই। তবু তিনি অনুমান করছেন, শতশৃঙ্গ পর্বতের কোন বিশিষ্ট ঋষি পুরুষের ঔরসে অর্জুনের জন্ম হয়েছিল। শতশৃঙ্গ পর্বতের এই ঋষি ছিলেন ব্রাহ্মণ পরশুরামের মতোই অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ।

ইতিহাসবিদ ব্যাসদেব স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি বলে কালকূট ধন্দে পড়ে গেছেন। ইন্দ্রকে আহ্বানের কথাও তিনি উড়িয়ে দিতে পারছেন না। কেননা, কুন্তীর রূপ, সততা সেকালের শ্রেষ্ঠ মানুষ ও দেবতাকে আকৃষ্ট করত। তবুও কালকূট বলেছেন, — পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে যেখানে শতশৃঙ্গের ঋষিরা পাঁচটি বালক পুত্রসহ কুন্তীকে হস্তিনায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি ঐতিহাসিক সত্য রয়ে গেছে। কুন্তী যখন একে একে পুত্রদের জন্ম দিচ্ছিলেন তার খবর কেন হস্তিনায় পৌঁছায় নি — এ'কথার উত্তর কালকূট কোথাও পাননি। ভারতকার এ বিষয়ে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রেখেছেন।

যাই হোক পাণ্ডু অর্জুনের জন্মের পর কুন্তীকে চতুর্থ সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য অনুরোধ করাতে পাণ্ডুকে বলেছিলেন যে, চতুর্থ পুরুষ সংসর্গ করলে নারী 'স্বৈরিণী' হয় এবং পঞ্চম পুরুষ সংসর্গ করলে 'বেশ্যা' হয়। এ তথ্য পাণ্ডু জেনেও কেন তাঁকে আবার এই অন্যায় অনুরোধ করছেন? পাণ্ডুকে এই কথা বলে কুন্তী নিরস্ত্র করেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের অন্তরের জ্বালাকে প্রশমিত করতে পারেন নি। কালকূট কুন্তীর অন্তরে উঁকি দিয়ে দেখেছেন "অন্তরে তিনি স্বৈরিণী ছিলেন, এবং তা যতকাল প্রকাশ করতে পারেন নি, ততকাল কষ্ট পেয়েছেন।" *(পৃ: ১৪০৫, ঐ)*

পাণ্ডুর পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়েছে, যুধিষ্ঠিরের বয়স তখন ১৬, তাহলে এতদিন হস্তিনাপুরের কেউ কেন জানতে পারলেন না? এ প্রশ্ন কালকূটের মনেও যেমন জেগেছে, তেমনি তিনি দেখছেন, কুরুকুলের রাজপুরুষ ও মহিলাদের মনেও সেই একই প্রশ্ন? বিস্ময়! মহামতি ভীষ্মের মনেও এই প্রশ্নেরই উদয় হয়েছে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। তাই ভীষ্ম সেই মুহূর্তে সকলের চিন্তিত অবস্থায় হস্তিনায় উপস্থিত প্রজাবৃন্দের মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করছিলেন। প্রজাদের মুখে-চোখে ঋষিদের কথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হওয়াতে ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ শতশৃঙ্গ পর্বতের ঋষিদের পাদবন্দনা করে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে পাণ্ডু ও মাদ্রীর অস্থিখণ্ড গ্রহণ করেছিলেন। বিদুরকে অস্থিখণ্ড দাহের ব্যবস্থা ও অন্যান্য কার্যাদির দায়িত্ব দিয়ে পাঁচটি ঋষিবালককে রাজপুত্রের মর্যাদা দিয়ে ইতিহাসের এক সংকটময় মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তাঁর রাজনীতি জ্ঞানের দ্বারা অতি সাবধানে মিটিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

কিন্তু দুর্যোধনকে বোঝাতে পারেন নি। দুর্যোধন পিতামহ ভীষ্মের এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে

পারেন নি। পাঁচটি পিতৃপরিচয়হীন ঋষিবালক কুরুকুল বংশের সিংহাসনের দাবিদার হয়ে গেল, এটা দুর্যোধন মেনে নিতে পারেন নি। সেই না মেনে নিতে পারা থেকেই কালকূট দেখলেন— ইতিহাস সর্পিল পথে এগোতে থাকল। দুর্যোধনের মনে হিংসার জন্ম নিল।

কুন্তী রাজ অন্তঃপুরে আশ্রয় পেয়ে ভেবেছিলেন একটু বুঝি স্বস্তি মিলল। পুত্রদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই তাঁর হৃদয়ে শান্তি মিলবে। কিন্তু দুর্যোধন তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিল না। দুর্যোধন ভীমের খাদ্যে বিষ মিশিয়ে ভীমকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। বিদুর প্রথমেই সতর্ক করেছিলেন কুন্তীকে এই বলে যে, তিনি বন্ধু-বান্ধব পরিবৃত হয়ে থাকলেও একমাত্র বিদুরই তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই তিনি ভীমকে বিষ খাওয়ানোর কথা গোপন করতে বলেছিলেন। কুন্তীর জীবনের ইতিহাস নদীর গতির মতোই সর্পিল। জীবনের জটিল মুহূর্তে তিনি তাঁর পরিত্যক্ত পুত্রকে চিনতে পারেন তাঁরই দেওয়া 'কবচ ও কুণ্ডল' দেখে।

একদিন গান্ধারীর পাশে বসেছিলেন রঙ্গভূমির বাইরে রাজপুত্রদের অস্ত্রচালনা দেখবেন বলে। অর্জুন রণভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে অসামান্য রণ-নৈপুণ্য দেখালো। সমস্ত জনগণ ও রাজপুরুষগণও এতে ধন্য ধন্য করতে লাগল। কুন্তীর পুত্র-গৌরবে মনে হচ্ছিল "তাঁর স্তনযুগল যেন দুধে সিক্ত হচ্ছে।" *(পৃ: ১৪০৫, ঐ)* কিন্তু আবার রঙ্গভূমিতে কোলাহল। "রঙ্গভূমিতে কর্ণ প্রবেশ করে অর্জুনের মতোই অস্ত্রবিদ্যা দেখালেন, এবং অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে অভিলাষী হলেন। অর্জুন আর কর্ণকে কেন্দ্র করে দর্শকদের মধ্যে দুটি ভাগ হয়ে গেল। আর কুন্তী কী দেখলেন?" *(পৃ: ১৪০৫, ঐ)*

কুন্তী কর্ণকে দেখামাত্রই চিনতে পারলেন। "তাঁর নিজেরই দুই পুত্র পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য অবতীর্ণ হতেই, কুন্তী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।" *(পৃ: ১৪০৫, ঐ)* কালকূট সেই সুদূর অতীতের চরিত্র ও ঘটনাবলীকে লক্ষ্য করছেন। বিদুর মুহূর্তে সচকিত হয়ে কুন্তীকে শীতল জল দিয়ে পরিচর্যা করার নির্দেশ দিলেন। কুন্তীর জ্ঞান ফিরেও স্বস্তিবোধ হল না। কিন্তু অর্জুন তাঁকে স্বস্তি দিয়েছিলেন। রাজপুত্র হয়ে সুতপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না এই কথা বলে।

কালকূট লক্ষ্য করছেন দুর্যোধনকে। পাণ্ডবদের তিনি ঈর্ষার চোখে দেখতেন। কর্ণের মত বীরকে অপমানিত হতে দেখে দুর্যোধন কর্ণকে বন্ধুত্বের বাঁধনে বেঁধে ফেললেন। এবং পিতা ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম ও বিদুর কারো সঙ্গেই আলোচনা না করে অর্জুনের কথা শোনামাত্র কর্ণকে অঙ্গরাজ্য দান করে রাজা বলেও ঘোষণা করলেন। সবাই অবাক হয়েছিল দুর্যোধনের অধিকারবোধ দেখে। দুর্যোধনের এই আচরণে কালকূটের তাঁকে দূরদর্শী বলেই মনে হল। আর অন্যদিকে কুন্তী মনে মনে খুব আনন্দিত হয়েছিলেন কর্ণ রাজা বলে ঘোষিত হওয়ায়।

ধৃতরাষ্ট্র নানা ছলে কুন্তী সহ পাণ্ডবদের বারণাবত নগরীতে পাঠিয়ে জতুগৃহে থাকতে

দিয়েছিলেন তাঁদের পুড়িয়ে মারার জন্য। সে হত্যার চেষ্টাও সফল হয়নি। বিদুর সময়মত ম্লেচ্ছভাষায় সংকেত পাঠোনোর জন্য।

জতুগৃহ থেকে পালানোর সময় হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষসকে ভীম যুদ্ধে বধ করেছিলেন। তাঁর বোন সুন্দরী হিড়িম্বা ভীমকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কালকূট এখানে তাঁর 'রাক্ষস' শব্দ সম্বন্ধে বলেছেন, রাক্ষসরাও এক ধরনের মানুষ। কুন্তী হিড়িম্বার মনের কথা জানতে পেরে নিজেই "ভীমকে হিড়িম্বার পাণি গ্রহণের নির্দেশ দেন। কুন্তী নিজে জানতেন একজন অপাপবিদ্ধা রমণী কেন ভীমের মতো বীরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে।" *(পৃ: ১৪০৫, ঐ)* কুন্তী আরও কতকগুলো নির্দেশ দিয়েছিলেন, দেখা যাক সেই নির্দেশগুলো।

একাচক্রা নগরীতে যে ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই গৃহের ব্রাহ্মণকে তিনি কথা দিয়েছিলেন, এক মাংসভোজী বক রাক্ষসের কাছে ব্রাহ্মণের বা তাঁর পুত্রের বদলে তাঁর পুত্র ভীম যাবেন।

কালকূট কুন্তীর মনের ভিতরে উঁকি দিয়েছেন। বুঝতে পারলেন কুন্তী ভুল সিদ্ধান্ত নেন নি। বকের মত একজন রাক্ষস ব্যক্তিকে হত্যা করা জনসমাজের কাছেও প্রয়োজন ছিল। পুত্রের বীরত্বে ও সাহসের প্রতি কুন্তীর ভরসা ছিল। তাই তিনি নিজের বলশালী বীরপুত্র ভীমকে পাঠিয়েছিলেন বক রাক্ষসকে হত্যা করার জন্য।

কুন্তী পাঁচপুত্রের এক স্ত্রীকে গ্রহণ করাকে সমর্থন করেছিলেন। কালকূট কুন্তীর মনজগতে ডুব দিয়ে দেখছেন, — "তিনি পাঁচ পুত্রের মুখ দর্শনেই বুঝেছিলেন, সকলেই দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ ও তাঁর পাণিপ্রার্থী। তিনি যদি সেদিন ঘটনাটি সমর্থন না করতেন, তাহলে পাণ্ডব ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতো।" *(পৃ: ১৪০৫, ঐ)* তিনি বলছেন দ্রৌপদী সম্পর্কে যে ভিক্ষালব্ধ পাঁচ ভাইয়ের যে গল্প প্রচলিত আছে তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কুন্তী না জেনে এরকম সিদ্ধান্ত নেন নি। ব্যাসদেবের কাছে পাণ্ডবদের দ্রৌপদী লাভের ঘটনা কুন্তী আগেই জেনেছিলেন। অতএব অত্যন্ত বিচক্ষণতার কাজ করেছিলেন তিনি সেদিন। দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে পাণ্ডবদের বনবাস যাত্রাকালে কুন্তীও সঙ্গী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিদুর যেতে দেন নি, তিনি বিদুরের গৃহেই ছিলেন। সেই বনবাস যাত্রাকালে কুন্তী দ্রৌপদীকে বলেছিলেন সহদেবকে লক্ষ্য রাখতে। তিনি মা, তাই তিনি জানতেন সহদেব সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান, তাঁর কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা কম। কালকূট দেখেছেন, এক স্নেহশীলা মাতাকে। মাদ্রীপুত্র সহদেব, কিন্তু কখনও তাঁর স্বাভাবিক ও ন্যায় বুদ্ধি মুহূর্তের জন্য হারান নি।

কৃষ্ণের পাণ্ডব পক্ষে থাকার সিদ্ধান্তেও কুন্তীর ভূমিকা আছে। কৃষ্ণের পিসিমাতা কুন্তী তাঁর

মনের দুঃখের কথা এমনভাবে বলেছিলেন যে, তা শুনেই কৃষ্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গেই থাকবেন।

কালকূট কুন্তীকে যতই দেখছেন, ততই আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন। কুন্তীর প্রতি কালকূটের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যাচ্ছে। কালকূট কুন্তীকে জানতে মহাভারতের যুগ থেকে অনেক আগের যুগ ক্রমশ কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি কালে এসে পৌঁছেছেন। কৃষ্ণের শান্তি প্রস্তাব ব্যর্থ হয়েছে। তিনি শেষ পর্যন্ত দুর্যোধনকে সম্মত করাতে পারেন নি। কৃষ্ণ কুন্তীর কাছে এসে জানতে চেয়েছিলেন এরপরে তিনি যুধিষ্ঠিরকে কী বলবেন। কুন্তীর উত্তর যেন কালকূট শুনেছেন। বলেছেন "তুমি যুধিষ্ঠিরকে বলবে, তার ধর্ম ক্ষীণ হচ্ছে। আমি তাঁর মা হয়ে পরগৃহবাসিনী। আমাকে ধিক্। তুমি ভীম অর্জুনকে বলবে, তাদের ক্ষত্রিয়ের পরীক্ষাকাল উপস্থিত হয়েছে। তারা যদি এ সময় বৃথা নষ্ট করে, তবে আমি তাদের মুখ দেখতে চাই না। প্রাণের ভয় না করে, তারা যেন প্রাণ দেওয়াটাই শ্রেয় বলে মনে করে। নকুল সহদেবকেও এ কথাই বলবে।" *(পৃ: ১৪০৬, ঐ)*

কুন্তী আরও বলেছিলেন "কৃষ্ণ, তুমি যুধিষ্ঠিরকে আরও বলবে, তার বুদ্ধি ক্ষত্রিয়োচিত নয়। ক্ষত্রিয় সন্তান বাহুবলে পৃথিবী জয় করবে, ধর্মপথে থেকে প্রজাপালন করবে। ... যুধিষ্ঠির যেন এসব কথা স্মরণে রেখে, পৈতৃক রাজ্য যুদ্ধের দ্বারা উদ্ধার করে, এই আমার আদেশ।" *(পৃ: ১৪০৬, ঐ)*

এরপরে কুন্তী বিদুলা নামে এক তেজস্বিনী রমণীর গল্প কৃষ্ণকে শুনিয়েছিলেন। বিদুলার পুত্র সঞ্জয় সিন্ধুরাজের কাছে পরাজিত হয়ে ঘরে শুয়ে, বসে, উদ্যমহীনতায় দিন কাটাচ্ছিল বলে বিদুলা পুত্রকে বলেছিলেন "যা, হয় বীরত্ব দেখা, নয় মৃত্যুবরণ কর।" *(পৃ: ১৪০৬, ঐ)* বিদুলার কথায় সঞ্জয়ের প্রাণে ক্ষাত্রধর্ম জেগে উঠেছিল এবং সে আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। পাণ্ডবজননী কুন্তী কৃষ্ণকে আরও বলেছিলেন, কৃষ্ণ যেন তাঁর পুত্রদের এ কাহিনী শুনিয়ে বলে "ক্ষত্রিয় সন্তান কখনও যুদ্ধকে ভয় করে না। আমার ছেলেরা যেন দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার কথা ভুলে না যায়।" *(পৃ: ১৪০৬, ঐ)*

কালকূট কুন্তীর উক্তিগুলো থেকে কুন্তীকে মূল্যায়ন করেছেন। একদিকে পৈত্রিক রাজ্য উদ্ধারের জন্য পুত্রদের উদ্দীপ্ত করা, অন্যদিকে পুত্রবধূ দ্রৌপদীর চরম লাঞ্ছনার কথা, কোনটাই তিনি বলতে ভুলে যান নি। কৃষ্ণের মুখে কুন্তীর এই আগুন ঝরানো কথা শুনে সেদিন শুধু পাণ্ডবরাই অবাক হননি, ভীষ্ম অবাক হয়েছিলেন; তিনি দ্রোণাচার্য, দুর্যোধনকে বলেছিলেন, "মায়ের এই অত্যুগ্র উপদেশ শুনে, পাণ্ডবরা তাদের রাজ্যাংশ না পেলে শান্ত হবে না।" *(পৃ: ১৪০৬, ঐ)*

'যুদ্ধ অনিবার্য' এই কথা কুন্তীকে জানিয়ে বিদুর আরও জানিয়েছিলেন ভীষ্ম, দ্রোণ স্নেহবশত পাণ্ডবদের বিশেষ ক্ষতি করবেন না। একমাত্র পাপমতি কর্ণ দুর্যোধনের সমর্থক সে অতি বলবান,

পাণ্ডবদের ক্ষতি করতে সক্ষম এবং পাণ্ডবদের সে অতিমাত্রায় দ্বেষ করে। বিদুরের কথায় কালকূট পর্যবেক্ষণ করলেন কুন্তীকে। কুন্তী বিদুরের কথা শুনেই কর্ণের কাছে গিয়ে কর্ণকে তার জন্মবৃত্তান্ত সব শুনিয়ে বলেছিলেন ''তুমি দুর্যোধনকে ত্যাগ কর। নিজের ভাইদের সঙ্গে যোগ দাও।'' *(পৃ: ১৪০৬, ঐ)* একথা শুনে কর্ণ কুন্তীকে নানা ভাষায় অভিযুক্ত করে ধিক্কার দিয়েছিলেন।

দীর্ঘদিন বাদে পুত্রত্যাগিনী মাতা পুত্রের কাছে যন্ত্রণাক্লিষ্ট ও বেদনাহত মন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সাহায্য প্রার্থী। পুত্রদের জীবন রক্ষার্থে কানীনপুত্র কর্ণকে নিজমুখে সংকোচের সঙ্গে তার জন্মের কাহিনী বলে পুত্রকে স্বীকার করেছেন। কর্ণ যথার্থই বলেছিলেন, ''তুমি আজ তোমার পুত্রদের রক্ষার্থেই আমার কাছে এসেছ। দুর্যোধনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। আমি অকৃতজ্ঞ নই। আমি কৌরব পক্ষ থেকে যুদ্ধ করবো। তবে, তোমার অনুরোধ রক্ষা করার জন্য একটি প্রতিজ্ঞা করছি। অর্জুন ভিন্ন আমি তোমার আর চারপুত্রকে সুযোগ পেলেও হত্যা করব না। কিন্তু অর্জুনকে রেহাই দেবো না। যদি অর্জুন নিহত হয়, তাহলেও তুমি পাঁচ পুত্রের জননী থাকবে? আমি নিহত হলেও তুমি পাঁচ পুত্রের জননী থাকবে।'' *(পৃ: ১৪০৬-১৪০৭, ঐ)* কর্ণের কথা শুনে কুন্তী কাঁপতে লাগলেন। পুত্রকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। কুন্তীর কথা, অনুরোধ কর্ণ মানলেন না। কালকূট মাতা ও পুত্রের কথোপকথন সবই শুনলেন। দেখলেন আশাহত, পুত্রবুভুক্ষু এক দুঃখিনী অসহায় মাতাকে। অনেকগুলো বছরের বাধা কাটিয়ে কুন্তী নিজ মুখে পুত্রের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করেছিলেন।

কর্ণেরও অভিমানাহত অন্তরটি কালকূট দেখতে পেলেন। মায়ের অনুরোধ পুরোপুরি ফেলতে পারেন নি। হয় অর্জুন নয় তিনি (কর্ণ)। সুতরাং কুন্তীও কর্ণের মুখে এই ভয়ঙ্কর শপথের কথা শুনে কাঁপতে কাঁপতে বিদায় নিয়েছিলেন।

এরপর যুদ্ধ শেষ! অর্জুনের হাতে কর্ণ নিহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছেন আরও শত শত মৃতদেহের সঙ্গে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত বীর সৈন্যদের মৃতদেহ ঘিরে কান্নার রোল উঠেছে। সে কান্নার আওয়াজে আকাশ-বাতাস বেদনায় মথিত হচ্ছে। যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে বিদুর সমস্ত মৃতদেহের দাহকার্য শেষ করলেন।

কালকূট দেখছেন, রণক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র শ্মশানক্ষেত্র হয়ে উঠল। এই মহাশ্মশানই কালকূট দেখেছিলেন এলাহাবাদে কুম্ভমেলার শেষ দিনে। পুণ্যলাভের আশায় ভীড়ের চাপে পদপিষ্ঠ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল বহু নরনারী ও শিশু। সমস্ত মৃতদেহের দাহকার্য কুরুক্ষেত্রের মৃতদেহের দাহকার্যর মতই হয়েছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যেন আকাশ ছুঁয়েছিল। আর কান্নার রোল-এ আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়েছিল। কালকূট তাঁর সেই মহাশ্মশানের চিত্র 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'

গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' লিখেই সমরেশ বসুর সত্তায় কালকূট তাঁর জয়যাত্রা শুরু করেছিলেন অর্থাৎ পাঠককুলের হৃদয়ে স্থায়ী আসন পেতে বসেছিলেন।

যাই হোক্, আবার কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে ফিরে আসতে হল কালকূটকে অনুসরণ করে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই গঙ্গার তীরে এসে দাঁড়ালেন। সবার আগে ধৃতরাষ্ট্র। সকলেই যুদ্ধে নিহত আপনজনদের আত্মার শান্তি কামনায় সলিলাঞ্জলি দিলেন।

কালকূট দেখছেন কুন্তীকে, — কুন্তী স্বীয় অন্তর্বেদনাকে আর চেপে রাখতে পারছেন না। অবশেষে কুন্তী সকলের সামনে কেঁদে উঠলেন এবং নিজ পুত্রদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন— যে মহাবীর তারা (পাণ্ডবগণ) রাধাতনয় বলে জানে, যে দুর্যোধনের সহায়ক ছিলেন, 'অর্জুনের দ্বারা যিনি নিহত হয়েছেন, সেই পুণ্যকর্মা কর্ণ তোমাদেরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।" *(পৃ: ১৪০৭, ঐ)* কালকূট কুন্তীর স্বীকারোক্তি শুনছেন, — কুন্তী আরো বললেন "তিনি সূর্যসম পিতা কর্তৃক আমার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন। তোমরা তাঁর উদ্দেশ্যেও তর্পণ কর।" *(পৃ: ১৪০৭, ঐ)*

কালকূট বিস্ময়ে অভিভূত! কুন্তীর সত্য বলবার সাহস দেখে কালকূটের মনে হয়েছে কুন্তীর মানসিক দৃঢ়তাই তাঁকে এই সাহস যুগিয়েছে। এই অনন্যতাই কুন্তী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কালকূট কুন্তীর এই সত্য স্বীকারোক্তিকে এইভাবে দেখেছেন— "ইতিহাসের এটাই বিস্ময় এবং কুন্তী চরিত্রেরও। তিনি যে কথা বহুকাল গোপন করেছিলেন, আজ তা প্রকাশ করলেন সর্বসমক্ষে। এখানেই তিনি মহৎ মহীয়সী।" *(পৃ: ১৪০৭, ঐ)*

কুন্তীর একথা শুনে, সকলেই বিস্মিত হয়েছিলেন। সব থেকে বেশি যুধিষ্ঠির। তিনি তো কুন্তীর স্বীকারোক্তির কারণে সমস্ত নারীজাতিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, তাঁরা কখনও কথা গোপন রাখতে পারবেন না।

যুধিষ্ঠির রাজা হওয়ার পরেও কুন্তীর মনে কোনও আনন্দ ছিল না। কোনরকমে দিন কাটাচ্ছিলেন গান্ধারীর সেবা করে। পনের বছর পরে আর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী বাণপ্রস্থে যাওয়ার সময় সকলের আগে আগে চললেন কুন্তী। কালকূট দেখছেন, সেদিন কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথি। কুন্তীর মনের ভেতরে উঁকি দিয়ে আগেই দেখে নিয়েছেন কালকূট। কাউকে কিছুই জানান নি, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সঙ্গে কুন্তীও চলেছেন বাণপ্রস্থে।

যুধিষ্ঠিরসহ অন্য সকলে তখনই বুঝতে পারলেন, যখন কুন্তী বলছেন — "সহদেবকে সর্বদা সস্নেহে রক্ষা করবে। সে তোমার ও আমার একান্ত অনুরক্ত। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সূর্যতনয়, যাঁর পরিচয় আমি এতকাল গোপন রেখেছিলাম, তাঁকে স্মরণ করে আমার প্রাণ অপরাধ বোধে বিদীর্ণ হচ্ছে। তোমরা তাঁর নামে দক্ষিণাদি দিও। আমি ভাসুর ও ভাসুর পত্নীর সেবায় তপস্বিনী হয়ে

বসবাস করবো।" *(পৃ: ১৪০৭, ঐ)*

কালকূট দেখেছেন সন্তান ত্যাগের যন্ত্রণায় সারাজীবন বিদীর্ণ হওয়া একটি মাতৃহৃদয়ে পুত্রকে কাছে না পাওয়ার যন্ত্রণায় অপরাধবোধ, যা তাঁর হৃদয়কে তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি করে পুড়িয়েছে। কালকূট আরও দেখেছেন, সন্তানের প্রতি স্নেহে তাঁর মাতৃহৃদয় কত উদ্বেলিত। কুন্তী বাণপ্রস্থে যাওয়ার সময় সহদেবকে সস্নেহে রক্ষা করতে বলেছেন। সন্তানের স্নেহশীলা মায়ের অন্তরটি কালকূট মহাকাব্যের চরিত্র থেকে তুলে এনে রক্তমাংসের মনুষ্য চরিত্রের সজীবতা দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। মহাকাব্যের এক অনন্য দৃঢ়চেতা চরিত্রকে বাস্তবের রঙ্গভূমিতে নামিয়ে এনেছেন, একালের সামাজিক পটপরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে কুন্তী চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন।

কুন্তীর বাণপ্রস্থে যাওয়ার সিদ্ধান্ত যখন পাণ্ডবরা জানতে পারলেন, তখন শোকে ভেঙে পড়েছিলেন। তাঁরা কুন্তীকে বলেছিলেন যে, কুন্তী যখন থাকবেনই না পাণ্ডবদের সঙ্গে, তখন পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য কৃষ্ণর মুখ দিয়ে বিদুলার কাহিনী কেন শুনিয়েছিলেন। প্রতি উত্তরে কুন্তী বলেছিলেন যে, তিনি পাণ্ডবদের ক্ষাত্রতেজে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাই বিদুলার কাহিনী বলেছেন। কালকূট একথাটুকু শোনার পরে আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে শুনেছেন "দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধের জন্য তোমাদের উত্তেজিত করেছি।" *(পৃ: ১৪০৭, ঐ)* কালকূট কুন্তীকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। পুত্রবধূর লাঞ্ছনা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। নারী হয়ে নারীর অপমান তিনি মেনে নেন নি। 'দ্রৌপদী'র লাঞ্ছনার কথা এর আগে তিনি কৃষ্ণকে বলেছিলেন পাণ্ডবদের মনে করিয়ে দিতে।

এদিকে সন্তান ত্যাগের আত্মগ্লানি, অন্যদিকে পুত্রবধূর কৌরবসভায় লাঞ্ছনার যন্ত্রণায় প্রতিশোধ স্পৃহা— এই দুইয়ে মিলে কুন্তী চরিত্রকে একটি সুদৃঢ় অনন্যতা দিয়েছে। সেই সূক্ষ্ম মানসিক অনুভূত ভাবনাগুলোকে কালকূট মহাকাব্য থেকে তুলে এনেছেন বাস্তবোপযোগী করে তুলেছেন এই অনন্য সাধারণ মহীয়সী নারী চরিত্রকে।

কুন্তী কত নির্বিকার বাণপ্রস্থ যাত্রাকালে। কোনও অনুরোধ শোনেন নি। ভোগের স্পৃহা নেই, কেননা, তিনি তাঁর স্বামীর ঐশ্বর্য ভোগ করেছেন ও ধন দান করেছেন। সন্তানদের রক্ষা করা তাঁর উদ্দেশ্য।

কালকূট কুন্তীকে অনুসরণ করে তাঁদের অরণ্যে দিনযাপন দেখেছেন। যুধিষ্ঠির সবাইকে নিয়ে অরণ্যে এসেছেন। যুধিষ্ঠিরের সামনে বিদুরের মহাপ্রয়াণ ঘটেছিল; অরণ্য মধ্যে বায়ুভক্ষণকারী নগ্ন, কৃশ বিদুর যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে যোগবলে তাঁর দেহে প্রবেশ করেছিলেন।

এ ঘটনাকে কালকূট ইতিহাসের সংকেত বলেছেন। ধর্মের মধ্যে ধর্মের লীন হওয়া। অর্থাৎ

কালকূটের মতে— 'যুধিষ্ঠির ধর্মাত্মা বিদুরের ঔরসজাত পুত্র ছিলেন।' *(পৃ: ১৪০৭, ঐ)*

ব্যাসদেবও কুন্তীদের অরণ্যজীবন দেখতে এসেছিলেন। কালকূট এঁদের কথাও শুনেছেন। মাতৃহৃদয়ের পাপবোধ ও হাহাকার শুনেছেন কালকূট। সেই একই স্বীকারোক্তি "ভগবান, নিতান্ত দুর্বুদ্ধিবশতঃ আমি আমার সন্তানটিকে নদীপথে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। সে কথা মনে করে, আমার অন্তর পুড়ে যাচ্ছে। এ পাপ না অপাপ, জানি না, আপনার কাছে অকপটে স্বীকার করি, দুর্বাসার বরেই আমার সব লাভ হয়েছে। এখন আমি আমার সেই পুত্রটিকে একবার দেখতে চাই।" *(পৃ: ১৪০৭, ঐ)*

উত্তরে ব্যাস বলেছেন "তোমার স্বীকারোক্তি ও চরিত্রই তোমার সব অপরাধ ধুয়ে দিয়েছে। কোনো পাপই তোমার নেই।" *(পৃ: ১৪০৭, ঐ)*

গঙ্গাদ্বারের (হরিদ্বার) কাছে এক মহারণ্যে দিনযাপন কালেই একদিন বনে দাবানল লাগে। সেই দাবানলের আগুনে সকলে প্রাণ আহুতি দিয়েছেন। কালকূটের চোখে ধরা পড়েছে— কুন্তী যোগাসনে বসে প্রাণত্যাগ করেছেন।

কালকূট পৃথার অন্বেষণে বেরিয়ে পৃথার জীবনকাল থেকে অনেক অতীতে মনভ্রমণ করেছেন। মহাকাব্যের আলোকে সেই সময়কাল, সমাজব্যবস্থা, মানব চরিত্র প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। ধীরে ধীরে কুন্তীকে একটি মানবিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে কালকূট একটার পর একটা ঘটনা কাহিনী উপকাহিনী সাজিয়ে সেইসঙ্গে সমাজপট পরিবেশের মধ্যে তাঁর কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এই অতীত ভ্রমণ কালকূটের চোখে উপন্যাসের রূপ পেয়েছে।

কুন্তী চরিত্রকে কালকূট এ'কালের দৃষ্টিতে চিত্রায়িত করেছেন। ইতিহাস থেকে তুলে এনেছেন এক মহিমান্বিত রাজকন্যা, মহারানী, জননীকে— যিনি বঞ্চনা, দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে নিজেকে করে তুলেছেন অনন্য সাধারণ।

কালকূট বলেছেন, "আমি দেখেছি, ইতিহাসের পাতায় কী ঐশ্বর্যময়ী রমণী চিত্র অঙ্কিত। সারাজীবন দুঃখের মধ্যেও যিনি ভেঙে পড়েন নি এবং যোগাসনে বসে দাবানলে প্রাণত্যাগ করেছেন। পৃথার জীবন যেন সমস্ত সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে। যিনি প্রেম কী তা জেনেছেন। কিন্তু সারাজীবন দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর পাপবোধ, বিশ্বের সকল মানবীকে নতুন চেতনা দিয়েছে।

পৃথা! তুমি আমাদের সকলের প্রণাম নাও।" *(পৃ: ১৪০৭, ঐ)*

কালকূট মনভ্রমণে এক ঐতিহাসিক মহারাণীর সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। সেই সন্ধানে মহাকাব্যের এই ঐশ্বর্যময়ী মহারাণীকে কালকূট যে চোখে দেখেছেন ও তাঁর জীবনের রহস্যে ঢেকে থাকা ঘটনাবলীকে আধুনিক যুক্তিনিষ্ঠ তথ্য দিয়ে তাঁর ভাবনাগুলোকে লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মহাকাব্যিক চরিত্রগুলোর সুখ-দুঃখ-বেদনা-প্রতিশোধ ইত্যাদি সময়োপযোগী করে তাঁর মানসভ্রমণকে ভ্রমণকাহিনীতে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, উপন্যাসের পূর্ণতা দিয়েছেন।

কালকূট **'অন্তিম প্রণয়'** নামক গ্রন্থটি রচনা করেছেন ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (১৩৯৩ বঙ্গাব্দ) জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল, গ্রন্থটি কাউকে উৎসর্গ করা হয়নি, এই লেখাটি প্রথমে 'প্রসাদ' পত্রিকায় ভ্রমর ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি মহাভারতের পর্বের একটি ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা। এই লেখাটি প্রথমে 'প্রসাদ' পত্রিকায় ভমর ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

কালকূট আবার মানস ভ্রমণে চলেছেন ইতিহাসের পথ ধরে কুরুজাঙ্গল অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের পথে। 'এক প্রাণঘাতী প্রেম প্রণয়ের ঘটনার কুশীলবদের প্রত্যক্ষ করতেই' *(পৃ: ১৪৮৫, কালকূট রচণাসমগ্র, ৩য় খন্ড)* কালকূটের এই মানস যাত্রা এক ঐতিহাসিক প্রেম— প্রণয়ের চরিত্রদের দেখতে। আর সেই কুরুক্ষেত্রের পথে চলতে গিয়ে তিনি কুরুরাজ পাণ্ডুকে নিরীক্ষণ করছেন।

"কুরুজাঙ্গল পৌঁছেও আমার বর্তমানটাকে ত্যাগ করে আসতে পারিনি। সেই চোখ নিয়েই কয়েক হাজার বছর পিছনে এসে দেখেছি, পাণ্ডুর মূর্তি। পাণ্ডু নামক রাজা বা পুরুষটির কথা আমি আগেই শুনেছি। আপনারা নিশ্চয়ই মহাভারতে পাঠ করেছেন। কিন্তু এই বলশালী, রূপবান, যোদ্ধা ও ধার্মিক, রাষ্ট্র ও রাজনীতি অভিজ্ঞ মানুষটির দিকে আমার একালের চোখে নতুন বিস্ময়ে দেখছি। দেখছি অতুল বীর্যের অধিকারী, যার বুকে প্রেম সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ, এমন মহামতি রাজার জীবনে কি কোনো দৈব সর্বনাশ ঘটতে পারে?" — *(পৃ: ১৪৮৫, ঐ)*

বুকে যার প্রেম সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ তিনি তো চিরপ্রেমিক পুরুষ। প্রেমিক পাণ্ডু রাজার জীবনে প্রণয়কালে কি দৈব সর্বনাশ ঘটেছিল? সেটা আরও বিশদভাবে জানতে গিয়ে কালকূট পাণ্ডু রাজার জীবনকাল থেকে আরও একটু পিছন দিকে এগিয়ে গিয়েছেন, সংক্ষিপ্ত সেই ভ্রমণ পথ। পথ চলতি সঙ্গীদের কাছ থেকে, পরিবেশ থেকে তিনি জেনে নিতে চান সেই দৈব সর্বনাশের মূল কারণগুলো। কুরুজাঙ্গলের যমুনা নদীর তীরে পৌঁছে সেই বহু প্রচলিত বহু কথিত ঘটনাকে একালের চোখে কালকূট প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

বহু প্রচলিত কাহিনীটি হল, পিতার আদেশে মৎস্যগন্ধা সত্যবতী যমুনা নদীতে খেয়া পারাপার করতেন। এই যমুনা নদীর তীরেই মৎস্যগন্ধার সঙ্গে পরাশর মুনির সাক্ষাৎ হয়েছিল। মৎস্যগন্ধার যৌবন ও রূপ-লাবণ্যে মুনি কামমোহিত হয়ে কন্যাটিকে প্রার্থনা করেছিলেন ও তার লজ্জা নিবারণের জন্য নদীর বুকে গাঢ় কুয়াশার সৃষ্টি করেছিলেন।

এই ঘটনাটিকে কালকূট দেখেছেন এইভাবে যে, নদীর বুকে কুয়াশা তো নেমে থাকে।

মহাভারতে কোথাও কোনও সময় বা পল উল্লেখ করা নেই। সাধারণত শীতকালেই নদীর বুকে গাঢ় কুয়াশা নেমে থাকে। সুতরাং একলা যাত্রী পরাশর মুনি মৎস্যগন্ধাকে দেখে কামমোহিত হয়ে তাকে প্রলোভিত করেছিলেন, বর দিতে চেয়েছিলেন এবং নদীর বুকে গাঢ় কুয়াশা নেমে না আসা পর্যন্ত 'আপন অভীষ্ট সিদ্ধি তৎপরতা'র জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। ঘটনাটিকে আরও গভীরভাবে চিন্তা করলে কালকূটের সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলা যায়— শুধু আপন সিদ্ধিলাভের জন্য মুনিকে নদীর বুকে গাঢ় কুয়াশা নেমে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল তা নয়, লোকচক্ষুর আড়ালেরও প্রয়োজন ছিল। 'লোকচক্ষুর আড়াল', ও 'গোপনীয়তা' এই দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল মহর্ষির কাছে। গাঢ় কুয়াশায় ঢাকা নদীর বুকে নৌকার মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনার সময়েই মৎস্যগন্ধার দেহে সঞ্চারিত করেছিলেন পরম রমণীয় পদ্মগন্ধ। মৎস্যগন্ধা সত্যবতী পদ্মগন্ধায় রূপান্তরিত হয়েছিল। তিনি আদেশ করেছিলেন— "তুমি এই যমুনা দ্বীপে গর্ভমোচন করে আবার তোমার কন্যকাবস্থা ফিরে পাবে।"*(পৃ: ১৪৮৭, ঐ)*

পদ্মগন্ধা সত্যবতী পরাশর মুনির আদেশ মতো গোপনে যমুনা দ্বীপে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছিলেন। দ্বীপে জন্ম বলে সেই পুত্রের নাম দ্বৈপায়ন। গায়ের রঙ অসিত অর্থাৎ কালো, সেইজন্য তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামেও পরিচিত। বেদের বিভাগ করেছিলেন, তাই তিনি বেদব্যাস। জগৎব্যাপী খ্যাতিসম্পন্ন পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন পদ্মগন্ধা সত্যবতী; কিন্তু এই ঘটনা গোপন ছিল বহুদিন পর্যন্ত। একদিন সত্যবতী নিজমুখেই সতীন পুত্র ভীষ্মকে বংশরক্ষার তাগিদে এই গভীর গোপন ঘটনাটি ব্যক্ত করেছিলেন। ভীষ্ম অর্থাৎ শান্তনু ও গঙ্গার পুত্র দেবব্রত নিজেই উদ্যোগী হয়ে তাঁর পিতা শান্তনুর সঙ্গে ধীবর কন্যা পদ্মগন্ধা সত্যবতীর বিবাহ দিয়েছিলেন। আর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন— "সত্যবতীর সন্তানই রাজা হবে, তিনি হবেন না। সেই থেকেই তিনি ভীষ্ম।" — *(পৃ: ১৪৮৭, ঐ)*

সত্যবতীর পিতার শর্ত ছিল — যদি সত্যবতীর সন্তান পরবর্তী কৌরবকুলের রাজা হন, তবেই তিনি তার কন্যাকে মহারাজ শান্তনুকে দান করবেন। কিন্তু সত্যবতীর সঙ্গে মহারাজের প্রণয়ের অনেক আগেই মহারাজ তার ছেলে দেবব্রতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন। মহারাজ শান্তনু প্রথমে এই শর্তে রাজি হতে পারেন নি, কিন্তু পুত্র দেবব্রত সমস্ত বিষয় জেনে এই দুরূহ কাজটি সম্পাদন করেছিলেন।

মুনির অলৌকিক গুণে সত্যবতী সত্যিই কন্যকাবস্থা ফিরে পেয়েছিলেন কিনা কালকূটের মনে প্রশ্ন জেগেছে— "আমরা এ যুগের মানুষেরা কি কুমারীত্ব ঘুচে যাবার বিষয় ভাবি? বিশ্বাস করি, একবার কিছু ঘটলেই কুমারীত্ব ঘুচে যায়? না, পুরুষের কুমারীত্ব যাচাইয়ের কোনো ক্ষমতা

আছে? একমাত্র কোনো বিশারদ চিকিৎসককে দেখানো ছাড়া।" — *(পৃ: ১৪৮৭, ঐ, অন্তিম প্রণয়)*

মহাভারতের যুগের মানুষেরা অনেক আধুনিক ছিলেন বলেই বাহুল্য নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেন নি। সত্যবতীর কন্যকাবস্থা নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠেনি। যথারীতি তিনি মহারাজ শান্তনুর ঔরসে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। বিচিত্রবীর্যের জন্মের পরই মহারাজ শান্তনু স্বর্গলাভ করেন ও চিত্রাঙ্গদ উপযুক্ত হয়ে উঠলে ভীষ্ম তাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন। চিত্রাঙ্গ দ-এর সঙ্গে গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদ-এর কুরুক্ষেত্রে তিন বছর ধরে পরস্পরের গাত্র বিমর্দে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল। সৈন্যসামন্তের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হলেও ভাইদের রক্ষক ভীষ্ম সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। মায়াবী গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদ শান্তনু পুত্র চিত্রাঙ্গদকে হত্যা করে অন্তরীক্ষে অর্থাৎ বর্তমানের কাশ্মীরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এমতাবস্থায় বিচিত্রবীর্য অপ্রাপ্তবয়স্ক হলেও ভীষ্ম তাঁকেই সিংহাসনে বসিয়ে তাকে রাজপদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে রাজ্য চালাতে থাকেন এবং বিচিত্রবীর্য তরুণ বয়স প্রাপ্ত হলে মাতা সত্যবতীর অনুমতি নিয়ে ভীষ্ম নিজেই কাশীরাজের তিন কন্যাকে হরণ করে নিজ রাজ্যে নিয়ে এসেছিলেন। কাশীরাজের তিনকন্যার সঙ্গেই বিচিত্রবীর্যের বিবাহের আয়োজন করতেই জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা হাসতে হাসতে বলেছিলেন যে তিনি মনে মনে শাল্বরাজকেই স্বামী বলে বরণ করেছেন, মনে মনে তাঁকে স্পর্শ করেছেন। অম্বার মুখে স্পষ্টভাবে নিজের পতি নির্বাচনের কথা শুনে ভীষ্ম অম্বাকে সসম্মানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শাল্বরাজের কাছে। আর অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দিয়েছিলেন। এই দুইবোন ছিল— "নিবিড় নিতম্বিনী, পয়োধর যুগল পীন, কটিদেশ ক্ষীণ, নখ সকল রক্তবর্ণ আর তেমনি তাদের শ্যামল কেশপাশ।" *(পৃ: ১৪৮৭, ঐ)*

এই দুইবোনকে একত্রে পাণিগ্রহণ করে বয়সে তরুণ বিচিত্রবীর্য তাদের অধীন হয়েছিলেন এবং দীর্ঘ সাত বছর নিরন্তর বিহার করে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন; কোনো মহিষীকেই তিনি গর্ভবতী করতে পারেননি।

কালকূটের অনুসন্ধিৎসু মন সংশয়াকুল— কেন বিচিত্রবীর্যের দুই স্ত্রীই গর্ভবতী হতে পারেন নি? বিচিত্রবীর্য যখন অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করেছিলেন তখন তরুণ বয়স্ক হলেও যথেষ্ট সাবালক হননি। তাঁর দাদা চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্বরাজের সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ লড়াই-এ প্রাণ হারিয়েছিলেন। বয়সে তরুণ ক্ষাত্রবীর্য বিচিত্রবীর্যের বিবাহের জন্য কন্যা হরণ করতে ভীষ্ম নিজেই কেন গিয়েছিলেন, ভাইকে সঙ্গে না নিয়ে! কালকূটকে অনুসরণ করে এ'কথা বলা যেতেই পারে— ঘটনাটা ক্ষাত্রধর্মের বিপরীতমুখী কাজ। তরুণ ক্ষত্রিয় কুরুবীর তথা কুরবরাজ নিজ বিবাহের কন্যা হরণ করতে নিজে যান নি, তাঁর রক্ষণাবেক্ষণকারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীষ্ম তাঁকে এই অভিযানে যাওয়ার উপযুক্ত মনে করেন নি! এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না, যে বিচিত্রবীর্য রাজা

হলেও বিবাহের জন্য যথেষ্ট সাবালক হননি। সে কারণেই তিনি স্ত্রীদ্বয়-এর অধীন হয়েছিলেন, উৎশৃঙ্খল জীবনযাত্রায় নিজের শারীরিক ক্ষমতা অর্থাৎ সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা নষ্ট করেছিলেন, যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বিচক্ষণ চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করানোর পরেও বিচিত্রবীর্যকে বাঁচানো সম্ভব হয় নি। কুরুবংশ রক্ষা করার চিন্তায় সত্যবতী শেষ পর্যন্ত ভীষ্মেরই শরণাপন্ন হলেন। তিনি ভীষ্মকে জানালেন— "পরম রূপবতী সম্পূর্ণ যৌবনবতী মহিষীদ্বয় অতিমাত্রায় পুত্রার্থিনী হয়েছেন। ভীষ্ম এখন তাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করুন।" *(পৃ: ১৪৮৮, ঐ)*

পিতা শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহের জন্য তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন চিরব্রহ্মচর্যের। মায়ের নির্দেশে সেই প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হওয়া কখনও সম্ভব নয়। ভীষ্মকে দিয়ে বংশরক্ষা করানোর জন্য ভীষ্মকে তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করানো সম্ভব নয় বুঝতে পেরেই সত্যবতী বাধ্য হয়েছিলেন ভীষ্মকে নিজের কন্যকাবস্থায় গর্ভজাত পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ণের কথা বলতে। ভীষ্ম বেদ বিভাগকর্তা ব্যাসদেবকে মনে মনে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর খ্যাতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানলেও জানতেন না তাঁর জন্মবৃত্তান্ত। মাতা সত্যবতী সেই বহুকাল আগে ঘটে যাওয়া গোপন ঘটনা পুত্রের কাছে প্রকাশ করার পরেও ভীষ্মের মহর্ষির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমেনি কিংবা মাতার প্রতি বিরূপতায় মন ভরে ওঠে নি। কালকূট যথার্থই বলেছেন, সেকালের মানুষেরা অনেক আধুনিক ছিলেন, বাহুল্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা অনাবশ্যকই ছিল, মাতার কথা শুনে ভীষ্ম অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিলেন, পরম ভাগ্য বলে বংশরক্ষার জন্য মাতাকে সম্মতি জানিয়েছিলেন।

মাতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ণকে স্মরণ করা মাত্র তাঁর জগৎবিখ্যাত পুত্র মায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন মাতা সত্যবতী বাহুযুগল দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গনপূর্বক স্নেহ নিঃসৃত স্তনদুগ্ধ দ্বারা অভিষিক্ত করলেন আর চোখের জলে ভাসলেন। 'চিরন্তন' এ মিলন দৃশ্য। চিরন্তন এই দৃশ্যের পরই আর একটি চিরন্তন সত্যের রূপও কালকূটের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, — সেটা হল মায়ের অধিকারের রূপ। বংশরক্ষার জন্য উদগ্রীব সত্যবতী তাঁর কন্যকাবস্থার পুত্রকে স্মরণ করেছেন ও অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিজের অভিপ্রায়টি ব্যক্ত করেছেন। এইখানে তিনি মহাকাব্যের মানবী থেকে বর্তমানের মানবীর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন। ভীষ্ম তো তাঁরই কারণে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েও রাজা হননি এবং দারপরিগ্রহ করেন নি। এই যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত মনটি কালকূটের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণকে বিধবা ভ্রাতৃবধূদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের নির্দেশ দিতে মাতা সত্যবতী কুণ্ঠিত হননি। তবে বিষয়টি উপস্থাপন করেছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। প্রথমে বলেছেন ভীষ্ম কেন দারপরিগ্রহ করেন নি ইত্যাদি। অবশেষে "রূপ যৌবনবতী তোমার ভ্রাতৃবধূরা সাতিশয়

পুত্রার্থিনী হয়েছেন। বংশ রক্ষার্থে তুমি তাদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে, তাদের মনের বাসনা পূর্ণ কর।" *(পৃ: ১৪৮৮, ঐ)* মাতৃ আজ্ঞা তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন একটি শর্ত রেখে — "দুই বধূ দেবীকেই সংবৎসরকার নিয়মের সঙ্গে আমার নির্দিষ্ট ব্রতপালন করতে হবে। ব্রতবিবর্জিতা রমণীরা অপবিত্র হয়, তাদের পক্ষে আমাকে স্পর্শ করা সম্ভব হবে না।" *(পৃ: ১৪৮৫, ঐ)*

পুত্রের কথা শুনেই সত্যবতী ব্যাকুল হয়ে পুত্রকে অনুরোধ করেছিলেন, যত তাড়াতাড়ি যেভাবে গর্ভ উৎপাদন করা সম্ভব তিনি যেন সেভাবেই সব ব্যবস্থা করেন। কেন তিনি তাড়াতাড়ি বংশধর চান সেটাও পুত্রকে বলেছিলেন মায়ের কথা শুনে দ্বৈপায়ণ বলেছিলেন যে ব্রত স্বরূপ বিরূপ আচরণ যদি বধূরা সহ্য করতে পারেন, তাহলে তিনি অকালিক পুত্র উৎপাদন করবেন।

মহর্ষির কথা শুনে কালকূটের মনে প্রশ্ন জেগেছে, "দ্বৈপায়ণের ব্রতস্বরূপ বিরূপ আচরণই বা কী? যা বধূদের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হতে পারে। মনে হয়, বিচিত্রবীর্যের দুই স্ত্রীকেই দ্বৈপায়ণের কোনরকম শোধন করে নেবার দরকার হয়েছিল। সে শোধন নিতান্ত তন্ত্র মন্ত্র না, তার চেয়েও আর কিছু।" *(পৃ: ১৪৮৮, ঐ)*

কালকূটের আধুনিক দৃষ্টিকে অনুসরণ করে ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় — মহারাজ বিচিত্রবীর্য নিরন্তর সাত বছর স্ত্রীসঙ্গ বিহার করেও গর্ভসঞ্চার করতে পারেন নি। তার উৎশৃঙ্খল জীবনযাত্রায় অম্বিকা-অম্বালিকার মাতৃদেহ সন্তান ধারণের উপযুক্ত ছিল না। তাই সংবৎসরকাল ব্রত পালন অর্থাৎ যথাযথ চিকিৎসা করে মাতৃজঠর সন্তান ধারণের উপযুক্ত করে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সত্যবতীর দ্রুততার ব্যাকুলতায় যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে না পারলেও ব্রতেরই বিকল্প অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি অম্বিকা-অম্বালিকার গর্ভে সন্তান উৎপাদনে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু অম্বিকা-অম্বালিকা কেউই মহর্ষির ব্রতের স্বরূপ বিকল্প ব্যবস্থা সহ্য করতে পারেন নি। তাই সন্তান জন্মের অনুপযুক্ত মাতৃজঠরে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু সুস্থ সন্তানরূপে জন্ম নিতে পারে নি। অথচ এই দ্বৈপায়ণের ঔরসে এক দাসীর গর্ভে একটি সুস্থ সন্তানের জন্ম হয়েছিল, তিনি বিদূর। কালের ধূলি সরিয়ে কালকূট যথার্থই দেখেছেন 'মাতৃজঠর দোষমুক্ত'। অথচ এই সত্যটুকু আড়াল করা হয়েছে এইভাবে যে মহর্ষির বিকট দর্শনে অম্বিকা ভয় পেয়ে সহবাস কালে একবারের জন্যও চোখ খোলেন নি বলে তাঁর পুত্র অন্ধ হয়েছে এবং অম্বালিকা দ্বৈপায়ণের ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন বলে তাঁর পুত্র পাণ্ডু হয়েছে। অন্ধপুত্র কুরুবংশের উপযুক্ত নয় বলে মাতার অনুরোধে মহর্ষি আবার এসেছিলেন অম্বিকার অন্ধ সন্তানের জন্ম দেবার পরে আর একটা সুস্থ সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য। কিন্তু মহর্ষির সেই বিকট রূপের কথা চিন্তা করেই অম্বিকা ভীত হয়ে অন্য বুদ্ধি করে নিজের একটি সুন্দরী দাসীকে নিজের সাজ-পোশাকে সজ্জিত করে শয়নকক্ষে

পাঠিয়েছিলেন। দাসী মহর্ষিকে ভক্তিভরে শুশ্রূষা করেছিল। মহর্ষি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বলেছিলেন— "রমণী, তুমি দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে। আর তোমার ছেলে হবে অসাধারণ বুদ্ধিমান, পরম ধার্মিক।" *(পৃ: ১৪৮৯, ঐ)* দাসীর গর্ভে দ্বৈপায়ণ একটি জ্ঞানী ও ধার্মিক পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, ইনি বিদূর নামে পরিচিত।

অম্বালিকা অম্বিকার অন্ধসন্তান ধৃতরাষ্ট্রের জন্মের পর যথাসময়ে একটি পাণ্ডুবর্ণ পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। মাতা অম্বালিকার দোষেই পুত্র পাণ্ডুবর্ণ হয়েছিলেন। "এই পাণ্ডুর প্রেম-প্রণয় আমার প্রত্যক্ষ করবার সাধ" — *(পৃ: ১৪৮৯, ঐ)* কালকূট এই কথার মধ্য দিয়ে পাণ্ডু জন্মের পূর্বকালের অতীত মনভ্রমণকে সমাপ্ত করে 'অন্তিম প্রণয়'-এর কথা ব্যক্ত করতে অগ্রসর হয়েছেন। পাণ্ডুর জন্মরহস্য জানতে কালকূট অতীতের পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন। এই পথে মূল কুশীলব হলেন ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পিতামহী সত্যবতী ও তাঁর কানীন পুত্র দ্বৈপায়ণ; সঙ্গে গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম এবং ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর মাতা যথাক্রমে অম্বিকা ও অম্বালিকা। এঁরাই এই কাহিনীর একটি বৃত্ত। এবার শুরু দ্বিতীয় বৃত্ত। এই দ্বিতীয় অংশের অর্থাৎ পাণ্ডুর প্রেম-প্রণয় অংশের প্রধান কুশীলব হলেন পাণ্ডু ও মাদ্রী, সঙ্গে কুন্তী অবশ্যই আছেন।

কালকূট অতীতের এক স্বয়ম্বর সভায় দৃষ্টি ফিরিয়েছেন— "আমি পথের যাত্রায় এখন সেই দৃশ্যটি দেখছি, কুন্তী সভায়; স্বয়ম্বরা হয়ে পাণ্ডুর গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছেন। কুন্তী পাণ্ডুর দিকে তাকিয়ে দেখছেন, ভরতবংশাবতংস মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু সূর্যসদৃশ অনুপম স্বীয় শরীর প্রভা দ্বারা সভায় উপস্থিত সমস্ত ভূপতিদের প্রভা চাপা দিয়ে রেখেছেন। কুন্তী সেই পুরুষকে দেখামাত্র তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল, পাণ্ডুর প্রতাপ যেন সিংহসম। বক্ষোদেশ কপাটোপম। চোখ দুটি বিকচকমল সদৃশ। কুন্তীর মনে হল, যেন স্বর্গের ইন্দ্রই তাঁর নিজের আশ্রয় ছেড়ে কুন্তীকে পাবার আশায় সেই সভায় উপস্থিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, কুন্তীর মতো অপরূপ রূপবতী লাবণ্যময়ী নারী, পাণ্ডুর সেই মোহন মূর্তি দেখে স্মরশরে জর্জরিত হয়ে, লজ্জায় মুখ নামিয়ে তাঁর গলাতেই মালা পরিয়ে দিলেন।" — *(পৃ: ১৪৮৫, ঐ)*

কালকূট বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মনভ্রমণ করছেন সুদূর অতীতের কুরুক্ষেত্রের জনপদে পাণ্ডু-কুন্তী-মাদ্রীর প্রণয় পথে।

পাণ্ডুর প্রণয় জীবনে কুন্তীর প্রবেশ। কুন্তীকে বিয়ে করে পাণ্ডু পরম সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন। এই সময়ে কুন্তী পাণ্ডুকে তাঁর কুমারী জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা বলেননি। সেই সময়ে তো বলেনই নি, পাণ্ডুর জীবিতকাল পর্যন্ত তিনি সে ঘটনায় নীরব থেকেছেন। তিনি কুমারী জীবনে সূর্যপ্রতিম পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়েছিলেন। তবে স্বেচ্ছায় তিনি একাজ করেন নি। কুন্তিভোজ কন্যা কুন্তী দুর্বাসা

মুনিকে সেবা-যত্ন করে তুষ্ট করেছিলেন। দুর্বাসা তাকে মন্ত্র দান করে বলেছিলেন "যে দেবতাকে তুমি আহ্বান করবে, তাঁরা এসে তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন এবং পুত্র উৎপন্ন করবেন।" *(পৃ: ১৪৮৬, ঐ)* — কুন্তী সেই মন্ত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে বিপত্তি ঘটিয়েছিলেন। কালকূট বলেছেন — "তবে আমি সেই পথের ইঙ্গিতে দেখছি, স্বয়ং সূর্যসম উজ্জ্বলকান্তি দুর্বাসাই সেই সূর্যপুরুষ।" *(পৃ: ১৪৮৬, ঐ)*

কালকূট এ যাত্রাপথে এপ্রসঙ্গে আর বিস্তৃত কিছু বলেননি, কারণ তাঁর এ যাত্রাপথ তো পাণ্ডুর প্রেম-প্রণয় প্রদর্শন। কুন্তীর সঙ্গে বিয়ের পরে পাণ্ডু যখন সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন সেই সময়ে ভীষ্ম এক কূটনৈতিক চাল চেলেছিলেন। ভীষ্ম চতুরঙ্গিনী সেনা নিয়ে মদ্রদেশে গমন করেছিলেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভীষ্ম মদ্ররাজ শল্যের কাছে তার বোন মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। ভীষ্মের প্রস্তাবে শল্যরাজ বলেছিলেন যে, কুরুবংশে তাঁর বোনের বিয়ে হলে বোন নিঃসন্দেহে ভাগ্যবতী হবে, কিন্তু তাদের একটা বংশগত প্রথা আছে, সেটা তিনি লঙঘন করতে পারবেন না। ভীষ্ম মদ্ররাজদের কুলপ্রথা জানতেন, তাই তিনি তাঁর চতুরঙ্গিনী সৈন্যদের সঙ্গে পণের উপহার হাতী, ঘোড়া, বসন-ভূষণ, মণিমুক্তা, প্রবাল নিয়েই গিয়েছিলেন। পণ দিয়েই মদ্ররাজের বোনকে পাণ্ডুর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য হস্তিনারাজ্যে ফিরে এসেছিলেন। শল্যরাজ ভীষ্মের ভ্রাতুষ্পুত্রের বিক্রমের কথা আগেই শুনেছিলেন, কুরুবংশের শৌর্যবীর্যের কথাও অজানা ছিল না। তাই তিনিও বোনের বিবাহে আপত্তি করেন নি। দুটি সমান বংশমর্যাদার রাজপরিবার পারিবারিক বন্ধনে বাঁধা পড়েছিল দূরদর্শী ভীষ্মের জন্য। ভীষ্ম মদ্রদেশ থেকে ফিরে আসার সময় মাদ্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন ও বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত মাদ্রীকে হস্তিনানগরের প্রাসাদেই রেখেছিলেন। বিবাহের পর পাণ্ডু নব প্রণয়িণীর জন্য আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

কুন্তী ও মাদ্রীকে নিয়ে পাণ্ডু একত্রে সুখে কাল কাটিয়েছিলেন মাত্র তেরো রাত্রি। কালকূট দুই স্ত্রীর মনঃসলিলে ডুব দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছেন— দু'জনের মধ্যে সখ্যতা কতটা ছিল? মাদ্রীর প্রতি পাণ্ডুর দুর্বলতা যে বেশি তা কালকূটের চোখেই ধরা পড়েছে, তখন বুদ্ধিমতী রূপবতী কুন্তীর চোখে যে আরও বেশি করে ধরা পড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঈর্ষার দীপ প্রজ্জ্বলিত কুন্তীর মনে। এটাই স্বাভাবিক। পাণ্ডুর যে মোহনমূর্তি দেখে কামে জর্জরিত হয়ে কুন্তী তাঁকে মালা পরিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন তখনই হস্তিনার প্রাসাদে মাদ্রীর আগমন। প্রেমের সুখে বাধা পড়েছিল, পাণ্ডু নতুন প্রেমিকা মাদ্রীতে বেশি অনুরক্ত হয়েছিলেন।

মাদ্রীর সঙ্গে বিয়ের পরে মাত্র তেরো রাত্রি অতিবাহিত। কালকূট প্রণয়-নাট্য রঙ্গে ঢুকে পড়েছেন। দেখছেন পাণ্ডুকে— "তিনি দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়লেন।" *(পৃ: ১৪৮৯, ঐ)* দর্শানদেশ, মগধ, মিথিলা, কাশী, সুহ্ম, পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশ জয় করে সসাগরা সাম্রাজ্য স্থাপন করে প্রচুর

ধনদৌলত ও উপঢৌকন নিয়ে পাণ্ডু হস্তিনাপুরের দিকে অগ্রসর হতেই ভীষ্ম, বিভিন্ন অমাত্যগণসহ পাণ্ডুকে সংবর্ধনা জানিয়ে নগরীতে নিয়ে এসেছিলেন। এরপর হস্তিনানগরের সুরম্য প্রাসাদে কুন্তী ও মাদ্রীকে নিয়ে সুখে দিনযাপন করতে ভালো লাগছিল না। তাই পাণ্ডু দুই রূপবতী স্ত্রীকে নিয়ে বনবিহারে চলে গিয়েছিলেন। এর প্রকৃত কারণ কালকূটের দৃষ্টি এড়ায় নি। বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, প্রচুর ধনদৌলতের অধিকারী, মাতা সত্যবতী ও দাদা ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহ আলিঙ্গন, উপরন্তু সুন্দরী দুই স্ত্রীর সাহচর্য — কিছুই পাণ্ডুকে রাজপ্রাসাদের গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখতে পারে নি। তিনি জীবনকে নানাভাবে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। তার ভেতরেও একটা বিবাগী মন বাসা বেঁধেছিল, তাই তিনি হিমালয়ের দক্ষিণে পাহাড়ের উপত্যকায়, ঝরণার ধারে, মৃগয়ার উত্তেজনাকে উপভোগ করার জন্য প্রিয়তমাদের নিয়ে স্বেচ্ছাবিহারে বেরিয়েছিলেন। পাণ্ডু নিজে ছিলেন একজন তীরন্দাজ শিকারী। কালকূট একালের দৃষ্টিতে সেকালের বনবিহারের চিত্রটি তুলে ধরেছেন। দুই মহিষীসহ রাজার বনবিহার যে-সে কথা নয়। কেমন সে বনবিহার — "তিনি যে বিশাল দাসীবাহিনী নিয়ে, নানা বনে বনে পাহাড়ের উপত্যকায় আধুনিক ভাষায় যাকে বলে 'ক্যাম্প করা' তাই করে বেড়াচ্ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পান, ভোজন, মৃগয়া আর ভোগ অথচ তার সঙ্গে বাইরের প্রকৃতিতে ছুটে বেড়ানো, সব মিলিয়ে গোটা চিত্রটিই স্বাস্থ্যকর উজ্জ্বল। অনুমান করেই নিতে পারি, পাণ্ডু রাজার সেনাবাহিনী এবং অপরাপর গূঢ় পুরুষেরা (গুপ্তচর বৃন্দ) এই সময়টায় চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল। হস্তিনানগরে ধৃতরাষ্ট্র তো ছিলেনই। অন্ধ হলেও তার জ্ঞান অনুভূতি শক্তি কিছুমাত্র কম ছিল না। তাছাড়া স্বয়ং ভীষ্ম তো ছিলেনই। তিনি রাজ্য পালন না করুন, তাঁর অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিশক্তি ছিল প্রখর। নিজে ছিলেন একজন সেই সময়কার সমগ্র দেশে তুলনাহীন একজন যোদ্ধা। তাঁর তুল্য অস্ত্রচালনা কেউ করতে পারতেন না। অতএব পাণ্ডু বনবিহারে দুই যুবতী মহিষীকে নিয়ে মহানন্দে কাটাতে লাগলেন। পাণ্ডু যখন কুন্তী আর মাদ্রীকে নিয়ে বনে কাননে ভ্রমণ করছিলেন, তখন 'করেণুদ্বয়ের মধ্যবর্তী গজরাজ ঐরাবত যেরূপ শোভিত হয়,' পাণ্ডুকে সেইরকম দেখাত। অর্থাৎ দুইদিকে দুই হস্তিনীকে নিয়ে নিজে যেন গজরাজ ঐরাবত স্বয়ং চলেছেন। তাছাড়া, বনে পাহাড়ে বিচরণকালে তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত, ধনুর্বাণধারী, বিচিত্র কবচযুক্ত। তাঁকে বলা হয়েছে মহা অস্ত্রকোবিদ।" *(পৃ: ১৪৯০, ঐ)*

'কবচ' সম্বন্ধে কালকূট একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'কবচ' বা 'মাদুলি' একালেও লোকজন ধারণ করে থাকেন। সেকালেও লোকে কবচ ধারণ করতেন। কবচের সঙ্গে জ্যোতিষের সম্পর্ক থাকতেই পারে। "আর বীরের পক্ষে সেই কবচ মনের এক মহাশক্তিরূপে কাজ করে।" *(পৃ: ১৪৯০, ঐ)*

কর্ণের কবচ কুণ্ডলই এর অকাট্য প্রমাণ। যদি কর্ণ তার 'কবচ কুণ্ডল' দান না করতেন, তবে তাকে পরাজিত করা মানুষ তো দূরে থাক, দেবতাদেরও সাধ্য ছিল না। কর্ণ দাতা ছিলেন,

তাই তাঁকে 'কবচ কুণ্ডল' খোয়াতে হয়েছিল। 'দাতা কর্ণ' এই অহমিকা তাকে বিভ্রান্ত করেছিল। কালকূটের স্বপক্ষে যুক্তিতে এই কথায় পাওয়া যায় — "মানুষের শক্তিই তার দুর্বলতার কারণ হয়ে ওঠে কখনো কখনো।" *(পৃ: ১৪৯০, ঐ)*

দৈবকে অস্বীকার করা যায় না। দৈবের সঙ্গে ভাগ্য যুক্ত। কিন্তু পুরুষকারহীন দৈবকে মূল্য দেওয়া হয়নি কখনো, না মহাভারতে না একালে। পুরুষকারকে খুব বড় স্থান দেওয়া হয়েছে সবকালেই।

পাণ্ডুর বনবিহারকালেই হস্তিনানগরীর দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন কালকূট। একালের দৃষ্টিতে তিনি দেখছেন সেই সময়ে ঘটে চলেছে আরও অনেক ঘটনা-রঙ্গ, যেগুলো উল্লেখ না করলে কাহিনী পূর্ণতা পাবে না বলে তাঁর মনে হয়েছে। আরও এক উপকাহিনী এই প্রণয়কাহিনীকে সমৃদ্ধ করেছে। হস্তিনা রাজপ্রাসাদে ভীষ্ম পারশবী মহীপতি দেবকের পরমাসুন্দরী কন্যা যুবতী পাবশবী তনয়ার সঙ্গে বিদূরের বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই কন্যা বিদূরের মতোই বিনয়সম্পন্ন পুত্রগণের জন্ম দিয়েছিলেন। একই সময়ে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর গর্ভে শতপুত্র উৎপাদন করেছিলেন কিন্তু দু'বছরের মধ্যেও সে সন্তানরা ভূমিষ্ঠ হননি। গান্ধারী যখন গর্ভধারণ করেছিলেন সেই সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের এক বেশ্যা পত্নী তার সেবা যত্ন করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাকেও গর্ভবতী করেছিলেন। সেই বেশ্যা পত্নীর সন্তানের নাম যুযুৎসা।

হস্তিনাপুরীতে যখন এইসব আনন্দঘন ঘটনাগুলো ঘটে চলেছিল, সেই সময়েই একদিন পাণ্ডুর জীবনে নেমে এসেছিল এক দৈব অভিশাপ। দুই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মৃগয়ার উত্তেজনা উপভোগ করতে গিয়েই নিদারুণ ঘটনাটি ঘটেছিল। যে ঘটনাকে জানতে গিয়েই কালকূট কালের ধুলো সরিয়ে কয়েক হাজার বছর পিছনের দিকে মনভ্রমণ করেছেন। সেই সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনা ও ঘটনার সঙ্গে যুক্ত চরিত্রগুলোকে পুরাণ থেকে তুলে এনে বর্তমানের নিরিখে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নতুন করে মূল্যায়ন করেছেন। এখন কালকূটকে অনুসরণ করে যাওয়া যাক্ কুন্তী-মাদ্রীসহ পাণ্ডুর মৃগয়াস্থলে।

পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীকে নিয়ে মহানন্দে একটি পুষ্পিত অপরূপ অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সেটা ছিল মৃগদের বিচরণক্ষেত্র। সেই 'মৃগব্যালসেবিত মহারণ্য'-এ মৃগয়ার উত্তেজনায় উত্তেজিত ছিলেন পাণ্ডু। মৃগয়ার নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই দেখতে পেয়েছিলেন একটি মৃগ ও মৃগীর কামক্রীড়ারত রূপ। ধনুর্বাণ হাতে পাণ্ডুকে দেখেও তারা নির্বিকারভাবে কামক্রীড়ায় প্রমত্ত ছিল। পাণ্ডু মৃগ ও মৃগীকে এরকম প্রমত্ত দেখে পর পর পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন। তীর নিক্ষেপের পরই মৃগ যূথপতি একটি আহত ঋষিপুত্রে পরিণত হয়েছিল, পাণ্ডুর

বাণের আঘাতে তার আর বাঁচার কোনো উপায়ই ছিল না। যন্ত্রণায় সে বিলাপ করছিল— "মহারাজ তুমি নিতান্তই কামক্রোধপরতন্ত্র, নির্বোধ। তুমি এমনই পাপী, এরকম একটা নৃশংস কাজ করতে তোমার বাধল না।" *(পৃ: ১৪৯০, ঐ)*

মহারাজ পাণ্ডু এই ঘটনায় অত্যন্ত অবাক হয়ে নিজকর্মের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন এই কথা বলে যে— রাজাদের শত্রু হত্যা করা যেমন কর্তব্য, হরিণ বধও কর্তব্য। আচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যে বনমধ্যে মৃগ দেখতে পেলেই তাকে বধ করতে হবে একথা সকলেই জানে। মৃগ হত্যা যদি অধর্ম হত, তাহলে অগস্ত্য যজ্ঞ করার জন্য মৃগয়া করতেন না। শুধু তাই নয় মৃগবসাদ্বারাই তাঁর হোমের কাজ হয়েছিল। অতএব তাঁকে ঋষিপুত্র বৃথাই তিরস্কার করছে। উত্তরে ঋষিপুত্র রাজার কথা মেনে নিলেও বলেছিলেন মিথুন সময়ে শত্রুকে হত্যা করা উচিত হয়নি।

পাণ্ডু বলেছিলেন — "ঠিকই, মাতাল, ভীত পলায়মান শত্রুকে বধ করা বিধেয় নয়। কিন্তু ভবাদৃশ মৃগ বধ করা তো অবিধেয় নয়।" *(পৃ: ১৪৯১, ঐ)*

মৃগ মহারাজকে প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন যে মহারাজ তাকে হরিণ ভেবেই বাণ মেরেছেন, কিন্তু সঙ্গম অবস্থায় হত্যা করা উচিত হয়নি, কেন না ইন্দ্রিয় সুখ তো সকলেরই সমান, মহারাজ "নিজে তো একজন রতিকোবিদ (কামকলানিপুণ) বীর্যবান পুরুষ।" *(পৃ: ১৪৯১, ঐ)* তিনি ফলাহারী একজন নিরপরাধ মুনি, কিন্দম তার নাম। লোকলজ্জাভয়ে হরিণের বেশে বনে এসে হরিণীতে আসক্ত হয়েছিলেন। হরিণ ভেবে মহারাজ প্রাণঘাতী তীর মেরেছেন তাই ব্রহ্মহত্যার পাপ হবে না, কিন্তু এর ফল ভোগ করতেই হবে। — "তুমিও যে সময় স্ত্রী সংসর্গ করবে, তোমার মৃত্যু হবে। তুমি আমাকে বড় সুখের সময় মৃত্যুমুখে পাঠিয়েছ। নিজের সেই সুখের সময়ে তোমাকেও আমার মতন এই একই দুর্ভাগ্য বরণ করতে হবে।" *(পৃ: ১৪৯১, ঐ)*

মৃত্যুপথযাত্রী মৃগ ও মহারাজ পাণ্ডুর মধ্যে তীব্র তর্কযুদ্ধ চলাকালীন কালকূট মহারাজ পাণ্ডুকে লক্ষ্য করছেন। পাণ্ডুরাজ মৃগরূপী কিন্দম মুনির শেষ কথাগুলো শুনতে শুনতে বিমর্ষ ও বিষণ্ণ হয়ে উঠেছেন। তিনি স্বপক্ষে যতই যুক্তি দেখান না কেন, তাঁর অন্তরে গভীর অনুতাপের সঞ্চার হয়েছে। তাঁর অবচেতন মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া হতে শুরু করেছে। কালকূট ঠিকই লক্ষ্য করেছেন— পাণ্ডু চিন্তিত; মৈথুনাসক্ত হরিণ-হরিণীকে বধ করাটা পাণ্ডুর মত হৃদয়বান ব্যক্তির ঠিক হয় নি। পাণ্ডু তো নিজেই রতিকোবিদ অর্থাৎ কামকলানিপুণ। পাণ্ডুর যন্ত্রণাবোধ একজন সাধারণ মানুষের যন্ত্রণার সঙ্গে একাকার হয়েছে। মহাভারতের একটি ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কালকূট একালের মানসিকতায় মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তুলে ধরতে চেয়েছেন একালের মানসিকতায় সেকালের জীবনযাত্রা, সামাজিক পরিবেশ ও কুশীলবদের।

পাণ্ডুরাজের প্রতিক্রিয়াটি লক্ষ্য করা যাক্ কালকূটের দৃষ্টিপথে। তিনি কুন্তী ও মাদ্রীকে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলছেন— "তার পিতা বিচিত্রবীর্য অত্যধিক কামপরায়ণতন্ত্রতার জন্য যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণের ঔরসজাত হয়েও কেন এমন কাজ করলেন? আমার এখন মৃগয়া ব্যসনে মত্ত হওয়া ঠিক হয় নি। অনুতাপে আমি দগ্ধ হচ্ছি। আমি এখন থেকে মহর্ষি দ্বৈপায়ণের মতনই মোক্ষলাভের জন্য তপস্যা করব। স্ত্রী, বন্ধু সবাইকে ছেড়ে গায়ে ধুলা মেখে গাছতলায় শুয়ে থাকব। সুখে দুঃখে, কোন কিছুতেই আমি আর বিচলিত হব না। সব সময়ে প্রসন্ন থাকব। সর্বভূতের হিতসাধন করর। জীবনধারণের জন্য গাছের কাছে ভিক্ষে চাইব। গাছ ভিক্ষে না দিলে মানুষের দরজায় দরজায় গিয়ে ভিক্ষে করব। আমি এককালে ধর্মার্থ বা ভোগ সুখ, আর কোন কিছুতেই লিপ্ত হব না। কারণ এক পরম দুঃখ আমাকে দহন করছে। আমি সুখ কী দুঃখ কী, সবই জেনেছি।" *(পৃ: ১৪৯১, ঐ)*

কি নিদারুণ দুঃখবোধ থেকে সসাগরা সাম্রাজ্যের অধিপতি মহাবলপরাক্রান্ত, মহাঅস্ত্রকোবিদ, মহাবীর্যবান রতিকোবিদ মহারাজ পাণ্ডুর মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে। তিনি সাম্রাজ্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত। কিন্তু প্রস্তুত নয় তাঁর পত্নীদ্বয় তাঁকে ত্যাগ করতে; তাঁরা হস্তিনাপুর যেতে রাজি হলেন না। এই দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণার সাথী হতে চাইলেন কুন্তী ও মাদ্রী। রাজার মতো ভোগবিলাস ত্যাগ করে বনমধ্যে আশ্রমে পাণ্ডুর সঙ্গেই কঠোর সংযম ও তপস্যায় দিনযাপন করতে চাইলেন। তাতে যদি পাণ্ডু রাজি না হন তাহলে তাঁরা মৃত্যুকেই বেছে নেবেন।

উত্তরে পাণ্ডু জানিয়েছিলেন যে,— অরণ্যশাস্ত্র বিধান মেনে আত্মীয়-স্বজন গ্রামবাসী কারও সঙ্গেই তাঁরা দেখা করতে পারবেন না। বল্কল পরতে হবে, চীর চর্ম জাঠধারণও করতে হবে, উভয়কে সকাল সন্ধ্যায় হোম স্নান করতে হবে। অর্থাৎ কঠোর তপস্যায় ব্রতী হতে হবে। কুন্তী মাদ্রী ব্রাহ্মণদের ডেকে সুবর্ণ রত্নঘটিত অলঙ্কার দান করে দিয়েছিলেন আর পাণ্ডু ঐ ব্রাহ্মণদের দিয়ে হস্তিনানগরে গিয়ে খবর দিতে বলেছিলেন যে— "পান্ডু বনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করছেন। সেখান থেকে আর ফিরবেন না।" *(পৃ: ১৪৯১, ঐ)*

কালকূটের চোখে ঘটনাটা অত্যন্ত অদ্ভুত আর বিস্ময়কর লেগেছে এইজন্য যে, মহারাজ পাণ্ডু পাপবোধে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন এতবড় গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত পাণ্ডুরাজ কেন কয়েকজন গ্রহীতা ব্রাহ্মণকে দিয়ে পাঠালেন। কালকূটকে সমর্থন করে একথা বলা যেতেই পারে পাণ্ডুরাজার সেনাবাহিনী, লোকলস্কর ও গূঢ় পুরুষেরা সব কোথায় ছিলেন? পাণ্ডুরাজার সেবার জন্য বা প্রয়োজনে যখন যা দরকার তা পালনের জন্য যারা প্রস্তুত থাকত বা মহিষীদের সেবার জন্য যে বিশাল দাসীবাহিনী নিযুক্ত ছিল তারা সব কোথায় গেলেন। পাণ্ডুর গভীর মনোবেদনার সময়ে

ভীষ্ম-বিদূরের মতো ধার্মিক গুণীজন ও ধৃতরাষ্ট্রের মতো স্নেহশীল বড়দাদা, মাতা সত্যবতী এদের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল। দিগ্বিজয় সেরে হস্তিনাপুরীতে ফেরার খবর পেয়েই ভীষ্ম সৈন্যসামন্ত নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন পাণ্ডুকে সংবর্ধনা দেবার জন্য। তাহলে চরম দুঃখের দিনে তাঁরা তো কেউই যাননি পাণ্ডুর কাছে তাঁকে মানসিকশক্তি বা সান্ত্বনা দিতে? গ্রহীতা ব্রাহ্মণদের কাছে খবর পেয়েই বিষণ্ণ মনে তাঁরা পাণ্ডুর বাণপ্রস্থে গমনের খবরটা মেনে নিয়েছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে দেখছি বিষয়টি এইভাবে বর্ণিত আছে। — "পরে তৎপ্রদত্ত সমুদয় ধনগ্রহণপূর্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে হস্তিনানগরে গমন করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল। ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র তাহাদের মুখে পাণ্ডুর বনবাস-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একান্ত বিষণ্ণমনা হইয়া আহার, বিহার, শয়ন প্রভৃতি সমুদয় সুখ পরিত্যাগপূর্বক দিন যামিনী কেবল চিন্তাসাগরে নিমগ্ন রহিলেন।"

কালকূট সন্দেহ প্রকাশ করেছেন— "ভারত ইতিহাসের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, মনে রাখতেই হচ্ছে, এই ব্যাপারটির জন্যই মহাভারতের কুরুবংশ, কুরু পাণ্ডবে বিভক্ত হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের বীজ এইখানেই রোপিত হল। এই বিচ্ছিন্নতাই সন্দেহ অবিশ্বাস ঈর্ষার জন্ম দিয়েছিল।" *(পৃ: ১৪৯২, ঐ)* — আসলে পাণ্ডু যেহেতু বনবিহারে ছিলেন, সেইহেতু ধৃতরাষ্ট্রই রাজকার্য পরিচালনা করেছিলেন মহারাজরূপে। পাণ্ডু ফিরে এলে পাণ্ডুই মহারাজের আসনে আসীন হতেন। বিপত্তি এখানেই! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর বাণপ্রস্থের সিদ্ধান্তে মনে মনে খুশিই হয়েছিলেন, কিন্তু বাইরে এমন আচরণ করেছিলেন যাতে সকলেই মনে করেছিল তিনি সত্যি ভাইয়ের প্রবজ্যা গ্রহণের সংবাদে অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে ভেঙে পড়েছেন। আসলে পাণ্ডুর অবর্তমানে ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের মাধ্যমে রাজ্য শাসন করছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র চাননি বলেই ভীষ্ম-বিদূর কেউই পাণ্ডুর কাছে যেতে পারেন নি প্রব্রজ্যা গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য কোনরকম অনুরোধ করতে; ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর প্রবল ঈর্ষাই সকলকে পাণ্ডুর কাছে যেতে বিরত করেছিল। গান্ধারীর ঈর্ষার কথা উল্লেখ করা হল এই কারণে যে গান্ধারীর পরবর্তী আচরণই একথা প্রমাণ করে দেবে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শোকসাগরে নিমজ্জিত হয়ে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন, তাঁকে ফেলে পিতামহী সত্যবতী ও মাতা অম্বালিকা পাণ্ডুর কাছে যেতে পারেন নি।

কালকূটের ভ্রমণ কাহিনী ক্রমশ একটি জটিল কাহিনীতে পরিণত হচ্ছে। পটভূমি, সামাজিক পরিবেশ সেকালের চরিত্রের কুশীলবরা একালের দৃষ্টিতে চিত্রিত।

প্রবজ্যা গ্রহণের পরে পাণ্ডু তাঁর দুই মহিষীকে নিয়ে কঠিন জীবনযাপন শুরু করেছিলেন। পত্নীদের নিয়ে নাগপাশ পর্বত থেকে চৈত্ররথ, সেখান কালকূট, হিমালয়, গন্ধমাদন, ইন্দ্রদ্যুম্ন

সরোবর, হংসকূট পেরিয়ে শতশৃঙ্গ পর্বতে গভীর তপস্যায় বসেছিলেন।

লেখক কালকূট পাণ্ডু, কুন্তী ও মাদ্রীর সঙ্গে যেন পদব্রজে সঙ্গী হয়েছিলেন। পাণ্ডুর এই কঠিন তপস্যা অর্থাৎ নানান কঠিন নিয়ম পালন ইত্যাদি থেকে কালকূটের মনে হয়েছে — পাণ্ডু যেন প্রায়শ্চিত্ত করছেন। এই কঠিন তপস্যার মধ্যে দিয়েই পাণ্ডু ধীরে ধীরে সমস্ত পাপমুক্ত হয়ে মহর্ষিতুল্য হয়ে উঠেছিলেন একথা স্বয়ং মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বলেছিলেন। মহর্ষির এই উক্তি থেকে কালকূটকে সমর্থন করে বলা যায় — গভীর তপস্যার ফলে পাণ্ডু শরীরে ও মনে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। মৃগের অভিশাপে তাঁর দেহে-মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল সেই পরিস্থিতি থেকে ক্রমশ তাঁর উত্তরণ ঘটছিল। শতশৃঙ্গবাসী সিদ্ধাচার্যদের সঙ্গে স্বর্গে ব্রহ্মদর্শনে যেতে চেয়ে পাণ্ডু যেতে পারেন নি অপুত্রক বলে। সিদ্ধাচার্যরাই তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, চারপ্রকার ঋণের মধ্যে সন্তান উৎপাদন করে একটি ঋণ শোধ করতে হয়। একথা শোনার পরে পাণ্ডু সন্তান কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। মৃগের শাপে পুত্র উৎপাদনে অক্ষম পাণ্ডু, কিন্তু ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনে তো অসুবিধা নেই, কেননা তিনিও তো ক্ষেত্রজ সন্তান। অতএব তিনি কুন্তীকে নির্জনে ডেকে নিয়োগানুসারে তপঃস্বাধ্যায় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ দিয়ে পুত্র উৎপাদন কীভাবে করা যায় সেটা বুঝিয়ে দিয়ে তাঁকে সন্তান উৎপাদনে রাজি হতে অনুরোধ করেছিলেন।

কুন্তী এ প্রস্তাবে রাজি হতে পারেন নি। অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে সহবাস করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, কেন না তিনি পাণ্ডুতেই অনুরক্ত; পুত্রার্থে তিনি পাণ্ডু ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে সহবাসে রাজি নন। পাণ্ডু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নর তাঁর কাছে আর কেউ নেই। এ অবস্থায় কুন্তী ব্যাষিত্যশ্ব রাজার রানী কিভাবে রাজার গশবদেহের সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্তান ধারণ করেছিলেন সেই উদাহরণ দিলেন এবং নিজের জন্মবৃত্তান্ত বলে কুন্তীকে আদেশ দিয়েছিলেন — "স্বামীর আজ্ঞাই শেষ আজ্ঞা।" *(পৃ: ১৪৯২, ঐ)* নারীর অবস্থান সম্পর্কে সেই সময়কার সামাজিক-পারিবারিক পরিবেশ কালকূট অতি দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। স্বামীর আদেশই শেষ কথা। পত্নীকে মানতেই হবে। অগত্যা কুন্তী তখন পাণ্ডুকে তাঁর কুমারীকালে দুর্বাসাকে সেবা করে কোন দেবতাকে আহ্বান করে সন্তান উৎপাদন করতে পারার এক মন্ত্রলাভ বা বর পাওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি যে পূর্বে এ মন্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন সেকথা একবারও বলেননি। কালকূট বলেছেন যে এটাই হয়ত নারী ধর্মের বিশেষত্ব, যেটি বলবার নয়, সেটা তারা কখনো বলবেন না। কুন্তীও বলতে পারেন নি। সামাজিক পরিস্থিতি কুন্তীকে বাধ্য করেছিল কথাটি গোপন রাখতে। কুন্তী সে আমলে প্রভাবশালিনী রমণী ছিলেন, তাঁর রূপের সৌন্দর্য ও সেবাপরায়ণতার খ্যাতি বহুদূর বিস্তার লাভ করেছিল। তাই স্বয়ং দুর্বাসা এসেছিলেন কুন্তীর সেবা গ্রহণ করতে। কুন্তী তাঁকে তুষ্ট করতে

পেরেছিলেন। পাণ্ডুর আদেশে ও ইচ্ছা অনুসারে কুন্তী এবার দুর্বাসার দেওয়া মন্ত্র প্রয়োগ করে ধর্মকে ডেকে এনেছিলেন এবং একটি ত্রিভুবন বিশ্রুত ধার্মিক পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন।

গান্ধারীর কাছে সংবাদটি পৌঁছেছিল এইভাবে — "কুন্তী একটি পরম বিক্রমশালী ব্রতচারী সন্তানের জন্ম দিয়েছে।" *(পৃ: ১৪৯২, ঐ)*

কালকূটের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ব্যাপারটি নজর এড়ায়নি। সন্দেহটি ঠিকই। পাণ্ডুর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ বা খোঁজখবর ছিল না কুরুবংশের। তাহলে গান্ধারীকে কে সংবাদ দিয়েছিল? তাহলে গান্ধারী গোপনে গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁদেরই কেউ এই খবরটি পৌঁছে দিয়েছিল। এর পরবর্তী ঘটনাটি হল— গান্ধারী চব্বিশ মাস পরে গর্ভপাত করে একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করেছিলেন। প্রশ্ন ওঠে যে— তিনি কেন করেছিলেন এই গর্ভপাত? নিশ্চয়ই ঈর্ষায়। তাঁর সন্তানের জন্মের পূর্বেই কুন্তীর সন্তান প্রসব অর্থাৎ রাজসিংহাসনের দাবীদার হয়ে গেল পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠির। আগেই দেখা গেছে — পাণ্ডুর প্রবজ্যা গ্রহণের সময় কেউ তাঁকে বিরত করতে যেতে পারেন নি। এখন গান্ধারীর এই আচরণে তাঁর ঈর্ষার কারণটি প্রকাশিত — 'সিংহাসনের উত্তরাধিকার'। একালের দৃষ্টিতে কালকূট এই সত্যটি দেখেছেন মহারাজ পাণ্ডু ফিরে এলে তাঁর সন্তানই সিংহাসনের উত্তরাধিকার হবে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ণের বরে গান্ধারী শতপুত্রের জননী হবেন এটা তিনি জানতেন। তবুও তিনি আশঙ্কায় গর্ভপাত করে ফেলেছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ এসে সেই মাংসপিণ্ডের উপর জলসেচন করিয়ে একশটা খণ্ডে বিভক্ত মাংসপেশীগুলো একটা ঘৃতপূর্ণ কলসের উপরে রেখে দু'বছর পরে কলসীগুলোর মুখ খোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কালকূট এখানে একশটা কলসের কথা বলেছেন কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের ১ম খন্ডে ১২১ পৃষ্ঠায় দেখা যায় আরও একটা কলসের কথা বলা হয়েছে যা থেকে কন্যা দুঃশলার জন্ম হয়েছিল। ঘটনাটা এইভাবে বর্ণিত আছে— ধাত্রী যখন মাংসপিণ্ডের এক একটি ভাগ ঘৃতপূর্ণ কসলের মধ্যে রাখছিল তখন গান্ধারী মনে মনে কামনা করেছিলেন — "আমি যদি কখনও তপস্যা, দান, হোম বা গুরুজনসেবা করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই পুণ্যবলে যেন আমার এক কন্যা হয়।" *(পৃ: ১২১, মহাভারত, ১ম খন্ড)* — মহর্ষি তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে সেই খণ্ডগুলো গুণে দেখেছিলেন একটি ভাগ বেশি হয়েছে। তখন তিনি গান্ধারীকে ডেকে বলেছিলেন — "বৎসে! এই শতভাগ তোমার শতপুত্ররূপে পরিণত হইবে; আর এই যে একভাগ অবশিষ্ট রহিল, ইহাতে তুমি এক কন্যাও উৎপন্ন দেখিবে এবং তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, তদ্বারা তোমাদের দৌহিত্রজনিত লোক প্রাপ্তি হইবে।" *(পৃ: ১২১, মহাভারত, ১ম খন্ড)* এই বলে তিনি আর একটা ঘৃতপূর্ণ কলস আনিয়ে সেই কন্যাভাগ রক্ষা করলেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকার যেহেতু পুত্ররা সেহেতু হয়ত কালকূট কন্যাভাগের কথা উল্লেখ করেন

নি। তবুও এখানে উল্লেখ করা হল এই কারণে যে গান্ধারী মাত্র একবারই গর্ভধারণ করেছিলেন, কন্যা দুঃশলার জন্মের কথা সুনির্দিষ্ট করতেই কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত ১ম খন্ড থেকে এই অংশটি উল্লেখ করা হল।

কালকূটের জিজ্ঞাসু মন জানতে চায়— আধুনিককালে একসঙ্গে দশটি সন্তানই বাঁচে না তাহলে একসঙ্গে একশটি সন্তান কিভাবে বেঁচেছিল? তিনি ভাবছেন— "কৃষ্ণদ্বৈপায়ণের ব্যবস্থার মধ্যে হয়ত বিশেষ কোনো কার্যকারণ ছিল।" *(পৃ: ১৪৯২, অন্তিম প্রণয়)*

সেই বিশেষ ব্যবস্থাটি কি? ঘৃতপূর্ণ কলসগুলো সাধারণ কলস ছিল না। জন্ম সুনিশ্চিত করার উন্নতমানের যন্ত্রবিশেষ ছিল সেই ঘৃতপূর্ণ কলসগুলো— মাতৃজঠরের বাইরেই যাতে পরিপূর্ণ মানব শিশু জন্ম নিতে পারে একটা নির্দিষ্ট দিনে বা সময়ে। দুর্যোধন দু'বছর পরে জন্মেছিলেন এবং জন্মের পরই গাধার মতো চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন, তার সঙ্গে সুর মিলিয়েছিল শেয়াল-শকুনেরা। সেদিনই বনে জন্মেছিলেন ভীম। পাণ্ডুর নির্দেশে কুন্তী বায়ুকে আহ্বান করে ভীমের জন্ম দিয়েছিলেন। আর ইন্দ্রকে আহ্বান করে এরপরে অর্জুনের জন্ম দিয়েছিলেন। তিন তিনটি সন্তান পেয়েও পাণ্ডু কুন্তীকে আরও একটা সন্তানের জন্ম দিতে বলেছিলেন। কিন্তু কুন্তী রাজি হননি পরপুরুষ সংসর্গ করতে, কেন না পরপুরুষের দ্বারা মাত্র তিনবার সন্তান উৎপাদন করা যায়, চারবারে স্বৈরিণী ও পাঁচবারে নারী বেশ্যা হয়। কালকূটের মনে প্রশ্ন— পরপুরুষ কোথায়? সকলেই তো দেবতা। তাহলে তিনি স্বৈরিণী বা বেশ্যা হতে যাবেন কেন? দেবতা ও মানুষে তো তফাত আছেই। তাছাড়া বারে বারে পাণ্ডু কুন্তীকেই বা কেন বলছেন? মাদ্রীও তো রয়েছেন, তার কথা কি ভুলে গিয়েছিলেন? পাণ্ডু মাদ্রীর কথা ভোলেন নি, হয়ত ভেবেছিলেন তার প্রিয়তমা পত্নী যদি রাজি না হয় এ প্রস্তাবে। কেন না কুন্তীকে তিনি শেষপর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন। মাদ্রীকে পান্ডুর কিছুই বলতে হয়নি। মাদ্রী নিজেই পুত্রার্থিনী হয়ে পাণ্ডুকে বলেছিলেন যে কুন্তী পুত্রবতী হলে তিনিই বা কেন হবেন না? কালকূট অতীতের পথে মানস ভ্রমণকালে মানবমনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, রাগ-দ্বেষ কিভাবে লক্ষ্য করেছেন তা মাদ্রীর উক্তি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। সপত্নীর সঙ্গে যে তাঁর সামান্য ঈর্ষা ভাব আছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই কথাগুলিতে— "কুন্তীর উচিত আমাকেও অনুগ্রহ করা। কিন্তু সে আমার সপত্নী, আমি নিজে তার অনুমতি চাইতে পারব না। কুন্তীকে আপনি বলে রাজি করান।" *(পৃ: ১৪৯২, ঐ)* সন্তান প্রার্থী পত্নী পতিকে সপত্নী সম্বন্ধে কত সূক্ষ্মভাবে অভিযোগ করেছেন তা কথাগুলিতেই স্পষ্ট। পাণ্ডুর মনের অবস্থাটাও লক্ষ্য করার মতো। কালকূটের কিছুই চোখ এড়িয়ে যায় নি। গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন পাণ্ডুর মানসিক দিকগুলো। কুন্তীকে আগে বিয়ে করেছেন, তাই আগে তাঁর মত নিতে হবে সতীনের গর্ভধারণের

জন্য। এছাড়া 'দুর্বাসা প্রদত্ত বরে' মাদ্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য কুন্তীকে রাজি করাতেই হবে, তাই তিনি নানাভাবে কথা বলে কুন্তীকে রাজি করিয়েছিলেন। কুন্তী মাদ্রীকে 'দেবতা' বেছে নিতে বলায় মাদ্রী অবিচ্ছিন্ন দেবতা অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে আহ্বান করেছিলেন যা তিনি অনেক আগেই ভেবেচিন্তে ঠিক করে রেখেছিলেন। মাদ্রী একসঙ্গে দুটি পুত্র প্রসব করেছিলেন। এ ব্যাপারে কুন্তী অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তাই পান্ডু যখন দ্বিতীয়বার প্রিয়তমা পত্নী মাদ্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের কথা বলেছিলেন, তখন কুন্তী স্পষ্ট বলেছিলেন যে, মাদ্রী অত্যন্ত ধূর্ত। সে একবারে দু'জনকে আহ্বান করে দুই পুত্রের জন্ম দিয়েছে; ব্যাপারটা তাঁর জানা থাকলে তিনিও সেরকম কিছু করতেন। মহারাজ পাণ্ডু যেন তাঁকে এ বিষয়ে অনুরোধ না করেন। দুই সতীনের মধ্যে সৌহার্দ্য জন্মেছিল ঠিকই, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সূক্ষ্ম বিরূপতা ছিল। কালকূটের চোখ দিয়ে সেই বিরূপতাই স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে। কুন্তী বুদ্ধিমতী মাদ্রীকে আর সুযোগ দেননি, পাণ্ডুও এ ব্যাপারে আর কিছুই বলতে পারেন নি। অসহায় স্বামী, সন্তান উৎপাদনের ইচ্ছা প্রবল, কিন্তু নিজে সন্তান উৎপাদনে অক্ষম, প্রেমিক মন বিষণ্ণ। পাঁচ পুত্রেই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। পাণ্ডুর এই পাঁচ ক্ষেত্রজ পুত্ররা বনের মধ্যে সিংহের ন্যায় বলশালী, দর্পশালী হয়ে বেড়ে উঠছিলেন। আর ওদিকে হস্তিনানগরে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা জলাশয়ের কমলের ন্যায় বেড়ে উঠছিলেন।

কুরুবংশের ছেলেরা একদল বনে ও একদল রাজপ্রাসাদে বেড়ে উঠছিলেন কেন — এ প্রশ্ন কালকূটকে ভাবিয়ে তুলেছে। তিনি অনুমান করতে পেরেছেন— কুরু ও পাণ্ডবের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত পাণ্ডুর বাণপ্রস্থ গমনের সময়ই শুরু হয়েছিল। পাণ্ডুর পাঁচ ক্ষেত্রজ পুত্র হয়েছে এখবর নিশ্চয়ই হস্তিনাপুরীতে পৌঁছেছিল; তবু তাঁরা বনেই মানুষ হচ্ছিল। কুরু রাজবংশের কেউ খোঁজ নিতেও আসেন নি। কেন? কিন্তু এই প্রশ্নই বারে বারে উঠেছে। পাণ্ডবদের জন্মকুলের সাক্ষী ছিলেন পাণ্ডু-কুন্তী-মাদ্রী ছাড়া শতশৃঙ্গ পর্বতের মুনিঋষিরা। রাজপরিবারের লোকজন জন্মের ঘটনাটা শুনেছেন, কিন্তু সাক্ষী তো ছিলেন না! ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু কৃষ্ণদ্বৈপায়ণের ঔরসজাত সন্তান; সাক্ষী ছিলেন সত্যবতী ও ভীষ্ম। তাই পাণ্ডবদের সম্পর্কে একটা অবিশ্বাসের জন্ম নিয়েছিল, আর ঈর্ষা তো ছিলই। তাই পাণ্ডুর পুত্রদের কেউ খোঁজও করে নি বা খোঁজ করতে দেওয়া হয়নি অনুচ্চারিত রাজ আজ্ঞায়।

যাই হোক, বনমধ্যে পাণ্ডু পুত্রদের নিয়ে সুখেই দিন কাটাচ্ছিলেন। "ইতিমধ্যে সর্বভূতের সম্মোহনকারী ঋতুরাজ বসন্ত বনে আবির্ভূত হল। রাজা পাণ্ডু চললেন বনবিহারে।" *(পৃ: ১৪৯৩, ঐ)*

কালকূট অতীতের পথে পাণ্ডুর অনুগামী হয়েছেন। তিনি দেখছেন ব্রহ্মচর্যধারী পাণ্ডুকে। তাঁর মনে একটা পরিবর্তন এসেছে, তিনি আগের মতো মনের আনন্দে বনবিহারে চলেছেন। এ

পরিবর্তন শুধু তার মনেই নয়, শরীরেও এসেছে মনে হয়। সম্মোহনকারী ঋতুরাজ বসন্তের ছোঁয়াও তাঁর দেহে মনে এসে লেগেছে। বসন্তের সাজে প্রকৃতি রঙ্গিণী হয়ে উঠেছে — পলাশ-তিলক-আম্রচম্বক-পারিভদ্রক গাছগুলি ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে; পদ্ম কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি জলজ পুষ্প জলাশয়ের শোভা বৃদ্ধি করেছে। পাখির কল-কাকলিতে বনভূমি মুখরিত। এমনি সময়ে পাণ্ডু চলেছেন বনবিহারে। মাদ্রীও চলেছেন তার পিছনে পিছনে। কালকূট পাণ্ডুর অনুগামী, সবকিছু দেখছেন আর নিজের মনে নানা প্রশ্ন তুলে যাচ্ছেন — "মাদ্রী, তুমি কি জানো না, বসন্ত আকাশে বাতাসে মদনের শর সাজিয়ে রেখেছে? শুধু তাই নয়, মাদ্রী 'দিব্যাম্বর ধারণপূর্বক' পাণ্ডুর পশ্চাতে চললেন। দিব্য বললেই অপরূপ সুন্দর মনে হয়। দিব্যাম্বর মানেই সুন্দর সজ্জা বোঝায়। দিবাঙ্গনা বলতে বোঝায় অপ্সরাদের। মাদ্রী তো তপশ্চারিণী ছিলেন। তাঁর আবার এ কি সাজ?" *(পৃ: ১৪৯৩, ঐ)*

বসন্তের উন্মাদনা পাণ্ডু ও মাদ্রীর মধ্যে। বনবিহারে যাওয়ার সময় পাণ্ডু নিশ্চয়ই কুন্তীর চোখ এড়িয়ে প্রিয়তমা মাদ্রীকে প্রণয় কটাক্ষ করেছিলেন। আর সেই কটাক্ষেই মাদ্রী দিব্যাম্বরী হয়ে পাণ্ডু রাজার পিছু পিছু চলেছেন। পাণ্ডু পিছু ফিরেই একাকিনী অপরূপ সাজে মাদ্রীকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। বহুদিনের অবদমিত কামনা রাজীব লোচনা মাদ্রীকে দেখে ধীরে ধীরে জেগে উঠেছিল, পাণ্ডু অনঙ্গশরে দগ্ধ হচ্ছিলেন। অতল এক প্রেম সমুদ্রের ঢেউ পাণ্ডুর এতদিনের সংযম তপস্যা সবকিছুকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎই পাণ্ডু তাঁর প্রণয়িনী মাদ্রীকে দুহাতে প্রেম আলিঙ্গনে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিলেন। মাদ্রী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনো বাধাই পাণ্ডুর প্রেমিকমনের সঙ্গম ইচ্ছাকে আটকে রাখতে পারেনি। প্রেমের উত্তাল উন্মাদনা পাণ্ডুকে ভুলিয়ে দিয়েছিল মৃগরূপী ঋষির অভিশাপের কথা। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, তিনি শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ নন, কোনরকম শারীরিক উত্তেজনা সহ্য করতে পারবেন না। সঙ্গম ইচ্ছাকে পূর্ণতা দিতে তিনি বলপ্রয়োগ করেছিলেন, মাদ্রী বাধ্য হয়েছিলেন আত্মসমর্পণ করতে। যেহেতু কালকূট পাণ্ডুর অনুগামী হয়েছিলেন, সেই তিনি একালের চোখ দিয়ে দেখছেন সেকালে ঘটে যাওয়া পাণ্ডু ও মাদ্রীর সেই দুরন্ত প্রেম মুহূর্তকে — "সূর্যসদৃশ পুরুষ পাণ্ডু মাদ্রীর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হলেন, আর সহসাই মৃত্যুর করাল গ্রাস তাকে গ্রহণ করলো। এমনকি পাণ্ডু কোন কথাও বলতে পারলেন না। যেন গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বা সহসা মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন স্তব্ধ হয়ে একটি পুরুষ সঙ্গ মকালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।" *(পৃ: ১৪৯৩, ঐ)*— বেদনার্ত মুহূর্ত। পাণ্ডু মনে মনে নিজেকে সুস্থ ভাবলেও আসলে তিনি দেহে-মনে পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন না। রোগের সূত্রপাত বেশ কয়েক বছর আগেই। মৃগরূপী ঋষির অভিশাপের উপলক্ষণের আড়ালে প্রকৃত রোগকে ঢাকা দেওয়া হয়েছে। পাণ্ডু জন্মমুহূর্তেই মায়ের কারণে শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল ছিলেন। মৃগহত্যার

আগে পত্নীদের গর্ভসঞ্চার করতে পারেন নি। মৃগহত্যার পর থেকেই তার দেহে হৃদরোগ জাতীয় কোনো রোগ প্রকট হতে থাকে। সে কারণেই "মৈথুনে রত হলেই মৃত্যু হবে।" *(পৃ: ১৪৯৩, ঐ)* এমন ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

মৃগরূপী ঋষির অভিশাপ একটি রোগের প্রতীক; পত্নীদের কামনা বাসনা থেকে নিরত করার ফলে এই প্রতীকের উত্থাপন। পাণ্ডুর প্রেমিক মন ছিল অতৃপ্ত। অতৃপ্ত কামনাকে পূর্ণতা দিতে মৃত্যুকে পরোয়া করেন নি পাণ্ডু। মাদ্রীর চিৎকারে কুন্তী এসে দেখেছিলেন — পাণ্ডু ও মাদ্রীর দুই দেহ লীন হয়ে আছে কিন্তু পাণ্ডু মৃত। কুন্তী আরও দেখেছিলেন মৃত পাণ্ডুর মুখটি 'আশ্চর্য প্রসন্ন সুন্দর'। শোকার্ত কুন্তী সেই সময়ে মাদ্রীকে বলেছিলেন তিনি সর্বদা মহারাজকে বাঁচিয়ে চলতেন। মাদ্রী কেন তাঁকে প্রলোভিত করেছিল। উত্তরে মাদ্রী অদ্ভুত কথা বলেছিলেন— "রাজর্ষি আমাকে বলাৎকার করেছিলেন।" *(পৃ: ১৪৯৩, ঐ)*

মাদ্রী নিজ পতি রাজর্ষি পাণ্ডুর সম্বন্ধে 'বলাৎকারে'র মত গুরুতর অভিযোগ করেছেন। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক দৃষ্টিতে কালকূট ঘটনাটিকে দেখেছেন। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায়— মাদ্রী যথার্থই বলেছেন। কেননা, কামকলানিপুণ রাজর্ষি পাণ্ডু মাদ্রীর সঙ্গে সেদিন যথেষ্ট কলানিপুণতা প্রদর্শন করেন নি; সঙ্গমকালে তিনি বলপ্রয়োগ করেছিলেন যা, মাদ্রীর কাছে বলাৎকার বলে মনে হয়েছিল। এছাড়া কুন্তির তিরস্কারের ও লোকলজ্জার ভয়েও মাদ্রী 'রাজর্ষি' সম্বন্ধে গুরুতর অভিযোগটি আরোপ করেছিলেন। কিন্তু কুন্তী এ অভিযোগটি বিশ্বাস করতে পারেন নি, বুঝেছিলেন মাদ্রী আত্মরক্ষার্থে এই কথা বলেছেন। অকস্মাৎ পাণ্ডুর মৃত্যুতে কুন্তী শোকবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন; একটি অব্যক্ত প্রেমযন্ত্রণাবোধ তাঁর হৃদয়কে মথিত করেছিল। সেই যন্ত্রণাবোধই কুন্তীর অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছিল, সার্বজনীন মহতী নারীতে উত্তরণের পথে এগিয়ে দিয়েছিল; তাই তিনি তীব্র শোকের মধ্যেও মাদ্রীকে বলতে পেরেছিলেন "মদ্ররাজনন্দিনী তুমি ধন্যা, আমার চেয়েও শতগুণে সৌভাগ্যবতী। কারণ স্বামীর সেই আশ্চর্য প্রসন্ন সুন্দর মুখটি তুমিই দেখেছ।" (পৃ: ১৪৯৩, ঐ) — এ তো কুন্তীর নারী হৃদয়ের অন্তর মথিত হাহাকার ধ্বনি। তিনি পারেন নি স্বামীকে প্রসন্নতা দিতে, রতিকোবিদ মহারাজ পাণ্ডুর কাছে প্রণয় ছিল তার হৃদয় ও রক্তের অঙ্গ। শারীরিক কারণে সেই প্রেমিক পুরুষ পাণ্ডু সঙ্গমে অক্ষম, এই কারণে পাণ্ডু মনে মনে বিষণ্ণ ছিলেন। কুন্তী তা লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু দৈবশাপের ভয়ে প্রেমিক পতিকে প্রসন্ন করতে পারেননি, তিনি সংযমের গণ্ডি ভাঙতে পারেন নি। কিন্তু মাদ্রী পেরেছেন। তাই পাণ্ডুর মৃত্যুতে কুন্তীর বুকের পাঁজর ভেঙে গেছে, তবুও এই কথাগুলি মাদ্রীকে বলেছিলেন। কালকূটের চোখে তাই কুন্তী 'প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী' এবং তাঁর কাছে পাণ্ডু চির প্রেমিক পুরুষ।

মহাভারতে পাণ্ডু-মাদ্রীর প্রণয়কাহিনী ছোট্ট একটি ঘটনা। মহাভারতের সেই ছোট্ট ঘটনাটিকে বিশদভাবে প্রত্যক্ষ করতেই কালকূটের এবারের মানসভ্রমণ। সেই ছোট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একালের দৃষ্টি দিয়ে সেই প্রণয়কাহিনীকে ধীরে ধীরে সামাজিক-রাজনৈতিক-প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে নরনারীর সম্পর্ক দ্বারা কাহিনী-উপকাহিনী তৈরি করে উপন্যাসের পূর্ণতার দিকে নিয়ে গেছেন। ভ্রমণকাহিনী আর ভ্রমণকাহিনীতে সীমাবদ্ধ থাকে নি। পাণ্ডুর প্রয়ণকে আমাদের মনে এক চির প্রেমিক পুরুষের কথাই মনে করে দিয়েছে একটি বিয়োগান্ত অথচ প্রণয়ের মহিমায় মহিমান্বিত আশ্চর্য প্রণয়কাহিনী উপন্যাসের রূপ পেয়েছে।

বাংলার শাহী বংশের শাহী সুলতানরা নিজেদের যোগ্যতা, শক্তি ও ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের অন্যতম হয়ে উঠেছিলেন। তার ফলে তাঁরা বাংলার জনসাধারণের, এমনকি বিধর্মী হিন্দুদেরও আস্থা ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন।

কালকূট বলেছেন ইতিহাসের পথে "ইলিয়াস শাহী বংশেরই এক বিশেষ সুলতানের সন্ধানেই আমার যাত্রা।" *(পৃ: ১৪৯৮, ঐ)*

শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস শাহ ভাঙরা কীভাবে তার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার সবই কালকূটের বিশ্লেষণে অন্বেষণে উঠে এসেছে।

কালকূট-এর কাহিনী '**প্রেম-কাব্য-রক্ত**' ইতিহাসের ধারায় বাংলার বিস্মৃত ইতিহাস। কালকূট শুরু করেছেন নবদ্বীপের নিমাই-এর হৃদয়বিজড়িত মর্মবেদনার কথা দিয়ে— "সকলই অনিত্য মা"। পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে এসে প্রিয়তমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু সংবাদ শোনার পরে নিমাই-এর মুখ থেকে এই কথাটি বেরিয়ে এসেছিল। কালকূট বলেছেন "মানুষের ইতিহাসই, অনিত্যকাল থেকে নিত্যকালের ধারায় প্রবাহিত। স্বয়ং নিমাই, শ্রীচৈতন্য রূপে কৃষ্ণের অবতার হয়ে সেটাই প্রমাণ করে গিয়েছেন। তথাপি মানুষমাত্রেই আমরা জানি, ইতিহাসে কার স্থান থাকবে, না থাকবে, সেকথা ভেবে কেউ তাঁর কাজ করেন না। তাঁর যা করণীয়, তিনি তা করে যান। ইতিহাসে যাঁরা বেঁচে আছেন, মৃত্যুর কথা তাঁরা কেউ সজ্ঞানে ভাবেন নি। অথচ সমগ্র মানব ইতিহাসের ধারায় তাঁরা ইতিহাসের পাতায়, মানুষেরাই স্মৃতিচারণের মধ্যে বেঁচে থাকেন।" *(পৃ: ১৪৯৫, কালকূট রচনা সমগ্র, ৩য় খণ্ড)।*

কালকূটের এবার মনভ্রমণের স্থান হল গৌড়। তিনি বলেছেন— "বাংলার দুশো বছরের স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে বিশেষ একজন সুলতানের ঘটনাকালে আমি যেতে চাই।" *(পৃ: ১৪৯৫, ঐ)* আর গৌড়ের যে রাজত্বকালকে তিনি ধরতে চেয়েছেন, তা হল— গৌড়ের পাঠান রাজত্ব শুরু হওয়ার আগে হিন্দু রাজত্বও নয়, বা লক্ষ্মণাবতীতে সেন রাজাদের আমলে যে পাঠানরা এসে

বাংলা জয় করেছিল তাদের সময়েও নয়। তিনি চলেছেন ''ইলিয়াস শাহী বংশের সময়ে, গৌড়ের প্রাঙ্গণে যাব''*(পৃ: ১৪৯৫, ঐ)*। সেখানে তিনি নিজের চোখেই সব দেখতে চান।

এই ইলিয়াস শাহী বংশের এক সন্তান সুলতান গিয়াসুদ্দীন মামুদ শাহের কালেই কালকূটের এবারের মনভ্রমণ। সেই ভ্রমণ আরও তথ্যনিষ্ঠ ও যুক্তিনির্ভর করে একমাত্র ইতিহাস মিশ্রিত ভ্রমণ কাহিনীটি পাঠককূলের সামনে তুলে ধরলেন 'প্রেম কাব্য রক্ত' রচনাটিতে।

'প্রেম কাব্য রক্ত' রচনাটি প্রথমে ভ্রমর ছদ্মনামে 'প্রসাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে এপ্রিল, ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ (১৩৯৩ বঙ্গাব্দ) 'জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স' থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটি 'অন্তিম প্রণয়' রচনার সঙ্গে একত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

'কালকূট রচনা সমগ্র' (১ম খন্ড) -এ 'কালজয়ী কালকূটে' নিতাই বসু মহাশয় লিখেছেন 'প্রেম কাব্য রক্ত' কালকূটের লেখা একমাত্র ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস; অবশ্য কালকূট তাঁর শিল্পী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পুরাণ বা জীবনীকেন্দ্রিক এমন কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছেন যাতে তার বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিনির্ভর ও সত্য সন্ধানী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধরনের মনের অধিকারী ছিলেন বলেই একদা শান্তিনিকেতনে বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে, অবসর যাপনের অলস দুপুরে, তাঁর বইয়ের আলমারি থেকে ইতিহাসের বই বেছে নিয়ে পড়েন তিনি। বইটির নাম 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর। স্বাধীন সুলতানদের আমল'। লেখক— শান্তিনিকেতনের বাংলার অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়। কালকূট গ্রন্থটি পড়ে বাংলার ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পরবর্তী দু'শো বছরের ইতিহাস জানতে পারেন যখন বাংলার সুলতানেরা নিজেদের যোগ্যতা, শক্তি ও ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের অন্যতম হয়ে উঠেছিলেন। ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠ ছাত্রের মতো কালকূট লক্ষ্য করেছেন কীভাবে কবি-প্রেমিক-ধার্মিক সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহর নৃশংস হত্যার পর রাজা গণেশের উত্থান শুরু হল।

কালকূট তাঁর এই ইতিহাসাশ্রিত রচনাটির জন্য সুলতানের গিয়াসসুদ্দীন মামুদ শাহের কালে যাত্রা করেছেন, সেই সুলতানের শাহী বংশ কবে বাংলাদেশের সিংহাসন দখল করেছিল, কীভাবে করেছিল, কেমনভাবে তাঁরা রাজ্যশাসন করেছেন, দিল্লীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কেমন ছিল, দিল্লীর সঙ্গে কেমন করে তাঁরা অধীনতা ছিন্ন করে স্বাধীন বাংলার স্থায়িত্ব দিয়েছেন সেইসব বিশদভাবে জানবার জন্য কালকূট ইতিহাসের সেই ধূলাচ্ছন্ন পিছনের পথে আরো এগিয়ে গেছেন; ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে চলে গেছেন। ********

১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফখরুদ্দীন মুবারকশাহ নাম নিয়ে নিজেকে স্বাধীন বাংলার সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। কাল ১৩৩৮ সালের কিছু আগের দূরকালে চলে গেলেন। ফখরুদ্দীন শাহ

তখনও নিজেকে স্বাধীন বাংলার সুলতান বলে ঘোষণা করেন নি। লখনৌতি, সাতগাঁ, সোনারগাঁও ইত্যাদির শাসকবর্গ ছিলেন বহ্‌রাম খান; দিল্লীতে তখন অধিষ্ঠিত সুলতান হলেন মহম্মদ তুঘলক। এই সমকালে কালকূট দেখলেন — মহম্মদ তুঘলকের খামখেয়ালিপনা আর ভয়ানক অত্যাচারে জনজীবন অতিষ্ঠ। এই কারণে তাঁর শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল।

বহ্‌রাম খানের 'তরবারি বাহক' ফখরুদ্দীন। 'ফখরা' নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। বহ্‌রাম খানের মৃত্যুর পর এই 'তরবারি বাহক' বাঙালি সৈন্যদের সাহায্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সেই সময়ে লখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন কদর খান। কদর খান 'ফখরা'কে দমন করার জন্য সোনারগাঁয়ে ছুটলেন। ফকরা সেই সময়ে পালিয়ে গিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন। কদর খান ছিলেন লোভী; প্রচুর ধনদৌলত আর সোনারূপা নিয়ে সোঁনারগাও-এ রয়ে গেলেন, দিল্লীর রাজকোষে জমা দিলেন না। একদিন সুযোগ পেয়ে ফখরুদ্দীন সৈন্যসহ কদর খানকে আক্রমণ করে হত্যা করলেন। তাঁর ভৃত্য মুখলিশকে লখনৌতির দায়িত্বভার দিয়ে তিনি চলে গেলেন সোনারগাঁও-এ। কদর খানের সৈন্যদের বেতন দাতা ছিলেন আলি মুবারক। তিনি একদিন মুখলিশকে হত্যা করে নিজেকে লখনৌতির স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করলেন এবং নিজে নতুন নাম নিলেন — আলাউদ্দীন আলি শাহ।

কালকূট অতীতের দিকে চোখ রেখেছেন। বিচিত্র ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে হত্যার রাজনীতি বাংলার রঙ্গমঞ্চে ঘটে চলেছে। ঠিক এরকম সময়ে বাংলার রঙ্গমঞ্চে ইলিয়াস শাহ্‌-এর প্রবেশ। কালকূট ইতিহাসের ঝাপ্‌সা পথে চলে স্পষ্ট করে কিছু বুঝতে পারছেন না। তবু তা থেকে যেটুকু বুঝতে পেরেছেন তা হল— কেউ বলেছেন ইলিয়াস আমীর ছিলেন, কেউ বলেন আলাউদ্দীন আলি শাহের ধাত্রী মায়ের ছেলে ছিলেন ইলিয়াস শাহ্‌, আবার কেউ বলেছেন তিনি নাকি আলাউদ্দীন আলি শাহের ভৃত্য ছিলেন— নানা কাহিনীর ছড়াছড়ি। তাঁর ভেতর থেকে কালকূট ইলিয়াস শাহের বংশধর এক সুলতানের সুলুক সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন।

খুঁজতে খুঁজতে ইতিহাসের এক জীর্ণ পাতায় পেয়ে গেলেন একটি তথ্য। "ইলিয়াসকে অল্‌-খিজিস্থানী বলা হয়েছে। খিজিস্থান পূর্ব ইরানের এক জায়গার নাম। তাহলে ইনি হাজীও বটে। পূর্ব ইরানবাসী হওয়াই বোধহয় সঠিক।" *(পৃ: ১৪৯৬, ঐ)*

এছাড়া কোথাও কোথাও তাঁকে 'মালিক ইলিয়াস' বলা হয়েছে। কালকূটের মনে এর থেকে ছোট্ট একটা জিজ্ঞাসা উঁকি দিয়েছে। 'মালিক' শব্দটি সাধারণত অভিজাত পুরুষদের নামের আগে বসানো হয়। তাহলে মালিক ইলিয়াস কি সত্যি সত্যি আলাউদ্দীনের ধাত্রী মায়ের ছেলে?

পূর্ব ইরানের অধিবাসী বলেই, অল্প বয়সে মক্কায় গিয়ে তিনি হাজী হয়েছিলেন। ধর্মপ্রাণ

ছিলেন। আর মনে মনে একটি উচ্চাশাও ছিল। সেটা পূর্ণ করার জন্য। একদিন কাজের সন্ধানে সুদূর দিল্লীতে পাড়ি জমালেন। আলাউদ্দীন আলি সেই সময়ে দিল্লীতে বাদশাহের অধীনে কাজকর্ম করছিলেন। দিল্লীতে এসে ইলিয়াস কিছু করতে পারলেন না। 'হাজী' বলে সকলে একটু সম্মান সমাদর করে, এই যা। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ্-এর প্রাসাদেও তাঁর যাতায়াত ছিল। সুলতানের উপপত্নীদের কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল। উপপত্নীদের একজনের সঙ্গে যেই প্রেম জমে উঠল অমনি অন্যান্যরা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল এবং যথাসময়ে কথাটা সুলতানের কানে পৌঁছল। সুলতান ক্ষিপ্ত হয়ে ইলিয়াসের গর্দান নেবার হুকুম দিলেন। ইলিয়াস যথাসময়ে খবর পেয়ে পালিয়ে গেলেন সুবে বাংলায়। সেই সময়ে ফখরুদ্দীন দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেকে বাংলার স্বাধীন নরপতি বলে ঘোষণা করেছিলেন। ফখরুদ্দীন দীর্ঘকাল দিল্লীর সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন।

ইলিয়াস শাহ ঠিক জায়গাতেই এসে পৌঁছেছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ ইলিয়াসকে খুঁজে না পেয়ে আলি মুবারক তথা আলাউদ্দীন আলি শাহ কে তলব করলেন ইলিয়াসকে খুঁজে বের করার জন্য। কেননা, সুলতান ফিরোজ শাহ জানতেন যে ইলিয়াস আলি মুবারকের ধর্মভাই।
আলি মুবারক ইলিয়াসকে খুঁজে না পাওয়াতে ক্রুদ্ধ সুলতান ফিরোজ শাহ মুবারককে তাড়িয়ে দেওয়াতে সেও গেল বাংলার পথে। আলি মুবারক ফররুদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধ করে লখনৌতির রাজা হয়েছিলেন। কালকূট ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় দেখেছেন— ইলিয়াসের সঙ্গে আলাউদ্দীন আলি শাহর দেখা হতেই তাঁর গর্দান নেবার হুকুম দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর ধাত্রী মায়ের অনুরোধে তিনি গর্দান নেওয়া থেকে বিরত থাকলেন।

বাংলায় এসেই ইলিয়াস আলি তার অনেক দিনের উচ্চাশাকে পূরণ করার সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর দূরদৃষ্টি। তিনি সেই সময়ের বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা খুব গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছিলেন। সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং সেখান থেকেই ভাং নেশা ধরেছিলেন। এত নেশা করতেন যে 'ভাংরা ইলিয়াস' নামে তিনি পরিচিত হয়ে গেলেন। ফখরুদ্দীনের সেনাবাহিনীর মনও জয় করে ফেললেন, যুদ্ধবিগ্রহে অংশ নিতে লাগলেন।

এরই ফাঁকে ইলিয়াস মনে মনে ফখরুদ্দীনকে সরিয়ে আলাউদ্দীন শাহকে গোটা বাংলার সুলতান করার ফন্দী-ফিকির খুঁজতে লাগলেন। আবার সেই হত্যার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন কালকূট; তবে ইতিহাসের পথে এই ঘটনার ইঙ্গিতটা কালকূট স্পষ্ট করে বুঝতে পারলেন না। তিনি বলেছেন "এই অস্পষ্ট ইঙ্গিতটা যদি বাস্তবে ঘটে থাকে, তাহলে বলতে হয়, অত্যন্ত দুঃসাহসও তাঁর ছিল। আর আলাউদ্দীন আলি শাহ্ নিশ্চয় তখন থেকেই ইলিয়াসকে মর্যাদা দেবার কথা ভেবেছিলেন।

একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, ইলিয়াস হাতে রক্ত মাখতে আরম্ভ করেছিলেন বাংলায় এসেই। ফখরুদ্দীনের ছেলে ইখ্‌তিয়ারুদ্দীনকে তিনি হত্যা করেছিলেন। আর এসব হত্যার কোনোটাই সামনা-সামনি যুদ্ধে ঘটে নি। ইখ্‌তিয়ারুদ্দীনের হত্যার পরে আলাউদ্দীন আলি সমগ্র সুবে বাংলার সুলতান হয়ে বসেছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল ইলিয়াসের নেতৃত্বেই।" *(পৃ: ১৪৯৭, ঐ)*

কালকূট মানবমনের ভেতরে উঁকি দিয়ে অন্তর্লোকের খবর বের করে আনেন। এখানেও তিনি উঁকি দিয়ে দেখতে পেয়ে গেলেন, ইলিয়াস আলি মনের উচ্চাশাকে পূরণ করার জন্য ধীরে ধীরে স্থির লক্ষ্যে পৌঁছাচ্ছেন। কিন্তু বাংলার মসনদের দিকে তাঁর ঈগলের দৃষ্টি ছিল। রাজপ্রাসাদের খোজা রক্ষীদের তিনি হাত করেছিলেন। আমীর ওমরাহ, সেনাবাহিনী সকলকেই তিনি হাত করেছিলেন।

আলাউদ্দীন আলি শাহ্ রাজত্বের এক বৎসর পাঁচ মাস হয়েছে। এমনি একদিন ইলিয়াসের মা তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন— ইলিয়াসের ইচ্ছা কি? তাঁর আচরণ তাঁর মায়ের মোটেই ভালো ঠেকছে না। মুবারক ইলিয়াসকে এক সময়ে হত্যা করতে চেয়েছিল, তাঁর কথাতেই মুবারক ইলিয়াসকে হত্যা করেনি। এছাড়া তিনি তাঁর গর্ভধারিণী মা, মুবারকের ধাত্রী মা। সে যেন মুবারকের কোনো ক্ষতি না করে। সুলতানকে যেন সুলতানের মতই থাকতে দেয়; আর সেনাবাহিনী আমীর ওমরাহদের সে যেন সুলতানের বিরুদ্ধে একত্রিত না করে, উস্‌কে না দেয়, মুবারকের ক্ষতি না করে। কিন্তু উত্তরে ইলিয়াস আলি জানিয়েছিল, মুবারকের সে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু করে নি। তার জন্য সে অনেককে হত্যা করেছে। ফখরুদ্দীন ও তাঁর ছেলেকে সে হত্যা না করলে মুবারক কখনো লখনৌতির রাজা হতে পারত না। রাজা হওয়ার পর মুবারক রাজ্য বাড়ানোর চেষ্টা না করে কোনমতে দরবার ছেড়ে প্রমোদবিলাসে মেতে ওঠে। অন্যের উপর নির্ভর করে শুধু হুকুমদারি করে।

ইলিয়াসের মা তাঁর কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তাঁর মতলব কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। তিনি পুত্রকে বার বার সংযত হতে বলেছেন। তিনি শুনেছেন— ইলিয়াস সুলতানের বিরুদ্ধাচরণ যাঁরা করছেন তাঁদের ইলিয়াস থামাচ্ছে না, বরং সেই প্ররোচিত করছে। তিনি পুত্রকে বলেছেন— "আমি দেখতে চাই, তুমি মুবারকের প্রতি সবসময় বিশ্বস্ত আছ।" *(পৃ: ১৪৯৭, ঐ)* উত্তর না দিয়ে ইলিয়াস আলি জানিয়েছেন অন্য কথা। স্বয়ং হজরত শাহ্ মখদুম জালালুদ্দীন তাব্রিজী মুবারককে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন যখন মুবারক দিল্লী থেকে বাংলায় আসছিলেন। সেই দরবেশই তাঁকে সুবে বাংলা দান করেছেন। কিন্তু মুবারক ক্ষমতা হাতে পেয়ে দরবেশের কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

দরবেশ আবারও স্বপ্নে দেখা দিয়ে সেই দরগার ইট কোথায় পাওয়া যাবে সব কিছুই

হদিশ দিয়ে দরগা বানিয়ে দিতে বলেছিলেন। মুবারক লোক দিয়ে কোনমতে দরগাটি বানিয়ে দিয়েছিলেন। সেই দরগা দরবেশের পছন্দ হয়নি। এই কথা জেনে ইলিয়াসের মা শঙ্কিত হয়েছিলেন এবং পুত্রকে আবার অনুরোধ করেছিলেন সে যেন মুবারকের কোনো ক্ষতি না করে। এরকম নানা বাদানুবাদের পরে ইলিয়াস শাহ বলেছেন "সুলতানকেই তাঁর সুলতানী বজায় রাখতে হয়। আর আপনার ভাগ্যে যদি থাকে, আপনি হবেন সুলতানের মা, তাহলেও তো ভাগ্যের ওপরে আপনার হাত থাকবে না।"

এরপর ইলিয়াস শাহ্ আর দেরি করেন নি। ষড়যন্ত্র একেবারে পাকা করে শুধু সময়ের অপেক্ষা — "একদিন গভীর রাত্রে ইলিয়াস, অনায়াসে অন্দরমহলে প্রবেশ করে, আলাউদ্দিন আলি শাহ্ অর্থাৎ মুবারককে হত্যা করেছিলেন। তাঁর একটুও হাত কাঁপেনি।"*(পৃ: ১৪৯৮, ঐ)*কালকূট তাঁর মানসচক্ষে সেই রাত্রের অন্দরমহলের হত্যালীলা সব প্রত্যক্ষ করলেন। এরপর ইলিয়াস নিজেকে সুবে বাংলার সুলতান বলে ঘোষণা করে লখনৌতির সিংহাসনে বসেছিলেন। 'ভাঙ্‌রা' ইলিয়াস যে সুলতান হয়েছে এটা সকলকে জানানোর জন্য সিংহাসনে বসে তিনি যে তার নতুন নামকরণ করেছিলেন, তার সঙ্গে ভাঙ্‌রা শব্দটি জুড়তে ভুললেন না, সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ ভাঙ্‌রা। কালকূটের দেখানো পথেই ইতিহাসের পথ ধরে দেখা গেল — পূর্ব ইরানের খিজিস্থানের একজন সামান্য লোক, তথা হাজী, নিজ উচ্চাশার বলে দিল্লী থেকে পালিয়ে এসে কীভাবে বাংলার মসনদটি দখল করে বসেছিলেন। কালকূট দেখেছেন— একটি ভাঙ্‌খোর, চরিত্রহীন, সমাজের উঞ্ছ লোকদের সঙ্গে যাঁর বন্ধুত্ব, তাছাড়া বিশ্বাসঘাতক ও গুপ্তঘাতক সেই লোকটি কীভাবে তাঁর দূরদৃষ্টি, বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্যের সঙ্গে বাংলার সিংহাসনে বসেছিলেন। কালকূট ইতিহাসের ধুলো সরিয়ে দেখেছেন — "এই ইলিয়াসই পরবর্তীকালে গৌড়ের ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। গৌড়ের ইতিহাসে ইলিয়াসশাহী বংশ বেশ কিছু যোগ্য সুলতানের জন্ম দিয়েছিল। ইলিয়াস যে রাজবংশের সৃষ্টি করেছিলেন, সে বংশ দীর্ঘকাল গৌরবের সঙ্গে বাংলায় রাজত্ব করে গিয়েছে। এই ইলিয়াস শাহী বংশেরই এক বিশেষ সুলতানের সন্ধানে আমার যাত্রা। কিন্তু তার আগে, ইলিয়াস শাহী কীভাবে এই বংশকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার।" *(পৃ: ১৪৯৮, ঐ)*

কালকূট একটি শিলালিপিতে দেখেছেন— তাতে স্পষ্ট করে লেখা আছে ৭৪৩ হিজরীর ২রা তারিখে এই শিলালিপিটি লেখা হয়েছিল। হিজরীর হিসাব অনুযায়ী ইংরাজি ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর হয় দিনটি। কালকূট অনুমান করেছেন এই শিলালিপির অন্তত বছর খানেক আগে তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন। পাণ্ডুয়াসহ উত্তরবঙ্গ জয় করেছিলেন সেই বছরেই, তাঁর সেনাবাহিনীকে

তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে দেননি। ১৩৪৬ সালে সপ্তগ্রাম দখল করে সেখানকার টাঁকশাল থেকে নিজের নামাঙ্কিত টাকাও বাজারে ছেড়েছিলেন। কালকূট লক্ষ্য করেছেন, সুলতানরা যে কোনো ছোটখাট রাজধানী বা শহর দখল করলে, সেটা জনসাধারণের কাছে প্রচারের জন্য মুদ্রা তৈরি করতেন। সোনারগাঁও তিনি অনায়াসেই দখল করতে পারবেন এই বিশ্বাস ছিল তবে তাঁর ভয় ছিল বাংলাদেশের সীমান্তের বাইরের দেশগুলি সম্পর্কে। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধ করার আগে তিনি প্রস্তুতি নিয়েছিলেন যুদ্ধের জন্য। সেনাবাহিনীকে নতুন করে সংগঠিত করে উজ্জীবিত করেছিলেন। আরও একটি কাজ করেছিলেন— হিন্দু পাইকরা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, তিনি তাঁদের সেনাবাহিনীতে নিয়ে তার সেনাদলকে শক্তিশালী করেছিলেন। নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেও দিল্লীর অধীনেই যে সুবে বাংলা তা দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ্‌কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কালকূট বলেছেন যে, ইলিয়াস দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করলেও নজরানা দিতেন না। সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করেই তিনি নেপাল আক্রমণ করেছিলেন। কালকূট বলেছেন— এ যুদ্ধ নয়, লুটপাট। বহু নগর পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। পশুপতি নাথের বিখ্যাত মূর্তি তিন খণ্ড করে কেটে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং নেপালের রাজা জয়চন্দ্র মল্ল পশুপতিনাথ-এর কাছ থেকেও প্রচুর অর্থ নিয়েছিলেন।

এরপর ঐ একই বাহিনী নিয়ে উড়িষ্যার জাজনগর থেকে চিল্কা হ্রদের সীমা ছুটে গিয়েছিলেন এবং ৪৪টি হাতীসহ প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে এসেছিলেন। এরপরে তিনি অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন। এরপরে ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালি সেনাপতি সহদেবকে নিয়ে ত্রিহুত আক্রমণ করেন। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ্‌র কাছে এই খবর যায়। ফিরোজ শাহ্‌ হেমন্তকালে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে বাংলার দিকে আসছেন এই খবর পেয়েই ইলিয়াস একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ একডালায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। একদিকে গঙ্গা, একদিকে অরণ্য, আর একদিকে গঙ্গারই জাতের ছোট একটি খাড়ি নদী — এইরকম দুর্গম অঞ্চলে দুর্ভেদ্য দুর্গ এই একডালা। ফিরোজ শাহ্‌ বিশাল বাহিনী নিয়ে একডালা দুর্গ অবরোধ করলেন।

এই অবরোধকালীন সময়ে ইলিয়াস হঠাৎ তাঁর হাতীসহ সৈন্যদল নিয়ে ফিরোজ শাহের ছাউনিতে আক্রমণ করে দ্রুত দুর্গে ফিরে আসতেন। ফিরোজ শাহের সৈনদল পর্বত প্রমান হাতীর সমনে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ত। তার সৈনবাহিনীতে কোন হাতী ছিল না তাই ফিরোজ শাহের সৈন্যদল ইলিয়াসের হস্তীবাহিনীর হত্যায় মেতে উঠে মাত্র তিনটি হাতীকে মারতে সক্ষম হয়। এইভাবে কিছুদিন চলার পর বর্ষা এসে যাওয়ায় ফিরোজ শাহ সন্ধির প্রস্তাব পাঠান। আর নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্য ফিরোজ শাহ্‌ কয়েকটি হস্তী জয়ের দ্বারা যুদ্ধে জয়লাভ হল বলে প্রচার করে

দিয়েছিলেন।

এরপর ইলিয়াস দিল্লীর সুলতানকে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন একজন পরাজিত সুলতান হিসাবে নয়, একজন স্বাধীন সুলতান যেমন আর একজন স্বাধীন সুলতানকে উপঢৌকন পাঠান, সেইভাবেই পাঠিয়েছিলেন। এইজন্য উপঢৌকন দেখে ফিরোজ শাহ ইলিয়াসের দূতকে বলেছিলেন "তুমি যা এনেছ, আমার সামান্য গোলামরাও তার চেয়ে ভাল জিনিস তৈরি করতে পারে। তোমাদের উচিত বাছা বাছা হাতী আনা। একজন সুলতানের আর একজন সমকক্ষ সুলতানকে সেরকম উপহারই দেওয়া উচিত।" এ'থেকেই প্রমাণ হয় সন্ধি একটা শেষ পর্যন্ত হয়েছিল। ইলিয়াস শাহ্ এরপর উত্তর বিহারের হাজীপুর, এছাড়া চম্পারণ, গোরখপুর আর কাশী জয় করে তাঁর রাজ্যের সীমানাকে বাড়িয়েছিলেন। তবে ইলিয়াস শাহ্ সন্ধির পরে বিজিত রাজ্যের কিছু কিছু ফিরোজ শাহকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র সিকন্দর শাহ্ সিংহাসনে বসেন। দিল্লীতে ফিরোজ শাহ এই খবর শুনে আবার বাংলা অভিযান করেন। ইলিয়াসের শক্তির কাছে পর্যুদস্ত হওয়ার বদলা নেওয়ার এটাই সুযোগ বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু এবারও পূর্ববর্তী যুদ্ধেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল। সিকন্দর পিতার মতো একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দু'বছর সাতমাস ধরে ফিরোজ শাহ্ তাঁর অভিযান চালিয়েছিলেন। কিন্তু কোন পক্ষই চূড়ান্ত জয়লাভ করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত সন্ধি হয়। ফিরোজ শাহ্ দিল্লীতে ফিরে যান সিকন্দরের কাছ থেকে কিছু উপঢৌকন নিয়ে।

এসব ঘটনা কালকূট দেখছেন ইতিহাসের পথে চলতে গিয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। সিকন্দর সন্ধির প্রস্তাব পাঠান নি; এটা তিনি বুঝেছেন। এর প্রমাণ হিসাবে বলেছেন, "সন্ধির প্রস্তাব পাঠালে তাকে ফিরোজ শাহ্র সামন্ত হয়ে থাকতে হত। তাঁর পিতাও তা করেন নি, তিনিও তা করেন নি। *(পৃ: ১৫০০, ঐ)*

সিকন্দর শাহ্-র একটি অক্ষয় কীর্তি আদিনা মসজিদ। ভারতে তৈরি সমস্ত মসজিদের মধ্যে আয়তনের দিক থেকে এটি দ্বিতীয়, এর গায়ে হিন্দু মন্দিরের উপকরণগুলো সুন্দরভাবে লাগানো দেখেছেন। রাজা গণেশ যখন কিছু কালের জন্য রাজা হয়েছিলেন তখন তিনি এর কিছু পরিবর্তন করেছিলেন বলে ওরকম সুন্দরভাবে লাগানো আছে; এটি মুসলমান সুলতানদের কীর্তি নয়, তাঁরা হিন্দু মন্দিরের উপকরণ গুলো বিকৃত করে উলটে লাগাতেন—এটাই কালকূট তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন।

সিকন্দর শাহ্ দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করার পরে আর তেমন যুদ্ধ করেন নি। দীর্ঘকাল সুনামের সাঙ্গে রাজত্ব করেছেন। কিন্তু পারিবারিক অশান্তি তাঁর জীবনে নিয়ে আসে চরম

বিপর্যয়। সিকন্দর শাহ্-র দুটি বেগমের মধ্যে বড়ী বেগমের ছিল সতেরোটি সন্তান; ছোটি বেগমের মাত্র একটি সন্তান— নাম গিয়াসুদ্দীন। এই গিয়াসুদ্দীনের সন্ধানেই কালকূটের এবারের মানসিক পরিভ্রমণ। তাঁকে ও তাঁর কালকে বিশেষভাবে জানবার জন্য কালকূট তাঁর সময়কাল থেকে অনেক অনেক আগের ইতিহাসের কালের সময়ে চলে গিয়েছিলেন। বড়ী বেগমের সতেরোটি ছেলের মধ্যে ভালগুণের বদলে খারাপ গুণগুলো প্রকট হয়ে উঠেছিল। শাহী আদব-কায়দা কিছুই তারা মেনে চলত না, আলস্যে বিলাসে দিন কাটাত। বন্ধুরাও কেউ ভালো ছিল না, আমীর-ওমরাহ কেউই তাঁদের পছন্দ করত না।

অপরদিকে ছোটি বেগমের পুত্র গিয়াসুদ্দীন একেবারে আলাদা। শাহী আদব-কায়দা যথাযথভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। পড়াশুনায় মনোযোগী ছিলেন। অস্ত্র চালনা, অশ্ব চালনা শিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি ভালো যোদ্ধা হয়ে উঠেছিলেন। এছাড়া সেনাপতি ও যুদ্ধবিশারদদের কাছ থেকে তিনি যুদ্ধের বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন। চিন্তাশীল, বিবেচক ব্যক্তিদের কাছ থেকে তিনি সুলতান শাহীর উপযুক্ত জ্ঞান আহরণ করতেন। বড়ী বেগমের ছেলেরা আমোদ-প্রমোদে অংশ নিতে বললে তিনি অংশ নিতেন না, নেশাও করতেন না। বড়ী বেগমের ছেলেরা তাঁকে নানাভাবে উপহাস করতেন এবং পছন্দ করতেন না। গিয়াসুদ্দীন তাঁর মায়ের শিক্ষা ও নির্দেশে বড় হয়েছিলেন। তাঁর মা কখনও সিকন্দর শাহের কাছে ছেলের জন্য দরবার করতে যেতেন না। কিন্তু বড়ী বেগম যেতেন তাঁর ছেলেদের জন্য বলতে ও গিয়াসুদ্দীনের নামে নালিশ করতে।

কিন্তু সুলতান তাঁর অনুচরদের মারফৎ সব খবর রাখতেন বলে বড়ী বেগমের কথাতে গুরুত্ব দিতেন না। কারণ গিয়াসুদ্দীন যে সব দিক থেকেই শিক্ষালাভ করছে, কোনরকম বেয়াদপির খবর সুলতান শোনেন নি; কিন্তু বড়ী বেগমের ছেলেরা যে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করছে তা তিনি জানতেন। তিনি বড়ী বেগমের ছেলেদের কাছে নিজের এবং তাঁর পিতা সামসুদ্দীন ইলিয়াস কীভাবে দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন সে সব কথা বলে তাঁদের রাজ্য রক্ষা আর সিংহাসন রক্ষার দিকে মনোযোগ দিতে বলেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সুলতানকে এ সম্পর্কে আশ্বাস দিলেও আদতে কিছুই করে নি। তাঁর পিতা তাঁকে ঠিক সময়ে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু বড়ী বেগমের ছেলেরা সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব নেবে কি? সুলতানের প্রশ্নের উত্তরে বড়ী বেগম বলেছিলেন " আপনার ছোট বেগমের ছেলে গিয়াস যুদ্ধ শিখেছে। তাকে পাঠান। আমার ছেলেরা যা করবার ঠিক করবে।" (পৃ: ১৫০১, ঐ) সুলতান বড়ী বেগমের এ কথাকে গুরুত্ব না দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে বড়ী বেগমের ছেলেদের প্রতি তাঁর ভরসা নেই। তাছাড়া সিংহাসনে কে বসবে অর্থাৎ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কে হবে বড়ী বেগমের জিজ্ঞাসার উত্তরে কঠোরভাবে

বলেছিলেন — "সুলতান শাহী নিয়ে আমি তোমার বা ছোটি বেগম, কারোর সঙ্গেই কথা বলতে চাইনে। ছোটি বেগম কোনদিন আমার সঙ্গে তার ছেলের বিষয়ে একটি কথাও বলেনি। তার সে সাহসও নেই। তোমারই দেখছি সে স্পর্ধা আছে। সকলের জানা দরকার, কার কতখানি এখ্‌তিয়ার আছে।" (পৃ: ১৫০১,

এরূপ পরিস্থিতিতে একদিন বন্ধুদের সঙ্গে গিয়াসুদ্দীন প্রাসাদের বাইরে অশ্বারোহণে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় একটি তীর তাঁর কাঁধের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, কিন্তু তার অশ্বটি তীরবিদ্ধ হয় গিয়াসুদ্দীনের চলার পথটি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছেন। সুলতানের জীবনের সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম জীবনবোধ ও তার সন্তান গিয়াসুদ্দীনের জীবনে আবর্তিত সমস্যাগুলো ইতিহাসের পাতা থেকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। জীবনের একটা সংকটময় মুহূর্তে তৈরি হয়েছে গিয়াসুদ্দীনের। এই ঘটনার গুরুত্ব বুঝে যান ছোটি বেগম। গিয়াসকে হত্যার পরিকল্পনা যে এটি তা বুঝতে পেরে তিনি গিয়াসকে কথাটি সুলতানের কানে দিতে বললেন। গিয়াস সময়মত সুলতানকে ব্যাপারটি জানাতেই সুলতান গিয়াসকে সাবধানে থাকতে বললেন এবং যেহেতু হিন্দু পাইকরাই ভালো তীরন্দাজ তাই তিনি তাঁর পিতার আমলের হিন্দু সেনাপতি সহদেবের পুত্র সেনাপতি মহাদেবকে এ বিষয়ে খোঁজখবর নিতে বললেন।সেনাপতি মহাদেব খবর নিয়ে জানালেন যে, প্রচুর অর্থ ও পদোন্নতির লোভে এবং কোন এক ওমরাহের বিশ্বস্ত লোকের কথায় তারা এই কাজ করেছে। কিন্তু ওমরাহকে তারা চেনে না।

সুলতানের বড়ী বেগমের ভাই মালিক সিকন্দরকে সন্দেহ করলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে বড়ী বেগম গিয়াসের এক বন্ধুর মুখ দিয়ে এক গুরুতর অভিযোগ করালেন— "সে আমাকে বলেছে খুব শীঘ্রই সে আপনাকে আর তার বৈমাত্রেয় ভাইদের হত্যা করে সিংহাসন দখল করবে।" (পৃ: ১৫০২,ঐ) সুলতান গিয়াসের বন্ধু আলীশার কথা বিশ্বাস করলেন না। সিকন্দর শাহ্ বড়ী বেগমকে বিদায় দিয়ে গিয়াসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আলীশাকে কোরান স্পর্শ করিয়ে প্রকৃত ঘটনা জেনে নিলেন। আবার সেই মালিক সোলেমানের ষড়যন্ত্র। সুলতান এই ঘটনার পরের দিনই মালিক সোলেমানকে ত্রিহুত সীমান্ত রক্ষার জন্য পাণ্ডুয়া ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। মালিক সোলেমান কোন প্রতিবাদ করে না। একদিনের মধ্যে ত্রিহুত সীমান্তে যাত্রা করলেন। এবং বড়ী বেগমকে জানিয়ে দিলেন— " তোমার অভিযোগের সত্যাসত্য আমি সবই জেনেছি, তার যথাযথ ব্যবস্থাও নিয়েছি, গিয়াসুদ্দীন কর্তব্যপরায়ণ পুত্র। শাসন দক্ষতার অধিকারী। সে যদি আমার জীবন নিতে চায় নিক। পুত্র কর্তব্যপরায়ণ হলেই সুখের কথা। সে যদি তা না হয়, তাহলে ধ্বংস হোক।" (পৃ: ১৫০২, ঐ) আর একথায় বড়ী বেগমের চোখে পৈশাচিক অভিব্যক্তি ঝলসে উঠেছিল তা বলার

অপেক্ষা রাখে না, চলে যাবার আগে বললেন "দুনিয়াতে খোদার ওপর কোন কথা চলে না, আর সুলতানের রাজ্যে সুলতানের কথার ওপর কথা চলে না" (পৃ: ১৫০২, ঐ) তাই কালকূটের অতীত মানসভ্রমণেও ধরা পড়ল।

সুলতান এরপরে গিয়াসুদ্দীনের ওপর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমীর-ওমরাহরাও এই ঘটনাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমীর ওমরাহরা তাঁর পক্ষে থাকলেও তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইরা চারিদিকে এমন ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে ফেলেছিল যে, গিয়াসুদ্দিনের ঘরে-বাইরে চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। সেগুলো কালকূট তাঁর অর্ন্তদৃষ্টিতে অনুভব করেছেন।

এরকম অবস্থায় বাধ্য হয়ে গিয়াসকে অন্য পথ ধরতে হয়েছিল। তিনি আশা করেছিলেন, "পিতা রাজ্য পরিচালনার পরিবর্তে সিংহাসনে বসিয়ে সমস্ত ক্ষমতা তার হাতে তুলে দেবে।" *(পৃ: ১৫০২, ঐ)* কিন্তু তা না হওয়ায় তিনি একটু আশাহত হয়েছিলেন। কিন্তু নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য গিয়াস বড়ী বেগম ও বৈমাত্রেয় ভাইদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে উঠলেন।

একদিন শিকারে যাবেন বলে গিয়াস ঘোষণা করে দিলেন। এজন্য বিশাল দলবল, তাবু, ঘোড়া ইত্যাদি নিয়ে শিকারে বেরলেন। আসল কথাটি মাকে বললেন না। শিকার থেকে তিনি পাণ্ডুয়ায় না ফিরে সোজা সোনারগাঁ পৌঁছে গেলেন এবং সেখানকার শাসনকর্তাকে সরিয়ে নিজেকে ঘোষণা করলেন সোনারগাঁ-এর স্বাধীন সুলতান হিসাবে। নাম গ্রহণ করলেন গিয়াসুদ্দীন আজমশাহ্। গিয়াসুদ্দীন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এটা চারিদিকে প্রচার হয়ে গেল। কালকূট বলেছেন 'কথাটা একেবারে মিথ্যেও নয়।' শুধু তাই নয়, বিরাট এক সেনাবাহিনী গঠন করে পিতার কাছে বাংলার সিংহাসন দাবি করলেন। বাংলার সিংহাসন দখলের প্রস্তুতি চলতে লাগল। সৈন বাহিনী গঠন করে দক্ষ হাতে 'সোনারগাঁ' রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে 'সাতগাঁ' দখল করে নিলেন।

কালকূট এতক্ষণ গিয়াসুদ্দীনের বাংলার নবাব হওয়ার ইতিহাস অন্বেষণ করে বহু তথ্য উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু তাঁর যে কাব্যপ্রেমের একটা ইতিহাস আছে তা বলেন নি। এবার তিনি ব্যক্তি গিয়াসুদ্দীনের ইতিহাসের বাইরের পরিচয় দিতে শুরু করলেন। ইরানের হাফিজের কবিতা তিনি পড়তে ভালবাসতেন। তাঁর কবিতা ও গান সংগ্রহ করে তিনি নিজে হাতে লিখে রেখেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল, তিনি যখন বাংলার সুলতান হবেন, তখন তিনি সুদূর ইরান থেকে হাফিজকে নিয়ে আসবেন। তাঁর সে আশা ফলপ্রসূ হয়নি। কেন হয়নি তা কালকূটের দেওয়া বিশ্লেষণের পথেই জানা যাক্।

কালকূট অতীত ইতিহাসের আস্তরণ সরিয়ে দেখছেন যে— ১৩৮৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিক থেকে

১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে গিয়াসুদ্দীন গুরুতর অসুস্থ হয়েছিলেন, তাঁর জীবন সংশয় ঘটেছিল। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। হারেমের তিনটি মেয়ে সরব, গুল ও লালা-এর প্রতি তিনি প্রেমাসক্ত ছিলেন। মৃত্যুর আশঙ্কায় তিনি এই তিনটি মেয়েকে একটি বড় সম্মান দিলেন— "আমার মৃত্যুর পর তোমরা তিনজন আমার শবদেহ স্নান করাবে।" *(পৃ: ১৫০৩, ঐ)* প্রাসাদে এই কথা ঘোষণা করে দিতেও বললেন। কিন্তু দেখা গেল, তাঁর মৃত্যু হল না, তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করলেন। কিন্তু প্রাসাদের অন্যান্য মেয়েরা ঈর্ষান্বিত হয়ে এই তিনজনকে বিদ্রূপ করতে লাগল। সুলতান তাদের নামে কবিতা লেখা শুরু করলেন। ফারসীতে লিখলেন— "সুরাপাত্র বহনকারিণী, এই কাহিনী সরব, গুল আর লালার— " কিন্তু শেষ করতে পারলেন না। তাঁর সভাকবিরাও পারলেন না। তাঁর মন শান্ত হল না। তিনি হাফিজের ভক্ত, তাই তিনি একজন দূতকে পাঠালেন হাফিজের কাছে কবিতাটির প্রথম চরণ দিয়ে। সুদূর ইরানের সিরাজ শহর থেকে হাফিজ কবিতাটির বাকি অংশটি লিখে পাঠাবেন কিনা এ বিষয়ে সুলতান মনে মনে যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু তাঁর সব সন্দেহ অমূলক করে দিয়ে "হাফিজ কেবল দ্বিতীয় চরণটিই দূতের মারফৎ পাঠালেন না, সেই সঙ্গে পাঠালেন একটি পূর্ণ গজল (গান)।" (পৃ: ১৫০৩, ঐ)

কালকূট সুদূর অতীতের এই ঘটনাটিকে প্রত্যক্ষ করে বলেছেন— "এর থেকে বোঝা যায় গিয়াসুদ্দীন কিরকম কাব্যপ্রেমিক ছিলেন। আর হারেমে সরব, গুল আর লালা কেবল আনন্দিতই হয়নি, সুলতানের কাজে তারা নিজেদের সম্মানিত বোধ করেছিল। ভাবতেও পারেনি, তখন একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে ইরানের হাফিজের কাছে দূত পাঠাবেন।" (পৃ: ১৫০৩, ঐ) এই ঘটনায় সুলতান গিয়াসুদ্দীন নিজেকে সম্মানিত মনে করলেন। তিনি মনে মনে এত আনন্দিত হলেন যে হাফিজের কাছে সুদূর ইরানে অনেক উপহার পাঠালেন ও বাংলাদেশে হাফিজকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে হাফিজ আসতে পারেন নি, কারণ তিনি অসুস্থ ছিলেন। সেই সময়ে ইরান থেকে বাংলায় আসতে যে একবছর লেগে যেত তার প্রমাণ হাফিজের গজলে আছে — "এক রাত্রির নবজাত গাথা, এক বৎসরে ভ্রমণে যায় বাংলায়" (পৃ: ১৫০৩, ঐ) । হাফিজ ১৩৮৯-এর কাছাকাছি সময়েই মারা যান। গিয়াসুদ্দীন হাফিজের মৃত্যুসংবাদে শোকাহত হলেন।

এই সময়েই পাণ্ডুয়া অভিযানের প্রস্তুতি চলছে। আর পাণ্ডুয়াতেই চলছে যুদ্ধের তোড়জোড়। বড়ী বেগমের প্ররোচনায় সুলতান সিকন্দর শাহ্ বিচলিত। ত্রিহুত সীমান্ত থেকে মালিক সোলেমান ফিরে এসেছেন।

কালকূট ইতিহাসের পরিক্রমায় সুলতানী আমলের ইলিয়াস শাহী বংশের এক গভীর

সংকটময় পরিস্থিতি দেখছেন। তিনি পিতার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। পিতার কাছে বাংলার সিংহাসন দাবি করেছেন। পিতা বিমাতার মন্ত্রণায় এবং গিয়াসুদ্দীনের কার্যকলাপে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত। বাইরে থেকে দেখে সিকন্দর শাহকে মনে হচ্ছে তিনি গিয়াসের প্রতি ক্ষমাহীন।

এদিকে গিয়াসুদ্দীনের কানে পাণ্ডুয়ার সব খবরই পৌঁছেছে। মনে ভাবনা যদি পিতার স্বাভাবিক মৃত্যু হয় তাহলে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা সিংহাসনের দখল নেবে। সিংহাসনের দাবি গিয়াসুদ্দীন ছাড়তে রাজি নন। অতএব এবার পাণ্ডুয়ার দিকে যুদ্ধযাত্রা শুরু করার আগে গিয়াসুদ্দীনের সমস্ত সেনাবাহিনীর কাছে ঘোষণা করে দেওয়া হল, তাঁর পিতা সিকন্দর শাহকে যেন কোনমতেই নিহত করা না তাঁকে জীবিত বন্দী করতে হবে। গিয়াসুদ্দীন ৭৯২ হিজরীয় অর্থাৎ ১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দে পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। গোয়ালপাড়ার প্রাঙ্গণে তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। একবেলা যুদ্ধের পর কয়েকজন সৈনিক এসে জানাল— আত্মরক্ষার্থে তারা তাঁর পিতাকে অস্ত্রাঘাত করেছে। বল্লমবিদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি পড়ে আছেন, প্রাণবায়ু এখনও বের হয়নি। কোথাও যেন কোন অস্পষ্টতা না থাকে সেই জন্য তিনি ড্রু. ট্রপ্ত্রজন্সন্দ্ধ-এর অনুবাদের সাহায্য নিয়ে প্রকৃত তথ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন।

গিয়াসুদ্দীন ঐ সৈন্যটির সঙ্গে তাঁর আহত পিতার কাছে গিয়ে অশ্ব থেকে নেমে পিতার মাথাটি নিজের কোলে তুলে নিলেন। অনেকদিনের স্মৃতি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল, চোখে জল চলে এল। "বাবা, চোখ খুলুন। আপনি আমাকে অভিশাপ দিন, আশীর্বাদ করুন— যাই করুন, আপনার শেষ ইচ্ছার কথা আমাকে বলুন। আমি প্রাণ দিয়েও তা রক্ষা করব।" *(পৃ: ১৫০৪, ঐ)* মৃত্যুপথযাত্রী সিকন্দর শাহ অতিকষ্টে পুত্রের মাথায় নিজের হাতখানি রাখলেন, মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্য দিয়েও বললেন "আমার জীবনের কাজ শেষ হয়েছে। তুমি বিজয়ী, এখন এ রাজ্য তোমার। আমার শেষ প্রার্থনা, বাংলার সুলতান হিসাবে তুমি সমৃদ্ধি লাভ কর।" *(পৃ: ১৫০৪, ঐ)* এই কথাগুলো বলবার জন্য যেন বেঁচেছিলেন। কথা বলা শেষ হতেই সিকন্দর শাহ প্রাণত্যাগ করলেন। একটি দুঃখজনক মৃত্যুদৃশ্যর অবতারনা করেছেন। পিতা মৃত্যুর সময়েও পুত্রের সাফল্যের জন্য আশীর্বাদ করেছেন। এক চিরন্তন পিতাপুত্রের সম্পর্কের মুহূর্ত। ইতিহাসের পাতা থেকে মাটিতে নেমে এসেছে।

পিতার জন্য শোক করবার সময় নেই গিয়াসুদ্দীনের। সে পিতৃহন্তা নয়, তবুও পিতৃহত্যার দায় তাঁকে নিতেই হবে। তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও তাঁরই সেনানীরা আত্মরক্ষার তাগিদে পিতাকে বধ করেছে। কালকূট যেন দেখতে পেয়েছেন, গিয়াসুদ্দীনের অন্তর্বেদনা। এই শোকের সময়েও কর্তব্যের টানে তাকে পাণ্ডুয়া অভিযান করতে হল। পিতার অন্ত্যেষ্টির ভার অমাত্যদের উপরে দিয়ে

গিয়াসুদ্দীনের বিজয়ী বাহিনী শেষরাত্রে পাণ্ডুয়ায় গিয়ে পৌঁছলেন।

কালকূটের চোখে ধরা পড়েছে গিয়াসুদ্দীনের মনের ভাবনাগুলো। পিতাপুত্রের বিরোধ রাজ্যের পক্ষে কখনো মঙ্গল হতে পারে না। "একচ্ছত্র বাংলা রাজ্যে, একই সময়ে পিতা পুত্র, দুইজন সুলতান হিসাবে বিচ্ছিন্নভাবে দেশ শাসন করেছেন। সাধারণ মানুষের মনে এর প্রতিক্রিয়া কখনো ভালো হয় নি। তাদের মনে অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। আর রাজনীতির নিয়মই হল, শত্রুরা সব সময়েই রাজশক্তির দুর্বলতার সন্ধানে থাকে। পিতা-পুত্রের বিরোধ, আর বাংলাদেশে দুই সুলতান কুচক্রী রাজনীতিকরা এর সুযোগ নিতে ছাড়েনি। তারা প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ বপন করেছে। তাদের মনোবলকে দুর্বল করেছে। দেশের মানুষের মনোবল দুর্বল করার পরিণতি হল, দেশ আরও দুর্বল হয়ে পড়া, অথচ গিয়াসুদ্দীনের আর কোনো পথ খোলা ছিল না। বিমাতা ও তার সন্তানদের চক্রান্তের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার প্রয়োজন ছিল। এটা যেমন সত্য, আর একটি সত্য হল, গিয়াসুদ্দীনের প্রতি দেশের দাবী।" *(পৃ: ১৫০৪, ঐ)* পাণ্ডুয়ায় তাঁদের বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না। সিকন্দর শাহ্‌র মৃত্যুর খবর পৌঁছে গেছে। সেনানীদের জানিয়ে দিলেন যে তাঁর পিতার রাজ্য তিনি দখল নিচ্ছেন। কেউ যেন রাজধানী পাণ্ডুয়া লুটপাট না করে। দুর্গ অধিকার করে দুর্গের দরবারে রাজ্যের আমীর-ওমরাহ-অমাত্যদের ডেকে আলোচনায় বসলেন। সকলেই তাঁর পরিচিত, তাঁদের কাছেই শাহী আদব-কায়দা, রাজ্য পরিচালনা শিক্ষা করেছেন। আবার তাঁদের অধীনে থেকে পিতার অনুমতি নিয়ে রাজপদ পরিচালনাও করেছেন সেগুলো সব মনে করিয়ে দিলেন। এবং কী কারণে কেন তিনি বিদ্রোহ করেছেন সবকিছুই বলার পরে নিয়ম অনুসারে তাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন "আপনারা কি আমাকে সিংহাসনে বসার অনুমতি দিচ্ছেন?" *(পৃ: ১৫০৪, ঐ)*

আমীর-ওমরাহ-রা সবই জানতেন। 'তাঁরাই গিয়াসুদ্দীন-আজম-শাহ্‌কে বাংলার একচ্ছত্র সুলতানের সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন।" *(পৃ: ১৫০৪, ঐ)*

সিংহাসনে বসেই গিয়াসুদ্দীন ঘোষণা করেছিলেন "আমি ন্যায় ও নীতির দ্বারা রাজ্য শাসন করব। ঐশ্লামিক আইনের বিধিনিষেধ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব। কিন্তু আমার হিন্দু ওমরাহ ও সেনাপতি যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না। তাঁরা আমার ঠাকুর্দা আর পিতার আমলে যেমন রাজ্যশাসনে সহায়তা করেছেন, স্বাধীনতা ভোগ করেছেন, তেমনই করবেন।" *(পৃ: ১৫০৪, ঐ)*

পাণ্ডুয়ার দুর্গের দরবার কক্ষে আলোচনার সময়েই গিয়াসুদ্দীন তাঁর গুপ্তচরদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইরা যেন পালিয়ে না যায় "যেভাবেই হোক তাদের খুঁজে বের কর

এবং আটক কর।" *(পৃ: ১৫০৪, ঐ)* দু'দিন পরে বৈমাত্রেয় ভাইদের ও মালিক সোলেমানকে আটক করা হল এবং সামনে দাঁড়িয়ে তাদের হত্যা করালেন। বিমাতাকে হত্যা করতে পারলেন না ঐশ্লামিক বিধান অনুসারে নারীহত্যা নিষেধ তাই, কিন্তু শাস্তিস্বরূপ তাঁর সতেরোটি মৃত পুত্রের শবদেহ তাঁরই কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন গিয়াসুদ্দীনকে হত্যার পরিকল্পনাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই বিমাতাই। গিয়াসুদ্দীনের এরকম আচরণকে অন্যায় বলে আমীর - ওমরাদের মনে হল না। "সব শাহীরই এটাই পদ্ধতি, শত্রুর শেষ রাখতে নেই।" *(পৃ: ১৫০৪, ঐ)*

কালকূট গিয়াসুদ্দীনকে দেখছেন আর ভাবছেন কী বৈপরীত্যের বাহার তার চরিত্রে। একদিকে সরব, গুল আর লালার প্রতি প্রেমপূর্ণ কবিতা লেখা, কবিতার দ্বিতীয় চরণ শেষ করবার জন্য সুদূর ইরানে দূত পাঠানো, হাফিজের গজল গানে মুগ্ধ হওয়া, কোথাও হাফিজের কবিতা পেলে সেটি নিজ হাতে লিখে রেখে সংগ্রহ করা; আর একদিকে তিনিই সামরিক শিক্ষায় নিজেকে উপযুক্ত করেন ও বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন, পিতার বিদ্রোহী হন ও নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। একচ্ছত্র সুবে বাংলার সুলতান হওয়ার জন্য পিতার কাছে দাবীপত্র পাঠান। পিতা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান করলে নিজেও বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। পিতা যুদ্ধে আহত হয়ে প্রাণ হারান। পিতার সিংহাসন নিষ্কন্টক করার জন্য নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বৈমাত্রেয় ভাইদের হত্যা করান ও দেহগুলি বিমাতার কাছে পাঠিয়ে দেন।

ইতিহাসের অমোঘ গতি। কালকূট অতীত ইতিহাসের মানব চরিত্রগুলো সেইকালের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানের আলোয় মূল্যায়ন করেছেন। ইতিহাসের চরিত্রগুলি ইতিহাসের কাঠামোয় রক্তমাংসের রূপ পেয়েছে। ইতিহাসের চরিত্রগুলি ও তাঁদের কথাবার্তা, চালচলন যেমন হওয়া উচিত কালকূট সেভাবেই চরিত্রগুলি নিজ কলমের স্রোতধারায় বাস্তবের আঙিনায় তুলে এনেছেন। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণাই সাহিত্যের কথা হয়ে চরিত্রগুলি মুখে উঠে এসেছে। চরিত্রগুলি সুলতানী আমলের চালচলন, সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। চরিত্রগুলির ভেতরে প্রবেশ করে তাঁদের অন্তর্লোকের তোলপাড় হয়ে যাওয়া, বিদ্যুতের চমকের মতো ঝলসে ওঠা আনন্দঘন অথবা অশ্রুসজল মুহূর্তগুলো পরম ক্ষমতায় ও যত্নের সঙ্গে তুলে এনে চরিত্রগুলিকে নতুনরূপে নতুনভাবে তুলে এনেছেন। কালকূটের স্বকীয়তা এখানেই। তিনি মানবচরিত্রের মানবমনকে সন্ধান করেন, বিশ্লেষণ করেন। কালকূট ঐতিহাসিক চরিত্র বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীনকে ও তাঁর হৃদয়-মনকে এভাবেই চিত্রিত করলেন।

সব শত্রুর বিনাশ করে অবশেষে গিয়াসুদ্দীন তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। মাকে তিনি চেনেন, তাঁর শিক্ষাতেই তিনি বড় হয়েছেন। কিন্তু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা মা মেনে

নেবেন না বলেই মাকে না জানিয়ে এসব কাজগুলি করেছিলেন। মনে মনে তিনি মায়ের কাছে অপরাধী। কালকূট সেই বিশেষ ক্ষণ— বেদনাঘন ও আনন্দঘনমুহূর্তটি এভাবে জীবন্ত করে তুলেছেন।

গিয়াসুদ্দীন মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন, কিন্তু মা তাঁকে তার স্বামীহন্তা মনে করে পুত্রের সামনে এলেন না। অনেক অনুনয় বিনয়ে তিনি সুলতান পুত্রের সামনে এসে বললেন, "আমি সুলতানের আদেশেই বেরিয়ে এসেছি, কিন্তু আমার স্বামীহন্তার মুখ আমি দেখতে চাইনে।" *(পৃ: ১৫০৫, ঐ)* পুত্র গিয়াসুদ্দীন জানালেন— "আমি আপনার কাছে সুলতান নই।" *(পৃ: ১৫০৫, ঐ)* আরও বললেন "আমি আপনার একমাত্র পুত্র।" *(পৃ: ১৫০৫, ঐ)*

মা এবারও চোখ না তুলে বললেন, "আর সেই একমাত্র পুত্র আমার স্বামীহন্তা। এবং সুলতান সুলতানই। তাঁর আর কোনো পরিচয় নেই।" *(পৃ: ১৫০৫, ঐ)* মায়ের শিক্ষায় বড় হয়ে ওঠা সুলতানপুত্র সবিনয়ে সত্যটি তুলে ধরতে চাইলেন— "কিন্তু মা বোধহয় জানেন না, গিয়াসুদ্দীন পিতৃহন্তা নয়" । *(পৃ: ১৫০৫, ঐ)* গিয়াসুদ্দীন বিনীত ভাবে বললেন "যুদ্ধটা অনিবার্য ছিল। কিন্তু আমার আদেশ ছিল, পিতার শরীরে যেন কেউ অস্ত্রাঘাত না করে। কিন্তু একজন সেনা যখন আমাকে অকপটে এসে জানালো, নিজের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে সে সুলতানকেই অস্ত্রাঘাত করেছে, তখন আমি কি তার প্রাণদণ্ড দিতে পারি? আমি ছেলেবেলা থেকে আমার মায়ের কাছে নীতি শিক্ষা লাভ করেছি।" *(পৃ: ১৫০৫, ঐ)*

কালকূট লক্ষ্য করেছেন যেন ছোটি বেগমের স্বরে বিদ্রূপ ধ্বনিত হল — "বন্দী করার সুযোগ ছিল না বলেই কি সেই সেনা সুলতানকে অস্ত্রাঘাত করেছিল নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য। পুত্র কী করতো? পিতার হাতে প্রাণ দিত?" *(পৃ: ১৫০৫, ঐ)* মায়ের প্রশ্নের উত্তরে সুলতান পুত্র জানালেন— "পিতা যদি পুত্রকে হত্যা করতে উদ্যত হতেন, তাহলে পুত্রের কী করা উচিত ছিল?" *(পৃ: ১৫০৫, ঐ)* এবং মাকে কঠিন প্রশ্নের সামনে ফেলে দিলেন— "আর একজন বেগমসাহেবাকে এ কথাও জিজ্ঞেস করি, তিনি সেই অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু চাইতেন, না পুত্রের মৃত্যু চাইতেন?" *(পৃ: ১৫০৫, ঐ)* মাতা পুত্রে কথাবার্তা বাস্তবোচিত তুলে এনেছেন কালকূট। "এ যুদ্ধ যাত্রা যদি আমি না করতাম, তাহলে সিংহাসন পেতাম না। আপনি কি তাই চান?" *(পৃ: ১৫০৫, ঐ)* ছোটি বেগম তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিতে পারেন না। গিয়াসুদ্দীন আরও বললেন, "পিতা আমার কোলে মাথা রেখেই মারা গেছেন। তিনি আমাকে বলে গেছেন, তাঁর কাজ শেষ হয়েছে, আমিই এখন বাংলার সুলতান, তাই সুলতান হিসাবে আমি যেন সমৃদ্ধি লাভ করতে পারি। এই আশীর্বাদই তিনি আমাকে করে গেছেন। তবে আপনি কেন ক্ষমা করবেন না? আমি তো কার্যত কোনো অন্যায় করিনি।" *(পৃ: ১৫০৫, ঐ)* পরিস্থিতি অনুযায়ী ছোট ছোট অনুভূতিপ্রবণ কথাগুলি মা ও পুত্রের মুখ

দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন কালকূট, প্রাঞ্জল বাংলাভাষা ঐতিহাসিক কাহিনী ব্যক্তি চরিত্রের ভাব সংঘাতের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে গেছে কথাসাহিত্যের জগতে। তাঁর কাহিনী উপন্যাসের ধারায় গতিশীল হয়ে উঠেছে। কাহিনীর ঘনঘটা ও কথার জাল বিস্তারের মধ্য দিয়ে কালকূটের ঐতিহাসিক কাহিনী গতি পেয়েছে।

অবশেষে অনেক বাগ-বিতণ্ডার পরে মায়ের অভিমান, রাগকে প্রশমিত করতে পেরেছেন পুত্র গিয়াসুদ্দীন। মায়ের চিত্তকে শান্ত করার জন্য ও তাঁর 'দোয়া' পাবার জন্য গিয়াসের মন ব্যাকুল হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মা তাঁকে পিতার শেষ কথার মতো আশীর্বাদ করলেন— "আর তোমার সন্তানই যেন ভবিষ্যতে তোমার সিংহাসনে বসতে পারে।"*(পৃ: ১৫০৫, ঐ)*

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ ইলিয়াস শাহী বংশের তৃতীয় পুরুষ যিনি বাংলার মসনদে বসলেন। কালকূট লক্ষ্য করেছেন, সুবিচারে সুলতান গিয়াসুদ্দিন অনেক প্রশংসা লাভ করেছিলেন কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের দিকে তেমন সুনাম অর্জন করতে পারেন নি। অথচ যখন তিনি বিদ্রোহী ছিলেন তখনই তিনি যুদ্ধবিগ্রহে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতার সঙ্গে বিবাদের ফলে কামতা ও আসাম আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল।

পিতামহ - পিতার বিজিত রাজ্য কামতা কোচ ও কামরূপ রাজ্যের বড় অংশ হাতছাড়া হয়ে গেল, তিনি রক্ষা করতে পারলেন না। রক্ষা না করতে পারার কারণ ছিল পিতামহ পিতার বিজিত রাজ্য অহোম-রাজ সুদঙ্গকার স্ত্রীর গুপ্তপ্রণয়ী তাইসুলাইকে কামতারাজ আশ্রয় দিয়েছিলেন। অহোম রাজ রাগে কামতারাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। গিয়াসুদ্দীন এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি কামতা-কামরূপ অভিযানে বেরিয়ে কামতা রাজ্য অনায়াসেই জয় করেছিলেন। কামরূপ রাজের সঙ্গে কামতার বিবাদের সুযোগ নিয়ে গিয়াসুদ্দীন কামরূপ পুনরাধিকার করতে চাইলেন। কিন্তু বিধি বাম। কামতারাজ বেগতিক দেখে অহোমরাজ সুদঙ্গকার সঙ্গে নিজের ভগ্নী ভাজনীর বিয়ে দিয়ে সন্ধি করে ফেলেন। ফলে দুই রাজ্যের রাজা তাঁদের মিলিত শক্তি দিয়ে গিয়াসুদ্দীনের আক্রমণকে প্রতিহত করেন। গিয়াসুদ্দীনের সৈন্যবাহিনী করতোয়া নদী অতিক্রম করতে পারল না। এই ঘটনা বাংলার অপরাজেয় সৈন্যবাহিনীর কাছে অগৌরবের কাহিনী হয়ে থাকল।

এছাড়াও সামান্য একজন পশ্চিমী জায়গিরদার শহাব খানের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যুদ্ধে বহু লোকক্ষয় করেও গিয়াসুদ্দীন জয়লাভ করতে পারেন নি। পরে দরবেশ নুর কুৎব আলমের মধ্যস্থতায় যখন সন্ধি প্রস্তাব হয় তখনই সুযোগ বুঝে শহাব খানকে বন্দী করেন। এই ঘটনাও বাংলার গৌরবকে ম্লান করেছিল। এতে গিয়াসুদ্দীনের নিজেরই ক্ষতি হয়েছিল বেশি।

সিংহাসন লাভের জন্য গিয়াসুদ্দীন যে উদ্যমে যুদ্ধ করেছিলেন, সিংহাসন লাভের পর

অর্থাৎ সুলতান হওয়ার পর তাঁর সে উদ্যম স্তিমিত হয়ে যায়। তিনি তাঁর জীবনের মোড় অন্যদিকে আসে, আস্তে ঘুরিয়ে দিতে থাকেন। দরবারে কবির আদর করেন, নিজে কবিতা লেখেন, গজল গান শুনে রাতের পর রাত কাটিয়ে দেন, সরব, গুল ও লালার মতো সুন্দরীদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজবে, পাশা খেলায় সময় কাটিয়ে দেন। খাসমহলে বেগমদের সন্তান-স্নেহ দেখে নিজে বিগলিত হন, শিকারে তো আগে যেতেন, পরে তিনি আরও বেশি যান। কিন্তু যুদ্ধ করে নিজের রাজ্যসীমা বাড়াতে পারেন নি এবং কেউ তাঁকে তেমন বিরক্তও করেননি। যুদ্ধ না থাকলেও মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়তে হয় সেনাবাহিনীকে সজাগ, সতর্ক ও ব্যস্ত রাখার জন্য। কিন্তু তিনি তা করেন নি, সৈন্যদলকে শুধুই বেতন দিয়ে গেছেন।

তবে তাঁর রাজ্যে সুবিচার ছিল। তিনি নিজেও একবার কাজীর বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। কাজী তাঁর যোগ্য বিচার করেছিলেন বলে কাজীকে পরে তিনি প্রচুর পারিতোষিক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সুলতানের এই কাজীর বিচারের ঘটনাকে অনেক ঐতিহাসিক মেনে নেন নি। কিন্তু কালকূটের চোখে এ ঘটনা সত্য। এই পর্যন্ত কালকূটের কাছে গিয়াসুদ্দীন একজন শান্তিপ্রিয় সুলতান।

এরপরেই সুলতানের জীবনের গতি সর্পিল ধারায় বদলে যেতে থাকে। গিয়াসুদ্দীন ক্রমে ধর্মের দিকে বেশি ঝুঁকে যেতে থাকেন। ধর্মে প্রবণতা আর ধর্মান্ধতা এক কথা নয়। গিয়াসুদ্দীন ধর্মান্ধ হয়ে ওঠার আগে তাঁর উত্থান ছিল রূপকথার নায়কের মত। তাঁর চরিত্রে এমন কতগুলো গুণের সমাবেশ ছিল যে তার আকর্ষণে বহু দরবেশ তাঁর কাছে আসতেন। খান-ই-জাহান নামে তার এক উজীরের অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে তিনি তাঁর ভৃত্য য়াকুৎ অনানী মারফৎ সুদূর মক্কা-মদিনায় প্রচুর অর্থ পাঠান ঐ পবিত্র স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে বন্টন করার জন্য। তাঁর নামে পবিত্র শহরে একটি মাদ্রাসা ও একটি সরাই নির্মাণের জন্য, আরফাও নামক স্থানে একটি খাল খননের জন্য।

বন্ধুত্বের সম্পর্ক পাতাবার জন্য জৌনপুরের বিখ্যাত শাসক— কনৌজ, কবহ, অযোধ্যা, গঙ্গীশহ, দালমু, বহ্‌রাইচ, বিহার, ত্রিহুত ইত্যাদি পর্যন্ত যাঁর রাজ্যসীমা সেই খাওয়াজা-ই-জহানকে তিনি অনেকগুলি হাতী পাঠিয়েছিলেন। এমনকি ভারতের বাইরে বন্ধুত্ব পাতাবার জন্য সুদূর চীনেও সম্রাট ভ্রংলাকে ভেট সমেত এক দূত পাঠান ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে। চীনের সম্রাট ও সুলতান এবং তাঁর রানীদের উদ্দেশ্যে অনেক উপহার পাঠান। চীন ও বাংলার মধ্যে দূত প্রেরণ বেশ কয়েকবার হয়। হাফিজের কাছেও দূত পাঠিয়েছিলেন যার মধ্যে ছিল তার কাব্যমোদী ভাবনার প্রকাশ।

কালকূট তাঁর স্বপ্নের নায়কের মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ দেখেছেন। এই বিশেষ

গুণসম্পন্ন নায়কের তথা সুলতানের সন্ধানেই তিনি এত অতীতের পথ পরিক্রমা করেছেন। ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁর স্বপ্নের নায়ক বদলে যেতে থাকেন। তাঁর দরবারে বিভিন্ন কাব্যালোচনা, ধর্মালোচনার কারণে দরবেশদের আসা যাওয়া বাড়তে থাকে। নুর কুৎব আলম ছিলেন এইসব দরবেশদের প্রধান। তাঁর ভাই আজম খান গিয়াসুদ্দীনের একজন উজীর ছিলেন। নুর কুৎব আলমকেও গিয়াসুদ্দীন রাজদরবারে উচ্চপদ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কোনো পদের ও অর্থের লোভ ছিল না। তিনি চমৎকার একটি উপদেশ দিয়েছিলেন,— "সুলতান ও অমাত্যরা কর্তব্যকর্মে অবহেলা করে, আচার-নিষ্ঠা নিয়ে পড়ে থাকলে ঈশ্বরের অভিশাপ লাভ করবে। আর দরবেশরা আচার-নিষ্ঠা ত্যাগ করলে, ঈশ্বরের কাছে অভিশপ্ত হবে।" *(পৃ: ১৫০৭, ঐ)*

আর একজন দরবেশকে গিয়াসুদ্দীন মানতেন, তিনি হলেন মুজফফর শাম্‌স বলখি। ইনি শুধু দরবেশ নন, পণ্ডিতও বটে। তাঁর সঙ্গে বিহারে যুবা বয়সে গিয়াসুদ্দীনের পরিচয় হয়েছিল। তিনি গিয়াসুদ্দীনকে ধর্মের বিষয়ে অনেক উপদেশ ও পথ নির্দেশ করেছিলেন, ঈশ্বর উপলব্ধি ও তাঁর মাহাত্ম্য বিষয়েও বলেছেন। অনেক চিঠি তিনি লিখেছিলেন গিয়াসুদ্দীনকে। চিঠিতে রাজকর্তব্যের কথাও যেমন বলেছেন, তেমন ন্যায় বিচারের কথাও বলেছেন। আবার একথাও বলেছেন— "আমাকে দিয়ে মুসলমানদের কাজ ঠিকভাবে করাও, বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত কর।" *(পৃ: ১৫০৭, ঐ)* এই বলখি শেষবার যখন মক্কায় যান তার দু'বছর আগে তাঁকে বাংলাদেশে থাকতে হয়েছিল। গিয়াসুদ্দীন তাঁকে কয়েকটি ফরমান পাঠিয়েছিলেন। একটি ফরমানের সঙ্গে একটি পোশাক পাঠিয়েছিলেন, সেটি পরে বলখি হাঁটু গেড়ে দু'বার গিয়াসুদ্দিনের জন্য প্রার্থনা করেন। আর একটি ফরমানের সঙ্গে একটি গজল লিখে পাঠান, যাতে লেখা আছে সুলতানের সঙ্গে বলখির বিচ্ছেদের মনোবেদনা। বলখি গজলের প্রশংসা সহ সুলতানেরও প্রশংসা করে চিঠি লেখেন; কিন্তু তার মধ্যে বিধর্মীদের প্রতি অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা মিশিয়ে দেন। আর একটি ফরমানের সঙ্গে গিয়াসুদ্দীন একটি চতুষ্ক শ্লোক পাঠিয়েছিলেন— "যদি তুমি আধ্যাত্মিক কামনার মদে মাতাল হয়ে থাক, যদি তুমি স্বর্গীয় প্রেমে চিরমত্ত হয়ে থাক, এই ভিখারির পাত্রে তার একটি ফোঁটা ফেলে দাও।" *(পৃ: ১৫০৮, ঐ)* বল্‌খি সে চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন। মুজাফফর বল্‌খির সংস্পর্শে এসে গিয়াসুদ্দীন ক্রমে যেমন ধর্মগত প্রাণ হয়ে ওঠেন, তেমনি ধর্মান্ধতার বিষও এই বল্‌খিই তাঁর মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। বল্‌খি বিধর্মীদের উপর সদয় ছিলেন না, বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন। এই বিদ্বেষভাব বল্‌খির চিঠির মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। একজন শান্তিপ্রিয়, কবি-মনের মানুষের মানসিক পরিবর্তন কীভাবে হচ্ছে লেখাই লেখক কালকূট তুলে ধরেছেন পাঠকের কাছে। ধর্মের দিকে ঝুঁকছেন।

৮০০ হিজরির সমাপ্তিতে বল্‌খি যে চিঠিটি লিখেছিলেন তার মর্মার্থ হল বিধর্মী বিতাড়ন।

কালকূট দেখেছেন সেই চিঠির ভাষায় কী ভয়ানক বিদ্বেষবাণী উদ্‌গারিত হয়েছে— "খোদা বলেছেন, বিধর্মীরা কেবল তোমার ধ্বংস কামনা করতে পারে। কাফেরদের কিছু কাজ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাদের তত্ত্বাবধায়ক বা শাসনকর্তা নিযুক্ত করা উচিত নয়। তাহলে তারা মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব করবে, মুরুব্বিয়ানা ফলাবে। খোদা বলেছেন, মুসলমানরা যেন কাফেরদের বন্ধু বা সহায়ক হিসাবে গ্রহণ করে খোদাকে উপেক্ষা না করে। যদি তারা তা করে, তবে খোদার সাহায্য পাবে না।" *(পৃ: ১৫০৮, ঐ)* এরকম একজন সর্বত্যাগী দরবেশের চিঠি গিয়াসুদ্দীনের মত বিচক্ষণ, বিদ্বান, কাব্যমোদীর মনে ভীষণ রেখাপাত করল। এই দরবেশের সংস্পর্শে এসে গিয়াসুদ্দীন ধর্মের দিকে ঝুঁকে ক্রমশ হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ভুলে যাচ্ছিলেন তাঁর পিতামহ ও পিতার বিচক্ষণতা। রাজকার্য পরিচালনার জন্য হিন্দুদের নিজের কাছে রাখা দরকার, তাদের পরামর্শ ও উপদেশটুকু নেওয়া প্রয়োজন; কিন্তু ধর্মীয় অন্ধতায় তিনি এই চিঠি পাবার পর ভাদুরিয়ার রাজা গণেশকেও বিদায় দিলেন।

এই গণেশ সিকন্দর শাহের আমল থেকে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, যুদ্ধবিশারদ, সামরিক শক্তিতে বলীয়ান ছিলেন। রাজা গণেশ ছিলেন ইলিয়াস শাহী বংশের 'অজ উমরাএ'। তাঁর এই বিতাড়ন বহু মুসলমান আমীর-ওমরাহ, উজীর-সেনাপতি ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা ভাল মনে মেনে নিতে পারলেন না। "গণেশের মত ব্যক্তিকে অপমান ও ক্রুদ্ধ করা হল। ইলিয়াসশাহী বংশের একজন শুভানুধ্যায়ীকে অপমানিত করা হোল, শত্রু করা হল।" *(পৃ: ১৫০৮, ঐ)* রাজ দরবার থেকে হিন্দু বিতাড়ন শাহী বংশকে সর্বনাশের অতল অন্ধকারে নিয়ে গেল। কালকূট বলেছেন 'আমি দেখছি, রাজা গণেশ ইতিহাসের পথে এক নতুন মোড় ফেরাতে উদ্যত হলেন।' *(পৃ: ১৫০৮, ঐ)* বিশ্বস্ত অনুচররা সব দূরে সরে গেল। রাজা গণেশ ইতিহাসের মোড় ঘোরানোর জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনের দূত প্রথম ভারতে আসেন। তিনি গিয়াসুদ্দীনের দরবারে কোনো হিন্দুকেই দেখতে পাননি, হিন্দু বিতাড়ন তার আগেই শেষ হয়েছিল।

১৪০৫ সালে এই গিয়াসুদ্দীন পাশের একটি ছোটরাজ্য মিথিলা আক্রমণ করে বসলেন। শিব সিংহের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ ছিল না, শুধুমাত্র হিন্দুরাজ্য বলেই কেউ নিশ্চয় হিন্দু বিদ্বেষমূলক উস্কানি দিয়েছিলেন, সে কারণেই কি আক্রমণ? কালকূট ইতিহাসের ধূলাচ্ছন্ন পাতায় এই উস্কানি দাতাকে চিনতে পারেন নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, গিয়াসুদ্দীন ছোট রাজ্যটির সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠলেন না। তিনি শুধু পরাজিতই হলেন না, তাঁর নিজের রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম করে শিব সিংহের সেনাবাহিনী এগিয়ে এল। কালকূট দেখেছেন, শিব সিংহের এই জয়ের পিছনে

রাজা গণেশের হাত আছে। শাহী বংশের উচ্চপদস্থ কর্মচারী রাজা গণেশের সঙ্গে শিব সিংহের বন্ধুত্ব ছিল। বন্ধুর বিপদের সময়ে রাজা গণেশই এগিয়ে এসে জানিয়ে দেন শাহী বংশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, সেনাবাহিনীর দুর্বলতা কোথায়। রাজকার্য থেকে হিন্দু বিতাড়নের ফল ভালো হয় নি। নুর কুৎব আলম তাঁকে অনেক আগেই সতর্ক করেছিলেন। সুলতান ও অমাত্যরা কর্তব্য কর্ম থেকে বিরত থেকে, আচার-নিষ্ঠা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে ঈশ্বরের অভিশাপ নেমে আসে। অভিশাপই নেমে এসেছে গিয়াসুদ্দীনের উপর। প্রবল ধর্মান্ধতা গিয়াসুদ্দীনের জ্ঞানচক্ষু অন্ধ করে দিয়েছে। তাই রাজদরবার থেকে হিন্দু বিতাড়নে লেখক বলেছেন যে, "আমি দেখতে পাচ্ছি, যে ইলিয়াস শাহী বংশের ধ্বংসের সংকেত। ভবিষ্যতে রাজা গণেশের উত্থানের অমোঘ প্রয়াস।" *(পৃ: ১৫০৯, ঐ)* তা গিয়াসুদ্দীন বুঝতে পারেন নি। একজন কবি, প্রেমিক ধর্মপরায়ণ জনপ্রিয় সুলতান রাজনীতির থেকে ধর্মকেই বড় করে দেখার জন্য তার শেষ পরিণতি কী হয়েছিল এখন সেটাই কালকূটের চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যাক।

গভীর রাতে গিয়াসুদ্দীনের মনে নতুন একটি গজলের ভাষা ও ছন্দ জেগে উঠেছে। হারেমের রমণীদের যৌবন আর সুরা তাঁর মনকে স্পর্শ করতে পারছে না। তাঁর মন কাব্যলোকে বিচরণ করছে। সেদিনের সন্ধ্যার একটি ঘটনা তাঁর মনকে উদ্বেলিত করেছে; ঘটনাটি তাঁর ফেলে আসা অতীতের স্বপ্নময়, ছন্দময় জীবনে নিয়ে গিয়েছে। এটা ফিরিয়ে দিয়েছে সর্‌ব্ আর গুল যৌবনে প্রেমের পরশে তাঁর দোলায়িত মন একটি কবিতার প্রথম চরণের মিল খুঁজে দেওয়ার জন্য তিনি সেটি নিয়ে দূত পাঠিয়েছিলেন হাফিজের কাছে। সুলতান হয়ে রাজপদের কার্যে ব্যস্ত থেকেছেন বেশ কিছুকাল। আবার তিনি পূর্বের দিনগুলিতে ফিরতে চেয়ে সর্‌ব্ আর গুলের মহলে গিয়েছিলেন। ওদের দেখে তিনি প্রথমে চিনতে পারেন নি, তাদের শরীরের চামড়া ঝুলে গেছে, মোটা হয়ে গেছে, চুল সাদা হয়ে গেছে। লালার মৃত্যুর পরে সুলতান একটি শোকগাথা লিখেছিলেন। সর্‌ব্ আর গুল বলেছিল যে তাদের সুলতানের আগেই যদি মৃত্যু হয় তাহলে তাদের জন্যও সুলতান গজল রচনা করবে এবং সেই গজলে স্থান পেয়ে তারা অমর হয়ে থাকবে। দীর্ঘদিনের অদর্শনে জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে যে বার্ধক্য উপস্থিত হয়েছে তা ভাবনায় আসেনি। গুল সুলতানের মুখের সামনে আয়না ধরলে সুলতান যেন নিজেকেই চিনতে পারলেন না। তার চুল দাড়ি গোঁফ সবই পেকেছে, মুখে ও কপালে বলিরেখা। এই বুড়োটাকে সুলতান আগে দেখেন নি। গুল তাঁকে যোগ্য জবাব দিয়েছে বলে সুলতান সহাস্য উক্তি করলেন। তারপরে কত বছর আগে গজলের একটি চরণের মিলের জন্য হাফিজের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন সেটা মনে করতে পারলেন না। গুল মনে করিয়ে দিল 'তেইশ বছর আগে' কথাটা শুনে সুলতান বিস্মিত স্বরে আস্তে আস্তে বললেন "হ্যাঁ,

তাই তো হবে। সে কি আজকের কথা! কেননা তাঁর শৈফুদ্দীনের বয়স হয়ে গেল বিশ। তার বাচ্চাটা খুব ফুটফুটে হয়েছে।" *(পৃ: ১৫১৩, ঐ)* গুল, সরবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, সুলতান হারেমে কিছুক্ষণ নবীনা নারীদের সঙ্গে সময় কাটালেন, সুরা পান করলেন। কিন্তু সন্ধ্যার ঘটনায় তাঁর মন অন্যমনস্ক। গজলের কথা ও সুর তাঁর মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠছে। মনে মনে বললেন, "আজ গিয়াসুদ্দীন তোমার স্মরণে, তাঁর শেষ গজলটি লিখবেন। আজ রাত্রে আমার চোখে ঘুম আসবে না। হাফিজ!" *(পৃ: ১৫১০, ঐ)* আরও বললেন হাফিজকে শ্রদ্ধা জানিয়ে দীর্ঘ তেইশ বছরের কাহিনী নিয়ে জীবনের শেষ গজল তিনি লিখবেন।

তাঁর মন অশান্ত। এছাড়া কিছুদিন থেকেই তাঁর মনে হচ্ছে কেউ যেন তাঁকে অনুসরণ করছে? পিতা না বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা; কাদের ছায়া তিনি দেখতে পান? বিদ্রোহী সন্তানকে দমন করতে গিয়ে পিতার মৃত্যু হয়েছে, সিংহাসন নিষ্কন্টক রাখতে ভাইদের হত্যা করে বিমাতার কাছে দেহগুলি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রাসাদে নিজের মহলে ঢোকার আগে গিয়াসুদ্দীন সামনের উদ্যানে নেমে গেলেন। কালকূট দেখলেন সুলতান এতই অন্যমনস্ক যে রাতে আঁধারে বাগানে নেমে যাওয়া যে তাঁর ঠিক হয়নি এটা খেয়ালই নেই। তিনি রাতের তারা দেখতে লাগলেন। বল্‌খির অনেক উপদেশের মধ্যে শেষ কথাগুলো সুলতানের কানে বাজতে লাগল "খোদার ইচ্ছাই ইচ্ছা। আমার নিজের ক্ষেত্রে সে কথাটা একবারও মনে আসেনি। তুমি সাবধানে থেকো। তোমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছি। কিন্তু সবই কি ঠিক দিয়েছি।" *(পৃ: ১৫১০, ঐ)* কেন যে মৃত্যুর পরপার থেকেও বল্‌খির মুখ থেকে এরকম কথা শুনলেন, সে'কথা ভাবতে ভাবতেই উদ্যান ছেড়ে প্রাসাদের দিকে ঢুকতে গেলেন। শৈফুদ্দীনের ঘরে আলো জ্বলছে। সুলতান শৈফুদ্দীনের মত বয়সে এতটা অসংযত জীবন যাপন করেন নি।

কালকূট তাঁর স্বপ্নের নায়কের চলার পথকে অনুসরণ করছেন। ১৪১১ সালের মার্চ মাসের গভীর রাত্রিতে উদ্যান থেকে সুলতান প্রাসাদে তাঁর মহলের অলিন্দ দিয়ে কিছুটা এসেই ডানদিকের বড় দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। পর পর তিনটি কক্ষ, শেষে তাঁর খাসমহল। প্রথম কক্ষে আলো নেই দেখে অবাক হলেও বাতিদারকে না ডেকে এগিয়ে গেলেন। সেই মুহূর্তেই একটা অনুভূতি— "একটা তীক্ষ্ম কিছু যেন তাঁর তলপেটে ঢুকে গেল।" *(পৃ: ১৫১০, ঐ)* তীব্র যন্ত্রণায় একবার আর্তনাদ করে তলপেট চেপে ধরতেই রক্তে হাত ভিজে গেল। জীবনের শেষ ঘনিয়ে এসেছে জেনে শুধুমাত্র কে একাজ করল জানতে চাইলেন। হত্যাকারী উত্তর দিলেন— "আমি ইলিয়াস শাহী বংশের ধ্বংসকারী। আপনাকে দিয়ে শুরু করলাম। আমি কার আদেশ বহন করছি, শুধু শেষবারের জন্য তাঁর নামটা শুনে যান। তিনি আপনার প্রাক্তন অজ উমরাএ রাজা গণেশ।" *(পৃ: ১৫১০, ঐ)*

এই কথাগুলো ফিসফিস করে বলে উঠেই শাণিত তরবারি দিয়ে গিয়াসুদ্দীনের মস্তক ছিন্ন করে দিলেন। তাতেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, প্রমাণস্বরূপ "সুলতানের ডান হাতের সোনা দিয়ে মোড়া বড় হীরকখণ্ডের সুপরিচিত আংটিপরা আঙুলটি কেটে নিয়ে, অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।" *(পৃঃ ১৫১০, ঐ)* শেষ রাত্রি আজানের সময়ও কেউ জানতে পারল না যে, বাংলায় রাজা গণেশের উত্থান হল, শাহী বংশের অবসান হল। কালকূট মনভ্রমণে ইতিহাসের পথে বেরিয়ে তাঁর স্বপ্নের নায়কের মর্মান্তিক মৃত্যু ও শাহী বংশের অবসানের সাক্ষী হয়ে রইলেন।

বাল্যকাল থেকে পাণ্ডুয়ায় সিংহাসনে আসীন হওয়া পর্যন্ত গিয়াসুদ্দীনের জীবন ছিল দুর্বার গতিময়, আকর্ষণীয়। তাঁর সুশাসনের খ্যাতি রাজ্যের সর্বত্র বিরাজিত। তাঁর গুণের মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে বহু দরবেশ তাঁর রাজসভায় আসতে শুরু করেছিলেন। কালকূটের মনে হয়েছে এটাই তাঁর পতনের ভিত্তিভূমি। দরবেশের প্রভাবে সুলতান ক্রমশ ধর্মান্ধ হয়ে পড়েন। তাঁর পতনের মূল কারণই হল প্রচণ্ড হিন্দুবিদ্বেষ, ধর্মান্ধতা, পিতা-পিতামহের অনুসৃত নীতি থেকে সরে এসে রাজদরবার থেকে হিন্দু বিতাড়ন।

কালকূট এক ঐতিহাসিক চরিত্রের সন্ধান করতে গিয়ে মনভ্রমণে ইতিহাসের পথে হেঁটেছেন। ইতিহাসের কাঠামোয় ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে তিনি দেখেছেন এবং চরিত্র অনুযায়ী সেই কালের অর্থাৎ শাহী বংশের আমলের মানসিকতায় যেরকম হওয়া উচিত কালকূট তাঁর লেখনীর টানে চরিত্রগুলিকে সেইভাবে রূপ দিয়েছেন বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁর নিজের দেখা ও উপলব্ধির মাধ্যমে চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে নিজ দৃষ্টিভঙ্গিতে কথা বলিয়ে নিয়েছেন এবং চরিত্রগুলির ইতিহাসের চরিত্র না থেকে ব্যক্তি মানুষের সুখ-দুঃখ নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। লেখক তাঁর নিজের উপলব্ধিতে চরিত্রগুলির সুখ-দুঃখ-ব্যথা-বেদনা, নীচতা, ক্রুরতা, প্রতিহিংসা চরিতার্থতা সবকিছু উপন্যাসের চরিত্রের মতো রূপায়িত হয়েছে। চরিত্রগুলিকে এমনভাবে উপস্থিত করেছেন যে, তাঁর অতীত ভ্রমণকাহিনী ধীরে ধীরে ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের রূপ পেয়েছে। ঐতিহাসিক কাহিনী উপন্যাসের জীবনে রূপ পেয়েছে।

কালকূট দেখেছেন পূর্ব ইরানের একজন সামান্য মানুষ কী অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও কূটবুদ্ধির সাহায্যে নিজের হাত রক্তাক্ত করতে করতে বাংলার মসনদ দখল করেছিলেন সে সবই কালকূটের নজরে এসেছে। তিনি তাঁর মনভ্রমণে ইতিহাসের পথের ঘটনাবলীকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর লেখনীর দ্বারা চিত্রায়িত করেছেন। এই চলার পথে দু'জন বলিষ্ঠ নারীর পরিচয় দিয়েছেন। যাদের কথাবার্তার একটু লক্ষ্য করলে, সেকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র অনেকটাই বুঝতে পারা যায়। একটি নারী ইলিয়াস শাহের 'মা', যিনি মবারক আলি তথা বাংলার

সুলতান আলাউদ্দিন আলি শাহ-র ধাত্রী মা ছিলেন। ইলিয়াস শাহ অসচ্চরিত্র, নেশাখোর থাকলেও তাঁর মনের মধ্যে জিইয়ে রাখা উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ফলপ্রসু করবার জন্য তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আলাউদ্দীন আলি শাহকে তিনি ফফুরুদ্দীন ও তাঁর ছেলে ইখতিয়ারুদ্দীনকে হত্যা করে বাংলার সুলতান করেছিলেন। সুলতান নিশ্চিন্ত হয়ে ইলিয়াসের ওপর রাজ্যপাটের অনেকটা দায়িত্ব দিয়ে নিজে প্রমোদ-বিলাসে দিন কাটাচ্ছিলেন।

এদিকে ইলিয়াস শাহ বাংলার মসনদ দখলের দিকে গোপনে ষড়যন্ত্র করছিলেন। তাঁর মা তা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি একদিন পুত্র ইলিয়াসকে ডেকে কী বলেছিলেন সেটা কালকূটের চোখ দিয়েই দেখা যাক্ — "তোমার আচরণ আমার মোটেই ভাল ঠেক্‌ছে না। মনে রেখো, মুবারক এক সময়ে তোমাকে হত্যা করতে পারতো। আমার কথায় সে তা করে নি। কারণ আমি তাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছি।" *(পৃ: ১৪৯৭, ঐ)*

মা আরও বিশদ ভাবে জানতে চান "তোমার উদ্দেশ্যটা কী? তুমি কী করতে চাও?"

ছেলের উত্তর ছিল, মুবারক লখনৌতিতে বসে শুধু হুকুমজারি করে, কেবল অপরের উপর নির্ভর করতে পারে। এ'কথা শুনে উত্তর "সে সুলতান। সে সবই পারে। সে কি করছে না করছে, তা নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা কেন? সে যেভাবেই সময় কাটাক, তাতেই বা তোমার কি?" *(পৃ: ১৪৯৭, ঐ)*

"রাজ্যের লোকেরা অনেককিছুই বলাবলি করতে পারে। তাতে সুলতানের কিছু যায় আসে না। কিন্তু তাদের কি সাহস আছে, সুলতানের সামনে এসে কিছু বলত? তারা যা বলছে বলতে দাও।" *(পৃ: ১৪৯৭, ঐ)*

উত্তরে পুত্র বলেছিল, 'রাজ্যের লোকেরা সুলতানের ওপর বিরক্ত হলেও সুলতানের তাতে মঙ্গল হয় না।" *(পৃ: ১৪৯৭, ঐ)* মা আরও বললেন, মুবারককে তিনি শিশু বয়স থেকে পালন করেছেন। অতএব তিনি বলছেন 'সেও আমার ছেলে। তোমরা দুই ভাই। তুমি যদি তাই বল, আমি তো সুলতানেরই মা।' *(পৃ: ১৪৯৮, ঐ)*

"মুবারকের নসীবে কী লেখা আছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু ইলিয়াস, মুবারকের নথীতে যাইহোক, তুমি তার কোন ক্ষতি করো না। সে তোমার ভাল ছাড়া মন্দ করে নি।"

"তাহলে তাই থাকবেন।" ইলিয়াস মায়ের সঙ্গে আর কোন কথা না বলে চলে যান।

কালকূট অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অতীতের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন এবং ইলিয়াসের মায়ের মুখ দিয়ে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যক্তিমনকে ব্যক্ত করেছেন। মাতাপুত্রের দৃষ্টিভঙ্গিকে

উপস্থাপন করেছেন। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বাস্তবসম্মত রক্তমাংসের নারী চরিত্র উপস্থিত করে তাঁর কাহিনীর গতিকে ত্বরান্বিত করেছেন।

শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতার সিংহাসন লাভের পূর্বে মায়ের সঙ্গে ইলিয়াসের কথাবার্তার মধ্যে একটি সজীব চিত্র ফুটে উঠেছে, যেগুলো ইতিহাসের রাজনৈতিক ঘনঘটায় এমন নিবিড় করে বলা থাকে না। কালকূট তাঁর অন্তর্দৃষ্টি মেলে ধরে মানবমনের কথাগুলো তাঁর কথাসাহিত্যে বসিয়েছেন।

এমনিভাবেই ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহকে এনেছেন। বড়ী বেগম ছোট বেগমের পুত্র গিয়াসুদ্দীনের নামে নালিশ করছেন। কালকূট বড়ী বেগম ও সুলতানের আলাপচারিতায় শুনেছেন, বড়ী বেগম বলছেন— "ছোটি বেগম আপনাকে যা বোঝাচ্ছে, আপনি তাই ভালো মানুষের মত বিশ্বাস করছেন? আসলে এ সবই হল, শীঘ্রই গিয়াস আপনাকে সরিয়ে নিজে সুলতান হতে চায়।" *(পৃ: ১৫০১, ঐ)* এই কথা শুনে সুলতান বলছেন "আর তোমার সতেরোটি গর্ভজাত ছেলেরা কী করছে? নেশাভাঙ, ফূর্তি এসব নিয়ে মেতে আছে।" *(পৃ: ১৫০১, ঐ)* তিনি আরও বললেন— "বড়ী বেগম, দায়িত্ব কারোকে দিতে হয় না। দায়িত্ব নিতে শিখতে হয়। গিয়াসের থেকে যারা বয়সে বড়, তাদের সবাইকে ডেকে আমি অনেকবারই বলেছি, সিংহাসন আর রাজ্যরক্ষার কাজে মন দাও। তোমরা সবাই মিলে আঠারো ভাই। আমার বাবা ঠিক সময়ে আমাকে সীমান্তরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তোমার কোন ছেলেকে কি আমি সে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতে পারি?" *(পৃ: ১৫০১, ঐ)* এই কথাগুলোর মধ্য দিয়েই সুলতানের চিন্তাধারা, দূরদৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে; আবার নিজ পুত্রদের অকর্মণ্যতা তাঁর পিতৃহৃদয়কে আশাহত করে তুলেছে।

গিয়াসুদ্দীনকে কারা তীর মেরে তা ভেবে নিতে মুহূর্তমাত্র সময় লাগে নি। "হিন্দু পাইক সেনারাই ভালো তীরন্দাজ। আমার বাবার আমলের হিন্দু সেনাপতির ছেলে মহাদেব বর্তমানে একজন সেনাপতি। হিন্দু পাইক সেনাদের খবর তার জানা থাকার কথা। শুনে মনে হচ্ছে, এটি তোমাকে হত্যারই পরিকল্পনা।" *(পৃ: ১৫০১, ঐ)* রাজ্যের সেনাবাহিনীর প্রতি কত সূক্ষ্ম ও সজাগ দৃষ্টি ছিল সুলতানের, তা উপরোক্ত কথাগুলি বোঝা যায়।

ইতিহাসের কাহিনী ক্রমশ বিভিন্ন ঘটনা বিন্যাস ও কথোপকথনের মধ্য দিয়ে একটি নিটোল গল্পকাহিনীতে পরিণত হয়েছে। ইতিহাসের বিষয়ের মধ্যে বিচরণ করেও লেখক ইতিহাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন নি, সেই গণ্ডী ছাড়িয়ে তিনি সমাজ জীবনে ঢুকে পড়েছেন। ছোট ছোট কথা, ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই সময়কালের জীবনযাত্রাকে উপস্থাপিত করেছেন। কালকূটের চোখ দিয়ে আর একটি নারী চরিত্র উঠে এসেছে এই কাহিনীতে,— তিনি হলেন গিয়াসুদ্দীনের মা, সিকন্দর শাহর ছোটি বেগম। মায়ের শিক্ষায় অর্থাৎ ছোটি বেগমের শিক্ষায় গিয়াসুদ্দীন বড় হয়েছেন। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তিনি যে পিতার বিদ্রোহী হয়ে সোনারগাঁও অধিকার করে

নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করবেন এ পরিকল্পনা মাকে বলেননি। শিকার যাত্রায় বেরিয়ে আর পাণ্ডুয়ায় ফিরে আসেননি। নিজেকে গিয়াসুদ্দীন আজমশাহ বলে ঘোষণা করেছেন। মা যে তাঁর এই অন্যায় অভিযান মেনে নেবেন না তা কালকূটের সূক্ষ্ম নজরে ধরা পড়েছে। এমনকি পিতার মৃত্যুর পর নিজে আমীর-ওমরাহদের দ্বারা সুলতান রূপে ঘোষিত হওয়ার পরেও মায়ের সঙ্গে দেখা করেন নি। সতেরোটি ভাইকে হত্যা করার পরে প্রাসাদে গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করেছেন। মা প্রথমে সামনে আসতে চাননি। অভিমানাহত মাতার কথোপকথন কালকূট লক্ষ্য করেছেন। 'প্রথমেই তিনি বললেন, "আমি সুলতানের আদেশেই একমাত্র বেরিয়ে এসেছি, কিন্তু আমার স্বামীহন্তার মুখ আমি দেখতে চাইনে।" "আমি আপনার কাছে সুলতান নই।" গিয়াসুদ্দীন বললেন, "আমি আপনার একমাত্র পুত্র।" *(পৃ: ১৫০৫, ঐ)*

ছোটি বেগমের স্বরে বিদ্রূপ ধ্বনিত হল, "বন্দী করার সুযোগ ছিল না বলেই সেই সেনা সুলতানকে অস্ত্রাঘাত করেছিল নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য। পুত্র কী করতো? পিতার হাতে প্রাণ দিত?"

"পিতা যদি পুত্রকে হত্যা করতে উদ্যত হতেন, তাহলে পুত্রের কী করা উচিত ছিল?" বললেন গিয়াসুদ্দীন।'

গিয়াসুদ্দীন পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন, "আর একজন বেগম সাহেবাকে একথাও জিজ্ঞেস করি, তিনি সেই অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু চাইতেন, না পুত্রের মৃত্যু চাইতেন?"

ছোটি বেগম তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিতে পারলেন না।' *(পৃ: ১৫০৫, ঐ)*

কালকূট গিয়াসুদ্দীন-এর চলার পথকে যেভাবে দেখেছেন সেভাবেই তুলে ধরেছেন। গিয়াসুদ্দীনের সুবিচারে প্রত্যেকে খুশি ছিল। অন্যরাজ্য গ্রাস করতে পারেন নি। সেই সোনারগাঁও-এ গিয়াসুদ্দীন একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, যে সেনাবাহিনীকে নিয়ে পিতার বিরুদ্ধে পাণ্ডুয়া অভিযান করেছিলেন। রাজ্যলাভের পর গিয়াসুদ্দীনের মধ্যে আর সেরকম উদ্দীপনা, উৎসাহ দেখা যায় নি।

গিয়াসুদ্দীন ভিন্ন জগতের মানুষ ছিলেন; কাব্য রসিক, সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন। গিয়াসুদ্দীন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ধর্মের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েছিলেন। কালকূটের কাছে সেটা অশুভ দিক বলে মনে হয়েছে। কালকূট তাঁর রূপকথার নায়কের জীবনপঞ্জী দর্শন করতে করতে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন।

"চীনের দূতেরা যখন আসেন, তখন গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ অনেকটাই ধর্মান্ধ হয়ে উঠেছেন। যে কারণে চীনের দূতেরা রাজকার্যের কোথাও কোনো হিন্দুকেই দেখতে পেলেন না।" *(পৃ: ১৫০৮, ঐ)*

কালকূট এজন্য দায়ী করেছেন মুজাফফর শামস বল্‌খিকে। তিনি পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু মনে মনে ছিলেন প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষী।

কালকূট গিয়াসুদ্দীনের এই ধর্মান্ধতা দেখে মনে মনে বিলাপ করেছেন। "কিন্তু যে বলখি আপনার হৃদয়কে ঈশ্বরাণুভূমির সৌন্দর্য দান করেছেন, তিনি আপনার চোখকে সবদিক দেখে অন্ধ করে দিয়ে গিয়েছেন।" *(পৃ: ১৫০৯, ঐ)*

বল্‌খি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলীয় লোক ছিলেন না। তাই তিনি বাংলার জনগণের হৃদয়কে বুঝতে পারেন নি। নুর কুৎব তাঁকে সতর্ক করেছিলেন। তাঁর পিতা-পিতামহ বুঝেছিলেন, রাজকার্য পরিচালনা করতে গেলে হিন্দুদের রাজকার্যে রাখা প্রয়োজন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন পিতা-পিতামহর দূরদর্শিতাকে কাজে না লাগিয়ে ধর্মের পথে হেঁটে রাজকার্য থেকে তাদের বিতাড়ন করলেন। বিশ্বস্ত অনুচরদের শত্রু বানিয়ে ফেললেন। কালকূট আক্ষেপের সঙ্গে গিয়াসুদ্দীনের পরিণতি করে বলছেন "রাজ্যের অবস্থা কোথায় এসে পৌঁছেছে, আপনি কি তা একটুও বুঝতে পারছেন না?" *(পৃ: ১৫০৯, ঐ)*

কালকূট গিয়াসুদ্দীনের জীবনধারার সঙ্গে চলতে চলতে তাঁর জীবনের জলছবি এঁকেছেন কালির তুলিতে। কাব্যপ্রেমিক গিয়াসুদ্দীনের জীবনের শেষদিনের শেষ রাতের দৃশ্য বেদনার তুলিতে এঁকেছেন। কালকূট দেখেছেন কাব্য রচনার নেশাতেই রক্ষী শূন্য অবস্থায় রাতের আঁধারে উদ্যানে নেমে রাতের তারাদের দিকে চেয়ে হাফিজকে ভাবছিলেন — "আজ গিয়াসুদ্দীন তোমার স্মরণে, তাঁর শেষ গজলটি লিখবেন। আজ রাত্রে আমার ঘুম আসবে না। হাফিজ! তোমাকে স্মরণ করে, আমি তেইশ বছরের কাহিনী নিয়ে দীর্ঘ গজল রচনা করব। আর এটিই হবে আমার জীবনের শেষ গজল রচনা।" *(পৃ: ১৫০৯, ঐ)*

একটি ঐতিহাসিক চরিত্রকে অসাধারণ কাব্যময় করে তুলেছেন। কালকূট গিয়াসুদ্দীনের হৃদয়ের গভীরে জমে থাকা হত্যার বেদনাকে কালির তুলিতে স্পর্শ করেছেন, তাঁর চেতনার রাজ্যে উঁকি দিয়েছেন। বিদ্রোহী পুত্র তিনি, পিতাকে দুঃখী করেছিলেন, এটা তাঁর হৃদয়ে সবসময় জ্বলজ্বল করত, সেইজন্যই তিনি ধর্মের পথে ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু এটাই তার পতনের কারণ হল, এক জনপ্রিয় সুলতান, স্বপ্নের মত যার উত্থান, সেই স্বপ্নের নায়ক বাস্তবের মাটিতে ধর্মীয় সংকীর্ণতার বেড়াজালে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন।

এজন্য বল্‌খিকেই কালকূট দায়ী করেছেন। তাঁর প্ররোচনামূলক চিঠি পেয়েই তিনি বহুকালের বিশ্বস্ত 'অজ উমরা' রাজা গণেশকে রাজকার্য থেকে বিতাড়ন করে ধীরে ধীরে তাঁর জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছিলেন। রাজ্যের আমীর-ওমরাহ-সেনাপতি, সেনাবাহিনী ও প্রজাসাধারণ 'রাজা গণেশে'র রাজসভা থেকে বিতাড়ন মেনে নিতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত রাজা গণেশেরই এক

আজ্ঞাকারী অনুচরের হাতে রাতের আঁধারে প্রাসাদের মধ্যে সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। কালকূট দেখেছেন তাঁর প্রিয়নায়ককে ছিন্ন মস্তকে ভূলুণ্ঠিত হতে।

কালকূট তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিতে ইতিহাসের পথে চলতে চলতে তাঁর প্রিয় নায়কের জীবনকাহিনীকে চিত্রিত করেছেন। তিনি অত্যন্ত পুঙ্খাপুঙ্খভাবে বাংলার দুশো বছরের সুলতানী আমলের সমাজজীবন, রাজনৈতিক জীবনন ও জনজীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন এ'কালের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। আর তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই তিনি ইতিহাসের চরিত্রগুলিকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে এনেছেন। নিজের উপলব্ধি, ভাবনা-চিন্তাগুলি যুগোপযোগী চরিত্রগুলির মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন। ইতিহাসের পথে মনভ্রমণ করতে করতে তাঁর ভ্রমণকাহিনীর স্থান-কালের সঙ্গে মানুষই প্রধান উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এবং ধীরে ধীরে তাঁর কথাসাহিত্য উপন্যাসের পূর্ণতা পেয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

কালকূট - রচনা : বিষয় ভাবনা ও শিল্পরূপ

লেখক কালকূট ও লেখক সমরেশ বসু এক ব্যক্তির দ্বৈতসত্তা। একই ব্যক্তি তাঁর দুই ধরনের শিল্পকীর্তি দুটি ধারায় প্রবাহিত করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। ব্যক্তি সমরেশ বসু যখন লেখক সমরেশ বসু রূপে কলম ধরেছেন, তখন তীক্ষ্ম কলমের খোঁচায় সমাজ দর্পণ ঝলকিয়ে উঠেছে। সেখানে তিনি জীবনের অতি বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন সমাজচিত্রকে তাঁর লেখনীর দ্বারা প্রতিভাত করেছেন। তাঁর লেখনীতে উঠে এসেছে প্রেম-প্রেমহীনতা, হিংসা-প্রতিহিংসা, রাগ-ক্রোধ, চটকলের শ্রমজীবী মানুষদের জীবনচিত্র, ক্ষয়ে যাওয়া যুবসমাজের প্রতিচ্ছবি, মাছমারাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। সর্বত্রই তাঁর তীক্ষ্মদৃষ্টিতে ছুরির ফলার মতো ঝলসে উঠেছে। তাঁর সৃষ্টি করা চরিত্রগুলো সমকালীন কিছু কিছু জনজীবনের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। কতগুলো কাহিনীতে তিনি সাহসী পদক্ষেপ রেখেছেন, যেগুলো সেই বহু চর্চিত, বহু আলোচিত হয়েছে। তবুও তিনি শেষপর্যন্ত তাঁর সাহসী, প্রতিবাদ মুখরিত সমাজদর্পণ লিখতে থেমে যাননি। এ সমরেশ বসু এক শিল্পকর্ম। কিন্তু আবার সমরেশ বসুই যখন কালকূট রূপে কলম ধরেছেন, তখন সেখানে একটি ভিন্ন সত্তা ভিন্নরূপে কাজ করেছে। কালকূটের লেখাগুলোতে কালকূট তথা লেখকই স্বয়ং একটি চরিত্র। লেখক ভ্রমণে বেরিয়ে আত্মানুসন্ধান করেছেন। বহুরূপের মধ্য থেকে নিজেকে দেখতে চেয়েছেন। লক্ষরূপের ফেরে চলতে চলতে জীবনের নানা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে তিনি নিজেকে ঋদ্ধ করেছেন। লক্ষরূপের মধ্যে চলতে চলতে মানব হৃদয়ের গভীরে অন্তর্দৃষ্টি ফেলেছেন। সেই অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি তুলেছেন অমৃতরস। তার বিষে জরজর হৃদয়কে তিনি সেই অমৃতের কিছু বিন্দু রসে ভরিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তার বিভিন্ন কাহিনীকে লেখক তার মনের জিজ্ঞাসা, জানবার আগ্রহ বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। যে তথ্যে তিনি নিজে সমৃদ্ধ হয়েছেন, তার উত্তর লেখক চরিত্রের মধ্য দিয়ে এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে প্রশ্নে পাঠকের মনেও অনুরণিত। মানব জীবনের ছোট ছোট হঠাৎ দেখা মুহূর্তগুলো তার চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে বিকাশ দেখিয়েছেন। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিয়ে লেখক তার সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে দিয়ে একের পর এক কাহিনীর মালা গেঁথেছেন অন্যরূপে। প্রচলিত উপন্যাসের রীতি থেকে অন্য রীতিতে লেখক কালকূট তার শিল্পকর্মের বিকাশ ঘটিয়েছেন। আবার ইতিহাস-পুরাণ-মহাকাব্য বিষয়ক কাহিনীর চরিত্রগুলো তিনি বর্তমানের আলোকে আলোকিত করেছেন। বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে সেই সময়ে ঘটে যাওয়ার ঘটনার ভেতরের অন্তর্নিহিত কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রগুলোর

মূল্যায়ন করেছেন, সমাজ, ধর্ম, বাধা প্রতিবন্ধকতা সবকিছুর ওপর চরিত্রগুলোর নবমূল্যায়ন করেছেন। লেখক সেখানে একটি চরিত্র, কথক ঠাকুরের মত সেইসব পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও মহাকাব্যিক কাহিনী বিবৃত করেছেন। এ'কালের দৃষ্টিতে তিনি মহাভারত থেকে পৃথা চরিত্রটিকে নবমূল্যায়ন করেছেন মহাকাব্যের পথ বেয়ে। লেখক কালকূট, পৃথা তথা কুন্তীকে কিভাবে দেখেছেন, কিভাবে কতটা যুক্তিসঙ্গতভাবে আধুনিক দৃষ্টিতে তুলে ধরে তা শিল্পসম্মত করে তুলে ধরেছেন। লেখক কালকূট নিজের মনোভাবনাকে বারে অতীতচারী করেছেন, এবং সেই জায়গায় সেই সময় থেকে লেখক তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ব্যক্তি চরিত্রগুলোকে তাঁর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আলোকিত করেছেন। তেমনি মহাকাব্য মহাভারত থেকে অন্তিম প্রণয়, সম্রাট পান্ডু ও তাঁর দুই পত্নী কুন্তী ও মাদ্রীকে, সেই সময়ের সামাজিক কার্যকারণ, সামাজিক অনুশাসন এগুলো তাঁর কাহিনীতে অতীত থেকে তুলে এনেছেন, চরিত্রগুলোকে এ'কালের ছাঁচে সৃষ্টি করে অন্যরূপে মহিমামণ্ডিত করেছেন। তেমনি দ্রোণাচার্য পুত্র অশ্বত্থামা। ভয়ংকরতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, মিত্রপ্রীতি, পিতৃশোকে জর্জরিত এক পুত্রের জ্বলন্ত ক্রোধ লেখক তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তুলে ধরেছেন তাঁর যুদ্ধের শেষ সেনাপতিতে। রামায়ণ থেকে 'প্রাচেতস' কিভাবে 'বাল্মীকি'তে রূপান্তরিত হলেন, তার মানবিক পরিবর্তন ও অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর জগতে উত্তরণের জন্য লেখক কালকূট তাঁর মনোভাবনাকে বারে বারে অতীতের সেইসব স্থান-কাল-পাত্রর কাছে নিয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে পাঠকের সামনে মেলে ধরেছেন। এমনি আরও ইতিহাসভিত্তিক কাহিনী তিনি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মানবচরিত্রগুলো চিত্রিত করেছেন। এগুলো আলোচনা করার আগে লক্ষরূপের আরশিতে লেখক কালকূট নিজে স্বয়ং কাহিনীর প্রধান চরিত্র হয়ে যে যে চরিত্রগুলোকে তিনি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টি করেছেন সেগুলোই দেখব এবার। তাঁর মানবজীবন কেন্দ্রিক রচনাগুলোর মধ্যে অমৃতকুম্ভের সন্ধানে, মুক্তবেণীর উজানে, পণ্যভূমে পুণ্যস্নান, পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ, কোথায় পাবো তারে, আরব সাগরের জল লোনা এইসব কাহিনীগুলোর প্রথমেই 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' দৃষ্টি দেবো।

'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' কাহিনীতে লেখক নিজেই চলেছেন প্রয়াগের কুম্ভমেলায়। কাহিনীর প্রধান চরিত্র লেখক। তিনি যাচ্ছেন আত্মানুসন্ধানের জন্য, নিজেকে দেখবেন লক্ষরূপের আরশিতে। তাঁর মনে প্রশ্ন এসেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ কিসের জন্য ছুটে যাচ্ছে? লক্ষ লক্ষ মানুষ ধর্মান্ধ হয়ে কী ছুটে চলেছে মহামেলার পথে? কী তাদের কামনা বাসনা? তাই লক্ষরূপের আরশিতে নিজের বৈচিত্র্যকে দেখতে মানবমনের হৃদিকুম্ভে ডুব দিয়েছেন। লক্ষ জনের বিচিত্র রূপ বিচিত্র নাদে লেখকরূপী কথক কালকূটের প্রতিটি ধমনীতে ডাক দিয়ে চলেছে। তাই এই যাত্রার আত্মদর্শন রেলের কামরা থেকেই শুরু হয়েছিল। প্রথমেই যে চরিত্রের মধ্যে শুরু হয়েছিল, সে টিকিয়া পাড়ার যক্ষারোগে আক্রান্ত রোগী। সে কেন যাচ্ছে কুম্ভমেলায়? এই প্রশ্ন তার বন্ধুও করেছিলেন। তিনি

বন্ধুকে বলেছিলেন 'ধর্মান্ধ কিনা জানিনে, তবে মানুষ দেখতে যাচ্ছি।' এবার লেখক তারই সহযাত্রীকে সেই একই প্রশ্ন করেছিলেন। যেহেতু লেখক তার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্য দিয়ে নিজের কথাই বলিয়ে নেন, এক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে। লেখক এক দরদী মন নিয়ে চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কথার উত্তর মৃত্যু পথযাত্রীর মিষ্টি হাসির মধ্য দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন এইভাবে, 'শুধু শোননি, কেন দুনিয়ার মানুষ যায় সেখানে? কেন মহাপুরুষ সাধুরা আসেন সেখানে স্নান করতে? তাঁদের চেহারা দেখনি কী সুন্দর! কী তার বাঁধুনি! কুম্ভযোগে সঙ্গমে স্নান করলে মানুষ শত শত পরমায়ু পায়, রোগমুক্ত হয়। তাই তো আমি যাচ্ছি।'' *(পৃ: ৩৯, অমৃতকুম্ভের সন্ধানে, ১ম খণ্ড)* অসহ্য যন্ত্রণায় তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে অথচ কুম্ভমেলায় যাওয়ার ইচ্ছা, তার সেই যন্ত্রণাবোধকে, ইচ্ছাকে লেখক তুলে ধরেছেন এইভাবে, 'খুলে দাও দরজা, জিঞ্জির খুলে দাও। প্রাণ গেল হে ভগবান! এখনো অনেক দূর।' *(পৃ: ৩৯, ঐ)* কাশতে কাশতে সে চেঁচিয়ে উঠে লেখককে আবার বলে 'খুলে দাও বাবু, খুলে দাও।' *(পৃ: ৩৯, ঐ)* তীব্র মৃত্যুযন্ত্রণাবোধ, তাঁর প্রাণের আকুতি এইভাবেই বেদনামণ্ডিত হয়ে উঠেছে। বেদনার রেশ মোকমাঘাট স্টেশনে ছড়িয়ে পড়েছিল। একদিকে ভোরের আলোয় রক্তিমাক্ত আকাশ, উত্তরের হিমেল হাওয়া আর দিগন্তবিস্তারী মাঠে হলুদ ফুলে ফুলে ছোলামটরের কিশোরী ডগা দোলানো আর একদিকে লালকাঁকরের উপর শোয়ানো শতবছর পরমায়ু সন্ধানী যেন ঘুমাচ্ছে, কম্বলে ঢাকা তার দেহ। একদিকে সূর্যোদয় আর একদিকে জীবন অস্তমিত। আশ্চর্য শিল্পসুষমায় বেদনাবোধকে পাঠকের অন্তরে জাগিয়ে তুলেছেন। আবার প্রকৃতির নিয়মে এটাই যে স্বাভাবিক 'তুমি পড়ে থাক, আমাদের পরমায়ু নিয়ে আমরা ছুটে চলি। এটাই নিয়ম।' *(পৃ: ৪০, ঐ)* ওই মৃত্যুজীবাণুর হাত থেকে বাঁচতে উচ্চ শ্রেণীর যে কামরায় উঠেছিলেন, সেখানে অন্ধ্র পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তারা কালীঘাট দর্শন করে প্রয়াগে চলেছে। লেখকের চোখ দিয়ে উঠে এসেছে চারভাই ও একভাঁজের একটি অভিশপ্ত পরিবারের যন্ত্রণা, ভাবনা ও আশা। তিনি অন্ধ্রের পরিবারটিকে একটু আবেগপ্রবণ করে দেখিয়েছেন। সমুদ্রোপকূলবর্তী প্রদেশের মানুষরা হয়ত এইরকমই। তিনি তাদের আবেগটাকে প্রকৃতির সঙ্গে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। অভিশপ্ত পরিবারটি কুলগুরুর নির্দেশে সারাভারত ঘুরে বেড়িয়েছে পাগলের মত। বড় ভাই কথা বলতে বলতে হয় উত্তেজিত, তার স্ত্রীর মুখে রক্ত প্রবাহ তত হু-হু করে ছুটছে, লজ্জায় বাকরুদ্ধ। তার বেদনাকে লেখক অনুভব করেছেন ''মনে হল তাঁর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। তাঁর দক্ষিণী সমুদ্রের অতল ডাগর চোখে ঝিকমিকিয়ে উঠল অশ্রুর মুক্তাবিন্দু। সপ্তরশ্মি খেলে গেল তাঁর গ্রাম্য নারীর মত কানে পরা অনেকগুলি পাথরখচিত কর্ণভূষণে। ক্লান্ত নাগিনীর মত পিঠের উপর এলিয়ে পড়ে রইল রুক্ষ বেণী।'' *(পৃ: ৪১, ঐ)* প্রকৃতি মানবী একসুরে ধরা পড়েছে। বড়ভাই নীচু স্বরে তাদের সঙ্গে কথা বলছে 'এইবারই আমাদের শেষ, আমাদের আশা-নিরাশার পরীক্ষার

শেষদিন এগিয়ে আসছে। এইবারই আমাদের সঞ্চিত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। সংসার পাতবে আমার ভাইয়েরা, আর আমার—' *(পৃ: ৪১, ঐ)* লেখকের কাছে পরিবারটির অন্তর্বেদনার চিত্র এমনভাবেই ফুটে উঠেছে। পরিবারের মধ্যে একটা ট্রাজেডি লুকিয়ে আছে। প্রায়শ্চিত্তের দিন শেষ হবে কুম্ভে পুণ্যস্নান করে। গরলে অমৃতের উদ্ভব হবে। তাঁর পরশে তাদের অনাগত ভবিষ্যৎ ভরে উঠবে এই কামনা তাদের মনে।

মৃত্যুপথ যাত্রী ও অন্ধ্র পরিবারটি অমৃতকুম্ভে ডুব দিতে ছুটে চলেছিল মনে ভিন্ন ভিন্ন আশা নিয়ে। লক্ষ্য একই পুণ্যস্নান, কিন্তু অন্তরের কামনা ভিন্ন ভিন্ন। লেখকের সঙ্গে মনের জিজ্ঞাসা পাঠকের মনে ছড়িয়ে পড়েছে, কেন যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ? লক্ষ লক্ষ মানুষ মহামেলায় দিকে ছুটছে। মরিয়া হয়ে তারা উঠছে গাড়ি, যেভাবেই হোক প্রয়াগে পৌঁছাতেই। ট্রেনে যাত্রীদের আছড়ে পড়াকে লেখকের ঝড় বলে মনে হয়েছে। 'আচম্‌কা ঝড় এল। ঝড়-ই বলি। হঠাৎ একটা তুমুল গণ্ডগোল আর তার সঙ্গে শিলাবৃষ্টির মত কামরাটার মধ্যে এসে পড়তে লাগল বাক্স, প্যাটরা, বোচকা পুঁটুলি। প্রতিবাদের অবসর ছিল না। অবসর ছিল না তাকাবার। যে যার মাথা বাঁচাতেই ব্যস্ত।' লেখকের বলার ঢঙে মানুষের ভিড়ের একটা বাস্তব রূপ কৌতুকমিশ্রিত সৌন্দর্যে উঠে এসেছে। মানব স্রোতের ঢেউ আছড়ে পড়েছে ট্রেনের কামরায়, কামরায়, অতি পরিচিত দৃশ্য একঘেঁয়েমি বর্ণনার সঙ্গে মিশে যায়নি। কৌতুকের ছটা ছড়িয়ে পড়েছে বলরামের মালের চাপে চাপা পড়ার মধ্যেও। চাপা পড়া বলরামকে দেখে শ্যামাদের দলটি দুঃখ পাওয়ার বদলে হেসে উঠেছিল। হাস্যরত শ্যামরা কালকূটের ছড়িয়ে দেওয়া মালপত্র গোছাতেব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। লেখক সেই দৃশ্য দেখে বলেছেন 'যত না মালপত্র সাজায়, তত সামলায় বুড়োকে। বুড়ো যেন তাদের সাত রাজার ধন এক মাণিক। কেন কে জানে! সেই সঙ্গেই স্বভাষায় কি একটা কথা নিয়ে হেসে খুন হচ্ছে সকলে। আর আড়চোখে তাকিয়ে দেখছে আমাকে।' *(পৃ: ৪০, ঐ)* তাদের কলকাকলিতে মুখরিত কামরা। খাঁচার পাখি খাঁচা ছাড়া হয়ে যেমন মুক্তির আনন্দে মেতে ওঠে এদের হাসি-কলরোলও তেমনিভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। তাদের কলকাকলিতে বলরাম খুশিতে বলে ওঠে 'এতক্ষণে শুকনা খালে জোয়ার এইল।' ব্যথা পেয়েও অম্লান বদনে হাসতে পারে বলরাম। সে বলে 'চইলতে চোট লাগে না বাবু? আপনার লাগে না।? তার কথার মধ্যে বাউলের ধ্বনি বাজে। আমঘাটার আখড়ার মূল গায়েন সে। ক্ষমা তাঁর স্বভাবের ধর্ম। লেখক বলরামের এই ক্ষমাকে বৌদ্ধ শ্রমণের ক্ষমাধর্মের সঙ্গে তুলনীয়। বেদনাবোধকে লেখক অনন্য উচ্চতায় তুলে ধরেছেন যা লেখকের বোধের সঙ্গে পাঠকের বোধকে সমভাবে জাগ্রত করে তোলে। প্রয়াগে চলার পথের কাহিনীতে নুলো বলরাম একটি মুখ্য চরিত্র। পথ চলতে বহু লোকের সঙ্গে দেখা হলেই সম্পর্ক শেষ। কিন্তু এই কাহিনীতে গ্রন্থিক হিসাবে বলরাম বারে বারে এসেছে আপন বাউল মনের

মহিমায়। তাঁর কথা তো নয় যেন কথার পুষ্পবন, গান হয়ে তার সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র কাহিনীতে। লেখক বলরামের কথা শুনে বলেছেন "আবার সেই কথার ফুল ফোটানো। সে ফুলে এমন গন্ধও ছিল যে চট করে উত্তর দিতে পারিনি।" *(পৃ: ৪৫, ঐ)* বলরামের অসহায়তাতে লেখক কালকূট ফুটিয়ে তুলেছেন একই কথার মধ্য দিয়ে "অ্যালবাদ ইষ্টিশনে এট্টুস হাত দুইখান ধরবেন, কোনরকমে একবার টেনে হিঁচড়ে ফেলতে পারলেই হইবে।" *(পৃ: ৪৫, ঐ)*

লেখক কালকূট বিকলাঙ্গ বলরামের করুণ অসহায় রূপকে এ সংসারের আয়নায় দেখে মনভাবনায় বলেছেন 'বোধহয় এটাই তার প্রকৃত রূপ। আর এ রূপই বুঝি তাকে দিয়েছে প্রাণ ভোলানো সুর, গলা, কথা ও মন। লেখক দেখিয়েছেন দু'হাতে ভর দিয়ে হেঁচড়ে হেঁচড়ে চললেও বলরাম মনে পঙ্গু নয়। সে বসে থাকতে পারে না, দেখবে বলেই মহামেলায় এসেছে। যমুনাপাড়ে এসে লেখককে বলে 'এমন কইরে আর একদিনও যমুনার পাড়ে আসি নাই। যদি আইসলাম তবে একটু গান গাই, অনুমতি দেন।' বলরাম গান গেয়ে যমুনার রূপ ফিরিয়ে দিয়েছিল

'যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা
পোরবাহিনী।
ও বিশাল তটে রূপের হাটে
বিকাত নীলকান্ত মণি।.....' *(পৃ: ১১৫, ঐ)*

তার হৃদয় রাধাকৃষ্ণময়। সে বলে, 'ভাবি, এখনো কি বাঁশি বাজে ঠাকুরের। ছুটে ছুটে আসে রাজঠাকরুণ'। *(পৃ: ১১৫, ঐ)* আখড়ার অধ্যক্ষা লক্ষ্মীদাসীকে এনেছেন মধ্যবয়সের বালিকারূপে। সে অভিমান করে বরামের ওপরে। বলরাম ও লক্ষ্মীদাসীকে একে অপরের পরিপূরক করে চিত্রিত করেছেন। নদিয়ার আমঘাটার গ্রাম্য অশিক্ষিত বোষ্টম বোষ্টমীকে রাধাকৃষ্ণের প্রতিরূপ করে চরিত্রায়ন দুটি অপরূপ শিল্প মাধুর্য্যে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। স্থানীয় গ্রাম্য ভাষা দিয়েছেন তাদের মুখে। অভিমানী লক্ষ্মীদাসীকে বলরাম গলা বাড়িয়ে বলেছিল 'যাইও না, কারে ধইরে নিয়ে আসছি, একবার দ্যাখ।' *(পৃ: ১১৬, ঐ)*তারপরেই গলা নামিয়ে লেখককে বলল, 'গোঁসা করেছে আমার উপুর। চিনতে পারে নাই আপনারে।' লক্ষ্মীদাসী লেখককে প্রাণের আবেগে 'ঠাকুর! আসেন আসেন! মনে পড়েছে?' *(পৃ: ১১৬, ঐ)* বলরাম বলে 'মনে কি পড়ে গো। মনে পড়াইতে হয়। ধ্যান কইরে নিয়ে আসতে হয়।' লক্ষ্মীদাসী লেখকের কাছে বিচার চায়, নালিশের ভাষা 'কথা নাই বার্তা নাই, যখন তখন বাহির হইয়ে যায়। কোথায় গিয়ে বইসে থাকে। এট্টা বিপদ হইলে আমি কোথায় যাইব, বলেন তো?' *(পৃ: ১১৭, ঐ)* লেখক কালকূট নিজের সৃষ্ট চরিত্রে এ'কালের প্রেমকে এনেছেন যুগান্তরের কালের পরিপ্রেক্ষিতে। বলরামের খোঁজে লক্ষ্মীদাসী পাগলের মত ছুটে ছুটে খুঁজে বেড়িয়েছে। বলরাম, লেখক কালকূট ও শ্যামার সঙ্গী হয়ে হেঁচড়ে হেঁচড়ে চলে। এই কাহিনীর

অন্যতম চরিত্র শ্যামা। শ্যামা চটুল, উদ্ধত, কথায় কথায় খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। ট্রেনে উঠেই লেখকের দৃষ্টিতে উঠে আসে। লেখক শ্যামাকে বলেছিল 'এই দেখিয়ে আপ উতর যাইয়ে, হামারা ঘাড়সে।' *(পৃ: ৪৪, ঐ)* লেখকের এই কথার প্রত্যুত্তর কিভাবে দিয়েছিল শ্যামা সেটা দেখা যাক্। ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল লেখকের দিকে তারপরে এই কথাগুলি বলল 'আরে ভাই সবকোইকো তখ্‌লিফ, কিসীকো তো একলী নহি। এ দেখা, আদমিলোগ ঝগড়া কর রহে।' তারপরে দেহটি সামান্য সরিয়ে আবার ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে হাসল। শ্যামার জেদি, উদ্ধতভাব তারই সঙ্গে নালিশও করা কেমন অনায়াস ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক তার আপন ভাবনা দিয়ে। আবার লেখকের কাণ্ড থেকে হেসে গড়িয়ে পড়ছে সঙ্গিনীদের সঙ্গে। বলরামের কপাল ফুলে রক্ত জমে যাওয়ার দুঃখের বদলে খিলখিলিয়ে হেসে উঠছে। লেখক একজন সাধারণ যাত্রীর মত ওদের ওপরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওদের কথার উত্তরে ওদেরই কথা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এলাহাবাদ স্টেশনে যাত্রী ভিড়ে চেপটে যাওয়ার মুহূর্তে লেখকেরই কনুই ধরে নেমে এসে পরিবারের আর সকলের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে লেখককেই সে বলেছিল অশ্রুজল নিয়ে 'ওদের একটু নামিয়ে দাও বাঙালীবাবু।' *(পৃ: ৪৬, ঐ)* এলাহাবাদ স্টেশনে ইন্‌জেকশন নিতে কেমন ব্যথা লেগেছে সেটা সে লেখকের কাছেই জানতে চায় "চোট লাগেনি? ভাবলাম, বলরামের মত জবাব দিই যে, চোট ছাড়া চলা যায় নাকি? হেসে বললাম 'সামান্য। ও কিছু নয়। শ্যাম বলল 'সচ বলছ?' 'ঝুটা বলে লাভ কি আমার। নিয়ে দেখা।' তাদের সঙ্গী বুড়ো লোকটির জন্য উৎকণ্ঠিত স্বরে বলেছিল 'আমাদের এই বুড়ো মানুষটি নিতে পারবে তো?' লেখক এমনই ছোট ছোট কথাবার্তার মধ্য দিয়ে শ্যামার হৃদয় দেখেছেন। আপন ভাবনায় চরিত্রটিকে সৃষ্টি করেছেন এক ভাললাগা শিল্প সুষমায়। বিচিত্ররূপে রঙ্গিনী শ্যামা, টাঙায় চলতে চলতে লেখকের সঙ্গে মনের এক গোপন খেলার দুষ্টুমিতে মেতে উঠেছে।

শ্যামা চটুল, উদ্ধত, কথায় কথায় খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, তবু লেখকের মনে হয়েছে এই চটুলতার মধ্যে কোন গোপন ব্যথা অবশ্যই লুকিয়ে আছে। শ্যামার চড়া হাসির লহরে চাপা পড়ে আছে এক বন্দীর নিঃশব্দ যন্ত্রণার ছটফটানি। লেখক তার ব্যথাভরা সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন এইভাবে 'কিন্তু শ্যামারও আলতারাঙানো পা, প্রজাপতির নকশাকাটা স্যান্ডেল, আবার বাঁকা মল। মলের উপর পেখম-উন্মুক্ত-ময়ূর-ছাপা শাড়ি। তাঁর বলিষ্ঠ অঙ্গ জুড়ে ছড়াছড়ি নৃত্যরত ময়ূরের। খুলে গিয়েছে ধূলিরুক্ষ চুল। সিঁথিতে মেটে সিঁদুর, কাচা সোনার স্থূল কাজ করা কঙ্কন শোভিত দু'হাতে কোলের উপর জড়িয়ে ধরেছে একটা পেতলের কলসীর গলা বসেছে বেঁকে, ঘাড় হেলিয়ে। মুখে তার খেলার হাসি। লেখক শ্যামাকে প্রয়াগের ধূলি-ধূসরিত পথে টাঙায় করে চলতে চলতে এইভাবে দেখেছেন। লেখকের এই বর্ণনা পাঠকের কাছে এক অনুপম সৌন্দর্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। পাঠকের দৃষ্টিতে উঠে এসেছে বর্ষায় নৃত্যরত ময়ূরের মত শ্যামার হৃদয়। যার অঙ্গে অঙ্গে যৌবন

সুরভি প্রকৃতি সদৃশ্য। রাধার মত বিরহিনী সে, সে-ই অশীতিপর বুড়োর দ্বিতীয় পক্ষ। লেখক তার কৌতুকপ্রিয় মনটাকে তুলে ধরেছেন সযতনে। লেখক তার রিক্সা থেকে পড়ে যাওয়ার মুখে শ্যামার কলসীকে ধরে রক্ষা পেয়েছিলেন। অথচ শ্যামা অনায়াসে প্রৌঢ়াকে বলে দিল 'কিছু না, বাঙালী ভাই আমার কলসী বাঁচিয়ে দিয়েছে। (পৃ: ৪৯, ঐ) কোন ঘটনার কী উত্তর! উত্তর দিয়েই লেখকের মুখের দিকে চেয়ে দুষ্টুমিভরা হাসিতে তাঁকে চম্‌কে দিয়েছে। মুহূর্তে রঙবদল! লেখক বলছেন, 'কী দেখছ?' সে হেসে গলার স্বর নামিয়ে বলছে 'আমি কোথায় দেখছি। দেখছ তুমি।' *(পৃ: ৫০, ঐ)* কাহিনী যত এগিয়ে যায়, শ্যামার পরিহাসপ্রিয়তা ততই নানা রঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, চমকিয়ে যায়। এরপরে তার মুখ বর্ষার মেঘের মতো কালো হয়ে যায়। 'ওই মানুষটি কি তোমার বাবা?' *(পৃ: ৫০, ঐ)* 'বাবা! হট্। বাবা কেন হবে।' *(পৃ: ৫০, ঐ)*অন্ধকারে যেমন বিদ্যুৎ ঝলকিয়ে যায় তেমনি তীক্ষ্ম হাসিতে সে লে, 'আমার স্বামী।' বেদনার তুলতে শ্যামাকে সৃষ্টি করেছেন। ওই বুড়ো শ্যামার বাবা নয় স্বামী, এই কথা বলে শ্যামা গম্ভীর ও অন্যমনস্ক হয়ে দূরে তাকিয়েছিল। লেখকের মনে হয়েছিল ধুলোর ছায়া ঘনিয়ে এসেছে শ্যামার মুখে। শ্যামার বেদনাবোধ, অসহায় বন্দীদশা, বর্ষার ময়ূর সদৃশ উচ্ছলতা সবকিছুই পাঠকের কাছে অন্যমাত্রায় পৌঁছে যায়। এরই সঙ্গে পাঠক লেখকের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় শ্যামার বেদনার সঙ্গে। লেখক এরই মধ্যে দুটো সংস্কৃতির মিল অমিল অত্যন্ত সূক্ষ্মবোধের সঙ্গে পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন। বাংলার কৌলীন্যপ্রথার মত বিহারের ভুঁইয়ার বর্ণ হিন্দুদের বৈবাহিক প্রথা। তা নইলে শ্যামাকে কেন ওই অশীতিপর ধনী বৃদ্ধের অঙ্কশায়িনী হতে হয়েছে। লেখক তার কথকতার আশ্চর্য গুণে সেই কঠিন সত্যকে, তার মনের প্রশ্নকে পাঠকের কাছে তুলেছেন, তাদের মনেও জিজ্ঞাসা এনে দিয়েছেন। লেখক কোথাও একটানা তার কাহিনীর চরিত্রকে তুলে ধরেন নি। সময় ১৯৫৪ সাল, সেই সময় ও তার আগের সমাজ ব্যবস্থাকে লেখক তুলে ধরেছেন। একজন প্রৌঢ়া সহ তিনজন যুবতী মেয়ে এক বৃদ্ধকে নিয়ে কুম্ভমেলায় বাঙালী সমাজে সেই সময়ে এটা ব্যতিক্রম বলে মনে হয়েছে। আবার মিল খুঁজে পেয়েছেন বাঙালী মেয়েদের মত আল্‌তা রাঙানো পা দেখে। যে বৈচিত্র্যকে দেখবেন বলে কুম্ভমেলায় চলেছেন, সেই বৈচিত্র্যের রস তাঁর হৃদিকুম্ভে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। সেই অমৃতের রসে তিনি তাঁর কাহিনীকে শিল্পরসে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি কাহিনীতে কখনও কথকতার ঢঙে, কখনও তার পাত্রপাত্রীদের সরাসরি কথাবার্তার মধ্যে, কখনও মূল চরিত্রগুলোর অন্তর্নিহিত সত্যকে, কখনও বর্তমানের আলোয় পুরোনোকে দেখেছেন। এক অনবদ্য লেখনীশৈলীতে ইতিহাসপুরাণের ভৌগোলিক সত্যকে, প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু বর্ণনে কোথাও একঘেঁয়েমি আসে নি।

কাহিনীর প্রয়োজনে বিভিন্ন চরিত্র এসেছে। সেই চরিত্রগুলো দিয়ে লেখক মালা গেঁথেছেন। তারপর এসেছে স্থানিক বৈশিষ্ট্য কিন্তু লক্ষণীয় তথ্যের বিবৃতিতে সেগুলো ভারাক্রান্ত হয়নি।

বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে পশ্চিমদেশে ঢোকার সময় লেখক প্রকৃতিকে উপস্থাপিত করেছেন এইভাবে, "ভোরের আলোয় যাকে দেখেছিলাম শ্যামাঙ্গিনী, রৌদ্রালোকে দেখলাম শ্যামাঙ্গিনী কিঞ্চিৎ রুক্ষ। যত দূরে চোখ যায়, শুধু জনহীন মাঠ আর মাঠ। অড়হর, কলাই, মুগ আর মুসুরির মাঠ ঠেকেছে গিয়ে আকাশের গায়ে। মাঝে মাঝে হঠাৎ ক্লান্ত চোখের সামনে ভেসে উঠেছে গ্রাম। এ গ্রাম কালকাসুন্দের ঘনঝোপ আর আম-জাম-সুপুরি-নারিকেলের ছায়া-শীতল গ্রাম নয়। আমবাগান আছে বটে, থোকো থোকো কাঞ্চনবরণী বোলে ভরে উঠেছে তার সর্বাঙ্গ। আর আছে তাল বন। তারই ফাঁকে ফাঁকে মাটির দেয়াল আর খোলার ছাউনি দেওয়া বস্তি।" *(পৃ: ৪০, ঐ)* তিনি তার স্বকীয় ভঙ্গিতে প্রকৃতিকে এনেছেন, পার্থক্য নির্দেশ করেছেন বাঙলার প্রকৃতির সঙ্গে। ইলাহাবাদ স্টেশনে পৌঁছে ইন্‌জেকসনের ভয়ে শুধু শ্যামাদের মত নারী বাহিনীই নয় মস্ত জোয়ান মরদরা যেভাবে কান্নাকাটি, কথা কাটাকাটি শুরু করেছেন তা লেখকের দৃষ্টিতে কৌতুকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে। সেই সঙ্গেই সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করেছেন যদি ধর্মের নামে নাক কান ফুটো করতে হত তাহলে তারা ভয়শূন্য হয়ে সহ্য করতো কিন্তু ইন্‌জেকশন দিতে তাদের মূর্চ্ছা যাওয়ার অবস্থা। টাঙায় করে প্রয়াগে মেলার দিকে যেতে যেতে লেখক অতীতচারী হয়েছেন। বর্তমানের উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ শহরই প্রাচীন হিন্দু রাজাদের দেশ প্রয়াগ। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রকৃষ্ট স্থান। "পুরাণ শাস্ত্রের প্রজাপতি-ব্রহ্মার যজ্ঞদেবী, যজ্ঞের মধ্যবেদী এই প্রয়াগ। প্রজাপতের্যজ্ঞ আসীৎ প্রয়াগে। ভারতের আদিম যুগের ধর্মীয় ইতিহাসের লীলাক্ষেত্র। পৃথিবীর প্রথম যজ্ঞের ধূম সঞ্চারিত হয়েছে এখানকার মাথার উপরের আকাশে। প্রয়াগ সেই পুণ্যভূমি।" *(পৃ: ৫২, ঐ)* লেখক কোথাও একটানা প্রয়াগের ইতিহাস বর্ণনা করেন নি। মাঝে মাঝেই তাঁর স্মৃতিপথে উদয় হয়েছে, ছোট ছোট ফ্রেমের মতো করে তিনি সেই অতীত কাহিনীকে কলমের টানে চিত্রায়িত করেছেন। কখনও তিনি কাল থেকে কালান্তরে গেছেন ইতিহাসের সন্ধানে। তিনি তাঁর ভাবনাকে তুলে ধরেছেন এইভাবে, "ভাবি, যে পথের উপর দিয়ে আজ রিক্সায় চেপে চলেছি, একদিন এখানকারই ভয়াবহ বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অযোধ্যার দশরথ-পুত্র রাম, ভাই লক্ষ্মণ ও স্ত্রী সীতাকে নিয়ে বনবাসের পথে গিয়েছিলেন। দেখতে পেয়েছিলেন দূর-আকাশের ধোঁয়ার কুন্ডলী। ধোঁয়ার কুন্ডলী উঠেছিল ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম থেকে।" পাঠককুলকে একটা স্বপ্নময় বেদনাজড়িত অনুভূতির মধ্য দিয়ে লেখক বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে এনেছেন।

লেখকরূপী কালকূট পাঠককুলকে বলেছেন, "কাব্য নয়, বাস্তবে কি একবার চোখ বুজে ভাবতে পারি না যে সৎমায়ের তাড়নায় দুইভাই আর এক বউ বহুকাল পূর্বে ঘর ছেড়ে একদিন এ পথে এসেছিলেন। তাঁদেরই দিয়ে আমাদের রাজকথা, কাব্য, গৌরবগাথা, রূপকথা, আমাদের ইতিহাস।" *(পৃ: ৪৮, ঐ)* আশ্চর্য কথকতার ঢঙে লেখক আপন বক্তব্যকে প্রতিভাত করেছেন।

এমনি করেই তিনি কুম্ভের পথে যেতে যেতে ভেবেছেন "যদি খুলে দিই এই রাস্তার পুরানো ইতিহাসের পাতা তবে খুঁজে পাব বুঝি গৌতমবুদ্ধর পদরেণু। কান পাতলে শুনতে পাব বিজয়ী মৌর্য বাহিনীর পদশব্দ। দেখতে পাব মুগ্ধচিত্ত গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস, চীনা পর্যটক ফা-হিয়েনকে। শুনতে পাব সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষবর্ধনের রথচক্রের ঘর্ঘরানি, পদচিহ্ন খুঁজে পাব হিউ-এন-সাঙ, শঙ্করাচার্যের!" লেখক কালকূট স্থানিক বর্ণনাকে অন্যরূপে উপস্থাপন করেছেন। প্রয়াগের ইতিহাসের পর তিনি ধীরে ধীরে এলাহাবাদের ইতিহাসের দিকে পাঠককুলকে আগ্রহী করে তুলেছেন। "মুঘলের শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর প্রয়াগে এসে তার নাম রাখলেন ইলাহাবাস। ভিত্তি স্থাপন করলেন দুর্গের। ক্রমে বাদশাহের রম্যভূমি হয়ে উঠেছে এই ইলাহাবাস। জাহাঙ্গীর তৈরি করলেন তার শখের খসরুবাগ। শাজাহান ইলাহাবাদের নাম দিলেন ইলাহাবাদ।" *(পৃ: ৪৯, ঐ)* গৌরবময় যুগের পর অন্ধকারময় যুগ। অযোধ্যার নবাব দেনার দায়ে ইলাহাবাদ বিকিয়ে দিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে। লেখকরূপী কালকূট চরিত্র কাল থেকে কালান্তরের, যুগ থেকে যুগান্তরের ইতিহাস মনে করতে করতে পাঠককুলের সামনে বাস্তবকে এনে দাঁড় করিয়েছেন। সেখানে কাহিনীর গতি একটুও শ্লথ হয়নি, বরং সমগ্র কাহিনীতে একটা কোমল শৈল্পিক সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়েছে।

লেখক কালকূটের লেখায় স্থানিক মাহাত্ম্যর থেকে আশেপাশের নিত্য পরিচিত মানুষজনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তই মাহাত্ম্য পেয়েছে। এমনই উঠে এসেছে এলাহাবাদ স্টেশনে প্রহ্লাদ ও তার পরিবার ব্রজবালা, সঙ্গে দিদিমা, পাঁচ বদ্যি, লক্ষ্মীদাসী-বলরামের আমঘাটার আশ্রমের অধ্যক্ষা ও মূল গায়েন। কতটুকু সময়ের পরিচয় এদের সঙ্গে। প্রহ্লাদ ও দিদিমাকে নিয়ে লেখক এক অন্য রঙ্গ রসের চিত্র এঁকেছেন যা কাহিনীকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। বুড়ি দিদিমা যখন জানতে পারলেন লেখকের কোথাও থাকার জায়গা হয়নি, অমনি তার হৃদয় গলে গেল, অচেনা এক পথযাত্রীকে নিয়ে তার চিন্তা। সঙ্গীকে বলছে 'পাঁচু ছেলেটাকে নিয়ে নে। রাত করে যাবে কোথায়?' *(পৃ: ৫৫, ঐ)* পাঁচুর কথা 'যেখানে খুশি যাক, তোমার অত ভাবনা কিসের খুঁড়ি। এখানেও থাকবে কোথায়?' *(পৃ: ৫৫, ঐ)* দিদিমা দমবার পাত্রী নয়। তাকে অগ্রাহ্য করে বলে 'এস, চলে এস। আমার যেন মরণ নেই, সব হয়েছে একতরো।' *(পৃ: ৫৫, ঐ)* একনিমেষে স্নেহের ফল্গুধারা প্রবাহিত। এই স্নেহের ফল্গুধারা। বারে বারে অমৃত হয়ে হৃদয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তীর্থক্ষেত্রে এসে সাবাং যে মাখতে নেই সেটাও জানিয়ে দিয়ে বলেছে অত শুচিবাই ভাল না, 'দেখো বাপু, শেষে নিমুনি বাধিয়ে বোসো না। ওসব ঝক্কি পোহাতে পারবো না।' *(পৃ: ৫৭, ঐ)* লেখক কালকূট রাতে শুয়ে শুয়ে আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে দিদিমার গলায় কৃষ্ণনাম শুনতে শুনতে যেন তাঁর বাল্যকালে পৌঁছে গেলেন। স্মৃতির দোলায় চড়ে লেখকের মন ঘুমের দেশে চলতে লাগলো যেমন

করে তাঁর 'শিশুরক্তের শিরায় শিরায় ঘুমের মায়া' *(পৃ: ৫৭, ঐ)* হয়ে লুকিয়ে থাকত। না-ছোঁয়া থাকলেও সর্বাঙ্গ ভরে থাকত, জড়িয়ে থাকত আমার মায়ের আলিঙ্গন, এমনি ছিল রাত্রের ঘুমে, ভোরের জাগরণে। সে সুরে ঘুম আসত, আবার সেই সুরেই একটু একটু করে খুলে যেত চোখের পাতা। লেখক কালকূট তার কথার যাদুতে এক স্বপ্নিল আবেশ তৈরি করেছেন, শতনামের সঙ্গে পাঠককুলকে পৌঁছে দিয়েছেন এক চিরন্তন পরম্পরায় যা শুধু লেখকের হৃদয়ে অনুরণন তোলেনি, পাঠককুলের রক্তপ্রবাহেও সেই সুর অনুরণন তুলেছে। এই অংশটি এক স্বপ্নময় মুহূর্ত তৈরি করেছে।

বালিকা বধূ ব্রজবালার ছোট হৃদয়টুকুর সঙ্গে পেতেছিলেন খেলাপাতি। লেখক তার ছোট্ট হৃদয়কে শিল্প সুষমায় ভরিয়ে দিয়েছেন। তিনি দেখেছেন তার 'দেহলতায় ফোটে নি ফুল, তার হৃদিসাগরে ফুটেছে পদ্ম।' *(পৃ: ৭৩, ঐ)* বালিকা বধূ ব্রজবালা কেন এসেছে কুম্ভমেলায়? স্বামী পেল্লাদের মঙ্গলের জন্য, ওর যেন ব্যামো সেরে যায়। মতিগতি ভালো হয় একশো বছর পরমায়ু হয়। সেই আশা নিয়ে 'তিপুন্নিতে' নাইতে এসেছে। বালিকা বধূ হলে কী হবে, লেখক তাঁর মধ্যে দিয়ে আর এক পরম্পরা তুলে এনেছেন। দিদিমার কাছে জীবনের পাঠ নিয়েছে সে, লেখকের মনে হয়েছে ব্রজবালা বালিকা নয়, ব্রজবেশিনী এক মঙ্গলচারিণী নারী। সুখে দুঃখে কামনা বাসনায় সে অতি সাধারণ ও অসাধারণ মানুষী। লেখকের রূপমুগ্ধ মন বোবা হয়ে গিয়েছিল ক্ষণিকের জন্য। "মানুষ খোঁজার ছলে খুঁজি মন। সেকথাটি মনে নেই। রূপসায়রে ডুবে দেখি, তলিয়ে গেছি হৃদিকুম্ভে। ওইটি কি মন?" কাহিনীর মধ্যে বিচিত্ররূপের ঘনঘটা, কথার চলাচলি, হাসাহাসি, চোখের বিচ্ছুরণ সব, সব কিছু কাহিনীটিকে অন্য একটি মাত্রা এনে দিয়েছে। যা প্রধানত অন্য কাহিনীগুলো থেকে আলাদা। প্রতিটি মোড়ে মোড়েই নতুন লোক, নতুন পরিচিতি, নতুন করে তাকে জানা, তার হৃদিকুম্ভে ডুব দেওয়া। সেই সঙ্গে এসেছে মহামেলার বৈচিত্র্য, বহু রূপে, বহু রূপের মধ্যে রূপভেদ। চরিত্রগুলোর মধ্যে কথার শব্দ চয়ন, রেলের কামরায় দেখা মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে বাংলা-হিন্দী মেশানো কথা, শ্যামার মধ্যে হিন্দী বাংলা মেশানো কথা, বলরাম লক্ষ্মীদাসী তাদের উচ্চারণে গ্রাম্য টান, পেল্লাদদের মুখের ভাষা একরকম, পাঁচুগোপালের কথা আর একরকম। অন্ধ গায়ক সুরদাসের হিন্দী কথা আর ভূতানন্দ ভৈরবীর আর এক রকমের কথা। চরিত্র অনুযায়ী কথাবার্তা চালচলনে বিভিন্নতা এনেছেন, যাতে চরিত্রগুলো রক্তমাংসের মানব-মানবীতে পরিণত হয়েছে। কথার ইন্দ্রজালে, বক্তব্যের স্ফুরণে লেখক কালকূট তার বহুমুখী ভাবনার বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছেন। মেলার কোলাহল যখন থেমে গেছে, চাঁদ ঢলে পড়েছে দুর্গের আড়ালে, সেই সময়ে তাবু থেকে বেরিয়ে এসে বিস্তীর্ণ বালুচর দিয়ে হাঁটছিলেন। দূরে কোথাও কোথাও দু'একটি আগুনের শিখা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ধোঁয়ারাশি উঠছে নিঃশব্দ্য বালুচর। তাবু

সমুদ্রের মধ্যেই লেখক যেন হঠাৎ ফিসফাস আওয়াজ পেলেন। তিনি যেন শুনতে পেলেন কারা যেন হিন্দিতে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, ''বহুত পাপ কিয়া ভগবান! হে ঈশ্বর, আমার অর্থ নাও, আমার সোনা নাও, আমার খাওয়া নাও, আমাকে বিবস্ত্র কর, আমার সব নিয়ে, আমাকে মৃত্যু দাও। আমার এই পাপের প্রাণ আমি তোমার পায়ে দিচ্ছি। গ্রহণ করে তুমি আমাকে মুক্তি দাও।'' *(পৃ: ৫৮, ঐ)* লেখক কাউকেই দেখতে পেলেন না, শুধু হিন্দি ভাষায় ফিসফিস আওয়াজ শুনছেন। লেখকের মনে হল তিনি যেন হাজার বছরের অতীতে ফিরে এসেছেন। বালুচরের নিশি যেন তাঁকে দু'হাতে আলিঙ্গন করলেন। এইভাবে লেখক কাহিনীতে অতীতকে এনেছেন। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের ধোঁয়া তিনি যেন দেখতে পেলেন। আর শত শত মানুষ দিনের পর দিন অক্ষয়বটের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দিয়েছে। সেই শত শত বছরের অশরীরী মানুষগুলো যেন লেখককে ঘিরে ধরেছে। 'খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, এ কোন্ দেশের মানুষ। গঙ্গাতীরে তাদের শত শত বছরের এই নির্জন বিচরণক্ষেত্রে রাত্রি নিশিথে এ কোন্ রক্তমাংসের জীব।' *(পৃ: ৫৮, ঐ)* লেখকের মনে হয়েছে তারা বিদ্রূপ করছে মরজগতের মানুষগুলোর বেঁচে থাকার ইচ্ছা দেখে। মানুষের পাপকে গোপন করার কত চেষ্টা, মুদ্রা নিক্ষেপ করে ঈশ্বরের কৃপালাভ করতে চাইছে। তাদের ফিসফিস কথার আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন লেখক কিন্তু লেখক কালকূট তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছে। তারা গঙ্গার কোল থেকে একে একে উঠে আসছে। লেখক প্রয়াগে মেলার বালুচরে রাতের আলো-ছায়ার মধ্য দিয়ে অতীতকে এনেছেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গঙ্গার জলের আওয়াজে তাঁর বালুচরের নিশির ঘোর কাটিয়েছেন। অতীতের সঙ্গে বাস্তবের মেলবন্ধন করিয়েছেন। তখনই তিনি শুনতে পেয়েছেন এক নারী কণ্ঠে গঙ্গাস্তোত্র। তার পেছনে এসে সুর মেলাল এক পুরুষ কণ্ঠ। তারপরে একটি মেয়ে ও একটি বালক এসে মিলল। তারাও স্তোত্র পাঠ করছে। লেখক তাদের অনুসরণ করে নদীর ঢালু বালুচরের দিকে এগিয়ে গেলেন। দুটি ভাগে ভাগ হয়ে সমূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে তারা প্রার্থনা করছে। কোন যন্ত্র নেই শুধু প্রয়াগ মাহাত্মের চাপাসুর তাদের গলায়, শুধু সঙ্গত করছে নিয়তবাহী গঙ্গা। নগ্নতাকে লেখক ব্যক্ত করেছেন 'কিন্তু এই নগ্নতা! আকাশের মত, এই চরের মত, ওই গঙ্গা ও যমুনার মত দ্বিধামুক্ত নগ্নতা। নগ্নতা পরিবেশ অন্থ। নগ্নতা কী ভয়ঙ্কর অথচ কী অপরূপ।' *(পৃ: ৬০, ঐ)*

বস্ত্রে আবৃত হয়ে 'গঙ্গাস্তোত্র শেষ করে নতুন সুরে আবৃত্তি ধরেছে 'প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিমহাতিশন্তৈ্য নারায়ণং গুরুড়বাহননমব্জনাভম... আবৃত্তি করতে করতে এগিয়ে আসছে তারা' লেখকের সঙ্গে দেখা হতেই লেখক জেনেছিলেন উনি গৃহাবধূত। সঙ্গের স্ত্রীলোকটি ওনার অবধূতানী। বাকী দু'জন লেড়কা লেড়কী। অবধূতানীকে দেখে একজন খাঁটি মা বলে মনে হল, কোথাও এদের সন্ন্যাসের ছাপ দেখা যাচ্ছে না। তাই জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনার কি দান নিয়েই

দিন চলে?' *(পৃ: ৬১, ঐ)* সন্ন্যাসী বলল, 'সাধুকে দান করবার লোক কোথায় মহারাজ। আর ঘর আছে। আছে কিছু ক্ষেতিবাড়ি। তাইতেই দিন চলে যায়। এখন তীর্থ করতে এসেছি। ভিক্ষামাত্র সার।' *(পৃ: ৬১, ঐ)* লেখক ক্ষেতবাড়ির কথা শুনে অবাক হয়ে বললেন 'কিন্তু এই ভোর রাত্রে তো কোন সাধুকে স্নান করতে দেখলাম না।' *(পৃ: ৬১, ঐ)* সন্ন্যাসী হেসে উঠল, 'দেখেন নি, কিন্তু অনেকেই করেছে। সব জিনিস কি দেখা যায়? শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী, এরই নাম মাঘব্রত, কল্পবাণীর অবশ্য কর্তব্য।' আরও বললেন যে মকরসংক্রান্তি থেকে গঙ্গাচরে বাস করতে হয়, উপোস করতে হয়। ধর্মের কথা শুনতে হয় 'আর ব্রাহ্মমুহূর্তে নগ্ন হয়ে নাইতে হয়। তবে পরম ব্রহ্ম তুষ্ট হন।' পরমব্রহ্মকে তুষ্ট করার জন্য এই তীব্র শীতে তাই ওদের নগ্ন হয়ে স্নান করতে দেখেছেন। সেই নগ্নতাকে তিনি অপরূপ শিল্প সুসমায় ভরিয়ে তুলেছেন. অবধূত কন্যা লেখক কালকূটকে দেখে চোখে বিস্ময় নিয়ে আরক্তিম হয়ে উঠেছে ভাবী অবধূতানীর মুখ, 'গৃহকন্যার চারিত্রিক অলঙ্কা ভরে রয়েছে তার আপাদমস্তক। তার আলুলায়িত কেশের আড়াল দিয়ে ঢেকেছে সে তার মুখ ও বুক। সামনে যে তার পরপুরুষ।' *(পৃ: ৬১, ঐ)* অথচ প্রার্থনার সময় দেখেছেন আর এক রূপ, আড়াল করার কোন চেষ্টা ছিল না। লেখক কালকূটের ভাবনায় উঠে এল এক অনুপম সৌন্দর্য 'তাই ভাবি, যে মেয়ে লজ্জায় লজ্জাবতী, সে মেয়েই অকুণ্ঠ উদাসীনতায় প্রকৃতির মত নগ্ন। কোনটা সত্য?' *(পৃ: ৬২, ঐ)* নগ্নতার সৌন্দর্যে প্রকৃতি মানবী একাকার।

লেখক প্রাক্ ঊষাকালে অবধূত কন্যা ও প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ব্যক্ত করেছেন 'শূন্যে ওড়া কালনাগিনীর মত তার উড়ন্ত দীর্ঘ কেশরাশি, তার বলিষ্ঠ দেহের সুস্পষ্ট রেখা, তার চাপা গুনগুনানি, সব মিলিয়ে পৃথিবীর চেহারা বদলে গেল আমার চোখের সামনে।' *(পৃ: ৬০, ঐ)* সে জলের দিকে নেমে যেতেই তার গুনগুনানি স্তোত্র চাপা পড়ে গেল। চারিদিক সোনার আলোয় ভরে উঠল। মানবীর সঙ্গে প্রকৃতিকে এনেছেন তার সঙ্গে স্থানিক বিবরণ। কী আশ্চর্য দক্ষতায় তিনি এই তিনের সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। ''দূর পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে দেখি, কালো অথচ তীব্র আলোকময়ী জলের স্রোতরেখা ছুটে আসছে আমার দিকে। আসতে আসতে আচমকা বাঁক নিয়ে চলে যাচ্ছে এই প্রাক-ঊষা মুহূর্তে গঙ্গার অস্পষ্ট হিম-বিদ্ধ-মুক্তা ধবল তরঙ্গের গায়ে গায়ে। এই মুহূর্তে নীল যমুনার রং হয়েছে নিকষ কালো। দূর পশ্চিমে তার ঝাপসা রেলওয়ে সেতু। উত্তর কোলে জলের বুক থেকেই উঠেছে দুর্গের পাথুরে ইমারত। কী হাওয়া! প্রাণনাশী ঠাণ্ডা হাওয়া যমুনার উত্তর তীরের উঁচু গাছের মাথা দুলছে। যেন ঝাপ দিতে চাইছে যমুনায়। ব্যাকুল হাওয়ায় শনশন, যেন কোন অদৃশ্য চারিণীর ব্যাকুল গুনগুনানির মত আসছে ভেসে। আর মুরারিকায় কালী যমুনার বাঁকা স্রোতে ঝলকিত বাঁকা হাসি। সে হাসি গোপনে হেসে ভেসে চলেছে দূরে।''

বালুচরের নিশিদের কথা তার বাস্তবের গৃহাবধূতের স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে

সমর্পণের চিত্রটি তুলেছেন। এই দেখতেই তো লেখক এসেছেন। তার মধ্যে গৃহাবধূতের সাধন-ভজন প্রণালী ব্যক্ত করেছেন কথাবার্তার মধ্য দিয়ে। লেখক গৃহাবধূতের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন "সে পরম ধার্মিক সদাহাস্যময়, প্রেমিকা স্ত্রীর স্বামী, আদুরে ছেলেমেয়ের বাবা।" ওরা চলে যাওয়ার পরও লেখকের আবেশ যায় না। সেই আবেশ পাঠকের মধ্যেও জেগে ওঠে। লেখকের এক শৈল্পিক পরশে পাঠকের মন ছুঁয়ে যায়। কাহিনীর মধ্যে প্রয়োজনেই সাধু-সন্ন্যাসী আখড়া-আশ্রমবাসীদের এনেছেন। যে আশ্রমের তাবুতে উঠেছেন সেই আশ্রমের কোতয়ালী সন্ন্যাসী ও আর এক সন্ন্যাসীর মাধ্যমে 'কুলাচার', জোতমার্গের মত গূঢ় সাধনার তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন। লেখক প্রয়োজন অনুযায়ী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, লেখক চরিত্রের মনের প্রশ্নগুলো আর চরিত্রের মধ্য দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন। যে প্রশ্নগুলো পাঠকের মনেও উঠেছে, দেখা যাচ্ছে পাঠককুলও সে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন। যে উত্তর লেখক বুঝতে পারেন নি, তা তিনি বলেছেন, আমি ধর্মে নেই, সকলের জানার বস্তু নয়। লেখক রামজীদাসী চরিত্রটিকে এক স্বর্গীয় প্রেমময়ী সাধিকা করে সৃষ্টি করেছেন। 'জ্যোতমার্গে'র মত গূঢ় বিষয়টি লেখক রঘুনন্দন রুক্‌মিণীর প্রেমমুগ্ধতার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। আশ্রমের কোতোয়াল সন্ন্যাসীর মুখ দিয়ে অপর এক প্রাক্তন কোতোয়াল সন্ন্যাসীর মুখ দিয়ে লেখক কথকতার ঢঙে বলিয়ে নিয়েছেন জোতমার্গের মত গূঢ় বিষয়। রঘুনন্দন-রুক্‌মিণীর কাহিনীতে আসার আগে লেখক কালকূট কোতোয়ালী সন্ন্যাসীর মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন আশ্রমের নিয়মালী। কিভাবে বলিয়ে নিয়েছেন সেইটেই দেখবার।

কোতোয়াল সন্ন্যাসী বলছেন 'আমি একাধারে এ আশ্রমের হিসাবী, অর্থাৎ মুহুরী। আর একাধারে কোতোয়াল। বলতে পারেন ম্যানেজার' *(পৃ: ৭০, ঐ)* এ'কথা শুনে কৌতুহলী লেখকের প্রশ্ন 'আপনাদের আবার এসবও আছে নাকি?' *(পৃ: ৭১, ঐ)* সন্ন্যাসী উত্তরে বলছেন 'কী নেই বলুন। একটা প্রতিষ্ঠান চালাতে হলে যা যা দরকার, আমাদের সবই আছে। আশ্রমেরও তেমনি নিয়ম আছে বৈকি। বিশেষ, বাইরে যখন আমরা জমায়েত হই। মোহান্তের নীচে আছে পূজারী, কুঠারী, কাববারী, হিসাবী, কোতোয়াল, ভান্ডারী, পাহারাদার, তুবীবাদক। কত কি। নইলে কি মনে করছেন, এ বড় ব্যাপারটা আপনি আপনি হচ্ছে?' লেখক কালকূট ধীরে ধীরে আশ্রমের নিয়মকানুন পাঠককে পরিচিত করাচ্ছেন। শুধু সন্ন্যাসী বাইরে থেকে দেখলেই হো না, আশ্রমে থাকতে হলে তাকে সেই নিয়মের বাঁধনে ধরা দিতেই হবে। যে নিয়ম মানবে না, আশ্রমের শৃঙ্খলা ভাঙবে, অন্যায়, অপরাধ করবে, তার জন্য শাস্তি আছে। 'সবাই মিলে যে পঞ্চায়েত তৈরী হয়েছে, সেই পঞ্চাডেত বিচার করে। বিচারকর্তা মোহান্ত বলতে পারা ওখানে বড় কারুর হাত চলে না। বিচারের সাজা হয়। কতরকম সাজা আছে। জেল ফাঁসি দড়ি কেন? সন্ন্যাসীর সাজা তার চেয়েও কঠিন। সকলে বুঝবে না। সাজা মানলে ভাল। নইলে বহিষ্কার।' *(পৃ: ৭০, ঐ)* লেখক কালকূট

আশ্রমের নিয়মশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সমাজ তথা রাষ্ট্র পরিচালনার দুরূহ ব্যাপারটিকে তুলে ধরেছেন। তারই সঙ্গে বিশ্বের নিয়মকানুন মিলিয়ে দিয়েছেন সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। 'বিশ্বের নিয়মকানুন আছে। দিন হয়, রাত্রি হয়, ঋতু বদলায়, সবই সেই নিয়মের মধ্যে। মাস গেলে রোগজারটি করতে হলে, মুখে ভাত গুঁজে ছুটতে হয় না অফিসে? সকাল হলে ঝাঁপ খুলতে হয় না দোকানের? খালি অ্যালাকাড়ি বুঝি ভগবান পাওয়ার বেলায়? সেখানে আইনকানুন নেই বুঝি? ওটা হল ফোকোটিয়া, না? তা হবে না।' *(পৃ: ৭০, ঐ)*

কথোপথনের মধ্যে কতগুলো শব্দও লক্ষণীয়। স্থান বিশেষে চরিত্র অনুযায়ী শব্দচয়ন অনবদ্য। ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে যাওয়া, কোন ঘটনা বা কাহিনীর ভিতর কাহিনী বা উপকাহিনী একটানা বলে গিয়ে পাঠককে ক্লান্ত করে তোলেন নি বরং থেমে থেমে বা বিক্ষিপ্তভাবে ঘটনার ধারাবাহিকতাকে বলে পাঠকের মনে উৎসুক্য জাগিয়ে তোলা হয়েছে, এটাও কালকূটের লেখায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে উঠে এসেছে। আশ্রমের নিয়মকানুন বলতে বলতেই তিনি চলে গেছে সিদ্ধপুরুষদের কথা। তিনি সূক্ষ্মভাবে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন কোতোয়াল সন্ন্যাসীর মুখ দিয়ে। 'সিদ্ধপুরুষ? সে কজনা? এই যে দেখছেন, এতবড় কুম্ভমেলা আর দেশের তাবৎ সাধু, সন্ন্যাসী যোগী, এর মধ্যে কার সিদ্ধিলাভ হয়েছে, কে বলতে পারে। যার হয়েছে তাকে কে চিনতে পারবে? সে যে কি বেশে, কী রূপে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে বলবে?' *(পৃ: ৭০, ঐ)* মানুষের বিশ্বাসকে তিনি বলেছেন কোতোয়ালের মুখ দিয়ে 'যেখানেই থাক, এখানে তাকে আসতে হবে। মাঘ মাসের প্রয়াগ ছেড়ে তার কোথাও যাবার উপায় নেই। কিন্তু কে চিনতে পারবে। যে মোহান্তের সঙ্গে বছরের পর বছর ঘুরে বেড়াচ্ছি, হয়তো উনিই সেই মানুষ। দত্তাত্রেয়র পাদুকা-পূজারী হয়তো ছদ্মবেশে ঘুরছে আমারই সঙ্গে সঙ্গে। কে জানে? কে জানে—' *(পৃ: ৭০, ঐ)* এরকমই মানুষের বিশ্বাসের কথা তিনি নানারূপের মধ্য দিয়ে বলেছেন বারে বারে। ভোরবেলায় গৃহাবধূতের মুখেও এই বিশ্বাসের কথাই শুনেছেন। লেখকের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে মানুষের হৃদয়ের অন্তস্থলের একটি বিচিত্র আবেগ ও ভক্তি। ভক্তি ও বিশ্বাসের আবেগে চেনা মানুষই হঠাৎ অন্য মানুষরূপে ধরা দেয়। লেখক লক্ষরূপের মাঝে যে বৈচিত্র্যকে দেখতে এসেছিলেন সেটাই তুলে ধরেছেন এক আলাদা বৈশিষ্ট্যে। কেন আসে মানুষ কুম্ভমেলায়, কাহিনীর শুরুতে যে প্রশ্ন তাঁকে ছুটিয়ে এনেছে কুম্ভমেলায় সেই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে খুঁজে নিয়েছেন বহু মানুষের রূপের আরশিতে নিজেকে পরখ করতে করতে। বৈচিত্র্যের আড়ালে তিনি খুঁজেছেন মানুষের মন।

এই মন খুঁজতে খুঁজতে কুম্ভমেলার ধর্মীয় আশ্রমিক পরিবেশে সৃষ্টি করেছে রঘুনন্দন ও রুক্মিণীকে। কোতোয়াল সন্ন্যাসী পাঠককে উৎসুক্য করে তুলেছে রুক্মিণী-রঘুনন্দনের স্বর্গীয় প্রেম সম্বন্ধে। ওদের প্রেমকাহিনীও লেখক একটানা বলে যাননি, কিছুটা বলিয়েছেন কোতোয়াল সন্ন্যাসীর

মুখ দিয়ে আর কিছুটা অপর এক সন্ন্যাসীর মুখ দিয়ে। যিনি নিজে রঘুনন্দন-রুক্মিণীর প্রেমকে, প্রেমভাবকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তিনি তখন ছিলেন ওই আখড়ার কোতোয়ালজী, রঘুনন্দনের 'মহাবীর ভাই'। লেখক কালকূটকে তাবুর কোতোয়ালজী কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটা খবরটা দিলেন 'আজ বিকেলে রামজীদাসী আসছেন। কোথাও যাবেন না যেন।' *(পৃ: ৭১, ঐ)* জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনি কে?' *(পৃ: ৭১, ঐ)* 'সে কি, রামজীদাসীর কথা শোনেন নি? তিনি একজন সাধিকা। আমাদের মাইকে তো অনেকবার বলা হচ্ছে আজ সে কথা। তিনি রোজ রোজ এক-একটি আশ্রমে ঘুরে বেড়াবেন। খবর পাঠিয়েছেন, আজ এইখানে আসবেন। তিনি হিমাচল প্রদেশের মেয়ে। এলে বুঝতে পারবেন।' *(পৃ: ৭১, ঐ)* শুধু একটু আরম্ভের সূচনা। তারপর আগ্রহ সন্ধ্যা পর্যন্ত। এল যখন তখন রূপের আলোয় চারিদিক যেন ঝলকিয়ে গেল। তার আগমন বার্তা লেখকরূপী কালকূট শুনেছেন এইভাবে ''কানের কাছে শুনলাম, কে যেন ফিসফিস করে 'ওই যে, ওই রামজীদাসী আসছেন।' *(পৃ: ৭৫, ঐ)* 'রটি গেল সেই বার্তা' *(পৃ: ৭৫, ঐ)* কান থেকে কানে গেল ছড়িয়ে এসেছে রামজীদাসী, ব্রহ্মচারিণী। শুধু কানে কানে নয়, বুঝি পশিল মরমে মরমে।''

মানবীর সৌন্দর্যকে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। 'অন্তহীন গুনগুনানি বেজে চলল মনের তলে চাপা বীণার তারে। চোখের দৃষ্টি আটকেছিল নীল আকাশের গায়ে। আদিম রহস্যসন্ধানী মন বারবার দেখতে চেয়েছে, কী আছে ওই নীল আকাশের ওপারে। ভাবলাম, কল্কাচারী মনে, 'মাথার পরে খুলে গেছে ওই নীল আকাশের ওই সুনীল ঢাক্না'। *(পৃ: ৭৫, ঐ)* চোখভরা শুধু মানুষের রূপ। মানুষ নয়, মানবী, নারী। এত রূপ! দেখিনি তো কোনদিন। একি ব্রহ্মচারিণী রূপ!' সে নারীরূপের দুটার বর্ণনার সঙ্গে তিনি ইতিহাসের পথে চলে গেছেন। যে রূপের ছটায় সিংহাসন জ্বলে গেছে, ছারখার হয়ে গেছে রাজ্য, ধসে গেছে রাজধানী, প্রাণনাশ হয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রজার। বিদেশের ইতিহাসের সঙ্গে তিনি নিজ দেশের পদ্মিনীর রূপসৌন্দর্যের কথাতে। রামজীদাসীর সৌন্দর্য 'এ তো দীপ্ত দুটা দীপ্ত বরফশুভ্র কাঞ্চনজঙঘার শৃঙ্গ।' *(পৃ: ৭৫, ঐ)* লেখক কালকূটের 'হৃদয় তল ছন্দায়িত হয়ে উঠল তার নাচের ছন্দে ছন্দে।' *(পৃ: ৭৭, ঐ)* তাঁর মনে হয়েছে বালুচরের আশ্রমে নয় 'কোন নামকরা নৃত্যকুশলীর নাচ দেখতে বসেছি কোথাও। তার নাচের মাতনে সকলের চোখে মুখে ভক্তিরসের ছোঁয়া লেগেছে।

'যাকে আচোয়ান সরযূ গঙ্গাজল
তে কয়সে পিওত্ জঙ্গল জল খাড়া।।' *(পৃ: ৭৮, ঐ)*

দেহাতী ভাষায় গানে করুণ রসের তরঙ্গ বয়ে চলেছে। ''আমার পার্শ্ববর্তী সাধু বলে উঠল, 'উলারা'। জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কী?' 'এই গানের নাম বাবুজী। এদেশের ঝি-বহুড়িরা পাল-পার্বনে এই গান গায়' দেখলাম, সাধুর চোখে মুখেও ওই গাছের রসের তরঙ্গ লেগেছে।'' *(পৃ: ৭৮,*

ঐ) রামজীদাসীর নাচ দেখতে এসেছিলেন মহাবীর সাধুজী। আশ্রমের কোতোয়ালীকে খুঁজতে গিয়ে এঁর দেখা পেয়েছিলেন। লেখক একজনকে খুঁজছিলেন সেটা জেনে বললেন, 'আপনি খুঁজছেন, বাবুজী, আমি খুঁজছি। দুনিয়াভর তাঁকে খুঁজছি। জীবন কেটে গেল, তবুও পাতা মিলল না।' *(পৃ: ৭৭, ঐ)* লেখকের দৃষ্টিতে আবার সেই খোঁজার কথা অন্যভাবে ধরা পড়ল। এই সাধুজীর মুখ দিয়েই বলিয়েছেন 'সন্ন্যাসীর প্রেমকথা' কখনো শোনেন নি? এ'কথা বলার পরক্ষণেই লেখক কালকূটকে বলেছেন, 'সন্ন্যাসীর প্রেম তার ধ্যানে ও ধর্মে। ধর্মে আর কর্মে। তার প্রেম বলে, ওগো দেব, প্রাণেশ্বরী, প্রেয়সী, সন্ন্যাসীনাং সদা সেব্যং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে! তবে গোপনে। গৃহী-জগতের বাইরে।' লেখক কালকূটের পাঠকের মনে আগ্রহ জীইয়ে রেখে সাধুজীকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন "বাবুজী, সন্ন্যাসীর আছে কুলাচার। কুলাচার কী? আপনি বাঙালী। আপনাদের দেশে কুলাচারী বড় বেশী ছিল।" তন্ত্রমতে সাধনপথের গুহ্য পদ্ধতি ধীরে ধীরে সাধুজী লেখক কালকূটকে বলেছেন। সন্ন্যাসী আর অবধূতে তেমন পার্থক্য নেই। এরা অনেকে জোতমার্গের সাধন করে। ধীরে ধীরে জোতমার্গের সাধনের ক্রিয়াকাণ্ডের কথা সাধুজী বলতে থাকেন। জোতমার্গে 'যে প্রবেশ করে তাকে আর একটি ব্রত করতে হয়। তাকে বলে চৈত্র মাসে নবরাত্র ব্রত। এই ব্রতের দিন সন্ন্যাসী চক্র করে আর গুপ্ত স্থানে মিলিত হয় আওরতের সঙ্গে।এই মিলন হল সন্ন্যাসীর গুপ্ত সাধনের সিঁড়ি।' লেখক কালকূট সাধনপথের এসব গুহ্য পদ্ধতি সহজ করে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে বলেছেন। আবার সন্ন্যাসীর মুখে নিজে বলেছেন 'এর মধ্যে আছে অনেক যুক্তি, কূট বিষয়। আপনি সব বুঝবেন না বাবুজী।' *(পৃ: ৮০, ঐ)* লেখক চরিত্র কৌতুহলী অন্য বিষয়ে। জিজ্ঞেস করলেন, 'রঘুনন্দনের কী হল?' লেখকের কথার উত্তরে সন্ন্যাসী বলল, 'রঘুনন্দন আর রুক্মিণীর কথা বলব বলেই এত কথা বললাম। এমনি বললাম বুঝি তোমাকে এসব?' *(পৃ: ৮০, ঐ)*

এমনিভাবে ঘটনার পর ঘটনা, কাহিনীর মধ্যে উপকাহিনী দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী চরিত্রগুলোকে এই পার্থিব জগতের নিত্য চেনা মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন। নিত্য পরিচিত মানুষগুলোর মনোলোক তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তাঁর ক্ষুরধার দৃষ্টি দিয়ে সেই মানসিক দিকগুলো তুলে ধরেছেন। যেন তুলে ধরেছেন রঘুনন্দন-রুক্মিণীর স্বর্গীয় প্রেম-কাহিনী। তাদের মানসিক দিকগুলো ছোট ছোট মুহূর্ত। রুক্মিণী প্রেম মুগ্ধতাকে লেখক দেখলেন এইভাবে 'রঘুনন্দনকে দেখে রুক্মিণী নির্বাক, নিথর। চোখে তার আলোর শিখা। তার লজ্জা হল না, জোড় হাতে দাঁড়িয়ে রইল সে।' *(পৃ: ৮১, ঐ)* আর রুক্মিণীর নমস্কার গ্রহণ করে 'নারায়ানো, বেঁচে থাক' বললো বটে কিন্তু সাধুজী বলল 'বাবুজী রঘুনন্দনের চোখে দেখলাম তেমনি আলো। সন্ন্যাসীর মুগ্ধতা! সে তো ভান কথা নয়, কিন্তু দু'জনেই কী সুন্দর! আমি জ্ঞানী নই, সাধনা নেই আমার। তবু আমার মনে হল, আমার সামনে স্বয়ং হরগৌরী রয়েছে দাঁড়িয়ে।"

নবরাত্রের শেষদিনে তারা নবরাত্র ব্রত করেছিল। এই ব্রতের পর তৃতীয় দিনে সাধুজীর সঙ্গে রঘুনন্দনের দেখা হতে 'ওঁ নমো নারায়ণ' বলাতে সন্ন্যাসীর মত জবাব দিয়ে সাধুজী হাত ধরে বলল 'মহাবীর ভাই'। অন্য মানুষ সে, উদাসীন স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি। সাধুজীকে আরও বলল, 'বুকের রস না হলে মাথায় ফুল ফোটে না। মাথায় সেই ফুলের নাম হল জ্ঞান। শিকড় তার হৃদয়ে। সে হৃদয় আমার অন্ধ ছিল। সে অন্ধ চোখ মেলেছে। যখন প্রাণ মানে না তখন আপনি পূজা করতে হয়।' লেখক কালকূট রঘুনন্দন-রুক্মিণীর প্রেমকে এমনি মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। যা কাহিনীর অমূল্য সম্পদ। রঘুনন্দনের কথা 'মনো ব্রহ্মেতি ব্যাজানাং' শুনে লেখক কালকূট বলছেন 'সন্ন্যাসী রঘুনন্দেনের কথা তো দেখেছি বাউলের গান হয়ে উঠেছে। এ যে সহজিয়া বাউলের কথা। যেন উঁকি দিচ্ছে বলরাম।' *(পৃ: ৮৩, ঐ)* সাধুজীর কাছে রঘুনন্দন-রুক্মিণীর এই প্রেমকাহিনী শুনে মনে হয়েছে 'যেন কোন অতীত অধ্যায়ের পাতা মেলে দিল আমার সামনে। যে রক্তমাংসের উচ্চ-নীচ মানুষ নিয়ে আমাদের কারবার, এ কাহিনীর নায়ক-নায়িকারা সে আওতার বাইরে। বেদাশ্রিত সন্ন্যাসীর প্রেম — সে-ই তো বিচিত্র। অথচ চোখে দেখে এসেছি রামজীদাসীকে। অধ্যাত্মবাদ না বুঝি, রঘুনন্দনের সঙ্গে রুক্মিণীর প্রেম অনুমান করতে পারি। যে প্রেম তাকে ঘরছাড়া করেছিল। ঘর-ই তো।' *(পৃ: ৮৪, ঐ)*

লেখক পুরো কাহিনী জুড়ে একটি স্বপ্নিল আবেশ করেছেন তার ভাষার শৈল্পিক সৌন্দর্যে। বহুরূপী ভারতের এও একরূপকে লেখক এমনিভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। আর যে সাধুজী এই কাহিনীর গল্পকার তিনি নিজেও ঘর-ছাড়া অর্থাৎ আখড়াছাড়া হয়ে গেলেন। সাধুজী চাপা গলায় লেখক কালকূটকে জানিয়েছিলেন 'সে যে আমাকে পাখির গান শুনিয়ে গেল, সে যে আমাকে এক পাগল প্রেমের পথ দেখিয়ে গেল, সেই হল আমার কাল। বাবুজী আমি আর সন্ন্যাসী নই।' *(পৃ: ৮৪, ঐ)* ঘরে ফেরা তার হয়নি। 'সেই সহজ' আর 'সেই অসীম' কে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে বুকের রসে মাথার ফুল ফোটানোর জন্য। রামজীদাসীর নাচের আসর ভেঙে যাওয়ার পর একাকী লেখক কালকূট বিস্তীর্ণ বালুচর দিয়ে চলতে শুরু করেছেন। চাঁদের আলোয় চারিদিক কুহেলিকাময়। হালকা কুয়াশায় ঢেকে গেছে চারিদিক। আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে সবাই চলেছে যার যার তাবুকোটরের দিকে। লেখক কালকূট কীভাবে মায়া ছড়িয়ে বাস্তবকে এনেছেন তার লেখায় 'আকাশে চাঁদ এসেছে প্রায় মাঝামাঝি। মেঘ ভেসে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। আকাশের কোন সীমানায় গর্জন করছে অদৃশ্য উড়োজাহাজ। সপাং করে চাবুকের শব্দ শুনে চম্‌কে উঠলাম। বালুচরে ঢুকেছে টাঙ্গা, চাকা বসে গেছে। ঘোড়া দৌড়তে পারছে না। যাত্রী ও যাত্রিণীরা সকলেই ঘুমে ঢুলুঢুলু।' *(পৃ: ৮৫, ঐ)* কল্পলোক থেকে বাস্তবের সম্মুখীন। শুনলেন ঘুম জড়ানো কণ্ঠে যাত্রী কথা 'ক্যায়া, বিমারীবালা ঘোড়া লে আয়া? ভাড়া ঠিক নাহি মিলেগী।' টাঙ্গাওয়ালার উত্তর 'হ্যাঁ, কুম্ভমেলায় ভগবান খালি

তোমাদেরই ঘাড়ে চেপে রয়েছে। আমি শালা খালি হাতে ফিরব ফিরে যাব?' লেখক কালকূট চরিত্র এক'থা শুনে হাসতে পারেন নি। তিনি তার মর্মধ্বনি শুনতে পেয়েছেন 'সত্যি, পুণ্যসঞ্চয় তো নয়, যেন সওদাগর এসেছে স্বর্ণরেণুর সন্ধানে।' *(পৃ: ৮৫, ঐ)*

রূপের হাটে এও এক রূপ লেখকের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। এরপরে আর এক রূপের সম্মুখীন। 'কুহকী চাঁদের আলোয় লেখক চরিত্রর মনে হল এক ষড়যন্ত্রীর মুখ যেন ভেসে উঠে তাকে যেন কী একটা বলছে। লেখক জানতে চাইলেন যে তিনি কী বলছেন? ''লোকটি অদ্ভুদ ভঙ্গি তে তেমনি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কিছু মিলল?' কি মিলবে, কিছুই বুঝতে পারলাম না। বরং খানিকটা ঘাবড়েই গেলাম। বললাম, 'কিসের কি মিলবে বুঝতে, পারছি না তো।' লোকটি বলল, 'কেন, এই যে দু-ঘণ্টা ধরে সাধুজীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। ফিসফিস করে কী বলছিলেন সাধুজী। হুঁ, হুঁ, বাবুজী, সব দেখেছি। আপনার কপাল ভাল। তাই ওরকম পেয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজ, একটু বলে যান, কী পেলেন থোড়া বহুত।' আশ্চর্য! হাসব কি কাঁদব, বুঝতে পারলাম না। বিচিত্র এই লক্ষ মানুষের মেলা!''

সেই একই প্রশ্ন? মানুষ কেন আসে এই কুম্ভমেলায়। তার অমৃতের কুম্ভ এমনিভাবেই পূর্ণ হতে থাকে বহু চরিত্ররূপী মানুষের মধ্য দিয়ে। লেখক আশ্রমের তাবুতে তাড়াতাড়ি ফিরতে চেয়েছিলেন রামজীদাসী সরোজ বাদককে। 'যে সব ছেড়ে, সরোদের বুকে সুর সাজিয়ে ফিরছে রামজীদাসী সঙ্গে সঙ্গে। যার সরোদের ঝঙ্কার বিনা রাজীদাসীর সুঠাম পা আসে না নাচের জোয়ার।' *(পৃ: ৮৪, ঐ)* লেখক কালকূটের মনের তারে সুর কেটে দেয় ঐ লোকটি। লেখক যে মহাবীর সাধুজীর সঙ্গে কথার ফাঁকে ঐ লোকটি নজরবন্দী হয়ে পড়েছিলেন। লোকটি লাখপতি হওয়ার স্বপ্নে সাধুর পেছনে পেছনে ছুটছে। মেলায় ঢোকার আগে এক মস্তবড় পাথরের দোকানের মালিক আগে ভিক্ষা করে খেত। একদিন এক সাধুর পেছনে ঘুরে শহরে ছোট একটি পাতার খুপরি করে ছোট ছোট কাটা পাথরের শিবলিঙ্গ, মহাদেব, বিষ্ণুমূর্তি নিয়ে দোকান খুলে বসে। ক'বছরেই সে লাখপতি হয়ে যায়। অতএব তারও সেইরকম সাধুসঙ্গ চাই। সিঁড়ি খুঁজছে মোক্ষলাভের। হঠাৎ সামনে মাথাজটা, গলায় একরাশ মালা ঝোলানো উলঙ্গ সাধুকে দেখে সেই লোকটির মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। চলমান নরনারী তার 'চলে-যাওয়া পদচিহ্নের ভেজা বালু নিয়ে মাথায় দিয়ে দিচ্ছে মাথায়।' *(পৃ: ৮৬, ঐ)* লোকটি তার শাল কোমরে বেঁধে চাপা গলায় ফিসফিস করে 'পেয়েছি পেয়েছি' বলে 'পা টিপে টিপে অনুসরণ করল দিগম্বর মূর্তিকে। ছায়ার মত চলল তার পিছে পিছে। যেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, শিকারী চলেছে শিকারের কাছে।' লেখক বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা, মানুষের ধর্মবোধ, সুখ-দুঃখ বোধ সব একাকার করে দিয়েছেন। 'লক্ষ লক্ষ কামনা বাসনা ও প্রবৃত্তি সকলেই পাগলের মত ছুটে চলেছে ইপ্সিত বস্তুর পেছনে।' *(পৃ: ৮৬, ঐ)* লেখক কালকূট

তার হতাশাবোধ ও দুরন্ত আশা দুটোই তুলে ধরেছেন। সে ছুটে চলেছে। 'ছুটবেও ওই ভয়ঙ্করী সুন্দরী মরীচিকার পেছনে।' *(পৃ: ৮৬, ঐ)* জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে মরীচিকার পেছনে ছুটবে। যেমন সেতার বাদকও ছুটছে হয়তো এমনি কোন লাখ টাকার মরীচিকার পেছনে। লেখকের একটার পর একটা চরিত্র সৃষ্টি করে মালার মতো গেঁথে তাঁর কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মায়াবী জ্যোৎস্নারাতের মতই মায়াবী কামনা-বাসনাকে চিত্রিত করেছেন এক অপূর্ব শৈল্পিক মহিমায়।

এইভাবেই এক শৈল্পিক সৌন্দর্য্যে সৃষ্টি করেছেন ডক্টর পাঁচুগোপাল রায়কে। সন্তানস্নেহে বুভুক্ষু পাগলপারা এক মানুষ। রগচটা, খামখেয়ালী মানুষ। প্রাণের থেকে প্রিয় মেয়ে শিউলি হঠাৎই একদিন উধাও হয়ে যায় পাড়ারই একটি ছেলের সঙ্গে। মেয়ে হারানোর বেদনাকে লেখক কীভাবে তুলে ধরেছেন সেটা দেখা যাব। "বললাম, 'পাঁচুগোপালবাবু, আপনার মেয়ে কোথায়?' বলল, 'তা জানলে কি আর ভাবনা ছিল? ভাবি, এ কেমন যাওয়া? একটু কি খোঁজ দিতে নেই? দশ বছর বাইরে ঘুরে এসেও খোঁজ পাই নি।' তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।" পিতৃহৃদয়ের যন্ত্রণাবোধ পাঠকহৃদয়ে অনুরণিত। তিনি অল্পবয়সের সুন্দর ছেলেমেয়েদের ভালোবাসেন। কিন্তু প্রতিমুহূর্তে পদস্খলনের ভয়ে তিনি শঙ্কিত। ভালোবাসার আড়ালে, স্নেহের আড়ালে যদি ওই অল্পবয়সের ছেলেমেয়েরা তারই মেয়ে শিউলির মত ভুল করে হারিয়ে যায় পিতার জীবন থেকে। তাই তো লেখকরূপী কালকূটের ওপর তিনি ক্ষিপ্ত হয়েছেন। এটাই তো স্বাভাবিক। অচেনা একটা ছেলে দিদিমার স্নেহচ্ছায়ায় স্থান পেয়ে তাকে আশ্রয়, খাদ্য থেকে বঞ্চিত করে দিল। রাতের আঁধারে একটা অচেনা ছেলে কেন বেরিয়ে যাবে তাবু থেকে সেটা দেখতেই কম্বল মুড়ি দিয়ে পিছু নিয়েছেন শিকারীর মত। লেখক কালকূট অনুভব করেছেন গুপ্ত আততায়ীর মত কেউ আসছে তার পিছু পিছু। দেখা হতেই মানসিক ধারণা 'পাঁচবদ্যি তো নয়, ফ্রাঙ্কেনস্টাইন বইয়ের দৈত্য। কিন্তু কেন, কী করেছি, কারোর বাড়া ভাতে তো ছাই দিই নি। তবে এমন বাঘের পেছনে ফেউয়ের মত লেগে রয়েছে কেন সে?'

লেখক কালকূটের মনোলোক দেখতে পায় পাঠক। পরিবেশটা একটা ভয় মেশানো 'ডানা মেলে উড়ে এলাম পায়রাটির মত। বললাম 'কোথায় চললেন?' ডাক্তার এক পর্দা চড়াল, 'যেখানেই চলি, তোমাকে চোখে চোখে রাখছি ঠিক। হ্যাঁ' আমিও একটু উষ্মাতেই বললাম, 'কেন বলুন তো?' 'আমার খুশি।' বলে ডাক্তার বুক চাপড়াতেই গাদাখানেক ধুলো ঝরে পড়ল তার কম্বল থেকে।" দু'জনের অনায়াস বাচনভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গি, মেজাজ সব পাঠকের চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে ওঠে। দু'জনের কথোপকথন লক্ষ্য করলে আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। কৌতুহলী লোক জমায়েত হয়েছে। লেখক বুঝতে পারছেন না এমন খ্যাপামির কী কারণ? তিনি

ভাবছেন 'হায় রে, এ কোন অমৃতকুম্ভের সন্ধানে ছুটে এলাম।' *(পৃ: ৬৩, ঐ)* তিনি পরিস্থিতি অনুমান করে বললেন ''বললাম, ডাক্তার নয়, ধন্বন্তরিই। কী দেখবেন, দেখুন। অত চেঁচাচ্ছেন কেন?' 'আলবাত চেঁচাব।' বাংলায় যাকে বলে তড়পানি, ডাক্তার সেরকম শুরু করল। তারপর যা হয়। একজন সাধুবেশী মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল ডাক্তারকেই, 'ক্যায়া হুয়া বাবা'? যা বলো সবই আগুনে ঘি। সাধুকেই তেড়ে গেল, 'যো হুয়া সো হুয়া তুম্‌কো কেয়া? তুম্ আপনা রাস্তা দেখো।' সাধুর বৈরাগ্যের মিষ্টি হাসি উধাও। বেচারা মুখ গোমড়া করে চুপ করে গেল।''

লেখক কালকূট, ডাক্তারবাবু ও সাধু তিনজনের মুখের ভাষা, মানসিকতা, পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী একেবারে বাস্তবের আঙিনা থেকে উঠে এসেছে, কাহিনীর চবিত্রের কথাবার্তা বলে মনে হয়নি। কোথায় যে আগুন লেগেছে লেখক বুঝতে পারছেন না, কিন্তু পাঠক বুঝতে পারছেন। লেখক কালকূট কেমন গলা চড়িয়ে ঝগড়া করছেন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। ডাক্তারবাবু তাঁকে বাপের বয়সী বলাতে লেখক চরিত্ররূপী কালকূটের মেজাজটা ধরেছেন লেখক কালকূট। ''বললাম, 'তা তো দেখছিই। তা আমাকে কেন? বাপের বয়সী আছেন, ঘরে গিয়ে নিজের ছেলেকে শাসন করুন।' 'কেন আমার কি ছেলেমেয়ে থাকতে নেই?' কথার কি অদ্ভুত অসঙ্গতি। 'একশোটা'? 'না হয় দুশোটাই?' তার মানে আমার কিছু নেই? আমাকে আঁটকুড়ো বললি তুই?' একেবারে 'তুই'। ট্রেনের ভিড়ে একবার মোষের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম বিপদে পড়ে। এও প্রায় তেমনি বিপদ। উদ্ধার পেতে হলে পালটা রূপ ধরতে হবে।'' এমনি করেই লেখক কালকূট চরিত্রগুলো চিত্রায়ন করেছেন, যা মনে হয় বাস্তবের মাটি থেকে উঠে এসেছে। কোথায় আগুন লেগেছে ডাক্তারবাবুর ধীরে ধীরে সেই আগুনের তাপটা পাঠক হৃদয় পেতে শুরু করেছে। এমনি করে পাঁচুগোপালের খ্যাপামি, অন্তর্বেদনাকে প্রকাশ করেছেন। শেষে পাঁচুগোপাল ডাক্তারকে কোমল হৃদয়ের ফুলের পাপড়ি খোলার মত প্রকাশ করেছে। পিতার বেদনাকে এক অনুপম শিল্প সুষমায় সর্বকালীন করেছেন। আবার এই ডাক্তারবাবু আর একটা দিকের ভাষা লক্ষ্য করা যাক্। লেখক চরিত্রর কাছে চাইছেন 'দেও তো, দু-আনা পয়সা দেও, একটু নেশা করি।' মনের আগুন নিভে গিয়েছে জলসিঞ্চনে। এখন অন্য মেজাজে প্রহ্লাদের সঙ্গে তাবুতে দেখা হতেই প্রহ্লাদ ছুটে বলল, 'ও বাবা, তোমরা বেড়ে বেড়ে ডুবে ডুবে জল খাও, শিবের বাবাও টের পায় না। আর আমি শালা মুখ ঢোকাচ্ছি তখন থেকে। খুব তুমি যা হোক ডাক্তার খুড়ো। পাঁচুগোপালের ভাষা একটু লক্ষ্য করা যাক। ''পাঁচুগোপাল ধমকে উঠল, 'মাকড়া কোথাকার কাকে কী বলছিস। ছেলেটা আমাকে দু-আনা দিল, তাই দিয়েই তো' — বলে পাঁচুগোপাল মুঠো খুলে দেখিয়ে দিল পরমবস্তুটি। প্রহ্লাদ আনন্দে পেল্লাদ হয়ে উঠল। বলল, 'মাইরি। ওর চলে না বুঝি? তাই বল। আমি যে এদিকে হেঁপ্সে মরছি কাকা তোমার জন্যে।' বলতে না বলতেই প্রহ্লাদ কয়েক আনা পয়সা তুলে দিল

পাঁচুগোপালের হাতে।"

কী বাস্তববোধ থেকে উঠে এসেছে চরিত্র দুটোর কথা, কথার ভাষা, উচ্ছ্বাস সবই। পাঠকের হৃদয় ভরে যায় দু'জনের কথায়, সকালের গ্লানি দুঃখবোধ দূর হয়ে যায় নেশাখোরদের আনন্দপূর্ণ উচ্ছ্বাসে। তার সঙ্গে নেশাখোরদের আরও একটি দিক সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। বিনা পয়সায় নেশার বস্তুটি ডাক্তার খুড়ো দিতে চায়নি ভাইপো পেল্লাদকে। এমনি করেই টুকরো টুকরো চিত্র দিয়ে কাহিনীকে বেঁছেন। পেল্লাদের বালিকা বধূর সঙ্গে লেখক কালকূটের সখ্যতা হয়েছিল। নিতান্ত বালিকাবধূ লেখককে কালকূটকে দেখে ঝাঁঝমিশ্রিত বালিকা কণ্ঠে বলে উঠল 'কোথায় যাওয়া হয়েছিল? দিমা আসুক, দেখাবে 'খনি'। বালিকা হলেও বালিকা নয় মনে। রীতি শাসন করে দিল লেখকরূপী কালকূট। অথচ তিনি তাঁকে লজ্জাবতী বালিকা বলে মনে করেছিলেন। এমন ধরনের মুখঝামটায় শুরু নয়। লেখকের কালিতে চিত্রিত হয়েছে বালিকা বধূর আরও বিচিত্র রূপ। তীর্থক্ষেত্রে তেলসাবান মাখা বারণ। কিন্তু বালিকা বধূ ব্রজবালা চুপি চুপি তেলের শিশি এনে দিল। লেখক চরিত্রের প্রশ্ন 'তেল দিলে কে? দিদিমা?' (পৃ: ৭২, ঐ) চাপা গলায় তার উত্তর না। আমিই এনেছি। চটপট নাও। নইলে দিমা আমার মুন্ডুপাত করবে।' (পৃ: ৭২, ঐ) পেল্লাদের পরিবারের সেই রূপটি কাহিনীতে উঠে এসেছে এইভাবে 'লুকিয়ে তেল এনেছে! এতখানি সুবুদ্ধি তার হয়েছে। প্রহ্লাদের পরিবার দেখছি শুধু কাঁচা নয়, হৃদয়টি তার রীতিমত কাঁচামিঠের স্বাদে অপূর্ব। এরপর বালিকা বলে অবজ্ঞা করব, তেমন সাহস আমার নেই।' এইরূপের পাশেই আবার আর এক রূপ। দিদিমা কি করছে জানতে চাওয়ায় বলল, 'কী আবার করবে, রান্না করছে। তোমাদের মত তো নয় যে, খালি টো-টো করে বেড়াবে।' ভাষার সৌন্দর্যে বালগিন্নীর মেজাজটি ধরা পড়েছে। লেখককে খোটা দিয়ে পরোক্ষে নিজের গঞ্জিকাসেবী স্বামীর কথা তুলেছে। নাম জানতে চাওয়ায় চোখে ভ্রুকুটি ভাবটি এমন যে বউ মানুষের আবার নামের দরকার। বলল 'কী আবার, ছিরিমেতি বেরজোবালা দেবী।' তার মুখে কথায় যে এমন উচ্চারণটিই মানায়। সেই আবার হিদের মাকে ও সর্ব্বনাশী ভিখারিনীকে পয়সা দিয়েছে বলে ক্রুদ্ধচাউনিতে লেখক চরিত্রকে পুড়িয়ে দিতে চেয়েছে। আবার সর্বনাশী সুন্দরী মেয়ে চোর সম্পর্কে দিদিমার কথা বিশ্বাস করে। 'দিমা বলেছে, ওরা নাকি ছেলেও চুরি করে।' স্বামীর কথাও বিশ্বাস করে। তোমার দাদা বলছিল, ওকেও নাকি চুরি করে নিয়ে যেতে পারে?'

লেখক কালকূট কথার সঙ্গে কথা জুড়ে চরিত্রটিকে পাঠকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন বাংলার চিরকালের এক মেয়েকে, 'সে মেয়েটি কিন্তু এরই মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে ব্রজবালার মধ্যে। ফুলফলহীন সকলকে লাউডগাটির মত।' আবার লেখক কালকূট মানবী প্রকৃতি একাকার করে দিয়েছেন। সংসারের ফুল-ফল চাপা আছে ওই চরিত্রের মধ্যে। যে সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে

সংসার জীবন সংগ্রাম। ব্যামোয় ভোগা আর নেশাভাঙ করা স্বামীর মঙ্গল কামনায় তিপুন্নিতে সে নাইতে এসেছে। সেই স্বামী তো পুরুষ মানুষ। বেচাল হতেই পারে। লেখকের এই কথা সে তাঁর ক্রুদ্ধ রূপের স্ফুরণ ঘটেছে। ফণা তোলা ফণিনীর মতো নিজেকে মেলে ধরেছিল। দু'চোখে জলের ধারা গলায় চাপা আওয়াজ 'যেখানে মন চায়, চোখ যায়, চলে যাব সেখানে। ঠিক হ্যাঁ।' বালিকা বধূ ব্রজবালার ছোট্ট হৃদয়ে ফুটে উঠেছে ভালবাসার পদ্ম। 'ওই প্রহ্লাদ প্রাণেশ্বর হয়েছে ব্রজর। তাই এত রাগ, এত ব্যথা, এত কান্না।' লেখকের সান্ত্বনা 'তোমার মত বউকে কে ঠকাতে পারে?' সেই প্রকাশে চিত্রিত হয়েছে শিল্প সুষমায় 'অমনি হাওয়া এল, মেঘ গেল। আকাশ নীল ঝকঝকে। ব্রজর আলোকিত মুখে মিটিমিটি হাসি। লজ্জা পেয়েছে একটু একটু।' গঠন শৈলীও এক নতুন ধরনের। লক্ষরূপের হাটে যা দেখেছেন তাই তুলে ধরেছেন, তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তার সূক্ষ্মঅর্ন্তদৃষ্টি। কোথাও কোথাও অদ্ভুত হেঁয়ালিও আছে। প্রসঙ্গান্তরে গিয়েছেন অন্য এক ধরনের শিল্প চেতনায়। যেমন ব্রজবালার দিমা চেঁচাচ্ছে 'এই তো এখানেই ছিল শিশিটা। কি চোরের জায়গা বাপু। এরকম হলে তো গায়ের কাকড়ও চুরি করে নেবে কখন।' এই শুনে লেখকের ভাবান্তর 'তা কি করে সম্ভব! সে কাজটি তো একজনই পারত। গোপিনীদের বস্ত্রহরণ করা যার অভ্যাস ছিল।' কোন কথার সঙ্গে কোথায় ঐ ছোট্ট কথাটির ব্যাপকতা দেখিয়েছেন। পাঠককে ভাবতে স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাঁদেরও ভাবনা মনপবসন বয়ে চলে অনেকদূর। এই মনপবনে ভাসিয়ে তিনি পাঠককে নিয়ে যায় তার শিশুকালে। দিদিমার দেওয়া চিঁড়ে-মুড়কি চিবিয়ে তারও বিছিয়ে দেওয়া বিছানায় শুয়ে আধো তন্দ্রা আধো জাগরণের মধ্যে ''আমার কানে এক ভাঙা-ভাঙা অর্ধস্ফুট একটি গলার গুঞ্জন—

'শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন
যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন।'

দিদিমার গলা। বোধহয় তন্দ্রাচ্ছন্ন গলা। আমার কানের শিরাগুলি চকিত মুহূর্তে একেবারে জেগে উঠল। তারপরে কানের পর্দা থেকে একটা বিচিত্র শিহরণ আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত করে তুলল।'' শিশুদের ঘুমের মায়ায় যে গানের সুর জড়িয়ে থাকে সেই সুরে পাঠক হৃদয়কে উদ্বেলিত করে মাতা-শিশুর চিরন্তন সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে দিদিমা লেখকরূপী কালকূটকে জড়িয়ে দিয়েছেন। লেখকের লেখার বৈশিষ্ট্য এখানেই। তিনি নিজেই খেলার যাত্রী নন, নিজেই দেখছেন না মানবহৃদয়কে পাঠককে মনপবনে সঙ্গী করেছেন।

প্রসঙ্গান্তরে গেছেন নানাভাবে। রামজীদাসী আশ্রমে এসেছেন। দূর থেকেই লেখক তাকে দেখছেন। আশ্রমের কোতোয়ালজী তাঁর দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে রইল। লেখক সঙ্গে াপনে একটা ভাবনা পাঠক হৃদয়ে পৌঁছেছেন। 'জানিনে ভুল দেখলাম কিনা। কিংবা চাঁদের এই

কুহকী আলোরই এমনি কারসাজি। কোতোয়ালের সারা মুখে একটি বিচিত্র ভাবান্তর খেলে গেল। সে ভাবান্তরে গভীর ও থমথমে হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, 'তাই দেখ হয়তো দূর থেকে ভাল দেখা যায়।' এ'কথা বলেই উনি হাঁটতে শুরু করলেন। কোথায় যাচ্ছেন একথার উত্তরে বললেন 'সেই সর্বনাশী ঘুরছে আশেপাশে। দু'বার সে চেষ্টা করেছে আশ্রমে ঢোকবার ঢুকতে পারে নি। দেখি কোথায় গেল! বেড়া ভেঙে ঢুকলে আর রক্ষে নেই। কার সর্বনাশ হয়ে যাবে।" লেখক চরিত্ররূপী কালকূট জানতে চাইলেন কোন্ সর্বনাশী কথা বলছেন? কে সর্বনাশী?' কোতয়ালের উত্তর ছিল 'জানেন না, খবর রাখেন না দেখছি। নারী চোরবাহিনীর সে সেরা মেয়ে। সে তো সবসময়েই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সাংঘাতিক মেয়ে মানুষ। পুলিশে ধরে নিয়ে গেলেও যে কি করে বার বার ছাড়া পেয়ে যায় সেটাই আশ্চর্য।' তার কথা লক্ষ্য করে তিনি দেখতে পেলেন 'ভিড়ে মাঝে ডুব দিয়ে হঠাৎ জেগে উঠছে একটি মূর্তি। মেয়েমানুষ নিঃসন্দেহে। ছোটার বেগে আঁচল উঠছে তার।' রামজীদাসী প্রসঙ্গ থেকে চোর বাহিনীর সেরা মেয়ের প্রসঙ্গ। চাঁদনী রাতের আলোতে অদ্ভুদ এক মায়াময় পরিবেশ যায় পাঠককে অন্য কাল্পনিক জগতে নিয়ে যায়, তাঁদের ভাবনাতে দোলা জাগায় 'কে সর্বনাশী'। অদ্ভুদ এক নস্টালজিক পরিবেশ।

পূর্ণিমায় স্নানের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্গমে জমায়েত হয়েছে। লেখক কালকূটও সেই প্রবহমান মানব স্রোতে গা ভাসিয়েছেন। সেখানে বহুরূপকে দেখার ভিন্ন চিত্ররূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর আশ্চর্য যাদুকরী লেখনীর তুলিতে। সঙ্গমের বুকে যাওয়ার জন্য মাঝি হাঁকছে 'সঙ্গ মে নাইবে এসো, দু-আনা, দু-আনা'। ক্ষিপ্ত মোষের মত মানুষে মানুষে ঠেলাঠেলি। এক বুড়ো মহারাজ মহারাজ বলে জলের কাছে কালকূটকে টেনে নিয়ে স্নান করে খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে ফোকলা দাঁতে বলল 'জীতা রহো বাবা। পানিমে বহুত ডর, সাঁতার নহি জানতা।' শিবপিয়ানী তার জা সহ কয়েকমাসের শিশুকে নিয়ে এসেছে স্নান করাতে। হাসিতে কাঁপুনিতে স্নানের কোলাহলে মাতোয়ারা সকলের মধ্যেও এরা দু'জনে ব্যতিক্রমী। একজন আর একজনের বুকের উপর মুখ রেখে চোখের জল ফেলছেন। সঙ্গমে স্নানের চিত্রকথা আঁকতে আঁকতে যমুনা গঙ্গার সাদা-নীল দুইধারার রূপচিত্র এঁকেছেন। কেমন স্থানিক চিত্র বর্ণনা সেটা দেখা যাক্ একজন রাগে অনুরাগে, যুগান্তরের বিরহের বেদনার রঙে নীল। আর একজন সব পাওয়ার আনন্দের বৈরাগ্য উদাসীন গৈরিক বসনা। একজন হাসে খিলখিল করে, আর একজন খলখল হাসিতে উন্মাদিনী। তবুও দু'জনে পাশাপাশি, একই প্রেমের টানে তারা দিগন্তে চলেছে ছুটে। সরস্বতী কোথায়? শুনেছি তিনি গুপ্ত আছেন।' লেখকরূপী কালকূট শুনতে পেয়েছেন কাঁদিস নে শিবপিয়ানী, বোন আমার কাঁদিস না।' লেখক কালকূট প্রাকৃতিক ধারা, যমুনা-গঙ্গা মানবিক ধারা একই সঙ্গে বইয়ে দিয়েছেন। কাহিনীর আলোচনায় ঐ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাঁদের দুঃখবোধকে। কোন আশা নিয়ে এসেছে এই

সঙ্গমে স্নান করতে। দুঃখ বেদনায় নীল শিবপিয়ানীর সঙ্গিনী জা বলেছিল ওর বাবা নেই, ওকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে, না চান করলে চলবে কেন?' দুঃখবোধ ও কামনা, সন্তানের পরমায়ুর জন্য এই সঙ্গমে স্নান, সন্তানের সুখেই ওর সুখ। তাইতো এই বিড়ম্বিত জীবনে দুঃখের মধ্যেও সন্তানের মুখের হাসিতে তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। নৌকা থেকে নেমে ন্যাড়া মাথার ভিড়। তার মধ্যে খনপিসী, প্রহ্লাদ ও দিদিমাও আছে। লেখকরূপী কালকূটকে দেখেই প্রহ্লাদ তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলে উঠল 'এই যে দাদা, বেশ হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন। মাথা মুড়োবেন না? লেখক না বলাতে আবার বলল, 'কেন, পাপ করেন নি? 'করেছেন নিশ্চয়ই, মুখ দেখেই মনে হচ্ছে। জানেন না।' প্রহ্লাদের চরিত্র অনুযায়ী, স্বভাব অনুযায়ী তাদের মুখের কথাগুলো যথার্থ। এমন কথা তার মুখেই মানায়। তাইতো সে আবার বলে 'মুড়িয়ে নিন, তারপরে আবার পাপ করবেন, কিছু হবে না, আগের পাপটা তো কাটান।' লেখক কালকূট প্রহ্লাদের মুখ দিয়ে এই কথা বলিয়ে পরক্ষণেই খনপিসীর মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন 'ছি, ছি ছি কি অনাচ্ছিষ্টির কথা। সঙ্গমে দাঁড়িয়েও মুখের রাখ-ঢাক নেই।' প্রহ্লাদও পাল্টা উত্তর দিতে ছাড়ে না 'আর রাখ-ঢাক। শালা এখনো সকাল থেকে দু-হাত এক হল না, সঙ্গম দেখাচ্ছে।'

লেখকের কালকূটের লেখাতে এই বৈশিষ্ট্যই বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস, ধর্মবোধ তিনি আঘাত করেন নি, কিন্তু কাহিনীর চরিত্রের মুখ দিয়ে তার নিজস্ব ধারণা বলিয়ে নিয়েছেন সুকৌশলে। চরিত্রগুলোর বক্তব্যে পাঠক চিত্তেও দোলা লাগে।

এই কাহিনীর বলরাম-লক্ষ্মী ও শ্যামা এই চরিত্রগুলোকে নিয়ে একটি বৃত্ত হয়েছে। বলরাম শ্যামা ও লেখক চরিত্রর যোগাযোগকারী হয়েছে। বলরাম বিহনে শ্যামা চরিত্র পূর্ণতা পায় না। বলরাম সঙ্গে লেখকের মেলার মধ্যে আবার দেখা হয়ে যায়। বিরল নৌকা ও স্নানার্থীহীন যমুনার দিকে আবার যাওয়ার সময় পা চেপে ধরেছিল লেখকের। আনন্দে উদাত্ত গলায় গান গেয়ে উঠেছিল। লোকজন জমে যাওয়াতে লেখক কালকূট বলেছিলেন যে লোক জমে গিয়েছে। বলরাম বলল 'বেশ তবে চলেন, কোথায় চইলছিলেন। কিন্তু ঠাকুর! ছেইড়ে দেব না।' লেখক বললেন যে যমুনার ধারে। যমুনার ধারে গিয়ে হেসে বলল 'বসইতে হবে কিন্তুন'। আর গামছা পেতে দিতে বলল 'ওই গামছা আমার মনে হিদয় কইরে দিলাম, বইসতে হইবে।' শেষে অভিমানে লেখককে বলল যে, 'লক্ষ লক্ষ গলা পাইছেন, তাই বুঝি আমারে ভুলছেন?' এমনি করে কথা দিয়ে গান দিয়ে বলরামের অনবদ্য চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যে চরিত্রে পাঠকের মনে বিশেষ ছাপ ফেলেছে। বলরাম মূল গায়েন, গানই তার জীবন, মুখের কথাতে গানই আগে ভেসে আসে। কালকূট গুরু করেছেন কিনা এ'কথা বলার পরে তার মনের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যাক্—

'গুরু বইলে ক্যারে পরনাম করিব মন।

তোর ভিতরে গুরু, বাইরে গুরু,

গুরু অগণন।' *(পৃ: ১১৯, ঐ)*

এরপর প্রেমময় ভাব প্রকাশ

'সখি গো! এবার গুরু বলে রাখি মাথা

তোমার চরণে,

পেমরীতি বুঝাইলে তুমি অবোধ

জীবনে।' *(পৃ: ১২০, ঐ)*

তার গুরুকে এই প্রশ্নের উত্তরে বলরাম বলে 'যে নিজে কেন্দে আমাকে কান্দায়।' *(পৃ: ১২০, ঐ)* এ'কথা বলেই সে চোখ মোছে। এই যে বলরামের গানে গানে অভিব্যক্তি, কোমল মনের প্রকাশ লেখক কালকূট অনবদ্য ভাষা মাধুর্যে তুলে ধরেছেন। এই কথার প্রতিফলন তাঁর অন্তরে 'বলরামের চোখের জলে আমার ডুব দেওয়া সাঙ্গ হল।' অমৃতকুম্ভে পুণ্যস্নান হল বলরামের চোখের জলে আর তার চোখ দিয়ে নিজের অন্তর দর্শন করালেন পাঠককুলকে। 'এক লক্ষ মানুষের মুখের মিছিল, আজ তারা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। কত গুরু। পথে প্রান্তরে, কুটিরে বস্তিতে, ইমারতে, ঘরে---অগণিত গুরুকে আমার নমস্কার জানাই।' *(পৃ: ১২০, ঐ)*ভাষাচয়ন এই কাহিনীর একটি অমূল্য সম্পদ, লক্ষ্মীদাসী বলরামের মুখের ভাষার সঙ্গে ব্রজবালা, প্রহ্লাদের ভাষা মেলে না। লক্ষ্মীদাসীর মুখের ভাষা একটু লক্ষ্য করা যাক। 'কথা নাই বাত্তা নাই, যখন তখন বাহির হইয়ে যায়। কোথায় গিয়ে বইসে থাকে। এট্টা বিপদ আপদ হইলে আমি কোথায় যাইব, বলেন তো?' *(পৃ: ১১৭, ঐ)* অথবা বলরামের বিপদের আশঙ্কা করে লেখকের চরিত্র কালকূটের কাছে তার শঙ্কার অভিব্যক্তি 'কিন্তন যদি কিছু হয়, তবে আমার আখড়া যে অন্ধকার হইবে! রাধামাধব তো আর কারুর গানে তুষ্ট নয়!' *(পৃ: ১১৭, ঐ)* বলরাম কেন লেখক কালকূটকে ঠাকুর বলেছে তার জন্য লক্ষ্মীদাসীকে বলার ভঙ্গি 'কই, তুমি যে ঠাকুরকে কী বলবা বলতেছিলে আমারে। ধইরে নিয়া আসলাম, বল। একবার পরখ কইরে লেও, কারে ঠাকুর কইছি।' *(পৃ: ১১৭, ঐ)* দু'জনের কথার মধ্য দিয়ে একটা গ্রাম্য সৌন্দর্য ও সরলতার অভিব্যক্তি লেখনী গুণে ছড়িয়ে পড়েছে।

আবার বলরাম যেহেতু লক্ষ্মীদাসীর প্রেমমুগ্ধ তাই সে শ্যামার যাতনা শ্যামার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়া মুহূর্তটি '' 'এই যমুনাপারে আপনারা দেখা করেন, কেন্দে ফিরে যান। আমি তাই দেখি। দেইখে ফিরে যাইব। সেই আমার আনন্দ। পথ চলার ওই তো মজা। ওই আনন্দটুকুই তার লাভ।'

'এই বুঝি তোমার গুরুর শিক্ষা?'

'হ্যাঁ। কিন্তন সে বলে ওইটুকু নাকি তার দুঃখু। যে দুঃখু মাইনসের সঙ্গ ছাড়ে না। আমরা

আনন্দ-দুঃখু একসঙ্গে থাকি।' '' *(পৃ: ১২২, ঐ)* শ্যামার দুঃখবোধ, প্রেমবেদনাকে তিনি যমুনাপারে তাদের উপস্থিত করতে যুগান্তরের বাধার বেদনার সঙ্গে বর্তমানের শ্যামার বেদনা বোঝাতে প্রতীকী হিসাবে যমুনাপারকে প্রেক্ষাপট করেছেন। এক অনুপম কাব্য সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়েছে বলরামের ওই কথার মধ্য দিয়ে। শ্যামার সঙ্গে দেখা হয়নি কালকূটের, কালকূট দেখা করতে যেতে পারে নি, শ্যামার অভিযোগটি লক্ষ্য করা যাক্ 'আমি খারাপ আওরত, তাই। তোমাকে তখলিফ দেব, সেই ভয়ে তুমি কথা দিয়েও যাওনি। তুমি এসেছ, চলে যাবে। আমিও চলে যাব। মানুষের সঙ্গে কি মানুষের মিতালি হয় না?' *(পৃ: ১২২, ঐ)* শ্যামার এই কথার সঙ্গে প্রকৃতিকে কীভাবে এনেছেন এইভাবে 'শ্যামার লাল শাড়ি নীল হয়ে উঠল। ও যে ব্যথার রঙ। যমুনার কারসাজি। যমুনাতীরের বাঁশি কবে লোকলজ্জা মেনেছে। সে যে চিরদিন কলঙ্কের ফোঁটা কপালে দিয়ে হাসিয়েছে কাঁদিয়েছে। শুধু মিতালী। শ্যামা আমার মিত্রাণী।' *(পৃ: ১২৩, ঐ)* প্রেমকে স্বীকার করতে যে দ্বিধা ছিল সেটা বোঝানোর জন্য যমুনার পাড়ই প্রেক্ষাপট। শ্যামা যেহেতু ভাল বাংলা জানে না সেইজন্য তার ভাষায় এনেছেন ছোট ছোট দু'একটা হিন্দি কথামিশ্রিত বাংলা, যা ওই চরিত্রোপযোগী। এমনি করে ভাষা সৌন্দর্য ও প্রকৃতি মানব-মানবীকে একাকার করে দিয়েছেন কাহিনীর সঙ্গে। তেমনি কাহিনীর শেষদিকে শত শত মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণা প্রকাশ করেছেন 'শত শত চিতার আগুন লকলকিয়ে উঠল প্রয়াগের আকাশে। আগুন লাগার ভুল করে বার বার ফায়ারব্রিগেড অ্যালার্ম বাজল। কিন্তু সে আগুন নেভাবার জন্য কোন জলধারা ছুটে এল না।' *(পৃ: ১২৩, ঐ)* কারা এইভাবে ভয়ংকর প্রতিশোধ নিল? সেটা প্রকাশের ভঙ্গিটি, কে যেন চিৎকার করে কেঁদে বলছে 'সব মাতাল সাধুরা এদের খুন করেছে, খুন।' *(পৃ: ১২৩, ঐ)* আর তার মনোভাবনা, বেদনার প্রকাশ, ধিক্কার 'কার প্রতিশোধ এমন রূপ নিল, কার প্রতিদানের এমন ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখা দিল!' *(পৃ: ১২৩, ঐ)* আবার শ্যামার কি হয়েছে সেটা উহ্য রাখলেন লক্ষ্মীদাসীর মুখ দিয়ে এইভাবে 'ওনার সতীনের দেখেছি ঠাকুর, বুক থাপড়াইয়ে কানতেছিল। কিন্তুন্ কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি নাই।' *(পৃ: ১২৪, ঐ)*

কালকূট নির্বিকার থাকতে পারলেন না কিন্তু প্রকাশও করতে পারলেন না। 'বুক চাপড়ে কান্না? হাঁটু মুড়ে বসে রইলাম।' আর পাটনা স্টেশনে নামার আগের মুহূর্ত '' 'তুমি ঘাটে এলে না। তোমার হয়ে তাকে আমি একটা জিনিস দিয়েছিলাম।'

'কী'?

'আমার একটা আংটি'।'' *(পৃ: ১২৪, ঐ)*

বলরামও নেই! তার উপহার বলরামের সঙ্গেই বিলীন হয়ে গেছে। যমুনাপারের ঘাটে যাওয়া ঘটনাও একদিন কালের ধূলায় ঢাকা পড়ে যাবে। তবুও মানুষ তো আসা নিয়েই বাঁচে। তিনি সেই

আশার কথাই শুনিয়েছেন, বিচারের ভার পাঠকের। " 'এই শ্যামাকে, নতুন বিধবাকে তোমার মনে থাকবে?'

'থাকবে'।

সে আবার বলল 'মিথ্যুক! তুমি বড় মিথ্যুক!' " *(পৃ: ১২৪, ঐ)*

কালকূটের মনে ভাবান্তর, শ্যামার এই কথার প্রতিবাদ করত বলরাম গানে গানে। তার বেদনা ঝরে পড়েছে 'আজ বলরাম নেই! নেই! সে ছাড়া যে আমাকে সত্যবাদী বলার আর কেউ ছিল না।' *(পৃ: ১২৪, ঐ)* দুঃখবোধ, বেদনাকে চিরকালীন করেছেন এই কথার মধ্য দিয়ে। এমনিভাবেই নতুন এক রচনা বৈশিষ্ট্য তিনি কাহিনীতে চরিত্র, চরিত্র অনুযায়ী কথাবার্তা, কোন সামাজিক পরিবেশ থেকে সেই চরিত্রটিকে তিনি তুলে ধরেছেন, বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে ট্রেনে যেতে যে স্থানের প্রকৃতির তফাৎ ও সামঞ্জস্য কতটুকু তাও তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তুলে ধরেছেন। এইভাবে সমগ্র কাহিনীতে এক শিল্প সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়েছে।

'লক্ষ রূপের আরশিতে বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান করেছেন তিনি 'পণ্যভূমে পুণ্যস্নানে'। সেখানে যেতে যেতে ট্রেনের যে চিত্র এঁকেছেন তাও অভিনব। ট্রেনের দৃশ্যের সঙ্গে তেমন মিল নেই। সেখানে তিনি সিংবাহাদুর সাহেবজীকে এনেছেন পড়ন্ত জমিদারির উত্তর পুরুষ হিসাবে। সিংজীর সঙ্গে আলাপের প্রথম মুহূর্তটি দেখা যাক্। লেখক কালকূটের বাঙালী বন্ধুটি পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছেন 'আমার এই বাঙালি বন্ধুটি পাটনা যাবেন। তাঁকে তুলে দিতে এসেছি। তা আপনার মতো রহিস্ আদমি যখন পেয়েই গেলাম, তখন আর আমার কোনো ভাবনা নেই।' *(পৃ: ১৪১২, কালকূট রচনা সমগ্র, ৩য় খণ্ড)* সিংবাহাদুর সাহেবজীর উত্তরটি 'আরে ছি ছি মজুমদার সাব, এসব আপনি কী বলছেন? আমি সামান্য মানুষ। সূর্য যখন অস্ত যায়, তখন সব কিছুর ছায়াই লম্বা দেখায়। আপনি আমাকে সে রকম দেখছেন। জানেন তো, অন্ধকার নেমে আসছে।' *(পৃ: ১৪১২, ঐ)* লক্ষ্মৌর প্রবাসী বাঙালী বন্ধু কথার মাঝে উর্দু ভাষায় ব্যবহার করেছেন চরিত্রের সঙ্গে বক্তব্যের বাস্তবতা আনতে। আবার পড়ন্তের জমিদারির উত্তর পুরুষের বেদনা, শূন্যতাকে এক বিষণ্ণ কাব্যিক মহিমায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের উর্দু মেশানো কথার মধ্য দিয়ে শিক্ষিত দুটি মানুষকে তুলে ধরেছেন। সোন্‌পুরের পশুমেলার বিচিত্র রূপের হাটের মেলায় কালকূট কোথায় থাকবেন সেটা জানতে পেরে তার মনের অভিব্যক্তি 'তা বলে পুণ্যস্থানে পুণ্যি করতে গিয়ে, আপনি রেলকুঠিতে থাকবেন কেন? বাগ্‌বাচ্চা বাবুজীর চিড়িয়াখানার কাছেই আমাদের তাঁবু পড়ে গেছে। আপনি সেখানেই আমাদের সঙ্গে থাকবেন।' *(পৃ: ১৪১৪, ঐ)* লেখক সেখানে উঠবেন ঠিক করেছিলেন সেখানে কিভাবে খবর দেবেন? এ'কথায় সিংজীর উত্তরটা লক্ষ্য করা যাক্ "তিনি যখন শুনবেন, লখনৌয়ের সিংবাহাদুরজীর তাঁবুতে আপনাকে আমরা পাকড়ে নিয়ে গেছি, তখন আর গররাজি

হবেন না।" *(পৃ: ১৪১৪, ঐ)* সিংবাহাদুরজীর মত প্রভাবশালী ব্যক্তির পরিচিত কতটা, সেটা এমনভাবে চিত্রিত করে তুলেছেন যেখানে তার বিনীত ভাবটির সঙ্গে প্রভাবটিও ফুটে উঠেছে। তাঁর সঙ্গে সদাপ্রফুল্ল মনটিও। কিভাবে খবর দেবেন? ছেলে জয়রাজ বলছে "বাবুজীকে নিয়ে আমি, রেলকুঠি ঘুরে তাঁবুতে নিয়ে যাবো।" *(পৃ: ১৪১৫, ঐ)* তাঁর স্বরে কোনও দ্বিধা নেই। পিতার কথার সূত্র ধরে সেও আগেই সব পরিকল্পনা করে নিয়েছে। অনেক রাত হয়ে যাওয়াতে তাঁকে 'আরাম' করে নিতে বলেছিলেন। নিজ স্ত্রী ব্রহ্মাদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন "বাবুজী, এ হচ্ছে খোদ বরহমদেই সিংবাহাদুর মহারানীজীর নির্দেশ। যা বলছে, তাই করুন। আমরা কেউ এঁর কথার অবাধ্যতা করি না। আর দেরি না করে শুয়ে পড়ুন।" *(পৃ: ১৪১৫, ঐ)* ঘুম থেকে দেরিতেই উঠেছিলেন কালকূট, তাঁর ঘুম ভাঙার পর সিংবাহাদুরজী বলেছিলেন "আপনার চোখভরা নিদ্ ছিল, সেটা বরহমদেই বাহাদুর অওরত ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। মানছেন তো?" *(পৃ: ১৪১৫, ঐ)* শুধু কথাটাই বললেন না, ব্রহ্মাদেবীর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠেছিলেন। স্ত্রী প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও দিলখোলা হাসির মধ্য দিয়ে সিংবাহাদুরজীর চরিত্রটির বিকাশ ঘটিয়েছেন। আর উর্দু কথার মধ্যে বাংলাভাষার মধ্যে উর্দু ভাষাকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন সে-ই ভাষাকে সজীব করে তোলার মধ্য দিয়ে।

সোনপুরের হরিহর ছত্রের পশুমেলা পণ্যভূমিতে যে দু'জনের মাধ্যমে দেখেছেন তারা হল পবননন্দন ও কুসুম। একবার সাধারণ এক চালচুলোহীন ভবঘুরে কিশোরের চোখ দিয়ে আর একবার এনসিয়েন্ট হিস্ট্রিতে এম. এ. ও পালিভাষার মৌলিকতা নিয়ে গবেষণা করা এক তরুণীর চোখ দিয়ে। লেখক কালকূট তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এই কাহিনীর কাঠামোতে তৈরি করেছেন। কাহিনী বলার ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজন বুঝে চরিত্রগুলোকে এনেছেন এবং কাহিনীর বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। পবননন্দনের কাহিনীর মধ্যে এসে পড়াটা লক্ষ্য করা যাক। লেখক কালকূট লজ্জিত। তিনি তাঁর সেই ভাবটা প্রকাশ করলেন এইভাবে "লজ্জিত হেসে বললাম, "এতোটা ঘুমিয়ে পড়বো, বুঝতেই পারিনি। আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি।"

"আমাদের আপনি কী কষ্ট দিলেন?" সিংবাহাদুরজী হেসে জিজ্ঞাসু চোখে অন্যান্যদের দিকে তাকালেন।' *(পৃ: ১৪১৬, ঐ)* সিংবাহাদুরজী কিছু বলার আগেই একটি কিশোর "আপলোগ্কা মাফিক রইস আদমি না রহলে ত ইকারকে হাল বহুত খারাপ হো যাতিন।" *(পৃ: ১৪১৬, ঐ)* এর কথার সুর একদম আলাদা। জয়রাজ ধমকে বলল "এই বে-আক্কেল ছোঁড়া, তুই ইকারকে কাকে বলছিস্?" *(পৃ: ১৪১৬, ঐ)* ছেলেটি মার খাওয়ার ভয়ে মাথা বাঁচার জন্য দু'হাতে মাথা ঢেকে বলল "হুজুর আমার কসুর হয়ে গেছে। আমাকে পেটাবেন না। বুঝতে পেরেছি, উনিও একজন রইস্ আদমি।" *(পৃ: ১৪১৬, ঐ)* প্রথম কথা থেকেই ও কালকূটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নেয়।

সিংবাহাদুর সাহেজীদের থেকে ওর ভাষাটা একদম আলাদা। কলকাতার বাইরে চটকলের শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকের ভাষা তিনি পবননন্দনের মুখে বসিয়ে দিয়েছেন। যা ওর চরিত্রের সঙ্গে পোষাকের সঙ্গে একদম মিলে গেছে। সোনপুরের পরিবেশে তার ওরকমই একটি চরিত্রের দরকার। যে তার মুক্ত চোখে সমাজের ভালমন্দ সব জায়গায় অনায়াসে যেতে পারে। কালকূট তো বৈচিত্র্যের মধ্যেই মানুষকে দেখতে গেছেন। আশ্চর্য কুশলতায় তিনি সোনপুরের প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। ভৌগোলিক পরিচয় দিয়েছেন অন্য এক আঙ্গিকে। কী অনবদ্য বৈশিষ্ট্যে স্থান-এর পরিচয় সামনে এনেছেন। কিশোর ছেলে পবননন্দন বলে উঠল, ' "দিনাপুর আ গইলান।"

সিংবাহাদুরজীর লোমশ ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠলো। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ' "বল্ তো এর পরের ইস্টিশনের নামটা কী?" ' *(পৃ: ১৪১৭, ঐ)* ছেলেটা একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল "হুজুর, দিঘা ঘাট এ গাড়ি যাবে না। পাটনা বড় টিশনের পর গুলজারবাগ।"

"উস্‌কে বাদ?" সিংবাহাদুরজী যেন এক ফাঁদে পড়া শিকারকে টেনে নিয়ে চলেছেন।' *(পৃ: ১৪১৭, ঐ)* সিংবাহাদুরজী গলার স্বরে ঝাঁঝ এনে আবার জিজ্ঞাসা করলেন। বারে বারে ওকে জিজ্ঞাসা করছেন 'উস্‌কে বাদ?' লেখকের দিকে কৌতুকে তাকিয়ে দাঁড়িতে হাত বোলালেন। ছেলেটি তাতেও দমল না। 'নিরুপায় হয়ে জবাব দিল, "হুজুর মহারাজ, উসকে বাদ বাঁকা ঘাট।"

"ত ই তামাম টিশন তু জানত বা? বহুত আচ্ছা।" সিংবাহাদুরজী যেন ঈষৎ খুশি।

ছেলেটা ঝটিতি মাথা নেড়ে বললো, "না হুজুর, হম তামাম টিশনকে নাম না জানলেবারে।"

"তু কহাঁ উতরবে?" সিংবাহাদুরজী অন্য প্রশ্নে চলে গেলেন।' *(পৃ: ১৪১৭, ঐ)* অমন খানদানি মানুষ, একটা চালচুলোহীন ছেলের সঙ্গে ওর ভাষায় কথা বলছিলেন। তারপর ওর নাম পবননন্দন জেনেই আবার কৌতুক "তোকে দেখতে তো বীর ভীমের মতো না। হনুমানজীর মতোও না।" *(পৃ: ১৪১৭, ঐ)* কর্তার কৌতুকের সঙ্গে গিন্নিও যোগ দিয়েছেন। স্টেশনের বিবরণ দিয়েছেন কৌতুকের সঙ্গে অত্যন্ত উপভোগ্য ভাগে। জীবনের অভিজ্ঞতা কিশোর ছেলেটির কেমন দেখা যাক্। সিংবাহাদুরজী কালকূটকে জংশন স্টেশনে নামতে না দিয়ে বললেন বাঁকা ঘাট পর্যন্ত টিকিট কেটে নিলেই হবে। পবননন্দন বলছে "টিকেট কি আর সব লোক কাটবে? রেলওয়াই কা বাবুসাহেবদের হাতে কিছু গুঁজে দিলেই—।" *(পৃ: ১৪১৮, ঐ)* জয়রাজের কথার উত্তরে ও বলে "হুজুর, আমার পয়সা কোথায় যে আমি টিকেট কিনবো? আপনি দেখবেন, রেলওয়াই কা বাবুসাবলোগ আমাকে সবাই চেনেন। তারা জানেন, আমার টিকেট কেনার পয়সা নেই। আমাকে কিছুই বলেন না।" *(পৃ: ১৪১৮, ঐ)* কালকূটের কৌতুকের এক 'বিনাটিকেটের যাত্রী' আর রেলওয়াই কা বাবুসাবলোগ'কে সামান্য কিছু গুঁজে দিলেই যাওয়া যায়। *(পৃ: ১৪১৮, ঐ)* সোনপুরের মেলায় পূর্ণিমার দিন হাজার হাজার লোক এসে পুণ্যস্নান করবেই। যদিও তারা আসে

লাখ লাখ টাকার কেনাবেচা করতে। সিংবাহাদুরজীর মুখ দিয়ে কালকূট এই পশুমেলায় পশু বিক্রির আড়ালে আর কি বিক্রি হয় সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। জন্তুজানোয়ারদের সঙ্গে মানুষও বিক্রির কথা শুনে কালকূট অবাক হয়ে গেলেন। সিংজী তার বচপনকালে রাজ-রাজরাদের মেয়েদের কিনবার জন্য রেষারেষি করতে দেখেছেন। আর এখন? সেটাই বলেছেন অন্য এক সুরে। 'আর এ কথাও জানবেন বাবুজী, হিন্দুস্থানে এখনো মানুষ বিক্রি হয়।' *(পৃ: ১৪১৮, ঐ)* "নওটুংকির শরীর বিক্রি না, সত্যি সত্যি মানুষ বিক্রি হয়। খুবই গোপনে। মেলার একদল লোক ছাড়া আর কেউ তা জানতে পারে না। যারা বিক্রি করে, যারা কেনে, আর যারা বিক্রি হয়।" *(পৃ: ১৪১৮, ঐ)* নদীরঘাটের কাছে পবননন্দন ধূলা উড়িয়ে ছুটে এসে নৌকার দিকে উঁকি দিয়ে কি যেন খুঁজতে লেগেছে। বাকা ঘাট স্টেশন থেকে ছুটতে ছুটতে ঘাটে এসেছে। এই ছেলেটার প্রতি জয়রাজের কেমন মমত্ববোধ 'বোকাটা একবার যদি বলতো, তা হলে একটা রিকশায় তুলে দিতাম। আমাদের সঙ্গেই আসতে পারতো।' *(পৃ: ১৪১৯, ঐ)* কিন্তু নৌকার মাঝির ধমকটা শোনা যাক্। "তু কে বা, নাওয়ে পর চড়ত আইলে?" *(পৃ: ১৪২০, ঐ)* এর কথাটার সুর পবননন্দনের সঙ্গে মিলে যায়। কোথাও একটানা কাহিনী বলে যান নি। স্থান-কাল পরিস্থিতির ওপর তার চরিত্র ও চরিত্রের কাহিনী এনেছেন। একটা ঘটনা বলতে বলতে হঠাৎই থেমে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন। কিন্তু কখনোই মনে হয়নি কাহিনীর সূত্র হারিয়ে গেছে। রেল কলোনীতে দেখা হয়েছে কুসুমের সঙ্গে। ও ভালো বাংলা বোঝে, কাহিনীর প্রয়োজনে কালকূট কুসুমকে এনেছেন। কুসুম পবননন্দনের কথা বলেই বুঝতে পেরেছে।

নৌকার উপর 'নাস্তা' করার সময় লেখক কালকূটের পবননন্দনের মুখটা মনে পড়ল। 'তবু পবনের মুখটা কেন যে হঠাৎ মনে পড়লো, জানি না।' *(পৃ: ১৪২০, ঐ)* একটা কিশোর ছেলে রিক্সার সঙ্গে ছুটতে ছুটতে এসেছে, তার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। কিন্তু কালকূট এমনভাবে সেই কথাটা বলেছেন যে তাতে দুঃখবোধটা কেমন একটা অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। যদিও লেখক জানেন যে নৌকার কোনো যাত্রীই অভুক্ত থাকবে না। ট্রেনের মধ্যে হঠাৎ পরিচয়ের একটা কিশোরের প্রতি মমত্ববোধ লেখক কালকূট আরও অন্যভাবে তুলে ধরেছেন, যার মধ্য দিয়ে এই পরিবারের হৃদয়ের মহানুভবতা, উদারতা সব ফুটে উঠেছে অথচ মুখে তেমন করে কিছুই বলেননি তিনি। রেল কলোনীর কাছের চিত্রটাই একটু তুলে ধরা যাক। পবননন্দনের আরও একটি নাম হল খাট্টা ঝা। ওর আগে কয়েকজন ভাইবোন মারা যাওয়াতে ওর নাম খাট্টা রাখা হয়েছে। এই চিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি আর একটি সংস্কারের বিশ্বাসের চিত্র তুলে ধরেছেন। এই বাঙলাতেও আছে যে পিতামাতার সন্তান জন্মেই মারা যায়, তারা তাদের সন্তানকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সন্তানের কানে ফুটো করে দেন, সন্তানের নাম 'মরণ!' বা অদ্ভুত ধরনের রাখেন।

যাতে যমরাজ এদের স্পর্শ করতে না পারে। তিনি এই জোট বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ভাতের দুটি ভিন্ন প্রদেশের অন্তরের মেলবন্ধন তুলে ধরেছেন। অথচ বলার ভঙ্গিটি অন্য রকমের। সবাই 'খাট্‌টা ঝা' নামটি নিয়ে কৌতুক করছিল। যাইহোক হঠাৎ জয়রাজ চিৎকার করে উঠল ''এই বেআক্কেল খাটটা ঝা, তুই রাস্তা দিয়ে হাঁটছিস কেন?'' *(পৃ: ১৪২৫, ঐ)* পবননন্দন হাতী সূরযের পাশে পাশে হাঁটছিল ওর ছোট পুঁটলিটা নিয়ে। 'তোকে তো লরিতে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।' *(পৃ: ১৪২৫, ঐ)* পবননন্দনের উত্তর ছিল ''হুজুর লরিতে যেতে আমার ভালো লাগছিল না। আমি অনেক আগেই লরি থেকে নেমে পড়েছি। আপনাদের হাতীর সঙ্গে যেতে আমার খুব মজা লাগছে হুজুর।'' *(পৃ: ১৪২৫, ঐ)* একটা লোক বলল, ''হুজুর, এ ছোকরা বলছে, ও আপনাদেরই লোক।'' *(পৃ: ১৪২৫, ঐ)* 'সেটা মিথ্যা কিছু বলেনি' *(পৃ: ১৪২৫, ঐ)* জয়রাজ বলেছিল। তারপর হুকুম করল 'তুই রেল কলোনির গেটের কাছে দাঁড়াবি।' *(পৃ: ১৪২৫, ঐ)* 'জী হুজুর' বলেই হস্তিনীর কাছে এগিয়ে গেল। কালকূট পবননন্দনের মনের ইচ্ছাটাকে এইভাবে তুলে ধরেছেন, হাতীর পিঠে চড়াতে ওর ইচ্ছে হয়েছিল, চড়তে পারে নি তাই হাতীর পায়ে পায়ে চলেছে। ওর আচরণের ছটা মৃদুভাবে আলোকিত করেছেন। রেল কলোনির কাছে নেমে যেতেই ওর প্রশ্ন ' ''বাবুজী আপ কহাঁ চলিহন?''

''রেলকলোনি। বিকেলে মেলায় যাবো।'' ' *(পৃ: ১৪২৫, ঐ)* এরপরের ঘটনাটাই লক্ষ্য করার মতো। ''হেই খাট্‌টা ঝা, জল্‌দি উঠে পড়্।'' *(পৃ: ১৪২৫, ঐ)* জয়রাজের ধমক খেয়ে চম্‌কে এক লাফে মইয়ের কাছে গিয়ে 'এমনভাবে মই বেয়ে সূরযের পিঠে চাপলো, যেন হাতীর পিঠে চাপতে ও খুবই অভ্যস্ত। আমার মনটা হঠাৎ খুশিতে ঝলকে উঠলো। আমার চেয়ে অনেক বেশি খুশি পবন। ওর মুখটা এখন টকটকে লাল দেখাচ্ছে। এটা ও আশা করতে পারেনি। আমার কাছেও অপ্রত্যাশিত ছিল। জয়রাজ প্রকৃতই হৃদয়বান ভদ্র। ভৃত্য মই সরিয়ে নিল। সূরয উঠে দাঁড়াতেই, আশপাশের লোক সরে গেল। পবন চিৎকার করে ওর ভাষায় আমাকে বললো, ''বাবুজী, তাড়াতাড়ি চলে আসবেন।'' ' *(পৃ: ১৪২৫, ঐ)* জয়রাজ ও পবননন্দন দু'জনকেই দু'ভাবে এই দু'একটি কথার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। যা কাহিনীকে এক অন্যরকমের শিল্প সুষমায় ভরিয়ে দিয়েছে।

রেলকলোনিতে বাঙালী সমাবেশ, শুধু বাঙালী সমাবেশ নয়, সাহিত্যিক ও গুণীজন সকলেই দেখা করতে এসেছেন। আবার অনেকেই সন্ধ্যাবেলায় আসবেন। সত্যেন চক্রবর্তী, এঁনার বাড়ীতেই লেখক কালকূটের ওঠার কথা ছিল। সত্যেন চক্রবর্তী অনেককেই খবর দিয়েছেন, আবার অনেকে অন্য কোথাও 'তাঁর আসার' খবর পেয়ে চলে এসেছে। যেমন 'অরুণ দত্ত' চুঁচুড়ার ছেলে, সুপারভাইজার কিভাবে আসার খবর হয়েছে দেখা যাক্। সত্যেনবাবুর প্রশ্ন ''তুমি যেন চুঁচুড়ার কাদের কথা বলবে বলেছিলে?'' *(পৃ: ১৪২৬, ঐ)* 'অরুণ হেসে বললো, ''সে সব পরে হবে। এখন

যাচ্ছি। কিন্তু চৌধুরী সাহেব লাল্লুকে স্টেশনে পাঠিয়েছেন, আপনাদের দেরি দেখে।''

''লাল্লু স্টেশনে আমাদের কোথায় পাবে?'' সত্যেনবাবু মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করে হেসে স্ত্রী ও অরুণের দিকে তাকালে, ''পহলেজাঘাট থেকে আমরা ট্রেনে আসি নি। এসেছি হাতীর পিঠে চেপে।'' *(পৃ: ১৪২৬, ঐ)* 'ও-বেলাই ওকে জমা করে দিয়ে আসতে হবে।' এ'কথা শুনে সত্যেনবাবুর স্ত্রী রুনু সহসা সবই-ই একটু আশাহত হয়ে গেল। এই সব টুকরো টুকরো চিত্রের মধ্য দিয়ে একটা বাঙালী কৃষ্টি ও সম্প্রীতিকে তুলে ধরেছেন তাঁর নিজস্ব লেখার ভঙ্গিতে। রেলের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মিঃ টি চৌধুরীর মেয়ে কুসুমের সঙ্গে সত্যেনবাবুর রেলকোয়ার্টারেই পরিচয় হয়েছিল। ওরা বাঙালী নয়। পরিচয়টা দিয়েছেন এইভাবে — ''চক্রবর্তী সাহেব একটু বাড়িয়ে বলছেন। বাঙালির চেয়ে তো বাঙলা বেশি জানি না। ওরিজিনালি আমরা এই সারণ জেলারই মানুষ। গোঁড়ের বাদশাহের আমল থেকে আমরা চৌধুরী হয়েছি। আমার বাবা ঠাকুদাও বাঙলা জানতেন। এখনো প্রতি বছর আমাদের ঘরে বাঙলা পঞ্জিকা আসে। আর সাহিত্যের তো কথাই নেই। পত্র-পত্রিকা, গল্প-উপন্যাস, সবই আমরা পড়ি। হিন্দি তো আছেই।'' *(পৃ: ১৪২৬, ঐ)* ওরা বাঙলা এত পড়েন যে 'বাপ-বেটি' না এসে পারেন নি। একটা 'বাঙলা-হিন্দী' মিলে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল-এর কথা তুলে ধরেছেন। ওবেলায় সত্যেনবাবু তার স্ত্রী রুনু ও কুসুমসহ কালকূট সিংজীর তাঁবুতে এসেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে কুসুম বলেছিল 'কিন্তু আপনি আগেই জেনে রাখুন, সোনপুরের মেলা কিন্তু প্রয়াগের কুম্ভমেলা নয়, বহুত তফাৎ।' *(পৃ: ১৪২৬, ঐ)* কুসুমের এই কথার মধ্য দিয়েই 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'র উল্লেখ করে বাংলাসাহিত্য প্রীতি তুলে ধরেছেন। সত্যেনবাবুর মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন তারা শহর বলতে 'হাজিপুরকে বোঝায়' কিন্তু সেটা কীভাবে বলেছেন। ''সোনপুরেও লাইব্রেরী, ক্লাব, সবই আছে। তবে হাজিপুরের মতো না। আজই একটু পরে, হাজিপুর থেকে কয়েকজন প্রফেসর ছাত্রের আসার কথা আছে। কিন্তু আপনার আর মহারানীজীর হুকুম, ওঁকে বিকেলেই এখানে হাজির করতে হবে।'' *(পৃ: ১৪৩০, ঐ)*

এরপর হাসি-মস্করার মধ্য দিয়েই সোনপুরে পৃথিবীর অদ্বিতীয় মেলার কাহিনী শুরু করে দিয়েছেন। কুসুম বলছে 'এ জায়গাকে ''হরিক্ষেত্র'' বা ''দদরিক্ষেত্র'' বলা হতো। অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধার মুখে শুনবেন, এখনো তাঁরা এ জায়গাকে ''দেবঘাট'' বলেন।' *(পৃ: ১৪৩০, ঐ)* আবার সিংবাহাদুরজীকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন 'আমি তো এখানকার একটা কথাই জানি, তা হলো গজগ্রহের কাহিনী। তুমি যা বললে, আমি এত কথা কিছুই জানতাম না। অবশ্যি, আমাদের কলাকার বাবুজী হয় তো এসব খবর জানেন—''

''আজ্ঞে (জী) না।'' আমি হাতজোড় করে, কুসুমের মুখের দিকে একবার দেখলাম, ''শ্রীমতী কুসুম চৌধুরী যা বললেন, আমি এ সবের কিছুই জানি না। আমি ওঁর কথা খুবই মনোযোগ দিয়ে

শুনছিলাম। আমার নতুন কিছু জানা হচ্ছি।" ' *(পৃ: ১৪৩০, ঐ)* একবার কুসুম ইতিহাস বলছে একবার সিংজী 'মিথ্' বা কাহিনী বলছেন। মিথ্, কিংবদন্তী ও ইতিহাসের মেলবন্ধন করিয়েছেন আশ্চর্য কথাবার্তার ভঙ্গিতে। কুসুম বলছে "কিন্তু এসব আমার বই পড়া বিদ্যার কথা বলছি। নতুন কিছু বলার নেই।" *(পৃ: ১৪৩০, ঐ)* সিংজীকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন "বই পড়া বিদ্যা কি খারাপ নাকি? পণ্ডিতরা তা হলে বই লিখে গেছেন কেন? বেদব্যাস মহাভারত না লিখলেই পারতেন? তুমি তো সেইরকমই বলছো।" *(পৃ: ১৪৩০, ঐ)* সিংজীর মাধ্যমে গজগ্রহের গল্প তখন বললেন যা পরে শোনাবেন অপেক্ষায় রেখে দিলেন তাঁবুর সকলকে সেইসঙ্গে পাঠককুল। কাহিনী বলার মধ্য দিয়ে এই যে শ্রোতা বা পাঠককে মুগ্ধ করে রাখা এটা ওনার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কোন কিছুই একটানা বলেন না। একটা ঘটনার পরপরই অন্য একটি সংযোগকারী ঘটনা এসে কাহিনীকে মালার মতো সংযুক্ত করে গেছেন। পবননন্দনের মন ও চরিত্রকে কালকূট এইভাবে বিকশিত করেছেন "আর তুমি কী কর?" *(পৃ: ১৪৩২, ঐ)* লেখক কালকূটের প্রশ্নে পবননন্দনের উত্তর "আমি কী করবো? গত সনে এই মেলায় এসেছিলাম। তারপরে তো আর ঘরেই ফিরিনি।" *(পৃ: ১৪৩২, ঐ)* "ঘরে ফেরো নি তো গোটা সালটা কোথায় ছিলে?" *(পৃ: ১৪৩২, ঐ)* পবন হেসে বলেছিল "বহুত জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছি। আমি দিল্লি পর্যন্ত ঘুরে এসেছি।" *(পৃ: ১৪৩২, ঐ)* ওর নির্বিকারত্ব লেখক কালকূট এইভাবেই তুলে ধরেছেন। ভিক্ষা সে করে না। কিন্তু কেন সে এভাবে ঘুরে বেড়ায় তা সে জানে না। নির্বিকার স্বরে বলে মাঝে মাঝে মা-ভাইবোন সকলের কথা মনে পড়ে। কিন্তু কষ্ট হয় কিনা তা জানায় না। এক সংসারমুক্ত কিশোরকে তিনি এনেছেন এই কাহিনীতে। এবং ওকে দিয়ে না দেখা না জানা অনেককিছুই দেখেছেন।

আবার কুসুমের মুখ দিয়েও ইতিহাসের কথা বলিয়ে নিয়েছেন এইভাবে— "এই এক যোজন দূর আর যে-পথের কথা বলা হচ্ছে, তাতে অনুমান হয়, ফাহিয়েন সোন্‌পুর অঞ্চল দিয়ে, পাটলিপুত্রে গিয়েছিলেন। কিন্তু মুশকিল লাগে, ঐ পাঁচ নদী দিয়ে। গণ্ডকের প্রাচীন নাম সদানীরা। সদানীরা বা সোন্‌পুরের কথা ঋক্‌বেদে কোথাও নাই।" *(পৃ: ১৪৪৮, ঐ)* সে আরও বলে "এটা বলতে পারি, সোনপুর-হাজিপুর ব্রাত্য বা কিকাতদের আন্ডারে ছিল, দুগ্ধবতী গাভীর জন্য যারা ছিল ধনী। অজাতশত্রুর সঙ্গে লিচ্ছবিদের ঝগড়া ছিল।" *(পৃ: ১৪৪৮, ঐ)* কুসুম আরও বলে "দেখুন, এই পুণ্য স্নানের যে-মিথ্‌টা সবাই জানে, কালীমন্দিরের দরজার সামনে দেওয়ালে তা খোদাই করা আছে।" *(পৃ: ১৪৪৮, ঐ)* ইতিহাস ও মিথ্ এই বৈপরীত্যের মধ্যে দিয়ে লেখক শিল্পচেতনার মেলবন্ধন দেখিয়েছেন। কুসুমকে দিয়ে মেলার সোনপুরের ইতিহাস অনবদ্যভাবে বলিয়ে নিয়েছেন, ইতিহাসের তথ্যই বসিয়েছেন এমনভাবে যাতে পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন না হয়। এইখানেই লেখকের মুন্সীয়ানা। আবার সিংবাহাদুরজীকে দিয়ে মিথ্, কিংবদন্তী বলিয়ে নিয়েছেন।

সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে তিনি আঘাত করেন নি। এই ভাতের লক্ষ লক্ষ মানুষ যে বিশ্বাস নিয়ে, উন্মাদনা নিয়ে এই মেলায় বুড়ীগাজনের সঙ্গমে পুণ্যস্নান করতে আসে তাঁকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। কিংবদন্তী বিশ্বাস করা না করা সেটা পাঠকের নিজস্ব ব্যাপার। তিনি পাঠককে সে স্বাধীনতা দিয়েছেন। নিজের বিশ্বাস কাউকে চাপিয়ে দেননি। ব্রহ্মদেবী স্নেশীলা মনটি তিনি তুলে ধরেছেন এইভাবে, ''যখন যেখানে যাবে, সব দেখবে। যা করার, পুরা করবে। তুমি নাস্তিক হও আর আস্তিক হও, কী যায় আসে? মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন করবে না কেন?''

''বহুত ভিড় যে?'' পাশ থেকে পার্বতী হেসে ফোড়ন কাটলো।

''ভিড় তো কী হয়েছে? মেলায় এসেছো, আর ভিড়ে মিশবে না? আস্নান করবে, পানি গায়ে লাগাবে না?'' ব্রহ্মদেবী আমাকে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকলেন।' *(পৃ: ১৪৪৫, ঐ)* ব্রহ্মদেবীর কথার সঙ্গে বাউলের সুর মিলিয়ে দিয়ে, সহজ কথা এক উচ্চমার্গে বেধে দিলেন। আর সত্যেন চক্রবর্তীর স্ত্রী রুনু তার পূর্ব পরিচিতা, তাকে কালকূট চিনতে না পারলেও রুনু তাকে চিনেছে, তার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় তার আছে। তার সূত্র ধরে পুরোনো দিনের স্মৃতিতে তিনি চলে গিয়েছেন। কথা কাহিনীর সৌন্দর্যকে জ্যোৎস্নালোকের মত কমনীয় করেছে। পশুমেলার পণ্যক্ষেত্রে মানুষ বিশেষত 'মেয়েমানুষ' বিক্রি হয় এ'কথা সিংবাহাদুরজী, সত্যেন চক্রবর্তীকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন, কুসুম এর সত্যতা স্বীকার করেছে কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ করিয়েছে পবননন্দন। এই মেলায় যেমন উঠে এসেছে পশু বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অশ্রুজল, তেমনি বিক্রিত পশুর দীর্ঘশ্বাস অশ্রুজল। সিংজীরা লছমিপিয়ারী ও সূরযকে বিক্রি করতে এই মেলায় নিয়ে এসেছিল। তাই প্রথম থেকে একটা বিষণ্ণতার ছায়া পুরো পরিবারটিকে ঘিরে রেখেছিল। 'মেটেলির কনজারভেটর দীনেশ পুরকায়স্থ সিংবাহাদুরজীর লছমীপিয়ারী আর সূরযকে এক লাখ টাকায় কিনে নিয়ে গেলেন।' *(পৃ: ১৪৫৩, ঐ)* কালকূট সিংবাহাদুর পরিবারের দুঃখবোধ এইভাবে তুলে ধরেছেন 'ব্রহ্মদেবী নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছেন। কিন্তু কর্তব্যে তাঁর গাফিলতি ছিল না। পার্বতী ছেলেমানুষের মতো কেঁদেছে। জয়রাজও প্রায় তাই। সিংবাহাদুরজী প্রস্তরবৎ। দাসী ভৃত্য পারিষদ আর মাহুতরা কান্নাকাটি করেছে। গীতা তাঁবু থেকে বেরোয়নি।' *(পৃ: ১৪৫৩, ঐ)* আর পশু বিক্রির স্থানে হাতী বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর পবনের চোখ দিয়ে দেখেছেন ও শুনেছেন ''এখনই ওর চোখ থেকে জল পড়তে আরম্ভ করবে।'' পবন গলার স্বর নামিয়ে বললো, ''বুঝে গেছে, ও বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। দেখছেন না, বুড়ো মানুষটাও লাড্ডু খাওয়াতে গিয়ে কাঁদছে?'' *(পৃ: ১৪৪২, ঐ)* তিনি শুনতে পেলেন বৃদ্ধ লোকটির ধরা গলায় অনুরোধ ''বেটি রাজমোহিনী, এ লাড্ডু ক'টি খেয়ে নে। তুই তো লাড্ডু খেতে ভালবাসিস।''

''পাপ, এটা একটা পাপ।'' আমাদের পাশ থেকেই একটি লোক সনিঃশ্বাসে বলে উঠলো,

"দেওতা গণেশের প্রাণে চোট লাগে। গতকাল থেকেই এই হাতনি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এ সোনপুরের মেলায় অনেক পাপ হয়।" *(পৃ: ১৪৪২, ঐ)* আর মানুষ বিক্রি কীভাবে ব্যক্ত করেছেন? কথাবার্তা "এ রউয়া, দশ বছরের মেয়েটাকেই নিন। দাম একটু বেশি পড়বে। তবে চাঁদ যদি কিনতে হয়, প্রথমার চাঁদ কেনাই ভালো। ওর পৌর্ণমাসী পর্যন্ত আপনাকে যোয়ান করে রাখবে।" *(পৃ: ১৪৫২, ঐ)* লেখকের মাথাটা ঘুরতে লাগল। 'ক্রোধ না, ঘৃণা, কি কোন অসহায়তার জন্যই, বুক থেকে গলা পর্যন্ত একটা বমনোদ্রেকের মতো কিছু ঠেলে আসছে। শোনা ছিল। দেখা ছিল না। সবরকম কথাই শুনছি। কদর্য, অশ্লীল আর ভয়ংকর, অথচ যেন পশুর চেয়ে অল্প দামের বস্তু বিক্রয় হচ্ছে।' *(পৃ: ১৪৫২, ঐ)* পবন বলছে "বাবুজী, আপনি এই পয়লা অওরত বিক্রি দেখলেন, আঁ? তাই আপনার মন খারাপ হয়েছে। আরো কতো জায়গায় তো বিক্রি হয়। কে না জানে?" *(পৃ: ১৪৫৩, ঐ)* আরও বলছে "খুবসুরত যোয়ানী আর বাচ্চা খুবসুরত লেড়কির দাম খুব বেশি হলে পাঁচ হো টাকা। একটা খারাপ জাতের দুবলা ঘোড়াও দেড় হাজার টাকার কমে বিকোয় না। এক জোড়া ভালো বয়েল সাত আট হাজার টাকা।" *(পৃ: ১৪৫৩, ঐ)*

আর কুসুমকে এনেছেন কুসুম ধর্ষিতা মেয়ে। অপরাধীরা কেউ শাস্তি পায় নি। কিন্তু কোথাও গিয়ে মানুষরূপী হিংস্র পশুদের লালসার দৃষ্টি থেকে সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারে না। শিক্ষিত সমাজও ওর দিকে হাত বাড়ায়। হাজিপুর থেকে অধ্যাপক মিশ্র এসেছেন কালকূটের সঙ্গে দেখা করতে। উনি বলেন "বলি যখন হয়েই গেছে, তখন এই মাংসে আমাদের দাবী থাকবে না কেন? যাঁরা আপনাকে নিয়ে বৈঠক করতে চান, ঐ যে অধ্যাপক মিশ্র, তাঁর মতো লোকও একথা বলেন। আমি এখানে সন্ধ্যাবেলা বেরোতে সাহস করি না। আমার ছ'টি সতাতো ভাই বোন আছে। আমার সৎ মায়ের চোখে আমি বেশ্যা ছাড়া কিছু নই। এ দেশের অশিক্ষিত গ্রামে জন্মালে বোধহয় আমার বাবা আমাকে রেহাই দিতো না। এ দেশকে আপনি তো চেনেন। আজ যদিও আমাকে কেউ গ্রহণ করে, বলির মাংস খাবার জন্যই করবে। তারপরে ফেলে দেবে। সেটা আমি ভাবি না। কিন্তু একলা জীবন কাটানোও যে কী কঠিন এখানে। অথচ আমি যেখানেই যাবো। সেখানে বাতাসে খবর যাবে, বলির মাংস বলির মাংস..." *(পৃ: ১৪৫১, ঐ)* লেখক কালকূট দুটো দিক এক মেয়ে মানুষ বিক্রি ও ধর্ষিতা মেয়ে কুসুমের যন্ত্রণাবোধকে দু'জনের চোখ দিয়ে দু'ভাবেই তুলে ধরেছেন। একদিকে নিজের বাবা-স্বামী-ভাই আর অপরদিকে নারীদেহলোলুপ শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা। দুটোর পাশাপাশি সহবস্থান ঘটিয়েছেন অত্যন্ত শৈল্পিক সুষমায়। সমাজের ঘৃণ্য দিকটা তুলে ধরেছেন এমনভাবে যেখানে কুসুমের জন্য বেদনার অশ্রু ঝরে পড়ে, বিক্রি মেয়েটি, তথা বালিকাটির জন্য মমত্ববোধ জেগে ওঠে। এই মেলায় কুসুমের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে তিনি কুসুমের হৃদয়ের কাছাকাছি আসেন। গায়ত্রী নদীর যেখানে তার পবিত্রতা নিয়ে কুলুস্বরে বয়ে চলেছে,

সতীদেবীর মায়ের মন্দিরের কাছে, গাছতলায় কুসুম মাথায় ঘোমটা টেনে কালকূটকে তার মর্মন্তুদ কাহিনী বলে। 'গায়ত্রীর স্রোত পূর্বের গণ্ডক থেকে, পশ্চিমে ধীর গতিতে চলেছে। ওপারে দিহারা ভূমি। জঙ্গল গাছপালা পাখির আস্তানা। গায়ত্রীর স্রোতই কি এই মর্মন্তুদ কাহিনী শোনাচ্ছে?' *(পৃ: ১৪৫১, ঐ)* মানবী কুসুমের হৃদয়ে বয় শত যন্ত্রণা গায়ত্রীর বয়ে যাওয়া ধ্বনির সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। কালকূট তার এই রচনায় নদী ও নারীকে এইভাবেই মিলিয়ে দিয়েছেন। আবার মনের শান্তির জন্য অন্ধকার থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ দেখিয়েছেন। বলেছেন "কুসুম, কথা শুধু কথা বলে নিও না। তোমার দুঃখ আর অপমানের তুলনা নেই। তোমার বোধ কতো গভীর। কী করে সেই আনন্দের জন্ম হবে তোমার মধ্যে তুমিই একমাত্র তা জানবে। বিশ্বাস কর, আমি নিজে সেই ধারায় বিশ্বাসী, অন্ধকারেরও আলো আছে। দুঃখ যন্ত্রণা আর ভয়ের আধারকে মেনে নেবে কেন? ঐ আধারটাকে ভাঙো। এই বিহার সোনপুর-পাটনা-ছাড়াও ভারত অনেক বড়। যে মুহূর্তে তোমার মুখে সেই নির্ভয় আনন্দের হাসি দেখা যাবে, শয়তান পালাবেই।" *(পৃ: ১৪৫৩-১৪৫৪, ঐ)*

কুসুমের মনের শান্তিকে তিনি কী শৈল্পিক মহিমায় ব্যক্ত করেছেন। বুদ্ধের চরণেই তার মনের শান্তি মিলবে, মোক্ষ লাভ হবে। তাই তিনি কুসুমকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন "এখন কিছুদিন আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন, ঘুরবেন। গৌতম বুদ্ধের পায়ের ছাপ দেশের যতো জায়গায় আছে, সবখানে। যাবেন তো?" *(পৃ: ১৪৫৪, ঐ)* পবন কালকূটকে না জানিয়ে চলে গেছে। কালকূট বলেছেন 'এই বিশ্বের পথিক, পবনের তাতেও কিছু আসতো যেতো না। ওর যখন সময় হয়েছে, ও চলে গিয়েছে। তবু মনে জিজ্ঞাসা জাগে, কী আছে ওর ভবিষ্যতে?' *(পৃ: ১৪৫৪, ঐ)* "চলুন হে পবন।" কুসুম আমাকে ডাকলো। হাসলো, বললো, "বয়স অভিজ্ঞতা শিক্ষা, তার দাম আছে। কিন্তু আমিও এক পবনকেই দেখছি।" *(পৃ: ১৪৫৪, ঐ)* কুসুমের দেওয়া 'কুসুম' ফুলের গাছটি কালকূট বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি। কুসুম বলেছিল "আপনি কোনোকালেই আপনার ঘরের সামনে এক কুসুম গাছের নিচে বসবেন না।" *(পৃ: ১৪৫৪, ঐ)* কুসুমের কথাই সত্যি হয়েছে। কালকূট নির্বিকারই রয়ে গেছেন। চলার পথের পরিচয় তাঁকে বেধে রাখতে পারে না। চলমান জীবনস্রোতের বেয়ে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে যান। নিজে কোনোকালে বাগানের মালী হতে শিখিনি। এক আশ্চর্য কাব্যিক মহিমায় কাহিনীকে শেষ করেছেন। পাঠকের মন সেই শিল্প সৌন্দর্যের স্পর্শে সিক্ত হয়।

এরপর 'পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ' শিল্পরূপ নিয়ে আলোচনা করা হবে। এই কাহিনী একটু অন্য আঙ্গি কে লেখা হয়েছে। প্রয়াগের কুম্ভমেলায় ৩২ বছর পরে তিনি হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় এসেছেন। ৩২ বছর আগে যে মন নিয়ে যে অজানা অভিজ্ঞতা নিয়ে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন, সেই মন নিয়ে নয়। অনেক পরিণত, অভিজ্ঞতা মন নিয়ে হরিদ্বারের কুম্ভমেলার স্মৃতিচারণ করেছেন।

হরিদ্বারের লক্ষ রূপের সঙ্গে প্রয়াগের লক্ষ রূপের মিল খুঁজে পেয়েছেন। সংবাদ পরিবেশনের ঢঙে তিনি কাহিনীটি বিবৃত করেছেন। মূল কাহিনী প্রবেশের পূর্বে তিনি প্রয়াগের কুম্ভমেলায় ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪ ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ তে আনন্দবাজার পত্রিকায় যে প্রতিবেদন দুটি পাঠিয়েছিলেন সে দুটি তুলে ধরেছেন 'মহা কুম্ভমেলা' এই উপন্যাসে। উদ্দেশ্য আগের কুম্ভমেলার প্রতিবেদন দুটি যারা পড়েন নি তাঁদের জানানো এবং যারা পড়েন নি তারাও যাতে নতুন করে কুম্ভমেলার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন, তাই তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এই 'কুম্ভমেলা' পরিক্রমার সঙ্গে নতুন কুম্ভমেলার কীভাবে মেলবন্ধন করেছেন সেটাই দেখা যাক। তিনি রচনাটিকে কতগুলি উপলক্ষে নির্দিষ্ট করেছেন— 'প্রয়াগ থেকে গঙ্গাদ্বার', 'আসন্ন সন্ধ্যায় পাখির চোখ', 'পাখির চোখে ঘুম নেই', 'নির্ভয় শক্তি পথে, নির্ভয়ে', 'দূরকালের উমাকে প্রণাম, প্রণাম একালের উমাদেরও', 'জগৎ মায়ায় বশ মহামায়ায়', 'স্বামী কোথায়, সোনা যে নিয়ে গেল', 'সাধুসঙ্গ প্রসঙ্গ , সাধু দর্শন', 'ইতিহাস ও অমৃতের উৎস সন্ধানে'।

'প্রয়াগ থেকে গঙ্গাদ্বারে' তে তিনি শুরু করেন পুরানো স্মৃতি দিয়ে। কারাবাসের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়েও তার মনে হচ্ছিল তিনি বন্দীই আছেন। দেহের উপবাস থেকে মনের উপবাস কাটানোর জন্য যে পথটা তিনি বেছেছিলেন সেটা ছিল লেখা। সেই লেখার মধ্যে তিনি তার মুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। 'লেখার সঙ্গে জীবনের দেখার অভিজ্ঞতাটাকে নিশ্চয়ই কখনও ছোট করে দেখা যাবে না। অবিশ্যি, অভিজ্ঞতাই একমাত্র, লেখার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। কিন্তু অভিজ্ঞতাই সম্ভবত প্রতিমা গঠন করে। সেটা যেমন শিল্পীর কাজ, তেমনি শিল্পী সত্তারই ধ্যান প্রতিমাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে।' *(পৃ: ১৫৭৪, কালকূট রচনা সমগ্র, ৩য় খণ্ড)* বঙ্গাব্দের ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি ফিরে গেছেন বারে বারে। তার সকল জটিলতার গ্রন্থিগুলো খুলে গিয়েছিল। নিজের দেশকে জানার জন্য, নিজেকে জানার জন্য সেই তার যাত্রা শুরু হয়েছিল। তার নিজের ছোট্ট গণ্ডিটা ছেড়ে তিনি বাইরের জগতে পা রেখেছিলেন। কৈশোর ছাড়িয়ে, দেশ আর মানুষকে পাথেয় করেই তার যাত্রা শুরু হয়েছিল। পরক্ষণেই তিনি বলেছেন তাও নয়, আন্তর্জাতিকতাও ছিল তার সেই পথের যাত্রায়। কিন্তু আন্তর্জাতিকতার স্বরূপ নিয়ে বিশ্বভারতীর যাত্রা শুরু হয়েছিল, কিন্তু তখন তা জানতেন না, তার মর্মই তিনি উদ্ধার করতে পারেন নি তখন। তাই তার স্বীকারোক্তি আন্তর্জাতিকতার অর্থটাই তার চৈতন্যে অস্পষ্ট ছিল। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' সেই ধারণাটাও তার ছিল না। কিভাবে সেই রূপ দর্শন করলেন? 'আমি দেখলাম, আমার ধসে পড়া গৰ্ডীর বাইরে থেকে, প্রয়াগের সঙ্গম আমাকে লক্ষ হাতে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দেখলাম, সেই হাতছানির আড়ালে, ভারতেরই একটি মুখ। ভারত আমাকে ডাকছে। সে টেনেছে আমার মূল ধরে।' *(পৃ: ১৫৭৫, ঐ)* সেই তেরশো একষট্টি খৃষ্টাব্দেই তার বন্ধু তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ''কী দেখতে? লক্ষ লক্ষ ধর্মান্ধ

মানুষ কে?'' *(পৃ: ১৫৭৫, ঐ)* তখন তিনি তাকে বোঝাতে পারেন নি সেই কথাটা 'যে প্রতিবেশীকে বছরের পর বছর দেওে কোনওদিন চোখে পড়েনি, পূর্ণ কুম্ভের মেলায় তাকেই নতুন চেনা রূপে মুগ্ধ হয়েছি। সে আমার চোখ ভিজিয়েছে। সে তার নিজের অজান্তেই আমার নমস্কার আদায় করে নিয়েছে।' *(পৃ: ১৫৭৫, ঐ)* ধর্মান্ধ হয়ে সে ছুটে যায় নি। সে গিয়েছে একজনকে খুঁজতে।

''কাকে বলুন তো?''

''যাঁকে একবার দেখলে, এ জীবনের মতো আর কিছু চাইবার থাকবে না।''

''কে সে?''

''ভাবি তো, সে ঈশ্বর। কেমন যে সে দেখতে, তা জানিনে।'' *(পৃ: ১৫৭৫, ঐ)*

সেই প্রয়াগের কুম্ভমেলা থেকে তিনি নিজেকে খুঁজছেন। তিনি বলেছেন 'আমার ভারত দর্শনের আর এক নাম, রূপের নেশায় মাতাল। মানুষের রূপ।

'প্রয়াগ থেকে গঙ্গাদ্বার' এই উপনামে তিনি বারে বারে ফিরে গেছেন প্রয়াগের কুম্ভমেলার স্মৃতিতে। তিনি তখন বেরিয়েছিলেন অমৃতের সন্ধানে, তার সেই সন্ধানী মনটা কোনদিনই ঘরে ফিরতে পারে নি। তাই তিনি বলেছেন আবার গঙ্গাদ্বারের পূর্ণকুম্ভের লক্ষ হাতের হাতছানতে ডাক এসেছে। চৈত্রের মধুসংক্রান্তিতে গঙ্গাদ্বারের গঙ্গা অমৃতের উদ্ভব হবে, 'কালকূটের আকণ্ঠ তৃষ্ণায়, ফাটি যাওত ছাতিয়া' সেই তৃষ্ণাতে তিনি চলেছেন 'অমৃতং গময়'। এখানে তিনি পুরাণের সঙ্গে নতুনের মেল করার চেষ্টা করে। এই একত্রিশ বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, তারই হিসাব করতে যাচ্ছেন 'মহাভারতের গঙ্গাদ্বারের তটে'।

'আসন্ন সন্ধ্যায় পাখির চোখে' এখানে তিনি 'পূর্ণকুম্ভ'-এর হিসাব করেছেন। 'বারো বছর অন্তর' পূর্ণকুম্ভের যোগ হয়, এটা তিনি হিসাব মেলাতে পারেন নি। তিনি সেই বলার চেষ্টা করেছেন সেটা 'বারো বছর' অন্তর নাও হতে পারে, দশ বারো বছর অন্তরও হয়। 'মকরে সূর্য যোগ'ই কুম্ভ যোগ হয়। প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনীতেও কুম্ভমেলা হয়। যখন তিনি প্রথমবার গিয়েছিলেন তখন তিনি কোনো পাঁজি দেখে যান নি। কুম্ভমেলার হাতছানিতে তিনি প্রয়াগে গিয়েছেন। সৈন্যদের যাত্রা শুরু হয়েছিল মৃত্যু দিয়ে, এবারের যাত্রা শুরুও মৃত্যু দিয়েই। তবে ট্রেনের মধ্যে নয় ব্রহ্মকুণ্ডে এক উস্কোখুস্কো চুলে, শীর্ণ মুখের একটি লোকের হলুদ রঙের খামটি বের করে পাশের লোকটিকে দেখিয়ে বলেছিল 'বাবুজী, দেখুন তো এই ফটো, আমার বুকের ক্যামেরার ছবি। আমি কি ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানে যেতে পারব? স্নান করলে বাঁচব তো?' *(পৃ: ১৫৭৭, ঐ)* গঙ্গাদ্বারে যাওয়ার শুরু তো সেই একরকম। তাহলে 'এতকাল পরে কী পরিবর্তন' সেই বেদনার তুলিতে চিত্রিরত ভাবনা তিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। আর নিজের কথাই তিনি বলেছেন 'আমার আজকের দেখাটা, আসন্ন সন্ধ্যার পাখির শেষ ওড়ার মুহূর্তের মতো।' *(পৃ: ১৫৭৭, ঐ)*

নিজের আসন্ন সন্ধ্যার কথা উল্লেখ করেছেন গোধূলির সৌন্দর্যে।

পরের প্রতিবেদনটি 'পাখির চোখে ঘুম নেই'। এই উপনামটি অর্থবহ করে তুলেছেন নিজেকে 'পাখি'র সঙ্গে তুলনা করে। নিজের বুকেই রোগের ছোবল, তাই তিনি সারারাত ধরে মানুষের মহামিছিল দেখেছেন। কালকূট তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তার চলমান জনস্রোতকে বুঝতে চেয়েছেন। গ্রাম্য বধূ-কন্যাদের পরস্পরের হাসাহাসি, কথা বলাবলি দেখে তিনি বুজেছেন, বাইরে বেরিয়ে এসে মুক্তির আনন্দে তারা মেতেছে। নেই কোন নিষেধের মানামানি। তিনি এই জনস্রোতকে বলেছেন 'আমার চোখের সামনে দিয়ে সেই রূপের কোটাল চলেছে নিরন্তরের স্রোত-ধারার তটে। এখানে না হয়, নগর-কর্তৃপক্ষ, উজ্জ্বল আলোর সাজে রাতকে দিন করেছে। কিন্তু এই মধ্যরাত্রি পার করেও, এ-কোটালের বান পায়ে হেঁটে, মিছিল করে, আসছে কোথা থেকে?' *(পৃ: ১৫৭৮, ঐ)* ব্রহ্মকুণ্ডে 'স্নানের সামান্য' আবরণে পুণ্যস্নানের আনন্দে মেতেছে নারী পুরুষ। এতকাল পরেও প্রয়াগের স্নান দৃশ্যের সঙ্গে সেই মিল, উৎসর্গের সৌন্দর্য। প্রায় উন্মুক্ত পোশাকে স্নানকে কালকূট উৎসর্গের সৌন্দর্যে দৃষ্টিনন্দন করেছেন। তিনি তার পরিচিত বন্ধু সেটাই দেখাতে চেয়েছেন। মন আর প্রাণ হেথা খেলিছে কোলাকুলি। ভারতের তরুণ প্রধানমন্ত্রীও এই পুণ্যস্নানে সামিল হয়েছিলেন। প্রথমবারে জওহরলাল এসেছিলেন তিনিও আচমন করেছিলেন। একজন 'গঙ্গার মূলধারার, প্রবলস্রোতে ভেসে গিয়েছে।' আর সেই ঘাটেই তিনি এনেছেন 'মায়ের উন্মুক্ত বক্ষে কয়েক মাসের শিশুকে।' জীবনমৃত্যুর এই খেলায় নিরন্তর স্রোত চলছে গঙ্গাস্রোতধারার, মানবজীবন নদীর স্রোতের মত, তার লেখনীর সৌন্দর্য নদীর স্রোতের মত তার নিরন্তর বয়ে চলেছে।

'নির্ভয় শক্তির পথে, নির্ভয়ে' এই উপনামের দিনলিপিতে তিনি লিখেছেন ১০ এপ্রিল। এখানে মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের কথা উল্লেখ করেছেন, কেউ আসে ব্যবসায় লাভের আশায়। সুযোগ বুঝে পান্থশালার মূল্য বাড়িয়ে দিতে। প্রয়াগের মেলার থেকে ভিন্নতর কিছু নয়। তিনি খুঁজছেন তাহলে কীসের পরিবর্তন? যাত্রার প্রতমে ভূমিকাতেই লিখেছিলেন অমৃতে নিয়ে চল 'সেই নিজের আর্তির মধ্যেই এই লক্ষ রূপের অনুপুঙ্খে যাব।' *(পৃ: ১৫৭৯, ঐ)* চলমান রূপের হাটের সঙ্গে তিনিও পা মিলিয়েছেন। চলেছেন 'হর কি পৌরি'র দিকে। মিছিলে দেখেছেন দশনামী সম্প্রদায়ের গুরুজীর অনুশাসন, না বুঝে তীব্র ভ্রুকুটি। কেন 'রাজপুতানী বধূটি' কালকূটকে খামচে ধরেছিল তা জানার দরকার নেই। সাধুদের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন দেখেছেন, পোশাকে, আচারে, চাল-চলনে। ঝুড়িতে বৃদ্ধাকে নিয়ে এসেছে গ্রামশুদ্ধ লোক। দেখা যাক কালকূট কিভাবে দৃশ্যায়িত করেছেন সেই দুর্লভ দৃশ্য!

' "বুড়িমাকে ওরকম করে নিয়ে আসছে কোথা থেকে?"

"গাঁও থেকে।"

"কিরায়া কত?"

আমার কথা শুনে সকলের কী হাসি। কিরায়া কী হে ভিন্‌দেশী? এ তো নাতি তার দাদিকে পূর্ণকুম্ভে স্নান করাতে নিয়ে আসছে।' *(পৃ: ১৫৮০, ঐ)* কালকূট সেই কথার ওপর তার ভাবান্তরকে এইভাবে পাঠকের কাছে ব্যক্ত করেছেন যেখানে বেদনার সঙ্গে আনন্দের অশ্রু ঝরে। দাদির 'নির্ভয় চলাকে' কালকূট নমস্কার জানিয়েছেন। এই উপনামের প্রতিবেদনটি এইভাবে শিল্প সুষমায় মণ্ডিত হয়েছে।

১১ এপ্রিল লিখেছেন —

দূরকালের উমাকে প্রণাম,

প্রণাম একালের উমাদেরও

হর কি পৌরি থেকে ফেরার পথে মহিষবাসিত শকটে 'নর্থ জোন'-এর নৃত্যরত শিল্পীদের মিছিল। তারা নৃত্যগীত প্রদর্শন করতে করতে যাচ্ছিল উদ্দেশ্য 'জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও চেতনা' জাগ্রত করা। কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। কালকূট নর্তকীদের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন 'তরুণীদের কেবল রূপ না, তাদের সুগঠিত দেহের নাচের ছন্দে আর কাজে পুথি থেকে উঠে আসা বর্ণনার মূর্তি দেখে।' *(পৃ: ১৫৮১, ঐ)* তিনি নর্তকীদের সূত্র ধরে অতীতে বিচরণ করেছেন। তিনি ঐ তরুণীদলের সঙ্গে গন্ধর্বদের মিল দেখে বলেছেন 'ভাবি, গন্ধর্বদের রক্ত কি এই অপ্সরাতুল্য তরুণীদের মধ্যে আছে?' *(পৃ: ১৫৮১, ঐ)* গন্ধর্বরাও নৃত্যগীত প্রিয় ছিল আর সৌন্দর্য? তাদের নৈতিক দিক ছিল শিথিল। 'গন্ধর্ব বিবাহ' সম্পর্কে তার মনে ওঠা প্রশ্নে তিনি পাঠকের মধ্যে অতীতের সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখানে তিনি ভৌগোলিক বিবরণ দিয়ে তার নিজস্ব রচনাশৈলীতে। তিনি ইতিহাসের দিকে অতীতচারী হয়ে 'কনখলের সেই যজ্ঞস্থান'টি দর্শন করেন। তিনি বলেছেন 'আমি আজও বিশ্বাস করি, এই অনিত্য সংসারে উমার প্রেম আজও নিত্য হয়ে আছে। এখানে আমার বিস্ময় নেই, দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। এ বিশ্বাস আমার অটল, প্রেমের উৎসর্গপাত্র, নব নব ঋতুর মতোই চিরনতুন।' *(পৃ: ১৫৮২, ঐ)* তিনি উমার সেই অহঙ্কারকে এ'কালের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে প্রণাম করেছেন। তিনি দূরকাল ও একালকে একাকার করেছেন 'আজ আমার প্রণাম সেই দূরকালের উমাকে, সেই সঙ্গে, একালের সারা বিশ্বের উমাদের প্রতিও আমার প্রণাম।' *(পৃ: ১৫৮২, ঐ)* ঘাটের সিঁড়িতে তিন রমণীকে দেখে মনোভাবনা ব্যক্ত করেছেন শৈল্পিক সৌন্দর্যে। 'মনে হল ঘাটের সেই ধাপে, সেই তিন রমণী-মূর্তির কালে ও যুগে আমি পৌঁছতে পারব না।' *(পৃ: ১৫৮২, ঐ)*

'জগৎ বশ মহামায়ায়' এই উপনামে প্রতিবেদনটি লিখেছেন ১২ এপ্রিল। এখানে তিনি স্টেশনের ভীড় ও তাঁকে এলাহাবাদ স্টেশনের স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছে। প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী সব রসাতলে। সোনপুরের রেলের বড় অফিসার তার পরিবারের প্রথম শ্রেণীর কামরাচ্যুত

হয়ে অন্য শ্রেণীতে মেঝেয় বসে এসেছেন। রাগে দুঃখে অপমানে বলছেন 'সব—ইয়েদের (বড্ড অশ্লীল) ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই তিনি ভেঙে দেবেন। কেবল, হ্যাঁ কেবল, বিষুব সংক্রান্তির দিন ঊষায়, ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানটা আগে সেরে নিতে হবে। তারপর ...

তারপর ভদ্রলোকের কণ্ঠরুদ্ধ। চোখ ছাপিয়ে জল।' *(পৃ: ১৫৮৩, ঐ)* এ দৃশ্য অনবদ্যভাবে ধুলে ধরেছেন। মনে হয়নি অপরিচিত কোনো দৃশ্য। অতি চেনা ছবি তিনি তার মতন করে বলে 'পিতাপুত্রীর চোখের ভাষাকে' দৃশ্যায়িত করেছেন। 'এখন কে চিনে নেবে ওই অফিসার পিতাকে, আর এই কন্যাকে।' *(পৃ: ১৫৮৩, ঐ)* এর মধ্যে জীবনের সেই ইচ্ছাটুকুকে বড় করে দেখিয়েছেন, যত কষ্টই হোক পুণ্যস্নান করতেই হবে। আর হাস্যরসের মধ্য য়িে দুই বাঙালী সাধুবাবা ঝগড়াকে আলোকিত করেছেন। পাঠককে এক অনাবিল আনন্দে সামিল করেছেন তার লেখার শৈল্পিক ছোঁয়ায়। ঝগড়াটা দেখা যাক্—" 'শালা বরা'র ছা (শুয়োরের বাচ্ছা?), তোর ওই ছারপোকা আর উকুনের বাসা জটায় আমি ইয়ে করি।" *(পৃ: ১৫৮৩, ঐ)* আর বৈষ্ণবী কেমন করে তার কথায় মাথায় বশ করল সেটা দেখা যাক্। "কী হল গো? আর লড়বেনি?" বৈষ্ণবীর ঠোঁটের বাঁকা হাসির সঙ্গে ঘাড়ও বেঁকে উঠল। বলল, "সেই তো কাল সকাল থেকে শুরু করেছিলে। রেলগাড়ির তাবৎ বাবুরা মায়েরা তোমাদের খেউড় শুনেছে। নড়াই থামালে কেন?" *(পৃ: ১৫৮৪, ঐ)* তাদের দু'জনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে বলল 'আর ভয় পাবেন না, বাবু। কুরুক্ষেত্তরের যুদ্ধ শেষ।' *(পৃ: ১৫৮৪, ঐ)* শিবকিষ্ট দু'জনেই তার পেছন চলতে শুরু করতেইকালকূট তার লেখার মোহমায়া ছড়িয়েছেন 'কী অবাক করো গো অয়ি মা। যেন মহামায়ার পশ্চাদ্ধাবন করল শিব আর কৃষ্ণ। নাকি মহাপ্রকৃতি?' *(পৃ: ১৫৮৪, ঐ)* সাধারণ অর্থে না বলে গূঢ় ভাষায় বলে উপনামটি তার সার্থকতায় পৌঁছে দিয়েছেন।

এরপর ১৩ এপ্রিল 'স্বামী কোথায়, সোনা যে নিয়ে গেল' এই প্রতিবেদনে কালকূট আনলেন এক গ্রাম্য রাজপুত বধূ ও তার শ্বশুরকে। কেউ কারো ভাষা বোঝে না। অথচ বধূটি কালকূটকে ছাড়ে না। ব্রহ্মকুণ্ডে পৌঁছে বধূটি পাণ্ডার সাহায্য নেওয়াতে কালকূট বুঝতে পেড়েছিলেন বৃদ্ধের সোনার মাকড়ি দুটি দুবৃর্ত্তেরা খুলে নিয়েছে, আর কালকূট তাকে দশ টাকা দিয়েছে। কালকূট তাদের ভাষা না বুঝলে তাদের কথার ভাবেভঙ্গিতে বুঝতে পেরেছিলেন ঐরকমই কিছু। এখানে পাণ্ডার সিন্দুকের তখতে বসতে গিয়ে কালকূটের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা তিনি এইভাবে তুলে ধরেছেন "আপনি স্নান করলেন না, আর তখতে এসে বসে পড়লেন, জানেন, এ তখতের জন্য রোজ আমাকে বিশ রুপিয়া ভাড়া দিতে হয়।"

"রুপিয়া আমিও দেব।" *(পৃ: ১৫৮৫, ঐ)* টাকা দেওয়ার কথাতেই সব সমঝোতা হয়ে গেল। কী নিপুণভাবে পাণ্ডাডের একটা দিক তুলে ধরলেন।

'সাধু প্রসঙ্গ, সাধু দর্শন' এই প্রতিবেদনটি ১৪ এপ্রিল লিখেছিলেন। এখানে সাধুদের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। তাদের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে সেটা তুলে ধরেছেন। আর নাগা সন্ন্যাসীদের মিছিলে পৌঁছে তিনি হতাশ। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন প্রয়াগের মেলার মত রমণীপুরুষরা সাধুসন্ন্যাসীদের রথ স্পর্শ করতে ছুটে আসছে না। ব্রহ্মপুণ্ডে সন্ধ্যারতি দেখতে দেখতে তার মনে হয়েছে 'বিশাল সেই অগ্নিশিখার প্রদীপ। মানুষ হাতে নেয় কেমন করে?' *(পৃ: ১৫৮৬, ঐ)* খুব সাধারণ জিনিস, প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ লোক সন্ধ্যারতি দেখে। তাদেরই মনে জেগে ওঠা প্রশ্ন তার কাহিনীতে তুলে ধরেছেন। চেনাছবিই তাঁর লেখার গুণে অর্থবহ হয়ে উঠেছে। ব্রহ্মকুণ্ডের আরতির পর সেই রাজস্থানী বধূটি তাদের তাবুতে কালকূটকে নিয়ে গেল। কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ তাকে জড়িয়ে ধরেনি। কালকূট মুগ্ধ এদের পরিবারের উদারতায়। তিনি বলেছেন ''স্বামীর সোহাগ যখন ভোগ করবে, তখন অয়ি রাজপুতানী বধূ, এ বঙ্গবাসীকে যদি মনে পড়ে, এই গঙ্গাদ্বারের পূর্ণকুম্ভে সেটাই আমার পুণ্যের ফল।'' *(পৃ: ১৫৮৬, ঐ)* এই কথার মধ্য দিয়ে কালকূট ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে তুলেছেন।

এরপর 'ইতিহাস ও অমৃতের উৎস সন্ধানে' লিখেছেন ১৬ অপ্রিল। এটিই এই রচনার শেষ উপনাম। পুণ্যস্নানের জন্য সাধুদের যে মিছিল, সেটা অল্পসময়ের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। কালকূটের মন ভরল না। হাতী নেই, তার পরিবর্তে বিচিত্র পোশাকে ব্যাণ্ড পার্টি, হিন্দি গানের আওয়াজ, গুরুজীরা চলেছে চাকাওয়ালা রথে। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানপর্ব চলছে পালা করে। একবার পুণ্যার্থীরা একবার এক একটি আখড়ার সাধু-সাধুনীরা। কালকূট গঙ্গাদ্বারের ভৌগোলিক বিবরণ দিয়েছেন। কালকূট নিরিবিলি স্থান দেখে অতীতচারী হলেন। বর্তমানের সঙ্গে অতীতের, মহাভারতের স্থানে বিচরণ করতে লাগলেন। তিনি অর্জুনকে দেখতে পেলেন ক্রুদ্ধ গর্ন্ধবরাজের সামনে। কিভাবে এনেছেন সেই দৃশ্য গন্ধর্বরাজ। অসময়ে অর্জুনকে দেখে তাকে হত্যা করতে চাইলেন। 'অর্জুন বললেন, ''দুর্মতি, সমুদ্র, হিমালয়ের পার্শ্বদেশ আর এই নদীকূল, এই তিনটি প্রদেশ, দিনে-রাত্রে-সন্ধ্যায়, কারও অধিকৃত জায়গা হতে পারে না ... এই পবিত্র স্থানে আসার কোনও বাধা আমি মানব না।'' *(পৃ: ১৫৮৮, ঐ)* তিনি গন্ধর্বদের লীলাভূমি খুঁজতে লাগলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন 'মহাভারতে অমৃতস্থানে অমৃতমন্থনে, কালকূট গরলের উদ্ভব হয়ে দেবাসুরদের মৃত্যু ঘনিয়ে তুলেছিল। মহাদেব সেই গরল পান করতে গিয়ে গলাধঃকরণ করতে পারেননি। গলাতেই বিষ আটকে থাকায় তিনি নীলকণ্ঠ।' *(পৃ: ১৫৮৯, ঐ)* তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেছেন 'আমি এসেছি অমৃত পান করে বিষের জ্বালা জুড়োতে। সেই জ্বালা জুড়োবার সঙ্গেই আমার রয়েছে আত্মানুসন্ধানের পথে ফেরা।' *(পৃ: ১৫৮৯, ঐ)* তিনি বলেছেন 'আমার ভিতরের অন্ধকারে যে বিষের মন্থন চলছে। আমি এই লক্ষরূপের হাটে, এই অমৃত যোগে, আমার সেই বিষমুক্ত জীবনের সন্ধান করছি। আমাকে আমার

জগৎ দাও। বিশ্বাস দাও। উৎসর্গের শক্তি দাও।' *(পৃ: ১৫৮৯, ঐ)* এইভাবেই তিনি অমৃতের তৃষ্ণাকে শিল্পমণ্ডিত করেছেন। কাহিনীর শেষ করেছেন এইভাবে। 'উপনামগুলো'র বিষয়বস্তু আলাদা আলাদা ভাবে শিল্পমণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে যে শিল্পরূপ প্রস্ফুটিত হওয়ার কথা তেমনভাবে শিল্পমণ্ডিত হয়ে ওঠেনি। তবু এই লেখার মধ্যে তার যে শিল্পরূপ বিকশিত হয়েছে সেটাই আলোচনা করা হল। এরপর 'হারায়ে সেই মানুষে'-এর শিল্পরূপ আলোচিত হবে। এখানে কালকূট বাল্যকালের কথা লিখেছেন। অতীতচারণার মধ্য দিয়ে এই কাহিনী রচনা করেছেন। এক দুষ্টু বালকের কথা না শোনার, বাধন না মানার কথা বলেছেন। দিদি শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। দিদি বলছে 'বট্ ঠাকুরকে প্রণাম করগে যা।' দিদি চোখ পাকিয়ে বলছে 'আমাকে তুই বলছিস? বাড়ি থেকে বারণ করে দিয়েছে না?' *(পৃ: ৭৬০, কালকূট রচনা সমগ্র, ২য় খণ্ড)* বালকটি বলল 'ওসব আমি পারব না।' *(পৃ: ৭৬০, ঐ)* বাড়ীর নিষেধ সত্ত্বেও বালকটির মধ্যে একটা নিষেধ না মানার ইচ্ছা প্রকট হয়ে আছে। কালকূট শিশুমনের উপযোগী করেই তার চিত্ররূপ দিয়েছেন। গ্রাম্য লোকটিকে সে প্রণামও করতে চায় না আবার প্রণাম করার পর তার আদরে, স্নেহপূর্ণ কথায় মুগ্ধ হয়ে যায়। এই কাহিনীতে পূর্ববঙ্গের ভাষার ব্যবহার আছে। বেহারারা তাকে জিজ্ঞাসা করে 'তুমিও যাইতানি কোনে বাবু?' *(পৃ: ৭৬০, ঐ)* বালকটি পাল্‌কিতে না উঠে হাঁটতে থাকে। বুট পড়ে আর হাঁটতে পারে না। জুতো খুলে জুতো হাতে নিয়ে হাঁটতে থাকে। সুরেনদা, জামাইবাবুর দাদা, বলে উঠলেন 'রামো রামো, এবারে সবাই চাষা বলবে যে।' *(পৃ: ৭৬২, ঐ)* জামাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন এখন ঠিক আছে। গ্রামের পথ দিয়ে যেতে বালকটির চোখ দিয়ে গ্রামবাংলা উঠে এসেছে। দক্ষিণবাংলায় গোল পাতায় ছাওয়া ঘর আর এই দেশে ছন দিয়ে ছাওয়া ঘর। দিদির শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে তারই বয়সী, তার থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পোশাকে বর্ণনা দিয়েছেন এত সুন্দরভাবে যে সে দৃশ্য যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দিদির শ্বশুর বাড়ীতে বালকটি নতুন এসেছে। তার সবকিছু লেখক কালকূট তাঁর বালকমন নিয়ে চিত্রিত করেছেন। সুরেনদার ছেলের নাম গান্ধী। গান্ধী যে কারো নাম হতে পারে সেটা বালকটি ভাবতেই পারে না। সে তো একজনই 'মহাত্মা গান্ধী'। গান্ধী নামের সূত্র ধরে কালকূট বালকটির ছেলেবেলাকে চিত্রিত করেছিল। সে সময় গান্ধীবিরোধী হাওয়া ছিল।

দিদির বাড়ির সবকিছু তার আশ্চর্য মনে হয়। লেখক কথার জাল বুনে তার সেই বিস্ময়ভাবকে চিত্রিত করেছেন। তাঁত ঘরে কিভাবে মাকু চলে, কিভাবে পাট নামায় সব সে দেখে। 'সোরি'র সঙ্গে পুকুরঘাটে দেখা হয়, সোরি তাকে মধুভূত ভেবে ভয় পায়। এ'কথা সুরেনদার মেয়ে হেলেনের মুখে শুনে রাগ করে তবুও সে মধুভূত যে গাছে ফাঁসি দিয়েছিল সেখানে যেতে চায়। হেলেন তাকে গাছটা দেখিয়ে দিয়ে ভয়ে দৌড়ে চলে গিয়ে বাড়িতে বলে দেয়।

বালকটি তেঁতুল তলায় যায়। এখানে লেখক কালকূট একটা আধিভৌতিক পরিবেশ তৈরি করেছেন। শিশুমনের উপযোগী করে সেই ভৌতিক পরিবেশ। দেখা যাক কেমন সেই ভৌতিক পরিবেশ। 'আমি কাছে আসতেই, ঝপ করে একটা শব্দ হল। একটা পাখিকে উড়ে যেতে দেখলাম। 'সে' কী না জানি না। কিন্তু আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম গাছের তলাটা কেমন থম্ থম্ করছে। না দেখতে পেলেও, সেখানে যে কেউ আছে, তা বুঝতে পারছি। একেবারে গোড়ায় যাওয়াটা ঠিক হবে না বোধ হয়।' *(পৃ: ৭৬৯, ঐ)* বালকজনের অভিব্যক্তি, বেল্টের আংটা ধরে আছে। মনটা ভয় ভয় করছে এমন সময় সুরেনদার ডাক। আশ্চর্য শিল্পসুষমা দিয়ে এই পরিবেশটি সৃষ্টি করেছেন। আবার কালকূট এটাও দেখিয়েছেন বাড়ির বড়রা তাকে যেতে নিষেধ করলেন, কিন্তু ভৌতিক কারণটা কিছুই বললেন না। কী বললেন দেখা যাক্। সুরেনদা ''হাত ধরে বললেন, 'মাঠে জঙ্গলে এ রকম একলা আসতে আছে? শীগ্‌গির চল।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'এলে কী হয়?'

সুরেনদাদা আমাকে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'কত কী হয়। হায়েনা আসতে পারে। পাগলা শেয়াল তাড়া করতে পারে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'শেয়াল পাগল হয় নাকি?'

সুরেনদাদা বললেন, 'হয় না? কুকুর যেমন পাগল হয়ে যায়, শেয়ালও তেমনি পাগল হয়। তখন সে সবাইকে কামড়ে দিতে আসে। পাগলা শেয়ালের দাঁতে খুব বিষ থাকে।'

শেয়াল পাগল হয়, কোনোদিন শুনি নি। জিজ্ঞেস করলাম, 'দিনের বেলা কি তারা বেরোয়?' '' *(পৃ: ৭৬৯-৭৭০, ঐ)*

শিশুমনের উপযোগী করে কথাগুলো তুলে ধরেছেন লেখক কালকূট।

সোরি তাকে ভূত ভাবায় সোরির সঙ্গে প্রথমে কথা বলেন নি। সোরির সঙ্গে হেলেন কিভাবে বন্ধুত্ব করিয়ে দিয়েছিল দেখা যাক, একটা বাটির মধ্যে কতগুলো নকুলদানা এনে বালকটির হাতে দিয়েছিল, মুখে কিছু বলে নি। ''হেলেন ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'আহা, হাতে করে দিচ্ছিস, আর বলতে পারছিস না?'

সোরি আমার দিকে চেয়ে বলেছিল, 'খাও'।

আমি অবিশ্যি নকুলদানা খেতে খুব ভালোবাসি। জমানো চিনির প্রলেপটা চুষে চুষে খেয়ে, সব শেষে, ভাজা ছোলাটা চিবিয়ে খেতে, খুব ভালো লাগে।

কিন্তু আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

সোরি আর একবার হেলেনের দিকে দেখল। বলল, 'তোমার জন্য এনেছি।'

'কেন?'

'তুমি খাবে বলে।'

'কেন?'

তখন সোরি আবার মাথা নিচু করে, চুপ করে ছিল।'' *(পৃ: ৭৭১, ঐ)*

সোরি আবার বলছিল '' 'তুমি মিছিমিছি কেন আমার ওপর রাগ করেছ? আমি তো ভয় পেয়েছিলাম।'

তবু আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কিন্তু নকুলদানা খাব কেন?'

সোরি বলেছিল, 'তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না বলেছিলে কেন?'

তখন হেলেন বলেছিল, 'সেইজন্য আপনাকে ও নকুলদানা খাওয়াচ্ছে। আপনি আর রাগ করবেন না।' '' *(পৃ: ৭৭১-৭৭২, ঐ)* এইভাবে শৈল্পিক সুষমায় এই মান ভাঙানোর ব্যাপারটি। আবার সোরির সঙ্গে ভাব হয়ে যাওয়ার পর ওদের বাড়ি যেতে চাওয়ায় হেলেন রাগ করেছিল। ঈর্ষায় বাড়ি ফিরে যেতে পারে নি, সোরিদের বাড়িতে গিয়েছিল।

বাল্যকালের বন্ধুত্বের হাসি-কান্নার চিত্র উঠে এসেছে অনবদ্যভাবে। লেখক তারই ছেলেবেলার চিত্র নিজের মত করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কল্পিত, তবুও দক্ষতায় সাবলীল ভাষা মাধুর্যে তুলে ধরেছেন। পূর্ববঙ্গে বড়দের 'আপনি' করে বলে। তিনি হেলেনের মধ্যে সেটা এনেছেন। নতুন মামাকে 'আপনি' বলে। বালকটি পছন্দ করেনি কিন্তু হেলেন তাকে 'আপনি' করেই বলেছিল। সোরিদের বাড়িতে গিয়ে সোরি কৃষ্ণযাত্রায় গেয়েছিল 'আমি যখন বসে থাকি গুরুজনের মাঝে / নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশি, আমি মরি লাজে।' *(পৃ: ৭৭২, ঐ)* বালকটি রেকর্ড থেকে শেখা নতুন গানটি গেয়েছিল 'নিশিথে যাইয়ো ফুল বনে রে ভ্রমরা / নিশিথে যাইয়ো ফুল বনে।' *(পৃ: ৭৭৩, ঐ)* সোরি খুশি হয়ে বলেছিল 'কাল তোমাকে রোয়াইল খাওয়াব।' *(পৃ: ৭৭৩, ঐ)* দুটি বালক বালিকা শিশু মনে আনন্দের প্রকাশ, নান্দনিকভাবে এনেছেন। গানের মধ্য দিয়ে অন্য একটা আবেশ এনেছেন। দিদির নিষেধ কিছুই সে শোনে না। দিদিকে বলে 'ও একটা পেতনি'। সুরেনদার বউ, বড়দিদি, স্নেহের সুরে নিষেধ করেছিল 'ছি ভাই, দিদিকে ও রকম বলতে নেই।' *(পৃ: ৭৭৩, ঐ)* সন্ধ্যাবেলায় হেলেন মামার রাগ ভাঙাতে গিয়েছিল। দেখা যাক শিশুমনকে কিভাবে রূপ দিয়েছেন; হেলেন বালকটির গায়ের কাছে সরে এসে বলেছিল '' 'মামা, আপনি রাগ করছেন?'

'না।'

'আমার খুব মন খারাপ হয়েছে।'

হেলেনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন?'

হেলেন আমাকে পাল্টা জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি কি সোরির মামা?'

অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'আমি ওর মামা হতে যাব কেন?'

হেলেনের গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। তবু বলেছিল, 'তবে আপনি ওকে এত ভালোবাসেন কেন?'

হেলেনের কথা শুনে আমি আরো অবাক হয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'সোরি তো ভালো মেয়ে।' '' *(পৃ: ৭৭৩-৭৭৪, ঐ)* এই কথা শুনে অভিমানে কেঁদে উঠেছিল কিন্তু কারণটা বলে নি। ঈর্ষাকে কত শৈল্পিকভাবে তুলে ধরেছেন।

মাধবদীর হাটে পায়ে পায়ে এগিয়ে পথ হারিয়ে বেদেদের ডেরায় চলে গিয়েছিল। কেমন করে সে সম্মোহিত হয়েছিল, বেদেনি বুড়ি বলছে 'আইয়ো আমার নদ্যার চাঁন্, তোমারে ভানুমতীর খেলা দেখাই।' *(পৃ: ৭৭৭, ঐ)* দিদির বয়সী মেয়েটি তার গাল টিপে 'এস আমার কালিয়া নগর, তুমি আমার ছোট বর। (আইয়ো আমার কালিয়া নাগর, তুমি আমার ছোট সোয়ামী।)' *(পৃ: ৭৭৭, ঐ)* মেয়েটির নাম সারি। সারি বলল '' 'লাগ্ ভেলকি লাগ্, আমার কালিয়া নাগরের চোখে লাগ্।'

'কেমন লাগছে গো?'

বললাম, 'ভালো।'

সারি হাত বাড়িয়ে বলল, 'তবে দুটো পয়সা দাও।'

আমি পকেট থেকে দুটো পয়সা বের করে ওর হাতে দিলাম।'' *(পৃ: ৭৭৮, ঐ)* সারি সব পয়সা দিয়ে দিতে বলাতে বালকটি দিতে পারে নি, সোরি, গান্ধী, হেলেন রেণুর জন্য কিছু কিনে নিয়ে যাবে। সারি তাকে বলে, 'নাগর, মূলো দিয়ে কাছিমের মাংস রেঁধেছি। দুটো গরম ভাত খেয়ে যাও।' *(পৃ: ৭৭৮, ঐ)* কেমন করে ভাত খেয়েছিল তাও বলতে পারে না। লেখক কালকূট বেদেনীদের কেমন করে ভুলেছিল সেটা অত্যন্ত শিল্পচেতনভাবে তুলে ধরেছেন। বালকমন 'ভানুমতীর ছেলে' সম্মোহিত হয়েছিল। এই ঘটনায় দিদির শ্বশুরবাড়ি আসার পরে দিদি 'থাপ্পড়' মেরেছিল। দিদিকে রাগ করে বলেছিল 'তুই একটা পেত্নি রাক্ষুসী, তাড়কা রাক্ষুসী, সূর্পণখা।' *(পৃ: ৭৭৯, ঐ)* রাতে আবার হেলেন ভাব করতে চেয়ে জানতে চেয়েছিল 'আপনার বেদে হতে ইচ্ছে করছিল?' *(পৃ: ৭৮০, ঐ)* রাগ পড়ে গেলে বালকটি শুয়ে শুয়ে কালিয়া নগরের গল্প বলেছিল। লেখক বলেছেন, 'বেদেনী সারি-প্রেমের কী শিক্ষা!' *(পৃ: ৭৮০, ঐ)* দিদির বয়সী সারি বেদেনির জন্য মনে সুপ্ত প্রেমের আভাস দিয়েছেন, লেখক কালকূট নিজেরই বাল্যকালকে স্মরণ করেছেন এরকম শিল্পরস মণ্ডিত করে।

সোরি, হেলেন আর বালকটি তিলফুলের ভিতরে ঢুকে যাওয়া মৌমাছি ধরে কৌটায় পুরে রেখেছিল। মৌমাছি কৌটা থেকে পড়ে গিয়ে উড়ে গিয়েছিল। বালকটি পরে মৌমাছি ধরে কৌটায় পুরে সোরির পায়ের কাছে মান ভাঙিয়েছিল। রাগ পড়ে গেলে সোরি বালকটির হুল ফুটে যাওয়া হাতে চুন লাগিয়ে দিয়েছিল। এতে হেলেন রাগ করে চলে গিয়েছিল। তিনটি শিশুমনকে আশ্চর্য

রূপ সৌন্দর্যে চিত্রিত করেছেন। লেখক নিজে তো বাল্যকালে ফিরে গেছেন, পাঠককুলকেও বাল্যকালে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার আগের দিন সোরি ওর চূড়ো, মুক্তোর মালা সব দিয়ে দিতে চায়, ওর লাল শাড়ি দিয়ে সাজাতে যায়, কিন্তু বালকটি শাড়ীও পড়ে না, ওর দেওয়া জিনিসও নেয়না। সোরি দুঃখ পেল, হেলেন এসে ওর দুঃখের ভাগীদার হল। গাঁয়ের সকলের সঙ্গে একটা প্রীতির বন্ধনে ধরা দিয়েছিল বালকটি। কিন্তু বালকটি সব বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে ফিরে যায়। এই স্মৃতিকথার শেষে কালকূট বলেছেন 'তথাপি আজ মনে হইতেছে, জীবন-ফসলের শীর্ষে, একটি শিশিরবিন্দু টলমল করিতেছে।' *(পৃ: ৭৮৩, ঐ)*

কাহিনীতে এক স্বপ্নময় অনুভূতির পরশ আছে। সেই ছোঁয়ায় রচনাটির বিষয়বস্তু বলার ঢঙে এক কাব্যিক শিল্পরূপ পেয়েছে। বিশেষ বৈশিষ্ট্য এর ভাষা বৈচিত্র্য। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে সেই ভাষা বলিয়ে নিয়েছেন।

এরপর মুক্তবেণীর উজানের শিল্পরূপ আলোচনা করা হবে। ত্রিবেণী সঙ্গম গুপ্ত নয় মুক্ত। প্রয়াগে তিন ধারার মিলন, আর ত্রিবেণীতে তিনধারা ছাড়াছাড়ি। ত্রিবেণী সঙ্গমে যাওয়ার পথে প্রথমে দেখা হয়েছিল এমদাদ আলির সঙ্গে।

এরপর মুক্তবেণীর উজানের শিল্পরূপ আলোচনা করা হবে। ত্রিবেণী সঙ্গম গুপ্ত নয় মুক্ত। প্রয়াগে তিন ধারার মিলন, আর ত্রিবেণীতে তিনধারা ছাড়াছাড়ি। ত্রিবেণী সঙ্গমে যাওয়ার পথে প্রথমে দেখা হয়েছিল এমদাদ আলির সঙ্গে। মুক্তবেণীতে যাওয়ার আগে কালকূট প্রথমে গেলেন জাফর খাঁ গাজীর মসজিদে। সঙ্গী জাফর খাঁ গাজীর বংশধর এমদাদ আলি। তার চোখ দিয়ে তিনি দেখলেন সেই মসজিদ, উঁচু টিলার মত জায়গা থেকে মুক্তবেণীকে দর্শন করলেন। সেইখান থেকে অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকন করলেন। এরপর আগে হিন্দু-মুসলমানের যে সম্প্রীতি সেটা গাজীকে দিয়ে তার পূর্বপুরুষের কাহিনী বলিয়ে নিয়েছেন। দেখা যাক্ কিভাবে বলেছেন, " 'বাঁশবেড়ের খামারপাড়া চেনেন তো বাবু?' এমদাদ আলি খাঁ আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো।

আমি মাথা নেড়ে বললাম 'না।'

'ত শোনেন বলি।' " *(পৃ: ১০৯৬, ঐ)* ভিখিরিদাস আর জাফর খাঁর 'গলাগলি পীরিতে'র কথা এনেছেন এর সঙ্গে ইতিহাসের পাতায় চলে গেছেন। উঁচু টিলার উপর দিয়ে মুক্তবেণী দেখতে দেখতে তিনি অতীতচারী হয়েছিলেন। অতীতচারী হয়ে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দে ধোয়ীর 'পবন দূতম'-এর কথা বলেছেন। দিল্লির মুঘলদের আগে গৌড়বঙ্গে পাঠান সুলতানদের রমরমা কথা বলে বিপ্রদাস বা কবি কঙ্কনমুকুন্দরামের কথা বলেছেন। তিনি মানসচক্ষে এনেছেন 'ত্রিবেণী, আদি সপ্তগ্রামের থেকেও যেন বড়, বিশাল এক বন্দর। সরস্বতী আর গঙ্গার বুক জুড়ে, হাজার জলযানের মাস্তুল ঠেকে আছে আকাশে। হাজার মানুষের কাজের ব্যস্ততা। সমুদ্রগামী বিশাল নৌকায় মাল খালাস

আর ভরতির দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি হাঁক-ডাক। যদি বলি, সেটা মুসলমান আমলের প্রারম্ভ, তা হলেও দূরদেশী সওদাগর আর নাবিকদের ভিড়ও কম না। তারপরে ছবিটা আস্তে আস্তে বদলে যেতে থাকে।' *(পৃ: ১০৯৫, ঐ)* অত্যন্ত কাব্যিক ঢঙে তিনি অতীত থেকে বর্তমানের দিকে এগিয়ে এসেছেন। 'যাঁর উঁচু মাস্তুলে মাস্তুলে ত্রিবেণীর আকাশের চেহারা গিয়েছে বদলে। জন-জনতার চেহারায়ও রঙ বদলের পালা। ঘুরে গিয়েছেন আগেই, তখন প্লিনি, টলেমি, উইলিয়াম হেজ্ আর স্ট্রাভোরিবাসের যুগ।।' *(পৃ: ১০৯৫, ঐ)* পুরনো দিনের স্মৃতির পথ বেয়ে তিনি শ্রুতিধর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কাহিনী বলেছেন। আবার অতীত থেকে বাস্তবে ফিরে এসেছেন এমদাদ আলির ডাকে। কখনো এমদাদের মুখে শোনা কিংবদন্তী, কখনও ইতিহাসের পথ দিয়ে অতীতে চলে যাওয়া এই দুটোর মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন অত্যন্ত কাব্যময় সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে।

মসজিদ থেকে ফিরে এসে ত্রিবেণী যাওয়ার পথে এক অভিনব মহিলা শবযাত্রীর সঙ্গী হয়ে কাঁধ মিলিয়েছিলেন। বেরিয়েছিলেন ত্রিবেণী যাওয়ার জন্য। কিন্তু যাওয়ার পথে সেই শবযাত্রার দৃশ্যের খুঁটিনাটি চিত্র তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সংবেদনশীল মন নিয়ে। চারজন ষাটোর্দ্ধ মহিলা শবযাত্রীর সঙ্গে আর একজন ঠাকুরমশাই চলছিলেন পাশে পাশে। তিনি গাইছিলেন —

'এ বড় সাধের আসা যাওয়া।
কে আনলে সেধে
নাকি যাও, অপনি সেধে
কেউ করে না তার বলা কওয়া
এ বড় সাধের আসা যাওয়া।' ... *(পৃ: ১১০২, ঐ)*

মহিলা শবযাত্রীদের ভাষা লক্ষ্য করা যাক্। ঠাকুরমশাই বললেন, 'ছি ছি ছি, সন্ধেতারা, এর মধ্যে তুমি ফুর্তি দেখলে কোথায়? এ হল গে, তোমার বাঁচা মরার তত্ত্বের গান।' *(পৃ: ১১০২, ঐ)* এক শববাহিকার কথা 'মিনসের শরীরে দুঃখ কষ্ট বলে যদি কিছু থাকে।' *(পৃ: ১১০২, ঐ)* কথার মধ্যে গ্রাম্য ভাষা, 'মরণ', 'মিনসে' উচ্চারণে গ্রাম্য ধ্বনি এনেছেন।

পরে তিনি বুঝেছেন কার শবদেহ বইছেন, কাদের সঙ্গী তিনি হয়েছেন। এদের সঙ্গে চলতে চলতে তিনি বারবণিতাদের জীবনকে ও তাদের জীবনপ্রণালীকে এক সহানুভূতির সঙ্গে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। ত্রিবেণীর শ্মশানঘাটে পৌঁছে শবদেহ সৎকারের ক্রিয়াকাজের মধ্য দিয়ে জীবনের কঠিন সত্যকে সমবেদনার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। বারবণিতার 'দয়ার শরীর' লেখক কালকূটকে আপ্যায়ণ করেছে গৃহস্থদের মত পারিবারিত মন নিয়ে। 'স্থান কাল বিশেষে গৃহস্থ অ-গৃহস্থ-রূপ ভাগাভাগি করা যায় না। স্বীকার করতে হবে, তাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে না, সমাজের পিছন দরজার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। বরং গৃহস্থের সদরের ছবিই যেন স্পষ্ট। *(পৃ:*

১১১১, ঐ) তাঁরা কালকূটের আপ্যায়ণের ব্যবস্থা করেছিল গোরা চক্কোত্তির বাড়িতে। সেখানে পারিবারিক গৃহকোণে আর এক জীবনকে দেখলেন। প্রথমে গোরা চক্কোত্তিমশাইকে রাগী, খিটখিটে মনে হলেও এক অভিমানে আহত শিশুকে আবিষ্কার করেছেন। তার মেয়ে পুষি কালকূটকে আগেই চিনেছিল। খাওয়া দাওয়ার পরে পুষি ওর বাবাকে কালকূটের ছবিসহ একটি পত্রিকা দেখিয়েছিল। পত্রিকাটি দেখে পিতা পুত্রীকে নিয়ে গর্বিত হয়ে উঠলেন। পুত্রী খুশিতে আটখানা। তাদের খুশি প্রকাশ করেছেন এইভাবে — " 'কিন্তু তুমি তো আমাকে অবাক করলে হে। তুমি একটা লেখক মানুষ, ওদের মড়া বয়ে আনলে?'

কী জবাব দিতাম জানি না। তার আগেই পুষি বলে উঠলো, 'তা নইলে যে আমাদের বাড়ি আসা হতো না।'

গৃহিণী হেসে উঠলেন, 'যা বলেছিল।'

কর্তা গৃহিণীর দিকে তাকিয়ে হাস্য করলেন। চতুর্থ হাসি।" *(পৃ: ১১২৩, ঐ)* চক্কোত্তিমশাই লেখক কালকূটকে আবার ত্রিবেণীর ঘাটে পৌঁছে দিয়েছিলেন। গঙ্গার ঘাটে ক্ষ্যাপাবাবা শ্যামাক্ষ্যাপাবাবা কালকূটকে দেখা করতে বলেছেন একথা জানিয়েছিলেন। ত্রিবেণীর ঘাটে পৌঁছে বারবণিতা চন্দ্রবলীর শবদেহে আগুন দিতে দেরি হয়েছিল পুলিশ এসেছিল বলে। এ নিয়ে বিস্তর ঝামেলা শেষ করে তবেই পারলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবস্থা করতে পেরেছে। ত্রিবেণীর ঘাটে লক্ষ লোকের মধ্য দিয়ে তিনি যে মানুষগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, জেনেছিলেন তাঁদের জীবনের না-জানা অনেক দিক। তাই তিনি গঙ্গার পবিত্র ধারা বইয়ে দিয়েছেন নিজ লেখনীর মধ্য দিয়ে। শ্যামাক্ষ্যাপাবাবার সঙ্গে দেখা করার পরে আর নিজ গন্তব্যস্থলে যেতে পারেন নি। শ্যামাক্ষ্যাপা বাবা ও পালিতা কন্যা গঙ্গাযমুনা ও পালিত পুত্র রতন ও শিষ্যদের সঙ্গে নৌকায় রাত্রি কাটালেন। রাত্রে গঙ্গা যমুনার গান শুনতে শুনতে এক স্বপ্নলোকে চলে গেলেন।

'পাটনী হে, আঁধারে পথের দিশা নাই।
এ বাঁকে পথ ও বাঁকে পথ
ঘুরপাক খাচ্ছে আপন মত
যে পথে যাই ধাঁধায় ফিরি এক ঠাঁই
বলেছিলে দেখিয়ে দেবে
কী খেলা চলেছে ভবে
ছ'পথ ঘুরে দশের মাঝে কিছু দেখি নাই।' *(পৃ: ১১৩৪, ঐ)*

ক্ষ্যাপাবাবার রুদ্ধ স্বর মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে 'হে মহাকাল হে মহাকালী।' ... *(পৃ: ১১৩৪, ঐ)* এক স্বপ্নময় ঘোরের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। জোয়ার আসায় কখন নৌকা ছেড়ে দিয়েছে তিনি টের

পান নি। সকাল হতে বুঝতে পেরেছিলেন ত্রিবেণী ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে এসেছেন।

গুপ্তি পাড়া আর কালনার মাঝামাঝি ক্ষ্যাপাবাবার আশ্রমে তিনি দু'রাত্রি কাটিয়ে আশ্রমের সংসারের এক নতুন দিক দেখলেন। গঙ্গা নতুনরূপে ধরা পড়ল। গঙ্গা সংসারী হতে চায় না, সেখানে সে যেতে ভয় পায়, সংসারের কিছু না জানার জন্য। সে বলে, " 'কেউ যে আসেনি, তা তো নয়। অনেকে এসেছে, গেছে, আরও আসবে। ঠিক তাকেই চিনে নিতে পারবো কি?' আমার চোখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে, হঠাৎ শব্দ করে একটু হাসলো, 'নিজেকেই চিনতে পারিনি, তাকে চিনবো কেমন করে? জীবনটা সকলের একরকম নয়।' ও আবার পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করলো।" *(পৃ: ১১৩৬, ঐ)* গঙ্গার কথাগুলো কালকূটের 'মস্তিষ্কের সীমানায় প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। ও চোখের আড়ালে চলে গেল। রৌদ্রালোকিত শূন্যভূমিতে দাঁড়িয়ে মনে হলো, আমার চোখের সামনে, সংসারের দিগন্ত এক অসীমে হারিয়ে যাচ্ছে।' *(পৃ: ১১৩৬, ঐ)* এক অপরূপ কাব্য সৌন্দর্যে কাহিনীকে শেষ করেছেন। মুক্তবেণীর উজানের শেষ অংশ এই কাহিনীর চরিত্রগুলো ভাষাগত দিক লক্ষণীয়। ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ কথা তিনি চরিত্রের মুখে বসিয়ে দিয়ে চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করেছেন। কখনই মনে হয়নি আরোপিত চরিত্র। গঠন বৈচিত্র্যে অনন্যরূপে পাঠকের চোখে ধরা পড়েছে।

এতক্ষণ কালকূটের মানবজীবন কেন্দ্রিক রচনাগুলির মধ্যে লক্ষ রূপের আরশিতে মানবজীবন অন্বেষণ পর্বের রচনাগুলি আলোচনা করা হল। প্রতিটি কাহিনীতেই ভাষা, প্রকরণগত দিক, শব্দচয়ন ও মানুষী ভাবনাকে উদাসী ভাবনায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি তাঁর কথকের ভঙ্গিতে তাঁর কাহিনীগুলিকে পথের বর্ণনা, বিষয়ে অভিমুখ খুঁজেছেন। কথার বাক্যজাল বুনে তিনি পাঠককে কাহিনীর ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অনবদ্য বলার ভঙ্গিতে চরিত্রগুলির অন্তররূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন।

এরপর মানবজীবন কেন্দ্রিক রচনাগুলির প্রকৃতি কেন্দ্রিক রচনাগুলিতে শিল্পরূপ কতটা পরিলক্ষিত হয়েছে সেটা আলোচনা করা হবে। প্রকৃতি কেন্দ্রিক রচনাগুলির বন পর্ব প্রথমে আলোচনা করা হবে। এই পর্বের ত্রয়ী উপন্যাস মন চল বনে, বনের সঙ্গে খেলা ও প্রেম নামে বন। তিনি বিভূতিভূষণের চরণরেখা ধরে চলেছেন। প্রথম কাহিনীতে 'মন চল বনে' তে দেখা যায় বনের প্রান্তসীমা ও বনজীবনের মানুষগুলোর প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ সখ্যতা। এখানে এসে তিনি বনকে চিনতে শুরু করেছেন তিপু ও নিতুর চোখ দিয়ে। আর অরণ্যসত্তা গাঙ্গুলিমশাই-এর চোখ দিয়ে পৌঁছে গেছেন প্রকৃতির অন্তররূপ দর্শনে। ট্রেনের যাত্রী হয়ে বনজীবনের পথে যাত্রা শুরু। তিনি বলেই যাচ্ছেন তবে বনভোজনে নয়। বনে যাওয়ার উদ্দেশ্য বনপরিবেশে থেকে তাদের চোখ দিয়ে বনজীবনকে চিনে নেওয়া। কাহিনীর শুরুতেই যে ব্যক্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি হলেন

গাঙ্গুলিমশাই। তার মুখের ভাষাটা একটু লক্ষ্য করা যাক্। 'শালাগোর যত বাটপাড়ি আর জুয়াচুরি।' কালকূট যশোরিয়া টানে তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'শালার কাণ্ড দেখেছেন, এতগুলানের মধ্যে একটাত জ্বলল!'

তার কাণ্ড দেখে মেয়ে তিপু, ছেলে শিবু ও স্ত্রী সকলেই মজা পাচ্ছে। তার বাবা বার বার দেশলাই ধরানোর জন্য কাঠিকুটের কাছে 'ম্যাচবাত্তি' চাইছে দেখেও মেয়ে কৃত্রিম রূপ প্রকাশ করে হাসছে। কালকূট বন দেখতে যাচ্ছে এই কথা শুনে বিশ্বাস না হওয়াতে সিংজীর উদাহরণ দিয়ে জানিয়েছিল যে, 'বেড়াতে আসার নাম করে, জরাইকেলায় রাজ্যপাট বিছিয়ে বসেছেন।' সেই কথা শুনে মেয়ে তিপু বলেছিল 'বাবার যত আর আনতে কুঁড়। কাকে কী বলতে হয়, তার কোনো হাথামাথা নেই।'

বাবার উত্তর ছিল 'আমি কি মন্দ ভেবে কিছু বলেছি নাকি? তা বলিনি। মিছা কথাও তো বলিনি।' *(পৃ: ৬৭৭, ঐ)* এইভাবে কাহিনীর মধ্যে তারা ঢুকে পড়েছেন, কালকূটও ওদের। নিতু তাকে বনজীবনের সঙ্গে ও বনবাসীদের জীবনাচার সম্পর্কে পরিচয় দিয়েছে। ওদের বাড়িতে ছোট থেকে মানুষ হওয়া আদিবাসী মেয়ে ও ওদের বাড়ির কর্ত্রীর মতো জেমা কথা বলেছে, যে বাঙালী পরিবেশে মানুষ হওয়ার জন্য বিয়ের পর নিজের স্বামীর ঘর করতে পারে নি। ও বিপত্নীক সুরীনকে পছন্দ করে। সুরীনের ছেলেমেয়েদের ও প্রতিদিন নিয়ম করে দেখাশোনা করতে যায়। এটা নিতুদের চোখে খারাপ লাগে না। আদিবাসী যুবক মংলার বউ পালিয়ে গেছে। জেমা আর নিতু মজা করে। কিন্তু কালকূট ওর বেদনার্ত চোখের দৃষ্টি দেখেছেন। সে বলেছে 'আয়েগা, এক রোজ চলা আয়েগা। লেড়ক-লেড়কি কে লে গিয়া না? সবকো লেকে এক রোজ চলা আয়ে না।' *(পৃ: ৬৮৫, ঐ)*

ওই বনের প্রান্তসীমার পরিবেশে এমনি করেই মংলা চরিত্রটি উঠে এসেছে। তার সুখের ভাষা, চালচলন সবই যেন বাস্তব থেকে উঠে এসেছে। গঠনগত বৈশিষ্ট্য ও শব্দচয়নের মুন্সীয়ানা এইখানেই। বন প্রকৃতির সৌন্দর্য এভাবে তুলে ধরেছেন 'সহসা আমার সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে আগুনের শিখা দেখে, থমকে দাঁড়ালাম। যে আগুনের শিখার অগ্নিঝলক কেবল যে আমার গায়ে লাগল তা না। যেন আমার প্রতি রোমকূপের ভিতর দিয়ে মিশিয়ে গেল রক্তে রক্তে। আমার সমস্ত অনুভূতির মধ্যে একটা দাবানলের গোপন উল্লাস। এমন করে আগুন জ্বালাল কে? শিখা যার ছড়িয়ে গিয়েছে, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আকাশের দিকে।' *(পৃ: ৬৯০, ঐ)* নিতুকে "জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কি ফুল না পাতা?' নিতু বলল, 'সবই পাতা। নতুন পাতা। প্রকৃতি সৌন্দর্য ও নিতুর প্রকৃতিও মানুষকে চিনিয়ে দেওয়া দুটো একই সঙ্গে চলেছে।

তিপু বনের মধ্যে ভৌতিক পরিবেশের পাশ দিয়ে যেতে ভয় পেয়েছিল। কালকূটকে বনের

ভয়ংকরতা নিয়ে গল্প করেছিল। সামটা নালায় চান করতে এসেছিল একটি মেয়ে, 'তাকে অজগর গিলে খেয়ে ফেলেছিল।' *(পৃ: ৭০২, ঐ)* তিপুর মনের ভয় ধীরে ধীরে কালকূটকেও গ্রাস করেছিল। তিপু 'রাজারানী' ফুল চিনিয়েছিল। কালকূট তার মাথায় ফুল গুঁজে দেওয়াতে তিপুর মুখে লজ্জার ছটা লেগেছিল। সেই মুহূর্তেই দেখলেন 'কয়েকটি একটু দূরে গাছতলা থেকে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে, আর হাসছে। মাথায় ওদের আমার অজানা এক ধরনের ঘাসের বোঝা।' *(পৃ: ৭০২, ঐ)* বন পরিবেশে এই বনবালাদের উপস্থিতি একদম যথার্থ। বন পরিবেশে ঘটনাটিকে একটা কোমল সৌন্দর্যের পরশ বুলিয়ে দিয়েছে। তিপু ইউলিয়াম সাহেবের বাড়ি গিয়ে কালকূটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। 'মদগ্‌ম্' খেতে অনুরোধ করেছে, ভাল না লাগলে খেতে হবে না। বনের সীমায় এসে বনে প্রবেশের মন প্রস্তুত করে দিয়েছে পিতু। কালকূট বলেছেন 'বনের সংসারে আমি এক নবজাতক। তিপু আমার ধাত্রী। আমি তো জানি, ওর চোখে-মুখে এই যে লজ্জার ছটা, সেটা আপন প্রকৃতির আপন ধর্মে রঙ ফেরানো। হৃদয়ের অকলুষ স্পর্শ আমাকে সতেজ করেছে।' *(পৃ: ৭০২, ঐ)*

জরাইকেলা থেকে বনে যাওয়ার আগে তিপু বলেছিল 'ফেরার সময় জরাইকেলা হয়ে যাবেন।' *(পৃ: ৬৭৭, ঐ)* বনে প্রবেশের মুখে বনবাসী শুক্রমের সঙ্গে দেখা হতেই মোহনবাবু ও সুরীন গাড়িতে তুলে নেন, এদেলবায় কাজ করার জন্য। শুক্রম ওর বউ সোমারি ও সোমারির বোন 'সুরসতিয়া'র সঙ্গে শিকারে বেরিয়েছিল। কালকূট ছোটনাগরা নেমে যান। গভীর বনে প্রবেশের আগে। পায়ে পায়ে বনভূমি ও বন পরিবেশের লোকজন দেখতে দেখতে কোয়েল তীরে বনের সীমার কাছেই একটা মাঠের মন্দির দেখে ফেরার সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নার্স তৃপ্তি ভৌমিকের সঙ্গে দেখা। নিবিড় বনে একটি নাগরিকা মেয়েকে দেখে অবাক হয়েছিলেন। তৃপ্তির সঙ্গে লেখকের পরিচয়ের মুহূর্ত। "তৃপ্তি জিজ্ঞেস করল 'মানে আপনি --- আপনি কি লেখক?' হেসে বললাম, এই বনে এসে সে পরিচয়টা দিতে বা শুনতে এখন ভাল লাগছে না।' মেয়েটি কালকূটের একজন পাঠিকা, গুণমুগ্ধ।

'তৃপ্তি আবার বলল 'শুনেছি, এ জঙ্গলে বিভূতিভূষণ ঘুরেছেন।'

বললাম 'জানি'।

'তারপরে বোধহয় আপনি এলেন।'

'সেটা বলা যায় না। হয়তো অনেকেই ঘুরে গেছেন।'

এই তো গোলমাল, মনে মনে বুঝতে পারছি, পরিচয় পাওয়ার পরে তৃপ্তির সংকোচ আর লজ্জাটা যেন আরো বেড়ে গেল।" *(পৃ: ৭০৯, ঐ)* তিপুর মতো তৃপ্তিও তাকে জঙ্গলের গাছ চেনায়। জানায় বনপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। শাল ফুল যখন ফোটে, রাশি ফুলে রিঅ্যাকশন হয়। শরীরের উত্তাপ বেড়ে একশো দুই তিন জ্বর উঠে যায়। লেখক কালকূট বিস্ময়ে

বলেন 'অদ্ভুত বললেন। ফুলজুর নাকি?' *(পৃ: ৭০৮, ঐ)* তৃপ্তি হেসে বলে 'তা বলতে পারেন, একরকম ফুলজুরই।' *(পৃ: ৭০৮, ঐ)* এরকমটি হলে বনবাসীরা 'সিম্‌জাস্টি সিমশালি' গাছের পাতার রস সেদ্ধ করে খায়।' এমনি করে তৃপ্তির সঙ্গে হৃদ্যতা বাড়ে। 'হাউ ভিউ ফাইন্ডার'কে তারা মাচা বলে। সেই 'তারামাচা'য় উঠে লেখক কালকূটকে সেই বিশাল বনভূমিকে দেখায়। দূরে পাহাড়ের গায়ে সারি সারি কী যেন চললছে। সেগুলোকে দেখিয়ে বলে 'ওটা গুয়া রেঞ্জ, ওখানে আয়রন ওরের খনি আছে, রোপওয়ে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।' *(পৃ: ৭১২, ঐ)* হলদে-সাদা তিলয়া ফুলের গন্ধে বনভূমি মাতোয়ারা। তৃপ্তি কাগজের মত সাদা দুটি ফুল নিয়ে কানে পড়ল, দেখে মনে হল দুটো কানপাশা। তৃপ্তি বলল 'এখানকার মেয়েরা পরে।' কালকূটের চোখের সামনে মুহূর্তে রূপ বদলে যেতেই কালকূট বললেন, 'আপনাকে সুন্দর দেখাচ্ছে' *(পৃ: ৭১২, ঐ)* তৃপ্তি লজ্জিত স্বরে বলেছিল, আমি আবার সুন্দর নাকি? এ'কথা বলার পরই তার মুখে ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল। আবার ছায়া সরেও গিয়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই তৃপ্তি কালকূটের হাত চেপে আঙুল দিয়ে দেখাল। তিনি দেখলেন 'একটি নীল গাই গাভী কোয়েনার ওপার থেকে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। পঞ্চাশ হাত দূরেও না। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র।' *(পৃ: ৭১২, ঐ)* কালকূট বলেছেন চিড়িয়াখানার বাইরে এই তাঁর প্রথম পশুদর্শন। মনে হল 'ময়ূরের মত চক্‌চকে নীল তার রঙ।' তৃপ্তি বলল জল খেতে এসেছিল থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বললাম বেচারির 'বেচারির তৃষ্ণা মিটল না। তৃপ্তি বলল, 'এখানে মিটল না, অন্য কোথাও গিয়ে মেটাবে।' এ দৃশ্যটা একটা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তুলে ধরেছেন। তৃপ্তি লেখক কালকূটের সঙ্গে এদেলবায় যেতে চেয়েছিল, কিন্তু কর্তব্য তাকে যেতে দিল না এদেলবার বনভূমিতে।

একটি মুন্ডা বউয়ের প্রসব ব্যথা উঠেছে। দু'দিন ধরে কষ্ট পাচ্ছে। আমি ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। ওর চোখ দুটো হঠাৎ টলটলিয়ে উঠল। আমি কাছে গিয়ে ডাকলাম 'তৃপ্তি'। তৃপ্তি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল 'মাত্র তো একটা দিন, তবু কেমন যেন হয়ে গেল।' *(পৃ: ৭১৩, ঐ)* তৃপ্তি নিচু হয়ে প্রণাম করল। লেখক কালকূট আবেগমণ্ডিত হয়ে উঠলেন।একটা নীরব প্রেমের সমর্পণ কীভাবে এনেছেন সেটাই একটু তুলে ধরা হল। তৃপ্তির হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে, অশ্রু হয়ে বেরিয়ে এসেছে। লেখক চলে গেলেন 'তৃপ্তি রক্ত কুসুমের রক্তভায় দাঁড়িয়ে'। লেখক কালকূট বনের প্রান্তসীমায় ছিলেন 'নবজাতক', ছোট নাগরায় এসে সেই নবজাতক মনটি সাবালক হয়েছে। এখন মনে বনযৌবন। তাই এখন সে একাই চলে যায় বনের সঙ্গে খেলতে। নাগরিকা তৃপ্তিতে পেছনে ফেলে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার নাগরিক মনটিও অবলুপ্ত হয়। এইভাবেই শৈল্পিক সুষমায় ছড়িয়ে কালকূট তার নির্বিকার, উদাসী মনটি তুলে ধরেছেন।

কালকূটের বনপর্বের পরবর্তী কাহিনী 'বনের সঙ্গে খেলা'। বনপর্বের তিনটি কাহিনীই একে

অপরের পরিপূরক। প্রথম কাহিনীর যেখানে শেষ সেখান থেকে দ্বিতীয় কাহিনীর শুরু। রেঞ্জার বদরিকা প্রসাদের সঙ্গে পাহাড়ী আকাবাঁকা পথে ছুটে চলেছেন। যেতে যেতে স্মৃতির গভীরে ডুব দিয়েছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরণচিহ্ন অনুসরণ করে তিনি চলেছেন। স্মৃতি থাকতে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। কোয়েনার কুলু শব্দ এই গভীর অরণ্যের স্তব্ধতাকে খান খান করে দিচ্ছে। কাছে গেলেই 'তার এই আরণ্যক গান' শুনতে পাওয়া যায়। তিনি সেই আরণ্যক গানকে এইভাবে চিত্রিত করেছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী, এই গভীরবনের সবখানি জুড়ে, সে গান করে চলেছে। সুর যদি বা জানা গিয়েছে, ভাষা কোনোদিনই বোঝা যায় নি। নিরন্তর সে তার নিজের ভাষায় বেজে চলেছে। মনে হয় কোয়েলা যেন এই বিশাল বন পাহাড়কে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। যেখানে যাই কোয়েনা সবখানেই আছে। এইভাবেই নদী-বন-প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্য তিনি তুলে ধরেছেন।

এদেলবা পৌঁছে তিনি দেখলেন 'মা বুক খুলে শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছে। যেন কচি ঘাসের মাঠটিতে গোবৎস চরে বেড়াচ্ছে।' *(পৃ: ৭২৩, ঐ)* এদেলবা এসে মোহনবাবুর কাজের লোক হোরো নেশা করে পাতার কুটির গুঁইয়োর পিছনে পড়ে ছিল। বদরিকা প্রসাদের ডাক শুনে এসেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ও দারু পিয়েছে কিনা। ও বলল 'হঁ হঁ জরুর পিয়া।' *(পৃ: ৭২৪, ঐ)* এ'কথা 'বলেই যেন গল্ গল্ করে হাসতে লাগলো; আর বাতাস লাগা কচি ডালের মত দুলতে লাগলো।' *(পৃ: ৭২৪, ঐ)* অরণ্যের মানুষের তুলনা করে সেই সৌন্দর্যকে বিকশিত করেছেন। ওখানে গিয়ে বনকন্যা সুরসতিয়ার সঙ্গে আবার দেখা। সুরসতিয়াকে কালকূট প্রথমে খেয়াল করেন নি। তাই ও গান গেয়ে শুনিয়ে দিয়েছে সে কথা। মেয়েটি গান গেয়ে জাগিয়ে দিয়েছে 'ও বলছে, এই যে আমার সেই সিগারেটবাবু এসেছে। কিন্তু বাবু আমাকে দেখতে পায়নি।' *(পৃ: ৭২৭, ঐ)* কালকূট যে চরিত্রগুলো এখানে এনেছেন তাদের মুখের ভাষা লক্ষণীয়। হোরো এক ভাষায় কথা বলছে, বদরিকা প্রসাদ এক ভাষায় কথা বলছেন। চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা বুঝেই সুরীন চরিত্রটি এনেছেন। ও দোভাষী কাজ করেছে। সুরীন চরিত্র বনের প্রান্তসীমার মানুষ আবার জেমার হবু স্বামী। দুটো ভাষা ও সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য সুরীনই যথার্থ চরিত্র।

সুরসতিয়া বন্য চাহনিতে মুক্তো দাঁতের ঝিলিকে কালকূট মুগ্ধ। তিনি বনবালাদের সঙ্গে ডিয়েং পান করেছেন, ওদের সঙ্গে নেচেছেন। বনবাসী যুবক কান্তেয়র আর মাংরি চেঁচিয়ে গান ধরেছে,

বিরিং আবু লীলশক্তি
ভাটিওড়া পিড়ি পিড়ি
খাসিয়া চানা বুচি বোওতল

নুকি দাংনো হেরি আঙ্গো

হহোবে কুড়ি' *(পৃ: ৭৪২, ঐ)*

সুরীন এই গানের অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছে। সুরীন না থাকলে লেখক কালকূটের এই গানে অর্থ বোঝা সম্ভব হত। এখানেই কালকূটের গঠনগত বৈশিষ্ট্য, চরিত্র চিত্রণে মুন্সীয়ানা ধরা পড়েছে। 'বনের সঙ্গে খেলতে' এসেছেন। খেলায় কোনো নিয়ম তিনি মানেন নি। খেলেছেন বনবাসী কন্যাদের সঙ্গে। সুরসতিয়ার বন্য চোখের চাউনিতে লেখক কালকূট সম্মোহিত। সুরসতিয়া কালকূটের ওপর অভিমান করেছে। সুরীন সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে। অত্যন্ত বাস্তবোচিত দৃশ্য। সুরসতিয়া গান করছে, 'চিময় বংকড়া তেতামাই নিমতং দোমো চালী বালো না', *(পৃ: ৭৪৮, ঐ)* মনে হলে 'বলেছে ওর মনেরই কথা। বলছে সখী কার চুপিচুপি কথায় তুমি এত ছটফট করছো?' বন্ধুনী, কার কানাকানিতে এমন উথালি পাথালি করছো?' *(পৃ: ৭৪৮, ঐ)* সুরসতিয়া কালকূটকে বলছে 'তুমি নারাজ হয়েছো?'

আমি কেন রাগ করবো?' *(পৃ: ৭৪৯, ঐ)*

সুরসতিয়া জানিয়েছিল ও মনে হয়েছিল। কালকূট বন্যবালার প্রেমের ধরা দিয়েছেন। ''আমি এই প্রথম, চিবুকে হাত দিয়ে, ওর মুখ তুলে ধরলাম, বললাম, আমি নারাজ হইনি।'

সুরসতিয়া ওর ডাগর কালো চোখে, আমার চোখের দিকে তাকালো।' *(পৃ: ৭৪৯, ঐ)*

প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি ও কথাবার্তা প্রকাশ করেছেন কোয়েনার স্রোতধারায় সূর্যের আলোক বিচ্ছুরণের মতো করে প্রকাশ করেছেন। বনপ্রকৃতির রূপ সৌন্দর্য? দেখা যায় কীভাবে শিল্পসম্মত করেছেন। 'পাথুরে মৃত্তিকার রাস্তা নেমে গিয়েছে কোয়েনার ধারে। আমি এখন বুঝতে পারি যেখানেই যাই কোয়েনা এঁকেবেঁকে সবখানেই আছে। আমরা যে পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে আছি, তার নিচে, বাঁদিকে বাঁক নিয়ে কোয়েলা হারিয়ে গিয়েছে। নিচে অনেকখানি অংশ, হাঁটুর থেকে লম্বা লম্বা ঘাস, নানাবিধ গাছ, কিন্তু সবই ফাঁকে ফাঁকে, অনেকটা গ্রামের মতো, আর সেই সমতলের প্রায় বৃত্ত করে ঘিরে আছে গভীর বন। অথচ কোয়েনার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, গভীর বনের বৃত্ত পাক দিয়ে আসছে না, বনের এক অংশে হারিয়ে গিয়েছে।' *(পৃ: ৭৫২, ঐ)* এই বর্ণনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুরসতিয়া রূপ বৈচিত্র্য। ও ওর দেহ স্পর্শ করে, আমার এমন ঘন সান্নিধ্যে দাঁড়িয়েছে, আমার দূর সমতলবাসী মন ভিতরে ভিতরে সচকিত হয়ে উঠছে। সহসাই মনে হল, চোখের মন্ত্র, এখন ওর সর্বাঙ্গে। ও বাঁ হাত দিয়ে গতকালের নাচের মত আমার কোমর বেষ্টন করে আছে। রৌদ্র ওর, প্রায় উদাস বাম বক্ষে। খোঁপার সেই সুর নাগের মতো ফুলটি কাঁপছে। কিন্তু ও আমার দিকে তাকিয়ে নেই, তাকিয়ে আছে, বাঁদিকের দূরে এই পাহাড়েরই উৎরাইয়ের জঙ্গলের দিকে। ঠোঁটে হাসি, চোখের দৃষ্টিতে যেন নিবিড় কৌতূহল।' *(পৃ: ৭৫২, ঐ)*

কোয়েনা নদী সুরসতিয়াকে একাকার করে দিয়েছে শিল্পসম্মত লেখনীতে। লোরের সৌন্দর্য এসেছে এইভাবে— 'হাতীরা এখানে স্নান করে, জল খেলা করে। প্রকৃতি যে বিশাল দেহ প্রাগৈতিহাসিক সেই বন্য পশুদের জন্যই, এমন একটি জলাশয়, নিবিড় বন, নরম মৃত্তিকা সৃষ্টি করেছে।' সুরসতিয়া কালকূটকে বলছে 'এনাচি অবেনেবেন উড়ক্তুতমা' এই বলেই সে কালকূটকে জড়িয়ে ধরে চলেছিল 'আমি তো এই বনবুরুর মেয়ে। তুমি এখানে থাকবে না। আমি জানি। আমি কখনো তোমার সঙ্গে যাব না; তাও জানি। তোমার সঙ্গে মিশলাম, আমাকে সবাই খারাপ বলবে। তুমি কেন মুন্ডা হলে না?' *(পৃ: ৭৫৪, ঐ)* বনবালা সুরসতিয়ার প্রেম যে পূর্ণতা পেলেও বন্যবালার জীবনের সঙ্গে কালকূটের জীবন কখনও মিলবে না সেটা কত সহজভাবে প্রকাশ করেছেন। তারা উন্মুক্ত পোশাকে লোরের জলে স্নান করেছিল। 'অঞ্জলি ভরে জল তুলে, আমার বুকে কাঁধে ছড়িয়ে দিল। ঠাণ্ডা শীতল, কবেকার সেই দূরকালে বহমান আদিম জলের স্পর্শ আমার গায়ে। মাতৃপূজার ছবি আমার চোখে। শক্তিস্বরূপিণী মহামায়া তোমার সামনে। আদিম আরণ্যক জলাশয়ে, এখন পূজার লগ্ন।' *(পৃ: ৭৫৪, ঐ)* খেলা শেষ। সুরসতিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে তার পাতার ঘরে সিংজী এসে গেছে, থলকোবাদ যাওয়ার জন্য। সুরীনের সঙ্গে গিয়ে দেখলেন 'ঘুমিয়ে আছে'। বাইরের গভীর অরণ্য তাঁকে ডাকছে। তিনি চলে গেলেন। এইভাবে এক অপরূপ শৈল্পিক চেতনায় কাহিনীটির শেষ হয়েছে। আর কখনও দেখা হবে না। তিনি লিখেছেন 'জাগ্রত চাক্ষুষ বিদায়, অনেক সময় বিদায়ের স্বরূপকে চিনতে দেয় না।' *(পৃ: ৭৫৬, ঐ)*

এরপর শিল্পরূপ আলোচনা করা হবে 'প্রেম নামে বন'। বন পর্বের এটিই শেষ রচনা। সিংজীর সঙ্গে কালকূট চলেন থলকোবাদ।

লেখক কালকূট তাঁর রচনাবলীতে যেভাবে পারিপার্শ্বিক ঘটনা, স্থান, কাল, ভাষা ও বিভিন্ন চরিত্রকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যা কিনা শিল্পের রূপ ধারণ করেছে। 'কোথায় পাবো তারে' এতে মামুদ গাজী একটি চরিত্র। সে কিনা গান গেয়ে গেয়ে ঘোরাফেরা করে। মুরশেদের নামে মজদুরি করে বসিরহাট থেকে কালকূটের সঙ্গ নিয়েছিল কালকূটের পৌষ মেলায় আসার আগে পর্যন্ত। গাজীর একটি গানের কথা ছিল,

'সব লোকে কয় তুমি কী জাত সংসারে।
আমি কই, জেতের কী রূপ, দেখলাম না নজরে।
সুন্নত দিলে হয় মুসলমান, নারীলোকের কী হয় বিধান।
বামন চিনি পৈতার প্রমাণ, বামনী চিনি কী ধরে।' *(পৃ: ২৭২, ঐ)*

গানের এই কথাগুলোতে গাজী জগতজোড়া জাতের বিচার মিটিয়ে দিয়েছিল। এই গাজী যার মুখে কত ভাবে, কত স্থানে, কত গান, সেই গাজী ডানসা নদীর জলে ডুবে মারা গিয়েছিল আর তার

স্ত্রী নয়নতারাকে দেখা গিয়েছিল, সন্তানদের নিয়ে ভিক্ষা করতে। এই দুঃখজনক ব্যাপারটি পাঠককুলকে ব্যথিত করেছে। কালকূটের উপন্যাসের আর এক চরিত্র 'ঝিনি', যা পোশাকী নাম অলকা চক্রবর্তী। কালকূট যখন লঞ্চ থেকে কালীনগরের পাড়ে উঠলেন, তখন দেখলেন ঝিনি হাত তুলে রয়েছে। কালকূট লিখেছেন --- "এখন আমরা ঠেকি দিগন্তের এক হাতায়। এবার খোপ চলে যায় দিগন্ত। সেখানে এক ছাপা শাড়ির আঁচল ওড়ে বাতাসে। বলব না, দাঁড়িয়ে আছি সহবতে। জানি, পথের দেখা পথেই শেষ তবু সুজনকে দাঁড়িয়ে থেকে বিদায় দিতে হয়।" এই ঝিনির সঙ্গে ই লেখক কালকূটের পৌষ মেলায় পুনরায় দেখা হয়। সেখানে তার সঙ্গে কালকূটের বাউল গান শোনা, ঘোরাফেরা, কথাবার্তা একটি অন্য মাত্রা অনয়ন করেছে। জয়দেবের মেলাতে পুনরায় দেখা এবং রাতে মদন গোঁসাইয়ের আখরায় ঝিনির কালকূটের পায়ের কাছে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়া ও ঘুমন্ত ঝিনিকে রেখে কালকূটের জয়দেবের মেলা পরিত্যাগ করা --- পাঠককুলের মনে গভীর রেখাপাত করে। কালকূট কোথাও বাঁধা পড়তে চান না, তিনি দ্রষ্টা, নায়ক হতে চান না। তাই কালকূট চলে যান, তাঁকে চলে যেতে হয় সব বন্ধন ছিঁড়ে।

আর একটি চরিত্র অচিন্ত্য মজুমদারের। যিনি কিনা শান্তিনিকেতনে পড়া শিক্ষিত মানুষ। নিরজাকে ভালোবেসেছিলেন, কিন্তু তার সঙ্গে বিয়ে হয়নি, তিনি অবিবাহিত ছিলেন। ভাগ্যচক্রে অনেকদিন পর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কিন্তু তখনও দু'জন দুজনকে ভালোবেসে চলেছে। গোপীদাস বাউল, রাধা বাউলানী, গোকুল দাস বাউল, তার বাউল প্রকৃতি বিন্দু, সুজন বাউল, মদন বাউল আরও অনেকজন বাউলের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে এবং অন্তরঙ্গতা হয়। সেদিন কালকূট মদন গোঁসাইয়ের আখড়ায় ঘুমন্ত ঝিনিকে কোন কিছু না বলে চলে এসেছিলেন এবং বিন্দুর কাছে তাঁর ঝোলাটা চেয়েছিলেন, তখন বিন্দু বলেছিল "ঝিনি দিদিকে কোথায় রেখে এলে?" কিছুক্ষণ পর বিন্দু আবার বলেছিল আবার এস্য বাবাজী, যখন মন কইরবে, এস্য। তোমার তো পথের বাধা নাই।' কালকূট যখন যে ভাষা প্রয়োগ করা প্রয়োজন তখন সেই ভাষা দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন। শেষবারের মতো ঝিনি হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদের মেলায় লেখক কালকূটের কাছে ছুটে আসে কিন্তু কালকূট তাকে বিনম্রভাবে প্রত্যাখান করলে ঝিনির কাছে তাঁর স্বরূপ উন্মোচিত হয় --- সে বিচ্ছেদ মেনে নেয়। লেখক এই বিচ্ছেদটাকে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যে পাঠকের মনে চিরবিচ্ছেদের সুর বাজে, অথচ যেন এটাই স্বাভাবিক। অসংখ্য মেলা প্রাঙ্গণে ঘুরেছেন, তাঁর উদাস মন তাঁকে ঘরে আটকে রাখতে পারেনি। তিনি বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করে, তার অভিজ্ঞতার কথা যেভাবে লিখে গেছেন তা বর্ণনা সমৃদ্ধ শিল্পের রূপ।

এবার শিল্পরূপ আলোচনা করা হবে 'খুঁজি ফিরি সেই মানুষে'। কালকূট কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলিতে গিয়ে বা জয়দেবের মেলাতে গিয়ে বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেশামিশি করেছিলেন।

বাউলদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তাদের ভাবনা, চিন্তার সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। সবার উপরে মানুষ সত্য, সেই মানুষকে খুঁজে ফেরাই বাউলের ধর্ম। সে মানুষ কিন্তু যে সে মানুষ নয়, সে হচ্ছে মনের মানুষ, সহজ মানুষ, সে রসিক, সে অচিন পাখি, সে অধরা। কালকূট বলেছেন মানুষ নিজেকে খুঁজবে। মানুষে মানুষে ভালোবাসাবাসি করবে, মানুষের মধ্যেই সে সর্বমনিবের অপরূপ রূপ দর্শন হবে, একথা চিরদিন ধরে বলতে হবে আমাদেরই, বাউল যেদিন থাকবে না সেইদিনও। 'খুঁজে ফিরি সেই মানুষে'– এত অর্থপূর্ণ লেখা, যা লেখক কালকূটের শিল্পী সত্তাকে প্রকাশ করে।

মহাকাব্য ভিত্তিক পৃথা, অন্তিম প্রণয়, যুদ্ধের শেষ সেনাপতি --- এতে প্রথমেই অতিরঞ্জন, উপলক্ষণ এইগুলো কালকূট তাঁর আধুনিক মন নিয়ে এ'কালের দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। এইগুলিকে অনেক সময় বাহুল্য বলে মনে হয়েছে, কিন্তু কাহিনীর প্রয়োজনে তিনি কালের যে মানব বা মানবীর কাছে চেয়েছেন তাদের প্রয়োজনেই এই অতিরিক্ত তথ্যগুলো তুলে ধরেছেন। কালকূট পাণ্ডব-জননী 'পৃথা' তথা কুন্তী চরিত্রের অন্তর্গহনে ডুব দিয়েছিলেন। পৃথা তথা কুন্তীকে কালকূট 'ঐতিহাসিক রানী' বলেছেন। যৌবনকালে কুন্তীর সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন এইভাবে, "দীর্ঘনয়না, রূপ-যৌবনশালিনী, স্ত্রী সুলভ গুণবতী, গম্ভীর স্বভাবা, মহাব্রতা ও ধর্মশীলা। অনেক নৃপতিই সেই তেজস্বিনী নারীকে পত্নীরূপে পাবার জন্যে বিশেষ উৎসুক ছিলেন।" অলৌকিক যে রমণীর বাস্তব সত্তার ওপর কল্পিত আর অলৌকিক সব আচরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে ইতিহাসের পথ ধরে বিচার বিশ্লেষণ করে, সমস্ত কুহেলিকা আর অজ্ঞানতাকে তিনি দূর করার চেষ্টা করেছেন। কালকূট পৃথার জন্ম থেকে শুরু করে, পৃথার জীবনে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা সুনিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। বাস্তবে কি ঘটনা ঘটেছিল সেটাই তিনি এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যেটা একটা শৈল্পিক মনোভাবের পরিচয় বহন করে। কালকূট কুন্তীকে শৈল্পিক দৃষ্টিতে মহিমামণ্ডিত করেছেন, এইভাবে "আমি দেখেছি, ইতিহাসের পাতায় কী ঐশ্বর্যময়ী রমণী চিত্র অঙ্কিত। সারাজীবন দুঃখের মধ্যেও যিনি ভেঙ্গে পড়েননি এবং যোগাসনে বসে দাবানলে প্রাণত্যাগ করেছেন। পৃথার জীবন যেন সমস্ত সুখ দুঃখের উর্ধ্বে। যিনি প্রেম কী তা জেনেছেন। কিন্তু সারাজীবন দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর পাপবোধ, বিশ্বের সকল মানবীকে নতুন চেতনা দিয়েছে। পৃথা! তুমি আমাদের সকলের প্রণাম নাও।"

এরপরে শিল্পরূপ আলোচনা করা হবে 'প্রেম নামে বন'-এর বন পর্বের এটিই শেষ রচনা। সিংজীর সঙ্গে কালকূট চলে গেলেন থলকোবাদ। বনকন্যা সুরাতিয়ার সঙ্গে কালকূটের খেলা শেষ হতে না হতেই কালকূটকে এদেলবা ছেড়ে চলে আসতে হয়। খেলা শেষ কিন্তু মনের মধ্যে খেলার উন্মদনাটুকু আছে। সেই উন্মাদনার ঘোর নিয়ে কালকূট থলকোবাদের বনপ্রকৃতিকে দেখেছেন। বনপরিবেশে সিংজীর

মনোমুগ্ধকর বাংলোর চেয়ে গভীর বনভূমির মধ্যে বসবাসকারী মানুষই তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছে। বাংলোয় ঢোকার আগেই তিনি দুটি বনবাসী মেয়েদের এনেছেন। যেটার মধ্য দিয়ে বনজীবনের স্বাভাবিক জীবনাচার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সিংজীর বনবালাদের সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক আছে। ওরা মাঝে মাঝে সিংজীর ফাইফরমাস খেটে দেয়, এটা তাদের উপরি পাওনা। একজনের নয় 'সুইয়া', সুইয়া মানে চিড়িয়া। বাংলোতে কাজ করতে আসার পরে কালকূট ওদের নামের মানে জেনে নিয়েছিলেন। সুইয়া ও বিসোয়ারীর সঙ্গে কালকূটের কথাবার্তা একটু পর্যবেক্ষণ করা যাক্। বিসোয়ারী বনভূমিতে এক ধরনের প্রচলিত হিন্দিতে কালকূটকে বলেছিল—'তোমার মুখে হাপানম্, শুনে আমরা ভেবেছিলাম, তুমি আমাদের কথা বলতে পারো।' (৮৬৩/ঐ) কালকূট বলেছেন— ''তিনি হেসে মাথা নেড়ে বললাম, 'পারিনা'। তবে, তোমাদের কথা আমার শিখতে ইচ্ছা করে। সুইয়া নামটা বেশ ভালো। এর কি কোনো মানে আছে?'

সুইয়া বললো, 'আছে না? সুইয়া মানে তো চিড়িয়া।' বলে দু'হাত দিয়ে উড়বার ভঙ্গি করে দেখালো।'' (৮৬৩/ ঐ) বনজীবনের সঙ্গে বনবাসীদের জীবনাচারণকে তুলে এনেছেন এইভাবে। সিংজী বন পরিবেশে বেমানান তবুও দীর্ঘদিন এই বনভূমিতে থাকার ফলে তাঁর প্রভাব অপরিসীম। তাঁর চালচলন, অভিব্যক্তি, কথাবার্তায় বনজীবনের ছাপ স্পষ্ট ধরা পড়েছে। সিংজীকে লেখক কালকূট সীমার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন এই বনের 'আনক্রাউন্ও কিং'। সীমা আরও বলেছে ''আমাকে বনের নেশাটা, সিংই ধরিয়েছে।'' (৮৬৫/ ঐ) কালকূটের মনে হয়েছে তিনি থলকোবাদের গভীর অরণ্যের চেয়েও ভয়ঙ্কর। সিংজীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি সিংজীর ভেতরের দুঃখী ও বেদনাই মনটাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। প্রাণের চেয়েও প্রিয় সীমা চলে গেছে জার্মান সাহেব ফিলিপের কাছে, এবেদনা তিনি ভুলতে পারেননি। তার কাছে সীমা 'বিখ্যাত স্বেচ্ছাচারিনী মেয়ে'। অসম্ভব সুন্দরী, 'স্বর্বেশ্যা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন সীমার রূপ সৌন্দর্যকে। তার সেই রূপ সৌন্দর্য কালকূটের চেখে উঠে এসেছে এইভাবে— 'এই রমণীকে দেখে যদি কোনো পুরুষের চিত্ত বিভ্রম ঘটে, তাকে দোষ দেওয়া কঠিন। প্রথম দর্শনেই মনে হয় কোনো শিল্পীর তৈরি পাথর প্রতিমা প্রাণ পেয়েছে; সংসারের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিক থেকে ভাবতে গেলে এটা একটা অপ্রাকৃত ব্যাপার। এতএব, সংসারের বাস্তবতায় সে সমস্যার সৃষ্টি করবেই।' (৮৬৬/ঐ) সীমার রূপসৌন্দর্য যে বাস্তবজীবনে সমস্যা সৃষ্টি করেছে সে কথাও লেখক কালকূটের ভাবনায় উঠে এসেছে।

এই সীমা ও সিংজীর অসুস্থ পুত্রই সিংজীর কাছে সব থেকে প্রিয়। তাঁর যন্ত্রণাকে লেখক কালকূট এভাবে শিল্পিত করেছেন 'রাইটার সাহেব, এসংসারে দু'জনের জন্য আমি সব কিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি। একজন সীমা, আর আর একজন টাটার হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে, আমার ছেলে— আমার লাল।' (৮৫৯/ঐ)

কালকূটের মনে বন 'তাঁর শেষের কথাটা যেন আমার বুকে, একটা তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ

করল, একটা কষ্টে টনটনিয়ে উঠলো।' (৮৫৯/ঐ) এই যে মনোবেদনার অভিব্যক্তি, তিনি অনবদ্যভাবে তুলে ধরেছেন। তেমনি তুলে ধরেছেন তাঁর ক্রুর মনোভাব এই কথার মধ্য দিয়ে 'টিজ দ্য প্লেগ্ অব্ গ্রেট ওয়ানস্/ প্রেরোগেটেটিভড্ অব দ্য লেস্ দ্যান্ দ্য বেস টিজ ডেস্টিনি আন্শাননেবল্, লাইফ ডেথ/ এভন্ দেন দিন ফরকড্ প্লেগ ইজ ফেটেড টু আস/ হোয়েন উই ডুনট কুইকেন। লুক হ্যোয়র সী কাম্স ...' (৮৫৬/ঐ)

সীমা ফিলিপসহ এই বনবাংলোয় আসছে। তিনি প্রেমের ফাঁদ পেতেছেন। সীমা যেদিন বাংলোয় এলো সেদিন গঞ্জুকে ডেকে সিংজীকে বলেছিলেন—'শুনো মহাদেও, 'হমারা মেহমান লোগ্ আয়া। রাউলকেল্লা কা কারখানাকা ইয়ে এক বড়া সাহাব ভি আয়া।' (৮৭১/ঐ)

সে এসে প্রায় আভূমি গ্রণত হয়ে সবাইকে নমস্কার করে, উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলো 'হুজুর হম গঞ্জু মহাদেও।'

সিংজী বললেন— 'তুম গাঁও-মে বাতা দো, কাল শাম কো, ইধার নাচা গানা করনে পড়েগা। খানে পিনেকা খরচা হামারা। যো যেত্না হাঁড়িয়া পেনে সক্তা, সিগারেট পিনে সক্তা, ভাত আওর শুয়োর কা গোস্ত খানে সক্তা মিলেগা।' (৮৭১/ঐ)

'মাদলের উদাম তাল, পাহাড়ে বনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সারা চত্বরে মেয়ে পুরুষের ছায়া ও মূর্তি যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। ধূলা উড়ছে। কম করে একশো নারী পুরুষ নাচছে। তার মধ্যে সিংজী হারিয়ে গেলেন।' (৮৭২/ঐ)

বনভূমির জীবনাচারের কৃষ্টির সঙ্গে আনন্দ উৎসবকে মিশিয়ে কালকূট এক ময়াময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। এই অনন্দঘন পরিস্থিতি হঠাৎ থেমে গিয়েছিল ফিলিপের চিৎকারে।

তৃপ্তি থলকোবাদে এসেছিল। কালকূট ও তৃপ্তি বারান্দায় বসে নৃত্যানুষ্ঠান দেখছিলেন। তৃপ্তি ভয়ে কালকূটের কাছে মুখ রেখে প্রায় চিৎকার করে কেঁদে উঠে বললো 'বুঝতে পারলেন না? সীমাকে সিংজী ছুড়ে খাদে ফেলে দিয়েছেন।' (৮৭৪/ঐ)

মধ্যরাতে সিংজী ফিলিপসহ অনেকে মিয়ে সীমাকে নিয়ে এল। নিজে ও ফিলিপ সারারাত মদ খেলো সীমার কাছে বসে। কালকূটের কানে বাজতে লাগলো 'পুট আউট দ্য লাইট, অ্যাণ্ড পুট আউট দ্য লাইট'। ... (৮৭৩/ঐ) ওথেলোর 'জেনারেল মূরে'র সেই কথা। তবুও কালকূট সিংজীর মত বলেছেন 'সিংজীর মতো আমিও মনে করি, এই বন আমার প্রেম।'

কাহিনী শেষ করেছেন, এক ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে এনে এক কাব্যিক মূর্চ্ছনা ছড়িয়ে দিয়ে অত্যন্ত শিল্পমণ্ডিত করে তুলেছেন এই কাহিনীটি।

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে অশ্বথামা ছিলেন শেষ সেনাপতি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষতম মুহূর্তে কুরু সেনাপতি অশ্বথামা যেভাবে জ্বলে উঠেছিলেন তার কাহিনীই হলো 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি'র। অশ্বথামার

পিতা দ্রোণাচার্যকে ছলনা করে হত্যা করা হয়েছে, যুধিষ্ঠিরের মতো ধর্মপরায়ণ মানুষ মিথ্যা কথা না বললে কিছুতেই তাঁর পিতা দ্রোণাচার্যকে হত্যা করা সম্ভব হতো না! অশ্বত্থামার মনে মনে হয়েছিল, গুরুকে কূটযুদ্ধে হত্যা করতেও পাণ্ডবরা দ্বিধা বোধ করেন নি, তা হলে ন্যায় সত্য ইত্যাতির কি মূল্যই বা আছে। অশ্বত্থামা শিশুর মতো কেঁদেছিলেন। তাঁর পিতার এইরূপ মৃত্যু তিনি কোনোমতেই মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর মনের কষ্ট, হাহাকার তাঁকে তীব্র যন্ত্রণা দিয়েছে। উপন্যাসটিতে পিতার জন্যে অশ্বত্থামার এই অসহনীয় মনোবেদনা লেখক কালকূট অতি সুন্দরভাবে, দক্ষতার সাথে বর্ণনা করেছেন। এতো পরিস্কার ভাবে, বিস্তারিত করে, ভাষার সৌন্দর্য্য রক্ষা করে এত নিপূণভাবে তুলে ধরেছেন যে, পাঠকের চোখের সামনে ঐ ঘটনা ভেসে ওঠে, মানসচক্ষে তারা তা প্রত্যক্ষ করে, রুনাটিতে কালকূটের শিল্প নৈপুন্য ফুটে উঠেছে।

পাণ্ডবদের কূটকৌশল, পাণ্ডবদের হাতে কৌরবদের হেনস্থা, শ্রীকৃষ্ণের কূটবুদ্ধি, দ্রোণাচার্যের শিরচ্ছেদের ঘটনা অশ্বত্থামাকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। পাণ্ডব-পাঞ্চাল সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত ও শোকার্ত অশ্বত্থামা বলতে গেলে প্রায় একক সংগ্রাম করেছিল। কালকূট এই উপন্যাসটির একেবারে শেষে কালকূট বলেছেন ''হত্যার উন্মাদনার পরে, তাঁর চোখ থেকে অবিরল জলধারা গড়িয়ে পড়েছে। এবং শেষবারের জন্য তিনি উচ্চারণ করলেন 'রক্তের পিপাসা শেষ হোক, জীবন ধন্য হোক। আমি আজীবন এই পৃথিবীর মাটিতে, মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ লাভ করতে চাই।'' (পৃ. -১৭) এতো সুন্দর ভাষায় এত সুন্দরভাবে কালকূট এটি ব্যক্ত করেছেন যাতে এই কথা অপরূপ শিল্প সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে।

এবার শিল্পরূপ আলোচনা করা হবে 'অন্তিম প্রণয়'-এর। এখানে কালকূট ভ্রমণে জাননি তিনি মনোভ্রমণে পাঠিয়েছেন তাঁর আর এক সত্ত্বা 'ভ্রমর'কে। এখানে তিনি পরম রূপবাণ ও বলশালী পাণ্ডুর মর্মবেদনা কাব্যিক ভাষায় তুলে ধরেছেন। তিনি ছিলেন 'রতিকোবিদ্' অথচ দুই পত্নীর সঙ্গে তিনি বনবিহার করছেন অথচ কিন্দম মুনির অভিশাপের কথা স্মরণ করে তিনি স্ত্রী সংসর্গ করতে পারছেন না। কিন্দম মুনি কী বলেছিলেন দেখা যাক্, 'তুমিও সে সময় স্ত্রী সংসর্গ করবে, তোমার মৃত্যু হবে। তুমি আমাকে বড় সুখের সময় মৃত্যুর মুখে পাঠিয়েছ। নিজের সেই সুখের সময় তোমাকেও আমার মতন এই দুর্ভাগ্য বরণ করতে হবে।' (১৪৯১ কালকূট রচনা সমগ্র তৃতীয় খণ্ড) কালকূট এই অভিশাপের অর্থাৎ পাণ্ডুর শারীরিক অক্ষমতার কথা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন। অনুতাপে দগ্ধ পাণ্ডুর মনোবেদনাকে কালকূট প্রকাশ করেছেন এইভাবে, ''সুখ কী, দুঃখ কী, সবই জেনেছি।'' তিনি আরও ভেবেছেন মৃগয়াব্যসনে মত্ত হওয়ার তাঁর ঠিক হয়নি। তিনি মহর্ষি দ্বৈপায়ণের মতোই মোক্ষলাভের তপস্যা করবেন। 'শরীর আর মনকে এমনভাবে লুকিয়ে শুকিয়ে জীর্ণ রাখতে হবে, যেন দুশ্চর তপস্যা ছাড়া আর কোন চিন্তাই মনে না আসে।' (১৪৯১/ঐ) কালকূট বলেছেন 'ধূলাজীর্ণ' এই ইতিহাসের পথের যাত্রায় আজ আমি দর্শন করতে

চলেছি এক প্রেম প্রণয়ের ঘটনাকে। মায়াময় প্রপঞ্চকতার সে এক আশ্চর্য রূপ। অথচ দেখছি আমার টান লেগেছে হাজার হাজার বছরের পিছনে। আর সেই পটভূমিটা কী? (১৪৮৫/ঐ) ইতিমধ্যে সর্বভূতের সম্মোহনকারী ঋতুরাজ বসন্ত আবিভূত হল। রাজা পাণ্ডু চললেন বনবিহারে' (১৪৯৩/ঐ) মাদ্রীও তার পিছনে পিছনে চলেছেন। কালকূট তথা ভ্রমর জিজ্ঞাসা করছেন মনে মনে ''মাদ্রী, তুমি কি জানো না, বসন্ত আকাশে বাতাসে মদনের শর সাজিয়ে রেখেছে? শুধু তাই নয়! মাদ্রী 'দিব্যাম্বর ধারণপূর্বক' পাণ্ডুর পশ্চাতে চলেছেন।'' (১৪৯৩/ঐ)

পাণ্ডু পিছন ফিরে মাদ্রীকে দেখে 'অনঙ্গশরে দগ্ধ হতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে মাদ্রীকে দু'হাতে আলিঙ্গন করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। মাদ্রী বারে বারে বললেন ''না না, এমনটি করবেন না।''...' কালকূটের ভাবান্তর, 'কী সেই ব্যাধি? তাঁর কি হৃদরোগ জাতীয় বা মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনে সহসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এমন কোনো আশঙ্কা ছিল?' (১৪৯৩/ঐ) মাদ্রী কিছুটা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু তাঁর জিজ্ঞাসা সত্যি কি সে-টা বাধা ছিল? সঙ্গম আকাঙক্ষায় তিনি মাদ্রীকে আপন অঙ্গ ধারণ করতে গিয়ে যেসব আচরণ করেছিলেন, তখন আর তাঁকে মাদ্রীর বাধা দেওয়ার উপায় ছিল না।

লেখক কালকূট তার আশ্চর্য লেখনীর টানে তুলে ধরেছেন সেই বিয়োগান্ত মিলনদৃশ্য, সেই কালান্তরের প্রেমকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছেন।

মাদ্রী কুণ্ডীকে বলেছিলেন 'রাজর্ষি আমাকে বলৎকার করেছিলেন।' (১৪৯৩/ঐ) তিনি মনভ্রমণে প্রত্যক্ষ করেছেন সেই ক্ষণটি, পাণ্ডু কোন কথাই বলতে পারেন নি। 'যেন গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিয়ে বা সহসা মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন স্তব্ধ হয়ে একটি পুরুষ সঙ্গমকালেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।' (১৪৯৩/ঐ) মাদ্রীর কথা কুন্তী বিশ্বাস করেন নি, তিনি বলেছিলেন 'আমি রাজাকে সর্বদা বাঁচিয়ে চলতাম। তুমি কেন এই নিরালয়ে এনে ওঁকে প্রলোভিত করলে?'' (১৪৯৩/ঐ) অতিবাস্তব কথা যা আমাদের পার্থিব জগতের সঙ্গে মিলে যায়। তবুও কুন্তী একটি আশ্চর্য কথা মাদ্রীকে বললেন, 'মদ্ররাজনন্দিনী তুমি ধন্যা, আমার চেয়েও তুমি শতগুনে সৌভাগ্যবতী। কারণ স্বামীর সেই আশ্চর্য প্রসন্ন সুন্দর মুখটি তুমিই দেখেছ।'' (১৪৯৩/ঐ)

কালকূট বলেছেন, 'অন্তিম প্রণয় কাহিনীর শেষে শুধু একটি কথাই বলব। কুন্তীর এই শেষ কথাটির জন্যই, তাঁকেও আমি ধন্যা মনে করছি। সত্য কথা এমন করে, বুকের পাজর ভেঙে কোন্ রমণী বলতে পারেন? তিনি সত্যই প্রাতঃস্মরণীয় রমণী।

কিন্তু পাণ্ডুর প্রণয় চিরপ্রেমিক পুরুষের কথাই মনে করিয়ে দিল। দিচ্ছে, দেবেও।' (১৪৯৩/ঐ) মহাকাব্যের প্রেমকে আশ্চর্য শিল্প সুষমায় পার্থিব জগতের প্রেমে নামিয়ে এনেছেন। তাঁর সেই লেখনীর যাদুমন্ত্রে মহাকাব্যের নায়ক নায়িকার অতৃপ্ত প্রণয়ে বেদনার অশ্রু ঝরিয়ে সে-ই প্রেমকে চিরকালীন

প্রেমে পর্যবসিত করেছেন।

এরপরে কালকূট রামায়ণ মহাকাব্যের 'প্রাচেতস' নামে এর মহান প্রেমিকের সন্ধান করতে হাজির হয়েছিলেন তমসার তীরে। তিনি 'প্রাচেতস' কহিনীতে কিভাবে কোন্ মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে মহাকবি 'বাল্মীকি' হয়ে উঠেছিলেন সেই ঘটনাই তুলে ধরেছেন। এই কাহিনীর শুরুতেও তিনি সঠিক কাল ও সময় নির্দেশ করার জন্য অনেক তথ্য, সংকেত 'অতিরঞ্জন', 'উপলক্ষণ' এগুলো তাঁর একালের মন নিয়ে খুঁজেছেন। যেগুলো পড়তে গেলে পাঠকের একটু ক্লান্তি আসতে পারে, কিন্তু ঘটনাকে, কালকে, ব্যক্তিকে জানতে হলে এই তথ্যগুলো জানা প্রয়োজন। মূল কাহিনীর প্রয়োজনেই তিনি এসব তথ্য পরিবেশন করেছেন কথকের ভঙ্গিতে।

ভৃগুবংশীয় চ্যবনদের বংশধর প্রাচেতসের মনের বিভিন্ন স্তর তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর সূক্ষ্ম অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে। মহর্ষি নারদ তাঁকে পথ দেখিয়েছিলেন, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তোমার সকল জগতের অন্ধকার দূর হয়েছে, আলোকিত হয়েছে তোমার সকল সত্তা' (১২৯৮/কালকূট রচনা সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড) প্রাচেতস সেই কথার উত্তরে বলেছেন ''প্রভু, আমি এখনও অন্ধকারে। অথচ সেই দিন, এক ব্যাধ যখন কামাসক্ত দুই ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর মধ্যে সহসা ক্রৌঞ্চকে তীর হননে হত্যা করলো, আমার মুখ দিয়ে কী এক ভাষা বেড়িয়ে এলো। আমি না জানি তার অর্থ, না জানি সেই ভাষা। আমি তাঁর অর্থ খুঁজে ফিরছি।'' (১২৯৮-১২৯৯/ঐ) মহর্ষি নারদ সেই বাণী শুনলেন

''মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমঃ আগম শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদ্ একম্ অবধী কামমোতিম্।।'' (১২৯৯/ঐ)

শুনেই তিনি দু'হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন 'প্রাচেতস! প্রাচেতস, তুমি দেবভাষায় অনুষ্ঠুভ ছন্দে শ্লোকছন্দ বাণী উচ্চারণ করেছো!''(১২৯৯/ঐ) মহর্ষি আরও বলেছেন, 'অনুষ্ঠুভ ছন্দে শ্লোকছন্দ বাণী এই প্রথম উচ্চারিত' হয়েছে ''সেই বাণী রূপ পেলো তোমার সত্তার থেকে — তুমি আদি কবি হে প্রাচেতস!'' (১২৯৯/ঐ) প্রাচেতস মহর্ষির পাদবন্দনা করে বললো ''আপনি আমাকে যথার্থ পথ দেখিয়ে যান, কার কথা রচনা করবো আমি শ্লোকছন্দধৃত বাণীতে।'' (১২৯৯/ঐ) মহর্ষি বললেন, ''যার কথা রচনা রচনা করবে তুমি, সে নিজে এসে ধরা দেবে তোমার কাছে।'' (১২৯৯/ঐ) সীতা এসে ধরা দিয়েছেন মহর্ষির তপোবনে। তিনি সীতাকে বললেন ''প্রজানুরঞ্জক রাজা অবতার হবেন, কিন্তু তার সকল কারণ তুমি। তুমিই তার কার কারণ। প্রজানুরঞ্জক রাম তোমাকে ত্যাগ করে অবতার হবেন। তার কারণও তুমি। আমরা রাবণের চিতা দেখেছি, রামের অন্তরের চিতা দেখি নি। কিন্তু জানি, সেখানে আগুন জ্বলছে। এখন আমি ভবিষ্যদ্রষ্টা।'' (১৩০২/ঐ) তিনি বলেন তাঁকে সত্য বলতে সেইভাবে যে-ভাবে ক্রৌঞ্চীর কাছ থেকে ক্রৌঞ্চকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, সেইভাবে বিপরীত রূপে সীতাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তাঁর কাছ থেকে, 'ঈশ্বরের অভিপ্রায় আমার দ্বারা সিদ্ধ হবে জানিনা। যদি সত্য আমি

আদি কবি, তবে এই শেষ গতি আমার সার্থকতা। সেই কারণেই, আজকের দিনটি আদি কবির সর্বাপেক্ষা, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক্ষার দিন। তুমি মোহহীন চিত্তে নিজেকে প্রকাশ কর। আমি মোহহীন চিত্তে শুনি।'' ... (১৩০৩/ঐ) এক কাব্যিক ছন্দে তিনি 'প্রাচেতস'-এর 'আদিকবি বাল্মীকি' হয়ে ওঠার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। অপরূপ শিল্পমহিমায় সীতার অশ্রুঝরা বেদনাকে তমসার অবিরাম স্রোতের ধারায় বইয়ে দিয়েছেন পাঠকের অন্তরে, যা পাঠকের অন্তরে এক চিরকালীন বেদনারূপে প্রতিভাত হয়েছে।

কালকূট পুরাণ পথে চলেছেন 'শাম্ব' দর্শনে। তিনি বলেছেন আমি পিতা পুত্র'কে একসঙ্গে দর্শন করতে চাই। তিনি সেখানে পৌঁছানোর জন্য বিস্তর পুঁথি ঘেটেছেন, গুণীজনদের সাহায্য নিয়ে ঠিক ক্ষণটিতে পৌঁছানোর জন্য। কালকূটের চোখে 'কৃষ্ণ-ইতিহাস প্রসিদ্ধ' আর 'শাম্ব' হল ত্যাগী, নিরলস, যোগী, সংকল্পে অটুট থাকা মানুষের প্রতি আস্থাভাজন এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। পিতার দ্বারা শাম্ব অভিশপ্ত হয়ে কীভাবে শাপমুক্ত হয়েছিলেন, তারই নিরসল প্রচেষ্টা করে গেছেন লেখক কালকূট কাহিনীর প্রথম অংশ তথ্যের জালে ভারাক্রান্ত হলেও কাহিনীকে সংহত করে বাঁধবার জন্যই এত তথ্যের অবতারণা করেছিলেন।

'অরূপকান্তি বীর শাম্ব' কীভাবে মুক্ত হয়েছিলেন তারই শিল্পমণ্ডিত দিকটি আলোচনা করা হবে। তিনি তাঁর মনের কত নায়ক খুঁজতে বিস্তর জায়গা খুঁজেছেন, অবশেষে তিনি দ্বারাবতীতে তার মনের মতো নায়কের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি 'কৃষ্ণপুত্র' শাম্ব! দেখা যাক, পিতার অভিশপ্ত হওয়ার মুহূর্তটি। নারদের ক্রোধের কারণে নারদ ছল করে শাম্বকে কৃষ্ণর 'প্রমোদ কাননে' কাটিয়েছিলেন। তাঁর রূপসৌন্দর্য শাম্বকে দেখাতে ব্যস্ত হয়েছিলেন ও তার সঙ্গ কামনা করেছিলেন কৃষ্ণ তা দেখে ক্রোধে জ্বলে উঠেছিলেন—'' তোমার এই রমণীমোহন রূপ নিপাত যাক। কুষ্ঠরোগের কুশ্রীতা তোমাকে গ্রাস করুক।'' (৯৯২/কালকূট রচনা সমগ্র-২য় খণ্ড) কালকূট বলেছেন তীব্র ঈর্ষা থেকে পিতার এই অভিশাপ দিয়েছেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত পিতা পুত্রকে পরামর্শ দিয়েছেন 'মহর্ষি নারদের কাছে যেতে, তিনি বহু স্থান ভ্রমণ করেছেন, তিনি রোগমুক্তির উপায় বলে দিতে পারবেন। শাম্বর মনের দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যায়। 'আমার ভাগের এই অমোঘ অনিবার্য পরিণতি জেনেও, আমিও নিশ্চেষ্ট থাকবো না। প্রয়োজন হলে, মুক্তির জন্য আমি এই সসাগরা পৃথিবী, দেবলোকে, অন্তরীক্ষে সর্বত্র যাবো। আমাকে আপনি বিদায় দিন।'(পৃ. ৯৯৩/ঐ) যখন কুষ্ঠরোগ বিশেষ ভাবে প্রকটিত হওয়ার পর দ্বারকায় গিয়েছিলেন কীভাবে দেখা হবে মহর্ষি নারদের সঙ্গে। কৃষ্ণ ও নারদ দু'জনেই দু'জায়গায় থেকে যেন শাম্বর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। দেখা যায় সেই প্রতীক্ষার অবসানের সময় কৃষ্ণ বলছেন পুত্রকে 'শাম্ব, এ বিচিত্র যোগাযোগ! মহর্ষি আজই দ্বারকায় এসে আমার আথ্যি গ্রহণ করেছেন। তাঁকে আমি এখনই তোমার সংবাদ দিচ্ছি, তুমি অপেক্ষা করো।'(৯৯৫/ঐ) মহর্ষি কৃষ্ণ ও শাম্ব একজায়গায় হওয়ার দৃশ্যটিই দেখা যাক্। কৃষ্ণ শাম্বর সঙ্গে দ্রুত মহর্ষিকে খবর দিতে গেলেন এবং দু'জনেই একটু পরেই ফিরে এসেছিলেন।

দু'জনের ব্যগ্রতা কালকূট দু'একটি কথায় কত সুন্দরও স্বাভাবিক করে তুলে ধরেছেন। মহর্ষি শাম্বকে আশির্বাদ করে কৃষ্ণর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেছিলেন— 'আমি শাম্বর ব্যাধিমুক্তি নিয়ে আলোচনা করবো।' (৯৯৫/ঐ) কৃষ্ণ মহর্ষির ইঙ্গিত বুঝে স্থান ত্যাগ করেছিলেন। ঐ কালের দৃষ্টিতে পুরাণে চরিত্র গুলো কী আশ্চর্য দক্ষতায় মানবিক গুণ সম্পন্ন করে তুলেছেন।

শাম্বর দুঃখবোধকে এইভাবে শিল্পসম্মত করেছেন, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত শাম্ব দ্বার কানগরী অসমতল পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। যদুবংশের কুমাররা কেউ তাঁকে চিনতে পারছে না। শাম্ব ভাবছেন— 'একজন কুষ্ঠরোগীর প্রতি তাকিয়ে, কেউ তার দৃষ্টিকে অকারণ বিঘ্নিত করতে চায় না।' (৯৯৬/ঐ) অকারণ অতীতের কথা ভেবে তিনি মনস্তাপ করতে চান না। ক্ষুধার্ত শাম্ব যদু-ফুল রমণীদের কাছে হাত পেতেছিলেন পূজার ফল ও মিষ্টি নেওয়ার জন্যে। তারা তাঁকে দেখে শিহরিত হয়ে স্পর্শ বাঁচিয়ে দূর থেকে মিষ্টান্ন নিক্ষেপ করেছিলেন। শাম্ব দুঃখ ও মনস্তাপ থেকে নিজেকে নিবৃত রেখে মনে মনে 'আমি অভিশপ্ত' এই কথা উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি আত্মজিজ্ঞাসা করেছিলেন অতীতে সুস্থ অবস্থায় তাঁর মনেও ওরকম বিকার ঘটতো, এ 'রমণী'রা তার থেকে যথেষ্ট উদার লেখক কালকূট শাম্বের মনোভাবনার কোন অতল থেকে ডুব দিয়ে তুলে এনেছেন এমন মনোভাবনা, যে কথাগুলো থেকে শাম্ব এই পৃথিবীর একজন সাধারণ রোগাক্রান্ত মানুষের কথা বলে মনে হয়েছে। পুরাণের 'চরিত্র'কে একালের মানুষে পরিণত করেছেন। তার আশ্চর্য লেখনীর যাদুতে।

কুষ্ঠদের ডেরায় গিয়ে কুষ্ঠরোগীদের সঙ্গে তার কথাবার্তা একটু লক্ষ্য করা যাক্। " কেউ কেউ বললো, 'নীলাক্ষির ছেলে নতুন বাপকে এখনো চিনতে পারছে না। ওহে ছেলের বাপ, ছেলেকে একটু আদর করছো না কেন?'

কেউ বললো, 'তোমার ঘরে কি বউ ছিল না? তোমার কি ছেলেমেয়ে ছিল না? তুমি কি গৃহস্থ ছিলে না? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন মোটেই ঘরকন্না করা জানোনা। কেন হে, তুমি কি রাজ-রাজড়ার ছেলে নাকি?' (১০০০/ঐ)

'শাম্ব মনে মনে বললেন, 'আমার এটাই পরিচয়, আমি অভিশপ্ত।' (১০০০/ঐ)

প্রভাযুক্ত ঋষির কাছে থেকে রোগমুক্তির জন্যে তিন স্থানে ও দ্বাদশ তীর্থে পরিভ্রমণের কথা জানতে ঋষিরকাছে ক্ষমা প্রর্থনা করে করজোড়ে বলেছিলেন 'আপনার উনদেশ ওরা গ্রহণ করে নি। আমি এক হতভাগ্য, ওরা যেন আরো অধিক হতভাগ্য। আমি ওদের জন্য এতই বিচলিত বোধ করছি, কেবলই মনে হচ্ছে, ওরাও কি দ্বাদশ স্থানে যেতে পারে না? আরোগ্য লাভ করতে পারে না? অমি কি ওদের সঙ্গে আহ্বান করতে পারিনা?' (১১০৬/ঐ) তার কথা শুনে প্রভাযুক্ত ঋষি বলেছিলেন, 'আমি তোমার কথায় বিরক্ত হওয়া দূরে থাক অত্যন্ত বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। তুমি যে-ই হও, আমার বিশ্বাস, তোমার শাপমোচন ঘটলো, তার সঙ্গে কোনো মহৎ কর্মেরও সাধন হবে। অন্যথায় এ চিন্তা তোমার মনে

উদিত হতো না।' (১০০৬/ঐ) শাম্ব তার রোগমুক্তির পথে যাওয়ার জন্য কুষ্ঠরোগীদের কাছে আবেদন করলেন, 'ব্যাধি হলে, আরোগ্য লাভের নানা উপায় আছে। আমাদের সেই উপায় অবলম্বন করতে হবে। এখনো আমাদের আশা আছে। মনে বিশ্বাস থাকলে আমরা আরোগ্য লাভ করতে পারবো, এই সব শিশু বালক বালিকারাও সুস্থ হবে। বড় হয়ে ওরা তোমাদের গয়গান করবে।'(১০০৮/ঐ) প্রথমে কেউ রাজী হয়নি। নীলাক্ষি সেই অসাধ্য সাধন করলো, 'ও সুস্থ্য লোকের মতন আমাদের কেবল উপদেশ দিতে আসে নি। ও আমাদের সঙ্গে যাবে ও আমাদের মতন একজন। আমি ওর সঙ্গে যাবো।' (১০০৮/ঐ) এরপরে সকলে একে একে রাজী হলো 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের মনেও আশা জাগছে। তোমাকে আমরা বিশ্বাস করি।' (১০০৮/ঐ) শাম্ব কুষ্ঠরোগীদের মনে এই যে বিশ্বাস জাগিয়ে সম্মিলিত করতে পেরেছেন তাই নিয়ে শাম্বর মনোভাবনা লেখক কালকূট প্রকাশ করেছেন এইভাবে, 'তিনি একজন ক্ষত্রিয়। কোনো কার্য সমাধা করতে হলে অস্ত্র ও বাহুবলেই তিনি অধিকতর বিশ্বাসী। অথচ সমস্ত ঘটনাটি ঘটে গেল এক মানবিক আবেদনে। এ ক্ষেত্রে তিনি দেখলেন, নীলাক্ষিই তাঁর অস্ত্র স্বরূপ কাজ করলো।'' (১০০৯/ঐ)

তারা পরদিন ভোরে যাত্রা করেছিল রোগমুক্তির পথে। সেইদিনের ভোরো প্রকৃতি বর্ণনাটি এইরকম, 'অন্ধকারে প্রথম পাখির ডাকেই শাম্বর নিদ্রাভঙ্গ হলো। এ ডাক রাত্রিচর পাখীর, প্রভাতের প্রত্যাশায় ব্যাকুল স্খলিত জিজ্ঞাসু পাখীর স্বর। শাম্ব দেখলে, পূর্বাকাশে ঈষৎ রক্তাভা জেগে উঠেছে।' (১০০৯/ঐ) প্রকৃতি মুখরিত, কুষ্ঠপল্লীর রূপ দেখা যাক্। শাম্ব ''প্রতিটি কুটিরের সামনে, মৃত্তিকা গহ্বরে কাছে গিয়ে সবাইকে ডেকে তুললেন।

মুহূর্ত মধ্যেই সমস্ত অঞ্চলটি কোলাহলে পূর্ণ হলো'' (১০০৯ঐ) সূর্যোদয়ের আগে প্রকৃতির পাখীর কূজনে মুখরিত, টিলার বসতিও তেমন 'নতুন করে বেঁচে ওঠার' আনন্দে মুখরিত। প্রকৃতি আনন্দ ও মানব মনের আনন্দ একাকার করে দিয়েছেন। শাম্বর নির্দেশে তারা দ্রুত প্রস্তুত হয়ে গেলো। এসব দেখে শাম্বর 'মনে পড়ে গেল, শ্বাম্ব এবং অন্যান্য বীরদের সঙ্গে যুদ্ধের কথা কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামের চিত্র ভেসে উঠলো চোখের সামনে। আজও যেন তিনি যুদ্ধযাত্রা করছেন। যুদ্ধের রূপ আলাদা।' (১০০৯/ঐ)

এইভাবেই লেখক কালকূট তাঁর মনের ভাবনাকে শিল্পের স্তরে নিয়ে গেছেন। শাম্বর একদল আশাহত, মৃতপ্রায় মানুষকে শাম্বর রোগমুক্তির চলার পথে বিশাল দলটির মাত্র চৌদ্দজন বেঁচে ফিরে এসেছিল। শাম্ব শাকদ্বীপ থেকে চিকিৎসকদের যে দলটি ভারতবর্ষে নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের দ্বারাই তারা কুষ্ঠরোগ মুক্ত হয়েছিলেন। দ্বাদশ বর্ষ ধরে এই চিকিৎসা চলেছিল, শাম্ব তাঁর আগের রূপ ফিরে পেয়েছিলেন, শাম্ব কুষ্ঠরোগের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

শাম্ব নীলাক্ষিকে বলেছিলেন 'নীলাক্ষি, মিত্রবলেন প্রথম এবং দ্বিতীয় রাত্রের কথা আমি ভুলি নি। তুমিও আমার অতি শক্তিময়ী মমতাময়ী মৈত্র। তুমি বিনা আজ এ সার্থকতা সম্ভব ছিল না।' (১০১২/ঐ) নীলাক্ষি কোনাদিত্যেই রয়ে গিয়েছিল। শাম্ব মিত্রতার বন্ধনে শাম্বর সঙ্গে বাঁধা পড়েছিল তাই সে বলেছিল

' তবে আজ থেকে এই কোণাদিত্যক্ষেত্রের নাম হোক মৈত্রেয়বন।' এই নামে মুগ্ধ হয়ে শাম্ব নীলাক্ষিকে বলেছিলেন, 'মৈত্রেয় কখনো মৈত্রেয়কে মিথ্যা বা দ্বিধা সূচক কথা বলে না।' (১০১৩)

তাদের এই সম্পর্কে কীভাবে কাব্য মণ্ডিত করেছেন দেখা যাক— 'নীলাক্ষি অশ্রুপূর্ণ চোখে হাসলো মৈত্রবনে বাতাস শনশন নিস্বনে প্রবাহিত হচ্ছে। কোণাদিত্য যেন তাকেই স্নেহপূর্ণ লোচনে অবলোকন করছিলেন।' (১০১৩/ঐ) বাক্য বিন্যাসের শব্দ জালে, প্রকৃতির রূপ বর্ণনাময় ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যে এ কাহিনী এক অনন্য সৌন্দর্যে প্রতিভাত হয়েছে।

মহর্ষি নারদ শাম্বের রোগমুক্তির অভিমানে সংগ্রমী, বিশ্বাসী, সিদ্ধিলাভের প্রতিজ্ঞায় অটল শাম্বকে কণাদিত্য বলে পূজা করেছেন। লেখক কালকূট তার মনোভ্রমণে কাহিনী এই ভাবে শেষ করেছেন, 'শাম্ব তাঁর অভিশাপের দিনেও অশ্রুমোচন করেননি। আজ এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে অশ্রুপাত রোধ করা কঠিন বোধ হলো। তিনি দেখলেন মহর্ষির দুই চোখও অশ্রুপূর্ণ, মুখে অনির্বচনীয় হাসি। তিনি ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বাইরে চলে গেলেন।' (১০১৩/ঐ)

এভাবেই কাহিনীটি অপরূপ শিল্পসুষমায় চিত্রিত হয়েছে লেখক কালকূটের অসাধারণ শৈল্পিক মনোভাব ও কল্পনার গুণে।

কালকূটের দৃষ্টি এবার পুরীর 'নির্জন সৈকতে'। তিনি দিশাহারার মনে ছুটে গেলেন 'পুরীর নির্জন সৈকতে'। তিনি পেরেছেন অকূল নীলাম্বুধির ডাক। তিনি স্বপ্নে এখেছেন, দূর দিগন্ত ছোঁয়া আকাশের হাতছাঁনি।

বেড়িয়ে পড়ার আনন্দ তাঁকে সবকিছু থেকে মুক্তি দিল, এক বিচিত্র ছন্দের নৃত্য যেন তাঁর মনের পাশে পাশে কালকূট বলেছেন, ''মানুষ নামের মদে আমার বড় তৃষ্ণা। আকণ্ঠ পান করে আমি নেশা করেছি। তারপর নেশা গেছে, কিন্তু খোয়ারি কাটে না। গড়াগড়ি যাই ধূলায়। তবু শক্তি পাই নে। অসহায় হয়ে বলি আমার মুক্তি কোথায়? আমার আলোর মুক্তি, অবশেষের মুক্তি?'' (পৃ. ১৩৪/নির্জন সৈকতে প্রথম খণ্ড) কালকূট যাত্রাকালে ট্রেনের সহযাত্রীদের বিবরণ দিয়েছেন, তার মধ্যে বিশেষ করে রেনুর কথা। কালকূট বলেছেন, ''যা দেখব না ভাবি, তাই চোখে পড়ে। আমি যেন একটি মূর্তিমতী শোককে দেখছিলাম। (পৃ. ১৪১/ঐ) কালকূট এই লেখার মাধ্যমে এমন একটি চিত্র তুলে ধরেছেন, তিনি একজন শিল্পী, আপন মনের রঙ তুলি দিয়ে সুনিপুন ভাবে চিত্র অঙ্কন করেছেন। কালকূট ছোট বৌদিকে একজন স্নেহশীলা রমণী রূপে চিত্রিত করেছেন। তিনি জগন্নাথ মন্দিরে গিয়েছিলেন। মন্দিরের গাত্রে কারুকার্য দেখে তাঁর শিল্পী মন উতলা হয়ে উছিল। মন্দিরের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে তাঁর মনে হয়েছিল তিনি অতীত ইতিহাসের পথ ধরে চলেছেন। যদি আঁকা থাকত সেই সব চরণ চিহ্ন, তাঁর আগে যাঁরা শতাব্দীকাল ধরে আরোহন করেছে এই মন্দিরে। তাঁর মনে হয়েছে শত শত বর্ষ আগে, সেই সব নরনারীর প্রাণে কী কথা অখন নিঃশব্দে উচ্চারিত হয়েছিল। কালকূট বলেছেন, ''এই প্রায়ান্ধকার সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে

আমার সর্বঙ্গ কন্টকিত হয়ে উঠল সহসা। তাঁর সুগৌর চরণ যেন আমি দেখতে পেলাম। এই পৃথিবীতেই তাঁর শেষ চরণচিহ্ন এই সিঁড়িতেই পড়েছিল। তিনি আরোহণ করেছিলেন, আর কোনোদিন অবতরণ করেন নি। এই নীলাচলেই তো নিমাইয়ের শেষ বাস, এই মন্দিরে তাঁর দেহের শেষ লয়।"(১৫৩/ঐ) লেখক কালকূট কী অনায়াসে, স্বাচ্ছন্দ্যে নিমাইয়ের শেষ পরিণতির অবস্থা চিত্রিত করেছেন। এমন ভাবে চিত্রিত করেছেন যেন পাঠক চোখের সামনে নিমাইয়ের ঐ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর এই বর্ণনা শিল্পের রূপ নিয়েছে। খুব সম্ভব কালকূটের এই ভাবনাই কালকূটকে চৈতন্যচর্চায় মনোনিবেশ করিতে আগ্রহী করে।

কালকূট কোণারকের মন্দিরে গিয়েছিলেন। তিনি নির্জন সৈকতের বুকে নিজেক যে খুঁজতে চেয়েছিলাম দেখলাম আমার আপনাকে দেখারই আয়না কোনারকের মন্দির গাত্র। "কে বলেছিল, এ মন্দির অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ? যদি শিল্পের দেবতা কেউ থাকেন, তবে সেই রুচিবাগীশের জন্যে কি তিনি করুণা কি হাসেন নি! এই পাথরের বুকে মানুষ তার স্বপ্নকে ফুটিয়ে তুলেছে, একটা বিশ্বাসের আনন্দ নিয়ে, আপনার স্বেদ মেদ, অস্থি মজ্জা সকল কিছু উৎসর্গ করে, এ কি কখনো শুধুমাত্র বিকৃত বিলাস?"... (২০৩/ঐ) কোনারকের মন্দির সম্বন্ধে লেখক কালকূট তাঁর যে মনোভাবনা ব্যক্ত করেছেন, তা তাঁর শিল্পী মনের পরিচয় বহন করে।

উপন্যাসটিতে কালকূট ভাষা, বর্ণনা, ভাবাবেগ ইত্যাদি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে 'নির্জন সৈকতে' উপন্যাসটিতে ভাষা বিচিত্র, বর্ণনা, ভাবাবেগ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে কালকূটের শিল্প সচেতনতার পরিচয়ে পাওয়া যায়।

কালকূট কাঞ্চনজঙঘার রূপ ও সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য যাত্রা করেন। এখন দেখা যাক 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে'র শিল্পরূপ কিভাবে প্রতিভাত হয়েছে। সুবর্ণমণ্ডিত কাঞ্চনজঙঘার বিশ্বমোহিত সৌন্দর্য কালকূট দেখেছিলেন। তিনি সুবর্ণমণ্ডিত এই কাঞ্চনজঙঘার যে রূপ বর্ণনা করেছেন তা পাঠকমনকে মুগ্ধ না করে পারে না। তাঁর শিল্পীমন অনায়াস স্বাচ্ছন্দে চিত্রকরের মতো তুলির আঁচড়ে কাঞ্চনজঙঘার রূপ তুলে ধরেছিলেন। স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে পৌঁছানোর পূর্বেই মণিহারি ঘাট, সকরিগলি ঘাট ঘুরে কালকূট যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা তিনি উপন্যাসটিতে চিত্রিত করেন যা পাঠক মনে দাগ কেটে যায়। কালকূট উপন্যাসটিতে প্রেমবতীর চরিত্রটিকে খুব দক্ষতার সঙ্গে চিত্রায়িত করেছেন। সুবর্ণমণ্ডিত কাঞ্চনজঙঘার সৌন্দর্য কালকূটকে মোহিনীমায়ায় আবিষ্ট করে ফেলে না, তিনি স্বভাবসিদ্ধ তৎপরতার সঙ্গে মানুষের হৃদয়রহস্যে মুগ্ধ হতে থাকে — পপলার ভিউয়ের তরুণী পার্বতী, তার স্নেহময়ী জননী মায়লী, চিত্রশিল্পী গণেশ সেন ও তার লাস্যময়ী মডেলকে কালকূট কয়েকটি তুলির টানে জীবন্ত করে তুলেছেন। স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে উপন্যাসটিতে বর্ণনা নৈপুণ্য, ভাষা বৈচিত্র্য, কথা, রচনাশৈলী ইত্যাদিতে লেখক কালকূটের শিল্পী

সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

' প্রেম কাব্য রক্ত' কালকূটের লেখা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস। 'প্রেম কাব্য রক্ত' উপন্যাসটির শিল্পরূপ আলোচনা করা হচ্ছে। উপন্যাসটি স্বাধীন সুলতানী আমলের কথা লেখা আছে। বাংলার সুলতানেরা নিজেদের যোগ্যতা দিয়ে, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের অন্যতম হয়ে উঠেছিলেন। ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠ ছাত্রের মতো কালকূট লক্ষ্য করেছেন যে কীভাবে কবি প্রেমিক গিয়াসুদ্দীন আজমশাহের নৃশংস হত্যা হল এবং হত্যার পর রাজা গণেশের উত্থান শুরু হল। মৃত্যুকালে গিয়াসুদ্দিন অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলেন 'কে?' লেখক কালকূট লিখেছেন, যেন বাতাসের তরঙ্গে ফিসফিস শোনা গেল ''আমি ইলিয়াসশাহী বংশের ধ্বংসকারী। আপনাকে দিয়ে শুরু করলাম। আমি কার আদেশ রক্ষা করছি, শুধু শেষবারের জন্য তাঁর নামটা শুনে যান। তিনি আপনার প্রাক্তন অজ উমরাত্র রাজা গণেশ।'' *(পৃ: ১৫১০, প্রেম কাব্য রক্ত)* তিনি আরও লিখেছেন ''ভবিষ্যতের ইতিহাস চোখ তুলে দেখল, রাজা গণেশের উত্থান শুরু হল এই রাত্রি থেকেই। কিন্তু সে কথা তখন কেউ জানতে পারল না। জানতে পারল না তখনও কত রক্তপাত বাকি। বাইরে মোরগের ডাক রাত্রি শেষ ঘোষণা করল। প্রাসাদের দেউড়ির ওপর থেকে সানাইয়ের সুর ভেসে এল।'' *(পৃ: ১৫১০, প্রেম কাব্য রক্ত)* ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু লেখক কালকূট তাঁর সমস্ত শিল্পীসত্তা দিয়ে এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন। তিনি শিল্পী মন দিয়ে বর্ণনা সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ, রচনাশৈলী, সব কিছুতেই একটা শিল্পের আঁচ পাওয়া যায়। এই উপন্যাসটিতে কালকূটের শিল্পীসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

কালকূট তুষার সিংহের পদতলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, '' আহ্ আমার মন পাগল হইলরে! তুষার সিংহের পায়ের তলায়, সূতোর মতো তিস্তা। সমতলে যে এলোকেশী রণরঙ্গিনী। বন জনপদ ডুবানি ভাসানি। শুনেছি, হস্তীমূথকে আছড়ে তলিয়ে নিয়ে যায়। কোনখানে সে আপন ঘরে শান্ত থাকে? তুষার সিংহের পায়ের নিচেই।''(৯৫২/ঐ) লেখক কালকূট 'তুষার সিংহের পদতলে''-তে তাঁর মনোভাবনা তাতি সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন। তুষার সিংহের পদতলে পৌঁছাবার আগেই তাঁর শিল্পরূপ সক্রিয় হয়ে ওঠে। অনায়াস স্বাচ্ছন্দে তিনি চিত্রকরের মতো তুলির আঁচড়ে বিভিন্ন চিত্র ফুটিয়ে তোলেন।

লেখক কালকূট তিস্তার উদ্দেশ্যে বলেছেন, '' কোথা থেকে আসছো তুমি? কোথায় তোমার জন্ম ভূমি? তুষার সিংহের পায়ের তলায়। কবে তোমারই সেই ঘরখানি দেখতে পাবো? পাবো কিনা কখনো?'' (পৃ. ৯৫৩/ঐ) তিস্তাকে উদ্দেশ্য করে লেখক কাটকূট তাঁর মনের আবেগকে এমন ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, তা একজন শিল্পির পক্ষেই এইরূপ সুনিপুন ভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব।

কালকূট বর্ণনা করেছেন, তুষার সিংহের দিকে তিনি তাকালেন, বিশাল মাথা উঁচু বিগ্রহ সকল,

তাদের সর্বাঙ্গ ধূসর। দেখতে দেখতেই একপাশে লালের আভা পড়লো, দ্রুত রঙ্ বদলাতে লাগল, সহসা তাঁর বুকের মধ্যে যেন কেঁপে উঠলো। তাঁর চোখের সামনে বিশাল এই সিংহমূর্তি পান্না সবুজ কেশর ফোলানো। সামনের দুই পায়ের উপর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। পিছনের দুই পায়ের ওপর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। পিছনের দুই পায়ের উপরে শরীরের ভার। বুকের তলে সুগভীর নীল। পিঙ্গল দুই চোখে তাকিয়ে আছেন।

লেখক বলেছেন, ''এই তার আঁতুড়ঘর। সমস্ত তুষারবৃত পাহাড়েই তার জন্মভূমি। বহু দিনের সাধ খাজাঞ্চি খানা দেখবো। সুখ সম্পদ মোক্ষ দর্শন এবং লাভ।''(৯৭২/ঐ) লেখক কালকূট এই বর্ণনাগুলির মাধ্যমে তাঁর শিল্প সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তুষার সিংহের সৌন্দর্য, দু'চোখ ভোরে দেখেও তাঁর কুন্দ নন্দিনীর জন্যে গভীর মমত্ববোধ জেগে উঠেছিল। কুন্দনন্দিনীর বিষজর্জর জীবন কালকূটের শিল্পী মনকে বেদনার ছায়ায় আবৃত করে।

মানবজীনকেন্দ্রিক রচনায় 'খুঁজে ফিরে সেই মানুষে' রচনায় তিনি সবার উপরে যে মানুষ সত্য সেই মানুষকে খুঁজে ফেরাই বাউলের ধর্ম। সে-মানুষ যে সে মানুষ নয় সে মনের মানুষ, সহজ মানুষ সে রসিক, সে অচিন পাখি, সে অধরা বাউলের সহজ সাধনার মানব মনের তত্ত্বতালাশ তিনি এক অপরূপ শিল্প সৌন্দর্য মহিমায় প্রকাশ করেছেন।

'কোথায় পাবো তারে'তে তিনি এই বাংলার বিশাল জনপদের অসংখ্য মেলায় ঘুরেছেন অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে। এখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানুষের সঙ্গে প্রাণখোলা আত্মীয়তার ফলে তিনি নিজেই একটা চরিত্র হয়ে যান। মামুদগাজী, ঝিনি, অচিনদা, বিন্দু, যোগমতী, গোপীদাস বাউল, গোকুলদাস বাউল, সুজনদাস বাউল, রাধা বাউলানী এ-সমস্ত মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে তিনি মানব জীবনের বিচিত্র দিক, জীবনাচার অপূর্ব এক শিল্পমহিমায় তাঁর বাউল ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন।

উপসংহার

'কালকূট'-এর রচনার বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে যে ভাবে বিভাজন করা হয়েছে সেগুলোকে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং পঞ্চম অধ্যায়ে এই রচনা গুলোর শিল্পরূপ অন্বেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কীভাবে এই গবেষণার কাজটি করা হয়েছে তারই একটি সংক্ষিপ্ত রূপচিত্র নিম্নে দেওয়া হল।

ভূমিকায় উল্লেখিত অধ্যায় ধরেই এই গবেষণার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হল— প্রথম অধ্যায়ে 'কালকূটের ব্যক্তিসত্তার পরিচয়' দেওয়া হয়েছে। 'কালকূট সত্তা'র আত্ম প্রকাশের পূর্বে সমরেশ বসুর লেখক সত্তার প্রকাশ ঘটে। এই 'সমরেশ বসু'ও 'কালকূট' দুই ভিন্ন সত্তা কিভাবে লেখার মধ্যে দিয়ে কাজ করে গেছেন তা আলোচনা করা হয়েছে তেমনি ব্যক্তিজীবনে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৮ এর মার্চ পর্যন্ত প্রায় চার দশক ধরে গঙ্গার স্রোতধারার মতো কলমের ধারায় কথার জাল বুনে বিচিত্র পটভূমি, বিচিত্র ভাবনা, জীবনের ভাঙাগড়া, সুখ দুঃখের খুঁটিনাটি চিত্র নিপুণ ভাবে এঁকে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে বিশেষ অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, অন্তরঙ্গ অনুসন্ধানই নানা ভাবে বিভিন্ন পট পরিবেশের মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যে উপস্থাপিত করেছেন। ছোটবেলা থেকে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ মিশুক স্বভাবের জন্য যে কোন পটপরিবেশে মিলে যেতে পারতেন। তিনি ছিলেন আশ্চর্য গল্পবলিয়ে। মায়ের কাছে পৌষের নিশাকালে শোনা ব্রতকথা পরদিন বন্ধুদের কাছে বলতেন কল্পনার রঙ মিশিয়ে। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল 'সুরথনাথ'। সুরথনাথের বাবার উদাসীনতা, সংসার বৈরাগ্য সব কিছুই বালক সুরথনাথকে প্রভাবিত করেছিল। এবং কিভাবে সুরথনাথ 'সমরেশ বসু' হয়ে গেলেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে সমরেশ বসু 'কালকূট' নামে পরিচিত হয়ে ধীরে ধীরে জীবন্ত কিংবদন্তীতে পরিণত হয়ে গেলেন, এসবই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

বন্ধু দেবশঙ্করের দিদি গৌরীদেবীর সঙ্গে প্রেমের উন্মাদনায় তিনি সতের বছর বয়সে নিজ ছাত্রজীবন শেষ করেছিলেন। এবং কঠিন জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে 'পার্টির পোষ্টার লেখা' ও হাতে লেখা লিপিকারের মধ্য দিয়ে নিজের অজান্তে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরতে শুরু করেছিল। এসবই উঠে এসেছে আলোচনায়। ১৯৪৬ সালে তাঁর প্রথম গল্প 'আদাব' পরিচয় পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। এবং তার প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ' (১৯৫১) প্রভূত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। যদিও তার প্রথম লিখিত উপন্যাস ছিল 'নয়নপুরের মাটি' ছদ্মনামে 'ভোটদর্পণ' নামে একটি রাজনৈতিক রচনা লিখেছিলেন। এরপরে ১৯৫৪-তে আনন্দবাজার পত্রিকায় রিপোর্টারের কাজ নিয়ে ফটো সহ মেলার ধারা বিবরণী

পাঠানোর মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল 'সমরেশ বসু'র অন্য এক ধারায় পথ চলা। পুরাণ-ইতিহাসের স্মৃতি বিজরিত সারাভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষের ভাষা পোশাক-খাদ্য-ধর্মীয় আচরণ তার হৃদয় উন্নীতে মহামিলনের সুর তুলেছিলেন, তার পূণ্যস্নান করতে গিয়ে ভীড়ের চাপে পিষ্ট হয়ে গিয়েছিল শতশত মানুষ, তাদের চিতার আগুন আকাশ স্পর্শ করেছিল, কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের চিত্র তারমধ্যে ভেসে উঠেছিল, তাঁর হৃদয় মনকে ব্যথিত করে তুলেছিল। তাই তিনি তাঁর 'বিষবাহী' প্রাণের 'অমৃতের পরশ পেতে লিখেছিলেন 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', নয়টি কিস্তিতে ধারাবাহিক ভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ছদ্ম নামে। 'কালকূট' ছদ্মনাম নিয়ে সমরেশ বসু তার ছেলে বেলার 'উদাসী বাউল' সত্তা 'সুরথনাথ- এর মধ্য দিয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

এক নতুন রচনাশৈলীতে 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' প্রকাশিত হয়েছিল 'কালকূট' নামে। 'সমরেশ বসু' সৃষ্ট তার দ্বিতীয় 'সত্তা' কালকূটের রচনা শৈলী সমরেশ বসুর রচনাশৈলী থেকে আলাদা। একই কলমের দ্বৈতধারা। 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'র প্রভূত সাফল্যের সাথে সাথে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল— এগুলোই বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া একই উৎস থেকে দুটি ধারার রচনাগুলোও আলোচনা করা হয়েছে। সমরেশ বসু জীবনীমূলক উপন্যাস, 'দেখি নাই ফিরে', রামকিংকর বেইজকে নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেন নি, অসময়ে ইহলোক ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। এই রচনাটিতে 'সমরেশ বসু' ও'কালকূট', দুজনে হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি চলতে শুরু করেছিলেন। এই সমস্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়েঃ 'কালকূটের রচনাবলীর বিষয়গত শ্রেণীকরণ' কালকূটের সমগ্র রচনা ১৯৫৪ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে কতগুলি বিষয় নজরে এসেছে বিষয়ের ভিন্নতা অনুযায়ী রচনা গুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন— ১. মানবজীবন কেন্দ্রিক রচনা ২. ইতিহাস-পুরাণ মহাকাব্য কেন্দ্রিক রচনা।

এই মূল দুটি ভাগের মধ্যে রচনা গুলিতে বিষয়গত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আরও নানা ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে যেমন, কালকূটের মানব জীবন কেন্দ্রিক রচনাগুলির মধ্যে আছে। অমৃতকুম্ভের সন্ধানে, খুঁজে ফিরি সেই মানুষ, আরবসাগরের জল নোনা, নির্জন সৈকতে, সবই শিখর প্রাঙ্গনে, কোথায় পাবো তারে, পিঞ্জরে অচিন পাখি, হারায়ে সেই মানুষ, মন চল বনে, বনের সঙ্গে খেলা, প্রেম নামে বন, তুষার সিংহের পদতলে, ঘরের কাছে আরশিনগর, মুক্তবেণীর উজানে, চল মন রূপনগরে, পণ্যভূমে পুণ্যস্নান এবং 'পূর্ণকুম্ভ, পুনশ্চ' ইত্যাদি।

এই মানবজীবন কেন্দ্রিক রচনাগুলিকে রচনার প্রকৃতি অনুযায়ী তিনটি উপবিভাজনে বিভাজিত করা হয়েছে। ক. লক্ষ্য রূপের আরশিতে বৈচিত্র্যের অন্বেষণ খ. প্রকৃতির টানে ঘর ছাড়া কালকূটের মানবজীবন অন্বেষণ ও গ. বাউলের সহজিয়া সাধনায় মানব মনের তত্ত্বতালাশ।

তৃতীয় অধ্যায় : মানবজীবন কেন্দ্রিক রচনা— এই অধ্যায়ে প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে লক্ষ রূপের আরশিতে মানবজীবন অন্বেষণ এই পর্বে প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'— এই কাহিনীতে আলোচনা করা হয়েছে প্রয়াগের মেলায় লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড়ে জীবনকে তিনি কিভাবে দেখেছেন। লক্ষ রূপের হাটে যে মানুষগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন সেই মানুষগুলোকে নিয়েই, তাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী দিয়ে কাহিনীর মালা গেঁথেছেন। ট্রেনে যেতে যেতে কুম্ভস্নান অভিলাষী যাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল, প্রয়াগে তার পৌঁছানো হয়নি। ট্রেনের মধ্যে পরিচয় হয়েছিল বলরাম, শ্যামা, প্রেমবতীয়া। স্টেশনের বাইরে ইন্‌জেকশন নেওয়ার সময় দেখেছিলেন প্রহ্লাদ, দিদিমাকে। দিদিমার বদান্যতায় কালকূটের তাঁদের তাঁবুতে থাকবার জায়গা হয়ে যায়। বলরাম কেদিন লেখক কালকূটকে শ্যামাদের তাঁবুতে নিয়ে আসে। এরপরে বারে বারে শ্যামার সঙ্গে যমুনার তীরে নিয়ে যায়। বলেছিল, কেন্দে ফিরতে চায় তাকে কেন্দেই ফিরতে দিন, যমুনার তীরে সেই দৃশ্য দেখে জীবন সার্থক করবে। এইভাবে শ্যামা-কালকূট একটা মানসিক সম্পর্কের বন্ধনে ধরা পড়েন। এই কাহিনীতেই উঠে এসেছে প্রহ্লাদের বালিকা বধূ 'ব্রজবালা'। লেখকের চোখে সে হয়ে উঠেছে ব্রজবেশিনী মঙ্গলচারিণী নারী। আর দিদিমার ছায়ায় কালকূটের তাঁবুতে কটা দিন কেটেছিল। কাহিনী উঠে এসেছে প্রেমজীদাসী রঘুনন্দনের স্বর্গীয় প্রেমকাহিনী, পাঁচবদ্যির হারিয়ে যাওয়া মেয়ে শিউলির কথা। রাত্রিশেষের অন্ধকারে গঙ্গাতটে দেখেছেন গৃহী অবধূত পরিবারের বন্ধন মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন, আবার দেখেছেন বালুচরের নিশিকে, আবছা ছায়া-ছায়া মূর্তি লেখক কালকূট তারা দেখছে আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে। বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত লক্ষ লক্ষ নরনারী আর সাধু-সন্ন্যাসীদের। মেলার শেষদিনে পুণ্যস্নানে গিয়ে অনেকেরই আর ফেরা হয় নি। ভীড়ের চাপে পিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছিল শত শত লোক। চিতার আগুন প্রয়াগের আকাশ স্পর্শ করেছিল। লেখক কালকূটের মনে প্রশ্ন? কার ক্রোধের ফলে শত শত লোকের প্রাণ গেল। কথার ফুলবাগানের মালী চিতার আগুনেই শেষ হয়ে গেছে। লক্ষ্মীদাসী চিতার আগুনের দিকে চেয়ে থাকে। আগুন নেভে না কিন্তু তাদের চলে যেতে হয় ঘরে ফেরার গাড়ি ধরার জন্য। ট্রেনে শ্যামার সঙ্গে দেখা হয়, নতুন বিধবা। শ্যামার সতীন জানায় 'আমার বুঢ়াটা' মরে গেল ভাই। শ্যামা জানায় বলরামকে সে একটা আংটি দিয়েছিল, কালকূট শ্যামার মুখে একটা প্রশান্তির ছাপ দেখেছেন। শ্যামারা পাটনায় নেমে যায়। কালকূট নিজের জায়গায় ফিরে আসে। লক্ষ রূপের মধ্যে থেকে কালকূট রূপ বৈচিত্র্যের অন্বেষণ করেছেন, নিজেকে খুঁজেছেন। কাহিনীটিতে কালকূট বহুরূপের মধ্যে নিজেকে, মানুষের আন্তররূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এই কাহিনী উপন্যাস হিসাবে কতটা সার্থক সেটাই দেখা হয়েছে।

এরপর আলোচনা করা হয়েছে 'পুণ্যভূমে পুণ্যস্নান'। সোনপুরে হরিহরছত্রের মেলায় পশু

বিক্রি হয়। পৃথিবীর অদ্বিতীয় পশুমেলা এটি। তাঁর পরিচিত প্রবাসী লেখক বন্ধু তাঁকে লক্ষ্ণৌ থেকে ট্রেনে তুলে দিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন পড়ন্ত জমিদারির উত্তরপুরুষ সিংবাহাদুর সাহেব। লক্ষ্ণৌর খানদানি মানুষ। উঁচু মনের, দিলখোলা মানুষ সপরিবারে চলেছেন সোনপুরের মেলায়, ক্রেতা হিসাবে নয়, 'লছমীপিয়ারী ও সূরয' নামে হাতী দুটিকে বিক্রি করতে। হাতী বিক্রি করে দিতে হবে জন্য সবার মন খারাপ, কিন্তু বিক্রি না করে উপায় নেই। ট্রেনের মধ্যে দেখলেন পবননন্দন চালচুলো ভবঘুরে। চেহারায় যার গ্রীক সৌন্দর্য। তার সঙ্গে সোনপুরের পশুমেলা দেখেন। ওর চোখ দিয়ে পশু বিক্রির গোপন সংকেত দেখেন, পশুদের দীর্ঘশ্বাস শোনেন। মীনাবাজারের মেয়েদের দেখেন, নিজের পরিবারের বাবা-স্বামী-ভাই কীভাবে মেয়েদের বিক্রি করে দেন সেটা পবননন্দন জানিয়ে দেয়। সত্যেনবাবু রেলকোয়ার্টারে অনেক লেখক-গুণীজনের সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। কুসুমের সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। মেলায় ঘুরতে ঘুরতে কালকূটকে ইতিহাসের আলোকে সোনপুরের মেলার কথা, মন্দিরের ভাস্কর্যের কথা শোনায়। আর গায়ত্রী নদীর কাছে বসে কালকূটকে তার ধর্ষিতা হওয়ার কাহিনী শোনায়। 'বলির মাংস' বলে সবাই তাকে ছিঁড়ে খেতে চায়। কালকূটের সঙ্গে হাজিপুর থেকে অধ্যাপক মিশ্র এসেছিল তার মুখেও সেই 'বলির' কথা! কুসুমের সঙ্গে কালকূট প্রীতির সম্পর্কে বাধা পড়ে। কালকূট তাঁকে আত্মহননের পথ থেকে আলোর পথে যেতে বলেন। বুদ্ধের শরণ নিতে বলেন। কুসুম কালকূটের কথায় বাঁচার পথ খুঁজে পায়। কুসুমের দেওয়া কুসুম ফুলের গাছটি কালকূট বাঁচাতে পারেন নি। পবননন্দন কালকূটকে না জানিয়েই চলে গেছে, এই বিশ্বপ্রকৃতিই ওর! এই কাহিনীকে ভাষা নৈপুণ্য কাহিনীর বিন্যাস, চরিত্রগুলোর কথাবার্তা কতটা সাহিত্যধর্মর আর কতটা বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে সেগুলো আলোচনা করা হয়েছে। উপন্যাসের মর্যাদা পেয়েছে কিনা সেটা দেখা হয়েছে।

এরপর 'পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ' আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়াগের কুম্ভমেলার ৩১ বছর পরে আবার হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় গেছেন। বুকে তার রোগের ছোবল বলে তিনি এবার ৩১ বছর আগের মত মনজোয়ারে ভাসতে পারেন নি। এই কাহিনীটি অনেকগুলো উপন্যাসের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। দিনলিপির আকারে লিখে গেছেন। 'কুম্ভমেলা' উপনামটিতে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকায় পাঠানো দুটি প্রতিবেদন তুলে দেওয়া হয়েছে, ৩১ বছর আগের কুম্ভমেলাকে জানবার জন্য। লক্ষ রূপের হাটে তিনি বহু মানুষকে দেখেছেন, তাদের তিনি তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চিত্রিত করেছেন। মাঝে মাঝে অতীতচারী হয়ে মহাভারতের গঙ্গাদ্বারে স্নান, অমৃত উত্থানের কাহিনী আরও মেলায় ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীকে দিয়ে 'পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ' কাহিনীটি রচনা করেছেন। দিনলিপির আকারে লেখা কাহিনীটি উপন্যাসের সম্পূর্ণতায় আসতে পারেনি এ'কথা এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

'হারায়ে সেই মানুষে' এটি একটি নাতিদীর্ঘ রচনা। লেখক কালকূট তার বাল্যকালের স্মৃতিতে

কাহিনীটি সৃষ্টি করেছেন। এতে কতকগুলো ছোট ছোট বালক বালিকার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সুন্দরভাবে করা আছে। এর সঙ্গে উঠে এসেছে তার বালকমনে কিছু নিষেধ না মানার কাহিনী। কয়েকদিনের জন্য দিদির শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে সকলের মন জয় করে ফিরে এসেছিল। বহু শিশুর মনোলোক চিত্রিত হয়েছে এতে। এই কাহিনীর ভাষাবৈচিত্র্য লক্ষ্য করার মত। লেখকের লেখনীর গুণে চরিত্রগুলো বাস্তব রূপ পেয়েছে।

'মুক্তবেণীর উজানে' এই কাহিনীটি আলোচনা করা হয়েছে এরপর। কালকূট ত্রিবেণী যাওয়ার পথে জাফর আলির মসজিদে গিয়েছিলেন। সেখানে জাফর আলির বংশধর এমদাদ আলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। টিলার ওপর থেকে তিনি ত্রিবেণীর মুক্তবেণীকে দেখেছিলেন। ইতিহাসের পাতায় ফিরে গিয়ে বর্তমানে ত্রিবেণীর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাইছিলেন। টিলা থেকে নেমে এসে এক অভিনব শবযাত্রার সঙ্গী হয়েছিলেন। চার খাটের ওপর মহিলা একটি শবদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা শবদেহ বইতে পারছিল না, তাই কালকূটকে কাঁধ দেওয়ার জন্য বারে বারে অনুরোধ করেছিল। অগত্যা কালকূট কাঁধ দিয়েছিলেন। কার মড়া, মড়াটি কে কিছুই জানা ছিল না। পরে জেনেছিলেন ওরা বারবনিতা। ত্রিবেণী ঘাটে শবদেহ নিয়ে পৌঁছানোর পর তারা গোরা চক্কোত্তির বাড়িতে তাঁর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিল। গোরা চক্কোত্তির বাইরের আচরণে কঠিন, ভিতরে একটি দিলখোলা শিশু। তার কলেজে পড়া মেয়ে তাকে কালকূটের ছবিসহ একটি পত্রিকা দেখিয়েছিল। মেয়ে কূলকূটকে চিনতে পেরেছে সেই গরবে বাবা গর্বিত।

গোরা চক্কোত্তি জানিয়েছিল গঙ্গার ঘাটে তাকে ক্ষ্যাপাবাবা দেখা করতে বলেছেন এ'কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। কালকূটকে ত্রিবেণীর ঘাটে পৌঁছে দিয়েছিলেন, গাড়ী না পেলে তিনি যেন তাদের বাড়িতেই চলে যান এ'কথা বলেছিলেন। শ্যামাক্ষ্যাপাবাবার সঙ্গে দেখা করে তিনি তাদের নৌকাতেই রয়ে গেলেন। ক্ষ্যাপাবাবার সঙ্গে তিনিও নৌকাতেই যাবেন। নৌকায় উঠে তিনি আর এক নতুন জীবনকে চিনলেন। ক্ষ্যাপাবার আশ্রমের সংসার। তিনি হারমোনিয়াম বাজান আর গলায় সাপ পেঁচিয়ে রাখেন। তার আশ্রমের সংসার হল অনাথ আশ্রম। গঙ্গা, যমুনা তার এই কন্যাই কুড়িয়ে পাওয়া। রতনও তাই। মেয়েদের বিয়ে দেওয়া তার একটি কাজ।

রাতে গঙ্গা-যমুনার সুমধুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভেঙে দেখেন জোয়ারে তারা অনেক দূরে চলে এসেছেন। ক্ষ্যাপাবাবা কালকূট তাঁদের আশ্রমে নিয়ে গেলেন। তিনদিন থেকে যেতে হল ক্ষ্যাপাবাবার নির্দেশে। আশ্রমে থেকে জানলেন আশ্রমের সংসারের জীবন। ক্ষ্যাপাবাবার 'সিদ্ধিলাভে'র স্থানটি গঙ্গা দেখিয়েছিল। বিশাল গাছের ছায়ায়, যেখানে দিনের আলো ঢোকে না সেখানে দাঁড়িয়ে গঙ্গা বলেছিল সে বিয়ে করে ঘরসংসারী হতে ভয় পায়। সংসারে কখনও থাকেনি বলেই তার এই ভয়। এ'কথা বলেই গঙ্গা হাঁটতে শুরু করেছিল। কালকূট ত্রিবেণী

সঙ্গমে এসেও ক্ষ্যাপাবাবার আশ্রমে থেকে এই অনুভবে পৌঁছে যান জীবন এক বহতা নদীর মতো চলমান মানবস্রোতে তিনি ভেসে যান।

প্রকৃতির টানে ঘরছাড়া কালকূটের মানবজীবন অন্বেষণ :

বনপর্ব : এই পর্বে আলোচনা করা হয়েছে বন পর্বের একটি রচনা 'মন চল বনে', 'বনের সঙ্গে খেলা' এবং 'প্রেম নামে বন'। এই তিনটি রচনা একে অপরের পরিপূরক। 'মন চল বনে' এই রচনাটিতে লেখক কালকূট ট্রেনে করে জরাইকেলা যাচ্ছেন। ট্রেনের মধ্যে যশোরিয়া টানের মানুষ গাঙ্গুলিমশাই-এর সঙ্গে বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিচিত হয়েছিলেন। তার কাণ্ড দেখে তাঁর ছেলে শিবু, মেয়ে তিপু ও তার স্ত্রী কখনও চোখে চোখে, কখনও মুখটিপে হেসে যাচ্ছিল। পরিচয় হওয়ার পরে জানতে পারেন তিনি যাদের বাড়ি যাচ্ছেন তারা তার পরিচিত। এবং 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়' তাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন। বনের প্রান্তসীমায় জরাইকেলা। যে বাড়িতে তিনি উঠেছেন সেই বাড়ির ছেলে নিতু কালকূট বন সম্পর্কে, বনবাসীদের সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দেয়। তিপু ও নিতু তাকে কোয়েনা নদী ও সায়টা নালা, বনের গাছপালা প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। জরাইকেলা থেকে মোহনবাবু ও সুরীনের সঙ্গে ছোটনাগরা যান। পথে যেতে যেতে শুক্রম, সোমারি ও তার শালী সুরসতিয়াকে দেখে মোহনবাবু ধমকে গাড়িতে তুলে নেন কাজ করার জন্য। ছোটনাগরায় নার্স তৃপ্তি ভৌমিকের সঙ্গে দেখা হয়। তৃপ্তি ভৌমিক কালকূটকে বনভূমি ঘুরিয়ে দেখায়। বনের গাছপালা, বনবাসীদের অসুখবিসুখ সম্পর্কে অবহিত করে। তৃপ্তি কালকূটের সঙ্গে এদেলবায় যেতে চায় কিন্তু কর্তব্যের টানে সে যেতে পারে না। তাঁর চোখে জল এসে যায়। কালকূট এদেলবার পথে রওনা দিয়ে দেন। রক্তকুসুম গাছের নীচে তৃপ্তি ভৌমিক দাঁড়িয়ে থাকে।

এরপর আলোচনা করা হয়েছে 'বনের সঙ্গে খেলা'র। ছোটনাগরা থেকে লেখক কালকূট রেঞ্জার বদরিকা প্রসাদের সঙ্গে গভীর অরণ্যকে দেখতে দেখতে ও কোয়েনার কুলু কুলু ধ্বনি শুনতে শুনতে এদেলবায় পৌঁছে যান। সেখানে বিশাল বিশাল বৃক্ষকে কাটা, টেনে এনে গাড়িতে তোলা সবই প্রত্যক্ষ করেন এবং ভূলুণ্ঠিত বৃক্ষগুলিকে দেখে বেদনার্ত হন। বনবাসী ও বনবাসিনীরা সবাইকে কাঠ কাটতে দেখে। বনকন্যা সুসতিয়ার সঙ্গে আবার ওই বনভূমিতে দেখা হয়ে গেল! ভূপতিত গাছের ফাঁক দিয়ে যখন সে বেরিয়ে এসেছিল মনে হয়েছিল জীবনবৃক্ষ। বনভূমি আর বনকন্যা রঙ রূপে একাকার। সন্ধ্যাবেলায় পাতার কুটিরে 'গুইয়ো' তে আবার সকলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কালকূট তাদের সঙ্গে ডিয়েং পান করেন ও নাচে অংশ নেন। এইভাবেই লেখক কালকূট বনপ্রকৃতির বনবাসী মানুষজনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে খেলতে আসেন। বনের প্রান্তসীমায় যে ছিল নবজাতক 'এদেলবার' বনভূমিতে সে যৌবনে পদার্পণ করে। পরদিন 'লোরে'র জলে

লেখক কালকূট ও সুরসতিয়া পোশাক উন্মুক্ত করে জল ছিটিয়ে স্নান করে। কালকূট তার সঙ্গে খেলায় মেতে উঠেছিলেন। সেই সময়ে তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল তিনি মাতৃপূজায় মেতেছেন। সুরসতিয়া তাঁর দৃষ্টিতে শক্তিরূপিণী মহামায়া হয়ে যায়।

খেলা শেষ, এদেলবার বনভূমি থেকে চলে যাওয়ার জন্য সিংজী জীপ নিয়ে উপস্থিত। সুরসতিয়া ঘুমিয়ে থাকায় সুরীন কালকূটতে ডাকতে দেয় না, তিনি তার 'কালো শীতল দুটি পায়ে' প্রণাম জানিয়ে বিদায় নেন। হঠাৎ করেই খেলা শুরু হয়েছিল, হঠাৎ করেই খেলা শেষ হয়ে যায়।

ইতিহাস পুরাণ পথে চলতে গিয়ে তিনি রচনা করেছেন 'বাণীধ্বনি বেণুবনে', 'শাম্ব', প্রাচেতস, যুদ্ধের শেষ সেনাপতি, পৃথা, অন্তিম প্রণয়, জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য ও প্রেম কাব্য রক্ত। বাণীধ্বনি বেণুবনেতে তিনি গেছেন জনকপুরে রামের বিবাহের বরযাত্রী হয়ে। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন একটি দরিদ্র পরিবারের মেয়ে ধীরুমায়া তার সেবা করেছিল। এখান থেকে তিনি চলে যান রাজগৃহে। সেখানে কাহিনীতে এসেছে সোন্‌পাতিয়া, পুরনো মন্দিরের সৌন্দর্য তার দেহে। কালকূট তিনি রাজগৃহের ধ্বংস স্তূপে গিয়ে পুরাণকালের খ্যাতিমান পুরুষদের ছায়ায় ছায়ায় বিচরণ করেছেন। পৌরাণিক ও মহাকাব্যে পথে চলতে গিয়ে কালকূট এক বিখ্যাত সংগ্রামী অভিযাত্রী শাম্বকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এগুলো চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তমসার তীরে তিনি সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এক মহান প্রেমিক পুরুষ প্রাচেতসের। যার মুখ থেকে ধ্বনিত হয়েছিল 'আদিকবি'র প্রথম শ্লোক। পৃথায় তিনি দেখেছেন এক ঐতিহাসিক রাণীকে। আর কুরুক্ষেত্রের শেষ সেনাপতি অশ্বত্থামার শেষ দিনে জ্বলে ওঠার একক সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছিলেন মানস চক্ষে। তিনি মহান প্রেমিক সমাজ বিপ্লবী অমৃত পুরুষ চৈতন্যের দর্শনের আশায় মানস ভ্রমণ করে নীলাচল পর্যন্ত। এগুলো বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে কালকূটের রচনাগুলোর শিল্পরূপ আলোচিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ ঃ

১. কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, ১ এ কলেজ রো, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-নববর্ষ, ১৩৯৪, এপ্রিল ১৯৮৭, পুনমুদ্রণ-বৈশাখ ১৪০৪, এপ্রিল ১৯৯৮।

২. কালকূট রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, ১ এ কলেজ রোড, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-নববর্ষ, ১৩৯৪, এপ্রিল ১৯৮৭, পুনমুদ্রণ-বৈশাখ ১৪০৪, এপ্রিল ১৯৯৮।

২. কালকূট রচনা সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, ১ এ কলেজ রোড, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-নববর্ষ, ১৩৯৪, এপ্রিল ১৯৮৭, পুনমুদ্রণ-বৈশাখ ১৪০৪, এপ্রিল ১৯৯৮।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১. বাল্মীকি রামায়ণ, সারানুবাদ, রাজশেখর বসু এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম মুদ্রণ-১৩৫৩, নবম মুদ্রণ-১৩৯০।

২. মহাভারত, প্রথম খণ্ড, বেদব্যাস বিরচিত কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত, তুলি-কলম, ১ কলেজ রোড, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ-জৈষ্ঠ ১৩৯৪, জুন ১৯৮৭, নূতন মুদ্রণ-ফাল্গুন ১৪০৭, মার্চ ২০০১।

৩. মহাভারত, বেদব্যাস বিরচিত কালীপ্রসন্ন সিংঅনূদিত, তুলি-কলম, ১ কলেজ রোড, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৪০৩, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, নূতন মুদ্রণ-মাঘ ১৪০৭,সেপ্টেম্বর ২০০১।

৪. ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার -বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, দশম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০২, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩।

৫. ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার -বাংলা দেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্য যুগ, ষষ্ঠ সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৩, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩।

৬. ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার - বাংলা দেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড , প্রাচীন যুগ, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০১, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩।

৭. ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার -বাংলা দেশের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, মুক্তি সংগ্রাম, তৃতীয় সংস্করণ, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩।

৮. শ্রী রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়- বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি

স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-১৩২৪, প্রথম দে'জ সংস্করণ-১৩৯৪, পুনর্বিন্যস্ত দ্বিতীয় মুদ্রণ-১৪০২, তৃতীয় মুদ্রণ-১৪০৫।

৯. কৃত্তিবাসী সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২.

১০. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত)- কৃত্তিবাস রামায়ণ শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ -আশ্বিন ১৩৬৪, আগস্ট ১৯৫৭, চতুর্থ মুদ্রণ- বৈশাখ ১৪০৯, এপ্রিল ২০১২।

১১. অন্নদাশঙ্কর রায় - লালন ফকির ও তার গান, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ চৈত্র ১৩৯৮, চতুর্থ মুদ্রণ-আষাঢ় ১৪৪৮।

১২. সমরেশ বসু রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ-জানুয়ারী ১৯৯৭, তৃতীয় মুদ্রণ-জুলাই ২০০১।

১৩. সমরেশ বসু রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ-জানুয়ারী ১৯৯৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ-জানুয়ারী ২০০০।

১৪. সমরেশ বসু রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ-জানুয়ারী ১৯১৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ-জুলাই ২০০১।

১৫. সমরেশ বসু রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ-জানুয়ারী ২০০০।

১৬. সমরেশ বসু রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ-জানুয়ারী ২০০১।

১৭. সমরেশ বসু রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ-জানুয়ারী ২০০২।

১৮. সমরেশ বসু রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০২।

১৯. সমরেশ বসু রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৩।

২০. সমরেশ বসু রচনাবলী, নবম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৪।

২১. সমরেশ বসু রচনাবলী, দশম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৫।

২২. সমরেশ বসু রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০১১।

২৩. সমরেশ বসু রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ মে ২০১২।

২৪. শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চম স্কন্ধ, ভক্তিবেদান্ত বুকট্রাস্ট, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৫, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৩।

২৫. শ্রীমদ্ভাগবত, ষষ্ঠ স্কন্ধ, ভক্তিবেদান্ত বুকট্রাস্ট, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৫, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৩।

২৬. শ্রীমদ্ভাগবত, সপ্তম স্কন্ধ, ভক্তিবেদান্ত বুকট্রাস্ট, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৪।

২৭. শ্রীমদ্ভাগবত, অষ্টম স্কন্ধ, ভক্তিবেদান্ত বুকট্রাস্ট, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৪।

২৮. শ্রীমদ্ভাগবত, নবম স্কন্ধ, ভক্তিবেদান্ত বুকট্রাস্ট, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৪।

২৯. শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ, ভক্তিবেদান্ত বুকট্রাস্ট, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৫, তৃতীয় সংস্করণ, জন্মাষ্টমী ২০০৪।

৩০. শ্রীমদ্ভাগবত, একাদশ স্কন্ধ, ভক্তিবেদান্ত বুকট্রাস্ট, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৪।

৩১. শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বাদশ স্কন্ধ, ভক্তিবেদান্ত বুকট্রাস্ট, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৪।

৩২. শ্রীশ্রী কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত- আদিলীলা, রাধাগোবিন্দনাথ সম্পাদিত, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬৩, সপ্তম মুদ্রণ ২০০৬

৩৩. শ্রীশ্রী কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত- মধ্যলীলা-১, রাধাগোবিন্দনাথ সম্পাদিত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৫৬, সপ্তম মুদ্রণ ২০০৬

৩৪. শ্রীশ্রী কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত- মধ্যলীলা-২, রাধাগোবিন্দনাথ সম্পাদিত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৫৬, সপ্তম মুদ্রণ ২০০৬

৩৫. কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত, অন্তলীলা, রাধাগোবিন্দনাথ সম্পাদিত, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৪, সাধনা প্রকাশনী, ৬৯, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-০৯

৩৬. উপন্যাসে বর্ণমালা, সুমিতা চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা -৯, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৯৮, দ্বিতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ জানুয়ারী ২০০৩

৩৭. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, দ্বাদশ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০৬, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

৩৮. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর সরোজ বন্দ্যোপাধায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-১৯৬১, পরিবর্তিত প্রথম দে'জ সংস্করণ জুন ১৯৯০, আষাঢ় ১৩৮৭

৩৯. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিমচ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পুনমুদ্রণ-জানুয়ারী ১৯৯৬, পুনমুদ্রণ-

১৯৯৭-৯৮।

৪০. বঙ্কিমরচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, শিশুসাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, সংশোধিত দ্বাদশ মুদ্রণ-আশ্বিন ১৪০১।

৪১. অরণ্যক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র এবং ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জৈষ্ঠ্য ১৩৮৩, অষ্টম মুদ্রণ, মাঘ ১৩৯৮

৪২. বিভূতিভূষণ ঃ আধুনিক জিজ্ঞাসা, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ফিরোজ শাহ রোড, দিল্লি ১১০০০১, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭, তৃতীয় মুদ্রণ-২০০৯

৪৩. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান, দীনেশচন্দ্র সেন, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম ছাপা- অক্টোবর ১৯৪০, প্রথম (করুণা) মুদ্রণ, কলিকাতা পুস্তক মেলা, ১৯৯৫

৪৪. সংসদ বাংলা অভিধান, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-০৯, সংশোধিত ও পরিবর্তিত তৃতীয় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৭১, বিশেষ ষোড়শ মুদ্রণ, জুন ১৯৯৪।

৪৫. গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ, ৫ নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা ০৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০২

৪৬. সংসদ সমার্থ শব্দকোষ, অশোক মুখোপাধ্যায়, ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৮৭, সংশোধিত সপ্তম মুদ্রণ, জানুয়ারী ১৯৯৬, একাদশ মুদ্রণ, মে ২০০৩

৪৭. মহাভারত, সি রাজাগোপালচারী, কলপতি কে. এ. মুন্সী মার্গ, মুম্বাই-০৭, প্রথম সংস্করণ ১৯৫১, সাতান্নতম সংস্করণ ২০১২

৪৮. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড, সুকুমার সেন, প্রথম সংকরণ ১৯৯৯, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯

৪৯. কালের প্রতিমা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-১২

৫০. বাংলা সাহিত্যের একদিক, শশিভূষণ, ষষ্ঠ বইমেলা সংস্করণ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা-৭৩

৫১. বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, শশিভূষণ দাসগুপ্ত, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৬৩, এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোংপ্রাইভেট লিমিটেড, কলেজ স্কেয়ার, কলকাতা-১২

৫২. সাহিত্যে ছোটগল্প, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিতীয় মুদ্রণ-১৪০৮, মিত্র-ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৫৩

৫৩. আধুনিক বাংলা উপন্যাস, অশ্রুকুমার সিকদার, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮, অরুণা প্রকাশনী, যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা-৬

৫৪. বাংলা পরিভাষা, ড. কৃষ্ণগোপাল রায়, সোমা প্রকাশন, ১৯৯৫, ড. ডি. রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,

কলকাতা-৯

৫৫. সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, তৃতীয় প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৪, জিজ্ঞাসা, কলকাতা-২৯

৫৬. চর্যাগীতি তারাপদ মুখোপাধ্যায়, পুণর্মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৮৫, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭

৫৭. বাংলা সাহিত্যে নানারূপ শুদ্ধ সত্ত্ব বসু, তৃতীয় মুদ্রণ, আষাঢ় ১৩৯৯, বিশ্বাস বুক স্টল, ৮৮ মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা-৯

৫৮. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সুকুমার সেন, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৮, আনন্দ চন্দ্র পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯

৫৯. সত্তর দশক দ্বিতীয় খণ্ড (সত্তর দশকের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যায়ন) অনীল আচার্য সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯

৬০. বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩

৬১. আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, ড. রামেশ্বর শ', প্রথম প্রকাশ, ২০০৬, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

৬২. বাংলা উপন্যাসে ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, ক্ষেত্রগুপ্ত, প্রথম প্রকাশ ২০০২, গ্রন্থ নিলয়, ৫৯/১ বি পটুয়া টোলা লেন, কলকাতা-৯

৬৩. বাংলা উপন্যাসে যুবসমাজ (১৯৬১-১৯৮৫), উর্মি রায়চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ, ২০০১, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন-৯

৬৪. শিল্পিত বাংলা উপন্যাস, গুণময় মান্না, প্রথম প্রকাশ ২০০২, বামা পুস্তকালয়, ১১ এ বঙ্কিমচ্যাটার্জী স্ট্রীট, ৭৩

৬৫. বাংলা উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতা, ড. প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, ২০০২, এডুকেশন ফোরাম, স্টল ৪১, ভবানী দত্ত লেন, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

৬৬. বাংলা কথা সাহিত্যে মনোবিশ্লেষণ, ড. কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, প্রথম পুষ্প সংস্করণ ১৯৯৯, পুষ্প, ১৩ বাঙ্গুর অ্যাভিন্যু, কলকাতা-৫৫

৬৭. সাহিত্য সন্ধান, ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮ সাহিত্যে বিহার, ১ মি কহেন্দ্রশী স্ট্রীট, কলকাতা-৯

৬৮. সায়াহ্নে, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৯

৬৯. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮

।গুপ্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১ বি পটুয়া টোলা লেন, কলকাতা-৯, চতুর্থ ।রণ নভেম্বর ২০০৯।

বকুমার বসু, কল্লোল গোষ্ঠীর কথা সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, প্রগুক্ত, দ্বিতীয় করুণা প্রকাশনী ংস্করণ, আগস্ট ২০০৮

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, প্রমথনাথ বিশী, নবম মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪০০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

. নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৮, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৯

৪. বঙ্গীয় শব্দকোষ, প্রথম খণ্ড, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০০৪

৫. পৌরাণিকা, অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭ বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৮

১. কালকূট সাহিত্যে সন্ধানে, শম্ভুনাথ চক্রবর্তী, সাহিত্যায়ন, ১/১ বি. ড. অমল রায়চৌধুরী লেন কলিকাতা-০৯

৭৮. বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস ঃ মধ্যাহ্নে থেকে সায়াহ্নে, অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

৭৯. চৈতন্য চরিতামৃত কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত, সুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি-০১, প্রথম প্রকাশ-১৯৬৩, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০৯

৮০. বাংলার বাউল ও বাউল গান, অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দোতলা), কলিকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ দীপান্বিতা ১৩৬৪, তৃতীয় সংস্করণ-নববর্ষ ১৪০৮

৮১. সঞ্চিতা, কাজী নজরুল ইসলাম, পঞ্চমপঞ্চাশৎ সংস্করণ, জন ২০০১, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী কলকাতা-৬

পত্রপত্রিকা ঃ

১. এবং জলাক, জা-মা ১৯৮৮

২. 'দেশ' সমরেশ বসু স্মরণে, ১৪ মে, ১৯৮৮

৩. সমরেশ বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, আজকাল পত্রিকা, 'রবিবাসর' ১৯৮৫, ৬ই অক্টোবর